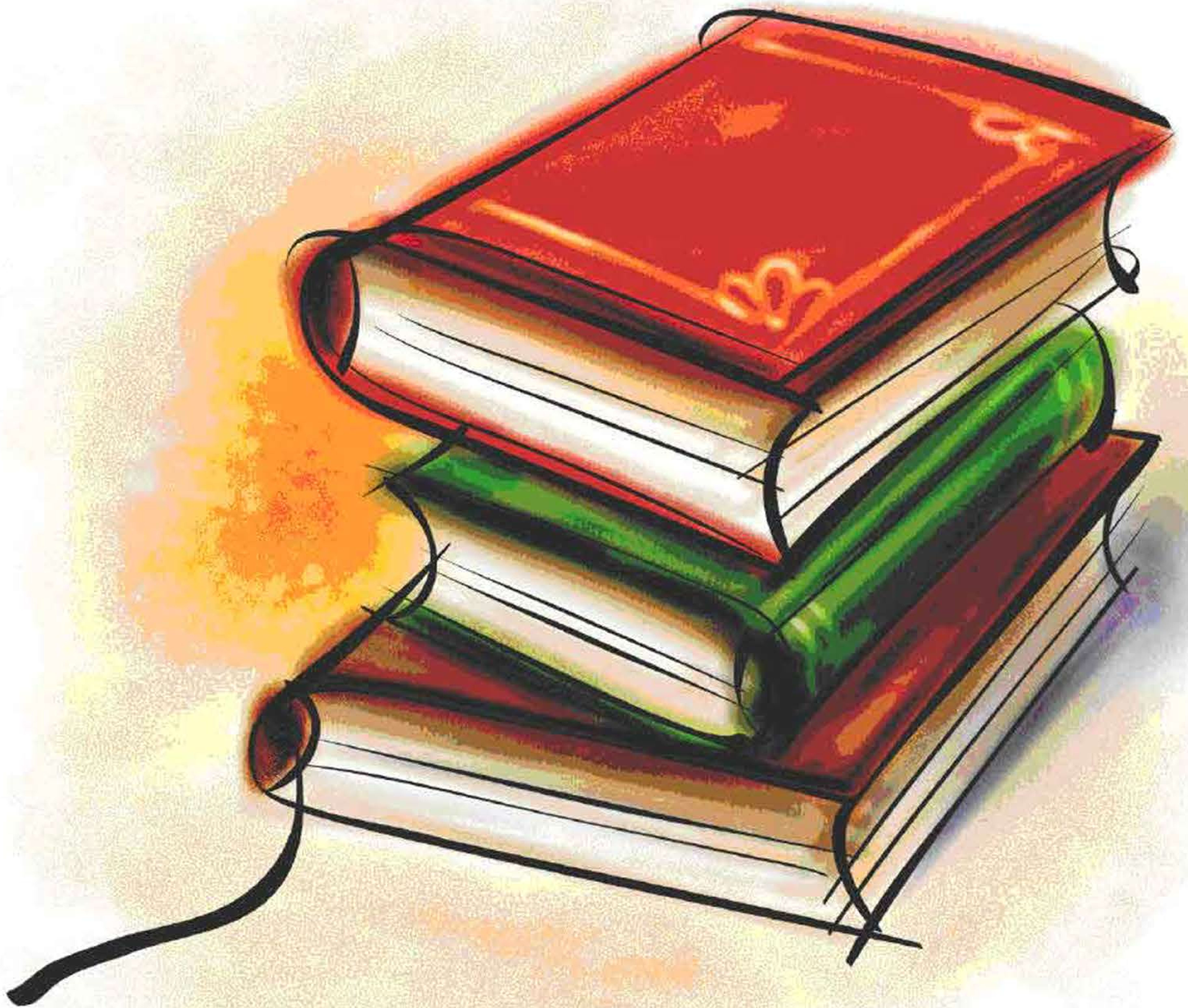
"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"



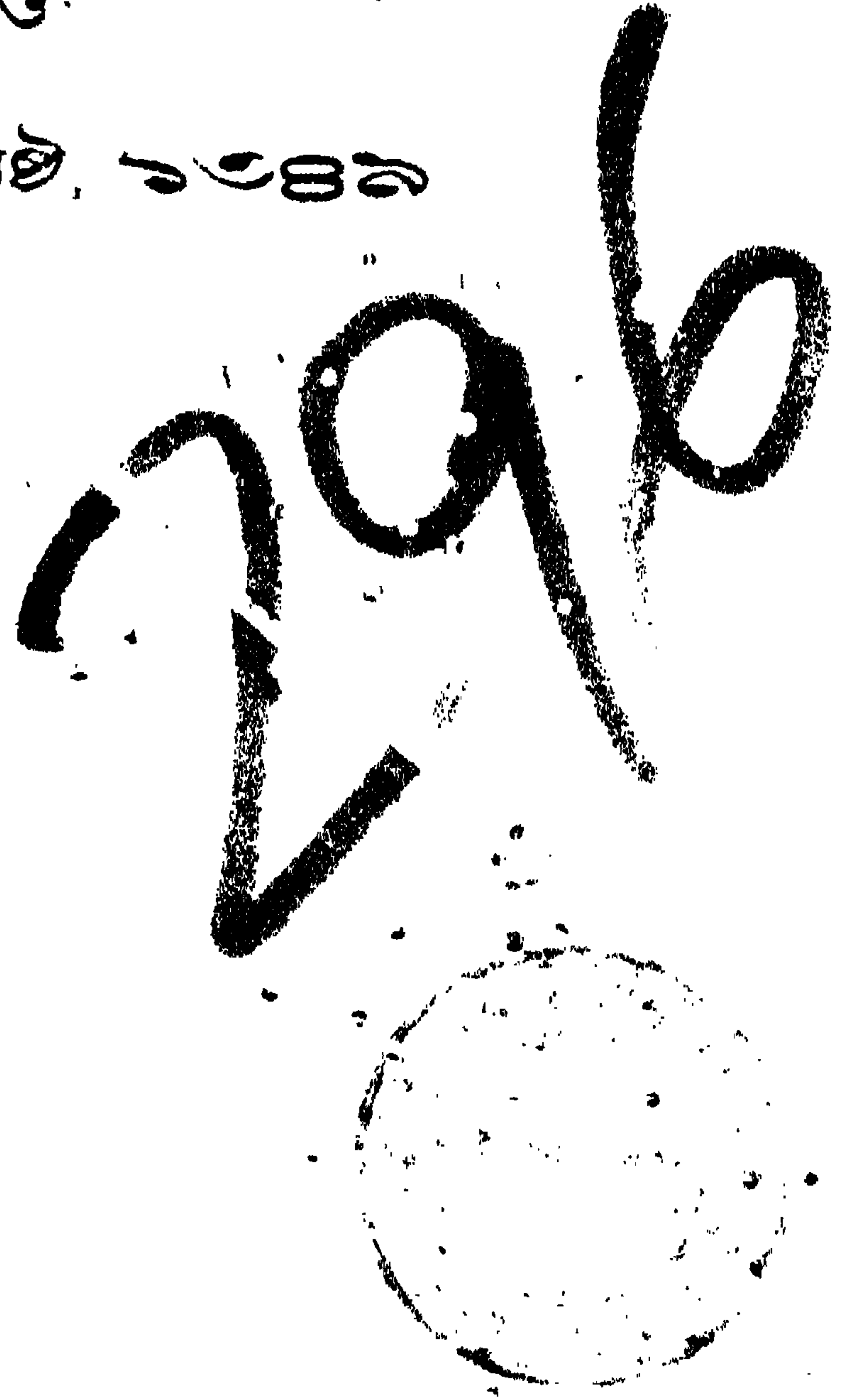
মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

বঙ্গশ্রী

নবম বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড

পৌষ, ১৩৪৮ হইতে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯



ষাণ্মাসিক সূচী

সম্পাদক

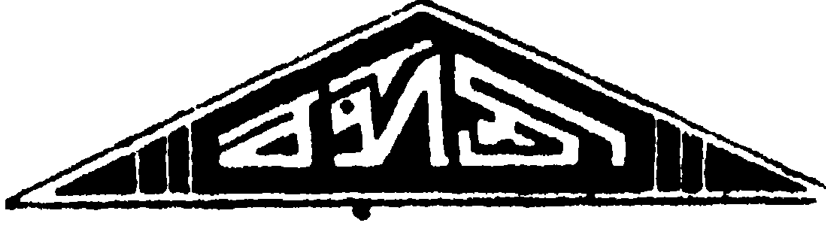
শ্রীরসিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

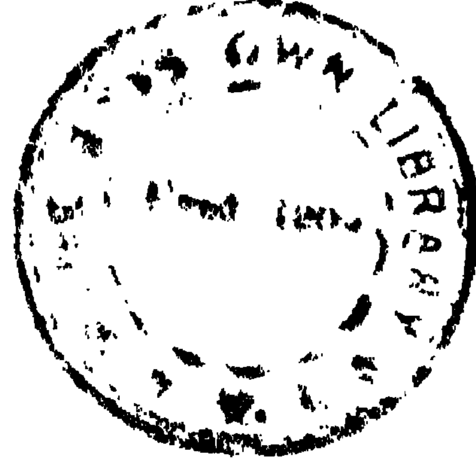
মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড

৯০, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

বর্ণানুক্রমিক লেখক-সূচী

চিত্র-সূচী





বৈশাখ—১৩৫০,
১০ম বর্ষ ২য় খণ্ড—১ম সংখ্যা



নববর্ষ

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

পুরাতন বর্ষ হ'ল শেষ ;—জীবনের অস্তাচল-কূলে
হেরি' তারে নব রক্তরাগে নীরবে প্রণাম করি।
দিগন্ত শায়িত পথে দেই তারে মহানিষ্ক্রমণ,
নূতনের যাত্রা হ'ল সুরু। সম্মুখে নূতন দিন
নূতন সঞ্চয়
মঞ্জুরিয়া শুষ্ক তরু,
ফোটায়ে নূতন ফুল, ভরিয়া পথের ধূল্
নব তৃণে নবীন সবুজে
উদার আকাশ-তলে পাখা মেলি' নব মেঘলোকে
উড়ায়ে সঞ্চিত ধূলি, ছড়ায়ে ফুলের ডালা
নূতন কাজল ছানি' কচি কচি শ্যামল পাতায়
লেবুর ফুলের ঘ্রাণে, আমের মঞ্জরী-গন্ধে
নব ছন্দে ভরিয়া ভুবন—
ভিজায়ে তৃষিত মাটি নব জলধারার সিঞ্চনে,
অতীতের ভস্ম হ'তে অঙ্কুরিছে নবীন জীবন ;
তারেও প্রণতি করি,

প্রশ্ন করি,

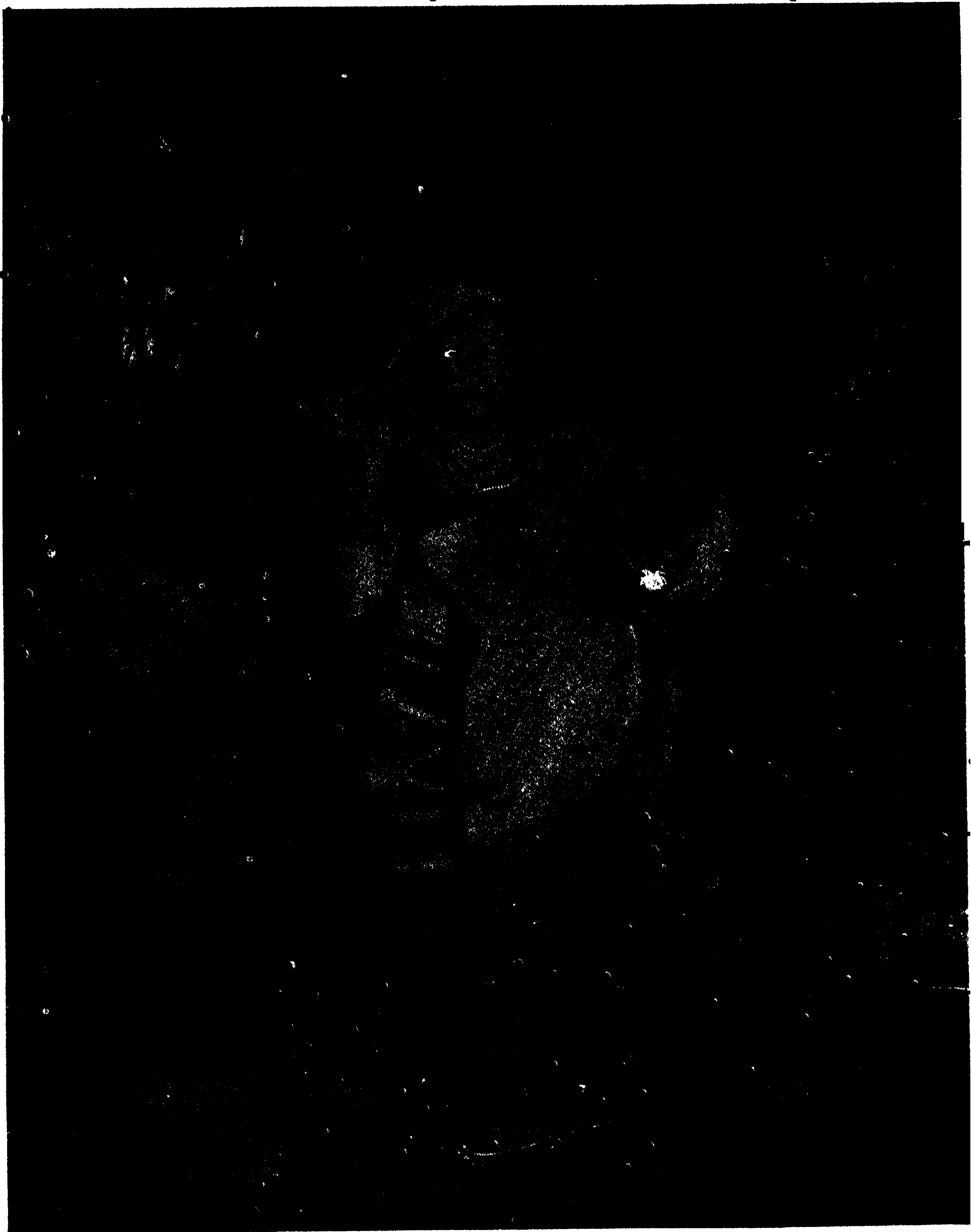
মানুষের জীবনের শীর্ণ শুষ্ক কঠিন শাখায়
আসে নি নূতন পাতা কত দীর্ঘ দিন! খর মরুদাহে
মৃতের কঙ্কালসম ভুবনের এক প্রান্তে রয়েছে দাঁড়ায়ে
অন্তহীন চরম দুর্দৈবে, কালের শ্মশান-কূলে
কালো ছায়া মেলিয়া আকাশে!—
কী এনেছো নূতন পথিক!
তোমার সোনার ঝাঁপি ভ'রে এনেছো কী নতুন সঞ্চয়
আয়ুহীন জীবনের লাগি' কী এনেছো নূতন পাথেয়!
অরুণ আলোর রঙে দিগ্‌চক্রতলে জেলেছ কী উজ্জ্বল মশাল
মানুষের লোভ আর খলতার ক্ষুধিত শৃগাল
সে আলোকে পড়িয়াছে ধরা;—সংসার শ্মশানে যারা
হানাহানি ক'রে ফিরে অন্তহীন অন্ধ হিংস্রতায়
প্রহরের আতঙ্কেরে অন্ধকারে কালরাত্রি যাপিছে শঙ্কায়।

আলো নাই এ জীবনে,
রূপ নাই, রস নাই, নাই পরিচয়
আনন্দ লাবণ্যহীন ক্ষুধিত নির্ম্মম
জীবনের অন্তিম-শিয়রে দুঃখের প্রদীপ জলে নিষ্কম্প শিখায়
—রাত্রিদিন,
প্রাণহীন জীবনের শব
বহিছে অনন্ত ক্লেশে অন্তিমের পথে;
—ললাটে জলে না রবি আরক্ত গৈরিকে
জয়ের তিলক নাই ক্ষয়দৃপ্ত ভালে
নয়নে নূতন আলো নূতন চাহনী
জীবনে নূতন আশা নূতন স্বপন
নাই নাই কিছু নাই
নবজীবনের মহামুক্তির আস্বাদ কত কাল পায় নাই তারা!
—দুরন্ত ঝটিকারূপী ওগো বহুরূপী!
খোল তব সর্ব্ব আবরণ
উলঙ্গ উজ্জ্বল সূর্য্যে ভরিয়া ভুবন
দেখাও নূতন মুখ দীপ্ত নবারুণে
কঠিন ঝড়ের বজ্রে প্রদীপ্ত আলোকে আবার দেখাও মুখ
অট্টহাসে অতি আচম্বিতে
জন্ম আর মৃত্যু-মাঝে আদি অন্তে হোক্ পরিচয়।
জ্বালো তব রুদ্র বহ্নি-শিখা,
পুরাতন ভঙ্গুর কঙ্কাল দগ্ধ হ'য়ে জাগুক নবীন
নয়নে নূতন স্বপ্ন অমল উজ্জ্বল
জীবন প্রসাদপুষ্ট দীপ্ত ভয়ঙ্কর;
নৈরাশ্যের কলঙ্কের ছায়া লুপ্ত হোক্ নব বজ্রপাতে।

আর্ত্তেরে নির্ভয় করো, নিঃস্বতারে করো দূর—
নিরন্ন তৃষিত মুখে দাও অন্নজল
মৃত্যুপথযাত্রী এই মানুষের করুণ ক্রন্দন
স্তব্ধ কর নব জয়োল্লাসে।

নিখিলের দিকে দিকে ধ্বনিতেছে তীব্র হাহাকার—
আতঙ্কিত সৃষ্টি সাথে কম্প্রবুকে কাঁপিছে মানুষ
ঈশাণে জমেছে মেঘ বজ্রগর্ভ, কঠিন করাল,
তারই মাঝে জাগো তুমি হে প্রলয় সুন্দর ভয়াল—
আসন্ন মৃত্যুর এই বিষবাষ্প হ'তে
মুক্ত ক'রে বাঁচাও বিশ্বেরে।
দুঃখের পাবকে দগ্ধ জরাজীর্ণ প্রাচীন পৃথিবী
আর তার ভাগ্যহীন মানুষের দীর্ণ ইতিহাস
রোগ, শোক, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, মড়ক
অনন্ত বৈরিতাভরা অন্তঃসারহীন এই দম্ভের হিমাদ্রি
সর্ব্বনাশা সভ্যতার অসভ্য স্পর্দ্ধারে
চূর্ণ কর নির্ম্মম আঘাতে।

তোমার অশনি সাথে আনো নব প্রাণের মুকুল
ধ্বংসের শ্মশান-ভস্মে নবজন্ম লভুক বসুধা
মরণ-বিজয়ী তব নব মন্ত্র শোনাও মানবে
বিক্ষুব্ধ বিপুল বুকে গর্জ্জমান্ গুরু গুরু রবে;
—শক্তি দাও শান্তি দাও, দাও তারে বল
অক্ষমের কণ্ঠ হ'তে ছিন্ন করো এ অনন্ত মৃত্যুর শৃঙ্খল।



বাঁশীর ডাক

শিল্পী—শ্রীশচীন্দ্রভূষণ ধর

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

ধান্যশ্রী

দশম বর্ষ | পৌষ—১৩৪৯ | ২য় খণ্ড—১ম সংখ্যা

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ও রচনাপ্রণালী

আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রধান দায়িত্ব ও প্রধান কর্ত্তব্য কি কি তাহা নির্দ্ধারণ করা। মনে রাখিতে হইবে যে জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রধান দায়িত্ব ও প্রধান কর্ত্তব্য কি কি, কেবল মাত্র তাহাই আমরা এই প্রবন্ধে নির্দ্ধারণ করিতে বসিয়াছি। জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় যে যে বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হইয়াছে তাহা যখন তিরোহিত হইয়া যাইবে তখন আমাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য যাহা যাহা হইবে তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা আমাদিগের এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আরও মনে রাখিতে হইবে যে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যাহা যাহা প্রধান দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য কেবলমাত্র তাহাই আমাদিগের এই প্রবন্ধের আলোচ্য। শিক্ষার্থী ছাত্র সম্প্রদায়ের অথবা বিশেষজ্ঞ রাজপুরুষ ও বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের অথবা অর্দ্ধাহারী অশিক্ষিত শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের যাহা যাহা কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা আমাদিগের এই প্রবন্ধের অভিপ্রেত নহে।

আমরা এই প্রবন্ধে যাহা আলোচনা করিতে বসিয়াছি তাহা সম্পূর্ণ ও ভ্রমপ্রমাদহীন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে বৈশিষ্ট্য কি কি (অর্থাৎ এমন কোন্ কোন্ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যাহা আগে ছিল না এবং কেবলমাত্র গত ২।৩ বৎসরেই দেখা যাইতেছে) তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। তাহার পর, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে অকাম্য বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হইল কেন তাহার কারণ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে যে যে অকাম্য বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা দূরীভূত করিতে হইলে কোন্ কোন্ পন্থার আশ্রয় লইতে হয় তাহা স্থির করিতে হইবে। চতুর্থতঃ বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে যে যে অকাম্য বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হইয়াছে তাহা দূরীভূত করিতে হইলে যে যে পন্থার আশ্রয় লইতে হয় সেই সেই পন্থার কোন্ কোন্টী ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায় অনায়াসে কাহারও সহিত বিরোধিতা না করিয়া, কোনরূপ বিপদের সম্মুখীন না হইয়া গ্রহণ করিতে পারেন তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

এক্ষণে আমরা উপরোক্ত চারিটী চিন্তার বিষয় একে একে এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে বৈশিষ্ট্য কি কি ?

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে বৈশিষ্ট্য কি কি তাহা সংক্ষেপ করিয়া বলা যাইতে পারে আবার বিস্তৃতভাবেও তৎসম্বন্ধে

আলোচনা চলিতে পারে। বর্ত্তমান পরিস্থিতির এই বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে হইলে বলিতে হয় যে উহা দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য আপাতদৃষ্টিতে মানুষ মাত্রেরই কাম্য। আর, অপর শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য মানুষ মাত্রেরই অকাম্য। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে যে যে কাম্য বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে নিম্নলিখিত তিন কথায় প্রকাশ করা যায়, যথা :—

(১) শিল্প ও বাণিজ্য কার্য্যের বিস্তৃতি (Industrial and Commercial expansion)

(২) নিয়োগ ও চাকুরীর বিস্তৃতি। (Expansion of Employment and Services)

(৩) শিল্প ও বাণিজ্যে লাভের হারের বৃদ্ধি। (Increment in the rate of profit of Industrial and Commercial Concerns)

যে যে অকাম্য বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে হইলে নিম্নলিখিত আটটী কথা বলিতে হয়, যথা :—

(১) প্রয়োজনীয় ঔষধ, খাদ্য, পরিধেয় ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্য হারের অপরিমিত বৃদ্ধি।

(মানুষ তাহার আয়ের অনুপাতে প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনিবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যে মূল্য দিতে সক্ষম হয়, দ্রব্যের মূল্য যখন তদপেক্ষা বেশী হয় তখন ঐ মূল্য অপরিমিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে ইহা বুঝিতে হয়।)

(২) প্রয়োজনীয় ঔষধ, খাদ্য, পরিধেয় ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যের প্রয়োজনীয় পরিমাণের দুর্লভতা ও অপ্রাপ্যতা।

(মানুষকে সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে তাহার কার্য্যের রকমানুসারে কতগুলি খাদ্য, পরিধেয় ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যের খানিকটা পরিমাণ তাহার নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বিলাসিতা ও অমিতব্যয়িতা সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিলেও উপরোক্ত দ্রব্যগুলির খানিকটা পরিমাণ না হইলে মানুষ সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। উপরোক্ত দ্রব্যগুলির উপরোক্ত পরিমাণ মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্য, পরিধেয় ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যের প্রয়োজনীয় পরিমাণ। উপরোক্ত দ্রব্যগুলির উপরোক্ত পরিমাণ যখন মানুষ তাহার হাতের কাছে কোন ক্লেশ না করিয়া পায়, তখন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রয়োজনীয় পরিমাণ সুলভ হইয়াছে ইহা বুঝিতে হয়। যখন উহা হাতের কাছে পাওয়া যায় না এবং পাইবার জন্য মানুষের চেষ্টা প্রয়োজন হয় তখন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রয়োজনীয় পরিমাণ দুর্লভ হইয়াছে ইহা বুঝিতে হয়। আর যখন চেষ্টা করিয়াও মানুষ তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রয়োজনীয় পরিমাণ যোগাড় করিতে পারে না তখন ইহা অপ্রাপ্য হইয়াছে ইহা বুঝিতে হয়।)

(৩) মিলিটারী বিভাগের প্রয়োজনের জন্য বাসস্থানাদি হইতে বিচ্যুত হইবার আতঙ্ক।

(৪) শত্রুপক্ষের আক্রমণে সপরিবারে বিধ্বস্ত ও বিনষ্ট হইবার আতঙ্ক।

(৫) নৌকা, রেল, ষ্টীমার, ট্রাম ও বাস প্রভৃতিতে জনতার জন্য এক স্থান হইতে আর এক স্থানে যাতায়াতের অসুবিধা।

(৬) গুণ্ডা, চোর, ডাকাত ও সৈন্যগণের অত্যাচারের আতঙ্ক।

(৭) গভর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত ট্যাক্স্ সমূহের অসহনীয় ভার বহন।

(৮) জন-নায়কগণের কারাগারে আবদ্ধ হইবার জন্য প্রত্যেক অসুবিধার প্রতিবিধান সম্বন্ধে নৈরাশ্য।

বর্ত্তমান পরিস্থিতির উপরোক্ত কাম্য ও অকাম্য বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, কাম্য বৈশিষ্ট্যগুলিতে মানুষের কিছু সুবিধা হইয়াছে আর অকাম্য বৈশিষ্ট্যগুলিতে মানুষের দৈনন্দিন জীবন নির্ব্বাহ করা ও জীবনধারণ করা অবর্ণনীয়ভাবে ক্লেশকর হইয়াছে। কাম্য বৈশিষ্ট্যগুলির সুবিধাসমূহ উপভোগ করিতেছেন কেবলমাত্র সমাজের শিল্পী, বণিক ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সামান্য অংশ, আর অকাম্য বৈশিষ্ট্যগুলির অসুবিধায় জর্জ্জরিত হইতেছেন সমাজের প্রায় প্রত্যেকে। যাঁহারা কাম্য বৈশিষ্ট্যগুলির সুবিধা উপভোগ করিতেছেন তাঁহারাও অকাম্য বৈশিষ্ট্যগুলির অসুবিধায় জর্জ্জরিত হইতেছেন, তাঁহাদিগেরও কাম্য বৈশিষ্ট্যের সুবিধাসমূহের তুলনায় অকাম্য বৈশিষ্ট্যের অসুবিধা অধিকতর বলিয়া মনে হইতেছে।

যাঁহারা মনে করেন যে আধুনিক শিল্প, বাণিজ্য ও চাকুরীক্ষেত্র প্রসার লাভ করিলে মানুষের বেকার, অর্থাভাব ও খাদ্যাভাব সমস্যার পূরণ হইতে পারে তাঁহাদিগের

মতবাদ যে অত্যন্ত ভ্রম-প্রমাদ পরিপূর্ণ ও অসার তাহা বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে প্রতিপন্ন হইবে।

উপরোক্ত কাম্য ও অকাম্য বৈশিষ্ট্যগুলির কেবলমাত্র বর্ত্তমান বৎসরে উদ্ভব হইয়াছে। এক বৎসর আগে ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান ছিল না। ইহারই জন্য ঐগুলিকে বর্ত্তমান পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য বলিতে হইবে। বর্ত্তমান পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়া ভারতবাসীর আরও অনেকগুলি সমস্যা আছে, সেই সমস্যাগুলি পাঁচ প্রকার; যথা:—

(১) অর্থাভাব, (২) স্বাস্থ্যাভাব, (৩) শান্তির অভাব, (৪) অকাল-বার্দ্ধক্য ও (৫) অকাল-মৃত্যু।

বর্ত্তমান পরিস্থিতির কাম্য ও অকাম্য বৈশিষ্ট্যগুলি ও উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর সাধারণ সমস্যাগুলি যে কেবলমাত্র ভারতবর্ষে উদ্ভব হইয়াছে তাহা নহে। অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে উহার প্রত্যেকটী জগতের প্রত্যেক দেশে অত্যধিক বিকটভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। বিরাট বিরাট বীরপুরুষগণের অধিনায়কত্ব থাকিলেও হিটলারের দেশ, তোজোর দেশ, মুসোলিনীর দেশ, চার্চ্চিলের দেশ রুজভেল্টের দেশ ও ষ্ট্যালিনের দেশ ঐ সমস্ত অকাম্য বৈশিষ্ট্য ও সমস্যার হাত হইতে বিন্দুমাত্রও রক্ষা পাইতে পারে নাই।

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে অকাম্য বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হইল কেন?

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হইল কেন তাহার অনুসন্ধান করিতে বসিলে সর্ব্বপ্রথমে বর্ত্তমান পরিস্থিতির প্রধান অঙ্গ কি তাহার দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। বর্ত্তমান পরিস্থিতির প্রধান অঙ্গ যে জগৎব্যাপী যুদ্ধ ইহা বলাই বাহুল্য, কাজেই বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে উপরোক্ত কাম্য ও অকাম্য বৈশিষ্ট্যসমূহের উদ্ভব হইল কেন তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে জগৎব্যাপী যুদ্ধের উদ্ভব হইল কেন তাহার কারণ সন্ধান করিতে হইবে।

অনেকে মনে করেন যে, জগৎব্যাপী যুদ্ধের কারণ এক কথায় বলা যাইতে পারে উহা হিটলারের সাম্রাজ্য-লোলুপতা। আমাদিগের মতে হিটলারের সাম্রাজ্য-লোলুপতা যুদ্ধের কারণ—এই কথা ধরিয়া লইলে জগৎব্যাপী যুদ্ধের মূল কারণ নির্দ্ধারণ করা হয় না। এই কথা অতীব সত্য যে, জার্ম্মাণ জনসাধারণের আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতা না পাইলে একমাত্র হিটলারের সাম্রাজ্য-লোলুপতাতে জগৎব্যাপী এত বড় দুর্দ্ধর্ষ যুদ্ধের উদ্ভব হইতে পারিত না। কাজেই হিটলার তাহার এত বড় পাশবিক কার্য্যে জার্ম্মাণ জনসাধারণের আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতে পারিল কোন্ কারণে, তাহার সন্ধান করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, প্রকৃতির নিয়মানুসারে প্রত্যেক দেশেরই জনসাধারণ অত্যন্ত অল্পতে সন্তুষ্ট এবং শান্তিপ্রিয় হইয়া থাকে। অসহনীয় বিশেষ কোন কারণের উপস্থিতি না হইলে তাহারা সকলেই কখনও একযোগে জীবন, সম্পদ ও সম্মান উপেক্ষা করিয়া নরঘাতকতার পাশবিক কার্য্যে লিপ্ত হয় না। কুশিক্ষা ও কুসাধনার ফলে জননায়কগণ রাজসিক ও তামসিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিবার জন্য অত্যন্ত হেয় কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারেন বটে এবং জনসাধারণের অংশবিশেষও তাহাতে যোগদান করিতে পারেন বটে, কিন্তু সর্ব্বব্যাপী বিশেষ কোন অসুবিধার উৎপত্তি না হইলে প্রকৃতির নিয়মানুসারে জনসাধারণ সকলেই একযোগে নরঘাতকতার পাশবিক কার্য্যে লিপ্ত হয় না। প্রকৃতির এমন কিছু নিয়ম যদি না থাকিত তাহা হইলে মানুষের পক্ষে সমাজ বন্ধন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা অসম্ভব হইত। যখন তখন জনসাধারণের সকলেই একযোগে মিলিত হইয়া কাহারও না কাহারও অধিনায়কত্বে সমস্ত শৃঙ্খলা ভগ্ন করিয়া সমাজকে নষ্ট করিয়া দিতে উদ্যত হইত, কিন্তু তাহা প্রায়শঃ হয় না। কাজেই হিটলারের সাম্রাজ্য-লোলুপতা জগৎব্যাপী পাশবিক যুদ্ধের কারণ, ইহা ধরিয়া লইলে চলিবে না; সর্ব্বব্যাপী কোন্ অসুবিধার জন্য জার্ম্মাণ জনসাধারণের প্রায় সকলেই একযোগে এই যুদ্ধে যোগদান করিল তাহার সন্ধান করিতে হইবে।

অনেকে হয়ত মনে করিবেন যে, এত খোঁজাখুঁজির কি প্রয়োজন? বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে যে সমস্ত অকাম্য বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হইয়াছে তাহা গভর্ণমেন্টই অনায়াসে

নূতন নূতন আইন ও অর্ডিনান্সের সহায়তায় দূর করিয়া দিতে পারেন। জগতের প্রত্যেক দেশেরই প্রায় প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টই করিতেছেনও তাহাই। মূল্য নিয়ন্ত্রণের অর্ডিনান্স ও আইন করিয়া মূল্যাহারের অপরিমিত বৃদ্ধি দূরীভূত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। রেল, ষ্টীমার প্রভৃতি ট্রান্সপোর্টের অর্ডিনান্স ও আইন করিয়া প্রয়োজনীয় খাদ্য, পরিধেয় ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যের দুর্লভতা দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ষ্টক করিয়া উহার অপ্রাপ্যতা দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। মিলিটারী বিভাগের প্রয়োজনের জন্য কাহারও কোন বাসস্থানাদি লইতে হইলে মানুষের যাহাতে অসুবিধা না হয় গভর্ণমেণ্টের পক্ষে তাহার চেষ্টারও অবধি নাই। শত্রুপক্ষের আক্রমণে মানুষ যাহাতে সপরিবারে বিধ্বস্ত ও বিনষ্ট না হয় তাহার জন্য কোন গভর্ণমেণ্ট, এ, আর, পি, প্রভৃতি ব্যবস্থার কার্পণ্য করেন নাই। গুণ্ডা, চোর, ডাকাত ও সৈন্যগণের অত্যাচার যাহাতে বৃদ্ধি না পায় তাহার জন্য কোন গভর্ণমেণ্টের সতর্কতা অবলম্বনে ঔদাসীন্য নাই। এক কথায় কোন বিষয়েই গভর্ণমেণ্টের বুদ্ধি ও সামর্থ্য হিসাবে চেষ্টার কোন কসুর নাই। কিন্তু কার্য্যতঃ মানুষের অকাম্য অবস্থারও কোন অভাব নাই। প্রত্যেক গভর্ণমেণ্ট যত কিছু চেষ্টা করিতেছেন তাহা ব্যাধির লক্ষণ অথবা বহির্বিকাশ (Symptoms) দূর করিবার জন্য। ব্যাধির নিদান স্থির করিয়া ব্যাধির মূল কারণ নির্দ্ধারণ করিতে না পারিলে এবং ব্যাধির মূল কারণ যাহাতে আরোগ্য লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা না হইলে কোন ব্যাধি হইতে সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য লাভ করা সম্ভব নহে। ইহা চিরন্তন সত্য।

কোন গভর্ণমেণ্টই ব্যাধির নিদান স্থির করিবার চেষ্টা করিতেছেন না এবং ব্যাধির মূল কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছেন না। ফলে প্রত্যেক দেশেই যদিও গভর্ণমেণ্ট প্রজার দুঃখ দূর করিয়া তাহাদিগের সন্তুষ্টি সাধন করিবার জন্য সচেষ্ট থাকেন, কিন্তু তথাপি প্রত্যেক দেশেই প্রজার দুঃখ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধেই প্রজার অসন্তুষ্টির মাত্রাও বাড়িয়া চলিতেছে। কাজেই বলিতে হইবে যে, খোঁজাখুঁজির প্রয়োজন আছে। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে যে অকাম্য বৈশিষ্ট্যসমূহের উদ্ভব হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটী সমূলে উৎপাটিত করিতে হইলে জগৎব্যাপী পাশবিক যুদ্ধের সম্ভব হইয়াছে কোন্ কোন্ কারণে তাহার সন্ধান করিতে হইবে। তাহার পর যে যে কারণে এই জগৎব্যাপী পাশবিক যুদ্ধের সম্ভব হইয়াছে সেই সেই কারণ কোন্ কোন্ পন্থায় সমূলে উৎপাটিত হইতে পারে তাহার সন্ধান করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, যে যে পন্থায় জগৎব্যাপী এই পাশবিক যুদ্ধের কারণসমূহ সমূলে উৎপাটিত হইতে পারে সেই সেই পন্থা কোন্ প্রণালীতে কাহার দ্বারা কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায় তাহা চিন্তা করিয়া বাহির করিতে হইবে এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে। তাহা না করিয়া কেবলমাত্র বহির্বিকাশের অথবা লক্ষণের (symptoms-এর) চিকিৎসা করিলে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে চিকিৎসার ব্যয় ও সময় খরচ করা হইবে বটে কিন্তু কার্য্যতঃ কোন ফলোদয় হইবে না। জনসাধারণের যে দুঃখ সেই দুঃখ সমানভাবেই থাকিয়া যাইবে। বরং উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

যে জগৎব্যাপী পাশবিক যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে কাম্য ও অকাম্য বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হইয়াছে আমাদিগের মতে সেই বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রধান কারণ তিনটী :

(১) জগৎব্যাপী অর্থাভাব ;
(২) রাগ-দ্বেষের সংযমোপযোগী শিক্ষার জগৎব্যাপী অভাব ;
(৩) সমগ্র মানবজাতি-পরিব্যাপ্ত পরার্থপরতার অভাব।

আমাদিগের উপরোক্ত মতবাদ (অর্থাৎ দ্বন্দ্ব-কলহ ও পাশবিক যুদ্ধ যে কখনও মনুষ্যসমাজের অথবা ব্যক্তিগত মানুষের মঙ্গলপ্রদ নহে এবং উহার কারণ যে উপরোক্ত তিনটী ইহা) যে অকাট্য, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য প্রথমতঃ ইতিহাসের সাহায্য লইব এবং তাহার পর দর্শনের সাহায্য লইব।

ইতিহাসের সাহায্যে দেখাইব যে, জগতে লিখিত ইতিহাসের কালে যত কিছু যুদ্ধ হইয়াছে তাহা হয় ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য নতুবা কাম-লোভ তৃপ্তির জন্য, নতুবা বল দেখাইবার জন্য। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে,

ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য যুদ্ধ হইয়াছে ইহা বলিলে যাহা বুঝায়, আকাঙ্ক্ষানুরূপ অর্থাভাবের জন্য যুদ্ধ হইয়াছে বলিলেও তাহাই বুঝায়। কামাদি পরিতৃপ্তির জন্য যুদ্ধ হইয়াছে ইহা বলিলে যাহা বুঝায়, কামাদি সংযত করিবার উপযোগী শিক্ষার অভাবে যুদ্ধ হইয়াছে বলিলেও তাহাই বুঝায়। বল দেখাইবার জন্য যুদ্ধ হইয়াছে বলিলেও যাহা বুঝায়, পর-প্রাণতার অভাবের জন্য যুদ্ধ হইয়াছে বলিলেও তাহাই বুঝায়।

ইতিহাসের সাহায্যে আরও দেখাইব যে, যখনই যুদ্ধ হইয়াছে তখনই মনুষ্যসমাজ সাময়িক রকমে বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং যাঁহারা যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা স্থায়ীভাবে কোন ব্যক্তিগত অথবা জাতিগত লাভ করিতেও সক্ষম হন নাই।

মানুষের দর্শনের সাহায্যে দেখাইব যে মানুষের ক্ষয়ের প্রধান কারণ দ্বন্দ্ব ও কলহের প্রবৃত্তি এবং উহার কারণ তিনটী, যথা (১) পরের দুঃখ অনুভব করিবার সামর্থ্যের অভাব, অথবা রাগ-দ্বেষের প্রাবল্য, (২) রাগ-দ্বেষ সংযত করিবার উপযোগী সুশিক্ষার অভাব, (৩) জীবন রক্ষার উপযোগী প্রকৃত অর্থ কি তাহা বুঝিবার এবং তাহা উপার্জ্জন করিবার সামর্থ্যের অভাব।

লিখিত ইতিহাসে জগতে যত কিছু দ্বন্দ্ব-কলহ ও পাশবিক যুদ্ধের কথা লেখা আছে তাহার প্রত্যেকটী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে তাহার প্রত্যেকটীর মূলে হয় রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া কাম ও লোভের পরিতৃপ্তির প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা, না হয় ধর্ম্ম প্রচারের নামে প্রাধান্য লাভ করার এবং কাম ও লোভের পরিতৃপ্তির কামনা চরিতার্থ করা, না হয় রাজ্য জয় করিয়া অর্থপ্রাচুর্য্য লাভ করা এবং কাম ও লোভের পরিতৃপ্তির প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা, না হয় পদ্মিনীর মত সুন্দরী কামিনী লাভ করিয়া কামের পরিতৃপ্তি সাধন করার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার প্রচেষ্টা বিদ্যমান আছে। যদি এই পাশবিক যুদ্ধগুলির ফলে যাঁহারা যুদ্ধ করাইয়াছেন তাঁহাদিগের অথবা তাঁহাদিগের স্থলাভিষিক্তগণের অথবা তাঁহাদিগের সন্তান-সন্ততিগণের অথবা তাঁহাদিগের সম-সাময়িক মনুষ্য-সমাজের সুখ-শান্তি বৃদ্ধির কোন প্রমাণ পাওয়া যাইত তাহা হইলে এতাদৃশ যুদ্ধের প্রয়োজন আছে ইহা মনে করা যাইত। যাঁহারা যুদ্ধ করিয়া মনুষ্যসমাজের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদিগের কাহারও প্রভুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই এবং তাঁহাদিগের কাহারও সন্তান সন্ততিগণ পুরুষানুক্রমে দীর্ঘকালের জন্য ঐ প্রভুত্ব উপভোগ করিতে পারেন নাই। গ্রীক সাম্রাজ্যের, রোমান সাম্রাজ্যের, মৌর্য্য সাম্রাজ্যের, পাঠান সাম্রাজ্যের, মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস ইহার জলন্ত প্রমাণ। ইংরাজ সাম্রাজ্যের ইতিহাস আলোচনা করিলেও দেখা যাইবে যে, যাঁহারা প্রাণপাত করিয়া যুদ্ধে জয়ী হইয়া এই সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহারা শান্তিতে শেষ জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন নাই এবং তাঁহাদিগের সন্তান-সন্ততিগণ এখন আর সাম্রাজ্য পরিচালনায় স্থান পাওয়া ত দূরের কথা, ইংরাজ সমাজের শ্রদ্ধা পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন নাই। অধিকাংশেরই বংশের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। লিখিত ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে বুঝা যাইবে যে, যাঁহারা যুদ্ধ করিয়া নিজদিগের কাম্য লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগের প্রত্যেককেই জীবনের শেষভাগে অস্বাস্থ্যের দুঃসহনীয় যাতনায় অথবা পুত্রকলত্রাদির বিরূপতা জনিত অশান্তিতে জীবনলীলা শেষ করিতে হইয়াছে। লিখিত ইতিহাস হইতে উপরোক্ত কথাগুলি বিচারবুদ্ধির দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া গ্রহণ করিতে পারিলে, মানুষের জীবন হত্যা করিয়া যুদ্ধে জয় করায় যে কাহারও মঙ্গল হয় না তৎসম্বন্ধে এবং নরহত্যাময় যুদ্ধের মূলে যে অর্থলালসা, কামাদির উত্তেজনা সংযত করিবার মত সাধনা শিক্ষার অভাব, এবং পরের দুঃখে বেদনা অনুভব করিবার সামর্থ্যের অভাব বিদ্যমান থাকে তৎসম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইতে হয়।

মানুষ কেন নষ্ট হইয়া যায়, মানুষের জীবনে স্বতঃই তাহার বার্দ্ধক্যের অসামর্থ্য কেন দেখা দেয়, মানুষ কেন ব্যাধিগ্রস্ত হয়,—দার্শনিক ভাবে তাহার কারণ সন্ধান করিতে বসিলেও দেখা যাইবে যে, মূলতঃ উহার প্রধান কারণ দ্বন্দ্ব-কলহ ও যুদ্ধের প্রবৃত্তি এবং তাহার কারণ তিনটী, যথা (১) প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব, (২) কামাদি প্রবৃত্তির

সংযম করিবার মত সুশিক্ষা ও সামর্থ্যের অভাব, এবং (৩) পরার্থ-পরতার অভাব।

মানুষ শৈশব অবস্থায় যে কতকগুলি কার্য্যক্ষমতার বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করে তাহা যে কোন শিশুকে লক্ষ্য করিলে প্রতীয়মান হইবে। যে সমস্ত কার্য্যক্ষমতার বীজ লইয়া মানুষ শৈশব অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে দার্শনিক-গণ সেই সমস্ত কার্য্য-ক্ষমতাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা :-

(১) জীবনের প্রকৃত অর্থ, প্রকৃত সামর্থ্য ও প্রকৃত কারণ কি (অর্থাৎ সত্তা, কাহাকে বলে) ও তাহা লাভ করা যায় কোন্ পন্থায় তাহা বুঝিবার ও অনুসরণ করিবার কার্য্য-ক্ষমতা।

(২) বল লাভ করিবার (অর্থাৎ বিরাজ করিবার) কার্য্য-ক্ষমতা।

(৩) উপভোগ ও পরিতৃপ্তি লাভ করিবার (অর্থাৎ বিচার না করিয়া বিভোর হইবার) মত্তা।

বস্তুতক্ষেত্রে যে কোন মানুষকে শৈশবাদি যে কোন অবস্থায় লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, উপরোক্ত তিন শ্রেণীর কার্য্য করার কোন না কোন কার্য্য-ক্ষমতায় তিনি ব্যাপৃত আছেন। আপাতদৃষ্টিতে মানুষের কার্য্য-ক্ষমতা বহুবিষয়ক ও বহু রকমের। কিন্তু মূলে উপরোক্ত তিন শ্রেণীর কার্য্য-ক্ষমতার বাহিরে মানুষের কোন কার্য্য-ক্ষমতা নাই। আমাদিগের এই কথা যে অতীব সঠিক তাহা মানুষের চরিত্র ও কার্য্য সম্মুখে রাখিয়া চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে।

ভারতের ঋষিগণ মানুষের এই তিন শ্রেণীর কার্য্য-ক্ষমতাকে যথাক্রমে (১) সত্ত্ব, (২) রজ এবং (৩) তম এই তিনটী নাম দিয়াছেন। তাঁহাদিগের কথানুসারে জগতের আদি কারণ একটী অখণ্ড কর্ম্ম (indivisible work)। উহা—ঐ অখণ্ড (অথবা অবিভাজ্য) কর্ম্ম অব্যক্ত (অর্থাৎ মানুষের ইন্দ্রিয়াদির অগোচর)। উহা ব্যক্ত হয় গুণের (অর্থাৎ multiplicationএর) সহায়তায়। যে গুণের (অর্থাৎ multiplicationএর) সহায়তায় জগতের আদি কারণ অব্যক্ত কর্ম্মের বিকাশ হয় (অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হয়) তাহা অঙ্গাঙ্গীভাবে প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত জড়িত। ঐ প্রাকৃতিক নিয়মই অঙ্কশাস্ত্রের আদি কারণ এবং উহাই অঙ্কশাস্ত্র। উহার ব্যভিচার কদাপি সম্ভব নহে। ঐ অঙ্কশাস্ত্রের অপর নাম "জ্যোতীষ"। ঐ প্রাকৃতিক নিয়ম অথবা অঙ্কশাস্ত্র অথবা জ্যোতীশ শাস্ত্র যথাযথভাবে জানিতে পারিলে জগতে অথবা জগতের মানুষে কখন কোন্ গুণ প্রাবল্য লাভ করে তাহা সঠিক-ভাবে হিসাব করিয়া বলা যায়। মনুষ্যসমাজ এখন আর ঐ প্রাকৃতিক নিয়ম বিদিত নহে। এই অজ্ঞতার জন্যই দম্ভভরে মানুষ প্রকৃতিকে দমন করিতে পারা যায় বলিয়া মনে করে। কিন্তু তাহা পারা যায় না। "কার্য্য-ক্ষমতা" ও "গুণ" এই দুইটী শব্দ একই অর্থ প্রকাশক।

মানুষ শৈশব অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে সত্ত্ব, রজ, ও তম এই তিনটী গুণের (অথবা তিন শ্রেণীর কার্য্য-ক্ষমতার) বীজ লইয়া। স্বভাব বশে সাধারণতঃ শৈশবাবস্থায় "সত্ত্ব", যৌবনপ্রারম্ভে "রজ" ও যৌবনের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে "তম" প্রাবল্য লাভ করে।

জীবনের প্রকৃত অর্থ, প্রকৃত সামর্থ্য ও প্রকৃত কারণ কি এবং তাহা লাভ করা যায় কোন্ পন্থায় তাহা বুঝিবার অব্যক্ত সামর্থ্য ও ঐ পন্থা অনুসরণ করিবার অব্যক্ত কার্য্য-ক্ষমতার বীজ থাকে বলিয়াই শৈশব অবস্থায় এতটুকু ছোট ছোট হাত, এতটুকু ছোট ছোট পা, এতটুকু ছোট ছোট কায় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াও আপনা হইতেই এতখানি বড় বড় হাত, এতখানি বড় বড় পা, এতখানি বড় বড় শরীর লাভ করিতে পারে। তখন তাহার মধ্যে "সত্ত্ব" নামক গুণের অথবা কার্য্য-ক্ষমতার প্রাবল্য থাকে বলিয়াই সে বৃদ্ধি অথবা উন্নতি লাভ করিতে পারে তখন তাহার মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তি থাকে না বলিয়াই তাহার কোন ক্ষয় হয় না। কেবলই বৃদ্ধি হইতে থাকে। তখন তাহার মধ্যে "রজ" নামক গুণের অথবা বল লাভ করিবার কার্য্য-ক্ষমতার প্রাবল্য থাকে না বলিয়াই সে ছুটাছুটী মারামারি করিতে পারে না। শায়িত অবস্থায়ই তাহার বৃদ্ধি সাধিত হয়।

যৌবনের প্রারম্ভে তাহার বল লাভ করিবার কার্য্য-ক্ষমতার অথবা "রজ" নামক গুণের প্রাবল্য হয় বলিয়াই তাহার ইন্দ্রিয় ও মন সতেজ হয় এবং সে উপভোগপ্রবৃত্তি

চরিতার্থ করিবার জন্য রাগ-দ্বেষ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই রাগ-দ্বেষ বশতঃই যুবক দ্বন্দ্ব-কলহে মাতিয়া যায়।

যৌবনের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপভোগ ও পরিতৃপ্তি লাভ করিবার প্রবৃত্তি অথবা "তম" নামক গুণের প্রাবল্য সংঘটিত হয়। এই অবস্থায় মানুষ সাধারণতঃ রাগ-দ্বেষ চরিতার্থ করিবার জন্য দ্বন্দ্ব-কলহে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকে। জীবনের প্রকৃত অর্থ, প্রকৃত সামর্থ্য ও প্রকৃত কারণ যে কি এবং তাহা লাভ করা যায় যে কোন্ পন্থায় তাহা স্মরণ করিবার প্রবৃত্তি মানুষ সাধারণতঃ হারাইয়া ফেলে। ফলে মানুষের ক্ষয় দেখা দেয় এবং ক্রমে মানুষ প্রৌঢ় ও জরাগ্রস্ত হইয়া সামর্থ্য হারাইয়া বসে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

যৌবনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে উপভোগ ও পরিতৃপ্তির চরিতার্থতা প্রবৃত্তির উদয় হয় এবং তজ্জন্য যে রাগ ও দ্বেষ দুর্দ্দমনীয় হয় এবং দ্বন্দ্ব-কলহে ব্যাপৃতি ঘটে, মানুষ যদ্যপি শিক্ষার দ্বারা পরার্থপরতার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করিয়া, ঐ উপভোগ ও পরিতৃপ্তির জন্য রাগ-দ্বেষ, সংযত করিয়া দ্বন্দ্ব কলহের প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে পারে এবং সাধনার দ্বারা জীবনের প্রকৃত অর্থ, প্রকৃত সামর্থ্য ও প্রকৃত কারণ যে কি এবং তাহা লাভ করা যায় কোন্ পন্থায় তাহা উপলব্ধি করিতে পারে এবং যদি ঐ পন্থানুসারে কার্য্যে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে মানুষের ক্ষয় এত অল্প বয়সে সম্ভব হয় না। দুই শতাধিক বর্ষ পর্য্যন্ত তাহার যৌবন স্থায়ী হইতে পারে।

মানুষের জীবনের উপরোক্ত দার্শনিক সত্যগুলি অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে তাহার ক্ষয়ের প্রধান কারণ দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তি এবং দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তির কারণ প্রথমতঃ পরের দুঃখ অনুভব করিবার সামর্থ্যের অভাব অথবা রাগ-দ্বেষের প্রাবল্য, দ্বিতীয়তঃ রাগ-দ্বেষ সংযত করিবার উপযোগী সু-শিক্ষার অভাব, তৃতীয়তঃ জীবন রক্ষার উপযোগী প্রকৃত অর্থ কি তাহা বুঝিবার এবং তাহা উপার্জ্জন করিবার সামর্থ্যের অভাব।

"অর্থ" শব্দে আমরা কোন্ বস্তুকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি তাহা এইখানে বিবৃত করিব। সংস্কৃত ভাষানুসারে যে সমস্ত বস্তুর যে সমস্ত ব্যবহারে মানুষের শরীরের, ইন্দ্রিয়ের, মনের, বুদ্ধির ও আত্মার স্বাস্থ্য ও কার্য্য-ক্ষমতা সমানভাবে রক্ষা করা ও বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় এবং উহাদের ক্ষয় নিবারিত হয় সেই সমস্ত বস্তুর ও তাহাদের সেই সকল ব্যবহারের নাম "অর্থ"। যে সমস্ত বস্তু অথবা তাহাদের যে সমস্ত ব্যবহারে মানুষের শরীরাদির কোন একটী ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে পারে সেই সমস্ত বস্তু অথবা তাহাদিগের সেই সমস্ত ব্যবহারকে সংস্কৃত ভাষায় "অনর্থ" বলা হয়। সংস্কৃত ভাষায় "অর্থ" বলিতে যাহা বুঝায় আমরা সাধারণতঃ তাহা প্রকাশ করিবার জন্যই এই প্রবন্ধে অর্থ শব্দটী ব্যবহার করিতেছি। মানুষের শরীরাদির প্রত্যেকটীর কার্য্য-ক্ষমতা ও স্বাস্থ্য যাহাতে সমানভাবে রক্ষা করা যায় এবং বৃদ্ধি করা যায় তাহা করিবার জন্য মানুষ যে সমস্ত বস্তু ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়—তাহা সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা—(১) বাচ্য, (২) ব্যঙ্গ ও (৩) লক্ষ্য।

যে বস্তু এবং তাহার যে ব্যবহার মুখ্যতঃ মানুষের মনের বৃদ্ধি সাধন করে অর্থাৎ উহাকে সংযত এবং চিন্তাশীল করিয়া তুলে এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীর, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও আত্মার স্বাস্থ্য ও কার্য্য-ক্ষমতা রক্ষা করে সেই বস্তু ও তাহার সেই ব্যবহারকে সংস্কৃত ভাষায় "বাচ্যার্থ" বলা হইয়া থাকে। কতকগুলি পদ, সূত্র ও শ্লোক ও তাহার নিয়মাবদ্ধ ব্যবহার মানুষের "বাচ্যার্থ"। ঐ পদ, সূত্র ও শ্লোক নিয়মবিরুদ্ধ-ভাবে ব্যবহৃত হইলে উহা অনর্থে পরিণত হয়। পদ, সূত্র ও শ্লোকের যে ধারণা মানুষের বাচ্যার্থের সহায়ক হয় তাহাও উহাদের অর্থ।

যে বস্তু এবং তাহার যে ব্যবহার মুখ্যতঃ বুদ্ধির ও আত্মার বৃদ্ধি সাধন করে অর্থাৎ ঐ দুইটীকে পরিমার্জ্জিত ও পরিস্ফুট করিয়া তোলে এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীর, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও মনের স্বাস্থ্য ও কার্য্য ক্ষমতা রক্ষা করে সেই বস্তু ও তাহার সেই ব্যবহারকে সংস্কৃত ভাষায় মানুষের ব্যঙ্গার্থ বলা হইয়া থাকে। কতকগুলি মন্ত্র, স্তোত্র ও কবচ এবং তাহার নিয়মাবদ্ধ ব্যবহার মানুষের "ব্যঙ্গার্থ"। এই মন্ত্র, স্তোত্র ও কবচ নিয়ম-বিরুদ্ধ ভাবে ব্যবহৃত হইলে উহা অনর্থে পরিণত হয়। মন্ত্র, স্তোত্র ও কবচের যে ধারণা মানুষের ব্যঙ্গার্থের সহায়ক হয় তাহাও উহাদের অর্থ।

যে বস্তু ও তাহার যে ব্যবহার মুখ্যতঃ শরীর ও ইন্দ্রিয়ের বৃদ্ধি সাধন করে অর্থাৎ এই দুইটীর স্বাস্থ্য এবং কার্য্য-ক্ষমতা বাড়াইয়া দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মন, বুদ্ধি ও আত্মার স্বাস্থ্য ও কার্য্য-ক্ষমতা রক্ষা করে সেই বস্তু ও তাহার সেই ব্যবহারকে সংস্কৃত ভাষায় মানুষের লক্ষ্যার্থ বলা হইয়া থাকে। মানুষের লক্ষ্যার্থ সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—(১) খাদ্য, (২) পরিধেয়, (৩) বাস-গৃহ, (৪) আসবাব অর্থাৎ রন্ধন, শয়ন, বিশ্রাম, লৌকিকতা প্রভৃতির উপকরণ এবং এই সমস্ত উপকরণের রক্ষার উপকরণ। উপরোক্ত বস্তুসমূহের প্রত্যেকটীর নাম মানুষের লক্ষ্যার্থ। উহাদের প্রত্যেকটীর ব্যবহারের নিয়মের নামও মানুষের লক্ষ্যার্থ। খাদ্যাদির জন্য যে-সমস্ত বস্তু, ব্যবহার করিলে শরীরাদির কোনটী কোনরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে পারে সেই সমস্ত বস্তুকে অথবা ক্ষয়-সংসাধক ব্যবহারকে "অর্থ" বলা চলে না। তাহাকে অনর্থ বলিতে হয়।

ভারতীয় ঋষিগণ যে সমস্ত কথা, মন্ত্র ও সূত্রের সহায়তায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটী মানুষের বাচ্যার্থ, ব্যঙ্গার্থ ও লক্ষ্যার্থের সহায়ক এবং উহার প্রত্যেকটীর উপরোক্ত তিন তিনটী করিয়া "অর্থ" থাকে। কোন ভাষ্যকার নিয়মাবদ্ধ ভাবে কোন মন্ত্র অথবা সূত্রের এই তিন তিনটী অর্থ বিশদ করিয়া লেখেন নাই। ইহারই জন্য ভারতীয় ঋষিগণের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা মনুষ্য-সমাজে লুক্কায়িত হইয়াছে।

বর্ত্তমান পাশ্চাত্ত্য অর্থ-বিজ্ঞান ভারতীয় ঋষির লক্ষ্যার্থ-বিজ্ঞানের সামান্য অংশ মাত্র। মানুষের মন, বুদ্ধি ও আত্মার রক্ষা ও বৃদ্ধি কোন্ উপায়ে সংঘটিত করা সম্ভব হয় তাহার কোন কথা বর্ত্তমানে পাশ্চাত্ত্য অর্থ-বিজ্ঞানে নাই। মানুষের শরীর ও ইন্দ্রিয়ের স্বাস্থ্য ও কার্য্য-ক্ষমতা বজায় রাখিতে হইলে কি কি করার প্রয়োজন তাহার কতিপয় কথা বর্ত্তমান পাশ্চাত্ত্য-বিজ্ঞানে আছে বটে কিন্তু এই সমস্ত কথা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। শরীর ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্য-ক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য কতকগুলি উপায় বর্ত্তমান পাশ্চাত্ত্য-বিজ্ঞানে উদ্ঘাটিত হইয়াছে বটে কিন্তু ঐ সমস্ত উপায় অবলম্বন করিলে মানুষের মন, বুদ্ধি ও আত্মার উপর কি ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া হয় তাহা লক্ষ্য করিবার কোন উপায়ই উদ্ঘাটিত হয় নাই। ঋষিগণ মানুষের অবয়ব-বিজ্ঞানে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন তাহাতে প্রবিষ্ট হইলে দেখা যাইবে যে, মানুষকে ভাল থাকিতে হইলে একসঙ্গে তাহার শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মার দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। কোনটীকে ছাড়িয়া কোনটীকে লক্ষ্য করিলে চলিবে না। কাজেই পাশ্চাত্ত্য অর্থ-বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া মানুষের ভাল থাকা সম্ভব হয় না।

পাশ্চাত্ত্যগণ তাঁহাদিগের অর্থ-বিজ্ঞানে দুইটী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। একটী "Money" আর অপরটী "Wealth"। Money বলিতে তাঁহারা যাহা যাহা বুঝাইয়াছেন তাহা বুঝাইতে সংস্কৃত ভাষায় "ধন" শব্দ ব্যবহার করিতে হয়। Wealth বলিতে তাঁহারা যাহা বুঝাইয়াছেন তাহা সংস্কৃত "অর্থ" শব্দের অংশ মাত্র। পাশ্চাত্ত্য-বিজ্ঞানের Wealth এর মধ্যে সংস্কৃত ভাষার অনর্থও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

ভারতীয় ঋষির "অর্থ" অত্যন্ত ব্যাপক এবং তাহার বিজ্ঞানও অত্যন্ত ব্যাপক। অতবড় বিস্তৃত অর্থ-বিজ্ঞানের সমস্ত কথা এই প্রবন্ধে বলা সম্ভব নহে।

লক্ষ্যার্থের অভাব দূর করিবার উপায় সম্বন্ধে লক্ষ্যার্থ-বিজ্ঞানের যে সমস্ত কথা আছে তাহার সামান্য কয়েকটী মোটা কথা মাত্র আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

মানুষ যদি একবার ঠিক ঠিক ভাবে বুঝিতে পারে যে, কোন্ কোন্ জিনিষ খাইলে, কোন্ কোন্ বস্ত্র পরিধান করিলে, কিরূপ গৃহে বাস করিলে, কোন্ কোন্ আসবাব ব্যবহার করিলে মানুষের শরীর, মানুষের ইন্দ্রিয়, মানুষের মন ও মানুষের বুদ্ধি—ভগবানের দেওয়া মানুষের এই চারিটী জিনিষ সমান ভাবে সুস্থ থাকিতে পারে, তাহা হইলে মানুষ দেখিতে পাইবে যে, যাহা খাইলে, যাহা পরিধান করিলে, যাহাতে বাস করিলে, যাহা ব্যবহার করিতে পারিলে মানুষ সর্ব্বতোভাবে ভাল থাকিতে পারে তাহার সমস্ত উপকরণই মানুষ যে-স্থানে জন্মগ্রহণ করে তাহারই নিকটবর্ত্তী চারিদিকে ছড়ান রহিয়াছে। তাহা সংগ্রহ করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিবার জন্য কোন দ্বন্দ্ব-কলহ

অথবা যুদ্ধের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় কেবলমাত্র এই [illegible]ণগুলি বাছিয়া লইবার শিক্ষা এবং উহা উৎপাদন করিবার শিক্ষা এবং উহা বণ্টন করিবার শিক্ষা।

যে যে জিনিষ খাইলে, যে যে বস্ত্র পরিধান করিলে, যেরূপ গৃহে বাস করিলে, যে যে আসবাব ব্যবহার করিলে, মানুষের শরীর, মানুষের ইন্দ্রিয়, মানুষের মন, মানুষের বুদ্ধি—ভগবানের দেওয়া মানুষের এই চারিটী জিনিষ সমান ভাবে সুস্থ থাকিতে পারে তাহা বাছিয়া লইতে হইলে, তাহা উৎপাদন করিতে হইলে এবং তাহা বণ্টন করিতে হইলে মানুষের যে শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন সেই শিক্ষা ও সাধনা বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজ বিস্মৃত হইয়াছে। যাহা খাইলে, যাহা পরিধান করিলে, যাহাতে বাস করিলে, যাহা ব্যবহার করিলে মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সমানভাবে ভাল থাকে তাহা বর্ত্তমান সমাজের মানুষ বাছিয়া লইতে পারে না বলিয়াই কামনানুরূপ খাদ্য, বসন-ভূষণ, অট্টালিকা ও আসবাব উপভোগ করিয়াও প্রায়শঃ শারীরিক অথবা ইন্দ্রিয়ের অথবা মনের অথবা বুদ্ধির অস্বাস্থ্য ভোগ করে। ঐ সমস্ত জিনিষ অনায়াসে উৎপাদন করিতে হইলে যে শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন সেই শিক্ষা ও সাধনার অভাব হইয়াছে বলিয়াই প্রত্যেক দেশের সমগ্র লোকসংখ্যার জীবন নির্ব্বাহের জন্য যে পরিমাণের যে যে জিনিষের প্রয়োজন তাহা সর্ব্বতোভাবে উৎপাদন করা সম্ভব হইতেছে না। ঐ সমস্ত জিনিষ প্রত্যেক সংসারের প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে বিতরণ করিতে হইলে যে শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন, বর্ত্তমান সমগ্র মনুষ্য-সমাজে সেই শিক্ষা ও সাধনার অভাব হইয়াছে বলিয়াই সমগ্র পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের শতকরা নব্বইটী সংসার অর্থাভাবের তাড়নায় প্রায় সর্ব্বদাই জর্জ্জরিত।

যাহা খাইলে, যাহা পরিধান করিলে, যাহাতে বাস করিলে, যাহা ব্যবহার করিলে মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সমানভাবে ভাল থাকিতে পারে, তাহা সঠিক ভাবে বাছিয়া লইতে, তাহা যাহাতে সমগ্র লোক-সংখ্যার প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে উৎপন্ন হয় তাহা করিতে, প্রত্যেক সংসার যাহাতে ঐ সমস্ত জিনিষের প্রত্যেকটী প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে পাইতে পারে তদনুরূপ বিতরণের ব্যবস্থা করিতে হইলে যে শিক্ষা ও কার্য্যক্ষমতার প্রয়োজন সেই শিক্ষা ও কার্য্যক্ষমতা যখন মনুষ্যসমাজে বিদ্যমান থাকে, তখন মনুষ্যসমাজে অর্থাভাব থাকিতে পারে না। কেবলমাত্র অর্থাভাব দূর হইলেই যে দ্বন্দ্ব-কলহ ও পাশবিক যুদ্ধের প্রবৃত্তি দূর হয় তাহা নহে। অর্থাভাব না থাকিলেও মানুষের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদের উত্তেজনাবশতঃ রাগ-দ্বেষ থাকিতে পারে এবং ঐ রাগ-দ্বেষবশতঃ দ্বন্দ্ব-কলহ ও পাশবিক যুদ্ধের প্রবৃত্তি জাগ্রত হইতে পারে। বরং অর্থাভাব না থাকিলে এবং অর্থ-প্রাচুর্য্য থাকিলে ঐ রাগ-দ্বেষ-প্রবৃত্তির জাগরণ অধিকতর পরিমাণে সম্ভবযোগ্য হয়। অর্থাভাব থাকিলেও স্বভাব-বশে মানুষের রাগ-দ্বেষ-প্রবৃত্তির জাগরণ হইতে পারে। রাগ-দ্বেষ-প্রবৃত্তির জাগরণ হইলেই দ্বন্দ্ব-কলহ ও পাশবিক যুদ্ধের প্রবৃত্তি জাগ্রত হইয়া থাকে। এই হিসাবে বলিতে হয় যে, অর্থাভাব যেরূপ দ্বন্দ্ব-কলহ-প্রবৃত্তির কারণ, সেই-রূপ রাগ দ্বেষ-প্রবৃত্তির কারণও দ্বন্দ্ব-কলহ ও পাশবিক যুদ্ধের প্রবৃত্তির অন্যতম কারণ। কাযেই, দ্বন্দ্ব-কলহ ও পাশবিক যুদ্ধের প্রবৃত্তি দূর করিতে হইলে একদিকে যেরূপ মনুষ্যসমাজ হইতে অর্থাভাব দূর করা একান্ত প্রয়োজনীয়, সেইরূপ আবার রাগ-দ্বেষের কারণ দূর করাও একান্ত প্রয়োজনীয়। রাগ-দ্বেষের কারণ দূর করিবার একমাত্র উপায় ঐ বিষয়ক শিক্ষা ও সাধনা।

এক-একটা মানুষ অথবা এক-একটী জাতি যদি কেবলমাত্র নিজ নিজ অর্থাভাব ও রাগ-দ্বেষের কারণ দূর করিতে সক্ষম হয়—তাহা হইলেই যে মনুষ্যসমাজ হইতে দ্বন্দ্ব-কলহ ও পাশবিক যুদ্ধের প্রবৃত্তি দূর হইতে পারে তাহা নহে। কোন একটা মানুষের অথবা কোন একটী জাতির মধ্যে যদ্যপি অর্থাভাব ও রাগদ্বেষের কারণ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে ঐ একটা মানুষ অথবা ঐ একটী জাতি দ্বন্দ্ব-কলহের ও পাশবিক যুদ্ধের প্রবৃত্তির তাড়নায় অপর সমস্ত জাতিকে দ্বন্দ্ব-কলহে ও পাশবিক যুদ্ধে আহ্বান করিতে এবং বাধ্য করিতে সক্ষম হয়। কাযেই দ্বন্দ্ব-কলহের ও পাশবিক যুদ্ধের মূল উৎপাটন করিতে হইলে একদিকে যেরূপ নিজ নিজ অর্থাভাব দূর করা ও রাগ-দ্বেষের সংযমোপযোগী শিক্ষার বিস্তার করার প্রয়োজন হইয়া থাকে, সেইরূপ আবার জগতের প্রত্যেক দেশের অর্থাভাব যাহাতে দূর হয় এবং প্রত্যেক দেশে যাহাতে রাগ-দ্বেষের সংযমোপযোগী শিক্ষার বিস্তার হয় তাহারও ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

যখন দেখা যাইতেছে যে, যাহা খাইলে, যাহা পরিধান করিলে, যাহাতে বাস করিলে, যাহা ব্যবহার করিলে, মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সমানভাবে সুস্থ থাকে তাহা যদি মানুষ বাছিয়া লইতে, সমগ্র মনুষ্য-সংখ্যার প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে উৎপাদন করিতে, এবং প্রত্যেক সংসারের লোক-সংখ্যার প্রয়োজনানুসারে ও যোগ্যতানুসারে বণ্টন করিবার উপযুক্ত শিক্ষা ও সাধনা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে মানুষের অর্থাভাব দূর হয় এবং ঐ অর্থাভাব দূর হইলে, রাগ-দ্বেষের সংযমোপযোগী শিক্ষার বিস্তার হইলে এবং সমগ্র মনুষ্যজাতি-পরিব্যাপ্ত পরার্থপরতার বিস্তার হইলেই দ্বন্দ্ব-কলহের ও পাশবিক যুদ্ধের মূল উৎপাটন করা সম্ভব হয়, তখন ইহা অকাট্যভাবে বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের কারণ তিনটী, যথা :—

(১) জগৎব্যাপী অর্থাভাব ;

(২) রাগ-দ্বেষের সংযমোপযোগী জগদ্ব্যাপী শিক্ষার অভাব ;

(৩) সমগ্র মানবজাতি-পরিব্যাপ্ত পরার্থপরতার অভাব।

ইহা ছাড়া অকাট্যভাবে আরও বলা যাইতে পারে যে, সর্ব্বব্যাপী অর্থাভাবের কারণ তিনটী, যথা :—

(১) যাহা যে পরিমাণে খাইলে, যাহা যে পরিমাণে পরিধান করিলে, যাহাতে যে ভাবে বাস করিলে, যাহা যে পরিমাণে আসবাব ভাবে ব্যবহার করিলে মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সমানভাবে সুস্থ ও পূর্ণ কার্য্যক্ষম থাকিতে পারে, তৎসম্বন্ধে জ্ঞানের ও শিক্ষার অসম্পূর্ণতা।

(২) ঐ সমস্ত জিনিষের সমগ্র লোক-সংখ্যার প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণের উৎপাদন করিবার জ্ঞান ও শিক্ষার অসম্পূর্ণতা।

(৩) ঐ সমস্ত জিনিষের প্রত্যেক সংসারের প্রয়োজন ও যোগ্যতা অনুসারে পরিমাণের বণ্টন করিবার জ্ঞান ও শিক্ষার অসম্পূর্ণতা। তদনুসারে যুদ্ধের কারণ ও অর্থাভাবের কারণ নির্দ্দেশে আমরা উপরে যে তিনটী অভাব ও অসম্পূর্ণতার কথা বলিলাম, তাহা যে বর্ত্তমান জগতে বিদ্যমান আছে—আমরা এক্ষণে উহা একে একে যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত করিব।

মানুষের অর্থাভাব

মানুষের অর্থ বলিতে সংস্কৃত ভাষায় যাহা বুঝায় তাহার অভাব যে সম্পূর্ণভাবে মনুষ্যসমাজে প্রকাশ পাইয়াছে ইহা বলাই বাহুল্য। চলতি হিসাবে অর্থাভাব বলিতে যাহা বুঝায়, জগতের প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ সংসারেই যে অল্প-বিস্তর অর্থাভাব দেখা দিয়াছে তৎসম্বন্ধেও কাহারও সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই, ইহা আমরা ধরিয়া লইব এবং তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ এই প্রবন্ধে আমরা উপস্থিত করিব না।

রাগ-দ্বেষের সংযমোপযোগী শিক্ষার অভাব

রাগ-দ্বেষের সংযমোপযোগী শিক্ষার অভাব যে জগতের প্রত্যেক দেশেই দেখা দিয়াছে তৎসম্বন্ধেও চিন্তাশীলগণের মধ্যে কেহ বিরুদ্ধ মত পোষণ করিতে পারেন না। অনেকে "plain living and high thinking" এর কথা বলেন বটে, কিন্তু অর্থনৈতিকগণ "raise the standard of life" এই শিক্ষাই প্রদান করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, রাগ-দ্বেষ সংযত করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে উপভোগ-পরায়ণতা ও পরিতৃপ্তি-পরায়ণতার প্রবৃত্তি সংযত করিতে হয়। কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষা ঠিক তাহার বিপরীত। "Raise the standard of life" এই শিক্ষায় উপভোগ-পরায়ণতা ও তৃপ্তি-পরায়ণতার বৃদ্ধি অনিবার্য্য। আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্ব দেশেই উপরোক্ত শিক্ষার অনুবর্ত্তীগণের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

সমগ্র মানবজাতি-পরিব্যাপ্ত পরার্থপরতার অভাব

আধুনিক মানবসমাজের মধ্যে সমগ্র মানবজাতি-পরিব্যাপ্ত পরার্থপরতা ত' দূরের কথা, এক এক সম্প্রদায়ে পরিব্যাপ্ত পরার্থপরতা পর্য্যন্ত যে অদৃশ্যমান হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। কোন দেশেই "চাচা আপন প্রাণ বাঁচা" এই মতবাদের অনুশীলন-দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আগেই দেখান হইয়াছে যে, সমগ্র মানবজাতি-পরিব্যাপ্ত পরার্থপরতা বলিতে বুঝায়—প্রত্যেক মানুষকে সমগ্র মানবজাতির কথা ভাবিতে হইবে, সমগ্র মানবজাতির যাহাতে দুঃখ দূর হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে, যে কার্য্যে মানবজাতির কাহারও দুঃখ উপস্থিত হয় সেই কার্য্য বর্জ্জন করিতে হইবে। কোন একটী ধর্ম্ম, কোন একটী সম্প্রদায় অথবা কেবলমাত্র কোন একটী দেশের উন্নতিকল্পে কার্য্য করিলে সেই কার্য্যে মানবজাতিপরিব্যাপ্ত পরার্থপরতার দৃষ্টান্ত সমাধিত হয় না। বরং তাহার বিপরীতই সংঘটিত হইয়া থাকে। দেশগত জাতীয়তা সমগ্র মানবজাতিপরিব্যাপ্ত পরার্থপরতার বিপরীত। প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিকগণ যে গত দুইশত বৎসর হইতে দেশ-গত জাতীয়তার উন্নতি ও অবনতির কথা ভাবিয়া আসিতেছেন তাহার সাক্ষ্য তাঁহাদিগের প্রত্যেক গ্রন্থে পাওয়া যাইবে।

জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় বস্তু নির্ব্বাচনের জ্ঞান ও শিক্ষার অসম্পূর্ণতা

যাহা যে পরিমাণে খাইলে, যাহা যে পরিমাণে পরিধান করিলে, যে বাসগৃহে যে ভাবে বাস করিলে, যাহা যে পরিমাণে আসবাব ভাবে ব্যবহার করিলে, মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সমান ভাবে সুস্থ ও পূর্ণ কার্য্যক্ষম থাকিতে পারে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান ও শিক্ষার যে অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে তদ্বিষয়ে কোন তর্ক চলিতে পারে না। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে কেহ কেহ হয় ত মনে করেন যে তাঁহাদিগের বিজ্ঞানে উপরোক্ত বিষয়ক জ্ঞান লেখা আছে। আমাদিগের মতে তাঁহারা ভ্রান্ত। তাঁহাদিগের বিজ্ঞানে যদি উপরোক্ত বিষয়ক জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে যাঁহারা সমৃদ্ধি-সম্পন্ন এবং যাঁহারা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণের কথানুযায়ী খাদ্য, পরিধেয়, বাসগৃহ এবং আসবাবের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ এবং ঐ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের শরীর অথবা ইন্দ্রিয় অথবা মন অথবা বুদ্ধি অসুস্থ অথবা কলুষিত হইত না। কিন্তু কার্য্যতঃ হইয়া থাকে তাহার বিপরীত। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণের কথানুযায়ী যাঁহারা খাদ্য, পরিধেয়, বাসগৃহ এবং আসবাবের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকে হয় শরীরের, না হয় ইন্দ্রিয়ের, না হয় মনের, না হয় বুদ্ধির অস্বাস্থ্য ও কার্য্যাক্ষমতার অভাবে ভুগিয়া থাকেন এবং দীর্ঘজীবন লাভ করিবার আগেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। কাযেই, উপরোক্ত অবস্থা দেখিয়া সাধারণ বুদ্ধি ব্যবহার করিলেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে যে, খাদ্য, পরিধেয়, বাসগৃহ ও আসবাব সম্বন্ধে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণের জ্ঞান এখনও নির্ভরের অযোগ্য। যাহারা বর্ত্তমান খাদ্য-বিজ্ঞান, পরিধেয়-বিজ্ঞান, বাসগৃহ বিজ্ঞান ও আসবাব-বিজ্ঞানের সমস্ত কথাগুলির সহিত পরিচিত তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, কোন্ বস্তুর সহিত মানুষের মন, বুদ্ধি ও আত্মার কি সম্বন্ধ তাহার কোন বিচার বর্ত্তমান কোন বিজ্ঞানে এখনও আরম্ভ করা হয় নাই। কোন্ বস্তুর সহিত মানুষের মন, বুদ্ধি ও আত্মার কি সম্বন্ধ তাহার বিচার করিতে না জানিলে কোন্ বস্তুর ব্যবহারে মানুষের মন, বুদ্ধি ও আত্মার স্বাস্থ্য ও কার্য্যক্ষমতা বজায় থাকিবে ও বৃদ্ধি পাইবে, আর কোন্ বস্তুর ব্যবহারে উহাদিগের ক্ষয় হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করা কখনও সম্ভব হয় না। কাযেই, এদিক দিয়া দেখিলেও বর্ত্তমান বিজ্ঞানের জ্ঞান যে অসম্পূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য নহে তাহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। যে বিজ্ঞানের জ্ঞান অসম্পূর্ণ সেই বিজ্ঞানের শিক্ষা যে অসম্পূর্ণ হইবে ইহা বলাই বাহুল্য।

সুস্থ জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপাদনের জ্ঞান ও শিক্ষার অসম্পূর্ণতা

যে সমস্ত খাদ্য, পরিধেয়, বাসগৃহ ও আসবাব যে পরিমাণে ব্যবহার করিলে মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মা সমান ভাবে সুস্থ ও কার্য্যক্ষম থাকিতে পারে এবং যে প্রণালীর আশ্রয় লইলে ঐ সমস্ত খাদ্য, পরিধেয়, বাসগৃহ ও আসবাবের কাঁচা মাল অনায়াসে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে তাহার জ্ঞান আছে ভারতীয় ঋষির বিজ্ঞানে। ঐ বিজ্ঞান অবগত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, বিবিধ কাঁচামাল উৎপন্ন করিবার যে সমস্ত প্রণালী অধুনা ব্যবহৃত হয় তাহা প্রায়শঃ ভ্রম-প্রমাদ পরিপূর্ণ। ফলে যে সমস্ত কাঁচামালের সহায়তায় মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মার স্বাস্থ্য ও কার্য্যক্ষমতা সমান ভাবে রক্ষা করা ও বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় সেই সমস্ত কাঁচামাল এখন আর জগতের সমগ্র লোকসংখ্যার প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে না। প্রত্যেক দেশের ও সারা জগতের সমগ্র লোকসংখ্যার শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মার স্বাস্থ্য ও কার্য্যক্ষমতা বজায় রাখিতে ও বৃদ্ধি করিতে হইলে যে পরিমাণ খাদ্য-শস্যের প্রয়োজন তাহার শতকরা ষাট ভাগ পর্য্যন্ত এখন আর উৎপন্ন হয় না।

এক কানাডা এবং অষ্ট্রেলিয়ার কথা বাদ দিলে অনেক বৎসর হইতেই প্রতি বৎসরই প্রত্যেক দেশে সমগ্র লোকসংখ্যার প্রয়োজনানুরূপ শস্যের পরিমাণ উৎপন্ন হয় না। প্রয়োজনীয় খাদ্য-শস্যের উৎপাদনের পরিমাণ যে হ্রাস পাইয়াছে তাহা বর্ত্তমান অর্থ-বৈজ্ঞানিকগণের অনেকেই স্বীকার করেন না। তাঁহারা মনে করেন যে কোন কোন দেশে খাদ্য-শস্যের প্রয়োজনানুরূপ উৎপাদনের পরিমাণ কিছু কম হইলেও সমগ্র জগতের উৎপাদনের পরিমাণ ঠিকই আছে। তাঁহাদিগের মতে money অথবা টাকা থাকিলেই প্রয়োজনীয় খাদ্য-শস্য পাওয়া সম্ভব হয় এবং কোন কোন সংসারে যে অর্থাভাব দেখা যায় তাহার একমাত্র কারণ বণ্টন-পদ্ধতির দুষ্টতা। উপরোক্ত অর্থ-বৈজ্ঞানিকগণ যখন বণ্টন-পদ্ধতির দুষ্টতা এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন সংসারে প্রয়োজনীয় খাদ্য-শস্য কিনিবার মত money-র অথবা টাকার অভাবের কথা স্বীকার করেন, তখন কতকগুলি সংসার যে প্রতি বৎসরের কয়েকদিন আংশিক আহারে কাটাইয়া দেন তাহাও পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়া থাকেন। বাস্তব ক্ষেত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, জগতের অধিকাংশ সংসারকেই প্রতি বৎসরের অধিকাংশ দিন অল্পাহারে অথবা অর্দ্ধাহারে অথবা অনাহারে কাটাইতে হয়। প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ সংসারেই যদ্যপি প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের

পরিমাণের অপূর্ণতা না থাকিত তাহা হইলে প্রত্যেক দেশের সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগ চল্লিশ বৎসর প্রাপ্ত হইবার আগে মৃত্যুমুখে পতিত হইত না। এতদবস্থায় যদ্যপি প্রয়োজনীয় খাদ্য-শস্যের বাৎসরিক উৎপত্তির পরিমাণ সমগ্র লোকসংখ্যার প্রয়োজনানুরূপ হইত তাহা হইলে কতকগুলি সংসারে প্রতি বৎসরই কিয়ৎ পরিমাণ উদ্বৃত্তি দেখা যাইত এবং প্রতি বৎসরই জগতে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য-শস্যের লোকসানের সংবাদ শুনা যাইত। কারণ কোন খাদ্য-শস্য ৩।৪ বৎসরের অধিক জমাইয়া রাখা যায় না। উহাতে হয় পোকা ধরিয়া যায়, নতুবা পচিয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খাদ্য-শস্যের এবম্বিধ লোকসানের কথা প্রায়ই শোনা যায় না। কাজেই, অর্থ-বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে যাঁহারা মনে করেন যে খাদ্য-শস্য সমগ্র লোকসংখ্যার প্রয়োজন মত পরিমাণে প্রতি বৎসর উৎপন্ন হইতেছে এবং লোক অল্পাহারে কষ্ট পাইয়া থাকে বণ্টন-পদ্ধতির দুষ্টতার জন্য, তাঁহাদের মতবাদ যুক্তিসঙ্গত নহে।

সমগ্র লোকসংখ্যার প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে কোন বস্তু প্রতি বৎসর উৎপন্ন হইতেছে কিনা তাহা বিচার করিতে হইলে প্রথমতঃ জানিতে হয় মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মার স্বাস্থ্য ও কার্য্যক্ষমতা সমানভাবে রক্ষা ও বৃদ্ধি করিতে হইলে কোন্ কোন্ শস্য ও কাঁচামালের প্রয়োজন হয়, দ্বিতীয়তঃ জানিতে হয় ঐ ঐ শস্যের ও কাঁচামালের কত পরিমাণ একজন মানুষের প্রতিদিনে ও সমগ্র বৎসরে প্রয়োজন হইয়া থাকে, তৃতীয়তঃ জানিতে হয় সমগ্র দেশের অথবা সমগ্র পৃথিবীর লোকসংখ্যা কত।

আমরা আগেই দেখাইয়াছি যে মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মার স্বাস্থ্য ও কার্য্যক্ষমতা রক্ষা ও বৃদ্ধি করিতে হইলে কোন্ কোন্ শস্য ও কাঁচামাল অত্যাবশ্যকীয় তাহাই বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণের জানা নাই তাহার পর আবার ঐ ঐ শস্যের ও কাঁচামালের কত পরিমাণ একজন মানুষের প্রতিদিনে ও সমগ্র বৎসরে প্রয়োজন হইয়া থাকে তাহাও তাঁহাদিগের জানা নাই। কাজেই সমগ্র লোকসংখ্যার প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহের উৎপাদন হইতেছে কিনা তাহা বর্ত্তমান অর্থ-বৈজ্ঞানিকগণের পক্ষে নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নহে।

মানুষের কর্ম্মানুসারে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মার স্বাস্থ্য ও কার্য্যক্ষমতা সমানভাবে রক্ষা ও বৃদ্ধি করিতে হইলে কোন্ কোন্ শস্যের ও কাঁচামালের প্রয়োজন হয় এবং প্রত্যেক মানুষের প্রতিদিন অথবা প্রতিবৎসর ঐ ঐ শস্যের ও কাঁচামালের কত পরিমাণ অত্যাবশ্যকীয়, তাহার অকাট্য হিসাব রহিয়াছে ভারতীয় ঋষির অর্থ-বিজ্ঞানে। তদনুসারে জগতের অথবা প্রত্যেক দেশের সমগ্র লোকসংখ্যার কোন্ কোন্ শস্য ও কাঁচামাল কত পরিমাণে সমগ্র বৎসরে অত্যাবশ্যকীয় তাহা হিসাব করিয়া দেখিলে এবং ঐ হিসাবের সহিত জগতে বাস্তবিক পক্ষে ঐ ঐ শস্য ও কাঁচামালের কত পরিমাণ প্রতিবৎসর উৎপন্ন হইতেছে তাহা তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, আয়ুঃক্ষয়কর বহু বস্তুই উৎপন্ন হইতেছে বটে কিন্তু মানুষের সুস্থ জীবন ধারণের জন্য যে যে শস্য ও কাঁচামাল একান্ত আবশ্যকীয় তাহার কোনটিই শতকরা ষাট ভাগের অধিক উৎপন্ন হইতেছে না।

সুস্থ জীবনধারণের প্রয়োজনীয় বস্তুর বণ্টন সম্বন্ধে জ্ঞান ও শিক্ষার অসম্পূর্ণতা

প্রয়োজনীয় শস্য ও কাঁচামালের বণ্টনের পদ্ধতিতে যে দুষ্টতা আছে তাহা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। কাজেই বণ্টনের জ্ঞান ও শিক্ষার অসম্পূর্ণতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য কোন যুক্তি-প্রমাণ উপস্থিত করা নিষ্প্রয়োজনীয়।

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে অকাম্য বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হইল কেন তাহার উত্তরে আমরা যে তিনটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি তাহা যে অকাট্য তাহা যখন ইতিহাস ও দর্শনের সহায়তায় প্রমাণিত করা যায় এবং এই তিনটী কারণই যখন দেখা যাইতেছে বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজে বিদ্যমান আছে, তখন আমাদের নির্দ্ধারণ যে নির্ভরযোগ্য তাহা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে গৃহীত হইতে পারে।

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে যে যে অকাম্য বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হইয়াছে তাহা দূরীভূত করিতে হইলে কোন্ কোন্ পন্থার আশ্রয় লইতে হয়?

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে যে যে অকাম্য বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হইয়াছে তাহা দূরীভূত করিতে হইলে কোন্ কোন্ পন্থার আশ্রয় লইতে হয়?—এই প্রশ্নের জবাব দিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে বর্ত্তমান পরিস্থিতির প্রধান কারণ জগৎব্যাপী পাশবিক যুদ্ধ এবং জগৎব্যাপী ঐ পাশবিক যুদ্ধের প্রধান কারণ তিনটী, যথা :—

(১) জগৎব্যাপী অর্থাভাব ;
(২) রাগ-দ্বেষসংযমোপযোগী শিক্ষার জগৎব্যাপী অভাব ;
(৩) সমগ্র মানবজাতিপরিব্যাপ্ত পরার্থপরতার অভাব।

এক্ষণে আমাদিগকে অনুসন্ধান করিতে হইবে যে, ব্যাধির কারণ নির্দ্ধারিত হইলে ব্যাধিকে সম্পূর্ণ ভাবে দূর করিয়া রোগীর সম্পূর্ণ আরোগ্য সাধন করা যায় কোন্ পদ্ধতিতে; ব্যাধির কারণ সম্পূর্ণভাবে দূর করিতে পারিলে যে ব্যাধিকে

সম্পূর্ণ ভাবে দূর করিতে পারা যায় এবং রোগীর আরোগ্য সম্পূর্ণ ভাবে বিধান করা যায়, ইহা বলা বাহুল্য।

এই সূত্রানুসারে ইহা বলা যাইতে পারে যে, যে যে কারণে মনুষ্যজাতির মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহ ও জগৎব্যাপী পাশবিক যুদ্ধের প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় সেই সেই কারণগুলি দূর করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে জগৎব্যাপী পাশবিক যুদ্ধের অবসান ঘটিতে পারে এবং উহার অবসান ঘটলে বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে যে যে অকাম্য বৈশিষ্ট্যসমূহের উদ্ভব হইয়াছে সেই সেই অকাম্য বৈশিষ্ট্যসমূহ দূরীভূত হইতে পারে এবং মানবজাতি আবার শান্তিতে দিনপাত করিতে পারে।

উপরোক্ত নিয়মানুসারে বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে যে যে অকাম্য বৈশিষ্ট্যসমূহের উদ্ভব হইয়াছে তাহা দূর করিবার পন্থা কি কি? এই প্রশ্নের জবাবে বলিতে হইবে যে উহা দূর করিবার পন্থা নিম্নলিখিত ছয়টী, যথা :—

(১) মানবজাতির প্রত্যেকের অর্থাভাব দূর করা;
(২) মানবজাতির প্রত্যেকের অর্থপ্রাচুর্য্য সংঘটিত করা;
(৩) মানবজাতির প্রত্যেকের রাগ-দ্বেষ যে আছে এবং উহা যে মানবজাতির সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে তাহা মানবজাতির প্রত্যেককে বুঝাইয়া দেওয়া;
(৪) মানবজাতির প্রত্যেকে যাহাতে রাগ-দ্বেষ সংযত করিতে পারে সেই পন্থা বাছিয়া বাহির করা এবং ঐ পন্থার প্রচার করা;
(৫) মানবজাতির প্রত্যেকে যাহাতে সম্পূর্ণ স্বার্থপরতা পরিহার করে তাহার পন্থা প্রচার করা;
(৬) মানবজাতির প্রত্যেকে যাহাতে পরার্থপর হয় তাহার পন্থা প্রচার করা।

বিচারবুদ্ধির দ্বারা চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, উপরোক্ত ছয়টী পন্থার আশ্রয় লইতে পারিলে যুদ্ধের অবসান ও বর্ত্তমান পরিস্থিতির অকাম্য বৈশিষ্ট্যসমূহ দূর করা সম্ভব হয় বটে কিন্তু প্রশ্ন যে—উপরোক্ত ছয়টী পন্থার আশ্রয় পাওয়া যায় কি করিয়া এবং কেই বা এই কার্য্যের পৌরোহিত্য করিতে পারেন?

ব্যাধির কারণ সম্পূর্ণ ভাবে দূর করিতে পারিলে ব্যাধিকে সম্পূর্ণ ভাবে দূর করা যায় বটে এবং রোগীর আরোগ্যও সম্পূর্ণ ভাবে বিধান করা সম্ভব হয় বটে কিন্তু ব্যাধি যখন পুরাতন (chronic) হইয়া দাঁড়ায় তখন একদিনেই ব্যাধির সমস্ত কারণ দূর করা সম্ভব হয় না। তখন একদিকে রোগী ব্যাধির তাড়নায় ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলে, নানারকম জটিলতায় কোনটী যে আসল ব্যাধি তাহা বুঝিতে পারে না ও বুঝিতে চায় না এবং ঔষধ গ্রহণ করিতে চায় না, অন্যদিকে যে যে ঔষধ রোগীর সমস্ত কারণ দূর করিতে পারে সেই সেই ঔষধ সংগ্রহ করা এবং **কার্য্যকারী** করা সময়সাপেক্ষ থাকে এবং তাহার জন্য রোগী ধৈর্য্য রাখিতে চায় না ও পারে না। এতদবস্থায় একান্ত প্রয়োজনীয় রোগের বিকাশ অথবা লক্ষণ অথবা symptoms ধরিয়া এমন ভাবে ঔষধ প্রয়োগ করা, যাহাতে রোগের যাতনা কিছু তখনই হ্রাস হইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে রোগের কারণও দূরীভূত হইতে পারে। এতাদৃশ অবস্থায় চিকিৎসকের ধৈর্য্য, জ্ঞান, কর্ম্মক্ষমতা অপরিমেয় হওয়ার একান্ত প্রয়োজন আছে।

এখন প্রশ্ন, মানবজাতির এই জটিলতর পুরাতন ব্যাধির চিকিৎসাই বা কি হইবে এবং চিকিৎসকই বা কে হইবেন?

আমাদিগের মতে মানবজাতির এই পুরাতন ব্যাধির আরোগ্য সাধন করিতে হইলে ইংরাজজাতির শিক্ষিত ও চিন্তাশীল সম্প্রদায়কে ইহার চিকিৎসক হইতে হইবে। ভারতবর্ষের শিক্ষিত ও চিন্তাশীল সম্প্রদায়কে এই চিকিৎসার সহকারী চিকিৎসক অথবা Compounder হইতে হইবে। ইংরাজজাতির চিন্তাশীল ও শিক্ষিত সম্প্রদায়কে কেন এই চিকিৎসার চিকিৎসক হইতে হইবে, অন্য কোন জাতির চিন্তাশীল ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে এই চিকিৎসকের কার্য্য করিবার বাধা কি, ভারতবর্ষের শিক্ষিত ও চিন্তাশীল সম্প্রদায়কে ইহার সহকারী চিকিৎসক অথবা Compounder হইতে হইবে কেন, তাহা আমরা এই প্রবন্ধের অন্যতম অংশে আলোচনা করিব। এই ব্যাধির চিকিৎসার জন্য ছয়টী ঔষধ অবলম্বন করিতে হইবে। যথা :—

(১) যাহাতে অনতিবিলম্বে সমগ্র মানবজাতির প্রত্যেকের অর্থাভাব (অর্থাৎ সমানভাবে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মার অস্বাস্থ্য ও কার্য্যাক্ষমতার অভাব) যথাসম্ভব পরিমাণে দূর হয়, তাহার পরিকল্পনা স্থির করিতে হইবে এবং তাহার সংঘটন অনতিবিলম্বে গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) যাহাতে অদূরভবিষ্যতে সমগ্র মানবজাতির প্রত্যেকের অর্থপ্রাচুর্য্য (অর্থাৎ সমান ভাবে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মার স্বাস্থ্য ও কার্য্যাক্ষমতার অটুটতা) সংঘটিত হয়, তাহার পরিকল্পনা স্থির করিতে হইবে এবং তাহার সংঘটন অনতিবিলম্বে গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) যাহাতে অনতিবিলম্বে সমগ্র মানব-জাতির প্রত্যেকের হৃদয় হইতে শত্রুভাব-জনিত, বিভিন্ন দেশ-জাত ভাব-জনিত, বিভিন্ন বয়স-জাত ভাব-জনিত, বিভিন্ন বর্ণ-জাত ভাব-জনিত, বিভিন্ন শিক্ষা-জাত ভাব-জনিত, বিভিন্ন আচার-জাত ভাব-জনিত, বিভিন্ন ব্যবহার-জাত ভাব-জনিত, বিভিন্নব্যবসা-জাত ভাব-জনিত, বিভিন্ন চেহারা-জাত ভাব-জনিত, বিভিন্ন বেশভূষা-জাত ভাব-জনিত, বিভিন্ন খাদ্য-জাত ভাব-জনিত, বিভিন্ন ভাষা-জাত ভাব-জনিত, বিভিন্ন জ্ঞান-জাত ভাব-জনিত, বিভিন্ন রস ও সম্বন্ধ-জাত ভাব-জনিত, বিভিন্ন ধর্ম্ম-জাত

ভাব-জনিত ও বিভিন্ন অবস্থা-জাত ভাব-জনিত বিদ্বেষের উচ্ছেদ হয়, তাহার পরিকল্পনা অনতিবিলম্বে স্থির করিতে হইবে এবং তদনুযায়ী প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক মানুষ, যে মানুষ, প্রত্যেকেরই প্রাণে ক্ষুধা-পিপাসার যন্ত্রণা যে সমান, প্রত্যেকেরই প্রাণে ক্ষুধা পিপাসা দূর করিবার প্রয়োজন ও প্রচেষ্টা যে সমান, প্রত্যেকেরই প্রাণে পুত্র-কলত্রাদির জন্য উদ্বেগ যে সমান, প্রত্যেকেরই সুখেচ্ছা ও দুঃখবিদ্বেষ যে সমান, মানুষমাত্রেরই ধর্ম্ম যে স্বভাব-জাত এবং উহা যে এক, স্বভাব-জাত মানব-ধর্ম্মের সহিত পরিচিত হওয়া যে-মানুষের একমাত্র ধর্ম্ম, মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম্মের কথা প্রচার করা যে অদূরদর্শিতার পরিচায়ক এবং কল্পনা-প্রসূত, ইহা যাহাতে অনতিবিলম্বে সমগ্র মানব-জাতির প্রত্যেকের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতে পারে, তাহার পরিকল্পনা অনতিবিলম্বে স্থির করিতে হইবে এবং অদূর-ভবিষ্যতে তদনুযায়ী প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে।

(৫) মানব-সমাজের প্রত্যেকের হৃদয় হইতে যাহাতে স্বাধীনতা, স্থান-গত জাতীয়তা, সম্প্রদায়পরায়ণতা, পৃথকত্ব-পরায়ণতা, সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা, উচ্চ-নীচ ভাবপরায়ণতা, প্রভু-ভৃত্য-ভাবপরায়ণতা, সম্পূর্ণভাবে উচ্ছিন্ন হয় এবং মানুষ মানুষকে তাহারই মত ভাবে দেখিতে পারে, তাহার পরিকল্পনা স্থির করিতে এবং অনতিবিলম্বে তদনুযায়ী প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে।

(৬) উপভোগ ও তৃপ্তিপরায়ণতার প্রবৃত্তি উচ্ছিন্ন হইয়া যাহাতে অপর কাহারও অপকার হয় এতাদৃশ কার্য্য করিব না, যাহাতে মানুষের উপকার হয় কেবলমাত্র সেই কার্য্যই করিব এতাদৃশ ভাব যাহাতে সমগ্র মানবজাতির প্রত্যেকের হৃদয়ে স্থান পায় ও বদ্ধমূল হয় তাহার পরিকল্পনা স্থির করিতে হইবে এবং অনতিবিলম্বে তদনুযায়ী প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে।

মনে রাখিতে হইবে যে সমগ্র মানবজাতির বর্ত্তমান ব্যাধি অত্যন্ত বিষম। চিকিৎসার বিলম্ব করিলে চলিবে না। বিলম্ব করিলে রোগীর প্রাণত্যাগ ঘটিবার আশঙ্কা আছে। চিকিৎসা করিবার জন্য যে ছয়টি ঔষধের কথা বলা হইল তাহার একটী আগে এবং একটী পরে করিবার কল্পনা অবলম্বন করিলে দীর্ঘসূত্রতার পরিচয় দেওয়া হইবে এবং তাহাতে সুচিকিৎসা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াবে, যুগপৎ ছয়টী ঔষধেরই একসঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

মানবসমাজে শৃঙ্খলা আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যে জগতে অ্যাটল্যান্টিক চার্টার, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের পরিকল্পনা, মিঃ অ্যাটলির পরিকল্পনা, মিঃ হিটলারের পরিকল্পনা প্রভৃতি দেখা দিয়াছে। ইহার প্রত্যেকটি সময়গত স্বভাবের দাবী। উহার প্রত্যেকটী—মানুষ যে এখন আর বর্ত্তমান শৃঙ্খলায় সন্তুষ্ট নহে তাহার সাক্ষ্য। আমাদিগের মতে এই সমস্ত পরিকল্পনার কোনটী সম্পূর্ণ অথবা ভ্রম প্রমাদশূন্য নহে। মানবজাতির বর্ত্তমান ব্যাধির চিকিৎসার জন্য ভারতবর্ষ হইতে উপরে যে ছয়টি ঔষধের কথা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সহিত এই সমস্ত পরিকল্পনা তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে উহার প্রত্যেকটী ভারতবর্ষের পরিকল্পনার অংশ মাত্র। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা যুগপৎ গ্রহণ না করিয়া অন্য কোন পরি-কল্পনা গ্রহণ করিলে জগৎকে দীর্ঘসূত্রতার দোষে দুষ্ট হইতে হইবে এবং তাহাতে উদ্দেশ্যের অসাফল্য ঘটিবে।

সমগ্র মানবসমাজের বর্ত্তমান ব্যাধির চিকিৎসার জন্য যে ছয়টী ঔষধের কথা ভারতবর্ষ হইতে উপরে বলা হইয়াছে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে প্রত্যেক গভর্ণমেন্টকে বিশেষতঃ Government of Indiaকে ঢালিয়া সাজিতে হইবে। গভর্ণমেন্টগুলির পরিচালনাকার্য্য চালাইবার জন্য যে সমস্ত বিবিধ কার্য্য করিতে হয় তাহা এক্ষণে যেরূপ বিভিন্ন Departmentএ অথবা বিভাগে বিভক্ত করা হয়, ঐ Departmentalisation (অর্থাৎ বিভাগকরণ) পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে।

প্রত্যেক গভর্ণমেন্টকে মূলতঃ (১) আইন-প্রণয়ন (২) কার্য্য পরিণতি ও (৩) বিচার — এই তিন বিভাগে বিভক্ত করিয়া বহু শাখা-প্রশাখা উদ্ভাবন করিতে হইবে। এই প্রবন্ধে ঐ সমস্ত কথা বিস্তৃতভাবে বলা সম্ভবযোগ্য নহে। এ সম্বন্ধায় বিস্তৃত কথা যথা সময়ে আমরা প্রবন্ধান্তরে প্রকাশ করিব।

সমগ্র মানবসমাজের বর্ত্তমান ব্যাধির চিকিৎসার জন্য যে ছয়টী ঔষধের কথা এই প্রবন্ধে ভারতবর্ষ হইতে বলা হইতেছে তাহা ফলপ্রসূ করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথমে ইংরাজজাতির শিক্ষিত ও চিন্তাশীল সম্প্রদায়কে ভারত-গভর্ণমেন্টের (Government of Indiaর) সাহায্যে সচেষ্ট হইতে হইবে। এক্ষণে আমরা নিম্নলিখিত চারিটী কথার বিচার করিব :—

(১) মানবজাতির এই পুরাতন ব্যাধির আরোগ্য সাধন করিতে হইলে কেন ইংরাজজাতির শিক্ষিত ও চিন্তাশীল সম্প্রদায়কে ইহার চিকিৎসকের কার্য্য করিতে হইবে এবং অন্য জাতির শিক্ষিত ও চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের উহা করিবার বাধা কি?

(২) ভারতবর্ষের শিক্ষিত ও চিন্তাশীল সম্প্রদায়কে ইহার সহকারী চিকিৎসক অথবা Compounder-এর কার্য্য করিতে হইবে কেন?

(৩) মানবজাতির এই পুরাতন ব্যাধির চিকিৎসার জন্য যে ছয়টী ঔষধ অবলম্বন করিবার কথা বলা হইয়াছে তাহা

সংগ্রহ করা যাইবে কি করিয়া এবং তাহার কার্য্য (medicinal action) পরিণতি লাভ করিবে কিরূপে ?

(৪) উপরোক্ত ছয়টী ঔষধ প্রয়োগ করা হইবে কোন্ অবস্থায় ?

উপরোক্ত তিনটী কথার মধ্যে আমরা সর্ব্বপ্রথমে তৃতীয়টীর বিচার করিব। এই তৃতীয় কথাটীর বিচার না করিলে প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ কথাটীর বিচার করা সম্ভব হইবে না।

মানবজাতির পুরাতন ব্যাধির চিকিৎসার জন্য যে ছয়টী ঔষধ প্রয়োগ করিবার কথা বলা হইয়াছে তাহা সংগ্রহ করা যাইবে কি করিয়া এবং তাহার কার্য্য পরিণতি লাভ করিবে কিরূপে ?

মানব-জাতির পুরাতন ব্যাধির চিকিৎসার জন্য যে ছয়টী ঔষধ প্রয়োগ করিবার কথা বলা হইয়াছে তাহা সংগ্রহ করা যাইবে কি করিয়া এবং তাহার কার্য্য পরিণতি লাভ করিবে কিরূপে এই দুইটী প্রশ্নের জবাব দিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে উপরোক্ত ছয়টী ঔষধের নাম আর একবার স্মরণ করিতে হইবে। যথা :—

(১) অর্থাভাব দূর করিবার কথা ;

(২) অর্থপ্রাচুর্য্য সংঘটিত করিবার কথা ;

(৩) বিবিধ রকমের দ্বেষ দূর করিবার কথা ;

(৪) বিবিধ রকমের সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা দূর করিবার কথা ;

(৫) মানব-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিবার কথা ;

(৬) সমগ্র মানবজাতিপরিব্যাপ্তপরার্থপরতা সাধন করিবার কথা।

উপরোক্ত ছয়টী ঔষধ সংগ্রহ করা যাইবে কি করিয়া এবং তাহার প্রত্যেকটীর কার্য্য পরিণতি লাভ করিবে কিরূপে তাহার কথা আমরা এখানে একে একে বলিতে আরম্ভ করিব।

অর্থাভাব দূর করিবার কথা ও অর্থ-প্রাচুর্য্য সংঘটিত করিবার কথা।

অর্থাভাব দূর করিবার কথা ও অর্থ-প্রাচুর্য্য সংঘটিত করিবার কথা শুনিতে হইলে পাঠকগণকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে আমরা "অর্থ" বলিতে বুঝিয়া থাকি সেই সেই বস্তুকে এবং তাহাদের সেই সেই প্রয়োগকে যে যে বস্তু এবং তাহাদের যে যে প্রয়োগ সমানভাবে মানুষের শরীরের, ইন্দ্রিয়ের, মনের, বুদ্ধির এবং আত্মার স্বাস্থ্য ও কার্য্য ক্ষমতা বজায় রাখিতে পারে এবং বৃদ্ধি সাধন করে ; যে যে বস্তু অথবা যে যে প্রয়োগ মানুষের শরীরের অথবা ইন্দ্রিয়ের অথবা মনের অথবা বুদ্ধির অথবা আত্মার স্বাস্থ্য ও কার্য্যক্ষমতার ক্ষয় সাধন করে তাহাদিগকে আমাদিগের কথানুসারে "অর্থ" বলা চলে না, উহাদিগকে আমাদের কথানুসারে "অনর্থ" বলিতে হয়। সাধারণতঃ "বস্তু" শব্দে কতকগুলি দ্রব্য বুঝায়। সংস্কৃত ভাষায় যে যে বস্তুকে "অর্থ" এবং "অনর্থ" বলা হয় সেই সেই বস্তুর মধ্যে দ্রব্য এবং কর্ম্ম উভয়ই থাকে। শরীর ও ইন্দ্রিয়ের স্বাস্থ্য ও কার্য্যক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য ও বৃদ্ধি করিবার জন্য যে যে বস্তু প্রয়োগ করিতে হয় তাহারা মূলতঃ কতকগুলি দ্রব্য। মন, বুদ্ধি ও আত্মার স্বাস্থ্য ও কার্য্যক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য ও বৃদ্ধি করিবার জন্য যে যে বস্তু প্রয়োগ করিতে হয় তাহারা মূলতঃ কতকগুলি কর্ম্ম।

সমগ্র মানবসমাজের, শতকরা নব্বইটী সংসারে আজকাল অল্পাধিক অর্থাভাব বিদ্যমান আছে—এই কথা আমরা পাঠকগণকে আগেই শুনাইয়াছি। চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে সমগ্র মানবসমাজের শুধু শতকরা নব্বইটী সংসারে কেন প্রত্যেক সংসারে আমরা যাহাকে "অর্থ" বলিতেছি তাহার দারুণ অভাব চলিতেছে। কোন একটী সংসারও এই অর্থের অভাব হইতে মুক্ত নহে। যে সংসারে টাকার অথবা খাদ্যাদির অভাব নাই সে সংসারে হয় শারীরিক অস্বাস্থ্য, না হয় মনের অশান্তি, না হয় বুদ্ধির বৈকল্য, না হয় আত্মার মলিনতা বিদ্যমান আছে। যে সব সংসারে টাকার অথবা খাদ্যাদির অভাব নাই, সেই সব সংসার অধিকতর 'অনর্থের' ভাণ্ডার হইয়া রহিয়াছে, কারণ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মার ক্ষয় সেই সব সংসারেই অধিকতর পরিমাণে দেখা দেয়। সমগ্র মানবসমাজের উপরোক্ত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহা বলিতে বাধ্য হইতে হয় যে, মানবসমাজের প্রত্যেকের অর্থ-প্রাচুর্য্য সংঘটিত করা একেবারেই সহজসাধ্য নহে। বরং উহা অতীব কষ্টসাধ্য। সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেকের অর্থ-প্রাচুর্য্য সংঘটিত করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে কোন্ কোন্ বস্তু অনর্থের এবং

কোন্ কোন্ বস্তু অর্থের সহায়ক তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এই নির্দ্ধারণকার্য্যে কোন্ কোন্ বস্তু শরীরের অর্থ ও অনর্থসাধক, কোন্ কোন্ বস্তু ইন্দ্রিয়ের অর্থ ও অনর্থ সাধক, কোন্ কোন্ বস্তু মনের অর্থ ও অনর্থ সাধক, কোন্ কোন্ বস্তু বুদ্ধির অর্থ ও অনর্থ সাধক এবং কোন্ কোন্ বস্তু আত্মার অর্থ ও অনর্থ সাধক তাহা পৃথক পৃথক ভাবে স্থির করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ যে সমস্ত বস্তু অনর্থের সহায়ক তাহাদের নাম যাহাতে সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেকে জানিতে পারে এবং তাহাদিগের ব্যবহার যাহাতে পরিহার করিতে বাধ্য হয় তাহার ব্যবস্থা স্থির করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ যে সমস্ত বস্তু অর্থের সাধক সেই সমস্ত বস্তুর নাম যাহাতে সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেকে জানিতে পারে এবং তাহাদের ব্যবহার যাহাতে মানবসমাজের মধ্যে প্রচারিত হয় তাহার ব্যবস্থা স্থির করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ যে সমস্ত দ্রব্য অর্থের সহায়ক সেই সমস্ত দ্রব্যের অর্থ-মূলক উৎপাদনের পদ্ধতিই বা কি কি ও অনর্থ-মূলক উৎপাদনের পদ্ধতিই বা কি কি তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

পঞ্চমতঃ যে সমস্ত দ্রব্য অর্থের সহায়ক সেই সমস্ত দ্রব্যের অনর্থ-মূলক উৎপাদনের পদ্ধতি যাহাতে পরিত্যক্ত হয় এবং অর্থ-মূলক উৎপাদনের পদ্ধতি যাহাতে গৃহীত হয় তাহার ব্যবস্থা স্থির করিতে হইবে।

ষষ্ঠতঃ যে সমস্ত দ্রব্য অর্থের সহায়ক সেই সমস্ত দ্রব্য যাহাতে অর্থমূলক উৎপাদনের পদ্ধতিতে সমগ্র মানবসমাজের সমগ্র লোকসংখ্যার প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে উৎপন্ন হয় তাহার ব্যবস্থা স্থির করিতে হইবে।

সপ্তমতঃ অর্থ-মূলক বস্তুসমূহের কোন্ কোন্ ব্যবহার অনর্থসম্পাদক এবং কোন্ কোন্ ব্যবহার অর্থসম্পাদক তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

অষ্টমতঃ অর্থ-মূলক বস্তু সমূহের যে যে ব্যবহার অনর্থ সম্পাদক সেই সেই ব্যবহারের কথা যাহাতে মানবসমাজের প্রত্যেকে জানিতে পারে এবং পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয় তাহার ব্যবস্থা স্থির করিতে হইবে।

নবমতঃ অর্থ-মূলক বস্তুসমূহের যে যে ব্যবহার অর্থ সম্পাদক সেই সেই ব্যবহারের কথা যাহাতে মানবসমাজের প্রত্যেকে জানিতে পারে, শিক্ষা করিতে পারে এবং গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় তাহার পন্থা স্থির করিতে হইবে।

দশমতঃ যে সমস্ত দ্রব্য অর্থের সহায়ক এবং বণ্টনের যোগ্য সেই সমস্ত দ্রব্যের অর্থ-সাধক বণ্টনের পদ্ধতি কি কি এবং অনর্থ-সাধক বণ্টনের পদ্ধতি কি কি তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেকের অর্থ-প্রাচুর্য্য সংঘটিত করিতে হইলে একটীর পর একটী করিয়া যে দশটি কার্য্য-সূচীর সাধনা করিতে হইবে এবং যাহার কথা উপরে বলা হইল সেই দশটি কার্য্য-সূচীর মধ্যে কি কি কার্য্য কি ভাবে আছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, দেখা যাইবে যে উহার প্রত্যেকটির মধ্যে গবেষণা (Re-search), সংগঠন (Organisation), আইন প্রণয়ণ (Legislation), এবং শিক্ষা প্রদান (Training), এই চারিটি কার্য্য বিদ্যমান আছে। ইহা ছাড়া এই দশটি কার্য্য-সূত্রের কয়েকটির মধ্যে ক্ষেত্র নির্ব্বাচন (Selection of land), ক্ষেত্র-প্রণয়ণ (Preparation of land), কায়িক শ্রম (Physical labour), এবং শ্রম-পরিদর্শন (Supervision of labour) বিদ্যমান আছে।

যে দশটী কার্য্য-সূত্রের সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারিলে সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেকের অর্থ-প্রাচুর্য্য সংঘটিত করা সম্ভব হইতে পারে, তাহা যে দুরূহ, তাহা চিন্তাশীলগণ সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন। কিন্তু তাহার প্রত্যেকটী যে কত দুরূহ এবং সময়সাপেক্ষ তাহা অনুমান করা অতীব ক্লেশ-সাধ্য। এই দশটী কার্য্যসূত্রের প্রত্যেকটী যে কত দুরূহ এবং সময়সাপেক্ষ এবং মানবসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় উহা সহজ ও শ্রমসাধ্য করিতে হইলে কোন্ পন্থার আশ্রয় লইতে হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এই দশটী কার্য্য-সূত্রের প্রত্যেকটী আমরা একে একে বিচার করিব। পাঠক-গণকে অনুরোধ তাঁহারা যেন ধৈর্য্য না হারান।

সমগ্র মানবসমাজ কি কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত তাহা তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন। রোগ কঠিন হইলে চিকিৎসাও কঠিন হইয়া থাকে। চিকিৎসা কঠিন বলিয়া হতাশ্বাস অথবা অধৈর্য্য হইলে চলে না। ধৈর্য্য রক্ষা করিয়া সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারিলে সুফল অনিবার্য্য।

সমগ্র মানবসমাজের অর্থাভাব দূর করিয়া অর্থপ্রাচুর্য্য সংঘটিত করিতে হইলে যে দশটী কার্য্যসূত্র অবলম্বন করিতে হইবে বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল সেই দশটী কার্য্যসূত্রের মোটা মোটা কথাগুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচনা করিয়া আমরা পুনরায় সমগ্র মানবসমাজের অর্থাভাব দূর করিয়া অর্থপ্রাচুর্য্য সংঘটিত করিবার কথা আলোচনা করিব। [ক্রমশঃ

মায়া-মৃগ

শ্রী মতিলাল দাশ

কুমারগঞ্জ।

সুরেশ বসিয়া ভাবে। তাহার পোর্টিকো দক্ষিণ-মুখী, সেখান হইতে দৃষ্টি পড়ে কুমার নদীর ক্ষীণ-পরিসর বিসর্পিল রেখা। যখন দেশ-দেশান্তরের পণ্য বহিয়া তরণী আসে, তাহাদের রঙীন পালের দিকে চাহিয়া সুরেশের মন উড়িয়া যায়।

নিরুদ্দেশ গতি—চঞ্চল বেদনাময়। মনের এই ভাবকে ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। তাহার অঙ্গনে বেল ও জাম পরস্পর বেষ্টন করিয়া উঠিয়াছে। বৈশাখে বেলতরুতে অজস্র ফুল ফুটিয়াছে— তাহার সুমিষ্ট সুরভি আকুল করিয়া তোলে।

মাঝে মাঝে কোথা হইতে 'চোখ গেল' পাখী উড়িয়া আসে, তাহার উদাস করুণ স্বর হৃদয় বিগলিত করে।

বৈশাখের তপ্ত তাম্র আকাশ, মিষ্ট দক্ষিণ বাতাস, সুন্দর ও চারু, কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে এই চারুতা কোথায়?

সুরেশ সাব-রেজিষ্ট্রার। দিনের পর দিন সে দলিল লইয়া দিন যাপন করে। এই প্রাত্যহিক গ্লানি তাহাকে বিদ্রোহী করিয়া তোলে। কবালা, রেহেণী খত, কবুলিয়ত ও পাট্টা, আর তাহার সঙ্গে দেশের যত বিকৃত, বিশ্রী নর ও নারী।

যাহারা দলিল রেজিষ্টারী করিতে আসে, তাহাদের কেহই সুন্দর নহে, সে বসিয়া বসিয়া নভেল পড়ে। মাঝে মাঝে কাব্য লইয়া নাড়ে-চাড়ে।

উর্ব্বশীর কথা ভাবে—

> একজন তপোভঙ্গ করি'
> উচ্চহাস্য অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি'
> নিয়ে যায় প্রাণ মন হরি'
> দু'হাতে ছড়ায় তারে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে
> রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে
> নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।

নিদ্রাহীন যৌবনের গান তাহার অন্তরকে ভাবোদ্বেল করিয়া তোলে। গৃহে তাহার লক্ষ্মী আছে—প্রিয়তমা পত্নী বীণা।

বীণা বীণা নয়, তাহাতে সুরসপ্তক বাজে না। প্রাত্যহিক জীবনের মাঝে সে কর্ম্মময়ী সহধর্ম্মিণী। সুরেশ সহধর্ম্মিণী চায় না। চায় প্রেয়সী—যাহার সহিত ভালবাসা চলে—চলে জ্যোৎস্না-রাত্রির সম্ভাষণ, চলে নিশীথের নিস্তব্ধ আলাপন। সুরেশ হাঁফাইয়া ওঠে।

হায়, তাহার হৃদয়ে যে ক্ষুধিত যৌবন বিশ্বের সৌন্দর্য্য-প্রতিমা চায়, সে কি ব্যর্থ হইয়া ফিরিবে?

রবিবার:

ভিখারীরা দল বাঁধিয়া আসে। তাহাদের নানা জনের নানা সুর। নানা ভাবে ইনুনি বিনুনি করিয়া দাবী জানায়। একটী পাগলী আসিল, সে বকিয়া চলে, "এ অবিচার চলবে না, আমার জমি বেচলে শাপ লাগবে—" আরও কত কি।

আর একটী বুড়ী আসিয়া বসে; পা ছড়াইয়া বসিয়া ঝুড়ি হইতে চিরুণী বাহির করিয়া চুল আঁচড়াইতে বসে আর বলে—"মা ঠারণ—"

সুরেশ জানিত, বীণা ঐ বুড়ীটাকে ভালবাসে, মাঝে মাঝে এক আধটা পয়সা দেয়। সংসারের এই রিক্ত হাহাকার, এই সুগভীর দৈন্য সুরেশের বুকেও বেঁধে। সে বীণাকে বারণ করে না।

কিন্তু তাহার ভাবনা তাল-গোল পাকাইয়া বসে। বসুধার ধনরত্ন অনন্ত, অজস্র ঐশ্বর্য্যে দিকদিগন্ত পরিপূর্ণ—অথচ তাহার মধ্যে এই অসহায় ক্রন্দন। মানুষের সভ্যতার এই বিরাট অপচয় কেমন করিয়া শেষ হয়, সুরেশ ভাবিয়া পায় না।

বীণা পয়সা দিয়া ফেরে। সুরেশ ডাকে—"শুনবে বীণা আমার নূতন কবিতা—?"

"না; এখন আমার কাজ রয়েছে, কাসুন্দি রোদে দেব—"

"রোদ পালাবে না, একটু দাঁড়াও। কাল সারারাত ধরে এই স্বপ্নটি দেখেছি—আর আজ ভোরে উঠেই লিখেছি—"

"সে ত' ভাল হয় নি, ঘুম না হলে তোমার অজীর্ণ আবার বাড়বে—এনোর ফ্রুট-সল্ট এনে দেব কি?"

"এনো চুলোয়'থাক, তুমি একটু স্থির হয়ে দাঁড়াও।"

"বেশ দাঁড়ালাম। তারপর—"

"তারপর শোন তোমার স্তব—"

ভালবাসি সখি তোমার, কাজল কালো আঁখি
ওগো আমার প্রাণের পাখী !

বীণা খিল্ খিল্ করিয়া হাসে আর বলে—"আমি ত' পাখী নই—"

"পাখী হলেই ভাল হত,—চুপ করো, আমার আবৃত্তির আনন্দ মাটি করো না—"

তুমি আমার শূন্য প্রাণের পূর্ণতম সাকী
তোমায় আমার বামে রাখি,
তুমি আমার সারাদিনের গভীরতম বাওয়া
গন্ধভরা দখিণ হাওয়া,
তোমার লাগি কল্পলোকে নিত্য আসা যাওয়া
তবু তোমায় হয় নি পাওয়া।

বীণার চোখ বাহিরে ছোটে, সেখানে খোকা নিতাইয়ের কোলে বায়না ধরে—"আমি ঘ্যাচ করব।" তাহার অর্থ আছে। ঘ্যাচ করিয়া গলা কাটা যায় খোকা তাহা শিখিয়াছে। নিতাই তাহাকে চটা দিয়া তরবারি বানাইয়া দিবে, খোকামণি তাহা দিয়া নিতাইকেই ঘ্যাচ করিবে। সুরেশের কাব্যজাল হইতে প্রাণময় পুত্রের এই আনন্দমুখর বচন তাহার নিকট লাখগুণে প্রিয়।

সুরেশ রাগিয়া ওঠে, বলে, "শুনবে না—"

"ঐ দেখ না খোকামণি কেমন করছে—"

সুরেশও চাহিয়া রহে। বলে পিতৃগর্বে গর্বিত অভিমানে, "খুব দুষ্টু হয়েছে—কিন্তু—"

বীণা রাগাইবার জন্য বলে—"তুমি ত' আমায় ভালবাস না—"

সুরেশ বিস্মিত হইয়া বলে—"তবে কাকে ভালবাসি—?"

"আমি কি তার জানি। কিন্তু তোমার পাগলামি শুনবার অবসর নেই—যাই—রাঁধতে হবে—"

বীণা চলিয়া যায়।

তার ছাই-রঙ শাড়ী, তার হাতের ধবল শাঁখা, তার কাণের দুল, তার চপল চঞ্চল গতি এসেন্সের মত একটী মোহ ছড়াইয়া যায়। সুরেশ আবার ভাবিতে বসে।

বৈশাখের কনক-উজ্জল আলো ছড়াইয়া পড়ে—কিন্তু তাহার মধ্যে যেন অনাদি বঞ্চনার গভীর বিষাদ—তাহার নিস্তব্ধ হৃদয়ের নিবিড়তায় সেই সঞ্চরণশীল বিষাদকে সে অনুভব করিতে চায়।

সত্য বটে, বীণাকে সে হয় ত' কোন কালেই ভালবাসে নাই। পৃথিবীর নানা কবির নানা কাব্য সে পড়িয়াছে। তাহাদের ছন্দ ও গান তাহার চিত্তে যে পিপাসা জাগাইয়াছে, সেই পিপাসার সে নিবৃত্তি চায়। বীণা একান্ত পরিচিত—একান্ত সহজ, তাহাকে লইয়া জীবনে সংঘাত ওঠে না।

সে ভালবাসে আইডিয়া। তাহার মানসী অনিন্দিতা—সে মনে করে,—তার কালো রেশম-রঙের শাড়ী, তার পেলব রূপ যেন নিস্তরঙ্গ জ্যোৎস্নার প্লাবনের মত স্নিগ্ধ, তার চোখে সৃষ্টির বিস্ময় যেন জমাট বাঁধিয়াছে, তার কথায় যেন ছন্দ নাচে, তার চলায় যেন রাগিণী বাজে, সে যেন শুধু ভালবাসার মাধুরী—সে যেন চিরন্তন আত্মরী—এমনই কত কি—কল্পনার নায়িকা বীণাকে জানে না—

বীণা প্রতিষ্ঠিত বাস্তবের অচল ভূমিতে, তাহার অঞ্চলে বাজে চাবি, সে ঘরকন্নার আয়োজন করে—সে প্রেমিক প্রেমিকার বিস্তৃত নিভৃত জগৎ রচনা করিতে পারে না। তাই তারা অন্তরে অন্তরে যেন বিদেশী, সে যেন এক পারের পাখী, অশ্বত্থ তরুর পত্রজালে ডাকে বেদনার পূরবী, বীণা যেন অপর পারের সুখী বুলবুল, বকুলের ডাকে চুলবুল করে।

উপন্যাসের গতি অবাধ, সেখানে পরিচয় ঘটে সহজে, জীবনযাত্রা সেখানে যেন কোনও অন্তরায় ঘটায় না, কিন্তু বাস্তব একান্ত কঠিন—সুরেশ কল্পনায় চায় তার সঙ্গ, যে তার যাদু দিয়া দরদ দিয়া বিপ্লব সৃষ্টি করিবে।

সাব রেজিষ্ট্রার আর থানার দারোগা ইহাই লইয়া কুমারগঞ্জ। দারোগা সাহেব তমিজুদ্দিন খাঁ আলাপী লোক। অভিজাত বংশের মাধুর্য তার অঙ্গগঠনে, অভিজাত বংশের আলাপ তার কণ্ঠে। দুইজনে খুব বন্ধুত্ব—খাঁ সাহেব আসিলেন।

সুরেশ অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল, বলিল, "মেজাজ সরিফ?"

খাঁ সাহেব হাসিল, তারপরে বলিল, "আল্লার দোয়ায় চলছে।"

সুরেশ বলিল, "শুনবেন কবিতা, আজই লিখেছি—মনে

করুন আপনার বিবিসাহেব আপনাকে ভালবাসেন না, তাই আপনার হৃদয় শতধাবিদীর্ণ—"

খাঁ সাহেব বলিল, "কবিতা এখন থাক।"

সুরেশ বলিল, "তা হলে যুদ্ধের খবর শুনবেন, ইরাক আবার আমাদের বিরুদ্ধে লড়ছে—"

খাঁ সাহেব স্রোত থামাইতে বলিল, "কাগজ পড়েছি, আপনাকে এখন অন্য একটু কাজে বিরক্ত করতে এসেছি।"

"বলুন, মেহেরবানি করুন।"

"ওপারে গোয়ালদি গ্রামের নাম শুনেছেন?"

"শুনেছি, কেন? ওখানে কমিশনে গিয়েছি, ওই যে সুদর্শন ঋষির স্ত্রী—ইংরেজী স্কুলে দশ বিঘা জমি দান করল, তার বাড়ীতেই গিয়েছিলাম।"

"তার ছেলেকে নিয়েই কাণ্ড।"

"ছেলে? ছেলে নেই বলেই ত' সুদর্শন জমি দান করল!"

"ছেলে ছিল, রাজপুত্রের মত, ঋষিদের ঘরে এমন সৌম্যকান্তি দেখা যায় না, তার রূপ দেখলে পরাণ জুড়ায়। তার নাম বিষ্ণুপদ, দশ বৎসর আগে একদিন বাপের গালাগালি শুনে ছেলেটি পালিয়ে যায়—"

সুরেশ বাধা দিয়ে প্রশ্ন করল, "সে বুঝি ফিরেছে, ভাগ্য বলতে হবে—ঠিক যেন ভাওয়াল কুমারের মত।"

খাঁ সাহেব ধীর মানুষ। সুরেশের উচ্ছ্বাস জানিত। বলিল, "ফিরেছে, তবে একটা নাটক ক'রে।"

"কি বিয়োগান্ত, না মিলনান্ত?"

খাঁ সাহেব বেশী পড়াশুনা করে নাই। সুরেশের কথার রস উপভোগ না করিয়াই বলিল, "সব শুনুন, বিষ্ণুপদ ঋষি বরিশালে গিয়া বিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী নাম ধরে, তারপর ওখানকার এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের ঘরে আশ্রয় পায়। ব্রাহ্মণ নিঃসন্তান—তাঁর স্ত্রী ওকে পালিত পুত্রের মতই পালন করে, তারপর এক দিন শুভক্ষণে শুভলগ্নে তার বিয়ে দেয়—"

সুরেশ স্তম্ভিত হইয়া বলিল, "বলেন কি?"

খাঁ সাহেব বলিল, "সত্য কল্পনার চেয়ে শক্ত, এক অনাথ ব্রাহ্মণের এক সুরূপা সুলক্ষণা কন্যা ছিল—তার নাম সুজাতা—"

"নামটি খুব চমৎকার!"

"শুধু নাম নয়, তার চেহারাও চমৎকার—যেন জগদ্ধাত্রীর মত।"

"বেশ বলুন, তারপর।"

"বিয়ের পরে ওদের বিবাহিত জীবন চার বছর কেটেছে—হাসি, গানে, খেলায়,—মেয়েটি দিনে দিনে স্বামীকে ভাল বেসেছে। গত দুই মাস হ'ল সুজাতার কি অসুখ হয়েছে তাই কলকাতায় ডাক্তার দেখাবে বলে বিষ্ণুপদ ওকে এখানে নিয়ে আসে। সুজাতা এসেই সব জানতে পারে, সুদর্শনের শত্রু ত' কম নয়, ওর পয়সা আছে বলে ভদ্রলোকেরা ওকে দেখতে পারে না। সুজাতার কান্না শুনে তারা থানায় খবর দেয়—"

"তারপর?"

"এজাহার দেয় ফুসলানের, মেয়ের জবানবন্দী নিয়ে জানলাম ফুসলানো নয়, প্রবঞ্চনা। মেয়েটির দিকে চাইলে দুঃখ হয়, তার ভরা যৌবন—স্বামীকে সে ভালবাসে, অথচ ব্রাহ্মণের কন্যা সে তার সংস্কার মুছে ফিরতে পারে না ঋষির ঘরে। মেয়েটি এখন আশ্রয় চায়, সে কোনও বামুনের ঘরে যেতে চায়। এখানকার সবাইকে ডেকে বললাম, কেউ রাজি নয়। এরা সব একান্ত ভীরু।"

সুরেশ ব্যথিত হইয়া বলিল, "যা বল্লেন খাঁ সাহেব, হিন্দু এখন মেরুদণ্ডহীন। তার সৎসাহস নেই, সে কাছিমের মত শুঁড় গুটাতে জানে, আপনাকে মেলে ধরতে পারে না। সবাইকে বলেছেন?"

"বলেছি, কাউকে বাকি রাখি নি, কিন্তু—"

"এদের ধিক্কার দিতে হয়, এরা মরবে—নারীর মর্য্যাদা যারা বোঝে না—"

"কিন্তু আপনিও ত' বামুন—"

"তা' বটে, কিন্তু আমি সরকারি চাকর।"

"তাতে আপত্তির কারণ কি? আপনি ত' আইন ভাঙছেন না, একজন নিরাশ্রয়কে সাময়িকভাবে আশ্রয় দিচ্ছেন"

"কিন্তু আমার বাসা ত' ছোট।"

"হাসালেন, একজন আত্মীয়া এলে কি করতেন?"

"তা' ছাড়া বুঝেছেন ত' খাঁ সাহেব, এসব ব্যাপারে গৃহিণীরা উদারদৃষ্টি দিতে পারেন না—"

"তা' জানি, কিন্তু বৌদি এতে আপত্তি করবেন না। আপনি আশ্রয় না দিলে মেয়েটিকে কোথায় পাঠাব তা ত' ভেবেই পাই না।"

সুরেশ নিজের খনিত গর্ত্তে নিজেই পড়িল। মুখ কাচুমাচু করিয়া রহিল।

খাঁ সাহেব বলিলেন, "আমি মেয়েটিকে নিয়ে আসি, আপনি ততক্ষণ ক্ষেত্র প্রস্তুত করুন।"

খাঁ সাহেব সম্মতির অপেক্ষা না রাখিয়া বাহির হইয়া গেল।

সুরেশ মূঢ়ের মত বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

দুই

বীণা আসিয়া বলিল, "মশারির থান আনবার ব্যবস্থা করেছ ?"

"না।"

অপ্রসন্ন মুখে বলিল, "এসব বাজে বই না পড়ে, যদি সংসারের দিকে মন দিতে—"

সুরেশ হাসিয়া বলিল, "তাতে সংসারের লাভ হ'ত না, আমার মন শুধু শুকিয়ে যেত।"

পরে বীণার হাতে একখানি রঙীন খাম দেখিয়া বলিল, "ওটা কি ?"

বীণা হাসিয়া বলিল, "কলম্বোর চিঠি, আমার সই শান্তা দিয়েছে। সে লিখেছে মজার কথা, শুনবে ?"

সুরেশ পুলকিত হইয়া বলিল, "বেশ পড় না।"

"তোমার বন্ধুকে দিয়েছি উপহার, মাণিক নয়, মুক্তো নয়, একটা নাম। সে নাম থাকবে আমাদের দুজনের মাঝেই, পাঁচজনের মুখে সেটা সস্তা হতে পারে না—নাম দিয়েছি সুরজিৎ। তোমার বন্ধু আমার মনের সুরকে জয় করেছে, তাই। দু'জনের মন যেখানে মেলে, সেখানেই ত' বিশ্বের সমস্ত সুর। সেই সুর আমাদের হৃদয়কে নিত্যদিন অনুরঞ্জিত করবে।"

সুরেশ ক্ষুব্ধ বেদনায় বলিল, "শান্তার বরের সৌভাগ্যের জন্য আমার ঈর্ষ্যা হয়।"

বীণা বলিল, "কেন ?"

"তোমার সই ভালবাসতে জানে।"

বীণা বলিল, "এই, আর আমি বুঝি জানি না ?"

"না।"

"তার কারণ, আমি কবির ভাষায় কথা বলি না, কিন্তু তুমি যে বেজায় ভুল কর, গল্পে যা চলে জীবনে তা চলে না। চণ্ডীদাসের কবিতা খুব মিষ্টি, কিন্তু কেউ যদি সেটা প্রত্যহ ঘরে বলতে আরম্ভ করে তা' হ'লে লোকে তাকে পাগলা গারদেই নেবে।"

বীণা তাহার সহজ সাংসারিক বুদ্ধি দিয়া সুরেশকে পরাস্ত করে। হার মানিয়া লওয়া তাহার স্বভাব নহে, সে তর্কের খাতিরেই তর্ক করিয়া চলে। কিন্তু আজ সুজাতার কথা বলিতে হইবে। তাই সে পত্নীকে স্নিগ্ধ সম্ভাষণ করিয়া বলিল, "আচ্ছা একটা প্রশ্নের জবাব দাও—"

স্বামীর কণ্ঠের অস্বাভাবিকতা বীণাকে আশ্চর্য্য করিল, সে বলিল, "কি বল, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি, ভাতের হাঁড়ি উনানে চাপিয়ে এসেছি।"

"আচ্ছা, ধর যদি আমি বামুন না হ'য়ে অন্য জাত হ'তাম, তা'হলে কি তুমি আমায় অশ্রদ্ধা ক'রতে ?"

"দূর, তা' কেমন ক'রে হবে, তুমি বামুন না হ'লে আমার সঙ্গে বিয়ে হ'ত কেমন ক'রে ?"

"ধর, যদি আমি মিথ্যা পরিচয় দিয়ে তোমায় বিয়ে করতাম তা'হলে ?"

"তা' হ'তে পারে না, বিয়ে ত' তোমার ইচ্ছের কথা নয়, এ-যে জন্মজন্মান্তরের বাঁধন ?"

"কিন্তু মানুষ বোধ হয় বিধাতার বিধান উল্টাতে পারে, একজন প্রবঞ্চক এমনভাবেই একটা মেয়েকে প্রতারিত করেছে, সে কি করবে বল ?"

বীণা ভাবিত হইয়া পড়িল। এমন দুরূহ প্রশ্ন—সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। সে বলিল, "এর জবাব আমি দিতে পারব না।"

সুরেশ হাসিয়া বলিল, "কিন্তু দিতেই হবে, সেই মেয়েটি আমাদের এখানেই আসছে।"

"এখানে আবার এ-সব গণ্ডগোল কেন ?"

"আমি চাই নে, কিন্তু খাঁ সাহেব ধরলেন, আমরা আশ্রয় না দিলে নিরাশ্রয়া ভেসে যাবে, তুমি কি সেটা চাও ?"

বীণা না বলিতে পারিল না। কিন্তু তাহার মন খচ্ খচ্ করিতে লাগিল।

সে এল অনিন্দিতা লাবণ্যময়ী। ওর লালপাড় শাড়ীতে তাহাকে অগ্নিশিখারই মত দেখাইতেছিল। মেয়েদের রূপ আছে, সে-রূপ দিয়া তাহারা জয় করে, কিন্তু এ-রূপ বিশ্বাতিশায়ী, আপন অবিনশ্বর মাধুর্য্যে পরিবেশকে মধুময় করে। সুজাতা কাঁদিতেছিল, সুরেশের মনে হইল যেন পদ্মের পাঁপড়ীতে শিশির-বিন্দু টলমল করিতেছে। নিতাইয়ের সঙ্গে সুজাতা আসিয়াছিল। সে আসিয়া সুরেশের দুই পা জড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। সুজাতার করপল্লবের মদির স্পর্শ, করুণায় ও স্নেহে এবং বোধ হয় আরও এক অননুভূত শিহরণে খুশী হইয়া সে বলিল, "কাঁদবেন না, এখানে আপনি নিজের মতই থাকুন. বীণা, এঁকে নিয়ে যাও।"

বীণার মন অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। জ্যোতির্ম্ময়ী এই অগ্নিশিখাকে সে প্রথম দর্শনেই যেন ভয়ে গ্রহণ করিল, প্রেমে তাহাকে আপন করিতে পারিল না। জয় করিয়া সে স্বামীকে বশ করে নাই, সহজেই তাহাকে পাইয়াছে। সেই প্রেমাতুর ভাবালু মানুষকে এই পরিস্থিতি কোথায় নিয়া যাইবে তাহা কল্পনা করিয়া সে যেন শিহরিয়া উঠিল। কষ্টে আত্মদমন করিয়া সে বলিল, "এস বোন্।"

অপ্রসন্নতা সুজাতাকে বিদ্ধ করিল না। স্রোতের ভাসমান তৃণের মত সে আশ্রয় পাইলেই বর্ত্তিয়া যায়। এমন সময় খোকামণি আসিল, ডাকিল, "মা।"

সুজাতার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া রহিল। সুরেশ কহিল, "মাসী।"

সুজাতা বাঁচিল। খোকামণিকে বক্ষে চাপিয়া বলিল, "এস খোকামণি।"

সুজাতা আশ্রয় পাইল।

বীণা তাহাকে রান্নাঘরে যাইতে দিবে না। মাত্র দুটী ঘর। একটিতে সুরেশ থাকে, অপরটী সুজাতাকে দেওয়া হইল। সেখানেই সে থাকে ও খায়। খোকামণি সুজাতাকে পাইয়া বসিল, সুজাতার দিন কাটে তাহাকে লইয়া।

আফিসে যাইবার সময় সুজাতাকে সুরেশ বলিল—বীণা তখন রান্না ঘরে—"আপনার দিদিকে একটু সইতে হবে, উনি আচারপরায়ণ।"

সুজাতা মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল, "আমায় আপনি বলে লজ্জা দেবেন না দাদা, আমায় বোন বলে গ্রহণ করবেন।"

সুরেশ সে কথার উত্তর দিল না। সুজাতার করুণামাখা মুখমণ্ডলে যে অপার্থিব সৌন্দর্য্য জ্যোতিশ্ছটা ছড়াইতেছিল তাহাই তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল, সে কথা না বলিয়া চলিয়া গেল।

আফিস হইতে ফিরিতেই সুজাতা পাখা লইয়া সুরেশকে বাতাস করিতে বসিল। ক্লান্ত হইয়া যখন ফেরে, তখন সুরেশের হৃদয় সেবার জন্য ব্যাকুল হয়, কিন্তু বীণা দর্পিতা। স্বামীর অজস্র ভালবাসা সে পাইয়াছে, তাই তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য যে সাধনা তাহা কখনও শেখে নাই। সুরেশ চোখ বুজিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছিল আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না না সুজাতা, তুমি কষ্ট করছ কেন?"

"এ ত কষ্ট নয়, মেয়েদের এই ত' কাজ দাদা।"

সুরেশ উত্তর দিল না, ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে বীণার দিকে চাহিল। সুজাতার এই প্রগল্‌ভতা বীণার ভাল লাগিতেছিল না, তাহার ও তাহার স্বামীর মধ্যে ব্যবধান গড়িবার জন্য এই সুন্দরীর পরিচর্য্যাকে সে বিরক্তির সহিত দেখিতেছিল, তাই অস্বাভাবিক ঝাঁঝের সঙ্গে বলিল, "কি খাবে বল?"

সুজাতা লজ্জিত হইয়া কহিল, "সারাদিন খেটে ফিরেছেন, এখন কি অমন কড়া ভাবে বলতে হয়।"

বীণা তাহার উত্তর দিল না, স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "লুচি তৈরী করব।"

সুরেশ বিরক্ত হইয়া বলিল, "না?"

"কেন কি গেলা হয়েছে?"

সুজাতা অপ্রতিভ হইয়া বুঝিল তাহার উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নয়, তাই ধীরে ধীরে পাখা রাখিয়া চলিয়া যাইতেছিল। সুরেশ ডাকিয়া বলিল, "আর একটু বাতাস কর বোন।" সুজাতা কি করে, নিরুপায় হইয়া ফিরিল

বীণা রাগিয়া বলিল, "তা'হলে খাবে না।"

"আম যদি থাকে দু'খানা আনো।"

বীণা চলিয়া গেল, সুজাতা উঠিয়া দাঁড়াইল, "আসি দাদা।"

সুরেশ বুঝিল, কিন্তু পত্নীর সন্দেহ ও বিরক্তি যাহাতে

এই নবাগতাকে ক্লিষ্ট না করে, তাহার জন্ম সম্বন্ধকে সহজ করিবার জন্ম বলিল, "তোমার ভাই বোন আছে সু ?"

এই প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণ সুজাতার চোখে জল আনিল। সে ছল ছল চোখে বলিল, "না।"

বীণা প্লেটে আম আনিয়া বলিল, "এখন বসে কাঁদাকাটির দরকার নেই বোন, এখন নিজের ঘরে যাও।"

সুরেশ বলিল, "সুজাতা যাচ্ছিল, আমিই ওকে ধরে রেখেছি।"

বীণা তাহার উত্তর দিল না। তাহার পাংশু মুখে বিরক্তির রেখা খেলিয়া গেল।

এইভাবে সংশয় ও অবিশ্বাসের মধ্যে দিন কাটিল। সুজাতার দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহার পিতা কিংবা শ্বশুর কেহই অগ্রসর হইয়া আসিল না। জাতিচ্যুতির বিড়ম্বনার ভয়ে তাঁহারা নড়িলেন না। যে পাতা খসিয়া গিয়াছে তাহাকে খসিতে দিয়া কলঙ্কের দায় হইতে আপনাদিগকে বাঁচাইলেন। কাজেই প্রমাণের অভাবে সুদর্শনের পুত্রের বিরুদ্ধে মামলা টিকিল না। তাহা ছাড়া সুদর্শন জলের মত অর্থব্যয় করিয়া সমস্ত বিরুদ্ধ প্রমাণকে অনুকূল করিয়া তুলিল।

খাঁ সাহেব সেদিন সন্ধ্যায় বলিল, "মানুষের এই ঘৃণ্য মনোভাবের জন্ম একান্ত দুঃখ হয়। জাতির ভয় হিন্দুকে একান্তভাবে দুর্ব্বল করেছে।"

সুরেশ বিরক্ত হইতে পারিল না। বলিল, "তা ঠিক খাঁ সাহেব, আমরা মরে গেছি, তাই স্রোতের শক্তি আমাদের নেই, আমরা বদ্ধজলা, তাই নূতনকে আমরা গ্রহণ করতে পারি না, আমরা দুই কূলকে উর্ব্বর করতে পারি না।"

খাঁ সাহেব বলিল, "এই বিচ্ছেদবোধ শুধু আপনাদের নয়, আমাদের আছে, জোলাও মুসলমান, নিকারিও মুসলমান, জমাদারও মুসলমান, তা হলেও তাদের সঙ্গে আমরা আপনাদের মত জাতির বেড়া বেঁধে রেখেছি—"

সুরেশ কহিল, "ভারতকে বাঁচতে হলে এই বিচ্ছিন্নতাকে দূর করতে হবে, তাকে সামাজিক ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।"

খাঁ সাহেব কহিল, "কিন্তু সে সব ত' পরের কথা ভাই, এখন আপনার উপায় ?"

সুরেশ কহিল, "তাই ত' ভাবছি।"

খাঁ সাহেব বলিল, "আপনাকে বিপদে ফেলেছি, তার জন্ম আমার লজ্জা করছে, থানায় একজন ভদ্রলোক এসেছেন, কলকাতার নারীরক্ষা-সমিতির কর্ম্মী, তাঁকে পাঠিয়ে দিতে পারি।"

"দেবেন, দেখি কি করা যায়।"

"এই সব সমিতির উপর আমার আস্থা নেই, আর তা ছাড়া এই সমস্ত সুন্দরী তরুণী সেখানে নানারকম বিপদে পড়ে, এই আমার বিশ্বাস।"

"তা হলে উপায় ?"

খাঁ সাহেব উঠিতে উঠিতে বলিল, "তবু তার সঙ্গে আলাপ করুন, তাকে আমি পাঠিয়ে দেব।"

পরদিন নবীন ভট্টাচার্য্য আসিল। পরণে সন্ন্যাসীর মত গৈরিক বসন, গলায় নামাবলী, তাহার নীচে বিলম্বিত যজ্ঞসূত্র, নারীরক্ষা-সমিতির উপযুক্ত কর্ম্মী বটে।

সুরেশ বসাইয়া বলিল, "আপনাদের আশ্রমে মেয়েরা কি করেন ?"

"তাদের কাজকর্ম্ম শেখানো হয়, দু'চারজনের আবার বিয়ের ব্যবস্থাও আছে ?"

"কাদের সঙ্গে ?"

"বাঙ্গালীর সঙ্গে কচিৎ কদাচিৎ হয়, পাঞ্জাবী এবং সিন্ধীরা আমাদের আশ্রমের সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করে।"

"স্বেচ্ছায় ?"

"স্বেচ্ছায় বই কি, ভিক্ষান্ন গ্রহণ কিংবা পতিতার জীবনের চেয়ে বিদেশে সম্মানিত গৃহিণীর জীবন তারা পছন্দ করে।"

"তা বটে, কিন্তু শুনেছি এদের কাছে আপনারা কন্যা বিক্রয় করেন।"

"না, না, রামঃ সে কি হয় ?" ভট্টাচার্য্য টিকি দুলাইল।

"তা'হলে এসব মিথ্যা গুজব ?"

"মিথ্যা বই কি, তবে এইসব বিদেশীরা আমাদের আশ্রম-পরিচালনার জন্ম কিছু কিছু দান করেন, সেটা একান্তই দান।"

"বোধ হয় এই দান নিয়েই হিংসুকেরা আপনাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে ?"

ভট্টাচার্য্য প্রসন্ন হইয়া বলিল, "ঠিক ধরেছেন বাবু, আমাদের দেশের মানুষ ভাল জিনিষ ধরতে পারে না।"

সুরেশ বলিল, "আচ্ছা আপনি এখন আসুন, আমি মেয়েটিকে বুঝিয়ে বলি।"

ভট্টাচার্য্য বিদায় লইল।

সুরেশ পুস্তক লইয়া বসিল। কিন্তু এক বর্ণও সে পড়িতে পারিল না। এই অপরিচিত তরুণীকে সে এই কয়দিনেই স্নেহ করিতে শিখিয়াছে। সুন্দরী নিরাপরাধা এই আশ্রয়হীনাকে বিপদের মধ্যে পাঠাইতে তাহার সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। অথচ গৃহে তাহাকে আশ্রয় প্রদানও অসুবিধা-জনক। বীণা তাহাকে যেন আপন বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না।

সুরেশের হাতে ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ। সে পড়িতেছিল—ভাগ্যদেবতার সচল অঙ্গুলি লেখে আর লিখিয়াই দ্রুত চলিয়া যায়, মানুষের কোন বুদ্ধি, কোন সাধনা তার এক বর্ণও ঘুচাইতে পারিবে না, মানুষের অশ্রুজল তাহার একটী অক্ষরও মুছিতে পারিবে না।

সুজাতার ভাগ্যদেবতা তাহার অদৃষ্টে কেন এই সমস্যা জাগাইয়া তুলিল, সুরেশ তাহা ভাবিয়া পায় না। কিন্তু যতই অনিচ্ছায় তাহাকে সে গ্রহণ করিয়াছিল, সে অনিচ্ছা আজ তাহাকে এই দীনাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্বুদ্ধ করিল না।

সুজাতার সুন্দর মুখ, তাহার অকলঙ্ক লাবণ্য, তাহার স্নিগ্ধ সুমধুর আচরণ, তাহার একান্ত নির্ভরতা, তাহার করুণ পরিস্থিতি সমস্ত মিলিয়া তাল-গোল পাকাইয়া তুলিল। সুরেশ ভাবিল, সে অপেক্ষা করিবে, ভাগ্য তাহার রথচক্রে যেদিকে নিবে, সেদিকে নিবেই, ব্যস্ত হইবার কারণ নাই। ভট্টাচার্য্য পুনরায় আসিলে সে তাহাকে না করিয়া দিল।

[আগামীবারে সমাপ্য]

কর্ণ ও বিকর্ণ

ডাঃ শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

কী চিন্তায় ক্লান্ত আজি
রাজ-সখা, মহাবীর, কর্ণ ধনুর্দ্ধর
ধরণীর শ্রেষ্ঠদাতা,
যুধিষ্ঠির-জ্যেষ্ঠ-সহোদর?
নিদাঘের খররবি— অগ্নিস্রাবী
জ্বলে তীব্র মধ্যাহ্ন আকাশে,
পাপাসক্ত তৃষ্ণার্ত্ত ধরায়
পুড়াইয়া দিতে যেন
লেলিহান-অনল-নিশ্বাসে!
দুর্দ্দিন ভারতে এল আজি
অবসর বুঝি
কৌরব পাণ্ডবে ওই লেগে গেছে
দ্যূত মহামার,
দ্যূত-মত্ত হৃষ্ট দুর্য্যোধন
জয়-দম্ভে মুহুর্মুহু ছাড়ে হুহুঙ্কার!
যাহাদের বীর্য্য বিকম্পনে
প্রকম্পিত ফেরুসম
পলায়েছে কত শত বীর,
আজি—
শকুনির মোহ-মন্ত্রে
মাতামহ-অস্থি-যন্ত্রে
মন্ত্রৌষধি সম জিনে—
অজেয় সে পাণ্ডবশূরবীর!

দূরে—গৃহান্তরে বসি কর্ণ
চিন্তা-জীর্ণ বিবর্ণ সে
প্রশান্ত বদন
দ্যূত-মত্ত কৌরবের সাট্টহাস্য জয়ধ্বনি
বার বার করেন শ্রবণ!
একি এ বিষম দ্বন্দ্ব
অবিশ্রান্ত আন্দোলিত
করিতেছে মন!
অন্তরের গূঢ় প্রান্তে—
সূক্ষ্মধার সূচিকা মত
মর্ম্মাহত বিবেক কি করিছে দংশন?
সহসা কাহার চরণ শব্দে
চমকি উঠিল বীর—
হ'ল স্থির সহজ গম্ভীর!
কী জানি আসেন রাজা
বদনের স্বচ্ছন্দ দর্পণে
দুশ্চিন্তার ঘন মসী রেখা
ফুটে পাছে হয় বা বাহির।
"অঙ্গরাজ"—কে ডাকিল
স্নিগ্ধ কণ্ঠে
শুভ্রদন্তে উদ্ভাসিত করি চারিধার,
সমাগত ওঠে রাজা
সম্ভাষণ জানায় তাহারে
কহে সমাদরে—
"স্বাগত হে স্বাগত কুমার!

কহ বীর,
বিজয়-গৌরব-দীপ্ত সভাস্থল ত্যজি
কী মহা সৌভাগ্যে মোর
হেথা আসি দিলে দরশন ?"
"সৌভাগ্য তোমার নহে
সৌভাগ্য আমার রাজা"
কহিল বিকর্ণ কর্ণে
বিস্ফারিত আকর্ণ-নয়ন।
"এস মহামারণ যজ্ঞে
তুমি যে হে শ্রেষ্ঠ হোতা
ঋত্বিক্ মহান্!
পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চয়ের তরে
আইলাম দেখিতে সে
ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান।"
"বৃথা গঞ্জ মোরে বীর
কেনো স্থির মনে
বীরজন-ঘৃণ্য এই পাণ্ডব নিধনে
কোন অংশ নাহিক আমার !"
"কাহারে গঞ্জিব তবে
কহ বীর্য্যবান ?
বীর ভিন্ন কে বুঝিবে
বীরের সম্মান ?
বিশেষতঃ তুমি একি ভাবিছ না ?
আমি কিন্তু করি অনুভব
এ কপট বধ-যজ্ঞে
স্বর্ণ সম দগ্ধ হয়ে
খাঁটী হবে লাঞ্ছিত পাণ্ডব !
অদূর-দর্শন ফলে
এ অন্ধেরা বুঝিছে না
করিছে যে ভুল
সে মহাপাপের ফলে
সমূলে এ কুরুকুল হবে যে নির্ম্মূল !"
স্তম্ভিত হইল কর্ণ।
বিস্ময়ের না রহিল সীমা !
দুর্য্যোধন-ভ্রাতৃগণে দূরদর্শী হেন যুবা
সাধুশীল, হেন উচ্চমনা ?
সে ভাব চাপিয়া বুকে
হাসি মুখে কহে অঙ্গরাজ,
"ভীষ্মাদি থাকিতে বংশে
ধ্বংস হবে কুরু-মহাকুল
ভাবিতে কি নাহি হয় লাজ ?"
"না না রাজা নাহি নাহি
মোর লাজ
ওই দিক্‌চক্রবালে দৃষ্টি তব
কর প্রসারিত
দূরে—আরো দূরে ভবিষ্যের
কৃষ্ণ যবনিকা পা'র
দেখ চেয়ে কী দৃশ্য ভীষণ ?
ওই নীতি ওই ধর্ম্ম
ছলনায় লাঞ্ছনায়
মর্ম্মাহত অগ্নিশর্ম্মা ওই নীতি ধর্ম্ম,
মূর্ত্তিমান্ কৃতান্ত-সমান
ধেয়ে আসে কৃষ্ণার্জ্জুন রূপে,
কোন্ ভীষ্ম, কোন্ দ্রোণ কর্ণ
বল নিবারিবে তারে ?
সত্যের সে চিরজয়ী
অজেয় শক্তিরে
কেবা কবে পেরেছে বরিতে ?
কহ সত্য তবে
সত্য এ নিধন যজ্ঞ
কৌরব-মারণ যজ্ঞ কিনা ?"
"যদি তাই হয়
আমি কেন শ্রেষ্ঠ হোতা তার ?"
"তোমা সম বিজ্ঞজনে
একথা কি বুঝাইতে হবে গুণাধার ?
শক্তি সত্বে, বাধা নাহি দিয়ে
পাপকার্য্য স্থির চিত্তে দেখে যেই জন
সে নহে কি পাপী হ'তে
সমধিক পাপের ভাজন ?"
"শক্তি সত্বে"
'হাঁ হাঁ বীর শক্তিসত্বে ?
নাহি কি শকতি তব ?"
"কী শক্তি আমার ?
ছিনু নামহীন গোত্রহীন
গৃহছাড়া অন্নহারা যাযাবর বিপন্ন যুবক
যেই জন দিল নাম, দিল গোত্র,
ঐশ্বর্য্য সম্পদ, ধন মান.
হীন সূতপুত্রে অঙ্গরাজ খ্যাতি দিল,
সখা বলি করিল সম্মান।
কহ মতিমান্—
বাধা দিতে তাঁর কাজে
কী শক্তি আমার ?"

তাঁহার নিকটে—
বজ্রসার এ হস্ত আমার
শুষ্ক হ'য়ে আসে!
কণ্ঠ মোর রুদ্ধ হয়ে যায়!"
"কিন্তু বিচক্ষণ ভাব দেখি মনে—
যে দিয়াছে রাজ্য মান,
আভিজাত্য, পরিচয়
কৌলিন্য সম্মান
তারে মতিমান—এইভাবে
পরাজিত হৃতরাজ্য হৃতৈশ্বর্য্য ক'রে,
ক'রে তারে হৃত-মান,
গত অভিমান
শেষে পিঞ্জর আবদ্ধ
দীন শার্দ্দূল সমান—
প্রাণদান দিয়ে শত্রুকরে
দিবে কি হে সে দানের
যোগ্য প্রতিদান?
প্রাণ তব স্বস্তি তাহে পাবে?"
"আমি কী করিব?
কী করিতে পারি?
দীন আমি, হীন আমি
তাঁহার নিকটে নিতান্তই
অশরণ অক্ষম যে আমি!"
"নানা রাজ্য, রাজা,
বীর তুমি, ধীর তুমি, শক্তিমান তুমি
অক্ষম অশক্ত দীনহীন তুমি নও—
বীর্য্য-বহ্নি তব সম্মুখে তাহার
শুধু চিরাভ্যস্ত দাস-ভাব—
ভস্মস্তূপে হয় আচ্ছাদিত,
ঝেড়ে ফেল, মুছে ফেল তারে,
স্নান করি সুনীতির-মন্দাকিনী-নীরে
হও শুদ্ধ, হও মুক্ত,
মুক্তি দাও বন্ধুরে তোমার,
এ জঘন্য মনোবৃত্তি হ'তে,
রক্ষা হোক রাজা ধন মান,
যথার্থ বন্ধুত্ব দানে
কর ত্রাণ বন্ধুত্বের
চিরঋণ হতে।"
"একান্তই যদি হয় বাম
কহে মোরে অকৃতজ্ঞ
কৃতঘ্ন পামর!"

"তুচ্ছ ধূলিমুষ্টিসম
তার দেয়া রাজ-পদ
দূরে নিক্ষেপিবে,
ফিরে লবে—
দেহমনে অন্তরের পূর্ণ স্বাধীনতা,
দিয়ে নীতিধর্ম্ম মনুষ্যত্ব।
বিবেক আগুন,
মানুষ কি লয় বিনিময়ে
হেয় ঘৃণ্য রজত কাঞ্চন?
হেন আকিঞ্চন যদি ছিল
জীবনের আকাঙ্ক্ষা তোমার—
রামের চরণে পড়ি
কেন তবে শিখেছিলে মহাস্ত্র সম্ভার?
চাটুকার কতশত ভুঞ্জে রাজ্য
তোমারি মতন?"
গম্ভীর হইল কর্ণ
মুখবর্ণে দেখা দিল
উৎসাহের উজ্জ্বল-লালিমা—
মুষ্টিবদ্ধ হ'ল কর
ওষ্ঠাধর দৃঢ়বদ্ধ হ'ল,
মনে হ'ল
গরল অমৃতে ভরা
ভারতের কথা
হয় বুঝি সত্য সত্য অমৃত সমান।
হেনকালে
দেখা দিল ক্রুর গ্রহ সম সেথা
মূঢ় দুর্য্যোধন
জিঘাংসা সজাগ দৃষ্টি পাপমূর্ত্তিমান!
"সখা, সখা, শীঘ্র চল
কী কর হেথায়?
আরে কেও?
বিদুরের পার্শ্বচর,
মহাবিজ্ঞ বিকর্ণ পণ্ডিত!
কী কহে উন্মাদ? ধর্ম্মকথা বুঝি?
ওরে আয় আয়—আয়—
দেখে যা হেথায়
কী ভাবে আজিকে
ধর্ম্ম তোর কৌরবের চরণে লুটায়"
এই কথা হয়ে করে কর দিয়ে
দুইবন্ধু চলে দ্রুত পদে!
বিবেক, বিকর্ণ সনে—
দীন নেত্রে, ভগ্নমনে—
মৃতপ্রায় রহিল পশ্চাতে !!

ঠাকুর হরিদাসের পুণ্যকাহিনী

শ্রীবিপিনবিহারী দাশগুপ্ত

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ফুলিয়ায়—প্রেমোন্মাদ

হরিদাস শান্তিপুর পরিত্যাগের পর ফুলিয়ায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। শান্তিপুরের অদূরে গঙ্গার তটে এখনও ফুলিয়া নামে একটি গ্রাম আছে। বঙ্গের অমর কবি কৃত্তিবাস এই ফুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হরিদাসের সময় ফুলিয়া ও শান্তিপুর একজন কাজীর অধীনে ছিল। তাঁহার নাম ছিল গোড়াই কাজী। আর নবদ্বীপ ছিল দ্বিতীয় একজন কাজীর অধীনে। তাঁহার নাম ছিল চাঁদ কাজী। ফুলিয়ায় বহুসংখ্যক সরলপ্রাণ ব্রাহ্মণের বসতি ছিল। তাঁহারা সকলেই হরিদাসের অপূর্ব প্রেমভক্তি দর্শনে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন।

"সবেই তাহানে দেখি হইল বিহ্বল;
সবায় তাহানে বড় জন্মিল বিশ্বাস।"

প্রাণের সুহৃদ্ অদ্বৈতাচার্যের সঙ্গেও এখানে তাঁহার প্রত্যেক দিন মিলন হইত।

'পাইয়া তাহার সঙ্গ আচার্য গোসাঞি।
হুঙ্কার করেন আনন্দের অন্ত নাঞি।
হরিদাস ঠাকুরো অদ্বৈতদেব সঙ্গে।
ভাসেন গোবিন্দ-রস-সমুদ্র তরঙ্গে॥"

এখন হরিদাসের ভক্তিলতা ফলফুলে সুশোভিত দিব্য বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। এখন তার প্রেমফল সুপক্ব হইয়াছে। তিনি এখন অমৃত ফল ভক্ষণ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভাগ্যবান্ হরিদাস যে পরমফল ভোগ করিবেন তাহার নিকট চারি পুরুষার্থ কি ছার।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা জীব॥
মালী হঞা করে লতা বীজ আরোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেবন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদী যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদী পরব্যোম পায়॥
তাহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল:
ইহা মালী সেচে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি জল॥
প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়ে।
লতা অবলম্বী মালী কল্পবৃক্ষ পায়ে॥
তাহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফল রস করে আস্বাদন॥
এই মত পরম ফল পরম পদার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥"

হরিদাসের এখন চৈতন্যদেবের ন্যায় দিব্য প্রেমোন্মাদ উপস্থিত। তিনি আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে কখন মত্ত সিংহ প্রায় গর্জ্জন করেন, কখন উচ্চৈঃস্বরে রোদন করেন, কখন অট্ট অট্ট মহাহাস্য হাসেন, কখন হুঙ্কার ছাড়েন, কখনও অলৌকিক শব্দ করেন। পুলক, অশ্রু, রোমহর্ষ, হাস্য, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম প্রভৃতি কৃষ্ণভক্তির লক্ষণ সকল তাঁহার শ্রীবিগ্রহে উপস্থিত। বৃন্দাবন দাস তাঁহার দিব্যোন্মাদ এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

"নিরবধি হরিদাস গঙ্গা তীরে তীরে,
ভ্রমেন কৌতুকে কৃষ্ণ বলি উচ্চৈঃস্বরে।
বিষয় সুখেতে বিরক্তের অগ্রগণ্য,
শ্রী নামে পরিপূর্ণ শ্রীবদন ধন্য।
ক্ষণেক গোবিন্দ নামে নাহিক বিরক্তি,
ভক্তিরসে অনুক্ষণ হয় নানা মূর্ত্তি,
কখনো করেন নৃত্য আপনা আপনি,
কখনো করেন মত্ত-সিংহ প্রায় ধ্বনি।
কখনো বা উচ্চৈঃস্বরে করেন রোদন,
অট্ট অট্ট মহাহাস্যে হাসেন কখন।
কখন গর্জ্জেন অতি হুঙ্কার করিয়া,
কখন মূর্চ্ছিত হই থাকেন পড়িয়া।
ক্ষণে অলৌকিক শব্দ বলেন ডাকিয়া,
ক্ষণে তাই বাখানেন উত্তম করিয়া।
অশ্রুপাত রোমহর্ষ হাস্য মূর্চ্ছা ঘর্ম্ম;
কৃষ্ণভক্তি-বিকারের যত আছে মর্ম্ম।
প্রভু হরিদাস মাত্র নৃত্যে প্রবেশিলে,
সকল আসিয়া তার শ্রী বিগ্রহে মিলে।

হেন যে আনন্দধারা তিতে সর্ব্ব অঙ্গ,
অতি পাষণ্ডী দেখি পায় মহারঙ্গ।
কিবা সে অদ্ভুত অঙ্গে শ্রীপুলকাবলী,
ব্রহ্মা শিবে দেখিয়া হয়েন কুতূহলী।"

চৈতন্যদেব কৃষ্ণভক্তিরসের পঞ্চপ্রকার ভেদ বর্ণনা করিয়াছেন। হরিদাস ইহার মধ্যে কোন্ রসের সাধক ছিলেন তাহা বাহিরের লোকের পক্ষে অনুমান করা ভার। কারণ হরিদাস স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন ভাব অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যতীত অন্যের নিকট প্রকাশ করেন নাই। পুরী অবস্থান কালে চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁহার প্রায় রহস্য আলাপ হইত। রূপসনাতন ও স্বরূপ গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তির আচার্য্যগণ সতত তাঁহার সহবাস সুখ লাভ করিতেন। কিন্তু হরিদাসের সহিত তাঁহাদের কথোপকথনের বিবরণ বাহিরে প্রকাশিত হয় নাই। বোধ হয় হরিদাস হৃদয়ের গভীরতম ভাব গুহ্যাতি-গুহ্যরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং বন্ধুবর্গেরাও তাঁহার মত জানিয়া সে সম্বন্ধে নির্ব্বাক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার যে সকল ভাব ও উক্তি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে তিনি দাস্যরসের আশ্চর্য্য সাধক ছিলেন তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। প্রধান পঞ্চবিধ ভক্তিরস ব্যতীত ভক্তের মধ্যে আবার সাতটী রস গৌণভাবে বিদ্যমান আছে। বাহিরের লোক কেবল সেই রসেরই পরিচয় পায়। অন্তরের খবর তাঁহারা জানিতে পারে না।

"সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম কয়॥
প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে নাম মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড়খণ্ড সার।
শর্করাসিক্ত মিছরী উত্তম মিছরী সার॥
এই সব কৃষ্ণভক্তিরস স্থায়ীভাব।
স্থায়ীভাবে মিলে যদি বিভাব অনুভাব॥
সাত্ত্বিক ব্যভিচারী ভাবের মিলনে।
কৃষ্ণভক্তিরস হয় অমৃত আস্বাদনে॥
যৈছে দধি সিক্ত ঘৃত মরীচ কর্পূর।
মিলনে রসাল হয় অমৃত মধুর॥
ভক্তভেদে রতিভেদ পঞ্চ বিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তিরস পঞ্চ ভেদ॥
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম।
কৃষ্ণভক্তি রস মধ্যে পঞ্চ প্রধান॥—চরিতামৃত।

তথাপি ভক্তি রসামৃতসিন্ধৌ—

হাস্যোদ্ভুতস্তথা বীর করুণো রৌদ্র ইত্যপি।
ভয়ানকঃ বীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা॥
হাস্যোদ্ভুত করুণ রৌদ্র বীভৎস ভয়।
পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণে সপ্ত রস হয়॥
পঞ্চ রস স্থায়ী ব্যাপী রহে ভক্তগণে।
সপ্ত গৌণ আগন্তুক পাইবে কারণে॥

উপরে আমরা হরিদাসের দিব্যোন্মাদের মধ্যে কেবল গৌণ সপ্তরসের খেলা দেখিলাম। ভিতরে তিনি কোন রসে উন্মত্ত হইয়াছিলেন আপাততঃ বুঝা দুষ্কর। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চরসের লক্ষণ এই :—

কৃষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণাত্যাগ শান্তের দুই গুণে।
এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্তজনে॥
আকাশের শব্দগুণ যেন ভূতগণে।
শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতা গন্ধহীনে॥
কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয় শান্ত রসে।
পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভুজ্ঞান অধিক হয় দাস্যে॥
ঈশ্বর-জ্ঞান, সম্ভ্রম, গৌরব প্রচুর।
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে অধিক সেবন।
অতএব দাস্যরসে এই দুই গুণ॥
শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন, সখ্যে দুই হয়।
দাস্যে সম্ভ্রম গৌরব সেবা, সখ্যে বিশ্বাসময়॥
কাঁধে চড়ে কাঁধে চড়ায়, করে ক্রীড়ারণ।
কৃষ্ণ সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥
বিশ্রম্ভ প্রধান সখ্য, গৌরব সম্ভ্রম হীন।
অতএব সখ্যরসের তিনগুণ চিন্॥
মমতা অধিক কৃষ্ণে, আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্যরূপে বশ ভগবান॥
বাৎসল্য শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইহা নাম পালন॥
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ, অগৌরব সার।
মমতাধিক্যে তাড়ন ভৎ'সন ব্যবহার॥
আপনাকে পালন জ্ঞান, কৃষ্ণে পাল্য জ্ঞান।
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান॥
যে অমৃতানন্দে ভক্ত ডুবেন আপনে।
কৃষ্ণভক্ত রসগুণ কহে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানীগণে॥
মধুর রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসঙ্কোচ লালন-মমতাধিক্য হয়॥

কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর রসের হয় পঞ্চ গুণ॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
এই মত মধুরে সব ভাব সমাহার।
অতএব আস্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥—চৈতন্যচরিতামৃত

শান্ত রসে ভক্তির পত্তন হয়। শান্ত রসের দুইটী গুণ, ঈশ্বরনিষ্ঠা ও সংসারবাসনা ত্যাগ। শান্ত রসে ঈশ্বরের মর্ম হয় না। কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয়। শান্তভক্ত নবযোগেন্দ্র আর সনকাদি। দাস্যের প্রধান গুণ সেবা। দাস্যরতিতে ভগবানের পূর্ণৈশ্বর্য্য জ্ঞান হয় এবং ভক্ত ভগবানকে প্রচুর সম্ভ্রম ও গৌরব দেখান। ইহা ছাড়া শান্তের গুণ দাস্যে আছে। দাস্যভক্ত হনুমান, প্রহ্লাদ, হরিদাস, মুরারি গুপ্ত।

সখ্য রসে গৌরব সম্ভ্রমের অভাব, ভগবানে বিশ্বাসময়, মমতাধিকা ও আত্মসমজ্ঞান ভগবানের সহিত কোলাকুলি গলাগলি ভাব। ইহাছাড়া শান্তি ও দাস্যের গুণ সখ্যে আছে। সখ্যভক্ত—শ্রীদামাদি, ভীমার্জ্জুন, গুহরাজ, বিল্বমঙ্গল।

বাৎসল্যরসে নিজকে পালক জ্ঞান ভগবানকে পাল্য জ্ঞান। মমতাধিক্যে তাড়ন ভর্ৎসনা প্রভৃতি জনকজননীর ব্যবহার। ইহাছাড়া পূর্ব্ববর্ত্তী তিন রসের গুণ বাৎসল্যে আছে। সুতরাং চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান। বাৎসল্যভক্ত—যশোদা, নন্দ, দৈবকী, বসুদেব ও শচীমাতা।

আকাশাদি গুণ যেমন পর পর ভূতে বিদ্যমান, অতএব শেষভূত পৃথিবীতে যেমন রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ পাঁচটী গুণই বিদ্যমান, সেইরূপ মধুর রসে পাঁচটী রসের সমাহার হইয়াছে। উহা অপেক্ষা আর প্রেমের উচ্চতর আদর্শ নাই। এ রসের ভক্ত কান্তভাবে ভগবানকে নিজাঙ্গ দিয়া সেবা করেন। এ অবস্থায় ভক্ত ও ভগবান যেন সতী ও পতি—গৌরী ও শঙ্কর,—রাধা ও কৃষ্ণ। তখন ভক্ত ভগবানে মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া বলেন—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥

এই রসের পরম আদর্শ—শ্রীগৌরাঙ্গ, গোপীগণ, রাধা, রুক্মিণী ও সত্যভামা।

প্রেমিক সাধক যতই সাধনায় অগ্রসর হন ততই নূতন নূতন রস আস্বাদন করিতে থাকেন। এক সাধকই ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাধন করিয়া থাকেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস মাতৃভাবের সাধক ছিলেন। এই সাধনায় তিনি সিদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কখনো বৈষ্ণবের ন্যায় রাধা ভাবে, কখনো শিশুর ন্যায় পিতৃভাবে, কখনো অর্জ্জুন ও মহম্মদের ন্যায় সখ্যভাবে ভগবানের সাধনা করিয়াছিলেন; ভগবান একাধারে সখা-গুরু, পিতা-মাতা, প্রভু ও স্বামী। বিশিষ্ট ভক্ত তাঁহাকে নানাভাবে সেবা করিয়া নানারস আস্বাদন করেন। কিন্তু যখন ভক্তের প্রাণে মধুর রসের সঞ্চার হয় তখন তিনি আর অন্য কোন রস আস্বাদন করিতে চান না। মধুর রসই ভক্তের পুরুষার্থ। হরিদাস সাধনার পথে অগ্রসর হইয়া মধুর রসে সাঁতার দিতে দিতে উন্মত্ত হইয়াছিলেন কিনা জানি না। তাঁহার দিব্যোন্মাদের পূর্ণ লক্ষণ বৃন্দাবন দাস বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সেই দিব্যোন্মাদের অবস্থায় তাঁহার কোন মনের ভাব বা উক্তি তিনি লিপিবদ্ধ করেন নাই। সুতরাং এ বিষয় দৃঢ়নিশ্চয় হইবার সম্ভাবনা নাই। হরিদাস পূর্ব্বে আশ্রমে বসিয়া নাম জপ করিতেন। এখন উন্মত্তপ্রায় গঙ্গাতীরে কীর্ত্তন করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভক্তিশাস্ত্রে যেমন নামজপ যজ্ঞ নামে অভিহিত হইয়াছে, নামকীর্ত্তনও সেইরূপ যজ্ঞ নামে অভিহিত হইয়াছে।

"কলৌ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈ-
র্যজন্তি হি সুমেধসঃ।—শ্রীমদ্ভাগবত।

হরিদাস নামযজ্ঞ সমাপন করিয়া কীর্ত্তনযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। নিজে উন্মত্ত হইয়া শত শত লোককে উন্মত্ত করিতে লাগিলেন। ফুলিয়ায় আনন্দের ঢেউ খেলিতে লাগিল। কিন্তু এ জগতে যেখানেই স্বর্গ সেখানে অসুরের অত্যাচার, যেখানে তপোবন সেখানে রাক্ষসের উপদ্রব। যেখানে যজ্ঞ সেখানেই ভূত-পিশাচের বিভীষিকা ও বীভৎস ব্যবহার। হরিদাসের প্রেমের ভীষণ অগ্নিপরীক্ষা অচিরাৎ উপস্থিত হইল। সে পরীক্ষার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এসিয়ার পশ্চিম-প্রান্তে ঊনবিংশ শতাব্দী পূর্ব্বে মহামতি ক্রুশবদ্ধ ঈশার প্রেম যেমন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে হরিদাস ঠাকুরের

অচল বিশ্বাস ও গভীর প্রেমভক্তি তেমনি কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মৃত্যুঞ্জয় উপাধি লাভ করিয়াছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রেমের অগ্নিপরীক্ষা—গ্রেপ্তার ও কারাবাস

হরিদাসের প্রতিপত্তির সংবাদ গোড়াই কাজীর কর্ণগোচর হইল। গোড়াই যখন দেখিলেন যে, হরিদাস তাঁহার অধিকারের মধ্যে তাঁহার প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছেন তখন গোড়াই একেবারে ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। গোড়াই ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে স্বয়ং কতকটা শাসন করিতে পারিতেন কিন্তু তিনি হরিদাসের প্রতিপত্তি ও প্রভুত্বের ভয়ে নিজে তাঁহার আচরণের কোন প্রতিবাদ না করিয়া গৌড়েশ্বর হুসেন শাহার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাহাদের স্বধর্মত্যাগী, মুসলমানদ্রোহী বলিয়া তাঁহার নামে রীতিমত অভিযোগ উপস্থিত করিলেন।

"কাজী গিয়া মুলুকের অধিপতি স্থানে,
কহিলেন তাহার সকল বিবরণে।
যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার,
ভালমতে তারে আনি করহ বিচার।"

গোড়াই সম্ভবতঃ নৃপতি হুসেন শাহের একজন প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি গোড়াইর সমস্ত অভিযোগ মনোযোগের সহিত শুনিতেছিলেন এবং তাহার পরামর্শানুসারে হরিদাসকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পাইক পাঠাইলেন। হরিদাস যদি ধরা দিতে ইচ্ছুক না হইতেন তবে তাঁহাকে ধরিয়া নেওয়া এমন সহজ ব্যাপার ছিল না। সমস্ত হিন্দু-সমাজ তখন তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান। কিন্তু হরিদাস যেমন একদিকে নিষ্কাম ও নির্ব্বিকার অন্যদিকে তেমনই নিশ্চিন্ত ও নির্ভয়। তিনি গৌড়ের সংবাদ শুনিয়াই ধরা দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং বন্ধুজনের আর্ত্তনাদের মধ্যেও প্রাণের আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া রহিলেন। বরাভয়প্রদ ভগবানের চরণে যাঁহার চিত্ত নিযুক্ত তাঁহার প্রাণ একদিকে কুসুম হইতে মৃদু হইলেও অন্যদিকে বজ্র হইতেও কঠিন। তাঁহার প্রশান্ত চিত্তে সংসারের অত্যাচার, অবিচার, শাসন বা শাস্তি কিছুতেই ভয় বা বিভীষিকা উৎপাদন করিতে পারিত না। হরিদাসের নিকট পাইক আসিল। হরিদাস অচল অটল। তিনি পাইকদের কোন কথার প্রতিবাদ না করিয়া তাহাদেরই সঙ্গে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া যাত্রা করিলেন এবং যেখানে নৃপতি হুসেন শাহ দরবার করিয়া বসিয়া আছেন সেখানে যাইয়া নির্ভীক চিত্তে উপস্থিত হইলেন।

"কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাস মহাশয়,
যবনের কি দায় কালের নাহি ভয়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া চলিলা সেইক্ষণ,
মুলুকপতির আগে দিলা দরশন।"

সে-দিন গৌড়েশ্বরের সহিত হরিদাসের সাক্ষাৎ হইল না। এখন যেমন বিচারের পূর্ব্বে কারাগারে হাজত রাখার ব্যবস্থা আছে, তখনও ঐ প্রকার ব্যবস্থা ছিল। হরিদাস গৌড়েশ্বরের নিকট উপস্থিত হইবামাত্রই কারাগারে বন্দী হইলেন। রক্ষকেরা তাঁহাকে কারাগারে লইয়া গেল।

কারাগারে তখন বহুসংখ্যক হিন্দু বন্দী ছিলেন। বড় জমিদারেরাও তখন উপযুক্ত সময় খাজনা দিতে না পারিয়া বন্দী হইতেন। হরিদাস কারাগারে আসিতেছেন শুনিয়া বন্দীদিগের মধ্যে এক কোলাহল উঠিল। একদিকে যেমন তাঁহারা পরম বৈষ্ণব হরিদাসকে দেখিবার জন্য তৃষিত চাতকের ন্যায় উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন অন্যদিকে তেমনই ভক্তবীরের কারাবাসের সংবাদ শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁহার দর্শনাভিলাষী বন্দীগণ ব্যগ্রচিত্তে যথাসাধ্য উপযুক্ত স্থান অধিকার করিল। কেহ কেহ রক্ষকদিগকে অনুনয় বিনয় করিয়া বিশিষ্ট স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। যখন দেবতুল্য মনোহরজ্যোতিঃ প্রেমিক ভক্ত কারাগারের মধ্য দিয়া চলিলেন তখন তাঁহার পথের দুই পার্শ্বস্থ বন্দীগণ তাঁহাকে ভক্তিগদ্‌গদ্‌চিত্তে প্রণাম করিলেন। হরিদাস সকলের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন। তাহাদের প্রাণে তৎক্ষণাৎ কৃপাদৃষ্টির সঞ্চার হইল।

"হরিদাস ঠাকুরের শুনি আগমন,
হরিষে বিষাদ হৈল যত সুসজ্জন।
বড় বড় লোক যত আছে বন্দিঘরে,
তারা সব হৃষ্ট হৈলা শুনিয়া অন্তরে।
পরম বৈষ্ণব হরিদাস মহাশয়,
তানে দেখি বন্দি-দুঃখ পাইবেক ক্ষয়।
রক্ষক লোকেরে সবে সাধন করিয়া,
রহিলেন বন্দিগণ একদৃষ্টী হইয়া।
হরিদাস ঠাকুর আইলা সেই স্থানে,
বন্দি সব দেখি কৃপাদৃষ্টি হইল মনে।

হরিদাস ঠাকুরের চরণ দেখিয়া,
রহিলেন বন্দিগণ প্রণতি করিয়া।
আজানুলম্বিত ভুজ, কমল নয়ন,
সর্ব্ব-মনোহর মুখ-চন্দ্র অনুপম।
ভক্তি করি সবে করিলেন নমস্কার,
সবার হইল কৃষ্ণভক্তির বিকার।

কারাগার আজ তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইল। যাহারা আজীবন বিষয়-কূপে ডুবিয়া থাকিত তাহাদের প্রাণে ভক্তকৃপায় অভূত-পূর্ব্ব ভাবের উদ্রেক হইল। বন্দীদের ভক্তি দেখিয়া হরিদাস তাহাদিগকে সহাস্যবদনে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তোমরা এখন এখানে যেরূপ ভাবে আছ, চিরকাল এই ভাবে থাকিও।"

তা'সবার ভক্তি দেখি হরিদাস,
বন্দিসব প্রতি করিলেন আশীর্ব্বাদ।
"থাক থাক এখন আছহ যেন রূপে,
গুপ্ত আশীর্বাদ করি হাসেন কৌতুকে

হরিদাস তখন তাহাদের মনোগত ভাব বুঝিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

"আমি তোমা সভারে যে কৈনু আশীর্ব্বাদ,
তার অর্থ না বুঝিয়া ভাবহ বিষাদ।
মন্দ আশীর্ব্বাদ আমি কখনো না করি,
মন দিয়া সভে ইহা বুঝহ বিচারি।
এবে কৃষ্ণ প্রতি তোমার সভাকার মন,
যেন আছে এই মত রহু সর্বক্ষণ।
এবে হিংসা নাহি, নাহি প্রজার পীড়ন,
কৃষ্ণ' বলি কাকুর্ব্বাদে করহ চিন্তন।
আরবার গিয়া বিষয়েতে প্রবর্ত্তিলে,
সবে ইহা পাসরিবে গেলে দুষ্ট মেলে।
'বন্দী থাক' হেন আশীর্ব্বাদ নাহি করি,
বিষয় পাসরি অহর্নিশ বোল 'হরি'।
ছলে করিলাম আমি এই আশীর্বাদ,
তিলার্দ্ধ না ভাবিহ তোমরা বিষাদ।
সর্ব্ব জীব প্রতি দয়া দর্শন আমার,
কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি হউক তোমার সভার।
বন্ধন ঘুচিবে এই কহিনু তোমারে,
চিন্তা নাহি দিন দুই তিনের ভিতরে।
বিষয়েতে থাক কিম্বা থাক যথা তথা,
এই বুদ্ধি কভু না পাসরিহ সর্ব্বথা।"

হরিদাসের উপদেশ ও আশীর্ব্বাদপূর্ণ বাক্য শুনিয়া বন্দীগণ পুনরায় আশ্বস্ত ও আনন্দিত হইল এবং হরিদাসকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল। দেবদূতগণ যাহাকে ঘেরিয়া নৃত্য করিতে বাঞ্ছা করেন, তিনি আজ সামান্য প্রহরী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া দিনরাত্রি কারাগারে যাপন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিচারালয়ে

পরদিন হরিদাস ঠাকুর হুসেনশাহের দরবারে বিচারার্থ নীত হইলেন। আজ দরবার—লোকে লোকারণ্য। নৃপতি হুসেনশাহ পাত্র মিত্র নাজীর উজীরে পরিবেষ্টিত হইয়া দরবারে বসিয়া আছেন। ফুলিয়ার গোড়াই কাজীও অভি-যোক্তারূপে সেখানে উপস্থিত। এমন সময় প্রহরীগণ হরিদাস ঠাকুরকে নিয়া দরবারে উপস্থিত হইল। হুসেনশাহ দেখেন যে তাঁহার সম্মুখে এক দিব্যজ্যোতিঃ মহাপুরুষ উপস্থিত। তাঁহার দিব্যকান্তি ও অসামান্য তেজঃপুঞ্জ দেখিয়া তিনি অতিশয় মুগ্ধ হইলেন এবং যদিও তিনি তাঁহার সমক্ষে অপরাধীরূপে দণ্ডায়মান তথাপি তাঁহাকে বহুসম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক বসিবার আসন প্রদান করিলেন।

"অতি মনোহর রূপ দেখিয়া তাহান,
পরম গৌরবে বসিবারে দিল স্থান।"

হুসেনশাহ হরিদাসকে যথাযোগ্য সম্মান করিয়া তাঁহাকে মৃদুস্বরে সাদর সম্ভাষণে বলিতে লাগিলেন—

আপনে জিজ্ঞাসে তানে মুলুকের পতি,
"কেনে ভাই! তোমার কিরূপ দেখি মতি।
কত ভাগ্যে দেখ তুমি হৈয়াছ যবন,
তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন।
আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত,
অহা তুমি ছোড় হই মহাকুলজাত।
জাতি ধর্ম্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার,
পরলোকে কেমনে বা পাইবা নিস্তার।
না জানিয়া যে কিছু করিলা অনাচার,
সে পাপ ঘুচাহ করি কলিমা উচ্চার॥"

হরিদাস যেমন দুর্ভেদ্য বর্ম্মে বর্ম্মিত হইয়া আছেন তাহাতে কোন বাক্যবাণ তাঁহার হৃদয় ভেদ করিতে পারে না। কলমা

পড়িয়া তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে এরূপ কুৎসিত প্রস্তাব শুনিয়াও হরিদাস কোন বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিলেন না। পরন্তু "অহো বিষ্ণুমায়া" বলিয়া একবার উচ্চৈঃস্বরে হাসিলেন।

"শুনি মায়ামোহিতের বাক্য হরিদাস,
অহো বিষ্ণুমায়া বলি হৈল মহাহাস।"

কিছুক্ষণ পরে হরিদাস গৌড়েশ্বরকে মধুর কণ্ঠে প্রিয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাঁহার উদার হৃদয়ের উদারধর্ম্ম সর্ব্ব সমক্ষে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন—তিনি বলিলেন হে রাজন্! একশুদ্ধ শাশ্বত অখণ্ড অব্যয় ব্রহ্ম সকলের হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। যিনি হিন্দুর হরি, কৃষ্ণ, নারায়ণ, যিনি জ্ঞানীর ব্রহ্ম, ভক্তের ভগবান, যোগীর অন্তরাত্মা, তিনিই মুসলমানের আল্লা। একই অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে হিন্দু ও মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকেন। হিন্দুর বেদ ও পুরাণে যে তত্ত্বকথা, মুসলমানের কোরাণেও সেই তত্ত্বকথা। একই প্রভুর গুণাবলী রুচিভেদে নানাদেশের নানাশাস্ত্র নানাভাবে প্রচার করিতেছে। আমি হরিনাম লইতে ভালবাসি, আর একজন আল্লা নাম লইতে ভালবাসে। রুচিভেদ হইলেও বস্তুতঃ প্রভু তো এক। তিনি আমাকে যে নাম লইতে অনুমতি করিতেছেন আমি সেই নাম লইতেছি। ইহাতে আমার কি অপরাধ? আমি যেমন মুসলমান হইয়া হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি সেরূপ তো কত ব্রাহ্মণ স্বেচ্ছায় মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। হিন্দুরাই বা তাহাদের প্রতি কি বিধান করিতেছেন? রাজন্, তুমি বিচার করিয়া দেখ, যদি আমি দোষী হই তবে আমার প্রতি শাস্তির বিধান কর।

"শুন বাপ! সভারই একই ঈশ্বর।
নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দু ও যবনে,
পরমার্থে এক কহে কোরাণ পুরাণে।
এক শুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়,
পরিপূর্ণ হই বৈসে সভার হৃদয়।
সেই প্রভু যারে যেমন লওয়ায়েন মন,
সেই মত কর্ম্ম করে সকল ভুবন।
সে প্রভুর নাম গুণ সকল জগতে,
বোলেন সকল মাত্র নিজ শাস্ত্র মতে।
যে ঈশ্বর সে পুণি সভার ভাব লয়,
হিংসা করিলেও সে তাহান হিংসা হয়।
এতেক আমারে সে ঈশ্বর যে হেন,
লওয়াইছেন চিত্তে করি আমি যেন।
হিন্দুকুলে কেহো যেন হইয়া ব্রাহ্মণ,
আপনেই গিয়া হয় ইচ্ছায় যবন।
হিন্দু বা কি করে তারে যার যেই কর্ম্ম,
আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম্ম।
মহাশয়! তুমি এবে করহ বিচার,
যদি দোষ থাকে, শাস্তি করহ আমার।"

হরিদাস এইরূপ সর্ব্বধর্ম্মের মিলনক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের মহামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। তাঁহার উদার অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত সকল সম্প্রদায়ের শিক্ষণীয় বস্তু। হরিদাস যে স্থলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন সকল ধর্ম্মের প্রচারকেরা সেই স্থলে দণ্ডায়মান হইলে ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মারামারি কাটাকাটি পৃথিবী হইতে চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিতে পারে। যাঁহাকে নিয়া বিবাদ তাঁহার অভেদত্ব সম্বন্ধে হরিদাস হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে যে মহাসত্য সভাস্থলে বিবৃত করিলেন তাহা শুনিয়া সমবেত মুসলমান-মণ্ডলী মূক ও স্তম্ভিত হইল। নৃপতি হুসেনশাহের হৃদয়ও দ্রবীভূত হইল। কিন্তু গোড়াই কাজীর পাষাণ হৃদয় টলিল না। সে দেখিল যে তাহার শিকার ফাঁসাইয়া যাইতেছে। অমনি ব্যস্তচিত্তে দণ্ডায়মান হইয়া করজোড়ে মুলুকের পতির নিকট সবিনয়ে বলিতে লাগিল—প্রভু বিচারপতি! এই ব্যক্তির প্রতি আপনি সমুচিত শাস্তিবিধান করুন। ইহার কুদৃষ্টান্তে আরও মুসলমান-সন্তান হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, নচেৎ ইহার প্রতি গুরুতর শাস্তিবিধান করুন। যদি আপনি এ বিষয়ে উদাসীনতা প্রকাশ করেন তবে বঙ্গদেশে মুসলমানের গৌরব অচিরাৎ বিলুপ্ত হইবে। গোড়াই কাজীর এই উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া হুসেনশাহার মত ফিরিয়া গেল। তিনি পুনরায় হরিদাসকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভাই, তুমি নিজ শাস্ত্রমত গ্রহণ কর। তবে আর তোমার কোন চিন্তা নাই। ইহা যদি অস্বীকার কর তবে সব কাজী একত্র হইয়া তোমার শাস্তিবিধান করিবেক। অবশেষে নিজ শাস্ত্রমত গ্রহণ করিতেই হইবে। তবে কেন প্রথমতঃ অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া অপমানিত হইতেছ?"

"পুন বোলে মুলুকের পতি 'আরে ভাই।'
আপনার শাস্ত্র বোল তবে চিন্তা নাই।
অন্যথা করিব শাস্তি সব কাজীগণে'
বলিবাও পাছে, আর লঘু হইবা কেনে?"

নৃপতি হুসেনশাহ হরিদাসকে যথাসাধ্য ভয় প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার চরম সিদ্ধান্ত জানাইলেন। কিন্তু ভক্তবীর অচল অটল ভাবে উত্তর করিলেন যে, "ঈশ্বর যাহা করান তাহা বই আর কেহ কিছু করিতে পারে না। যাহার যেরূপ অপরাধ ঈশ্বর তাহাকে তদনুরূপ শাস্তির বিধান করিয়া থাকেন। তিনি মনে মনে যিশুর ন্যায় ভগবানকে বলিলেন—"প্রভো! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

"হরিদাস বোলেন "যে করান ঈশ্বরে,
তাহা বই আর কেহো করিতে না পারে।
অপরাধ অনুরূপ যার যেই ফল,
ঈশ্বর সে করে, ইহা জানিহ সকল।"

হরিদাস তারপর মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এমন কি শাস্তি আছে যাহার ভয়ে আমি হরিনাম ছাড়িতে পারি। মনে মনে এই প্রশ্নের উদ্রেক হইবামাত্রই ধীর, শান্ত, সৌম্য, কোমলপ্রাণ হরিদাস প্রহ্লাদের ন্যায় সিংহগর্জ্জনে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—

"খণ্ড খণ্ড হই যদি যায় দেহ প্রাণ,
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।"

হরিদাস দিব্যচক্ষে তাঁহার ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, একদিকে হরিনামামৃত, অন্যদিকে ভীষণ অত্যাচার, কঠোর শাস্তি, প্রাণান্তিক যাতনা, মৃত্যুর বীভৎস মূর্ত্তি। হরিনামামৃত পানে উন্মত্ত হরিদাস অনায়াসে সকল ভয় উপেক্ষা করিয়া যে মহাবাণী উচ্চারণ করিলেন তাহা 'যাবচ্চন্দ্র-দিবাকরৌ' ভক্তের প্রাণে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইবে। ভারতবর্ষের অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া বীরদর্পে মধুর কণ্ঠে এমন বাণী প্রহ্লাদের পরবর্ত্তী সময় আর কখনো ভারতাকাশে উত্থিত হয় নাই। এ অশরীরিণী বাণী ভারতের চিরসম্পত্তিরূপে ভারতের প্রত্যেক ধর্ম্মমন্দিরে সাধনায় সর্ব্বোত্তম আদর্শরূপে বিরাজ করিবে। নামজপ যাহাদের সাধনার অঙ্গ তাঁহারা যদি নামের ন্যায় এ বাণী যপ করেন তবে তাঁহাদের দুর্ব্বল প্রাণে বল আসিবে, মৃতদেহে জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হইবে, সকল ভয় দূরে পলায়ন করিবে।

হরিদাসের এ অশ্রুতপূর্ব্ব অমৃতময়ী প্রতিজ্ঞা বাঙ্গালী পাঠকগণ একবার স্মরণ করুন।

"খণ্ড খণ্ড হই যদি যায় দেহ প্রাণ,
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।"

নৃপতি হুসেন শাহের দরবার ইংরেজের বিচারালয় নহে, সেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে নিজের মত ব্যক্ত করিতে পারে, অথচ সে জন্য তাহার প্রতি আইনসঙ্গত দণ্ডের মাত্রা বৃদ্ধি পায় না। বর্ত্তমান সময়ের দণ্ডবিধি তদানীন্তন দণ্ডবিধির তুলনায় অতিমাত্র নগণ্য। তদানীন্তন নৃশংস শারীরিক দণ্ড যেরূপ ভীতি ও আতঙ্কের উৎপাদন করিত অধুনাতন কারাবাস নির্ব্বাসন ও প্রাণদণ্ড তাহার বিন্দুমাত্র ভীতি বা আতঙ্কের সঞ্চার করিতে পারে না। ক্রুদ্ধ রক্তিম-লোচন কাজীগণ ও নৃপতি হুসেনশাহের সমক্ষে রক্তপিপাসু অসংখ্য সশস্ত্র প্রহরী বেষ্টিত হইয়া হরিদাস যেরূপ বীরত্ব, তেজস্বিতা ও ভগবদ্ নিষ্ঠার পরিচয় দিলেন বর্ত্তমান জগতে তাহার মাপকাঠি খুজিয়া পাওয়া যায় না।

মুসলমানাধিপতি হরিদাসের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শুনিয়া বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন আর তাঁহাকে বশীভূত করিবার কোন আশা রহিল না। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গোড়াই কাজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন ইহার প্রতি কি ব্যবস্থা করিবা?"

"শুনিয়া তাঁহার বাক্য মুলুকের পতি,
জিজ্ঞাসিলা এবে কি করিবা ইহার প্রতি।"

গোড়াই কাজী উত্তর করিল—এখন আর বিচারের দরকার নাই। ইহাকে বাইশ বাজারে নিয়া কঠোর বেত্রাঘাত করিয়া ইহার প্রাণ হরণ করিতে হইবে। বাইশ বাজারে মারিলেও যদি এ ব্যক্তি জীবিত রহে তবে বুঝিব যে ইহার কথা সত্য।

"কাজী বলে বাইশ বাজারে বেড়ি মারি,
প্রাণ লহ আর কিছু বিচার না করি।
বাইশ বাজারে মারিলেও যদি জীয়ে,
তবে জানি জ্ঞানী সব সাচ্চা কথা কহে।

গোড়াই কাজী নৃপতির মতের অপেক্ষা না করিয়া নিজেই পাইক সকল ডাকিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কহিতে লাগিল যে, এমনভাবে মারিবি যেন প্রাণ না থাকে।

"পাইক সকলে ডাকি তর্জ্জ করি কহে,
'এমত মারিবি, যেন প্রাণ নাহি রহে।
যবন হইয়া যেই হিন্দুয়ানী করে,
প্রাণান্ত হইলে শেষে এ পাপেতে তরে।"

পাপাত্মা হুসেনশাহ নরাধম গোড়াই কাজীর আজ্ঞা অনুমোদন করিল। দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দিক হইতে দুরন্ত পাইকেরা আসিয়া ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি, প্রেম-ভক্তির অধিনায়ক হরিদাসের দিব্য তনু ধৃত করিল। দেখিতে দেখিতে ভীষণ কলরব ও বীভৎস চীৎকারধ্বনির মধ্যে সহাস্যবদন উৎফুল্ল নয়ন আনন্দের প্রতিমূর্ত্তিখানি যবনের দরবারকে চির অমানিশায় নিমজ্জিত করিয়া অন্তর্হিত হইল। স্বর্গে দুন্দুভি বাজিল। অনন্ত বিশ্বে মহাশঙ্খ ধ্বনিত হইল। দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিল। অপ্সরাগণ সঙ্গীতসুধা ঢালিল। ভক্তগণ বিশ্বরাজের সিংহাসন ঘেরিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। প্রেম-ভক্তির বিজয়-নিশান বঙ্গের পুণ্যময় আকাশে উড্ডীন হইল। *

[ক্রমশঃ

* পূর্ব্বাপর সংখ্যায় প্রবন্ধটী 'সাধু হরিদাসের পুণ্যকথা' নামে অভিহিত হইয়াছিল। লেখকের আগ্রহাতিশয্যে এই সংখ্যা হইতে উহা বর্ত্তমান নামে পরিবর্ত্তিত হইল। —বঃ সঃ

কলিযুগ

শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

(নাটিকা)

[স্থান—কলিকাতা, কাল—অপরাহ্ন। টালীগঞ্জের লেকের নিকটস্থ এক সুন্দর বাটীর বসিবার ঘর—কলিযুগ কাগজের সম্পাদক কৃষ্ণকমলবাবু সোফায় বসিয়া গড়গড়া টানিতেছিলেন—বয়স প্রায় পঞ্চাশ হইয়াছে—দীর্ঘাকৃতি সুন্দর সুপুরুষ—তবে মাথায় বৃহৎ টাক বর্ত্তমান। কিয়ৎক্ষণ পরে কৃষ্ণবাবু দুইটী পত্র পাঠ করিয়া বিরক্ত ও চিন্তান্বিত। এই সময়ে বাহির হইতে মোটর গাড়ীর শব্দ]

কৃষ্ণকমল। ওরে ভজা—ভজা—(ভজার প্রবেশ) দেখ তো দরজার সামনে একটা গাড়ী এসে দাঁড়াল না?

ভজা (বাহিরে না গিয়া জানালা হইতে দেখিয়া) আজ্ঞে না—

কৃষ্ণকমল। না, বাহিরে গিয়ে গেটের সামনে দেখ—

(ভজার প্রস্থান ও আগমন)

ভজা। আজ্ঞে হাঁ—

(প্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক মলয় রায়ের প্রবেশ)

কৃষ্ণকমল। এসো—এসো মলয়, তোমার কথাই ভাবছিলাম, গাড়ী কিনলে না কি? ওরে ভজা, যা এক কাপ চা ও টোষ্ট বেশ ভাল করে মাখম চিনি দিয়ে নিয়ে আয় আর মা যে ক্ষীরের মালপো করেছেন তাই দু'টো নিয়ে আয়—যা-যা—

মলয়। ক্ষীরের মালপো? বড় ভাল সময়ে এসেছি তো—হাঁ কৃষ্ণ দা—গাড়ীটা সস্তায় পেয়ে কিনলাম, টকীতে একজন নূতন ফিল্ম কোম্পানী খুলেছে, গল্পের প্লট দিয়ে প্রায় দু'হাজার টাকা জোগাড় করেছি—

কৃষ্ণকমল। ভাই মলয়, হাতে হাত মেলাও—এই তো চাই, পাকা Business man হবে তুমি—Capital একটা plot দিয়ে দু'হাজার—Wonderful!

মলয়। আপনার হাতে চিঠি—কার চিঠি, রমেশবাবুর লেখা না?

কৃষ্ণকমল। আর বল কেন? যোগেশ আর রমেশ—

মলয়। আপনার কাগজের দুই স্তম্ভ—

কৃষ্ণকমল। কে তৈরী করলো দুই স্তম্ভকে—এই কৃষ্ণ শর্ম্মা, এখন আমাকেই শাসায়?

মলয়। কী হয়েছে কী—

কৃষ্ণকমল। দু'জনেই লিখেছেন যে মাসে মাসে দু'জনের লেখা আমার কাগজে বেরোয় তা তাঁরা চান্ না।

মলয়। ভারী বিপদ তো—

কৃষ্ণকমল। বিপদ আর কী, তোমরা এখন চালাও—

(এমন সময়ে নিখিলেশ, বিশ্ব, নীহার, পুলিন, জ্যোৎস্না, নীরেন প্রভৃতি সাহিত্যিক বৃন্দের প্রবেশ)

কৃষ্ণকমল। (ব্যস্ত হইয়া ঘন ঘন গড়গড়া টানিয়া) এসো এসো সব (সজোরে) ওরে ভজা—ভজা (ভজার এক কাপ চা, টোষ্ট ও ক্ষীরের মালপো লইয়া প্রবেশ)—যা ওটা রেখে ছ' কাপ চা আরো, টোষ্ট ও ক্ষীরের মালপো বারটা নিয়ে আয়।

জ্যোৎস্না। কৃষ্ণ'দা, মুলতানী কালো গরুটা দুধ দিচ্ছে বুঝি—ওঃ কী সময়েই এসে পড়েছি—বুঝেছো মলয়, একেই বলে good-luck—

নীহার। বোধ হয় দু'তিনটে গরু এক সঙ্গে দুধ দিচ্ছে—

কৃষ্ণকমল। Right you are—আচ্ছা—চা টা আসুক তৎক্ষণ।

মলয়। শুনেছ নিখিলেশ, জ্যোৎস্না, রমেশবাবু ও যোগেশবাবু দাদাকে পত্রাঘাত ক'রেছেন যে একই কাগজে দু'জন পাশাপাশি মাসে মাসে লেখা দিতে চান্ না—

পুলিন। কেন? ভারী আশ্চর্য্য তো—

কৃষ্ণকমল। (গড়গড়া টানিয়া)—আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই—এই দুইজনকে বড় লেখক ব'লে এত দিন ভুল ক'রেছিলাম, এদের মধ্যে কেউই Genius নয়—Talent আছে কিছু উভয়ের—লেখা তাদের হ'য়ে গিয়েছে প্রচুর, বৈচিত্র্যও গিয়েছে ক'মে—আমার উদ্দেশ্য ছিল যে পাশাপাশি মাসে মাসে লেখা দিলে উভয়েই ভাল লিখ্তে চেষ্টা ক'রে কিন্তু তা

তো ওরা খাটতে চায় না—সে জন্য ঠিক করেছি এবার দু'জনকেই বাদ দেবো—Part of business—

বিশ্ব। কিন্তু…

কৃষ্ণকমল। এর মধ্যে "কিন্তু" নেই বিশ্ব—তোমরা বোধ হয় কেউ অস্বীকার ক'রবে না যে, আমার কাগজের সার্কুলেশন খুব বেশী—টাকাও তোমাদের আশীর্ব্বাদে অনেক অর্জ্জন করেছি এবং কাগজের প্রতিষ্ঠাও আছে। তাঁদের পত্রাঘাতে ভীত হ'য়ে কৃষ্ণকমল শর্ম্মা কাগজ চালান ছেড়ে দেবে না—এখন চুস্ ক'রে ব্যাচ্ ঠিক ক'রে নিতে হবে—দু'জনকেই বাদ দেবো এটা ঠিক—

মলয়। কাদের চুস্ ক'রবেন, ঠিক করেছেন?

কৃষ্ণকমল। নিশ্চয়ই—ছোট গল্পে—মলয়, নীরেন; কবিতা—নীহার, জ্যোৎস্না—বেশ ভাল কবি। উপন্যাসের জন্য—বিশ্ব, পুলিন, নিখিল আর প্রবন্ধের জন্য Religious Political, Social তিন জন ঠিক আছেন-ই আর প্রবন্ধে চুসিং কিছু কাজের হয় না—

(এই সময়ে পুনরায় ভণ্টার প্রবেশ—প্রথমে এক ট্রেতে চা—পরে টোষ্ট ও পরে মালপো ৬টা প্লেটে)

কৃষ্ণকমল। দে—দে সব, মলয়, আর একবার হবে না কী?

মলয়। হ্যাঁ—আপনি আমার মনের কথা ধ'রে ফেলেছেন—

কৃষ্ণকমল। ভণ্টা এক ডিস মালপো, চা, টোষ্ট নিয়ে আয়—আমার গিন্নীর দু'টো hobby আছে—একটা প্রচুর ক্ষীরের মালপো তৈরী করা আর দ্বিতীয়, সপ্তাহে তিন দিন কালীঘাটে পূজো দেওয়া, নিজে গিয়ে—

পুলিন। দুটোই খুব ভাল hobby—

মলয়। একটা গল্প লিখে এনেছি কৃষ্ণ'দা।

কৃষ্ণকমল। প্লটটা কী?

নীরেন। যেটা আমাকে প'ড়ে শুনিয়েছিলি মলয়?

মলয়। হ্যা—

নীরেন। সেই-টে চমৎকার first class—কেবল একটা যায়গায়—

কৃষ্ণকমল। প্লটটা কী ব'লো, মলয়।

মলয়। কৃষ্ণ'দা, গল্পের প্লটটা হচ্ছে—এক বন্ধুর আর এক বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় তারপর সেই বন্ধুত্ব ক্রমশঃ ঘনীভূত—

কৃষ্ণকমল। ঘনীভূত—তারপর—

জ্যোৎস্না। বন্ধুর স্ত্রীর চেহারা কী রকম, বয়স কতো, গায়ের কি রকম রং—

মলয়। একেবারে ইহুদী ভাই—ইহুদী ব'লে ভ্রম হয়—

পুলিন। জ্যোৎস্না, যখন বন্ধুত্ব ঘনীভুত তখন চেহারা কী রকম out of the question—

নীরেন। মোটেই না—বন্ধুর স্ত্রীর চেহারা শুধু ইহুদীর মতন ব'ললেই তো হবে না—বয়স কতো—মোটা কি রোগা কি দোহারা—চোখ ভাসা ভাসা, বড় বড় কালো কী না—

মলয়। তোরা বড় জ্বালিয়ে তুলেছিস্—দোহারা চেহারা বয়স ২২-এর বেশী নয়, ভাসা ভাসা বড় চোখ, aquiline nose, ঠোঁট পাতলা, দীর্ঘাকৃতি—এখন এ বন্ধুত্ব ঘনীভুত হবার কারণ বন্ধুটী গান করেন ভাল ও বন্ধুর স্ত্রীও সুগায়িকা। বন্ধুটী গানই শেখাতেন—

কৃষ্ণকমল। আচ্ছা, তারপর—

মলয়। ক্রমশঃ বন্ধুর বাড়ীতে ঘন ঘন যাতায়াত, প্রথমে বন্ধুর উপস্থিতিতে তারপর অনুপস্থিতে আরো বেশী—

কৃষ্ণকমল— তারপর—

জ্যোৎস্না। তারপর বোধ হয় প্রেম—

মলয়। তুই কী আমায় পচা লেখক পেয়েছিস্, অমনি প্রেম। বন্ধুর ঘন ঘন আগমনে বন্ধুর স্ত্রী প্রীতা হ'লেও স্বামী ক্রমশঃই বিরক্ত, পরে কলহ—

কৃষ্ণকমল। শুধু কলহ? স্ত্রীর মুখে কিছু free love এর argument দেও নি?

মলয়। Argument দেবো না? তবে আপনি শোনলেন কি এতদিন! Argument দিয়েছি যে বিবাহ একটা ধরা-বাঁধা নিয়ম, তার মধ্যে কি ভালবাসা প্রস্ফুটিত হ'তে পারে? এই বাঁধা-বাধির মধ্যে কি হৃদয়ের মিল হ'তে পারে?

নীরেন। বাঃ ভাই capital!

কৃষ্ণকমল। Good তারপর—

মলয়। তারপর। বন্ধু একসন্ধ্যায় আফিস্ থেকে এসে দেখলেন টেবিলে স্ত্রীর চিঠি। স্ত্রী জানিয়েছেন যে, তিনি নিরুদ্দেশ হ'লেন।

কৃষ্ণকমল। তারপর—

মলয়। স্বামী বন্ধুর মেসে গিয়ে শুনলেন তিনিও রুদ্দেশ—তারপর স্বামী পুলিশে খবর দিলেন—

(প্রায় সকলেই একসঙ্গে) Murder! Murder! লিশে খবর!

জোৎস্না। পুলিশে খবর বর্ত্তমান যুগের অযোগ্য—

কৃষ্ণকমল। পুলিশে খবর? এ আমার কাগ। কলিযুগে এ চ'লবে না—ওটা বাদ দিতে হবে, তারপর—

পুলিন। Excuse me Krishnada, একটা ক জজ্ঞাসা করে নি—স্ত্রীর ছেলে-পিলে হয়েছিল?

মলয়। না।

পুলিন। বেশ—বেশ ছেলে-পিলে হ'লে ব্যাপার একটু complicated হ'ত, sociology-র stand poi থেকে—

কৃষ্ণকমল। পুলিন থামো, কিছু complicated হো না। তোমার দ্বারা উপন্যাস লেখা চ'লবে না, কলিযু নীতির দুর্গন্ধ এখনও যায় নি তোমার।

পুলিন। নীতির দুর্গন্ধ প্রায় পরিত্যাগ করেছি দাদা আপনার কৃপায়।

কৃষ্ণকমল। থাক্, তারপর বোধ হয় একটু compa-monate marriage-এর কথা দিয়েছো—বিয়ে করলো না অথচ স্বামী স্ত্রীর মতন থাকলো ও বেশ সুখে সময় কাটে

মলয়। হাঁ।

জ্যোৎস্না। দাদা, না না ও ঠিক হ'ল না—মলয় বন্ধু স্ত্রীকে দেখিয়ে দাও তিন বছরের মধ্যে অনবরত তিন জনে সঙ্গে love-এ প'ড়লো।

কৃষ্ণকমল। না না, এখনও সে সময় আসে নি, আরো বছর দুই পরে, এখন অতোটা বাড়াবাড়ি ক'রলে কাগজে sale ক'মে যাবে।

জ্যোৎস্না। Bold হওয়া দরকার কৃষ্ণ'দা, sale ন হয় কমলো।

কৃষ্ণকমল। দেখ, বাবা বোতল বিক্রী ক'রে জীবন আরম্ভ করেন, Stevedore-এর কাজ ক'রে অনেক টাকা উপার্জ্জন করেন, আমি কাগজ বের করেছি ব্যবসা হিসাবে, লাভ কমলে তো চ'লবে না, সৎসাহিত্য প্রচার করতে আমি সাহিত্য বাজারে আমদানী করছি নে, সেই জন্য কোন প্রিন্সিপল্ নেই আমার—যখনই দেখবো সে বন্ধুর স্ত্রী পাঁচ জন কেন দশ জনের সঙ্গে পর পর প্রেমে প'ড়লেন এরকম গল্প খুব চ'লবে তখনই চালাবো, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ ক'রো না।

(এই সময়ে প্রবীণ অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জগদীশ চৌধুরী, এম্-এ, পি-আর্-এস্, পি-এইচ্-ডি প্রবেশ করিলেন)।

(জগদীশ বাবুকে দেখিয়া সকলে উঠিয়া)

"আসুন, আসুন আমাদের Puritan ঠাকুর্দা"।

জগদীশ। মদনদেবের আশীর্ব্বাদ তোমাদের উপর বর্ষিত হোক্, উপবেশন ক'রো, আমার Bohemian নাতীরা—(সকলের উপবেশন)।

কৃষ্ণকমল। জগদীশ কাকা, আপনার হাতে ওটা কি?

জগদীশ। থিয়েটারের হাণ্ডবিল, ভারী interesting, তাই নিয়ে এলাম।

কৃষ্ণকমল। কি লিখেছে?

জগদীশ। প'ড়ছি, শোন, "স্বামী ও স্ত্রী নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার রক্ষায় দৃঢ় হইয়া যে বিভ্রাটের সৃষ্টি করিল এবং পরিণামে যে সত্যের সন্ধান পাইয়া স্বাধিকার সম্বন্ধে সচেতন হইল তাহা এই নাটকে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে" এটুকু বেশ, কিন্তু তারপর "এই দ্বন্দ্ব অতীতে ছিল, বর্ত্তমানেও আছে ও ভবিষ্যতেও থাকিবে। নর ও নারী, স্বামী স্ত্রী এ সম্বন্ধে এখনো স্পষ্ট বোঝা পড়া করিয়া লইবার মত শক্তি অর্জ্জন করিতে পারে নাই বলিয়াই সমস্যাটী সর্ব্বকালীন হইয়া রহিয়াছে।"

মলয়। আমার গল্প যে ঠাকুরদা' এই নিয়েই, এই সমস্যা যে সর্ব্বকালের প্রেমের।

জগদীশ। প্রেম ভালবাসা মোটেই একটা সমস্যা নয়, স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ ঠিক আছে ভারতে।

জ্যোৎস্না। অদ্ভুত লোক আপনি, যদি সমস্যাই নয় ত প্রেম নিয়ে সাহিত্যে এত হুড়াহুড়ি কেন?

জগদীশ। হুড়াহুড়ি এই জন্য যে তা সৌখীন সমাজে আদর পাবে, বইএর কাট্তি হবে। লেখক কিছু টাকা পাবে আর টকীতে প্লট হিসাবে গৃহীত হ'লে বেশ মোটা টাকা পেয়ে যেতে পারে—purely commercial, সাহিত্যের স-ও নেই।

জ্যোৎস্না। আপনি সৌখীন সমাজ ব'লছেন কাকে?

জগদীশ। সৌখীন সমাজ আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ—ধনী, upper middle class and lower middle class, সৌখীন সমাজ ব'লতে আমি mean করছি specially upper middle class, অর্থাৎ বাপ ঠাকুরদা ভাল চাকুরী করতেন, ছেলেদেরও ভাল মাইনের চাকুরী জুটিয়ে দিয়েছেন এবং by fluke or luck, ভাল কাজ পেয়েছেন। এই সৌখীন সমাজে সমাজের অধঃপতনকে সমাজের অগ্রগতির বেশে সুন্দর মোহনরূপ দিয়ে একদল সাহিত্যিক বেশ নাম করেছেন ও পয়সাও পাচ্ছেন।

কৃষ্ণকমল। কাকা, এ আপনার অন্যায় কথা, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল গত হ'লেও তাঁদের সৃষ্টি বর্ত্তমান, আর রবীন্দ্রনাথ তো সে-দিন গত হ'য়েছেন, এদের লেখার পরও যখন আধুনিক লেখক নাম করছেন তখন তাকে উপেক্ষা করেন কী করে?

সকলে। Exactly, Bravo কৃষ্ণ'দা।

জগদীশ। বাবা, সোনার বোতাম প'রো আর ক্যারেট গোল্ড-এর সোনার বোতাম পরো, দেখবে যে ক্যারেট গোল্ড-এর বোতাম বেশী চকচক্ করে। চকচক্ করে বটে ক্যারেট গোল্ড কিন্তু স্থায়ী হয় না, কিন্তু খাঁটী সোনা যা, তা চকচক্ করে চিরদিন যদিও ঔজ্জ্বল্য হয় তো কম হ'তে পারে কিন্তু তার দাম চিরদিনই থাকে। মেকী জিনিষের চাকচিক্য হয় বেশী, সেইজন্য মেকী Artist কিছুদিন ধাঁধিয়ে দেয় বটে কিন্তু আবার তার সৃষ্টি লোপ পায়ও তেমনি, এ-বিষয়ে আমি একটা প্রবন্ধ লিখেছি, কৃষ্ণ এটা দিয়ে দিও এই Issueতে (প্রবন্ধর manuscript দান)।

মলয়। আমার প্লটটা একটু শুন্‌লেন না।

জগদীশ। না, প্লট শোন্‌বার এখন সময় নেই, আমি আস্‌ছি ঘুরে, আসি তবে। বেঁচে থাক তোমরা—(প্রস্থান)।

নিখিলেশ। কৃষ্ণ'দা, আপনি ওঁর প্রবন্ধ ছাপ্‌বেন না।

কৃষ্ণকমল। তাও কি হয়? ছাপ্‌বো বৈ কি, এম্-এ, পি-আর্-এস্, পি-এচ্-ডি, হিন্দুভাবাপন্ন, হিন্দুত্বের প্রতি আস্থা আছে, এই রকম দু'টো তিনটে প্রবন্ধ বার ক'রে হিন্দুত্বের প্রতি শ্রদ্ধা আর অন্যদিকে তরুণের নব-অভিযান ছাপিয়ে দুই দলকেই হাতে রেখে বেশ কাগজ চালাচ্ছি ভায়া, business, business—বুঝেছো।

(এই সময়ে খদ্দরধারিণী এক সুন্দরী প্রৌঢ়া মহিলা নাম লতিকা কারসরমা এসে উপস্থিত হ'লেন, এম্-এ পাশ, স্বরাজ কাগজের সম্পাদিকা)

সকলে। আসুন—আসুন—লতিকাদি।

কৃষ্ণকমল। কি খবর মিসেস্ কারসরমা?

লতিকা। দেখুন, কলিযুগ কাগজ একটু বেশী বাড়াবাড়ি আরম্ভ ক'রেছে, এ-বিষয়ে আপনাকে একটু ব'লতে এলাম, দেখুন তো এই গল্প আপনি কি দেখে দিয়েছিলেন।

কৃষ্ণকমল। কি লেখা, দেখি, এ যে রমেশবাবুর লেখা, বিখ্যাত লেখক, হাঁ৷ তবে একটু nude লেখা, Nudism চালান দরকার।

লতিকা। দেখুন আমিও কাগজ চালাই, এম্-এ পাশও ক'রেছিলাম, এক সময়ে দেশের জন্য জেলও খেটেছি। যিনি ওকালতী এক সময়ে ছেড়ে আমারই সঙ্গে জেলে গিয়েছিলেন এবং বাবা তাঁর সঙ্গে বিবাহের ঠিক ক'রেছিলেন সেই বিবাহ ভঙ্গ ক'রে পুনর্ব্বার বিবাহ ক'রেছি তাঁকেই। দেশের সেবা করতে গিয়ে নারী ও পুরুষের স্থান রাজনীতির ক্ষেত্রে সমান ব'লে আমার বক্তৃতায় একদিন মুগ্ধ হ'য়ে কংগ্রেস সেবায় ঝাঁপিয়ে প'ড়েছিলেন অনেক নারী, তারপর ভাই বোন্ যুবক তরুণীর সংসর্গে দেশের সেবায় এসে এই আমার অভিজ্ঞতা হ'য়েছে যে, নারী ও পুরুষের স্থান বিভিন্ন সমাজে রাষ্ট্রে সর্ব্বত্র। সেই কারণেই আজ মা গৃহিণী হয়ে অন্তঃপুরেই বাস করছি। কলিযুগের এই প'ড়ে তাই থাকতে না পেরে এসেছি। আমার মেয়ে যখন হেসে এই গল্প প'ড়তে দিলে কি মনে হ'ল আমার তা ব'লতে পারি না, ভাগ্যিস্ মেয়ের বিবাহ হ'য়ে গিয়েছে। আমিও নারী, আমিও মা।

কৃষ্ণকমল। আপনি চ'টেছেন দেখ্‌ছি।

মিসেস্ কারসরমা। শুধু চ'টেছি, পুরুষ মানুষ হ'লে আমি সে লেখককে চাবুক দিতাম, আপনারাও যদি মানুষ হ'তেন তা হ'লে লেখককে···

মলয়। প্রেম নিয়ে গল্প লিখ্‌লে ও Psycho analysis থাকলে একটু nude হবেই লতিকাদি।

মিসেস্ কারসরমা। রেখে দাও তোমাদের প্রেম আর

rubbish psycho-analysis, মেয়েদের নারীত্ব নিয়ে তোমরা পণ্য হিসাবে সাহিত্যে আমদানী করছো। সে-দিন কৃষ্ণ'দা তিন জন সম্পাদকের সঙ্গে এই কথাই হচ্ছিলো, তাঁরা সকলেই একমত হ'লেন যে, আমাদের দৃষ্টির কিছু দোষ ঘটে থাকবে যাতে এই যৌন প্রেম এই sex একটা বড় স্থান সাহিত্যে নিয়েছে।

কৃষ্ণকমল। দৃষ্টির দোষ কেন ব'লছেন তাঁরা।

মিসেস্ কারসরমা। দৃষ্টির দোষ এই জন্য ব'লছেন যে, প্রেম বিয়ে জীবনে যতটুকু স্থান অধিকার ক'রে আছে ঠিক ততটুকু স্থানই সাহিত্যে বা কথা-সাহিত্যে তাদের থাকা উচিত।

কৃষ্ণকমল। আপনি কি ব'লতে চান যে, প্রেমের জন্য কিছু বীভৎস ব্যাপার সমাজে ঘ'টছে না?

মিসেস্ কারসরমা। আমি ত' বলি নি যে, ঘ'টছে না, ঘ'টছে বৈ কী। এমন নারী অনেক আছে যারা নিজের দেহ বিক্রয় ক'রে আনন্দ পায়, এমন যুবক অনেক আছে যারা তাদের সুন্দর চেহারা নিয়ে অনেক তরুণীর সর্ব্বনাশ করে, এমন নারী অনেক আছে যারা পুরুষকে আকৃষ্ট ক'রে ফাঁদে ফেলে মজা দেখে, এ-সমাজে আছে ও থাকবে এ-কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না, কিন্তু আছে ব'লেই এই জঘন্য প্রবৃত্তিকে খাদ্য দিয়ে এই সব ব্যাপার গল্পের আকারে রঙীন চিত্র দিয়ে শত শত যুবক, শত শত তরুণীকে এই পথে অগ্রসর করাই কা উচিত, না এ-পথের বিভীষিকাই আঁকা উচিত?

মলয়। তা হ'লে গল্পে উপন্যাসে কেবল ভীষ্মের মতন চরিত্র আঁকতে হয়।

মিসেস্ কারসরমা। এমন বাজে কথা আমি ব'লব না যে, উপন্যাস বা গল্প লিখলে ভীষ্মের মতনই চরিত্র আঁকতে হবে, যদি কোন লেখক তা করেন তবে তিনি লেখকই ন'ন। তবে চরিত্র আঁকতে হ'লে সেটা যদি লালসা কামের পোঁটলা হ'য়ে দাঁড়ায় তবে সেটাও চরিত্র হবে না। আমাদের দেখতে হবে চরিত্রগুলো একদিকে যেমন সদ্গুণের পোঁটলা না হয় আবার অন্যদিকে কাম লালসারও পোঁটলা না হয়। কে অস্বীকার ক'রবে কৃষ্ণ'দা যে কাম লালসার পোঁটলাই আজ সাহিত্যের দোকানে খোলা হ'য়েছে। আর ছেঁড়া পঁচা ন্যাকড়াগুলো বিক্রী হচ্ছে মখমল্ আর কিংখাপের দরে।

কৃষ্ণকমল। মিসেস্ কারসরমা, কিন্তু ছেঁড়া ন্যাকড়া কাজে লাগিয়েই তো নূতন কাপড় তৈরী হয়।

মিসেস্ কারসরমা। ঠিক তাই, ছেঁড়া ন্যাকড়া বাড়ীতে রাখবার যো নেই আবর্জ্জনা বাড়ে, কিন্তু সেই পঁচা কাপড় ছেঁড়া ন্যাকড়াকে কাজে লাগাতে জানা চাই।

নিখিলেশ। সেই ছেঁড়া ন্যাকড়াকে কাজে তো লাগাচ্ছি আমরা, তাতে আপনি চ'টছেন কেন লতিকাদি?

মিসেস্ কারসরমা। এই ছেঁড়া ন্যাকড়া কাজে লাগিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, টলষ্টয়, থ্যাকারে, রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র।

কৃষ্ণকমল। শরৎচন্দ্র?

মিসেস কারসরমা। হাঁ, শরৎচন্দ্র—তিনি কোন দিন দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেন নি, এমন কি কোন হিন্দু বিধবার সামাজিকভাবে বিবাহ দেন নি কোন গল্প বা উপন্যাসে। তিনি চরিত্রহীন লিখতে পারেন কিন্তু চরিত্রস্খলন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে পাওয়া কঠিন।

কৃষ্ণকমল। তাই তো বটে, তবে তো character unnatural—

মিসেস্ কারসরমা। ঐ তো কৃষ্ণকমল দা—magic of words আপনাকে টেনে নিয়ে গিয়েছে তো, আমি না ব'ললে আপনারা এই বিষয়ে চিন্তা করতেন না। তিনি সত্যিকারের পঁচা দুর্গন্ধ ন্যাকড়াকে কাজে লাগিয়েছিলেন দেশের জাতির মঙ্গলের জন্য।

নিখিলেশ। তবে আমরা করছি কি?

মিসেস্ কারসরমা। (হাসিয়া) তোমরা দেখাচ্ছো যে, ছেঁড়া ন্যাকড়াই সব, কাপড় কিছুই নয়, এই আর কি। শুনুন সকলে, আমি আপনাদের কাছে এসেছি এক আবেদন নিয়ে—

সকলে। বলুন বলুন—লতিকাদি।

মিসেস্ কারসরমা। আমি কাগজ চালাচ্ছি অতি কষ্টে, আমার স্বামী অনেকবার আপত্তি করেছেন তাও আমি শুনি নি। আমি এ কাজে ব্রতী হয়েছি দুই কারণে, প্রথম কারণ হচ্ছে দেশ-সেবার ভুল পথ থেকে দেশবাসীকে যদি পারি

ফিরিয়ে আনতে ও দ্বিতীয় কারণ সাহিত্যে যে আগাছার সৃষ্টি হওয়ায় হিন্দুর ধর্ম্ম-কর্ম্ম, শিক্ষা-দীক্ষাকে ব্যঙ্গ ক'রে যাচ্ছেন এই আগাছার দল, তাঁদের expose করতে, তৃতীয় কারণ হচ্ছে, ইংরেজ-বিদ্বেষ পরিত্যাগ ক'রে জাতির দোষ কোথায়, তাই চিন্তা করতে।

জ্যোৎস্না। কংগ্রেস সেবিকা হ'য়ে আপনি বলছেন ইংরেজ বিদ্বেষ পরিত্যাগ করতে।

মিসেস্ কারসরমা। নিশ্চয়ই, আপনাদের মনে আছে বোধ হয় যে, ১৯৪১ সালে যখন হজ হয় মুসলমানদের মক্কায় যাবার জন্য জাহাজের দরকার হয়, তখন সরকার বাহাদুর অতি কষ্টে দু' খানার স্থলে তিন খানা জাহাজ দিয়েছিলেন আর দু' মাস পরে যখন পূর্ণকুম্ভ মেলা হ'লো তখন সরকার বাহাদুর কোনই special train-এর ব্যবস্থা করলেন না, প্রায় ৭ লক্ষ লোক সেখানে সমবেত হওয়া সত্ত্বেও—

জ্যোৎস্না। এটা কি সরকার বাহাদুরের উচিত কাজ হ'য়েছিল?

মিসেস্ কারসরমা। কিছু অনুচিত হয় নি, তা কলিযুগ সম্পাদক তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করা সত্ত্বেও—আমি লিখেছিলাম যে, গভর্ণমেণ্টকে দোষ দেওয়ার আগে হিন্দুধর্ম্ম কয়জন হিন্দু পালন করেন, কয়জন হিন্দুধর্ম্মের জন্য ভাবেন সেটা চিন্তা করা দরকার। আর্য্য-ঋষি ভারতের সর্ব্বপ্রকার সমস্যার সমাধান ক'রে গিয়েছেন, সেই ঋষি বাক্যের প্রকৃত অর্থ প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিলে তা তো আপনারা কষ্ট ক'রে পাঠ করেন না এবং পাঠ না ক'রেই সে বিষয়ের সমালোচনা করেন, এই তো আপনাদের হিন্দুত্বের প্রতি, হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা। প্রত্যেক মুসলমান জানে যে, যদি তার প্রতি অত্যাচার হয়, তার ধর্ম্মের প্রতি অত্যাচার হয়, কোটী মুসলমান তার পশ্চাতে আছে—অধিকাংশ মুসলমানই নিজের ধর্ম্মকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসে। তারা ধর্ম্মপ্রাণ সুতরাং শক্তিমান, তাই তারা দু'টো জাহাজের স্থলে তিনটে জাহাজ পেয়েছিল। হিন্দুরা ধর্ম্মের প্রতি সেরূপ অনুরাগী থাকলে, তারাও ৬টা special train পেতো। বাঙ্গালী হিন্দুরা অনেকেই ধর্ম্মের প্রতি আস্থাহীন, এবং যাঁরা ঋষি-বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান তাঁদের হিন্দু হ'য়েও তাঁরা বিদ্রূপ করেন। হিন্দুরা শক্তিহীন ব'লেই অধিকার পাচ্ছে না, অধিকার অর্জ্জন করতে হ'লে শক্তি চাই, শক্তি অর্জ্জন করতে হ'লে ধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান হওয়া প্রয়োজন, আত্ম বিশ্লেষণ-এর প্রয়োজন, ইংরেজ বিদ্বেষ প্রকাশ ক'রে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি ভক্তি দেখান বন্ধ করা দরকার, অধিকার অর্জ্জন করতে হয়, দয়া ক'রে কেউ কাউকে অধিকার দান করে না।

পুলিন। তাই তো, এ কথা তো ঠিক বলেছেন, এ রকম ভাবে তো আমরা চিন্তা করি নি।

মিসেস্ কারসরমা। যে দিন দেশের কাজে নেমেছিলাম—সে দিন কারাবরণ ক'রেছিলাম, সেদিন বুঝিনি যে পাশ্চাত্য movement এর নকল ক'রে ভারতের মুক্তি হবে না—পরে বুঝলাম, সেই দিন থেকে ভারতীয় ঋষি কি ব'লছেন, তারই অন্বেষণ করেছি—যাক্, তর্কে মূল বক্তব্য থেকে অনেক দূরে চ'লে এসেছি। আমি আজ এসেছি আপনাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে। আমি কোন দিন আমার পত্রিকা "স্বরাজ" ব্যবসাদারীর motive নিয়ে চালাতে আসি নি। আমি কলিযুগ নিয়মিত পাঠ করি। অনেক তরুণ লেখকের শক্তি দেখে আনন্দে গর্ব্বে হৃদয় ভরে যায়, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই বিষাদ এসে উপস্থিত হয় যখন মনে করি, এই শক্তির কি অপব্যয় হচ্ছে—দেশে অন্ন বস্ত্রের অভাব, চতুর্দ্দিকে বন্যা, হাহাকার, মড়ক, দেশে অর্থের অভাবে বহু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পিতা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কন্যাকে অনূঢ়া রাখতে বাধ্য হয়েছেন, এই সব কি আপনাদের গল্পের, প্রবন্ধের, উপন্যাসের, কবিতার Subject matter হ'তে পারে না?

মলয়। Art-এ আবার Subject-matter কি লতিকাদি, Art for art's sake—Art-এর Subject matter যা খুশী তাই হ'তে পারে। সৃষ্টিটা সুন্দর হ'লেই হোল, ফরমায়েস দিয়ে Artএর সৃষ্টি হয় না। Artistএর পক্ষে কতকগুলো principle নিয়ে গল্প বা উপন্যাস লেখা চ'লে না। গল্পে উপন্যাসে কোন principle বা idea প্রচার করা চলে না। উদ্দেশ্য, গল্প লেখা।

মিসেস্ কারসরমা। ও সব বাজে কথা ভাই, একটু খাটতে হবে, চিন্তা করতে হবে—উপন্যাস গল্পে প্রত্যেকেই কিছু প্রচার ক'রে গিয়েছেন। Thackeray, Dickens, George Eliot, Galsworthy, Tolstoy, Dostoivesky, Hugo, Gorky, Romain Rolland, H. G. Wells, Burnard

Shaw., বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী কি preach করেন নি? জানেন—Dickensএর যখন নাম ছিলো না Editorএর কথা মত কতকগুলো principle নিয়ে লিখতে আরম্ভ ক'রেন, নইলে Editor ছাপবে না। Dickens তাই লিখেছিলেন, সেই পুস্তক হোল জগৎবিখ্যাত Pick wick papers—

জ্যোৎস্না। তাই তো এ কথা তো আমরা জানতাম না—

মিসেস্ কারসরমা। আপনারা ডিকেন্স, থ্যাকারে, জর্জ্জ ইলিয়ট প'ড়বেন না জানবেন কোথা থেকে? যাক্, শুনুন আমার পত্রিকার খারাপ অবস্থা দেখে ও আমি কাগজ ব্যবসাদারী হিসাবে প্রকাশ করি না জেনে আমার স্বামীর বিশেষ বন্ধু এক ধনী মহাপ্রাণ ব্যক্তি আমাকে অর্থ সাহায্য করতে অগ্রসর হয়েছেন। আপনারা এক সময়ে আমার কাগজে লিখেছেন, টাকা অবশ্য নিতান্তই কম পেয়েছেন তার জন্য আমি লজ্জিত, কিন্তু এখন সে ত্রুটী থাকবে না। কৃষ্ণ কমলবাবু অনেকদিন সাহিত্য সেবা করছেন আমাকে নিশ্চয়ই এ বিষয়ে উৎসাহিত করবেন। আমার স্বামীর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেবেন। আজ তবে আসি—নমস্কার। (প্রস্থান)

কৃষ্ণকমল। (সক্রোধে) লেখক ভাঙ্গিয়ে নিতে এসেছেন সম্পাদকের বাটীতে। কী করব? সাহিত্যকে ব্যবসাদারী হিসেবে চালাচ্ছি তাও তো লিখতে পারি নে, তাতেও কাগজের Sale কমে যাবে, পুরুষ মানুষ হ'লে দু'কথা বলতাম, স্ত্রীলোক যে—

জ্যোৎস্না। চ'টছেন কেন এতো কৃষ্ণকমলদা—

কৃষ্ণকমল। চ'টবো না, এই "কলিযুগ" প্রায় আঠারো বছর সগৌরবে চালিয়ে এসেছি, কত লেখককে তুলেছি, এখনও তুলছি, কত লোকের খাতির পা'চ্ছি, সব যাবে এক মেয়ে মানুষের কথায়?

পুলিন। আমি তো লতিকাদির কাগজেই লিখবো—আমি ভাবছিলাম ঐরকম একটা কাগজ হ'লে ভাল হয়—

কৃষ্ণকমল। তা তো লিখবেই—আমার কাগজে নাম হ'লো এখন অন্য কাগজে—

পুলিন। সে বিষয়ে আপনি আমার গুরুদেব কৃষ্ণ'দা—লেখক টাকার জোরে ভাঙাতে আপনি past master—

নিখিলেশ। আপনি ক্ষেপেছেন—আমরা ছাড়ছি না আপনাকে—আপনি এখনও লেখকদের exploit করুন, কাগজ বেচে ৪ খানা বাড়ী করে ছেন, আর হিভেডোরী ক'রে ৮ টা বড় বাড়ী, আর ৪ খানা বাড়ী যাতে কর্তে পারেন কাগজ বেচে তার চেষ্টা আমরা করবই—আপনাকে সাহায্য করবই—পুলিন যেতে চাচ্ছে যাক্—কি ব'লো হে!

(পুলিন ব্যতীত সকলেই) আমরা আছি কৃষ্ণ'দা, মেকীর যুগ চ'লছে, আসল চালাতে চেষ্টা করলেই চ'লবে?"

কৃষ্ণকমল। বেশ বেশ—তোমরা আমায় সাহায্য ক'রো—

কৃষ্ণকমল। মলয় গল্পটা দাও একটু বদলে' সদলে দেবো, তোমার মত আছে তো?

[এমন সময়ে অন্তঃপুরে কৃষ্ণকমলের স্ত্রী দ্বিজেন্দ্রলালের অমর নাটক সাজাহানএর অভিনয় radioতে শুনিতেছিলেন, বাহিরের ঘর হইতে তাহা স্পষ্ট শ্রুত হইতেছিল।]

মলয়। সাজাহান হচ্ছে।

নিখিলেশ। চুপ কর, শুনতে দে।

(নাটকের মহামায়া ও যশোবন্ত সিংহের দৃশ্য রেডিওতে অভিনীত হইতেছে।)

মহামায়া। একে যুদ্ধ ব'লো—ধিক্!

যশোবন্ত। মহামায়া! তোমার এই ছাড়া কি আর কথা নাই? দিবারাত্র তোমার তিক্ত ভর্ৎসনা শুনবার জন্যই কি তোমায় বিবাহ ক'রেছিলাম?

মহামায়া। নহিলে বিবাহ করেছিলে কেন মহারাজ?

যশোবন্ত। কেন? আশ্চর্য্য প্রশ্ন! লোকে বিবাহ করে আবার কেন?

মহামায়া। হাঁ, কেন? বিলাস প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য? তাই কি? তাই কি?

যশোবন্ত। (ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়া) হাঁ, একরকম তাই ব'লতে হবে বৈ কী—

মহামায়া। তবে একজন গণিকা রাখো না কেন?

যশোবন্ত। ঝড় উঠছে বুঝি—

মহামায়া। মহারাজ, যদি তোমার পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে চাও, যদি কামের সেবা করতে চাও ত তার স্থান কুলাঙ্গনার পবিত্র অন্তঃপুর নয়—তার স্থান বারাঙ্গনার সজ্জিত নরক। সেইখানে যাও। তুমি রৌপ্য দিবে, সে রূপ

দিবে। তুমি যাবে তার কাছে লালসার তাড়নায়, আর সে তোমার কাছে আসবে জঠরের জ্বালায়। স্বামী স্ত্রীর সে সম্বন্ধ নয়।

যশোবন্ত। তবে—

মহামায়া। স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ ভালবাসার সম্বন্ধ। সে যেমন তেমন ভালবাসা নয়। সে ভালবাসা প্রিয়জনকে দিন দিন হেয় করে না, দিন দিন প্রিয়তম ক'রে। সে ভালবাসা নিজের চিন্তা ভুলে যায়, আর তার দেবতার চরণে আপনাকে বলি দেয়, সে ভালবাসা প্রভাত সূর্য্যরশ্মির মত যার উপরে পড়ে তাকেই স্বর্ণ-বর্ণ করে দেয়, ভাগীরথীর বারি রাশির মতন যার উপরে পড়ে তাকেই ভাগ্যবান করে—এ সেই ভালবাসা—অচঞ্চল, অনুদ্বিগ্ন, আনন্দময়—কারণ উৎসর্গময়।

যশোবন্ত। তুমি আমাকে সেইরকম ভালবাস মহামায়া?

মহামায়া। বাসি। তোমার গৌরব কোলে ক'রে মরতে পারি।

(নাটক অগ্রসর হইতেছে, সে সময়ে "ধনধান্যে পুষ্পে ভরা" বিখ্যাত সঙ্গীত "আমার জন্মভূমি" গীত হইতেছে। ডাঃ জগদীশ চৌধুরী প্রবেশ করিয়া সঙ্গীত শ্রবণে হাতজোড় করিয়া নতজানু হইয়া সঙ্গীত শুনিলেন, চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতেছিল)

(গীত শেষে জগদীশ উঠিলেন, সাহিত্যিক সম্প্রদায় এই দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন—জগদীশবাবুর ন্যায় এতবড় পণ্ডিত বিদ্বান ও যাঁহার মতামত পুরাতন যুগের বলিয়া "Puritan ঠাকুর্দ্দা" বলিতেও তাহারা দ্বিধা করে না ও যিনি এত উদার সামাজিক লোক যে তাহাদের সহিত সমানভাবে মেলামেশা ক'রেন, তাঁহার মধ্যে দেশভক্তি, জন্মভূমির প্রীতি এত গভীর আকর্ষণ দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন, কৃষ্ণকমলও আশ্চর্য্য হইয়াছেন)

জগদীশ। পবিত্র হ'লাম—সাজাহান আমার খুব ভাল লাগে—

মলয়। আমাদেরও বড় ভাল লাগে—কেন বলুন তো—অতি পুরোণো বই, বহুবার অভিনয় হয়েছে—

জগদীশ। পুরোণো হ'লে কি হবে—ক্লাশিক নাটকের দেশ কাল নেই—

কৃষ্ণকমল। সাজাহান যত দিন যাচ্ছে তত বেশী অভিনীত হচ্ছে, বঙ্কিমবাবুর চন্দ্রশেখরও অভিনীত হচ্ছে, হোল কি? আবার এদিকে মিসেস্ কারসরমা বল্লেন যে, এক ধনী মহাপ্রাণ ব্যক্তি সৎসাহিত্যের প্রচারে মাসিক পত্রিকার জন্য অর্থব্যয় করতে অগ্রসর হয়েছেন। দেশের কথা, জাতির অভাব অভিযোগের কথা, ভারতের দুঃখ-কষ্টের প্রকৃত কারণ কি, এইসব বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক ও উপন্যাস লেখা হবে। দেশের মঙ্গল কামনার চিন্তাধারা প্রত্যেক লেখার মধ্যে ফল্গু নদীর ধারার মতন অগ্রসর হবে; ভাবিয়ে দিয়েছে—

জগদীশ। ও মিসেস্ কারসরমা তাই বলেছেন বুঝি, বেশ, বেশ আমি ওর কাগজেই লিখবো—

কৃষ্ণকমল। আমাকে ছাড়বেন না কাকা।

জগদীশ। আমি অনেকদিন তোমাদের লেখা দিয়েছি, প্রবন্ধের মূল্য কি যদি না দেখলাম যে কাগজে প্রবন্ধ লিখছি অন্ততঃ সে কাগজও আমার প্রবন্ধ অনুসারে কিছু কাজ করছে—কী হবে আর তোমার কাগজে লিখে? আচ্ছা আসি— (প্রস্থান)

কৃষ্ণকমল। বুঝছো মলয়—

পুলিন। আমিও ঐ কাগজে লিখবো কৃষ্ণ'দা। নীতির দুর্গন্ধ ও কাগজ সহ্য করবে, নমস্কার। (প্রস্থান)

কৃষ্ণকমল। তাই তো জ্যোৎস্না বড় চিন্তার কথা হয়ে প'ড়লো। পাশ্চাত্য সাহিত্যের বদ হজমের রূপ হাজার সাজিয়ে গুজিয়ে চাপা দাও, ধরে ফেলেছে। বদ হজম একেবারে ধরে ফেলেছে, এমন লাভের ব্যবসা গড়ে তুলেছিলাম, সে ব্যবসা টিকলো না দেখছি।

জ্যোৎস্না। ভাববেন না—কাগজ চালান সোজা নয়।

মলয়। কিছু ভাববেন না কৃষ্ণ'দা—মেকীর যুগের এখনও অবসান হয় নি, আপনি দমবেন না, কি বল হে?

সকলে। নিশ্চয়ই, দমবার কি আছে?

নীরেন। দাদা, আপনি বড় up set হ'য়ে প'ড়েছেন, চিন্তার কোন কারণ নেই, (কৃষ্ণকমলের হাত ধ'রে) চলুন একটু লেকে বেড়িয়ে আসি।

কৃষ্ণকমল। (গড়গড়ায় একটান দিয়া) চ'লো, মাথাটা গরম হয়েছে—ওরে ভজা, ভজা।

(ভজার প্রবেশ)

কৃষ্ণকমল। গাড়ীটা বের করতে বল, চলো হে।

[সকলের প্রস্থান]

পদাবলী সাহিত্যে শেখর কবি

শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়, বি-এল

মহাজন পদাবলী রসচিত্র। উপনিষদের 'ব্রহ্ম রসো বৈ সঃ'। বৈষ্ণব মহাজনদিগের রস, এই ব্রহ্ম পর্যায়ভুক্ত। বৈষ্ণব কবিগণ অনুভূতির ভিতর দিয়া কল্পকলার স্রষ্টা, তাঁহারা রূপ রসে বিলাস করিয়া জীবনে চিদানন্দ ঘন রস পান করিয়াছেন।

পূর্ব্বরাগ, প্রেমবৈচিত্র্য, রসোদ্গার, ভাবসম্মিলন বর্ণনে ভাষার আড়ম্বর নাই, কিন্তু অনুভূতির জগতে ইহা চির বসন্তের চারু চিত্রপট।

মহাজনপদাবলী সাহিত্য ক্ষেত্রে বাঙালীর জীবনে নব যুগের সৃষ্টি করিয়াছিল; যে প্রেমের অভিনব উৎসে রস-সাহিত্যের সৃষ্টি হইল, তাহাতে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে রসিক কাব্যামোদীগণ বিভোর হইলেন। ফলে নসিরমামুদ, আকবর শাহ, সেখ জালাল, সেখ ভিক্, সেখ লাল, ফকির হবিব, মার্তুজা, চাঁদ কাজী রচিত পদাবলী জ্ঞানদাস, চণ্ডীদাস, গোবিন্দ দাসের পদাবলীর সহিত সমতা রক্ষা করিয়া চলিতেছে।

এপার হতে বাজাও বাঁশী ওপার হতে শুনি
অভাগীয়া নারী হাম যে সাঁতার না জানি।

চাঁদ কাজীর এই মর্ম্মস্পর্শী পদ ভক্তচিত্তের অপূর্ব্ব আত্মনিবেদন। বৈষ্ণব কবিগণ যাঁহারা অনুভূতির ভিতর দিয়া কল্প কলার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের পদাবলী বিবিধ পুস্তকাকারে সংগৃহীত আছে। রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃত সমুদ্র', বৈষ্ণব দাস সঙ্কলিত 'পদকল্পতরু', নিমানন্দ দাসের 'পদরসসার', 'পদকল্পলতিকা', 'গীতচিন্তামণি', 'গীতচন্দ্রোদয়', 'পদচিন্তামণিমালা', 'রসমঞ্জরী' প্রভৃতি সংগ্রহ পুস্তক আছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে ৺সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় 'পদকল্পতরুর' অভিনব সংস্করণ বাহির করিয়া বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। ৺জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় 'গৌরপদ তরঙ্গিনী' প্রকাশ করিয়া ভূমিকায় বহু বৈষ্ণব কবিতা-সংগ্রহের এক অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাপতির পদাবলীর পদ্যানুবাদ, সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের বিদ্যাপতির পদাবলীর সংস্করণ সুধীবৃন্দের চিত্ত বিনোদন করিতেছে। অক্ষয়কুমার সুরকার, রমণীমোহন মল্লিক, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, নগেন্দ্রনাথগুপ্ত, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ প্রমুখ মহোদয়গণ বৈষ্ণব পদাবলীর বিবিধ সংস্করণ প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্যকে জনসাধারণের সহজগম্য করিয়া দিয়াছেন।

বৈষ্ণব পদাবলী আলোচনা করিলে শেখর ভণিতাযুক্ত বহু পদ দৃষ্ট হয়। 'গৌরপদতরঙ্গিনী' প্রণেতা ৺জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, চন্দ্রশেখর, শশিশেখর, রায়শেখর অভিন্ন পদকর্ত্তা, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে বিশেষ আলোচনায় ঐ সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম দেখা যায়।

কবি রায়শেখর বর্দ্ধমান জেলার পরাণ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। কবি তাঁহার রচিত পদাবলীতে নিজকে কবিশেখর, রায়শেখর, শেখররায় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কবি রায়শেখর, গোবিন্দদাসের অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহার রচিত পদে গোবিন্দদাসের রসপূর্ণ উচ্ছ্বাসের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে।

কাজর রুচিহর রয়নী বিশালা
তছুপর অভিসার করু ব্রজবালা।

এই অভিসারের পদটী রায়শেখরের, নিজেকে শেখর বলিয়া ভণিতা দিয়াছেন—

যতনহি নিঃসরু নগর দুরন্তা,
শেখর অভরণ ভেল বহন্তা।

শ্যাম সাগরের অভিমুখে রূপানুরাগের প্রবলবেগে রসময়ী ব্রজবধূর অভিসার—

তরল জলধর, বরিখে ঝর ঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর,
শ্যাম নাগর, একলে কৈছনে
পন্থ হেরই মোর,
সোঙরি মঝু তনু অবশ ভেল জনু
অথির থর থর কাঁপি।
মোর গুরুজন নয়ন দারুণ
ঘোর তিমিরহি ঝাঁপি।

ত্বরিতে চল অব, কিয়ে আওসায়
জীবন মঝু আওসার।
শ্রী-কবি শেখর, বচনে অভিসর
কিয়ে সে বিঘিণ বিথার॥

রায়শেখর শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তা,, দণ্ডাত্মিকা পদাবলীগ্রন্থে নিজেকে পদের ভণিতায় কবিশেখর প্রভৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির কবিশেখর উপাধি দৃষ্ট হয়। সুতরাং অষ্টকালীয় লীলাবর্ণনকারী, দণ্ডাত্মিকা পদাবলী রচয়িতা রায়শেখরের পদাবলীর সহিত বিদ্যাপতি ও গোবিন্দ দাসের পদাবলীর সৌসাদৃশ্য থাকায় অনেকস্থলে পদকর্ত্তা নির্ণয়ে গোলযোগ ঘটে। রায়শেখর ব্রজবুলি ও বাংলা উভয়বিধ রচনায় কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন।

নিরুপম কাঞ্চণ, রুচি কলেবর, লাবণি বরণি না হোই।
নিরমল বদন, বচন অমিয়াসার, লাজে সুধাকর রোই।

পদগুলি রায়শেখর রচিত।

চন্দ্রশেখর বর্দ্ধমান জেলার কাঁদড়াগ্রামে গোবিন্দ ঠাকুরের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতার নাম পদকর্ত্তা শশিশেখর, পদাবলীর ছন্দলালিত্যে তাঁহারা দুই ভ্রাতা গোবিন্দ দাসের প্রায় সমকক্ষ ছিলেন। নায়িকারত্নমালা কীর্ত্তনগীত রত্নাবলীগ্রন্থে তাঁহাদের প্রচুর পদাবলী দৃষ্ট হয়।

চন্দ্রশেখরের নায়িকার রূপবর্ণনা, ভাব গাম্ভীর্য্যে ও রচনার পারিপাট্যে, পূর্ব্ববর্ত্তিগণ হইতে পৃথক, বিশেষতঃ কীর্ত্তন আসরে চন্দ্রশেখরের পদাবলী সুর তাল মান যোগে এক অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করে,

তুঙ্গ মণি মন্দিরে, ঘন বিজুরী সঞ্চরি,
মেঘ রুচি বসন পরিধানা,
যত যুবতী মণ্ডলী, পন্থ ইহ পেখলি
কোই নহি রাইক সমানা।
ভাবি বিহি তোহারি সুখ লাগি
রূপে গুনে সায়রি সৃজল ইহ নায়রি
ধনিরে ধণি ধন্ধ তুয়া ভাগি।

কাহে তুহু কলহ করি, কান্ত সুখ ত্যজলি
অবসে বসি রোয়সি কাহে রাধে,
মেরু সম মান করি, উলটি ফিরি বৈঠলি
নাথ যবে চরণ ধরি সাধে।

জয়দেবের গীতগোবিন্দের ছন্দের সহিত ইহার তুলনা চলে

বদসি যদি কিঞ্চিদপি, দন্তরুচি কৌমুদী
হরতি দর তিমিরমতি ঘোরং।

কলহান্তরিতায় যখন নায়কের শত অনুরোধেও দুর্জ্জয় মান ভাঙ্গিল না,

জগত জীবন কৃষ্ণ চরণ ধরিয়া
ফিরিয়া না চাহলি কি কুলিশ হিয়া।

কিন্তু বিষন্নবদনে হেটমুখে প্রাণবল্লভের কুঞ্জ হইতে প্রয়াণ করিবার পর বিরহের উচ্ছ্বাসে মানের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল।

টুটল মান ভেল বিরহ তরঙ্গ
গৃহ মাঝে বৈঠল সহচরি সঙ্গ,
কহইতে অন্তর গদগদ ভাষ,
বিমুখ হই সবে ছোড়ল পাশ।
চন্দ্রশেখর কহে অনুচিত মান,
রোয়ে তেজলি কাঁহে নাগর কাণ।

ললিত শব্দ ঝঙ্কারের মধ্য দিয়া বিরহব্যথা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে।

তাহার পরে সখীগণের ভর্ৎসনা,

শ্যামর ঝামরি, মলিন নলিন মুখ
ঝর ঝর নয়নক নীর,
পীতাম্বর গলে, পদহি লোটায়ল
হিয়া কৈছে বাধলি থির।

সখীবচন শ্রবণে রাধার এমন হইল কেন? ঐ যে স্বর্ণ-কান্তি মলিন হইল, পূর্ণচন্দ্র সমতুল বদনখানি রসহীন হইল। নয়নকমলের জলধারায় নীল শাড়ী ভিজিয়া গেল, এখন যে মান জীবন গ্রাহক হইল, মনে যত ক্রোধ হয়, তত প্রকাশ করা উচিত নহে। যাহার অদর্শনে নিমিষ কাল শতযুগ, সেই কান্তের ক্রন্দনরত বদন পানে ফিরিয়া ত' চাহিলে না? মঞ্জরী সখীর ভাবাবিষ্ট চন্দ্রশেখর বলিতেছেন, উত্তমা নায়িকার পক্ষে এ কাজ ভাল হয় নাই।

স্বর্ণবর্ণ বিবর্ণ ভই গেয়ো পুর্ণ বিধুমুখ তুর্ণ নিরমল রে।
নয়ন পঙ্কজ লোরে ভিগোয়ো, হিয়াক অম্বর রে।
মান ভেল তুয়া জীবন গাহক
নহিলে উপেখসি রসিক নায়ক
যো ভেল সো ভেল, অবহু মুগধিনী
আপনা সম্বর রে।

যতহি মন মাহা কোপ উপজত
ততহি কোপকি করিতে সমুচিত
পায়ে পরনত যোজন হয়ত
তাহে কি তাজিয়ে রে।
হিত কহইতে অহিত মানসি
সুহৃদগণে তুহুঁ বৈরী সম জানসি
অতয়ে দেখি শুনি, নীরবে রহি নহি
উত্তর দেই রে।
যামিনু যুগশত, নিমিখে হোয়ত
সো তোহে মিনতি কয়লহি কত শত
করহি করজোরি, গলহি অম্বর
ধরণী লোটায়ল রে।
ঐছে হটপুন উলটি বৈঠলি
কান্ত বদন নিতান্ত না হেরিলি
চন্দ্রশেখর ভনয়ে ভামিনী পিরিতি ভাঙ্গিলি রে।

বিরহ ব্যথায় ক্লিষ্টা সখীগণের মৃদু ভর্ৎসনায় আন্তরিকতার ও সহানুভূতির সুন্দর দ্যোতনা।

মান অবসানে—

সো মুখ চাঁদ হৃদয়ে ধরি পৈঠব
কালিন্দী বিষহ্রদনীরে।

তাহা শ্রবণে গোবিন্দদাসের সস্নেহ উক্তি

কি কহিলি কঠিনি, কালীদহে পৈঠবি
শুনইতে কাঁপই দেহা,
ঐছন বচন, কানু যব শুনব
জীবনে না বাঁধব থেহা।

এই স্থলে চন্দ্রশেখরের সখী-উক্তিতে মানের সার্থকতা

মান কয়লি তো কয়লি কলহে কাঁহে কান্দসি
বৈঠি রহ তুহু ভবনে,
সো কাঁহা যাওব, আপনি আওব,
পুনহি লোটায়ব চরণে।
সুন্দরী বচনে কয়বি বিশোয়াস,
সজল নয়নে পন্থ নেহারই চিত্রা কহল মধু পাশ।

কৃষ্ণের অন্বেষণে দূতীর যাত্রা—ভাষা ও ছন্দের স্বাভাবিক সরল গতিতে শব্দই অর্থের দ্যোতক।

জিতি কুঞ্জর, গতি মন্থর, চলত সো বর নারী
বংশী বট যাঙ্কট তট বনহি বন হেরি।

চন্দ্রশেখরের পদাবলীতে ছন্দের বিচিত্র ঝঙ্কার আছে, খণ্ডিতা নায়িকার মুখের যে উক্তি, তাহাতে বিদ্রূপের সতেজ ভঙ্গী আছে।

তরুনারুণ নয়নাম্বুজ ঢুলু ঢুলু আলসে।

কুঞ্জ ভঙ্গে নিশান্ত লীলায়—

দশ দিশ নিরমল ভেল পরকাশ,
সুখীগণ মনে ঘণ উঠয়ে তরাস
আম্রে কোকিল ডাকে, কদম্বে ময়ুর,
দাড়িম্বে বসিয়া কীর কহয়ে মধুর।
ব্রহ্মা ডালে বসি ডাকে কপোত কপোতী
তারাগণ সনে লুকায়ল তারাপতি
কুমুদিনী বদন তেজল মধুকর,
কমল নিয়রে আসি মিলিল সত্বর।

ইহা মদনমোহন তর্কালঙ্কারের "পাখীসব করে রব রাতি পোহাইল" ছন্দের ন্যায় সরল ও স্বাভাবিক।

কলহান্তরিতার

কাতরে তুয়া চরণ যুগ বেঢ়ি ভুজ পল্লবে
নাহ নিজ শপথি বহু দেল,
মিপটে কটু নাদ কোটি কঠিনি বজরা বুকি
কৈছে কর চরণ পর ঠেল।

পদে চন্দ্রশেখরের ভনিতা আছে।

কবি শশিশেখর চন্দ্রশেখরের ভ্রাতা, তাঁহার রচিত পদাবলীতে শশিশেখর, শশী, শেখর ভণিতা দৃষ্ট হয়। শশিশেখরের পদাবলী লঘু এবং দ্রুত ছন্দে লিখিত, মৃদু উপাদানের ভিতর দিয়া সুললিত ছন্দে ও মনোহর প্রকাশভঙ্গীতে শশিশেখরের গীতিকাব্য সুধীজন সমাজে সমাদৃত হইয়াছে। ইঁহার পদাবলী ব্রজবুলি ও বাংলায় রচিত। নায়িকারত্নমালা, কীর্ত্তন-গীতরত্নাবলী, কৃষ্ণপদামৃতমাধুরী গ্রন্থে শশিশেখরের পদাবলী দৃষ্ট হয়।

প্রেমাস্পদের বিচ্ছেদ বর্ণনা শশিশেখর মনোজ্ঞ ভাষা ও ছন্দে প্রকাশ করিয়াছেন।

অতি শীতল মলয়ানিল মন্দ মধুর বহনা
হরি বৈমুখ হামারি অঙ্গ মদনানলে দহনা।
কোকিলাকুল, কুহু কুহু রই অলি ঝঙ্কর কুসুমে,
হরি লালসে তনু তেজব পাওব আন জনমে,
ললিতা কোরে করি বৈঠত বিশাখা ধরে নাটিয়া
শশিশেখরে কহে গোচরে যাউত জীউ ফাটিয়া।

পদকল্পতরুর বিরাট সংগ্রহে শশিশেখরের ভণিতার কোন পদ

দৃষ্ট হয় না। সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত বৈষ্ণবদাস সঙ্কলিত পদকল্পতরুতে পদ-সংখ্যা ৩১০১। সুতরাং 'তরুনারুণ নয়নাম্বুজ, নীলোৎপল বদনমণ্ডলঝামর কাছে ভেল' প্রভৃতি ঝঙ্কারময় শব্দগুলি তৎনামে প্রচলিত থাকিলে তাহা নিশ্চয়ই পদকল্পতরুতে স্থান পাইত। কিন্তু নিমানন্দ দাসের পদরসসার ও কমলাকান্তের পদরত্নাকরে শশিশেখরের পদ পাওয়া যায়।

নিম্নে উদ্ধৃত মাথুরের শ্রেষ্ঠ গানটী শশিশেখর রচিত।

চির দিবস ভেল হরি, রহল মথুরাপুরী
অতয়ে হাম বুঝিয়ে অনুমানে।
মধু নগর যোষিতা, সবহু তারা পণ্ডিতা
বাঁধল মন সুরত রীতি দানে।
গ্রাম্য কুল বালিকা, সহজে পশু পালিকা
হাম কিয়ে শ্যাম সুখ ভোগ্যা।
রাজকুলসম্ভবা, যোরণী নর গৌরবা
যোগ্য জন্তে মিলয়ে যেন যোগ্যা।
তত দিবস জীবই নিম্ব ফল চাখই
অমিয়া ফল যাবত নাহি পাতয়ে,
অমিয়া ফল ভোজনে, উদর পরিপূরণে
নিম্ব ফল দিক নাহি ধাতয়ে।
তাবত অলি গুঞ্জরে, যাই ধুতুরা ফুলে
মালতীফুল যাবত নাহি ফুটে
রাই মুখ কাহিনী শশিশেখর শুনি শুনি
রোখে ধনি কহয়ে কিছু খুঁটে।

চন্দ্রশেখর আচার্য্য চৈতন্য মহাপ্রভুর আত্মীয়, নদীয়া লীলার অন্যতম সহচর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথীতে আচার্য্য চন্দ্রশেখরের

নিতাই কি সাধনে পাইব
শীতল চরণ-ছায়া পাইয়া
কতদিনে জুরাইব।

পদটী দৃষ্ট হয়। বৈদ্যবংশ জাত চন্দ্রশেখর নামে অপর একজন পদকর্ত্তা ছিলেন, তিনি নরহরি সরকারের শিষ্য ছিলেন, তাহার সম্বন্ধে রামগোপাল দাস নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছিল।

চন্দ্রশেখর নামে বৈদ্য আছিল খণ্ডেতে,
যার বাস্তবাড়ী খণ্ডে তেঁতো তলাতে
রসিক রায় বিগ্রহ তার সেবা অতিশয়,
স্বর্ণ ঠাকুর বলি মোগল বেড়িল আলয়,
বক্ষে রাখিল ঠাকুর তবু না ছাড়িলা,
চন্দ্রশেখর মুণ্ড মোগল কাটিল।

নিম্নে বর্ণিত পদে কবির সুনির্ম্মল প্রেমভক্তি প্রকাশ পাইয়াছে।

কপট চাতুরী চিতে, জনমন ভুলাইতে
লইয়ে তোমার নামখানি।
দাঁড়াইয়া সত্য পথে, অসত্য ত্যজিব তাথে
পরিণাম কি হবে না জানি।
চন্দ্রশেখর দাস এই মনে অভিলাষ
আর কি এমন দশা হব,
গোরা পরিষদ সঙ্গে, সঙ্কীর্ত্তন রস রঙ্গে
আনন্দে দিবস গোঙাইব।

বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের একটী বিশেষত্ব আছে। ভগবানকে অন্তরতমরূপে পাইতে হইলে সকল উপাসককেই ব্রজগোপীর ভাবের মধ্য দিয়া সাধন করিতে হইবে। এই রসতত্ত্ব বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ রূপগোস্বামী কর্ত্তৃক দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপিত।

সুতরাং চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, ও ব্রজভূমির কবি সুরদাস প্রভৃতির রচনায় ভক্ত-সুলভ বৈষ্ণবতার প্রচুর নিদর্শন থাকিলেও পরবর্ত্তী পদকর্ত্তাদিগের রচনায় সখীসুলভ সেবা-ধর্ম্মের যেরূপ স্পষ্ট নিদর্শন আছে, সেরূপ অন্য দৃষ্ট হয় না। সুতরাং পদে ঐ ভাবলক্ষণ দেখিয়া পদকর্ত্তা চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী কি পরবর্ত্তী তাহা নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে।

হে ঈশ্বর

শ্রীআশীষ গুপ্ত

শ্যামলী সুনন্দর শৈশবের বন্ধু। সংসারে বন্ধু কথাটার অপব্যবহার নানাদিক্ দিয়া বহুবার হইয়াছে, অতএব আর একটি উদাহরণ এইখানে যোগ করা হইল কি না ঠিক বুঝিতেছি না। সুনন্দর বয়স যখন ছিল পাঁচ এবং শ্যামলীর তিন তখন তাহারা ছিল দুইখানা পাশাপাশি ভবনের অধিবাসী। কিন্তু পাশাপাশি ভবনের অধিবাসী হইলেই লোকে অকস্মাৎ বন্ধু হইয়া যায় না, সত্যকার বন্ধুত্ব যে কখন কেমন করিয়া গড়িয়া ওঠে সে এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য এবং সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিপদ এই যে অন্য আরও দশটা রহস্যের ন্যায় এই বস্তুটি পথে, ঘাটে, প্রান্তরে দিবারাত্র মেলে। যে জিনিষ হাতের কাছে নিরন্তর পাওয়া যায়, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে তাহাদের সম্বন্ধে জটিলতাই সব চেয়ে কঠিন হইয়া ওঠে। সেজন্যই বুদ্ধিমান ব্যক্তি ওসকল বস্তু লইয়া মাথা ঘামাইতে সহজে রাজী হন না,—তবু পথে, প্রান্তরের সৌহার্দ্দ লইয়া আমরা সংশয় প্রকাশ করিয়া থাকি, এমনই আমাদের স্বভাব।

কিন্তু যাক্ সে কথা। মোটের উপর শ্যামলী সুনন্দর বন্ধু। লোকে বলে শৈশবের বন্ধু, এবং যেহেতু শৈশবের বন্ধু সেহেতু শুধু যে সে বন্ধুত্ব আন্তরিকতায় পূর্ণ তাই নয়, সে পরমসুলভ সামগ্রীটি টেঁকসইও বটে। কিন্তু শ্যামলী সুনন্দর বহুকালের সখী। আজ শ্যামলী বড় হইয়াছে পুত্রকন্যার জননী শ্যামলী আজ ষষ্ঠীবুড়ী সাজিয়াছে—লোকে বলে ষষ্ঠীবুড়ী, শ্যামলীর অসাক্ষাতে বলে, কারণ শ্যামলীর রসনা তীব্র এবং ক্ষুরধার, কলাসম্মতরূপে তীব্র, কলাসম্মতরূপে ক্ষুরধার। শ্যামলী আধুনিকা এবং শ্যামলী ষষ্ঠীবুড়ী, সুনন্দর শৈশবের বন্ধু রূপসী শ্যামলী।

বিজয়ের বিবাহের নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া অনেকদিন পরে অকস্মাৎ শ্যামলীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়া গেল। বিজয় লোকটি একটু বেশীমাত্রায় সাহসীগোছের, ঢাক পিটাইয়া সহরের লোককে জানাইয়া বেড়ায় পৃথিবীতে যাহারা নিপীড়িত হইল, যাহারা দুঃখ পাইল, যাহারা দুঃস্থ যাহারা রিক্ত, যাহারা বঞ্চিত তাহাদের কথা চিন্তা করিয়া আর তাহার স্বস্তি নাই। এই কথা বলাতেই বিজয়ের আনন্দ, ইহার চেয়ে অধিকতর মহত্ত্বের ও সাহসিকতার উক্তি সে কল্পনা করিতে পারে না।—যদি পারিত তাহা হইলে প্রতি রবিবার যখন সে পেট্রোল খরচ করিয়া শ্যামবাজার হইতে খিদিরপুর তাহার বন্ধু দেবেন্দ্রের গৃহে উপস্থিত হইয়া এই কথা বারংবার উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিত তখন বাকী কথাগুলাও প্রচার করিতে তাহার সদম্ভ গর্জ্জনের অবধি থাকিত না।

বিজয় সুনন্দকে ঘৃণা করে; ঘৃণা করে সুনন্দ জীবনে কিছু করিতে পারিল না বলিয়া, ঘৃণা করে তাহার মিথ্যা কথা কাহার হেরম্ব মৈত্রোচিত অক্ষমতার জন্য। বিজয়ের বিশ্বাস সুনন্দর ন্যায় এমনতর পূর্ণবয়স্ক শিশু সে আর দেখে নাই। সুনন্দর বসনভূষণের একান্ত দৈন্য, সুনন্দর আহার্য্য বস্তুর স্বল্পতা—পথের ধারের গাছতলায় সুনন্দ খালি গায়ে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বিশ্রাম করে, বিজয় তখন তাহার জাহাজের মাল-খালাসের অফিসে এয়ার-কন্‌ডিশান্‌ড্ ঘরে বসিয়া কাজে নিযুক্ত—বিজয় ষ্টিভেডোর, সুনন্দ চিরন্তন পথচারী।

খিদিরপুরের দেবেন বলিল, "বিজয়ের সত্যিকার সাহস আছে,—অত বড় বড় লোক, সাহেবসুবাদের মধ্যে আসবে একটা নেংটা ফকির, যেমন চেহারা, তেমনই গোঁয়ারের মত কথাবার্ত্তা, ছোটলোকের মত চালচলন, এক বছরের উপোসী রাস্তার ভিখারী—চট পরে' আসবে কি ছেঁড়া নেংটি পরে' আসবে তার ঠিক নেই,—এক মুখ দাড়ি,—নাঃ, বিজয়ের মনে মুখে দুই নেই।"

সুনন্দ নিমন্ত্রণ পাইল। নিমন্ত্রণ পাইলে সুনন্দ ছাড়িবার পাত্র নয়। বিশ্রী নোংরা একটা কাপড় পরিয়া সুনন্দ বোকার মত খানিকটা হাসিল, অমিতাকে ডাকিয়া বলিল, "একটা ন্যাকড়া দে ত। আমি, তোদের জন্যেও কিছু বেঁধে নিয়ে আসব—"

প্রত্যুত্তরে অমিতা চোখ তুলিয়া দাদার দিকে চাহিয়া রহিল। আষাঢ়ের মেঘে যখন আকাশ স্নিগ্ধ হইয়া আসে, যখন আর আশঙ্কা থাকে না, সংশয় থাকে না, চিন্তা থাকে না, শুধু নির্ভয়ে বলা চলে ব্যাকুল, নভঃতল ভাঙিয়া এইবার বৃষ্টি

নামিবে, ইহার জন্ম আমার সর্ব্বস্ব পণ রাখিতে পারি, তেমনি-তর অমিতার কাজলকালো চোখের দিকে চাহিয়াও সুনন্দর সন্দেহ রহিল না যে, ওই নয়নের কোণে জলভরা মেঘ দেখা দিয়াছে, ঝরিয়া পড়িল বলিয়া।

অমিতা নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল,—সুনন্দ বলিল, "তুই একটা বোকা, তুই একটা গাধা,—রুমাল এনে দে অমি, বোকামি করিসনে, এমনি করেই পৃথিবীতে লোকে আহার সংগ্রহ করে, এতে লজ্জা নেই, অগৌরব নেই।"

চোখের জল গোপন করার জন্যই বোধ হয় এবার অমিতা মুখ ফিরাইল।

সুনন্দ কহিল, "তবে তুই থাক মুখপুড়ী শুঁটকি দিয়ে, কেমন লুচি খেতিস, রসগোল্লা খেতিস, তা তোর সইবে কেন!" বলিয়া সে দ্রুতপদে স্থান ত্যাগ করিল।

নিমন্ত্রণবাড়ীতে দেখা হইল শ্যামলীর সহিত। মোটর হইতে শ্রীমতী শ্যামলী প্রচুর পরিমাণে হীরা, জহরৎ ও সোনা বহন করিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতেছিলেন, প্রবেশপথের ঠিক সম্মুখেই সুনন্দ তাহার মুখের সঞ্চিত গুম্ফ শ্মশ্রু তাহার দেহের অসঞ্চিত মেদমাংস লইয়া দণ্ডায়মান ছিল। শ্যামলী অকস্মাৎ সেদিকে তাকাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। বাক্‌রুদ্ধ অবস্থায় বিপুল বিস্ময়ের ভঙ্গীতে সে কিয়ৎক্ষণ সুনন্দর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—সুনন্দর মুখের একটা মাংসপেশীও কুঞ্চিত হইল না, বর্ণহীন কণ্ঠে সে বলিল, "শ্যামলী গীগ্‌গির কি নিজের ওজন নিয়েছিলে?"

শ্যামলী কহিল, "নন্দদা না?"

"হাঁ। তিনিই পয়সা নেই বলে দাড়িগোঁফ কামাতে পায়েন নি—"

শ্যামলী বলিল, "ঘণ্টা দুয়েক পরে এসে একবার আমার খোঁজ কোরো নন্দদা, বোলো মিসেস চৌধুরী, মিসেস বি, বি, চৌধুরী, তাঁর সঙ্গে তুমি দেখা করতে চাও। বোলো মিসেস বি, বি, চৌধুরী—" বলিতে বলিতে সে গৃহাভ্যন্তরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সুনন্দ কহিল, বেশ উঁচু গলাতেই কহিল, "বিজয় মহাত্মা লোক, শ্যামলী, অতএব আমারও নিমন্ত্রণ হ'য়েছে।—তোমার সঙ্গে দেখা না করে' আমি এখান থেকে নড়ছিনে—"

শ্যামলী শুনিতে পাইল কি না ঠিক বুঝা গেল না।

নিমন্ত্রণগৃহে প্রবেশ করিয়া অনেক পরিচিত মুখ সুনন্দর চোখে পড়িল। মুখই দেখা গেল, দাড়ি নয়। তাহাদের পয়সা আছে, দাড়ি কামাইয়াছে। দু'-একজন যে দাড়ি রাখে নাই তা নয়, কিন্তু তাহারা দস্তুরমত দাড়ির চাষ করিয়াছে, কেয়ারি করা দাড়ি, খরচ পরিয়াছে অনেক,—সে সব দাড়ির টাইপই আলাদা।

সুনন্দর সহিত কেহ কথা কহিল না। সে যেখানে বসিল তাহার কাছ হইতে সকলে সরিয়া বসিয়া তাহাকে একটি অসামান্যতা দান করিল।

প্রফুল্লর চেহারা একটু রুক্ষ ধরণের, অবস্থাও যে খুব ভালো তা নয়, তবুও সে আঁটসাট সিল্কের পাঞ্জাবী পরিয়া আসিয়াছে, হাত ঘড়িও একটা চাহিয়া আনিয়াছে কাহার না কাহার কাছ হইতে। এই সব ধার করা ময়ূরের পালকে সজ্জিত হইয়া সুনন্দর নিকট হইতে যথাসম্ভব দূরে সরিয়া গিয়া তাহার বন্ধুবর্গের ভিড়ের মধ্যে বসিয়া প্রফুল্ল ঘর্ম্মাপ্লুত হইতেছিল। বুদ্ধিমান সুনন্দ পাখাটার ঠিক নীচে বসিয়া বাকী লোকগুলাকে নিষ্ঠুরভাবে জব্দ করিয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন সে স্কুলে পড়িত তখন প্রফুল্লর সহিত তাহার অন্তরঙ্গতা ছিল নিবিড়। কিন্তু সে অনেকদিন পূর্ব্বের কথা।

সুনন্দ প্রফুল্লকে ডাকিয়া বলিল, "ভাই প্রফুল্ল, জামাকাপড় ভাড়ার দরুণ পয়সাও কিছু ধার থাকবে, অথচ ঘেমেও মরছ। আমার মতন দাড়িগোঁফ রেখে নিজের কাপড়চোপড় পরে' এলে, কেমন আমার পাশে বসেই হাওয়া খেতে পারতে —

প্রফুল্ল হিংস্রদৃষ্টিতে সুনন্দর দিকে তাকাইল, দেবেন্দ্র তীব্র কণ্ঠস্বরে চাপা গলায় বলিল, "চাষা—"

খুশী হইয়া সুনন্দ নিজের খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলাইতে লাগিল।

খাওয়ার ডাক পড়িল, ছাদে আসন হইয়াছে। বিজয়ের বন্ধুবর্গের স্থান কিন্তু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে অন্দরমহলের শয়নকক্ষে। সুনন্দ অগ্রসর হইয়া সেই দলের সহিত মিশিয়া গেল।

প্রকাণ্ড ঘর, কালো সাদা পাথরের মেঝে, আয়নার মত ঝক্‌ঝকে, বরফের ন্যায় মসৃণ। দেয়ালের গায়ে গায়ে আলমারী, মাথার উপরে বিচিত্র দোদুল্যমান আধারে ইলেকট্রিকের আলো, ঘরের একধারে দক্ষিণ দিকের জানালার গা ঘেঁসিয়া পালঙ্ক, দুগ্ধফেননিভ শয্যা, ঝালর-দেওয়া রেশমের মশারি, জানালার উপরে বিলাতী ল্যাণ্ডস্কেপ ও মেমসাহেবের ছবি।

সমস্ত ঘর জুড়িয়া খাওয়ার জায়গা করা হইয়াছে। দেবেন্দ্র বসিল খাটের গা ঘেঁসিয়া, সুনন্দ ঠিক তাহার পাশে গিয়া বসিল। দেবেন্দ্র সুনন্দকে লক্ষ্য করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিল, তৎপরে নিজের বসিবার আসনটা সুনন্দর নিকট হইতে কিছু দূরে সরাইয়া লইল। সুনন্দ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল,—দেবেন্দ্র সুনন্দর নিকট হইতে সরিয়া প্রায় দেয়ালঠেসা হইয়াছিল,—বক্রদৃষ্টিতে সেইদিকে তাকাইয়া সুনন্দ নিজের আসনখানা দেবেন্দ্রের নিকটতর করিয়া লইল, ঝালর-দেওয়া মশারির একটা অংশ টানিয়া দেবেন্দ্রের পিঠে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর আঘাত দিয়া বলিল, দেবেনবাবুমশাই, এই সিল্কের গজ কত করে'? আমাদের বাড়ীর পালঙ্কে লাগাব—"

রুদ্ধ রোষে দেবেন্দ্রের গলা দিয়া ঘরঘর করিয়া একটা শব্দ বাহির হইল মাত্র, দাঁতে দাঁত ঘসিয়া সে কহিল, "ইডিয়াট—"

সুনন্দর উপস্থিতিতে সমস্ত ঘরের উৎসব যেন মলিন হইয়া গেছে। সে না থাকিলে যেন অনেক কিছু হইতে পারিত, কত হাসিঠাট্টা, কত বাক্যোচ্ছ্বাস, কত কি! সুনন্দ যেন সেই ঘরের মধ্যে অপরূপসুন্দর দেহে দূষিত ক্ষতের ন্যায় আবির্ভূত হইল। চারি দিকে চাহিয়া ঘটনাটা সম্যক উপলব্ধি করিতে সুনন্দর বিলম্ব হইল না,—চিত্ত তাঁহার প্রসন্ন হইয়া উঠিল, কিন্তু সে প্রসন্নতাকে তিক্ত আখ্যা দেওয়া চলে। বাহিরের দৃষ্টি ভিতরের দিকে ফিরাইয়া সে ভাবিতে লাগিল,—এই তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল মানবসঙ্ঘ, গড্ডলিকাপ্রবাহের স্বল্পপ্রাণ মেষশাবক,—ইহাদিগকে ঘৃণা করিবে কি অনুকম্পা করিবে তাহা যেন সে স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

খাওয়া শেষ হইয়া আসিয়াছিল। নিজের আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইবার পূর্ব্বে একজন পরিবেশককে উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিয়া সুনন্দ কহিল, "ওহে, পাঁপড় ভাজা লুচি থেকে আরম্ভ করে' সব রকমের খাবার দু'তিন জনের মত নিয়ে এস ত, বাড়ী নিয়ে যাব—" বলিয়া সে অপরিচ্ছন্ন বস্ত্রের কোঁচার প্রান্তভাগ মেলিয়া ধরিল। অসহ্য লজ্জায় অভ্যাগত নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, পরিবেশক নূতন করিয়া খাদ্যসামগ্রী আনিতে গেল।

কাপড়ের কোণে খাবার বাঁধিয়া সুনন্দ আসিয়া বারান্দার মাথায় দাঁড়াইল। কোথাকার এক ক্লান্তি, কোথাকার এক বিষাদখিন্নতা মন জুড়িয়া আছে, দীর্ঘ দিবসের উত্তেজনার শেষে সুনন্দর মনে যেন অবসাদ। বসনপ্রান্তের আহার্য্যের দিকে চাহিয়া চোখ জ্বালা করে, মনে হয়, এ শ্রান্তি দুর্জ্জয়, এ ভার দুর্ব্বহ, এ লজ্জা অসহনীয়। কিন্তু কিসের দুঃখ? কোথায় মানুষের মর্য্যাদাবোধ? আজ সারা বিশ্বে যদি এ হীনতার অভিনয়, দীনতার লীলা চলিয়াই থাকে তাহা হইলে সুনন্দ কেন একটা নোংরামির মুখোস আঁটিয়া বেড়াইতে পারিবে না?—বারান্দায় দাঁড়াইয়া নীচের উঠানের দিকে চাহিতেই সুনন্দ দেখিল, ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল রং-বেরং-এর পোষাক পরিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে। শ্রান্ত দৃষ্টিতে তাহাদের পানে চাহিয়া নিজের মনেই সুনন্দ কহিল, আগামী কালের মানব-মানবী, জীবনের হিসাব-নিকাশে আমি বাজে খরচ, কিন্তু তোমাদের জন্য আমি ভবিষ্যতের পথ সুগম করিয়া যাইব—"

বারান্দা দিয়া অন্দর-মহলের দিকে একজন দাসী যাইতেছিল। সুনন্দ তাহাকে ডাকিয়া কহিল, "দেখ, ভিতরে গিয়ে বল, মিসেস বি, বি, চৌধুরীর সঙ্গে সুনন্দ রায় দেখা করতে চান—"

দাসী সুনন্দর দাড়ির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে অদৃশ্য হইল। সেখানে দাঁড়াইয়া আধঘণ্টা কাটিয়া গেল, দাসীর আর দেখা নাই। সুনন্দ বুঝিল, দাসী সুনন্দর দাড়ির মর্য্যাদা বুঝিয়াছে, সে আর দেখা দিবে না।—সুনন্দ নামিয়া গিয়া গেটের কাছে দাঁড়াইল। শ্যামলী নামিয়াছিল একটা ক্রীম রং-এর ডেম্‌লার গাড়ী হইতে। সুনন্দ রাস্তার ধারের লাইনবন্দী গাড়ীর মধ্য হইতে সেই গাড়ীখানাকে বাহির

করিল, ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করিল, "এটা মিসেস বি, বি, চৌধুরীর গাড়ী ?"

প্রশ্ন শুনিয়া ড্রাইভার রূঢ়ভাবে প্রতিপ্রশ্ন করিল, "সে খবরে তোমার কি দরকার ?"

সুনন্দ বলিল, "বুঝেছি, তুমিও প্রফুল্ল-দেবেন পন্থী লোক! কিন্তু কুছ্ পরোয়া নেই, চালাকি আমিও জানি। দেখ বাপু, আমি হলাম দরজী, মেমসাহেবের কাছে একটা খবর পাঠাতে হবে যে আমি এসেছি। মেমসাহেবের কতকগুলো জরুরী কাজ আছে, কালই চাই।—আমাদের দোকান থেকেই সেগুলো উনি করিয়ে নিতে চান। তাড়াতাড়ি আছে বলে' আমাকে এখানে এসেই ওঁর সঙ্গে দেখা করে' চেনে যেতে বলেছিলেন। যাও, তাড়াতাড়ি যাও, মেমসাহেবকে খবর দাও যে দরজী সুনন্দ রায় এসে পৌঁছেছে—"

মেমসাহেবের দরজী শুনিয়া ড্রাইভারটা বিস্মিত হইলেও আর আপত্তি করিল না।—তাহার মত লোকও জানে পোষাক পরিচ্ছদ সংক্রান্ত কোন আলোচনায় যোগদান করিতে যেদিন মেমসাহেব আপত্তি করিবেন, সেদিন আর তাঁহার জীবনধারণের কোন অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

অন্দরমহলে যেখানে নারীবাহিনীর কলগুঞ্জন সেখানে দাসীর মুখে সংবাদ গেল, দরজী সুনন্দ রায় মিসেস বি, বি, চৌধুরীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়। মহিলাসঙ্ঘ চমকিত হইয়া উঠিল, শ্যামলী বুঝিতে পারিল যে তাহাদের প্রত্যেকেই এক একটির জিজ্ঞাসার চিহ্নে রূপান্তরিত হইয়া গেছে। শ্যামলী নিজেও কম বিস্মিত হয় নাই, কিন্তু সে কহিল, "কাল আবার শ্বশুর হরিদাসের গার্ডেন পার্টির হাঙ্গামা আছে, তাই দরজীটাকে আসতে বলেছিলাম এখানে, কয়েকটা কথা বলে' দেব বলে'। ঝি, যাও ত এদিককার বারান্দায় ডেকে নিয়ে এস ত দরজীকে—"

ঝি চলিয়া গেলে নমিতা শান্তার দিকে চাহিল,—নমিতার ঠোঁটের কোণে হাসি, শান্তার নয়নপ্রান্তে বিদ্যুৎ—সে সবের অনেক কিছু অর্থ হইতে পারে। নমিতা বলিল, "দরজীর নাম সুনন্দ রায়! বেশ ইণ্টারেষ্টিং কিন্তু, নয় ?"

চোখ টিপিয়া শান্তা বলিল, "নিশ্চয়—"

শ্যামলী একবার মুখ ফিরাইয়া ঘরের আবহাওয়াটা বুঝিয়া লইল, নমিতাকে উদ্দেশ করিয়া কৌতুকস্মিত কণ্ঠে কহিল, "সুনন্দ রায় নামের দরজীর কথা শুনে তোমরা বিস্মিত হ'য়েছ দেখছি,—কি দেখলে তোমরা খুশী হ'তে ? ব্যারিষ্টার, না এঞ্জিনীয়ার, না গ্লোরিফায়েড্ গাভর্ণমেণ্ট ক্লার্ক ?" বলিয়া সে মৃদু হাসিল।

"কিন্তু সদাশিব নাম ত তোমরা পছন্দ কর না জানি, অথচ ইন্‌কাম-ট্যাক্সের দেড়-হাজারী অফিসার দেখলাম যে ওই নামের সেদিন—"

বলিয়া শ্যামলী সপ্রশ্নদৃষ্টিতে নমিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।—কাঁধের উপরকার ব্রোচটা আঁটিয়া দেওয়ার জন্য নমিতা মুখ নামাইল।—সদাশিব মুখোপাধ্যায় ইন্‌কাম-ট্যাক্স বিভাগে বড় চাকরি করেন। কিছুকাল পূর্বে নমিতা গঙ্গোপাধ্যায় নামের একটি মেয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। যেরূপেই হউক এ সংবাদ নমিতার অজ্ঞাত ছিল না।

শ্যামলী কহিল, "নমিতা, খবরটা জান দেখছি তাহ'লে! অতএব বুঝতে পারছ খুকীরা, এমন উল্টো-পাল্টা ব্যাপার সংসারে নিত্য ঘটে থাকে।"

ঝি আসিয়া কহিল,—"সুনন্দ রায় বারান্দায় অপেক্ষা করিতেছে,—শ্যামলী বাহির হইয়া আসিল। দরজার পিছনে কয়েক জোড়া হরিণ-নয়ন যে দরজী সুনন্দ রায়কে দেখিবার জন্য পলক ফেলিবার অবকাশ পাইল না সে সংবাদ শ্যামলীর অজ্ঞাত রহিল না। শ্যামলী কণ্ঠস্বর নীচু করিয়া সুনন্দকে কহিল, "তুমি একটু গাড়ীর কাছে গিয়ে দাঁড়াও নন্দদা, আমার খাওয়া হ'য়ে গিয়েছে, আর বেশী দেরী হ'বে না।—গাড়ীর কাছে থেকো কিন্তু, চলে' যেয়ো না যেন, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে, নন্দদা—"

সুনন্দ কহিল, "কিন্তু আমি তোমাকে ঠকাতে চাইনে শ্যামলী, তোমার সে নন্দদা আর নেই। আমায় এবাড়ীতে বিজয় নিমন্ত্রণ করেছিল তার বন্ধুবান্ধবদের কাছে সৎসাহস দেখাবার জন্যে। লোকে আমায় আজকাল সাহস দেখানোর উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোন-কিছুর জন্যে নিমন্ত্রণ করে না। আমি এখন একশ' তালি-দেওয়া কাপড় পরি, পথ পর্যটন করি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, the Wandering Jew।"

বলিয়া সে এক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল, পরে কহিল, "লুচি নিয়ে যাচ্ছি কোঁচায় বেঁধে—"

সুনন্দ নীরসভাবে হাসিতে লাগিল।—"লুচি নিয়ে যাচ্ছি অমিতার জন্যে—আমার বোন অমিতা—তাকে তোমার মনে আছে শ্যামলী ?"

"আছে—"

শ্যামলী কি যেন একটা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল, পরীক্ষার ছাত্র যেমন করিয়া দুর্বোধ্য পাঠের 'পরে সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া বসিয়া থাকে, শ্যামলী তেমনই একাগ্রভাবে সুনন্দর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, যেন সে মুখের একটি রেখাও তাহার দৃষ্টি না অতিক্রম করিয়া যায় সেদিকে শ্যামলীর মন রহিল জাগ্রত। সুনন্দকে ভুল বুঝিলে যেন একটা গুরুতর অপরাধ হইবে, সে ত্রুটি সংশোধনের যেন আর উপায় থাকিবে না। বহুকাল পরে পথের ধারে হারানো রতন যদি বা খুঁজিয়া পাওয়া গেল, তাহা হইলে তাহার উপরকার নগণ্য ধূলাবালিগুলা শ্যামলী যেন ধুইয়া লইতে পারে। বাহিরের মাটি দেখিয়া শ্যামলী যেন ভিতরের মণিমাণিক্যের বিচার না করিয়া বসে।

সুনন্দ কহিল, "অনেক দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল শ্যামলী,—আমার মন আজ বিক্ষিপ্ত, কাউকে আমি প্রবঞ্চনা করতে চাইনে, কিন্তু তাই বলে দুঃসাহস দেখাবার জন্যে তুমি যে আমাকে তোমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করবে সেটাও আমি আজ আর সইতে পারব না। তাই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয় তাহ'লে আমি চললাম। পথের কুকুর তোমার অনেক মিলবে শ্যামলী, তাদের সবাইকে ডেকে ভুক্তাবশিষ্ট রাজভোগগুলো বেঁধে-ছেঁদে দিতে বোলো তোমার দাসদাসীদের,—তোমার নামে জয়জয়কার পড়ে যাবে। আমায় তুমি ক্ষমা কোরো শ্যামলী,—প্রার্থনা করি লক্ষ্মীঠাকরুণ তোমার গৃহের হীরাজহরৎসোনার ওজন কাবুলিওয়ালার সুদের অনুপাতে বর্দ্ধিত করুন।"

বলিতে বলিতে সুনন্দ সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল। ত্রস্তভাবে শ্যামলী কহিল, "দুঃসাহসের কথা নয় নন্দদা, বাস্তবিক তোমাকে আমার দরকার আছে। তুমি যেয়ো না যেন, আমি এখুনি আস্‌ছি।"

বলিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া শ্যামলী বলিয়া গেল, "অপেক্ষা কোরো, চলে যেয়ো না কিন্তু নন্দদা—"

সুনন্দর পোষাক পরিচ্ছদ এবং আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া সে যে নিশ্চয়ই ভদ্রলোক নয় তৎসম্বন্ধে নারীবাহিনীর কাহারও সন্দেহ ছিল না, অতএব সুনন্দ আসিয়া পৌছানো মাত্র তাহার দিকে নিমেষের তরে চাহিয়াই মহিলাবৃন্দ বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্যামলীকে আর বেশী সময়ের অপব্যবহার করিতে হইল না। সকলের নিকট বিদায় লইতে তাহার যেটুকু বিলম্ব হইল শ্যামলী তাহার চেয়ে একমুহূর্ত্ত বেশী সময় লইল না।

সুনন্দ পথে আসিয়া প্রবেশদ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইল। দিবসের কোলাহলের শেষে তাহার কুল মিলিয়াছে। সারাদিন ধরিয়া তিক্ততার সীমা ছিল না, এখন দিবসের তরঙ্গ হইয়া গেছে শান্ত, কোন চিন্তা আর মস্তককে স্পর্শ করিতে চায় না,—কোন ছোট কথা নয়, কোন বড় আশা নয়, শূন্য মন লইয়া নিরর্থক বসিয়া বসিয়া আজিকার রজনী সুনন্দ কাটাইয়া দিতে চায়।—

বাড়ীর ভিতর হইতে অশ্রান্তভাবে নরনারী বাহির হইয়া যাইতেছে, বিচিত্র বেশভূষার দীপালি উৎসব চলিতেছে চোখের সম্মুখে। কোন রকম তুলনা করিতেও ঘৃণা বোধ হয়,—কোথায় কোন্ দুঃখ, কোথায় কোন্ গ্লানি, কোথায় মানুষের বড় মন ছোট হইয়া গেল, কোথায় কাহার ছোট মন সঙ্কুচিত হইয়া নিঃশেষ হইয়া গেল, কোন্ অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তি আজ এই গৃহদ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার উল্লেখ করিবে, যে দ্বারপ্রান্তে আলোর উৎসব, যে গৃহে সঙ্গীতের মাধুরী, লক্ষ রৌপ্যমুদ্রার ঐশ্বর্য্যের সমাবেশ!—সুনন্দ কিছু ভাবিতে পারে না, ভাবিতে চায়ও না। সে শুধু জানে তাড়াতাড়ি করিয়া বাড়ী ফিরিতে হইবে, অমিতা এবং অন্যান্য ছেলেমেয়েদের জন্য সে লুচি বন্দী করিয়া লইয়া চলিয়াছে, অতএব বিলম্ব করিলে চলিবে না। সংসারের সকল প্রশ্নের শেষে যে সত্যটুকুর সন্ধান সুনন্দ পাইয়াছে, তাহা ওই লুচি সন্দেশের মধ্যে যেন পরম যত্নে স্থান লাভ করিল,—সুনন্দর দার্শনিকতার মূল্য আজ মিলিল হয় ত'।

সুনন্দ আসিয়া শ্যামলীর মোটরের সম্মুখে দাঁড়াইল।

শ্যামলীর ড্রাইভার সুনন্দর মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, তাহার চোখে, তারার ভঙ্গীতে অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা। —সুনন্দ গ্রাহ্য করে না, পৃথিবীতে সে কিই বা গ্রাহ্য করে!

শ্যামলী আসিয়া পৌছিল। ড্রাইভার খুলিয়া দিল গাড়ীর দরজা, কি তার ভক্তি! কি তার সমারোহ!

শ্যামলী কহিল, "নন্দদা, ওঠ—"

সুনন্দ বলিল,—ক্লান্ত, বেদনার্ত্ত সে স্বর, সারাদিনের পরিশ্রমের শেষে এক অভিশপ্ত নিঃসঙ্গ মানব কাহার কোলে মাথা রাখিবে তাহারই জন্য যেন কাঁদিয়া মরিতেছে—"শ্যামলী, আজ তোমার বাড়ী যাব না,—কোথায় তোমার বাড়ী, ঠিকানা দাও, কাল যাব, নিশ্চয় যাব। আজ আমি বড় ক্লান্ত আর তা ছাড়া আজ আমাকে তাড়াতাড়ি করে' এই খাবারগুলো বাড়ী নিয়ে যেতে হবে ছেলেমেয়েদের জন্যে—"

শৈশবের সেই সুনন্দকে শ্যামলীর মনে পড়িল, হারাইয়া-যাওয়া বিড়ালছানার শোকে যে সাত দিন অন্নজল গ্রহণ করে নাই। শ্যামলী কহিল, "সত্যিই যাবে না নন্দদা?"

"না—"

"তবে কালই যেয়ো, কিন্তু কথা দাও নিশ্চয় যাবে—"

"হাঁ, যাব।"

"তবে তাই যেয়ো, নিশ্চয় যেয়ো কিন্তু।"—নিজের বাড়ীর ঠিকানা বলিয়া দিয়া শ্যামলী গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

সুনন্দ যেন অপ্রত্যাশিতভাবে রেহাই পাইয়া গেল। আজ আর কোন চিন্তা নাই, পৃথিবীর কোন প্রশ্ন আজ আর সুনন্দর মনে উদিত হইবে না। এইবার পরম স্বস্তিতে গৃহে ফেরা চলিবে।

সুনন্দ বাড়ী ফিরিল। রাত্রি গভীর হইয়াছে, অন্ধকার ঘরে ছেলেমেয়েদের কোলাহল নীরব হইয়া গেছে, বড়র দল তখনও জাগিয়া বসিয়া আছে,—তাহাদেরই কথাবার্ত্তার মৃদু গুঞ্জন।

অমিতা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সুনন্দ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, "অমু, তোমাদের খাবার নাও ভাই। অনেক কষ্ট করে' এ জিনিষ নিয়ে আসতে হ'য়েছে। কোন রকম মিথ্যে আত্মসম্মান অথবা লোকঠকান বড় কথার মোহে পড়ে' যদি তোমরা এ খাবারের সদ্ব্যবহার না কর, তাহলে আমায় বোলো, আমি সবার অগোচরে এ জিনিষ প্রফুল্ল, দেবেন, রমনী অথবা ওই দলের অন্য যাকে হ'ক দিয়ে আসব। বাইরের কেউ না জানলে এমন দুর্ল্লভ খাদ্যসামগ্রী পরমানন্দে গ্রহণ করতে তাদের আটকাবে না।"

উত্তরে অমিতা কোন কথা কহিল না। প্রভাবতীকে সুনন্দ কহিল, "মা, অমির রকম দেখে মনে হচ্ছে, ও হয় ত এ খাবারের এক কণাও মুখে দেবে না। তা ভালোই হ'ল, ছেলেমেয়েগুলোর ভাগে একটু বেশী পড়বে'খন। আর যদি সবাইকে দিয়েও কিছু বাকী থাকে, তাহলে আমিই খাব। কিন্তু, তুমি এ খাবারটা ভালো করে ঢাকা দিয়ে রাখ মা, ইঁদুরে না খায়—"

চারিদিক নিস্তব্ধ, ঘরের ভিতরের কেহও কথা কহিল না।—হঠাৎ সুনন্দ হাসিয়া উঠিল, "নাঃ, তোমাদের এখনও অনেক দেরী। রাস্তায় বেরিয়ে পৃথিবীর মানুষের অন্তরের মুখোমুখি না দাঁড়ালে, মধ্যাহ্ন সূর্য্যকে মাথায় করে' তারই দীপ্ত আলোতে মানুষের হৃদয়ের দগদগে চেহারা না দেখলে এ জিনিষ বোঝা যায় না।—ভাই অমিতা, তোকে আমি দোষ দিচ্ছিনে, কিন্তু এত কষ্টের সামগ্রী একটা ঠুনকো ভাববিলাসের জন্যে রাস্তায় ফেলে দিতেও তাই বলে আমি পারব না।" বলিয়া নিজেই একটা পাত্র জোগাড় করিয়া ঘরের এক কোণে খাবারগুলা ঢাকা দিয়া রাখিল। জামা ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, "প্রফুল্ল কিংবা দেবেনকে দিয়ে আসতে পারি, কিন্তু সেটা কুকুর বেড়ালকে খাওয়ানোর চেয়েও খারাপ ব্যাপার হবে, হবে আঁস্তাকুড়ে বিসর্জ্জন—"

অমিতা খোলা জানালার মধ্য দিয়া গলির ভিতরকার গ্যাসের আলোর দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া কি দেখিতে লাগিল সে-ই জানে। ওই ক্ষীণ রশ্মিটুকুকে সূত্র করিয়া সে যেন প্রদীপ্ততর কিরণের সন্ধান করিতেছিল। দুই চোখ তাহার জলে ভরিয়া গেল, মনে মনে সে দাদার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল,—সহসা যেন অমিতা অত্যন্ত ভয় পাইয়া গেছে! —সুনন্দর জন্য অমিতার প্রার্থনা জ্যোতিষ্মান্ রাজপথের প্রার্থনা, সত্য ও সুন্দরের যে লক্ষ্য ধ্রুব তাহারই প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠার প্রার্থনা। বেপমান হৃদয়ে সাশ্রুনয়নে অমিতা ভাইয়ের জন্য প্রার্থনা করিল, "হে ঈশ্বর—"

হিন্দু-মুসলমান

শ্রীশোভা দেবী

ভারতের বীর পুত্র জাগ দোঁহে হিন্দু-মুসলমান,
অন্তরে দীপ্ত শিখা ক'রে দিক্ পথের সন্ধান।
ভুলে যাও শত দ্বেষা-দ্বেষি
আভিজাত্য, অহঙ্কার, স্বার্থ ল'য়ে
কেন রেশারেশি?
মন্দির-মসজিদে ল'য়ে কেন কর ভেদ,
কিসের বিচ্ছেদ?
হানাহানি টানাটানি ধর্ম্মকর্ম্ম ল'য়ে
নিজ দেশে কেন ফের বৃথা দিগ্বিজয়ে।
পিছনে হাসিছে শত্রু
করতালি দেয় ঘন ঘন
তবু নাহি শোন—
স্বদেশের ভুলিয়া কল্যাণ
কি নেশায় হারায়েছ জ্ঞান?
জমা আছে অতীতে যে পাপ
সে স্মৃতি যে সর্প হ'য়ে
নিরন্তর দেয় অভিশাপ।
প্রায়শ্চিত্ত কর আজি গরলে অমৃত করি' পান
সর্ব্ব দুঃখ হবে অবসান।
অন্ধকারে ঢেকে গেছে দিক্
জননীর ক্লান্ত আঁখি
দোঁহা পানে রহে অনিমিখ।
ধ্বংসের জ্বালা অকল্যাণ সহিতে না পারি
বঙ্গ-মার চক্ষে বহে বারি
নীলাম্বু অধীর হ'য়ে বেলা লঙ্ঘি'
পড়ে উচ্ছ্বসিয়া
আকাশের রক্ত আঁখি আসন্ন দুর্দ্দিন আসে নিয়া।
পবন শ্বসিছে ঘন ঘন
অনলের তীব্র পরশন
লেলিহান জ্বলন্ত উচ্ছ্বাসে
নাচি ফিরে ভৈরব উল্লাসে
স্রোতস্বতী ছন্দ হারা গতি
গ্রাসে বন্যা, মৃত্যুকন্যা
বাড়াইতে দারুণ দুর্গতি।
দুর্ব্বার তরঙ্গে মিশে আর্ত্তকণ্ঠ হ'ল একাকার
জলস্থল করিয়া বিস্তার
রোগ শোক দৈন্য জীর্ণ
দুঃখভরা দিন
এই কি গো তোমাদের
একান্ত সুদিন?

কি দেখে ভুলেছ বল
মরুভূমে মরীচিকা-মণি
তার তরে কেন আজি
আপনারে এত হেয় গণি—
নিজেরে করিলে অপমান
শৌর্য্য-বীর্য্যে খ্যাতনামা ভারতের দু'টী মহাপ্রাণ।
ভারতের দু টী মহাবল
নিজ হাতে মুছাইছ নিজেদের একান্ত সম্বল।
জাতি, ধর্ম্ম, শিক্ষা, দীক্ষা সর্ব্ব প্রতিষ্ঠান
মণীষার নব কীর্ত্তি,
নিজেদের জীবনের স্পৃহণীয় বিরাট সম্মান,
নিজ হাতে তিলে তিলে তিলোত্তমা সম
স্বপ্ন হ'তে সত্যরূপে বিরচিলে
মূর্ত্তি অনুপম।
বৃথা গর্ব্বে ফেল না ভাঙ্গিয়া
ভ্রাতৃ-স্নেহ প্রীতি-ডোরে
পুণ্যক্ষণে বেঁধে লও হিয়া।
সব শান্তি হোক্ শান্তি-নীরে
হিংসানল নিভে যাক্
আসুক সে প্রসন্নতা ফিরে।
রাম রূপ রহিমে প্রকাশ
শ্রীরামের আঁখি কোণে
রহিমের মহিমা বিকাশ।
তবে কেন করিয়াছ জাতিগত পার্থক্য প্রচার
মুমূর্ষু ভারত কাঁদে সহি আজ অবিশ্রাম
তোমাদের এত অনাচার।
অগ্র আজি মোহ আবরণ
লক্ষ্যপথে যাত্রা কর অমৃতের বরপুত্রগণ।
বিভেদের গ্রন্থি খুলি'
ভ্রাতৃত্বের হোক্ বিনিময়
প্রাণে প্রাণে নব পরিচয়।
বিবেক ঘুমায়ে আছে
অজ্ঞানের অশান্ত তিমিরে
নব অভ্যুদয়-রশ্মি
নবীন চেতনা দিক্ ফিরে।
মুক্তি-ব্রত কর অনুষ্ঠান
অস্তগামী গৌরবেরে বরণ করিয়া লও
ধূলিসাৎ ক'র না কল্যাণ।



আয়র্ল্যাণ্ড

দুই

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

মহামতি গ্লাডষ্টোন তৃতীয়বার প্রধান মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর আইরিশ হোম-রুল বিল নামক আয়র্ল্যাণ্ডের স্বায়ত্ত-শাসন সম্পর্কীয় ব্যবস্থার প্রস্তাব পার্লিয়ামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হইবার জন্য চেষ্টা করেন। এই ব্যবস্থানুসারে ডাবলিনে প্রতিষ্ঠিত স্বতন্ত্র আইরিশ ব্যবস্থাপক সভার কতকগুলি বিষয় ছাড়া সকল আইন-কানুন প্রস্তুত করিবার অধিকার থাকিবে। অবশিষ্ট নিষিদ্ধ বিষয়গুলির আইন ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট প্রস্তুত করিবে। সেখানে কোন আইরিশ সদস্যের বসিবার অধিকার রহিবে না। আয়র্ল্যাণ্ডের উন্নতিকামী গ্লাডষ্টোনের চেষ্টা সত্ত্বেও আইরিশ হোমরুল-বিল পার্লিয়ামেণ্ট কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইল। কেহ কহিলেন, আইরিশরা স্বায়ত্ত-শাসন পাইবার উপযুক্ত নহে; কেহ কহিলেন, আয়র্ল্যাণ্ড ক্যাথলিক প্রধান স্থান সুতরাং সেই দেশ স্বায়ত্ত-শাসন পাইলে তথাকার প্রোটেষ্টাণ্টগণ উৎপীড়িত হইবে। কেহ কেহ এই বিষয়ে অসম্মত হইবার অন্যান্য কারণও দেখাইলেন। অবশেষে ৯৪ জন উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল দলে যোগ দেওয়ার জন্যই পার্লিয়ামেণ্ট হোম-রুল-বিরোধীরাই সংখ্যাধিক হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহার পর পার্লিয়ামেণ্ট পুনর্গঠিত হইলে দেখা গেল নবগঠিত পার্লিয়ামেণ্টেও হোম-রুল-বিরোধী দলেরই সংখ্যাধিক্য আছে। এইরূপ অবস্থা দেখিবামাত্র গ্লাডষ্টোন পদত্যাগ করিলেন। এই চেষ্টাটিকে গ্লাডষ্টোনের আইরিশ হোম-রুল সম্পর্কীয় দ্বিতীয় প্রচেষ্টা বলা চলে। গ্লাডষ্টোনের পদত্যাগের পর যিনি হাউস-অফ-কমন্সের নেতৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত হন তাঁহার নাম লর্ড র‍্যানডল্ফ-চার্চ্চিল। ইনি ইংলণ্ডের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চিলের পিতা।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী ও উদারনৈতিক নেতা মিঃ এস্কুইথের দ্বারা তৃতীয়বার আইরিশ হোম-রুল বিল পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় উপস্থাপিত করা হয়। এই সময় আয়র্ল্যাণ্ডকে স্বায়ত্ত-শাসন দিবার সঙ্কল্প করা হয় বটে কিন্তু য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। স্বাধীনতাকামী আইরিশদিগের অসন্তোষ ক্রমশঃ প্রবল আকার পরিগ্রহ করে এবং "সীন-ফীন" নামক বিপ্লবাত্মক আন্দোলন ও দলের প্রভাব দিন দিন বাড়িতে থাকে। এই আন্দোলনের নেতৃবর্গের মধ্যে ডি-ভ্যালেরা ও আর্থার গ্রীফিথের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা আয়র্ল্যাণ্ডে সম্পূর্ণ স্বাধীন গণতন্ত্র গঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করেন। "সীন-ফীন" গায়েলিক শব্দ। ইহার অর্থ "কেবল আমরাই"। মহাযুদ্ধের পর ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আলষ্টার ছাড়া অন্যান্য প্রদেশগুলিকে লইয়া "আইরিশ ফ্রি-ষ্টেট" জন্ম লাভ করে। ইহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ডোমিনিয়ন বলিয়া গণ্য হয়। ডি-ভ্যালেরা প্রভৃতি রিপাব্লিকান নেতা এই ব্যবস্থাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না, সুতরাং ফ্রি-ষ্টেটের কর্তৃপক্ষগণের সহিত রিপাব্লিকানদের সজ্ঘর্ষ চলিতে লাগিল। পরে ডি-ভ্যালেরা ফ্রি-ষ্টেটকে করায়ত্ত করিবার পর এই সজ্ঘর্ষের অবসান ঘটিল।

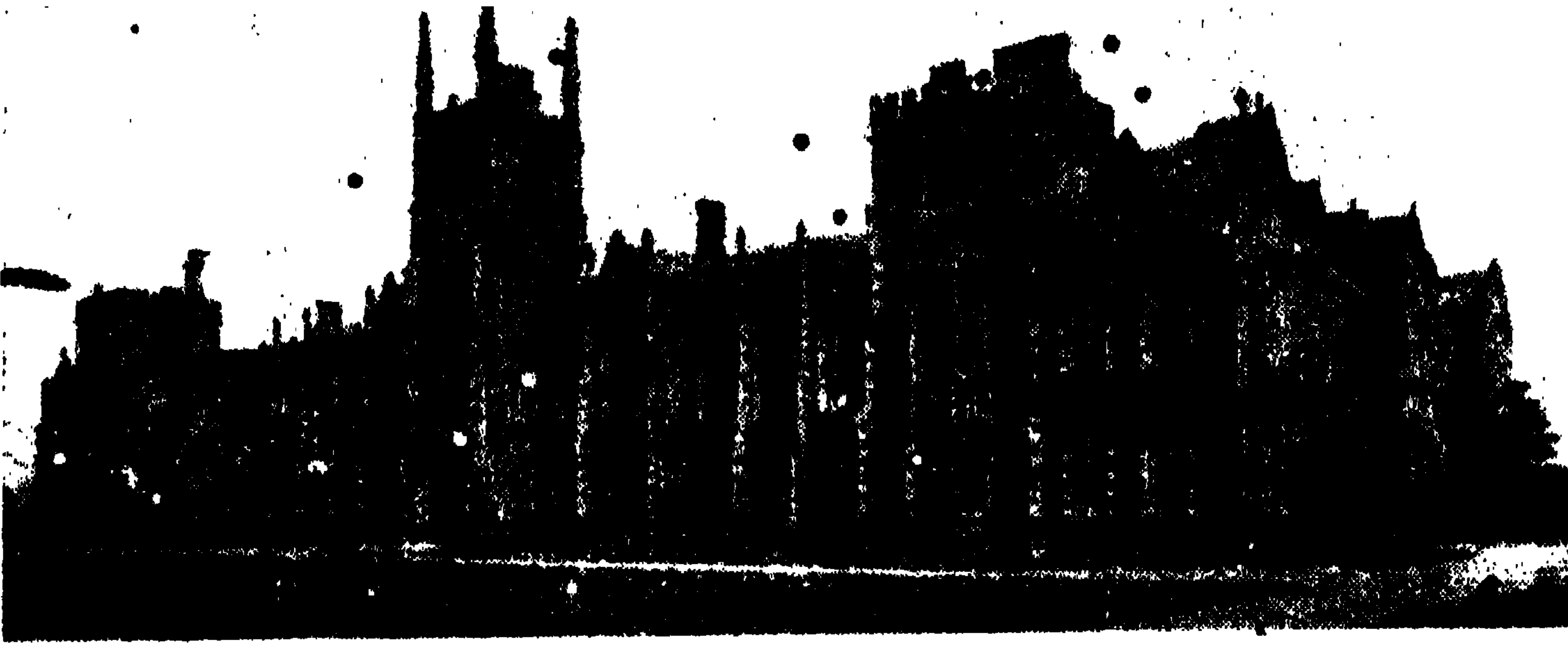
১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর আয়ারের অদ্বিতীয় নেতা ডি-ভ্যালেরা নিউ ইয়র্ক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্পেনিশ কিন্তু মাতা আইরিশ। তিনি "গায়েলিক লীগ" নামক সমিতির সভাপতি পদ প্রাপ্ত হন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন বটে কিন্তু উক্ত সভায় যোগদান করেন নাই। আমরা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি "আইরিশ-ফ্রি-ষ্টেট" আখ্যায় অভিহিত ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস বিশিষ্ট রাষ্ট্র ইঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। ইনি চান আরও অধিক। সে যাহা হউক, নূতন গণতন্ত্রটির উপর তিনি আপনার অপ্রতিহত প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়া অবশেষে কৃতকার্য্য হন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে "ডেল" নামক আইরিশ রাষ্ট্রীয় মহাসভায় তাঁহার দল সংখ্যাধিক হইলে তিনি রাষ্ট্রপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইনি ডেলের সদস্যগণের পক্ষে "ওথ অফ্ এলিজেন্স" বা বশ্যতা সম্পর্কীয় শপথ গ্রহণ অপ্রয়োজনীয় মনে করিলে ঐরূপ শপথের প্রথা এখান হইতে উঠিয়া যায়। ইংলণ্ডের নিকট হইতে জমি কিনিবার জন্য গৃহীত ঋণের সুদ দিতে ইনি অস্বীকার করেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি রাষ্ট্রীয় সভার অন্যতম বিভাগ সিনেট উঠাইয়া দেন। সীন-ফীন আন্দোলনের অন্যতম নেতা আর্থার গ্রীফিথ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মুদ্রাকর ও প্রকাশক এবং সুবিখ্যাত সাংবাদিকও ছিলেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি "ইউনাইটেড আইরিশম্যান" নামক কাগজ বাহির করেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে এই সংবাদপত্র "সীন-ফীন" আখ্যা বরণ করে এবং পরে ইহাকে "আয়ার" নাম দেওয়া হয়। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে



ডি-ভ্যালেরা

ইঁহাকে "ইণ্টার্নি" নজরবন্দীরূপে বাস করিতে হইয়াছিল এবং ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার কারাবাস ঘটে। ডি ভ্যালেরার অনুপস্থিতিকালে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি রাষ্ট্রপতি হইয়া কিয়ৎকালের জন্য ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। আইরিশ



কুইন্স-কলেজ (বেলফাষ্ট)

ফ্রি-ষ্টেটের জন্ম হইবার অব্যবহিত পরে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে অকস্মাৎ ইঁহার মৃত্যু হয়।

উত্তর আয়র্ল্যাণ্ড বা আলষ্টার আইরিশ ফ্রি-ষ্টেটের অন্তর্ভুক্ত নহে, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আলষ্টার ছয়টি কাউন্টি বা জিলায় বিভক্ত। এই ছয়টির নাম ডাউন, এণ্ট্রিম, আর্মাঘ, টাইরোন, লণ্ডনডেরি এবং ফার্ম্মানাঘ। এই জিলাগুলির অধিকাংশ অধিবাসীই প্রোটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী ইংরেজ ও স্কচদিগের সন্তান। উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডের রাজধানী বেলফাষ্ট নগরে এই রাজ্যের রাষ্ট্রীয় মহাসভার অধিবেশন হয়। রাজার প্রতিনিধিরূপে একজন গভর্ণর এখানে অবস্থান করেন। অবশিষ্ট তিনটি প্রদেশ লইয়া গঠিত আইরিশ ফ্রি-ষ্টেটে ক্যাথলিক মতাবলম্বী গায়েলিক বা কেল্টিক জাতিই প্রধানতঃ বাস করে। রাজপ্রতিনিধিরূপে একজন গভর্ণর-জেনারেল এখানে অবস্থান করেন এবং রাজধানী ডাবলিনে এই রাষ্ট্রের পার্লিয়ামেণ্টের অধিবেশন হয়। এর্স আখ্যায় অভিহিত গায়েলিক ভাষা এই অংশে প্রচলিত।

আয়র্ল্যাণ্ডের মধ্যস্থলকে একটি প্রকাণ্ড প্রান্তর বলা চলে। পর্ব্বতশ্রেণী প্রধানতঃ উপকূলাংশে অবস্থিত। বিশেষ পশ্চিমস্থ কোনট নামক প্রদেশের উপকূল-ভাগ অনুর্ব্বর পর্ব্বতপুঞ্জে পূর্ণ। বহু নদ এবং হ্রদ এই দেশে দেখা যায়। নদ-নদীর মধ্যে শ্যানন সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং হ্রদাবলীর মধ্যে আলষ্টারে অবস্থিত লাফ্-নী শুধু আয়র্ল্যাণ্ডের মধ্যে নয় সমগ্র ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে বৃহত্তম হ্রদ। কিলার্নী হ্রদাবলী আখ্যায় অভিহিত তিনটি হ্রদ কলার্নী নামক নগরের নিকটে নয়নাভিরাম নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের বক্ষে বিরাজিত। কেরী নামক কাউণ্টির অন্তর্গত শৈলমালার পার্শ্বে প্রসারিত এই শোভাময় হ্রদত্রয় কাব্যে ও কাহিনীতে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহারা 'আপার' 'মিডল' এবং 'লোয়ার' আখ্যায় অভিহিত "লোয়ার" হ্রদটিই বৃহত্তর। ইহা ৬ মাইল দীর্ঘ এবং ৩ মাইল প্রশস্ত। এই নিভৃত পার্ব্বত্য প্রদেশে আজিও রক্তবর্ণ হরিণ বিচরণ করে এবং বহু বিচিত্র বৃক্ষ লতা ও ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদ্ দেখা যায়। এই পরম প্রীতিপ্রদ পার্ব্বত্য প্রদেশের যে প্রশস্তি কবিকুলের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে তাহা উহার সম্পূর্ণ যোগ্য সন্দেহ নাই। বহু নদনদী ও হ্রদাদিতে বিভূষিত বলিয়া এবং আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র হইতে উষ্ণ ও সলিল-সিক্ত বাতাস বহিয়া আসে বলিয়া এই দ্বৈপায়ন দেশের আবহাওয়া প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বা অত্যন্ত গরম হইতে পারে নাই। এইরূপ অনুকূল আবহাওয়ার জন্যই এখানে সবুজ তৃণরাজি প্রচুর জন্মিয়া থাকে।

আয়র্ল্যাণ্ডের পর্ব্বতগুলি প্রধানতঃ উপকূলাংশে দণ্ডায়মান বলিয়া মধ্যস্থ প্রান্তর বা নিম্নভূমিসমূহ সহজেই জলায় বা বিলে পরিণত হইয়াছে। এই সকল জলা "বগ" আখ্যায় অভিহিত। স্থানে স্থানে বগগুলি বেগ-বিহীন দূষিতজল নদ-নদীতে বা হ্রদে পরিণতি পাইয়াছে। এই সকল জলার মধ্যে ডাবলিনের পশ্চাতে প্রসারিত বগ অফ এলেন বৃহত্তম। এই বগের জল একপার্শ্বে বয়িন এবং ধ্যারো নামক নদীদ্বয়ের সহিত এবং অপর পার্শ্বে শ্যাননের অন্যতম করদনদের সহিত মিশিয়াছে। শ্যানন শুধু আয়র্ল্যাণ্ডের নহে সমগ্র ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে দীর্ঘতম নদ এবং জলযান চালনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। বগ আখ্যায় অভিহিত বিলগুলির স্থানে স্থানে সবুজ তৃণ বা উদ্ভিদের পাতলা পর্দ্দা দেখা যায়। অনেক সময় ভ্রমণকারিগণ এই সকল উদ্ভিদ দেখিয়া ঐ সকল স্থানকে সলিলশূন্য শুষ্কভূমি বলিয়া ভ্রমে পতিত হন। এইরূপ ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া কেহ কেহ নিম্নস্থ গভীর পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া বিশেষ

বিপন্ন হন। আয়র্ল্যাণ্ডের প্রায় সপ্তমাংশ এইরূপ জলায় পরিপূর্ণ। এই সকল জলার জন্য এই দেশের প্রকৃতি এক প্রকার বিষাদ-গম্ভীরভাব জাগাইয়া তুলে বলিলে ভুল হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া এই দেশে নেত্রতর্পণ ও চিত্তরঞ্জন দৃশ্যাবলী নাই তাহা নহে। আমরা কিলার্নীহ্রদের কথা উপরে বলিয়াছি। ইহাদিগকে সমগ্র ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সৌন্দর্য্যে অদ্বিতীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহা ছাড়া উইকলোর পর্ব্বতপুঞ্জ ও বনভূমির চিত্তাকর্ষক শোভাও উল্লেখযোগ্য। ইহা লীনষ্টার প্রদেশে অবস্থিত। মুনষ্টার প্রদেশের মধ্যে গোল্ডেন-ভেলী বা স্বর্ণ-উপত্যকা আখ্যায় অভিহিত অংশটি বিশেষ নয়নাভিরাম। এই দেশের গুরু-গম্ভীর দৃশ্যাবলীর মধ্যে পশ্চিম ও উত্তর উপকূলে দণ্ডায়মান ঝঞ্ঝাহত গিরিশ্রেণী উল্লেখনীয়। আটলান্টিক হইতে প্রবাহিত প্রবল বাত্যা গিরি-গাত্রগুলিকে বিচিত্র আকার প্রদান করিয়াছে। উত্তরস্থ ডনেগোল নামক কাউন্টির মালভূমিগুলিও গুরুগম্ভীর। উত্তরে অবস্থিত হইলেও এই কাউন্টি আইরিশ-ফ্রি ষ্টেটের অন্তর্ভুক্ত। আলষ্টারের অন্তর্গত ডাউন নামক কাউন্টিতে বিরাজিত মূর্ণ পর্ব্বতশ্রেণীর গাম্ভীর্য্যও উল্লেখযোগ্য। এই জিলাটিই বৃটেনের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী।

আইরিশ ফ্রি ষ্টেটের রাজধানী ডাবলিন নগর লীনষ্টার প্রদেশের অন্তর্গত ডাবলিন নামক কাউন্টিতে অবস্থিত। আইরিশ সাগর হইতে সাত মাইল দূরে এবং একটি সুদৃশ্য উপসাগরের শীর্ষদেশে এই নগরটি বিরাজিত। এই কাউন্টির প্রধান নদী লিফি ডাবলিন নগরকে প্রায়ই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। এক সময় এই নগর সমগ্র দেশের রাজধানী ছিল। স্কান্দিনেভিয়া হইতে আগত আক্রমণকারী-গণ এই নগরে দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। পরে ইহা এ্যাংলো নর্ম্যান উপনিবেশে পরিণত হয়। স্কান্দিনেভিয়ান এবং এ্যাংলো-নর্ম্যান উভয় জাতিই তাহাদিগের উপনিবেশ ও প্রাধান্যের বহু চিহ্ন এখানে রাখিয়া গিয়াছে। এই নগরের রাস্তাসমূহের মধ্যে স্যাকভিলে ষ্ট্রীট সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত এবং পার্ক সমূহের মধ্যে ফিনিক্স পার্ক সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত। নগরের পশ্চিম প্রান্তে প্রসারিত এই প্রীতিকর পার্কের আয়তন প্রায় সাত মাইল। বহু প্রসিদ্ধ প্রাসাদ এই পার্কের বক্ষে বিরাজিত। ক্যাথলিক-প্রধান স্থান হইলেও ডাবলিনে দুইটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ প্রোটেষ্টান্ট উপাসনাগৃহ বিদ্যমান। ইহা-দিগের নাম ক্রাইষ্ট চার্চ্চ ও সেন্ট প্যাট্রিক্স। ক্রাইষ্ট চার্চ্চ দিনেমারদিগের দ্বারা স্থাপিত। পরে প্রেম ব্রোকের আর্ল ষ্ট্রংবোর দ্বারা ইহা পুনর্নির্ম্মিত হয়। ষ্ট্রংবোর পার্থিব দেহ এই গীর্জ্জাগৃহে সমাহিত রহিয়াছে। ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রবঞ্চক ল্যাম্বার্ট সিমনেলের রাজাভিষেক ক্রিয়া এই গীর্জ্জায় সম্পাদিত হয়। পরে সিমনেলকে ইংলণ্ডেশ্বর সপ্তম হেনরীর পাকশালার ভৃত্য রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। সেণ্ট-প্যাট্রিক্স উপাসনাগার ১১৯০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। "গালিভারস ট্রাভিলস" আখ্যায় অভিহিত বিশ্ববিখ্যাত পুস্তকের রচয়িতা জোনাথান সুইফট কিছুকাল এই গীর্জ্জাগৃহের ডীন-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ এই স্থানে সমাহিত হয়। ডাবলিনের



এলবার্ট-মেমোরিয়াল—বেলফাষ্ট-নগর

দ্রষ্টব্য সমূহের মধ্যে ট্রিনিটি কলেজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময়ে এই বিখ্যাত শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজের গ্রন্থাগারে বহু দুর্লভ ও মূল্যবান প্রাচীন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রক্ষিত রহিয়াছে। অষ্টম শতকের কোন

লিপিকারের লিখিত লাটিন বাইবেলের পাণ্ডুলিপি "বুক অফ্ কেল্‌স" আখ্যায় অভিহিত। প্রাচীন লিপিকার শুধু যে গ্রন্থের নকল করিয়াছেন তাহা নহে সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডুলিপিকে অপূর্ব্ব শিল্প-সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছেন। এই বিষয়ে ইহাকে লাটিন বাইবেলের অদ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি বলিয়া মনে করা হয়। বিখ্যাতনামা আর্দ্দ-রী বা রাজচক্রবর্ত্তী বীরবর ব্রায়াণ-বোরুর কথা আমরা পাঠকগণকে পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। ট্রিনিটি কলেজের সংগ্রহশালায় "ব্রায়ন-বোরুর বীণা" নামক একটি বাদ্যযন্ত্র রক্ষিত আছে। সম্ভবতঃ ব্রায়ান বোরুর দরবারের কোন গায়ক বা চারণ ইহা ব্যবহার করিতেন। যাঁহারা এই বীণা খানিকে ব্রায়ান বোরুর সময়ের বলিয়া বিশ্বাস করেন



বেলফাষ্টের বোটানিক বাগান

না তাঁহারাও বলেন ইহা নয়শত বৎসর অপেক্ষাও প্রাচীনতর সন্দেহ নাই। ডাবলিনের বন্দর বা পোতাশ্রয় কিংষ্টন আখ্যায় অভিহিত। ইহা ডাবলিন উপসাগরের তীরে বিরাজিত। ডাবলিন নগরের পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলী বিশেষ চিত্তাকর্ষক।

এই দেশের নগরাবলীর মধ্যে ডাবলিনের পরেই আলষ্টারের রাজধানী বেলফাষ্টের কথা উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা আলষ্টারেই শিল্প ও বাণিজ্যের অধিক উন্নতি দেখা যায়। এক প্রকার ফ্ল্যাক্স বা শন-জাতীয় উদ্ভিদ এই প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। এই শন হইতে সঞ্জাত সূতার দ্বারাই লিনেন, ড্যামস্ক, ক্যাম্ব্রিক্ প্রভৃতি মূল্যবান্ বস্ত্র প্রস্তুত করা হয়। বেলফাষ্ট নগর লিনেন সম্পর্কীয় বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে যাহা সামান্য ধীবর-পল্লী মাত্র ছিল তাহা লিনেন সম্পর্কীয় শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য শত শত সুদৃশ্য সৌধ শালী বিশেষ উন্নতিশীল বিশাল নগরে পরিণত হইয়াছে। আলষ্টারের গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে বহু চরকা ও তাঁত অবিরাম চালিত হইয়া যে সকল বস্ত্র প্রস্তুত করে, বেলফাষ্টের বাজারে তাহাই বিক্রীত হয়। বেলফাষ্ট-বন্দরে বিশেষ বৃহদাকার পোতও প্রস্তুত হইয়া থাকে। লিনেন সম্পর্কীয় শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে আলষ্টারের অন্তর্গত আর্মাঘ নামক নগরের নামও উল্লেখযোগ্য। খাড়া পাহাড়ের গায়ে বিরাজিত এই নগরটি বিশেষ সুদৃশ্য। সেণ্ট প্যাট্রিক এই স্থানে একটি উপাসনাগৃহ স্থাপিত করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। ইহাও কথিত হইয়া থাকে যে, সেই উপাসনাগারটি তৎকালের অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্র ছিল।

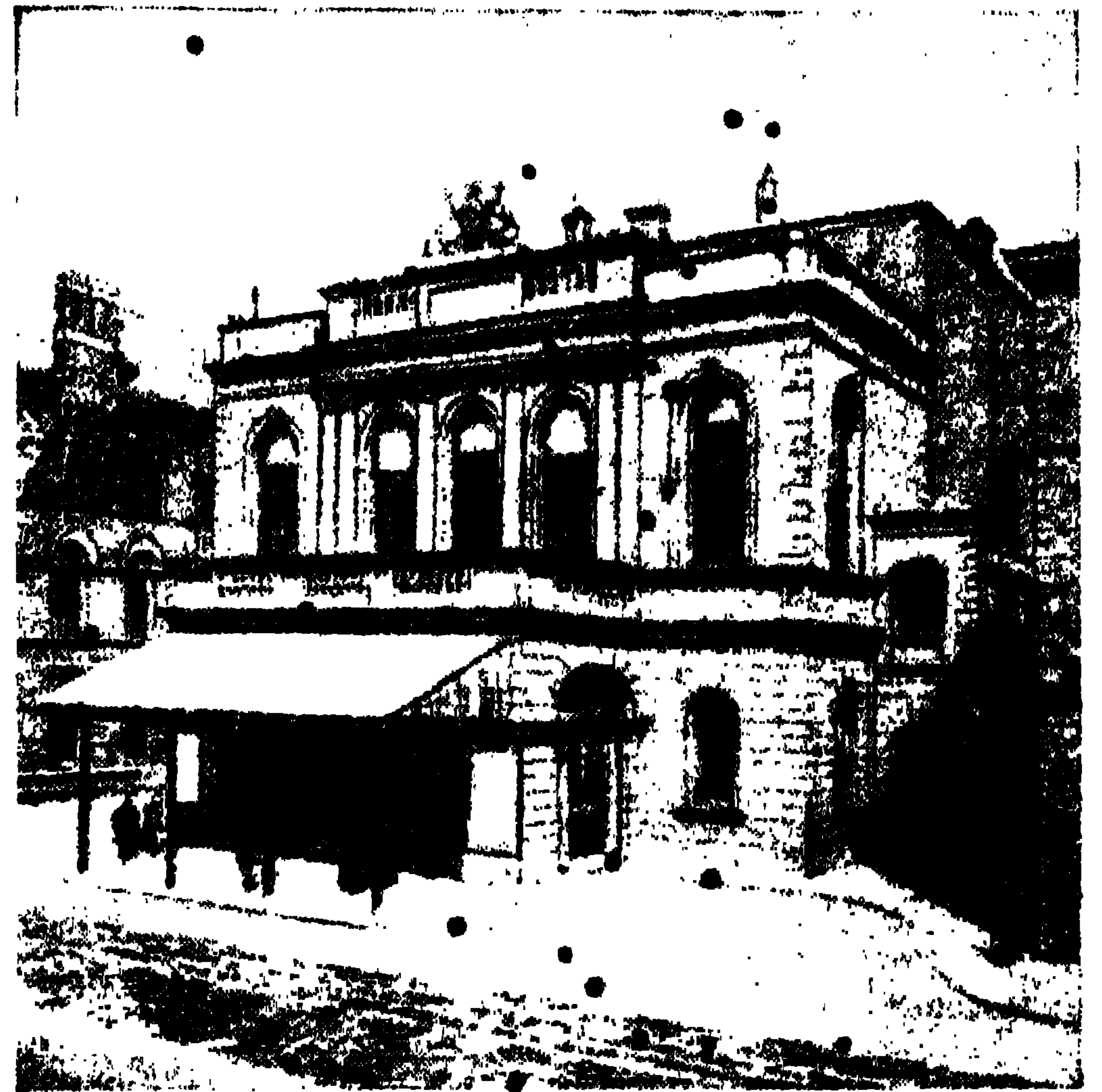
উপকূলাংশে এবং নদী ও হ্রদাদির তীরদেশে যাহারা বাস করে তাহাদিগের অনেকেই মৎস্যজীবী। অভ্যন্তর-ভাগের অধিবাসীদিগের মধ্যে কৃষক ও পশুপালকের সংখ্যা অধিক। বিশেষ মুনষ্টার এবং লীনষ্টার প্রদেশে চাষ এবং পশুপালনই জীবিকার্জ্জনের প্রধান উপায়। পশুপালনের মধ্যে আয়র্ল্যাণ্ডে শূকরই অধিক পালিত হইয়া থাকে এবং কৃষিকার্য্যের ভিতর আলুর চাষই সর্ব্বাধিক হইতে দেখা যায়। আয়র্ল্যাণ্ডের প্রধান খাদ্য গোল আলু এ কথা হয় তো অনেকেই জানেন। যেমন আমরা ভাত খাই, ভারতের পশ্চিমাংশের লোক এবং ইংরেজ প্রভৃতি অধিকাংশ পাশ্চাত্য জাতি রুটি খায় তেমনই আইরিশরা গোল আলু খাইয়া থাকে। সার ওয়াল্টার র‍্যালে এই দেশে গোল আলুর ব্যবহার প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। গোল আলু আদিতে আমেরিকায় জন্মিত। তামাক, সিনকোনা প্রভৃতির ন্যায় ইহারও ব্যবহার আমেরিকা হইতে য়ুরোপ শিখিয়াছিল এবং য়ুরোপ হইতে পরে আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। অবশ্য মিষ্ট আলু এবং মাটি আলু প্রভৃতি অন্যান্য জাতীয় আলুর ব্যবহার আমাদের দেশে প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত ছিল। য়ুরোপে তামাক ও আলুর প্রবর্ত্তক সার ওয়াল্টার র‍্যালে।

যেমন ধান্য না জন্মিলে বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তেমনই কোন বৎসর আলু উপযুক্ত পরিমাণে উৎপন্ন না হইলে আইরিশরা দুর্ভিক্ষে কষ্ট পায়। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে আয়র্ল্যাণ্ডে আলুর অজন্মা-জনিত

দুর্ভিক্ষ অতি ভয়াবহ আকারে প্রকাশ পায়। বহু লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। ফলে আইরিশরা দেশত্যাগের জন্য দলে দলে কর্ক বন্দরে আসিয়া তথা হইতে পোতারোহণে আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় চলিয়া যায়। এই সকল নরনারী আর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন না করায় আয়র্ল্যাণ্ডের লোকসংখ্যা প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়া যায়।

এই দ্বৈপায়ন দেশে বিচিত্র কথা ও কাহিনীসমূহের সহিত বিজড়িত বহু প্রাচীন দুর্গ, মঠ, গির্জ্জা এবং গোলাকার বুরুজ অতীতের সাক্ষীরূপে দাঁড়াইয়া আছে। গোলাকার বুরুজগুলি বিশেষ উচ্চ এবং সাধারণতঃ গির্জ্জাগৃহসমূহের সন্নিকটে ইহারা দৃষ্ট হয়। সেই জন্য পরে এই সকল বুরুজ বেলফ্রি বা গির্জ্জার ঘণ্টা-ঘর রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এই সকল উচ্চ বুরুজের অধিকাংশ নবম শতকে নির্ম্মিত বলিয়া মনে হয়। আক্রমণকারী পরাক্রান্ত স্কান্দিনেভিয়ানদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য ইহারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। বুরুজের সমুচ্চ শীর্ষে আরোহণ করিয়া চারিদিকে চাহিলে বহু দূরের দৃশ্যও দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। স্কান্দিনেভিয়ানরা আসিতেছে কি না দেখিবার জন্য এই সকল বুরুজের শীর্ষে একজন করিয়া সতর্ক প্রহরী সর্ব্বদা পাহারায় নিযুক্ত থাকিত। শত্রুপক্ষ আসিতেছে জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ পার্শ্ববর্ত্তী লোকালয়ের অধিবাসীরা নিরাপদ হইবার জন্য বুরুজে সমবেত হইত। আয়র্ল্যাণ্ডের নানাস্থানে উচ্চ ক্রশ দণ্ডায়মান দেখা যায়। এই সকল উচ্চ ক্রশকে প্রাচীনকালের পবিত্রক্ষেত্র বা তীর্থ বিশেষের সীমানির্দ্ধারক চিহ্ন বলিয়া মনে হয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আয়র্ল্যাণ্ডের অধিবাসীদিগের মধ্যে শূকরই সর্ব্বাধিক সংখ্যায় পালিত হইতে দেখা যায়। গ্রামাঞ্চলের প্রায় প্রত্যেক কুটিরেই স্বল্পবিস্তর শূকর দৃষ্ট হয়। শূকর পালন অতিশয় লাভজনক কার্য্য বলিয়া বিবেচিত। এই দেশে শূকর সম্বন্ধে একটী বিচিত্র বাক্য প্রচলিত আছে। গ্রামবাসী আইরিশরা শূকরকে "দি জেণ্টলম্যান হাট্ পেজ্ দি রেণ্ট" বলিয়া থাকে। ইহার অর্থ "করদাতা ভদ্রলোক"। শূকর পুষিয়া যে লাভ হয় তাহার দ্বারা অনায়াসে কর দেওয়া চলে বলিয়াই এইরূপ উক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মুনষ্টার প্রদেশের মধ্য দিয়া এবং টিপেরারি নামক স্থান হইতে লিমারিক এবং কেরির ভিতর দিয়া আটলাণ্টিক পর্য্যন্ত একটি বিশেষ উর্ব্বর অংশ আছে। এই শস্য ও শষ্পশ্যাম অংশকেই "গোল্ডেন ভেলী" বলা হয়। এখানে কৃষিকার্য্য এবং দুগ্ধজাত পণ্যের ব্যবসা চলিয়া থাকে। টিপেরারি প্রাচীনকাল হইতেই মাখন ও বেকন বা শূকরমাংসের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। ব্রিটিশ সৈন্যগণের মধ্যে প্রচলিত সঙ্গীতসমূহের মধ্যে "ইট্স্ এ লং লং ওয়ে টু টিপেরারি" সঙ্গীতটি বিশেষ জনপ্রিয়। বিগত মহাযুদ্ধের সময় ইহা ব্রিটিশ সৈন্যগণের প্রিয় সঙ্গীত ছিল। এই সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে তাহারা সগর্ব্বে অগ্রসর হইত। মাখন ও বেকন প্রভৃতি বলিয়াই টিপেরারি সামরিক সঙ্গীতসমূহের মধ্যে গৌরবান্বিত স্থান অধিকার করিয়াছে। দুইটিই ব্রিটিশ সৈন্যগণের প্রিয় আহার্য্য।



আলষ্টার হল

কর্ক নামক নগরকেও আয়র্ল্যাণ্ডের বাণিজ্যপ্রধান স্থানসমূহের অন্যতম বলা চলে। আইরিশ নগরগুলির মধ্যে ইহা তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মুনষ্টার প্রদেশের অন্তর্গত কর্ক নামক কাউন্টির প্রধান নগর ইহা। অনেক প্রয়োজনীয় পণ্য পদার্থ এখানে প্রস্তুত হয়। এখানকার মাখনের বাজার বিশেষ প্রসিদ্ধ।

কর্ক নগরী লী নামক নদীর তটদেশে বিরাজিত। কর্কের দক্ষিণ-পূর্ব্বে এবং দশ মাইল দূরে কুইন্সটাউন নামক বন্দর। পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল কোভ অব্ কর্ক। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া এখানে আসিলে ঐ নাম কুইন্সটাউনে রূপান্তরিত হয়। আটলাণ্টিকের অপর পার হইতে বাষ্পীয়পোতসমূহ

এখানে নিয়মিতভাবে আসিয়া থাকে। কর্কের পোতাশ্রয় এরূপ বৃহৎ যে, এক সঙ্গে প্রায় ছয় শত জাহাজ এখানে থাকিতে পারে। এই নগরের অদূরে ব্লার্নীক্যাসল নামক দুর্গ দেখা যায়। ইহার বহিঃপ্রাচীরে সংলগ্ন একটী প্রস্তরকে বিচিত্র শক্তি বা গুণের আধার বলিয়া মনে করা হয়। এই প্রস্তরখানিকে চুম্বন করিলে চুম্বনকারী বক্তৃতাশক্তি বা



কেস্ত-হিল

বাগ্মিতার অধিকারী হইয়া থাকে বলিয়া বিশ্বাস প্রচলিত। ওজস্বী বক্তা হইবার বাসনায় এখনও অনেকে এই প্রস্তর চুম্বন করিয়া থাকে। ইহা প্রমাণিত করে জনসাধারণ প্রচলিত বিশ্বাসের প্রভাব হইতে সহজে মুক্তিলাভ করে না। বিশেষতঃ আইরিশ-চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এইরূপ বিশ্বাস।

বড় বড় নগরে কল-কারখানার সাহায্যে বিস্তৃত আকারে নানা প্রকার পণ্য প্রস্তুত হওয়া ছাড়া আয়র্ল্যাণ্ডের পল্লীগ্রাম অঞ্চলে নানারকম কুটির শিল্প অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। ডনেগোল কাউন্টি এবং কোনট প্রদেশের গ্রাম্যাঞ্চলের বহু কুটিরবাসী কৃষক সপরিবারে এইরূপ শিল্পে নিযুক্ত থাকে এবং উহার সাহায্যেই জীবিকার্জ্জন করে। পশম প্রস্তুত নানা প্রকার বস্ত্র এবং কার্পেট প্রভৃতি এই সকল কুটিরবাসীরা প্রস্তুত করে। পুরুষদিগের দ্বারা বয়ন ব্যাপার সম্পাদিত হয় এবং স্ত্রীলোকরা সুতাকাটা এবং রন্ধন কার্য্য সম্পাদন করে। হাতে তৈয়ারী লেস বা জালির কাজও এই সকল কুটীর শিল্পের অন্যতম। এই ধরণের অনেক শিল্পকার্য্য মঠবাসী নর-নারীর দ্বারাও সম্পাদিত হইয়া থাকে। ক্যাথলিক প্রধান স্থান বলিয়া এই দেশে বহু মঠ বা আশ্রম আছে।

আইরিশদিগের অধিকাংশই কেল্‌টিক বা গায়েলিক জাতির বংশধর। কৃষ্ণ কেশ এবং নীল চক্ষু ইহাদিগের শারিরীক বৈশিষ্ট্য। আইরিশদিগের প্রকৃতি ভাবপ্রবণ সে কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাহারা সহৃদয়, ভদ্র এবং সরল স্বভাবও বটে। ইহাদিগের পারিবারিক জীবনে প্রীতি বা প্রণয়ের প্রবল প্রকাশ দেখা যায়। ইহারা ভালবাসিতে জানে এবং প্রীতির পাত্র হইতেও পারে। অন্য দিকে কাহারও প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ পোষণ করিলে তাহা অতিশয় তীব্র হইয়া থাকে। ইহারা সাধারণতঃ মধ্যপন্থা না হইয়া আচারে ব্যবহারে চরমভাবাপন্ন হইয়া থাকে। ইহারা অতিশয় যুদ্ধপ্রিয় জাতি, যেন যুদ্ধানুরাগ লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। এই যুদ্ধানুরাগের জন্যই বোধ হয় আইরিশ জাতির মধ্যে ডিউক অব্ ওয়েলিংটন ও লর্ড কিচেনারের মত জগদ্বরেণ্য যোদ্ধা ও লর্ড চার্লস ব্রেসফোর্ডের মত নৌ-বীর জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

আইরিশ জাতি নগর অপেক্ষা পল্লীগ্রাম অঞ্চলকে অধিক ভালবাসেন এবং কল-কারখানায় কাজ করা অপেক্ষা কুটির শিল্পের সাহায্যে জীবিকার্জ্জন করা অধিক পছন্দ করে। এই হিসাবে মুনষ্টার ও লীনষ্টার অপেক্ষা কোনট প্রদেশকে অধিকতর আইরিশ ভাবাপন্ন বলিলে ভুল হয় না। এই প্রদেশে সহরের সংখ্যা খুব কম এবং কল-কারখানা প্রায় নাই বলিলেই হয়। মধ্যযুগে কোনটের গ্যালোয়ে নামক নগরের সহিত স্পেনের বাণিজ্যসম্পর্ক স্থাপিত থাকার কালে কতিপয় স্পেনীয় বণিক আয়র্ল্যাণ্ডে বাস করিয়াছিল। তাহারা আইরিশ রমণীকে বিবাহ করিয়া এই দেশে রহিয়াই গিয়াছিল। গ্যালোয়েতে এখনও সেই সকল স্পেনীয়দিগের বংশধর দেখা যায়। ইহাদিগের দেহের বর্ণ খাস আইরিশদিগের বর্ণ অপেক্ষা কালো। নাম হইতেও স্পেনীয় প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্যালোয়ে কাউন্টির অন্তর্গত ক্ল্যাডাঘ নামক অঞ্চলেও স্পেনীয়দিগের বংশধর দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইংলণ্ড আক্রমণ করিবার জন্য আগত স্পেনীয় আর্মাডা আয়র্ল্যাণ্ডের উপকূলে ধ্বংস হইবার পর যাহারা জীবিত ছিল তাহারা এই অঞ্চলে বাস করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। অল্পকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্তও ইহারা নিজ সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত

বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইত না এবং অপর সম্প্রদায়ের লোককে আপনাদিগের মধ্যে স্থান দিত না। অধুনা এই ভাব আর দেখা যায় না। ইহারা আইরিশ ভাষাই ব্যবহার করে। কিছুকাল পূর্ব্বেও ইহারা কেবল আপনাদিগের প্রস্তুত আইন-কানুন মানিয়া চলিত এবং আপনাদিগের নির্ব্বাচিত নেতাকেই মানিত। তাহাদিগের দ্বারা ফিষ্ট অব সেণ্ট-জন এবং মিড-সামার-ইভ এই পর্ব্বদ্বয় শোভাযাত্রা ও জাকজমকের সহিত অনুষ্ঠিত হইত। এই পর্ব্বোপলক্ষে পবিত্র পাবক প্রজ্বলিত করিয়া রাখার প্রথা প্রচলিত ছিল।

এই সম্প্রদায়ের রমণীরা লালবর্ণ পেটিকোট ও বডিসের উপর একপ্রকার নীলবর্ণ ম্যাণ্টাল বা ঢিলা পরিচ্ছদ পরিয়া থাকে এবং মাথার উপর রুমাল বাঁধিয়া অবগুণ্ঠন রচনা করে। পরিণীতা হইবার পর হইতে প্রত্যেক নারী বিশুদ্ধ স্বর্ণ-নির্ম্মিত একপ্রকার বিশিষ্ট পরিণয়াঙ্গুরী ধারণ করিয়া থাকে। এই আংটির গায়ে একটি বিচিত্র চিত্র উৎকীর্ণ করা হয়। দুইটি হাত একটি হৃৎপিণ্ডকে ধরিয়াছে, ইহাই সে চিত্র। এখন ইহারা অপর সম্প্রদায়ের লোককে আপনাদিগের মধ্যে বাস করিতে দেয়। মিড সামার পর্ব্ব এখন বালকবালিকার ক্রীড়ায় পরিণত হইয়াছে। ইহারা এই সময় চিত্তাকর্ষক পরিচ্ছদ পরিয়া পথে পথে আগুন জ্বালাইয়া এই প্রাচীন পর্ব্ব পালন করে। আমাদের দেশে দোলে বা বসন্তোৎসবে বালকেরদল শুষ্ক তালপত্রের সাহায্যে যেরূপ ভাবে পথে পথে অগ্নি প্রজ্বলিত করে ইহা কতকটা তদ্রূপ।

আইরিশ কৃষক রমণীদের পরিচ্ছদ সকল অংশে সমান নহে। তবে সকল অংশের নারীরাই একপ্রকার শাল ব্যবহার করে। এই শাল সাধারণতঃ কালো বা ধূসর বর্ণের হইয়া থাকে, তবে কোন কোন স্থলে বাদামী বর্ণের শালও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। শালের প্রান্তটিকে উজ্জ্বল বর্ণে মণ্ডিত করা হয়। কোন কোন অংশের নারীরা স্কন্ধে একটি এবং মাথার উপর আর একটি শাল সংলগ্ন করে। কোনেমারা নামক স্থানের রমণীরা এখনও পূর্ব্বের ন্যায় লাল পেটিকোট পরিয়া থাকে এবং পুরুষরা সাদা ফ্লানেলের জ্যাকেট ধারণ করে। পার্শ্ববর্ত্তী আরাণ দ্বীপের অধিবাসীরা বাছুরের চামড়ায় প্রস্তুত একপ্রকার অদ্ভুত পাদুকা ব্যবহার করে এই সকল জুতা প্যাম্পুটি আখ্যায় অভিহিত। সদ্য নিহত গো-বৎসের চামড়া পায়ে জড়াইয়া রাখা হয়। এই চামড়া যতই শুষ্ক হয় ততই পরিধানকারীর পায়ের ন্যায় আকার ধারণ করিয়া থাকে। একখণ্ড সরু চামড়া গোঁড়ালির চতুর্দ্দিকে বাঁধিয়া এই জুতাকে পায়ের সহিত সংযুক্ত রাখা হয়।

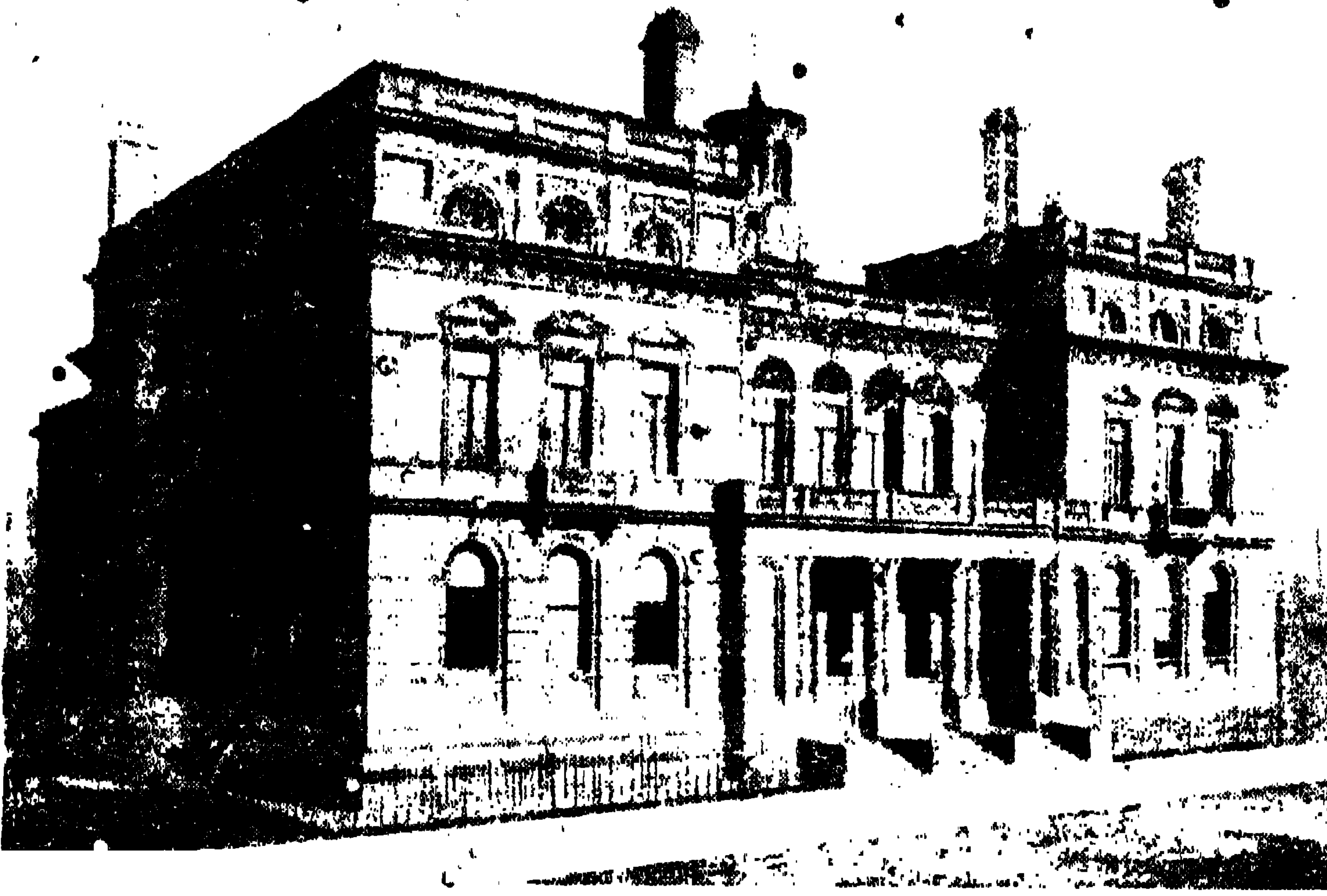
আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আইরিশরা নগর অপেক্ষা নগরাঞ্চলে বাস করিতে ভালবাসে এবং কোলাহল-কম্পিত কল-কারখানা ও আড়ম্বরপূর্ণ অট্টালিকা অপেক্ষা শান্তিপূর্ণ কুটির-শিল্প ও শুভ্র-সুন্দর অনাড়ম্বর কুটিরাবলীতে বাস করা



ফোর্ট-উইলিয়ম পার্ক চার্চ্চ (বেলফাষ্ট)

অধিক পছন্দ করে। ইংরেজরা কিন্তু নাগরিক জীবনই ভালবাসে। সেই জন্য ইংলণ্ডে বহু সমৃদ্ধিশালী সহর শীঘ্র ও সহজেই গড়িয়া উঠিয়াছে। আয়র্লণ্ডের প্রায় সর্ব্বত্রই

চুণকাম করা এবং তৃণাদির ছাউনিযুক্ত কুটির দেখা যায়। কৃষকদিগের বাসস্থল এই সকল কুটিরে দুইটির বেশী কক্ষ প্রায়ই থাকে না। কোন কোন কুটিরে একটি মাত্র ঘর দৃষ্ট হয়। ঘরের ভিতর খোলা উননে আগুন জ্বালাইয়া রাখা হয়। উননের উপর লৌহ নির্ম্মিত রন্ধন-পাত্র বা লৌহ কেটলি হুকের সাহায্যে ঝুলাইয়া রাখিতে প্রায়ই দেখা যায়। এই কেটলিতে আইরিশ নারী মাত্রেরই পরম প্রিয় চা প্রস্তুত করিবার জন্য জল ফুটান হয়। আইরিশ নারীরা চা'কে "টি" না বলিয়া "টে" বলিয়া থাকে। প্রাচীনকালে ইংলণ্ডেও "টে" শব্দ ব্যবহৃত হইত। আইরিশ নারীরা একটি বিশিষ্ট



বন্দর সম্বন্ধীয় নূতন কর্ম্ম মন্দির—বেলফাষ্ট

প্রণালীতে মাংস রন্ধন করিয়া থাকে। একটি মুখ-ঢাকা পাত্রে মাংস রাখিয়া সেই পাত্রটিকে কয়েক ঘণ্টা জ্বলন্ত অঙ্গার আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। এই সকল অঙ্গার বা কয়লা জলায় জাত পিট নামক উদ্ভিদ কাটিয়া ও শুকাইয়া প্রস্তুত করা হয়। আয়র্ল্যাণ্ডের বহু অংশ বগ বা জলায় পূর্ণ সে কথা আমরা পূর্ব্বেই পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি। বগগুলিতে প্রচুর পিট জন্মায়। সুতরাং আয়র্ল্যাণ্ডে পাথরকয়লার পরিবর্ত্তে পিটের কয়লাই ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই দেশে ইন্ধনাভাব কখনও হয় না।

আবেগ-প্রবণ আইরিশ জাতি পরস্পর মিলিতে মিশিতে জীবনের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ এই সকল মেলা। শুধু গ্রামাঞ্চলে নয় প্রত্যেক সহরের পথেও মাসে দুইবার করিয়া মেলা বসে। আয়র্ল্যাণ্ডে উৎকৃষ্ট অশ্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে। বৎসরে দুইবার করিয়া (ফেব্রুয়ারী ও সেপ্টেম্বর মাসে) অশ্ব-সম্পর্কীয় মেলা বিশেষ সমারোহ সহকারে সম্পাদিত হইয়া থাকে। অশ্ব-মেলার ন্যায় শূকর-মেলাও আছে। শূকর-মেলা বৎসরে একবার করিয়া হয়। শূকর-শাবকগুলির মাতাকে ছাড়িয়া থাকিবার মত অবস্থা হইলেই তাহাদিগকে "ক্রিল্‌স" আখ্যায় অভিহিত একপ্রকার বিচিত্রাকৃতি শকটে চড়াইয়া বিক্রয়ের জন্য মেলায় লইয়া যাওয়া হয়। প্রায় সকলেই মেলায় যায়। ক্রয় বিক্রয় ব্যতিরেকে নানাপ্রকার ক্রীড়া-কৌতুক আমোদ-প্রমোদ মেলায় হইয়া থাকে। বাজিকর বাজি করে বা নানাপ্রকার কৌশল দেখায়। গণৎকার হাত বা অন্য কোন অঙ্গ দেখিয়া ভাগ্য নির্ণয় করে। চারণগণ প্রাচীন গীতি ও গাথা গাহিয়া অতীত গৌরবের স্মৃতি জাগাইয়া তুলে। কেহ কেহ বেহালা বাজাইয়া লোকের মনোরঞ্জনে প্রয়াস করে। আয়র্ল্যাণ্ডের জাতীয় ক্রীড়ার মধ্যে হার্লিং এবং গায়েলিক ফুটবল প্রধান। হার্লিং অনেকটা হকি খেলার মত। ভালবাসে বলিয়া তাহারা মেলার বিশেষ পক্ষপাতী। আইরিশ আইরিশদিগের ন্যায় আবেগপ্রবণ জাতির পক্ষে নৃত্যের প্রতি প্রবল অনুরাগ স্বাভাবিক। পূর্ব্বে জিগ এবং রীল-জাতীয় নৃত্য প্রত্যেক বালক বালিকার শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। শীতকালে জনৈক নৃত্য-শিক্ষক গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বালক বালিকাদিগকে নৃত্য শিখাইতেন। বালক বালিকারা প্রতি রাত্রিতে পালাক্রমে নির্দ্ধারিত কোন এক শিক্ষার্থীর ভবনে মিলিত হইয়া শিক্ষকের নিকট পদক্ষেপের প্রণালী শিক্ষা করিত। বেহালা বাজিত এবং বালিকার দল সেই বেহালার সুরে ও তালে পা ফেলিয়া সহর্ষে নৃত্য করিত। রীল নৃত্য এখনও ভালবাসে।

মডার্ণ অভিনয়

শ্রীশক্তিপ্রসাদ দাশ

পল্লীটি কলিকাতা হইতে বেশী দূর নহে। কলিকাতার আবহাওয়া সেখানেও তাই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, সাধারণ পাঠাগার, পল্লী মঙ্গল সমিতি, ইউনিয়ন ক্লাব, ক্রিকেট ক্লাব, ফুটবল ক্লাব—মায় সহরের প্যাটার্ণের সেলুন—কোনটারই অভাব নেই। এখনকার নব্য শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত যুবকদল পল্লীর তথা-কুপিত প্রাচীন পন্থীদিগকে প্রায় সকল কার্য্যেই তাক্ লাগাইয়া দেয়।

এহেন প্রগতিশীল পল্লীতে থিয়েটার হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। বৃদ্ধেরা আরম্ভ করিয়াছেন সামাজিক নাটক। নব্য যুবকেরা আশ্চর্য্য হইয়া যায়। আশ্চর্য্য হইবার একটু কারণও আছে। বৃদ্ধেরা এই বিশেষ ব্যাপারটিতে যদিও যুবকদিগকে একাধিক্রমে চারিটি বৎসর হার মানাইয়া প্রায় চ্যাম্পিয়ান হইবার জোগাড় করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের সাধারণ অভিনয় একটু অন্য প্রকারের ছিল। তাঁহাদের কয়েকটি বাঁধা পালা থাকিত—আর সবই পৌরাণিক। তাহাদের মধ্যে রাম-রাবণের যুদ্ধ—আর দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যে বিবাদ লইয়া একটা কিছু থাকিতই। সবচেয়ে চমৎকার হইত হনুমান আর ভীমসেন। তাহারাই প্রায় দর্শকদিগকে সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্য্যন্ত একভাবে বসাইয়া রাখিত। তাহার উপর তাঁহাদের থাকিত জমকাল পোষাক, এক মহিলা বাদ দিয়া ছেলে হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত ইয়া ইয়া গুম্ফ—দুই এক ডজন নর্ত্তকী। ছেলেরা প্রগতি ভাবাপন্ন; সুতরাং তাহারা করিত সামাজিক অভিনয়। তাহাদের পোষাক ছিল সাধারণ—অঙ্গরাগের মধ্যে বড়জোর পাউডার;—কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা গোলমাল হইত মহিলার পার্ট লইয়া। কেহ প্রাণান্তেও স্ত্রী-ভূমিকায় নামিতে চাহিত না। আর শেষ পর্য্যন্ত অনেক কাঠ খড় পোড়াইয়া যাহারা নামিত, তাহারা স্ত্রী সুলভ হাবভাব আনিতে পারিত না। এই সব নানা কারণে ছেলেরা কোনও দিনই বৃদ্ধদের উপর টেক্কা মারিতে পারিত না। ইহাতে তাহারা মনে মনে ক্ষেপিয়া উঠিত।

সম্প্রতি সেই বৃদ্ধেরা ছেলেদের উপর আর এক কাঠি লইয়া বসিলেন। ছেলেদের মধ্যে কে নাকি তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন—রং মেখে হনুমান সেজে বাহবা নিতে সবাই পারে। দেখাতে পারতে আমাদের মত আর্ট—তো, হুঁ···বুঝে নিতাম। তাঁহারা ভাবিলেন যে ছোকরারা অনেক বিষয়েই তাঁহাদিগকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। একমাত্র এই বিশেষ ব্যাপারে তাহারা পারে নাই। কিন্তু তাঁহার যে বুড়া হাড়ে মায় ভেল্কি পর্য্যন্ত খেলিতে পারেন তাহাই প্রমাণ করা উচিত। সার্ব্বজনীন হরিহর খুড়ো বলিলেন, "বাপু রে, ঘাবড়িও না; এবারে সামাজিকই করবো; ঐ যে কি বলে—চাটুয্যে হে—অরই বই করবো—ঐ কান্ত, কান্ত - হ্যাঁ, ঐ যে শ্রী—."

আশ্চর্য্যের উপর আশ্চর্য্য! একে সামাজিক বই—তায় শরৎ চাটুয্যে—তায় শ্রীকান্ত!

নরেন আসিয়া পরেশকে বলিল, "কি হবে ভাই? ওরা যে শ্রী—"

পরেশও হয় তো কথাটা আগেই শুনিয়াছিল; কিন্তু বোধ হয় বিশেষ খুসী হয় নাই। মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "নে, নে। শ্রীকান্ত? ইন্দ্রনাথ করবে কে রে? রাত্রের সেই এডভেঞ্চারটা—? ঘাটের উপর সেই বুড়ো বটগাছটা? ঝুরি বেয়ে উপর থেকে নীচে নামা—নৌকা বাওয়া, সেই মরা ছেলেটা—হুঁ! করলেই হোল?"

নরেনও আপ্যায়িত হইয়া বলিল, "তা ছাড়া অন্নদা দিদি, পিয়ারী···! মরেছে এবার! আর এত ছোট ছোট ছেলের পার্টই বা করবে কে? ওদের সবাই তো চল্লিশের উপর!"

সামনে একটি দশ বার বৎসরের ছেলে দাঁড়াইয়াছিল। সম্বন্ধে সে হরিহরের খুড়োর তৃতীয় পক্ষের সম্বন্ধী। তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "খবরদার বলছি, গুপে, ওদের ওখানে ঢুকবি না। তোদের মত fifth columnist নিয়েই তো সব মাটি।"

বৃদ্ধদের পুরাদমে রিহার্শেল আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। অভিনেতাদের সকলেরই বয়স চল্লিশের উর্দ্ধে। বঙ্গদেশে শৈত্য ও উষ্ণতামিশ্রিত আবহাওয়ায় যাহাদের জন্ম—ও ভাত নামক

পদার্থ যাহাদের খাদ্য, তাহাদের এই বয়সেও যে এত উৎসাহ থাকিতে পারে তাহা ইঁহাদিগকে না দেখিলে বিশ্বাস হয় তো হইত না। সবই প্রায় ঠিক্। এক ইন্দ্রনাথকে লইয়া গণ্ডগোল বাঁধিয়াছে। হরিহর খুড়ো নুটবিহারীকে বলেন, "নুটু, তুই নে।"

নুটবিহারী বলেন, "হরে, তুই-ই নে।"

ইঁহাদের আসল আপত্তি এই যে, কেহই গুম্ফ কামাইতে রাজী নহেন। অথচ সগুম্ফ ইন্দ্রনাথ তো আর সম্ভব নহে।

রাসবিহারীবাবুর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। গুম্ফের উপর তাঁহার দরদ অগাধ। তাঁহার প্রাণপ্রিয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শ্রাদ্ধেও তিনি তাঁহার গুম্ফটি বজায় রাখিয়াছিলেন। চাকরিতে এই গুম্ফের জোরেই তাঁহার গাম্ভীর্য্য বজায় রহিয়াছে ষোল আনা ও উন্নতিও সেই জন্য চড়্ চড়্ করিয়া হইয়া চলিয়াছে। সাহেব তাঁহার গুম্ফের তারিফ করিয়া থাকেন অনেক। এই গুম্ফ কামাইবারও তাঁহার কোনদিন আবশ্যক হয় নাই। কারণ থিয়েটারে তিনি চিরদিনই হয় রাবণ না হয় ভীমসেন সাজিয়াই আসিয়াছেন। তাছাড়া নিজেকে তিনি বনেদি বংশের একজন বলিয়াই মনে করিতেন; এবং বনেদি বংশের চরম বিশেষত্ব তিনি মনে করিতেন এই গুম্ফ। তবে যিনি রাসবিহারীবাবুর গুম্ফকে আধুনিক রুচি-বাগীশ বাবুদের গুম্ফ বলিয়া বিবেচনা করিবেন তিনি বিষম ভুল করিবেন। বাটার ফ্লাই বা ফ্রেঞ্চকাটের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। তাঁহার গুম্ফের সম্মুখ ভাগে অসংখ্য ঝুঁর নামিয়া মুখবিবরটিকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। দুই পাশে যে একটু সংস্কার করা হইয়াছে তাহারই মধ্য দিয়া রাসবিহারী বাবুর মনের ভাব প্রকাশিত হয়। তিনি যখন দুগ্ধ বা অন্য কিছু তরল পদার্থ পান করেন তখন ঐ গুম্ফের মধ্য দিয়াই, তাহা পরিশুদ্ধ হইয়া মুখবিবরে প্রবেশ করে তিনি স্পষ্টই বলিয়া থাকেন —আরে ছো, ঐ সব গোঁফ কামানো ডেঁপো ছোকরাগুলোর মেয়েলিপনা দেখলে গা জ্বলে যায়। পুরুষত্বের চিহ্নই হচ্ছে গোঁফ। সেই গোঁফ কামিয়ে অষ্টবজ্রের মত এঁকে বেঁকে চলাটা আজকাল নাকি একটা আর্ট।

কথিত আছে একবার তাঁহার পুত্র নাকি সখ করিয়া গুম্ফ কামাইয়া বাড়ী আসিয়াছিল। পিতা জানিতে পারিয়া হুকুম দেন, যতদিন না গোঁফ গজায় ততদিন আমার বাড়ীতে ঢুকতে পাবে না।

যাই হোক্, এ হেন রাস ভারি রাসবিহারী বাবু যখন গুম্ফ কামাইয়া শ্রীকান্ত করিতে রাজি তখন হরিহর ভট্টাচার্য্য বা নুটবিহারী মিত্রের পক্ষে গুম্ফ না কামানোটাই তো বেয়াদবি।

নুটবিহারীর আপত্তির কারণ এই যে, তাঁহার গুম্ফের উপর তাঁহার নিজের কোন অধিকার নাই। উহা মা কালীর নিকট মানসিক রহিয়াছে। গতবারে সহধর্ম্মিণীর অসুখের সময় তিনি উহা মানসিক করিতে বাধ্য হইয়াছেন। নইলে ইত্যাদি ইত্যাদি···

কারণটা যাহাই হউক—তাহার সঙ্গে মা কালীর নামটা থাকায় সকলকেই সে গুম্ফের আশা পরিত্যাগ করিতে হইল। বাকি রহিল হরিহর খুড়ো। তাঁহার আপত্তি এই যে, তিনি তৃতীয় পক্ষের নিকট মুখ দেখাইতে পারিবেন না। যতই হোক—ছেলেমানুষ স্ত্রী—হাসিয়া ফেলিতে কতক্ষণ! আর স্ত্রী হইয়া হাসিবে—সে তিনি বরদাস্ত করিবেন না।

রাসবিহারীবাবু বলিলেন, বেশ তো হে, খুড়ীর কাছে মুখ দেখাতে না পার, দেখিয়ো না। ও চন্দ্রবদন কয়টা দিন না দেখালেও খুড়ীর মূর্চ্ছা যাবার মত অবস্থা হবে না। গোঁফ গজালে তখন বাড়ী যেয়ো।

হরিহর খুড়ো আমতা আমতা করিয়া বলিলেন;—আজ্ঞে, তাও কি হয়? ছেলেমানুষ বউ, কোথায় একলা থাকবে।

তারপর একটু ভাবিয়া বলিলেন, তার চেয়ে এক কাজ করা যাক। গোঁফটা খানিকটা ছেঁটে দোব তা হলেই চলে যাবে। আজকাল বার তের বছরেই তো গোঁফ বেরোয়।

এ যুক্তি বড় মন্দ নয়। অস্ফুট একটা গুঞ্জন ধ্বনি শোনা গেল। কিন্তু সে সকলকে চাপা দিয়া রাসবিহারীবাবু বলিলেন, পাগল হয়েছো? তোমার জন্তে প্লেটাই মাটি করবো? আজকালকার ডেঁপো ছোড়াদের দস্তুরই হচ্ছে গোঁফ কামিয়ে মোদ্দা বিবি সাজা আর ইন্দ্র ছোড়াটা হচ্ছে একের নম্বর ডেঁপো। ঐ বয়সেই সে সেকেণ্ড পণ্ডিতের টিকি কেটেছে, স্কুলের সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়েছে, গার্জ্জেনগুলো ওর কিছুই করতে পারে নি—তা'ছাড়া মারামারি, কাটাকাটি নৌকা বাওয়া, মায় সিদ্ধি, গাঁজা, চরস, তার উপর মাছচুরি উঃ, কি ভীষণ ছেলে? এমন আর একটা ছেলে থাকলেই দেশটাকে জ্বালিয়ে তুলতো! ছোড়াটার ভয় বলে কিছুই ছিল না হে! এ হেন এচোড়ে পাকা ছেলের গোঁফ থাকবে?

রামচন্দ্র! ওসব ছেলে মার পেট থেকে পড়তে না পড়তেই গোঁফ চাঁচতে আরম্ভ করে।

তাও তো বটে! হরিহর ভট্টাচার্য্য তবুও বলিলেন, দেখুন, রায়মশায়; গোঁফটা খু-উ-ব ছোট করে ছাটলে হবে না?

রাসবিহারীবাবু;—কি করে হবে? ডেঁপো ছোড়ারা যখন টিটকিরি দেবে তখন?

ভট্টাচার্য্য খুড়োর উপর সহানুভূতি অনেকের ছিল দেখা গেল। উপস্থিত সভ্যগণের অনেকেই বলিলেন যে, ডেঁপো ছোড়াদের প্রবেশ নিষেধ করিয়া দেওয়া হইবে। এবং সেই জন্য দ্বার দেশে উপযুক্ত প্রহরীর ব্যবস্থাও করা হইবে।

রাসবিহারী কি করিতেন জানি না; কিন্তু "অন্নদাদিদি"-ই সবংমাটি করিয়া দিলেন। অন্নদাদিদি ইন্দ্র হইতে চাহেন—ইন্দ্র অন্নদাদিদি হউন।

কিন্তু তাহা করিলেই বা সমস্যার সমাধান হয় কোথায়? রাসবিহারীবাবু তবুও বলিলেন, বেশ, তাই। আর তা না হলে সরে পড়।

হরিহর খুড়োর সম্মুখে মহাসমস্যা। অভিনয় তাঁহাকে করিতেই হইবে—তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী যতক্ষণ বর্ত্তমান। তাহার উপর ছোকরাদের নিকট প্রতিপত্তি বজায় রাখিতে গেলেও তাঁহার অভিনয় বন্ধ করিলে চলিবে না। এখন কথা হইতেছে হয় "ইন্দ্রনাথ"—আর না হয় "অন্নদাদিদি।" "অন্নদাদিদি"র স্ত্রী বিয়োগ হওয়ায় যাহা সম্ভব হইয়াছে—তাঁহার পক্ষে তাহা সম্ভব নাও হইতে পারে। ইন্দ্রনাথ-ই সকল দিক দিয়া তাঁহাকে সুট করে। প্রথমতঃ আফিং, সিদ্ধি, চরস, গাঁজা প্রভৃতিতে তিনি ইন্দ্রনাথকেও ছাড়াইয়া যাইতে পারিবেন আশা করা যায়, দ্বিতীয়তঃ খিস্তিতে তিনি ইন্দ্রনাথকেও হার মানাইবেন একথা হলপ করিয়া বলা যায়। বিপদ এক গুম্ফ লইয়া। তা না হয় আর কি করা যাইবে? চাঁদা দিয়া অভিনয় পরিত্যাগ করা বা ছিন্ন সাড়ী পরিয়া বেদেনী সাজা অপেক্ষা গুম্ফহীন ইন্দ্রনাথ অনেক ভাল।

নরেশ আসিয়া পরেশকে বলিল, বুড়োরা কি সত্যই এবারে আমাদের ডুবিয়ে দেবে?

পরেশ যে একথা ভাবে নাই এমন নয়। কিন্তু ভাবিয়াও কোন কুল কিনারা দেখিতে পাইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। তবুও বলিল, আমরা কি আর ঘাসে মুখ দিয়ে চলি হে? দেখাই যাক্ না!

যোগেশ বলিল, ধান দিয়ে তো আর লেখাপড়া শিখিনি! দস্তুর মত পয়সা খরচ করতে হয়েছে। তা ছাড়া চল্লিশ হাজার ছেলেমেয়ের সামনে দিয়ে বুক ফুলিয়ে অঙ্কে পাশ করে এসেছি বাবা, হু। এ আর হরিহর ভট্‌চায বা মুটবিহারী মিত্তির নয়। মাথা ভাঙলে এখনো কিছু বেরোবে।...হু!...

এইখানে একটু বলিয়া রাখা আবশ্যক শ্রীমান যোগেশচন্দ্র চৌধুরী উপর্য্যুপরি তিনবার ফেল করিয়া এই বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় সসম্মানে তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

কিন্তু এ হেন মস্তিষ্কেরও তারিফ কেহ করিল না। তাহাদের সকল বিষয়েরই প্রতিদ্বন্দ্বী বুড়োরা যে আজ এমন করিয়া তাহাদিগকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিবেন, ইহা তাহারা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। কিন্তু সেই স্বপ্ন যখন আজ সত্য সত্যই বাস্তবে পরিণত হইবার জোগাড় হইল তখন ছেলেরা বাস্তবিকই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাহাদের মুখের মত একটা উত্তর দিতে হইবে—এ বিষয়ে কাহারও দ্বিতীয় মত নাই। কিন্তু কোন পথ ধরিলে যে মুখের মত একখানা জবাব দেওয়া যাইতে পারে—সে বিষয় কেহই কিছু স্থির করিতে পারিল না। এমন সময় ভগবানের আশীর্ব্বাদের মতই হরিশের আবির্ভাব হইল। হরিশ মুখার্জ্জি সম্প্রতি বঙ্গ ভাষায় এম, এ পরীক্ষা দিয়া আসিয়াছে ছেলে হিসাবে হরিশ এক টুকরা রত্ন। ডক্টরেটের থিসিস্ সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। পরীক্ষার ফল বাহির হইবার অপেক্ষা মাত্র। ইহার উপর শোনা যায় সে একজন সাহিত্যিক এবং সাহিত্য সম্বন্ধে এক নূতন গবেষণা সে নাকি বর্ত্তমানে করিতেছে। আরও একটা কথা, হরিশ মুখার্জ্জি চিরকালই নাকি আলট্রা মডার্ণ, প্রাচীন পন্থীদিগকে চিরকালই সে ওল্ড ফুলের দলে ফেলিয়া থাকে। জামা-কাপড়, কথা-বার্ত্তায় সে ইচ্ছা করিয়াই নাকি কম সম অর্দ্ধশতাব্দীর অগ্রবর্ত্তী যুগের। যাহারা মনীষি তাহারা নাকি চিরদিনই বর্ত্তমান যুগের অগ্রবর্ত্তী। হরিশের সম্বন্ধে এইরূপ অনেক কিছুই তাহারা শুনিয়াছে। গ্রামে সে কোনও দিনই থাকিত না; বিশেষ করিয়া এই জন্যই গ্রামের ছেলেদের নিকট তাহার কদর এতটা বাড়িয়া গিয়াছে।

কিন্তু এ যেন হরিশ মুখার্জ্জির সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া ও বিশেষরূপে আদ্যোপান্ত অবধান করিয়া যখন "মেঘনাদ বধ" অভিনয় করিবার প্রস্তাব করিল—তখন কিন্তু তাহার পল্লী বন্ধুরা সত্য সত্যই দমিয়া গেল। চোরার মুখে ধর্ম্ম তত্ত্ব ব্যাখ্যা বা ভূত নামক অশরীরির নিকট রাম নামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনও তাহারা বিশ্বাস করিতে হয় তো পারিত কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখোজ্জ্বলকারী হরিশ মুখার্জ্জির নিকট আদ্দিকালের রাম-রাবণের যুদ্ধেরও মোটা ধরণের একটা কাহিনী অভিনয় করিবার প্রস্তাব কি কেহ সজ্ঞানে শুনিবে আশা করিয়াছিল।

নরেশ বলিল, বুড়োরা কর্চ্ছে শ্রীকান্ত, আর আমরা করব মেঘনাদ বধ ?

পরেশ বিরক্তভাবে বলিল—"তার চেয়ে বালিবধ কল্লেই হয়—সবই হনুমান।"

যোগেশ প্রশ্নাত্মক ভাবে গলার সুর করিয়া বলিল—"অপরেশ মুখুজ্যের···

দারুণ অবজ্ঞামিশ্রিত ছোট একটু হাসি হাসিয়া হরিশ বলিল—"কোন মুখুজ্জেরই নয়।"

তারপর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি নিজের বক্ষের দিকে বাড়াইয়া বলিল, "এই শর্ম্মাদের ! আমি কি একটা old fool ? বুড়োরা কর্চ্ছে শ্রীকান্ত, আর আমরা করবো modernised মেঘনাদ বধ।"

সকলেই বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"modernised ! মানে ?"

হরিশ বলিল—"চরিত্রগুলোকে সব modern করে ফেলা হবে, এই আর কি। নামগুলো ঠিকই থাকিবে। অবিশ্যি পাল্টে দেওয়া যায় না এমন নয়, কিন্তু তা হ'লে তো আর publicকে চমকে দেওয়া যায় না। তারপর base করা হবে মাইকেলের মেঘনাদ। Dress হিসেবে রাম রাবণের সকলের হবে খাকি military। তীর ধনুকের বদলে থাকবে বন্দুক, রিভলভার চাবকামান ইত্যাদি।" তাদের মধ্যে যুদ্ধ মানে হচ্ছে আড়ালে আড়ালে—অর্থাৎ কেউ কারো মুখোমুখি হবে না, সেনাপতিরা ত নয়ই—কারণ সভ্য জগতে বিশেষতঃ 20th centuryতে কোনও সেনাপতিই যুদ্ধ করে না। দু'টো Army Head Quarters চাই—ব্যস্। সঙ্গে Radio station, সেখান থেকেই সব সংবাদ সরবরাহ হবে। বানরদের সব ল্যাজ কেটে দেও।"

যোগেশ প্রতিবাদ করিয়া বলিল—"ল্যাজ কাটা বানর। সে কি রকম হবে। তারপর বিশেষ করে ঐ ল্যাজটাই publicকে সারারাত্তির বসিয়ে রাখবে।"

হরিশ চটিয়া উঠিয়া বলিল—"দেখ, এটা হচ্ছে বিংশ শতাব্দী মানে century 20th, ওসব ল্যাজ-ট্যাজে আমরা বিশ্বাস করি না। আর বানর নিয়ে কি কখনও যুদ্ধ হয় করা যায় ? ওসব রামের সুশিক্ষিত অনার্য্য সৈন্য। তারপর আরও একটা কথা। রাবণ কথা কইবে পালিভাষায় আর রাম কথা কইবে আরবী ভাষায়।

সর্ব্বনাশ ! যোগেশ বলিল—আরবী ?

পরেশ বলিল—"সে আবার কি ?"

হরিশ গম্ভীর হইয়া উত্তর দিল—"philology পড়তে তো বুঝতে।"

উপস্থিত দুই একজন বলিল—"কিন্তু public বুঝতে পারবে কেন ?"

হরিশ একটু চটিয়া বলিল—"অশিক্ষিত publicকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে playটার spiritটা তো আর নষ্ট করা যায় না।

সকলেই প্রায় অভিনয়ের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিল। যোগেশ বলিল—"দেখ, বাপ ঠাকুর্দ্দার আমল থেকেই তো শুনে আসছি যে রাম রাবণ বাংলা ভাষাতেই কথা বলছে।"

অতিরিক্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া হরিশ বলিয়া উঠিল—"বাংলা ভাষায় ? হোপলেশ। রাম হোল অযোধ্যার লোক আরবী বা পূর্ব্বী হিন্দীই হচ্ছে ওখানকার ভাষা। রাবণ লঙ্কার রাজা—সেখানকার রাজভাষাই হচ্ছে পালি।

এবার সকলেই প্রতিবাদ করিয়া উঠিল—"তা হলে ও প্লেটা হতেই পারে না, আমরা তো আর ওসব বিদঘুটে ভাষার কিছুই জানি না।"

যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হইল যে বাংলা ভাষাতেই অভিনয় হইবে। তারপর casting আরম্ভ হইল।

হরিশ বলিল—"চরিত্রের মধ্যে প্রধান জিনিষ এই যে, গোঁফ কারুর থাকবে না।"

দুই একজন বলিয়া উঠিল—"রাবণেরও না ?"

হরিশ চটিয়া আগুন। রাবণ! না, এই সব foesilised anti-quarian নিয়ে play করা চলে না। আরে সুসভ্য রাজা রাবণ, স্বর্গ মর্ত্ত, পাতাল যার ভয়ে থর থর করতো— সেই রাজার থাকবে গোঁফ! ওটা ত' অসভ্য অনার্য্যদেরই বিশেষত্ব। কোনও সভ্যদেশের লোক গোঁফ রাখে? দেখছ, রাবণই বল, কুম্ভকর্ণই বল আর মেঘনাদই বল—লঙ্কার কারুরই গোঁফ থাকবে না।"

পার্ট ঠিক হইয়া গেল। মেঘনাদ বধের hero মেঘনাদ, তাহার স্ত্রী প্রমীলা। এই দুইটি লইয়া একটু ভাবিবার কথা আছে।

হরিশ বলিল—"দেখ heroকে ভালই করতে হবে। যুদ্ধ করতেও যেমন সে মজবুত, প্রেম করতেও তেমনি—লেখা পড়াতেও তাই—মানে যাকে বলে একেবারে ইয়ে—"

সবাই হরিশকে অনুরোধ করিয়া বলিল—"দেখ ওটা তুমিই নাও।"

হরিশ বলিল—"দেখ, একে ত' আমার সময় কম থিসিসটার জন্য বড্ড খাটতে হচ্ছে। তা ছাড়া—আমার art কি ঠিক এরা .. মানে··· mass বুঝতে পারবে? হাঁ। play করেছিলাম একবার University Instituteএ। কোন এক মিসেস্ মুখার্জ্জি ত' আমায় একখানা মেডেলই offer করে বসলেন। তাছাড়া সেবারকার New Empireএ modernised শকুন্তলা···উঃ সে একটা দিন! তারপর এক মুস্কিল···মানে অভিনয় শেষ হবার পর কি congratulation এর ঠেলা! তবে হাঁ, রেবা রায় পাশে মানে শকুন্তলা ছিলেন বলেও playটা খাসা উতরেছিল। তা থাক্···মানে কি জান...এটা হচ্ছে একটা inborn faculty···

হরিশকে যদিও বা রেহাই দেওয়া যাইত কিন্তু ইহার পরে তাহাকে আর রেহাই দেওয়া চলে না। সকলেই বলিল— "তোমাকে ওটা নিতেই হবে হরিশ, কোনও কথা শুনছি না কিন্তু।"

হরিশ একটু হাসিয়া বলিল—"বেশ, তা নয় হোল কিন্তু প্রমীলা কাকে করছো?"

যোগেশকে দেখাইয়া পরেশ বলিল—"কেন, যোগেশ।"

হরিশ বলিল—"যোগেশ! সে কি হে? প্রমীলার মত অমন educated girl মানে শুধু educated নয়··· accomplished in every respect, শুধু তাই নয়... মেঘনাদের সহধর্ম্মিণী—মানে—better-half সে হবে ঐ যোগেশ? হো-প-লে-শ! দেখ, আমি যদি হই মেঘনাদ, প্রমীলা হবে রেবা—দেখবে ও একাই মাতিয়ে দেবে। গানের সম্বন্ধে ও একটি ওস্তাদ—খেয়াল বল, ঠুংরি বল, আর টপ্পাই বল, কোনটাই ওর অজানা নেই—তারপর ছুরিও চমৎকার জানে—তা ছাড়া Oriental dance competitionএও হয়েছে একেবারে first, বুঝলে কি না—"

যোগেশ বলিল—"উনি কি এখানে মানে—এই পল্লীতে আসবেন?"

হরিশ হাসিয়া বলিল, "সে ভাবনা আমার।"

আনন্দের একটা সাড়া পড়িয়া গেল। বৃদ্ধদের মুখে চুণ-কালির প্রলেপ দেওয়া তা' হইলে বিশেষ কঠিন হইবে না।

প্রথম দিনের অভিনয় বৃদ্ধদের।

লোকে লোকারণ্য। গ্রীনরুমে রাসবিহারীবাবু চার্ট হাতে করিয়া বসিয়া আছেন। ওদিকে বিষ্টু নাপিত তাঁহার সামনে বসিয়া আছে, রাসবিহারীবাবুর কাহাকেও বিশ্বাস নাই। এক এক জনকে ডাকিয়া তাহাকে ক্ষৌরকর্ম্ম করিতে বিশেষ করিয়া গুম্ফ কামাইতে আদেশ করিতেছেন। পাছে সময়মত কেহ বিগড়াইয়া যায় এই জন্য তিনিই সর্ব্বপ্রথমে গুম্ফ কামাইয়া ফেলিয়াছেন।

অভিনয়ের সময় উপস্থিত। অথচ ইন্দ্রনাথ এবং অন্নদাদিদির দেখা নাই। অন্নদাদিদি পরে হইলেও চলিবে। কিন্তু ইন্দ্রনাথ না হইলে অভিনয় সুরু হইবে কি প্রকারে?

ছেলেদের চীৎকার বাড়িয়াই চলিয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দর্শকগণও বিরক্ত হইয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে! অথচ ইন্দ্রনাথের আক্কেল দেখ। রাসবিহারীবাবু কি করেন, হুকুম দিলেন, "সিন তোল—মারামারিটা হয়ে যাক্ তো আগে।"

সিন উঠিল। শ্রীকান্তের উপর দমাদম ছাতার বাঁট পড়িতেছে। কিন্তু কোথায় ইন্দ্রনাথ! শ্রীকান্ত কাঁদিতেও পারে না, পলাইতেও পারে না। চারপাশ দিয়া সকলে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। ইন্দ্রনাথ নইলে এই ব্যূহ ভেদ করিয়া কে তাহাকে রক্ষা করিবে?

সিনটা জমিয়া উঠিয়াছে বেশ। ছেলেরাই উপভোগ করিতেছিল বেশী; তাহারা চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "বেশ হচ্ছে, লাগাও জোরসে!"

হঠাৎ ইন্দ্রনাথের আবির্ভাব। ইন্দ্রনাথ আসিতে না আসিতেই সকলে সরিয়া পড়িল। শ্রীকান্ত কিন্তু ইন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়াই 'থ', ইঃ! অর্দ্ধেক গোঁফ কামান—দু'পাশে এখনও সাবানের ফেনা, এক গাল দাড়ি! হতভাগা করিয়াছে কি? উপস্থিত জনতা হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ইন্দ্রনাথের অবস্থাটা বুঝিয়া লইবার মত। রায়ম'শাইএর কঠিন দৃষ্টির সম্মুখে এতটুকু হইয়া গিয়া বলিলেন, "কি করি বলুন? গেলুম বাঁশবেড়ে বৌকে আনতে। বৌ কিছুতেই আসবে না কিন্তু এমন একটা থিয়েটার…স্বয়ং রাসবিহারীবাবু নেমেছেন…আর দেখবে না। কত করে বুঝিয়ে আনলাম। তা এসেছি বটে, ৬ মাইল পথ…৩ ঘণ্টায় এসেছি? যেন উড়ে এলাম। তাঁরপর…গোঁফ…। এসেই কামাতে বসলাম। সবে আদ্দেক হয়েছে, এমন সময় অবিনেশ এসে বল্লে—ভট্‌চায মশাই, তাড়াতাড়ি…ওদিকে রায়ম'শাইকে পিশে মেরে ফেল্লে যে! আর কি বসে থাকতে পারি! তাই তো এই অবস্থায় ছুটে এলাম।

ছেলের দলকে আর চুপ করান গেল না। তাহারা চীৎকার করিয়া হাততালি দিতে লাগিল। দর্শকগণ আর কাহাতক বসিয়া থাকিবে?

স্ক্রিন পড়িয়া গেল।

রায়ম'শাই বাহিরে আসিয়া করজোড়ে দর্শকদিগকে একটু চুপ করিয়া থাকিতে বলিলেন। অভিনয় আবার নুতন করিয়া আরম্ভ হইবে।

সিন উঠিল।

মারামারির পালা নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইলে, ইন্দ্রনাথ এক মুঠা সিদ্ধি গালে ফেলিয়া একটি সিগারেট ধরাইয়াছে—এমন সময় আর এক গণ্ডগোল। রামসিং ষ্টেজের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। কি বিভ্রাট! ইন্দ্রনাথ চোখ টিপিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল। এদিকে রামসিং শ্রীকান্তের ঘাড় ধরিয়া বলিল—তুম দিল্লাকি পায়া হ্যায়—বলিয়াই দুই কিল? হাহা করিয়া অনেকেই ষ্টেজের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

ব্যাপারটি এই। রামসিং, রায়ম'শায়ের দরোয়ান। নুতন বহাল হইয়াছে। রায়ম'শায়ের জন্য খাবার আনিয়া তাঁহাকে খুঁজিতেছিল।

রামসিংহ যেখানে খাবারটি রাখিয়া দেয়, রায়ম'শাই সেখান হইতে খাবারটি লইয়া যান। ইতিমধ্যে রামসিংহ প্রভুকে খুজিতে খুজিতে সেইখানেই উপস্থিত হয়। গোঁফ কামান প্রভুকে চিনিতে না পারিয়া মনে করিল অন্য কেহ খাবার লইয়া গেল। এই কারণে সে প্রভুর পিছু পিছু আসিয়া সরাসরি ষ্টেজে ঢুকিয়া পড়ে।

মহা হৈ-চৈ। রামসিং কিছুতেই তাহাকে ছাড়িবে না। এদিকে টিট্‌কিরির অন্ত নাই…ষ্টেজে ঢিলের পর ঢিল আসিয়া পড়িতেছে। সকাল হইতে আকাশে মেঘ ছিল, তখন বেশ একটু ঝড় আরম্ভ হইয়া গেল, বৃষ্টিও পড়িতে লাগিল টিপটিপ করিয়া।

ইহার পর অভিনয় করা বিড়ম্বনা মাত্র।

ছেলের দলের বিদ্রূপ ও প্রকৃতির বিদ্রূপের মধ্য দিয়া বৃদ্ধদের সখের থিয়েটার ভাঙ্গিয়া গেল।

* * *

পরদিন সকাল হইতে ছেলেদের সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। যে বৃদ্ধদিগকে কাল তাহারা প্রকৃতির বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া নাজেহাল হইতে দেখিয়াছে তাহারা যে আজ স্বেচ্ছায় তাহাদের অভিনয় সাফল্যমণ্ডিত হইতে দিবে এ ভরসা তাহাদের ছিল না। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয়ের জন্য তাহারা প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে লাগিল। কিন্তু গোলমাল হইল হিরো এবং হিরোইন্ লইয়া। হরিশের রিহার্সাল সুবিধা হইতেছিল না। কেহ কেহ এবিষয় অভিমত প্রকাশ করিলে সে রেবা রায়ের দোহাই দিয়া বলিত, "আরে partner না হ'লে কখনও proxy দিয়া অভিনয় জমে? দুটো দিন একটু চুপ থাকো, আসল দিনে দেখে নিয়ো…" ইত্যাদি।

রেবা রায়কে আনিতে আজ দুইদিন হইল হরিশ কলিকাতায় আসিয়াছে। ছেলেরা চাঁদা তুলিয়া তাহার ট্রেণ-ভাড়া, ট্যাক্সি-ভাড়া ইত্যাদি অগ্রিম দিয়া দিয়াছে।

দুপুরে হরিশ আসিয়া হাজির। রুক্ষ তাহার চুল, মুখে মলিন কান্তি। সকলে প্রশ্ন করিল, "রেবা কোথায়?"

হরিশ উত্তর করিল, "একটা accident হয়—সে এখনও হাঁসপাতালে···বাঁচবে কি না সন্দেহ।"

যোগেশ অপমান ভুলিয়া যায় নাই। সে ছাড়িল না, বলিল, "আসলে রেবা রায় বলে কেউ ছিল কি? চাল ত' খুব দিয়েছিলে···যত্ত সব—"

হরিশের এতবড় একটা ধাপ্পা যে পাড়াগেঁয়ে ছেলেরা ধরিয়া ফেলিবে—এ আশঙ্কা যে কারণেই হউক হরিশের হয় নাই। রেবা রায় বলিয়া কাহারও অস্তিত্ব হয় ত' থাকিতে পারে—কিন্তু তাহার সহিত হরিশের পরিচয় কোনও কালেই ছিল না।

সে সময়টা ঐরূপ কথা সে হঠাৎ খেয়ালের বশেই বলিয়া ফেলিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, দেখাই যাক না, পরে যাই হোক একটা কিছু করা যাইবে। কিন্তু অভিনয়ের দিন যতই অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল ততই প্রাণটা তার টিপ টিপ করিতে লাগিল। শেষ পর্য্যন্ত অ্যাক্সিডেন্ট হইয়াছে না বলিলে উপায় আর কিছু ছিল না।

যাই হোক, সকলের অনুরোধে ও বিশেষ করিয়া দলের সম্মানার্থে যোগেশই প্রমীলা সাজিল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া বৃদ্ধেরা আসিয়াছেন অভিনয় দেখিতে। দুই একজন নাক সিঁটকাইয়া বলিলেন, "আবার modernised মেঘনাদ, হুঁ! ইচ্ছে করে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জুতো-পেটা করি।"

সিন উঠিয়াছে। রাবণরাজার সভা। রাবণ কৌচের উপর হেলান দিয়া প্রাতঃকালীন সংবাদপত্র পড়িতেছেন। সম্মুখে ছোট একটী টিপয়ের উপর ব্র্যাণ্ডির বোতল। আধ বোতল ব্র্যাণ্ডি ঘট ঘট করিয়া পান করিয়া রাবণ উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর চার্চ্চিল-প্যাটার্ণে চুরুট ধরাইয়া পায়চারি করিতে লাগিল। বৃদ্ধমন্ত্রী মারণের প্রবেশ। চশমা চোখে প্রভুর কাছে আসিয়া মিলিটারি স্যালুট করিয়া বলিল, "Good morning Sir."

মুটবিহারী মিত্তির বলিলেন, "দেখছো খুড়ো, চুরুট খাওয়ার ঘটা। আমরা এখানে বসে আছি, আর ওরা দিব্যি চুরুট ফুঁকছে। না, দাদা, এর যদি বিহিত একটা না কর ত' ঘরে ছেলে রাখাই দায় হয়ে পড়বে।"

এ দিকে দর্শকবৃন্দ ব্যস্ত হইয়া পড়িল। আধ ঘণ্টা হইল রাবণ কেবল পায়চারির সঙ্গে সঙ্গে এক একবার মাত্র হুম্ হুম্ করিতেছে।

গোলমালের চোটে মারণ একটু ঘাবড়াইয়া গিয়া বলিল, "মহারাজ, শুনিয়াছেন যুদ্ধের বারতা?" রাবণ উত্তর করিল না। মারণ এবার কথা কহিল গদ্যে, "কাল রাত্রে পশ্চিম দিকে শত্রুর উপর ডাইভ বোম্বিং করা হয়েছে—তাতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠে। আজ সকালে ডিনামাইট ষ্টিক আর ব্যায়োনেট নিয়ে আমাদের সৈন্যেরা ভীষণ যুদ্ধ করছে। বীরবাহুর সৈন্যদের কাছে সুগ্রীবের সৈন্যেরা পেরে উঠছে না। শুনলাম সুগ্রীবকে নাকি ডিস্‌চার্জ করে রাম স্বয়ং কম্যাণ্ড নিয়েছে।"

দর্শকগণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না বৃদ্ধেরাও তাই মুটবিহারী মরিয়া হইয়া বলিলেন, "ডেঁপোমি করবার আর জায়গা পাও নি? ঐসব কথা রামায়ণে লেখা আছে?"

কিন্তু এত কথার পরও রাবণ কথা কয় না। একা মারণ কাঁহাতক বকিতে পারে? রাবণের হইল কি? মারণ আগাইয়া গিয়া বলিল, "বল না হতভাগা, শুনিয়াছি মন্ত্রিবর···"

রাবণ পার্ট ভুলিয়া গিয়াছিল। মারণের কথা শুনিয়া তাহার মনে পড়িল। কিন্তু কথাটা এত জোরে বলা হইয়াছিল যে তাহা দর্শকবৃন্দের অনেকেই শুনিয়া ফেলিয়াছিল। হো-হো করিয়া অনেকেই হাসিয়া উঠিল। ছেলেরা চেঁচাইয়া উঠিল, "শুনিয়াছি মন্ত্রিবর—বল না হতভাগা!"

হঠাৎ টেলিফোন বাজিয়া উঠিল···ক্রীং···ক্রীং···ক্রীং··· রাবণ এবারে মরিয়া। ফোনটা জোরে টানিয়া লইয়া বকিতে আরম্ভ করিল—হ্যালো···Army Head Quarter—20th Garrison? হোয়া···ট··· হো···য়া···

তারপর পতন ও গোঙানি।

মারণ একটুকাল হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; কারণ ঠিক এই সময়ে রাবণের পতন ও মূর্চ্ছার কোনও কারণ ছিল না। তথাপি রাবণের যখন পতনই হইল—তখন মন্ত্রী হইয়া নিছক ত' দাঁড়াইয়া দেখা যায় না। তাই মারণ বুদ্ধি খরচ করিয়া কিছুটা ব্রাণ্ডি রাবণের মুখে ঢালিয়া দিয়া প্রশ্ন করিল —এ কি মহারাজ?

সহসা রাবণ লাফাইয়া উঠিয়া বলিতে লাগিল—কি হবার রহিয়াছে বাকি? দুষ্ট শত্রুদল করিয়াছে ব্যবহার কামানে

গ্যাসের। সৈন্য মোর কেঁদে, কেঁদে হয়েছে আকুল। আর হেন Prime minister, preparation করনিক কিছু?

মারণ বলিল—মানে, কি মহারাজ…

রাবণ হাঁকিয়া বলিল—রেখে দাও মানে তব। শোন তারপর—তারপর…তারপর…হো হো…বক্ষ যায় মোর… বীরবাহু…পুত্ররত্ন মোর has succumbed to eternal darkness in hospital today!

মারণ…এ্যা…

রাবণ টেলিফোনের দিকে দেখাইয়া দিয়া বলিল—জিজ্ঞাস উহারে…হা পুত্র বীরবাহু…

তারপর ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল—রে telephone! মিথ্যা বার্ত্তা তোর! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে কাতর—তাহারে বধিবে সম্মুখরণে রাঘব ভিখারী! মারণ—যাব আমি নিজে headquarter-এ। পরাজিত সৈন্য মোর—re-inforcement কর শীঘ্রগতি—complete black out আজ হইবে লঙ্কায়—five hundred tanks and tomy gunners পাঠাও শীঘ্রগতি।

আগে রাবণ ও পরে মারণের প্রস্থান। সিন পড়িয়া গেল।

হরিহর ভট্টচাযা বলিলেন—দেখলি মুটু…হতচ্ছাড়াদের কাণ্ড। এমনি করে থেটার করে? না আছে কনসার্ট, না আছে ড্যান্সিং-পার্টি।

ষ্টেজের ভিতর হইতে একটা গোলমাল আসিতেছিল এবং উহা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিল। গোলমাল লাগিয়াছে হরিশকে লইয়া। অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই বার বার সাজঘরের ফাঁক দিয়া উঁকি দিয়া গিয়াছে। তারপর ষ্টেজে আসিয়া তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। প্রাণপাত করিয়াও সে অবাধ্য পা দুটিকে ঠিক রাখিতে পারিতেছিল না।

আসলে সে কোনদিন অভিনয় করে নাই! তারপর প্রথম সিন শেষ করিয়া সে ষ্টেজের পিছনের দিকে বার বার যাতায়াত করিতে লাগিল। সকলে তাড়া দিয়া বলিল—এই হচ্ছে কি? যা না?

হরিশ কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিল, "আরে পেটটা বার বার মোচড় দিয়ে উঠছে…দাঁড়া আসছি।"

এইভাবে যাতায়াত করিতে প্রায় একঘণ্টা কাটিয়া গেল। এদিকে বাহিরে গোলমাল বাড়িয়াই চলিতেছে। অবশেষে গত্যন্তর না দেখিয়া দুর্গানাম স্মরণ করিয়া হরিশ ষ্টেজে আসিল। আসা মাত্র ষ্টেজের ফুট-লাইটগুলি তাহার চোখ ঝলসাইয়া দিল। সব অন্ধকার। দর্শকবৃন্দের মধ্যে এতক্ষণ যে ভীষণ গোলমাল চলিতেছিল এখন তাহা ভীষণতর হইল। সকলেই বলিতে লাগিল, এসেছে, এসেছে।

হরিশের গাটা বমি বমি করিতেছিল। কি বলিবে ভুলিয়া গেল। সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বেগতিক দেখিয়া মেঘনাদের মুণ্ডপাত করিতে করিতে প্রমীলা প্রবেশ করিল। মেঘনাদের নিকটে গিয়া বলিল—কি হয়েছে প্রিয়তম? চিন্তাগ্রস্ত আজি কেন দেখি বীরবরে?"

এবারেও কথা না বলিলে স্ত্রীর উপর অবিচার করা হয় তাই মেঘনাদ বলিল, "মানে…কি—কি…"

সর্ব্বনাশ! এ তোতলামি আসিল কোথা হইতে? প্রমীলা ভাবিল, এই মোলো! প্রমীলা আর কাহাতক একা একা কথা বলিতে পারে? একটা হ্যাচুর সঙ্গে ত' আর কথা বলা চলে না? প্রমীলা দুঃখে ও রাগে বিড় বিড় করিতে করিতে ষ্টেজ পরিত্যাগ করিল। যুবকদল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। না, হরেটা যে এইভাবে সব মাটি করবে, এ কথা কে ভেবেছিল?

এদিকে হরিশের কাঁপুনি অসম্ভব রকম বাড়িয়া গেল। হাঁটু দুটি ঠক্ ঠক্ করিতে লাগিল। দর্শকগণ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও। দুই একদল বলিল, অনেক তো দেখলাম, ওরিয়েণ্টাল ড্যান্স আর দেখিও না বাপধন, বসে পড়।

অশিক্ষিত জনসাধারণ যে এইভাবে অপমান করিবে হরিশ তাহা কি করিয়া বরদাস্ত করিবে? সে বলিয়া উঠিল, সাট্ আপ্ scoundrels!

কি! এত বড় কথা? সম্মুখস্থ কয়েকজন রুখিয়া দাঁড়াইল।

কি! দু'পাতা ইংরেজি পড়ে গালিগালাজ!

হরিশ দমিবার পাত্র নয়—মরিয়া হইয়া বলিল—ন-ন-ননসেন্স! আবার! প্রায় কুড়ি পঁচিশ জন লোক ষ্টেজের দিকে ছুটিয়া আসিল। চোঁ করিয়া সিন পড়িয়া গেল। ঢোল বাজিয়া উঠিল। অর্থাৎ অভিনয় শেষ।

হরিহর ভট্টাচার্য্য আর মুটবিহারী মিত্তির হাত ধরাধরি করিয়া নাচিতে আরম্ভ করিয়াছেন। হঃ, বাঁচালে—কি অপমানটাই না নচ্ছারগুলো কাল করলে।

রাসবিহারীবাবু অভ্যাস বশতঃ গোঁফে চাড়া দিতে গিয়া দেখিলেন গোঁফ নাই। বিরক্ত হইয়া বলিলেন—যত সব…।

কবি হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম

শ্রীভবপতি মৈত্র এম-এ

কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশ-প্রেমিক কবিগণের মধ্যে উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছেন। রঙ্গলাল "পদ্মিনী" "শূরসুন্দরী" প্রভৃতি কাব্য লিখিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি ভারতচন্দ্র রায়ের পশ্চাদনুবর্ত্তী শিষ্য। তাঁহার স্বাদেশিকতার কবিতা "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, দসত্বশৃঙ্খল বল, কে পরিবে পায় হে" ইত্যাদি। এই কবিতা লিখিবার সময় নির্দ্দেশ হইতেছে, যে সময় আলাউদ্দিন খিলজী মেবার আক্রমণ করেন তখন ভীমসিংহ, লক্ষ্মণসিংহ প্রভৃতি রাণাগণ রাজপুত যোদ্ধৃবর্গকে উৎসাহিত করিতে করিতে এই কথা বলিয়াছিলেন। রঙ্গলালই প্রথম মূলসূত্র প্রদান করিলেন "দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে" রঙ্গলাল তাহার অসাধারণ প্রতিভাবলে আদিরস-পরিপ্লাবিত বঙ্গীয় কাব্যসাহিত্যের স্রোত ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। বীরত্ব স্বাদেশিকতা পরিচয়ের প্রধান অঙ্গ। রঙ্গলালের কাব্যে ইহার প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। তাঁহার "বাদল" কবিতায় যুদ্ধের বিবরণ ও বীরত্বের কাহিনী পরিস্ফুট দেখা যায়।

"একতায় হিন্দুরাজগণ
সুখেতে ছিলেন সর্ব্বজন।
সে ভাব থাকিত যদি পার হয়ে সিন্ধুনদী
আসিতে পারিত কি যবন?
অরুণ-উদয়ে তারাগণ
একে একে অদৃশ্য যেমন
সেরূপ ক্ষত্রিয়গণে যুদ্ধ করি প্রাণপণে
ক্রমে ক্রমে হইল পতন।
যথা তথা চপলার প্রায়
অতি বেগে মহারথী ধায়
যেন ভয়ঙ্কর ঝড়ে অসংখ্য পাদপ পড়ে
ম্লেচ্ছদল পতিত ধরায়।

কবি রঙ্গলালের বর্ণনায় যেরূপ নির্ভীকতা ও তেজস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়, অনেক বঙ্গদেশীয় কবির কাব্যে সেরূপ দেখা যায় না। রঙ্গলালের এইরূপ স্বাদেশিকতা যে সম্পূর্ণ মৌলিক-চিন্তা-সম্ভূত তাহা মনে হয় না। কারণ, ইংরেজ কবি Thomas Moore এরও এইরূপ লেখা আছে। "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে" ইহারই অনুরূপ—

From life without freedom
Oh! who would not fly?
For one day of freedom
Oh! who would not die
Hark! hark! 'tis the trumpet
The call of the brave
Our country is bleeding
Oh! fly to her aid
One arm that defends is worth
Hosts that invade.

"পদ্মিনী" উপাখ্যানে বীরত্বের কাহিনী যাহা পাওয়া যায় তাহাতে রঙ্গলালের স্বদেশ-প্রেমিকতা বর্ণনার অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। রাজপুত-রমণীগণ স্বামী মৃত্যুমুখে পতিত হইলে জহরব্রত অবলম্বন করিতে যাইতেছেন তাহার বর্ণনা বীরত্বেরই পরিচয় দেয়। মৃত্যুকে সচরাচর লোকে আহ্বান করে না—অত্যন্ত সাহসী ব্যক্তিগণই মরণ বরণ করিতে ভয় পায় না। রাজপুত-রমণীগণ বলিতেছেন—

এসো এসো সহচরীগণ এস সহচরীগণ!
হুতাশন-গ্রাসে করি জীবন অর্পণ।
ধর সবে মনোহর বেশ বাঁধ বিনাইয়া কেশ
চলহ অমরাবতী করিব প্রবেশ।
ওরে সখি! আজিরে সুদিন ঘটিয়াছে ভাগ্যাধীন,
শুধিব জীবন-দানে পতি-প্রেমঋণ
আজি অতি সুখের দিবস পাব সুখ-মোক্ষ-যশ;
বিবাহের দিন নহে এরূপ সরস।
সকলে জেনেছে এখন পতি অতি প্রাণধন;
যার জন্য যুবতীর জীবন যৌবন।
হেন ধন নিধন অন্তরে এই ছার কলেবরে,
রাখিবে এ ছার প্রাণ আর কার তরে?

মাইকেল মধুসূদন দত্তের যে কয়টি কবিতা স্বাদেশিকতার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন তাহা অত্যুৎকৃষ্ট। বিজাতীয় ভাষার ভাবে

আচ্ছন্ন মধুসূদন প্রথমে ইংরেজি ভাষায় কাব্যগ্রন্থাদি রচনা করিয়া যশোলাভের চেষ্টা পাইয়াছিলেন কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় স্বদেশীয় সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি প্রতিভা নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাই তাঁর কবিতা—

হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পরধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি!

যখন তিনি বিশেষ অনুতপ্ত, তখন কুললক্ষ্মী তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিলেন এবং বলিলেন—

"ওরে বাছা! মাতৃকোষে রতনের রাজি
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি অজ্ঞান তুই যা রে ফিরি ঘরে!

মধুসূদন বঙ্গলক্ষ্মীর আদেশ শুনিলেন—

পালিলাম আজ্ঞা সুখে, পাইলাম কালে
মাতৃভাষা রূপে খনি পূর্ণ মণিজালে।

মধুসূদন বাঙ্গালার ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিলেন এবং সেই বঙ্গ-সাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হইল—

"রচিব মধুচক্র গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

তাঁহার চতুর্দ্দশ-পদী কবিতাবলীর মধ্যে স্বদেশীয় কবিগণের সম্বন্ধে যে সব কবিতাবলী বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা দ্বারাই তিনি তাঁহার স্বাদেশিকতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এবং কপোতাক্ষ নদ সম্বন্ধে যাহা পরে তিনি "Poetical hypocrisy" আখ্যা দেন তাহাও আন্তরিকতা-বিবর্জ্জিত নহে। ফ্রান্সের ভারসেলস্ সহরে এই কবিতা রচিত।

সতত, হে নদ! তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমারি কথা ভাবি এ বিরলে,
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে—
জুড়াই এ কাণ আমি ভ্রান্তির ছলনে!
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে;
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমিস্তনে।

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার "পলাশীর যুদ্ধে" স্বদেশ-প্রীতির পরিচয় প্রদান করিলেও তাঁহার "রৈবতক", "কুরুক্ষেত্র" ও "প্রভাস" কাব্যগ্রন্থে তিনি স্বাদেশিকতার গণ্ডী ছাড়াইয়া বৃহত্তর বস্তুর প্রতি বদ্ধলক্ষ্য;—বিশ্বপ্রেম ও সার্ব্বজনীন প্রীতি ইহাই তাঁহার লক্ষ্য বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর মধ্যে মাইকেল, কাশীরামদাস, কাত্তিবাস, জয়দেব, কালিদাস প্রভৃতি কবিগণের প্রতি যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার স্বদেশ-প্রেমিকতা পরিস্ফুট হইয়াছে। বাল্মীকি, বেদব্যাস, ভর্ত্তৃহরি প্রভৃতি কবিগণকে তিনি যথেষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার "পরিচয়" কবিতাতে তিনি স্বদেশ সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ পরিচয় দিয়াছেন—

যে দেশে উঠিয়া রবি উদয়-অচলে
ধরণীর বিম্বাধর চুম্বেন আদরে
প্রভাতে; যে দেশে গেয়ে, সুমধুর কলে,
ধাতার প্রশংসা গীত, বহেন সাগরে
জাহ্নবী; যে দেশে ভেদি বারিদমণ্ডলে
(তুষারে বপিত বাস ঊর্দ্ধ-কলেবরে,
রজতের উপবীত স্রোতোরূপে গলে)
শোভেন শৈলেন্দ্ররাজ, মানসরোবরে।

১২৬২ সালের শেষভাগে মধুসূদন দত্ত আইন শিক্ষার্থে ইংলণ্ডে গমন করেন। স্বদেশ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তিনি মাতৃভূমির নিকট বিদায় লইয়া যে কয়টি কবিতা পংক্তি লিখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্বদেশ-জননীর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরিচায়ক।

রেখ মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মন-কোকনদে।
সেইধন্য নর কুলে
লোকে যারে নাহি ভুলে
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।
তবে যদি দয়া কর
ভুল দোষ গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে মানসে মা যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে।

অনেকে মনে করেন, কবিবর হেমচন্দ্রের স্বদেশ-প্রীতি বিজাতি-বৈরিতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই ধারণা

একান্ত অমূলক, কারণ যে ব্যক্তি "ভারত-বিলাপ" ও "ভারত-সঙ্গীত" রচনা করিয়াছেন, তিনিই "ভারত-ভিক্ষা" নামক কবিতায় শ্বেতজাতি, ভারতেশ্বরী ও যুবরাজের যথেষ্ট গরিমা বর্ণনা করিয়াছেন। যুবরাজের আগমনোপলক্ষে লিখিত হইয়াছে—

ভাসিছে আনন্দে ভারত বেড়িয়া
দেব-অট্টালিকা সদৃশ শোভিয়া
অর্ণব-তরণী কেতনে সাজিয়া
কৃষ্ণা, গোদাবরী গঙ্গার গায়।

কবিবর হেমচন্দ্র "ভারত-বিলাপ" ও "ভারত-সঙ্গীত" কবিতাদ্বয় রচনা করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় কবি বলিয়া তৎকালে পরিচিত হন এবং প্রথম শ্রেণীর কবি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। "কুলীন কন্যাদিগের আক্ষেপ", "ভারত-কামিনী" ও "বিধবা রমণী" প্রভৃতি কবিতা রচনা করিয়া স্বদেশীয় সামাজিক দুর্নীতি ও কুপ্রথার কুফল প্রদর্শন করিয়াছেন। হেমচন্দ্র তাঁহার স্বদেশীয় কবিতায় পুনঃ পুনঃ ভারতের প্রাচীন গৌরবময় যুগের উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার মতে স্বাধীন ভারতের আবির্ভাব হইতে পারে হিন্দুগণ যদি পুনরায় সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। তিনি এতদূর পর্য্যন্ত বলেন যে, ভারত উদ্ধার অতি সামান্য কথা, এমন কি প্রয়োজন হইলে তাঁহারা সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত হাসিতে হাসিতে শাসন করিতে পারেন। তাঁহার স্বাদেশিকতাপূর্ণ কবিতা "ভারত-সঙ্গীত" মধ্যযুগীয় মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ মাধবাচার্য্যের মুখ হইতে বহির্গত হইয়াছে এবং যখন মোগলদিগের প্রাদুর্ভাব তখন স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত উদ্দীপনাপূর্ণ গান করিয়া বেড়াইতেন। এই প্রবাদ অবলম্বন করিয়া ভারত-সঙ্গীত লিখিত হইয়াছে। প্রথমতঃ তিনি পৃথিবীর অপরাপর স্বাধীন দেশ ও স্বাধীন জাতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং স্বদেশীয় জাতির ও দেশের অধঃপতনের কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতেছেন এবং শিঙ্গাকে বলিতেছেন—

বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

কবির সন্দেহ হইতেছে এই হিন্দুজাতি—ইহারা কি প্রাচীন আর্য্য-ঋষিগণ হইতে উদ্ভূত ? যদি তাহাই হয় তবে ইহাদের এমন দুর্দ্দশা কেন ?

আর্য্যাবর্ত্তজয়ী পুরুষ যাহারা
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা ?
জনকত শুধু প্রহরী পাহারা,
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধাঁ ?
ধিক্ হিন্দুকুলে! বীরধর্ম্ম ভুলে
আত্ম-অভিমান ডুবায়ে সলিলে
দিয়াছে সঁপিয়া শত্রু-করতলে
সোণার ভারত করিতে ছার।

স্বদেশ উদ্ধার সম্বন্ধে কবি বলেন যে, পূজা-আরাধনার দ্বারা পন্থা নির্দ্ধারিত হইবে না। পরন্তু আধুনিকভাবে সজ্জিত হইতে হইবে। আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—

ছিল বটে আগে তপস্যার বলে
কার্য্যসিদ্ধি হত এ মহীমণ্ডলে,
আপনি আসিয়া ভক্ত-রণস্থলে
সংগ্রাম করিত অমরগণ।
এখন সেদিন নাহিক রে আর,
দেব-আরাধনে ভারত-উদ্ধার
হবে না—হবে না খোল তরবার
এ সব দৈত্য নহে তেমন।
অস্ত্র-পরাক্রমে হও বিশারদ
রণ-রঙ্গরসে হও রে উন্মাদ
তবে সে বাঁচিবে ঘুচিবে বিপদ্
জগতে যদ্যপি থাকিতে চাও।

"বীরবাহু" কাব্যে নিম্নোক্ত পদগুলিতে কবির গভীর স্বদেশ-প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়,—

মা গো ওমা জন্মভূমি
আরো কত কাল তুমি,
এ বয়সে পরাধীনা হয়ে কাল যাপিবে।
পাষণ্ড যবন দল
বল আর কত কাল
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর মনে নিপীড়ন করিবে।
কতই ঘুমাবে মাগো
জাগো গো মা জাগো জাগো,
কেঁদে সারা হয় দেখ পুত্রকন্যা সকলে।

কাহার জননী হয়ে
কারে আছ কোলে লয়ে,
ক্ষীর সুতে ঠেলে ফেলে কার সুতে পালিছ,
কারে দুগ্ধ কর দান,
ও নহে তব সন্তান,
দুগ্ধ দিয়া গৃহমাঝে কালসর্প পুষিছ।"

যাঁহারা বাংলা ভাষাকে দুর্ব্বল ও নিস্তেজ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন, যাহাদিগের সংস্কার ছিল বঙ্গ-ভাষাতে হৃদয়ভেদী ও জ্বালাময়ী কবিতা লেখা যাইতে পারে না, তাঁহাদের হেমচন্দ্রের "ভারতসঙ্গীত" ও "ভারতবিলাপ" পড়িয়া সে ভ্রম দূরীকৃত হইয়াছে। "ভারতকামিনী" সম্বন্ধে হেমচন্দ্র দেশবাসিগণকে যথোচিত তিরস্কার করিতেছেন, কারণ তাঁহাদিগকে পশ্চাতে রাখা হইয়াছে এবং অজ্ঞানের অন্ধকারে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে, কিন্তু বিদেশীয় মহিলাগণ স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন। তাঁহার কর্কশবাণী যেন Hebrew Prophet এর ন্যায়—

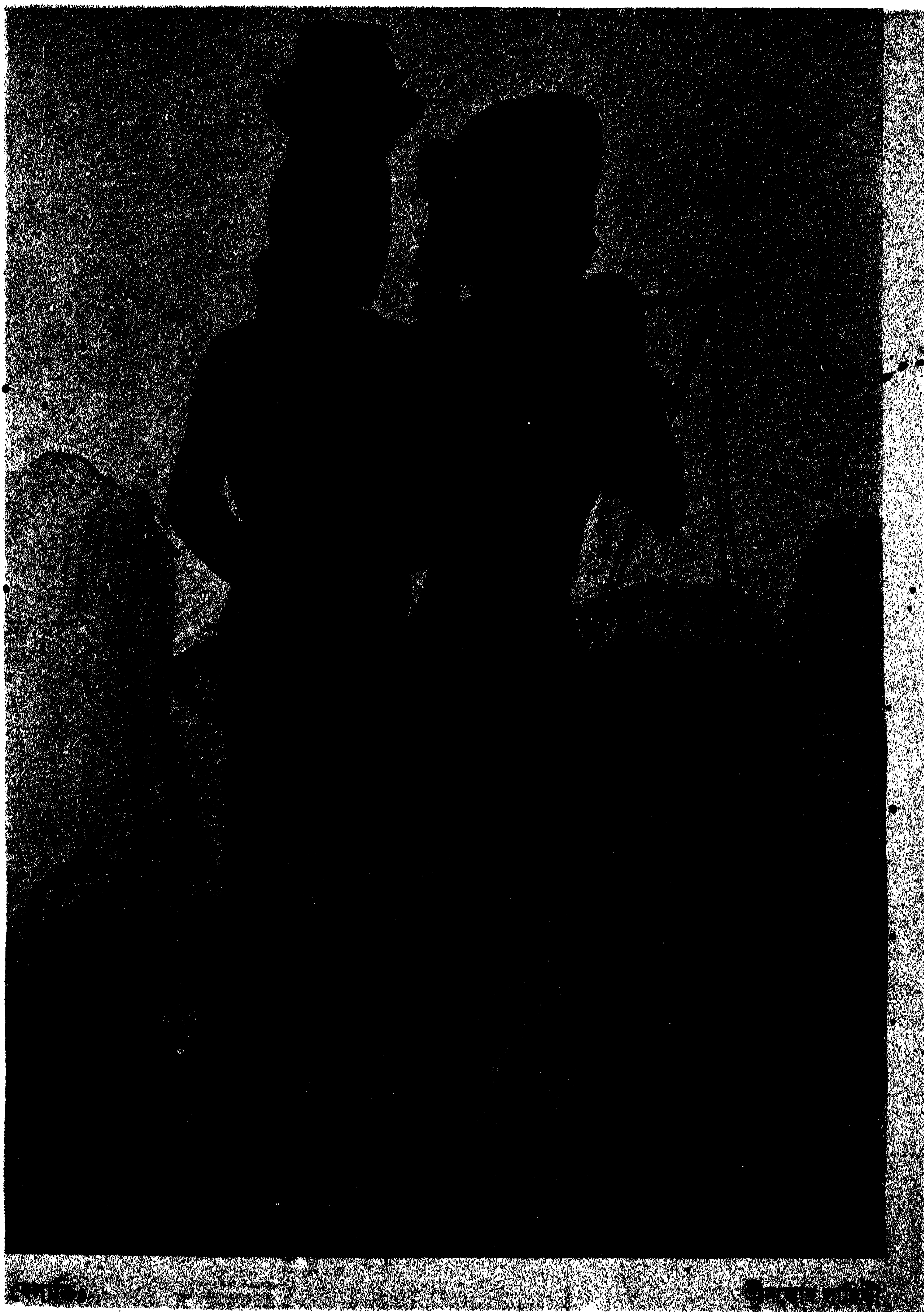
অরে কুলাঙ্গার হিন্দুদুরাচার—
এই কি তোদের দয়া—সদাচার?
হয়ে আর্য্যবংশ অবনীর সার—
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে?
এখনও ফিরিয়া দেখ না চাহিয়া
জগতের গতি—ভ্রমেতে ডুবিয়া
চরণে দলিয়া মাতা-সুতা-জায়া
এখনও রয়েছ উন্মত্ত হয়ে?

কবিবর ভক্তিবিহ্বলচিত্তে প্রাচীনা মনস্বিনী বীর রমণীগণের কথা উত্থাপন করিতেছেন এবং অধুনা তাহার যে বিপর্য্যয় হইয়াছে তাহাই বলিতেছেন।

কোথা সে এখন অসি-ভল্লধারী
মহারাষ্ট্র-বামা রাজোয়ারা নারী
অরাতি-বিক্রমে পরাজিত হলে
চিতানলে যারা তনু দিত ঢেলে
পতি-পিতা-সুত সংহতি লয়ে।
বীরমাতা যারা বীরাঙ্গনা ছিল
মহিমা কিরণে জগৎ ভাতিল,
কোথা এবে তারা—কোথা সে কিরণ
আনন্দকানন ছিল যে ভুবন
নিবিড় অটবী হয়েছে এবে।
দেখরে নিষ্ঠুর হাতে লয়ে মালা
কুলীন কুমারী অনূঢ়া অবলা
আছে পথ চেয়ে পতির উদ্দেশে
অসংখ্য রমণী পাগলিনী-বেশে
কেহ বা করিছে বরমালা দান,
মুমূর্ষুর গলে হয়ে ম্রিয়মাণ
নয়নে মুছিয়া গলিত বারি।
চারিদিকে হেথা ভারত জুড়িয়া
সরসীকমল যেন রে ছিঁড়িয়া—
কামিনীমণ্ডলী রেখেছ তুলিয়া
কোমল হৃদয় করেছ হতাশ
না দেখিতে দাও আলো-আকাশ
করে কারাবাস জগতে রয়ে।
... ...
এই রঙ্গভূমে করেছিল লীলা
আত্রেয়ী, জানকী, দ্রৌপদী সুশীলা
খনা, লীলাবতী প্রাচীন মহিলা
সাবিত্রী ভারত পবিত্র করে।

বিধবা রমণী সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন—দেশাচার কিরূপ বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই দুঃখে দুঃখিত হইয়া পুনরায় বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি অই রে।
না হলে এমন দশা নারী আর কই রে?
মলিন বসনখানি অঙ্গে আচ্ছাদন,
আহা দেখ অঙ্গে নাই অঙ্গের ভূষণ।
রমণীর চিরসাধ চিকুর-বন্ধন
হাদে দেখ সে সাধেও বিধি-বিড়ম্বন।
... ...
হায় রে নিষ্ঠুর জাতি পাষাণ হৃদয়,
দেখে শুনে এ যন্ত্রণা তবু অন্ধ হয়;
বালিকা-যুবতী ভেদ করে না বিচার,
নারীবধ ক'রে তুষ্ট করে দেশাচার
এই যদি হয় হিন্দুশাস্ত্রের লিখন
এদেশে রমণী তবে জন্মে কি কারণ?
পুরুষ দু'দিন পরে আবার বিবাহ করে
অবলা রমণী ব'লে এতই কি সয় রে,
যখন দেখিব হায় করিব স্মরণ
বিধবা নারীর মুখ হায় রে বিদরে বুক
ইচ্ছা করে অন্নশোধ দেশত্যাগী হই রে।



হেমচন্দ্রের উদার হৃদয় তাঁহার কবিবন্ধু মধুসূদনের মৃত্যু উপলক্ষে যে অনুভূতি করিয়াছিলেন, তাহা স্বদেশপ্রেমিকতা ও স্বাদেশিকতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দেয়।

লীলা সাঙ্গ করি হলে অবসর
ওহে বঙ্গ-কুলরবি।
যতদিন ভবে থাকিব বাঁচিয়া
ভাবিব তোমার ছবি :—
আকর্ণপূরিত সেই নেত্রদ্বয়
সুহৃৎরঞ্জন ভান
মধুচক্র-সম মধুর ভাণ্ডার
সরল কোমল প্রাণ ;
আনন্দলহরী ভাবায় নির্ঝর
শোভিত আশার ফুলে,
উৎসাহ-ভাবিত বদনমণ্ডল
পঙ্কজবান্ধবকুলে।

হেমচন্দ্রের "ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার" কবিতাটী ১২৮০ সালের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে রচিত। স্বদেশ ও স্বজাতির দুঃখ-কষ্টে হেমচন্দ্র যথেষ্ট ক্লেশ অনুভব করিয়াছিলেন। এরূপ অলন্ত বর্ণনা অতি অল্প কবির লেখনী হইতে নিঃসৃত হয়।

দেখ রে চলেছে আহা শিশু কতজন
শীর্ণদেহ চাহি আছে জননী-বদন ;
আকুল জননী তার মুখ চাহি বার বার,
অনিবার বারিধারা করে বরিষণ—
ভ্রমে যেন উন্মাদিনী অন্নের কারণ—
হের দেখ পথিধারে বসিয়া ওখানে
পতির চরণে লুটি আকুল পরাণে
বলিছে কামিনী কেহ কই নাথ অন্ন দেহ,
কালি আর চাহিব না রাখ আজ প্রাণে
বলিয়া ত্যজিল প্রাণ চাহি পতিপানে।

কি মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় হেমচন্দ্র দুর্ভিক্ষ দমনার্থে বদ্ধপরিকর হইতে অনুরোধ করিয়াছেন—

"কেমনে হে বঙ্গবাসি—নিদ্রা যাও সুখে ?
ভাবিয়া এ ভাব, চিত্ত ভরে নাকি দুঃখে ?
নিজ সুতপরিবার না জানিছে অনাহার,
ভাবিয়ে না চাহ কিহে অভুক্তের মুখে—
স্বজাতি-শোকের শেল বিঁধে না কি বুকে ?

পল্লী-জননী ডাকে

শ্রীনকুলেশ্বর পাল বি, এল্,

স্নেহের আঁচল বিছায়ে আজি যে পল্লী-জননী ডাকে ;
কেমন করিয়া নিঠুর পরাণে ভুলিয়া র'য়েছি মাকে।
আজি শেফালীর গন্ধে আকুল—
ছায়া-ঘেরা পথে ডাকে বনফুল ;
শিশিরসিক্ত নব তৃণদল প্রাণের অর্ঘ্য আঁকে ;
পল্লীর বধূ আনমনে চায় কলসী লইয়া কাঁখে।

পল্লী আমার স্বর্গ আমার কেমনে ভুলিব তায় ;
অন্তর আজি কাঁদিয়া ফিরিছে মর্ম্মের বেদনায়।
জীবন-প্রভাতে প্রথম তপন
যেথায় আঁকিল সোনার স্বপন ;
আজি সে মায়ের বক্ষে লুটাতে পরাণ আমার চায় ;
স্নিগ্ধ শ্যামল আলো-ঝলমল পল্লীর শ্যাম ছায়।

পল্লীর বুকে যদিও আজিকে দৈন্য ও হাহাকার ;
বেদনায় ভরা অশ্রু-সাগর উথলিছে চারিধার।
পল্লীর বুকে আজো ওই চাষী,
ধরণীর মুখে ফুটাইছে হাসি ;
ক্ষুধার অন্ন দিতেছে ভুলিয়া—ব্যথার অর্ঘ্য তার ;
অন্তরে বহে সুধার বন্যা আঁখিতে অশ্রুধার।

পল্লীর বধূ তুলসীতলায় আজিও জ্বালায় বাতি ;
সাত পুরুষের রিক্ত-ভিটায় জীর্ণ আঁচল পাতি'।
কতই আঘাত বুকে তার বাজে ;
কি আগুন জ্বলে অন্তর মাঝে ;
ঐ হের আজি পল্লীর বুকে ঘনায়ে এসেছে রাতি ;
শেষ আলোটুকু বুঝি নিতে যায়—সাঁঝের প্রদীপ-ভাতি।

পল্লীর বুকে আজি ফিরে যেতে প্রাণ করে আনচান্।
অশ্রুর জলে বাজে আজি ঐ কণ্ঠহারার গান।
জননী ডাকিছে আয় ফিরে আয়,
শ্যামলিমা বুকে স্নেহের ছায়ায়
কে ডাকিবে আর, কার আছে বল্, এমন প্রাণের টান ;
চল্ ফিরে চল্ কে আছিস্ তোরা পল্লীর সন্তান।

সঞ্চয়

(নাটিকা)

শ্রীহরিপদ দত্ত

চরিত্রাবলী

পুরুষ

উমাপদ বসু ... সুবর্ণপুরনিবাসী ১ম জমিদার

জীবনকৃষ্ণ ঘোষ ... ঐ ২য় ঐ

বিভূতিভূষণ বসু ... উমাপদর পুত্র

তমিজুদ্দীন সর্দ্দার, আশরফ আলি, সাদেক আলি, আব্দুল আলি ... (তমিজুদ্দীনের পুত্র), মহম্মদ হানিফ ... (ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র) — সুবর্ণপুরের অধিবাসী

বীরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিনোদবিহারী ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ দেব, পদ্মলোচন পুরকাইত, দেবীপদ প্রামাণিক, ফজলু ইলাহি, স্কুলের ছাত্রগণ, ভৃত্যগণ।

নারী

দয়াময়ী ... উমাপদর পত্নী

সৌদামিনী ... জীবনের ঐ

কমলা ... ঐ কন্যা

হৈমবতী ... ঐ পিতৃস্বসা

জ্ঞানদা ... দয়াময়ীর মাসতুত ভগ্নী

মঙ্গলা ... ঐ পরিচারিকা

অন্যান্য রমণীগণ।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—সুবর্ণপুরগ্রামস্থ ঘোষপুকুরের বাঁধা-ঘাট

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। আমার বিয়ের জন্য বাবার বিষয় যা'বে? ও বন্ধক দেওয়াও যা', বিক্রী হওয়াও তাই। বাবার কি এমন আয় আছে যে বন্ধকের দেনা শোধ করে' বিষয় খোলসা কর্বেন। শুনেছি বন্ধকের দায়ে একটা বড় বিষয় বিক্রী হ'য়ে গেছে। যদি সঞ্চয়ের ক্ষমতা থাকৃত, তা' হ'লে সে-বিষয়টা বিক্রী হ'বে কেন? এ-বিষয়টাও যদি যায়, খাওয়া-পরা চল্‌বে কি করে'? আমি যেন শ্বশুরবাড়ী যা'ব, কিন্তু মা থাক্‌বেন, ঠাকুরমা থাক্‌বেন, বাবা নিজে ত' থাক্‌বেনই। তা'র ওপর ঠাকুর আছেন। খরচ চল্‌বে কিরূপে? এখনই ত' টানা-কষার ওপর সংসার চল্‌ছে।—ঠাকুরমা আমার বিয়ের জন্য বাবাকে যে-রকম ব্যস্ত করে' তুলেছেন তা'তে মনে হয় তাঁ'কে শীগ্‌গিরই বিয়ের যোগাড় কর্‌তে হ'বে। কিন্তু টাকা কোথায়? টাকার যোগাড় কর্‌তে হ'লে বাবার যে-বিষয়টুকু আছে সেটি নষ্ট কর্‌তে হ'বে। ঠাকুরমার যে টাকা আছে তা' দিতে চান, কিন্তু বাবা সে-টাকায় হাত দিতে নারাজ। অবস্থা হীন হ'লেও মেয়ের বিয়ে দিতেই হ'বে—এই কি শাস্ত্রের বিধান? মেয়ের বিয়েতে যে পণ দিতে হয় তা'ও কি শাস্ত্র-সঙ্গত? তা' যদি না হয়, আর যদি শাস্ত্রের এক বিধান না মান্‌লে চলে, তা' হ'লে একই বিষয়ে অন্য বিধান যে মান্‌তেই হ'বে এর মানে কি? এ-কথা বলেই বা কে, শোনেই বা কে? আমাকে ত' মুখটি বুঁজেই থাক্‌তে হচ্ছে।—এ-দিকে কে আস্‌ছে। ঐ গাছটার আড়ালে যাই। (প্রস্থান)

(ডাক্তারী ব্যাগ হস্তে বিভূতির প্রবেশ)

বিভূতি। বাঃ! মেয়েটি ত বেশ সুশ্রী! নিশ্চয় এই পল্লীরই মেয়ে, কিন্তু অচেনা। হয় ত' যখন ছোট ছিল তখন দেখেছি, এখন চিন্‌তে পার্‌ছি না।—মেয়েটিকে বড় বিষণ্ণ দেখ্‌লাম—যেন কোন দুশ্চিন্তায় কাতর। এই বয়সে এত চিন্তা কিসের? University examination দিতে হ'বে না ত'? গেলই বা কোথায়? বোধ হয় আমাকে আস্‌তে দেখে আড়ালে গা-ঢাকা দিয়েছে। যাই, আমার এখানে দাঁড়ান উচিত নয়। (প্রস্থান)

(কমলার পুনঃপ্রবেশ)

কমলা। হাতে একটা ব্যাগ র'য়েছে। বোসেদের

বাড়ীর ছেলে ডাক্তার হ'য়েছেন, সম্ভবতঃ তিনিই হ'বেন।—এদিকে বেলা গড়িয়ে গেল, গা ধুয়ে বাড়ী যাই। আবার কে এসে প'ড়বে! (পুষ্করিণীতে অবতরণ)

(বিভূতির পুনঃপ্রবেশ)

বিভূতি। কিসের আওয়াজ হ'ল? হঠাৎ পিছলে জলাশয়ে প'ড়ে গেলে যে-রকম আওয়াজ হয় সেই রকমই ত' মনে হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা ক্ষীণ কাতরোক্তি শোনা গেল। মেয়েটি কি পিছ্‌লে জলে প'ড়ে গেল? পুরোনো ঘাট, ধাপগুলো পেছল—কিছুই বিচিত্র নয়। যদি সাঁতার না জানে? সাঁতার জান্‌লেও হঠাৎ পিছ্‌লে পড়লে হাতে-পায়ে কাপড় জড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা। তা' হ'লে ত' সাঁতার জান্‌লেও আত্মরক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না। কি করি? উভয়-সঙ্কট। কিন্তু প্রাণ-সংশয়ের সম্ভাবনা যখন রয়েছে তখন মেয়েটি ছোট না হ'লেও লোকলজ্জা বা লোকনিন্দার ভয় উপেক্ষা করাই উচিত। আর সময় নষ্ট করা চলে না।

(পুষ্করিণীতে দ্রুত অবতরণ)

(আশরফ আলীর প্রবেশ)

আশরফ। সূর্য্যি ডুবে গেছে, এমন সময়ে ঘোষপুকুরে সাঁতার কাটে কে? এ-সব আজকালকার ছেলের কাণ্ড। যা'র যা' ইচ্ছে করুক। আমার ত' দাঁড়াবার সময় নেই। লণ্ঠন আন্‌তে ভুলে গেছি, বেশী অন্ধকার হ'বার আগেই বাড়ী ফির্‌তে হ'বে।

(প্রস্থান)

(আর্দ্রবস্ত্রে কমলাকে পাথালি কোলায় লইয়া বিভূতির প্রবেশ)

বিভূ। অতিকষ্টে ত' তোলা গেল। পম্প-টম্প করে' পেট থেকে অনেকটা জলও ত' বের করা হ'ল। কিন্তু এখন কি করি? কা'দের মেয়ে, কোথায় বাড়ী কিছুই ত' জানি না। কাউকে দেখতেও পাচ্ছি না যে জিজ্ঞাসা করি। অথচ এখানে দেরী কর্‌লে চল্‌বে না। এক্ষুনি একটু ব্রাণ্ডি খাইয়ে দিতে হ'বে। যাই বাড়ী নিয়ে গিয়ে মার হাতে গচ্ছিয়ে দিই, পরে খোঁজ-খবর নিয়ে যা'দের মেয়ে তাঁ'দের বাড়ীতে পৌঁছে দিলেই হ'বে।

[প্রস্থান

(দুইটি তরুণের একটী হিন্দু, অপরটী মুসলমান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গান

জননী আমার, স্বর্গ আমার, তুমি গো ভারতবর্ষ,
নির্ব্বাণ যেন তোমার অঙ্কে জন্মে যেখানে হর্ষ।
দেশ বলি' খ্যাত তুমি মহাদেশ, প্রকৃতিরচিত চারু তব বেশ,
কটীলম্বিত নীল অম্বর করিছে চরণ স্পর্শ।
বিটপিপুঞ্জ শ্যামাবগুণ্ঠ, সরিতমালা আপাদকণ্ঠ,
তরণ কান্ত, কিরীটে তুঙ্গ, মণ্ডিত তব শীর্ষ।
গ্রাম্য ষড় ঋতু জানিয়া হর্ষ পর্য্যায়ক্রমে ব্যাপিয়া বর্ষ,
শ্যামল ক্ষেত্র প্রসবে নিত্য পুঞ্জ পুঞ্জ শস্য।
পুঞ্জিত গৃহে গোধূম, ধান্য, পীযূষ তুল্য গোধন-স্তন্য,
স্বস্তিপূর্ণ অমিয়শূন্য নাস্তি অভাব স্পর্শ।
পূজা, মান্য মানবধর্ম্ম, জীবকল্যাণ সবার কর্ম্ম,
পরিবর্জ্জিত সদা কুকর্ম্ম—নাহিক পাতক স্পর্শ॥

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

(জীবনের প্রবেশ)

জীবন। কাপড় কেচে এক ঘটী জল নিয়ে যেতে এত দেরী হয়? এক ঘণ্টার ওপর বাড়ী থেকে বেরিয়েছে, এ-দিকে সন্ধ্যা হ'য়ে এল, মেয়েটা গেল কোথায়? ঘাটে ত' কাউকে দেখছি না! ওটা কি চক্ চক্ করছে? ঐ ত সেই পেতলের ঘটীটা বসান র'য়েছে। গেল কোথায়? কারও বাড়ী গিয়ে গল্প জুড়বে সে-রকম মেয়ে ত' নয়!

(আশরফ আলির প্রবেশ)

আশ। নমস্কার খুড়োম'শায়! সন্ধ্যে না হ'তে লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়েছেন যে? কোথায় যাচ্ছেন?

জীবন। যাইনে কোথাও বাবা! মেয়েটা এই পুকুরে কাপড় কাচতে এয়েছিল। অনেকক্ষণ বেরিয়েছে—বাড়ী ফির্‌তে দেরী হচ্ছে দেখে এগিয়ে নিতে এসেছিলেম। কিন্তু তা'কে ত' দেখতে পাচ্ছি না। অথচ যে ঘটীটা হাতে করে' এসেছিল সেটা ঘাটে বসানো র'য়েছে। জলে পড়ে' যায় নি ত'? ধাপগুলো যে-রকম পেছল। ভেবে কিছুই ঠিক কর্‌তে পার্‌ছি না।

আশ। দেখুন কাকাবাবু, আমি যখন বাজারে যাচ্ছিলুম, তখন দেখলুম্ পুকুরে কে সাঁতার কাটছে। ফিরে আস্‌তে আস্‌তে দেখলুম বোসের বাড়ীর ঐ ডাক্তার দাদা একটি বড়-সড় সুন্দর মেয়েকে পাথালি কোলা করে' নিয়ে নিজেদের বাড়ী ঢুক্‌লেন। দু'জনেরই পরণের কাপড় থেকে জল ঝর্‌ছিল। আপনি একবার বোসের বাড়ীতে খবর নাও।

জীবন। কি-রকম কাপড় নজর করে'ছিলে?

আশ। না কাকাবাবু, মেয়েছেলের দিকে কি ক'রে তাকাবো? তা' ছাড়া আমি কাছে না আস্‌তে আস্‌তে ওরা বাড়ীর ভেতর চলে' গেল।

জীবন। আচ্ছা বাবা, তুমি যাও। অন্ধকার হ'য়ে আস্‌ছে। অনেকটা যেতে হ'বে তোমাকে।

আশ। আমি কাল সকালে এসে খবর নোবো কাকাবাবু! আমার যৎচুন্ন মনে লাগে, বোসের বাড়ী গেলেই আপনি মেয়ে পা'বে।—সেলাম। [প্রস্থান

জীবন। আবার উমাপদ বোসের বাড়ী যেতে হ'বে? মনে করেছিলুম এ জীবনে আর ও-বাড়ীতে ঢুকব না। কিন্তু উপায় নেই—মেয়েটার খবর ত' নিতেই হ'বে। ভগবান করুন যেন আশরফের কথাই সত্য হয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য—উমাপদ বসুর অন্দরের দরদালান

(দয়াময়ী, মঙ্গলা ও অচেতন অবস্থায় শায়িতা কমলা)

দয়া। মেয়েটী যেন সাক্ষাৎ কমলা। যে-মায়ের গর্ভে জন্মেছে তা'র কোল আলো ক'রেছে, যে-ঘরে জন্মেছে সে-ঘর আলো করেছে। কা'দের মেয়ে? গাঁয়েরই ত' মেয়ে, তবে চিন্‌তে পাচ্ছিনে কেন? ঘোষ-পুকুরে গা-ধুতে এসে ডুবে গেছলো—হয় ত' ঘোষেদেরই মেয়ে।—জীবনঠাকুরপোর মেয়ে নয় ত'! তা'র এমনি একটী টুকটুকে মেয়ে ছিল, বাপের সঙ্গে আমাদের বাড়ী আস্‌ত। কিন্তু সে আজ বারো বছরের কথা। একটা যুগই কেটে গেছে। সেই-যে ঠাকুরপোর সঙ্গে কর্ত্তার কী হ'ল তখন থেকে সে আর এ-দরজা মাড়ায় নি। হয় ত' সেই মেয়েই হ'বে। তখন ছোট্ট কুঁড়িটি ছিল, এখন ফুটে উঠেছে।

মঙ্গ। হাত-পা গরম হ'য়েছে মা!

দয়া। বিভূ ঐ-যে ওষুধটা খাইয়ে গেল, তা'র পরেই মুখখানি লাল হ'য়ে উঠল। সে-ওষুধটা ধরেছে। জগদম্বে, মুখ তুলে চাও মা। মা-পো-এর মুখ রক্ষে কর মা!

(উমাপদর প্রবেশ)

উমাপদ। কিগো, হঠাৎ জগদম্বা-স্মরণ হচ্ছে কেন? (কমলার দিকে দৃষ্টি পড়ায়) এ-মেয়েটি কা'দের? ঘুমোচ্ছে নাকি? কি হয়েছে গা?

দয়া। ঘোষ-পুকুরে গা-ধুতে গিয়ে ডুবে গেছলো। বিভূ মুসলমানপাড়ায় একটা রোগী দেখবার জন্যে ঐ-পথে যাচ্ছিল, দেখতে পেয়ে জল থেকে তুলে এখানে এনে ওষুধ খাইয়ে রেখে গেল। মেয়েটি কা'র জান? বিভূ জানেই না, আমিও চিন্‌তে পারছি না। গাঁয়ের মেয়ে নিশ্চয়। ঘোষেদের মেয়ে নয় ত'?

উমা। দেখ দেখি মেয়েটির গায়ে হাত দিয়ে—গা গরম কি না!

দয়া। এই মাত্তর মঙ্গলা গায়ে হাত দিয়ে বল্‌লে হাত পা গরম। মঙ্গলা, তুই এখন যা।

মঙ্গ। হ্যাঁ মা! ছিষ্টির কাজ প'ড়ে র'য়েছে।

উমা। আমার চাদরখানা ঘরে রেখে যা।

(চাদর লইয়া মঙ্গলার প্রস্থান)

দয়া। (কমলার সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করতঃ) হ্যাঁ, হাত পা গরম, কপাল ঠাণ্ডা। বুক, পিঠ একটু গরম।

উমা। সে ওষুধের জন্য। যাই হ'ক, জগদম্বা মেয়েটিকে বাঁচিয়ে দিলেন। তোমাদের মুখরক্ষা হ'ল। ও এখন ঘুমোচ্ছে—যতক্ষণ ঘুমোয়, ঘুমুক। বিভূ ফিরে এসে যা' করতে বলবে তাই কর'। ধন্য করুণাময়ি, ধন্য তোমার করুণা!

দয়া। এ-দিকে যে সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। এ-পাড়া ও-পাড়ায় খবর নাও, কা'র মেয়ে হারালো। আহা, মেয়েটি যেন লক্ষ্মী ঠাকরুণ। রূপ যেন ঢল-ঢল করছে। যদি কায়েতের মেয়ে হয়—যাক্, সে কথায় কাজ নেই। সেরে উঠুক, মা-বাপের কাছে পাঠিয়ে দিই, তারপর বোঝা যা'বে। তুমিও ত' দেখ্‌ছি চিন্‌তে পার্‌লে না। তা' খবর নাও।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। ঘোষেদের বাড়ীর জীবনবাবু এসেছেন।

উমা। বৈঠকখানায় বসাগে যা। আমি আস্‌ছি।

(ভৃত্যের প্রস্থান)

(তারস্বরে) জীবনবাবুকে বলিস্ চিন্তার কোন কারণ নাই।

দয়া। কে গা? কা'কে বল্‌লে চিন্তার কারণ নেই? জীবন ঠাকুরপো নাকি? এতদিনে হঠাৎ রাগ থাম্‌লো?

উমা। জীবনের উদ্দেশ্যেই ও-কথা বল্‌লুম। মেয়ের

খোঁজ-করতে এসেছে—হয় ত' কারো কাছে শুনেছে, কিম্বা ঘড়ী বাড়ী খবর নিয়ে বেড়াচ্ছে।

দয়া। ঠাকুরপোর মেয়ের আবার কি হ'ল?

উমা। ঐ ত'। ওটি জীবনেরই মেয়ে।

দয়া। বটে? তা' হ'লে আমার ঠাকুর শিন্নী খেয়েছে।

(বিভূতির প্রবেশ)

বিভূ। মা! এখন অবস্থা কেমন? দেখে ত' মনে হয় ঘুমোচ্ছে। একবার নাড়ীটা দেখলে হ'ত।

দয়া। তা ত্থাখ্ না!

বিভূ। (নাড়ী পরীক্ষা করিয়া) ভালই আছে। তবু একটু ব্রাণ্ডি আর কুইনিন খাইয়ে দিতে হ'বে। কারণ, যদি জ্বর আসে, তা' হ'লে নিউমোনিয়ার সম্ভাবনা। আমি তৈরী করে' আনি। (প্রস্থান)

উমা। বিভূ ত' এয়েছে, আমি যাই। জীবনকে অনেকক্ষণ একলা বসিয়ে রাখা হ'য়েছে। বাপের প্রাণ ত', এতক্ষণে অস্থির হ'য়ে উঠেছে।

দয়া। তখনি ভেতরে ডেকে পাঠা'লেই হ'ত। বাইরে বসে' আছে কেন? এসে মেয়েকে দেখুক।

উমা। ডেকে আন্‌তেই যাচ্ছি। চাকর দিয়ে ডেকে পাঠা'লে ত' ভাল দেখা'ত না। (প্রস্থান)

(বিভূতির প্রবেশ)

বিভূ। ও মা, এই ওষুধ তৈরী করে' এনেছি। খাইয়ে দাও।

দয়া। ও আমি পারব না বাবা! ঘুমটা ভেঙ্গে যাবে। তুই খাইয়ে দে। (বিভূতি নিদ্রিতা কমলাকে ঔষধ খাওয়াইল) (স্বগতঃ) বাবা, তুমিই আমার পেটে জন্মেছ, আমি ত' তোমার পেটে জন্মাই নি। কেন তোমার নিজের হাতে ওষুধ খাওয়াতে বললুম তা' তুমি কি বুঝবে? (প্রকাশ্যে) এ-বারে ওষুধ খেয়ে মুখখানি চট করে' লাল হ'য়ে উঠল। প্রথমবারে দেরী হয়েছিল। (বিভূতির প্রস্থান)

উমা। (প্রবেশ করিতে করিতে) জীবন আসছে গো।

দয়া। আসুক না ঠাকুরপো। সে জন্যে আবার খবর দিতে হয় নাকি? (জীবনের প্রবেশ) এস ঠাকুরপো!

জীবন। (ভূমিষ্ঠ হইয়া দয়াময়ীকে প্রণাম করিলেন)

দয়া। বেঁচে থাক ভাই। পায়ে হাত দিতে হ'বে না। মেয়েকে দেখ। জগদম্বা খুব বাঁচিয়ে দিয়েছেন। মা লক্ষী এখন ঘুমুচ্ছে। বিভূ এখন আর একবার ওষুধ খাইয়ে গেল। আর কোন ভয় নেই।

জীব। মেয়ে যে দয়াময়ী মায়ের হাতে পড়েছে। আর ভয় কিসের? তোমাদের মা-ছেলের কল্যাণে কমলার পুনর্জ্জন্ম হ'ল।

দয়া। মেয়ের নাম কমলা? তাও ভুলে গেছি। এ কি কম দিনের কথা? মা আমার সাক্ষাৎ কমলা।

জীব। বিভূ কোথায় বৌদি? তা'কে একবার দেখব।

উমা। বিভূ বাড়ীতেই আছে না! বিভূ!

দয়া। বিভূ ওপরে আছে। এই ত' ওষুধ খাইয়ে গেল। (বিভূতির প্রবেশ) বাবা, জীবনকাকাকে প্রণাম কর। চিন্‌তে পেরেছিস্ ত'। এটি ঠাকুরপোর মেয়ে।

বিভূ। (জীবন ও পিতামাতাকে প্রণাম করিল) কাকাকে চিন্‌তে পারব না কেন? কিন্তু মেয়েটিকে চিন্‌তে পারি নি—খুব ছোটবেলায় দেখেছিলাম। তারপর কয়েক বৎসর ত' একেবারে ক'লকাতা-বাসী।

জীব। তুমি বেঁচে থাক বাবা! কমলাকে বাঁচাবার জন্যই জগদম্বা তোমাকে ঘোষপুকুরের পথে নিয়ে গিয়েছিলেন। নইলে কি হ'ত ভাবলেও শরীর শিউরে ওঠে। তুমি দীর্ঘজীবী হ'য়ে লোকের উপকারই কর, আর তোমার যশ চা'রদিকে ছড়িয়ে পড়ুক। এর চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ আমি জানি না।

উমা। বিভূ যে বিদ্যে শিখেছে তাতে লোকের যত উপকার করা যায়, তত আর কোন বিদ্যের, কোন ব্যবসাতেই করা সম্ভব নয়। কিন্তু এখন কমলার কথাই ভাবা আবশ্যক। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এখন ওকে ঘরে নিয়ে বিছানায় শোয়ানো উচিত নয় কি? কি বলিস্ বিভূ?

বিভূ। আজ্ঞে হাঁ—এখন ঘরে তুলে শোয়ানোই ভাল তবে এ কেস-এ আর ভয়ের কারণ নাই।

জীব। বাড়ীতেও এখনি খবর দেওয়ায় দরকার এতক্ষণে সেখানে কান্নাকাটি পড়ে গেছে।

বিভূ। খবর এখনি দিন, কারণ রাতে হাওয়ায় মাঠের ওপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া ঠিক হ'বে না। এ-রাতটা এখানো থাকতে হবে।

দয়া। তা' হ'লে ঠাকুরপো, তুমি গিয়ে সন্তুকে এ বাড়ীতে নিয়ে এস। তার প্রাণ এখনি আনচান করছে। এ খবর পেলে কিছুতেই না এসে থাকতে পারবে না।

উমা। আর ব্যবস্থাটাই বা কি? আর ছেলে মেয়ে ত' ন্যাই যে তাদের সামলাতে হ'বে।

জীব। পিসীমা ত' আছেন—তিনি যে ছেলের বাড়া। আজ আবার দশমী। তার ব্যবস্থা করে দু'জনে চলে' আসব। এখন গিয়ে দু'জনকে প্রকৃতিস্থ দেখতে পেলে বাঁচি। হাঁড়ী ত' নিশ্চয়ই চড়ে নি।

দয়া। তবে শীগ্‌গির গিয়ে খবর দাও ঠাকুর পো। আর রাতে তোমরা দু'জনেই এখানে খাবে। যদি বাড়ীতে আবার ফিরে যেতেও হয়, এখান থেকে খেয়ে দেয়ে যা'বে। মেয়ের জন্যে আর ভাবনা নেই।

জীব। মেয়ে যখন তোমাদের কাছে আছে তখন আর ভাবনা কি? তবে চল্লাম এখন।

দয়া। এস ভাই, সন্তুকে নিয়ে শীগ্‌গির এস।

তৃতীয় দৃশ্য—মুসলমানপল্লীস্থ বৃক্ষতল

তমিজদ্দিন, আব্দুল ও হানিফ

(আশরফ গ্রাম্যপথ বাহিয়া দ্রুত চলিতেছে)

তমিজ। ও আশরফ ভাই, ভোরবেলায় এত তরস্ত কোথায় যাচ্ছ? (আশরফ ফিরিয়া দাঁড়াইলে) সেলাম-আলেকম্‌।

আশ। আলেকম্‌ সেলাম। একটা খবর নিতে যাচ্ছি ভাই! খবরটা ভাল হ'বে কি মন্দ হ'বে তা'ত বুঝতে পারছিনে, সেই জন্যে মনটা ধড়ফড় করছে। কাজেই চলাটাও জোর হচ্ছে।

তমিজ। ফিরতে কি দেরী হ'বে?

আশ। তা'ত ঠিক বলতে পারছি নি ভাই! খোদা করেন যদি খবর ভাল হয়, শীগ্‌গির চলে আসব, যদি মন্দ হয়, দেরী হ'তে পারে। কেন বল দেখি?

তমিজ। আমার তামাক-ক্ষেতে যো হ'য়েছে, নাঙল দিতে হ'বে। আমার ত' মোটে একখানা নাঙল। তোমার নিজের কাজ না থাকলে আমার ক্ষেতে নাঙল জুড়তে পারতে। আবার তোমার দরকার হ'লে আমিও তোমার ক্ষেতে জুড়ব।

আশ। তা' ত জানি রে দাদা! আমি সেদিন নীলু গোপকে দিয়ে আমার ক্ষেত চষিয়ে নিলুম, আবার আমি গিয়ে তা'র ক্ষেত চষলুম। কিন্তু এ খবরটা না পাওয়া পর্য্যন্ত আমি কোন কাজে লাগতে পারছি নে।

আব্দুল। কী এমন জরুরী খবর, চাচা, যে কাজ ফেলে দৌড়চ্ছ? জমিদারের কাছারী যেতে হবে নাকি?

আশ। না, সেখানে ত' যখন তখন যেতে পারি। সে জন্য এত তরস্ত যাব কেন?

হানিফ। তবে কী খবর চাচা? তোমার কুটুম ত' ঢের—সংসারে আপনি আর কর্ত্রী। তবে কিসের জরুরী খবর?

আশ। খালি আপনি আর কর্ত্রীর দিকে চাইলেই কি হ'ল? যদি নিজের খাস সংসার নিয়েই ডুবে থাকব, পাড়া-পড়শীরও খবর না নেবো, যতদূর পারি কাজ করে' না দেবো, তবে খোদা মানুষ করে' পাঠিয়েছেন কেন? কি বল তমিজ ভাই?

তমিজ। ঠিক কথাই বলেছ আশরফ ভাই! ওরা ছেলেমানুষ, পড়শীর কিম্মত কী বুঝবে বল? তা' কা'র খবর নিতে যাচ্ছ শুনি!

আশ। কাল সন্ধ্যের একটু আগে বাজারে যেতে হ'য়েছিল। ফিরতি মুখে দেখি উমাপদ খুড়োম'শার ছেলে—ঐ যেটি হালে ডাক্তার হ'য়ে এয়েছে—একটি মেয়েকে পাঁজাকোলা করে' নিয়ে বাড়ী ঢুকছে।

হানিফ। কি-রকম কথা হ'ল? মেয়েটা কত বড়?

আশ। আরে শোন্‌ না বাপু, তারপর জিজ্ঞেসা করিস্‌।

তমিজ। ব'লে যাও ভাই! আজকালকার ছেলেগুলো কথায় কথায় লাফিয়ে ওঠে। শেষ পর্য্যন্ত শোন্‌, তারপর কথা ক'স্‌।

আব্দুল। বল চাচা, বল।

আশ। দেখলুম মেয়েটি অজ্ঞান আর দু'জনেরই কাপড় চোপড় ভিজে—টস্‌ টস্‌ করে' জল পড়ছে।

হানিফ। জলে ডুবে গেছল নাকি?—না ঘামে ভিজেছিল?

তমিজ। এ হানিফ বড় ভড়বোজে। কথার ডগা কাটিস্‌ কেন?

আশ। দু'কুড়ি পেরিয়ে গেল আর ধাম কি জল বুঝতে পারিনে?

আব্দুল। ও হানপেটা বড় বে-আক্কেল মুখোড়। তুমি বলে' যাও চাচা!

আশ। মিছেমিছি দেরী ক'রে দিচ্ছে। এতক্ষণে আমার কথা শেষ হ'য়ে যেত।—অন্ধকার হ'য়ে আসছিল বলে' আমি তাড়াতাড়ি চলে' আসছিলুম। দেখলুম মেয়েটিকে ব'য়ে নিয়ে যেতে ডাক্তার হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। আরও মনে করলুম যখন নিজের বাড়ীতেই যাচ্ছে তখন কোন কথা জিজ্ঞেস করবার দরকার কি? তারপর ঐ ঘোষপুকুরের কাছে আসতে জীবন খুড়োম'শার সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন, তাঁর মেয়ে পুকুরে গা-ধু'তে এয়েছেল, বাড়ী ফেরে-নি। অথচ ঘেঁ'ঘটটা নিয়ে এসেছেল, সেটা ঘাটে বসান রয়েছে।

তমিজ। বল কি? তারপর?

হানিফ। তারপর ত বোঝা-ই যাচ্ছে।

আব্দুল। তুই বড় চালাক। এখন থাম্ দেখি!

আশ। আমি জীবন-খুড়োকে বললুম ঐ ডাক্তার আর ঐ মেয়েটির কথা, আর শীগ্‌গির উমাপদবাবুর বাড়ীতে খবর নিতে বললুম। আমার হাতে লণ্ঠন ছেল না দেখে, আর অন্ধকার হ'য়ে আসছিল বলে' জীবন-খুড়োম'শায় আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে শশব্যস্ত হ'য়ে উমাপদবাবুর বাড়ীর দিকে ছুটলেন।

হানিফ। 'শশব্যস্ত' কথার মানে জানিস্ আব্দুল? 'শশ' অর্থাৎ খরগোসের মত ব্যস্ত—মানে তরস্ত ইতি ভাষা।

আব্দুল। তুই মস্ত পণ্ডিত।

হানিফ। পেহ্লাদগুরুর পাঠশালে পড়েছি, উমাপদ বোসের ইস্কুলে পড়েছি, তবু পণ্ডিত হ'ব না?

তমিজ। লেখাপড়া শিখেছ ত হানিফ, ভদ্রলোকের মান রেখে কথা বলতে শেখনি? উমাপদবাবু দেশের জমিদার, গাঁয়ের জন্যে এত করেছেন, বিনি মাইনেয় গরীবের ছেলেদের লেখাপড়া শেখবার জন্য ইস্কুল খুলে দিয়েছেন, আর তাঁকে বলছ কিনা উমাপদ বোস! উমাপদবাবু বলতে ত' একই সময় লাগে। দু'খানা বই পড়লেই শিক্ষে হয় না বাবা!

আশ। উমাপদবাবু আর জীবনবাবু কী দরের লোক তা' ছোঁড়ারা বুঝবে কি করে'? আমি চল্লুম ভাই! যদি খবর ভাল হয়, শীগ্‌গির ফিরে আস্‌ব—এসে তোমার ক্ষেতে হাল জুড়ব। (প্রস্থান)

তমিজ। তোরা ত' দেখেছিস্—এবারে যখন বানে সব ভেসে গেল তখন উমাপদবাবু আর জীবনবাবু ডোঙায় করে' চাল ডাল পাঠিয়েছেন তবে আমরা খেয়ে বেঁচেছি। জীবন-বাবু নিজে বাড়ী বাড়ী গিয়ে খবর নিয়েছেন। তাঁরা বীজধান না যোগালে আমাদের চাষই হ'ত না। আল্লা করুন যেন জীবনবাবু মেয়েটিকে ফিরে পা'ন। আমারও ছুটে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। খবরটা না শুনে ক্ষেতে যেতে মনই সরছে না।

(ফজলের প্রবেশ)

ফজল। কি মিঞাভাই, মসজিদ থেকে এসে এখানে সকলে এত বেলা পর্য্যন্ত বসে' যে? কাজকর্ম্ম নেই বুঝি?

তমিজ। কাজকর্ম্ম আছে বৈ-কি হাজিসাএব? আশরফ-ভাই একটা খবর নিতে গাঁয়ে চলে' গেল। সেই খবরটা শোনবার জন্যে উৎসুক আছি। কাজে মন লাগছে না।

ফজল। কি এমন জরুরী খবর যে শোনবার জন্যে কাজ ফেলে বসে' আছেন?

তমিজ। আমাদের জমিদার জীবন ঘোষ-বাবুর মেয়ে কাল বিকেলে জলে ডুবে গেছল এই সন্ধে করে' আশরফ-ভাই কাল সারা রাত বড় কাতর ছিল, তাই সকালে খবর নিতে গেছে।

ফজল। হিন্দুর মেয়ে? তা'র জন্য এত কাতর যে আশরফ মিঞা কাজ ছেড়ে খবর নিতে গেলেন? নিজের জাতভাই হ'লেও বোঝা যেত।

তমিজ। আপনি যদি এ গাঁয়ের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতেন তা হলে বুঝতে পারতেন জীবনবাবু আর উমাপদ-বাবু কি দরের লোক। হিন্দু মুসলমান, ভদ্দর চাষা তাঁরা সমান চোখে দেখেন। আমরা তাঁদিগে কাকাবাবু বলে' ডাকি, তাঁদের ইস্ত্রীদেরকে কাকীমা বলি, তাঁদের ছেলে মেয়েকে দাদা দিদি বলি। তাঁরা আমাদের ছেলের মতন দেখেন। কত উপকার যে তাঁরা করেন বলে শেষ করা যায় না। শুধু ওঁরা কেন, গাঁয়ের সমস্ত হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এই রকম আত্মীয়তা। এনাদের মত জমিদার না হ'লে

বছর বছর যে রকম বন্যা অজন্মা হচ্ছে, আমরা সকলে না খেয়ে মারা যেতুম। জমি জমা ত' অন্যরকম জমিদার হ'লে বিকিয়ে যেত।

ফজল। তবু আমরা মুসলমান আর তাঁরা হিন্দু। দু'জাতের ধর্ম্মে আকাশ পাতাল তফাৎ। কোথায় ইস্লাম আর কোথায় কুসংস্কারপূর্ণ পৌত্তলিকতাবাদী হিন্দুধর্ম্ম!

তমিজ। যদিও তাই হয়, ধর্ম্মের সঙ্গে আত্মীয়তার বা বন্ধুত্বের সম্পর্ক কি?

ফজল। সম্পর্ক নাই? হিন্দুরা যে মূর্ত্তি পূজা করে, তেত্রিশকোটী দেবতা মানে। আল্লা যে এক, তাঁর কি মূর্ত্তি আছে, না সীমা আছে? যে-ধর্ম্মে ঈশ্বরের একত্ব ও অসীমতা মানে না, সে কি আবার ধর্ম্ম? যিনি নিরাকার তাঁর মূর্ত্তি গড়ে' তস্‌বির এঁকে পূজার ভান করে। আমরা বরং খৃষ্টানের মেয়ে, ইহুদীর মেয়ে বিবাহ করতে পারি, কিন্তু হিন্দুর মেয়েকে পারি না। হিন্দুকে সর্ব্বদা দূরে দূরে রাখতে হয়, তার ছায়া মাড়ালেও পাপ।

তমিজ। যে-ধর্ম্ম মেনেই চলুক, আর পুতুল পূজোই করুক, বা ছবির পূজোই করুক লোক যদি ভাল হয়, যদি কারও অনিষ্ট না করে, বরং উপকারই করে, তা' হ'লে তাকে ভাল বলব না কেন, তার খাতির করব না কেন, তার সঙ্গে আত্মীয়তা করব না কেন? আর যদি কোন মুসলমান লোকের অনিষ্ট করে' বেড়ায়, কারও ভাল দেখতে পারে না, তা'কে অমনি মান্‌ব?

ফজল। যে মুসলমান, যে আল্লাকে মানে, যে হজরত মহম্মদকে মানে, সে যাই হ'ক তা'কে মানতেই হবে, খাতির করতেই হ'বে। যে-কোন মুসলমান আপনার সঙ্গে এক আসনে বসে খাবে, দরকার হলে আপনার জন্য অর্থাৎ জাত ভায়ের জন্য লাঠি ধরবে। কোন হিন্দু কি তা করবে? হিন্দুরা, বিশেষতঃ তাদের বিধবারা খানা খেতে বসে যদি কোন মুসলমানের মুখ দেখে, খানা ছেড়ে উঠে পড়বে। তারা মুসলমানের ছায়া মাড়ালেও পাপ হয় এই রকম মনে করে। হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের আত্মীয়তা কি হ'তে পারে?

তমিজ। তা হলে' আমাদের হ'ল কি করে'? জানেন ত হাজীসাএব, হিন্দুরা জাত মানে। তাদের নিজেদের মধ্যে কত রকম জাত আছে। হিঁদুর কোন জাত কি অন্য কোন জাতের সঙ্গে বসে' খায়? কোন কোন জাতের জল পর্য্যন্ত চলে না। কিন্তু তারা জাত-ব্যাওসাটা বজায় রাখে। কামার লোহার গড়ন গড়ে, কুমোর মাটির গড়ন গড়ে, কাঁসারি কাঁসা পেতলের গড়ন গড়ে বা কেনা বেচা করে, ভটচায্যি বামুন পূজো আচ্চা করে বা টোল খুলে ছেলে পড়ায়। এই রকমেই হিঁদুর সমাজ চলে' আসছে। আর দেখুন না আমরা এখানে এত মুসলমান, আমাদের মধ্যে না জানে কেউ কামারের কাজ, না জানে কুমোরের কাজ। আমরা কেবল চাষ করতেই জানি। কোন মুসলমান এ পর্য্যন্ত একটা মুদিখানা খুলতে পারলে না।

ফজল। আপনারা কাজ করান পয়সা দিয়ে, জিনিষ কেনেন পয়সা দিয়ে। ফেল কড়ি মাখ তেল। এজন্য আত্মীয়তা, বন্ধুতার প্রয়োজন কি?

তমিজ। আমাদের কড়ির খবর ত' রাখেন না হাজী সাএব! সব সময়ে কড়ি কি থাকে? যখন ট্যাঁক হয় গড়ের মাঠ, তখন যে ধারে কারবার করতে হয়। একটু দহরম মহরম না থাকলে কি সে-কারবার চলে? আমাদের মধ্যে একজন গুরুও নেই যে ছেলেগুলোকে তা'র পাঠশালে পড়াই। আমাদের ছেলেরা হিন্দুগুরুর পাঠশালে বা হিন্দুর ইস্কুলে হিন্দুর ছেলেদের সঙ্গেই পড়ে। গাঁয়ের লোকের সঙ্গে, পাড়া পড়শীর সঙ্গে যদি বনিয়ে না চলি, তা'হলে ত' দিনরাত অশান্তির মধ্যে বাস করতে হয়। এই বাবুদের বাড়ীতে পূজোর সময়, বিয়েথার সময় আমাদের নেমন্তন্ন হয়, কত যত্ন করে' তাঁরা আমাদেরকে লুচি মোণ্ডা খাওয়ান। সে কী আনন্দ!

ফজল। এঃ—আপনারা ক্রমে ক্রমে পুতুল পূজো করবেন দেখছি!

তমিজ। তা'র মানে কি? ধর্ম্ম ত যে যার নিজের কাছে। আর ঐ যে বললেন সব মুসলমান একসঙ্গে বসে' খায় তাও, আমার যতদূর মনে হয়, একেবারে ঠিক নয়। আমার মতন চাষার সঙ্গে কোন বড়লোক মুসলমান কি একই আসনে বসে' খাবেন—তা' তিনি বড় চাকুরেই হ'ন আর জমিদারই হ'ন? জাত কি আমরাই মানি না? আমরাই কি হিন্দুর রান্না ভাত খাই, না খ্রীষ্টানের রান্না ভাত খাই? আর ঐ যে বিয়ের কথা বললেন, ইহুদীর মেয়েকে খ্রীষ্টানের

মেয়েকে ঐ সব বড়লোক মুসলমানই বিয়ে করেন—আমাদের মতন গরীব গেরস্তও নয় বা গোঁড়া মুসলমানও নয়।

ফজল। কোন মুসলমান এমন হিন্দুভক্ত হ'তে পারে আমার ধারণা ছিল না। ছেলেগুলোকে হিন্দুর স্কুলে, হিন্দুর ছেলের সঙ্গে, হিন্দু মাষ্টারের কাছে পড়িয়ে তা'দের পরকাল খাচ্ছেন।

হানিফ। হাজীসাএব, আমি চ্যাংড়া হ'লেও কথা না বলে' থাকতে পার্‌ছি না। হিন্দুর পাঠশালে বা স্কুলে হিন্দুর ছেলেরা যা' পড়্‌তো, আমরাও তাই পড়্‌তেম সত্যি। কিন্তু কি পড়া হ'ত বা সাধারণতঃ কি পড়া হয় তা' জানেন? পাটিগণিত, ভূগোল, ইতিহাস, পদার্থবিদ্যা, প্রাণিবৃত্তান্ত এবং এই ধরণের অন্যান্য বই। এ ছাড়া বড় বড় লোকের জীবন-চরিত এবং নানা রকমের বাংলা ও ইংরেজী গদ্য ও পদ্য পড়া হ'ত। একখানিও ধর্ম্ম গ্রন্থ পড়া হ'ত না। বরং খ্রীষ্টান মিশনারীদের স্কুলে বাইবেল পড়ান হয় শুনতে পাই। জীবন-চরিতে হজরৎ মহম্মদের জীবনীও থাকে, যীশুখ্রীষ্টের জীবনীও থাকে, চৈতন্য-বুদ্ধেরও জীবনী থাকে। জীবনীগুলি যে শিক্ষাপ্রদ তা' বোধ করি স্বীকার করবেন। এই সকল বই পড়ে' আমাদের পরকাল কিরূপে নষ্ট হ'তে পারে? হিন্দুর স্কুলে পড়ে' ত' আমরা হিন্দু হই নি! মহম্মদের জীবনী পড়ে'ও কোন হিন্দুর ছেলে মুসলমান হয় নি। খ্রীষ্টানের স্কুলে বাইবেল পড়ে'ও কাউকে খ্রীষ্টান হ'তে দেখি নি।

আব্দুল। আমিও একটা কথা জিজ্ঞাসা করি হাজিসাএব, কিছু মনে করবেন না। আপনি ঐ যে ইস্‌লামের কথা বল্লেন, অন্য ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা কি ইস্‌লামের শিক্ষা? তা' কখন হ'তে পারে না।

ফজল। হিন্দুর স্কুলে পড়ে' তোমরা প্রায় কাফের হ'য়ে গেছ!

তমিজ। গালাগালি দেবেন না হাজীসাএব! ভিন্ন ধর্ম্মকে বা ভিন্ন ধর্ম্মের লোককে সম্মান করলে কেউ কাফের হয় না। আর যদি উমাপদবাবু, জীবনবাবুর মত লোক হিন্দু বলে' কাফের হ'ন, আমিও সে-রকম কাফের হ'তে রাজী আছি। আপনি জানেন কি যে যদি উমাপদবাবুর ইস্কুলে আমাদের ছেলেরা বিনি মাইনের পড়্‌তে না পেত, তা' হ'লে ওদের যে-টুকু বিদ্যে হ'য়েছে তা' হ'ত না। আর যদি ধান-চাল-শাক-শবজী দিয়ে পেল্লাদ গুরুর পাঠশালে লিখতে পড়তে না শিখত, তা' হ'লে ওদের অক্ষর-পরিচয়ও হ'ত না। চাষার ছেলে হ'লে কি হয়, একটু আধটু বিদ্যেও ত' দরকার।

ফজল। ও-রকম বিদ্যা আর ঐরকম ক'রে শেখবার চেয়ে না শেখাই ভাল।

হানিফ। আপনি ত' বলে'ই যাচ্ছেন, হাজীসাএব, ওটা ভাল নয়, এটা মন্দ, কিন্তু কোন যুক্তি ত' দেখালেন না। যুক্তি না দেখা'লে আমরা বুঝব কিরূপে?

ফজল। বিষাক্ত শিক্ষায় তোমাদের মাথা বিগড়ে গেছে। হাজার যুক্তি দেখালেও তোমরা বুঝবে না। আর যুক্তি শোন্‌বারই বা দরকার কি? আমি কথন বল্‌ছি সেই-ই যথেষ্ট।

আব্দুল। কোরাণশরীফ থেকেই দু'একটা নজীর দেখান না। তা' ছাড়া আমরাই যেন উমাপদবাবুর স্কুলে পড়ে' কু-শিক্ষা পেয়েছি, বাপজী ত' সে স্কুলে পড়েন নি।

তমিজ। আমিও যে দয়াল গুরুমশায়ের পাঠশালে ট টা টি টী পড়েছিলুম বাবা! যাক, ও-সকল কথা এখন ধামা-চাপা দেও—ঐ আশরফভাই আসছে। খবরটা শোনবার জন্যে প্রাণটা হাঁই-ফাঁই করছে। (আশরফের প্রবেশ) কি খবর আশরফভাই! আমরা সকলে তোমার মুখ চেয়ে আছি।

আশ। খবর ভাল। অমন লোকের বরাতে যদি কিছু মন্দ ঘটে তা' হ'লে যে আল্লাতালার বদনাম হবে। চল, তোমার ক্ষেতে হাল জুড়িগে।

তমিজ। বেলা অনেক হয়েছে যে!

আশ। হ'ক বেলা—এখন দম বেড়ে গেছে।

[ক্রমশঃ]



বিজ্ঞান জগৎ

আহতের চিকিৎসায় রক্তের ব্যবহার

অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র, বি-এস্-সি (লণ্ডন)

আজকাল প্রতিদিন খবরের কাগজে "ব্লাডব্যাঙ্ক"-এর কথা সকলেই পড়িয়া থাকেন। যুদ্ধে হাজার হাজার আহত সৈনিকেরা যাহাতে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে তাহার জন্য রক্তের প্রয়োজন—সুস্থ লোকের রক্ত আহতের শরীরে প্রবেশ করাইয়া বহু লোকের প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব। এই রক্ত এক জায়গায় জমা করিয়া যেখানে প্রয়োজন সেখানে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়। ব্যাঙ্কে যেমন টাকা জমা হয়, এই ব্যাঙ্কে তেমনি রক্ত একত্রিত করা হয় বলিয়া উহাকে "ব্লাডব্যাঙ্ক"—এই নাম দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা স্বেচ্ছায় পরোপকারার্থে নিজের নিজের রক্ত দান করেন তাঁহাদের blood-donor বা রক্তদাতা নামে অভিহিত করা হয়। খবরের কাগজে তাহাদের তালিকা বাহির হয়, যাহাতে অন্যান্য লোকে তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করে।

আহতদিগের জন্য রক্তের ব্যবহার কিরূপে করা হয়, সে সম্বন্ধে দুই-চারিটী কথা সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত। রক্ত শরীরের একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তু। রক্তের প্রধান কাজ ফুস্ফুস্ হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া তাহা শরীরের বিভিন্ন অংশে পৌছাইয়া দেওয়া। অক্সিজেন না থাকিলে বাতি যেমন জ্বলিতে পারে না, তেমনি অক্সিজেন ব্যতিরেকে শরীরের বিভিন্ন অংশের কার্য্যও চলে না। মানুষের দেহ কতকগুলি কোষের (cell) সমষ্টি—সেই কোষগুলি প্রোটোপ্লাজম্ নামক এক রকম জেলির মত পদার্থ দ্বারা গঠিত, তাহার একটী উপাদান কার্ব্বন্। অক্সিজেনের সম্পর্কে আসিলে প্রোটো-প্লাজমের এই কার্ব্বন্ অক্সিজেনের সহিত মিশিয়া দেহে উত্তাপের সৃষ্টি করে এবং সেই উত্তাপের সাহায্যে দেহের যন্ত্রগুলি পরিচালিত হয়। যদি রক্ত শরীর হইতে ক্রমাগত বাহির হইয়া যায় তাহা হইলে শরীর ক্রমেই নির্জ্জীব হইয়া আসিবেই এবং অবশেষে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, পাকস্থলীর ক্রিয়া, শরীরের অঙ্গচালনা সবই বন্ধ হইয়া যাইবে এবং মৃত্যু ঘটিবে।

যুদ্ধক্ষেত্রে কত লোক যে আহত হইয়া রক্তস্রাবের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। যদি কোনও উপায়ে ইহাদের শরীরে রক্ত প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহারা সন্তমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে এবং পরে চিকিৎসার গুণে সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিতে পারে।

একজনের রক্ত অন্যের শরীরে দিবার আগে অনেক বিষয় ঠিক করিয়া লইতে হয়—প্রথমতঃ রক্তের কোন্ অংশটুকু দেওয়া উচিত, দ্বিতীয়তঃ কোন্ ব্যক্তির রক্ত কাহার পক্ষে ক্ষতিজনক হইতে পারে, তৃতীয়তঃ যুদ্ধক্ষেত্রে অপরের দেওয়া রক্তের সরবরাহ মজুত রাখা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? এই তিনটী প্রশ্নের সিদ্ধান্ত না হইলে "Blood Bank"-এর কোনও রূপ ব্যবস্থা করা বৃথা।

রক্তের মোটামুটি তিনটী অংশ—plasma, red corpuscle ও white corpuscle। রক্তের জলীয় অংশের নাম plasma, ইহা ঈষৎ হরিদ্রাভ—এই জলীয় অংশে দুই প্রকার দানার মত জিনিষ ভাসিয়া বেড়ায়—লাল চাকতীর মত এক রকম দানা তাহাদের red corpuscle বলে এবং বর্ণহীন দানা যাহাদের white corpuscle বলা হয়। রক্তের রং লাল তাহার কারণ উহাতে red corpuscle থাকে। এক cubic millimeter পরিমাণ plasma-য় প্রায় ৫০ লক্ষ red

corpuscle এবং ১০ হাজার white corpuscle ভাসমান থাকে। Plasma জলীয় পদার্থ, ইহাতে জল ছাড়া আরও অন্যান্য কয়েকটী বস্তু মিশ্রিত আছে। ১০০০ অংশ plasma য় নিম্নলিখিত উপাদানগুলি পাওয়া যায়:—

জল—	৯০২'৯০ অংশ
Solids—	৯৭'১০ "
প্রোটিন্—	৮৯'৮৯ "
Extractives (including fat) ...	৫'৬৬ "
Inorganic Salts ...	৮'৫৫ "

আহতদিগের ব্যবহারের জন্য রক্তের এই plasma সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ।

আরও আগে সুস্থ ব্যক্তির শিরা হইতে রক্ত লইয়া, সমস্তটুকুই আহতের শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইত—plasma, red corpuscle, white corpuscle সবই ভিতরে যাইত। এ রকম রক্তপ্রদানের নাম "transfusion of whole blood"। এ প্রকার ব্যবস্থায় অনেক অসুবিধা আছে। যে কোন লোকের রক্ত অন্য যে কোনও লোককে বিনা বিচারে দেওয়া বিপজ্জনক—কোনও কোনও ক্ষেত্রে অন্যের রক্ত রোগীর শরীরে প্রবেশ করিলে রোগীর রক্ত জমাট বাঁধিয়া যায়, ফলে রক্তচলাচল বন্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটে। একজনের রক্ত আর একজনের রক্তের সহিত খাপ খাওয়ান যায় কি না তাহা আগে পরীক্ষা করা দরকার।

রক্তের সংমিশ্রণের ফলের দিক্ দিয়া মানুষকে চারিটী শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—Group I, Group II, Group III, Group IV। এই চারিটী শ্রেণীকে blood groups বলা হয়। Group I পর্য্যায়ের লোকেরা যে কোনও লোকের রক্ত গ্রহণ করিতে পারে—তাহাদের universal recipients বলা হয়, কিন্তু নিজেদের শ্রেণীভুক্ত লোক ছাড়া অন্য কাহাকে ইহাদের রক্ত দিলে অন্যের রক্ত জমাট বাঁধিয়া যায় এবং মৃত্যুর কারণ হয়। Group IV পর্য্যায়ের লোকেরা ঠিক উল্টা—ইহারা universal donors অর্থাৎ ইহাদের রক্ত অন্য যে কোনও শ্রেণীর লোকেদের দেওয়া চলিতে পারে, কিন্তু ইহারা নিজেদের শ্রেণীভুক্ত ছাড়া অন্য কোনও শ্রেণীর লোকদের রক্ত গ্রহণ করিতে পারেন না। Group II ও Group III শ্রেণীর লোকেরা শুধু আপন আপন পর্য্যায়ভুক্ত লোককে রক্ত দিতে পারে এবং আপন আপন পর্য্যায়ভুক্ত লোকের রক্ত গ্রহণ করিতে পারে।

রক্তের এই শ্রেণীবিভাগের তারতম্য থাকার দরুণ চিকিৎসককে blood transfusion ব্যাপারে খুবই সাবধান হইতে হয়। রোগী কোন্ blood groupএর লোক তাহা যেমন জানা দরকার, সেই রকম যাহার কাছ হইতে রক্ত নেওয়া হয় সেও কোন্ blood groupএর লোক তাহাও জানা প্রয়োজন। যদি whole blood অর্থাৎ রক্তের সমস্ত অংশটুকু প্রদান না করিয়া শুধু plasmaটুকু আলাদা করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে সমস্যা অনেকটা সরল হইয়া উঠে। রক্তের red corpuscle ও white corpuscleগুলিকে পৃথক্ করিয়া শুধু plasmaটুকু রোগীর শরীরে প্রবেশ করাইলে blood groupএর তারতম্যের কোনও বিচারের দরকার হয় না। যে কোনও লোকের রক্তের plasma যে কোনও রোগীর শরীরে প্রদান করা চলে। কাজেই transfusion of plasma অনেকটা নিরাপদ transfusion of whole bloodএর তুলনায়। এই সকল কারণে আজকাল plasmaরই ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে।

Plasmaকে red corpuscle ও white corpuscle হইতে পৃথক্ করা সহজ। একটী test tubeএ কিছু কাঁচা রক্ত (fresh blood) লইয়া তাহার সহিত নূনের জল মিশাইয়া test-tubeটা বরফের মধ্যে বসাইয়া রাখিয়া দিলে রক্ত জমাট বাঁধে না—কিছুক্ষণ পরে red corpuscle ও white corpuscleগুলি তলায় থিতাইয়া যায় এবং উপরে জলীয় plasma ভাসিতে থাকে—এই জলীয় plasma কাঁচের নলের সাহায্যে সহজেই উঠাইয়া লওয়া যায়। রোগীর শরীরে প্রবেশ করাইবার আগে পরীক্ষা করা উচিত ইহাতে রোগের জীবাণু আছে কি না। যদি জীবাণুবিহীন (sterile) হয় তাহা হইলে ইহার দ্বারা transfusion-কার্য্য চলিবে, নহিলে ইহা ফেলিয়া দিতে হইবে। জীবাণুর অস্তিত্ব পরীক্ষার একটী সহজ উপায়—শিশির ভিতরে কিছু beef broth (গোমাংসের ঝোল) লইয়া তাহাতে একটু plasma ঢালিয়া দিয়া ২৪ ঘণ্টা রাখিয়া দিতে হয়—beef broth জীবাণুর সংখ্যাবৃদ্ধির সাহায্য করে। ২৪ ঘণ্টায় জীবাণুর সংখ্যা এত বাড়িয়া উঠে যে, মাইক্রোস্কোপে তাহা স্পষ্টই ধরা পড়ে।

উপরে যে উপায় বর্ণনা করা হইল তাহা লেবরেটারীতে ছোট পরিমাণ plasma সংগ্রহের কাজে চলিতে পারে কিন্তু যুদ্ধের সময় যখন খুব বেশী পরিমাণ plasmaর দরকার হয় তখন অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন সহর ও গ্রাম হইতে সংগৃহিত রক্ত শিশিতে ভরিয়া sodium citrate নামক এক পদার্থের সহিত মিশাইয়া রাখা হয় যাহাতে রক্ত জমাট না বাঁধে—জমাট বাঁধিলে plasma আলাদা করা যায় না। এইরূপ শিশির রক্ত refrigerator-এর মধ্যে রাখিয়া ট্রেণের সাহায্যে Processing Laboratoryতে পাঠান হয়। এই Laboratoryতে রক্ত হইতে plasma আলাদা করা হয়। একটা বড় ঘূর্ণায়মান চাকতীর চারিদিকে রক্তের শিশিগুলি আটকাইয়া দিয়া, চাকাটিকে খুব জোরে ঘোরান হয়। মিনিটে প্রায় ২৫০০ বার চাকা ঘোরে। এইরূপ centrifugal force-এর ফলে শিশিগুলির ভিতরে red corpuscle ও white corpuscle তলায় পড়িয়া যায় এবং উপরে plasma সরের মত ভাসিতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে চাকা থামাইয়া শিশিগুলি বাহির করিয়া আনা হয় এবং উহার ভেতর হইতে plasma উঠাইয়া নেওয়া হয়। এই plasma শিশিতে ভরিয়া উহার সহিত কিছু saline solution মিশাইয়া জীবাণু পরীক্ষার জন্য পাঠান হয়। প্রত্যেক শিশির একটু একটু plasma নিয়া beefbroth-এর সহিত মিশাইয়া একটী গরম ঘরে, যাহাকে incubation room বলে, সেখানে রাখা হয়—২৪ ঘণ্টা পরে খালি চোখেই দেখিতে পাওয়া যায় উহাতে জীবাণু নড়িয়া বেড়াইতেছে কি না। যদি জীবাণুর চিহ্ন না পাওয়া যায়, তাহা হইলে, শিশির plasmaটিকে এক একটা কাচের cylinderএ পুরিয়া বরফের মধ্যে রাখিয়া ১০০° হইতে ১৫০° ফারেনহাইট্ ঠাণ্ডার মধ্যে আস্তে আস্তে ঘোরান হয়—এইরূপ ঘোরানর ফলে plsama জমিয়া গিয়া শিশির গায়ে পাউডারের মত জমে। পরে একটী vacuum pump-এর সাহায্যে শিশিকে dehydrate করা হয় অর্থাৎ সমস্ত জলীয় বাষ্প নিষ্কাশিত করা হয়। cylinder-এর ভেতর plasma তখন ঠিক গুঁড়া গুঁড়া ক্রীম রংয়ের পাউডারের মত দেখায়। কাচের cylinderএর মুখগুলি তখন আগুনের সাহায্যে air-tight করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

এইরকম জীবাণুবিহীন, জলীয়-বাষ্পবিহীন, hermetically sealed plasma অনির্দিষ্ট কালের জন্য রাখা চলে। প্রয়োজনের সময় জীবাণুহীন (sterile) জলের সঙ্গে plasma গুলাইয়া লইলে, plasmaর পাউডার গলিয়া যায় এবং সেই solution রোগীর দেহের veins-এর মধ্যে ইন্জেকসন্ করিয়া দেওয়া হয়।

রেডক্রস সোসাইটী রক্ত সংগ্রহ ও রক্ত বিতরণ কার্য্যে খুবই সচেষ্ট—বিগত যুদ্ধে এইরূপ রক্তের দ্বারা চিকিৎসায় বহু লোক মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

আনো শান্তিজল

শ্রীপ্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়

বর্ত্তমান সভ্যতার অগ্নিগিরি বহির্বাস খুলি',
সহসা কখন জানি সগর্জ্জনে উঠিছে চঞ্চলি।
গলিত লাভার স্রোত নামি আসে কামানের মুখে,
অগ্নিবৃষ্টি করে ওই অগ্নিবোমা হেরি দিকে দিকে!
জীবাত্মা গুমরি উঠে, প্রাণখানি কাঁপে ধরিত্রীর,
প্রদীপ-শিখার মত, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ উন্মত্ত রাত্রির।
খাদ্য-মূল্যে অগ্নি লাগে, ক্ষুধাগ্নির তৃপ্তি নাহি আর,
চতুর্দ্দিক অগ্নিময়ী, বিশ্বব্যাপী উঠে হাহাকার।
নগরী বিধবা সাজে, খুলি' ফেলে সব আভরণ,
নিভায় আলোকমালা, ছুঁড়ি দূরে রতন ভূষণ
করিছে ক্রন্দন।

হে বন্ধু, দয়ার সিন্ধু ত্বরা করি আনো শান্তিজল,
মন্ত্রপূতঃ বারিস্পর্শে দিগদিগন্ত হৌক সুশীতল।
নূতন পথের দিশা, হে দিশারী দাও ত্রিভুবনে,
মৃত্যুর আবর্ত্ত হ'তে মুক্ত করি নবস্রোত টানে
লয়ে চল সেইখানে, যেথা আছে গান আর প্রাণ
উচ্ছল আনন্দ, প্রেম, শান্তিময়ী অনন্ত কল্যাণ।
সেই পথে লয়ে চল মানুষ-সে মানুষেরে যা'তে,
ভালবাসি, মিলিমিশি' খেলি হাসি চলে একই সাথে।
অভিশপ্ত শতাব্দীর বর্ব্বর সভ্যতা হ'ক শেষ,
ধরিত্রী ডাকিছে 'ত্রাহি' কর চির শান্তির উন্মেষ
হে বন্ধু প্রাণেশ।

মঙ্গল-কাব্য

শ্রীকালিদাস রায়

(এক)

বাংলা ভাষায় দেব দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য যে কাব্য রচিত হইত তাহার নাম মঙ্গল-কাব্য। বৈষ্ণব সাহিত্যের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব হইতে এই শ্রেণীর কাব্য আমাদের দেশে রচিত হইতেছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে সাহিত্যাংশে উৎকৃষ্ট বিশেষ কোন মঙ্গল-কাব্য রচিত হয় নাই।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রেম-বন্যায় দেব দেবীর ঘটপট সব ভাসিয়া গিয়াছিল। নূতন ধর্ম্মমতের এবং তদনুগত সাহিত্যের আবির্ভাবে মঙ্গল-কাব্যের ধারা বিলুপ্ত না হইলেও স্তিমিত হইয়া গিয়াছিল। বৈষ্ণবধর্ম্মও ভক্তিমূলক, লৌকিক ধর্ম্মও ভক্তিমূলক। কিন্তু এই দুইশ্রেণীর ভক্তিতে প্রভেদ প্রচুর। বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভক্তি নিষ্কাম, উহাতে পুরুষার্থ বা মোক্ষ পর্য্যন্ত প্রার্থনীয় নয়, প্রেমই পুরুষার্থ-শিরোমণি ভক্তিতেই ভক্তির শেষ। লৌকিক শক্তি ধর্ম্মের ভক্তি সকাম। ইহসংসারে সকল সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও পরত্রের স্বর্গসুখ ইহাতে প্রার্থনীয়। বৈষ্ণব ভক্তির আদর্শ ঢের বেশি উচ্চগ্রামের।* স্বভাবতই এই আদর্শের সাহিত্যধারা লৌকিক ধর্ম্মসাহিত্যধারাকে পরাভূত করিয়াছিল। দেশের সাহিত্য ধর্ম্মমূলক হইলেও ইহা জনসাধারণকে আনন্দও দিয়াছে। রাত্রি জাগিয়া বাঙ্গালা চণ্ডী মনসার গান শুনিত বলিয়া বৃন্দাবন দাস নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালী যে রাত জাগিয়া এই গান শুনিত এবং ইহা লইয়া মাতিয়া থাকিত তাহা কেবল ধর্ম্মের জন্য নয়, আনন্দের জন্যও বটে। সেদিক হইতেও বৈষ্ণব সাহিত্য দেশের লোককে গভীরতর ও বিশুদ্ধতর আনন্দ দান করিয়াছে। রসকলাসম্মত পদাবলীকীর্ত্তন পুরজনপদের নাটমন্দির, দোলতলা, বারোয়ারিতলাগুলিকে অধিকার করিয়া ফেলিয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের কিছুকাল পরে কালাপাহাড় বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সমস্ত দেবদেবীর মূর্ত্তি চূর্ণ করিয়াছিল। যে সকল দেবদেবীকে বাঙ্গালীরা জাগ্রত দেবতা বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহারা কেহই আত্মরক্ষাও করিতে পারেন নাই, আততায়ীর দণ্ডবিধান করিতেও পারেন নাই। ইহাতে লোকের মনের মন্দিরেও তাঁহাদের আসন অটল ছিল বলিয়া মনে হয় না। ইহার ফলে দেশের লোকের চিত্ত দেব দেবীর মন্দির হইতে বৈষ্ণবদের আশ্রমে ও আখড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল কি না তাহাই বা কে বলিল?

যাহা হউক, লোকের চিত্তের সকাম ভক্তিভাব বিলুপ্ত হইতে পারে না। বৈষ্ণবধর্ম্ম লোকের মনের কোন ঐহিক প্রার্থনা পূরণ করিতে পারে না; যাহারা ঐহিক সুখসম্পদ বর্জ্জন করিয়াছিল, তাহারা তাঁহার অর্জ্জনের কোন পথও বলিয়া দেয় নাই। কেমন করিয়া শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে সে কথা তাঁহারা বলেন নাই—কেমন করিয়া ভক্তিলাভ করিতে হইবে তাহার জন্যই তাঁহাদের সকল উপদেশ, তাঁহাদের আবেদন ছিল—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং বনিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্ম জন্মনীশ্বরে ভবতাৎ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।

লোকের কিন্তু অভাব অভিযোগ ও দুঃখের অবধি ছিল না। কোথায় তাহার প্রতিকার? মানুষ ত' দৈবশক্তির হাতের পুতুল, তাহার পৌরুষ কতটুকু প্রতিকার করিতে পারে? দেশের রাজার কাছে কোন আবেদন নিবেদন বৃথা। রাজার জাতির মনোভাব হিন্দু প্রজার প্রতি কিরূপ ছিল বিজয়গুপ্ত পদ্মাপুরাণে ও জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গলে তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন কাব্যে, এবং কবিকঙ্কণ সাক্ষ্য দিয়াছেন তাঁহার জীবনে।

---

* বৈষ্ণবধর্ম্মের শক্তি হ্লাদিনী শক্তি—সে শক্তি বলরূপিণী নয়—প্রেম-রূপিণী। তাহাতে ভগবানের সহিত জগতের যে দ্বৈতবিভাগ স্বীকার করে তাহা প্রেমের বিভাগ, আনন্দের বিভাগ। তিনি বল ও ঐশ্বর্য্য বিস্তারের জন্য শক্তি প্রয়োগ করেন নাই—তাঁহার শক্তি সৃষ্টির মধ্যে নিজেতে নিজে আনন্দিত হইতেছে। এই বিভাগের মধ্যে তাঁহার নিয়ত মিলনরূপে প্রতিষ্ঠিত শাক্ত ধর্ম্মে অনুগ্রহের অনিশ্চিত সম্বন্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মে প্রেমের নিশ্চিত সম্বন্ধ। শক্তির লীলায় কে দয়া পায় কে না পায় তাহার ঠিকানা নাই। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রেমের সম্বন্ধ যেখানে সেখানে সকলেরই নিত্য দাবি। শাক্ত ধর্ম্ম ভেদকেই প্রাধান্য দিয়াছে—বৈষ্ণব ধর্ম্মে এই ভেদকে নিত্য মিলনের নিত্য উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। —রবীন্দ্রনাথ

রাজার জাতির নির্য্যাতনকে হিন্দুরা দৈবনির্য্যাতনেরই অঙ্গ মনে করিত। কাজেই দেবদেবীর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর উপায় কি? এই মনোভাব হইতেই মঙ্গল-কাব্যের পুনরভ্যুদয়।

দেশের মঠমন্দিরে ও মনোমন্দিরে দেববিগ্রহ চূর্ণ হওয়ায় যাহাদের প্রভুত্ব, প্রতিষ্ঠা ও উপজীবিকার উপায়ও চূর্ণ হইয়াছিল, তাহারাও নিশ্চেষ্ট ছিল না। তাহারা নূতন করিয়া অলীক ভয় ভীতি ও আশা আকাঙ্ক্ষার জাল বুনিয়া দেবতাদের নব কলেবর দানের জন্য নিশ্চয়ই সচেষ্ট হইয়াছিল। ইহা ছাড়া বৈষ্ণব-সমাজের সঙ্গে যখন অবৈষ্ণব সমাজের দারুণ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল, যখন বৈষ্ণবগণ নিত্য নব মহোৎসবে মাতিয়া খোলকরতালের ধ্বনিতে সারা দেশকে মুখরিত করিয়া তুলিল, তখন অবৈষ্ণবগণ তাহাদের ঢাকঢোল খাড়ে করিয়া এ ধ্বনিকে ডুবাইয়া দিতে যে চেষ্টা করিবে তাহাতে সন্দেহ কি? ফলে দেবদেবীর পূজা আবার মহাসমারোহে সম্পাদিত হইতে লাগিল। আকবর শাহের বঙ্গাধিকারের পর বহুকাল আর কোন কালাপাহাড়ের উপদ্রব হইতে পায় নাই। দেবতারা নিশ্চিন্ত হইয়া নিজ নিজ পূজা প্রচারের জন্য কবিদের স্বপ্ন দিতে লাগিলেন, তাঁহারা গন্ধর্ব্ব অপ্সরা ও দেবপুত্রগণকে শাপ দিয়া বঙ্গদেশে পাঠাইতে লাগিলেন। মঙ্গল-কাব্যের যুগ ফিরিয়া আসিল।

কোন দেবতা বিশেষের মহিমাকীর্ত্তন ও তাঁহার পূজা-প্রচারই মঙ্গল-কাব্য রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। এইগুলি বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্যের ঠিক বিপরীত ধারার সামগ্রী। চৈতন্য-চরিত সাহিত্যের সঙ্গে বরং ইহার কিছু মিল আছে, চৈতন্য-চরিত গ্রন্থগুলি চৈতন্যের মহিমাপ্রচারের জন্য রচিত। এইগুলির সাধারণ নাম সেজন্য চৈতন্যমঙ্গল। অন্যান্য দেবতার সঙ্গে চৈতন্যও আর একটি দেবতা হইয়া উঠিলেন। কবিকঙ্কণ অন্যান্য দেবতাদের বন্দনার সঙ্গে চৈতন্যেরও বন্দনা গাহিয়াছেন।

পদাবলী গীতিরসাত্মক ও ভাবতন্ত্রীয়। মঙ্গল-কাব্যও গাওয়া হইত বটে, কিন্তু উহা বর্ণনাত্মক এবং বস্তুতন্ত্রীয়। আর মঙ্গল-কাব্যের গান সুরে আবৃত্তিরই মত। পদাবলীর উদ্দেশ্য রস-সৃষ্টি এবং এই রসসৃষ্টিই পদকর্ত্তাদের সাধন-ভজনের অঙ্গ। মঙ্গল-কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য দেবতাবিশেষে ভক্তির সৃষ্টি—রস-সৃষ্টি গৌণ। পদাবলীর আদর্শ নিষ্কাম প্রেমধর্ম্ম, মঙ্গল-কাব্যের আদর্শ সকাম ইষ্টসিদ্ধিমূলক লৌকিক ধর্ম্ম।

বৈষ্ণব-সাধকগণ বলিতেন—ভক্ত যেমন ভগবানের জন্য ব্যাকুল, ভগবানও তেমনি ভক্তের জন্য ব্যাকুল। ভগবান্ ছাড়া ভক্তের চলে না—ভক্ত ছাড়াও ভগবানের চলে না। ভক্তের সহিত ভগবানের সম্পর্ক প্রেমাত্মক। মঙ্গল-কাব্যকারগণ দেখাইলেন, ভক্ত না হইলে দেবতার চলে না সত্য, তবে প্রেমের প্রয়োজনে নয়—আত্মপূজাপ্রচারের জন্য। আর ভক্তেরও ভগবান না হইলে চলে না—তাহাও প্রেমের প্রয়োজনে নয়—ইষ্টসাধনের জন্য, সুখসৌভাগ্য লাভের জন্য। প্রেমের সম্পর্ক নয় বলিয়া দেবতা ভক্তের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পারিয়া নিজেও ছলে বলে কৌশলে আত্মপূজা প্রচারের চেষ্টা করেন। আর ভক্তও দেবতার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে না—নিজের পুরুষকারের ও আত্মশক্তির প্রয়োগে বিন্দুমাত্র ত্রুটী করে না।

বৈষ্ণবের দেবতা আনন্দলীলা সম্ভোগের জন্য নরদেহ ধারণ করেন—মঙ্গল-কাব্যের দেবতা কোন একটা মানবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থতার জন্য ধরাতলে অবতীর্ণ হন এবং প্রয়োজন হইলে নরদেহ ধারণ করেন। বৈষ্ণব কবি তাঁহার দেবতার মধ্যে প্রেম ছাড়া আর কিছুই দেখেন না—মঙ্গল-কাব্যের কবি উপাস্য দেবতায় রোষ, হিংসা, প্রতিহিংসা, ছলনা ইত্যাদি বহু বৃত্তিরই আরোপ করিয়াছেন।

মঙ্গল-কাব্য রচনার ভঙ্গীটা ক্রমে একটা নির্দ্দিষ্ট গতানুগতিক ভঙ্গী বা মামুলী প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তখনকার দিনে যে-কেহ মঙ্গল-কাব্য রচনা করিত—সে ঐ কাব্যরূপই গ্রহণ করিত—সব সময়ে দেবদেবীর প্রতি ভক্তিবশতঃ নয়। তাই দেখি বৈষ্ণবও চণ্ডীমঙ্গল লিখিতেছে—গোঁড়া হিন্দুও ধর্ম্ম-মঙ্গল লিখিতেছে। এ যেন মাইকেলের ব্রজাঙ্গনা-কাব্য লেখার মত।

নূতন একটা কাব্যরূপ (form) আমাদের দেশের কবিদের মাথায় আসিত না—চিরপ্রচলিত রূপ ছাড়া তাহাদের গতি ছিল না। দেবতার মহিমা প্রচারই সকলের উদ্দেশ্য ছিল না—দেশের জনসাধারণকে ধর্ম্মকথার ছলে আনন্দ দান ও

তখনকার আদর্শে সাহিত্য সৃষ্টিও অনেকের উদ্দেশ্য ছিল। *

কেবল কাব্যের বহিরঙ্গীয় রূপ নয় নূতন আখ্যানবস্তুও কবিদের মাথায় আসিত না। এমনই গতানুগতিকতা ও মৌলিক চিন্তার অভাব দেশের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল যে, কবিরা একটা নূতন গল্পেরও উদ্ভাবন করিতে পারিতেন না। তাই কয়েকটি দেবদেবী-ঘটিত গল্প ছাড়া তাঁহাদের অন্য কোন বিষয়বস্তু জুটিত না। কাজেই যে কেহ কাব্য লিখিতে চাহিত তাহাকে মঙ্গল-কাব্যই লিখিতে হইত।

উপন্যাস বা নাটক লেখার প্রথা তখন প্রচলিত ছিল না।—গান লেখার প্রথা ছিল। কিন্তু এখনকার ধরণের গীতি-কবিতা লেখারও প্রথা ছিল না, গদ্য রচনার পদ্ধতি ত' ছিলই না। প্রথা না থাকিলে কি হয়, মনের কথা ঐ সকল ভঙ্গীতে প্রকাশ চায়। ভিন্ন ভিন্ন রূপায়নের ভঙ্গী না পাইলে অগত্যা এমন একটা ভঙ্গী অবলম্বন করিতে হয় যাহা ঐ গুলির অনুকল্প। সেকালে এই মঙ্গল-কাব্যের ভঙ্গীটাই হইয়াছিল সকল প্রকার ভঙ্গীর সম্মিলিত অনুকল্প।

এই ভঙ্গীটাই একাধারে ইতিহাস, কাব্য, নাট্য উপন্যাস, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, গদ্য-সাহিত্য ও গানের মিশ্রণে উৎপন্ন। মঙ্গল-কাব্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে তাই আমরা দেখি ইহার কতকটা গদ্যাত্মক, কতকটা গীতাত্মক, কতকটা উপন্যাসের মত, কতকটা নাটকের মত। এক রসপাত্রেই সকল প্রকার পানীয়ের বণ্টনের ব্যবস্থা ছিল।

মঙ্গলকাব্যগুলির আর একটা বৈশিষ্ট্য—ইহাতে দেবতা ও মানবের, স্বর্গ ও মর্ত্তোর, কল্পনা ও সত্যের মধ্যে একটা কোন ব্যবধান রাখা হয় নাই। মানুষও দৈববলে বলী হইয়া অলৌকিক শক্তিতে প্রকৃতির নিয়মভঙ্গ করিতেছে—দেবতাও মানুষের সর্ব্ববিধ দুর্ব্বলতা লইয়া মানুষের মত আচরণ করিতেছে—মানুষের ভয়েই হয় ত' ব্যাকুল। স্বর্গ ও মর্ত্ত্য যেন নদীর এপার ওপার। কল্পনা ও সত্য সর্ব্বত্রই ওতপ্রোত-ভাবে বিজড়িত। তাই কত অলৌকিকতা, অস্বাভাবিকতা ও অসম্ভাব্যতা যে ইহাতে স্থান পাইয়াছে—তাহার ইয়ত্তা নাই।

ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক কোন শৃঙ্খলার শৃঙ্খলে ইহা বাঁধা নয়। মঙ্গল-কাব্যের রসাস্বাদ করিতে হইলে চিত্তকে তদনুযায়ী করিয়া বসিতে হইবে। কোন অস্বাভাবিক অঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া, ইহাও কি সম্ভব এ প্রশ্ন করিলে চলিবে না। সব মানিয়া লইয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখার মত ইহার ভিতরটা দেখিতে হইবে অর্থাৎ মর্ম্মার্থটুকু গ্রহণ করিতে হইবে।

মঙ্গল-কাব্য দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণীর মঙ্গল-কাব্যে দেবতাবিশেষের পূজা-প্রতিষ্ঠাই উদ্দিষ্ট, তাহাতে অন্যান্য দেবতা লইয়া টানাটানি করা হয় নাই। আর এক শ্রেণীর মঙ্গল-কাব্যে এক দেবতাকে ছোট করিয়া অন্য দেবতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা দেখা যায়। এইরূপ কাব্য সাম্প্রদায়িক বিসংবাদের ফল। আর এক শ্রেণীর কাব্য আছে—তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার মধ্যে একটা সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা দেখা যায়। নানা শ্রেণীর কবিরা মঙ্গল-কাব্য রচনা করিয়াছে—তাই বৃত্তি-প্রবৃত্তি ধর্ম্মের আদর্শের পার্থক্যের জন্য এই পার্থক্য ঘটিয়াছে।

বহু দেবদেবীর স্তবস্তুতি করিয়া গ্রন্থের সূত্রপাত হয়। ইহা একটা মামুলী প্রথা মাত্র। চৈতন্য-মঙ্গলের কবিও এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। আসরে নানা ধর্ম্মমতের লোকও নানা দেবতারই উপাসক উপস্থিত থাকিত। সকলেরই মনোরঞ্জনের প্রয়োজন, অন্ততঃ প্রারম্ভে। বোধ হয় ইহা হইতেই এই প্রথার উৎপত্তি। তাই কবিকঙ্কণকে অন্যান্য দেবদেবীর সঙ্গে চৈতন্যেরও বন্দনা করিতে হইয়াছে। চৈতন্য যে তখন দেবতা বলিয়াই অর্দ্ধ-বঙ্গের পূজ্য।

মঙ্গল-কাব্যগুলি সবই স্বপ্নাদেশে রচিত বলিয়া কবিরা

---

* একই উপাখ্যান লইয়া শত শত মঙ্গল-কাব্য রচিত হইয়াছে। যে গ্রন্থগুলিতে আখ্যানভাগ পরিপূর্ণাঙ্গ এবং সাহিত্যাংশে যেগুলি উৎকৃষ্ট সেই গুলিই টিকিয়া গিয়াছে। এক্ষেত্রে Survival of the fittestএর নিয়মই কাজ করিয়াছে। যে কবি আখ্যানভাগের প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহার গ্রন্থ কালসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে—যিনি ঐ আখ্যানভাগকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাহিত্যরূপ দিতে পারিয়াছেন—তাঁহার গ্রন্থই কালসাগরে ভাসিয়া চলিয়া আসিয়াছে।

এক রাত্রির অন্ধকারে আলোক দিয়া দীপান্বিতার মৃৎপ্রদীপগুলির মত অধিকাংশই পথের আবর্জ্জনা স্তূপ বাড়াইয়াছে—যে গুলি তৈজস প্রদীপ সেই গুলিকেই সযত্নে তুলিয়া রাখা হইয়াছে। যেগুলি লুপ্ত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যেটুকু উৎকৃষ্ট তাহা লুপ্ত হয় নাই—যে গ্রন্থ কীর্ত্তিমান হইয়াছে তাহারই অঙ্গীভূত হইয়া আছে।

কাব্যের মধ্যেই ঘোষণা করিয়া থাকেন। ইহার তিনটি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। দেবতার স্বপ্নাদেশে রচিত অতএব এই গ্রন্থ শ্রদ্ধেয়—ভক্তির সামগ্রী। আর একটি আত্মসমর্থন। একই দেবতার মঙ্গল-কাব্য একাধিক থাকিতে পুনরায় আর একখানি রচনার সার্থকতা থাকে না দেবতার স্বপ্নাদেশ ছাড়া। প্রকারান্তরে পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থগুলির নিন্দা করিবার জন্য এমন স্বপ্নও কল্পিত হইয়াছে যে, দেবতা পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থগুলিতে তুষ্ট হন নাই। ইহা ছাড়া, বাংলা ভাষায় দেবতার কথা লেখা গৌরবের ব্যাপার ছিল না—নিন্দনীয়ই ছিল। দেবতার স্বপ্নের দোহাই দিয়া কবিরা তাই ধর্ম্মকথা বাংলায় লিখিতেন। মোটকথা স্বপ্নাদেশের দোহাই দেওয়া মঙ্গল-কাব্যগুলির একটা প্রথায় দাঁড়াইয়াছিল।

সাধারণতঃ মঙ্গল-কাব্যগুলির দুটি ভাগ। একটি ভাগে অবিমিশ্র দেব-লীলা—স্বর্গে, আর একভাগে নরলীলা—মর্ত্ত্যে। প্রয়োজন হইলে মর্ত্ত্যে দেবতার আবির্ভাব। প্রথমাংশের এই দেবলীলার সঙ্গে কোন কাব্যের অঙ্গাঙ্গী যোগ নাই—কোন কাব্যের আছে। এই দেবলীলাবর্ণনাচ্ছলে পাঠকদিগকে কতকটা পৌরাণিক জ্ঞান বিতরণ করা হইত। এটা যেন সমগ্র কাব্যের গৌরচন্দ্রিকা।* সাধারণতঃ হরগৌরীর দাম্পত্যলীলাই প্রথমাংশের প্রধান উপজীব্য। গ্রন্থের মধ্যেও কতক কতক মালিক পৌরাণিক কথাও কাহারও না কাহারও জবানীতে সংযোগ করা হইত। মঙ্গলকাব্যের পৌরাণিক অংশ সংস্কৃত হইতে গৃহীত। লৌকিক অংশ খাঁটী বাংলার নিজস্ব। দুই অংশের মধ্যে মিলন সামঞ্জস্য সাধনের জন্য কবিরা পৌরাণিক অঙ্গে কিছু কিছু যোগ বিয়োগ সাধনে কল্পনার প্রয়োগ করিয়াছেন। লৌকিক অঙ্গেই কবিদের কৃতিত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে। মঙ্গল-কাব্যে ভাষায় ভূষায়, আখ্যান-ভাগে, রসসৃষ্টির আদর্শে সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্য ধারার মিলন ঘটিয়াছে। কতকগুলি কাব্যের দেবলীলা শুধু কাব্যের নায়ক নায়িকাকে স্বর্গলোক কিংবা গন্ধর্ব্বলোক হইতে শাপভ্রষ্ট করিবার জন্য। শাপভ্রষ্টদের স্বর্গারোহণ ও শাপমুক্তির দ্বারা গ্রন্থের পরিসমাপ্তি।

গ্রন্থের পরিপুষ্টি হয় নায়ক নায়িকার জীবনে নানা অনর্থ নানা বিপৎপাতের সৃষ্টির দ্বারা। এই অনর্থ বা বিপৎপাত আধিভৌতিক নয়, আধিদৈবিক। নায়ক নায়িকা দেবতার অনুগ্রহে অথবা দেবদত্ত শক্তি বলে সমস্ত বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া শেষ পর্য্যন্ত বিজয়ী হয়—প্রতিপক্ষের দর্প চূর্ণ হয়।

দেববিশেষের পূজাপ্রচারের সঙ্গে সকল মঙ্গল-কাব্যে সতীধর্ম্মের জয়গান করা হয়। সতীর জীবনেও নানা পরীক্ষা, নানা সঙ্কট ঘটে। শেষ পর্য্যন্ত সতীত্বের জয় হয়। কোথাও দেবানুগ্রহে—কোথাও সতীত্বের নিজ তেজোবলে। সতীত্বের কঠিন পরীক্ষা দেওয়ারও ব্যবস্থা থাকে। প্রলোভন সৃষ্ট করিয়া নায়ক নায়িকার চরিত্রবল, ধর্ম্মবল-পরীক্ষারও ব্যবস্থা থাকে। এই অঙ্গটি লোক-শিক্ষার জন্যই বিশেষভাবে পরিকল্পিত।

প্রত্যেক মঙ্গল-কাব্যে এক বা ততোধিক বিবাহের চিত্র দেখানো হইয়াছে। ঘটকের আগমন হইতে বরকন্যার বিদায় পর্য্যন্ত একটা ধারাবাহিক বর্ণনা থাকে। স্ত্রী-আচার ও এয়োদের কথা থাকা একটা প্রথায় দাঁড়াইয়াছিল। কাব্যের মধ্যে এই অংশে রস-সৃষ্টির প্রচুর অবকাশ থাকে।* ইহা ছাড়া নানাপ্রকারের তালিকা, বিশেষতঃ বারমাস্যা বর্ণনা, ভোজ্য-দ্রব্যের তালিকা, নারীগণের পতিনিন্দা, স্বপ্নাদেশ, নায়িকার রূপ বর্ণনা, নায়িকার বেশভূষার বর্ণনা, দুঃস্বপ্ন ও যাত্রার কুলক্ষণের বিবৃতি, ডিঙ্গা-ভাসানো ও জলপথের বিপদ-আপদের কথা, প্রাণদণ্ড, শাপপ্রাপ্তি, শাপাবসান, বিশ্বকর্ম্মার কৃতিত্ব, হনুমানের সহায়তা, সতীত্ব পরীক্ষা ইত্যাদি কতক-গুলি অঙ্গ প্রায় সকল কাব্যের-মামুলী উপকরণ।

* মঙ্গল-কাব্যের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল লোকশিক্ষা দান। পূর্ব্বে এই কার্য্য প্রধানতঃ পুরাণের দ্বারা চলিয়া আসিতেছিল। মঙ্গল-কাব্য গ্রামে গ্রামে গীত হইত। এই কাব্যের মধ্যে যতটা সম্ভব সুনির্ব্বাচিত পৌরাণিক কাহিনী সন্নিবেশ করিয়া কবিরা লোক শিক্ষার প্রচলিত ধারা বজায় রাখিয়াছেন।

তাহা ছাড়া দেবতা নিজেই পুরাণে একটি চরণ রাখিয়া কাব্যে আর একটি চরণ স্থাপিত করিয়া দুইএর মধ্যে যোগসাধন করিয়াছেন। তাই পুরাণকাহিনী আপনা হইতেই আসিয়া পড়িয়াছে। মানুষের মত আচরণের দ্বারা দেবতা যে দেব-মহিমা হারাইতে বসিয়াছে, পৌরাণিক পরিবেশ সৃষ্টির দ্বারা তাহার সে দেব-মহিমাকে রক্ষা করা হইয়াছে।

* ইহা বিশেষভাবে কাব্যের লৌকিক অঙ্গ। এই লৌকিক অঙ্গটি শিবের বিবাহকেই আশ্রয় করিয়া কোন কোন কাব্যে রূপ লাভ করিয়াছে। হিমালয়ের চূড়া ইহাতে বাংলার বাঁশবনের মধ্যে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে এবং শিব হইয়াছেন দ্বিতীয় পক্ষের বুড়া দরিদ্র ও কুলীন বর।

মঙ্গল-কাব্যগুলিকে প্রাচীনবঙ্গের ইতিহাস বলা যাইতে পারে। দেশের রাষ্ট্রীয় জীবনের ইতিহাস নয়, ধর্ম্ম জীবনের ইতিহাস। সেকালের আচার-ব্যবহার, উৎসব-পার্ব্বণ, ভোজন-শয়ন, গমনাগমন, শিক্ষা-দীক্ষা, কু-সংস্কার, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদির ইতিবৃত্তিও ঐগুলি হইতে উদ্ধার করা যায়। বলাবাহুল্য, এই সকলের পরিচয় দেওয়ার জন্যই কবিরা কাব্য লেখেন নাই, ঐগুলি কাব্যের উপাদান বা অঙ্গস্বরূপ স্বতই আসিয়া পড়িয়াছে। কোথাও সরস হইয়াছে, কোথাও হয় নাই, কোথাও কেবল তালিকা, কোথাও তালিকা মালিকার আকার ধারণ করিয়াছে। ঐ সকলের পরিচয় দেওয়া বর্ত্তমান গ্রন্থের অধিকার-ভুক্ত নয়।

বাঙ্গালী বড় দুর্ব্বল, অনুন্নত ও মৃদু প্রকৃতির জাতি। আত্মশক্তিতে তাহার বিশ্বাস বড় অল্প। তাহার বিশ্বাস,—দৈবীশক্তির কাছে আত্মশক্তি কিছুই নয়। দেবতা প্রসন্ন না থাকিলে কোন প্রয়াসই সার্থক নয়। আমরা দৈবীশক্তির হাতের পুতুল মাত্র। এই দেবতা কিন্তু স্বয়ং ভগবান ন'ন। এই দেবতা যে কে তাহা তাহার অভ্রান্তভাবে জানা নাই। তাই সে এক এক ব্যাপারের জন্য পৃথক পৃথক দেবতার কল্পনা করিয়াছে। সে জানে যিনি অলক্ষ্যে থাকিয়া আমাদের অদৃষ্টকে শাসন করিতেছেন তিনি যেই হউন না কেন, যে কোন মারফতে তাহার আবেদন যথাস্থানে গিয়া পৌঁছিবে। অনির্দ্দিষ্টের উদ্দেশ্যে আবেদন নিবেদন পাঠানো চলে না—তাই ভিন্ন ভিন্ন আবেদন বহনের জন্য সে ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীকে ধরিয়াছে।

যাহারা বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়াছে—দারা পুত্র পরিবারের ধার ধারে না, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু ছেলেপুলে লইয়া ঘর-সংসার করিতে হইলে দেবতার কৃপা চাই।

আর একটি কথা,—এই ভৌগোলিক দিক হইতেও দেখিলে বাঙ্গালীর মত অসহায় জাতি আর নাই। এত বেশি প্রাকৃতিক উপদ্রব অন্য কোন দেশে নাই। বন্যা, ঝঞ্ঝা, ঘূর্ণিবাত্যা, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প এদেশে লাগিয়াই আছে। ঐ সকল উৎপীড়ন হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য কখনও কোন মানুষের শরণাপন্ন হওয়া চলে বাঙ্গালী তাহা জানিত না। ঐতিহাসিক দিক হইতেও এই যুগের বাঙ্গালী সবচেয়ে অসহায়। তাই মহামারী, দুর্ভিক্ষ, সর্প, ব্যাঘ্র ইত্যাদির উপদ্রব এবং মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার হইতে তাহারা কোন প্রকারেই আত্মরক্ষা করিতে পারিত না। তাহাদের আবেদন-নিবেদন অভাব-অভিযোগের কথা শুনিবারও কেহ ছিল না। রাজা বিদেশী বিজাতীয় ও বিধর্ম্মী। রাজার সহিত প্রজার প্রতিপালক-প্রতিপাল্য সম্বন্ধ তখনও স্থাপিত হয় নাই। রাজশক্তি তখনও বিজিত জাতিকে বিশ্বাস করিত না—মিত্র ভাবিত না বরং শত্রুই ভাবিত। এইরূপ স্থলে আবেদন নিবেদন চলে না। ভূস্বামীরা নিজেরাই বিব্রত কি করিয়া রাজাকে প্রসন্ন রাখিয়া আত্মরক্ষা করিবে তাহাই তাহাদের প্রধান চিন্তা।* প্রতিকার করিবে কে? কাজেই দেশের লোকের যুক্ত কর ঊর্দ্ধ পানেই উঠিয়াছে। দৈবশক্তির নিকট আবেদন ও দেবতার কাছে সর্ব্ববিধ আকিঞ্চন জানানো ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।*

দেবতার কৃপা চাই দুই কারণে। প্রথম মঙ্গল বিধানের জন্য, দ্বিতীয় অমঙ্গল বারণের জন্য। এই জন্যই বাঙ্গালী দেব দেবীর শরণ গ্রহণ করিয়াছে। তাহার এই আকিঞ্চনই মঙ্গল-কাব্যের রূপ ধারণ করিয়াছে।

যে ধর্ম্মের উপাস্য শিবরূপী সাংখ্যের নিষ্ক্রিয় পুরুষ সে ধর্ম্মের কথা ভুলিয়া যে ধর্ম্মের মূল প্রার্থনা—

দেবি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি (মার্কণ্ডেয় চণ্ডী)।

সেই ধর্ম্মকেই বাঙ্গালীর প্রপন্নার্ত্ত চিত্ত আশ্রয় করিল। মহা-শক্তির কাছে সে শক্তি প্রার্থনা করিল। চণ্ডী এই শক্তি প্রার্থনাই কাব্যগুলিতে নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

শাক্তকবিগণ তখন দেবীর স্বপ্নাদেশ লাভ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কাব্যে তাঁহারা দেখাইলেন নির্গুণ

* তখন নীচের লোকের আকস্মিক অভ্যুত্থান ও উপরের লোকের হঠাৎ পতন সর্ব্বদাই দেখা যাইত। হীনাবস্থার লোক কোথা হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া অরণ্য কাটিয়া নগর বানাইতেছে—প্রতাপশালী রাজারা হঠাৎ পরাস্ত হইয়া লাঞ্ছিত হইতেছে। ইহারই মূলে শক্তি।

এই শক্তির প্রসন্নমুখ মাতা, এই শক্তির অপ্রসন্ন মুখ চণ্ডী। ইঁহারই প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ—সেই জন্য সর্ব্বদাই করজোড়ে বসিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু যতক্ষণ ইনি যাহাকে প্রশ্রয় দেন, ততক্ষণ তাহার সাতখুন মাপ। যতক্ষণ সে প্রিয়পাত্র ততক্ষণ তাহার সঙ্গত অসঙ্গত সকল আবদারই পূর্ণ হয়।

এইরূপ শক্তি ভয়ঙ্করী হইলেও মানুষের চিত্তকে আকর্ষণ করে। কারণ, ইহার কাছে প্রত্যাশার কোন সীমা নাই।—রবীন্দ্রনাথ।

নিরুপাধিক ব্রহ্মোরত কথাই নাই, এমন কি শিব বা বিষ্ণু আপন আপন উপাসকের মঙ্গলামঙ্গল বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। কিন্তু শক্তি আপন উপাসককে ঐহিক ঋদ্ধি দান করেন, বরদানে তাহার মনস্কামনা পূর্ণ করেন এবং শরণাগতকে সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ করেন। যাহার প্রতি তিনি অপ্রসন্ন কোন দেবতার ক্ষমতা নাই তাহাকে রক্ষা করেন। যাহার প্রতি তিনি বিরূপ তাহার লাঞ্ছনার অবধি থাকে না। ছলে বলে কৌশলে যেমন করিয়া পারেন দেবী ভক্তকে রক্ষা করেন—বিরোধীকে ধ্বংস করেন।*

বৈষ্ণব-সাহিত্য ভক্তকে এই আশ্বাস দিতে পারে নাই। কিন্তু বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রভাব যে দেশের সুপ্ত শাক্ত মনোভাবকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল এবং এই শ্রেণীর শাক্ত সাহিত্য সৃষ্টির প্রণোদনা দিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

* দেবদেবীর অনুগ্রহ নিগ্রহচ্ছলে কবিরা বলিতে চাহিয়াছেন যে, দেবতা অনুগ্রহ করেন এবং না মানিলে নিগ্রহ করেন তিনিই নিয়তি। এই নিয়তির কাছে পুরুষকারের কোন মূল্যই নাই। পুরুষকার যতই বিরাট হউক, তাহা লইয়া ক্ষুদ্র মানুষের অহঙ্কার সাজে না। অদৃষ্টবাদী বাঙ্গালী কবি নিয়তির সহিত পুরুষকারের সংগ্রামে নিয়তিকে বিজয়িনী করিয়া আনন্দই পাইয়াছেন এবং অদৃষ্টবাদী স্বজাতিগণকে আনন্দও দিয়াছেন। যে নিয়তিকে মানে না তাহার লাঞ্ছনাতেই বাঙ্গালী চিরদিন আনন্দ পাইয়াছে।

সত্যিকারের বাণীর সেবক মরছে লাথি খেয়ে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ভাগ্যলিপির অঙ্কপাতে দেখতে পেলেম আজ,
প্যাজের খাতির রন্ধনেতে গাওয়া ঘিয়ের চেয়ে।
ঝুঁটার আদর,—সাচ্চা লোকের পড়ছে বুকে বাজ,
সত্যিকারের বাণীর সেবক মরছে লাথি খেয়ে।
কাব্যে যাদের ছন্দপতন নাইকো মিলের ঠিক্
আজকে তারা মোদের দেশে কাব্য বিশারদ।
শব্দ ভাষার নাইকো জ্ঞান,—মস্ত সাহিত্যিক।
সম্পাদকের জগন্নাথের ওরাই টানে রথ।
মূর্খগুলোর হট্টগোলেই ভাষার মরণ হেরি,
এরাই টাকা লুটতে পারে বাজিয়ে বিজয় ভেরী।

এদের লেখায় ঘুরছে "ধূসর উষ্ট্র বেদুঈন"
"পামীর" "ঈগল" "মোনালিসায়" খুলছে ভাবের শোভা।
"আল্‌কাতরার রাত্রি" লেখে "পুঁযের মতই দিন,"
এদের হাওয়া "মুখচোরা" হয়, "জান্‌লা এদের বোবা"।
উপাধিতেই ভুলিয়ে রাখে বোকা পাঠকটারে,
চাঁদকে দিয়ে মাসিক কাগজ করছে এরা জয়;
এদের লেখা পড়তে হবে ধৈর্য্য সহকারে
পরিহাসেই এদের নাকি নামের প্রচার হয়।
বললে কিছু দল বেঁধে যে করবে ভীষণ তাড়া,
তাদের ঘরে করছে চুরি বুদ্ধিজীবি তারা।

হিংসা এবং দুর্ব্বলতায় পরের ছিদ্র ধরে'
ভাবজগতে দুঃখ জাগায় সুখের স্বপন রেখে ।
যশের তরে পাগলগুলো ক্ষিপ্ত হয়েই ঘোরে,
তোষামোদের চরম করে' ওরাই চিঠি লেখে ।
যা খুসী সব গল্প লেখে ফেলো এবং ভুলো,
উপন্যাসের চরিত্র নাকি এদের হাতেই ফোটে !
গীতার ভাষ্য লিখ্‌ছে বসে সিবিলিয়ান গুলো
মুর্‌গী খেয়ে বেদের বাণী সহজ হয়েই ওঠে ।
হায়রে কবি ! প্রদীপ জ্বেলে লিখ্‌লে যাহা দেশে,
তেলের দামও কেউ দিল না, ধাপ্‌পা পেলেই শেষে ।

বন্ধু ! তোমার কাব্যলেখা কর্‌তে হবেই বন্ধ,
ঘূর্ণী হাওয়া ভাঙ্‌ছে তোমার ছোট্ট কুঁড়ে ঘর ।
পাঁচটা কাগজ হজম করেই লিখ্‌লে প্রবন্ধ
পাঁচটি টাকা জুট্‌তে পারে সুপারিশের পর ।
কবি ! তোমার প্রাঙ্গণেতে চোখের জল ঢেলে
ফুলের চারা সজীব করে' ফুটাও কেন ফুল !
মাটির তলে নাইকো সাড়া, বাতাস নাহি খেলে,
শান্তি তোমার চিতায় জ্বলে,— কর্‌লে কবি ভুল !
পেটের জ্বালায় মর্‌ছ তুমি, কেউ কহে না কথা,
নদীর তীরে শ্যামল ছায়া বইছে' তোমার ব্যথা ।

ধর্ম্মকথা বল্‌ছে যেজন, সেই তো ভণ্ড শুধু,
বুদ্ধিবিহীন,—যেজন ধরায় নিচ্ছে দাতার মান ।
পরের দুখে যে জন কাঁদে সেই তো কুলবধূ !
স্নায়ুর দোষ আছে যাহার সেই তো হৃদয়বান্‌ ।
এমন কথাই বল্‌ছে সবে জ্ঞানের বহর নিয়ে
পত্রিকাতে বুলায় এরা পাচড়া এবং খোস ।
বেদের বার্ত্তা শুনায় যেজন যুক্তিবিচার দিয়ে
বর্ত্তমানের লিখিয়ে যারা, দেয় যে তারে দোষ ।
দেশটা গেল জাহান্নমের অগ্নি-শিখায় পুড়ে,
কেমন করে থাক্‌বে কবি ! তোমার পাতার কুঁড়ে !

চল্‌তি প্রথায় বড় লোকের চাচ্ছ আদর বাণী,
বন্ধুকবি বল্‌ছে তারা, চায়না পেটের পানে ।
বড়লোকের বন্ধু মানেই মোসাহেবই জানি
অমন আদর নাইবা পেলে দুঃখভরা প্রাণে ।
অর্থ যদি জোগায় কেহ আত্মসমর্পণে
এমন বন্ধু বড় লোকের আস্তাকুঁড়ও ভালো ।
এই জগতে আছে ক'জন নিঃস্ব কবি জনে
অর্থ দেবে ! দলের লোকের মুখ যে হবে কালো !
কাব্য লেখাও সহজ হোলো মিলের মুণ্ড কেটে,
তুমিই কেবল মিল ঘটাতে মর্‌লে বৃথাই খেটে ।

আমার কাছে প্রাচীন দিবস স্বপ্ন-প্রাচীর ঘেরা,
তার মাঝেতে ছোট্ট কুঁড়ের ঘুমায় হরিণ মোর ।
আমার বনে আরণ্যকের প্রশ্ন ওঠে সেরা,
ঋষির মেয়ে মীমাংসারই বাঁধ্‌ছে মিলন ডোর ।
বর্ত্তমানের সভ্য মানুষ আমার দুটি চোখে
স্পষ্ট হয়েই উঠ্‌ছে কবি ! অধম পশুর চেয়ে ।
জীবনটা তো চলেই গেল দুঃখে এবং শোকে
ধাপ্পাবাজীর জগৎমাঝে ভোজের বাজি পেয়ে ।
মাসকাবারে মাইনে নিয়ে শুধ্‌ছি সকল দেনা,
মর্‌ছে আমার আপনজনে হয় না ওষুধ কেনা ।

আমার কথা বল্‌ছ কেন ?···মূল্য আমার কিবা !
ভাগ্য আকাশ কৃপণ, কবি ! কাঁদ্‌ছি হাহাকারে ।
সর্ব্বহারার গর্ব্ব নিয়েই কাটাই রাত্রি দিবা,
অন্তরেতে ঘৃণাই করি নূতন সভ্যতারে ।
কাব্য আমার মর্‌বে নূতন দলাদলির দাপে
ভণ্ড যুগের জগন্নাথের আটকে বাঁধার মাঝে ;
আমার লেখার মৃত্যুপরে তীব্র আগুন পাবে
সেই আগুনে জ্বল্‌বে স্বদেশ চৈত্র দিনের কাছে ।
এমন দিনে থাক্‌বো নাকো বাঙ্‌লা দেশের তটে,
রুদ্ধ ঘরে অশ্রু আমার রেখো মাটির ঘটে ।

যুদ্ধ ও ভারতবর্ষ

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

(প্রথম প্রস্তাব)

সমগ্র ইয়োরোপ ব্যাপিয়া যে দাবানল প্রায় চার বৎসর ধরিয়া জ্বলিতেছে, ভারতবর্ষ কি তাহা হইতে মুক্ত ও অক্ষত থাকিতে পারিবে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। আধুনিক যুদ্ধ-বিশারদ হইতে আমাদের মত গোলা লোক পর্য্যন্ত সকলেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে জুয়া খেলিতেছেন। কাহারও মতে কোনও দেশই যখন অক্ষত থাকিতেছে না, ভারতবর্ষের কি এমন পুণ্য যে তাহার গায়ে আঁচটি লাগিবে না? পাপ-পুণ্য চোখে দেখা যায় না, সুতরাং ঐ কথার পরে কথা বলা বড় দায়। এখানকার যুদ্ধ-বিশারদগণের বিপুলায়োজন দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় যে, তাঁহারা ভারতবর্ষকে সমর-সীমানা বা গণ্ডীর বহির্ভূত বিবেচনা করেন না। আশাবাদীরা মনে করিতেছেন, আমাদের সাজ-সজ্জাই সার হইবে, যুদ্ধ এতদূরে আসিবে না। ভাল কথা। অমানিশার মধ্যে আশার অল্প আলোক, তাই বা মন্দ কি!

যুদ্ধ আসুক আর নাই আসুক, আগুনের আঁচে আমরা যে ঝলসাইয়া যাইতেছি এ কথা অস্বীকার করিবার লোক ভূ-ভারতে কেহ আছেন বলিয়া আমরা মনে করিতে পারিতেছি না। পাড়ার এক জন লোকের ঘরে আগুন লাগিলে, কেবলমাত্র তাহার ঘরই পুড়ে না, আগুনের স্বভাব এই যে, আরও দশজনকে গৃহহীন করিবার জন্য উল্লসিত হইয়া উঠে। পৃথিবীরও আজ সেই দশা। মুক্ত, স্বচ্ছন্দ, অক্ষত কেহ থাকিবে না। আমরাও অক্ষত নহি, বরং অতিমাত্রায় ক্ষত-বিক্ষত। সৈনিক যুদ্ধ করে, কামান চালায়, বন্দুক ছুঁড়ে, বোমা ফাটায়, ট্যাঙ্ক ছোটায়, এরোপ্লেন উড়ায়, মোটর হাঁকায়, তাহারা আহত হয়, মরে; আমরা এ সকলের কিছু না করিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রের চেহারা না দেখিয়াও ক্ষত-বিক্ষত এ কেমন কথা?

কথা তেমন শক্ত নয়, অসত্যও নয়। আমরা জীবন-যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত, মরিতে বসিয়াছি। কাব্য অথবা নাটকের মরা নয়।—এ সেই মৃত্যু, যে মৃত্যু এই রক্তমাংসের দেহ, সচল, সবাক্ মানুষকে চিরতরে নিশ্চল, নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ করিয়া মরজগৎ হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়। খাদ্য-সমস্যা কিছুকাল হইতেই গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছিল, যুদ্ধের চাপে, আগুনের তাতে একেবারে চরমে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। যুদ্ধ যদি কোন দিন ভারতবর্ষে আসে, তাহাতে কত লোক মরিবে, আর কতগুলি বাঁচিয়া থাকিবে এই চিন্তা কয়জন লোক করিতেছে জানি না; কিন্তু যুদ্ধ যদি আরও কিছুকাল চলে, তবে না খাইয়া যে অনেককেই গতায়ু হইতে হইবে সে বিষয়ে মতানৈক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। বরং ইহাই মনে হয় যে, রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক মহলে বহুল বিভিন্নতা সত্ত্বেও এ বিষয়ে আশ্চর্য্য রকমের মতৈক্য দেখা যাইতেছে।

অথচ, আমরা আজন্ম শুনিয়া আসিতেছি, আমাদের এই দেশ সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা; আমরা আজন্ম জানিয়া রাখিয়াছি, ভারত জগতের অন্নদাত্রী; আমরা আজন্ম বলি, ভারত পৃথিবীকে খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখিতে পারে। তবে কি এ সব কথা কাহিনী মাত্র? শুধুই উপকথা? কেবল কবির কল্পনা? চারণের গাথা? সম্ভবতঃ কাহিনীও নয়, উপকথাও নয়, কল্পনাও নয়, গাথাও নয়। সত্য বলিয়াই মনে হয়। প্রমাণেরও অভাব নাই। প্রমাণের সেরা প্রমাণ, শতাব্দীতে শতাব্দীতে পৃথিবীর গৃহশূন্য, অন্নহীনদের, ক্ষুধিতের ব্যগ্র করুণ দৃষ্টি ফেলিয়া ভারতের পানে চাহিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। এই শস্যপূর্ণ বসুন্ধরাকে আয়ত্তে আনিবার জন্য পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে কত আপ্রাণ আয়াস, কত প্রাণান্তকর প্রয়াসই না পরিলক্ষিত হইয়াছে? অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা অনন্তকাল ধরিয়া অনন্ত জগতের সম্মুখে সে সকল দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিতেছে। সেই সঙ্গে ইতিহাস ইহাও দেখাইয়াছে যে, যে জাতি যখনই ভারতবর্ষকে স্বাধিকারভুক্ত করিতে পারিয়াছে, চিরন্তনের কঠিন, কঠোরাধিক কঠোর অন্নসমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করিয়া অশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া

জগতে দুর্দ্ধর্ষ ও অপরাজেয় হইয়া উঠিয়াছে। খাদ্য হইতে সার সংগ্রহ করিয়া জীবজন্তু উদ্ভিদ যেমন দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে, উৎকর্ষ সাধন করে, ভারতবর্ষের অফুরন্ত খাদ্য ভাণ্ডার করায়ত্ত করিয়া বিজয়ী জাতিও সেইরূপ শক্তি ও সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিয়াছে। ভারতবর্ষের অন্নপূর্ণা মা-টিকে আয়ত্তে আনিবার জন্য পৃথিবীর বহু জাতি বহু সময়ে ভারতের মাটিকে স্বীয় শোণিতে প্লাবিত করিয়া গিয়াছে। কেহ পারিয়াছে, কেহ হারিয়াছে। মা-টিকে যে পাইয়াছে, সে ধন্য হইয়াছে, আর যে পায় নাই, সে ঈর্ষ্যাপূর্ণ নয়নে ভারতের মাটির পানে চিরদিনই লোলুপ দৃষ্টি ফেলিয়া বসিয়া আছে।

সেই মা-টির সন্তান আমরা, আমাদের খাদ্য-সমস্যা এমন ভয়াবহ রূপ ধারণ করিল কেন? অন্নপূর্ণা কি অন্নদানে বিমুখ? মা-টির বক্ষে কি সে পীযুষধারা নাই? দেশের মাটি কি পাষাণ হইয়া গিয়াছে? মাটি কি শস্য উৎপাদন করে না? আকাশে কি মেঘ নাই? মেঘে কি বৃষ্টি নাই? নদীতে কি জল নাই? উত্তরে বলিতে হয়, অন্নপূর্ণা অন্নদানে কোনদিনই বিমুখ নহেন। মাতৃস্তন্যে পুণ্যপীযুষধারা তেমনই আছে। মাটি মাটিই আছে। শস্য উৎপাদনে মাটি আজও বিরত নহে। আকাশে মেঘ আছে, মেঘে সলিল-সম্ভারও আছে, নদীতেও জল দেখা যায়। তবে? এই 'তবে' লইয়াই যত গোল।

এই 'তবে' এমন একটা কথা, এমন একটা সমস্যা যে, এক কথায় তাহা বুঝাইয়া দিতে পারিবে এমন মহামহোপাধ্যায় ব্যক্তি ভূমণ্ডলে কেহ আছেন বলিয়া মনে হয় না। যিনি যত বড় পণ্ডিত হউন না কেন, তাঁহাকে মূলান্বেষণে প্রবৃত্ত হইতে হইবে এবং মূলান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে তিনি দেখিবেন যে, হাজার হাজার বৎসরের বিস্মৃতির সমাধিস্তূপ খনন না করিতে পারিলে সেই মূলটির সন্ধান মিলিবে না। ভাগ্যবান্ তিনি, যিনি সেই অতলস্পর্শে পৌঁছিতে পারিবেন। সৌভাগ্যবান তিনি, যিনি সেই লুপ্তরত্নোদ্ধারে সমর্থ হইবেন। ক্ষণজন্মা তিনি, যিনি সেই মূলমন্ত্র পুনরুদ্ধৃত করিয়া জগতের কল্যাণে সেই মহামন্ত্রের প্রয়োগ করিতে পারিবেন। কেহ যে সে চেষ্টা করেন নাই বা এখনও করিতেছেন না, তাহা আমরা মনে করি না। অমাবস্যার ঘনান্ধকারে বিজলী-আলোক কখনও কখনও অন্ধ চক্ষুকেও চমক দিয়া যায়, তাহাও লক্ষ্য করি; কিন্তু ক্ষণপ্রভার ক্ষণদীপ্তি ব্যতীত অপর কিছু মনে করিতে আমরা পারি কৈ।

যদি কোনও চিন্তাশীল মনীষী বলেন, জমির উর্ব্বরাশক্তি হ্রাস পাওয়াতেই পৃথিবীর-খাদ্যভাণ্ডার ভারতের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, আমরা তৎক্ষণাৎ বলিতে পারি, তা আমরা কি করিতে পারি? আমাদের অপেক্ষা বিদ্বান্, বিশেষজ্ঞগণ গম্ভীরমুখে বলিবেন, আমাদের দেশের চাষীরা চাষ জানে না, জমির সার নির্ব্বাচন করিতে পারে না, বীজ রাখিতে জানে না, তাই জমিও রাগ করিয়া ফসল উৎপাদন করে না। দুধ পাইতে হইলে গাভীকে উত্তম খাদ্য দিতে হয়, জমির বেলাতেও সেই কথা। বিশেষজ্ঞগণের কথার উপরে কথা কহা বড় দোষ, কহিতে নাই, গুণাহগারী হয়, জানি; তবুও যদি কোন ধৃষ্ট অর্ব্বাচীন বলে, ভারতবর্ষের গভর্ণমেণ্ট ত' কৃষিবিভাগ খুলিয়া, কৃষিমন্ত্রী রাখিয়া, কৃষিদপ্তর বসাইয়া, গবেষণা করিয়া, সার দিয়া, বীজ সরবরাহ করিয়া চেষ্টার একশেষ করিতেছেন, কিন্তু জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পাইল কতখানি? ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস এমন পুরাণো নয় যে তাহা পাঠ করিবার জন্য বই খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে, সেই ইতিহাস যাঁহারা পড়িয়াছেন, অথবা সেই ইতিহাস রচিত হইতে চোখের সম্মুখে যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা বলিবেন, বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে দশ বিঘা জমি যে চাষীর ছিল, সারা বছরের অন্নবস্ত্রের পুরাপুরি সংস্থান অব্যাহত রাখিয়া সেই লোকটা দোল-দুর্গোৎসব পর্য্যন্ত করিত। অভাব কাহাকে বলে, সে জানিত না; নিরানন্দ তাহার নিকট অজ্ঞাত ছিল; অস্বাস্থ্য বলিতে একেবারে সেই শেষ দিনটি বুঝিত। একটা গৃহস্থবাড়ীতে পাঁচটা যোয়ান ভাই অথবা সমর্থ ছেলে বসিয়া বসিয়া ভাত মারিলে, তাস-পাশা খেলিয়া বেড়াইলে, যাত্রা-পাঁচালী গাহিয়া কালহরণ করিলে দুশ্চিন্তাক্ত অনিদ্রায় গৃহকর্ত্তার পেটের ভাত চাল হইত না। পেটের ভাত, পরণের কাপড়ের সংস্থানে গৃহ ছাড়িয়া, আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া দূরদেশে সহরে—পরঘরে—পরবাসী হইবার কল্পনাও ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচিত হইত।

আর আজ চাষার ঘরে তিনটা ছেলে থাকিলে, চাষা নিজেই অন্ততঃ দু'টা ছেলেকে স্কুলে লেখাপড়া শিখাইয়া, দরখাস্ত বগলে দিয়া ম্লানমুখে সহরে পাঠাইতে বাধ্য হয়। কেন বাধ্য হয়? তাহার সেই দশবিঘা জমির আধবিঘাও কমে নাই, জমিতে সার সে আগেও যেমন দিত, এখনও তেমনই দেয়; বীজ রক্ষায়ও ত্রুটী নাই, পরিশ্রম করিতেও কুণ্ঠিত নয়, তবু

প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে সামান্য কয়টি টাকার জন্য বিদেশে বিভূঁয়ে পাঠায় যে কোন্ প্রাণে? 'কি বিষম দায় ঠেকিয়াই এই গর্হিত কার্য্য সে করে, তাহা সেই জানে; আর জানেন তিনি, এ বিশ্বজগতে ক্ষুদ্রবৃহৎ কিছুই যাঁহার অজানা নাই—অজানা থাকিতে পারে না। এই সঙ্গে ইয়োরোপীয় বণিকদিগের একটা তুলনা দিলে বেমানান্ হইবে না। তাহাদের দেশের খাদ্য যদি তাহাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে পারিত, অভাব মোচন করিতে পারিত, তবে তাহারাও স্বদেশ ছাড়িয়া, আত্মীয় স্বজনের প্রিয়বাহুপাশ ছিন্ন করিয়া সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে আসিয়া বিদেশীর অনুকম্পা যাচ্ঞা করিবার হীনতা স্বীকার করিত না বলিয়াই আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস। কিন্তু ইহাও অতীত ইতিহাসের কথা—সে-কথা থাক্।

অনেক বিশেষজ্ঞ বলেন, লোকসংখ্যা আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পাওয়াতেই খাদ্যসমস্যা এমন গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের উক্তি একেবারে অসত্য ইহা না বলিয়াও যদি প্রশ্ন করা যায় যে, লোকসংখ্যা যেমন বাড়িয়াছে, ফসলোৎপাদক জমির 'সংখ্যা' অথবা পরিমাণও কি তেমনই, অথবা আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পায় নাই? তাহার কি উত্তর মিলিবে?

তদুত্তরে তাঁহারা হয় ত' বলিবেন, এ-দেশের চাষীরা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষকার্য্য করে না, তা ফল পাইবে কিরূপে?

বিজ্ঞানসম্মত উপায় বলিতে তাঁহারা ট্রাক্টর ম্যানিওর ইত্যাদির কথা পাড়িবেন নিশ্চয়। কিন্তু যে ছাত্র ইতিহাস পড়িয়াছে, 'পুরাণ'দিনের কথা জানিয়াছে, সে বলিবে মূলের ভুল সংশোধন না করিতে পারিলে বিজ্ঞান অজ্ঞানতাই বাড়াইবে, কুজ্ঞানেরই সৃষ্টি করিবে। মূলের ভুল দূর কর, মূলে জল সিঞ্চন কর, দেখিবে বিজ্ঞান তাহার দিগন্ত-প্রভাসিত জ্যোতিতে জগৎ ভরাইয়া দিবে। ভারতবর্ষের ঋষিরা সেই মূলমন্ত্র জানিতেন, ভারতবর্ষের লোককে সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করিতেন, তাই ভারত জগজ্জননী, জগতের অন্নদাত্রী হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু কোথায় সে ঋষি, আর কোথায় সে মন্ত্র? কে অন্বেষণ করিবে? ঋষি বলিতে আমরা বুঝি হয় দুর্বাসা, না হয় নারদ। একটি মহাই বদরাগী, রক্তচক্ষু, শাপ দিয়াই বেড়ান, আর একটি, ছোটখাট ধানভানা ঢেঁকি চড়িয়া যত্র তত্র গমন করেন এবং ঝগড়া বাধাইয়া অপার আনন্দ উপভোগ করেন। আমাদের বিদ্যার দৌড় ঐ পর্য্যন্ত। আর বিশেষজ্ঞগণ ত' সাফ জবাব দিয়াই রাখিয়াছেন, ওসব myth—রূপক মাত্র। আমাদের বিদ্যার নৌকা ও তাঁহাদের বিদ্যার জাহাজের মাঝখানে পড়িয়া, হাবুডুবু খাইয়া ঋষিও মারা পড়িয়াছেন, মন্ত্র বেচারা মাঝদরিয়ায় ভরা ডুবি! কে এমন ডুবুরী আছে যে, আপিসের সাহেবের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করিয়া, ছেলের জ্বর, মেয়ের ফ্লু, গৃহিণীর টি, বি, চালের ভাবনা, কাপড়ের দুর্ভাবনা, চিনির দুশ্চিন্তা, তেলের ভাবনা, ভুলিয়া অতলে ডুব ফুঁড়িবে? সচরাচর চোখে পড়ে না, হাজারে এক, লাখে একও চোখে দেখি না সত্য কিন্তু ক্রোটিতে এক যদি থাকে, আর সে যদি বলে, জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধির মন্ত্র আছে, ঋষিরা তাহা অভ্রান্ত অক্ষরে, অক্ষয় অব্যয় ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, আমি ভাগ্যবশে সে মন্ত্র পাঠ করিয়াছি, তোমাদিগকেও তাহা পাঠ করাইতে পারি, তোমরা তাহা শুনিবে কি? অবসর আছে কি?

আমরা সকলেই বলিব, বাপু হে, বেশী বাহনা না করিয়া এক কথায় যদি বলিয়া দিতে পার, চট্ বলিয়া দাও শুনি। আরও ভাল হয়, যদি মন্ত্রটা চাষীদের শুনাইয়া দাও। আমরা ত' বাপু, চাষকর্ম্ম করি না, তাহারাই করে, তাহারা মন্ত্রটা পাইলে জমি উর্ব্বরা করিতে পারিবে, ধানটা জন্মিবে ভাল, চৌদ্দটাকা মণ চাউল কিনিতে আর পারি না। প্রাণ যায়, দিন চলে না।

ইষ্টমন্ত্র অল্প ক'টি অক্ষরেই সম্পূর্ণ। এই মন্ত্রও তাই। ইষ্টান্বেষীর পক্ষে সেই স্বল্পাক্ষরই যথেষ্ট, দেশের কল্যাণকামীর পক্ষে এই মন্ত্রও যথেষ্টাধিক যথেষ্ট। ঋষিদের কথায়—নদ-নদী যদি গভীর হয়, নদীতে যদি সারাবৎসর প্রচুর জল থাকে, আর সে জল যদি প্রকৃতিপ্রদত্ত জল হয় এবং সেই জল যদি সর্ব্বত্র অব্যাহত ও অকলুষিত থাকে, তাহা হইলে 'পুরাণ' কাহিনী অথবা myth প্রত্যক্ষ সত্য ও প্রত্যক্ষীভূত ঘটনা ঘটিতে পারে।

প্রস্তাব শুনিয়াই পাঠক বলিয়া উঠিবেন, এই ত' বাপু বিষম বেয়াড়া কথা বলিয়া বসিলে। নদী লইয়া টানাটানি করিব আমরা কিরূপে? নদীতে স্নান করিতে বল, রাজী আছি—তাও আবার কোনও কোনও নদীর জলে শুনি

ম্যালেরিয়া ! নদীর মাছ খাইতে বল তাও রাজী, শুনি নদীর মাছ বড় সুস্বাদু। নদী গভীর কি অগভীর, জল থাকে কি থাকে না, সে জল প্রকৃতি দেয় কিম্বা পুরুষে দেয়, কে কোথায় বাঁধ দিল, কি অপকর্ম্ম করিল—ইহা ল'য়া মাথা ঘামানো কি আমাদের কর্ম্ম ? আমাদের এত অবসরই বা কোথায় দেখিলে ?

আর একদল, যাঁহারা দুস্তর বিদ্যা-বারিধি লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা কৃপা-কটাক্ষে চাহিয়া কৃপাব্যঞ্জক স্বরে বলিতে পারেন, কংস রাজার বদ ফরমায়েস আর কারে বলে ? ইরিগেশন ক্যানেল কাটা হইয়াছে, কিঞ্চিৎ কড়ি দিলেই চাষের জল যেখানে সহজেই পাওয়া যায়, সেখানে নদী কাটার দরকারটা কি ? নদীতে জল থাকে, বিনি পয়সায় পাওয়া যায়, ভালই ; কিন্তু তাহা যখন প্রাপ্তব্য নয় এবং প্রাপ্তব্য হওয়াও সম্ভব নয়, তখন সেচের জল দিয়াই কাজ চালাইতে হইবে। আর এত লেখা পড়া ত' করিলাম, বিজ্ঞানকেও গুলিয়া খাইলাম, এমন উদ্ভট কথা ত' কস্মিন্ কালেও শুনি নাই।

বিজ্ঞতর ব্যক্তি বলিবেন, ও সব কোন কাজের কথাই নয়। বলে কি-না, মুনি-ঋষিদের লেখায় আছে। মুনি-ঋষির লেখা কেতাব আমরা বুঝি পড়ি নাই ? তাঁহাদের লেখায় ও সকল কথা থাকিলে আমরা পাইতাম না ?

বিজ্ঞতম ব্যক্তি আরও এক ধাপ উপরে উঠিয়া বলিবেন, বুজরুকি ! বুজরুকি ! বুজরুকরা জানে, নিজের মতটা বড় লোকের নামের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া চালাইতে পারিলে অজ্ঞ লোকে সহজেই মানিয়া লইবে, তাই মুনি-ঋষিদের নাম দিয়া একটা আজগুবি সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া ফাঁকতালে নাম করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

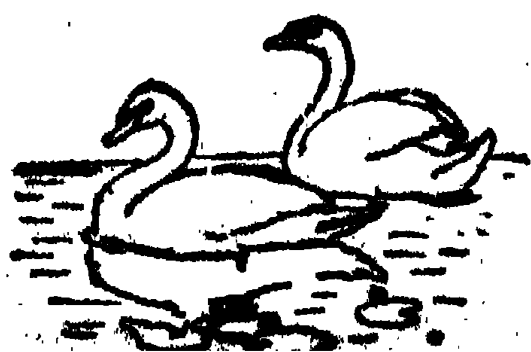
গভর্ণমেণ্ট ইঁহাদের কথাই শুনিবেন, ইঁহাদের কথাই গ্রাহ্য করিবেন ; কারণ গবর্ণমেণ্ট যে শিক্ষা দিয়াছেন, সেই শিক্ষায় ইঁহারা শিক্ষিত—সুশিক্ষিত। যে শিক্ষা গভর্ণমেণ্ট দেন নাই, তাহাতে ইঁহাদের বিশ্বাস থাকিতে পারে না। আবার ইঁহাদের কথা ছাড়া অন্যের কথায় গভর্ণমেণ্টও আস্থা স্থাপন করেন না। ইহাই আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, ইহার ব্যতিক্রম সম্ভব নয়।

বিদ্বানের বিদ্যা এতদূর সম্পূর্ণ যে তাঁহারা তর্কস্থলেও অপরের নিকট কোন্ শিক্ষা লইতে রাজী নহেন। বিদ্যার কলস এমনই কানায় কানায় পূর্ণ যে, আর একটি বিন্দুরও স্থান তথায় নাই। তাই তাঁহাদের ইচ্ছাও নাই, অবসরও নাই।

এই বিদ্বান্‌শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণ খেচরজাতীয় জীব না হইলেও, তাঁহাদের বুলিগুলি তোতাপাখীর বুলিরই নামান্তর। যাহা বিলাতী গ্রন্থে আছে, তাহাই গৃহীতব্য ; তাহাই বেদ-বেদাঙ্গ-পুরাণ-ভারত। যাহা বিদেশী কেতাবে নাই, তাহাই অবান্তর। তাহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক, সময়ের অপব্যবহার মাত্র। ততখানি অবসর তাঁহাদের কোথায় ?

ঠিক কথা, অবসর কোথায় ? আরও ঠিক কথা, অবসর যদিবা থাকে, ইচ্ছা কোথায় ? আসল কথা, অবসরও নাই, ইচ্ছাও নাই, তবে ? তাই ত' আগেই বলিয়াছি, ঐ 'তবে' কথাটা লইয়া যত গোলমাল ; কথাটা বড় শক্ত কথা।

তবে 'তবে'র একটা সহজ সমাধানও আছে। তিনটাকার চাল চৌদ্দ টাকায় কিনিয়া, দেড় টাকার কাপড় ছ' টাকায় পরিয়া ভাগ্যের নিন্দা করিতে, গভর্ণমেণ্টকে গালি পাড়িতে, যুদ্ধের ঘাড়ে সব দোষ চাপাইতে বাধাটা কি ? নিষেধ করেই বা কে ? এস ভাই ভগিনী সকল, সকলে মিলিয়া আমরা সেই সনাতন হুক্কা হুয়াই করি।





জাপান

পরিব্রাজক

জাপানী কবিতা

জাপানী 'হক্কু' বা 'হাইকাই' কবিতার নাম আমরা কিছু কিছু শুনিয়াছি। হক্কু জাতীয় কবিতায় কেবল মাত্র তিনটি ছত্র—তিনটি ছত্রে যে ভাবটি প্রকাশ করা হয়, তাহার মধ্যে অপ্রকাশিত ভাবই সমধিক। অর্থাৎ যেটুকু অর্থ ভাষার গণ্ডীতে ধরা পড়িল তাহার চেয়ে অনেক বেশী গূঢ়ার্থ শুধু ইঙ্গিতে বুঝিয়া লইতে হইবে।



জাপানীদের অন্নগ্রহণ

জাপানী কবিদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে যে, আকারে সুবৃহৎ না করিয়া, ছন্দ ও বাক্যের বাহুল্যের মধ্যে না যাইয়াও সুন্দর কবিতা রচনা করা যায়। এই ধরণের 'উতা' বা 'টঙ্কা' কবিতাগুলি জাপানীদেরই নিজস্ব সম্পদ। বহির্জ্জগতের কোন আধিপত্যই ইহাতে বিস্তারলাভ করে নাই বা করিতে পারে নাই।

তবে এ কথা সত্য যে, চীন-ভাষা ও চৈনিক রচনা-পদ্ধতি জাপানীরা অস্বীকার করে নাই বরং সানন্দে চীনা ভাবাপন্ন হইয়া চীন কবিতার অনুরূপ কবিতা রচনা করিয়াছে।

জাপানী কবিদের মধ্যে 'হিতামারো' ও 'আকাহিতো' খ্রীষ্টীয় অষ্টমশতাব্দীতে এবং 'সুরাইকি' দশমশতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারাই জাপানের আদি কবি।

তাই বলিয়া পাশ্চাত্ত্য প্রথায় কবিতা রচনার প্রয়াস জাপানে একেবারেই হয় নাই তাহা নহে। অধ্যাপক তোয়া-আমা-প্রমুখ কবিবৃন্দ ইউরোপীয় ধাঁচে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনুসরণকারী ও কিছু কিছু জুটিয়াছিল। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিতে কবিতা রচনা করিয়া সত্যিকার জাপানী কবি কেহই প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই।

জাপ-রমণী

কবিতার প্রসঙ্গ বন্ধ করিয়া কবিতার উৎস জাপ-ললনার কথা বলি।

বয়স চার কি পাঁচ—তখন হইতেই জাপানী বালিকা তাহার ভ্রাতা কি ভগিনীকে কোলে-পিঠে করিয়া লালন করিবার ভার প্রাপ্ত হয়। কোলে-পিঠে বলিলাম বাংলায় ঐ বলিতে হয় বলিয়া, বস্তুতঃ খুদে-শিশুটিকে জাপানী-দিদি পিঠে করিয়াই বহন করিয়া থাকে। দিদি যে বালিকা—তার খেলা-ধুলা আছে, দৌড়-ঝাঁপ আছে, ছোটা-ছুটি আছে; কিন্তু পিঠেবাঁধা সেই খুদে-শিশুটি দিদির পৃষ্ঠেই আরোহণ করিয়া কখনো মিটি-মিটি তাকাইতেছেন কখনও বা নির্ব্বিঘ্নে শত উৎপাতের মধ্যেও শান্ত হইয়া ঘুমাইতেছেন।

ভগল্যাস্ স্লাডেন বলিতেছেন, আমি একটি ছোট মেয়েকে দেখিয়াছি, পরবর্ত্তী জীবনে তাহাকে 'গায়েসা' বা নৃত্যগীত-কুশলা রমণীরবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে। তখন তাহার বয়স সাত থেকে দশ। এর মধ্যেই চুলের বাহার ফিরিয়াছে। মাথায় ফুল গোজা। চুলের কাঁটা দিয়া সযত্নে পরিপাটি করিয়া চুল বাঁধা। মুখে পাউডার, ঠোঁটে সিন্দুর অর্থাৎ লিপষ্টিক, ভ্রূদ্বয় এমনি করিয়া কামানো যে ত্রুটি ধরিবার উপায় নাই। সিল্কের পোষাকে সযত্ন সজ্জিতা। অবশ্য তার মা-ই তাকে পোষাক পরিচ্ছদে সজ্জিতা করিবার সময় সাহায্য করিয়াছে।

জাপানের নিম্ন মধ্যবিত্তশ্রেণীর রমণীদের পোষাক পরিচ্ছদের ধরণ অধিকতর প্রাচ্যরুচি সঙ্গত। বড়ঘরের মেয়েরা নানা বর্ণের কাপড় পরেন। বর্ণচ্ছটা তনু দেহ ও মরালগ্রীবার সহিত বস্ত্র পরিধানের কলাকৌশল ভারী মানায়।

কিন্তু আমি ভাবিয়া পাই না নিজেদের এই বিশেষত্ব, মার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন লীলাবিলাস ও বিচিত্র বর্ণের বস্ত্র পরিধান ভঙ্গী ত্যাগ করিয়া অভিজাত সম্প্রদায়ের কেহ কেহ ইউরোপীয় বিশেষতঃ জার্ম্মানী ধরণের পোষাক পরিচ্ছদে সজ্জিত হইতে কেন অযথা অভিলষিত হন? বিশেষতঃ এই ধরণের পোষাক পরিচ্ছদগুলি উপযুক্ত দর্জ্জির অভাবে না হয় সুন্দর, আর জাপানী তরুণীর লীলায়িত দেহবল্লরীর সঙ্গে না খায় খাপ। অথচ অভিজাত সম্প্রদায়ের মহিলারা কেহ কেহ পাশ্চাত্য প্রথায় সজ্জিত হইবার জন্য লালায়িত। আমাদের চক্ষে জাপানী রমণী জাপানী পরিচ্ছদেই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর দেখায়।

সাধারণ বর্ণনা :

জাপান—জাপানী ভাষায় নিপ্পোন—তিনটি প্রধান দ্বীপের সমষ্টি। এক একটি দ্বীপকে আবার বহু দ্বীপের সমষ্টি বলিলেও চলে।

প্রথম শ্রেণী—জাপান সাগরের পূর্ব্বে অবস্থিত, চারিটি প্রধান প্রধান দ্বীপ লইয়া গঠিত। চারিটি দ্বীপের নাম—হোকাইডো, হন্‌সিও কিউসিউ ও সিকোকু।

দ্বিতীয় শ্রেণী—ওখটস্ক সাগরের প্রবেশ দ্বারে অবস্থিত কুরিল দ্বীপপুঞ্জ।

আরও কয়েকটি প্রধান প্রধান দ্বীপপুঞ্জের নাম বলিতেছি,—প্রশান্ত মহাসাগরের ও পীত সাগরের মধ্যবর্ত্তী রিউকিউ ও ফরমোসা। সাখালিনের দক্ষিণাংশ ও কোরিয়া। এই সমস্ত দ্বীপপুঞ্জ লইয়াই জাপান গঠিত।

জাপানের সর্ব্বত্র পর্ব্বতশ্রেণী অবস্থিত। পর্ব্বতশৃঙ্গগুলি আগ্নেয়গিরির মুখস্বরূপ। সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ ফুজিয়ামা, ১২,০০০ ফুট উচ্চ। এই জলন্ত পর্ব্বতশ্রেণীর সক্রিয় অবস্থার জন্য জাপানের নদীগুলি চলাচলের উপযুক্ত থাকে না। নদীপথে বন্দরে যাইবারও উপায় থাকে না। কারণ আগ্নেয়-



জাপানী কৃষক

গিরি হইতে অবিশ্রাম ধারায় আবর্জ্জনারাশি পতিত হইয়া নদী-মুখগুলি বন্ধ করিয়া দেয়—নদীপথে যাত্রী ও মাল চলাচল অসাধ্য করিয়া তোলে।

সম্পদশালী আগ্নেয়গিরি-প্রদেশ মনোরম, গ্রীষ্মকাল ও অপর্য্যাপ্ত বৃষ্টিধারা জাপানের নিম্নভূমিকে যথেষ্ট পরিমাণে শস্য ও রত্নশালী করিয়া তুলিয়াছে। আবার জাপানের সর্ব্বত্রই পর্ব্বতশ্রেণী শৃঙ্খল অথবা মালিকার মত ঘিরিয়া রহিয়াছে বলিয়া চাষাবাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ জমিরও কম জমি প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু জমির বহর কম হইলেও জাপানী কৃষক এত যত্ন ও কৌশলে কৃষিকার্য্য পরিচালনা করে যে,

লোকবহুল সমগ্র জাপানের খাদ্য সম্ভারই এই এক তৃতীয়াংশের কম জমি হইতে সরবরাহ করা হয়। পরিশ্রম করিবার অমানুষিক শক্তি ও বর্ত্তমান বিজ্ঞানের আবিষ্কারলব্ধ জ্ঞান এই উভয়ের সমন্বয়ে জাপান অতি অল্প দিনের মধ্যেই বিস্ময়কর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে।

যদিও আমাদেরই মত জাপানীরাও অন্নগত প্রাণ তথাপি ধান্য ব্যতীত বহুবিধ শস্য জাপানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ধান্যের মতই অপর্য্যাপ্ত জন্মে যব ও বার্লি। অন্যান্য শস্যের মধ্যে চা, রেশম, কার্পাস ও তামাকই প্রধান। প্রধান প্রধান বৃক্ষ—ক্যাম্ফার, গাম বার্ণিস্, মুলবেরী ও বাঁশ। প্রধান খনিজদ্রব্য—কয়লা, লৌহ, তাম্র, অ্যান্টিমোনি, রৌপ্য, স্বর্ণ, সালুফার ও চীনা ক্লে।

বহির্ব্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জাপান সাধারণতঃ নিজেদের ঘরে কিনিয়া লয় অর্থাৎ আমদানী করে, কার্পাস পশমের বস্ত্রাদি, চিনি, পেট্রোলিয়াম্, কল-কব্জা ও জাহাজ; আর অপরের নিকট বিক্রয় করে অর্থাৎ রপ্তানী করে, পশম, চা, চাউল, কয়লা, পোরসিলিয়ন্ ল্যাকোয়াউ ওয়ারস (lacquered wares) ও ক্যাম্ফার।

পল্লীর ছবিঘর

শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

নয়নাজোলার মাঠের ওপারে শাপলাবেড়ার গাঁয়—
সেদিন সকালে চলিবার খনে শুনিনু বটের ছায়।
"নিতুই আমরা এই পথে বাবু কাঁকসার হাট যাই—
প্রাণের মাশুল যোগাব কোথায় ? কোনোরূপে করে খাই।"
অশোকবাবুর আঁখি রোষে লাল বলে, "দিতে হবে তোলা—
আমার মহলে সরকারী পথ ? এ'ধারে আয়তো 'ভোলা' ?"
"হাজির হুজুর" বলার সাথেই দেখিনু মূর্ত্তিমান—
চাষীর মাথার ঝুড়িগুলো হ'তে সে দিল কয়টা টান।
মাঠের ফসল বাবুর মহলে লুটাল ধুলার পরে—
অসহায় চাষা করে হায় হায় নয়নে বাদল ঝরে।
গ্রামে পড়ে থাকি এ'রূপ দু'চোখে দেখিয়াছি বহুবার—
দেখি নাই কভু অসহায় চোখে করুণ অশ্রুধার।
পরে শুনিলাম ও গাঁয়ে কাহার বন্ধ হয়েছে হাল্—
বাবুর দাপটে জন-মনিষেরা মনিবে করেছে থাল্।
অথচ সেথায় বহু শিক্ষিত পাশকরা ছেলে মেলে
জীবন যাহারা পঙ্গু করেছে কেবলি কলম ঠেলে।
সে কোন্ নারীরে সমাজ শাসনে করিয়াছে ভিটা ছাড়া—
সব থাকিতেও কাঙালিনী সে যে হ'য়েছে সর্ব্বহারা।
একে একে কত ব্যথার কাহিনী আসিল আমার কানে—
গুমরিল হিয়া রহিয়া রহিয়া মরমের মাঝখানে।

... ...

কূপ-মণ্ডুক পল্লী কবির কোথা দূর কল্পনা—
শ্যামল বনের মাধুরী কুড়ায়ে আঁকিবারে আল্পনা।
আছে তার দেশ সবুজ ক্ষেত্র পুরানো দীঘির জল—
সুদূর বিসারী গ্রামের আকাশ পঙ্ক ও পল্বল।
কঙ্কালসার দলিত জীবের অশ্রুর পারাবার—
আর আছে দীন দুর্ব্বল মনে সীমাহীন হাহাকার।
তবু ইহাদের ভয়াতুর আশা আছে বাঁচিবার সাধ—
প্রাণগুলি সব যেন প্রাণহীন বেড়িয়াছে অবসাদ।

... ...

শিহরিয়া দেখি নিতি ভয়ে ভয়ে পল্লীর ছবিঘর—
এই কঙ্কাল, প্রাণ-নিপীড়ন, হে কবি অতঃপর ?

দেশের সেবা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

দশ

আমার অন্তর যেমন ঝরিছে
তেমতি হউক সে! —চণ্ডীদাস

সুব্রতকে এমন অকুণ্ঠিতভাবে গ্রামের কল্যাণের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া গ্রামের যুবকেরাও তাহাকে সাহায্য করিতে আসিল। এই দলে সমাজে অস্পৃশ্য যাহারা, যাহাদিগকে দেশের কোন কাজেই আহ্বান করা হয় নাই, তাহাদিগকেও আহ্বান করা হইল। এতদিন পর্য্যন্ত গ্রামের যে কোনও কাজে তাহাদের কথা কেহই ভাবিয়া দেখে নাই, সভা-সমিতি যাহা কিছু হইয়াছে তাহাতে তাহাদের কোনও যোগই ছিল না। গ্রামের যে তাহারাও অধিবাসী, তাহাদের সুখ-দুঃখ, ব্যাধি-পীড়াও যে আছে, অভাব ও দারিদ্র কতখানি তাহাদিগকে বিপন্ন করিয়া তোলে, সে-কথা কেহই কোনদিন ভাবিয়া দেখে নাই। তাহারা ছোটলোক। ছোটলোক বলিয়াই তাহারা উপেক্ষিত, তাহাদের কথা ভাবিবার কোনও আবশ্যকতা আছে একথা কাহারও মনের কোণেও জাগে নাই—কিন্তু সুব্রতের আহ্বানে আজ তাহারা দলে আসিয়া মিলিত হইল।

জঙ্গল পরিষ্কার করিতে, কোদাল ধরিতে, পুকুরের জলে নামিয়া কি ভাবে কচুরিপানা সরাইয়া ফেলিতে হয়, সে অভিজ্ঞতাও আজ ভদ্রলোকের ছেলেদের নাই। তাহারা জানে বাবুগিরি করিয়া তাস-পাশা খেলিয়া সময় কাটাইতে মাত্র। কাজেই বক্তৃতার মধ্য দিয়া দেশহিতৈষণাই ছিল তাহাদের সম্বল।

সুব্রত কিন্তু শুধু উচ্ছ্বাসের প্রবল স্রোতে ভাসিয়া গেল না। সে বরাবরই পড়াশুনায় ছিল ভাল। তারপর কোনও কাজের ভার সে পাইলে তাহার সব দিক্ বেশ ভালভাবে বুঝিয়া শুনিয়া কাজে হাত দিত। এ জন্য জনসেবা ও গ্রামের কাজে আসিবার পূর্ব্বে সে ইউরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের পল্লীসেবকদের লিখিত বই ও কার্য্যপ্রণালী বেশ ভাল ভাবেই আয়ত্ব করিয়া লইয়াছিল। তারপর ফটোগ্রাফ তুলিতে, নক্সা করিতে এবং জনগণনা ইত্যাদি বিষয়েও তাঁহার অভিজ্ঞতা বড় কম ছিল না।

কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বদিন সে কবিরাজ মহাশয়ের বৈঠকখানায় বসিয়া জেলার মানচিত্র ও গ্রামের মানচিত্রখানি লইয়া বসিল এবং গ্রামের যে-সব পথ, খাল ও নালা বরাবর জনসাধারণের ব্যবহারেই চলিয়া আসিয়াছে সে-সকল চিহ্নিত করিল, এবং স্থির করিয়া ফেলিল—কি ভাবে কাজ সুরু করা যাইবে। একদিনে ত' আর সারা গ্রামের সব পথগুলি পরিষ্কার করা চলিবে না। এই ভাবে সে একটি পথ নির্দ্দেশ করিয়া লইল। তারপর সে জানিয়া লইল গ্রামের যে পথটিকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের কার্য্য আরম্ভ হইবে—সেই পথের দুই দিকে কতগুলি বাড়ী আছে, কয়টি পুকুর আছে এবং তাঁহাদের অবস্থা ও প্রকৃতি কিরূপ। গ্রামের যুবকদের মধ্যে কয়েক জনের উপর সে এইসব বিবরণ সংগ্রহ করিবার ভার দিল। যে-যুবকেরা এক সময়ে তাহার আগমন প্রসন্ন চক্ষে দেখে নাই আজ তাহাদের অনেকেই, জানি না কি মনে করিয়া, সহযোগিতা করিতে দল বাঁধিয়া ছুটিয়া আসিল।

সুব্রত এইভাবে সমুদয় বিবরণ সংগ্রহ করিয়া লইয়া দেখিল যে, যদি একদিনেই গ্রামের সমুদয় যুবকেরা পথে সা'র বাঁধিয়া কোঁদালি হাতে দাঁড়ায় তাহা হইলে পথের দুই ধারের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে একদিনের মধ্যেই সম্ভবপর, কিন্তু মুস্কিল যদি কেহ বাধা দেয়। যে ভয় ত' গ্রামের লোকের! তাই সে সমুদয় বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া কহিল, এখন কি করবেন বলুন ত'!

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন; "বাবা আমি তোমার কাজের ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা দেখে মুগ্ধ হয়েছি, আমার মনে হয় আমরা পারবো এই শেষ বয়সে গ্রামের কিছু কাজ করে যেতে! দেখ, প্রত্যেক কাজেরই একটা শৃঙ্খলা আছে তা ছাড়া কোন কাজ করা কি সম্ভব! বেশ বাবা, তোমার ব্যবস্থায় ফল বেশ ভালই হ'বে বলে ত' মনে করি।"

সুব্রত বলিল, "আপনি বরাবর গ্রামে বাস করে আসছেন,

গ্রামের লোকদের স্বভাব বেশ ভাল করেই জানেন, আমি ত' তা জানি না। তবে একটী কথা আমার মনে হয়—এদের প্রতি অভিমান করে যদি আমরা দূরেই থাকি, তবে সেইটী কি বড় স্বার্থপরতার কাজ হয় না?"

কবিরাজ মহাশয় উৎফুল্ল হইয়া কহিলেন, "সত্যি কথা বাবা! আমার এ দীর্ঘ জীবনের মধ্যে এ সত্যটাই ত' আমি প্রচার করতে চেয়েছি, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি বাবা, কেউ বোঝে না, কেউ কাজে লাগতে চায় না, বুঝতে চায় না। আপনাকে বঞ্চনা করে চললে কখনও কল্যাণ হতে পারে কি? এরা আত্মপ্রবঞ্চনাই শুধু করে আসছে।"

সুব্রত কহিল, "আমি ত' দেখতে পাই আমাদের দেশের ধনীদের মধ্যে শোষণের ভাব যত বেশী, পোষণের ভাব তত বেশী নয়। ধনী যারা, বড় যারা তারা নিতেই জানে—দিতে জানে বলে ত' মনে হয় না।"

এমন সময় সুবোধ বলিল, "আমি আশ্চর্য্য হ'লাম সুব্রত বাবু আপনার মুখে এমন একটা কথা শুনে, এর চেয়ে বড় সত্য আর কি আছে জানি না! জানেন এ গ্রামের যারা বড় লোক, যাঁরা ধনী, যাঁরা ইচ্ছা করলে এই পল্লীর প্রভূত কল্যাণ করতে পারেন, তাঁরা গ্রামের কোনও কাজে আসেন না। নির্ভর করেন একজন গোমস্তা বা মুহুরীর উপর, যার কাজ শুধু দীন দরিদ্র প্রজাদের লুণ্ঠন করে অর্থ শোষণ। তার সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলতে গেলে মালিকেরা কাণে তুলতেও চান না। বরং তার সব অন্যায় কাজেরও সমর্থন করেন। কাজেই গ্রামের উন্নতির মূলে এই যে সব বাধা, সে বাধা দূর করবে কে বলুন ত'।"

সুব্রত কহিল, "করবেন আপনারা। একবার তাদের ডেকে আনুন আপনাদের মধ্যে, বুঝিয়ে দিন ভাল করে দেশের দুর্দ্দশার কথা। জানেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে শক্তি আছে, সে শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে তুললে কোন অন্যায় মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না।"

সুবোধ মৃদুস্বরে কহিল, "এ কয়দিনের মধ্যেই ত' বুঝতে পেরেছেন গ্রামের অবস্থা কতকটা, আর কিছুদিন থাকলে আরও কিছু উপলব্ধি করতে পারবেন।"

"[illegible] হবে না, সুব্রতবাবু। আমার মনে হচ্ছে আমরা যারা শিক্ষিত বলে গৌরব করি, তাদের অপরাধেই এমন সব সাজা পেতে হচ্ছে আমাদের। মানুষকে আমরা ঘৃণা করেছি, দেবতা যে মানুষের মধ্যেই বাস করছেন, সে-কথা একেবারেই ভুলে গেছি, তারই ফলে আমরা দূরে সরে পড়ে রয়েছি। দেখুন, আমি চাই আমরা নিজেরাই কাজ করবো। সর্ব্ববিষয়ে রাজদরবারে হাত পাতবো, সে কি শুধু দুর্ব্বলতা নয়! আজ যদি এই গ্রামের সংস্কার করতে গিয়ে আমাদের মাথায় লাঠি পড়ে, তবে যে রক্ত বেয়ে পড়বে সেই রক্তধারাই গড়ে তুলবে ভোগবতীর সুমিষ্টধারা, যা পবিত্র করবে, অনুপ্রাণিত করে তুলবে সাত শত যুবকদের ও কর্মীদের।"

কবিরাজমহাশয় বলিলেন, "এইবার যখন আমাদের ব্যবস্থাটা সুনির্দ্দিষ্ট হয়ে গেল, তখন গ্রামের সকলকে ডেকে বুঝিয়ে বলে, চল বাবা, কাল থেকে কাজে লেগে যাই।"

তাঁহার এই কথাটা সকলেই সমীচীন মনে করিল।

গ্রামের সকলেই আসিলেন। আসিলেন না কেবল চট্টোপাধ্যায়মহাশয়, লোক আসিয়া খবর দিল, তিনি কাল দূরবর্ত্তী কোন এক আত্মীয়ের বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন।

সেদিনের সেই বৈঠকে অনেকেরই অনুকূল মত পাওয়া গেল। চট্টোপাধ্যায়ের দলের একজন শুধু কহিল "গ্রাম ত' এখনও গ্রামই আছে। সে ত' আর কোথাও যাবে না। চাটুযোমহাশয়ের আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করলে কি কোন দোষের হত?"

"নিশ্চয়ই নয়, তবে কদিন এই ভদ্রলোক এ গ্রামে বসে থাকবেন?"

উত্তর হইল, "এ গ্রাম ত' আর এ ভদ্রলোকের নয়। দুই দিনের জন্য এসে কোন্ পথ তিনি দেখিয়ে দিবেন? সে কি কলহের না মিলনের।"

সুবোধ বলিল, "কাকাম'শাই জানেন যে এমন কাজে তিনি মন খুলে যোগ দিতে পারবেন না, তাই ত' তিনি ইচ্ছা করে চলে গেলেন, নইলে এমন একটা ভাল কাজে না থাকলে কি দোষের হত?"

মোহন চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষে যিনি কথা বলিতেছিলেন তিনি উত্তপ্ত সুরে কহিলেন, "কাজটা কি ভাল করছ সুবোধ? কাকার বিরুদ্ধে আহ্বান, চমৎকার।"

সুবোধ বলিল, "আমি আমার জীবনের যা কিছু শিক্ষা ও

দীক্ষা লাভ করেছি, সকলই কাকার জন্তে সে কথা আমি কোনদিন ভুলি নি। যতদিন বেঁচে থাকবো ভুলবো না। কিন্তু আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি, এই যে মানুষগুলো দারুণ গ্রীষ্মে দু'ফোঁটা জল পায় না, এই যে তারা সুদের সুদ তস্য সুদ দিয়ে দিয়েই নির্য্যাতীত হয়েছে তার কি কোন প্রতিকার, কোন দয়া-কাকা করতে পারতেন না ? কাকা তা করেন নি। আমি জানি না, আমি আমার মায়ের মত স্নেহময়ী কাকীমার কাছে শুনেছি বাবার সব কিছু উপার্জ্জিত অর্থ কাকার কাছেই তিনি দিয়েছিলেন মৃত্যুরও অনেক আগে। কাজেই আমি অকৃতজ্ঞ নই, তবু বলবো, তিনি নিঃস্বার্থভাবে যদি সব কাজ করতেন তবে আমার বলবার কিছু ছিল না। কি হবে তাঁর অর্থে ? যে অর্থ শুধু আপনার সুখ ও স্বার্থপরতাকেই বড় করে তোলে পরের মঙ্গলের জন্য একটি কপর্দ্দকও ব্যয় করতে কুণ্ঠিত, সে অর্থ দিয়ে কি হবে, বলুন ত ?"

সুবোধ উত্তেজিত ভাবেই সব কথাকয়টি বলিয়াছিল।

ভদ্রলোক রাগে ও অপমানে উত্তেজিত ভাবে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

পরেরদিন কাজ আরম্ভ হইল। প্রভাতের স্নিগ্ধ রবিরশ্মি যখন ধরণীর বুকে নূতন জীবনের উজ্জ্বল দীপ্তি ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, সকলে কোদাল ও দা হাতে ও দড়ি ইত্যাদি সব প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। মানচিত্রখানি হাতে করিয়া, সীমা ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া কবিরাজমহাশয় ও একজন সরকারী অবসরপ্রাপ্ত আমীন চলিয়াছিলেন এবং উপদেশ দিতেছিলেন যেন কোনরূপ অন্যায় বা গোল না বাঁধে।

ছেলে, বুড়ো, যুবা সকলেই অগ্রসর হইতেছিল, ছোট বালক বালিকারা পথের পাশে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, জঙ্গলে ভরা দু'পেয়ে পথটী কেমন প্রশস্ত হইয়া চলিল। যেখানে বাঁশগাছটি হেলিয়া পড়িয়া, তেঁতুলগাছের ডালটি ঝুলিয়া পড়িয়া পথচারী পথিকদের পথে চলা বিপজ্জনক করিয়া তুলিয়াছিল, এখন সেই পথ সুন্দর ও সুপ্রশস্ত হইতে চলিল। দুইদিকে সার বাঁধিয়া যুবকেরা পথের পাশে থাকিয়া কাজ করিতেছিল। এমন কি গ্রামের কুলবধূরা পর্য্যন্ত যুবকদের এই পথ পরিষ্কার করিতে দেখিয়া কোন কোন স্থলে আপনাদের কৌতূহল দমন করিতে পারে নাই। তাহারাও একান্ত উৎফুল্লভাবে পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

এইভাবে যুবকেরা আধমাইল পর্য্যন্ত পথ বিনা ঝঞ্ঝাটে পরিষ্কার করিয়া ফেলিল। তখন দেখা গেল কি প্রশস্ত পথটিকেই না তাহারা এমন করিয়া চলার অযোগ্য করিয়া ফেলিয়াছিল।

রাস্তাটার মোড় ফিরিতেই পথের চিহ্ন পাওয়া গেল না। দেখাগেল যে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীর কাছে আসিয়া পথ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ চাটুয্যেমহাশয় পথের জমি তাহার পুষ্করিণীর সামিল করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এইখানেই পড়িল মস্তবড় বাধা।

কোন্‌দিক দিয়া পথ তাহারা নিবেন, সে সমস্যা যখন বিষম গুরুতর সমস্যারূপে আসিয়া উপস্থিত হইল—তখন পাশের এক বাড়ী হইতে একজন ভদ্রলোক বাহির হইয়া আসিয়া কহিলেন, "এ কি অন্যায় বলুন ত' ? এই একপাল ছেলেদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে কি করতে চাইছেন আপনারা ?"

কবিরাজমহাশয় তাহার লাঠিখানা নাড়িতে নাড়িতে কাছে আসিয়া বলিলেন, "কিছুই নয় ভাই, আমাদের রাস্তার উপরেই পুকুর কাটা হয়েছে, এখন কোনদিক্ দিয়ে পথ নিয়ে যাই বলুন ত' ?"

ভদ্রলোকটি বিদেশে চাকরী করেন তাঁর মনটিও বেশ ভাল, বলিলেন, "এই কথা, বেশ ত' আমার বাড়ীর পাশ দিয়ে নিয়ে যান, কোন বাধার কারণ নেই, আমরাও বিদেশেই থাকি, এই দেখুন না বিপদে পড়ে দেশে চলে এসেছি।"

ভদ্রলোক বরাবর এখানেই থাকিতেন। তাহার এই কথায় সকলেই তাঁহাকে প্রশংসা করিতেছিলেন এবং সেদিক দিয়া পথটা ঘুরাইয়া নিলে মোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত অনর্থক একটা অশান্তির সৃষ্টি নাও হইতে পারে। সেইভাবে যখন সকলে দ্বিপ্রহরে রৌদ্রের মধ্যে ঘর্ম্মসিক্ত দেহে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন সেই বাড়ীর মধ্য হইতে বৃদ্ধ লাঠি হাতে ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এতবড় অন্যায় কিছুতেই হতে দিব না। চৌদ্দপুরুষের বাস্তুভিটার উপর দিয়ে কি না চলবে সরকারি দশজনের রাস্তা।"

কবিরাজমহাশয় এই বৃদ্ধ ব্যক্তির কথায় খানিকক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং আশ্চর্য্য হইলেন এই লোকের ব্যবহারে। বৃদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে প্রতিদিন

সন্ধ্যায় তাঁহার আসরে বসিয়া টাকাটা সিকেটা চাহিয়া আনে আর কত তোষামোদ বাক্যেই না কার্য্যসিদ্ধি করিয়া আসে, সেই বাড়ুয্যের এ কি আচরণ! তিনি নীরবে একটি তেঁতুল গাছের তলায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

গ্রামের যুবকেরা কেহ কোন কথা বলিল না। সুব্রত এইবার বৃদ্ধের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

বৃদ্ধ বরদা বন্দ্যোপাধ্যায় এক সঙ্গে অতগুলি কথা বলিতে গিয়া হাঁপাইতে ছিলেন, তাঁহার বুকের শীর্ণ পাঁজরাগুলি গণিতে পারা যায় এমনি তাহার শরীরের অবস্থা, কিন্তু গলায় জোর তাঁহার কম নয়। সুব্রতকে দেখিয়া তিনি ক্রোধে আবার গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "কি চাই বাপু তোমার? কোথাকার কে বলে কি না আমড়া ভাতে দে। এসেছেন আমাদের পথ ঘাট ভাল করে দেবেন, আমাদের লেখাপড়া শিখাবেন, কি চাই বাপু তোমার!"

সুব্রত বিনীতভাবে কহিল, "চাই আপনার পায়ে ধূলো। আপনি প্রাচীন ব্রাহ্মণ, আপনার কাছে আশীর্ব্বাদ চাই যেন যে কাজের ভার নিয়ে এসেছি, সে কাজ করে যেতে পারি।" বৃদ্ধ তাহার এইরূপ কথায় একটু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "আমি ত' বলেছি, ভাল কাজে আমার বাধা নেই, কিন্তু তোমাদের গাঁয়ের মোড়ল ঐ যে কবিরাজ দাঁড়িয়ে আছে, বুড়ো বয়সে ওর কেন ভীমরতি হল, কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে এই রোদে বেড়িয়েছেন হৈ হৈ করতে,—তুমি যাই বল বাপু, আমি কিছুতেই দিব না আমার বাড়ীর পাশ দিয়ে পথ নিতে। এতে খুন হয়, জখম হয় তবু ভাল, নইলে নিজে মরবো, হাঁ; আমার এই কথা।"

সুব্রত বলিতে লাগিল, "দেখুন, দেখি আপনার পুকুরের কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে! এর জল কি কেউ খেতে পারে? কচুরিপানায় ঢাকা, পাড়ে ভীষণ জঙ্গল আর আমরা যে পথ তৈরী করবো, সে কি গ্রামের সকলের কল্যাণের জন্যই নয়। বলুন আপনি, রাত দুপুরে চলতে কি আপনিও কোন অসুবিধে মনে করেন না?"

বরদা বাড়ুয্যেমহাশয় বলিলেন, "আমি গরীব মানুষ, তাই এসেছ আমার বাড়ীর পাশ দিয়ে পথ নিতে, যাও ত' একবার মোহন বাড়ুয্যেমহাশয়ের বাড়ীর কাছে, কিলিয়ে চিট্ করে দেবেন না। সেদিন কেমন লাঠির ঘা পড়েছিল"।

সুব্রত নিরাশ হইয়া বলিল, "আপনারা যদি নিজেদের ভালমন্দ না বুঝতে পারেন, তবে কে বুঝিয়ে দেবে বলুন ত'? আপনি ত' আর চিরদিন পৃথিবীতে রইবেন না।"

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আরও রাগিয়া গেলেন—বলিলেন, "ভারী ত' বড়লোক তুমি, আমায় মরতে বল? তুমি মরতে পার না, ঐ ছোড়াগুলো মরতে পারে না!"

এইবার সুবোধ কহিল, "নিশ্চয়ই পারে। তবে আমরা মরণকে ভয় পাই না, নইলে মুন্সীগঞ্জ গিয়ে মিথ্যা সাক্ষী কে দিবে? পরের নামে কুৎসা রটাবে কে? আপনি বুড়ো হয়েছেন, এখনও মিথ্যাকথা বলতে ছাড়েন না। আমরা রাস্তা করবোই, দেখি কে বাধা দেয়। এস ত' ভাই সুরেন, এস ত' ভাই রহিম, এস ত' ভাই সহদেব মাল।"

সুবোধ বলিবামাত্র তাহারা সকলে জঙ্গল কাটা সুরু করিয়া দিল—আমীন মহাশয় অগ্রসর হইয়া সূত্র ধরিয়া ও ম্যাপ দেখিয়া নির্দ্দেশ করিয়া চলিলেন। সুব্রতও সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয় মড়াকান্না জুড়িয়া দিলেন, লাঠি লইয়া সুবোধকে মারিতে আসিলেন। সুবোধ বৃদ্ধের হাত হইতে লাঠিটা কাড়িয়া লইল। তখন বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয়ের করুণ চীৎকার সুরু হইল, "আমি মহারাণী বাহাদুরের, মহারাজা জর্জ্জ বাহাদুরের সরকারের দোহাই দিচ্ছি, তোমরা দেখ এসে, গ্রামের এই ষণ্ডা গুণ্ডারা আমায় মেরে ফেল্লে।"

এমন সময় একটী কিশোরী ছুটিয়া আসিয়া বাড়ুয্যে মহাশয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া কহিল, "কেন মিছেমিছি চেচাচ্ছ দাদু ভাই, এত বেশ হলো, আঃ বাঁচলুম, দেখ দেখি কেমন সুন্দর আকাশ দেখা যাচ্ছে, সেফালি গাছটা যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। বেশ করেছেন সুবোধবাবু, দাদু ভাই আফিং খেয়ে বসে বসে ঝিমুবে আর যত সব মামলা-মোকদ্দমার তদ্বির করে বেড়াবে। তবে দেখুন, একটী কথা, আমি কিছুতেই দোব না আর এগুতে যদি আপনারা পুকুরের এই পানা পরিষ্কার করে না দেন, দিবেন ত'?

সুব্রত কহিল, "নিশ্চয় দেবে।"

"নিশ্চয় বললে চলবে না ভাই, আপনি হলেন বিদেশী মানুষ, হয় ত' কালই চলে যাবেন," তারপর কিশোরী হাসিয়া কহিল, "এই যে সুবোধদাদার দলটিকে দেখছেন, তারা কি করবে

জানেন, সুবোধদাদাও স্কুল খুললে যেমন চলে যাবেন, এরাও যার যার ঘরের কোনে বসে মা পিসীর সঙ্গে ঝগড়া বাধাবে!"

সুবোধ বলিল, "দু'দিন কলেজে পড়ে খুব কথা বলতে শিখেছিস্, বাঁদরী কোথাকার! চুপকর বলছি অনু।"

অণিমা হাসিয়া বলিল, "বাঁদর না হ'লে কি বাঁদরী চিনে? তুমি তা হলে কি ভাই সুবোধদাদা!"

সুবোধ বলিল, "তোর দাদুভাইকে ঠাণ্ডা কর দেখি! আমরা কাজ করা সুরু করি! কি অভিনয়ই করতে পারে তোর দাদাম'শাই!. আমরা পার্ট মুখস্থ করে ভুলে যাই অভিনয় করতে আর তোর দাদু কি চমৎকার অভিনয় শুনিয়ে দিলেন, বাহবা বলতে হয় বই কি!"

এইবার অনু যাহারা কোদালি ধরিয়াছিল, তাহাদের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "খবরদার কেউ এক পা এগুতে পারবে না, আগে নামো জলে, তোল কচুরিপানা, তবে ত' বোলব মানুষ—সত্যিই তোমরা চাও গ্রামের কাজ

সুব্রত কহিল, "নিশ্চয় করবো। আপনি আপনার দাদুভাইকে বুঝিয়ে দিন—গ্রাম না বাঁচলে দেশ বাঁচে না, গ্রামের মানুষ যদি মানুষ না হয় তবে কেমন করে দেশের মঙ্গল হতে পারে।"

অণিমা তর্জ্জনি হেলাইয়া সুব্রতের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া কহিল, "সে ভার আমার সুব্রতবাবু! দাদু আমার মানুষটি ভালো। তবে দিদিমণি মারা যাবার পরেই কেমন হয়েছে। যাক্, কথা কাটাকাটি ত' অনেক হল, এইবার কাজে লাগুন ত'! এসেছেন ত' এক সপ্তাহে গ্রাম উদ্ধার করে দেশের সেবা করতে!"

সুব্রত মালকোচা করিয়া কাপড় পরিয়া হাতের আস্তিন গুটাইয়া জলে নামিল। তাহাদের জলে নামিতে দেখিয়া এবং কচুরিপানা তুলিতে দেখিয়া অণিমা আগাইয়া কহিল, "বড় যে জলে নামছেন, সাঁতার জানেন?"

সুব্রত গর্ব্বভরে হাসিয়া কহিল, "সাঁতারের চ্যাম্পিয়ান না হতে পারি, তবে সুইমিং ক্লাবের এই অধম সুব্রত রায়কে সকলেই জানে।"

অণিমা হাসিয়া কহিল, "ঘাটটা বড্ডই পিচ্ছিল কিনা, আর পুকুরের জলটাও তেমন আরামের নয়, পুকুরটাও বেশ গভীর। তাই সতর্ক করে দিচ্ছিলাম। আমরা ত' জানি ক'লকাতার ছেলেরা জানে শুধু সিগ্রেট ফুঁকতে আর সিনেমা দেখতে!"

সুব্রত কহিল, "জানেন ত' আপনি, শোনা কথা অনেক সময়েই ভুল হয়।"

এদিকে তাহাদের দলে যে সব জেলে ও কৈবর্ত্তের ছেলেরা ও যুবকেরা ছিল, তাহারাও প্রায় পঞ্চাশ জন হইবে, সকলে বলিয়া উঠিল, "কর্ত্তারা পথের কাজ করেন, আমরাই দিমু পুকৈরটা ছাপ কইরা, দুইদণ্ডের কাজ ত' মাত্র।" যেমন বলা সঙ্গে সঙ্গে তাহারা জলে নামিল, বাঁশ যোগাড় করিল, দড়ি আনিল এবং হৈ-হৈ করিয়া দুই ঘণ্টার মধ্যে পুকুরটিকে পরিষ্কার করিয়া ফেলিল। ওদিকে ছেলেরাও জঙ্গল পরিষ্কার করিতে ও পথ তৈরী করিতেছিল।

বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয় হঠাৎ কেন যে শান্ত হইয়া বসিয়া তামাক টানিতে ছিলেন ইহা সুব্রত বুঝিতে পারিল। অণিমা, বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয়ের দৌহিত্রী। বাঁড়ুয্যেমহাশয়ের একটি মাত্র কন্যাই ছিল এবং একজন মুন্সেফের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। কন্যা এই একমাত্র কন্যা অণিমাকে রাখিয়া মারা গিয়াছেন, সে আজ পনেরো ষোল বৎসরের উপর। তারপর হতভাগ্য বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয় গৃহিণীকেও হারাইয়াছেন চারি বৎসরের উপর। তাঁহার আপনার বলিতে কেহই নাই। আছেন শুধু এক প্রৌঢ়া বিধবা মাসী। তিনিই দুইটি ভাত রাঁধিয়া দেন। জামাতা আবার বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহার কয়েকটি পুত্র-কন্যাও হইয়াছে, তিনি নানা জেলায় ঘুরিয়া বেড়ান, কাজেই কন্যা অণিমা ঢাকার মেয়েদের কলেজে, বোর্ডিংয়ে থাকিয়া লেখা পড়া করে, অবসর মত ছুটি পাইলে হয় বাবার কাছে যায় নয় বৃদ্ধ দাদুর কাছে আসে। সে যে কয়টা দিন এখানে থাকে তখন বৃদ্ধ সব ভুলিয়া যায়! নাতিনীও বিশেষ করিয়া জানে যে দাদুর এমন ক্ষমতা নাই যে তাহার কোন কাজে বাধা দিতে পারে। অণিমা যখন বাহির হইয়া আসিল, তখনই বৃদ্ধ বরদা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিয়াছিল। তিনি শান্ত হইলেন।

পুষ্করিণীর বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মত যে কচুরিপানা বসিয়াছিল, তাহা পরিষ্কার হইয়া গেলে পর অণিমা, বরদা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতখানি ধরিয়া কহিল, "লক্ষ্মী দাদুভাই,

দেখ দেখি একবার পুকুরটির দিকে তাকাইয়া! আর পথের পানেও তাকাও, বল ত' কেমন দেখাচ্ছে?"

বরদা বন্দ্যোপাধ্যায় কহিলেন, "তবে কি জানিস্ দিদিমণি আমার বাড়ীর সীমানাটা যে এইরূপ করলে রে অন্যায় করে! জানিস্ আমি চুপ করে থাকবো না, লাগিয়ে দিব এক নম্বর মোকদ্দমা ঐ তোদের সুব্রতবাবুর বিরুদ্ধে আর বুড়ো কবরেজের এই সাঙ্গোপাঙ্গোর দলকে।"

অণিমা কহিল, "দেখ দাদুভাই, সাবধান, যদি ও সব কিছু করতে যাবে, তবে আর কোন দিন তোমার কাছে আসবোনা বলে দিচ্ছি।"

বৃদ্ধ শান্ত হইয়া কহিল, "এতে কি আমাদের গ্রামের কোন ভাল হয়েছে?"

"নিশ্চয় হবে দাদুভাই। দশজনে মিলে যাই কোন কাজ করে, যদি সকলে মনে করে এ আমারই কাজ, একটি গ্রামকে মনে করে একই পরিবার, তা' হলে কি ভাল না হয়ে পারে? বল ত' দাদু! বলনা এই যে কবিরাজম'শায় তোমাকে রোগে ঔষধ দেন, অভাবে টাকা দেন, তোমার কোন অসুবিধা হ'লে ছুটে আসেন, কেন আসেন?"

"আসবে না কেন রে ভাই? আমরা যে ছেলেবেলা এক সঙ্গে খেলাধুলা করেছি, পড়াশুনা করেছি, আসবে না?"

"শুধু কি তাই? তাও নয়। তিনি মানুষের মত মানুষ বলে ছুটে আসেন। আর তুমি রাগ করো না, দাদুভাই এত বড় অকৃতজ্ঞ যে, যে কবিরাজম'শায় এতটা ভাল করেন, তুমি কি না, আজ তিনি নিজে এই বিদেশী একজন ভদ্রলোককে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন, তারি সামনে কি চীৎকার, কি হল্লা করলে, ঐ দেখ কবিরাজম'শাই ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন, যাও তাঁর কাছে ক্ষমা চাও। আর একবার নিজের চোখে চেয়ে দেখ ভাল করে পুকুরের দিকে, কেমন স্বচ্ছ কালো জল ছল্ ছল্ করছে! চেয়ে দেখ পথের দিকে— কি সুন্দর পথটি নদীর দিক্ হতে চলে এসেছে। আমাদের বাড়ীর শোভা কতই না বেড়ে গেছে! দেখ দেখি, নদীর বুক দিয়ে পাল তুলে কত নৌকা চলে যাচ্ছে, বারে বা! কি মজা!"

অণিমা তাহার দাদুভাইয়ের হাত ধরিয়া কবিরাজম'শায়ের কাছে টানিয়া লইয়া আসিল। বরদাকান্ত চলিতে চলিতে কহিলেন, "আমার যে বড় লজ্জা করে ভাই।"

"তোমার আবার লজ্জা! লজ্জা থাকলে কেউ মিছি মিছি চেঁচামেচি করে, লজ্জা থাকলে কেউ নিজের ভাল বোঝে না, দশজনের কল্যাণ বোঝে না? চলে এস।"

বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া কবিরাজের পাশে দাঁড়াইল।

অণিমা কহিল, "মাপ করবেন কবিরাজ দাদু! দাদুভাইকে ত' জানেন কি তিরিক্ষি মেজাজ!"

কবিরাজমহাশয় হাসিয়া কহিলেন, "কি ভাই বরদা, এমন করে কি লোক্ হাসাতে হয় রে ভাই! আমাকে তুই কি অপমানটাই না করলি!"

বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয় কবিরাজমহাশয়ের হাত ধরিয়া কহিলেন, "রাগ করিসনি ভাই! তবে তোরা যে বড় বে-আইনী কাজটা করে ফেল্লি, একেবারে তছরুপ করা, মাথা লঙ্ঘন, জানিস্ আমি যদি লাগিয়ে দিই এক নম্বর, তবে হু, তোদের বেশ ঘোল খাওয়াতে পারি।"

কবিরাজ লাঠীটা দিয়া মাটির উপর জোরে আঘাত করিয়া বলিলেন, "তা তুই পারিস্ বরদা। সত্যকে মিথ্যে করতে, আর মিথ্যেকে সত্যি বানাতে তুই অদ্বিতীয়, না না আর নিন্দে করবো না, কিন্তু একটা কথা বলি ভাই, ঐ যে পদ্মা, আমাদের গ্রাম থেকে মাত্র এক মাইল দূরে আছে, যখন গ্রামকে গ্রাম পদ্মার গর্ভে ডুবে যাবে, তখন মুন্সীগঞ্জ গিয়ে এক নম্বর মোকদ্দমা কেমন করে দায়ের করবে? কার বিরুদ্ধে বল ত'? কবিরাজের বিরুদ্ধে না পদ্মানদীর বিরুদ্ধে! বল ত' বরদা!"

"তা ত' বটেই। তবে কি জানিস ভাই, অর্থ মনটা বোঝে না। মাথার ভিতর কি যেন একটা আছে সে দিনরাত কেবল নানা দুষ্টবুদ্ধি জাগিয়ে দেয়!"

"এবার সেটাকে জব্দ কর।"

সকলে হা-হা করিয়া হাসিল।

অণিমা কহিল, "কবিরাজদাদু, তোমাদের দুই বুড়োর কাণ্ড দেখে হাসি পায়।—হাঁ, আমি নিলুম দাদুভাইয়ের ভার আর তুমি নাও গ্রামের আর সকলের ভার। আমার মায়ের এই জন্মভূমি, যে মাটিতে মা আমার জন্মেছিলেন, যে মাটিতে মা আমার খেলা-ধুলা করেছেন, যেখানে একদিন বিবাহ

উৎসবে সানাইয়ের রব ও বাদ্যি-বাজনার ভিতর দিয়ে—উজ্জ্বল আলোকে—আমার বাবার সাথে তাঁর হাতে হাত মিলেছিল, তারপর"—অণিমার চোখে জল আসিল—"এইখানে এই বকুল গাছের তলায়ই মা তার দেহ রক্ষা করেছেন, এ যে আমার মহাতীর্থ দাদু। তাই ত' এ গ্রামকে ভালবাসি। এই মাটিই যে আমার মায়ের স্মৃতিকে বক্ষে ধারণ করে আছে।"

অণিমা এমনি ভাবাবেগে এই কথাগুলি বলিয়াছিল যে সুব্রত, সুবোধ ও গ্রামের সব ছেলেদের মনে ও প্রাণে একটা বেদনার সুর জাগিয়া উঠিল।

সুব্রত অণিমার কাছে আসিয়া কহিল, আমি যে আপনাকে চাই।"

অণিমা চোখের জল মুছিয়া কহিল, "কেন বলুন ত' ?"

"আমার কাজে আপনাকেও লাগতে হবে।"

অণিমা হাসিয়া বলিল, "আমি কিন্তু কোঁদাল ধরতে জানি না—দা দিয়ে জঙ্গল কাটতেও পারবো না।"

"আমিই কি তা পারি। আর আপনি কোন আশঙ্কা করবেন না, আপনার কোঁদালও ধরতে হবে না বা জঙ্গলও কাটতে হবে না—আপনাকে শুধু মেয়েদের কাছে আমার আবেদন জানাবার ব্যবস্থা করতে হবে!"

অণিমা হাসিয়া বলিল, "ছেলেদের নিয়ে পড়েছেন তাই থাকুন, আবার মেয়েদের দিকে নজর কেন ?"

সুব্রত হাসিতে হাসিতে বলিল, "মেয়েদের না হ'লে কি কাজ হয়! এই দেখুন না, আপনি যদি আপনার দাদুকে না সামলাতেন, তা' হ'লে আজই আবার একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটে যেত!"

অণিমা প্রফুল্ল মনে কহিল, "কথাটা মিথ্যা বলেন নাই, দাদুর মাথায় মোকদ্দমার ফন্দী এমন খেলে যে ব্যারিষ্টার দেশবন্ধুও হার মানতেন বা হয় ত'। কোন ভয় করবেন না দাদুকে; আমি ঠিক হাল ধরে থাকবো।"

কবিরাজমহাশয় অণিমার দিকে চাহিয়া কহিল, "আজ সন্ধ্যেবেলা দাদুকে নিয়ে আসিস্, দু'একটা কীর্ত্তন শোনা যাবে তোর কাছে।"

"অমনি কি শোনাব ? বখশিস্ দিতে হবে যে!"

"তা' দোবরে দোব!"

সুব্রত কহিল, "চমৎকার ত'! বেশ আনন্দ হবে আজ, ট্র্যাজেডির পর কমেডি বেশ ত'!"

অণিমা অমনি সুর করিয়া গাহিল—

সই, কেমনে ধরিব হিয়া!
আমার বঁধুয়া   আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া।
সে বঁধু কালিয়া   না চায় ফিরিয়া
এমত করিল কে ?
আমার অন্তর   যেমন করিছে
তেমতি হউক সে।

কীর্ত্তনের মধুর সুরটি পল্লীর বনে বনে গুঞ্জরিয়া উঠিল, আজ সুব্রত হাসিমুখে ও প্রসন্ন মনে অনুভব করিল, তাহার এই অভিযান ব্যর্থ হইবে না। [ক্রমশঃ

সুর কোথা পাই

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস, এম্-এ, ব্যারিষ্টার-এট্-ল

সুর কোথা পাই অসুর রাজার
কামান বিমান দেয় ভরি',
নয়ন তুলে দেখ্‌বো কখন
'নবীন ধানের মঞ্জরী।
চিকণ-রোদে শীতের আমেজ
গন্ধ ছড়ায় তাত-রসের,
এরোপ্লেনের চক্র চলে
ছন্দে জাগে সুর ত্রাসের।

কোন্ বিহানে মাঠের পথে
ধানের ক্ষেতে যায় চাষী,
তরুণ-তপন সোণার ধানে
কখন ওঠে উদ্ভাসি'!

শত্রু-সেনা অলক্ষ্যেতে
বীরের পাশে দেয় হানা,
কখন বুনো-হাঁসের পাতি
যায় রে উড়ে নাই জানা।

খেজুরগাছে কখন গাছী
মিষ্টি সোঁদো-রস পাড়ে,
ষ্টেলিনগ্রাডের পতন বুঝি
আসন্ন কয় রয়টারে।
বিশ্বকবির অমর বীণায়
গুঞ্জরিত কোন্ বাণী—
'মেশিন গানের সম্মুখে থুই
যুঁইফুলের এই গানখানি।'



রেল্‌পথের ইতিবৃত্ত

বাণীকুমার

(প্রথম কথা)

রেল্‌গাড়ীর আজ উন্নত অবস্থা। কিন্তু এই উন্নতির প্রায় চরম সীমায় পৌঁছুবার অনেক আগে রেল্‌ওয়ের ক্রমবর্দ্ধন কি উপায়ে হোলো, সেই গোড়ার কথা জানা দরকার।

বহু বৎসর পূর্ব্বে এক বিশেষজ্ঞের মাথায় জাগলো রেল্‌-চলনের প্রথম উপায়। এই উপায়টি আবিষ্কারের পরে দেখা গেলো—কয়লাখনি থেকে জাহাজ-ঘাট পর্য্যন্ত মাল-ভর্ত্তি বড় বড় গাড়ীগুলো অনায়াসে লোকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে আন্দাজ এক ফুট চওড়া লাইন-করা রাস্তার ওপর দিয়ে। আবিষ্কারকের বুদ্ধির সকলে প্রশংসা করলে। কোনো যায়গায় পাতা হোলো কাঠের তৈরী লাইন, আবার কোনো কোনো স্থানে পাতা হোলো পাথরের একটা এক ফুট চওড়া লাইন। লাইন ক্ষ'য়ে গেলে মেরামতীতেও বেশী খরচ পড়তো না। কিন্তু এই উপায়ে একটু অসুবিধা লক্ষ্য করা গেলো যে, মাঝে মাঝে মাল-গাড়ীগুলো লাইন পিছ্‌লে মাটিতে প'ড়ে যায়। এর কোনো সুব্যবস্থা করা হঠাৎ সম্ভব হ'য়ে উঠ্‌লো না। তবে এই ভাবে কোনো রকমে কাজ চ'লে যেতে লাগ্‌লো। তারপরে দ্বিতীয় উন্নতির অবস্থা এলো। অনেক চিন্তা ও পরীক্ষার পর মালগাড়ী চালাবার অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ উন্নত ব্যবস্থা করা হোলো। এই উপায়ে পূর্ব্বের চেয়ে অল্প সময়ের মধ্যে মাল খালাস হ'তে লাগলো। এর আগে—পাথর কিংবা কাঠের চওড়া চওড়া লাইন যেমন ক্ষ'য়ে যেতো, কাজ শেষ করতে তেমনি সময় লাগতো, উপরন্তু গাড়ীগুলো লাইন থেকে পিছ্‌লে মাটিতে প'ড়ে যেতো। কিন্তু পেটা-লোহার পাতের লাইন ও দু'ধারে আটকাবার জন্য বাড়্‌তি নেমি ক'রে দেওয়াতে মালগাড়ীর আর পিছ্‌লে প'ড়ে যাবার আশঙ্কা রইলো না। এই উপায়ে কিছুদিন কাজ চ'লে গেলেও আরও উৎকর্ষের জন্য আবিষ্কারকের মাথা ঘেমে উঠলো। অনেক চিন্তার পর স্থির হোলো এই যে—দু'ধারে রীম-তোলা একটা লোহার পাতের লাইনের ওপর কাজ চালানোর চেয়ে—গাড়ীগুলোর চাকার দু'টি ধার লাইনে আটকাবার জন্য বাড়িয়ে দেওয়া দরকার,—আর চওড়া পাত পাতার বদলে দু'ধারে সমরেখায় সরু সরু গভীর রেল্‌ পাতলে কাজের অনেক সুবিধা হওয়া সম্ভব অল্প সময়ে পাওয়া যাবে বেশী কাজ, ও ব্যয়ের অঙ্কটা কমের দিকেই যাবে—কারণ এ ক্ষেত্রে লোহার দরকার হ'বে আরও কম। এই ভাবে লাইন পাতবার ব্যবস্থা করা হোলো, গাড়ীর চাকা দু'টি প্রান্ত সামান্য বাড়িয়ে দেওয়া হোলো—মাঝখানটা লাইনের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গ'ড়িয়ে চলবার এই নূতন সংস্কৃত উপায়ে রেল্‌লাইন পাতবার ব্যবস্থা করা হোলো, আর গাড়ীর চাকার দু'টি প্রান্ত সামান্য বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য নেমি তৈরী করতে কারখানায় অর্ডার দেওয়া হোলো। এই ভাবে গাড়ীতে চক্রনেমি তৈরী ক'রে কাজ চালাতে লাইন ভাঙলো খুব কম, আর সে জন্য ক্ষতিও বেশী সইতে হোলো না। সরু রেল্‌লাইনের ওপর দিয়ে গাড়ী চলাচল সহজ উপায়েই হ'তে লাগলো। লক্ষ্য করা যায়—এই প্রণালীরই পরিণতি রেল্‌ওয়ে। প্রথমে পাথরের বা কাঠের এক ফুট লাইন-রাস্তা পাতার অবস্থা থেকে লৌহ-পাতের লাইন রাস্তার অবস্থায় উন্নত হোলো, তারপরে সামান্য ব্যবধানে একজোড়া লোহার রেল্‌ পাতার ব্যবস্থায় এসে পৌঁছে গেলো।

আজকের যে রেল্‌ওয়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয়, তা'র গোড়া পত্তন কয়লা-খনির ছোট ছোট ঘোড়ায় টানা রেল্‌ওয়ে থেকে। কিন্তু এই রেল্‌গাড়ীর বহুল প্রচলনের আরও গোড়ার কথা আছে। কেমন ক'রে আর কোন্‌ সময়ে

পৃথিবীতে রেলওয়ের প্রথম প্রবর্ত্তন হোলো—সেই ইতিহাস টুকু এখানে বলা উচিত। জর্জ্জ ষ্টীফেন্‌সন্‌-উদ্ভাবিত "রকেট্‌" নামক বাষ্পীয় শকট দেখে ইংল্যাণ্ডবাসীরা একদিন উল্লাসের চীৎকার তুলেছিল। ষ্টীফেন্‌সন্‌ এই নব-নির্ম্মাণের জন্ম উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছিলেন কি উপায়ে—সে সম্পর্কে একটি ঘটনা জানা যায়। একদিন ষ্টীফেন্‌সন্‌ ও তাঁর বন্ধু লক্ষ্য করলেন, বাষ্পচালিত একটি যান। তাঁদের মধ্যে তখন যে আলোচনা হয়েছিল—সেইটি সংক্ষেপে এখানে দেওয়া গেলো।......

"ঐ ট্রেন্‌ কেমন ক'রে চলছে বন্ধু?"

"লক্ষ্য করো ষ্টীফেন্‌, ঐ এঞ্জিন ট্রেনকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।"

"কিন্তু এঞ্জিন কা'র জোরে চলছে?"

"অবশ্য বাষ্পের জোরে এঞ্জিনের এ-শক্তি আসে।"

"আর বাষ্প কী উপায়ে তৈরী হয়?"

"কয়লা বাষ্প তৈরী করে।"

"ওঃ—তাই বটে! কিন্তু কয়লার জন্মদাতা কে?"

"তুমিই বলো না—ষ্টীফেন্‌সন্‌?"

"আমার প্রশ্নের আমিই উত্তর দোবো, সূর্য্যরশ্মিই কয়লার জনক। সত্য কি না?"

"ষ্টীফেন্‌, এ খুব খাঁটি কথা। সূর্য্যের উত্তাপে চিরদিনই বাষ্প তৈরী হ'য়ে আসছে। সেই বাষ্পকে কার্য্যকরী করবার জন্যে অনেক মনীষী বৈজ্ঞানিক অনেক গবেষণা ক'রে আসছেন। শেষকালে ঐ কয়লা আর জলেরই সাহায্য নিতে হয়েছে।"

"কিন্তু আজ এই সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে একটা প্রচেষ্টা আসা উচিত, বাষ্পকে মানুষের ব্যবহারিক কাজে লাগাবার অদম্য উদ্যম চাই।"

"দু'চারজন কর্ম্মী এরি মধ্যে এ-চেষ্টায় লেগে গেছেন।"

"আমি ব'লে রাখছি—বন্ধু, এই বাষ্প একদিন অসাধ্য-সাধনে মানুষের সহায় হ'য়ে দাঁড়াবে। আমি এমনি একটি বাষ্প-চালিত এঞ্জিন তৈরী করবো—যা'র ত্বরিত গতিবিধি দেখে সকলে বিস্মিত হ'য়ে যাবে।"

"তাই যদি করতে পারো, মানব-জাতির অশেষ উপকার ও সুবিধা এনে দেবে।"

সেইদিন থেকে ষ্টীফেন্‌সনের অদম্য চেষ্টা আরম্ভ হোলো। এদিকে দু'চারজন কৃতী ব্যক্তির চেষ্টাতে রেলওয়ে যানের ক্রমোন্নতি হ'তে লাগলো। এই ক্রমবর্দ্ধনের গৌরব নিতে চান অনেকে। কিন্তু কর্ণোয়াল্‌-বাসী রিচার্ড টেভিথিক্‌ সর্ব্বপ্রথম রেলওয়ে-যান নির্ম্মাণের প্রশংসা দাবী করতে পারেন। এই যানটি দক্ষিণ ওয়েল্‌স্‌-এর মার্থার টিড্‌ভিলের কাছে একটি খনির ট্রাম-লাইনে ১৮০৪-এর ১৫ই ফেব্রুয়ারীতে চালানো হোলো। রিচার্ড-নির্ম্মিত গাড়ীখানি দেখতে ছিল কিস্তূতকিমাকার, আর তা'র গতি বেশীদূর ছিল না। ন'মাইল স্বচ্ছন্দে যাওয়া যেতো, ও দশ টন্‌ লোহা, আর তা'র ওপর সত্তরটি আরোহী-সমেত এ ট্রেনকে টেনে নিয়ে যেতে পারতো রিচার্ডের ক্ষুদ্রাকৃতি বাষ্পীয় যানটি। কিন্তু একদিন এই ভারে লোহার রেল্‌ ভেঙ্গে গেলো। সেই থেকে প্রত্যেক ওয়েলস্‌-বাসীকে সতর্ক ক'রে দেওয়া হোলো এই ব'লে যে—এইরকম যানে কেউ যেন না বিপদ ঘাড়ে ক'রে উঠতে চেষ্টা করে।

রিচার্ডের নব-নির্ম্মিত বাষ্পীয়-যানের মধ্যে বর্ত্তমানের কল-কব্জার সমস্ত মুখ্য ও আসল ব্যবস্থা ছিল। এর পরের বিকাশ জানতে হ'লে ইংল্যাণ্ডের উত্তরদিকে যেতে হ'বে। সেখানে ব্লেন্‌কিন্‌সপ্‌, হেড্‌লে ও জর্জ্জ ষ্টীফেন্‌সন্‌ পরের পর কয়লা-বহনের গাড়ী টানবার জন্য বাষ্পীয়-শকটের উন্নতি সাধন করলেন। ১৮২৫-এ সর্ব্বসাধারণের জন্য প্রথম বাষ্প-চালিত রেলগাড়ী প্রবর্ত্তিত হোলো—ষ্টক্‌টন্‌ ও ডার্লিংটনের মধ্যে। এই হোলো জগতের সর্ব্বপ্রথম জনসাধারণের যাতায়াতের জন্য রেলওয়ে। এই রেলওয়ে ২৮ মাইল রাস্তা দীর্ঘ ছিল; একটিমাত্র লাইন-পথ হোলো, আর গাড়ী সিকি মাইল অন্তর স্থানে স্থানে সামান্যক্ষণ দাঁড়িয়ে আবার পার হ'য়ে যেতো।

১৮২৯ লিভারপুলের কাছে রেণহিল্‌ নামক স্থানে বাষ্পীয় রেল্‌-যান নির্ম্মাতাগণের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা আয়োজিত হোলো। বিস্মিত দেশবাসীগণ নির্দ্দিষ্ট দিনে জনতা ক'রে এসে দাঁড়ালো। প্রথমে ছুটে এলো একটি এঞ্জিন—ঠিক ঠেলাগাড়ীর মত দেখতে, গড়নটা অনেকখানি ময়লা ফেলা টবের মত, আর যেন মাথার ওপর একটা খোঁদা জগ বসানো—নাম "এক্সপেরিমেণ্ট।" দ্বিতীয়টি প্রবেশ করলে, দেখতে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুদৃশ্য, স্বয়ং জন্‌ ব্রেথ্‌ওয়েট্‌ চালিয়ে নি

এলেন এঞ্জিনটিকে—নাম তা'র "নভেলটি।" তৃতীয় এঞ্জিন—"স্যান্সপেরীল্" টীমুথী হ্যাক্ওয়ার্থ কর্ত্তৃক চালিত হ'য়ে এগিয়ে এলো। পূর্ব্ববর্ত্তী দু'টি এঞ্জিনের চেয়ে দেখতে এটি আরও চমৎকার, তদুপরি এই এঞ্জিনের কল-কব্জার সাজ-সরঞ্জাম ছিল অনেকাংশে উন্নত। সর্ব্বশেষে প্রবেশ করলে জর্জ্জ ষ্টীফেন্‌সনের এঞ্জিন "রকেট"। এটি নির্ম্মানে-গঠনে সকলকে পরাজিত করলে। সকলের সেরা এঞ্জিন "রকেটে"র নির্ম্মাতা জর্জ্জ ষ্টীফেন্‌সনকে পাঁচশত পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হোলো। প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হোলো "স্যান্সপেরীল্।" "রকেট" ও "স্যান্সপেরীল্" নামক দু'টি এঞ্জিন লণ্ডনের দক্ষিণ কেন্‌সিংটনের মধ্যবর্ত্তী বিজ্ঞান-সংগ্রহাগারে রক্ষিত হোলো। অনাগত যুগের জন্য বাষ্পীয়যানের এই অপূর্ব্ব নমুনা দু'টি তোলা রইলো।

এর পর থেকে উত্তম বাষ্পীয়-যান প্রস্তুত করবার বিশেষ উৎসাহ দেখা গেলো। জর্জ্জ ষ্টীফেন্‌সন্ ব্রাসেল্‌টন্ থেকে ষ্টক্‌টন্ পর্য্যন্ত প্রায় নব্বুই টন্ ওজনের প্রথম ট্রেন চালিত করেন। কয়েক বৎসর ধ'রে জন-বহনের জন্য ঘোড়ায় টানা গাড়ী চালানো হোতো, কিন্তু সে-ব্যবস্থা ১৮৩৩-এ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্জ্জিত হয়। আরও পূর্ব্বে অনেক লাইন খোলা হয়েছিল—জানা যায়। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে ম্যান্‌চেষ্টার ও লিভারপুলের মধ্যে যে রেল্‌ওয়ে খোলা হয়, সেটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই রেল্‌ওয়েকে, সেই যুগ বিবেচনা করলে, অসাধারণ আখ্যা দেওয়া যায়, কারণ গোড়া থেকেই গুরুভার মাল্ টেনে নিয়ে যাবার শক্তি এই বাষ্পীয় রেল্‌গাড়ীর বর্ত্তমান ছিল, আর এই বাষ্পীয় যন্ত্র শুধু যে জন-সাধারণ-যাত্রী-বহন-পটু ছিল—তা' নয়, মাল-পত্র ও খনিজ পদার্থ বহন করবার শক্তিও এর ছিল। এই রেল্‌ওয়ে ১৮৩০-এর ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে খোলা হয়—৩১ মাইল দীর্ঘ পথ, সারা পথে ছিল জোড়া লাইন, আর একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন সমস্ত রাস্তাটি সম্পূর্ণ করতে পারতো প্রায় নব্বুই মিনিটের মধ্যে। সেদিন গড়পড়তায় ভাড়া ধার্য্য হ'য়েছিল প্রতি জনের ওপর পাঁচ শিলিং (প্রায় তিন টাকা বারো আনা) ক'রে।

কিন্তু রেল্‌লাইন নির্ম্মাণ-কার্য্যে বহু বাধা অতিক্রম ক'রে যেতে হোলো। স্থানীয় জমিদাররা বিশেষ আপত্তি তুললেন। পয়ঃপ্রণালীর স্বার্থে ও স্বত্বে আঘাত লাগার দরুণও অত্যন্ত প্রতিবাদ এলো, উপরন্তু যায়গার দাম ন্যায্য দামের চেয়ে অনেকগুণে বর্দ্ধিত হোল। তথাপি এই সমস্ত বাধা সত্ত্বেও দেশে রেল্‌ওয়ে প্রবর্ত্তনের কোন বিরতি ঘটলো না। আর একটি হঠাৎ বাধা এলো। তদানীন্তন লিভারপুলের পক্ষ-সমর্থিত পার্লামেন্টের সদস্য হাস্‌কিসন্ একটা এঞ্জিনে চাপা প'ড়ে প্রাণ হারালেন। তখন এই বিপৎপাতের জন্য কার্য্যের গতি কিঞ্চিৎ স্তব্ধ হ'য়ে গেলেও রেল্‌ওয়ের বিস্তার মধ্যপথে থেমে গেলো না। কারণ রেল্‌গাড়ীর পত্তনে দেখা গেলো যে—ব্যবসায়-বাণিজ্যে অশেষ সাফল্য ও সুবিধা-সুযোগ লাভ করা যায়। এর ফলে রেল্‌ওয়ে প্রসারের জন্য দেশের যাঁরা মাথা, তাঁরা সকলেই বিশেষ মনোযোগী হ'য়ে উঠলেন,—শুধুমাত্র গ্রেট্‌ব্রিটেনে নয়, ইউরোপের সকল দেশে, ও উত্তর আমেরিকায়—সকলেই এই কার্য্যে ব্রতী হোলো। ৪ ফিট—৮½ ইঞ্চির গেজে রেল্ পাতা হোলো দেশে দেশে। এইটুকু রেল্‌ওয়ের ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এখন সর্ব্বদেশে রেল্‌পথের ও রেল্-যানের অপ্রত্যাশিত উন্নতি সাধিত হয়েছে। কত বৈচিত্র্য আনা হয়েছে, কত অসম্ভবকে সম্ভব করা হয়েছে, তা' গণনা করা যায় না।





গৃহিণী

জনৈক গৃহী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(৬) মিতব্যয়িতা ও ব্যয়সঙ্কোচ—এই বিষয়েই পাকা গৃহিণীর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। আয় বুঝিয়া ব্যয় করা উচিত—এই সূত্রটি প্রত্যেক গৃহিণীর হৃদয়ঙ্গম ও তদনুসারে কার্য্য করা বিধেয়। যে-সংসারের আয় মাসিক বেতনে বা মাসহারায় সীমাবদ্ধ, সে-সংসারের কর্ত্রী আয়ের ও পরিজনের অনুপাতে অনুমিত ব্যয়ের তালিকা অর্থাৎ বাজেট বা এষ্টিমেট মাসের প্রথম দিনে বা পূর্ব্ববর্ত্তী মাসের শেষদিনে প্রস্তুত করিলে ভাল হয়। যেথানে আয় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট, সেখানে বাজেট প্রস্তুত করা এবং গৃহিণীপনা অপেক্ষাকৃত সহজ। যে-সংসারে মাসিক আয় নির্দ্দিষ্ট নহে, যেমন উকীল, ডাক্তার ও অন্যান্য ব্যবসায়ীর সংসার, সেখানেই গৃহিণীর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়, কারণ ইঁহাদের আয় কোন মাসে অধিক, কোন মাসে অল্প হইতে পারে। ইঁহাদের উপার্জ্জন "কাঁচা পয়সা রোজগার" কথিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রেও ব্যয়ের এষ্টিমেট প্রস্তুত করা উচিত। মাস বিশেষের আয় হইতে সে-মাসের ব্যয়সঙ্কুলান না হইলে পূর্ব্ব মাসের উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে খরচ চালাইতে হয় এবং পরবর্ত্তী যে-মাসে আয় অধিক হইবে তাহা হইতে তৎপরিমাণ টাকা কাটিয়া উদ্বৃত্ত অর্থভাণ্ডারে পুনর্ব্বার জমা দিতে হয়। ঐ-টাকা অর্থভাণ্ডার হইতে ঋণস্বরূপ গ্রহণ করা হইয়াছিল এইরূপ মনে করা হইয়াছিল, এইরূপ মনে করিতে হয়। যেখানে "কাঁচা পয়সা রোজগার", সেখানে ব্যয় সম্বন্ধে গৃহিণীর যথেষ্ট আত্ম-সংযমের প্রয়োজন, নচেৎ আয় যেমন অনির্দ্দিষ্ট, ব্যয়ের বিষয়েও সেইরূপ শিথিলতার আবির্ভাব হইবে। মাসিক বাজেট প্রস্তুত করিবার সময় আয়ের কিয়দংশ সঞ্চয়ের জন্য পৃথক ভাণ্ডারে অর্পণ ও রক্ষা করা উচিত। এ-বিষয়ে যাহা বক্তব্য তাহা বাজেট-শীর্ষক অংশে বিবৃত হইবে। কথিতরূপে বাজেট প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

(ক) খাদ্য—পুষ্টিকর অথচ লঘুপাক হওয়া আবশ্যক। ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে সংসারভুক্ত পরিজনের মধ্যে কাহার কী-প্রকার ও কী-পরিমাণ আহারে পরিতৃপ্তি হয় তাহা গৃহিণীর বিদিত। বাঙ্গালীর গৃহে ভাত সর্ব্বপ্রধান দৈনিক খাদ্য। কেহ কেহ দুইবেলাই ভাত খাইয়া থাকেন, কেহ কেহ পূর্ব্বাহ্নে বা মধ্যাহ্নে ভাত খান এবং রাত্রিকালে লুচি, পরোটা বা রুটী আহার করেন। বাজারের ঘৃতের যেরূপ অবস্থা, লুচি বা পরোটা না খাইলেই ভাল হয়। গৃহে যে ব্যঞ্জনাদি বা মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রস্তুত হইবে তাহার পরিমাণ এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে সকলে কিছু কিছু অংশ পায়। প্রত্যেকদিন বা বেলায় একই রকমের খাদ্য প্রস্তুত না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রকমের করা ভাল। ক্রমাগত "থোড়-বড়ি খাড়া" ও "খাড়া-বড়ি-থোড়" ভোক্তার রুচিসঙ্গত হইতে পারে না। যে-খাদ্য রুচিবিরুদ্ধ বা যাহা পূর্ণ রুচির সহিত খাইতে পারা যায় না তাহা কার্য্যকর বা ফলোপধায়ক হইতে পারে না, বরং তাহা হইতে অজীর্ণতার উদ্ভব হইতে পারে। বেলা নয়টা ও রাত্রি নয়টার মধ্যে রন্ধনকার্য্য সম্পন্ন হইলে ভাল হয়।

সাধারণতঃ অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সংসারে আমিষ-ভোজী পরিজনের জন্য পূর্ব্বাহ্নে ডাল, ভাতে পোড়া, চচ্চরী বা ভাজা, মাছের ঝোল ও ঝাল এবং অম্বল প্রস্তুত হয়; ইহার উপর কোনদিন শুক্ত, কোনদিন ডালনা বা অন্য কিছু হয়। রাত্রিকালে ডাল, ডালনা, ভাজা, মাছের ঝোল বা কালিয়া ও চাটনি হয়। সপ্তাহে একদিন বা দুইদিন মাংস রন্ধনও হয়, অবশ্য যে-বাটীতে মাংস নিষিদ্ধ নয়। মাংসের পরিবর্ত্তন

সম্ভব নয়, কারণ, যদিও কোন কোন বাড়ীতে খাসী ও ভেড়ার মাংস চলিয়া যায়, অধিকাংশ হিন্দুর গৃহে পাঁঠার মাংস মাত্র চলে। অপেক্ষাকৃত অবস্থাহীন গৃহস্থের গৃহে ডাল, ভাজা বা চচ্চড়ী এবং মাছের ঝোল বা ঝাল বা অম্বল—ইহার অধিক খাদ্য সংস্থান হইয়া উঠেনা। মুগ, মুস্থরী, অরহর, ছোলা ও কলাই এই পাঁচ প্রকার ডাল সাধারণতঃ খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়; মটর ও খেঁসারীর ডালে বড়ী দেওয়া হয় কিন্তু এ-দুইটি ডাল কদাচিৎ কোন বাটীতে খাওয়া হয়। যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত পাঁচরকম ডালেই উহাদের রকম-ফের সহজসাধ্য। আলু একবেলাও বাদ দেওয়া চলে না। গৃহিণীর কর্ত্তব্য রাত্রিকালে পরবর্ত্তী দিবসের খাদ্য-তালিকা প্রস্তুত করা এবং তদনুসারে বাজারের ফর্দ্দ লিখাইয়া দেওয়া। খাদ্য এরূপ পরিমাণে প্রস্তুত করা উচিত যাহাতে সংসারের সকলেই পর্য্যাপ্ত আহার পায়—মায় চাকর-বাকর—অথচ কোন দ্রব্যের অপচয় না হয়। গৃহে পাচক থাকিলে ভাণ্ডার হইতে হিসাবমত রন্ধনোপযোগী জিনিষ বাহির করিয়া দেওয়া গৃহিণীর কার্য্য—কতক পাচককে কতক যে ঝি বা চাকর মসলা পিষিবে তাহাকে। গৃহিনীর নিজের শাক-সবজী কুটিবার সময় না থাকিলে যিনি কুটিবেন তাঁহাকে হিসাবমত তরকারী বাহির করিয়া দিতে হইবে। পরিবেশনকার্য্য পাচকের হাতে থাকিলেও কী-পরিমাণ খাদ্য কাহাকে পরিবেশন করিতে হইবে তাহা বলিয়া দেওয়া এবং থালা ও বাটীতে খাদ্য গুছাইবার সময়ে রন্ধনশালায় উপস্থিত থাকিয়া দেখিয়া লওয়া গৃহিণীর কর্ত্তব্য, নচেৎ অপচয়ের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। যদি এক যায়গায় একসঙ্গে সকলে খাইতে বসে সে যায়গায়ও স্বয়ং গৃহিণী (যদি ফুরসদ থাকে) অথবা তাঁহার নিয়োজিতা কোন কন্যা বা পুত্রবধূর উপস্থিতি আবশ্যক। বিশেষতঃ যখন বালক-বালিকাগণ খাইতে বসে তখন এইরূপ একজনের উপস্থিতি নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সকলে একত্র খাইতে বসিলে পরিদর্শন কোন না কোন বর্ষীয়সী রমণীর করনীয়, কারণ, ভাসুরের বা মামাশ্বশুরের ভোজনকালে ভ্রাতৃবধূ বা ভাগিনেয়বধূ কোন সাহায্য করিতে পারিবেন না। কাহারও ভোজনকালে এমন কোন রমণীর উপস্থিত থাকা উচিত যিনি ভোক্তার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন।

কোন্ খাদ্য পুষ্টিকর এবং কোন্ খাদ্য গুরুপাক বা লঘু-পাক, বহুদর্শিতার ফলে অধিকাংশ গৃহিণী ইহা অল্প-বিস্তর অবগত আছেন। তথাপি কোন্ কোন্ খাদ্যদ্রব্যে কী-পরিমাণ protein বা vitamin বা starch বা sugar অথবা কী-পরিমাণ carbohydrate আছে জানা থাকিলে গৃহিণীর কার্য্যের অনেক সুবিধা হয় এবং সারা সংসার উপকৃত হয়। গৃহিণীকে এ-বিষয়ে শিক্ষাপ্রদান কর্ত্তার বা পরিবার-ভুক্ত অপর যে-ব্যক্তি এতৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তাঁহার কর্ত্তব্য।

শিশুদের খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন। যে-শিশুর দন্তোদ্গম হয় নাই তাহাকে তরলখাদ্য (liquid food) খাওয়াইতে হয়, কোনরূপ কঠিন খাদ্য (solid food) তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ। তাহার খাদ্য—দুগ্ধ এবং সাগু, বার্লি বা তদনুরূপ দ্রব্য। শিশুকে খাঁটী দুধ না খাওয়ানই ভাল, দুধের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে সাগু বা বার্লি মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইতে হয়। সাগু ও বার্লি উত্তমরূপে সিদ্ধ করা উচিত। পরিপাক শক্তির ন্যূনতা বা অভাব থাকিলে শিশুকে কেবলমাত্র জলসাগু বা জলবার্লি খাওয়ান উচিত। পাঁচজনকে লইয়া যে সংসার সেখানে গৃহিনীর কর্ত্তব্য উল্লিখিত বিষয়ের প্রণিধানপূর্ব্বক শিশুদের খাদ্য তাহাদের জননিদিগের মধ্যে বিতরণ। শিশুদিগকে খাওয়াইবার নির্দ্দিষ্ট সময় এবং নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বা মাত্রা থাকা আবশ্যক। খাদ্যের মাত্রাধিক্য হইলে শিশুরা অসুস্থ হইয়া পড়িতে পারে। অধিক পরিমাণে দুগ্ধ খাওয়াইলে সহজেই শিশুর যকৃতের দোষ জন্মিতে পারে। প্রথম প্রথম মাতৃস্তন্যেই শিশুর ক্ষুধা-নিবৃত্তি ও পুষ্টিসাধন হয়। যখন হইতে মাতৃস্তন্য ক্রমশঃ অল্পতাপ্রাপ্ত হয় এবং শিশুর বয়স বাড়িতে থাকে তখন হইতে অন্য খাদ্যের প্রয়োজন হইতে থাকে এবং সম্যকরূপে হিসাব করিয়া শিশুকে সে-খাদ্য খাওয়াইতে হয়।

বাড়ীর যে-সকল বালক-বালিকা বিদ্যালয়ে যায় তাহাদিগকে টিফিনের ছুটীর সময় কিছু খাওয়ান আবশ্যক। যদি স্কুল বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হয় এবং চাকর-বাকরের সুবিধা থাকে তাহা হইলে কিছু দুগ্ধ ও বড়জোর একটা মিষ্টি পাঠাইলেই হইবে। যদি চাকর পাঠাইবার সুবিধা না থাকে তাহা হইলে বালকবালিকাদের সঙ্গে কিছু খাবার দেওয়া আবশ্যক। থার্ম্মোফ্লাস্ক (Thermos flask) থাকিলে তাহাতে দুগ্ধ দেওয়া ভাল, কারণ তাহা হইলে দুগ্ধ গরম

থাকে এবং বালকবালিকাগণ অনায়াসে, বরঞ্চ উল্লাস ও উৎসাহ সহকারে বহিয়া লইয়া যাইতে পারে। ঠাণ্ডা দুধ না খাওয়াই উচিত। এরূপে দুগ্ধ দিবার সুবিধা না হইলে গৃহে প্রস্তুত কোন খাবার দেওয়া আবশ্যক। উহাদের হাতে পয়সা দিতে নাই, দিলে কী কিনিয়া খাইবে তাহার স্থিরতা নাই। বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া আসিবার পরে বালক-বালিকাদিগের আরও কিছু খাদ্যের প্রয়োজন হয়। সে-সময়ে খাদ্যের রকম ও মাপ হিসাব করিয়া উহাদিগকে খাইতে দেওয়া উচিত, কারণ রাত্রি নয়টার মধ্যে উহাদিগকে পুনর্ব্বার খাওয়াইতে হইবে। বালকবালিকাদিগকে আহার্য সম্পর্কে অধিক স্বাধীনতা দেওয়া অকর্ত্তব্য এবং স্বেচ্ছাচারিতা দমনীয়। যাহাতে তাহারা বেলা নয়টায় ও রাত্রি নয়টায় খাইতে পায় সে-চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বেলা এগারটা এবং রাত্রি এগারটার মধ্যে সংসার চুকিয়া যাওয়া বাঞ্ছনীয়।

গৃহে প্রস্তুত খাদ্যই জলযোগের পক্ষে প্রকৃষ্ট। বাজারের খাবার আপাতমধুর বা মুখরোচক হইলেও অবশেষে ইহা হইতেই অম্লরোগ, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। বাজারের খাবার খাইতে হইলে সন্দেশ ভিন্ন অন্য কিছু খাইতে নাই। গৃহে প্রস্তুত হইলে অল্প ব্যয়ে স্বাস্থ্যকর অথচ পুষ্টিকর জলযোগের ব্যবস্থা হইতে পারে। যে পরিমাণ খাবার বাজার হইতে কিনিতে গেলে অন্যূন একটাকা খরচ হয় সেই পরিমাণ খাবার গৃহে প্রস্তুত করিলে আট-দশ আনার অধিক লাগে না। হালুয়া ও মোহনভোগ অতি পুষ্টিকর খাদ্য অথচ আদৌ আয়াসসাধ্য নহে। বাজারে সাধারণতঃ যে হালুয়া বিক্রয়ার্থ থাকে তাহা কী ভাবে ও কোন্ কোন্ উপকরণ দ্বা। প্রস্তুত তাহা জানিলে অনেকেই সে হালুয়া খাইতে চাহিবেন না। বাজারের তথাকথিত ঘৃতপক্ক বা তৈলপক্ক খাবার অপেক্ষা মুড়ি ও চিঁড়া অনেক ভাল। মুড়ি নারিকেল সহযোগে সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। ভিজানো চিপিটক অন্যান্য উপকরণের সহযোগে উত্তম খাদ্যে পরিণত হয়। অনেকে মুড়ি খাইতে অপমান বোধ করেন। তাঁহাদের ধারণা কেবল গরীব লোকেই মুড়ি খায় এবং কেহই অন্যের কাছে গরীব প্রতিপন্ন হইতে প্রস্তুত নহেন। এ ধারণা যে নিতান্ত ভ্রান্ত ইহা বলাই বাহুল্য। সুদূর পল্লীগ্রামে "বাজারের খাবারের" বড় বালাই নাই বলিয়া সেখানে অম্লরোগ ও ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার তেমন প্রাদুর্ভাব নাই। সেখানে প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থই গাভী পোষণ করেন। বলাবাহুল্য দুধ হইতে অনেক প্রকার উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হইতেও পারে। কিছুকাল পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে সাধারণ গৃহস্থের গৃহে মুড়ি ও নারিকেল বা মুড়ি ও গুড় জলযোগের উপকরণ ছিল। যদি ম্যালেরিয়ার প্রকোপ না থাকিত, পল্লীগ্রামের অধিবাসিগণ "বাজারের খাবারের" অভাবে চিরজীবন স্বাস্থ্যবান থাকিতে পারিত। আসল কথা, স্বাস্থ্যকর অথচ পুষ্টিকর খাদ্য মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং সেরূপ খাদ্য যাহাতে অল্প ব্যয়ে আহরণ করা যাইতে পারে সেদিকে দৃষ্টি থাকা আবশ্যক।

সংসারভুক্ত যে যে ব্যক্তিকে সারাদিন কর্ম্মস্থলে থাকিতে হয় তাঁহাদের জন্য জলখাবার বাঁধিয়া সঙ্গে দিতে হয়। জলখাবার কিরূপ হওয়া উচিত তাহা বলা হইয়াছে; পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

(খ) ভাণ্ডার—গৃহিণীর নিজের আয়ত্তে বা হস্তে থাকা উচিত। পাচক-পাচিকা বা দাস-দাসীর হস্তে গুছাইবার সাহায্য গ্রহণ ভিন্ন ভাণ্ডারের ভার প্রদান সমীচীন নহে। জিনিষপত্র চুরি হইতে পারে এরূপ সন্দেহে ইহা বলিতেছি না। ঘৃত, তৈল ও মসলাদির বিষয়ে পাচকের বিশেষ দুর্ব্বলতা থাকে এ-কথা বোধ হয় সর্ব্বজনবিদিত। সে মনে করে অধিক পরিমাণে ঘৃত, তৈল ও মসলা প্রয়োগ করিলে ব্যঞ্জন অধিক সুস্বাদু হয়, কাজেই নিজের হাতে লইবার সুবিধা পাইলেই সে এই সকল দ্রব্য অধিক পরিমাণে ভাণ্ডার হইতে বাহির করিবে। চাউল, ডাইল, আটা, ময়দা বাহির করিবার সময় সে সতর্কতার সহিত মাপিয়া লইবে এরূপ আশা করা যায় না; ইহার অন্যতম কারণ এই যে, পাচক মনে করে যদি অবশেষে খাদ্যের অপ্রতুল হয়, সে সেই দোষের ভাগী হইবে। ঘৃতাদি অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করিলেও পাচকের হস্তে পক্ক ব্যঞ্জনাদি যে আশা ও ব্যয়ের অনুরূপ স্বাদযুক্ত হয় না তাহার অন্যতম কারণ এই যে, শীঘ্র শীঘ্র রন্ধন-সমাপ্তির উদ্দেশ্যে সে কয়লা অত্যাধিক পরিমাণে পোড়ায় অথচ প্রবল তাপে রন্ধন করিলে ঘৃত ও তৈল অনেকাংশে নিষ্ফলভাবে পুড়িয়া যায়, ব্যঞ্জনের স্বাদবৃদ্ধি হয় না। অত্যধিক তাপে সিদ্ধ হইলে কোন দ্রব্যই স্বাদু হয় না। তাই গৃহিণী নিজে ভাণ্ডার হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য বাহির করিয়া দিবেন, নচেৎ জা অথবা

পুত্রবধূর হস্তে ভার দিবেন। কন্যা ও পুত্রবধূকে যেমন সংসারের কার্য্য শিখাইবেন, গৃহিণী সেইরূপ ছোট জাকেও শিক্ষিত করিয়া তুলিবেন।

ভাণ্ডারস্থ কোন দ্রব্যের কোন কারণে অধিক খরচ হইয়া গেলে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হইবার দুই এক দিন পূর্ব্বে সংসারের কর্ত্তাকে জানান উচিত। ভাণ্ডার সুচারুরূপে গুছাইয়া রাখিলে এবং স্বহস্তে জিনিষ বাহির করিয়া দিলে কোন্ জিনিষ কখন্ আনা আবশ্যক গৃহিণী সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

(৮) পরিচ্ছন্নতা—শয়নকক্ষ ও রন্ধনশালার পরিচ্ছন্নতার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সমস্ত অন্দরবাটীর পরিচ্ছন্নতার দিকে গৃহিণীর দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। এ বিষয়ে দৃষ্টিরক্ষা এবং গৃহিণীকে সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করা গৃহস্বামীর কর্ত্তব্য।

স্বহস্তে এতগুলি-কার্য্যসম্পাদন গৃহিণীর পক্ষে সম্ভবপর নয়। তিনি জা ও পুত্রবধূগণকে সকল প্রকার কার্য্য শিখাইয়া নিপুণা করিয়া তুলিলে, কাজগুলির অধিকাংশ তাহাদের মধ্যে বিতরণ করিতে পারেন। এরূপ করিলে গৃহিণীর নিজের হাতের কাজ কমিয়া যাইতে পারে এবং তাঁহার কার্য্যভারের লাঘব হয়।

(৯) মাসিক বাজেট—ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি প্রত্যেক মাসকাবারে পরবর্ত্তী মাসে কি কি ব্যয় আবশ্যক হইতে পারে বিচার করিয়া একটি হিসাব বা তালিকা প্রস্তুত করিলে কার্য্যসম্পাদনের বহুতর সুবিধা হয়। কর্ত্তা ও গৃহিণী উভয়ে মিলিয়া এইরূপ বাজেট প্রস্তুত করা উচিত, কারণ, কর্ত্তার হাতে আয় এবং কর্ত্রীর হাতে ব্যয়। আয়ের পরিমাণ অনুসারে ব্যয়ের তালিকা প্রস্তুত করিতে হয়। আয়ের অধিক ব্যয় করা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ তাহা করিলে গৃহস্থ ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িবেন। এরূপ হিসাব করিয়া ব্যয় করিতে হইবে যে ঋণগ্রহণের প্রয়োজন ত' হইবেই না, অধিকন্তু আয়ের কিয়দংশ উদ্বৃত্ত হইতে পারিবে। এজন্য "চোখ কাণ বুঁজিয়া" আয় হস্তগত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই শতকরা হিসাবে তাহার একাংশ পৃথক করিয়া একটি "উদ্বৃত্ত অর্থ-ভাণ্ডারের" সৃষ্টি করিতে এবং তাহাতে সঞ্চিত রাখিতে হইবে। এরূপ না করিলে গৃহস্থকে সময়ে সময়ে বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। বাড়ীর কেহ সহসা কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িতে পারে এবং বাজেটের "চিকিৎসা"-শীর্ষে নির্দ্দিষ্ট অর্থে তাহার চিকিৎসার ব্যয়সঙ্কুলান না হইতে পারে; এরূপ স্থলে উদ্বৃত্ত অর্থ-ভাণ্ডার হইতে সে ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার সুবিধা থাকে, বাহির হইতে ঋণগ্রহণের প্রয়োজন হয় না। কন্যার বিবাহ বহু ব্যয়সাপেক্ষ, সেজন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। কেহ কেহ বীমা কোম্পানীর সহিত এ-বিষয়ে বন্দোবস্ত করেন; এরূপ বন্দোবস্ত সমীচীন।

উল্লিখিত উপায়ে অর্থ বাঁচাইতে হইলে যদি সাংসারিক কোন ব্যয়ের সঙ্কোচ আবশ্যক হয় তাহাও করা উচিত। পাঁচখানি ব্যঞ্জনের স্থলে দু'খানি রাঁধিতে হইবে। জলযোগ সন্দেশের পরিবর্ত্তে মুড়ি-মুড়কী খাইয়া সারিতে হইবে অথবা লুচি বা পরোটার পরিবর্ত্তে রুটী খাইতে হইবে। মহাভারতের উপদেশ—শাকান্ন খাইয়া যদি অঋণী থাকা যায় তাহাই করিবে। ইংরেজীতে একটি প্রচলিত কথা—যে ব্যক্তি সমস্ত আয় খরচ করে সে অর্ব্বাচীন, যে আয়ের অধিক ব্যয় করে সে চোর, যে আয়ের কিয়দংশ বাঁচাইয়া রাখে সেই জ্ঞানী বা বুদ্ধিমান।

এই নিয়মের অনুসরণ করিয়া নিম্নলিখিত ভাবে একটি মোটামুটী রকমের বাজেট প্রস্তুত করা যাইতে পারে—

উদ্বৃত্ত অর্থভাণ্ডারে সঞ্চয়, জীবন বীমার প্রিমিয়াম্, বাটীভাড়া বা ট্যাক্স, পাচক ও দাসদাসীর বেতন, পূজা পার্ব্বণ ও অন্যান্য ধর্ম্মাচরণ, ধোবা, নাপিত, বস্ত্রাদি, দুগ্ধ, চাউল, আলু, শাক-সব্জী, আটা, ময়দা, তৈল—(১ রন্ধনের জন্য ২ কেশের বা মস্তকের জন্য ৩ জ্বালাইবার জন্য) ঘৃত, মশলা, মৎস্য, মাংস, সাগু, বালি প্রভৃতি চা, চিনি, গুড়, চিকিৎসা, লৌকিকতা।

যে গৃহস্থের নিজের বসতবাটী আছে তাঁহার বাটীভাড়া বাজেটে উঠিবে না, কিন্তু সম্ভবতঃ ট্যাক্স উঠিবে। যিনি দুগ্ধবতী গাভী পোষণ করেন তাঁহার বাজেটে দুগ্ধের পরিবর্ত্তে গাভীর খাদ্য উঠিবে। যদি কাহারও ট্রামভাড়া বা গাড়ীভাড়া অবশ্য প্রয়োজনীয় হয় তাহারও উল্লেখ করিতে হইবে। যদি কোন মাসে চিকিৎসার খরচ না লাগে, তাহার বাবদ নির্দ্দিষ্ট অর্থ উদ্বৃত্ত অর্থভাণ্ডারে সঞ্চয় করা উচিত। যে কোন দফার ব্যয়ের হ্রাস হইলে উদ্বৃত্ত অর্থ উক্ত ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইবে কিন্তু নির্দ্দিষ্ট "শতকরা অংশের" হ্রাসবৃদ্ধি হইবে না। এরূপে যাহা সঞ্চিত হইবে তাহা অতিরিক্ত সঞ্চয় বলিয়া গণ্য হইবে।

উপরোক্ত কার্য্য ও কর্ত্তব্যগুলি ব্যতীত সংসারসম্বন্ধীয় অন্য অনেক খুটীনাটী আছে যাহা গৃহিণী নিশ্চয় অবগত আছেন কিন্তু যে বিষয়ে গৃহীর পূর্ণজ্ঞান সম্ভবপর নয়। যে যে বিষয়ে ত্রুটী বা অভাব রহিল, আশা করি কোন পাকা গৃহিণী অচিরে তাহার সংশোধন বা পূরণ করিবেন।

যাহাদিগকে লইয়া পরিবার বা সংসার গঠিত, সংসার-চালনা-বিষয়ে বহুদর্শিতা ও কার্য্যদক্ষতা হিসাবে গৃহিণীর প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও স্থান সকলের উচ্চে বলিয়া লেখকের অন্তঃপুর-সম্পর্কীয় এই প্রথম প্রবন্ধে প্রধানতঃ গৃহিণী ও গৃহিণীপনার সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইল। ভবিষ্যৎ সংখ্যায় অন্যান্য পরিজনের কর্ত্তব্যসম্বন্ধে সংক্ষেপে যথাসাধ্য আলোচনা করিবার আশা রহিল।

সাময়িক প্রসঙ্গ ও আলোচনা

যুদ্ধের মহড়ায় বিপত্তি

বিগত ১০ই নভেম্বর এক সংবাদে প্রকাশ, যে বাঙ্গালোর হইতে ৬০ মাইল দূরবর্ত্তী কোলার গোল্ড ফিল্ডে কামান-যুদ্ধের মহড়ার সময় ভারতীয় বাহিনীর ৪ জন হত ও ৮ জন আহত এবং ব্রিটিশ বাহিনীর ২ জন আহত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অসামরিক দর্শকদেরও তিনজন আহত হইয়াছিল, একজন অল্পক্ষণ পরেই মারা গিয়াছে। এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে সাউদার্ণ আর্ম্মি এক প্রেস কমিউনিক বাহির করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, মহড়ায় অন্যূন সাতশত গোলা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং দুর্ঘটনা সম্বন্ধেও যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করা হইয়াছিল। কিন্তু দৈবাৎ দুইটি গোলা নিকটে পড়িয়া বিকীর্ণ হওয়ার ফলেই এইরূপ শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে। গোলন্দাজ বাহিনীটি নাকি বেশ সুশিক্ষিত এবং ইহার গোলন্দাজ সেনারাও নাকি সকলেই ভারত সন্তান। সংবাদটা বড়ই মর্ম্মান্তিক!

চট্টগ্রামে বোমাবর্ষণ

গত ১৯শে অগ্রহায়ণ, শনিবার অপরাহ্নে জাপানী বোমারু ও জঙ্গী-বিমানের একটী বহর চট্টগ্রামের উপর আবার হানা দিয়াছিল। ব্রিটিশ জঙ্গী-বিমানবহর তাহাদের বাধা দেওয়ায় জাপানী বিমানগুলি বিতাড়িত হয়। বোমাগুলির অধিকাংশই জলে পড়ায় ক্ষতি সামান্য এবং অল্পলোকই হতাহত হইয়াছে। এইবার লইয়া এই তৃতীয়বার চট্টগ্রামের উপর জাপ-বিমানের আক্রমণ হইল। সুতরাং এই বিমান আক্রমণকেই মূল আক্রমণের পূর্ব্বাভাষ বলিয়া মনে করিবার কোন হেতু নাই।

পুলিশ কবলে কংগ্রেস রেডিও

বোম্বাই পুলিশের সংবাদে প্রকাশ, যে তাহারা গীরগাঁও ব্যাকরোডে অবস্থিত একটা বাড়ীতে হানা দিয়া একটি কংগ্রেস রেডিও হস্তগত করিয়াছে। এই রেডিও হইতে নাকি কয়েক সপ্তাহ যাবৎ কংগ্রেসের প্রচারকার্য্য নিয়মিত ভাবে চলিতেছিল।

কুইনাইনের মহার্ঘতা

বোম্বাই প্রদেশে সম্প্রতি কুইনাইনের দর প্রতি পাউণ্ড ৩০০৲ তিনশত টাকায় উঠিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে তথায় এই কুইনাইনের দর ছিল প্রতি পাউণ্ড ১৮৲ আঠার টাকা মাত্র।

স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপ্‌সের ভাগ্যবিপর্য্যয়

স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপ্‌স বিগত ফেব্রুয়ারী মাস হইতে পার্লামেন্টে লর্ড প্রিভিসিল এবং কমন্স সভার লীডার ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহাকে সে পদ হইতে সরাইয়া একেবারে শাসন-তন্ত্রের বাহিরে বিমান-সচিবের পদে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মস্কো-দৌত্যে সাফল্য অর্জ্জন করিয়া, অর্থাৎ সোভিয়েট রুশিয়াকে দলে ভিড়াইয়া, স্যার ষ্টাফোর্ড যখন ইংলণ্ডে ফিরিলেন তখন তাঁহার জয়নাদে ও যশোগানে ইংলণ্ডের জল, স্থল, আকাশ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকেই এক বাক্যে বলিয়াছিলেন যে তিনি অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। হয় ত' তাহার ফলেই স্যার ষ্টাফোর্ডের প্রাপ্য পদোন্নতি ঘটিয়াছিল। আবার ভারতীয় দৌত্য ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিবার অব্যবহিত পরেই এই পদাবনতি দেখিয়া অনেকেরই মনেই হয় ত' এই প্রশ্নটা জাগিতেছে যে, তবে ইহাই কি যোগ্যতারই পুরস্কার? যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আপাততঃ কোন মন্তব্য প্রকাশ না করাই ভাল। স্বরূপ সময়ে অবশ্যই প্রকাশ হইবে। এ সম্বন্ধে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপ্‌সকে সান্ত্বনা দিয়া একখানা চিঠি লিখিয়াছেন, "যুদ্ধ বর্ত্তমানে যেরূপ অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে,



স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপস্

সকলদিক বিবেচনা করিয়া আমার মনে এইরূপ বিশ্বাসই বদ্ধমূল হইয়াছে যে, বিমান-উৎপাদন ও রেডিওর উৎকর্ষ সাধনই আমাদের মূল সমস্যা। সুতরাং, যদিও আপাত শাসনতান্ত্রিক দৃষ্টি-ভঙ্গিতে এই বিমান-সচিবের পদ আপনার পক্ষে অবনতি সূচক বলিয়া মনে হইবে, তথাপি, আশাকরি, আপনি ক্ষুণ্ণ হইবেন না। কারণ, বর্ত্তমানে এই পদে বসিয়াই আপনি দেশের অধিকতর সেবা করিতে সমর্থ হইবেন। অধিকন্তু ইহাতে আপনার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতাও পূর্ব্বাপেক্ষা গাঢ়তর হইবে।" মিঃ চার্চ্চিল যাহা বলিয়াছেন তাহা অযৌক্তিক নহে। বর্ত্তমান যুদ্ধের জয় পরাজয় বিমান-শক্তির তারতম্যের উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে। স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপস্ সুচতুর ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তিনিও প্রধান মন্ত্রীর সান্ত্বনা-বাণী অকপট উদারতার সহিতই গ্রহণ করিয়া প্রধান মন্ত্রীকে তাঁহার সৌজন্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। ব্রিটিশ শাসনচক্রের ইহাই চিরন্তন বৈশিষ্ট্য।

জার্ম্মানীর সতর্কতা

যে-স্থানে শ্লোভাকিয়ার সহিত অস্ট্রিয়া রাজ্যের সংযোগ সাধিত হইয়াছে, জার্ম্মানেরা নাকি সেইস্থানে সীমান্ত সুরক্ষিত করিতেছে। ইহাতে মনে হয়, যে মিত্রপক্ষ আফ্রিকার ও ভূমধ্যসাগরাঞ্চলে ক্রমশঃ শক্তিমান হওয়ায় জার্ম্মানদের মনে ভীতির সঞ্চার হইয়াছে এবং অদূর-ভবিষ্যতে ইতালীরও আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। যদি সত্য সত্যই পরাক্রান্ত মিত্রপক্ষীয়-বাহিনীকর্তৃক ইতালী আক্রান্ত হয় এবং তাহাকে রক্ষা করা একান্তই অসম্ভব হইয়া উঠে, তখন, বেগতিক বুঝিলেই, জার্ম্মানেরা "চাচা আপন প্রাণ বাঁচা" নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক এতদিনের মিত্রকে ছাড়িয়া সুরক্ষিত সীমানার ভিতরে সারিয়া পড়িবে। বর্ত্তমান বিশ্ব-রাজনীতিক্ষেত্রে সন্ধি, মৈত্রী ও বিশ্বাসের যে মর্ম্মান্তিক প্রহসন চলিয়াছে তাহাতে ইহাও মোটেই অপ্রত্যাশিত নহে।

শোক সংবাদ

গত ২০শে অগ্রহায়ণ, রবিবার সন্ধ্যার সময় স্বনামধন্য স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। বিগত সেপ্টেম্বরমাস হইতেই তিনি অসুখে ভুগিতেছিলেন। মৃত্যুকালে স্যার মন্মথের বয়স ৬৮ বৎসর হইয়াছিল। ব্যবহার-শাস্ত্র বিশারদ হিসাবে তাঁহার যথেষ্ট পসার ও প্রতিপত্তি ছিল। সারা ভারতবর্ষে তাঁহার উপদেশ ও পরামর্শ চাওয়া হইত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ, বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯৯ সালে তিনি হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন এবং দীর্ঘ ২৫ বৎসর কাল সুনাম ও কৃতিত্বের সহিত ওকালতী করিয়া ১৯২৪ সালে কলিকাতা হাইকোর্টে বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৩৬ সালপর্য্যন্ত বিচারপতির কার্য্যেও বিশেষ প্রশংসা ও যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করেন। স্যার মন্মথ দুইবার হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতির (Chief-justice) পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ১৯৩৫ সালে তিনি 'নাইট' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯৩৮ সালের জুন মাস হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত তিনি বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য ছিলেন। এতদ্ব্যতীত কিছু কালের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, ধর্ম্ম-কৃষ্টি ও বিদ্যায়তনের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ ও গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। স্যার মন্মথের ন্যায় প্রতিভাবান আইনজ্ঞ, বিচারদক্ষ ধীর ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক আজ বাঙ্গালাদেশে বড়ই বিরল। তাই পরিণত বয়সে মৃত্যু হইলেও স্যার মন্মথের অভাব সারা দেশময়ই তীব্রভাবে অনুভূত হইবে। স্যার মন্মথ স্বর্গীয় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামাতা। স্যার গুরুদাসই ছিলেন মন্মথের আদর্শ। স্যার মন্মথের রচিত আইন সম্বন্ধীয় কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক আছে। তন্মধ্যে 'প্রজাস্বত্ব আইন', 'সাক্ষ্য দান আইন' ও 'জুরীর বিচার' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা বেদনাহত চিত্তে মৃতের পারত্রিক মঙ্গল কামনা এবং তদীয় শোক সন্তপ্ত পরিজন ও আত্মীয়বর্গের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।


স্যার মন্মথনাথ

পরলোকে জেনারেল হার্টজগ

দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী জেনারেল হার্টজগ সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে তাঁহার তলপেটে অস্ত্রোপচার করা হইয়াছিল। জেনারেল হার্টজগ বর্ত্তমান বিশ্বপ্লাবী যুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নকে নিরপেক্ষ রাখিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু জেনারেল স্মাটের বিরোধিতার ফলে তাঁহার সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। মৃত্যুকালে হার্টজগের বয়স ৭৮ বৎসর হইয়াছিল।

নিরঙ্কুশ ক্ষমতা

সমর বিভাগ এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া সিকিউরিটি কোরের প্রত্যেক অফিসার ও মেম্বরকে এইরূপ ক্ষমতা দিয়াছেন যে, অতঃপর তাহারা বিনা ওয়ারেন্টেই যে-সকল লোক ভারতরক্ষা আইনের ১২৯ ধারার ১ উপধারার আমলে পড়িবে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবে। সাধু, সাবধান!

ঘূর্ণীবাত্যার ধ্বংসলীলা

এক প্রচণ্ড ঘূর্ণীবাত্যার ফলে শ্যাম রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলের সাতলক্ষ বাসগৃহ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং এগারহাজার লোক প্রাণ হারাইয়াছে।

ক্লাবে অগ্নিকাণ্ড

আমেরিকায় বোষ্টন সহরের একটা ক্লাবগৃহে অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রায় সাত শত স্ত্রী-পুরুষের জীবনান্ত ঘটিয়াছে, এবং দুই শতাধিক লোক আহত হইয়াছে। প্রকাশ, ক্লাবে উপস্থিত স্ত্রী-পুরুষগণ সকলেই যে-সময় পান-ভোজন ও আমোদ-প্রমোদে মত্ত ছিল সেই সময় হঠাৎ বৈদ্যুতিক তার জ্বলিয়া উঠিয়া একটী তরুণীর চুলে আগুন ধরিয়া যাওয়ায়ই এই বিপত্তি ঘটে। চুলে আগুন লাগিতেই তরুণীটি 'আগুন! আগুন!' বলিয়া চীৎকার করিয়া জনতার মধ্য দিয়া ছুটাছুটি করিতে থাকে। ক্লাবগৃহ অনেকগুলি তালবৃন্তের পাখা দ্বারা সজ্জিত ছিল। তরুণীর চুলের আগুনে সেই সকল তালবৃন্ত জ্বলিয়া উঠিয়া সারা ক্লাবগৃহময় আগুন ছড়াইয়া ফেলে। আকস্মিক বিপদে সকলেই বিমূঢ়বৎ দিক্‌বিদিক জ্ঞানহারা হইয়া রুদ্ধশ্বাসে ঠেলাঠেলি করিয়া ক্লাবের দ্বারের দিকে অগ্রসর হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে দ্বারটি ঘূর্ণ্যমান থাকায় কেহই বহির্গত হইতে পারে নাই, সেই স্থানেই দগ্ধদেহে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া পড়িয়া যায়।

পার্ল পোতাশ্রয়ে মার্কিনের ক্ষতি

১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে জাপানী নৌ ও বিমান-বহর একযোগে আমেরিকার প্রশান্ত সাগরীয় বিখ্যাত পার্ল বন্দরের উপর এক

অতর্কিত প্রচণ্ড আক্রমণ করে। এই আক্রমণের ফলে আমেরিকার যে ক্ষতি হয় এযাবৎ তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই। সম্প্রতি মার্কিন সরকার উহা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকাশিত বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, উক্ত আক্রমণে জাপানীদের ১০৫ খানা বোমারু বিমান যোগদান করিয়াছিল। আমেরিকার ১৭৭ খানা বিমান, ৫ খানা বৃহদাকার ব্যাটেলশিপ,—১ আরিজোনা, ২ ওকলাহামা, ৩ ক্যালিফোর্নিয়া, ৪ নেভাদা, ৫ ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়া; তিন খানা ডেষ্ট্রয়ার,—১ স', ২ কাজিন, ৩ ডাউনিস; মাইনপাতা জাহাজ—১ ওসলালা; 'উটা' নামক বিরাট ভাসমান ওক সদৃশ একখানা বৃহদাকার জাহাজ একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে এবং ইহা ছাড়াও তিন খানা ব্যাটেলশিপ,—১ পেনসিল্‌ভ্যানিয়া, ২ মেরীল্যাণ্ড, ৩ টেনেসি; তিনখানা ক্রুজার, ১ হেলেনা, ২ হনোলুলু, ৩ র‍্যালে এবং ১ খানী সীপ্লেন ও 'কার্টিস' নামক জাহাজ খানা ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। এই ত' গেল বিমান ও জাহাজের ক্ষতি, ইহা ছাড়াও মার্কিনের যে সামরিক ক্ষতি হইয়াছে তাহা সামান্য নহে। উপকূলবর্ত্তী কতকগুলি সামরিক লক্ষ্য বস্তু, বিশেষতঃ হিক্‌হামের ও ওয়েলহারের বিমান-ঘাঁটি, ফোর্ডদ্বীপ, এবং কানোয়ে উপসাগরের নৌ বিভাগীয় বিমান ঘাঁটি একেবারেই বিধ্বস্ত হইয়াছে। ২১১৭ জন অফিসার ও নৌ বাহিনীর লিষ্টভুক্ত কর্ম্মচারী নিহত হইয়াছে এবং ১৬০ জনের এখনও কোন খোঁজ মিলিতেছে না। ৮৭৬ জন আহত হইয়াছে। স্থল বাহিনীর ২২৬ জন অফিসার এবং লিষ্টভুক্ত সৈন্য প্রাণ হারাইয়াছে এবং ৩৯৬ জন আহত হইয়াছে। অবশ্য আক্রমণ অতর্কিত বলিয়াই ক্ষতির পরিমাণ এইরূপ গুরুতর হইয়াছে। পাঠকবর্গের বোধ হয় মনে আছে যে, যখন জাপানী নৌ ও বিমান-বহর এই আক্রমণের জন্য অভিযান করিতেছিল তখনও জাপানী দূত খাস মার্কিন দরবারে বসিয়া প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সহিত আপোষের কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। কাপট্য আর কাহাকে বলে।

সমর-সংবাদ

রুশ সীমান্ত।—রুশিয়ায় জার্ম্মানদের শীতকালীন ভাগ্যবিপর্য্যয় আরম্ভ হইয়াছে। দক্ষিণে ককেসাস অঞ্চল হইতে উত্তরে লেনিনগ্রাড পর্য্যন্ত বিস্তৃত দুই হাজার মাইল ব্যাপী রণক্ষেত্রের প্রায় সর্ব্বত্রই সোভিয়েট বাহিনী বিপুল বিক্রমে আক্রমণ সুরু করিয়াছে, এবং অনেক স্থলেই জার্ম্মানেরা পরাজিত হইয়া পশ্চাদ্বর্ত্তন করিতে বাধ্য হইতেছে। দক্ষিণে জেনারেল টিমোসেঙ্কো উত্তরে জেনারেল জুকোভ সোভিয়েটবাহিনী পরিচালনা করিতেছেন। ষ্ট্যালিনগ্রাড অবরোধকারী জার্ম্মানবাহিনী এখনও প্রাণপণ শক্তিতে ষ্ট্যালিনগ্রাডে অধিকৃত অঞ্চল সমূহ আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। রুশেরাও মরিয়া হইয়া তাহাদের উপর আঘাত হানিতেছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে সম্পূর্ণ পর্য্যুদস্ত করিয়া ষ্ট্যালিনগ্রাড উদ্ধার করিতে পারে নাই। তবে রুশ সেনা যে ভাবে তাহাদের আক্রমণ পরিচালিত করিতেছে, যদি তাহাতে সাফল্য লাভ করিতে পারে তবে ষ্ট্যালিনগ্রাডস্থ তিন লক্ষ জার্ম্মান সেনার পক্ষে মূল জার্ম্মান বাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবরুদ্ধ হইয়া পড়িবার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। সোভিয়েট সেনা ক্রেটস্কায় পুনরধিকার করিয়াছে। জেনারেল জুকোভের সেনাদল, গত বৎসর শীতকালে লেনিনগ্রাড স্মলেনস্ক সীমান্তে সোভিয়েট সেনা ভেরোপেঁজ নামক যে স্থান পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল, সেই স্থান হইতেই এবার পশ্চিমাভিমুখী অভিযান আরম্ভ করিয়াছে। এই ভেরোপেজ নামক স্থানটা স্মলেনস্ক হইতে ১২০ মাইল উত্তরে অবস্থিত এবং ল্যাটেভিয়ার সীমান্ত হইতে ইহার দূরত্ব মাত্র ১৪০ মাইল।

মিশর-সীমান্ত।—মিশর-সীমান্তের যুদ্ধ সম্প্রতি শেষ হইয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। মিশরের দ্বারপ্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া বেনগাজী পর্য্যন্ত ভূমধ্যসাগর-তীরবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগই জার্ম্মান-কবলমুক্ত হইয়া মিত্রপক্ষের অধিকারে আসিয়াছে। জেনারেল রোমেল ইতিপূর্ব্বেই টিউনিসে আস্তানা গাড়িয়াছিলেন, সুতরাং এই অঞ্চলে জার্ম্মানদের এই পশ্চাদপসরণের মূলে কোন সামরিক অভিসন্ধি আছে কি না তাহাও ঠিক বুঝা যাইতেছে না। অনেকে মনে করেন যে, উত্তর আফ্রিকায় মিত্রবাহিনী অবতরণ করিবার ফলেই জার্ম্মানেরা অবরুদ্ধ হইয়া পড়িবার আশঙ্কায় এ অঞ্চলের মায়া পরিত্যাগ করিয়াছে এবং তাহাদের আফ্রিকাস্থিত সমস্ত শক্তি লইয়া টিউনিস ও বিজার্ত্তায় নবাগত জার্ম্মান-বাহিনীর সহিত সমবেত হইয়াছে।

উত্তর আফ্রিকা।—ইঙ্গ-আমেরিকান ও দারলাঁর অধীনস্থ ফরাসী-বাহিনী টিউনিস্ ও বিজার্ত্তা সীমান্তে জার্ম্মান-সেনার সম্মুখীন হইয়াছে। ইতালীয় ও জার্ম্মান-বাহিনী ট্যাঙ্ক ও বিমান-বলে পুষ্ট হইয়া উপরোক্ত দুইটি স্থান দখল করিয়া রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই টিউনিস্ বিজার্ত্তা-সীমান্তের যুদ্ধই আফ্রিকার ভাগ্য-পরীক্ষা হইবে। কেবল আফ্রিকার নহে, এই যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের উপরে ভূমধ্যসাগরের প্রাধান্যও সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যে-পক্ষই হারিবে ভূমধ্যসাগরে তাহার প্রাধান্য লোপ পাইবে, পক্ষান্তরে বিজয়ী পক্ষ ভূমধ্যসাগরে ত' প্রভুত্ব করিবেই, পরন্তু ইউরোপের দক্ষিণ উপকূল ভাগের উপরেও তাহার প্রভাব অনুভূত হইবে। যাহা হউক, এখন পর্য্যন্ত এই যুদ্ধের কোনরূপ ভবিষ্যৎ-বাণীই করা চলে না। এই স্থানে সমবেত দুই পক্ষই এখন পর্য্যন্ত প্রায় তুল্য বলশালী। বিমান ও ট্যাঙ্কে যে পক্ষ প্রতিপক্ষকে অতিক্রম করিতে পারিবে, সেই পক্ষেরই জয়াশা অনুকূল হইবে। সুতরাং এই দুইটি বস্তুর সরবরাহের উপরই বিশেষ করিয়া জয়-পরাজয় নির্ভর করিতেছে। সরবরাহ সম্বন্ধে মিত্রপক্ষ অপেক্ষা জার্ম্মানীর সুবিধা সমধিক। কারণ, জার্ম্মান ঘাঁটি সিসিলি হইতে টিউনিসের দূরত্ব অপেক্ষাকৃত অনেক কম। মিত্রপক্ষকে অনেক দূর হইতে সরবরাহ-কার্য্য চালাইতে হইবে। দেখা যাউক, কি হয়। এখন পর্য্যন্ত ত' মাত্র হাঁক, প্রকৃত বর্ষণ সম্মুখে। তবে মাঝে মাঝে বিমান-যুদ্ধ ও দু' একটা ছোটখাট সংঘর্ষও হইতেছে।

প্রশান্ত সাগরাঞ্চল।—নিউগিনিতে অষ্ট্রেলিয়ানরা কয়েকদিন বেশ জাপানীদিগকে কোণঠাসা করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু এখন আর তেমন পারিতেছে না। জাপানীরা না কি রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সলোমন দ্বীপপুঞ্জের কাছে মার্কিন নৌ-বহরের সহিত জাপানী নৌ-বহরের উপর্যুপরি কয়েকটা যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধগুলিও ছোট-খাট রকমের নয়, বেশ জোরালো বড় রকমের। প্রত্যেক যুদ্ধেই, মার্কিন মহলের সংবাদে প্রকাশ, জাপানীদের পরাজয় ঘটিয়াছে এবং জাপ নৌ বহরের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। যাহাই হউক, জাপানীরা এখনও সলোমানের এলাকা ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেছে না, মার খাইয়াও মারামারি করিতেছে।

ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত।— ব্রিটিশ ও জাপান উভয় পক্ষেই টহলদারী চলিতেছে। জাপ-টহলদারী সেনাগণ মাঝে মাঝে আসাম-ব্রহ্ম সীমান্তের মধ্যবর্ত্তী বেওয়ারিশ এলাকায় ঢুকিয়া উপদ্রব করিতে চাহিতেছে, ব্রিটিশ টহলদারী সেনারা তাহাদিগকে বাগে পাইলেই সমুচিত শিক্ষা দিয়া বিদায় করিতেছে। ইহার বেশী, এখন পর্য্যন্ত আর কোন সংবাদই আসে নাই। তবে মধ্যে মধ্যে ব্রিটিশ বিমান বহর ব্রহ্মদেশে হানা দিয়া বোমা বর্ষণ ও ক্ষতি করিয়া আসিতেছে। জাপানীরাও কিঞ্চিৎ প্রত্যুত্তর দিতে কসুর করিতেছে না। শুনা যাইতেছে, সম্প্রতি জাপান নাকি, ইন্দোচীন, শ্যাম, মালয় ও ব্রহ্ম সীমান্তে প্রচুর সৈন্য, ট্যাঙ্ক ও নানাশ্রেণীর বিমান আনিয়া আমদানী করিতেছে। মতলব অবশ্যই সাধু নয়। কেহ কেহ অনুমান করিতেছেন যে অদূর ভবিষ্যতে ভারত আক্রমণের জন্যই এই উদ্যোগ পর্ব্ব চলিতেছে। আবার কেহ কেহ বা বলেন যে, ইহা নিছক ভয় প্রদর্শন মাত্র; বস্তুতঃপক্ষে ভারত আক্রমণের মত শক্তি বর্ত্তমানে জাপানের নাই। জাপানের কি আছে বা নাই তাহা আমরা সকলেই সমান বুঝি। অতএব সে সম্বন্ধে মাথা না ঘামাইয়া আত্মরক্ষার দিকেই আমাদের অবহিত হওয়া উচিত।

দারলাঁর স্বরূপ কি ?

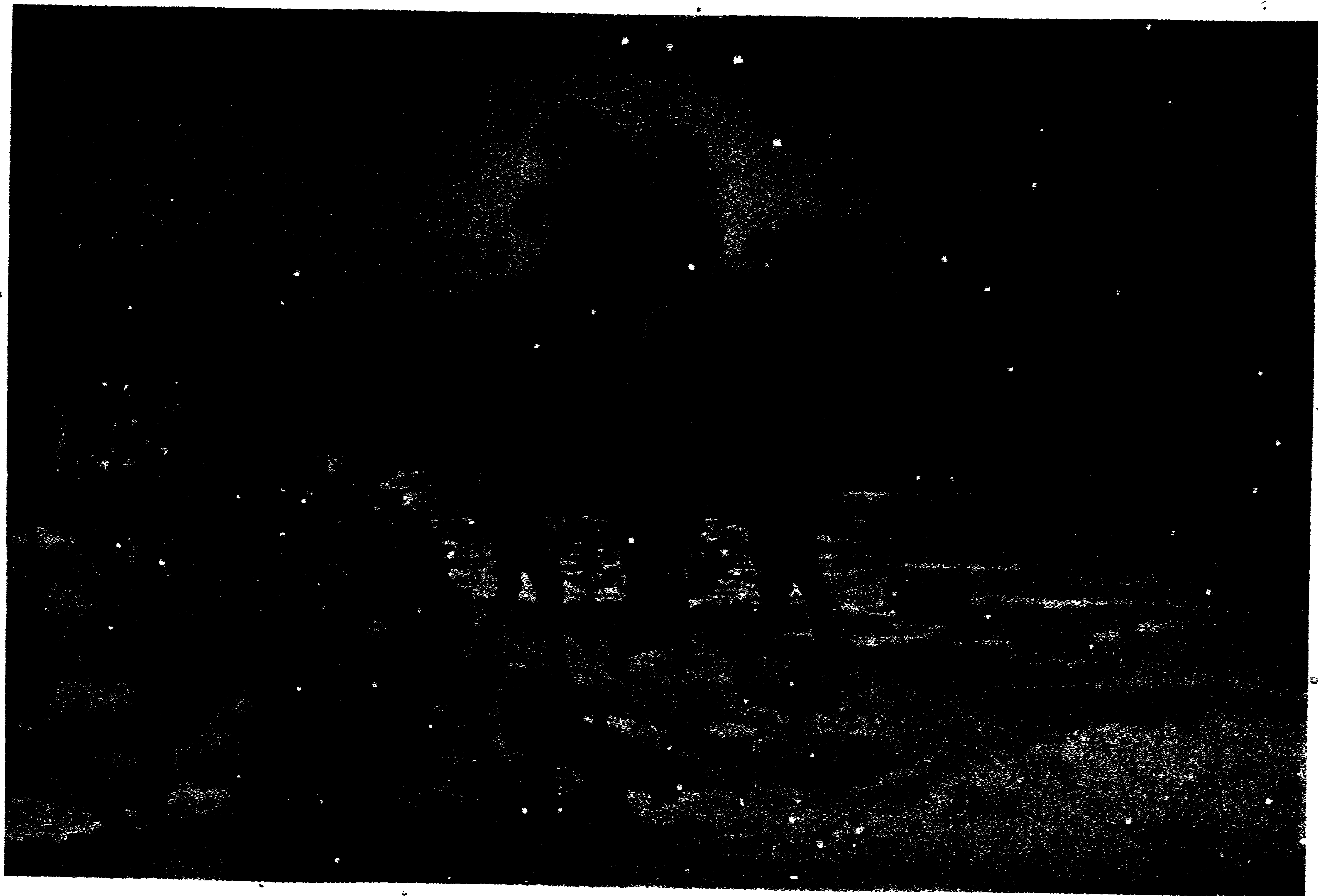
এডমিরাল দারলাঁর স্বরূপ লইয়া সম্প্রতি পাশ্চাত্ত্য রাজনৈতিক মহলে বেশ একটু চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। দারলাঁ পরম নাৎসীভক্ত বলিয়াই এতদিন সকলের ধারণা ছিল, কিন্তু ইঙ্গ-আমেরিকান বাহিনী উত্তর-আফ্রিকায় অবতরণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সে নাৎসী-প্রেম সহসা উবিয়া গেল, দেখিতে দেখিতে তিনি মিত্রপক্ষের পরম সহযোগী হিতৈষী হইয়া বসিলেন। মিত্রপক্ষীয় নায়কগণ কার্য্যোদ্ধারের জন্য তাঁহাকে কোল দিলেও সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারিয়াছেন কি না, তাহা অবশ্য তাঁহারা প্রকাশ করিয়া বলেন নাই, হয় ত দারলাঁর প্রতি তাঁহাদের সতর্ক দৃষ্টি সর্ব্বদা সজাগই রহিয়াছে। এদিকে রুশিয়া কিন্তু দারলাঁকে মোটেই বরদাস্ত করিতে পারিতেছে না। ইংলণ্ডস্থ রুশ-দূত মঃ মেইস্কী ওয়াশিংটনস্থ রুশ-দূত মঃ লিটভিনফও দারলাঁ সম্বন্ধে খুবই যে সন্দেহ পোষণ করেন তাহা তাঁহাদের কথায় প্রকাশ পাইয়াছে। স্বাধীন ফরাসীদলের নেতা জেনারেল দ্য গল ও তাঁহার সহকারী সিরিয়ার ফরাসী নায়ক জেনারেল কাত্রুও দারলাঁর সম্বন্ধে বিরুদ্ধমতই ব্যক্ত করিয়াছেন। কাত্রু স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, দারলাঁ মোটেই বিশ্বাস স্থাপনের যোগ্য পাত্র নহে। মিত্র-বাহিনীর সহিত তাঁহাকে না রাখাই ভাল। দারলাঁর সহযোগিতায় অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্টলাভের কোনই আশা নাই। দারলাঁকে বাদ দিলেও ফরাসী ঐক্যের অন্তরায় উপস্থিত হইবে না, পরন্তু দারলাঁ ফলমধ্যস্থ কীটস্বরূপ। এখন দারলাঁ দাঁড়ায় কোথায় ?

ফরাসী-স্বাধীনতার বিলোপ

ইউরোপের মানচিত্র হইতে স্বাধীন ফ্রান্সের শেষ চিহ্নটুকুও মুছিয়া গেল। হিটলারের আদেশে জার্ম্মানেরা অনধিকৃত ফ্রান্স দখল করিয়া ভিসি গভর্ণমেণ্টের হাত হইতে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব কাড়িয়া লইয়াছে এবং ফরাসী-সেনাদল ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিয়াছে। ফরাসী জাতির এ দুর্ভাগ্য যদিও একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়, তথাপি বড়ই মর্ম্মান্তিক। সভ্য-জগতে ফরাসীর অবদান বড় সামান্য নহে, বরং সমসাময়িক অনেক জাতির অপেক্ষাই বেশী। জ্ঞানে, গরিমায় শৌর্য্যে, বীর্য্যে বহু শতাব্দী ধরিয়া ফরাসী জাতির নাম পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। কালের কি বিচিত্র গতি! গত মহাযুদ্ধের পর যে জাতি বিজয় গর্ব্বে স্ফীতবক্ষে ইউরোপের রাষ্ট্রচক্র নিয়ন্ত্রিত করিবার ভার গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, আজ ইউরোপীয় রাষ্ট্রচক্র হইতে তাহারই চিরনির্ব্বাসন হইল! আজ নেপোলিয়নের জাতি, নেপোলিয়নের বীর্য্যে গড়া ফ্রান্স জার্ম্মানীর পদানত, নির্জ্জিত, মৃত!

তুলোঁর নৌ-বহর

তুলোঁ ভূমধ্যসাগর-তীরবর্ত্তী ফ্রান্সের একটি বৃহৎ নৌ-ঘাঁটি। এই স্থানে ফরাসীদের ভূমধ্যসাগরীয় প্রধান নৌ বহর অবস্থান করে। জার্ম্মানেরা এই নৌ-ঘাঁটিটিও অধিকার করিয়া লইয়াছে। প্রথমে সংবাদ রটিল যে, তুলোঁ অধিকারের পূর্ব্বেই তত্রত্য ফরাসী নৌ-কর্ত্তৃপক্ষ যুদ্ধ-জাহাজগুলিকে প্রচণ্ড বিস্ফোরকের সাহায্যে বিধ্বস্ত করিয়া জলে ডুবাইয়া দিয়াছে কিন্তু সম্প্রতি কর্ণেল নক্স আমেরিকার জনসাধারণের কাছে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ যে, তুলোঁতে অবস্থিত সমস্ত নৌ-বহরের একচতুর্থ ভাগ সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায়ই জার্ম্মানীর হস্তগত হইয়াছে এবং ১২ খানা ব্যাটেলশিপ জখম হইয়া থাকিলেও তাহা মেরামত করা চলিবে। দুইখানা সাবমেরিন তুলোঁ হইতে পলায়ন করিয়া আফ্রিকায় মিত্রপক্ষীয় নৌ-বহরের সহিত যোগ দিয়াছে। অবশিষ্টের ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে তাহা এখনও জানা যায় নাই।



দিনের শেষে

শ্রীরামনারায়ণ নন্দী

বড়বাবু

শ্রীকানাই বসু

'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা'। অর্থাৎ অফিস যত ছোটই হোক বড়বাবুর প্রতাপ প্রবলই থাকে। সুবিমল বড়বাবু হইয়াছে। তাহার বয়সও বেশী নয়, তাহার অফিসও বড় নয়। তথাপি বড়বাবুর প্রাপ্য মর্য্যাদা সুবিমল ষোল আনাই পাইয়া থাকে। কিন্তু এইখানেই তাহার সহিত জগতের বড়বাবুসম্প্রদায়ের প্রভেদ। অন্য বড়বাবুগণ মর্য্যাদা ষোল আনা মাত্র পাইলেই খুশী হন না, আঠারো আনা ছাপাইয়া আদায় করিয়া লন। আর সুবিমল ষোল আনার ভারেই কাতর ও কুণ্ঠিত হইয়া থাকে।

কারণ, বড়বাবু হওয়া সুবিমলের প্রিন্সিপ্‌লের বিরুদ্ধে। বাল্যকাল হইতে তাহার বড়বাবু-জাতির প্রতি একটা অহৈতুকী অপ্রীতি আছে। ভাল ছেলে বলিয়া স্কুল কলেজে তাহার সুনাম ছিল বরাবরই। ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে তাহার একটা মত ছিল, তাহা তাহারই নিজস্ব এবং দৃঢ়। এ সকল অবশ্য খুবই ভাল কথা, বিশেষতঃ ছাত্রজীবনে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজভুক্ত না হইয়াও যখন সে এম-এ পাশ করিবার পরও সত্য ও ন্যায়ের গণ্ডী হইতে মুক্ত হইতে পারিল না, তখন শুভাকাঙ্ক্ষীগণ তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির আশা ছাড়িয়া দিলেন।

নানা বিষয়ে এখনও তাহার মত ও অমত আছে। এই সকল বিষয়ের মধ্যে বড়বাবু অন্যতম ও অমতের ফিরিস্তি-ভুক্ত। এ জগতে দুর্ভিক্ষ আছে, বন্যা আছে, সময়ে সরস্বতী ও অসময়ে রক্ষাকালী পূজার চাঁদা আছে, সাপ এবং আরশুলা আছে, দাঁতের গোড়া ব্যথা ও পায়ের কড়া পাকা আছে,—কত কী আছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মোটের উপর দুঃখ কষ্টের সীমা নাই। তাহার উপর বড়বাবুগণ জগতের দুঃখ বাড়াইতেই আছেন, ইহাই ছিল তাহার মত। কিন্তু অঘটন ঘটানোই বিধাতার সৃষ্টি পালনের নিয়ম। একদা, এই সুবিমলই হঠাৎ বড়বাবু হইয়া আত্মীয় বন্ধুদের স্তম্ভিত করিয়া দিল।

কিন্তু ইহাতে সুবিমলের অপরাধ ছিল না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অফিস ছোট। আগের বড়বাবু অকস্মাৎ দেহ রক্ষা করাতে এবং সুবিমলের প্রতি সাহেবের সুনজর থাকাতেই তাহার এই নিদারুণ ভাগ্য-বিপর্য্যয়। পদবৃদ্ধি হইল, বেতন বৃদ্ধি হইল, গৃহিণী ও আত্মীয় পরিজন সকলেই সন্তুষ্ট। কিন্তু সুবিমলের মনে হইল কাজটা ভাল হইল না। কাহাকে যেন সে প্রবঞ্চনা করিল। অথবা নিজেই যেন কাহার দ্বারা প্রবঞ্চিত হইল। বড়বাবু কুলের কুলদেবতা বুঝি বিদ্রোহী নেতাকে ভুলাইয়া আপন সিভিল সার্ভিসে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। কিছুকাল সুবিমল অতিশয় লজ্জিত হইয়া প্রায় মুখ লুকাইয়া ফিরিতে থাকিল।

কিন্তু উপায় নাই। বড়বাবুত্ব ছাড়িতে হইলে চাকরী ছাড়িতে হয়। অগত্যা সুবিমল কাজ করিতে লাগিল, কিন্তু সতর্ক হইয়া, যেন বড়বাবুসুলভ দুর্ব্বলতা তাহাকে গ্রাস না করে।

অ-বড়বাবু মনোভাব হইলেও সুবিমল বড়বাবুর কাজ এতাবৎকাল ভালই চালাইয়া আসিয়াছিল। অধীনে যে কয়জন বাবু আছেন, তাঁহারা নূতন ও নবীন বড়বাবুর মত জানিয়া চেষ্টার সহিত অভ্যাস বদলাইয়াছেন। কথা কহিতে কহিতে অকারণে 'সার' 'সার' প্রায়শঃই করেন না। শীত-কালে আম ও গ্রীষ্মকালে ফুলকপি কিনিয়া আনিয়া অসময়ের গাছের ফল বলিয়া বড় বাবুকে উপহার দেন না এবং তাঁহা-দের বাড়ীতে পূজার তত্ত্বে সন্দেশ আসিলে ছেলেদের বঞ্চিত করিয়া বড়বাবুর পূজায় একভাগ ব্যয় করিতেও হয় না।

উড়িষ্যা প্রদেশী বেয়ারা একটী ও বিহারপ্রদেশী দারোয়ান একটী। দুই জনেই বৃদ্ধ হইয়াছে কিন্তু ইহারাও এপর্য্যন্ত বিশেষ অসন্তোষের কারণ ঘটায় নাই। অতএব কালক্রমে বড়বাবুত্বর গ্লানি আর সুবিমলের তত উগ্ররূপে অনুভূত হয় না।

কিন্তু বাঙ্গালাদেশে 'পদ্মপাঠ' না কি যে একখানি প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ আছে তাহাতে বলে, "চিরদিন কভু কারও সমান না যায়।" এক্ষেত্রেও শাস্ত্রবাক্য ফলিতে সুরু হইল। অফিসের কাজ ও পুরাতন বেয়ারার বয়স, দুই-ই দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এই সত্যটী একদিন সাহেবের মস্তিষ্কে হঠাৎ প্রকট হইল। ফলে সাহেব বৃদ্ধ বেয়ারাকে একটী সহকারী লইতে আদেশ করিলেন। নির্ব্বাচন ও নিয়োগের ভার বড়বাবুর উপরই রহিল। অফিসের বৃদ্ধ বেয়ারা তাহার এক আত্মীয় সন্তানকে আনিয়া কাজে লাগাইয়া দিল। নিয়োগ করিল অবশ্য সুবিমল।

নূতন বেয়ারা দীনবন্ধুকে কাজের লোক বলিতে পারা যায়। অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি, দুই-ই তাহার আছে। বাঙ্গালা কথা প্রায় পরিষ্কার কহিতে পারে, তাহার উপর আছে ইংরাজীর অক্ষর পরিচয়। সুতরাং লোকটী অল্পদিনের মধ্যেই সাহেবের ও বাবুদের প্রসন্নতা অর্জ্জন করিল। শুধু সুবিমলের চিত্ত তাহার প্রতি প্রসন্ন হইতে পারিল না। পারিল না যে

তাহার জন্য দীনবন্ধুকে দায়ী করিতে পারা যায় না। তাহার দিক হইতে বড়বাবুর প্রসাদ লাভ করিবার চেষ্টার ত্রুটী ছিল না। সুতরাং দায়ী তাহার অদৃষ্টই বলিতে হইবে।

সুবিমল প্রথম হইতেই লক্ষ্য করিল লোকটী তাহার অর্থাৎ বড়বাবুর সম্বন্ধে অত্যধিক সচেতন। কথায় ও কাজে, সর্ব্বদাই সে সুবিমলকে এই পরম অপ্রিয় কথাটাই স্মরণ করাইয়া দেয় যে, সুবিমল বড়বাবু। শুধু বড়বাবু নহে, যেমন সাধারণ বড়বাবুরা হইয়া থাকেন যেন সেই রকম বড়বাবুই সুবিমল। সে যে সাধারণ বড়বাবু-জাতীয় বড় বাবু নহে এবং হইতে চাহে না তাহা দীনবন্ধুর ব্যবহারে মনে করিবার অবকাশ থাকে না।

আদেশ করিলে অগৌণে আদেশ পালন করা ভৃত্য বেয়ারাদের কর্ত্তব্য, সে কর্ত্তব্য তো দীনবন্ধু অখণ্ড মনোযোগের সহিত পালন করেই। পরন্তু আদেশ করিবার পূর্ব্বেই যখন সে মানসকর্ণে আদেশ শুনিয়া লয় ও অগ্রিম তাহা পালন করিতে ব্যগ্র হইয়া ছুটে, তখন সুবিমল অতিশয় অস্বস্তি বোধ করে। বড়বাবুর স্বাস্থ্য, বড়বাবুর সুবিধা ও বড়বাবুর আরামের প্রতি দীনবন্ধুর নিদারুণ ও নিয়ত তীক্ষ্ণদৃষ্টি সুবিমলের গায়ে খোঁচা মারিতে থাকে। আঠারো টাকা বেতনের বেয়ারা দীনবন্ধু আশে পাশে থাকিলে দুইশত টাকা বেতনের বড়বাবু সুবিমল সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, তাহার মন যেন হাত পা ছড়াইয়া বসিতে পারে না।

সাধারণ বড়বাবুগণ এ রকম মনোযোগী ও সেবাপরায়ণ বেয়ারা পাইলে বিশেষ প্রীত হইতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু দীনবন্ধুর অদৃষ্টদোষে তাহার বড়বাবু সাধারণ বড়বাবু নহেন। সুবিমল মুখে না বলিলেও দীনবন্ধু কেমন যেন অনুভব করে তাহার বড়বাবুর এই অপ্রসন্নতা এবং বড়বাবুর মনস্তুষ্টির তপস্যায় দীনবন্ধু যতই অধিকতর আগ্রহে বড়বাবুর উপর মন নিবিষ্ট করে, ততই তাহার মনোনিবেশের প্রাবল্যে সুবিমলের মন তাহার প্রতি আরও বাম হইয়া উঠে। ফলে বেচারী দীনবন্ধুর সেবাপরায়ণতা ও বেচারী সুবিমলের বিরূপতা দুই-ই পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া বাড়িয়াই চলিল।

অবশেষে কি করিয়া কি হইল কেহ বুঝিতে পারিল না, এক সোমবার মধ্যাহ্নে অফিসের সকলে শুনিল, নূতন বেয়ারাকে বড়বাবু জবাব দিয়াছেন অর্থাৎ চাকরী তাহার এখনও আছে বটে, কিন্তু সে মাত্র আর এক সপ্তাহের জন্য। বুড়া বেয়ারাকে ডাকিয়া বড়বাবু হুকুম দিয়াছেন এক সপ্তাহের মধ্যে অন্য বেয়ারা বন্দোবস্ত করিতে। তাহার পর এ অফিসে আর দীনবন্ধুর আয়ু নাই।

বুড়া বেয়ারা সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, দীনবন্ধুর অপরাধ কি এবং তাহা যাহাই হোক তাহার জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু বড়বাবু সংক্ষেপে জানাইয়া দিয়াছেন ও লোকটীকে দিয়া চলিবে না।

এ অফিসে চাকরীতে বহাল হওয়ার ঘটনা প্রায়শঃ ঘটে না, এবং চাকরী হইতে বরখাস্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত আরও বিরল। বাবুরা সুবিমলকে চেনেন। সুতরাং তাঁহারা নিরতিশয় বিস্মিত হইয়াছেন বড়বাবুর এই অভাবনীয় কঠিন আদেশে। ইহা সুবিমলের চরিত্রের সহিত মেলে না। শুধু বিস্মিত নয়, সকলেই অতি বিষণ্ণ হইয়াছেন।

এবং বড়বাবুর মনও যে খুশী নাই তাহা আর কেহ না জানিলেও স্ত্রী অরুণার অনুমান করিতে বিলম্ব হইল না। অরুণা বলে সুবিমলের মুখে তাহার মেজাজের থার্ম্মোমিটার আছে, একমাত্র সে-ই তাহা পড়িতে পারে। অফিস হইতে ফিরিবামাত্র স্বামীর মুখ দেখিয়া অরুণা সন্দেহ করিল অসন্তোষকর কিছু ঘটিয়াছে। কিন্তু কৌতূহল অপেক্ষা বুদ্ধি তাহার বেশী। এবং নারী হইয়াও তাহার একটী গুণ আছে। সে অপেক্ষা করিতে জানে। তাই জলযোগান্তে সুবিমল যখন ইজিচেয়ারে দেহ এলাইয়া সিগারেট ধরাইল, মাত্র তখনই অরুণা জিজ্ঞাসা করিল—

"কি হয়েছে গা?"

সুবিমল কহিল, "কার কি হয়েছে?"

"তোমার গো, আবার কার? আপিসে কিছু গোলমাল হয়েছে বুঝি?"

সুবিমল বিস্মিতকণ্ঠে কহিল, "অফিসে? না, অফিসে আবার কি হবে? কিছুই তো হয় নি?"

দক্ষিণে ও বামে মাথা নাড়িয়া অরুণা বলিল, "উঁ-হুঃ, তুমি বললেই আমি শুনব? নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। আপিসে না হোক্, কোথাও কিছু হয়েছেই। আমার থার্ম্মোমিটার মিছে কথা বলে না। তোমার মনটা আজ ভাল নেই, সত্যি কি না বল?"

সুবিমলও মাথা নাড়িল, ঊর্দ্ধ ও অধঃদিকে। তাহার মনে পড়িল অফিসের কথা। বলিল, "হুঁ, হয়েছে বটে। বড়বাবু হওয়ার সুখভোগ হচ্ছে। তখনি বলেছিলুম—যা' ভালবাসি না তাই হয়েছে।" তাহার কণ্ঠস্বরে বিরক্তি প্রকাশ পাইল।

পাওয়াই স্বাভাবিক। বড়বাবু হইবার তাহার ইচ্ছা ছিল না, বড়বাবু হইয়া সে তাহার আদর্শচ্যুত হইয়াছে। অথচ এই বড়বাবু হওয়ার জন্য অরুণা দুঃখ ও লজ্জাবোধ তো করেই না বরং অতীব খুশী হইয়াছে। তাহা ছাড়া শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে যে বড়বাবু হইয়াই থাকিয়া যাইতে হইয়াছে এবং

সাংসারের কথা ভাবিয়া সে যে আদর্শরক্ষার জন্য চাকরী ত্যাগ করিবার মত বল সঞ্চয় করিতে পারে নাই, ইহার জন্য তাহার মনে একটা অনির্দ্দিষ্ট ক্রোধ সর্ব্বদাই চাপা থাকে। সুযোগ পাইলেই তাহা এমন ভাবে আত্মপ্রকাশ করে যেন একমাত্র অরুণার অবিবেচনাতেই তাহাকে প্রতিদিন বড়বাবু হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার দুর্গতি ভোগ করিতে হইতেছে।

বুদ্ধিমতী অরুণা স্বামীকে চেনে। তাই কি সে ভালবাসে না ও কি-ই বা হইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিল না। সে বুঝিল বড়বাবু হওয়ার কণ্টক কোনো বাস্তবিক বা কাল্পনিক কারণে আবার নূতন করিয়া স্বামীকে পীড়া দিয়াছে। স্বামীর দুঃখে অরুণার সহানুভূতি নাই, এ কথা বলিলে তাহার প্রতি গভীর অবিচার করা হইবে। কিন্তু এই একটা বিষয়ে অরুণা সুবিমলের দুঃখকে ছেলেমানুষির পর্য্যায়ে ফেলিয়া কৌতুক বোধ করিয়া থাকে। হাসিমুখে অরুণা জিজ্ঞাসা করিল, "কি আবার সুখভোগ হ'ল গো এত দিন পরে? কে বুঝি বড়বাবু বড়বাবু ক'রেছিল?"

অরুণার অনুমান সত্যের অনেকটা নিকটবর্ত্তী হওয়াতে সুবিমল বিরক্ত হইল। ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া সে বলিল, "দেখ, যতই লেখাপড়া শেখো, মেয়েমানুষের মাথা যাবে কোথা? বড়বাবু বড়বাবু করার ভেতরের অর্থটা তোমাদের মাথায় কিছুতেই আসবে না। শুধু কথা হিসেবে ওটা কিছু মন্দ কথা নয়। কারণ কথাটা শ্লীলতার বাইরেও নয় আর রাজদ্রোহ-মূলকও নয়। বরং অনেকের কাণে বড়বাবু ডাকটা খুবই মিষ্টি লাগে।"

এই অনেকের কাণের ইঙ্গিত অতি স্পষ্ট ও পুরাতন। অরুণার বড়দাদা সুবিমলের চেয়েও বয়সে অনেক বড়,—একটী আফিসের বড়বাবু এবং অনেক দিনের বড়বাবু। সুবিমল বড়বাবু হওয়ার বহু পূর্ব্ব হইতেই এরূপ ইঙ্গিত অরুণাকে প্রায়ই শুনিতে হইয়াছে। ইহাতে সে রাগ করে না, আনন্দ পায়। সে কোন জবাব করিল না। অতএব সুবিমলের উত্তেজনা বাড়িয়া উঠিল।

সুবিমল উঠিয়া বসিল। এতক্ষণ সিগারেট ওষ্ঠাধরের মধ্যে ঝুলিতেছিল, এখন তাহা নামাইয়া বামহাতে লইয়া ডান-হাতের তর্জ্জনী উঁচু করিয়া সুবিমল কহিল, "কিন্তু প্রত্যেক কথার একটা শক্তি আছে তা' জানো? শব্দই ব্রহ্ম। কোনো কোনো কথার যেমন শক্তি আছে ভাল ক'রবার, কতকগুলো কথার আবার তেমনি খুবই অনিষ্টকারী শক্তি আছে। ক্রমাগত বড়বাবু বড়বাবু ক'রে একটা লোককে কতটা conceited করা যায় তা' কখনো ভেবেছ? আর যে করে তারও slave mentality বেড়েই চলে; ফলে পক্ষেরই mental degradation যা' হয় তা' তোমরা বাবু জজের দল ভাবতেই পারো না।"

অরুণার প্রকৃতি অতি বেয়াড়া। সে আরশোলাকে পর্য্যন্ত ভয় করে না, এবং স্বামীর তিরস্কারেও ভীত হয় না। কিন্তু বক্তৃতাকে তাহার অতিশয় ভয়। নানাবিধ সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াও সুবিমলের চরিত্রে একটী মহৎ দোষ আছে। সে নিজে যাহা ভাল কিম্বা মন্দ বলিয়া বুঝিত তাহা যে ভালই বা মন্দই, ইহা হাতের কাছে কাহাকেও পাইলে নিতান্ত নিবিড়ভাবে বুঝাইতে সুরু করে, এবং তাহার ভাব-প্রবণ প্রকৃতিতে অতি সাদা কথাও অচিরে বক্তৃতার সুর ও রূপ ধরে। আরও বিপদ এই, বিবাহের পর হইতে সুবিমল হাতের কাছে স্ত্রীকে যত বেশী পায় এত আর কাহাকেও নহে।

শব্দ-ব্রহ্মের সূত্র হইতে পাছে সুবিমলের কথা বক্তৃতার রজ্জুতে পরিণত হইয়া অরুণাকে বন্ধন করিতে সুরু করে, এই ভয়ে অরুণা তাড়াতাড়ি বলিল, "না না, তা কি আর জানি না। সত্যিই তো একেই আমাদের দেশের লোকেদের মনে slave mentality ভরা তার ওপর বড়বাবু বড়বাবু ক'রে তাদের মাথা একেবারে খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তাই আমি ভাবি—

সুবিমল ধমক দিয়া বলিল, "মিছে কথা বোলো না অরুণা, তুমি এ নিয়ে কোনদিন কিছু ভাবো নি। মিথ্যে তোমাকে তোমার বাবা দু বচ্ছর কলেজে পড়িয়েছিলেন। দেশের সত্যিকারের দুর্গতি যে কোথায় তা তোমরা ভাবতেই পার না। এই তুমি, শিক্ষিতা মহিলা বলে সমাজে চলে যাচ্ছ, কিন্তু সারা দিনে রাতে সংসারের কুটনো বাঁটনা আর পাশের বাড়ীর বৌয়ের নিন্দে ছাড়া তোমার life-এর আর কোন interest যে আছে এ পরিচয় কক্ষনো পাওয়া যায় কি? খবরের কাগজ একটা করে নাও, পড়া শুধু বায়োস্কোপের আর সিল্ক-কুঠীর বিজ্ঞাপনগুলো। আসল কাজে লাগে কাগজ শুধু ছেলেদের দুধ গরম করবার সময় আর তাঁদের বেড্‌প্যানের বদলে।"

স্বামীর সহিত আলাপে অরুণার সবচেয়ে গর্ব্ব ও বিপদের কথা এই যে, সুবিমল যখন শিক্ষিত নারীজাতি সম্বন্ধে অভিযোগ করে তখন একমাত্র অরুণাকে সম্বোধন করিয়াই তাহা করিয়া থাকে। ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে আনন্দ হয় বই কি। অরুণার স্বামীর চোখে অরুণা ব্যতীত জগতে আর শিক্ষিতা নারী নাই। কিন্তু সব সময় ভাবিয়া দেখিবার মত সময় বা মন থাকে না। একমাত্র নিজেকেই সকল অপরাধের আসামী রূপে দেখিয়া অরুণা বড়ই বিপন্ন বোধ করে। ভুলিয়া যায় যে সে অপর সহস্র আসামীদের প্রতিনিধি মাত্র।

সুবিমল বলিয়া চলিল, "দেশের লোকের অধঃপতন যে কতদূর হয়েছে তা ভাবলে তোমার হাসি বেরিয়ে যাবে।"

অরুণা বলিল, "কই আমি হাসি নি তো।" বলিয়াই হাসিয়া ফেলিল।

ভ্রুকুটির সহিত স্ত্রীর দিকে একবার চাহিয়া সুবিমল বলিল, "রাজা মহারাজা থেকে আরম্ভ ক'রে গরীব কেরানী পর্য্যন্ত একটা লালমুখ পুলিশসার্জেন্ট দেখলে একেবারে তটস্থ। বাঙ্গালীর কাণে কে যে প্রথম "Sir" মন্তর শুনিয়েছিল তা জানি না, কিন্তু হতভাগা বাঙ্গালী লজ্জা, ভয়, ঘৃণা ত্যাগ করে, আজও সেই মন্তর জপ করে চলেছে। বাঙ্গালীর মাথা খুব উর্ব্বর কি না, Sir এর শেকড় তার মাথায় গেড়ে বসেছে। কতদিনে যে তাকে উপড়ে ফেলতে পারা যাবে তা ভগবানই জানেন।"

শব্দ-ব্রহ্মের উপর আবার বাঙ্গালীর নাম শুনিয়া অরুণা প্রকৃতই সন্ত্রস্তা হইল। চিন্তাশীল ও দেশপ্রেমিক বাঙ্গালী যখন দেশের জন্ম দুঃখবোধ করেন, তখন তাঁহার কাছে বাঙ্গালীর ভীরুতা, বাঙ্গালীর অলসতা, বাঙ্গালীর অসাধুতা—এককথায় বাঙ্গালীর পরিপূর্ণ অপদার্থতা অপেক্ষা মুখরোচক বক্তৃতার বিষয় আর কিছু নাই। দেশের দুঃখ, দৈন্য ও দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করিয়া যতই তাঁহার হৃদয় ক্রন্দন করিতে থাকে ততই প্রবল ও প্রখর ভাষায় তিনি গালি পাড়িতে থাকেন এই ভূতলে অধম বাঙ্গালীদিগকে।

বিপদের সূচনা বুঝিয়াই অরুণা আত্মরক্ষার উপায় খুঁজিতেছিল। বক্তৃতার ফাঁকে সুবিমল সিগারেটে টান দিবার জন্ম থামিতেই সে মহাব্যস্ত হইয়া কহিল. "ঐ যাঃ, পানের জায়গাটা বুঝি তুলতে ভুলে গেছি। ঝি মাগি দেখতে পেলে আর কিছু বাকী রাখবে না।" বলিতে বলিতে সে ত্বরিত পদে বাহির হইয়া গেল।

মিনিট তিনচার পরে ফিরিয়া আসিয়া অরুণা দেখিল সুবিমল পুনরায় ইজিচেয়ারের পিঠে পিঠ মিলাইয়া সিগারেট টানিতেছে। আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া অরুণা আগাইয়া আসিল।

যাহাতে আবার বক্তৃতার জ্বর না আসে, ও জ্বরের ধমকে সুবিমল খাড়া হইয়া না বসে, সেই জন্ম অভিজ্ঞা অরুণা আগে হইতেই স্বামীর মাথায় আইস-ব্যাগ চাপিয়া ধরিল। অর্থাৎ নিঃশব্দে চেয়ারের পিছনে আসিয়া সুবিমলের কেশের মধ্যে ধীরে ধীরে আপন চম্পক অঙ্গুলিগুলি প্রবেশ করাইয়া দিল। সুবিমলের বিবাহিত জীবনে ইহা একটী পরম বিলাস। আরামে তাহার চক্ষু দুইটী মুদিয়া আসিল অরুণা তাহার থার্ম্মোমিটারে পড়িল ধীরে ধীরে স্বামীর মেজাজের তাপরেখা নামিয়া আসিতেছে।

কিন্তু বুদ্ধি বেশী থাকিলেও অরুণা নারী তো বটে। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া প্রশ্ন করিল, "হ্যাগা, অপিসে কি হয়েছে তাতো বল্লে না?"

নিমীলিত-নয়নে সুবিমল কহিল, "হয় নি বিশেষ কিছু, মানে, এমন কিছু নয়। নূতন একটা বেয়ারা এসেছিল ক'দিন, সেটাকে জবাব দিয়ে দিইছি।"

"কাকে গো? সেই দীনবন্ধুকে? আহা, কি করেছিল সে?"

সুবিমল ঊর্দ্ধনেত্রে অরুণার মুখের দিকে চাহিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "তুমি চিনলে কি করে? নূতন বেয়ারার নাম যে দীনবন্ধু তোমায় কে বল্লে?"

"ওমা, তোমায় বলি নি বুঝি? সে যে দু'দিন এসেছিল আমাদের বাড়ীতে। তুমি বাড়ী ছিলে না। এলেই আমাকে পেন্নাম করে। মা মা' বলে কত গল্প করে, দেশের কথা, একথা সে কথা। তোমার সুখ্যেতে তার মুখে ধরে না। লোকটী তো মন্দ নয় বাবু।"

সুবিমল আবার চক্ষু মুদিয়া কহিল, "হুঁ, ঠিকই করেছি তা'হলে। বেটা কাজকর্ম্ম যতটুকু শিখেছে তার চেয়ে বেশী শিখেছে খোসামুদিটা। অফিসে আমাকে খোসামোদ করেই ওর হ'ল না, আবার বাড়ীতে আসে তোমার মন ভিজিয়ে রাখতে। বেশী সেয়ানা কি না?"

অরুণা কহিল, "তা এলেই বা। এসেছে বলে আর এমন কি অন্যায় করেছে?"

সুবিমল বলিল, "না, অন্যায় করেছে তা কি আমি বলছি? কিন্তু ওর কাকা, আমাদের বুড়ো বেয়ারা ঈশ্বর, এতদিনের মধ্যে ক'দিন তোমার কাছে এসেছে? ঐ যে বল্লুন বেশী সেয়না কি না।"

সকলপ্রকার তোষামোদ-অসহিষ্ণু স্বামীর নিকটে দীনবন্ধুর অপরাধ অনুমান করিতে অরুণার বিলম্ব হইল না। সে বলিল, "তাই বলে বেচারীর চাকরীটা যাবে? আহা, গরীবমানুষ! এ বাপু তোমার লঘুপাপে গুরুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে।"

দীনবন্ধুর অপরাধের তুলনায় তাহার শাস্তিটা অতি গুরু হইয়াছে কি না, এই সন্দেহে সুবিমলের চিত্তে অস্বস্তি ছিলই। সুতরাং অরুণার মুখে ঠিক সেই কথাই শুনিয়া ও তাহার কণ্ঠের সহানুভূতির সুরের মধ্যে সুবিমলের ন্যায়-বিচারের প্রতি কটাক্ষ অনুভব করিয়া তাহার তর্ক ইচ্ছা উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। আত্ম-সমর্থনের উদ্দেশ্যে তোষামোদ প্রবৃত্তির ভয়াবহতা সম্বন্ধে ভয়াবহ রকমের কিছু বলিতে উদ্যত হইয়া সে উঠিয়া বসিতে যাইতেছিল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই মাথার উপর সঞ্চলনশীল কোমল ও লীলায়িত স্পর্শের অনুভূতিসুখে সে ইচ্ছা দমন করিয়া পুনরায় নিমীলিত নয়নে সিগারেট টানিতে লাগিল।

মিনিট দুয়েক পরে সুবিমল কথা কহিল। কণ্ঠে তর্কের

ঝাঁঝ নাই। কহিল, "দেখ অরুণা, শরীরের ভালমন্দ প্রায় সব সময়েই প্রত্যক্ষ করা যায়। তাই শারীরিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমরা সাবধান হতে পারি। যদিও যতটা হওয়া দরকার ও উচিত তার সিকিও আমরা হই না। হ্যাঁ, তুমি সেই নূতন ওষুধটা খাচ্ছ না তো?"

অরুণা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ। কতবার জিজ্ঞেস করবে? সকালে তো বললুম।"

"বেশ। হ্যাঁ, শরীরের স্বাস্থ্য আমরা যদিও বা একটু আধটু দেখি, কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে আমরা একেবারে hopelessly উদাসীন! মনেরও একটা স্বাস্থ্য আছে সেটা মানো তো?"

অরুণা স্বামীর মাথায় একটা পাকা চুল দেখিতে পাইয়াছিল। সেটাকে বাগাইয়া ধরিবার পুনঃপুনঃ চেষ্টায় মনোনিবেশ করিয়া সুবিমলের মূল্যবান বাণীর শেষাংশ শোনে নাই। পত্নীর উত্তর না পাইয়া সুবিমলের কণ্ঠ উচ্চ হইল। "কি গো, মানসিক স্বাস্থ্য তুমি মানো না?"

অরুণা পাকা চুলটী অতি সাবধানে করায়ত্ত করিয়া বলিল, "না না, আমি বলছি—"

সুবিমল কণ্ঠ আরও একগ্রাম চড়াইয়া বলিল, "কি আশ্চর্য্য! এতে আবার বলবার কি আছে? আজকের দিনে mental hygiene মানে না এমন লোকও আছে?"

কেশোৎপাটন সমাধা হইল। খুশী মনে অরুণা বলিল, "হ্যাঁ mental hygiene? বাঃ, তা আর বলতে। মনের স্বাস্থ্যই তো আগে। তা নইলে শরীরের স্বাস্থ্য আসতেই পারে না।"

সুবিমলও খুশী হইল। কহিল, "কিন্তু তোমার এই দীনবন্ধু-জাতীয় লোকের সংস্পর্শে বেশীক্ষণ কাটালে সেই মানসিক স্বাস্থ্যের যথেষ্ট হানি হয়। আচ্ছা, আজকের ব্যাপারটা শুনলেই তুমি বুঝতে পারবে বেটার খোসামুদির ধারাটা। আজ আফিস যেতে একটু দেরী হয়েছিল তা তো জানো? আমি হলের ভেতর ঢুকছি দেখি দীনবন্ধু আমার গ্লাসটায় জল ভরে টেবিলে রাখছে। আমার টেবিল হলের একেবারে শেষপ্রান্তে, ও আমাকে দেখতে পায় নি। তারপর এসে বসেছি মাত্র, দীনবন্ধু 'দণ্ডবৎ' করে পাখাটা খুলে দিয়ে এসে দাঁড়াল টেবিলের ধারে। বললুম কি চাই? বল্লে "আজ্ঞে না, কিছু চাই না, বড়বাবুর শরীরটা কি তেমন ভাল নেই আজ?" এইরকমের প্রশ্ন সপ্তাহের মধ্যে পাঁচদিন ও আমাকে করবেই। দেখ আত্মীয়তা খুব ভাল জিনিষ। কিন্তু প্রত্যহ চাকর বেয়ারার সঙ্গে আত্মীয়তা করা আমার সুখকর বলে মনে হয় না।"

অরুণা হাসিয়া বলিল, "তা সত্যি বাবু! এরকম বাড়াবাড়ি কার ভাল লাগে বল?"

সুবিমল বলিল, "সোমবারে টেবিলে তুদিনের মেল জমে ওঠে, মন তখন সেই দিকে। তার ওপোর আবার অফিসে আসতেই বেলা হয়েছে, আমার তখন দীনবন্ধুর সঙ্গে 'হা-ডু-ডু' (How d'ye do) করবার মত মন নয়। ইচ্ছে করল দি বেটার কান ধরে হলের বার করে কিন্তু তা না করে বললুম, না শরীর ভালই আছে, আচ্ছা, তুমি যেতে পার। তা কি বেটা যাবে। বেটা তখন করলে কি জানো? আমার জলের গ্লাসটা তুলে নিয়ে থিয়েটারি স্বগতোক্তি করলে 'জলটা গরম হয়ে গ্যাছে'। বলে গ্লাসটা নিয়ে গিয়ে জল ফেলে আবার কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে রেখে গেল। বুঝতেই পারছ আগের জলটা তু' মিনিটও হয় নি ভরে রেখেছে, কাজেই সেটা গরম হয়ে যাবার কথা একেবারেই মিথ্যে। এ কেবল আমার মনোযোগ আকর্ষণ করবার চেষ্টা। আমাকে দেখানো যে আমার সুখ-সুবিধের দিকে ওর কী সজাগ দৃষ্টি।"

অরুণা কহিল, "তা সেটা কি মন্দ? ও তোমার চাকর, তুমি বলবে তোমার নয়, আপিসের চাকর—কিন্তু আপিস তো ওদের রেখেছে তোমাদের কাজ করবার জন্যেই। কাজেই তোমার সুখ-সুবিধে দেখা, তোমাদের সেবা করাই ওদের কর্ত্তব্য নয় কি?"

সুবিমল ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তুমি আমার পয়েন্টটা ঠিক ধরতে পারনি, অরুণা। কিম্বা ধরেও মিছে তর্ক করেছ। আমাদের সেবা করা ওর কাজ সেটা আমিও জানি। তাই পরসেবা করাতে তো আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ঐ যে একটা ইয়ে—মানে একটা ভান—অর্থাৎ ostentation, ঐ ভড়ংটা আমি সহ্য করতে পারি না। প্রত্যহ বেয়ারা এসে কুশল প্রশ্ন করবে, বিনা কাজে আশে পাশে ঘুর ঘুর করবে, শ্রীরাধিকার মত জল ফেলে জল আনতে যাবে, —এগুলো তো ওর কর্ত্তব্যের অন্তর্গত নয়।"

এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সুবিমল বলিল, "তারপর আরও আছে শোনো। কি একটা কাজে সাহেবের ঘরে গেছি, ফেরবার সময় একাউন্ট্যান্ট বুড়ো প্রফুল্লবাবুর টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে তুটো কথা কইছি। ব্যস্। শ্রীমান দীনবন্ধুর কোমল হৃদয় অমনি কেঁদে উঠল। তিনি আমার পেছনে লাগলেন, শুধু হাতে নয়, একখানি চেয়ার সমেত।"

অরুণা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন গা? চেয়ার কি হবে?"

সুবিমল কহিল, "যা-াঃ, তুমি দেখছি আমাকে দীনবন্ধুর মতন ভালবাস না! তা' বাসলে বুঝতে পারতে যে তু'মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে আমার কী অসহ্য কষ্ট হয়। আর সে কষ্ট তোমার বুকে শেল-সম বাজতো, যেমন দীনে বেটার বুকে বাজে।"

অরুণা হাসিয়া ফেলিল। কহিল, "তুমি বকো না বাবু। তারপর কি হ'ল বল।"

সুবিমল কহিল, "তুমি হাসছ, কিন্তু ওর জ্বালায় আমার কোথাও গিয়ে এক মিনিট দাঁড়াবার জো নেই। ওর ঐ চেয়ার নিয়ে তাড়া করার ভয়ে আমাকে প্রায় সিট্ থেকে ওঠা ত্যাগ করতে হয়েছে। যেখানে দাঁড়াব অমনি সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে একখানা চেয়ার টেনে এনে আমার পেছনে রাখবেই। বাবুরা হাসে। অবশ্য আমাকে উপহাস ক'রে হাসে না, দীনবন্ধুর ব্যাপার দেখেই হাসে। কিন্তু আমার তো হাসি আসে না, গা জ্বলে যায়।"

দীনবন্ধু-তাড়িত স্বামীর দুর্দ্দশার কাহিনী শুনিয়া অরুণার মুখ চাপা হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাহার সৌভাগ্য বশতঃ সুবিমল তাহা দেখিতে পাইল না। সে বলিল, "আজ তাই তাকে ডেকে ব'লে দিলুম, এখানে তার সুবিধে হবে না। মাস কাবার হ'তে আর দিন সাতেক আছে, এর মধ্যে অন্যত্র চাকরী দেখে নিক।"

অরুণার মুখের হাসি নিবিয়া গেল। কিন্তু সে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিল না। করিল না বলিয়াই সুবিমলের চিত্তে পুনরায় স্বস্তির অভাব হইল। একটুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সে বলিল, "কি গো কিছু বলছ না যে?"

অরুণা বলিল, "কি বলব? সত্যিই তো, তোমার অসুবিধে হচ্ছে, তুমি আপিসের বড়বাবু একটা বেয়ারা পছন্দ না হ'লে আর একটা বেয়ারা রাখবে। তাতে আমি কি বলব?"

অরুণার কথায় না আছে ব্যঙ্গের সুর, না আছে দরিদ্র দীনবন্ধুর জন্য অনুযোগ বা অনুরোধ। এবং বড়বাবুর ক্ষমতা সম্বন্ধেও তাহার কথায় যুক্তির অভাব নাই। ইহা সুবিমলের ভাল লাগিল না। সে হাত বাড়াইয়া স্ত্রীর হাত ধরিয়া বলিল, "থাক, আর মাথায় হাত বুলোতে হবে না। শোনো, সামনে এসো। আমি যে বড়বাবু তা' আমি জানি, কিন্তু তুমি যে মনে করছ—"

অরুণা স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "না গো, তা' আমি মনে করিনি। আমি মনে করিনি যে তুমি বড়বাবু হ'য়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করছ, লোকের হাতে মাথা কাটছ।"

সুবিমল পত্নীর হাত ধরিয়া টানিয়া সামনে আনিয়া বলিল, "দীনেটাকে ওর কাকা, মানে আমাদের বুড়ো বেয়ারা ঈশ্বর, ঠিক অন্য কোথাও ঢুকিয়ে দেবে। ওদের সব অফিসেই ভাই-বেরাদার আছে। ভদ্দর লোকের চাকরী গেলে চাকরী পাওয়া দুঃসাধ্য, কিন্তু ওরা চটপট্ চাকরী জোটায়। ওর জন্যে তুমি ভেবো না অরু, বুঝলে?"

অরুণা বুঝিল। বুঝিল এ আশ্বাস তাহাকে নহে, সুবিমল নিজেকেই দিতেছে। বলিলে সুবিমল স্বীকার করিবে না, কিন্তু দীনবন্ধুকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া তাহার আসন্ন অন্নচিন্তার দুশ্চিন্তায় সুবিমল বোধ করি দীনবন্ধুর অপেক্ষা কম কাতর হয় নাই। ইহা অরুণার অজ্ঞাত নহে।

তিন

সন্ধ্যার পর দীনবন্ধু আসিয়া উপস্থিত। সুবিমল তখন ক্লাবে গিয়াছে। তাহার জন্য দীনবন্ধুকে নিরাশ হইতে দেখা গেল না। বরং বড়বাবুর সে সময়ে বাড়ী না থাকাই তাহার হিসাবের মধ্যে ছিল। তবু বাহিরে চাকরকে জিজ্ঞাসা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া সোজা ভাঁড়ার ঘরের সামনে রকে উঠিয়া একটী ভূমিষ্ঠ দণ্ডবৎ করিল। ঘরের ভিতর অরুণা বসিয়া তরকারী কুটিতেছিল। বাহিরের আলো আঁধারে প্রথমটা চিনিতে পারে নাই। কিন্তু দীনবন্ধুর মত লোক অপ্রতিভ হয় না। সে নিজেই পরিচয় দিল, "মা, আমি আপনার চাকর দীনবন্ধু।"

অন্যদিন হইলে হয় তো অরুণা বলিয়া ফেলিত, "কে দীনবন্ধু?" কিন্তু আজ কিছুক্ষণ আগেই দীনবন্ধু-তত্ত্ব প্রচুর আলোচনা হইয়া গিয়াছে। ভুল করিবার অবকাশ নাই।

সে কহিল, "এসো এসো, ভাল আছ তো দীনু?" বলিয়াই তাহার মনে হইল ঠিক আজকের দিনেই দীনবন্ধুকে কুশলপ্রশ্ন করাটা ভাল শুনাইল না। এবং এই কুশল-প্রশ্নের পথ ধরিয়া যে অচিরে দীনবন্ধুর অনুযোগ ও আবেদনের স্রোত আসিয়া উপস্থিত হইবে তাহা অরুণার প্রখর সহজ বুদ্ধিতে অনুমান করিতে ভুল হইল না।

হইলও তাহাই। বুদ্ধিমান দীনবন্ধু এ সুযোগ ত্যাগ করিল না। তাহার আবেদন উত্থাপন করিবার,—যে উদ্দেশ্য লইয়া আজ তাহার বড়বাবুর বাড়ীতে বড়বাবুর অসাক্ষাতে মা এর নিকট অভিযান,—উত্থাপন করিবার জন্য আর ভণিতার প্রয়োজন হইল না।

ঘণ্টাখানেক পরে, সজল চক্ষু মুছিয়া প্রায় হাসিমুখে দীনবন্ধু যখন বিদায় লইল তখন এটুকু ধারণা লইয়া সে গেল যে চাকরী যদি তাহার ইহার পরও যায়, তবে বুঝিতে হইবে সে চাকরী রক্ষা করিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও পারিতেন না। অরুণার স্বভাব-স্নেহশীল মন পূর্ব্ব হইতেই ভিজিয়াছিল, দীনবন্ধু তাহাকে গলাইয়া দিয়া গেল।

বিপদ হইল অরুণার। দীনবন্ধু লোকটী একটু বেশী বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়া সময় সময় যে নির্ব্বুদ্ধিতা করিয়া ফেলে, সেটুকু বাদ দিলে তাহাকে মন্দলোক বলা যায় না। অরুণার ধারণা হইল লোকটি প্রকৃতই দুস্থ ও স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদির অন্ন-সংস্থানের চিন্তায় কাতর। ছোট অফিসে কাজ বেশী নয়, বেতনও খুব কম নয়, বাবুদের ব্যবহার ভাল, এরকম চাকরী ছাড়িতে হইলে ব্যাকুল হইবারই

কথা। তাহা ছাড়া তাহার না কি জমিজমা বিশেষ কিছু নাই, বেশীদিন বেকার বসিয়া থাকিলে অনায়াসে সংসার চলিবে এমন কোন ব্যবস্থাই সে দেশে রাখিয়া আসিতে পারে নাই, ইত্যাদি নানা কথায় সে অরুণার এজলাসে তাহার মামলা ভালোই চালাইয়া গিয়াছে। কিন্তু মামলার নিষ্পত্তি তো তাহার এজলাসে হইবে না। তাই অরুণার দুশ্চিন্তা সে কি করিয়া স্বামীর কাছে দীনবন্ধুর কথা পাড়িবে। কথা তুলিতে গেলেই প্রথমে দিতে হয় তাঁহার আবার আগমনের সংবাদ। আর তাহা হইলে সুবিমল যে দীনবন্ধুর আগমনকে তোষামোদপ্রচেষ্টা ভিন্ন আর কিছু ভাবিবে সে সম্ভাবনা কম। উপর আদালতে মামলা প্রবেশ লাভই করিবে না, জয়লাভ ত' দূরের কথা।

দিন তিনেক কাটিয়া গেল। অরুণা বড় উকীল নয়; মোকর্দ্দমা হাতে লইয়া সে মক্কেলের কথা ভোলে নাই। কিন্তু এই তিন দিনের মধ্যে সে একদিনও সুযোগ পাইল না সুবিমলের কাছে কথা তুলিতে। ঠিক এই সময়ে আবার এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর বাটীতে বিবাহ ব্যাপারে সুবিমলকে কয়দিন অফিসের ফেরৎ সেখানে যাতায়াত করিতে হইতেছিল। রাত্রে গৃহে ফিরিয়া আহারাদি সারিয়া যতটুকু সময় ঘুম আসিতে লাগে তাহা বিয়ে বাড়ীর গল্প করিতেই ফুরাইয়া যায়। সারাদিনের পরিশ্রম-ক্লান্ত স্বামীর সহিত তখন আর পরের হইয়া মামলা লড়িতে অরুণারও মন চাহে না।

কিন্তু যত সময় যায় তাহার মনে হয় সবই বৃথা যাইতেছে। সপ্তাহ পূর্ণ হইতে আর দেরী নাই। বেচারা দীনবন্ধু! যে তাহারই উপর একান্ত নির্ভর করিয়া দিন গুণিতেছে,—তাহার চাকরীর তরী একবার ডুবিয়া গেলে আর কি পুনরুদ্ধার হইবে? ফাঁসীর পর আপীল করিয়া কি ফল? কোমল-হৃদয়া অরুণা কল্পনার চোখে দেখে দীনবন্ধুর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা উড়িষ্যার সুদূর গ্রাম হইতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে তাহাদের ভবিষ্যতের জন্য। বাস্তব ও কল্পনা মিলিয়া অরুণাকে এমন এক জায়গায় দাঁড় করাইয়া দিয়াছে যেখানে দাঁড়াইয়া তাহার নিজেকে দীনবন্ধু ও তাহার অসহায় পরিবারের একমাত্র ত্রাণকর্ত্রী বলিয়া মনে হইতেছে। কাজ হাসিল না করিয়া সে উচ্চপদ হইতে সসম্মানে নামিয়া আসিবার কোন উপায় নাই। অরুণা বড়ই বিপদে পড়িল।

চার

শুক্রবার সকালে এক সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। কি কারণে সেদিন অফিসের ছুটি ছিল। অনেক কেরাণীর মত সুবিমলের সংসারেও নিত্য বাজার চাকরের হাত দিয়াই সম্পন্ন হইত। কেবল রবিবার ও ছুটির বারে সুবিমল নিজে বাজারে যাইত। গৃহিণী ও ছেলেরা খুশী হইত, সেদিন ভাল ও বেশী মাছ তরকারী আসিবে, খাওয়া-দাওয়াটা অন্যদিনের অপেক্ষা সুচারু হইবে যথারীতি সেদিনও সুবিমল বাজারে গিয়াছিল। দুই তিন প্রকার মাছ কিনিয়াছে, তাহার মধ্যে একটী নাতিবৃহৎ আস্ত রুই মাছ। উঠানে মাছ কোটার পর্ব্ব শুরু হইয়াছে, ছেলেরা মাছের আশে পাশে কলরব করিয়া ঘুরিতেছে। অরুণা ভৃত্য গোকুলকে বিভিন্ন তরকারির জন্য বিভিন্ন আকারের ও প্রকারের মাছ কুটিবার নির্দেশ দিতেছে।

কয়দিন আকাশের মুখ ম্লান ও গম্ভীর ছিল, মধ্যে মধ্যে বর্ষণও হইয়া গিয়াছে। আজ সকালে মেঘ কাটিয়া গিয়া আকাশের হাসি দেখা দিয়াছে। ভাঁড়ার ঘরের সামনে দাওয়ায় একটী মোড়ায় বসিয়া, দেয়ালে ঠেস্ দিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে সুবিমল আপন গৃহের এই শান্তির হাওয়াটি সকাল বেলার উজ্জ্বল আলো ও শীতল বাতাসের সঙ্গে গভীর তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিতে লাগিল। নিজের হাতে গড়া স্বচ্ছল সুখের সংসারে গৃহিণীপণা করিবার আনন্দ সদ্যস্নাতা অরুণার সুন্দর মুখে একটী গম্ভীর শ্রী দান করিয়াছে। সেই প্রসন্ন ও প্রশান্ত প্রিয় মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া সুবিমলের মনে হইল, এই নারীরত্নকে অদেয় তাহার কিছুই নাই। মনে হইল রাজা দশরথের মত সে অরুণাকে বলে, 'অরুণা, তুমি আমার পত্নীরূপে, আমার গৃহিণীরূপে, আমার প্রিয়ারূপে, তোমার সর্ব্বতোমুখী প্রেমে আমাকে যে পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিয়াছ, তাহার জন্য আমি তোমাকে বর দিব। তোমার যাহা প্রার্থনীয় আছে বল, যদি মানুষের সাধ্য হয়, আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি তাহা আমি পূর্ণ করিব'। কৈকেয়ীর সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দশরথ তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীকে মাত্র দুইটি বর দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন! সুবিমলের মনে হইল দশরথ কী কৃপণ ছিলেন! তিনি দুইটি মাত্র ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াই পত্নীপ্রেমের ঋণ শোধ করিতে চাহিলেন। সুবিমল ভাবিয়া পাইল না ইহা কি করিয়া সম্ভব হইবে যে, তৃতীয় বর চাহিলে দশরথ বলিবেন, "না, তোমার পাওনা চুকিয়া গিয়াছে, আর আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে বাধ্য নই।" সে তো অরুণাকে অজস্র ও বিবিধ উপায়ে সন্তুষ্টি ও সুখ দান করিয়াও মনে করে না যথেষ্ট হইল। অরুণার মত স্ত্রীর অভিলাষ নির্ব্বিচারে পূর্ণ করিয়া তবে না আনন্দ! সে অভিলাষ কি অঙ্গুলি গণিয়া পূর্ণ করিতে হইবে? এ কি ভৃত্যের বেতন, না, গয়লার পাওনা, যে বলিবে, 'এত দিন কাজ করিয়াছ, বা এত সের দুধ জোগাইয়াছ; তোমার হিসাবে এই পাওনা হইয়াছে, তাও ইহার কমও দিব না, কিন্তু ইহার বেশীও আশা করিও না।"

সুবিমল স্মিতমুখে সেই মুহূর্ত্তে নিজেকে দশরথের অপেক্ষা, পৃথিবীর সকল পত্নীপ্রেমিক পতির অপেক্ষা, অধিক প্রেমপূর্ণ ভাবিয়া প্রগাঢ় আনন্দ ও গর্ব্ববোধ করিল।

ঠিক এই মুহূর্ত্তে স্বামীর দরাজ মেজাজের (expansive

mood) সংবাদ অরুণার জানা থাকিলে সে অনেক কিছু চাহিয়া লইতে পারিত। অন্ততঃ তাহার আশ্রিত দীনবন্ধুর আশঙ্কিত অন্নকষ্ট হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া নিজের শান্তি অব্যাহত রাখিত। কিন্তু সে তাহার এই সম্ভাবিত সৌভাগ্যের কোন সংবাদ পাইল না, সে মাছ কোটাইবার তুচ্ছ কাজেই ব্যাপৃত রহিল। সুবিমলও স্ত্রীকে এ সংবাদ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিল না, নীরবে সিগারেট টানিতে লাগিল।

বাহিরের সদর দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল। সুবিমল কহিল, "কে ডাকে দেখ্ তো রে।"

মাছ রাখিয়া গোকুল উঠিয়া গেল, ফিরিয়া আসিয়া জানাইল একটি লোক দেখা করিতে চায়।

সুবিমল জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম লোক? ভদ্দর-লোক?"

"না বাবু, এই আমাদের মতন গরীব মানুষ, বোধ হয় কিছু চায় টায়।"

সুবিমল কহিল, "আচ্ছা, ডেকে নিয়ে আয় এইখানেই। আর উঠতে পারি নী।"

ভদ্রলোক নয় শুনিয়া অপরিচিত ব্যক্তির আগমনে অরুণা সরিয়া যাইবার কোন কারণ দেখিল না। সে কলেজে পড়া মেয়ে, স্বামীর সহিত বাসে, ট্রামে ঘোরে, এবং ইচ্ছামত দ্রব্য পছন্দ করিয়া কিনিতে হইলে স্বামীর সহিত দোকানে গিয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও নিজের বাড়ীতে অপরিচিত ভদ্রলোকের সম্মুখে বাহির হইতে এখনও তাহার সংস্কারে বাধে। এবং সুবিমল আধুনিক কালের শিক্ষিত ও বহু বিষয়ে সংস্কারবিহীন হইলেও বৈঠকখানায় স্ত্রীকে প্রতিষ্ঠিত করিবার বা নির্বিশেষে সকল বন্ধুর সহিত আলাপ করাইয়া দিবার চেষ্টা বা ইচ্ছাও কখনো করে নাই। এ বিষয়ে অরুণার আচরণ এখনো অনেকখানিই তাহার মা, ঠাকুরমার আদর্শে চলিয়া আসিতেছে।

কিন্তু আর একটু বয়স হইলে পুরাতন গৃহিণীদের মতই একখানি গামছা পরিয়া ও আর একখানি গামছায় উর্দ্ধাঙ্গ আবৃত করিয়া পূর্ব্ববঙ্গীয় মুসলমান গুড়ওয়ালা ও পশ্চিম-প্রদেশী খোট্টা ডালওয়ালার সহিত দর করিয়া সওদা করিতে তাহারও বাধিবে না; দুর্দ্ধর্ষ আকৃতি ঘুটিয়া-বিক্রেতাকে ধমক দিয়া এক পয়সায় চার গণ্ডার উপর এক গণ্ডা ফাউ আদায় করিতে সেও অবলীলাক্রমে প্রবল উদ্যম ও প্রখর কণ্ঠ নিয়োজিত করিবে। কারণ ইহারা ভদ্রলোক নয়। ইহাদের কাছে লজ্জা ও শালীনতা রক্ষার জন্য শাড়ীর নীচে সেমিজ ব্যবহার অবশ্য প্রয়োজনীয় নয়, এমন কি গামছাদ্বারাই শাড়ীর কাজ যথেষ্ট চলিতে পারিবে।

এ সকল কথা আমি ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেছি না। এতদূর স্পর্দ্ধা আমার নাই। ইহা সুবিমলের কথা। আজিকার অরুণা উত্তরকালে কিরূপ অরুণায় দাঁড়াইবে তাহারই প্রসঙ্গে সুবিমল এই সব ভবিষ্যদ্বাণী করে। অরুণা হাসে ও প্রবল প্রতিবাদ জানাইতে প্রবল বেগে মাথা নাড়িতে থাকে। কিন্তু বনিয়াদী গৃহস্থ ঘরের প্রবীণা বঙ্গমহিলার অতিঅদ্ভুত লজ্জা-বোধ সম্বন্ধে স্বামীর অঙ্কিত চিত্র অস্বীকার করিতেও পারে না।

আগন্তুক আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া রকের উপর প্রায় মাথা ঠেকাইয়া গৃহস্বামীকে প্রণাম করিল। লোকটির বুদ্ধির অভাব নাই, মাথা তুলিয়া উঠানে সম্ভ্রান্ত নারীমূর্ত্তিকে দেখিয়া গৃহ-স্বামিনীকে চিনিয়া লইল। সেদিকেও সে একটী অতি-অবনত প্রণাম নিবেদন করিয়া দিল।

সুবিমল ও অরুণা দেখিল অতি সাধারণ-দর্শন, প্রায় মধ্য-বয়স্ক একটী অপরিচিত বঙ্গ বা উড়িষ্যা-সন্তান। দরিদ্র তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার প্রণাম সাঙ্গ হইলে সুবিমল প্রশ্ন করিল, "তোমাকে তো আমি চিন্‌তে পারলুম না। কি চাই তোমার?"

লোকটী সবিনয়ে উত্তর করিল, "আজ্ঞে, আমাকে চিনবেন কি ক'রে বাবু। আমি তো পূর্ব্বে কখনো আপনার শ্রীচরণে আসি নি।"

সুবিমলের সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। সে তাহার দ্বিতীয় প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিল, "তা' তোমার কি চাই?"

আগন্তুক বলিল, "আজ্ঞে, বলি বাবু। অধীনের নাম শ্রীনিতাহরি দাস ঘোষ। পিতার নাম ৺ সত্যহরি দাস ঘোষ। নিবাস মেদিনীপুর জেলায়। কায়স্থের ছেলে বাবু। পেটের দায়ে এই হীন কর্ম্ম করতে হচ্ছে।"

নিতাহরির দ্বারা ইতিমধ্যে কি হীন কর্ম্ম সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা অবশ্য সুবিমলের জানা নাই। কিন্তু তাহার পৌরাণিকী পরিচয় দানের প্রথা দেখিয়া সুবিমলের সন্দেহ ছিল না যে, যথাসময়ে সকল সংবাদই বিনা চেষ্টায় অবগত হওয়া যাইবে। নিত্যহরিরা যে পাঠশালার লোক, সেখানে পরিচয় অর্থে নাম, ধাম, জাতি, পিতৃপরিচয় এমন কি বেতন অবধি সবই বলিতে শেখানো হয়। সুতরাং সে সকৌতুহলে অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু নিতাহরির বক্তৃতা হঠাৎ থামিয়া গেল।

অরুণার মন মাছের উপর হইতে সরিয়া নবাগতের কথা-বার্ত্তায় নিবিষ্ট হইয়াছিল। ইতিমধ্যে গোকুল ভৃত্য অন্য মাছ শেষ করিয়া রুই মাছে হাত লাগাইয়াছিল। নিতাহরি সেই দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ তাহার আত্মকথা ত্যাগ করিয়া বলিল, "উঁহুহু, ও কি করছ ভাই ওরকম নয়, ওরকম নয়।" বলিতে বলিতে সে দ্রুত গোকুলের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। বিস্ময় চকিত গোকুলের হাত অচল হইয়া গেল, সে মাথা তুলিয়া

জিজ্ঞাসুনেত্রে নিত্যহরির দিকে চাহিল। কিন্তু নিত্যহরি তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা না করিয়া বলিল, "কিছু মনে কর না দাদা, দেখি একবার বঁটীটা।" এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রায় তাহাকে ঠেলিয়া দিয়াই বঁটীর উপর চাপিয়া বসিয়া মাছটি হাতে তুলিয়া লইল। পরমুহূর্ত্তে বিস্মিত কর্ত্তা, গৃহিণী ও ভৃত্যের বিস্ময় বর্দ্ধন করিয়া নিত্যহরি নিপুণহস্তে মাছের মুণ্ড ও দেহ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। পরে মাছের মুড়া হইতে পিত্তের থলি বাহির করিতে করিতে ভৃত্যকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, "ওখান থেকে কাটলে কি মুড়োর বাহার থাকে ভাই? আহা হা, এমন সোনার মাছ, এর মুড়ো কি নষ্ট করার জিনিষ। আর পিত্তি গলে গেলে আর কি মাছ মুখে করবার জো থাকতো?"

নিজের কাজে ও কথায় নিত্যহরি নিজেই বোধ করি সন্তোষলাভ করিয়াছিল। তাই মাছের মুণ্ডপাত করিয়াই তাহার বঁটী ছাড়িতে ইচ্ছা হইল না। মাছের দেহটাকে আর একটা বৃহৎ খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া ছেলেদের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খোকাবাবু, পটকা ফাটাবে।"

খোকাবাবুরা অবশ্যই পটকা ফাটাইতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। অতএব তাহাদের উত্তরের জন্য অনাবশ্যক অপেক্ষা না করিয়া সত্যহরির কৃতীপুত্র মাছের পেটের ভিতর দুইটা আঙুল চালাইয়া দিয়া অবলীলাক্রমে একটা অক্ষত সুপুষ্ট পটকা টানিয়া বাহির করিয়া খোকাবাবুদের আনন্দ বর্দ্ধন করিল।

এতক্ষণে নিত্যহরির বোধ করি স্মরণ হইল যে সে এবাটীর বাবুর শ্রীচরণে আসিয়াছে মাছ কুটিতে নয়। সুতরাং যদি কুটিতেই হয় তবে অন্ততঃ একটা অনুমতি লওয়া সঙ্গত। সে মুখ তুলিয়া গৃহকর্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "মাছটা কুচিয়ে দেব মা?"

নিত্যহরি যদি তাহার প্রশ্ন গৃহিণীকে না করিয়া গৃহস্বামীকে করিত, তবে অনুমতি তাহার তখনই মিলিত। কারণ সুবিমলের চিত্ত আজ সকালে বিশ্বের প্রতি প্রসন্ন হইয়াইছিল। এরকম প্রসন্নতা সকল মানুষের মনেই এক এক সময়ে আসিয়া থাকে। কিন্তু কেন আসে তাহার কোনও বলিবার মত যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিতে গেলে প্রায় পাওয়া যায় না। ঠিক যেমন এক একটা দিনে কি এক অজ্ঞাত কারণে মেজাজ বিগড়াইয়া যায়, যখন কথা কহিতে গেলেই তাহাতে কলহের সুর বাজিয়া উঠে। আজ সকালে সুবিমলের সেই অকারণ চিত্ত প্রশান্তির সময়। ইহার ফলে সে নিত্যহরির কথায় ও কাজে একটা যেন কৌতুকের সন্ধান পাইয়াছিল এবং অপরিচিত গৃহস্থালীতে তাহার এই অনধিকার চর্চ্চায় বারণ করিবার কথা মনে হয় নাই।

কিন্তু অরুণার চিত্তে আজই সেই বিশ্বব্যাপী অমূলক প্রসন্নতার পালা পড়ে নাই। সে কহিল, "না না, তোমাকে কুটতে হবে কেন, ও-ই কুটবে'খন। তুমি বাছা আবার কেন কষ্ট করতে গেলে? যাও, তুমি হাত ধুয়ে ফেল।" বলিয়া হাত বাড়াইয়া উঠানের একধারে কলের দিকে নির্দ্দেশ করিল।

নিত্যহরি বিনীত হাস্যে ঠোঁটের কোন দুইটা প্রসারিত করিয়া বলিল, "এ আর কষ্ট কি মা? আমার পূর্ব্ব জন্মের পুণ্যি ছিল তাই আজ সকালে লক্ষ্মী-নারায়ণের ছিচরণ দর্শন হ'ল। আপনাদের সেবা করতে পাওয়া কি কম ভাগ্যের কথা"

বলিতে বলিতে সে উঠিয়া কল হইতে হাত ধুইয়া আসিল। সুবিমল কহিল, "তা, তুমি কি জন্যে এসেছ তা তো বল্লে না?"

নিত্যহরি পূর্ব্বে আত্মপরিচয় দিতেছিল দাঁড়াইয়া। এখন হয় তো নিজেকে এ বাড়ীর সঙ্গে অনেকটা পরিচিত বোধ করিয়া থাকিবে। হাত ধুইয়া আসিয়া রকের উপর উঠিয়া বসিল। তারপর ভিজা হাত দুইটা ধীরে ধীরে পরস্পর ঘষিতে ঘষিতে উত্তর দিল, "আজ্ঞে, তাই বলতে গিয়েই উঠে গিয়েছিলাম বাবু, অপরাধ মার্জ্জনা করবেন। মাছ ধরা আর বড় মাছ কোটা, এই দুটো আমার একটু সখ আছে বাবু। আর আছে কেন, ছিলই বলি। এখন তো দুঃখের ধাক্কায় সবই গিয়েছে। তবে নেহাৎ নাকি বাপ পিতেমোর আশীর্ব্বাদ ছিল তাই আজ মহতের আশ্রয়ে এসে পড়েছি। কায়েতের ছেলে বাবু, মুখ্যু লোক বটে, তবে অ-আ ক-খটাও জানি আর আপনাদের ছিচরণের কৃপায় এ-বি-সি-ডিও এখনো ভুলিনি। কলকাতার সহরে পূর্ব্বেও এসেছি। রাস্তা ঘাট চিনি, দু-চার জায়গায় কাজও করেছি বাবু, কিন্তু খোসামোদ করতে পারি নি বলে চাকরী খোয়াতে হয়েছে। অদেষ্ট দোষে মনের মতন মনিব কোথাও পাই নি। মনিবকে ভক্তি ছেদ্দা করতে হয় এটুকু শিক্ষে আছে। কিন্তু মনিব, অন্নদাতা, পিতার সমান, দেখলে আপনি ভক্তি হবে, সে রকম মনিবও কপাল না ফিরলে তো হয় না। তাই তো বলছি বাবু, এত দিনে বোধ হয় বিধেতা পেরসন্ন হলেন।"

নিত্যহরির শুভাগমনের উদ্দেশ্য এতক্ষণে যেন কিঞ্চিৎ পরিস্ফুট হইল। কথাটা আরও পরিষ্কার করিবার জন্যও বটে, এবং এতক্ষণে তাহারও মনে হইল নিত্যহরি অতিরিক্ত কথা কহিতেছে, সে কারণেও বটে, সুবিমল তাহার আত্মকীর্ত্তনে বাধা দিয়া বলিল, "তুমি কি আমার কাছে চাকরী করতে এসেছ না কি হে? আমার তো লোকের দরকার নেই, লোক আমার রয়েছে দেখতেই তো পাচ্ছ।"

বিনয়ী নিত্যহরি আরও বিনয়াবনত হইয়া বলিল, "আজ্ঞে, বাড়ীতে স্থান পাব ততদূর ভাগ্যি কি করেছি। আপিসের কাজে যদি কৃপা করে পেরণ করেন তাহলে জীবনটা ধন্য হয়।"

সুবিমল বিস্মিত হইয়া কহিল, "অফিসে ? অফিসে কি—ও, তুমি কি বেয়ারার কাজের জন্যে বলছ ?"

হাত দুইটী জোড় করিয়া নিত্যহরি কহিল, "আজ্ঞে।"

সুবিমল গম্ভীর হইয়া কহিল, "তোমাকে কে খবর দিলে যে আমার অফিসে বেয়ারার দরকার ?"

নিত্যহরি বলিল, "আজ্ঞে, চাকরীর চেষ্টায় ধা-ধা করে বেড়াচ্ছি, পাঁচ জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে খবর পেয়েছি বাবু। তা আমার তো মুরুব্বি কেউ নেই। থাকবে না কেন, খোসামোদ করতে পারলে মুরুব্বি জোগাড় করতে পারি। কিন্তু খোসামোদ করতে তো শিখিনি বাবু, যাকে দেখলে ভক্তি হয় তাকে প্রাণ দিয়ে—"

সুবিমল কহিল, "তুমি—মানে তোমার বাড়ী উড়িষ্যায় ?"

সজোরে ঘাড় নাড়িয়া নিত্যহরি বলিল, "আজ্ঞে না বাবু, আমি উড়ে নই। আমি বাঙ্গালী, মেদিনীপুরে বাড়ী আমার।"

সুবিমল কহিল, "ও হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি বলেছ বটে।"

বুদ্ধিমান নিত্যহরির মনে হইল বাবু যে ভাবে তাহার সহিত আলাপ করিতেছেন, তাহাতে সে তাঁহার কৃপা হইতে একেবারে বঞ্চিত নাও হইতে পারে। অতএব সে মুখখানি করুণ করিয়া হাত দুইটী পুনরায় জোড় করিয়া বলিল, "উড়ে হলে কি আর ভাবনা ছিল বাবু ? না এতদিন বসে থাকতে হত ? সব আপিসেই উড়ে ব্যায়রা আর খোট্টা চাপরাশী। আমাদের মতন গরীব বাঙ্গালীর আর কোথায়ও একটু দাঁড়াবার জায়গা মেলে না বাবু।" বলিয়া একটী সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মুখভাব আরও অসহায় ও করুণ করিবার প্রয়াস পাইল।

আচার্য্য রায়ের বক্তৃতা ও প্রবন্ধ সুবিমলের পড়া ছিল। তাহা ছাড়া সে নিজেও দেশের জন্য চিন্তা করিয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালী যে সর্ব্বত্রই বেদখল হইয়া পড়িতেছে এবং ইহার প্রতিবিধান করা যে একান্তই জরুরী প্রয়োজন, এ কথা তাহার ভাবুকচিত্তে প্রায়ই উদয় হয়।

সে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "হুঁ। তুমি অন্য জায়গায় কাজ করেছিলে বলছিলে না ? সে সব সার্টিফিকেট আছে ?"

তখন নিত্যহরি পরমোৎসাহে তাহার জামার পকেট হইতে ছেড়া কাপড়ে জড়ানো একটী লেপাফা বাহির করিল এবং আবরণ মুক্ত করিয়া লেপাফাখানি অতি ভক্তিভরে বাবুর হাতে তুলিয়া দিল।

অতঃপর আরও কয়েক মিনিট বাবুর সহিত নিত্যহরির সওয়াল-জবাব চলিবার পর, সোমবারে অফিসে দেখা করিবার আদেশ লাভ করিয়া নিত্যহরি বিদায় চাহিল। অবশ্য বিদায় চাহিবার পূর্ব্বে বাবুর শ্রীচরণে সভক্তি প্রণাম নিবেদন করিতে ভোলে নাই এবং মা ঠাকুরাণীর শ্রীচরণকমলকেও অবজ্ঞা করিল না। বিদায় কিন্তু তাহার তখনই মিলিল না। মা-ঠাকুরাণী বোধকরি তাহার মাছ কোটার পারিশ্রমিক বাবদ কিছু মিষ্টান্ন জলযোগ করিতে দিলেন। উপরের বারান্দায় বসিয়া দাড়ি কামাইতে কামাইতে সুবিমল শুনিল জলযোগরত নিত্যহরি অরুণাকে জানাইতেছে যে পরমেশ্বর যখন তাহাকে মহতের আশ্রয়েই আনিয়া ফেলিয়াছেন, তখন প্রাণ দিয়াও সে অন্নদাতা পিতার—এবং অন্নপূর্ণা মাতারও—সন্তুষ্টি সাধন করিবেই। কারণ সে কর্ত্তব্য সাধন করিতেই শিখিয়াছে, কাজে ফাঁকি দিয়া তোষামোদ করিয়া মনস্তুষ্টি করিতে সে পারেও না, আর তাহার পিতৃপিতামহের পুণ্যফলে তাহার মনিবও সে রকম নহেন।

হৃষ্টমনে নিত্যহরি প্রস্থান করিল। কর্ত্তা ও গৃহিণীর সদয় ব্যবহারে তাহার সন্দেহ মাত্র রহিল না যে, সোমবারে অফিসে দেখা করিতে গেলেই তাহার অঙ্গে অমুক কোম্পানীর চাপকান ও তকমা শোভা পাইবে। [ক্রমশঃ

কেতকী ও বায়ু

শ্রীদীপ্তিলেখা মিত্র

কেতকী করিয়া বাতাসে হৃদয় দান
কহিল তাহার কাণে :—
"তোমারে যে বঁধু সঁপিনু আমার প্রাণ
এ কথা কেহ না জানে।"
চপল বাতাস রাখিল না তার মান—
নিঃশেষে লুটি' কেতকীর বাস বিলাল দিগন্তর ;
বিহ্বলা কেতকী দেখে' লজ্জায় ম্রিয়মাণ ;
হাঁহা করি হাসিয়া উঠিল বনান্তর।
মালতীরে কহিল বাতাস,—
"শুনিলে তো কেতকীর আশ ?"
গুমরি' কেতকী ভাবে, "ছিঃ ছিঃ, একি লজ্জা ! একি অপমান !"
ওদিকে মালতী মনে বাতাসের প্রতি অনুরাগ।

যুদ্ধ ও ভারতবর্ষ

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

যুদ্ধ-বিগ্রহ হইতে জগতের কোন উপকার কস্মিন্‌কালে হইয়াছে কি না, অথবা হইতে পারে কি না সে বিষয়ে সন্দেহের সমূহ অবকাশ রহিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে যে যুদ্ধের কথা ও কাহিনী লোকের চিত্তপটে, নর নারীর মুখে মুখে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত, কুরুক্ষেত্রের সেই মহাযুদ্ধ হইতেও যুধ্যমান পক্ষীয়গণের ব্যক্তিগতভাবে, অথবা সমষ্টিগতভাবে পৃথিবীর কোন উপকার সাধিত হয় নাই। আজিকার প্রলয়-যুদ্ধেও যুধ্যমান জাতিগুলির অথবা জগতের উপকার হইবার সম্ভাবনা আদৌ আছে বলিয়া মনে করা যায় না। প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট, প্রাইম-মিনিষ্টার চার্চ্চিল, দুর্দ্ধর্ষ হিটলার, জাপানী টোজো, ইতালীর দম্ভাবতারশিরোমণি মুসোলিনী—যিনি যতই ঘন ঘন জনহিতের আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করিয়া পৃথিবীকে আশ্বস্ত করিতে চেষ্টিত হোন না কেন, যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে অনিষ্ট ছাড়া জগতের ইষ্ট করিবার সাধ্য কাহারও নাই। যুদ্ধ হয় কেন, উদ্দেশ্য কি, এ সকল খুবই বড় কথা, বক্ষ্যমান প্রবন্ধে তাহা আলোচনা করিবার সাধ্য ও শক্তি আমাদের নাই; কিন্তু যাঁহারা "বঙ্গশ্রী" পত্রিকার নিয়মিত পাঠক, তাঁহারা বিগত মাসের প্রথম প্রবন্ধটি অভিনিবেশ সহকারে ধারাবাহিকভাবে পাঠ করিলে উপকৃত হইতে পারিবেন এবং কৌতুহল চরিতার্থ হইবারও সম্ভাবনা আছে।

এই মাত্র বলিয়াছি যুদ্ধ-বিগ্রহ হইতে কাহারও—কোন মানুষের, কোন জাতির, কোন দেশের অপকার ব্যতীত উপকার হয় না। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধ হইতে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর কিছু 'উপকার' হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। কিরূপে তাহা বলিতেছি। ইয়োরোপে এই যুদ্ধ যখন প্রথমে বাধিল, আমরা—ভারতবাসীরা—মাথা ঘামাই নাই এবং কিছুকাল পর্য্যন্ত খবরের কাগজ ও মানচিত্র খুলিয়া গৃহের চায়ের টেবিলে, রেস্তোঁরায়, ট্রেণে, ট্রামে, বাসে, পুরাদস্তুর সমরবিশারদ হইয়া বিজয়ীকে বাহবা ও বিজিতকে দুয়ো দিতে লাগিলাম। তখন পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত ছিলাম এই ধারণায় যে, যা শত্রু পরে পরে। কিন্তু ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপানী টোজো যখন ব্রহ্মদেশের ঘাড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল, অস্মদ্দেশের সমরবিশারদদের (strategists) রণকুশলতা (strategy) একেবারে ককাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তারও পরে যুদ্ধ যখন ভারতের ঘাড়ে আসিয়া পড়িল, তখন আমাদিগের যুদ্ধশাস্ত্রের চরম অভিজ্ঞতা ও পরম বিজ্ঞতা শিকায় উঠিয়া গেল; 'চাচা আপনা বাঁচা' এই শাশ্বত সত্য কথাটাই শিবরাত্রির সলিতার মত ভয়ে ভয়ে অন্তরে শুধু জাগিয়া রহিল। এই সময়েই দেখিলাম, খাইতে পাই না, খাদ্যবস্তুর দারুণ অভাব, পয়সা যদি বা জোটে, জিনিষ নাই। আবার এই দেখাও যেমন তেমন দেখা নয়, হাড়ে হাড়ে দেখা, মর্ম্মে মর্ম্মে দেখা! এমন দেখা জীবিতকাল মধ্যে কেহ কোন দিন দেখে নাই, কোন কালে দেখিতে হইতে পারে একথাও কল্পনা করে নাই। তবুও আশঙ্কা হইতেছে যে দেখারও এখন অনেক বাকী। পুরা দেখা সেইদিন হইবে যে দিন বলিতে হইবে, এর চেয়ে বোমা খেয়ে মরা ভালো। সেদিনের যে খুব বেশী দেরী আছে, তাও নয়; বরং "দিন আগত ঐ!"

লেখককে যাঁহারা জানেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহে জানেন এবং যাঁহারা জানেন না, তাঁহারাও লেখকের মুখের এই কথাটা ধ্রুব সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন যে, তিনি কোন বিষয়েই বিশেষজ্ঞ নহেন; সাহিত্যের বাজারে শাকটা মূলাটা-শশাটা-আসটা ফেরী করাই তাঁহার পেশা। বিশেষজ্ঞ না হইলেও এবং অত্যন্ত ক্ষুদ্র মনুষ্য হইলেও পরমেশ্বর তাঁহাকে চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি দানে কার্পণ্য করেন নাই। চোখ দিয়া দেখিবার, কাণ দিয়া শুনিবার, হৃদয় দিয়া অনুভব করিবার ক্ষমতা অল্পবিস্তর এই ব্যক্তিরও আছে। সেই ক্ষমতাটুকুর ব্যবহারে এতোকাল পর্য্যন্ত ইহাই দেখা গিয়াছে যে সভ্যতার শিখর হইতে শিখরে উঠিবার সময়ে, আমরা, কিরূপে বড় চাকরী পাইব, মোটা মাহিনা আদায় করিতে পারিব, গৃহ, গৃহ হইতে অট্টালিকা, ইমারত প্রস্তুত করিতে পারিব, বিলাস, বিলাস হইতে বিলাসের মহাসমুদ্রে তরণী ভাসাইতে পারিব, এই সাধনাই করিয়াছি। সাধনায় যে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, ধরায় তাহার ধন্য ধন্য পড়িয়া গিয়াছে, আর অন্যে—অর্থাৎ আমাদের মত ব্যর্থসাধক ফ্যাল ফ্যাল চোখে সেই জৌলুসের পানে চাহিয়া নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার ও সিদ্ধিসাধকের ঈর্ষ্যা করিয়াছি। শুধু যে আমাদেরই এই কাজ ছিল, এমন নয়; সমগ্র পৃথিবীর তাবত জনসমাজের এইটিই একমাত্র কাজ বলিয়া বিবেচিত ও পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। ধন ও দৌলতবৃদ্ধির জন্য জগতের জাতিসমূহের মধ্যে পাল্লা চলিত। এই ধন ও দৌলতের মধ্যে খাদ্য নামক বস্তুটির কোন স্থান ছিল না। যে মুহূর্ত্তে অনুভূত হইল যে খাদ্য ব্যতিরেকে যে ধন দৌলত, তাহার দ্বারা মানুষ, জাতি বা দেশ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, সেই মুহূর্ত্তেই, যুদ্ধং দেহি হইল। ভাবটা এই যে, কাড়িয়া কুড়িয়া লইয়া যতদিন চলে। চোরের রাত্রিবাসও ভাল।

খাদ্য সম্পর্কে কোন্ দেশ কতটা স্বাধীন বলা কঠিন। আমরা ভাবিতাম, ভারতবর্ষ অন্ততঃ ঐ একটা বিষয়ে পরের অধীন নহে; কিন্তু ব্রহ্মদেশের পরহস্তে পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান খাদ্যবস্তুর অভাব উৎকট হইয়া উঠিল। শুনা গেল, ব্রহ্মদেশে হইতে আমদানী চাউল দ্বারাই, এতকাল পর্য্যন্ত আমাদের ঘাটতি পূরণ হইত। কথাটা শুনিয়া হাসিতে হয়; বলিতে হয়, "রাজার মাও ভিখ মাঙ্গে"। কিন্তু কথা সত্য। ব্রহ্মদেশ হইতে চাল আসিত এবং তদ্বারা ভারতের ঘাটতি পূরণ হইত, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। জাপানীরা সে পথ বন্ধ করিবামাত্র হাহাকার পড়িয়া গেল। কৃষি প্রধান মহাদেশ ভারতবর্ষ সম্বন্ধেই যখন এই কথা, যাহারা খাদ্য বিষয়ে চির-পরাধীন, চিরপরমুখাপেক্ষী, তাহাদের অবস্থাটা অনুমান করিতে কষ্ট হয় না।

পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত কোম্পানীর কাগজ থাকিলে যেমন নির্ঝঞ্ঝাটে সুদ পাওয়া যায়, খাদ্যবস্তু সম্বন্ধে আমাদের ব্যবস্থাটাও তদ্রূপ ছিল। জমি যখন দেশময় ছড়ানো রহিয়াছে এবং অসভ্য, বর্ব্বর চাষীর বংশও নির্ব্বংশ না হইয়া ধরিত্রীর গায়ে টিকিয়া আছে, তখন খাদ্যবস্তু না পাওয়া যাইবার কোন কারণই যে কোনদিনও ঘটিতে পারে তাহা আমাদের চিন্তার অতীত ছিল। ব্যাঙ্কের কেরাণী কোম্পানীর কাগজের সুদ কসিয়া যাহার যাহা প্রাপ্য নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়, চাষীরাও তেমনই জমি চষিয়া, পাট করিয়া বীজ বুনিয়া, যথাকালে খাদ্যবস্তু পাঠাইয়া দিবে, বিনিময়ে আমরা কিছু মূল্য দিব, ইহাই ছিল মোটামুটি ধারণা। এখনও এই ধারণাই আছে, বিশেষ ইতরবিশেষ যে হইয়াছে, তাহা নয়। তবে একশ্রেণীর শিক্ষিত লোক চিন্তান্বিত হইয়া ধারণা পরিবর্ত্তন করিবেন কি না তদ্বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন বলিয়া যেন মনে হইতেছে। কিন্তু তাহাতে সফলমনোরথ হইবার পক্ষে অন্তরায় অনেক। তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছেন যে (১) কেবলমাত্র যুদ্ধের জন্যই খাদ্যবস্তুর নিদারুণ অভাব ঘটিয়াছে; (২) যুদ্ধ না হইলে এ দশা কখনই হইত না; (৩) ইমারজেন্সীই (জরুরী অবস্থাই) যত অনিষ্টের মূল। শুধু যে ধরিয়া লইয়াছেন তাহাই নয়, এই ধারণা মনে বদ্ধমূল করিয়া বসিয়া বসিয়া হা হুতাশ করিতেছেন এবং যুদ্ধ মিটিলে বাঁচা যায় ভাবিয়া দিন গণনা করিতেছেন।

অনেকে মনে করেন এবং বলেন, আমাদের এই দেশটাকে গবর্ণমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালাইজড্ করেন নাই বলিয়াই এত দুর্দ্দশা। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশগুলি ইণ্ডাষ্ট্রিতে খুব উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে; কিন্তু খাদ্যবিষয়ে তাহাদের পরমুখাপেক্ষীতার সংবাদ যাঁহারা রাখেন, তাঁহাদেরই চক্ষু স্থির হইয়া যায়। ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়া না থাকিলে ইংলণ্ডের, ক্যানেডা না থাকিলে আমেরিকার ধনদৌলত চিবাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি কতখানি হইত তাহা কাহারও অজনা নাই। বৃহত্তর জগতের কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমাদের দেশের কথা আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, ইণ্ডাষ্ট্রি যতটুকু এদেশে হইয়াছে, তাহার ফলে মুষ্টিমেয় কয়জন লোক ধনদৌলতের অধিকারী হইতে পারিয়াছেন সে কথা ঠিক কিন্তু দেশ অস্থি-কঙ্কাল-চর্ম্মসার হইতে বাধে নাই। শুধু যে মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ীর হাতেই পয়সা জমিয়াছে তা' নয়, ইণ্ডাষ্ট্রিতে নিযুক্ত মুটে, মজুর শিল্পী-কারিকরদের হাতেও পয়সা আনাগোনা করিতেছে। হাতে পয়সা আসিলে যাহা হয়, বিলাসের স্রোত বৃদ্ধি পাইয়াছে; ভোগস্পৃহা বাড়িয়াছে; লালসা অদম্য হইয়াছে। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির মোহ সর্ব্বগ্রাসী হইয়া উঠিয়াছে। পক্ষান্তরে অভাবের পর অভাবের সৃষ্টি হইতেছে।

আমরা—যাহারা সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখিয়া শিক্ষিত বলিয়া অভিমান করি, তাহাদিগের অবস্থাটা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহাই দেখা যাইবে যে, অভাব সৃজনে আমরা বিশেষরূপে দক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলাম। টুথ পেষ্ট, টুথ ব্রাস, সোপ, হেয়ার অয়েল, টিন্‌ড্ ফিস্, টিন্‌ড্ মিট্, টিন্‌ড ফ্রুট, ফুড, স্নো, ক্রীম, রুজ এ সকল বস্তুই আমাদেরও অপরিহার্য্য নিত্যব্যবহার্য্য বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিলাতী তামাক ও সিগারেট স্থান পায় নাই এমন সংসার বোধ করি সুদুর্লভ। আজ আসমুদ্রপথ বিঘ্নাস্তৃত হওয়ায় জাহাজ চালাচল ব্যাহত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে টুথপেষ্ট হইতে টুব্যাকো, সিগারেট সবই মহার্ঘ্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং এতদিন যাঁহারা মৃদুমন্দ তরঙ্গায়িত বিলাস তরঙ্গিণীহিল্লোলে, বিলাস তরণীতে বসিয়া অনুকূল বায়ুভরে চৌপাল উড়াইয়া পরমানন্দে ভাসিয়া চলিতেছিলেন, এবং ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন, চিরদিন বুঝি এমনই যাইবে, আজ তাঁহাদের মলিন মুখের পানে চাহিলে করুণার উদ্রেকই হয়। যুদ্ধবিগ্রহ কখনও কাহারও উপকার করে না, তাহা সকলেই জানেন; আমরাও জানি। তথাপি প্রবন্ধের আরম্ভেই বলিয়াছি এই যুদ্ধ আমাদের খানিকটা উপকার করিয়াছে। তাহা ঐ। আমরা যে কত অসহায়, তাহা বুঝিতে পারিতেছি; অভাব সৃষ্টি বিষয়ে কতখানি দক্ষ ছিলাম তাহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে; অভাব মোচনের কোন উপায় নাই জানিয়াও অভাব সঙ্কোচ করিবার শিক্ষা পাই নাই, তাহারই ফলে আজ বহু কষ্ট ও বহু আয়াস স্বীকার করিতে হইতেছে, তাহাও প্রত্যেকে মর্ম্মে মর্ম্মে স্বীকার করিতেছি।

আজিকার এই তিক্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা উত্তরকালে ব্যক্তি ও জাতির কাজে লাগিবে বলিয়া আশা হইতেছে। বিলাস-বৃদ্ধি ও অভাব সৃষ্টি করিবার সময়ে, যুদ্ধ-কালের হাহাকার কি মনে পড়িবে না? তা' যদি পড়ে, তবে আজিকার অভিজ্ঞতা

যত কটু, বিস্বাদ ও কষ্টদায়ক হোক না কেন, ভবিষ্যতে উপকার সাধিতে পারিবে। অন্ততঃ আমার এই বিশ্বাস।

এই কথাগুলো আরও বিশদ করিয়া বলিতে চাই। আজ আমাদের ঘরে ঘরে টুথপেষ্ট ও টুথব্রাসের বড় কদর; রকমারী পেষ্ট, রঙচঙে ব্রাস, লোশন, ওয়াস, গার্গল—অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত বলিলেও হয়। সেই সঙ্গে দেখুন, রাস্তায় রাস্তায় অলিতে গলিতে ডেণ্টিষ্টের দোকানের কি বাহার! সোপ যে কত রকমের তাহা গণিতে হইলে সেই গণিতবিদকে ডাকিতে হইবে যিনি আকাশের তারা গণিয়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন। সেই সঙ্গে, চর্ম্মরোগের হাসপাতাল, ক্লিনিক্, পেটেণ্ট মেডিসিন, সালসার কত জৌলুস! হেয়ার অয়েলের বিজ্ঞাপন দেখিয়া সেকালের উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি ঠাকুরাণীগণেরও পুনর্জ্জন্ম গ্রহণের আগ্রহ জন্মিবে। প্রত্যেক কেশতৈলের বিজ্ঞাপনেই সেই লোভনীয় ভাষা—চুলের অকালপক্কতা নিবারণ করিতে, চুলের গোঁড়া শক্ত করিতে অদ্বিতীয়। ঐ কাজগুলা যদি একটিমাত্র ঐ অদ্বিতীয় কেশতৈলের দ্বারা সাধিত হইবে, তবে আবার লাখে লাখে দ্বিতীয়ের আবির্ভাব হয় কেন? সৌখীন খাদ্যদ্রব্যের যত প্রচার. কোষ্ঠ পরিষ্কারক স্বাস্থ্যবর্দ্ধক সল্ট, মিল্ক প্রভৃতির প্রসারও তত। অমুক ফ্রুট, সল্ট, অমুক মিল্ক, অমুক ম্যাগনেসিয়াতেও যখন কাজ হয় না, তখন ডাক্ ডাক্তার। ডাক্তার হালে পানি না পাইলে, কবিরাজ। কবিরাজের রিষ্ট অরিষ্ট নিষ্ফল হইলে মন্ত্রপূতঃবারি হোমিওপ্যাথী। ইহাকে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বলিব অথবা আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ বলিব তাহাই ভাবি!

আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে, দেশশুদ্ধ লোকের অসুখ হইবেই—হইতেছেও বটে—তাই হাজার হাজার ছাত্র মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল স্কুল, হোমিও কলেজ, হোমিও স্কুল, আয়ুর্বেদ কলেজ, আয়ুর্ব্বেদ মহাবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার জন্য লালায়িত।

আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে, দেশশুদ্ধ লোক মামলা মকর্দ্দমা করিবেই—করিতেছেও তাই—তাই হাজার হাজার ছাত্র আইন কলেজে ঢুকিবার জন্য আগ্রহান্বিত।

আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে, দেশশুদ্ধ লোক বিলাস-সামগ্রী ব্যবহার করিবেই—করিতেছেও, তাহাতে সন্দেহ নাই—কাজেই স্থল হইতে বিগ কেমিক্যাল ও ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ গড়িয়া তুলিবার জন্য অসামান্য ছটফটনি। সকলেরই এক লক্ষ্য, এক উদ্দেশ্য—টুথপেষ্ট, সোপ, অয়েল, পাউডার, সেণ্ট এবং সেই সঙ্গে গোটাকতক 'গন্ধ হারালে গন্ধ পাওয়া যায়' গোছের ঔষধ ও ইঞ্জেকসন প্রস্তুত ও প্রচার।

আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে, মানুষের নামের অগ্রে ও পশ্চাতে গোটাকতক শব্দ সমাবেশ না থাকিলে সমাজে শিক্ষিত ও গণ্যমান্য বলিয়া অভিহিত হওয়া যায় না, এই শব্দ সংগ্রহের জন্য কি কাঙালপনাই না পরিলক্ষিত হয়! পিতৃমাতৃদত্ত নামের পূর্ব্বে মাত্র একটি ক্ষুদ্র 'শ্রী'তে সুরু হইয়া অন্তেও যাহার অষ্টরম্ভা, তাহার কথা কেই বা শুনে? শুনিলেও কেই বা তাহার মূল্য দেয়? অমুক ডক্টর, পি-এচ্-ডি, ডি-লিট, ডি-ফিল্-এই কথা লিখিয়াছেন অথবা এই মন্তব্য করিয়াছেন শুনিবামাত্র, তটস্থ! বেদবাক্য না হইয়া প্রায় না।

আমরা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছি যে, ডক্টর, পি-এচ-ডি, ডি-লিট, ডি-ফিল্, ডি-এস্-সিরা যাহা বলিবেন, তদনুসারে কার্য্য করিলে দেশের, জাতির, মানবসমাজের—তথা মানুষের উপকারই হইবে। তাঁহারা যাহা না বলিবেন, তাঁহারা যে উপদেশ না দিবেন, তাহাই অবান্তর। তাহাতে কেহ কাণ দেয় না; কাণে ঢুকাইয়া দিলেও হাসিয়া উড়াইয়া দেয়—উপহাসের কথা, উপহাসেই অবসান।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। দৃষ্টান্তটা একটুখানি ব্যক্তিগত হইয়া পড়িবে, কিন্তু নিরুপায়। আমাদের এই স্বর্ণপ্রসূ ভারত ভূমিতে নিদারুণ খাদ্যাভাব হইয়াছে, খাদ্যাভাবের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যের অভাব, তাহার ফলে মানসিক স্ফূর্ত্তির অভাব ঘটিতেছে ইহাদের অব্যবহিত ফলস্বরূপ দেশব্যাপী অস্বাস্থ্য, অকাল-বার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুর আধিক্য প্রকট হইতেছে, ইহা লইয়া কোন এক মনস্বী ব্যক্তি এই পত্রিকার মারফত বহুবর্ষ ধরিয়া চীৎকার করিতেছেন "বঙ্গশ্রীর" পাঠকগণের তাহা অবিদিত নাই। চীৎকার করিয়া, অথবা গেল গেল রব করিয়াই তিনি নিবৃত্ত অথবা নিরস্ত হন্ নাই; পরন্তু খাদ্যাভাব দূর করিয়া, প্রাচুর্য্যে ভরাইবার উপায় যে আছে, মানুষ আবার কিরূপে স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ হইয়া, দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া প্রকৃত মানুষ হইতে পারে, তাহারও উপায় নির্দ্দেশ করিয়া সমাজের ও জাতির মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহার কতটুকু ফল ফলিয়াছে? তিনি হয় ত মনে করেন, ফলের জন্য চিন্তান্বিত হইবার প্রয়োজন নাই, আমার কাজ আমি করিয়া যাই। গীতারও সেই কথা বটে! কিন্তু যদি তাঁহার নামের অগ্রে ও পশ্চাতে ইয়োরোপীয় ভাষায় চিকিৎসক—তা সে ভাষারই হোক, দর্শনেরই হোক, অথবা খজাতিরই হোক—ডক্টরেট থাকিত, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গবর্ণমেণ্ট সকলেই অন্ততঃ একবার না একবার "খাইত ব্যাপারটা কি দেখা যাক্" করিতেও পারিতেন। কিন্তু আমরা অবধারিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছি যাহার দাগা নাই, তাহার কথা শুনিব না, তাহার কথা বাজে কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। ষাঁড়ের মর্য্যাদা ও পূজা দাগা ষাঁড়ই পাইয়া থাকে; অপরে তাহা পাইতে পারে না।

কিন্তু কথা শূন্যে মিলায় না—মিলাইবে না। একদিন তাহাতে কাণ দিতেই হইবে।

আমাদের দেশের রাজ্য অথবা রাষ্ট্র পরিচালনার ভার যাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত, তাঁহারা কখন যে কি বলেন, তাহা বুঝা দুষ্কর। খাদ্যবস্তুর নিদারুণ অভাব সম্পর্কে তাঁহাদের আগেকার উক্তির সহিত পরের উক্তির সামঞ্জস্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। পরে যাহা বলেন, তাহার সহিত আগের কথার হিসাব নিকাশ" করিতে গেলে মাথার মগজ পর্য্যন্ত উলোটপালোট হইয়া যায়। গত বৎসর শুনিয়াছিলাম, খাদ্য বস্তু চাহিদারও অধিক আছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে ধুয়া (রাক্‌) উঠিল, গ্রো মোর ফুড। এই দুই কথার মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? 'গ্রো মোর্ ফুড' মহাবাক্যের অনুশাসনে বড়লাট, লাট হইতে টম্ ডিক্ হ্যারী, হরেন নরেন গবেনের ফুলবাগান হইতে ছাদের টব ধান, যব, সরিষা বৃক্ষে ভরিয়া গিয়াছিল। সত্য মিথ্যা জানি না, তবে শুনিয়াছি, বহু ব্যক্তি, যাঁহাদের ইঞ্চি পরিমিত জমি অথবা ভাড়াটে বাড়ী কিম্বা ফ্ল্যাটের ছাদ পর্য্যন্ত নাই, তাঁহারা স্ব স্ব টাকের উপর গঙ্গামৃত্তিকার প্রলেপ লাগাইয়া তদুপরি বীজধান ছড়াইয়া দিয়া আরসির সামনে দাঁড়াইয়া ফুডের গ্রোথ লক্ষ্য করিতেছেন এবং আশা করিতেছেন, অভাব মিটিতে আর বড় দেরী নাই। ইত্যবসরে যুদ্ধ যদি মিটিয়া যায়, তাহা হইলে প্রলেপ তুলিয়া ফেলিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া ফেলা যাইবে সে বিষয়েও তাঁহাদের মনঃস্থির আছে।

আজ না হয় যুদ্ধের জন্যই আমাদের খাদ্যবস্তুর অভাব ও তজ্জনিত কষ্ট ভাবিয়া মনকে "আঁখি ঠারিয়া" চলিয়া যাইতে পারিব কিন্তু যুদ্ধ মিটিলেও উদরের যুদ্ধ যে মিটিবে না বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেই থাকিবে তাহা একরূপ নিশ্চিত। যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে এই ত সেদিন, কিন্তু খাদ্যের অভাব সুরু হইয়াছে অনেক দিন। আখমাড়া কল যেমন আখগাছটিকে চাপিয়া পিষিয়া সমস্ত রসটুকু নিঃশেষিত করিয়া জ্বালানি কাঠের রূপ দান করিয়া ফেলিয়া দেয়, অনেকদিন হইতেই আমাদের সেই অবস্থা ঘটিয়াছিল। চিংড়ী মাছের মতো আমরাও আমাদের দেহগুলিকে কাপড়-চোপড় জামা-জোড়া দিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছি মাত্র, দাড়া, খোলা খুলিয়া ফেলিবা মাত্র জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থা দেখিয়া আমরাই শুম্ভিত। আজ হৌক, কাল হৌক, আরও দশদিন পরেই হৌক, যুদ্ধ একদিন মিটিবেই। নিঃশেষে লোকক্ষয় হইয়াই হৌক, আর অর্থ-সামর্থ্যে নিঃস্ব হইয়াই হৌক, একদিন মারণাস্ত্র পরিহার করিতেই হইবে এবং আজিকার পাশবিকতা ভুলিয়া শান্তির উপাসনা করিতেই হইবে।

বিলাতী অভিধানের মতে যে শান্তি, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের অবিদ্যমানতা—তাহাও সেই শান্তিও হয় ত আসিবে কিন্তু যে শান্তি মানুষকে সুস্থ, সংযত, সন্তুষ্ট করিয়া বিশ্বজগতকে একটি অখণ্ড সংসার পরিবারের রূপ দিতে পারে, সেই শান্তির আশা কি ততদিন সুদূরপরাহতই থাকিয়া যাইবে না যতদিন না পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের প্রত্যেকটি মানুষ তাহার খাদ্য পরিধেয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে পারিবে? এ বিষয়ে পশুজগতের উদাহরণ উপমাস্বরূপ স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করা যাইবে। একটি সারমেয় একক একখণ্ড মাংস চিবাইতেছে দেখিলে দশটা সারমেয় তাহার টুঁটি ছিঁড়িয়া ফেলিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠে। যুদ্ধান্তে শান্তি প্রবর্ত্তিত হইলেও যে দেশ বা যে জাতির যখনই খাদ্যের অনটন ঘটিবে, সেই দেশ বা সেই জাতি অন্য দেশ ও অন্য জাতির টুঁটি লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞানসম্মত মারণাস্ত্র প্রয়োগে যত্নবান হইবে। অতীতের ও বর্ত্তমানের যুদ্ধগুলির কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে এই উক্তির সারবত্তা নিঃসংশয়ে স্বীকৃত হইবে।

আর যদি কোনদিন সেই সুদিন হয়, যে দিন পৃথিবীর ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল দেশের সকল অধিবাসীর খাদ্যবস্তু দেশের মাটিতে প্রাপ্ত হয়, তাহাকে আদৌ পরমুখাপেক্ষী না হইতে হয়, সেদিন—কেবল সেই দিন—ভারতীয় অভিধানের ভাষার মতে যে শান্তি তাহাই প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারিবে।

যুদ্ধের কারণে (কল্যাণে বলিব কি?) দেশের বেকার সমস্যার কতকটা অবসান ঘটিয়াছে ইহা চাক্ষুষ দেখিতে পাইতেছি। বেকার নাই বলিলেও চলে। সৈনিক হইয়াই হৌক, আর সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টে চাকরী পাইয়াই হৌক, অথবা সাপ্লাইয়ের কাজ করিয়াই হৌক, ভদ্রসমাজের লোক পয়সা রোজগার করিতেছে, 'অভদ্র' লোকদেরও কাজের অভাব হইতেছে না। রাজমিস্ত্রী, সুতার, কামার সকলেরই পোয়াবারো। তা ছাড়া এ-আর-পি। এ-আর-পিও বেকার নিঃশেষে শোষ করিতেছে। নিতান্ত অক্ষম, অপটু, বিকলাঙ্গ, বৃদ্ধ ও পঙ্গু এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক ছাড়া সকলেই রোজগার করিয়া পয়সা আনিতেছে। সুখের চৌদ্দ পোয়া! আহা, বঙ্গনারীরাও বিচিত্র শাড়ী, রঙদার ব্লাউজ, মরি মরি জুতা পরিধান করিয়া আফিসে আফিসে টেবিল আলো করিয়া স্বামী অথবা স্বজনগণের রোজগার সাপ্লিমেণ্ট করিতেছেন। আমাদের বাঙ্গালার সংসারটা দুইভাগে বিভক্ত ছিল, এক ভাগ পুরুষ, অন্যভাগ নারী; একভাগ উপার্জ্জন করিত, অন্য ভাগ সংসার চালাইত। এখন দুই ভাগ মিলিয়া মিশিয়া (?) এক দিল হইয়া অর্থ রোজগারে মনঃসংযোগ করিয়াছে, তদুপরি বেকার নাই, সংসারে সোণা ফলিবার কথা, স্বাচ্ছন্দ্যের ষাঁড়াষাড়ি বান ডাকিবার সময়। কিন্তু এমন সুসময়েও দিগ্‌দিগন্তে হাহাকার কেন? প্রায় সকল সংসারেই অন্নবিস্তর হা অন্ন, হা আটা, হা চিনি, হা কাপড় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় কেন? গোষ্ঠিশুদ্ধ মিলিয়া রোজগার করিতেছে, মাসের প্রথমেই একগাদা কারয়া টাকা ঘরে আসিতেছে কিন্তু সংসারের প্রয়োজন মিটাইয়া মাসের মাঝামাঝি হইতেই মুখ শুষ্ক, চিন্তায় জর্জ্জরিত বক্ষঃ হইয়া উঠিতে হয় কেন? কোথায় হাহাকার দেশছাড়া হইয়া গিয়া, স্বচ্ছলতার দখিন সমীরণে কামনার বসন্তাগম

অনুভূত হইবে, তা না হইয়া এ কি দুশ্চিন্তা ? কেন এমন হয় ?

ইহার একটিমাত্র উত্তর আছে। মাটি বিমুখ হইয়াছে; ভূমি বিদ্রোহ করিয়াছে। অবশ্য এমনও সম্ভব যে সে বিমুখও হয় নাই, বিদ্রোহও করে নাই—অযত্নে, অবহেলায় সে শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে: তাহার অবসাদ আসিয়াছে। কথাটা নূতন এবং নূতন বলিয়া অবিশ্বাস্য মনে হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু যাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে জমির ও ফসলের খবর রাখেন, তাঁহারা ভূমির উর্ব্বরতা শক্তির হ্রাস লক্ষ্য করিতেছেন; ফসলের পরিমাণ যে বৎসরের পর বৎসর কমিতেছে, তাহা তাঁহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে অবশ্যই স্বীকার করিতেছেন; এই ব্যাপারটা যে আজই প্রথম ঘটিতেছে, এমনও নয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগে, পুরাণাদির কালেও মাটির অবসন্নতা লক্ষিত হইত এবং যাঁহারা পুরাণাদি গ্রন্থগুলি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা রাজা-রাজড়াদের ভূমি-যজ্ঞের দৃষ্টান্তও পাইয়াছেন। কোন দেশে অনাবৃষ্টি হইয়াছে, কোথায়ও ফসল অজন্মা হইয়াছে, রাজা রাজড়ারা নিজেরা অথবা মুনি-ঋষিদের দ্বারা যাগযজ্ঞ করাইলেন, দেশ শস্যে ভরিল, দেশের লোকের মলিন আনন অনাবিল হাস্যে বিকশিত হইয়া উঠিল। এই যাগ-যজ্ঞটা ঠিক কি বস্তু তাহা বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব না হইলেও, ইহা অবশ্যই বলা চলে যে, বিজ্ঞ, বিদ্বান, অভিজ্ঞ ও জনহিতৈষী মুনিঋষিরা রাজা রাজড়াদের ধরিয়া (যেহেতু তাঁহারাই অর্থ সামর্থ্যশালী) প্রজাদের জমায়েত করিয়া জমির উর্ব্বরাশক্তি হ্রাসের কারণ বুঝাইয়া, উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধির উপায় বাৎলাইয়া দিতেন। সে মন্ত্র তাঁহারা জানিতেন। সে মন্ত্র তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের ঔদাসীন্যবশতঃ, আমাদের অবহেলার দরুণ গ্রন্থরাজির উপরে প্রথমে বল্মীক, পরে গিরি-পর্ব্বত গড়িয়া উঠিয়াছে—মন্ত্র চাপা পড়িয়া গিয়াছে। মন্ত্রের সঙ্গে আরও চাপা পড়িয়াছে মানুষের মানুষ হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার বিদ্যা। সেই বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে—যে জিনিষ খাইলে, যে বস্ত্র পরিধান করিলে, যেরূপ গৃহে বাস করিলে, যে আসবাব ব্যবহার করিলে মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, মানুষের বুদ্ধি সুস্থ ও স্বাস্থ্যপূর্ণ থাকিতে পারে, তাহাও চাপা পড়িয়া গিয়াছে, অন্ধকারের অতলে অন্তর্হিত হইয়াছে।

রাজনীতিকগণকে বলিতে শুনা গিয়াছে, দেশের যত কষ্ট, —তা সে অর্থের হোক, অন্নের হোক, বস্ত্রের হোক অথবা খাদ্যেরই হোক, যত অভাব,—তা সে অর্থের হোক, অন্নের হোক, বস্ত্রের হোক অথবা অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্যেরই হোক, দেশ স্বাধীনতা পাইলেই সমস্ত কষ্ট, সমস্ত অভাব বিদূরিত হইয়া যাইবে। সেকালের এলোপ্যাথিক ডাক্তারদের একটি অমোঘ ঔষধি ছিল। সেটির নাম, ক্যাষ্টর অয়েল। জ্বর হইয়াছে, দাও ক্যাষ্টর অয়েল; উদরাময় হইয়াছে, পিলাও ক্যাষ্টর অয়েল; হিষ্টিরিয়া, দাও ক্যাষ্টর অয়েল (বিষবৃক্ষের হীরার আয়ি ইহার নাম দিয়াছিল, কেষ্টরস! বুড়ী বুঝিয়াছিল, কেষ্টরসে ইষ্টিরস সারে)। সান্নিপাতিক, কুছ পরোয়া নেই, ঐ ক্যাষ্টর অয়েল। এদেশের ছোট বড় মেজ সেজ সব 'রাজনীতিক নেতারই ঐ বুলি, স্বাধীনতা আসিবামাত্র সব লাল হো যাগা'। কিন্তু লাল যে ক্যাইসে হোগা, তাহা অতি বড় নেতার মুখ দিয়াও বাহির হয় নাই। তবে দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা বিদেশীয়ের হাত হইতে স্বদেশীয়ের হাতে আসার আনন্দে জমি যদি স্বতোৎফুল্ল হইয়া দশবিশগুণ ফসল উৎপন্ন করিতে লাগিয়া যায়, তাহা হইলে অবশ্য লালই হইবে। কিন্তু সে বিষয়ে আমাদের মত অকেজো, অরাজনৈতিক, গোলা লোকের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। স্বাধীন-ভারতে আমাদের যখন প্রেসিডেণ্ট, ভাইস প্রেসিডেণ্ট, সিনেটর, ফুহ্‌রার, ছুচে কিছু একটা হইবার কোনও সম্ভাবনাই নাই, অতএব আনন্দে আটখানা হইবার কারণও খুঁজিয়া পাইতেছি না, জমিরও সেই অবস্থা। জীর্ণা শীর্ণা গাভী যতটুকু সম্ভব, দুগ্ধদান করিবে ইহা অবশ্য নিশ্চিত। অ-স্বাধীন অথবা পরাধীন ভারতের মা-টি আর স্বাধীন ও স্বেচ্ছাধীন ভারতের মাটি এক ও অভিন্নই থাকিবে, থাকিতে বাধ্য হইবে। যে মন্ত্রে মা-টির সেবা করিতে হয়, সে মন্ত্রের সঙ্গে স্বাধীন পরাধীনের সম্পর্ক বড় কম, আছে কি না, তাহাতেও দারুণ সন্দেহ!

আরব্যোপন্যাসের আলাদীন একটি প্রদীপের সাহায্যে অসাধ্য সাধন করিত। তদপেক্ষা কোটিগুণ অসাধ্য সাধন করিতে পারে যে মন্ত্র, তাহার উদ্ধার কতদিনে হইবে ?

গর্ব্বিত

শ্রীঅরূপ ভট্টাচার্য্য

দারিদ্র্যের বিকট আস্ত করিয়াছে গ্রাস
ঐশ্বর্য্যের দেহ মোর, হয়েছে বিনাশ,
সম্পদ-সৌধ চূড়া পড়িয়াছে ঢলে
গিরি সম দারিদ্র্যের দৈত্যপদতলে।
পলে পলে নিষ্পেষিত প্রতিদিনগুলি
মুহূর্ত্তের কষাঘাতে উঠিছে আকুলি'
ধাবমান অশ্ব যথা, ক্রুদ্ধ অভিমানে
বাঁকাইয়া গ্রীবা তার চলে লক্ষ্য পানে
চাহে না ফিরিয়া কভু দক্ষিণে ও বামে
যদি না থামায় চালক নাহি কভু থামে
কর্ত্তব্যের গুরুভার পৃষ্ঠদেশে জুড়ে
অদৃষ্টের রুদ্ধপথে চলে শুধু ঘুরে।
আমার অলক্ষ্যে থাকি' দানব সে কোন
নীরবে ডাকিয়া কহে, 'ওরে মূঢ় শোন,
কেমনে পলাবি ছিঁড়ে মোর বিঘ্ন জাল?
আমি যে ধরেছি তোর জীবনের হাল
কৃপাবশে আমি তার না ফেরালে গতি
কেমনে ফিরাবি তুই? কোথা সে শকতি?
ক্ষুব্ধ আমি, ক্ষুধা মোর ভরিতে গুহার
প্রতিদিন ঢেলে চল কর্ম্ম উপহার।'

মনে পড়ে অতীতের সেই দিনগুলি
বুভুক্ষু লইয়া তার ম্লান ভিক্ষা-ঝুলি
আর্ত্ত অনার্ত্ত বেশে প্রবঞ্চক কত
দুয়ারে দাঁড়াত আসি হয়ে দ্বিধাহত
মাগিত করুণাকণা চাটুবাক্য হানি'
ক্ষুণ্ণ গর্ব্বে প্রসারিয়া বুদ্ধিবৃত্তিখানি
অভিনয় পটুতায় করপুট ভ'রে
সাফল্যে ফিরিয়া যেত আপনার ঘরে
সুমেরু শিখর শিরে সূর্য্যালোক সম
যশোজ্জ্বল স্বর্ণদীপ জ্বলিত যে মম
অপযশ, অপমান, অবনত শিরে
দ্বার হতে প্রতিহত চলে যেত ফিরে।
—বিস্মৃতির ইতিহাসে সেই সব দিন
অবিশ্বাসের গর্ভতলে হয়েছে বিলীন।

আজি শুধু প্রতিদিন প্রতি বর্ত্তমান
নির্ভয়ে সম্মুখে মোর হয় মূর্ত্তিমান
আত্মঘাতী পাষণ্ডের কঙ্কালের বেশে
ভ্রূকুটি হানিয়া যেন বলে মোরে হেসে,
'আমি তোরে আনিয়াছি দুর্গমের পথে
শ্লথ চক্র যুক্ত হীন অদৃষ্টের রথে
তৃপ্তিপূর্ণ দীপ্তি তোর ধূমায়িত ছায়ে
নির্ব্বাপিত আজি মোর নিশ্বাসের ঘায়ে'।

জীর্ণ ম্লান আবরণে অর্দ্ধনগ্ন হয়ে
অদৃষ্টের অপমান ভীরু স্কন্ধে বয়ে
জীবনের দগ্ধ লৌহকুণ্ড তলে
কুণ্ঠাহীন যারা আজো ক্লেদযুক্ত বলে
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে করে স্বর্ণ অন্বেষণ
দলভুক্ত আজি আমি তারি একজন।
সঙ্কুচিত বক্ষে মোর প্রেক্ষাগৃহ চুমি'
অনন্ত বিস্তৃত এক ক্লান্ত মরুভূমি
কল্পনায় ফল্গুধারা স্রোত ক্লিষ্ট বয়
তাহে তার তৃপ্তিহীন তৃষ্ণা জেগে রয়।
পরিপাণ্ডু পদ্মসম ম্লান কাষ্ঠ হাসি
ওষ্ঠের পারাপারে বেড়াইছে ভাসি'।
তবু শান্তি, তবু তৃপ্তি ঘুমাইছে বুকে
বঞ্চনার মুখোসখানি ব্যথা ক্লিন্ন মুখে
আজো আসি পড়ি নাই, অকৃত্রিম ক্ষুধা
বাঁড়াইয়া জীর্ণবাহু খুঁজে মরে সুধা;
আকাঙ্ক্ষার মহাভাণ্ডে তবু আমি ভুলে
করুণার কপর্দ্দক রাখি নাই তুলে
জ্ঞাত বা অজ্ঞাতে, তাই অনুক্ষণ
খর্ব্ব দেহে জেগে রয় গর্ব্বে ভরা মন।

মায়া-মৃগ

শ্রী মতিলাল দাশ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

তিন

অপরিচিতা তরুণী রহস্যের মাধুরী লইয়া সুরেশকে মুগ্ধ করে। গৃহে প্রেম নাই, প্রেম বাহিরে, প্রেম পরকীয়া একথা সে সাহিত্যিকদের গল্প পড়িয়া শিখিয়াছে। সুজাতা আসিলে সে এই পরকীয়া রস অনুভব করিতে শিখিল। খাইতে যাইবার পথে সে দৃষ্টি মেলিয়া সুজাতার দিকে চাহে। হঠাৎ চোখে পড়িয়া যায়—চোখে চোখ মেলে। পুলকের এক শিহরণ তাহার অঙ্গে বহিয়া যায়।

সকালে পুস্তক লইয়া বসে, গ্রন্থে তাহার মন থাকে না। শার্লক হোমের গল্প তাহার খুব ভাল লাগে। সে গল্প এখন তাহার মন আটকাইয়া থাকে না। সে জানালা দিয়া চাহিয়া থাকে। সুজাতা বসিয়া খোকামণিকে লইয়া খেলা করে। খোকামণি বলে, 'মাসি খেল' সুরেশ চাহিয়া দেখে সুজাতা খোকামণির সঙ্গে মনের আনন্দে খেলিতেছে।

সেইদিন দুপুরবেলা বীণা বেড়াইতে গিয়াছিল। অশোকবাবুর স্ত্রী ধর্ম্মনিষ্ঠ, মেয়েদের লইয়া একটী হরিসভা করিয়াছেন। তিনি বীণাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এ-সব ত ভাল নয় ?"

বাণার নিজের ভাল লাগে নাই, কিন্তু অপরে স্বামীর নিন্দা করিবে তাহা সে সহিতে পারে না। তাই বলিল, "একজন নিরাশ্রয়াকে ফেলে দেই কেমন করে ?"

"এদের সব কথা সত্যি নয়, হয় ত' মেয়েটা পালিয়েই এসেছে, এখন এসে ভণ্ডামি করছে।"

"তাই যদি হবে, তা'হলে আর এরকম আপত্তি কেন ?"

বীণার কথায় বর্ষীয়সী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তোমরা এসব বুঝবে না মা, যখন বার হয়েছিল, তখন হয় ত' জাতের কথা জানত না, কিন্তু সে যাই হোক এ-সব মেয়েদের প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয় ?"

বীণা বলিল, "কিন্তু মেয়েটার গতি কি এখন ?"

"সে ভাবনা তোমার নয়, তুমি নিজের ঘর সামলাও, যে-পথে বেরিয়েছে, পথই তার আশ্রয়, তুমি ভেবে কি করবে ?"

বীণার রুচিবোধে আঘাত লাগিতেছিল। সুশীলা, নম্র চরিত্রা সুজাতার আলাপ, আচরণ ও ব্যবহারে এমনই একটী সুসঙ্গতি আছে যাহা একান্তই ভদ্র, একান্তই স্বচ্ছ, সে তাহাকে রূপোপজীবিনীদের দলে পাঠাইতে কিছুতেই সম্মত হইতে পারিতেছিল না। যে বলিল, "এ কি ভাল হয় মাসিমা, হাজার হোক বামুনের মেয়ে, তার চালচলন খুবই সুন্দর।"

"যা ভাল বোঝ তাই কর মা, কিন্তু এদের বিশ্বাস নেই।"

এদিকে সুরেশ বাটী আসিয়া দেখিল বীণা নাই, সুজাতা পাখা হাতে করিয়া বাতাস করিতে করিতে বলিল, "দিদি বেড়াতে গেছেন ?"

সুরেশ পোষাক খুলিয়া বিছানায় চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। পরে বলিল "তুমি কি করবে ভাবছ ?"

"কিছুই ত' ভাবি নি ?"

"তুমি যাকে ভালবেসেছ, তাকে শুধু জাতের জন্যই ত্যাগ করবে ?"

সুজাতা কথা কহিল না। তাহার সুন্দর মুখে লজ্জার আভা খেলিয়া গেল। সুরেশ চাহিয়া ভাবিল কি সুন্দর।

"কিন্তু আমার ধর্ম্ম, আমার সংস্কার ?"

সুরেশ তাহার তাহার উত্তর দিল না। চোখ বুজিয়াই রহিল।

"আপনার খেতে দেরী হবে দাদা, দিদিকে খবর পাঠাই ?"

সুরেশ চোখ না খুলিয়াই উত্তর দিল, "না, না, থাক, কিন্তু ভাবছি তোমার কি উপায় হবে ? এমনি ভাবে তোমার জীবন ত' নষ্ট হতে দিতে পারি না।"

"কিন্তু কি করবেন ?" সুজাতার কণ্ঠস্বর বাষ্পাকুল।

সুরেশ কহিল, "সেখানেই অন্ধকার দেখি, আমি তোমায় কোন পথই দেখিয়ে দিতে পারি নে, কিন্তু..."

"না, না, আপনি ভাববেন না দাদা, ভগবান আছেন, তিনি মঙ্গলময়।"

এ সান্ত্বনা তার মনের নয়, তবু এই প্রীতিময় অনাত্মীয়কে সে ব্যথিত হইতে দিতে পারে না।

"সে বিশ্বাস আমার নেই সুজাতা, তোমার পেলব হৃদয় নিয়ে তিনি এই যে খেলা করলেন, এখানে তার কল্যাণ-হস্ত কোথায়?"

সুজাতা কথার উত্তর দিল না, বাতাস করিতে লাগিল। সুরেশ অন্যকথা পাড়িল, "এখানে তোমার কষ্ট হচ্ছে?"

"না, না, কষ্ট কি?"

"হচ্ছে আমি জানি, কিন্তু কি করব ভেবে পাই না··· তোমার দিদির অন্তর ভাল, কিন্তু···"

"না, না, এরজন্য আমি দুঃখ করিনে, আমি ত' সত্যি আর প্রায়শ্চিত্ত না করে রান্নাঘরে ঢুকতে পারি না, নাই বা ঢুকলাম।"

বোবা বিকালের জন্য উঠান ঝাঁট দিতে আসিয়াছিল। কথা বলিতে পারে না বলিয়া সারদা ভুঁইমালিকে সকলে বোবা বলিয়া ডাকে। পিতামাতা তাহার যে একটী সুন্দর নাম রাখিয়াছিল, কেহ তাহা স্মরণ করে না।

খোকামণি ঢোলক নিয়া বাজাইবে আর বোবা নাচিবে—খোকামণির কথা বুঝিতে পারে নাই, তাই তাহাকে মারিবার জন্য লাঠি চাই। খোকা আসিয়া বলিল, "মাসি, লাঠি বোবা মালব।"

সুরেশ বলিল, "কি হবে গুণ্ডা?"

হাত নাচাইয়া নাচাইয়া অতি সুন্দর ভঙ্গীমায় খোকামণি বলে, "বোবা মালব, বোবা মালব।"

সুজাতা খোকামণিকে লাঠি পাড়িয়া দিল। খোকামণি লাঠি লইয়া বাহির হইয়া গেল।

সুরেশ সুজাতার সুন্দর মুখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা, তুমি কি আর কাউকে ভালবাসতে পার?"

সুরেশের কণ্ঠে নবানুরাগের মাদকতা, চোখে কামনার মোহ, আবেগকম্পিত স্বর। সুরেশকে যেন নেশায় পাইয়া বসে। সুজাতা এই আবেগ দেখে না, সে ভাবিতে বসে। সুরেশ আড়-চোখে চাহিয়া লয়—সুজাতার বরাঙ্গে লাবণ্যের দ্যুতি, মাথায় একরাশি কালো চুল, লাল সাড়ীর ফাঁকে তাহাদিগকে সুন্দর দেখায়, তাহার বসন্তের মত মাধুরী ম্লান ও পাণ্ডুর, কিন্তু সেই পাণ্ডুরতায় যেন তাহাকে আরও লোভনীয় করিয়া তোলে।

সে যেন বসন্তের প্রাচুর্য্যে উজ্জ্বল নয়, সে যেন বর্ষাসজল প্রভাতের মত স্নিগ্ধ, শান্ত, মধুর। বৈশাখ-আকাশ যেন ধূসর হইয়া গিয়াছে—এলোমেলো বাতাস বহিতেছে, পাখী ডাকিতেছে আবার টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, এমনই মধুর দিনের মোহ যেন সুজাতার রূপদীপ্তিতে।

সুজাতার কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বে বীণা আসিয়া পড়িল।

সুরেশ বলিল, "আজকাল যে সময় ভুলছ?"

বীণার পূর্ব্বে এসব ভুল হইত না। স্বামী আফিস হইতে আসিবার একঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই পরিপাটি সমস্ত জিনিষ সাজাইয়া সে অন্য কাজে চলিয়া যাইত। বীণা রহস্য করিয়া বলিল, "আমার আর দরকার কি, সুজাতা ত' রয়েছে?"

সুজাতা চলিয়া যায় নাই। সে হাসিয়া বলিল, "দুধের সাধ ত' আর ঘোলে মেটে না দিদি, দাদা শুধু আকুল হয়েই পথের দিকে চেয়েছিলেন।"

এই বলিয়া সুজাতা বিদায় নিল। বীণা সুরেশকে প্রশ্ন করিল, "তুমি কি বল?"

"আমি আর কি বলব? আমায় ত তুমি বিশ্বাস করবে না···"

বীণা সেকথার জবাব না দিয়া বলিল, "যাই তোমার খাবার নিয়ে আসি।"

খাইতে খাইতে সুরেশ বলিল, "সেবার যে একটা কালো হাফ-প্যাণ্ট কিনেছিলাম সেটা আছে?"

বীণা জানিতে চাহিল, "কেন?"

"খেলতে হবে, স্কুলের মাষ্টারমহাশয়দের ঝোঁক হয়েছে, চাকুরীয়াদের সঙ্গে তাদের মল্লযুদ্ধের আহ্বান। খাঁ-সাহেব আহ্বান নিয়েছেন তারা আমাকেও ধরেছেন।"

"এই বুড়ো বয়সে খেলতে গিয়ে যদি পা ভাঙ্গে···"

সুরেশ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল, "বুড়ো বলছ, জান এমন অপমানজনক কথা বললে বিলাতে ডিভোর্স হয়ে যায়—"

"তুমি বোধ হয় পারলে তা করতে?"

বীণার কথায় রহস্যের ছন্দ নাই। সুরেশ বলিল, "তার মানে?"

"যার মানে যা, তার মানে তাই—"

সুরেশ বলিল, "ঝগড়া করবার সময় আমার নেই, প্যাণ্টটি বার করে দাও—"

প্যাণ্ট পরিলে অপূর্ব্ব চেহারা হইল। খোকামণি আসিয়া ডাকিল, "বাবু!"

সুরেশ তাহাকে আদর করিয়া বলিল, "আমি ফুটবল খেলব।"

খোকামণি পা বাড়াইয়া বলে, "ফুটবল খেলবে? এমনি কলে বল মালবে।"

সুরেশ হাসিয়া বলে, "মালব?"

খোকামণি বায়না ধরে, "আমি বাবুল সাথে যাব।"

নিতাই তাহাকে কোলে করিয়া নিয়া চলে।

বীণা সুজাতাকে ডাকিয়া বলিল, "আর কতদিন এখানে থাকবে বল? একটা কিছু ভেবে ঠিক করেছ কি?"

সুজাতার চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল, ধীরে ধীরে বলিল, "কিছুই ত' ভাবিনি দিদি, কখনও ত' কিছু ভাবতে পারিনি…"

বীণা অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "ভাবতে ত' হবে?"

সুজাতা ভাবিয়া কূল-কিনারা পায় না…"আমায় তোমার দাসী করে রাখ দিদি, আমি তোমার থালা-বাসন মাজব, খোকামণিকে মানুষ করব…"

"না, এখানে তা' হবে না, কর্ত্তা তোমায় কিছু করতে দেবেন না—তুমি অন্য চেষ্টা করো।"

সুজাতা গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল, খানিক পরে বলিল, "আচ্ছা দিদি, এখানকার মেয়ে স্কুলে মেয়েদের যদি পড়াই, আমি ত' লেখাপড়া জানি…"

বীণা খুশী হইয়া বলিল, "তা' মন্দ নয়, আজ রাত্রে এই কথা বলব।"

বীণা পরিত্রাণের একটা পন্থা দেখিয়া খুশী হইয়া উঠিল, "আমার কথায় চটনি ত' বোন? আমি তোমার ভালর জন্যই বলছি। চিরজীবন ত' আর পরের গলগ্রহ হ'য়ে থাকা যায় না?"

অভিমানে ও দুঃখে সুজাতার বুক ভরিয়া কান্না উঠিতেছিল, কান্না থামাইয়া সে বলিল, "তা' ত' ঠিক, দিদি।"

এমন সময়ে খোকামণি নিতায়ের কোলে চড়িয়া বাসায় ফিরিল। কোল হইতে নামিয়া কল্পিত বলকে মারিবার জন্য পা চালাইয়া খোকামণি বলিল, "মা, বাবু এমনি কলে বল মেলেছে?"

সুজাতা ও বীণা হাসিয়া উঠিল।

পরে বসিয়া পড়িয়া দেখাইল, "মা, বাবু পলে গেছে।"

সুরেশ আসিল, হাসিতে হাসিতে বলিল, "বিজয়ী হ'য়ে ফিরছি; কিন্তু অভ্যর্থনার ত' কোনও আয়োজন দেখছি না—না তোরণে ফুলসজ্জা, না শঙ্খধ্বনি।"

বীণা তাহাকে থামাইয়া বলিল, "তোমার পাগলামি রাখ? পায় লাগেনি ত'?"

সুরেশ বলিল, "হে নিষ্ঠুর, আমার পা-ই বড় হল—আমার হৃদয় যে সাহারার মত মরু হয়ে গেল, তা' কি তুমি দেখবে না, বেশ তবে আইওডেক্স আনো, পা-টা গেছে মটকে, পদসেবা করে অক্ষয় স্বর্গ লাভ কর।"

"আইওডেক্স ত' ফুরিয়ে গেছে, নিতাই যেয়ে নিয়ে আসুক।"

সুজাতা বাহির হইয়া বলিল, "পুকুরের পাড় থেকে নিতাই বরং থানকুনির পাতা নিয়ে আসুক, সেটা বেঁটে প্রলেপ দিলে আরাম হ'য়ে যাবে।"

নিতাই পুকুরপাড় হইতে থানকুনির পাতা কুড়াইয়া আনিল। সুজাতা তাহা বাঁটিয়া আনিয়া পায়ে প্রলেপ দিয়া দিল। সুরেশ বাহিরে উঠানে ইজিচেয়ারে শুইয়া রহিল।

সুজাতা একটা মোড়া নিয়া পাশে বসিল। বীণা খোকামণিকে লইয়া অপর চেয়ারে বসিয়াছিল।

সুজাতা ধীরে বলিল, "দাদা, এখানকার এই মেয়ে স্কুলের মাষ্টারিটা আমায় যোগাড় ক'রে দিতে হবে।"

"কেন, আমি কি তোমার দুটি খেতে দিতে পারব না?"

সুজাতার প্রাণ ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। কষ্টে আত্মদমন করিয়া বলিল, "আপনার দয়া এ জীবনে ভুলব না…একটা কিছু করা ত' ভাল।"

বীণা বলিল, "সুজাতা ভাল কথাই বলেছে, দেখ না চেষ্টা করে?"

সুরেশ সে কথার জবাব না দিয়া কহিল, "তুমি রাশি চেন সুজাতা?"

"না।"

"ঐ দেখ বৃশ্চিক রাশি, দেখছ ঠিক যেন একটা বিছে। আমার বৃশ্চিক রাশি, অনুরাধা নক্ষত্র—ঐ দেখছ ঐটা অনুরাধা।"

সুজাতা খুশী হইয়া বলিল, "ঐ তারাটি যেন হাসিভরা, আপনিও বোধ হয় তাই সদাপ্রসন্ন।"

বীণা বাধা দিয়া বলিল, "ওসব বাজে কথা থাক, কালই তুমি অন্নদাবাবুর সঙ্গে দেখা করে ঠিক করো, আমিও বরং প্রকাশবাবুর স্ত্রীকে বলে দেবো—"

সুরেশ বলিল, "তুমি এদের চেন না বীণা। এখানে সুজাতার কাজ হবে না।"

বীণা অপ্রসন্ন হইয়া প্রশ্ন করিল, "কেন?"

"এরা শাস্তি দিতে জানে, পথ দেখাতে পারে না।"

সুজাতা বলিল, "কিন্তু আমার পথ ত' চাই দাদা?"

সেই কাকুতি সুরেশকে বিহ্বল করিয়া তুলিল। আকাশের বিচিত্র আলোর লহর নিঃশেষ হইয়া যেন মিলাইয়া যায়। সূচীভেদ্য তমসায় যেন ধরণী ভরিয়া যায়।

"ভগবানকে ডাকো, তিনিই পথ দেখাবেন।"

এই আশ্বাস সুরেশের নিজের কাণেও যেন বিসদৃশ লাগিল। সুজাতা কথা কহিল না। উঠিয়া আপন ঘরে গেল।

বীণা কহিল, "ভগবান ত' নিজে এসে কিছু করবেন না, আমাদেরই ত' পথ দেখাতে হবে—"

সুরেশ কথা কহিল না। উঠানে বেল-ফুলের কুঁড়ি ফুটিয়াছিল, তাহার সৌরভ ভাসিয়া আসিতেছিল সুরেশ তাহাই আঘ্রাণ করিতেছিল।

চার

রাত্রে বর্ষা।

রিম-ঝিম শব্দে পৃথিবী ধ্বনিত। বীণা বিনা আহ্বানেই সুরেশকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল, "শুনছ?"

সুরেশ ঘুমায় নাই, তবু চুপ করিয়া রহিল। বীণা বলিল, "লোকে কথা বলছে, সুজাতার একটা ব্যবস্থা করো"

সুরেশ বলিল, "কিন্তু ওকে ত' ফেলে দিতে পারি না?"

বীণা রাগিয়া বলিল, "তাহলে ওকে গৃহলক্ষ্মী করে রাখো, আমাকে বিদায় দাও—"

সুরেশ এ কথার উত্তর দিল না।

বীণা ক্রোধভরে কহিল, "জানি তুমি আমায় কোনওদিন ভালবাস না, তুমি সুজাতাকে নিশ্চয়ই ভালবাস?"

সুরেশ বলিল, "ছিঃ!"

পতি ও পত্নীর এই নির্জ্জন আলাপ নিশীথরাত্রিকে কেবল জাগায় নাই, পাশের ঘরে সুজাতার কাণেও গেল। নিদ্রাহীন দুশ্চিন্তায় সে জাগিয়াই ছিল। সুজাতা ভাবিতে বসে। সমাজের নিরাপদ আশ্রয় তাহার নয়—তাহার স্পর্শ আজ তাহার পরিবেশকে জটিল করিয়া তুলিবে। বীণা তাহাকে চায় না, সুজাতা তাহা বুঝিয়াছে। সুরেশ তাহাকে স্নেহ করে, দয়া করে। কিন্তু দয়া ও স্নেহের বিনিময়ে সে এই প্রেমময় দম্পতীর জীবনে ধূমকেতুর মত বিপ্লব তুলিবে না। ক্ষণিকের ক্ষণ পরিচয়। তাহার স্নেহ সে হৃদয় দিয়া অনুভব করিবে, কিন্তু তাহার বিনিময়ে তাহার দুর্ভাগ্য দিয়া তাহাকে কলুষিত করিবে না। সে ভাবিয়া কূল কিনারা পায় না।

বীণার কণ্ঠ শোনা যায়, "তুমি ওকে ভালবাসতে আরম্ভ করেছ?"

সুরেশ নিশ্বাস চাপিয়া উত্তর দিল, "তাতে কি হয়েছে?"

"কি হয়েছে তা' যদি বুঝতে—"

আর শোনা গেল না। সুজাতার সারা মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, এজীবনে সে ঘরের বাহির হয় নাই। কোথায় সে যাইবে? কে তাহাকে আশ্রয় দিবে? যুবতী নারীর জন্য পৃথিবী এতই সংকীর্ণ। সে সঙ্কল্প করিল—এক মাত্র পথ মৃত্যু। মৃত্যুর কল্পনায় সে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। পৃথিবীর আলো, বাতাস, হাসি, কান্না, তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকে। কিন্তু সে প্রলোভন তাহাকে আর ভুলাইবে না—সে চলিবে, মরণের নির্ভর আলিঙ্গনে সকল জ্বালা জুড়াইবে। কিন্তু মরাও ত' সহজ নহে। সে শুনিয়াছিল অনেক মানুষ গলায় দড়ি দিয়া মরে—না সে গলায় দড়ি দিতে পারিবে না, তাহা হইলে সুরেশের চরিত্র কলঙ্ক হইবে। কুমার—স্নিগ্ধ শান্ত কুমার নদ—তাহার স্বচ্ছ জলে সে আত্ম-বিসর্জ্জন করিবে।

মৃত্যুর কল্পনা তাহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল শেষ রাত্রিতে সে উঠিল উদ্দেশে সুরেশের চরণে সে প্রণাম জানাইল, তারপর রান্নাঘর খুলিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল।

জীবন মমতাময়—তাহার মনে হইল সে ফিরে। কিন্তু সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া সে চলিল। নিরাপদ কোমল শয্যা তাহাকে ভুলাইতে চাহিল, পিতা মাতা—তারপর প্রবঞ্চক স্বামী, সকলের কথা মনে পড়িল। কিন্তু সে ফিরিল না। চলিল—কে যেন তাহাকে পথ দেখাইয়া চলিল—কে যেন বলিল—এস আমি শান্তি দেব—এস আমি বিস্মৃতি দেব—

সুরেশ সেদিন ভাল ঘুমাইতে পারে নাই। শেষ রাত্রে উঠিয়া সে নদীতীরে বাহির হইল। প্রাতঃভ্রমণ তাহার অভ্যাস, কিন্তু এই দিন তখনও আলো হয় নাই। গুমট গরম অসহ্য হইল বলিয়া সে নদীতীরে চলিল। নদীর হাওয়া তাহার তপ্ত হৃদয়কে শান্ত করিবে।

ধূসর আকাশ—তারকার ম্লানদ্যুতি। সমস্ত সহর নীরব ও নিঃস্পন্দ—সুরেশ গিয়া ঘাটে বসিল। সহসা সুরেশের চোখে পড়িল অস্পষ্ট নারীমূর্ত্তি—উষার আলো ফোটে নাই—অন্ধকার। সুরেশ ভাবিল কোন পুণ্যবতী হয় ত' প্রাতঃস্নানের পুণ্য অর্জ্জন করিতে আসিয়াছে। সে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল।

সুজাতা জলে নামিল, কিন্তু সে সাঁতার জানে, ডুবিয়া মরা তাহার সহজ হইল না। তাহা ছাড়া তাহার ভরা যৌবন পৃথিবীকে এত সহজে ত্যাগ করিতে পারে না। সে স্নাত হইয়া ফিরিল।

সুরেশের দৃষ্টি পড়িল সেই আধ আলো আধ অন্ধকারে, সে চিনিল—সুজাতা। সে বিস্ময়ে ডাকিল, "সুজাতা"।

সুজাতা চমকিত হইয়া উঠিল, কোন উত্তর দিল না।

"এত সকালে তুমি এখানে কেন ?"

সুজাতা উত্তর দিল না—শুধু বেতস লতার মত কাঁপিতে লাগিল। সুজাতা বাহিরে স্নান করে না, কুমার নদে লোকে সাধারণতঃ স্নান করে না। তথাপি সুরেশ প্রশ্ন করিল, "তুমি বুঝি গঙ্গাস্নান করতে এসেছিলে ?"

সুজাতা তথাপি উত্তর দিল না। সুরেশ এইবার বলিল "তুমি তাহলে ডুবে মরতে এসেছিলে ? কিন্তু আমরা ত' তোমার অযত্ন করি নি।"

সুজাতা উত্তর দিতে পারিত—বীণা তাহাকে চায় না। গলগ্রহ হইয়া তাহার সুখের সংসারে যেন বিপ্লব না বাধায়। তাহা না বলিয়া সে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "আমার আর কি উপায় ?"

শান্ত নদীতীর, দূরে গন্ধরাজ ফুটিয়াছিল, বাতাস তাহার সুরভি বহিয়া আনিতেছিল। সুজাতার আর্ত্ত ব্যথিত স্বর সুরেশকে মুগ্ধ করিল। সে বলিল, "সু, তুমি যদি চাও, আমার গৃহে তোমার অধিকার চিরন্তন হবে···" আবেগে সুরেশের কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল।

সুজাতা বিস্মিত হইয়া গেল। সুরেশের স্নেহ ও অনুকম্পাকে সে বিগলিতচিত্তে গ্রহণ করিয়াছে। ইহা কি সেই দয়া ? ইহা কি সেই অনুকম্পা, না আরও কিছু ?

সুরেশ ভাবিতে পারিতেছিল না, ত্বরিত-বেগে বলিল, "বল সু, আমি তোমায় অবহেলা করব না, তুমি হবে আমার পরিণীতা পত্নী, এ-ছাড়া অন্য উপায় আমি দেখি না।"

সুজাতার মমতাময় নারীহৃদয় জাগিয়া উঠিল। মৃত্যুর কুশ্রী অসুন্দর গ্লানি একদিকে, অন্যদিকে প্রেমময় বন্ধুর বিশ্বস্ত বক্ষ, তাহার লোভ হইতেছিল কিন্তু সে কেবল ক্ষণিকের জন্য। সে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "না দাদা, তা' অসম্ভব, এ-জীবনে বিয়ে আর কাউকে করতে পারব না।"

সুরেশ বলিল, "চল বাসায় ফিরি, এখনই লোকজন আসবে।"

সুজাতা সিক্তবস্ত্রে চলিল। সুরেশ পিছনে পিছনে চলিল। সুরেশ বলিল, "তুমি অবাক হয়ে যাচ্ছ সু, কিন্তু আমি ভেবে দেখেছি, এ-ছাড়া বোধ হয় পথ নেই, তোমার আপনজন তোমাকে যখন নিল না, তখন তুমি কোন্ পথে যাবে

সুজাতা উত্তর দিল না। চুপ করিয়া পথ চলিতে লাগিল।

সুরেশ বলিল, "দাসীবৃত্তি করে জীবন-যাপন তোমার পক্ষে না হবে কল্যাণের, না হবে সুখের, তাই তোমায় ভেবে দেখতে বলি, বীণা রাগ করবে, হয় ত' দু'চার দিন বাপের বাড়ী চলে যাবে, কিন্তু শীঘ্রই ও ক্ষমা করতে পারবে, তারপর তোমরা দু'টি বোনের মত—"

সুজাতা বলিল, "হিন্দুর ত' আর দুই বিয়ে হয় না।"

সুরেশ বলিল, "হবে না কেন ? শাস্ত্রে তার বিধান রয়েছে, পতি নষ্ট, মৃত, প্রব্রজিত হলে অন্য স্বামীর ব্যবস্থা আছে, আর এ-বিষয়ে ত' বিয়ে নয়, তোমায় মিথ্যা বলে ঠকিয়েছে।"

সুজাতা উত্তর করিল না সে ইহার উত্তর জানে না।

তাহার মনে অন্য ভাব তখন খেলিতেছিল। কল্পনায় সে সুরেশের গৃহে তাহার ভাবী বধূর ছবি দেখিতে চেষ্টা করিতেছিল।

বাসায় ফিরিতেই উঠানে বীণার সহিত দেখা হইল। বীণা ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "দু'জনের অভিসার হইয়াছিল বুঝি।"

সুজাতা লজ্জায় মাটিতে মিশিয়া যাইতে লাগিল। সুরেশ গম্ভীর হইয়া বলিল, "তোমার জ্বালায় জলে সুজাতা মরতে গিয়েছিল, অভিসারে যায় নি, তবে আমি ঠিক করেছি, ওকে বিয়ে করব, ওর তা' ছাড়া পথ কোথায়?"

বীণা রাগিয়া বলিল, "শাঁখ বাজাবো না'কি?"

সুরেশ তাহার উত্তর দিল না। শুধু গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "সুজাতা, তুমি মন স্থির কর, আমার সংকল্প অটল।"

সুজাতা কথা কহিল না, নীরবে ঘরে চলিয়া গেল। বীণা অগ্নিদৃষ্টি মেলিয়া স্বামীর দিকে চাহিল। প্রভাতের নিত্যকার আয়োজনে বিপ্লব বাধিল। সুরেশ প্রত্যহ সকালে চায়ের বদলে এক পেয়ালা গরম দুধ খায়। আজ দুধ আসিল না। বীণা নিতাইকে রাঁধিতে দিয়া শয্যায় আশ্রয় লইল। সুজাতাও আপন কক্ষে বসিয়া অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিল।

সুরেশ বৈঠকখানায় বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। রঙ্গিলা নাপিত তাহার কাঠের বাক্স নিয়া পথ দিয়া যায়। দীঘির জল লইতে মেয়েরা আসে, কলস ভরিয়া জল লইয়া যায়।

সুরেশ একখানি বই লইয়া মন স্থির করিতে বসিল। তাহার হাতে উঠিল কেম্পির খৃষ্টের অনুসরণ নামক গ্রন্থ। বইখানি তাহার এক বিলাত ফেরত বন্ধু তাহাকে উপহার দিয়াছিল। চতুর্দ্দশ অধ্যায় খুলিয়া সে পড়িতেছিল—"তোমার নিজের দিকে তুমি দৃষ্টি দাও, অপরের কাজের সমালোচনা করো না।

পুস্তকে তাহার মন বসিতেছিল না। এমন সময় সুবেশ একজন যুবক তাহার ঘরে প্রবেশ করিল, সুন্দর, সুদর্শন ও সুবেশ। পুস্তকের পাতা হইতে মুখ তুলিয়া সুরেশ বলিল, "বসুন।"

যুবক বসিল না। সুরেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সুরেশ খানিক বিস্মিত হইয়া বলিল, "কি চান, বলুন!"

যুবক বলিল, "আমার নাম বিষ্ণুপদ। আমি আমার স্ত্রীকে নিতে এসেছি—"

সুরেশ রাগিয়া উঠিল, বলিল, "জোচ্চোর কোথাকার, স্ত্রী বলতে মুখে বাধল না—"

যুবকের মুখে ক্ষণিক মেঘ ম্লান হইয়া গেল। কিন্তু আগ্রহ হইয়া বলিল, "আমি তাকে বিয়ে করেছি, ওকে ভাল-বেসেছি—"

সুরেশ বলিল, "একজন নিরপরাধ কুমারীর সর্ব্বনাশ করেছ?"

"সর্ব্বনাশ কেন হবে? আমি কি মানুষ নই—মালব্য সেবার বরিশালে আসেন, তিনি যখন বর্ণ নির্ব্বিশেষে সমস্ত হিন্দুকে গায়ত্রী মন্ত্র দান করেন, আমি তখন উপবীত নিয়ে ব্রাহ্মণ হয়েছি। জাতিতে আমি ব্রাহ্মণ নই সত্য, কিন্তু সেই দিন থেকে আমি ব্রাহ্মণের আচার পালন করেছি, ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করছি—"

বিষ্ণুপদ চেয়ার টানিয়া এইবার বসিল। সুরেশ বলিল, "এসব হয় ত' সত্য, কিন্তু তুমি ত' তোমার সত্যকার পরিচয় দাও নি—"

"দেই নি বলতে পারেন না, কেউ চায় নি, আমায় মিথ্যাই দোষারোপ করছেন। যিনি আমায় আশ্রয় দিয়েছিলেন, তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ বটেন, কিন্তু তিনি কোনও আচারই মানেন না, তিনি নব্য ও আধুনিক। আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলেই তাঁর স্ত্রী আমায় পোষ্যের মত পালন করেন।"

সুরেশ বলিল, "কিন্তু তুমি ত' জান তোমার নিজের পরিচয়, তুমি কেন?"

"কিন্তু এত আমার মিথ্যা পরিচয় নয়, হিন্দুস্থানী বা উড়ের গলায় পৈতে থাকলে তার পাতে খেতে আমাদের বাধে না, আচারনিষ্ঠ বাঙ্গালীর হাতে খেলে দোষ কি?"

সুরেশ বলিল, "সে তর্ক আমি করতে চাই না, সুজাতা তোমার ওখানে যেতে পারবে না।"

"এ আপনার কথা, না সুজাতার কথা—"

"আমার কথা, আর আমার মনে হয় সুজাতার মনের কথাও তাই—"

"তাকে নিয়ে আপনি কি করবেন?"

"সে প্রশ্ন অবান্তর, তোমার তা জানবার প্রয়োজন নেই।"

বিষ্ণুপদ বলিল, "কিন্তু এইটেই জানা আমারই সবচেয়ে দরকার, তার কল্যাণ আমার চেয়ে কেউ বেশী চায় না—"

সুরেশ বলিল, "আচ্ছা তুমি যাও, আমি বরং তাকে, জিজ্ঞাসা করে বলব।"

"বেশ।"

বিষ্ণুপদ উঠিতে যাইতেছিল, এমন সময় দেখিল দরজার প্রান্তে সুজাতা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পরণে তার চওড়া-পাড়ের লাল শাড়ী, সীমন্তে সিন্দুরেরেখা, চোখে উজ্জ্বল শান্ত দৃষ্টি।

সুজাতা আসিয়া সুরেশকে প্রণাম করিয়া বলিল, "দাদা!" সে আর বলিতে পারিল না, ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সুরেশ তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল, "কেঁদনা সু, আমি ওকে চলে যেতে বলেছি, ও এসে আর তোমার জীবন কলঙ্কিত করতে পারবে না—"

সুজাতা মুখ তুলিয়া বলিল, "দাদা, আপনার স্নেহ ও যত্ন আমার চিরদিন মনে থাকবে, কিন্তু আমায় ছেড়ে দিন—"

সুরেশ অবাক হইয়া বলিল, "তার মানে?"

"আমি আমার স্বামীর সঙ্গেই যাব—"

সুরেশ ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলিল, "স্বামী! ঐ ঠক্ জোচ্চোর মুচির ছেলেই তোমার স্বামী—না, না, সুজাতা তোমায় আমি যেতে দিতে পারব না—তুমি কি বলছ তুমি বুঝতে পারছ না।"

সুজাতা কথা কহিল না। নিরুপায় করুণ দৃষ্টিতে সুরেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বিষ্ণুপদ বলিল, "সুজাতা যখন স্বেচ্ছায় আসতে চাইছে, আপনি কেন বাধা দিচ্ছেন?"

সুরেশ রাগিয়া বলিল, "তুমি তার কি বুঝবে, ধর্ম্ম, সমাজ, জাতি তুচ্ছ নয়।"

বিষ্ণুপদ বলিল, "কিন্তু এ সবের চেয়ে মানুষের প্রাণ বড়।"

সুরেশ বলিল, "সে প্রাণের মূল্য আমি দেব—সুজাতা তুমি চঞ্চল হয়ে আপনার সর্ব্বনাশ করো না।"

সুজাতা উঠিয়া বলিল, "দাদা, আমার ভুল ভেঙেছে, আচার বড় নয়, বড় স্বামী। ভাগ্য যার হাতে আমার হাত মিলিয়েছেন, সেটি আমার জন্মজন্মান্তরের, আপনি রাগ করবেন না, আমি আসি।

খোকামণি আসিয়া ডাকিল, "মাসি, বল খেলবি?"

সুজাতা তাহাকে বুকে তুলিয়া লইল, "আসি বাবা, তুমি নিতাইয়ের সঙ্গে খেল গে!

'না, মাসি, না মাসি,' খোকামণি কাঁদিয়া উঠিল।

সুরেশ প্রশ্ন করিল, "তাহলে কি ঠিক ক'রছ সুজাতা?"

"আমার ত' ঠিক করবার আর কিছু নেই, এ ছাড়া আর কোনও পথ আমার চোখে পড়ে না দাদা!"

সুরেশ রাগিয়া ডাকিল, "নিতাই খোকাকে নিয়ে যাও!"

বীণা আসিয়া দরজার দিকে দাঁড়াইয়া বলিল, "ওকে আমার কোলে দাও।"

সুজাতা খোকাকে বীণার কোলে দিয়া বলিল, "দিদি, আসি।"

বীণা তাহার মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিল—"চিরায়ুষ্মতী হও।"

সুজাতা বিষ্ণুপদের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

সুরেশ গুম হইয়া বসিয়া রহিল। বীণা স্মিতহাস্যে বলিল, "আমাদের নেমন্তন্ন ফসকে গেল দেখছি।"

সুরেশ কথা কহিল না। পত্নীর দিকে রোষ কষায়িত দৃষ্টি মেলিয়া চাহিল। বীণা এখন সুরেশকে রাগানো ঠিক নয় বলিয়া চলিয়া গেল।

সুরেশ রাগ করিয়া আফিসে গেল। আফিসে বসিয়া সে ধীর চিত্তে চিন্তা করিল। সুজাতা যাহা করিয়াছে, তাহা ভালই করিয়াছে। বীণা কখনও সতীনকে গ্রহণ করিতে পারিত না। তাহা ছাড়া লোক-গঞ্জনায় সুরেশের জীবনও অতিষ্ঠ হইয়া উঠিত। সাময়িক মোহ কাটিলে সুরেশ বুঝিল, বিষ্ণুপদ সুজাতাকে সমাদর করিবে। সেই গৃহে সে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিবে।

অভিমানে তাহার হৃদয় ফুলিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু চিন্তা করিয়া সে বুঝিল তাহার অভিমান অহেতুক। বাসায় ফিরিতেই বীণা হাস্যমুখে তাহাকে অভ্যর্থনা করিল।

তারপর প্রাত্যহিক প্রেম গুঞ্জন চলিল। সন্ধ্যার সময় সুরেশ ইজিচেয়ার পাতিয়া উঠানে বসিয়া রহিল। বীণা রাঁধিতে গেল না—নিতাইকে রাঁধিবার ভার দিয়া সে আসিয়া পাশে বসিল। বীণার চিত্ত পুলক-মদির—যে পাষাণ-ভার তাহার বক্ষে চাপিয়া বসিয়াছিল তাহা গিয়াছে। সুরেশ চোখ বুজিয়া বসিয়াছিল—বীণা সম্মুখে তেপায়া

রাখিয়া ফুলদানীতে হেনাফুল আনিয়া রাখিল। মিষ্ট সুরভি চারিদিক প্রমোদিত করিয়া তুলিল।

বীণা রহস্য করিয়া বলিল, "আমি ক্ষমা চাইছি।"

সুরেশ বলিল, "কেন ?"

বীণা হাসিয়া বলিল, "তোমার বিয়েতে বাধা দিয়েছি ?"

"নিরুপায় হয়েই ত' ওকথা বলেছিলাম।"

বীণা তাহার কৌতুক-সুন্দর ভঙ্গীতে প্রশ্ন করিল, "সত্যি ?"

সুরেশ কথা কহিল না।

বীণা ছাড়িবার পাত্র নয়, বলিল, "তুমি ওকে ভালবেসেছিলে, এ আমি হলফ্ করে বলতে পারি।"

আকাশে জ্যোৎস্নারাশি হাসে। পাশে রজনীগন্ধার কুঁড়ি—তরুণ ও তরুণী। মনে হয় তাহাদের অনন্ত অসীম ভালবাসা পৃথিবীকে মুগ্ধ করিয়া গতিহীন করিয়া রাখে। বীণা সাগ্রহদৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা একটা সত্য কথা বলবে ?"

সুরেশ বলিল, "কি ?"

"তুমি আমায় ভালবাস নি—কোনও দিন ভালবাস নি, আমি কালো, কুরূপা—তোমার মনে রয়েছে অতৃপ্ত তৃষ্ণা…"

সুরেশ বলিল, "তা' হয় ত' আছে ?"

বীণার ভ্রূকুঞ্চিত হইল। সে রাগ করিয়া মুখ ফিরাইল।

সুরেশ উঠিয়া বসিল, বলিল, "রবীন্দ্রনাথের 'বলাকায়' একটা চমৎকার কবিতা আছে।"

বীণা বলিল "থাক, কবিতায় আমার দরকার কি, আমি ত' তোমার প্রাণে কবিতা জাগাতে পারি নি ?"

"সেই কথাই বলছি, সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে দুই নারী মানুষকে পথভ্রান্ত করছে—একজন উর্ব্বশী—নিখিল বিশ্বের মনোরমা সে, তার পুষ্পিত যৌবন, তার নিটোল লাবণ্য, তার সর্ব্বাঙ্গে জ্যোৎস্না…"

"সুজাতা বুঝি তোমার সেই উর্ব্বশী ?"

"তা' ঠিক বীণা। সুজাতা এসে তার অসামান্য রূপ দিয়ে আমার হৃদয়ে বিক্ষোভ জাগিয়েছিল, কিন্তু উর্ব্বশী তপোভঙ্গ করে, তাকে নিয়ে সংসারের কাজ চলে না।"

"সংসারের জন্য চাই এই পোড়ারমুখী ?"

"সংসারের জন্য চাই লক্ষ্মী—শোনো কবি কি বলছেন—

আরজন ফিরাইয়া আনে,
অশ্রুর শিশির স্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায়
হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায়
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্ব্বাদ পানে
অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহাস্য সুধায় মধুর,
ফিরাইয়া আনে ধীরে
জীবন-মৃত্যুর
পবিত্র সঙ্গম-তীর্থ-তীরে
অনন্তের পূজার মন্দিরে।"

সুরেশের চমৎকার আবৃত্তি বীণাকে তৃপ্ত করিল। সব সে বুঝিল না, কিন্তু স্বামীর বিক্ষিপ্ত চিত্ত সে ফিরাইয়া আনিয়াছে, বিজয়িনীর এই গর্ব্বে সে উদ্বেল হইয়া উঠিল। সুজাতার প্রতি তাই সে সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া বলিল, "আমার অন্যায় হয়েছে, সুজাতার সঙ্গে আমি ভাল ব্যবহার করি নি।"

সুরেশ উঠিয়া পত্নীকে আদরে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া প্রাণের সমস্ত আবেগ তাহার দ্রাক্ষারস-মধুর অধর-পুটে ঢালিয়া দিয়া বলিল, "সুজাতা থাক, তুমি আমার হৃদয়ের অচঞ্চলা লক্ষ্মী…"

বীণা অন্তরে অন্তরে খুশী হইলেও বাহিরে কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল, "ছাড়ো তোমার কাণ্ডজ্ঞান কি লোপ পাচ্ছে, যদি কেউ দেখে ফেলে…"

সুরেশ বলিল, "দেখুক, আজ আকাশ বাতাস সুরে ভরে উঠেছে—উর্ব্বশীর কাছে যা চেয়েছি, তোমার কাছে সেই মাদকতা চাই ?"

বীণা হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা কি করে হবে, আমি ত' মায়া-মৃগ নই—আমি একান্ত বাস্তব।"

"না, প্রতিদিনের রসহীন জীবনে তুমিই হবে আমার মায়া-মৃগ, রোমান্সের রঙ দিয়ে জীবনের সমস্ত কঠোরতাকে সরস করে তুলবে ?"

বীণা কথা কহিল না। শুধু জ্যোৎস্নার দিকে ঘন-পরিতৃপ্তির সহিত চাহিয়া রহিল।

মঙ্গল-কাব্যে শিব

শ্রীকালিদাস রায়

দুই

মঙ্গল-কাব্যের সূত্রপাত বৌদ্ধ-সাহিত্যে এবং সমস্ত মঙ্গল-কাব্যে বৌদ্ধ প্রভাব অল্পবিস্তর বর্ত্তমান। বুদ্ধরূপী ধর্ম্মের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনই বৌদ্ধদের মঙ্গল-কাব্যের উপজীব্য ছিল। তাহা হইতেই হিন্দু দেবদেবীর মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। সেকালের বৌদ্ধগণ শিবপূজাও করিতেন। বৌদ্ধ-সাহিত্যে শিবের স্থান ছিল বুদ্ধ বা ধর্ম্মের নীচে। শিব ধর্ম্মেরই আজ্ঞাবহ। ১ শিব ছিলেন চাষবাসের দেবতা। বৌদ্ধ-সাহিত্যিকগণ শিবকে দিয়া চাষ করাইয়াছেন। শিব তাঁহার পত্নী মহামায়ার সঙ্গে অন্নাভাব লইয়া কলহ করেন এবং ভিক্ষা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। শিবের এই বৌদ্ধ চিত্র পরবর্ত্তী হিন্দু কবিরা গ্রহণ করিয়াছেন। ধান ভানিতে যে শিবের গীত গাওয়া হইত সে শিবও ইনিই।

এদিকে দেশের মন্দিরে ধর্ম্মঠাকুর ক্রমে ধর্ম্মরাজ হইয়া শিবত্ব লাভ করিয়াছেন। ধর্ম্মঠাকুর ধর্ম্মরাজনামে রাঢ়দেশের গ্রামে গ্রামে থাকিয়া গিয়াছেন—অথচ বৌদ্ধ নাই দেশে। তাই বলিয়া দেবতা ত' লুপ্ত হইতে পারে না—দেবতা যে অমর। হিন্দুরা ধর্ম্মরাজকে বুড়া শিব বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ধর্ম্মঠাকুরের চড়ক গাজনই শিবের চড়ক গাজন। চড়ক গাজনের গান ও গম্ভীরার গান বৌদ্ধ-সাহিত্যেরই গীতাত্মক পরিণতি। শিবের গাজন ধর্ম্মের গাজন মিলিয়া মালদহের গম্ভীরা উৎসবের উৎপত্তি।

বজ্রযানী বৌদ্ধদের মধ্যে বজ্রতারা, আর্য্যতারা, আদ্যা, বজ্রেশ্বরী, বিশালাক্ষী ইত্যাদি নামে যে দেবী পূজা পাইয়া আসিতেছিলেন, তিনিই হিন্দুর ভবানীর সহিত মিলিত হইয়া চণ্ডীরূপ ধরিয়াছেন। শিবঠাকুর আর ধর্ম্মঠাকুর যেমন এক হইয়া গিয়াছেন—নিরঞ্জন-পত্নী আদ্যাও তেমনি শিব-জায়া শঙ্করীর সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছেন। ২

মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যই আদিমতম। ইহার সৃষ্টিতত্ত্বও রামাই পণ্ডিতের (শূন্যপুরাণ) ৩ সৃষ্টিতত্ত্ব অভিন্ন। ধর্ম্মঠাকুরের নাম পরবর্ত্তী চণ্ডীকাব্যেও আছে। অন্যান্য দেবতার সহিত ধর্ম্মদেবতার স্তব করিয়া হিন্দু কবিগণ মঙ্গল কাব্য রচনা করিতেন।

---

১ নিরঞ্জন বা ধর্ম্মের ঘর্ম্ম হইতে আদ্যাশক্তির জন্ম। তাহার বিষপানের ফলে শিবের জন্ম। আদ্যা শিবের জননী; ব্রহ্মা ও বিষ্ণুও আদ্যার সন্তান। ইঁহারাই সৃষ্টি করিলেন। আদ্যা সাতজন্ম পার হইয়া দক্ষের কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া শিবের পত্নী হইলেন।

২ বৌদ্ধ কবিরা শিবকে ধর্ম্মদেবতার অধীনে চাষী বানাইয়াছিলেন—শূন্য পুরাণে তাঁহার চাষের বর্ণনা আছে। বহুদিন পরেও শিবায়ন গ্রন্থে তিনি আবার চাষী রূপে দেখা দিয়াছেন। শিব সকল মঙ্গল-কাব্যেই আছেন—তবে অন্যরূপে। মঙ্গল-কাব্য ও অন্যান্য সাহিত্যে ত্রিলোচন তিনরূপে দেখা দিয়াছেন। এক রূপে তিনি ধর্ম্মঠাকুরের সহিত মিশিয়া পাঁচালী ও গম্ভীরার গান শুনিয়াছেন। আর একরূপে তিনি বঙ্গীয় কবিদের উপাস্য না হইয়া উপহাস্য হইয়াছেন। এই শিবই একদিকে সাহিত্যে হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন—অন্যদিকে উমার প্রসঙ্গে করুণ রসের সঞ্চার করিয়াছেন। আর একরূপে তিনি হিন্দুপুরাণের ব্রহ্মময় শিব—জ্ঞানিগণের উপাস্য—চাঁদ সদাগরের পরমারাধ্য। ইঁহার উপাসকদের সঙ্গেই শাক্ত সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্বে মনসামঙ্গলের সৃষ্টি। নাথ-সাহিত্য বৌদ্ধ-সাহিত্যেরই একটি ধারা হইলেও ইহাতে ধর্ম্মঠাকুরের সহিত একাত্মক হইয়া শিবের মর্য্যাদা ঢের বাড়িয়াছে। নাথ-সাহিত্যে শিব অনাদি নিধন ব্রহ্ম স্বরূপ। গোরক্ষনাথ এই শিবেরই উপাসক না হইলেও ভক্ত। নাথযোগীদের ধর্ম্ম আংশিক শৈবধর্ম্ম।

৩ শূন্যপুরাণ - ধর্ম্মপূজা-প্রবর্ত্তক রামাই পণ্ডিতের রচিত। ইহাকে কেবল ধর্ম্মমঙ্গল নয়—মঙ্গলকাব্য ধারার উৎস বলিয়া মনে করা হয়। ইহার প্রকৃত নাম আগম পুরাণ। বৌদ্ধ শূন্যবাদের কথা ইহাতে আছে বলিয়া বর্ত্তমানযুগে ইহার শূন্যপুরাণ নামকরণ হইয়াছে। এই গ্রন্থে ধর্ম্মঠাকুরের মহিমা ও ধর্ম্ম-পূজার পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে। প্রথম মুসলমান আক্রমণের সময়ে ইহা রচিত। সাহিত্যের দিক হইতে ইহার মূল্য নাই—বঙ্গভাষার ক্রমোন্মেষের ইতিহাসে ইহার স্থান আছে। বৌদ্ধের শূন্যবাদের সহিত হিন্দুর পূজাপদ্ধতির মিশ্রণে ধর্ম্মপূজার প্রবর্ত্তন। ধর্ম্মপূজায় যে যে অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ইহাতে তাহার তালিকা দেওয়া আছে। ইহা ধর্ম্মপূজক সম্প্রদায়ের স্মৃতিসংহিতা। শূন্যপুরাণে যে হিন্দুপুরাণ ও বৌদ্ধ পুরাণের সৃষ্টি পত্তন, উপাসনা-পদ্ধতি ইত্যাদিতে একটা সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে তাহা হইতেই মঙ্গল-কাব্য রচনার সূত্রপাত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ধর্ম্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচারক মঙ্গল-কাব্যই প্রথম—তাহার অনুকরণে অন্যান্য মঙ্গল-কাব্যের আবির্ভাব হইয়াছে। বৌদ্ধগণ যে

মনসামঙ্গলেও বৌদ্ধ প্রভাব আছে। মনসামঙ্গলের উপাখ্যানটি বৌদ্ধ রাজাদের সময়ে বৌদ্ধবাংলায় পরিকল্পিত। মনসামঙ্গলে যে দৈবজ্ঞ আচার্য্যদের শক্তির উল্লেখ আছে তাহা বৌদ্ধ-সাহিত্য হইতেই সংক্রামিত। মনসামঙ্গলে চাঁদ-সওদাগরের যে মহাজ্ঞানের কথা আছে তাহা বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যদের মহাজ্ঞানেরই অনুরূপ। হেঁতালের লাঠি, মন-পবনের নৌকা ইত্যাদি বৌদ্ধ সাহিত্যেরই সামগ্রী। সকল মঙ্গল-কাব্যেই ব্রাহ্মণ জাতিকে কতকটা উপেক্ষা করা হইয়াছে—ব্রাহ্মণেতর জাতিকে এমন কি নিম্নশ্রেণীর লোকদের ভক্তি, সদাচার, শৌর্য্য-বীর্য্য এবং মনুষ্যত্বে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ইহা বৌদ্ধ প্রভাবের ফল বলিয়া মনে হয়। শৌর্য্য-বীর্য্য ক্ষত্রিয়ের একচেটিয়া নয়। কালু ডোম (ধর্ম্মমঙ্গল) একজন মহৎ চরিত্রের বীর। কালকেতু (চণ্ডীমঙ্গল) ব্যাধও একজন বীর ও মহাপুরুষ। ইছাই ঘোষও (ধর্ম্মমঙ্গল) উচ্চজাতীয় লোক ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার বীরত্ব ছিল অপরিসীম। মঙ্গল-কাব্যে বণিকসমাজই (মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল) ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় সমাজের স্থান অধিকার করিয়াছে। এ সমস্ত বৌদ্ধপ্রভাবের ফল।

শিবহীন যজ্ঞ যেমন অসম্পূর্ণ, শিবহীন মঙ্গল-কাব্যও তেমনি অসম্পূর্ণ। শিব সব মঙ্গল-কাব্যেই আছেন। ধর্ম্মমঙ্গলে ধর্ম্মঠাকুরই শিব। তবে এ শিবে আর অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের শিবের মধ্যে প্রভেদ আছে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের শিব আপন মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচারের জন্য একেবারেই চেষ্টা করিতেছেন না। তবু তাঁহার ভক্তের অভাব নাই। তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছাপূরণে উদাসীন—ভক্তকে শক্তির রোষ হইতে রক্ষা করিতেও পারেন না। তবু ভক্ত তাঁহাকে ত্যাগ করে না। ভক্ত তাঁহার কাছে কিছুই চায় না—তিনি নিজেই নিষ্কিঞ্চন, শ্মশানবাসী, সর্ব্বত্যাগী—তাঁহার কাছে প্রার্থনীয়ই বা কি আছে? ভক্তেরা তাঁহার মহিমায় মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বসংস্কার মুক্তি ও ত্যাগ তিতিক্ষার আদর্শ বলিয়া তাঁহার পূজা করে। মঙ্গল-কাব্যে তাঁহার ভক্তেরা সবই পুরুষ। তাহারা পৌরুষ শক্তিতে বলীয়ান, নারী দেবতার পূজা করিতে তাহারা রাজী নয়। তাহারা তাঁহাদের ইষ্টধনের জন্য নিজেদের পৌরুষশক্তির উপরই নির্ভর করে—উপাস্যের নিকট প্রার্থনা করে না। তাহারা বিপন্ন হইয়া তাহাদের উপাস্যকে স্মরণ করে—সে শুধু মহাসঙ্কটেও তাহাদের ভক্তি বিচলিত হয় নাই তাহাই জানাইবার জন্য। শেষ পর্য্যন্ত তাহারা যে রক্ষা পায় তাহা শিবের কৃপায় নয়—শক্তিরই কৃপায়।

ভাবে ধর্ম্মঠাকুরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন—হিন্দুরাও সেই ভাবে দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বৌদ্ধেরা যেমন এ জন্য লাউসেন, রঞ্জাবতী, কানড়ার উপাখ্যান সৃষ্টি করিয়াছিল—হিন্দুরাও তেমন বেহুলা-লখীন্দর, কালকেতু, ফুল্লরা, শ্রীমন্ত, ধনপতি, বিদ্যাসুন্দর ইত্যাদি উপাখ্যানের সৃষ্টি করিয়াছিল।

বৌদ্ধ কবিরা শিবকে দরিদ্র ভিখারীরূপে কল্পনা করিয়াছে এবং তাঁহার দ্বারা চাষ করাইয়াছে। সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ক্ষেত্রপাল শিব যখন বৌদ্ধ-সাহিত্যক্ষেত্র হইতে মঙ্গল-কাব্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন তখন তিনি তাঁহার লাঙ্গল ও ভীম ভৃত্যকে রাখিয়া আসিলেন, সঙ্গে আনিলেন তাঁহার বুড়া বলদ, ভিক্ষার ঝুলি, ভাঙ-ধুতুরার ঝোলা, হাড়ের মালা, করোটির পানপাত্র, ত্রিশূল ইত্যাদি। বৌদ্ধ-সাহিত্যের একটা ধারা স্বতন্ত্রভাবে মঙ্গল-কাব্য প্রবাহের পাশাপাশি চলিয়াছিল—তাহাতে তাঁহাকে পরেও চাষ করিতে হইয়াছিল।

মঙ্গল-কাব্যে দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ, মদনভস্ম ইত্যাদি কীর্ত্তির কথা আছে—গৌরীর সহিত তাঁহার বিবাহের কথাও আছে। কিন্তু সবচেয়ে প্রকট হইয়াছে তাঁহার দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্যের জন্য গৌরীর সঙ্গে তাঁহার নিত্য কলহ। সংসারী হইয়াও শিব উপার্জ্জনে উদাসীন—ইহাতেই যত গোলযোগ। বলা বাহুল্য ইহাও গভীর প্রেমের একটা রূপ।

শিবের জীবনের অন্যান্য ব্যাপার সম্পূর্ণ দেবলীলা, তাহার সহিত মানবসংসারের সম্পর্ক নাই। তাঁহার দাম্পত্য জীবন যাপন এবং শ্বশুরবাড়ীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক অবলম্বনেই কবি বাঙ্গালীর দরিদ্র সংসারটিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শিবের দেবলীলা পৌরাণিক উপাখ্যানের পুনর্বিবৃতি মাত্র। তাঁহার দাম্পত্য জীবনকেই কবিরা মৌলিকরূপ দিয়া আসল সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সাহিত্যে কবিরা প্রাণ সঞ্চারও করিতে পারিয়াছেন। শিবকে কেবল দরিদ্র করা হয় নাই, তাহাকে বিগতযৌবনও করা হইয়াছে এবং তিনি ধনীর শ্বশুরের দরিদ্র জামাতা। তিনি ভিক্ষা করিয়া খান, তবু ধনী শ্বশুরের গলগ্রহ হইতে প্রস্তুত নহেন। এইরূপ

দাম্পত্যজীবন বাঙ্গালার ঘরের ঘরে—অন্ততঃ প্রাচীনকালে ছিল।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"এই সকল কাব্যে জামাতার নিন্দা, স্ত্রীপুরুষের কলহ, ও গৃহস্থালীর বর্ণনা যাহা আছে তাহাতে রাজভাব বা দেবভাব কিছুই নাই। তাহাতে বাংলাদেশের গ্রাম্য কুটীরের প্রাত্যহিক দৈন্য ও ক্ষুদ্রতা সমস্তই প্রতিবিম্বিত। তাহাতে কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানাপুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাদের শিখররাজি আমাদের আমবাগানের মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই।"

দরিদ্র সংসারের সব দুঃখ জ্বালা, কোন্দল-কোলাহল, রাগ, রোষ অভিমান, আত্মাধিকার সমস্ত ভেদ করিয়া আদর্শ মহাপ্রেমের গৌরীশঙ্করের অভ্রভেদী শিখর যে স্বর্গের দিকে উঠিয়া গিয়াছে ভক্ত কবিগণ তাহা বিস্মৃত হন নাই।

আবার রবীন্দ্রনাথের উক্তিই উৎকলন করি—

"দাম্পত্যসম্বন্ধের মধ্যে একটা বিঘ্ন বিরাজ করিতেছে দারিদ্র্য। সেই দারিদ্র্য-শৈলটাকে বেষ্টন করিয়া হরগৌরীর কাহিনী নানাদিক হইতে তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছে। কখনও বা শ্বশুরবাড়ীর স্নেহ সেই দারিদ্র্যকে আঘাত করিতেছে, কখনো বা স্ত্রীপুত্রের প্রেম সেই দারিদ্র্যের উপর প্রতিহত হইতেছে। বাংলার কবিহৃদয় এই দারিদ্র্যকে মহত্ত্বে ও দেবত্বে মহোচ্চ করিয়া তুলিয়াছে। সৌভাগ্য ও আত্মবিস্মৃতির দ্বারা দারিদ্র্যের হীনতা ঘুচাইয়া কবি তাহাকে ঐশ্বর্য্যের অপেক্ষা অনেক বড় করিয়া দেখাইয়াছেন। ভোলানাথ দারিদ্র্যকে অঙ্গের ভূষণ করিয়াছেন—দরিদ্রসমাজের পক্ষে এমন আনন্দময় আদর্শ আর নাই। আমার সম্বল নাই যে বলে সেই গরীব, আমার আবশ্যক নাই যে বলিতে পারে তাহার অভাব কিসের? শিব ত' তাহারই আদর্শ।

অন্য দেশের ন্যায় ধনের সম্ভ্রম ভারতবর্ষে নাই—অন্ততঃ পূর্ব্বে ছিল না। যে বংশে বা যে গৃহে কুল-শীল সমান আছে সে বংশে বা গৃহে ধন নাই এমন সম্ভাবনা আমাদের দেশে বিরল নয়। এই জন্য আমাদের দেশে ধনী ও নির্ধনের মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান সর্ব্বদাই চলিয়া থাকে। কিন্তু সামাজিক আদর্শ যেমনি হউক ধনের একটা স্বাভাবিক মত্ততা আছে। ধন-গৌরবে দরিদ্রের প্রতি ধনী কটাক্ষপাত করিয়া থাকে। যেখানে সামাজিক উচ্চনীচতা নাই—সেখানে ধনের উচ্চনীচতা আসিয়া একটা বিপ্লব বাধাইয়া দেয়। এইরূপ অবস্থা দাম্পত্য সম্বন্ধে একটা মস্ত বিপাকের কারণ। স্বভাবতই ধনী শ্বশুর যখন দরিদ্র জামাতাকে অবজ্ঞা করে এবং ধনী-কন্যা দরিদ্র পতি ও নিজের দুরদৃষ্টের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠে তখন গৃহধর্ম্ম কম্পান্বিত হইতে থাকে। দাম্পত্যের এই দুর্গ্রহ কেমন করিয়া কাটিয়া যায় হরগৌরীর কাহিনীতে তাহা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

সতী স্ত্রীর অটল শ্রদ্ধা তাহার একটা উপাদান। তাহার আর একটা উপাদান দারিদ্র্যের হীনতা-মোচন, মহত্ত্ব কীর্ত্তন। উমাপতি দরিদ্র হইলেও হেয় নহেন এবং শ্মশান-চারীর স্ত্রী পতিগৌরবে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

দাম্পত্যবন্ধনের আর একটি মহৎ বিঘ্ন স্বামীর বার্দ্ধক্য ও কুরূপতা। হরগৌরীর সম্বন্ধে তাহাও পরাভূত হইয়াছে। বিবাহ-সভায় বৃদ্ধ জামাতাকে দেখিয়া মেনকা যখন আক্ষেপ করিতেছেন, তখন অলৌকিক প্রভাবে বৃদ্ধের রূপযৌবন বসন-ভূষণ প্রকাশিত হইয়া পড়িল। এই অলৌকিক রূপযৌবন প্রত্যেক বৃদ্ধ স্বামীরই আছে। তাহা তাহার স্ত্রীর আন্তরিক ভক্তি-প্রীতির উপর নির্ভর করে। গ্রামের ভিক্ষুক, কথক, গায়ক হরগৌরীর কথায় বারে বারে দ্বারে দ্বারে সেই ভক্তির উদ্রেক করিয়া বেড়ায়।

হরগৌরীর কথা ছোট বড়ো সমস্ত বিঘ্নের উপরে দাম্পত্যের বিজয়-কাহিনী। হরগৌরী প্রসঙ্গে আমাদের একান্ন পারিবারিক সমাজের মর্ম্মরূপিণী রমণীর এক সজীব আদর্শ গঠিত হইয়াছে। স্বামী দীন দরিদ্র বৃদ্ধ বিরূপ যেমনি হোক, স্ত্রী রূপযৌবন, ভক্তিপ্রীতি, ক্ষমাধৈর্য্যে, তেজোগর্ব্বে সমুজ্জ্বলা। স্ত্রীই দরিদ্রের ধন, ভিখারীর অন্নপূর্ণা, রিক্ত-গৃহের সম্মান-লক্ষ্মী।" (রবীন্দ্রনাথ)

মঙ্গল-কাব্যের দেবতা প্রধানতঃ দুইটি শিব ও শক্তি। শ্মশানচারী নৃমুণ্ডধারী নটরাজ পিণাকপাণি রুদ্র অনার্য্য-সমাজ হইতে আর্য্য-সমাজে প্রবেশ করেন। আর্য্যগণ সহজে ইহাকে দেবতা বলিয়া বরণ করেন নাই। বৈদিক আর্য্য-গণের অগ্রগণ্য দক্ষের যজ্ঞ-সভায় শিবের নিমন্ত্রণ হয় নাই। মনে হয় রুদ্র যেন নিজের প্রতাপবলে ও ঐশ্বরিক শক্তিতে আর্য্যসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। আর্য্যগণ তাঁহাকে ধ্যান-

পরায়ণ জ্ঞানাবতার শিবমূর্ত্তি দান করেন। আর্য্যগণের এই শিবই কুমারসম্ভবের শিব। বৌদ্ধ-সাহিত্য শিবকে নূতন রূপ দিয়াছিল সে কথা বলিয়াছি। বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যিক-গণ সাহিত্যের ধারা পাইলেন বৌদ্ধদের নিকট হইতে, উপাদান উপকরণ পাইলেন পুরাণ হইতে। কাজেই মঙ্গল-কাব্যের শিব আর্য্য অনার্য্য, ও বৌদ্ধদের পরিকল্পনার একটা মিশ্ররূপ লাভ করিয়াছেন। প্রথমে যাহারা অক্ষরে অক্ষরে আনুষ্ঠানিক পৌরাণিক ধর্ম্ম পালন করিতে সম্মত ছিল না—শিব ছিলেন তাহাদের দেবতা। আর যাহারা হিন্দুর আনুষ্ঠানিক ভীতি বোধিত সকাম ধর্ম্মের সেবক ছিল তাহাদের দেবতা ছিল শক্তি। কিন্তু ইহার ও ক্রমে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। এই শক্তিই নানারূপে মঙ্গল-কাব্যে দেখাদিয়াছিল। ইনিই চণ্ডী, ইনিই মনসা, ইনিই কালিকা, ইনিই শীতলা। আবার ইহারই দাক্ষিণ্যময় মাতৃরূপ অন্নপূর্ণা।

সমাজে শৈব ও শাক্তের দ্বন্দ্ব নিশ্চয়ই ছিল, যদিও তাহার স্পষ্ট ইতিহাস কিছু পাওয়া যায় না। মঙ্গল-কাব্যে সেই দ্বন্দ্বই পরিস্ফুট। সমাজে শাক্তের সহিত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব আরো প্রবল ছিল, কিন্তু মঙ্গল-কাব্যে তাহার পরিচয় বড় পাওয়া যায় না, লোক সাহিত্যে তাহার পরিচয় আছে। শৈব ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব লইয়াও কোন কাব্য রচিত হয় নাই। তবে দ্বন্দ্ব যে একেবারে ছিল না তাহা মনে হয় না। কবিদের কল্পিত হরিহর রূপ তাহার সমন্বয়—অর্দ্ধ নারীশ্বররূপ যেমন শৈব ও শাক্তের দ্বন্দ্বের সমন্বয়ের সূচক। ক্রমে শিবই সাধু শিষ্ট সমাজের উপাস্য হইলেন এবং নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই শক্তির উপাসনা করিয়া একটা বিদ্রোহের সৃষ্টি করিল। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "স্পষ্টই দেখা যায় এই কলহ বিশিষ্ট দলের সহিত ইতর সাধারণের কলহ। উপেক্ষিত জনসাধারণ যেন তাহাদের প্রচণ্ডশক্তি মাতৃদেবতার আশ্রয় লইয়া ভদ্রসমাজের শান্ত সমাহিত নিশ্চেষ্ট বৈদান্তিক যোগীশ্বরকে উপেক্ষা করিতে উদ্যত হইল। * * এইরূপ বিদ্রোহকালে শক্তিকে উৎকট রূপে প্রকাশ করিতে গেলে তাহার প্রবলতা, তাহার ভীষণতাই জাগাইয়া তুলিতে হয়। তাহা ভয় হইতে রক্ষা করিবার সময় মাতা ও ভয় জন্মাইবার সময় চণ্ডী। তাঁহার ইচ্ছা কোন বিধি বিধানের দ্বারা নিয়মিত নহে। তাঁহার বাধাবিহীন লীলা কখন কি করে, কেন কিরূপ ধরে তাহা বুঝিবার জো নাই। এই জন্য তাহা ভয়ঙ্কর। **

শিব আর্য্যসমাজে ভিড়িয়া যে ভীষণতা যে-শক্তির চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিলেন, নিম্নসমাজ তাহা নষ্ট হইতে দিল না। যোগানন্দের শান্তভাবকে তাহারা উচ্চশ্রেণীর জন্য রাখিয়া ভক্তির প্রবল উত্তেজনায় শক্তির উগ্রতাকেই নাচাইয়া তুলিল। তাহারা শক্তিকে শিব হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া বিশেষভাবে শক্তির পূজাই খাড়া করিল। * * যাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া শক্তিপূজা প্রচার করিতে উদ্যত, তাহারা উচ্চশ্রেণীর লোক নহে। যে নীচে আছে তাহাকেই উপরে উঠাইবেন, ইহাতেই দেবীর শক্তির পরিচয়। নিম্নশ্রেণীর পক্ষে এমন সান্ত্বনা, এমন বলের কথা আর কি আছে?"

এইখানে আর একটি কথা বলার প্রয়োজন। মঙ্গল-কাব্যে যে শিবের দাম্পত্যলীলা দেখানো হইয়াছে এবং যে-শিবকে ভিখারী বানাইয়া বলদে চড়াইয়া উপহাস্য করা হইয়াছে—সে-শিব শক্তির স্বামী মাত্র। এই শিব মঙ্গল-কাব্যের নায়কদের উপাস্য নহেন। শক্তির উপাসকদের সঙ্গে যাঁহারা সংগ্রাম করিয়াছেন—তাঁহাদের উপাস্য যিনি তিনি নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় সাংখ্যের পুরুষের ধ্যানতন্ময়রূপ,—দ্বন্দ্বাতীত—ভোলানাথ। এই শিবের উপাসকের সংখ্যা বেশী হইতে পারে না। যে-দেবতা বলেন—"সুখদুঃখ দুর্গতি ও সদ্‌গতি কিছুই নয়, ও-কেবল মায়া। ও-দিকে দৃকপাত করিও না, সংসারে তাহার উপাসক অল্পই অবশিষ্ট থাকে। সংসার মুখে যাহাই বলুক, মুক্তি চায় না, ধন, জন, মায়া চায়।"

কাজেই বাঙ্গালার সমাজে শিবের পরাভব ও শক্তিরই জয়জয়কার হইল। সাহিত্যে তাহাই দেখানো হইয়াছে। শাক্ত কবিরা শক্তির বিজয়লাভের পরে যে-শিবকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন—সে-শিব সংসারী লৌকিক শিব। এ-শিব আদর পাইয়াছেন—মহাশক্তির অক্ষম স্বামীরূপে—মহাশক্তির কৃপাপাত্ররূপে। বিজয়লাভের পর রুদ্রাণী প্রসন্ন হইয়া দক্ষিণা মূর্ত্তি ধরিয়া অন্ন বিতরণ করিতেছেন, আর ভিখারী স্বামী অঞ্জলি পাতিয়া সেই অন্ন গ্রহণ করিতেছেন। ভারতচন্দ্র হরগৌরীর এই রূপই ফুটাইতে অন্নদামঙ্গল রচনা করিয়াছেন।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বিজ্ঞানের বাণী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ

বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বমানবতা

পৃথিবীর নরনারী আমরা পরস্পরের ভাই-ভগিনী; আকৃতি ও প্রকৃতিগত শত বৈষম্য সত্ত্বেও জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে আমরা সকলেই এক। হিন্দু বা মুসলমান, বৌদ্ধ বা খৃষ্টান, ভারতীয় বা ইউরোপীয়, আমরা সকলেই একজাতি, সকলেরই এক ধর্ম্ম। আমাদের জাতির নাম মানবজাতি এবং ধর্ম্মের নাম মানবধর্ম্ম। এই সকল উক্তি দ্বারা মানুষের সহিত মানুষের যে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সূচিত হয় বিশ্বমানবতার ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের মূলসূত্র উহাই।

এই বিশ্বভ্রাতৃত্বের গোড়ায় রহিয়াছে এক বিরাট বিশ্ব-পিতৃত্বের বা বিশ্বমাতৃত্বের পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা কল্পনা মাত্র নহে, বাস্তব সত্য। কারবারের জগতে এই সত্যের কল্যাণদায়িনী শক্তি অসীম। ইহার প্রতি অনাস্থা পোষণ করিয়াই মানবজাতি সর্ব্বপ্রকার দুঃখ ও দুর্দ্দশা বরণ করিয়াছে। পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বভ্রাতৃত্বের মূল উৎস স্বরূপ একজন সাধারণ পিতা বা সাধারণ মাতা স্বীকার করিতেই হইবে। ইঁহাকে ঈশ্বর বলা যায় ভাল, না বলিলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু ইনি হইবেন এক ও সর্ব্বজনীন।

যে সংসারে পিতৃত্বের মর্য্যাদা অবজ্ঞাত সে সংসারে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন শিথিল, সেইরূপ নিরীশ্বর জগতেও বিশ্বভ্রাতৃত্বের ও বিশ্বমানবতার অনুভূতি ম্লান ও ছিন্নভিন্ন। বিশ্বমানবতার অবলুপ্ত চেতনাকে নূতন করিয়া জাগ্রত করিতে হইবে এবং তাহার শ্রেষ্ঠতম উপায় "বিশ্বের নরনারী আমরা সকলে একই পিতার বা একই মাতার সন্তান" এই চির-উপেক্ষিত সত্যকে বিস্মৃতির গহ্বর হইতে টানিয়া আনিয়া বাস্তব জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় এবং নূতন পৃথিবী রচনায় ইহাই সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজন।

মানবজাতির দুর্ভাগ্য যে, মানবেতিহাসে সর্ব্বসম্মতভাবে স্বীকৃত একজন সাধারণ ঈশ্বরের স্থান নাই। বর্ত্তমান পৃথিবীতে কোন ঈশ্বরেরই কোন সুনির্দ্দিষ্ট আসন আছে কি না সন্দেহের বিষয়। কিন্তু ঈশ্বরকে সরাইয়া রাখিয়াও একটি বিরাট ও প্রত্যক্ষগোচর বিষয়বস্তুকে আমরা অস্বীকার করিতে পারি নাই এবং কোন দিন পারিব এমন সম্ভাবনাও নাই; উহা হইতেছে বিশ্ব-প্রকৃতি। কোনরূপ জটিল তর্কে প্রবৃত্ত না হইয়া বিশ্বপ্রকৃতিকে আমরা অনায়াসেই আমাদের সাধারণ মাতা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

বর্ত্তমান ও ভবিষ্য যুগ বিজ্ঞানের যুগ। আমরা জড়বাদী ও প্রত্যক্ষবাদী। কিন্তু বৈজ্ঞানিকমাত্রই জানেন যে, জড়-বিজ্ঞানের পাতা কেবল কতগুলি নীরস ও দুর্ব্বোধ্য ফরমুলা দ্বারা পূর্ণ নহে। বিজ্ঞান মাত্রেরই পাতায় পাতায়, ছত্রে ছত্রে, বিশ্ব-প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে; আর ঐ ফরমুলা-গুলি, যাহাদের অপর নাম প্রাকৃতিক নিয়ম, প্রকৃতি দেবীর অন্তরের বাণী নির্দ্দেশ করিতেছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটির ভিতর দিয়াই প্রকৃতি সকলকে জানাইয়া দিতেছেন যে, আমরা সকলে একই বিশ্ব-প্রকৃতির দেহসম্ভূত, তাঁহারই ক্রোড়ে পালিত ও বর্দ্ধিত এবং সকলে সমভাবে তাঁহারই অলঙ্ঘ্য নিয়মের অধীন। প্রকৃতির বিধান লঙ্ঘন করিয়া একপাদ অগ্রসর হওয়ার ক্ষমতা বা স্বাধীনতা আমাদের নাই। বস্তুতঃ, প্রত্যক্ষের জগতে প্রকৃতি মাতাই আমাদের একমাত্র সাধারণ মাতার স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। ইঁহাকে ঈশ্বরী বলিয়া মানি বা না মানি, অশেষ শক্তিসম্পন্না ও স্নেহশীলা জননী বলিয়া মানিতে বৈজ্ঞানিক বা অবৈজ্ঞানিক কাহারও দ্বিধা, সঙ্কোচ বা আপত্তি হইতে পারে না। নিম্নোক্ত মতবাদ হইতে দেখা যাইবে যে, আধুনিক বিজ্ঞানও ইহার অনুকূল মতই পোষণ করিয়া থাকে। ইহার দ্বারা ঈশ্বরের ধারণা অস্বীকৃত হয় না বা কোন ধর্ম্মমতও ক্ষুণ্ণ হয় না; পরন্তু মানব মাত্রেরই বলিবার অধিকার জন্মে—আমাদের মাতা এক ও সর্ব্বজনীন।

বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তরের বাণী কি? বিজ্ঞানের ফরমুলা-

গুলির মধ্যে ঐক্যসূত্র কোথায়? বিংশ শতাব্দীর (১৯০৫-১৯১৫) বিজ্ঞানের একটি প্রধান, হয় ত' সর্ব্বপ্রধান মতবাদ এইরূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে —"যে সকল প্রাকৃতিক নিয়মকে আমরা (পৃথিবী এবং বিভিন্ন গ্রহনক্ষত্রের দ্রষ্টাগণ) খাঁটি নিয়মের মর্য্যাদা দান করিয়া প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ দানরূপে বরণ করিয়া লইতেছি, ঐ সকল নিয়মের বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে, প্রত্যেকেই উহারা, জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে, আমাদের সকলের নিকটে—আমাদের ভৌগোলিক, ভৌতিক এবং অন্যান্য বহুবিধ বৈষম্য সত্ত্বেও—অবিকল একই আকারে উপস্থিত হইয়া থাকে। সংক্ষেপে, প্রকৃতির শ্রেষ্ঠদানগুলি সম্পর্কে সকল জগতের সকল অধিবাসীরই স্থান ও অধিকার পূর্ণমাত্রায় সমান।"

এই উদার মতবাদ মহামতি আইনষ্টাইনের। ইহা 'আপেক্ষিকতাবাদ' নামে পরিচিত হইলেও বস্তুতঃ ইহার নাম হওয়া উচিত "বিজ্ঞানে সাম্যবাদ"।

একটু চিন্তা করিলেই বোঝা যায় যে, এই মতবাদ এক বিশ্বজনীন সম্বন্ধের ইঙ্গিত দান করিতেছে এবং খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়মের, তথা খাঁটি সত্য মাত্রেরই শ্রেষ্ঠ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া মানুষের সহিত মানুষের সত্যকার সম্বন্ধের স্বরূপ প্রকাশ করিতেছে। খাঁটি সত্য এবং খাঁটি নিয়ম তাহাই, যাহা আমাদের সর্ব্বপ্রকার অবস্থা বৈষম্যকে উপেক্ষা করিয়া সকলের নিকটে একই আকারে আত্মপ্রকাশে সম্পূর্ণ সক্ষম ও সতত উন্মুখ। সত্যের এইরূপ ব্যাপক সংজ্ঞা বিজ্ঞান জগতে ইহাই প্রথম। সত্যের এই প্রকাশভঙ্গী হইতেই আমরা প্রকৃতির সহিত আমাদের এবং আমাদের পরস্পরের মধ্যে সত্যকার সম্বন্ধের ইঙ্গিত পাই। একই সম্বন্ধের দু'টা দিক। ইহার একদিকে দেখিতে পাই, জননীস্বরূপিণী বিশ্বপ্রকৃতির সহিত তাঁহার প্রতিটি সন্তানের স্বাভাবিক স্নেহের নিবিড় সংযোগ; অপরদিকে দেখিতে পাই, জননীর প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ কোটি কোটি সন্তানের পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্য ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। মানুষের সহিত মানুষের সত্যকার যোগসূত্র ইহাই। মনে হয় যেন এই সম্বন্ধের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াই উক্ত মতবাদছলে স্বয়ং প্রকৃতিদেবী দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন—"খাঁটি সত্যের, তথা খাঁটি মাতৃস্নেহের পরিবেশনে আমার অন্তরে বিন্দুমাত্র পার্থক্য বোধ বা পক্ষপাতিত্ব নাই; মাতার স্নেহদৃষ্টির সম্মুখে তাহার সকল সন্তান সমান। বৈষম্যের অন্তরালে সাম্য, বহুত্বের পটভূমিকায় একত্ব, ইহাই আমার অন্তরের বাণী।"

এক সময় ছিল (প্রায় আঠার শত বৎসর পূর্ব্বেকার কথা) যখন টলেমির শিষ্যরূপে আমরা পৃথিবীকে অচলা এবং বিশ্বের কেন্দ্রস্থল রূপে কল্পনা করিয়া সমগ্র বিশ্বে একমাত্র পৃথিবীকেই খাঁটি মানমন্দিরের মর্য্যাদা দান করিয়াছিলাম। ফলে আমাদের (পৃথিবীর অধিবাসিগণের) দৃষ্টির সম্মুখে গ্রহগণের গতিবিধি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক নিয়ম যে আকারে উপস্থিত হইত, উহাই জগতের একমাত্র সত্যকার রূপ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া প্রকৃতির কোলে আমরাই একমাত্র আদুরে সন্তান এইরূপ দাবি করিয়া আসিতেছিলাম। তারপর একদিন আসিল যখন কোপর্নিকসের (১৪৭৩-১৫৪৩ খৃঃ) শিষ্যরূপে আমরা ঐ দাবি ত্যাগ করিলাম এবং জগদ্দর্শন ব্যাপারে সূর্য্যের অধিবাসিগণের দেখাই ঠিক দেখা এইরূপ সাব্যস্ত করিয়া ঐ সকল দ্রষ্টাগণকে প্রকৃতির দুলাল বলিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত হইলাম। সে দিনও চলিয়া গিয়াছে। আপেক্ষিকতাবাদের উক্ত উন্নততর মতবাদ অনুসরণ করিয়া বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান আজ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছে যে, প্রকৃতির আদুরে ছেলে বলিয়া বিশেষভাবে দাবি করিবার অধিকার কোন জগতের কোন ব্যক্তিবিশেষেরই নাই। অবস্থান কিম্বা অবস্থা-বৈষম্যের ফলে যদিও কোন কোন ছোটখাট বিষয় সম্পর্কে আমাদের (বিভিন্ন জগতের দ্রষ্টাগণের) মতভেদ রহিয়াছে, তথাপি ঐ সকল বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে এমন যোগসূত্র রহিয়াছে যে, তাহার ফলে মাতৃস্নেহরসসিক্ত প্রকৃতির সত্যকার রূপ তাঁহার সকল সন্তানের নিকটে একই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে বিন্দুমাত্র বাধা উপস্থিত হয় না। মাতার করুণার প্রস্রবণ সকল জগতের সকল অধিবাসীর প্রতিই সমভাবে উৎকীর্ণ; সুতরাং মাতৃপূজায় অর্ঘ্যপ্রদানেও সকলের অধিকার ও মর্য্যাদা সমান।

ভবিষ্যৎ পৃথিবীর নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া সত্যদৃষ্টি প্রসারিত করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই, এই বাণীর পুরোভাগে অবস্থান করিতেছে দ্বিশত কোটি নরনারীর অঞ্জলিবদ্ধ করপুট, যাঁহাদের অন্তর কৃতজ্ঞতায় ভরা, মস্তক শ্রদ্ধায় অবনত, নয়নে দীপ্তি, হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা—জননীর

প্রতি সন্তান-ধর্ম্ম পালনের অদম্য আকাঙ্ক্ষা। আর দেখিতে পাই, হাস্যোজ্জ্বল অসংখ্য আননের নির্ম্মল আনন্দোচ্ছ্বাস—সহস্র বৈষম্য সত্ত্বেও আমরা ভাই ভাই, এই অনুভূতির সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। আর শুনিতে পাই, ত্রিশত কোটি সমবেত কণ্ঠের চির-সান্ত্বনাভরা মাভৈঃ রব—'বন্দে মাতরম্।'

এই সন্তান-ধর্ম্ম কি? সন্তান-ধর্ম্ম চিরদিনই এক—জননীর তুষ্টি সাধন। এজন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, জননীকে জননীর মর্য্যাদা দান—জননী বলিয়া মনে প্রাণে স্বীকার। বাস্তব জগতে ইহার একমাত্র অর্থ, ভাইকে ভাই বলিয়া স্বীকার—বিশ্বের মানব মাত্রকেই অকপট চিত্তে আলিঙ্গন দান। আমাদের স্পষ্ট অনুভব করিতে হইবে যে, ভ্রাতার অপমান জননীরই অপমান। আত্মসর্ব্বস্ব হইয়া আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে, ভ্রাতার অঙ্গে আঘাত করিয়া কেহ জননীর তুষ্টি বিধান করিতে পারে নাই, ভ্রাতৃশোণিতে রঞ্জিত অর্ঘ্য মাতৃপদে কখনও স্থান পায় নাই। ভুলিয়া গিয়াছি যে, বিশ্বমাতৃকার পূজার একমাত্র প্রত্যক্ষগোচর উপায় বিশ্বমানবতার পূজা। পূর্ণ আস্থা লইয়া এই পূজায় আমাদিগকে যোগদান করিতে হইবে এবং ইহার মূলমন্ত্র হইবে, "বিশ্বমানব আমার প্রত্যক্ষ দেবতা এবং বিশ্বমানবের সেবাই আমার সন্তান-ধর্ম্ম ও মানব-ধর্ম্ম।" আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে; বিদ্যা, বুদ্ধি বা ক্ষমতায় মানুষে মানুষে ইতর বিশেষ থাকিবেই। এ বৈষম্য প্রকৃতিরই বিধান। কিন্তু জননী মাত্রই দেখিতে চাহেন যে, তাঁহার অপেক্ষাকৃত যোগ্য সন্তানগণ, আলোক বর্ত্তিকা হস্তে পশ্চাদ্বর্ত্তিগণকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিতেছে এবং সবল দুর্ব্বলের মুখে অন্ন যোগাইতেছে। উহারা পরস্পরকে আহার করিয়া বাঁচার অভিনয় করিবে এ দৃশ্য কোন জননীই অম্লান চিত্তে সহ্য করিতে পারেন না, পরন্তু উহার উপর দ্রুত যবনিকা-পাতের জন্যই তাঁহার সুসন্তানগণের মুখের দিকে আকুল নয়নে তাকাইয়া থাকেন। মাতৃহৃদয়ের এই স্বাভাবিক ও চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা পূরণই সন্তান-ধর্ম্ম এবং ইহার প্রতিষ্ঠাই, আমরা বলিয়াছি, পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি আনয়নের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন।

ভারতবর্ষে বা ভারতের বাহিরে এ বাণী নূতন নহে; কিন্তু আজিকার দিনে বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া না লইলে কোন কথারই নাকি মূল্য হয় না, তাই আধুনিক বিজ্ঞানের বাণী কারবারের জগতে কি আকার ধারণ করে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও বর্ত্তমানে বিশেষ প্রয়োজনরূপে উপস্থিত হইয়াছে। এই পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের শিক্ষাও যে ইহাই তাহা পৃথিবীর অধিবাসী মাত্রই মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছে।

এই সন্তান-ধর্ম্ম ও মানব-ধর্ম্ম একই ধর্ম্ম। ইহা মানব-ধর্ম্ম এই জন্য যে, পৃথিবীর দ্রষ্টা হিসাবে প্রাকৃতিক নিয়মের আবিষ্কার এবং উহার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের ক্ষমতা ও অধিকার রহিয়াছে বিশেষভাবে মানুষেরই এবং মানুষমাত্রেরই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ত্রিংশ বর্ষাধিককাল প্রাকৃতিক নিয়মের উক্ত স্বরূপ অবগত হইয়াও আজিও মানব মানবেতর প্রাণীর তুলনায় কিছুমাত্র হৃদয়ের উৎকর্ষের পরিচয় দিতে পারিল না; পরন্তু মারণাস্ত্রের আবিষ্কারে বিজ্ঞানের অমূল্য সম্পদ নিয়োজিত করিয়া পশুবলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাতেই অগ্রসর হইল! ইহা বিজ্ঞানের শোচনীয় অপব্যবহার। বড় দুঃখেই আজ মানবজাতিকে স্বীকার করিতে হইবে যে, পৃথিবীকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে হইলে মানুষের মস্তিষ্কের প্রসারের সঙ্গে হৃদয়ের প্রসারেরও সমান তালে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন।

ইহা স্বীকার্য্য যে, পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে মানুষের অভাব অভিযোগগুলিও সম্পূর্ণ দূর করিতে হইবে; এবং এজন্য একদিকে যেমন অন্নসমস্যা সমাধানের প্রয়োজন, সেইরূপ অপরদিকে, হিংসা, দ্বেষ, অতিলোভ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তিগুলিরও ক্রমে ক্রমে বিলোপ সাধনের প্রয়োজন। উভয়ই সুসাধ্য হয় একমাত্র বিশ্বমানবতার ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা দ্বারা। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, যিনি জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলকেই আপন বলিয়া মনে করেন পৃথিবীতে তাঁহার কেহ শত্রু থাকিতে পারে না। সুতরাং প্রত্যেকেই যদি ঐরূপ ব্যক্তি হন তবে মানবসমাজে হিংসার অস্তিত্বও থাকিতে পারে না। ইহার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন, একমাতৃত্বরূপ মহাসত্যকে মানবমাত্রেরই সবলে আঁকড়াইয়া ধরা। এই সর্ব্বজনীন প্রয়োজনবোধকেই বিজ্ঞান আজ বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরের বাণী বলিয়া ঘোষণা করিতেছে।

আমরা বলিয়াছি, কারবারের জগতে এই বাণীকে সুপ্রতিষ্ঠ করিতে হইলে যে জাতি গঠনের প্রয়োজন তাহার

নাম হইবে মানবজাতি এবং তাহার সাধারণ ধর্ম্ম হইবে মানব-ধর্ম্ম বা সন্তান-ধর্ম্ম। জনসাধারণের মধ্যে এই জাতি ও ধর্ম্ম আজিও স্পষ্ট হয় নাই। মানুষের সহিত মানুষের উক্ত স্বাভাবিক সম্বন্ধকে যোগ্য মর্য্যাদা দান করিয়া চিরসত্যকে কার্য্যদ্বারা সুপ্রতিষ্ঠ করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রকার ভৌগোলিক ও ধর্ম্মগত ব্যবধান দূরে সরাইয়া সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা বোধকে সমষ্টিগত মানবের বৃহত্তর ও মহত্তর জাতীয়তাবোধের বিশাল ক্রোড়ে আশ্রয়দান করিতে হইবে; এবং বিচ্ছিন্ন ধর্ম্মমত-সমূহকে কেন্দ্রীভূত করিয়া উক্ত সন্তানধর্ম্মের বা মানবধর্ম্মের অন্তর্গত করিতে হইবে। জাতীয়তাবোধ যদি মানুষ মাত্রেরই কাম্য হয় তবে উহার উচ্চতম আদর্শ নিশ্চয়ই কোন বিশিষ্ট প্রদেশ বা বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। উক্ত মতবাদের স্পষ্ট নির্দ্দেশ এই যে, এরূপ চেষ্টা অস্বাভাবিক এবং প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ। সুতরাং উহা পণ্ডশ্রমে পরিণত হইতে বাধ্য। কি ব্যক্তিত্বের বিকাশে, কি জাতীয়তার বিকাশে, কোন গণ্ডি টানা যাইতে পারে না। আর বর্ত্তমানে যদি টানিতেই হয়, তবে অন্ততঃ সমগ্র মানব-জাতিকে উহার অন্তর্গত করিয়া লইতে হইবে—যাহার ফলে, 'আমার দেশ' বলিতে যেন প্রত্যেকেরই নয়ন সমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে সসাগরা এই সমগ্র বসুন্ধরা এবং 'আমার জাতি' বলিতে প্রত্যেকেরই মনে জাগে সমগ্র মানবজাতি। আমরা পৃথিবীর মানুষ, বৃহস্পতি বা মঙ্গলের অধিবাসী নহি, কিম্বা সিংহ, শার্দ্দূল, ভল্লুক বা জম্বুক নহি, ইহাই হইবে বিশ্ববাসীর কাছে আমাদের গৌরবের পরিচয়। এমন দিন হয় ত' আসিবে যখন এই মনোভাবকে আরও ব্যাপকতা দান করিয়া মানবেতর প্রাণী এবং অন্যান্য গ্রহের অধিবাসিগণকেও আমরা স্বজাতি বলিয়া গৌরব বোধ করিতে পারিব; কিন্তু সঙ্কীর্ণতারগণ্ডি ভাঙ্গিয়া এতটা অগ্রসর হইতে পারিলেও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় একটা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান অতিক্রম করা হইল, ইহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে।

বিজ্ঞানের এই ঐক্যের সুর মানবজাতি আর উপেক্ষা করিতে পারে না। ইহা আজ দূরাগত বংশীরব মাত্র নহে, কর্ণপটহবিদারী ভেরীর আওয়াজ। ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উন্নতির চাপে, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মানবজাতি এই বাণীর অন্তর্নিহিত সত্যপালনে স্বতঃই বাধ্য হইয়া পড়িতেছে। মানুষ জানে যে, পৃথিবীতে সে একা আসে নাই, আসিয়াছে বহুর মধ্যে এবং তাহার কারবার বহুকে লইয়া; কিন্তু আজ সে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছে এই বহুত্বের বিস্তৃতি কত-দূর, স্পষ্ট অনুভব করিতেছে যে, কোন ব্যবধানই আজ বিশ্ব-মানবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষের সহিত মানুষের কারবার আজ সর্ব্বজনীন রূপ ধারণ করিয়াছে। দেশ ও কালের ব্যবধান ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়াছে, 'বিপুলা পৃথ্বী' একটি ক্ষুদ্র পল্লীর অবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে, দু'দিনের পথ দু'দণ্ডে পরিণত হইয়াছে, দূর নিকট হইয়াছে, পর আপন হইয়াছে, পৃথিবীর এক প্রান্তের সুখ-দুঃখের তরঙ্গগুলি নিমিষের মধ্যে অপর প্রান্তে সঞ্চালিত হইয়া প্রতি দুয়ারে আঘাত হানিতেছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি ব্যাহত হইবার নহে, সুতরাং আত্মসর্ব্বস্ব হইয়া কূপমণ্ডুকের অবস্থায় আর ফিরিবার উপায় নাই। এই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধকে স্বীকার করিয়া লইয়াই মানুষের সহিত মানুষের কারবারের প্রণালীকে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজাইতে হইবে এবং তাহার মূলসূত্র হইবে বিশ্বমানবতা।

প্রগতিধর্ম্মী বিজ্ঞান আজ বিশ্বপ্রকৃতির দ্রষ্টাসমূহকে সম-মর্য্যাদা দান করিয়া তারস্বরে ঘোষণা করিতেছে যে, মানুষ-মাত্রকেই স্বজাতি ভাবিয়া এবং সন্তানধর্ম্মকে সাধারণ ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে অবিলম্বে এবং কার্য্যকরী ভাবে বিশ্ব-মানবতার প্রতিষ্ঠার সময় আসিয়াছে। নূতন পৃথিবী রচনার পক্ষে ইহাই বিজ্ঞানের সনির্ব্বন্ধ নির্দ্দেশ। ইহার জন্য শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতবাদসমূহের সাহায্য গ্রহণের আবশ্যক হইবে এবং সমাজবিজ্ঞানকে প্রাকৃত বিজ্ঞানের অন্তর্গত করিয়া লইতে হইবে। এই বাণীকে উপেক্ষা করিয়া স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে যে কোন ব্যবস্থাই অবলম্বিত হউক না কেন, তাহা ব্যর্থতায় পরিণত হইতে বাধ্য। মানুষ মাত্রই প্রকৃতির সন্তান এই সত্যের অবমাননার একমাত্র পরিণাম প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য অভিশাপ স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লওয়া।

সত্যের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে, সত্যে সত্যে কোথাও বিরোধ ঘটে না; সুতরাং বিশ্বমানবতার মনোভাব কাহারও সত্যকার স্বদেশপ্রীতির বা স্বজাতিপ্রীতির পরিপন্থী হইতে পারে না। ইহা স্পষ্ট অনুভব করিতে হইবে যে, উভয় মনোভাব পরস্পরের পরিপূরক এবং একটি অপরটির অন্তর্গত।

বস্তুতঃ সঙ্কীর্ণ দেশপ্রেমের ক্ষুদ্র বিটপীকে রস সঞ্চালন দ্বারা সঞ্জীবিত করিয়া বৃহৎ মহীরুহে পরিণত করার পক্ষে বিশ্ব-মানবতাই হইবে সরস ও সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি স্বরূপ। জাতিকে অস্বীকার করিয়া যেমন ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না সেইরূপ বিশ্বজনীন জাতীয়তাবোধকে অস্বীকার করিয়াও সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবোধ তিষ্ঠিতে পারে না। কি ব্যক্তিগত স্বার্থ, কি সম্প্রদায়গত স্বার্থ সকলকেই চলিতে হইবে বিশ্বজনীন স্বার্থের মুখ তাকাইয়া। যদি ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্যাগ স্বীকার ভিন্ন একটি ক্ষুদ্র সমাজ গঠনও সম্ভব না হয় তবে বৃহত্তর জাতি-সমূহের বৃহত্তর ত্যাগ স্বীকার ভিন্ন মানবজাতি রূপ মহাজাতির গঠন সম্ভব হইবে ইহা কখনও আশা করা যায় না। এ কার্য্য কঠিন হইলেও অবশ্য কর্ত্তব্য। এই বিশ্বজনীন জাতিগঠন যতদিন না সুসম্পন্ন হইতে পারিবে ততদিন কি জাতি-বিশেষের পক্ষে, কি ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে, স্থায়ী শান্তির প্রত্যাশা আকাশ-কুসুমই রহিয়া যাইবে।

এ কথা সত্য যে, ক্ষুদ্র মানব আমরা বিরাটকে উপলব্ধি করিতে ভয় পাই, নিজের প্রতি, গৃহের প্রতি দরদ হারাইবার আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া পড়ি; কিন্তু ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে যে, প্রকৃতপক্ষে ইহা হারানো নহে, যাহা চাহি তাহাকেই অধিকতর নিবিড় ভাবে পাওয়া। বিরাটকে আলিঙ্গন করার অর্থ ক্ষুদ্রকে অস্বীকার করা নহে, পরন্তু ক্ষুদ্র যে বিরাটেরই অঙ্গীভূত এই অনুভূতির তীক্ষ্ণতাদ্বারা ক্ষুদ্রের ব্যক্তিত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। তরঙ্গের তরঙ্গত্ব সাগরকে লইয়াই, উহাকে বাদ দিয়া নহে। 'আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ঐ'—সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা ও সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিত্ববোধকে নিশ্চিন্ত নির্ভরতা ও সুকঠিন বাস্তবমূর্ত্তি দান করিতে হইলে বিশ্বমানবতার বিরাট আকাশের গায়ে উহাকে হেলান দিতেই হইবে।

আর মানবের অভাব অভিযোগ—পৃথিবীব্যাপী এই দৈন্য ও দারিদ্র্য? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহা সমা-ধানের ইঙ্গিতও রহিয়াছে ঐ শিক্ষার মধ্যেই। সমগ্র মানব জাতির অভাব দূরীকরণের প্রধান উপায় দুইটি—(১) পৃথিবীর মোট কর্ম্মশক্তির মাত্রা বৃদ্ধি। (২) উহাকে সুপথে চালনা দ্বারা কর্ম্মশক্তির অপচয় নিবারণ। প্রথমটির জন্য বিশেষ-ভাবে প্রয়োজন সর্ব্বত্র সুশিক্ষার বিস্তার। দ্বিতীয়টির জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন জনসমাজে দুষ্কৃতির মূলোৎপাটন। উভয়ই সুসাধ্য হয়, আমরা বলিয়াছি, বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা দ্বারা। বর্ত্তমান সর্ব্বব্যাপী দৈন্য ও দুর্দ্দশার একটা বড় শিক্ষা এই যে, পৃথিবীতে শাসকশ্রেণী অপেক্ষা শিক্ষক শ্রেণীর প্রয়োজন রহিয়াছে বেশী। বিশ্বভ্রাতৃত্বের নির্দ্দেশও ইহাই। বেত্রদণ্ড অপেক্ষা স্নেহের শাসন চিরদিনই অধিকতর ফলপ্রসূ হইয়াছে। মনকে বাঁধাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কাজ, এবং এজন্য সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন মানবমনের উন্নতি বিধান। সকল দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে মানুষগঠন কার্য্যে অধিকতর আত্মনিয়োগ করিতে হইবে, জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সমগ্র মানবজাতিকে মনুষ্যত্বের উচ্চতম স্তরে টানিয়া তুলিতে সর্ব্ব-শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। এ জন্য কার্য্যসূচী হইবে—মানবসমাজে বিশ্বভ্রাতৃত্বের পূর্ণ আদর্শ স্থাপন, পৃথিবীকে মিথ্যার কবল হইতে মুক্তিদান এবং সুশিক্ষা বিস্তার দ্বারা প্রতি মানবের কর্ম্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া উহাকে মানব-কল্যাণের একলক্ষ্য পথে পরিচালন। বিশ্বপ্রকৃতির সন্তান-রূপে মানব মাত্রেরই চিন্তাপ্রণালী হইবে এইরূপ—বিশ্বের প্রত্যেকটি পরমাণুর সহিত আমার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান। প্রকৃতির বিধানে ইহারা সকলেই আমার একান্ত আপন। এই সম্বন্ধের মর্য্যাদা আমাকে রক্ষা করিতে হইবে এবং ইহার ঋণ আমার শোধ করিতে হইবে। সুতরাং বিশ্ব-মানবের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও উন্নতি সাধনই হইবে আমার জীবনের চরম লক্ষ্য। ইহাতেই আমার মনুষ্যজন্মের একমাত্র সার্থকতা। আর কিছু না পারিলেও আমার কার্য্যদ্বারা পৃথিবীর একটি মানবেরও অনিষ্ট সাধন না হয় এ প্রতিজ্ঞা আমাকে রক্ষা করিতেই হইবে। এই সত্য মানবচিত্তে যতই দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হইবে ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধিমূলক মিথ্যাচারের বর্ত্তমান নির্লজ্জ ও উন্মত্ত অভিযানও ততই মন্দীভূত হইবে। ফলে মিথ্যাশ্রয়ী সর্ব্বপ্রকার অপরাধ-প্রবণতা অবলম্বনের অভাবে ক্রমে দূরে সরিয়া যাইবে এবং প্রকৃত সুস্থ ও সবল মানব গঠিত হইতে থাকিবে। ইহাই প্রগতি এবং মানবমুক্তির প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট পথ। হীন ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করা যদি জড়বিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব হয় তবে স্বভাবতঃ সরল মাটির মানুষকে সোনার মানুষে পরিণত করাও সমাজ-বিজ্ঞানের পক্ষে নিশ্চয়ই সম্ভব হইবে।

ইহা স্বীকার্য্য যে, আদর্শ মানবজাতি গঠন সময়সাপেক্ষ কিন্তু প্রগতির পথে এক পা, এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলেও উন্নতি সুনিশ্চিত। আলেয়ার পশ্চাতে শত পদ অগ্রসর হওয়া অপেক্ষা সত্যের অভিমুখে এক পাদ অভিযানের মূল্য অনেক বেশী। এ কার্য্যে অবশ্য শ্রমস্বীকারের প্রয়োজনও যথেষ্ট; কিন্তু অন্ধকে অন্ধ করিয়া রাখিয়া প্রতি হোঁচটে তাহাকে যষ্টির আঘাতে সুপথে পরিচালনের চেষ্টায় যে বিপুল শ্রম স্বীকারের প্রয়োজন হয় তাহা কেবল অযথা তিক্ত এবং অতি মাত্রায় বৃহত্তরই নহে, পরন্তু উহার অধিকাংশই পণ্ডশ্রম মাত্র। পৃথিবীর বর্ত্তমান দুর্দ্দশাই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। গঠনমূলক কার্য্যদ্বারা পৃথিবীতে বিশ্বমানবতার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই এই পণ্ডশ্রম হ্রাস প্রাপ্ত হইবে; ফলে প্রভূত সময় মানবজাতির হাতে আসিবে এবং তাহার বিপুল কর্ম্মশক্তি বর্ত্তমান শোচনীয় অপচয়ের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে। এই পুঞ্জীভূত শক্তি তখন পৃথিবী হইতে, আকাশ বাতাস হইতে এবং প্রয়োজন হইলে সুদূর গ্রহ-নক্ষত্র হইতে আহার্য্য সংগ্রহে এবং মানবজাতির সুখ শান্তি বিধানে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত হইতে পারিবে। আকুল আগ্রহে মাতা বসুন্ধরা সেই সকল মুক্তিদাতার আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করিতেছেন যাঁহারা মানবের উদ্ভাবনী শক্তিকে বর্ত্তমান ভয়ঙ্কর অপচয়ের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দান করিয়া সুপথে পরিচালিত করিতে সক্ষম হইবেন, যাহার ফলে এত খাদ্যের সংস্থান হইবে যে, অন্যান্য গ্রহের অধিবাসিগণকে যথেচ্ছা দান করিলেও বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ মানব সন্তানের জন্য সঞ্চয় থাকিবে যথেষ্ট। ইহাই হইবে দূরবর্ত্তী জগৎসমূহের উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র গ্রহের গৌরবের দান এবং অনাগত মানবশিশুর প্রতি মানবজাতির কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

বাংলা দেশের মাটি

শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিকঙ্কণ

সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা
ওগো আমার বাংলাদেশের মাটি
জন্মে যেন আবার তোমার বুকে,
জীবনটী মোর হয় গো পরিপাটী।
দোয়েল, ফিঙের এমন মধুর গান
কোকিল, শ্যামার মনমাতান তান
মলয় হাওয়ার স্নিগ্ধ করা বাওয়া—
জুড়িয়ে করে সকল হৃদয় খাঁটি,
ওগো আমার বাংলা দেশের মাটি!

শান্ত শীতল ঘন ছায়ার তলে
তোমার পরে ঠেকাই আমার মাথা,
চোখের জলে বুকভেসে যায় মোর
যখন শুনি তোমার পুরাণ গাথা।
চণ্ডীদাসের রামপ্রসাদের যত
দ্বিজেন, রবীর কণ্ঠ বাজে কত,
বাউল চলে পথের মাঝে গেয়ে—
একতারাতে বাজিয়ে মনের কথা;
তোমার পরে ঠেকাই আমার মাথা!

অন্নপূর্ণা; তুমিই দেবী মোর
ভাণ্ড তোমার ভরা সোনার ধানে।
রূপে তোমার সারা ভুবন আলো—
মাতিয়ে তোলে দূরের পথিক প্রাণে।
বন-ফুলের-কণ্ঠমালা বাসে,
লুটতে মধু হাজার ভ্রমর আসে,
বক্ষে তোমার স্বচ্ছ পীযূষধারা
তৃষ্ণাতুরে সরস করে আনে;
ভাণ্ড তোমার ভরা সোনার ধানে!

তুমিই আমার সর্ব্ব সুখের মেলা
সর্ব্ব সুখের শান্তি হেথায় পাই;
বিশ্ব প্রেমের উৎস হেথায় ঝরে
জগত মাঝে তোমার সমান নাই।
মরণ পরে আবার যেন আসি
তোমার কোলে আবার কাঁদি হাসি,
দুঃখ ব্যথা যতোই আসুক মনে
বক্ষে তোমার থাকতে আমি চাই!
সর্ব্ব সুখের শান্তি হেথায় পাই।

ভুল কার ?

শ্রীযোগেশ্বর ভট্টাচার্য্য

"চলা-ফেরার এমন ধারা দেখে বিস্ময় লাগে—এই ত ? শুধু তুমি নয়, যারই সঙ্গে বন্ধুত্ব জন্মে যায়, সেই ভাবে আমি এমন ধারা কেন ? কেন আমি কথা বলি অল্প ? কেন চলি মনের বাইরে বাইরে—বিজন পথে একা একা ! সঙ্গী জুটলে কেন চটে যাই হঠাৎ—আগুনে যেন জলের স্পর্শ ! মুগ্ধ হই তফাতের দৃষ্টিতে, কাছে এলে চোখ ফিরিয়ে রাখি—এ যেন খেয়ালের গোড়ামী ।

"ধূমপানে মত্ততা যথেষ্ট । বন্ধু-বান্ধব (হয় ত' তোমার মত এতটা অন্তরঙ্গ নয়) যদিও নিজের করেই ভাবে এই হতভাগা পথচারীকে, নিষেধ করে ধূমপান করতে । গলাটা নাকি একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে ঐ দোষে ! কাসির উপদ্রবও দেখা দিয়েছে খুব । তাদের উপদেশে বা অনুরোধে মনের কাছে কোন প্রশ্ন না করেই ছেড়ে দিই ধূমপান । একদিন দুদিন, ঠিক তিন দিনে আবার ভুল করে বসি । নিষেধকারীর অজ্ঞাতে লুকিয়ে চুরোটের কাছে আবার ভক্তি জানিয়ে ফেলি । নিজের কাছেও লুকো-চুরি । কেন হবে না আর ঐ বাস্মিজ্‌ চুরোট, যেহেতু প্রতিজ্ঞা করেছি ধূমপান আর করবো না । কিন্তু রাত যখন হয়ে আসে একটার কাছাকাছি, আলোটা নিবিয়ে দিয়ে অতীতের কথা ভাবতে বসি—ভবিষ্যৎকে টেনে আনি মনের অতি কাছাকাছি । ভাবনার নেশায় ধূমপানের নেশাটাও হঠাৎ প্রবল হয়ে ওঠে । অন্ধকারে কোনমতে হরিদাসবাবুর বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়াই । সে নাক ডেকে ঘুমোয় (বুঝি না সে অম্বলের ব্যথায় গোঙ্‌রায়, না সত্যিই ঘুমোয়) দাঁড়িয়ে থাকি নিঃশ্বাস বন্ধ করে । যখন তার অজ্ঞান অবস্থার সম্পূর্ণ প্রমাণ পাই, বালিশের তলা থেকে বিড়ির কৌটাটি বার করি অতি সন্তর্পণে । অগত্যা একটি বিড়িই অধরোষ্ঠের মাঝখানে স্থাপন করে বেড়িয়ে পড়ি দিয়েশলাই-এর সন্ধানে সেই অন্ধকারেই । চুরোট খাই—সে ত' নেশা নয়, আনন্দ নয়—শুধু অভাব পুরণ করার একটা বৃথা চেষ্টা । শেষটা একটু জোরেই টানি—ধোঁয়াটা বেড়িয়ে আসে নিঃসঙ্কোচে—লজ্জা ভয়ের শাসন এড়িয়ে । তাই ত' মেয়েরা বলে—বাবা ! চুরোট টান্‌ছে যেন ষ্টীমারের ধোঁয়া বেরুচ্ছে ! তখন অনেকেই ত' প্রশ্ন করে—তুমি কেমন হে ? কী উত্তর দেবো ! একেবারে চুপ্‌ ।

"রমলা ! তুমিও তাদের একজন । পথে যখন হঠাৎ দেখা হয়ে যায়, পিছন থেকে হাতখানা টেনে ধরো, অথবা সামনে দাঁড়িয়ে আমার দৃষ্টিটা ধরো-চেপে তোমার চাহনির কোমল আবরণে—শুধু বলো—"এমন কেন হে !" কী উত্তর দেবো । নিজের মুখোমুখি তোমার ঐ চোখ দুটোর দিকে চেয়ে থাকি ক্যাবলার মত ! তাই ত' কী উত্তর দিই ! চা খেতে গিয়ে যখন কাপটা ফেলে দিই (অর্থাৎ পড়ে যায় হাত থেকে অন্যমনস্কতার জন্য) কাপটা যে ভেঙ্গে গেল সেদিকে ভ্রুক্ষেপ মোটেই করো না, শুধু চেয়ে থাকো আমার দিকে—ভাবো আমি এমন কেন । রাস্তায় চলতে যখন হোচট্‌ খাই, পথিক ভাবে—কোন্‌ খোলা জানালাটা যেন আমার চোখদুটোকে টেনে ধরেছে । তুমিও কি তাই ভাবো রমলা । ভাবলেও উপায় নেই—উত্তর ত' আমার নেই ।

"কিন্তু রমলা, কেন এ জোরজুলুম ? যা কোন দিন পারি নি তা আজো পারবো না—একেবারেই অসম্ভব । কেন মিছেমিছি জ্বালাতন করো—কী আনন্দ তোমার ?"

"জ্বালাতন করেও যে আমরা আনন্দ পাই—তা কি করে বুঝবে তোমরা ? জ্বালাতন করেই যে তোমাদের চিনবার কষ্টিপাথর তৈরী করতে হয় ।"

"বেশ ত' ! জ্বালাতন করবে আমায় আর তারই রসদ জোগাব আমি । একেবারে ফ্যাসিষ্ট ক্লেম্‌ । না আমি কিছু বলবো না ।"

রমলা আমার মুখের কাছে তার মুখখানা আরো এগিয়ে চোখ দুটো টান করে বলে, "বলতে হবে ।"

রাগ হয়ে বলে উঠি, "রমলা, দুষ্টুমি করো না (হাতখানা টেনে ধরে, যদি চলে যাই) ছাড় না ! বাঃ ও কি ! (হাসে চোখ দুটো ঠিক আমার চোখের উপর রেখে) বাঃ রে এ যেন মেজিষ্ট্রেটের হুকুম না বল্লে ত' এরেষ্ট ।"

রমলা যেন পেয়ে বসে, কিছুতেই ছাড়বে না, বলতেই হবে

যুক্তিযুক্ত দু' একটা কারণ। অসহ্য হয়ে বলে উঠি, "না আর ভাল লাগে না, আজই তোমাকে বলবো, যা কিছু মনে পড়ে সবই।"

রমলা বলে উঠল, "তাহলে ভাই চল—ঐ গাছের তলায়। কেমন মধুর সন্ধ্যা—

আকাশ পরিল ললাটে সিঁদুর
বধূ রহে ঘরে বিরহবিধুর
হেরি অভিসার কানন বধূর
দিবস হইল মন্দা।

চল ভাই। এখুনি আকাশে চাঁদ উঠবে। তুমি শুধু বলবে আর আমি শুনবো, কেমন?"

রমলার মুখে আনন্দের দীপ্তি কিন্তু আমার বুকে হৃৎকম্প। কি বলবো কিছুই ত' ভেবে পাই না। রমলাই টেনে নিয়ে চল্ল কোথায় যাবে সেই জানে।

*

শীতের প্রভাত। ভোরের কুয়াসা ভেদ করে সূর্য্য আকাশ ঠেলে উঠেছে। জানালা খোলা—তারই মধ্য দিয়ে এক ঝলক রোদ-কুয়াসায় ঘামানো রোদ আমারই গায়ে এসে পড়ছিল। জানালার ভিতর দিয়ে খচ্ খচ্ শব্দ শুনে জেগে উঠলাম। চোখ দুটো খুলে দেখি কাগজ দিয়ে গেছে। চোখ রগরাতে রগরাতে কোন গতিকে ওয়ান্টেড কলমটা পড়তে সুরু করে দিলুম। "দ্বিতীয়বার্ষিক শ্রেণীর একটি ছাত্রীর জন্য একজন গৃহশিক্ষক চাই। শিক্ষকের বয়স অনূন পঁয়ত্রিশ হওয়া প্রয়োজন।" আর পড়বার প্রয়োজন নেই, শুধু ভাবতে লাগলুম, এল্‌ডার্লি—অন্ততঃ পঁয়ত্রিশ, এল্‌ডার্লি। এল্‌ডার্লি কথাটা হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে ভাষায় প্রকাশ পেল। রতীন দৌড়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো আমার অসুখটা কি তাই দেখতে। রতীনের পরিধানে ধুতি, চাদর, পাঞ্জাবি বেশ মানিয়েছে। আবার বল্লুম, এল্‌ডার্লি। রতীন আমার দিকে চেয়ে বল্ল, যেন একটু বিস্মিত—"প্যাগল!" কিন্তু ইতিমধ্যে তাহার স্কন্ধের কোচান চাঁদরখানি টেনে আমার স্কন্ধে এনে চাপিয়ে দিলুম। রতীন হাঁ করে চেয়ে রইল আমার দিকে হত বিস্ময়ে।

আমি শুধু বললাম, "দরকার আছে। বিনা চাদরে আজ বেড়িয়ে পড়।"

আর এক বুদ্ধের কাছ থেকে আনলুম একটা চেন্ ঘড়ি। বেড়িয়ে পড়লুম ধুতি চাদর পাঞ্জাবি পরিধানে, চেন্ ঘড়ি ঝুলিয়ে—তার উপরে আবার মুখে দাড়ির উপদ্রব যথেষ্ট। কে বুঝবে—পঁয়ত্রিশের কম।

*

মনে হল প্রায় পনের মিনিট তন্দ্রা (উহাই ছাত্রীর নাম) মাষ্টারম'শায়ের দিকে চেয়ে রয়েছে উৎসুক দৃষ্টিতে। কিন্তু ইহার প্রকৃত প্রমাণ নেবার সাহস হলো না প্রবৃত্তিও ততটা ছিল না। টেবিলের উপর একখানা বইএর একটা সাদা কাগজের দিকেই অত্যন্ত মনোযোগের সহিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখলুম। আর একটু আশ্চর্য্যের বিষয়, তন্দ্রা মাষ্টারম'শাই বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। (মুখের কি অবস্থাটা হল' দেখিওনি, বলতেও পারি না) একটু ইতস্ততঃ করে বলে উঠল, (বাংলা সিলেকশন থেকে রবীবাবুর সাজাহান কবিতাটা বের করে) হ্যাঁ—আচ্ছা বলুন ত এ-এ রবীবাবু ব্রাহ্ম নন্?

প্রশ্নটার মানে হঠাৎ বুঝতে পারলুন না। সত্যিই দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রীর পক্ষে এটা অদ্ভুতধরণের প্রশ্ন। তথাপি উত্তর একটা দিতে হবে। উত্তরটা সাদাসিধে হলেই বা কেমন হবে। তাই একটু বিদ্যে জাহির করে উত্তর দিলুম, "তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত বটে কিন্তু তাঁকে খাঁটি ব্রাহ্ম বলা চলে না।"

"তার মানে?"

এই ধরণের প্রশ্ন আমি মোটেই পছন্দ করি না। "মানে" শব্দটি দ্বারা কথার মাঝে বিঘ্ন ঘটানোর কু অভ্যাসটা আদৌ প্রশংসনীয় নয়। 'আমি একটু ধমক দিয়ে বলে উঠলুম—"ও কি! মুদ্রাদোষটা প্রথমেই প্রকাশ করতে হলো। সবটা না শুনে 'মানে' 'মানে' বলে কখনো ইন্‌টারাপ্ট করো না—করবেন না।"

তন্দ্রা হো-হো করে হেসে দিল—বলে গেল—"ওঃ-ও-হো-হো! আপনি কাকে কী বলতে হয় তাও জানেন না? ছাত্রকে মাষ্টারম'শায় বলে, 'তুমি' বা 'তুই' আর ছাত্র মাষ্টারম'শায়কে বলে—'আপনি'।

এ-ভাবে পরাস্ত হওয়াটা আমি মোটেই পছন্দ করলুম না। আমি বললুম—"হ্যাঁ-হ্যাঁ তুমি ত' আর ছাত্র নন্"।

তন্দ্রা আরো হাসল। বোধ হ'ল একটু এগিয়েই বল্‌তে লাগল, "না-ই বা হলুম ছাত্র—ছাত্রী ত' নিশ্চয়। মাষ্টার-ম'শায়ের সঙ্গে ছাত্র এবং ছাত্রী দু'জনের সম্পর্কই এক।"

কী আর বলি! অবশেষে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করলুম ক্রোধের প্রকাশে মাষ্টারি চাল দিয়ে—"তোমরা পড়তে চাও না গল্প করতে চাও।"

"লোক ত' আমি একা—পড়তেও চাই গল্প করতেও চাই। না-না-শুধু পড়তে। বলুন—"

"নিশ্চয়ই পড়েছ—গীতাঞ্জলির প্রথম গান—"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে"। এখানে আমাদের রবীবাবু মূর্ত্তি-উপাসক। নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক হলে সাকারের কল্পনা করা তার পক্ষে অসম্ভব। যদি মূর্ত্তি-উপাসনায় ধ্যান-নিরত না হওয়া যায়, তা' হ'লে উপাস্তের চরণরূপের কল্পনা করা যায় না। এখানে দার্শনিক কবি ব্রহ্মকে মূর্ত্তিতে আধেয় করে উপাস্তের বন্দনা কর্চ্ছেন। তাই আমাদের সমাজের সদস্য হিসেবে তিনি ব্রাহ্মণ্য কিন্তু তাহার কাব্যে, কবিত্বে তাহার সাহিত্যে তিনি সর্ব্বধর্ম্মের উপাসক। তাহার কবিত্বের উদারতা বিশ্বকে আলিঙ্গন করেছে, তাই সেখানে বিশ্বের ধর্ম্মই তাহার ধর্ম্ম—সেখানে তাহার আলাদা সত্ত্বা নেই—বিশ্বের অস্তিত্বেই তিনি বিদ্যমান; প্রভৃতি অনেক কিছুই বলে গেলুম। তন্দ্রা নিশ্চয়ই মনোযোগ দিয়ে শুনেছিল—একটু শব্দও তার মুখ দিয়ে বের হ'ল না। ইঙ্গিতনেত্রে নীল আকাশ বা সুগভীর অনন্ত সমুদ্রের দিকে সে যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল।"

যখন বের হয়ে আসি, আমার ওঠার সঙ্গে তন্দ্রার ওঠারও টের পেলাম। সে বলে উঠল—"কী ভুলই যে সেদিন করেছেন! আপনার নামটা কি তা-ও বলে যান নি! বলুন ত' আজ যদি আমাদের পড়তে না হতো, কী করে আপনাকে খবর দিতুম? আর যদি আপনিই বা না আসতেন—কেন যে এলেন না তা-ও জানবার উপায় ছিল না।"

"কেন—সেদিন ত' বলে গেছি।

"কৈ—কোথায়—কার কাছে বলে গেছেন? আপনার কিছুই মনে থাকে না বুঝি?"

আমি কোন উত্তর না করে সুমুখের দিকে একখানা পা ফেলতেই তন্দ্রা বলে উঠল—"তবে নামটা বুঝি বলবেনই না?"

আমি অগত্যা মুখখানা সেই সামনের দিকে রেখেই বলে ফেললুম—"শ্রী……"।

পিছনের দিকে হঠাৎ একটা শব্দ শুনে একবার চাইতে বাধ্য হলুম—তন্দ্রা হয় ত' ফিরতে গিয়ে দরজায় লেগে পড়ে গেছে? মনোযোগটা সামনের দিকে ফিরিয়ে এনে আবার চলতে লাগলুম।

বাড়ী এসে ভাবি—তাই ত' মেয়েটি কী রকমের—হয় ত' আজকাল যাকে আপ-টু-ডেট্ বলে, তাই। তা হলেই বা কথাগুলি এত পরিষ্কার কি করে হয়—নেই সঙ্কোচ, নেই দ্বিধা—এত বিশেষণ মিলেই কি আপ-টু-ডেট্! হবে, তবে অত একাগ্রতা! তাই বা কী করে সম্ভব! আপ-টু-ডেটের মন থাকে চঞ্চল, দেহ হয় অষ্টবক্র অরিএণ্ট্যাল ফ্যাশানে, সে সব ত' বোধ হলো না। আমি না চাইলেও সে চেয়ে থাকে, কথা বলতে যতই আমার অনিচ্ছা, ততই সে বলাতে চায় বেশী করে—হাসতে হাসতে আমায় বোকা বানিয়ে ছাড়ে। কিন্তু কথার সুরে যখন এতটুকুও কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ করি, মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মত সে নিশ্চুপ হয়ে পড়ে যেন নিতান্ত অনুগতা। যে মুহূর্ত্তে আমার নামটা উচ্চারণ করলুম—সে পড়ে গেল, একি একসিডেণ্টাল কয়েন্ সাইডেন্স! হবে, অসম্ভব কি!"

কিন্তু মুখখানা ত' মনে পড়ছে না—যেহেতু দেখিনি, দেখতে সাহসও করিনি—আমি শিক্ষক, সে ছাত্রী, তাকে দেখে যদি প্রেমের পিপাসা জেগে ওঠে। প্রেম করা গরীবের পক্ষে সাজে না। প্রেম করা তাদেরই শোভা পায় যাদের জীবনের ক্যালেণ্ডারে দিনগুলি দেখা দেয় পদ্মের পাপড়ির মত, ঝরে যায় রোদের একটুখানি তাপে, আদরের একটুখানি অভাবে, জীবনের ইতিহাস রেখে যায় গন্ধ, জীবন-মরণের ছন্দে একটি রমণীয় পরিচ্ছেদে সমাহিত করে। প্রেমের বোঝা তারাই বইতে পারে, যাদের আছে অফুরন্ত অর্থ—দু'হাতে অনায়াসে ব্যয় করলেও ফুরোয় না, যাদের আছে সৌন্দর্য্যের গর্ব্ব, যাদের আছে বংশের আভিজাত্য অথবা ঐ গুণটির একেবারেই অভাব। প্রেমের বাজারে বিনিময় প্রথা উঠে গেছে; তাকে মিডিয়াম অব একচেঞ্জ-এর সাহায্যে কিনতে হয়। বাঙ্গালায় সে বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের যুগ নেই। আজ এসেছে বিপ্লবের যুগ—গণ-বিপ্লব, শিল্প-বিপ্লব, কৃষি-বিপ্লব আর কত কি! কিন্তু প্রেমের জগতে বিপ্লব করবে কে? ক্যাপি-

টালিষ্টদের বিরুদ্ধে অন্নহীন শ্রমজীবীদের বিপ্লবী নেশা একটা কন্সালশন্ কিন্তু হতাশ প্রেমিকের বিপ্লবী নেশা একটা লাক্-শারি, তাই সেখানে গণতন্ত্রের যুগেও ক্যাপিটালিষ্টদের জয়। স্বাভাবিকতার দিন চলে গেছে—নবে এসেছে চাক্‌চিক্য ও পারিপাট্য নিয়ে কৃত্রিমতার যুগ। কৃত্রিমতার বিনিময় মূল্য যথেষ্ট, সে মূল্য কৃত্রিমতাই যোগাতে পারে। গরীবের বাগানে গোলাপগাছ হয়ে ফুল ধরে না, এ কথা যে সত্যি, খুব সত্যি—কে অস্বীকার করবে, সত্যকে অস্বীকার করবার কাহারো সাধ্য নেই। আমরা গরীব, টাকাটা আমাদের কাছে সব চেয়ে বড়।

রমলা প্রস্তর মূর্ত্তির মত বসে রইল, তৃষ্ণায় তার দৃষ্টি লেলিহান, কী সে চায় কে জানে। সাইকোলজির জ্ঞানটা আমার কম তাই আবিষ্কার কিছুই করতে পারলুম না। সোজাসুজি সিদ্ধান্ত করলুম রমলা গল্পটার শেষ শুনতে চায় তবু যেন আর বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। কিছু সময় চুপ করেই তার দিকে চেয়ে রইলুম। দু'জনের এই নিশ্চুপ অবস্থাটা সঙ্কটাপন্ন। রমলা উভয়ের অবস্থাটা বুঝতে পেরে বলে উঠল—নিঃশ্বাসে স্বরটা একটু ভারী করে—তার পর?

"তারপর ট্রেজিডি—বিরহ!"

"হোক বিরহ; ভয় কি! এ ত' আর বিজ্ঞানশাস্ত্র নয় যে ট্রেজিডির পরে কমিডি আর হতেই পারে না

"হতে পারে;—কিন্তু···।"

"কিন্তু কেন! ট্রেজিডির পরে কমিডি যে রাধা-কৃষ্ণের যুগল-মিলন, সে বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা আছে কি?"

"না। তবে—"

"আপশোষ হচ্ছে বুঝি?"

"হয় বই কি।"

রমলা চোখের কোনে দৃষ্টি এনে শুধু একটু হাসল। কিন্তু "তারপরে"র উত্তর না দিয়ে আর পারলুম না। আবার সুরু করতে হল সেই অপ্রিয় অথচ সত্য ইতিহাস—

"তারপর ট্রামে করে একদিন ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরছি। হাতে ফ্ল্যাট ফাইল। ফাঁকি দেবার আর সুযোগ ছিল না—দেখলেই বোঝা যায় আমার বয়েস বাইশের বেশী নয়। অনুমান করা চলে—ইউনিভার্সিটির ছাত্র এম্-এ ক্লাসে পড়ি। তাস্ত্রার বাবা আমার দিকে দৃঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে রইল—নেহাৎ কম হলেও পাঁচ মিনিট। আমার আপাদ মস্তক বারবার নিরীক্ষণ করতে লাগল। এ অবস্থায় একটু লজ্জিত হওয়া স্বাভাবিক—অন্যান্য আরোহীরা কী ভাবছে—নিশ্চয়ই ভাবছে সিঁদে চোর আটকেছে—এ দিকে ভয় হল অনুমানে, নিশ্চয়ই আজ মাষ্টারি পদের জবাব হবে।

আজ বিকালেও সব দিনের মত ধুতি চাদর পরেই পড়াতে গেলুম। যা ভেবেছি ঠিক তাই। তন্দ্রার বাবা ডিরেক্ট এসেই হুট করে বলে ফেল্ল, "আপনি ক'লকাতার চালটা বেশ আয়ত্ত করে ফেলেছেন!"

আমি যেন বিস্ময়ে একটু গম্ভীরভাবে উত্তর করলুম, "তার মানে?"

"আপনি আমাদের পরিচয় দিয়েছিলেন একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক বলে, আপনার বয়েস ত্রিশের ওপর, আপনি বিবাহিত আপনার ছেলে মেয়ে হয়েছে। বেশ-ভূষাও ঠিক সেই অনুযায়ী করে আসতেন। কিন্তু আপনার স্বরূপটি আজ ধরা পড়ে গেছে।"

"তার মানে?"

"আমি খোজ নিয়ে জেনেছি আপনি একজন এম্-এ ষ্টুডেণ্ট, দাড়ি গোঁপ হয়েছে বটে কিন্তু আপনার বয়েস বাইশের অধিক নয়, আপনি জুচ্চোর! শঠ! প্রতারক! ভণ্ড! আপনার বিরুদ্ধে কেস্ করা উচিত।"

কথাগুলি শুনে আমার মেজাজটা গরম হয়ে উঠেছিল কারণ এর পরে ছাত্রীর অভিভাবক কি বলতে পারে তাও আমি বুঝেছিলুম। আমি একটু উদ্ধত হয়েই বলে ফেল্লুম, "ভয়ানক অপরাধের কথা, ওল্ড-ফুল্! বেশ-যা উচিত তাই সবার করা উচিত।"

অভিভাবকটি দ্বিগুণ ক্রোধে বলে উঠল, "কি! ফুল!"

আমি মেজাজের মাত্রা বজায় রেখে বল্লাম, "হ্যাঁ, ফুল! এর চেয়ে উপযুক্ত বিশেষণ আপনার হতে পারে না। শিক্ষক এবং ছাত্রীর মধ্যে যে কুৎসিৎ সম্বন্ধের আপনি আশঙ্কা কর্চ্ছেন তা' ছাত্রীর সুমুখেই শিক্ষককে জানিয়ে দেওয়ার মত গোকামী আপনাতেই দেখছি।"

অভিভাবক দু'পা' এগিয়ে এসে চীৎকার করে বলে উঠল, "মানহানি! প্রবঞ্চনা! কেস্, নিশ্চয় আমি কেস্ করবো। যান্—এক্ষুণি আপনি বেড়িয়ে যান। এড্‌ভার্টাইজমেণ্টে

ছিল এল্‌ডার্মি। বাইশ বছরের যুবক হয়ে ভান করে এল্‌ডার্মি পরিচয় দিচ্ছেন। শুনি আপনার অভিসন্ধিটা কি! যান—বেড়িয়ে যান।"

"সেটা আগে শুনতে চাইলে আর মানহানির কেস্ করতে হতো না—অনর্থক পরিশ্রম—মানহানির সঙ্গে অর্থ-হানি। আর অভিসন্ধিটা যখন অনুমানই করতে পেরেছেন, শুনে আর কি লাভ।"

ক্রোধে অভিভাবকের পা কাঁপছিল, চক্ষু রক্তবর্ণ, ঠোট দু'টো আড়ষ্ট হয়েছে—বাক্য চালনার চেয়ে শরীর চালনায় তিনি সক্ষম বেশী।

এই সুযোগে আমার কথাগুলি বলে নিলুম—"যখন আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আপনার চোর-খোজা দৃষ্টি আমার চোখে পড়েছিল, তখনই বুঝেছিলুম, আমার বেড়িয়ে যাওয়া উচিত হবে এবং বেড়িয়ে যাবার জন্যই আজ প্রস্তুত হয়ে এসেছি। কিন্তু তার আগে একটা কথা বলবো—মানুষকে চিনতে হলে এই সামান্য মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানটুকু থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। আমরা গরীব—টিউসনের উপর নির্ভর করে আমাদের ছাত্র-জীবন। আমাদের অর্থের প্রয়োজন—অর্থের জন্যই পড়াতে আসি, এই মুখোস পড়ি, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করি। প্রেম করতে আপনার মেয়েকে পড়াতে আসি না। আজ শেষে কাল কী খাব—মাস অন্তে কোত্থেকে কলেজের মাইনে জোগাব—এই দুশ্চিন্তার সমাধান করার চেয়ে প্রেমের স্বপ্ন দেখা আমাদের কাছে বড় নয়। আমাদের মত বাঙ্গালী ছাত্রের জীবন যে কত রহস্যে ঢাকা, কত দুর্যোগের মধ্য দিয়ে এরা পথ করে চলে তা' আপনারা ভাবতে চান না। তাই ভাবেন আপনাদের ঐ প্রেমের স্বপ্ন দেখা এদেরও বুঝি একটা রোগ। এরা স্বপ্ন দেখার সুযোগ পায় না। রাতে না ঘুমিয়ে সারারাত বসে বসে ভাবে তাদের ভাই-বোনের কথা, বৃদ্ধ মা-বাপের কথা, আসন্ন এগ্‌জামিনের কথা। সে যাই হোক, এভাবে বাড়ীতে ডেকে এনে আমায় অপমান করা আপনার নিতান্ত অনুচিত হয়েছে। আপনি যদি বুদ্ধিমান হতেন, বিবেচক হতেন, আপনার উচিত ছিল আমাকে খবর দেওয়া আমি যেন পড়াতে না আসি।"

আমার এসব কথা তন্দ্রার বাবার মনের উপর কোনই কাজ করে নি। আমি যে তাকে 'ফুল্' বলেছি তারই প্রতিশোধ নেবার সে সুযোগ খুঁজছিল। কিন্তু আমি তাকে আর কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে পোঁ করে বাড়ী থেকে বেড়িয়ে পড়লুম।

রমলা বিস্মিত নেত্রে আমার দিকে চেয়ে থেকে বলে উঠল, "তন্দ্রা কিছু বল্লে না ?"

"না"

"কিছুই বল্লে না! একেবারে চুপ!",

"একেবারে। কিন্তু আমি যখন এসব কথা বলছিলুম সে আমার দিকে প্রতিটি মুহূর্ত্ত চেয়েছিল এবং যখনই তার দিকে দৃষ্টিটা এগিয়ে যেত দেখছিলুম সে কাঁদছে, আমার দিকে চেয়েই কাঁদছে

"কাঁদছে!"

"হ্যাঁ, কাঁদছে। চীৎকার করে বা ফুঁপিয়ে কাঁদা নয়, নীরবে অশ্রুই ঝরছিল—কল্লোল ছিল না।"

"তারপর?"

"তারপর একদিন যখন কলেজ থেকে আমি ফিরছি, তন্দ্রা হেদুয়ার কোনে দাঁড়িয়ে ট্রামের জন্য অপেক্ষা ক'রছিল। আমি যখন তার পাশ কেটে চলে যাই—"মাষ্টারম'শাই—মাষ্টারম'শাই" বলে সে ডাকতে আরম্ভ করল। আমারই উদ্দেশ্যে সে সম্বোধন বুঝতে পেরেও আমি তার দিকে দৃকপাতও করলুম না—যেমনি চলছিলুম তেমনি দীর্ঘ পদ-বিক্ষেপে বিডন-ষ্ট্রীটের ফুটপাথ ধরে পূব-মুখো এগিয়ে চল্লুম। তন্দ্রা তাতে একটুও নিরুৎসাহ হলো না—সে আমার পিছন পিছন চলতে লাগল। দু'তিন মিনিটের মধ্যে সে আমার হাতখানা ধরে ফেলে বলে উঠল, "মাষ্টারম'শাই!" আমি হঠাৎ একটু বিচলিত হয়ে পড়লুম বটে—সে আমার হাতে একটু চাপ দিয়ে বলতে লাগল, "মাষ্টারম'শাই! সেদিন বাবা আপনাকে অপমান করেছে—সত্যিই অপমান করেছে। কিন্তু বাবা এখন এখানে নেই। তিনি বদলি হয়ে দিল্লী চলে গেছেন; সেজন্য বাবার হয়ে আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি—বাবাকে, আমাকে, বাড়ীর সবাইকে ক্ষমা করুন মাষ্টারম'শাই।"

তথাপি আমি নীরব—আমি সেদিনের প্রতিশোধ নেবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প। কোন কথা বলবো না, জানি কি যদি কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্ত এসে পড়ে। কিন্তু তন্দ্রা মোটেই হতাশ হ'ল না, সে বলতে লাগল, "মানুষ অপরাধ করে, যেহেতু ভুল

করা অমানুষিক নয়। কিন্তু যদি অপরাধীর অনুশোচনা হয় তার কৃতকর্ম্মের জন্য তবু কি সে ক্ষমা পাবার উপযোগ্য নয়? চুপ করে রইলেন যে?—কথা বলুন—বলুন, উত্তর দিন।”

মনের আবেগে কথাগুলি বলে তন্দ্রা যেন একটু শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। আমার মুখের দিকে ঘাড় ঝুঁকে কিছু সময় চেয়ে থেকে আবার বলতে লাগল, “আপনাকে আমি চিনেছি, শুধু আপনার মুখখানাকে নয়, মনটাকেও। আপনি আমার নিতান্ত আত্মীয়—আমার পরম বন্ধু। আপনি কেমন করে আমায় এমনি অগ্রাহ্য কর্চ্ছেন! আমি কোন রকমেই আপনার ক্ষমা পাবার উপযোগ্য নই। কিন্তু যদি জানতেন তা হ'লে বুঝতেন—আমি সবার আগে ক্ষমা পাবার যোগ্য। আপনিই আমাকে পড়াবেন। যত মাষ্টারের কাছে আমি পড়েছি, আপনার মত কেউ পড়াতে পারে না। আপনিই আমার প্রকৃত গুরু। আপনিই আমার—না-না-না! বলুন পড়াবেন কি না।”

কথাগুলি তাঁর অত্যন্ত রহস্যময় বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু সেগুলির অর্থবোধ করার মত মনের অবস্থা আমার তখন ছিল না। আমি ক্রোধে, এবং অভিমানে মনের ইচ্ছাকে আহত করেও তার হাত হতে মুক্ত হবার চেষ্টা কচ্ছিলুম—সেই মুহূর্ত্তে সত্যিকার নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছিলুম প্রতিশোধ নেবার হিংস্র আত্মম্ভরিতায়।

তন্দ্রা আবার বলে, “মাষ্টারমশাই! আমাদের, মেয়েদের যেটুকু দৃষ্টিশক্তি আছে, দেখছি, আপনাদের সেটুকুরও অভাব। গর্ব্ব যথেষ্ট আছে কিন্তু মানুষকে চিনতে এখনো শেখেন নি!”

তন্দ্রার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে, নারীর সঙ্গে পুরুষের যতটুকু ভদ্রোচিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা চলে সেটুকু নিঃশেষ করলুম—তখনও তন্দ্রার দু'হাতের মধ্যে আমার হাতখানি সাঁপুরের কাছে সাপের মত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আছে। তন্দ্রা আমার চেষ্টার অর্থ বুঝতে পারল—তার যা' বলার ছিল শেষ করল, “যদি নিশ্চয়ই চলে যাবে—এই-ই যদি শেষবারের মত দেখা হয়—একটা কথা বলে যাও, বলে যাও একটা কথা!”

তখনো বুঝি নি এই নূতন সম্বোধনের মানে। মনে শুধু বিস্ময়ের নাচন লাগল—অতীত যেন মেঘের ফাঁকে রোদের মত ইসারা করল। কিন্তু ইহারই মধ্যে তন্দ্রার হাত থেকে নিজের হাতখানা মুক্ত করে ফেলেছি। দুর্ব্বলতার একটু আলগা চাপ যেন মনটাকে ক্ষণিকের জন্য চেপে ধরল। কিন্তু ক্রোধ, অভিমান সর্ব্বোপরি নিজের গোড়ামীকে বিসর্জ্জন দিয়ে কোনক্রমেই তন্দ্রার চাওয়া মানুষ হতে পারলুম না। তন্দ্রা আমার বাঁ-পাশে দাঁড়িয়ে মুখের দিকে চেয়েছিল। আর আমি, যাতে দৃষ্টিতে ধরা না পড়ে মনের চেহারাটা, দৃষ্টিটাকে বেঁধে ধরেছিলুম ডানদিকে—নিতান্ত নিষ্ঠুরের মত।

একেবারে নীরব থাকা যেন অপরাধীরই পরিচয়—নিজেকে সমর্থন করে অন্ততঃ দু'একটি কথাও বলা উচিত। দু'এক পা' অগ্রসর হতে হতে আমি বলতে লাগলুম, 'হ্যাঁ, তোমার বাবা দিল্লীতে চলে গেছে আর এই সুযোগে চোরের মত তোমাকে পড়াতে যাবো। যাদের অত নিখুঁৎ চরিত্র গড়ে তুলবার চতুর্দ্দিক দিয়ে চেষ্টা, তারা কেন এই শঠ জুচ্চোর প্রতারকের কাছে পড়তে চাবে, আর আমিই বা কোন সাহসে সেই চরিত্রবতী কলেজ-মহিলাকে পড়াতে পারি। সেদিন থেকে আমি প্রিন্সিপল করেছি আর কখনো মেয়েদের গৃহশিক্ষকতা করবো না। সেদিন তোমার বাবা আমায় যে বিশেষণগুলি দিয়েছিলেন, সেগুলি আর কখনো পেতে চাই না—ভুলি নি, তখন তুমি নির্ব্বাক হয়ে বাবার মিষ্টি কথাগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনছিলে। খুব মজা দেখছিলে, না?”

আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করে আমি দ্রুত পদবিক্ষেপে এগিয়ে চল্লুম। তন্দ্রা সেই ভাবেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে যা বলছিল দূর থেকে তারই কয়েকটি কথা কাণে এসে পৌঁছিল—হুঁ! আর আমিই বসে মনোযোগ দিয়ে শুনছিলুম—মজা দেখছিলুম, তোমাকেই অপমান করবার জন্য! নাঃ—

... ...

জানি না কত দুঃস্বপ্ন দেখেই সেদিন ঘুম ভাঙল। কাগজ খুলতেই চোখে পড়ল তন্দ্রার ছবি। তার উপরে বড় অক্ষরে দুই কলম হেডিং-এ লেখা, “বেথুন কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী তন্দ্রার আত্মহত্যা।” আর তারই লিখিত একখানি চিঠির নকল নিয়ে দিয়ে দিয়েছে।

"আমার বাবা পশ্চিমে কাজ করিতেন। তখন তাঁরই এক সহকর্ম্মীর মাতৃহীন একমাত্র পুত্রের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। আমাদের দুজনেরই তখন অতি অল্প বয়স অর্থাৎ আমার বয়স মাত্র ছ'বছর। বিয়ের রাত্রে আমার শ্বশুরের আকস্মিক মৃত্যু হয়। স্বামী ভাবিলেন আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ এই দুর্ঘটনা এবং সেই রাত্রেই তিনি তাহার নববধূকে ক্রোধে এবং দুঃখে ত্যাগ করিয়া গৃহ ত্যাগ করেন—ইহাই আমাদের অনুমান। তারপর বাবা তাঁর কর্ম্মস্থান ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসেন এবং তাঁহার জামাতার যথেষ্ট অনুসন্ধান করেন। কিন্তু সন্ধান মিলিল না। কিন্তু তিনি আমাকে চিনিলেন না। আমিও অভিমানে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিতে পারিলাম না কারণ এ দুর্ব্বলতাটুকু আমাদের স্বাভাবিক। স্বামীকে একদিনের জন্য দেখে ও বহুকালের ব্যবধানেও তাঁকে ভুলিতে পারি নাই কিন্তু স্বামী কেন তার স্ত্রীকে চিনতে পারবে না—এই আমার অভিমান। হয় ত' তিনিও আমাকে জানতে চেষ্টা করেন না অভিমানে।"

"আমার আত্মহত্যার জন্য অপরাধী কেউ নয়—অপরাধী এই দুর্ভাগা নারীর মন।" আরো সে লিখেছিল - না নাঃ! কথাগুলি সম্পূর্ণ শেষ না করে রমলার একখানা হাত অশান্ত আবেগে দু'হাতের মধ্যে চেপে ধরলুম—বলে উঠলুম, "রমলা, রমলা!"

রমলা হাতখানা সজোরে টানতে টানতে বলে উঠল, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি—তোমার হাতের স্পর্শকে আজ আমি ভয় করি, তুমি নির্দ্দয়—নির্ম্মম! তুমি অবিশ্বাসী, তোমায় কথনো আমি বিশ্বাস করতে পারি না!

আমার আশঙ্কাটা আরো দৃঢ় হলো—রমলা নিশ্চয়ই আমায় চিরদিনের জন্য ছেড়ে যাবে। রমলার শক্তির অনুরূপ বল প্রয়োগ করে তার হাতখানা ধরে রাখলুম, বল্লুম, "না জেনে, রমলা, মানুষ ত' কত ভুলই করে। তার সঙ্গে এক-দিনের দেখা—তাও লুকিয়ে লুকিয়ে—কিন্তু রমলা!"

"সেখানে তোমার কর্ত্তব্য ছিল, আইনের বন্ধন ছিল, ধর্ম্মের দোহাই ছিল, তবু তাকে অবজ্ঞা করেছ। যে প্রেমের তুমি গর্ব্ব করেছ, দুটো চোখের সেই ভাললাগাও তুমি যে কোন মুহূর্ত্তে ছিন্ন করে ফেলতে পার—এ আশঙ্কা আমার হয়েছে। আমি চাই না তোমাদের অনুগ্রহ। আমি হতে চাই মুক্ত, স্বাধীন পথের পথিক। তোমাদের খোসামোদ করে হারাই ছাড়া লাভ কিছুই করি না। ছেড়ে দাও হাত! ছেড়ে দাও!"

ছেড়ে দিলুম।

"ওকি! রমলা, কাঁদছ? লেগেছে?"

"না, লাগে নি।"

"তবে কাঁদছ যে? ওঠ রমলা। এই হাত ধর।"

"না! তুমি চলে যাও, আমি থাকতে চাই মানুষ-মনের ছোঁয়াচের বাইরে। আমি কাঁদবো, কাঁদতে আমার খুব ভাল লাগে। কিন্তু—কিন্তু তোমার স্পর্শ কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না। সরে যাও, সরে যাও সুমুখ থেকে—তুমি নির্দ্দয়—নির্ম্মম—তুমি অবিশ্বাসী।

জ্যোতিষি

শ্রীহরিপদ ঠাকুর

কভু মোরা হাত দেখি, কভু করি কুষ্ঠী;
মরা-বাঁচা ব'লে দেই বিচারিয়া রাষ্টি।

অপরের পাশ-ফেল, গুনে গেথে ব'লে দেই;
ছেলেটা যে বি-এ, দিল, কি হবে তা জানা নেই।

কোন্ দিন কবে কার, জানি মোরা হবে কি;
শুধু মোরা নাহি জানি, নিজেদের দশাটী।

কার' কত পরমায়ু, বিধাতার মত কই;
এই দেহ বিলীনের দিন ক্ষণ জানা নেই।

করতল গুনে বলি, হর্ম্মোতে হবে বাস;
না জানি কোথায় রব মাথা গুঁজে বারমাস।

সকলেরে গুনে বলি, সুখে থাবে দুধ ভাত;
অন্নেরই তরে নিজে ভেবে মরি দিন রাত।

খণ্ডাতে গ্রহ-দোষ, ভোজপাতা লিখে দেই;
নিজেদের বরাতে যে, কুগ্রহ ছাড়া নেই।

স্রষ্টার তাই মোরা, জ্যোতিষের গুষ্ঠী;
সাইনবোর্ড সম্বলে শিখি পড়ি কুষ্ঠি।

নাট্যশালার ইতিহাস

ডাঃ শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ডি-লিট্

বাঙ্গালীর প্রথম বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চ

চৌরঙ্গী থিয়েটারই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালীর প্রাণে থিয়েটারের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া দেয়। সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ এবং বিখ্যাত সমালোচক হোরেস্ হিমেন উইলসন, ব্যারিষ্টার মিঃ হিউম, "ইংলিশম্যানের" সম্পাদক মিঃ ষ্টক কোয়েলার, পুলিশ কোর্টের জনৈক ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি অনেক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি চৌরঙ্গী থিয়েটারের অভিনেতা ছিলেন। তাঁহারা অনেক সময় পরিচিত বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগকে অভিনয় দেখিবার জন্য আমন্ত্রণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত অনেক ইউরোপীয় অধ্যাপক বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে ইংরেজী থিয়েটার দেখিবার জন্য উৎসাহ প্রদান করিতেন এবং থিয়েটারের প্রবেশপত্র সংগ্রহ করিয়া দিতেন। থিয়েটার দেখিতে ছাত্রদের উৎসাহদাতা এই সকল অধ্যাপকদিগের মধ্যে কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন এবং হারম্যান জেফ্রয় ছিলেন সকলের অগ্রণী। জেফ্রয় ছিলেন ফরাসী দেশবাসী। তিনি প্রথমে কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতেন, কিন্তু স্খলিত-চরিত্র বলিয়া বিবেচিত হওয়ায়, বিচারালয়ের দ্বার তাঁহার নিকট রুদ্ধ হইয়া পড়ে। ব্যারিষ্টারী পরিত্যাগ করিবার পর তাঁহার স্বভাব সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইয়াছিল। কিন্তু বিচারপতি স্যার এড্ওয়ার্ড রায়েনের বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি আর আদালতে প্রবেশ করেন নাই। কিছুদিন পর তিনি ওরিয়েন্টেল সেমিনারীতে শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করিয়া ছাত্রগণের নৈতিক ও মানসিক উন্নতি সাধনে বিশেষভাবে মনোযোগী হইয়াছিলেন। জেফ্রয়ের নাট্যানুরাগই ছাত্রগণকে তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ডিরোজিয়োর শিক্ষায় হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগকে জাতি ধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতে দেখিয়া অনেক অভিভাবক তাহাদিগকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই কলেজে তাহারা জেফ্রয়ের শিক্ষাগুণে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

রিচার্ডসন প্রথমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে সৈনিক-রূপে এদেশে আগমন করেন। ক্রমে তিনি লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের দেহরক্ষী নিযুক্ত হন। ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতা থাকার জন্য অতঃপর তিনি অধ্যাপকরূপে হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি বাঙ্গালার মনীষিগণ তাঁহার প্রিয় ছাত্র ছিলেন। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসুমহাশয় তাঁহার আত্মকাহিনীতে অধ্যাপক রিচার্ডসন সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "তাঁহাকে স্মরণ হইলে কি পর্য্যন্ত ভক্তি ও প্রেম উচ্ছ্বসিত হয় তাহা বলিতে পারি না, তাঁহার স্বভাব বিশুদ্ধ ছিল না, তথাপি ঐরূপ হয়।" রিচার্ডসন সাহেব ইংরেজী সাহিত্যে খুব ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং সেক্সপিয়র এমন সুন্দর আবৃত্তি করিতেন যে খুব কম অধ্যাপকই তেমন পারিতেন। লর্ড মেকলে তাঁহার আবৃত্তিতে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, "I can forget everything of India, but not of your reading Shakespeare." অর্থাৎ আমি ভারতের সমস্তই ভুলিতে পারি, কিন্তু আপনার আবৃত্তি ভুলিতে পারিব না।" কথিত আছে বিদ্যাসাগরমহাশয় যখন সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক, তাঁহার সহকর্ম্মী ৺জয়গোপাল তর্কালঙ্কারমহাশয় তখন জজপণ্ডিত। তিনি কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি আবৃত্তি করিতে করিতে এমন তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, ভাবাবেশে আসন পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িতেন এবং অভিনয়ের সুরে আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিতেন। তদীয় ছাত্র প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশমহাশয়ও পড়াইতে পড়াইতে তন্ময় হইয়া যাইতেন। তাঁহার সম্বন্ধে স্বর্গীয় পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যমহাশয় বলিয়াছেন, "তিনি 'কুমার সম্ভবে' যখন পড়িতেন,—

"ত্রিভাগশেষাসু নিশাসু চ ক্ষণং
নিমীল্য নেত্রে সহসা ব্যবুধ্যত
ক নীলকণ্ঠ ব্রজসীত্য লক্ষ্যবাক্
অসত্যকণ্ঠার্পিত বাহুবন্ধনা।"

তখনই আহা-হা করিয়া উঠিতেন, তাঁহার ভাব

লাগিয়া যাইত, আমাদেরও সেদিনকার মত পাঠ বন্ধ হইত।”

রিচার্ডসন সাহেবের দৃঢ় ধারণা ছিল নাট্যশালাই আবৃত্তি শিক্ষা করিবার পক্ষে প্রধান বিদ্যালয়। সেইজন্য ছাত্রদিগকে থিয়েটারে পাঠাইতে তাঁহার এত উৎসাহ ছিল যে, তাহাদিগকে টিকিট দিয়া সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেন, “আশা করি, আজ তোমরা থিয়েটার দেখিতে যাইবে।”

ডাঃ হোরেস্ হেমেন উইলসন সংস্কৃত খুব ভাল জানিতেন। তাঁহার কয়েকখানা খুব উৎকৃষ্ট সংস্কৃত পুস্তকও আছে। বিখ্যাত ইংরেজ অভিনেত্রী মিসেস্ সিডনস্‌এর দৌহিত্রীকে তিনি বিবাহ করেন। চৌরঙ্গী থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হইতেই তিনি উহার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

জেফ্রয়, রিচার্ডসন এবং উইলসনপ্রমুখ সাহেবগণের উৎসাহে বাঙ্গালী ছাত্রদিগের হৃদয়ে অভিনয়ের বাসনা উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছিল। ‘হিন্দু থিয়েটার’ এবং নবীনকৃষ্ণ বসুর বাড়ীতে ‘শ্যামবাজার থিয়েটার’ প্রতিষ্ঠায় এই বাসনা কতকাংশে চরিতার্থ হইয়াছিল। ডাঃ উইলসনের প্রেরণা না পাইলে হিন্দু থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। বাঙ্গালীদের থিয়েটার করিবার প্রচেষ্টার মূলে রিচার্ডসন সাহেবেরও যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তাঁহার কয়েকজন প্রিয় ছাত্রই এইদিকে পথপ্রদর্শক ছিলেন।

আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি তৎকালে যাত্রাগানের দিকে শিক্ষিত সমাজের আগ্রহ ক্রমেই কমিয়া আসিতেছিল। অথচ বাঙ্গালায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর আমোদ-প্রমোদের কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ইংরেজী থিয়েটার দেখিতে যাইতেন। তাহাদের সংখ্যা দিন দিনই বাড়িতেছিল। এই অবস্থায় বাঙ্গালা থিয়েটার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে জাগিতেছিল। সংবাদ-পত্রেও এ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। চারিদিক হইতেই প্রেরণা আসিয়া যখন শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রাণে বাঙ্গালা নাটক অভিনয় করিবার ইচ্ছা জাগ্রত করিয়া তুলিল, আর তখন তাঁহাদের এই আকাঙ্ক্ষাকে কার্য্যে পরিণত করিবার মত সম্ভ্রান্ত ধনশালী লোকেরও অভাব হইল না। এইদিকে সকলের প্রথম অগ্রসর হইয়াছিলেন কলিকাতার স্বনামধন্য ধনকুবের প্রসন্নকুমার ঠাকুরমহাশয়। বাঙ্গালায় শিক্ষা-বিস্তারের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যথেষ্ট অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালীজাতির উন্নতির জন্য কোন প্রচেষ্টাই তাঁহার সাহায্য এবং সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইত না। বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের প্রথম প্রচেষ্টাও তাঁহারই উদ্যোগে হইয়াছিল।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, হিন্দু থিয়েটারে সর্ব্বপ্রথম অভিনয় হয় ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর। ইহার তিনমাস পূর্ব্বে একটী থিয়েটার প্রতিষ্ঠা কল্পে প্রসন্নকুমার ঠাকুরমহাশয় এক সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সভায় তিনটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রথম প্রস্তাবে থিয়েটার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়। “হিন্দু থিয়েটার” প্রতিষ্ঠা করা হউক, ইহাই সভার দ্বিতীয় প্রস্তাব। তৃতীয় প্রস্তাবে থিয়েটার পরিচালনা করিবার জন্য বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, শ্রীকিষেণ সিংহ, কিষেণচন্দ্র দত্ত, গঙ্গাচরণ সেন, মাধবচন্দ্র মল্লিক, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী এবং হরচন্দ্র ঘোষ এই কয়েকজনকে লইয়া একটী ম্যানেজিং কমিটি গঠন করা হয়।

“হিন্দু থিয়েটার” অবৈতনিক নাট্য সম্প্রদায় ছিল। প্রথম অভিনয় রজনীতে ইংরেজীতে অনূদিত ভবভূতির উত্তর-রামচরিতের কতক অংশ এবং ‘জুলিয়াস সীজার’-এর পঞ্চম অঙ্ক অভিনীত হইয়াছিল। অভিনয়ের জন্য অধ্যাপক ডাঃ উইলসন উত্তর-রামচরিতের কতক অংশ অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন। শুঁড়োতে (বেলিয়াঘাটা, নারিকেলডাঙ্গা) প্রসন্নকুমার ঠাকুরমহাশয়ের বাগানবাড়ীতে এই অভিনয় হইয়াছিল। বহু সম্ভ্রান্ত ইংরেজ এবং বাঙ্গালী দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণও দর্শকের আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। সমগ্র নাট্যশালা দর্শকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অভিনয়ও খুবই ভাল হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই থিয়েটার দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারে নাই। হিন্দু এবং সংস্কৃত কলেজের গঙ্গাচরণ সেন, অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র এবং আরও অনেকে এই থিয়েটারে অবৈতনিক অভিনেতা ছিলেন।

অতঃপর ১৮৩২ সালের ২৯শে মার্চ্চ হিন্দু থিয়েটারে “নাথিং সুপারফ্লুয়াস” (Nothing superfluous) অভিনীত হয়।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রবর্ত্তিত অভিনয় বাঙ্গালা নাটকে হয় নাই। তাই এই প্রসঙ্গে কয়েকখানি বাঙ্গালা নাটক ও অভিনয় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

১৭৭৮ সালে 'চিত্রযজ্ঞ' নামে একখানি বিমিশ্র নাটক (a heterogeneous composition) মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্রের অনুজ্ঞায় পণ্ডিত বৈদ্যনাথ বাচস্পতি কর্ত্তৃক রচিত হয়। রাজবাটীতে ইহার অভিনয়ও হয়, তবে ইহাতে বাঙ্গালা কথা এত অল্প এবং সংস্কৃত এত বেশী থাকে যে, ইহাকে সংস্কৃত নাটক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

১৭৯৫ সালের 'ছদ্মবেশের' কথা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতঃপরে ১৮২১ সালে 'কলিরাজার যাত্রা' নামক একখানি প্রহসন অভিনীত হয়। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'দাদা' ও 'দিদির' এবং অমৃতলাল বসুমহাশয়ের 'খাসদখলের' কলিরাজার একটু পূর্ব্বগামী ছায়া ইহাতে পরিলক্ষিত হয়। ইহা যাত্রা নহে, জনৈক ফিরিঙ্গি যে চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন, সেই কথাই ইহাতে আছে।

"কামরূপ যাত্রা" এইরূপ আর একখানি নাটক।

ভবানীপুরের জগমোহন বসু উইলিয়ম ফ্রাঙ্কলিন রচিত "কামরূপ" নামক ইংরেজী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। এই বঙ্গানুবাদ হইতে তিনি আবার "কামরূপ যাত্রা" নামক একখানি প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। ১৮২২ সালের ৯ই মার্চ্চ শনিবার রাত্রে ভবানীপুরের শ্যামসুন্দর দাসের বাড়ীতে উহা অভিনীত হইয়াছিল।

১৮২২ খৃষ্টাব্দে রচিত আর একখানি প্রহসনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রহসনখানির নাম "হাস্যার্ণব।" এই পুস্তকখানির একখানি 'কপি'ও দেখিবার সুযোগ আমাদের হয় নাই। তবে যতটুকু জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে এইটুকু মাত্র বলিতে পারা যায় যে, প্রহসনখানির বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়া নির্ব্বোধ কিন্তু লোভী রাজা, দুরাকাঙ্ক্ষী মন্ত্রী, নির্ব্বোধ চিকিৎসক, কাপুরুষ সৈনিকের চরিত্র ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। বইখানা ক্ষুদ্র হইলেও হাস্যরসের প্রচুর উপাদান উহাতে আছে। কিন্তু অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট বলিয়া বইখানি তেমন সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। এই প্রহসনখানি সংস্কৃত বইএর অনুবাদ। জগদীশ নামক জনৈক কবি ইহা প্রস্তুত করেন।

'ধূর্ত্ত নর্ত্তক' ও এইরূপ আর একখানি প্রহসন।[1]

এই সমস্ত প্রহসন এত অশ্লীলভাবে অভিনীত হইত যে "সম্বাদ কৌমুদী পত্রিকা"[১] এই জাতীয় প্রহসনগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করে।

১৮২২ সালে সংস্কৃত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের অনুবাদ 'আত্মতত্ত্ব কৌমুদী' নাটক নামে প্রকাশিত হয়। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, গদাধর ন্যায়রত্ন এবং রামকিঙ্কর শিরোমণি ইহার অনুবাদ করেন। ইহা ষড়ঙ্কবিশিষ্ট নাটক ও মূল্য নির্দ্ধারিত হয় দুই রৌপ্য মুদ্রা।

"কৌতুক সর্ব্বস্ব নাটক" হাস্যার্ণব অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পুস্তক। অবশ্য এখানাও সংস্কৃত পুস্তকেরই অনুবাদ মাত্র। হরিনাভির রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার ১৮২৮ সালে "কলিবৎসরাজার উপাখ্যান" নাম দিয়া "কলিবৎসরাজী" নামক সংস্কৃত নাটকের বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন। কোন ধনী ব্যক্তির গৃহে অভিনীত হইবার জন্য পণ্ডিত গোপীনাথ চক্রবর্ত্তী উহাকে নাটকে পরিবর্ত্তিত করেন। এই নাটকের নামই "কৌতুকসর্ব্বস্ব নাটক"। যে সকল নৃপতি ব্রাহ্মণদিগকে ভরণ পোষণ করেন না, বিলাস ব্যসন এবং আলস্য জড়তায় দিন অতিবাহিত করেন তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া মূল সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। অনুবাদের ভাষা তেমন ভাল নয়, অনেক স্থলেই সাধু ভাষার সহিত গ্রাম্য ভাষা মিশ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থকার অবশ্য তাঁহার ভাষাকে সাধু ভাষা নামেই অভিহিত করিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভেই ত্রিপদীছন্দে গণেশের বন্দনা রচিত হইয়াছে। ভিতরেও পয়ার এবং ত্রিপদী ছন্দে রচিত অনেক কবিতা আছে। লেবেডেফ্ কর্ত্তৃক "ডিস্‌গাইজের"- অনুবাদকে অনেকে "বিদ্যাসুন্দর" বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন। এই প্রহসনখানিকেও ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কেহ কেহ "বিদ্যাসুন্দর" বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন।[২]

১ Asiatic Journal, Sept. 1822 quoting from Kaumudi writes, "Letter from a correspondent pointing out the immoral and evil tendencies of dramas or plays recently invented and performed by a number of young men and recommending their suppression."

২ বিস্তারিত বিবরণ মৎপ্রণীত Indian Stage, Vol. II-এর ১২ পৃষ্ঠায় পাইবেন।

"কৌতুক সর্ব্বস্ব নাটক" রচিত হওয়ার পর শ্যামবাজারে নবীনকৃষ্ণ বসুর বাড়ীতে "বিদ্যাসুন্দর" অভিনীত হয়। অনুমান ১৮৩১-৩২ সালে প্রথমাভিনয় হয়। এই অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ আমরা প্রথম খণ্ডে প্রদান করিয়াছি। ইহার অভিনয় সম্বন্ধে ঠিক তারিখ জানা যায় নাই। 'হিন্দু পায়নিয়র' ১৮৩৫-এর অক্টোবর মাসে বলিয়াছেন যে, 'দুই বৎসর পূর্ব্বে এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠা হয়।' মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধিমহাশয় লিখিয়াছেন যে, গৌরদাস বসাকমহাশয়ের পিতা রাজকৃষ্ণ বসাক ২৮ বৎসর বয়সে অভিনয় দেখিয়াছিলেন তাঁহার জন্ম হয় ১৮০৩ সালে অর্থাৎ ১৭২৫ শকে। সুতরাং এই হিসাবে অভিনয়ের তারিখ হয় ১৮৩১ সাল। আমাদের মনে হয় ১৮৩২ সালেই এই থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয়।

রামতারক ভট্টাচার্য্যমহাশয় মহাকবি কালিদাস রচিত "শকুন্তলা" নাটক বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

নীলমণি পাল নামক জনৈক ব্যক্তিও কাশ্মীরের রাজা হর্ষ-বর্দ্ধন রচিত "রত্নাবলী" নাটকের অনুবাদ করেন।

শ্যামপুকুরের বাবু পঞ্চানন ব্যানার্জ্জি "প্রেম নাটক" এবং "রমণী নাটক" নামক দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই বই দুইখানির নাম নাটক হইলেও ইহারা নাটক নহে—কাব্যগ্রন্থ। কাব্য দুইখানি পয়ার এবং ত্রিপদী ছন্দে রচিত। ইহাতে কোন নাটকীয় চরিত্র বা কথাবার্ত্তা নাই, আদিরস আছে যথেষ্ট পরিমাণে। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে "রমণী নাটক" এবং ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে "প্রেম নাটক" মুদ্রিত হয়। উভয় নাটকের ভাষা জঘন্য এবং অশ্লীল। 'প্রেম নাটকে'র শেষ কবিতা—

"অতএব মন দিয়া শুন বন্ধুগণ।
নারীর সহিত প্রেম করো না কখন।
কহিলাম সার কথা কর প্রণিধান।
প্রেম নাটক গ্রন্থ হইল সমাধান।"

জি, সি, গুপ্ত "কীর্ত্তিবিলাস" নামক ৭০ পৃষ্ঠার একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। কীর্ত্তিবিলাস নামক জনৈক রাজপুত্র বিমাতার দুর্ব্ব্যবহারে আত্মহত্যা করেন, ইহাই এই নাটকের বিষয়বস্তু। রেভারেণ্ড লঙ্ বলেন, "এই নাটকে গ্রন্থকারের রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।"

কীর্ত্তিবিলাস নাটকের আখ্যানবস্তু ভাল। হেমপুরাধিপতি মহারাজা চন্দ্রকান্ত পত্নী বিয়োগান্তে বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিয়া যুবরাজ কীর্ত্তিবিলাসের উপর বিরূপ হন। বিমাতা "বর্ণচন্দ্র" নাটকের লুনার মত রাজার নিকট মিথ্যা অভিযোগ করে যে, যুবরাজ তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রেমবার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়াছে। ক্রুদ্ধ রাজা যুবরাজের প্রাণনাশের আদেশ দেন।

নাটকখানি করুণরসাত্মক। 'ট্রেজিডি'র ইহাতেই প্রথম অঙ্কুর। রাজা এবং কীর্ত্তিবিলাসের মৃত্যু প্রদর্শিত হইয়াছে। কীর্ত্তিবিলাস ধর্ম্মপরায়ণ ছিল, তাহার বন্ধু মেঘনাথও সদুপদেশে তাহার প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই।

নাটকে বিন্দুমাত্র অশ্লীলতা নাই। রাজপাত্র প্রাণনাথের মৃত্যু হইয়াছিল পাপকার্য্যে ... ইঙ্গিতেও রাণীর সহিত প্রণয়ের আ... নাই।

এই নাটকে অনেক তত্ত্বকথার ইঙ্গিত আছে, যেমন, 'সুখের কারণ অসুখ এবং অসুখের কারণ সুখ'। 'মৃত্যু না থাকিলে জীবনের আদর কেহই জানিত না।' 'আত্মার ধ্বংস ধূলাময় সবারই সমান।' 'অঙ্গার শতধৌতেন মলিনত্ব ন মুঞ্চতি' এবং

'প্রতিবিম্ব সমান ধন-যৌবন-মান।'

গ্রন্থে কিছু কিছু পয়ার কবিতা আছে বটে, কিন্তু অমিত্রাক্ষরের মত তাহা পড়া যায়। নাটকখানি পঞ্চাঙ্ক। প্রথম অঙ্কে দুই অভিনয় (দৃশ্য), দ্বিতীয় অঙ্কে ৪টী দৃশ্য (অভিনয়), তৃতীয় অঙ্কে দুইটী, চতুর্থ অঙ্কে ৪ টী এবং পঞ্চম অঙ্কে পাঁচটী দৃশ্য আছে। নাটকে নান্দী আছে, সূত্রধার ও নটীর কথাও আছে। নান্দিটী বড় সুন্দর—

তাঁরে ভজ মন, করেন যে জন, সতত সৃজন পালন লয়
ত্রিলোক কারণ, ত্রিলোক ধারণ, অনাদি নিধন করুণাময়।

ভাষায় নাগরী প্রভাব খুব আছে। মেঘনাথ বলিতেছে—এই ক্ষণ ভঙ্গুর অকিঞ্চিৎকর সংসার মত্ততায় যথার্থ আত্মবিস্মৃত হইয়া মিথ্যা কালহরণ করিতেছি…

রাজপুত্র বলিতেছে, "ইহারা এই অন্ধকারময় রজনীকে দিবসের ন্যায় দাপামানি করিবার মানস করিয়াছে। দিবাকর প্রজ্জ্বলিত কিরণে পরিতুষ্ট নহে।"

"লম্পট ভ্রষ্ট ব্যক্তিরা বারাঙ্গনালয়ে গমন করিয়া আমোদ-প্রমোদে মত্ত আছে।"

"জগদীশ্বর, যেমন তৃষ্ণাযুক্ত কুরঙ্গ বারি আকাঙ্ক্ষায় ব্যগ্র

হইয়া নদীতীরে ধাবমান হয়, আমার প্রাণ তেমনি তোমার করুণাসাগরে গমন কারণে অস্থির হইয়াছে।"

নাটকের ভাষা পণ্ডিতের ভাষা, ইহাতে কথোপকথনের চলিত ভাষা মোটেই নাই। নাটক ক্ষুদ্র এবং প্রাথমিক, তাই বিষয় ভাল হইলেও কোন ঘাত প্রতিঘাত নাই। কিন্তু প্রথম হইলেও উহা মোটেই কাঁচা নহে।

লঙ্ সাহেব যে বলিয়াছেন—যমুনায় আত্মহত্যা করিয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ নাই।

এই নাটকখানি ভদ্রার্জ্জুনেরও পূর্ব্বে রচিত, কারণ ১৮৫২, ২৮ মে তারিখের প্রভাকরে ইহার উল্লেখ আছে। সুতরাং এইখানিই আদি মৌলিক নাটক। এতদিন ভদ্রার্জ্জুন সম্বন্ধে যে আদিমত্ব আরোপিত হইত, এই নাটকের আবিষ্কারে তাহার লোপ পাইল।

বাঙ্গালার প্রথম আদি নাটক "কীর্ত্তিবিলাস।" আর মৌলিক এবং করুণরসাত্মক (ট্রাজিডি)। এই নাটকে যাত্রার সম্বন্ধেও উল্লেখ আছে, "অনেকেই অবগত আছেন যে বঙ্গদেশে যাত্রা নামে একপ্রকার অভিনয় সাধারণ জনগণের মনোনীত হইয়াছে, বাস্তবিক ইহা মন্দ নহে। কিন্তু বঙ্গদেশীয় প্রচলিত ব্যবহার দ্বারা এই অভিনয় ক্রমশঃ অপকৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাহার হেতু এই, যাত্রার গীত ও পয়ার রচকেরা অধিকাংশ সামান্য অজ্ঞ ব্যক্তি, সুতরাং সমস্ত বিরস হইয়া উঠে। যদি সাধারণের উৎসাহে পণ্ডিত লোকেরা সমস্ত রচনা করে তবে উৎকৃষ্টতা জন্মে তাহার সন্দেহ কি?"

গ্রন্থকার যোগেন্দ্র গুপ্ত মহাশয়কে আমরা সসম্মানে অভিনন্দিত করিতেছি।

"বোধেন্দুবিকাশ" নামক একখানা নাট্য-গ্রন্থ আছে। এই বইখানিকেও নাটক বলিয়া ধরা যাইতে পারে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেও ইহার একখণ্ড রক্ষিত আছে। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এবং নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের সাহিত্য-গুরু প্রসিদ্ধকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই নাটকখানি রচনা করেন। ১২৬০ বঙ্গাব্দে প্রভাকর পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হয়; গুপ্ত কবির মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা রামচন্দ্র ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রভাকর পত্রিকায় প্রকাশিত অংশ হইতে প্রথমখণ্ড পুস্তাকাকারে মুদ্রিত করেন। কিন্তু পরবর্ত্তী অংশটুকু আর প্রকাশিত হয় নাই। বইখানি সংস্কৃত নাটকের পদ্ধতি অনুসারে এবং প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অনুকরণে রচিত। মদন, রতি, বিবেক প্রভৃতি ইহার নাটকীয় চরিত্র।

"বোধেন্দুবিকাশ" নাটকে দৃশ্য আছে অনেকগুলি। কিন্তু কথাবার্ত্তাগুলি তেমন চিত্তাকর্ষক নয়। তবে গানগুলি সংযোজিত হইয়াছিল ভাল। এই নাটকখানি অভিনয় করিবার জন্য খুব উৎসাহের সহিত রিহার্সেল চলিয়াছিল, টাকাও অনেক খরচ হইয়াছিল। কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই, কেবল কতকগুলি বিষ্ণুবিষয়ক সঙ্গীত প্রচারিত হইয়াছিল মাত্র। শিক্ষিত সমাজের পছন্দ মত হয় নাই বলিয়াই উহা অভিনয় করিবার কল্পনা পরিত্যক্ত হয়।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তমহাশয় আরও একখানি নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। উহার নাম "কলি"। এই নাটকখানি তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

চব্বিশ পরগণা জেলার হরিনাভি নিবাসী পণ্ডিত রাম-নারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত "কুলীনকুল সর্ব্বস্ব"ই খাঁটি বাঙ্গালা নাটক রচনার প্রথম প্রচেষ্টা। এই নাটক রচনার মূলে খুব সুন্দর একখানি ইতিহাস আছে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে রঙ্গপুরের জমিদার বাবু কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী বল্লাল সেন প্রবর্ত্তিত কৌলিন্য প্রথার কুফল সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট নাটকের জন্য ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার প্রদান করিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের (খর্ব্বাকৃতির জন্য ইনি গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য নামেই পরিচিত ছিলেন) ভাস্কর পত্রিকায় এবং রঙ্গপুর জেলার প্রথম বেসরকারী সংবাদপত্র "রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ" পত্রিকায় পুরস্কারের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময় সামাজিক কুপ্রথা এবং দুর্নীতিগুলির শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। এই সকল কুপ্রথা ও দুর্নীতিগুলিকে দূরীভূত করিবার আকাঙ্খাও তাহাদের প্রাণে জাগ্রত হইয়াছিল। এই কু-প্রথাগুলির মধ্যে কৌলিন্য প্রথাও অন্যতম। একজন কুলীন একসঙ্গে পঞ্চাশ, ষাট এমন কি একশত পর্য্যন্ত বিবাহ করিত। দশ বৎসরের শিশু হইতে ষাট বৎসরের বৃদ্ধা পাত্রীর পর্য্যন্ত বিবাহ হইত; একই ব্যক্তির সঙ্গে একই বিবাহের সভায় এবং এক লগ্নে। বর প্রত্যেক পাত্রীর পিতার নিকট হইতে পণ গ্রহণ করিতেন, কিন্তু জীবনে দ্বিতীয়বার আর স্ত্রীর

সহিত বড় সাক্ষাৎ ঘটিত না। এই কুপ্রথা নিবারণকল্পেই "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" নাটক রচিত হয়।

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে রামচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বন করিয়া "মহানাটক" নামক একখানি নাটক রচনা করেন। রাজা কালীকৃষ্ণ নাটকখানি ইংরেজীতে অনুবাদ করাইয়াছিলেন।

"ভানুমতি চিত্তবিলাস" নামক নাটক ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে রচিত হয় ও ১৮৫৩ সালে প্রকাশিত হয়।১ এই নাটকখানি সেকস্‌পিয়রের "মার্চেন্ট অব ভেনিসে"র অনুবাদ ছাড়া আর কিছুই নহে। হুগলী জেলার বাবুগঞ্জ নিবাসী বাবু হরচন্দ্র ঘোষ এই অনুবাদ করেন। "মার্চেন্ট অব ভেনিসে"র অবিকল বঙ্গানুবাদ তিনি করেন নাই। নাটকখানিকে ভারতীয় ছাঁচে ঢালিয়া এবং পাত্র-পাত্রীদিগকে ভারতীয় নাম প্রদান করিয়া উহার অনুবাদ করেন। ভারতীয় সাজসজ্জায় সজ্জিত সেকস্‌পিয়রের নাটক যে এক অভিনব জিনিষ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই নাটকখানি যে অভিনীত হইয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই পুস্তকের একখণ্ড ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। বাবু হরচন্দ্র ঘোষ তাঁহার জনৈক ইউরোপীয় বন্ধুর উপদেশে মার্চেন্ট অব ভেনিসের এই অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি যে সময়ে পাশ্চাত্য গল্পকে ভারতীয় আকার প্রদান করিয়া বাঙ্গালার অনুবাদ করিয়াছিলেন সে সময়ে সংস্কৃত নাটকের প্রতি লোকের যথেষ্ট আকর্ষণ বর্ত্তমান। তথাপি নাটকখানি এত অধিক সমাদৃত হইয়াছিল যে, তিনি তাঁহার রচিত পুস্তকের সমাদরে উৎসাহিত হইয়া আর একখানি নাটকও (কৌরব-বিজয়) প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

ভানুমতি পোর্সিয়ার ও চিত্তবিলাস বেসেনিওর বাঙ্গালা প্রতিরূপ এবং নাটকীয় ঘটনার স্থান উজ্জয়িনী হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত। সুলোচনা এবং সুশীলা এই দুইজন ভানুমতির পরিচারিকা। নাটকের প্রারম্ভে রীতিমত মঙ্গলাচরণ এবং সরস্বতী বন্দনা আছে। রাজপরিষদদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বসন্ত-উৎসব সম্বন্ধেও একটী কবিতা রচিত হইয়াছে।

"ভানুমতি চিত্তবিলাস" রচিত হইবার সমসময়ে ১৮৫২ সালে তারাচরণ শিকদার "ভদ্রার্জ্জুন" নাটক রচনা করেন। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুভদ্রা হরণ এই নাটকের আখ্যান বস্তু। কীর্ত্তিবিলাসের পর ইহাই প্রথম এবং মৌলিক বাঙ্গালা নাটক। কিন্তু এক বিষয়ে ইহা সকলের অগ্রবর্ত্তী। তারাচরণ 'ভদ্রার্জ্জুন' রচনায় নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার পরবর্ত্তী নাট্যকারগণও তাঁহার প্রদর্শিত পথই অনুসরণ করিয়াছিল। সংস্কৃত নাটক রচনা পদ্ধতির প্রস্তাবনা ও পরিশিষ্ট তিনি বর্জ্জন করিয়াছেন। সূত্রধর বা নান্দীও উহাতে নাই। কোন বিদূষক চরিত্রও ভদ্রার্জ্জুন নাটকে নাই। মৃতভাষা সংস্কৃতের নাটক রচনা পদ্ধতি বাঙ্গালা নাটকের অগ্রগতির পথে যে বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই বাধামুক্ত করিয়া ইউরোপীয় নাটকের আদর্শ গ্রহণে বাঙ্গালার নাটক রচনার ইতিহাসে যে নূতন যুগের আবির্ভাব হয়, তাহার আভাষ দিতে তারাচরণই বাঙ্গালার প্রথম নাট্যকার। কিন্তু গদ্য এবং পদ্য দুই-ই নাটকে স্থান পাইয়াছে। নাটকের এক-তৃতীয়াংশ পয়ার ও ত্রিপদী কবিতায় পূর্ণ। তাই ইহাও পূর্ণাঙ্গ নাটক নয়। ইংরেজী নাটকের Prologueএর ন্যায় "ভদ্রার্জ্জুন" নাটকে একটি আভাস সংযুক্ত হইয়াছে। তাহাতে নাটক এবং নাট্যকলার প্রশংসা করিয়া নাট্যকার লিখিয়াছেন—

"সকল কাব্যের মধ্যে নাটক প্রধান।
সর্ব্বস্থলে নাটকের আদর সমান॥"

এইরূপে নাট্যকলার প্রশংসা করিয়া তিনি নাটকের উপাখ্যানটি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আভাসের পরেই প্রকৃত প্রস্তাবে নাটক আরম্ভ হইয়াছে।

ভদ্রার্জ্জুন নাটকের ভাষা খুবই সাধারণ। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের বৈচিত্র্যও ইহাতে নাই। বলদেবের অভিমান, ভীমের ক্রোধ এবং নারদের কলহপরায়ণতা প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্রৌপদী-চরিত্র আদৌ ফুটে নাই। সত্যভামা এবং রুক্মিনীর মধ্যে কোন স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয় না। কথাবার্ত্তাগুলি গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট হইলেও অতি সরল আর ভাষায়ও সাগরী ভাষার কোন ছাপ নাই।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রেমদাস (বি, এ,) "চৈতন্য চন্দ্রোদয়" নাটক বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করেন। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের জীবন-ইতিহাস লইয়াই এই নাটক রচিত। তাঁহার প্রচারিত মতবাদের পরিচয়ও আমরা এই নাটকখানি হইতে পাইয়া থাকি।

১ হরচন্দ্র ঘোষ অনেক স্থানে বলিয়াছেন যে, ১৮৫২তে প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু প্রভাকরের ১২৬০এর পৌষ বিবরণীতে এই গ্রন্থের প্রকাশ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। ইহাতে লিখিত আছে—"মালদহের আবগারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হরচন্দ্র ঘোষ ইংরেজী নাটকের রীত্যানুসারে বঙ্গভাষায় 'ভানুমতি চিত্তবিলাস' নামক অভিনব নাটক প্রকাশ করেন'।"

আমরা যে মৃত্তিকার অমর সন্তান

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট্-ল

একদিন সমুদ্রমন্থনে,
শুভক্ষণে,
করপদ্মে ধরি' কম্প্র সুবর্ণ মঞ্জরী
উষার রক্তিমচ্ছটা সেইক্ষণে দিয়েছিল ভরি'
হেমন্তের আনন্দের মধুর উন্মেষ!
তারি সুদূরেশ,
ধরিত্রীর শ্যামাঞ্চলে উঠিছে উদ্ভাসি'
কভু স্বর্ণ শস্যক্ষেত্রে হাসি
বৎসরের ধ্যানের স্বপনে,
তপঃকৃচ্ছ সর্ব্বহারা কৃষির অঙ্গনে।

আটি আটি ধান,
সোনার তরীতে অধিষ্ঠান,
তারি কলগান—
গোষ্ঠ পথে কণ্ঠে কণ্ঠে কূলে কূলে জলের উচ্ছ্বাসে;
যুগান্তের পার হ'তে অনাদি স্রোতের তীরে আসে
গ্রামান্তের কূলে।
অঞ্চলে ঘিরিয়া কণ্ঠ ভক্তিনম্র বধূটির তুলসীর মূলে,
দিনান্তে প্রণাম।
সেথা পূর্ণ তৃপ্তি হেরিলাম—
মূর্ত্তিমতী।
গৃহদেবতার পদে নিবেদিতা কুললক্ষ্মী সতী।

গৃহে গৃহে সুবর্ণ শস্যের সমারোহ
সর্ব্ব দ্বন্দ্ব অবসাদ মোহ
মুহূর্ত্তে লভিল অবসান।
অঙ্গনে অঙ্গনে পক্কধান
গৃহস্থ গোধন ল'য়ে প্রত্যুষে তুলিছে কলতান।
গোবৎসের হাম্বারব সনে
মধুর আনন্দগীতি উঠিয়াছে গগনে পবনে

ধান্য প্রস্তুতের আড়ম্বরে
কৃষকের ঘরে
উঠিয়াছে কর্ম্মরত পরিচিত সুর,
শিশুর কণ্ঠের সাথে মিশি' তারে করিছে মধুর।

ঘুরে ঘুরে বৃষগুণ ধায়,
নিপীড়িয়া শস্যরাজি কনকধান্যেরে পায় পায়।
দলিয়া পিষিয়া দলে দলে,
আঘাতে আনন্দে হর্ষে শস্য খ'সে পড়ে পদতলে,
পত্র হ'তে মৃত্তিকার পরে;
প্রভাতী তারার সাথে সুরে সুরে যেন তারা পড়ে ঝরে ঝরে।

বর্ষে বর্ষে এই মত আমার আঙিনাতলে করি আয়োজন,
হে দেবি, প্রসন্না হও, হে চঞ্চলা এই নিবেদন:
তুমি অন্ন দিও জনে।
শত দুঃখবেদনায় যাহা আনি শ্রমলব্ধ ধনে,
তা হ'তে করো না বিড়ম্বিত
ধন ধান্যে করো পীপাম্বিত।
আমার ভাগ্যের মন্দ দুর্গত কাহিনী
বলিতে চাহি নি,
শুধু কহি, আমারে ক'রো না অন্নহারা।
শ্রমলব্ধ ফল হতে ধরনীতে বঞ্চিত যাহারা
তাহাদের অভিশাপে,
ভাগ্যহত পৃথ্বী বুঝি কাঁপে।
বুঝি বা প্রলয় এল বাহ্নশিখা জ্বালি
বুঝি ক্রুদ্ধা শঙ্করী করালী?
আমার ন্যায়ের অধিকারে
বঞ্চিত করিবে যেবা, তারে—
বঞ্চিত করিবে ভগবান্;
আমরা যে মৃত্তিকার অমর সন্তান।



বিজ্ঞান জগৎ

সংবাদবাহক পারাবত (Pigeon-postman)

অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র, বি-এস-সি (লণ্ডন)

পশু পক্ষী বুদ্ধিতে ও বিচারশক্তিতে মানুষ অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট। তবে অনেক বিষয়ে তাদের বুদ্ধির এমন পরিচয় পাওয়া যায় যে, আশ্চর্যবোধ হয়। প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণ নানারূপ পরীক্ষা দ্বারা পশু পক্ষীর বুদ্ধির ও মানুষের বুদ্ধির তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। সাধারণতঃ তাঁহাদের মতে মানুষই বিচারশক্তির অধিকারী,—পশুপক্ষীর ভিতর যাহা বিচারশক্তি বলিয়া মনে হয় তাহা মূলতঃ স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তি (instinct); তবে মানুষ অনেক সময় পশু পক্ষীর এই প্রবৃত্তিকে নানাভাবে খাটাইয়া নিজের কাজে লাগাইতে সক্ষম হয়। পশুপক্ষী স্বাভাবিক অবস্থায় প্রবৃত্তির বশ, মানুষ পশুপক্ষীকে পোষ মানাইয়া নানাপ্রকার উপায়ে তাহাদের নানা কাজ করিতে শেখায়। যেমন বুনো ময়না বা কাকাতুয়াকে ধরিয়া তাহাকে পড়ান শিখাইলে তাহারা মানুষেরই মত শেখান বুলি বলিতে পারে, তেমন অন্যান্য পশুপক্ষীকে যদি নানাপ্রকার কার্য্য করিতে শেখান যায় তাহারাও সেগুলি মানুষের মত করিতে শেখে, তখন মনে হয় তাহারা বুঝি বিচারশক্তির প্রভাবেই কাজগুলি করে। বস্তুতঃ উহা বিচারশক্তি নহে, কেবল শিক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা পরিচালিত স্বতঃপ্রবৃত্তি (natural instinct)। যুদ্ধে সংবাদ সরবরাহকার্য্যে পারাবতের ব্যবহার ইহার একটী চমৎকার উদাহরণ।

আজকাল বেতারের খুব প্রচলন হয়েছে—ফলে যুদ্ধক্ষেত্রের এক প্রান্ত হইতে অন্যেক প্রান্তে খবর আদান প্রদান কার্য্যে খুব বেশী অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু বেতারের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে সংবাদ প্রেরণের অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হয়। বেতারের একটী অসুবিধা যে একটু চেষ্টা করিলেই যে কেহ বেতার প্রেরিত সংবাদ ধরিতে পারে। যাহাদের all wave radio set আছে, তারা জানে যে সাতসমুদ্র তেরোনদীর পারে কোথায় কে গান গাহিতেছে বা বক্তৃতা করিতেছে তাহা একটা বোতাম ঘোরালেই radio setএ ধরা সম্ভব হয়। যে wave-lengthএ সংবাদ বা গান প্রেরিত হইতেছে, ঠিক সেই wave lengthএর সঙ্গে radio setটী খাপ খাওয়াইয়া নিতে পারিলেই দূরের প্রেরিত বার্ত্তা setএ ধরা পড়ে। যুদ্ধক্ষেত্রে যে সংবাদ প্রেরিত হয়, সে সংবাদ অনেক সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, শত্রুর হাতে যাহাতে তাহা না পড়ে সে জন্য বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। এই জন্য বেতারের সাহায্যে সংবাদ হাওয়ায় ছড়াইয়া দেওয়াটা অনেক ক্ষেত্রে বিপজ্জনক। তাহা ছাড়া রেডিওর কলকব্জার অনেক সময় গোলমাল হইতে পারে, সে সময় জরুরি সংবাদ প্রেরণের প্রয়োজন হইলে অন্য উপায় অবলম্বন করার দরকার উপস্থিত হয়। যুদ্ধের সময় বাহিনীর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া থাকে। শত্রুর সহিত মুখোমুখি যুদ্ধের স্থানকে ফ্রন্ট (front) বলে—ফ্রন্ট হইতে হেড্‌কোয়ার্টার অনেক পিছনে থাকে। হেড্‌কোয়ার্টারে বাহিনীর পরিচালকগণ থাকিয়া নির্দ্দেশ দেন কোথায় কাহাকে কি ভাবে কাজ করিতে হইবে। ফ্রন্টের সহিত হেড্‌কোয়ার্টারের সব সময় সংবাদ আদান প্রদান চলে। স্থল যুদ্ধে



উড্ডীয়মান এরোপ্লেন হইতে সংবাদবাহক পারাবত ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে

যেখানে বেতারের ব্যবহার চলে না সেখানে মোটরসাইকেলে দূত (messenger) সংবাদ প্রেরণকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আজকাল এরোপ্লেনের চলন হওয়ায় আকাশযুদ্ধই বেশী গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক সময় এরোপ্লেন সমুদ্রের উপর টহলদারী করিতে করিতে শত্রুর সন্ধান পাইলে হেড্‌কোয়ার্টারে খবর পাঠায় উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য। এ ক্ষেত্রে বেতারের পরিবর্ত্তে মোটরসাইকেলে খবর পাঠান চলে না।

পারাবতের ব্যবহার এ সব স্থলে অত্যন্ত সুবিধাজনক। তাহা ছাড়া পারাবত ঘণ্টায় প্রায় ৫০ মাইল উড়িতে পারে এবং একসঙ্গে তিন চার ঘণ্টা বিনা বিশ্রামে উড়িতে সক্ষম হয়। যুদ্ধক্ষেত্রের বোমাপড়া ও গোলাগুলির মধ্য দিয়া মোটরসাইকেলে এই গতিতে ছোটা সকল সময় সম্ভবপর নয়। মোটরসাইকেলে সংবাদ প্রেরণের তুলনায় পারাবতের সাহায্যে সংবাদ প্রেরণ অধিক শীঘ্র সংঘটিত হইয়া থাকে, বিশেষতঃ যেখানে দূরত্ব এবং যাতায়াতের অসুবিধা খুবই বেশী। এই সব কারণে বর্ত্তমান যুদ্ধে পারাবতের ব্যবহার খুবই বেশী হইতেছে।

কি ভাবে পারাবতের সাহায্যে সংবাদ প্রেরণ চলে তাহার সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা খুব অল্প। অনেকেই জানেন না যে, এই কার্য্যে হাজার হাজার পারাবত দিনরাত লাগিয়া আছে। প্রত্যেক দেশেই বে-সামরিক অনেক লোকেরই পারাবত পোষার সখ আছে, তাহাদের বাড়ীর ছাতের উপর পারাবতের থাকিবার খোপ আছে। পারাবতের ঝাঁক আকাশে



এরোপ্লেনের ভিতর পারাবতের খাঁচা তুলিয়া দেওয়া হইতেছে

উড়াইয়া দিলে কিছুক্ষণ পরে তাহারা নিজ নিজ খোপে ফিরিয়া আসে, এ দৃশ্য সকলেরই কাছে খুবই সাধারণ। কিন্তু এই খোপগুলি এবং এই বে-সামরিক সখের পারাবতগুলিই যে যুদ্ধের কাজে লাগিতেছে এ ধারণা অনেকেরই নাই। যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি যে যে বাড়ীতে পারাবত পোষা হইত, সেই সেই বাড়ীর খোপগুলি যুদ্ধের সংবাদের গ্রহণস্থান (receiving station) রূপে ব্যবহৃত হয়। পারাবতগুলিকে খাঁচায় পুরিয়া হয় মোটর সাইকেলের সাহায্যে নয় এরোপ্লেনের সাহায্যে যুদ্ধের সীমান্তে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপে খাঁচাভর্ত্তি পারাবত সপ্তাহে বহুবার প্রেরিত হয় যুদ্ধের বিভিন্ন অংশে। সেখানে তাহাদের পায়ে একটা হাল্কা ছোট cylindrical কৌটা বাঁধিয়া দেওয়া হয়, সেই কৌটার ভিতর সংবাদ লেখা কাগজ পোরা থাকে। কৌটাটা হাল্কা হওয়ায় পারাবতের উড়িবার পক্ষে কোনওরূপ অসুবিধা হয় না। যেখান থেকে সংবাদ প্রেরিত হইতেছে, সেখানে পারাবতকে আকাশে উড়াইয়া দেওয়া হয় পায়ে সংবাদের কৌটা-শুদ্ধ। পারাবত উড়িতে উড়িতে যেখানে তাহার নিজের খোপ আছে, পথ চিনিয়া ঠিক সেইখানে ফিরিয়া আসে। অনেক সময় শত শত মাইল পথ তাহাদের উড়িয়া আসিতে এবং গন্তব্য স্থলে ঠিকমত পৌঁছাইতে দেখা গিয়াছে। নিজের বাসা উহারা এমন চেনে যে যেখানেই উহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হউক না কেন, সে বাসায় ফিরিয়া আসিবে। অনেক সময় পথভ্রম হইলে তাহাদের পৌঁছাইতে দেরী হয় বটে, কিন্তু নিজের খোপে উহারা আসিবেই। অবশ্য পথে দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে, কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, গন্তব্য স্থানে ফেরায় অসমর্থ হওয়ার সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। যে খোপে ফিরিবার কথা, সে খোপের দরজায় একটী ইলেট্রিক বেল থাকে। পারাবত খোপে পা দিলেই ঘণ্টাটি বাজিয়া উঠে। খোপের নিকটে কোনও ঘরে সঙ্কেতপ্রদানকারী অফিসার (signaller) সব সময় হাজির থাকে—খোপের ঘণ্টা শুনিলেই, তাহার কাজ পারাবতটীর নিকট গিয়া তাহার পায়ের কৌটাটি খুলিয়া ফেলা এবং তাহার ভিতর যে সংবাদ আছে তাহা গ্রহণ করা। এই সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে মোটরসাইকেলযোগে যথাস্থানে প্রেরিত হয়। এইরূপ ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটে যে যে বাড়ীতে পারাবতের খোপ আছে, তাহা যুদ্ধের সংবাদ গ্রহণের কাজে ব্যবহৃত হইতেছে। গৃহস্বামী অবশ্য এই জন্য কিছু কিছু পারিশ্রমিক পান—ইংলণ্ডে পারাবত সংবাদ আনিলে প্রতিবারে গৃহস্বামী দু' পেনি (প্রায় দু' আনার সমান) পান। সকল পারাবত এ কার্য্যে সক্ষম হয় না। যে সকল পারাবতকে পূর্ব্ব হইতে শেখান হইয়াছে দূর হইতে নিজের খোপ চিনিয়া ফিরিয়া আসায়, সেই সকল পারাবতই এই কার্য্য করিতে পারে—ইহাদের homing pigeon বা carrier pigeon বলে। অনেক সময় পারাবতকে এমন শেখান সম্ভব হয় যে খোপটী কোনও একটী মোটরগাড়ীর চালে করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া গেলেও, দূর হইতে আগত পারাবত সেই খোপটী ঠিকমত চিনিয়া লয় এবং যথাস্থানে পৌঁছিতে সক্ষম হয়। নিজের বাসা বা খোপটীই পারাবতের লক্ষ্য বস্তু—সেটি যেখানে থাকিবে সেখানেই উহা ফিরিয়া আসিবে। পথের দুর্ঘটনায় অনেক সময় পারাবত ফিরিতে পারে না। শত্রুর খরদৃষ্টিতে পড়িলে গুলির আঘাতে অনেকে জখম হয়। তাহা ছাড়া পারাবতের অনেক শত্রুজাতীয় পক্ষী আছে যেমন শ্যেন পক্ষী—উড়িবার সময় এইরূপ শত্রুর কবল এড়াইয়া যাওয়া অনেকক্ষেত্রে দুষ্কর। অনেক পারাবত পথশ্রমে এরূপ ক্লান্ত হইয়া পড়ে যে, গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই অন্য স্থানে নামিতে বাধ্য হয় এবং শত্রুর হাতে ধরা পড়ে। এই সকল দুর্ঘটনার কথা ছাড়িয়া দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পারাবত নিজ নিজ খোপে ঠিকমত ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হয়।

বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া পারাবতের এই ক্ষমতার আলোচনা উঠা খুবই স্বাভাবিক। এই ক্ষমতার মধ্যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কতটুকু এবং বিচার-শক্তি কতটুকু এ সমাধানের চেষ্টা বহুকাল হইতেই হইয়া আসিতেছে। প্রথমতঃ এ কথা সকলেই জানেন যে, ঋতুর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে অনেক পাখী এক দেশ হইতে আর এক দেশে উড়িয়া যায়—সাধারণতঃ শীতপ্রধান দেশের পাখী শীতের আগমনে দক্ষিণে উড়িয়া যায় এবং শীত ফুরাইলে পুনরায় স্বস্থানে ফিরিয়া আসে। পরীক্ষাহিসাবে কোনও কোনও পাখার পায়ে নাম ও ঠিকানা লেখা এলুমিনিয়মের আংটী পরাইয়া দেখা গিয়াছে যে, অনেক ক্ষেত্রে তাহারা

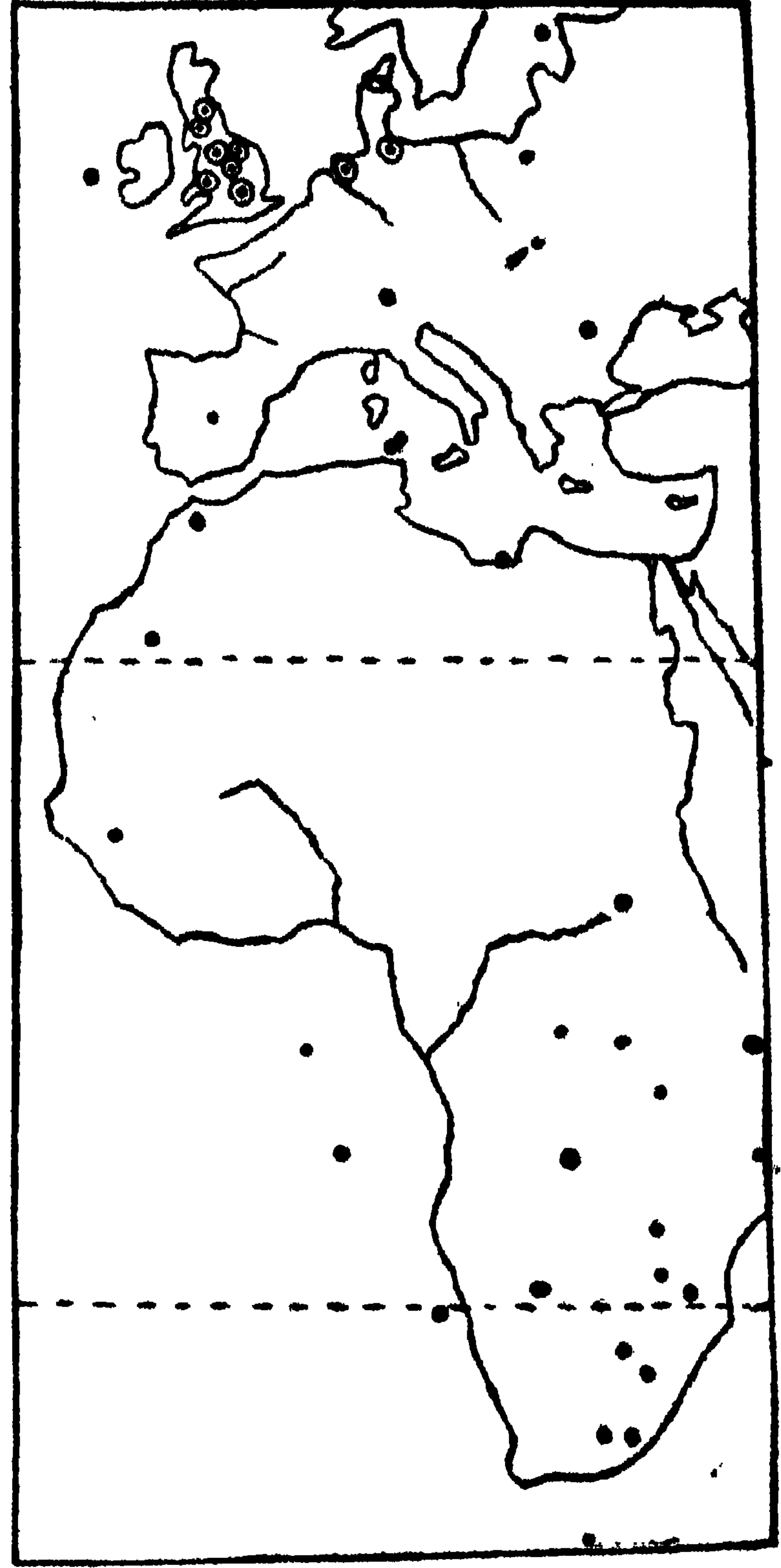
এতটা দূরে চলিয়া যায় এবং পরে পথ চিনিয়া ফিরিয়া আসে যে ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। একবার কয়েকটী সোয়ালো (swallow) পাখীকে ইংলণ্ড ও নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে এলুমিনিয়মের আংটী পরাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়•—সেই পাখীগুলির মধ্যে সাতটীকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ৭০০০ (সাত হাজার) মাইলেরও উপর দূরে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কতক-গুলিকে পুনরায় ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিতে দেখা গিয়াছিল। কি করিয়া ইহারা পথ চেনে? অনেক ক্ষেত্রে বাচ্চা পাখী পিতামাতার আগেই বিদেশের দিকে রওনা হইয়া পড়ে এবং গন্তব্যস্থানের অভিমুখে অগ্রসর হয়। ইহাতে মনে হয় যে, পথ চেনা ইহাদের একটী স্বভাবজাত ক্ষমতা। দিক্-নির্ণয় করিবার জন্য হয় ত' পথে কোনও নদী, পাহাড়, বন সহায়তা করে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে রাত্রির অন্ধকারে উহারা সমুদ্রের উপর দিয়া হাজার হাজার মাইল উড়িয়া যায়,—সে অবস্থায় কোনও চিহ্নের সন্ধান রাখা অসম্ভব মনে হয়। ঋতুর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল পাখীদের এক রকম উত্তেজনা উপস্থিত হয় যাহাকে প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণ "migration fever" বা দেশান্তর গমনের উত্তেজনা নাম দেন। এই উত্তেজনার ফলে তাহারা উড়িতে আরম্ভ করে এবং শত শত মাইল পথ বিনা বিশ্রামে অতিক্রম করে—পথেরও সন্ধান কোন্ এক অজানা শক্তির বলে পাইয়া থাকে। যদিও পারাবত এই সকল পাখীর দলভুক্ত নয়, তবুও ইহার মধ্যে দিক্-নির্ণয়ের আশ্চর্য্য ক্ষমতাটুকু পুরো-দস্তুর আছে।

পারাবতের এই স্বাভাবিক দিক্-নির্ণয়ের ক্ষমতা মানুষের শিক্ষার গুণে পরিবর্দ্ধিত করা হয়। জন্ম হইতে পারাবতকে নিজের খোপটীর সঙ্গে পরিচিত রাখা হয়। যে খোপে জন্মায় সেই খোপেই উহাকে যথাসম্ভব রাখা হয়। খোপটী আকাশে খুব উঁচু করিয়া রাখা হয় যাহাতে দূর হইতে উহা নজরে পড়ে। চার মাস বয়স হইলে খোপ হইতে উহাকে বাহির করিয়া কিছু দূরে আকাশে উড়াইয়া দেওয়া হয় এবং নিজের খোপে ফিরিয়া আসিতে সাহায্য করা হয়। দু'চার বার সাহায্যের পর নিজেই উহারা খোপ চিনিয়া ফিরিয়া



পারাবতের পা হইতে সংবাদের কৌটা খুলিয়া লওয়া হইতেছে

আসিতে পারে। কিছু কিছু দিন অন্তর উহাকে আবার বাহিরে লইয়া যাওয়া হয় এবং খোপ হইতে দূরত্ব ক্রমশঃ বাড়ান হয়। তবে এইটাই সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা দরকার যে, একই দিকে যেন উহাকে লইয়া যাওয়া হয়—দিক্ বদল না করিয়া প্রথমতঃ শুধু দূরত্বই বাড়ান হয়। প্রথমে ১ মাইল, পরে ২ মাইল,



◎ চিহ্নিত স্থান হইতে কয়েকটী সোয়ালো (swallow) পাখীকে আংটী পরাইয়া দেওয়া হয়। পরে • চিহ্নিত স্থানে তাহাদের সন্ধান পাওয়া যায়। ইংলণ্ড হইতে দক্ষিণ আফ্রিকার দূরত্ব ৭০০০ মাইলেরও অধিক

৫ মাইল, ১০ মাইল, ১৫ মাইল, ২০ মাইল এই রকম করিয়া একই দিকে দূরত্ব বৃদ্ধি করা হয় এবং যতদিন না পারাবত এই সকল দূরত্ব অতিক্রম করিয়া নিজের খোপে ফিরিতে শেখে ততদিন ক্রমাগত ইহাকে অভ্যাস করান হয়। অভ্যাসের ফলে দেখা গিয়াছে যে, এক বৎসরের ভিতর পারাবত ১০০ মাইল পথ চিনিয়া আসিতে শেখে। পাঁচ বৎসর বয়সের পারাবতকে ৫০০ মাইল দূর হইতে নিজের খোপে ফিরিয়া আসিতে দেখা গিয়াছে। স্বাভাবিক দিক্-নির্ণয়ের ক্ষমতা তাহাকে প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণ sense of direction বলেন তাহা এইরূপ শিক্ষা ও অভ্যাসের গুণে পরিবর্দ্ধিত হয়।

একটী বিষয় লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, পারাবতকে যখন খোপ হইতে দূরে উড়াইয়া দেওয়া হয়, উহা চক্রাকারে (spirally) উপরে উঠিতে থাকে এবং পরে কোনও একটী দিক্ নির্ব্বাচন করিয়া সেই দিকে ধাবিত হয়। ইহাতে মনে হয় যে, পারাবত উপরে উঠিবার সময় চারিদিকে লক্ষ্য করিতে থাকে কোনও চেনা চিহ্নস্থান (landmark) নজরে পড়ে কি না। পারাবতের দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা খুব বেশী, বহু দূর হইতে উহারা দেখিতে পায়। যখন

কোনও পরিচিত চিহ্নস্থান চোখে পড়ে, তখন সেই দিকেই উহারা উড়িয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে ভ্রম ঘটে, ফলে একদিকে কিছুক্ষণ উড়িয়া পুনরায় অন্যদিকে উহাদের যাইতে দেখা যায়। এইরূপ দিক্ সন্ধান করিতে করিতে উহারা গন্তব্য খোপের অভিমুখে আগাইয়া চলে। একবার কয়েকটী পারাবতকে খাঁচায় পুরিয়া জাহাজে করিয়া অনেক দূরে লইয়া যাওয়া হয় এবং তাহাদের একটী একটী করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পরে সব কয়টী পারাবতই নিজ নিজ খোপে ফিরিয়া আসে। একটী ৫০০ মাইল দূর হইতে, একটী ৩০০ মাইল দূর, একটা ১৫০ মাইল এইরূপ বিভিন্ন দূরত্ব হইতে পথ চিনিয়া উড়িয়া আসে। অবশ্য সময়ের তারতম্য খুবই ছিল। কোনও পারাবত ৩ ঘণ্টায়, কোনওটী ১ দিন, কোনওটী ৩ দিন সময়ে ফিরিয়া আসে। দূরত্বের সহিত সময়ের কোনওরূপ সম্বন্ধ পাওয়া যায় নাই। বরং এ বিষয়ে উল্টাই দেখা গিয়াছে,—দ্বিগুণ দূর অতিক্রম করিতে সময় দ্বিগুণের অধিক লাগিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, পথ অতিক্রমকালে ইহারা অনেক সময় ভুলদিকে অগ্রসর হয় এবং ভুল বুঝিতে পারিলে পুনরায় নূতন দিকে উড়িতে থাকে এবং এইরূপ চেষ্টা (Trial and error) করিতে করিতে গন্তব্য খোপে আসিয়া পৌঁছায়।

উপরোক্ত পরীক্ষা হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, মূলতঃ পারাবতের একটা অদ্ভুত দিক্‌নির্ণয়ের স্বাভাবিক ক্ষমতা (natural instinctive sense of direction) আছে, তবে এই স্বাভাবিক ক্ষমতার সহিত বুদ্ধির চালনা করিতে মানুষ উহাকে সহায়তা করে। সকল শিক্ষার উদ্দেশ্যই এই যে, অল্পে অল্পে বিচার-শক্তির সম্প্রসারণ করা। পারাবতের শিক্ষা (training) এই উদ্দেশ্যই সাধন করে। প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি দুইএরই প্রয়োগ আমরা এস্থলে দেখিতে পাই।

সংবাদসরবরাহ-কার্য্যে পারাবতের ব্যবহার বহু প্রাচীনকাল হইতেই হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন গ্রীক্‌গণ অলিম্পিক-প্রতিযোগিতার ফলাফল সহরে সহরে পারাবতের সাহায্যে পাঠাইতেন। প্রাচীন পারসিকদিগের মধ্যে পারাবত সাহায্যে সংবাদ প্রেরণের প্রচলন খুবই ছিল। আধুনিক কালে টেলিগ্রাফ আবিষ্কারের পূর্ব্বে ব্যবসায়ীগণ পারাবতের সাহায্যে এক দেশ হইতে অন্য দেশে বাণিজ্য ব্যবসায়ের খোঁজখবর পাঠাইতেন। ঊনবিংশ শতাব্দির পূর্ব্বভাগে ডাচ্ গভর্ণমেন্ট বাগদাদ্ হইতে পারাবত লইয়া আসিয়া জাভা ও সুমাত্রায় সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। ১৮৭০-৭১ সালে জার্ম্মানগণ যখন প্যারিস অবরোধ করে, সে-সময় প্যারিসবাসীগণ পারাবতের সাহায্যে বহির্জ্জগতের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়াছিল। অপর দিকে ইহার প্রতিরোধব্যবস্থা-স্বরূপ জার্ম্মানগণ প্যারিস পারাবতের বিরুদ্ধে শ্যেনপক্ষী ব্যবহার করে। চীনদেশে পারাবতের ব্যবহার ছিল। যাহাতে সংবাদবাহক পারাবত শিকারী পক্ষীর কবলে না পড়ে, সে জন্য চীনাগণ পারাবতের পায়ে বাঁশী ও ঘণ্টা বাঁধিয়া দিত। গত যুদ্ধে পারাবতের সাহায্যে খবরাখবর লওয়া খুবই চলিত এবং বর্ত্তমান যুদ্ধে ইহার ব্যবহারের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই।

বিগ্রহ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

ব্রাহ্ম :

চারিদিকে শঙ্খ, ঘণ্টা, পুষ্প, ধূপ, দীপ, স্তব, গান!
শুনি—তব "অভিষেক," হে লাঞ্ছিত অগতির গতি!
যত শুনি পুছি তত : "তাদেরো কি দাও বরদান
পূজা যারা করে তব—সাঙ্গ মন্ত্রনিষ্প্রাণ আরতি?"

লীলাময়! লীলা তব বিচিত্র!—তোমারে যারা নিতি
করিল অর্চনা হেন মন্দিরে মন্দিরে যুগে যুগে
তারা তব কৃপা ধন্য কে বলিবে দেখি' হায় রীতি
আচার তাদের? কে বলিবে—রাজো তাহাদেরো বুকে?

চারিদিকে শুধু মালা, কুঙ্কুম, প্রসাদ ছড়াছড়ি!
ললাটে কুরূপ স্থূল চন্দনের চিৎকার! বিভূতি
সর্ব অঙ্গে! কেহ করে ভিক্ষা! কেহ দেয় গড়াগড়ি
কর্দমে ধূলায়! আছে সবি—নাই অন্তর-আকূতি।

যুগে যুগে ধীরে ধীরে অবান্তর ম্লান লোকাচারে
কোন সে-অম্লান দীক্ষা দাও তুমি? চাহো কি শিখাতে—
"আচারের অভিমান যত গরজায়—অন্ধকারে
ততই লুকাও তুমি অভিনব আলোক বিলাতে?"

হিন্দু :

এ কী অভিনব আলো?—ভাবিয়া না পাই দেবদূত!
দেবতার রূপে তুমি মূর্ত্তি ধরো লক্ষ দেবালয়ে
দেশে দেশে কালে কালে! কভু কান্ত, কভু বা অদ্ভুত!
আসে যাত্রী কোটি কোটি তবুও তো কত না আগ্রহে!

ধরা দাও বুঝি আগে পূর্বরাগে—ওঠে যে দীপিয়া
সহজে—বিধানে, মন্ত্রে, স্তোত্রে, দীপে, পুষ্পে, উপচারে?
জীবন-অতীত ছন্দ যেথায় কচিৎ হিল্লোলিয়া
ওঠে ক্ষণজীবী রেশে—দেখা দাও কি সে অন্ধকারে?

পরে বুঝি দেখা দাও আরো অন্তর্গূঢ় গরিমায়
যে-রূপ মিলে না চিত্রে দৈনন্দিন মন্দির-বিহ্বল—
জনতার মাঝে?—যে ঝঙ্কারে অনির্বচনীয় তায়
শুধু যেথা ভক্তি ডাকে দেন সাড়া ভকতবৎসল?

স্থূল হ'তে সূক্ষ্মে বুঝি চলো নিয়ে বন্ধু, হাতে ধ'রে
দীক্ষা হ'তে দীক্ষান্তরে? যারা আজো প্রতীক-পসারী
তাদেরো প্রতিমা হ'য়ে কিছু দাও? তাই কি নির্ভরে
প্রসাদ তোমার কিছু পেয়ে হ'ল ওরাও পূজারী? *

* পালনির বিখ্যাত সুব্রহ্মণ্যম্ মন্দিরে



গৃহস্বামী

জনৈক গৃহী

গৃহস্বামী—ইঁহার কর্ত্তব্য বিধি। ইনি সচ্চরিত্র ও শুদ্ধাচারী হইলে ইঁহার পুত্রগণ এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ সহজেই তাঁহার মত চরিত্র ও আচার অর্জ্জন ও অবলম্বন করিতে পারে। যে-ক্ষেত্রে গৃহস্বামী চরিত্রবান ও শুদ্ধাচার হইলেও তাঁহার পুত্র বা ভ্রাতা বা ভ্রাতুষ্পুত্র চরিত্রহীন বা কদাচারী হয়, বুঝিতে হইবে যে সেখানে শিক্ষা ও শাসনের অভাব ঘটিয়াছে। গৃহস্বামী অসচ্চরিত্র ও ব্যভিচারী হইলে তাঁহার বাড়ীর ছেলেরা স্বভাবতঃই কুচরিত্র ও কু-অভ্যাসগ্রস্ত হয়, কঠিন শাসন সত্ত্বেও তাহাদিগকে সংযত করা যায় না। যে-বাড়ীর কর্ত্তা ধূমপান করে সে-বাড়ীর ছেলেরা যৌবনের পূর্ব্ব হইতেই ধূমপানে অভ্যস্ত হয়। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। যাহার শাসনের অধিকার আছে, যদি তিনি নিজেই ব্যভিচারী হন, অপরের কু-প্রবৃত্তি ও কু-অভ্যাস দমন করিতে তাঁহার প্রবৃত্তিই হইবে না, হয় ত' সেগুলিকে কু-প্রবৃত্তি বা কু-অভ্যাস বলিয়া গণনাই করিবেন না অথবা সে-বিষয়ে তাঁহার খেয়াল হইবে না কিম্বা প্রবৃত্তি জন্মিলেও বা খেয়াল হইলেও তাহাদের নিরাকরণ কল্পে শাসন করিতে তিনি সঙ্কোচ অনুভব করিবেন।

হাতে খড়ি দিবার উপযুক্ত হইলেই বালকগণের শিক্ষা ও শাসনের ভার গ্রহণ গৃহস্বামীর কর্ত্তব্য। অধ্যাপনার ভার না লইলেও চলে, কারণ, তাহাদের শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ সে-কার্য্য করিবেন, কিন্তু ধর্ম্ম-শিক্ষা, সামাজিক আচার ব্যবহারের শিক্ষা এবং কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, অভ্যাগতগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, কি হিসাবে বন্ধু নির্ব্বাচন করা উচিত, কাহার সংসর্গ পরিত্যাগ করা উচিত, কি কার্য্যে ও কি হিসাবে অর্থব্যয় অনুচিত স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত কি-নিয়ম ও কি-উপায় পালনীয় ও অবলম্বনীয় কোন্‌টি খাদ্য ও কোন্‌টি অখাদ্য, আহারের পরিমাণ কিরূপ হওয়া উচিত এ-সকল বিষয়ে শিক্ষাপ্রদান গৃহস্বামীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মকে নীতি ও ভক্তি এই দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। সকলের হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির উদ্রেক না হইতে পারে তাহাতে সমাজের বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু কেহ নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিলে তাহাতে অপরের অনিষ্ট হইতে পারে। কাহারও ইষ্টসাধন সাধ্যাতীত হইতে পারে, কিন্তু কাহারও অনিষ্টসাধন সকল নীতি অনুসারে নিষিদ্ধ। অনিষ্ট করিবার প্রবৃত্তি বোধ হয় মানুষের স্বভাবজাত, কারণ, যদি কোন শিশু এমন একখানি বস্ত্র পায় যাহাতে একটি ছোট ছিদ্র আছে, শিশু সুবিধা পাইলে সে-ছিদ্র বাড়াইয়া দিবে। হাতে কোন ভঙ্গ-প্রবণ দ্রব্য পাইলে সে তাহা আছড়াইয়া ভাঙ্গিবে। দন্তোদ্গম হইবার পর তাহার মুখে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইলেই সে কামড়াইবে। শিশু শৈশব উত্তীর্ণ হইলেই তাহার এই স্বভাবের সংশোধন আরম্ভ করিতে হয়। যৌবনোদ্গমের পূর্ব্বেই যদি কাহারও কোন চরিত্রগত দোষ বদ্ধমূল হইয়া যায় তাহার উন্মূলন অসম্ভব না হইলেও একান্ত ক্লেশসাধ্য।

বাড়ীর ছেলেদের যৌবনসুলভ উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করিবার জন্য গৃহস্বামীকে যথোপযুক্ত শাসনপ্রণালী অবলম্বন করিতে হয়—প্রয়োজন বোধে কঠোর হইতে হয়। কিন্তু কেবলমাত্র কঠোর শাসনে সকল সময়ে সে উচ্ছৃঙ্খলতার দমন হয় না। উচ্ছৃঙ্খল যুবককে উপদেশ দিতে হয়, তাহাকে নরম কথায় বুঝাইতে হয়। তাহার দোষের ভবিষ্যৎ ফল তাহার হৃদয়ঙ্গম করাইতে হয়। সে জন্য গৃহস্বামীকে যুগপৎ কোমল ও কঠোর হইতে হয়। কেবল কঠোর হইলে অনেক সময়ে অপরাধীর স্বভাব সংস্কার বা দোষের নিরাকরণ হয় না।

এইরূপ একটি ঘটনা লেখকের স্মরণ আছে; তাহা এই—

কলিকাতার অদূরবর্ত্তী একটি গ্রামের কোন বর্দ্ধিষ্ণু হিন্দু-পরিবারস্থ এক বালক হাইস্কুলের তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িতেছিল। সেই সময়ে গ্রামে একটি সখের যাত্রার দল গঠিত হইতেছিল। যেখানে এইরূপ দলের পত্তন হয় সেই-খানেই কিছুদিনের জন্য "ছেলে ধরার" ভয় হইয়া থাকে। এ-ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। দলের পাণ্ডারা এই বালকটিকে ফুসলাইয়া যাত্রার দলে ভিড়াইয়া লইল। বালকের পিতা কোপনস্বভাব ছিলেন। তিনি পুত্রের আচরণে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া গেলেন। পুত্রকে সম্মুখে পাইলেই তিনি নির্দ্দয়ভাবে তাহাকে প্রহার, মায় পাদপ্রহার, পাদুকাপ্রহার করিতে লাগিলেন। পিতার জমিদারী ছিল, তাঁহাকে অন্যত্র চাকরী বা অন্যপ্রকার কাজকর্ম্ম করিতে হইত না। মধ্যে মধ্যে নিজের জমিদারীতে যাইতেন, কিন্তু তদ্ভিন্ন প্রায় বারমাস বাটীতেই থাকিতেন। পুত্র প্রথম প্রথম পলাইয়া বেড়াইল, পিতারদৃষ্টি এড়াইয়া তাঁহার সংসারভুক্তা পিতৃস্বসার সাহায্যে দুইবেলা গোপনে খাইয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু পিতা অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করায় বাটী প্রবেশ তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল তখন হইতে পিতার বৃদ্ধা পিতৃস্বসা কোন না কোন প্রতিবেশী জ্ঞাতির বাটীতে দুইবেলা তাহার আহার বহিয়া আনিয়া যোগাইতে লাগিলেন। ইহা অবশ্য পিতার অজ্ঞাতসারেই হইত। ক্রমশঃ পিতা ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু গ্রাহ্য করিতেন না অথবা পুত্রের আহার বন্ধ করিবার প্রবৃত্তি হইত না—স্নেহের গতিই এইরূপ। স্বাভাবিক স্নেহ প্রচ্ছন্নভাব অবলম্বন করে, কিন্তু লুপ্ত হয় না। পিতা উপদেশ প্রদান করিয়া বা অন্য কোনরূপে পুত্রের স্বভাবসংস্কার বা কার্য্য সংশোধন সম্বন্ধে চেষ্টা ত' করিলেন না, অধিকন্তু কয়েক বৎসর তাঁহার মুখদর্শন করিলেন না। ইহার ফলে পুত্রের বিদ্যাশিক্ষা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। সখের দলের যেমন দশা হইয়া থাকে কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহাই হইল—দল ভাঙ্গিয়া গেল। দলের ভাঙ্গন যখন আরম্ভ হইল তখনও যদি পিতা পুনর্ব্বার পুত্রকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া বিদ্যাশিক্ষা-বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিতেন, হয় ত' তাহা হইলে পুত্রের পরকাল একেবারে নষ্ট হইত না। অবশেষে পিতা পুত্রকে ক্ষমা করিলেন, তাহার বিবাহও দিলেন, কিন্তু তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ যাহা রুদ্ধ হইয়াছিল, আর উন্মুক্ত হইল না। উপার্জ্জনক্ষম না হওয়ায়, পিতা বর্ত্তমানে অন্নবস্ত্রের ক্লেশ হইল না বটে কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার অভাবে প্রজাগণের সহিতও বনাইয়া চলিতে না পারায় শেষ জীবনে সাংসারিক কষ্ট ভোগ করিতে হইল এবং ক্রমে উত্তরাধিকারসূত্রে পিতৃত্যক্ত জমিদারীর যে অংশ পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাও তাহার হস্তচ্যুত হইল।

যদি পিতা উচ্ছৃঙ্খল পুত্রের নিকট তাহার আচরণ-জনিত দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তাহার উচ্ছৃঙ্খলতার ফল ভবিষ্যতে কি হইবে দৃষ্টান্ত প্রভৃতি দ্বারা সম্যকরূপে বুঝাইয়া দেন তাহা হইলে পুত্র অনুতপ্ত হইয়া স্বীয় উচ্ছৃঙ্খলতার প্রবৃত্তি দমন করিতে পারে। অনেক পিতার ধারণা এই যে, পুত্রের নিকট দুঃখ বা বিনয় প্রকাশ করিলে তাঁহার হীনতা স্বীকার করা হয়—তাঁহার পিতৃত্বের গর্ব্ব খর্ব্বিত প্রাপ্ত হয়। এ-ধারণা ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। পিতৃত্বাভিমানের প্রখরতা বা পরিমাণ এমন হওয়া উচিত নয় যাহার ফলে পুত্রকে প্রকৃত মানুষ করিয়া তুলিবার কোন পন্থা রুদ্ধ হইতে পারে। এ-বিষয়ে পিতার সকল অভিমান বর্জ্জনীয় এবং সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বনীয়।

পিতা কোপন স্বভাব হইলে, পুত্রের সহিত সর্ব্বদা কর্কশ ব্যবহার করিলে এবং পুত্রের মেজাজ না বুঝিয়া ও তাহার ক্ষমতার পরিমাণ গণনা না করিয়া তাহার প্রতি অসম্ভব বা কষ্টসাধ্য আদেশ প্রদান ও সে আদেশ পালনে ত্রুটী হইলে তাহাকে কঠোরভাবে শাসন করিলে পুত্র পিতাকে বাঘের মত ভয় করে বটে কিন্তু, তাহার কোমল প্রবৃত্তিগুলি পিতার দিকে ধাবিত হয় না। ইহা প্রকৃতির বিধান, ইহার ব্যতিক্রম কদাচিৎ হইয়া থাকে। কোন কোন পিতা নিজে পুত্রকে পড়াইয়া থাকেন, কিন্তু অনেকের সময়-অসময়ের জ্ঞান থাকে না। তাঁহারা যখন মনে করেন, তখনই পুত্রকে পড়িতে বসান। ইহাতে পড়া ঠিক হয় না। পাঠাভ্যাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় থাকা উচিত। পিতা যেন স্মরণ রাখেন যে, বালকগণকে খেলিবার সুবিধা এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে যখন অন্যান্য বালক খেলা করিতে থাকে তখন তাহাকে খেলার অবকাশ দেওয়া উচিত। যে বালক লেখাপড়া শিখিবার জন্য স্কুলে যায়, তাহার গৃহে প্রত্যাগমনের পরে এবং সন্ধ্যার প্রাক্কাল

পর্য্যন্ত পাঠে নিযুক্ত করা কোনমতেই বিধেয় নহে। তাহার মস্তিষ্কের বিশ্রাম ও শারীরিক ব্যায়াম একান্ত আবশ্যক। নিদ্রাকালে মস্তিষ্কের বিরাম হয় বটে কিন্তু দেহ নিশ্চল অবস্থায় থাকে। যে সময়ে খেলা করিবার অবকাশ দেওয়া উচিত তখন পড়িতে বাধ্য করিলে কোন বালকের পাঠে মনঃসংযোগ হইতে পারে না। অন্যমনস্কভাবে পাঠাভ্যাস করিলে পঠিত বিষয় হৃদয়ঙ্গম হয় না ইহা বলাই বাহুল্য। যেমন কাহারও উপর জুলুম বা জবরদস্তি বিধেয় নহে তদ্রূপ পুত্রের উপরেও জুলুম বা জবরদস্তী সঙ্গত হয় না। মনে রাখা উচিত যে, প্রত্যেক অপরিণতবয়স্ক বালকের জনক-জননীর উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরতা ভিন্ন গত্যন্তর নাই; আবার সে স্বভাবতঃ চায় স্নেহ ও স্নিগ্ধ ব্যবহার, সে চায় ভালবাসা, আদর। সে চাহিদা পূর্ণ হইলে তাহার অন্তঃকরণ প্রফুল্ল থাকে। তিরস্কার করিলে সে ক্ষুণ্ণ হয়। ক্ষুদ্র শিশুকেও আদর করিলে সে হাসে, ধমকাইলে কাঁদে। বালকগণ যাহাতে সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিতে পারে, সম্ভব হইলে তাহাদিগের সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করা উচিত। এরূপ করিলে, যখন অপকর্ম্মের জন্য তাহারা তিরস্কৃত হইবে তখন বুঝিতে পারিবে যে তাহারা অন্যায় বা অসঙ্গত কার্য্য করিয়াছে বলিয়া তিরস্কৃত হইল। যে সকল বালকবালিকাকে তাহাদের পিতামাতা অহোরাত্রি সামান্য ত্রুটীবিচ্যুতির জন্য তাড়না করেন, যাহারা পিতামাতার কাছে কখন কোমল ব্যবহার পায় না, তাহারাই অন্যের অপেক্ষা অধিক "অকর্ম্মা" করে, কারণ, তাহাদের "চড়-চাপড় গায়ের কাপড়" হইয়া যায়। দিবারাত্র "দাঁতখিঁচুনী" বা প্রহার খাওয়া যাহার অভ্যাস, দশ ও দ্বাদশের প্রভেদ তাহার গণনার মধ্যেই আসে না। যে বালক জনক-জননীর স্নেহে, অন্ততঃ স্নিগ্ধ ব্যবহার হইতে বঞ্চিত, অধিকন্তু, অবিরত তাঁহাদের তাড়নাই সহ্য করে, অন্যান্য পরিজনের কাছেও সে সদয় বা মিষ্ট ব্যবহার পায় না; অবশ্য পিতামহ, পিতামহী ও অনুরূপ সম্পর্কের পরিজনের কথা স্বতন্ত্র। যে-বালক স্বগৃহে এইরূপ ব্যবহার পায় তাহার স্বভাব, তাহার চরিত্র কিরূপ হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। "Spare the rod and spoil the child"—ইংরাজী ভাষায় এই যে উক্তি প্রচলিত আছে তাহা প্রজ্ঞাসমন্বিত কি না সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। উপদেশের অনুসরণ করিতে হইলে "লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ। প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রে মিত্রবদাচরেৎ" হিতোপদেশের এই উপদেশের অনুসরণ অধিকতর যুক্তিযুক্ত। "অধিকতর যুক্তিযুক্ত" বলিবার কারণ এই যে, যদি "তাড়য়েৎ"-শব্দের মৌলিক অর্থ গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে "দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ" এই শ্লোকাংশ বর্জ্জন করা উচিত। দশবৎসরব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন তাড়নায় যে কোন বালকের উপকার অপেক্ষা অপকারের সম্ভাবনাই অধিক। বিষ্ণুশর্ম্মার যতদূর পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় যে, তিনি এ অর্থে বা এ উদ্দেশ্যে এই শ্লোকাংশ রচনা করেন নাই।

"সঙ্গদোষে গ্রাম নষ্ট" এবং "সৎসঙ্গে কাশীবাস, অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ" এই প্রচলিত উক্তি দুইটির যথেষ্ট সার্থকতা আছে ও দুইটিই অনুসরণীয়। পুত্র যাহাতে অসৎ-সংসর্গে পতিত না হয় এ-বিষয়ে প্রত্যেক পিতার দৃষ্টি আবশ্যক। অপরের চরিত্র-বিচারের শক্তি বালকদিগের থাকে না ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ-দেশে প্রচলিত রীতি অনুসারে পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ণ হইলেই যৌবনের উদ্গম হয় এবং তৎসঙ্গে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি পক্বতার প্রথম স্তরে উপনীত হয়। আইনের হিসাবে ইহা পুরুষের বিবেক বা সদ্বিবেচনার বয়স—age of discretion, যদিও অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ না হইলে কেহ প্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া গণ্য হয় না। রমণীর চতুর্দ্দশবর্ষ বয়সকে কোন কোন ক্ষেত্রে age of discretion কথিত হইয়াছে। বালকের পঞ্চদশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে আমাদের দেশে সে যুবক-সংজ্ঞাভুক্ত হয়। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্কা বালিকাকে অনেক স্থলে যুবতী বলা হয়। বালকগণ ক্ষণকালের মিষ্ট ব্যবহারে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং সহজেই প্রলোভনের বশীভূত হয়। যে তাহাদিগকে মিষ্ট কথা বলে বা খেলার সামগ্রী (যতই সুলভ হউক) উপহার দেয় কিম্বা সুলভ আনন্দ লাভের পন্থা নির্দ্দেশ করে তাহারা পরম বন্ধু মনে করে। প্রকৃত বন্ধু-নির্ব্বাচনের ক্ষমতা তাহাদের থাকিতেই পারে না। পুত্র কাহার বা কাহাদের সঙ্গে বন্ধুভাবে মিশিতেছে ইহা পিতার লক্ষ্য করিবার বিষয়। তথাকথিত বন্ধু যদি সচ্চরিত্র ও সদাচারী না হয়, তাহার সহিত পুত্রের বন্ধুত্ব বিচ্ছিন্ন ও মিশামিশি বন্ধ করিতে হয়। দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফি করিলেই যে বালক দুর্বৃত্ত হয় তাহা নহে, যদিও এরূপ বালককে অনেকে "দুষ্ট ছেলে" বলেন। যে সকল বালক কখন কখন পরস্পরের

সহিত মারামারি করে তাহাদিগকেও "দুষ্ট ছেলে" বলা উচিত নয়। তবে যাহাতে তাহারা লাঠালাঠি বা "ইটপাটকেল" ছোড়াছুড়ি না করে এবং কাহারও কোন ক্ষতি না করে সে-বিষয়ে তাহাদিগকে সতর্ক ও প্রয়োজন হইলে শাসন করা উচিত। বালকগণের শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ তেজস্বিতা বাঞ্ছনীয়। যে-বালক অপর বালক কর্তৃক প্রহৃত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয় এবং পিতামাতার কাছে অভিযোগ করে, বুঝিতে হইবে তাহার তেজস্বিতার অভাব আছে। যাহাকে প্রহার করিলে সে প্রতিপ্রহার করে, কেবল কাঁদিয়া বাড়ী ফিরে না, সেই বালককেই তেজস্বী বলা যায় এবং ভবিষ্যতে সে-ই দৃঢ়গ্রাহী হইয়া উঠে। যে-বালক নিতান্ত মৃদুপ্রকৃতি বা গ্রাম্য ভাষায় "মেদামারা", মানুষ হইলেও সে তদ্রূপ থাকিয়া যায়। এরূপ লোকের দ্বারা সমাজের বিশেষ কোন কার্য্য সম্ভব নয়। স্বল্প-বিস্তর সমবয়স্ক বালকগণের মধ্যেই বন্ধুত্ব ও মিশামিশি হওয়া ভাল। উপপত্তি-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, সঙ্গদোষে পুত্রের স্বভাব-চরিত্র যাহাতে কলুষিত হইতে না পারে সে-দিকে পিতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি একান্ত প্রয়োজনীয়।

পিতা ও গৃহস্বামীর কর্তব্য গল্পের ছলে বালকগণকে শিক্ষা-প্রদান। বালকগণ স্বভাবতঃ অনুসন্ধিৎসু। তাহারা কোন বিষয় জানিতে চাহিলে বা কোন প্রশ্ন করিলে অবজ্ঞা প্রকাশ না করিয়া সে-বিষয় বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়া এবং প্রশ্নের সরল উত্তর প্রদান করা পিতা বা গৃহস্বামীর অবশ্যকর্তব্য। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে সে-বিষয় বা সে-প্রশ্ন সাধারণ বা সহজ হইতে পারে, কিন্তু সুকুমারমতি বালকের পক্ষে হয় ত' তাহা অসাধারণ বা দুরূহ। কথিত আছে—"মিষ্ট কথায় বনের পশুও বশ হয়"। যথাসম্ভব মিষ্ট কথায় ও মধুরভাবে বালক-গণকে শিক্ষাপ্রদান সমীচীন। কোন কার্য্যে ত্রুটী হইলে তাহাদিগকে ব্যঙ্গ করা উচিত নহে; প্রত্যুত, কেন ত্রুটী হইল, কিরূপে বা কি-পন্থা অনুসারে সমাধান করিলে ত্রুটী সংঘটিত হইত না তাহা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। পিতাকে কেবল ভয় করিয়া চলিলে পুত্র ভয়প্রযুক্ত যে-কাজ করিবে তাহার ফল আশানুরূপ হইতে পারে না। যে-কাজ স্ফূর্তি বা আনন্দসহকারে করা যায় তাহাই সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হয়। ভয়বশতঃ যে-চরিত্রবৃত্তি দমন করিতে বালক বাধ্য হয়, ভয়ের কারণ অন্তর্হিত হইলে সে-বৃত্তি বালকচরিত্রে পুনরায় প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারে। লাঞ্ছনা-ভর্ৎসনার ভয়ে বালক যে-সৎপ্রবৃত্তি অর্জন করে সকল ক্ষেত্রে তাহা চিরস্থায়ী হয় না। কিন্তু, পিতা মিষ্ট কথায় পুত্রকে যে-শিক্ষা প্রদান করেন তাহার ফলে পুত্রের চরিত্রে যে-সকল সৎবৃত্তি প্রবুদ্ধ হয় তাহাদের চিরস্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কারণ নাই। পিতার ব্যবহারগুণে পিতাপুত্রের মধ্যে এমন সখ্যতাস্থাপন বাঞ্ছনীয় যাহাতে পুত্র অবাধে ও উন্মুক্তচিত্তে পিতার সহিত সকল বিষয় সম্বন্ধে কথোপকথন ও আলোচনা করিতে পারে। পিতার আর একটি অপরিহার্য্য কর্তব্য—পুত্রের কৈশোরেই তাহার হৃদয়ে যাহাতে ভগবদ্ভক্তির উন্মেষ হয় সহজ ভাষায় তাহাকে সেইরূপ ধর্ম্মোপদেশ-প্রদান। যে-হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির সঞ্চার হয় অনাচার-স্পৃহা সহজে তাহাতে প্রবেশ-লাভ করিতে পারে না। অনেক ব্রাহ্মণ-বালক উপনয়নের পরে কিছুদিন নিয়মিত সময়ে সন্ধ্যাহ্নিক করিয়া থাকেন; কিন্তু, অধিকাংশ বালক আহ্নিকের মন্ত্রের অর্থ পরিজ্ঞাত নহেন। অর্থ না বুঝিয়া কেবল তোতাপাখীর মত মন্ত্রের আবৃত্তি করিলে পরকালের কোন কাজ হয় কি না এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় কি না জানি না; কিন্তু, ইহকালের বিশেষ কাজ যে হয় না সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। যাহাতে মন্ত্রগুলির প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য্য বালকগণের বোধগম্য হয় তদ্বিষয়ে পিতার ও গৃহ-স্বামীর সম্যক্ চেষ্টা করা উচিত।

পিতার আরও দেখা উচিত যে, পুত্র নিয়মিতভাবে ব্যায়াম করে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে পাঠাভ্যাস ও আহার করে এবং রাত্রিকালে নির্দ্দিষ্ট সময়ে শয্যা গ্রহণ করে। বিবাহের পূর্ব্বে (বাল্য-বিবাহের কথা বলিতেছি না) কোন যুবকের থিয়েটার বা বায়োস্কোপ দেখিতে না যাইলেই ভাল হয়। যদি কালে ভদ্রে যাইতেই হয়, তাহা হইলে এমন অভিনয় বা এরূপ চলচ্চিত্র দেখা উচিত যাহা দেখিলে রুচি বা চরিত্র বিকৃত হইবার সম্ভাবনা অথবা "এঁচোড়ে পাকিবার" ভয় না থাকে। বস্তুতঃ এমন নাটকের অভিনয় বা ছায়াচিত্র দেখা উচিত যাহা পিতাপুত্র একত্র বসিয়া দেখিতে পারেন। পরন্তু, স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে-স্থানে বা যে-উদ্দেশ্যেই যাওয়া হউক, রাত্রি দশটার মধ্যে গৃহে প্রত্যাগমন যুক্তিযুক্ত। মানবজীবনে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের একটি প্রধান ও মূল্যবান উপকরণ স্বাস্থ্য।

শরীর সুস্থ না থাকিলে মন বা মস্তিষ্ক সুস্থ থাকিতে পারে না। সহস্র গুণের অধিকারী ও সহস্র বিষয়ের কৃতবিদ্য হইলেও স্বাস্থ্যহীন, চিররুগ্নব্যক্তি সংসারের বা সমাজের বিশেষ কাজে লাগেন না। সর্ব্বসময়ে পুত্রপুত্রী ও অন্যান্য পরিজনবর্গের স্বাস্থ্যরক্ষাবিষয়ে গৃহস্বামীর সতর্ক দৃষ্টি আবশ্যক।

পরিজনবর্গের মধ্যে কোন কারণে কলহ উপস্থিত হইলে মীমাংসা করিয়া তাহা মিটাইয়া দেওয়া গৃহস্বামীর কর্ত্তব্য। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাকে পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিচার করিতে হইবে—মনে করিতে হইবে যে, তিনিই ধর্ম্মাধিকারী বা প্রকৃত বিচারক। অবশ্য পুত্রবধূগণের বা কন্যাগণের মধ্যে কলহ বা বিবাদ সঙ্ঘটিত হইলে তাহার বিচার বা মীমাংসা করিবার প্রথম অধিকার গৃহিনীর, কিন্তু, প্রয়োজন হইলে গৃহস্বামীও তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে ইতস্ততঃ করিবেন না। গৃহিণী ও গৃহস্বামী উভয়েরই আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য হইবে পরিজনবর্গের মধ্যে সম্প্রীতি ও সদ্ভাবের চিরস্থায়িত্ব। শিশু ও কিশোর-গণের মধ্যে "ভাব" ও "আড়ী" অতীব সুলভ। তাহারা সাধারণতঃ দলে ভারী থাকায় দুই একজনের সঙ্গে আড়ী হইলে তাহাদের বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। একজনের সঙ্গে আড়ী হইলে আর-একজনের সঙ্গে ভাব গাঢ় হইয়া থাকে। এইরূপ ভাব ও আড়ীর "পাল্টাপাল্টি" প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। যদি গৃহস্বামী উহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং "ছেলের ঝগড়া" বলিয়া উপেক্ষা না করেন বা উড়াইয়া না দেন তাহা হইলে তিনি অল্প বয়স হইতেই উহাদের স্বভাব-সংস্কারের একটি সুবিধা লাভ করিতে পারেন।

পুত্রবধূগণ সুশিক্ষিতা না হইলে তাহাদের বিবাদের কারণ অধিকাংশ সময়ে উত্থিত হয় তাহাদের স্বামী ও পুত্রকন্যাগণের মধ্যে খাদ্য বিতরণ-ব্যাপার হইতে। তাহারা স্ব স্ব পুত্র-কন্যাগণের পরিপাক শক্তির বিচার না করিয়া খাদ্যের পরিমাণের দিক লক্ষ্য করে এবং অনেক সময়ে নিজের পুত্র-কন্যাগণকে অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়াইয়া তাহাদের অসুস্থতার কারণ হয়। এইরূপ বধূগণের সুশিক্ষার অভাবের জন্য তাহার স্বামী এবং গৃহিণী ও গৃহস্বামী সকলেই দায়ী।

সংসারে এরূপ প্রায় ঘটিয়া থাকে যে, পুরুষগণের মধ্যে এক বা একাধিকজন অন্যের অপেক্ষা অধিক অর্থ উপার্জ্জন ও সংসারের জন্য ব্যয় করেন, এরূপ ক্ষেত্রে যদি গৃহস্বামী বা গৃহিনী আহার-ব্যবহারে তাঁহার প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেন তাহা হইলে অন্যান্য পরিজনের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি অসম্ভব নহে। এরূপ পক্ষপাতদোষ বর্জ্জনীয়। যে-সংসারে সকলের উপার্জ্জিত অর্থ গৃহস্বামীর হস্তে সংসারের উপকারার্থ গচ্ছিত হয় এবং এক তহবিল হইতে সংসারের সকল প্রকার ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়, তথাকার কর্ত্তা ও কর্ত্রী উভয়ের কার্য্য পরিবারস্থ সকলের প্রয়োজন ও অভাবের দিকে সমান লক্ষ্য রাখিয়া যথাসময়ে তাহার সিদ্ধি ও পূরণ। গৃহস্বামীর এক পুত্রের সন্তান সংখ্যা অন্যপুত্রের অপেক্ষা অধিক হইতে পারে, সেজন্য প্রয়োজন বা অভাব পুত্রের এরূপ মনে না করিয়া পৌত্র পৌত্রীরই প্রয়োজন বা অভাব এইরূপ মনে করিতে হয়।

সাধারণতঃ গৃহস্বামীর হস্তে অর্থভাণ্ডার বা তহবিল থাকে বলিয়া গৃহিণীকে অনেক কাজ তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া করা আবশ্যক হয়। সেইরূপ অনেক সময়ে গৃহস্বামীকেও গৃহিনীর পরামর্শ লইতে হয়। যে-সকল বিষয়ে এইরূপ পরামর্শের প্রয়োজন হয় তৎসম্পর্কে অসঙ্কোচে পরামর্শ-প্রদান ও পরামর্শ গ্রহণ বিধেয়।

এ-প্রবন্ধে পিতা ও পুত্রের সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা গৃহস্বামী ও তাঁহার সংসারভুক্ত যাবতীয় পোষ্যবর্গের সম্বন্ধে প্রযুজ্য।



চতুর্থ দৃশ্য

(উমাপদ বসুর অন্দর)

দয়াময়ী, সৌদামিনী ও কমলা

সৌদামিনী। আমরা এখন বাড়ী যাই দিদি!

দয়াময়ী। (চা প্রস্তুত করিতে করিতে) এখানে কি মাঠে পড়ে' আছ?

সৌ। দিদির সঙ্গে কথায় আঁটবার যো নেই। বেলা হ'লে রদ্দুর বাড়বে ত'! এখন গেলে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় যেতে পারি। দু'রাত্তির ত' এখানে কাট্‌ল!

দয়া। কী একেবারে দু'পাঁচ কোশ যেতে হ'বে যে রোদ্দুর লাগবে!

সৌ। আমার জন্যে বল্‌ছি না। কম্‌লীর ওপর—

দয়া। ফের কম্‌লী বল্‌ছিস্ সদু! কম্‌লী বল্‌তে যতক্ষণ, কমলা বল্‌তেও ত' ততক্ষণ। শুধু শুধু নাম খাস্ত করে' লাভ কি? ঐ-মেয়ের নাম কি খাস্ত কর্‌তে ভাল লাগে?

সৌ। তুমিও যে বিভূতিকে বিভু বলে' ডাক!

দয়া। ও-নাম যে খাস্ত হয় না ভাই! ভগবানকেও যে বিভু বলে' ডাকা হয়। আমার ছেলেকেও ডাকা হয়, ভগবানকেও ডাকা হয়—এক সঙ্গে।

সৌ। সে-কথা ঠিক দিদি! বল্‌ছিলুম যে কমলার ওপর দিয়ে অত বড় একটা ঝড় ব'য়ে গেল—বিভুর কল্যাণে আর মা-পো-এর যত্নে ওর ত' পুনর্জন্ম হ'ল। কিন্তু এখনও ত' শরীরটা কাহিল—রোদ্দুর না লাগালেই ভাল। তা' ছাড়া পরশু বিকেল থেকে সংসারটা ছত্রকোট্টি হ'য়ে আছে। পিসীমা ত' আছাড় পাছাড় খাচ্ছেন।

দয়া। ও-মেয়ে ত' এখন আমার। আমি যদি এখন ওকে যেতে না দিই! সংসারের কাজের জন্যে ছটফটানি ধরে' থাকে, তুই চলে' যা না। আমি ত' বুঝছি ভাবনা কেবল পিসীমার জন্যে। কমল, এই চা-টা বিভুকে দিয়ে আয় ত' মা! আর জিজ্ঞেস করিস্—তোকে আর ওষুধ খেতে হ'বে কি না। আর এখন তোর মা তোকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন, যেতে পারিস্ কি না তা'ও জিজ্ঞেস করিস্।

কম। (চায়ের পিয়ালা লইয়া) এত কথা জিজ্ঞেস কর্‌তে হ'বে?

সৌ। মুখচোরার একশেষ দিদি! ক'টা কথা? জ্যেঠাইমা ত' বলে' দিলেন, তবুও জিজ্ঞেস্ কর্‌তে পার্‌বি নে? (চা লইয়া কমলার প্রস্থান)

দয়া। মেয়েছেলের লজ্জা-সরম থাকা ভাল। আজ-কালকার মেয়েদের যে-সব গল্প শুনি, শুনে ঘেন্না ধরে' যায়। আমার মেয়েয় কাজ নেই মা! শুনি কল্‌কেতা থেকে একলা ট্রামে চড়ে' বালিগঞ্জে যায়—টালিগঞ্জে যায়—কত জায়গায় যায়। একলা একলা গড়েরমাঠে বেড়াতে যায়। একবার শুন্‌লুম এক হরতালের দিনে ট্রাম বন্ধ করবার জন্যে একদল মেয়ে ট্রাম-রাস্তার ওপর শুয়ে পড়ল; কি ঘেন্নার কথা!—যাঃ, কথায় কথায় যা জিজ্ঞেস করব মনে করলুম তাই করা হ'ল না!

সৌ। কী দিদি?

দয়া। মেয়ের বিয়ের চেষ্টা হচ্ছে? শত্তুর মুখে ছাই দিয়ে মেয়ে ত' বড় হ'য়ে উঠেছে। বিয়ে ত' দিতে হ'বে!

সৌ। ওঁরা বলেন টাকার যোগাড় যতদিন না হয়, ততদিন কোন কথাই কইবেন না। মেয়ে এ-পর্যন্ত দেখান-ও হয় নি। ঘটক ঘটকী এলে বলেন—পরে এস। অথচ পিসীমা দু'বেলা তাগাদা করেন।

দয়া। তোর মনে আছে সদু, মেয়ে হ'বার পর আমার সঙ্গে কী সত্যি করেছিলি?

সৌ। আমার ত' মনে নেই দিদি! কি বল না!

দয়া। বলেছিলি—আমার ছেলের সঙ্গে তোর মেয়ের বিয়ে দিবি। আর তখন থেকেই আমাদের বেয়ান পাতানো হয়েছিল। তোর মনে নেই?

সৌ। এ-কথা মনে আছে বৈ কি?

দয়া। কথার ঠিক রাখ্‌বি ত'?

সৌ। আমাদের কি সে-সৌভাগ্য হ'বে দিদি?

দয়া। সে আমি বুঝব। এখন থেকে মেয়ে আর কাউকে দেখাবি-না।

সৌ। ঐ যে বলে না—সেদো ভাত খাবি, না হাত ধোব কোথায়?

কম। (প্রবেশ) জ্যেঠাইমা, চা দিয়ে এলুম।

দয়া। আর যা' জিজ্ঞেস করতে বল্লুম?

কম। করেছি জ্যেঠাইমা। হাত দেখে বল্‌লেন ওষুধ আর খেতে হ'বে না, কিন্তু একমুঠো মাছের ঝোল ভাত না খেয়ে এবাড়ী থেকে যাওয়া হ'বে না।

দয়া। আমি জানি। পরশু বিকেল থেকে এক-রকম খাওয়াই ত' নেই। আমি ত' সকাল না হ'তে হ'তে বামুন-ঠাকরুণকে দুটি মাছের ঝোল ভাত রাঁধতে বলে' দিয়েছি।

সৌ। তা'র মানে এ-বেলা যাওয়া হচ্ছে না। খাওয়া হ'লে ত' বল্‌বে এত রোদ্দুরে কি মেয়ে নিয়ে যাওয়া হয়?

দয়া। তা হ'লোই বা! আমি কর্ত্তাকে বলে' পাঠাতে বল্‌ছি যে ঠাকুরপো এ-বেলা এখানে খাবেন। মুখের দিকে অমন করে' চেয়ে রয়েছিস কেন লা? সংসারের কাজের জন্যে মন যদি হাঁইফাঁই করে ত' ঘণ্টাখানেক বাড়ী থেকে ঘুরে আয়। আমি ঝিকে বল্‌ছি তোর সঙ্গে যেতে। আবার না-হয় ঘণ্টাদুই বাদে গিয়ে তোকে নিয়ে আসবে।

সৌ। কাজেই তাই হ'ক। পিসীমার সব যোগাড় করে দিতে হ'বে। বুড়োমানুষ—চোখেও ভাল দেখতে পান না। কাল একাদশী ছিল, কোন হাঙ্গাম ছিল না। সংসারে যে আর কেউ নেই দিদি! হয় ত' পিসীমার এখনও জল খাওয়া হয় নি। তিনি এখন কচিছেলের সামিল। আর তুমি আমার সেই দিদি ঠিক বজায় আছ।

দয়া। মানুষের স্বভাব কি সহজে বদলায়? যে ভাল বা মন্দ থেকে ভাল হয়, তা'কেই মানুষ বলা যায়। যে ভাল থেকে মন্দ হয় বা চিরদিন মন্দই থাকে, তা'কে কি মানুষ বলে? অনেক লোক, যতদিন গরীব বা মধ্যবিৎ অবস্থায় থাকে, ততদিন ভাল থাকে, কিন্তু যদি বরাত-ক্রমে ধন-সম্পত্তির মালিক হয়, অমনি তার মাথা বিগড়ে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে চাল-চলন, স্বভাব-চরিত্র সবই বিগড়ায়।—কমলা, আমাকে জ্যেঠাইমা বলে' ডাকবি না, বড়-মা বল্‌বি। আর দেখত মা, বিভু কি এখনও ওপরেই আছে? যদি থাকে, বেরোবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে' যেতে বল্‌বি।

(কমলার প্রস্থান)

এই বারোটা বছর মনে কী জ্বালা পেয়েছি জগদম্বাই জানেন। কী কর্‌ব, আমরা যে পরাধীনা। আর আমার ঠাকুরপো যেমন অভিমানী, তোর বড়ঠাকুরও তেমনি অভিমানী। অথচ এই বারো বছর ও'র মন ঠাকুরপোর জন্যে হাঁইফাঁই করেছে। সব কষ্ট চেপে রেখেছিলেন, মেয়েমানুষের ওপর যান।

সৌ। তোমার ঠাকুরপোর অবস্থাও ঐরকম। ঐ লক্ষ্মীমেয়েটা শেষে নিজের ফাঁড়া কাটিয়ে মিলন ঘটিয়ে দিলে।

দয়া। তা' সত্য, যেতেই যখন একবার হ'বে, আর দেরী করিস্ নে। যেতে আস্‌তে রোদ্দুর ভুগ্‌তে হবে। আজকালের মেয়ে নয় যে ছাতা মাথায় দিবি!

সৌ। অভাগ্যি আর কি? যে কষ্ট সইতে পারে না, সে আবার মেয়েমানুষ?

দয়া। ওরে মঙ্গলা—

মঙ্গলা। (নেপথ্য হইতে) যাই মা!

সৌ। আমি মঙ্গলাকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছি।

দয়া। চল। (সৌদামিনীর সহিত প্রস্থান)

কম। জ্যেঠাইমা আমাকে খালি খালি ও'র কাছে পাঠান, কিন্তু উনি ত' মুখ তুলে কথা ক'ন না। চা দিতে গেলুম, বল্‌লেন টেবিলের ওপর রেখে যাও। একবার জিজ্ঞেস করলেন কেমন আছ? তা'ও যেন ভয়ে ভয়ে, কারণ, কথাটা কাঁপ্‌ল। কিছু জবাব না দিয়ে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিলুম। হাত টিপে বল্‌লেন—এ-বেলা এখানে মাছের ঝোল ভাত খেয়ে ও-বেলা যেতে পা'বে। বল্‌তে গেলুম, বেরোবার সময় জ্যেঠাইমার সঙ্গে দেখা করে' যা'বেন, কিন্তু বলে' ফেললুম মা দেখা কর্‌তে বলেছেন। তা'রপর জ্যেঠাইমার কথা মনে পড়্‌ল বটে কিন্তু লজ্জায় আর কিছু বল্‌তে পার্‌লুম না। উনিও একবার মুখ তুলে আমার প্যানে চাইলেন না। আমি যেন মেয়েছেলে—লজ্জাটা স্বাভাবিক, কিন্তু উনি পুরুষ-মানুষ, তায় ডাক্তার, আমাকে, নিজের patientকে, দেখে অমন জড়সড় হ'য়ে যান কেন? অথচ, শুনলুম আমাকে এতটা পথ পাঁজাকোলা করে' এনেছিলেন। আমিই বা ও'কে দেখে জড়সড় হই কেন? যাক্, আর কারণ—অনুসন্ধানে কাজ নেই। মা, জ্যেঠাইমা—এ'রা কোথায় গেলেন? মা বাড়ী চলে' গেলেন নাকি? দেখি। (প্রস্থান)

বিভূতি। (প্রবেশ) কই, মা ত' এখানে নাই। কাকীমাও নাই। অথচ বল্‌লে কাকীমা দেখা কর্‌তে চেয়েছেন। মার কি মতলব বুঝতে পার্‌ছি না। কমলাকে বার বার আমার কাছে পাঠান কেন? কিছু একটা আন্দাজ বা মতলব নিশ্চয় করেছেন। যে চালাক মেয়ে! দেখি কোথায় আছেন। (প্রস্থান) [ক্রমশঃ



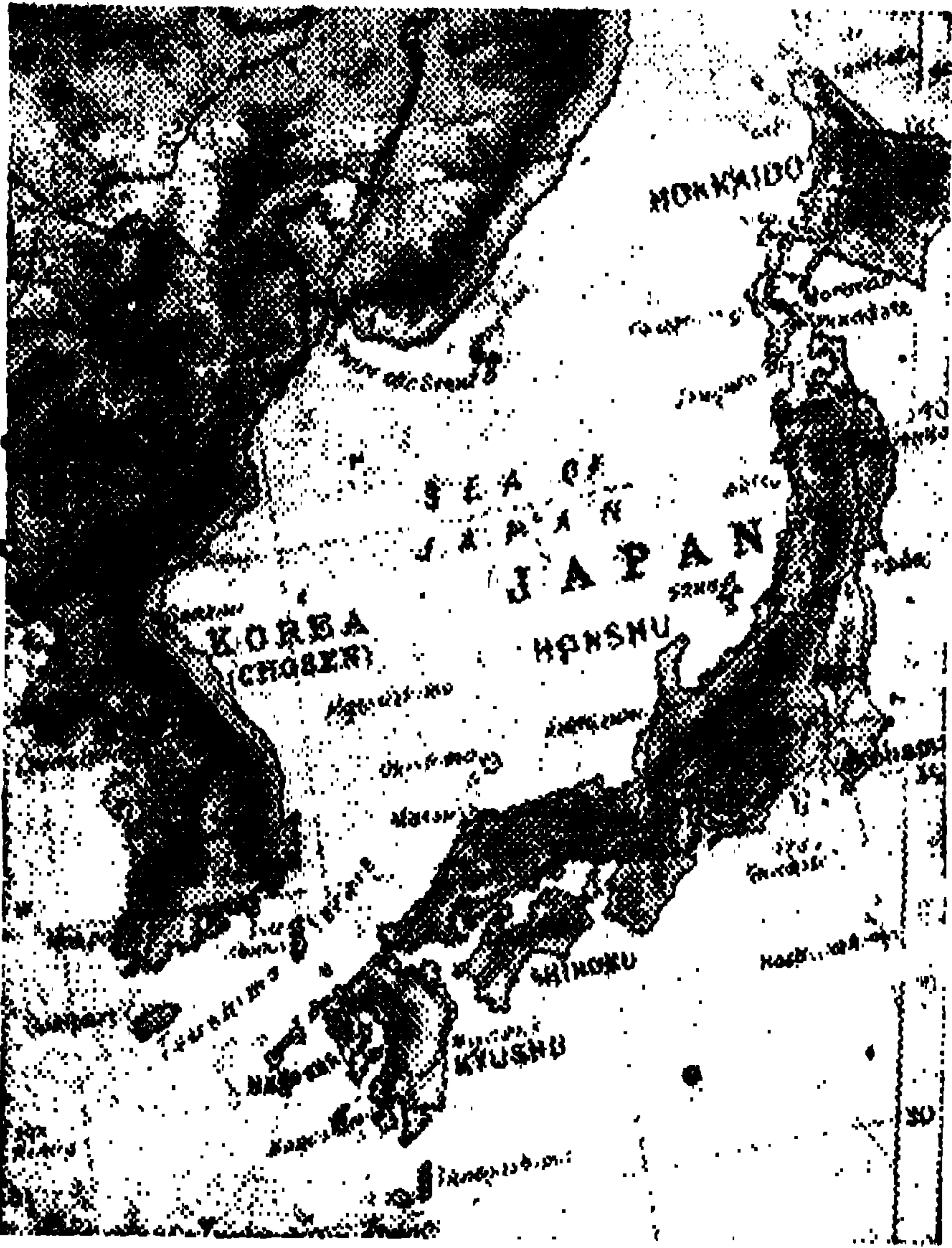
জাপান

পরিব্রাজক

জাপানী আতিথ্য

কুইরিন্‌টিনের সময় আমাদের জাহাজে একজন মধ্যবয়স্ক জাপানী ভদ্রলোক উঠ্‌লেন—আমরা তখন ইউকোহামা পৌঁছেছি। জিজ্ঞেস্ ক'রলুম, আপনি কি ইংরেজী জানেন? আমার সঙ্গে কয়েকখানি পরিচয়-পত্র আছে, দেখুন তো এগুলোর সদ্ব্যবহার কি ক'রে করা যায়?

পরিচয়-পত্রগুলির মধ্যে একখানি ইংরেজীতে লেখা আর দু'খানি জাপানী ভাষায়। ভদ্রলোকটি চিঠি কয়েকখানি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে বল্‌লেন, এ যে দেখ্‌ছি একই ব্যক্তির কাছে লেখা। ইউজো নোমুরা। তারপর একটু হেসে তার নিজের কার্ডখানি আমার হাতে দিয়ে বল্‌লেন, আমারি নাম ইউজো নোমুরা। আপনি কাস্‌টম্‌সে এই কার্ডখানি দেখালে আপনার জিনিষপত্র নিয়ে আর ঝামেলা ক'রবে না। হাঙ্গামা চুকিয়ে একবার আমার সঙ্গে দেখা ক'রবেন।



জাপান

জাপানে বেড়াতে এসে এই সহজ ভদ্রতাটুকু পেয়ে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। ইউজো নোমুরার কাছে অনেক উপকার পেয়েছি, এই তার সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টান্ত।

আমার সঙ্গে যা' টাকা-পয়সা ছিল তিনি তা' নিজের সিন্দুকে রাখ্‌তেন, আমার মালপত্র থাক্‌তো তারই গোডাউনে।

তাকে একদিন বলেওছিলাম, ম'শায়, আপনি যা' আমার উপকার ক'রলেন, তা' ভুল্‌বার নয়।"

তিনি প্রত্যুত্তরে কোন কথা না ব'লে একখানা ইংরেজী বই আমায় উপহার দিয়েছিলেন, 'জেন বুদ্ধের শিক্ষা'। বইখানি আমি পরম সম্পদ্-জ্ঞানে সযত্নে তুলে রেখেছি।

বিগত ভূমিকম্পের পর ইউকোহামা সহরের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটেছে। সহরটি নূতন ক'রে সংস্কার করা হ'য়েছে। মনে হ'ল যেন পশ্চিমদেশেরই কোন সহরে এসেছি। আধুনিক নির্ম্মাণ-পদ্ধতিতে রচিত নব নব সুরম্য অট্টালিকা আধুনিকতম আরকিটেক্‌চারের নবতম নিদর্শন।

রাস্তাঘাটে রিক্‌সাও কমে' এসেছে। নেই যে তা' নয়। অধিক বয়স্ক রিক্‌সাওয়ালা এখনও রিক্‌সা চালায়। যুবকেরা অবশ্যি ট্যাক্সি চালানোই বেশী পছন্দ করে। এক এক ট্যাক্সিতে দু' দু' জন যুবক, ভাড়া খাটিয়ে ট্যাক্সি চালাচ্ছে। আমাদের দেশে—ওয়াশিংটন সহরে ট্যাক্সি ভাড়া কম, এখানেই—উকোহামায় দেখ্‌ছি ওয়াশিংটন্‌কেও হার মানিয়েছে। ট্যাক্সি ভাড়া এখানে সত্যিই খুব কম। কোপেন্‌হেগের রাস্তায় রাস্তায় যেমন অসংখ্য বাইসাইকেল এখানেও তেমনি অসংখ্য বাইসাইকেল। বার্লিনে বহু ছোট ছোট মোটরগাড়ী, মোটর বাইক,—ইউকোহামায় দেখ্‌ছি, ততোধিক ছোট ছোট মোটরগাড়ী, মোটর বাইক। বরং আরও ছোট, এক সিলেনডারযুক্ত, শীতল হাওয়াপূর্ণ অসংখ্য ছোট গাড়ী। ছোট হ'লে কি হবে, আভিজাত্যে তারা ছোট নয়।

ইউজো নোমুরা সদাশয় ব্যক্তি, তিনি একজন সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো-ফেরৎ জাপানী ভদ্রলোককে গাইড্ হিসাবে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তার কাজ হ'ল আমাকে সহর দেখানো। লাঞ্চে নেমন্ত্রণ ক'রে তিনি আমায় কাঁচা-মাছ ও রাঁধা-অয়েস্‌টার খাইয়েছিলেন। কিন্তু উল্টোটা হ'লেই ছিল ভালো। রাঁধা-মাছ আর কাঁচা-অয়েস্‌টার খাওয়াই যে অভ্যাস! সে যা' হোক্, ডিনারে তিনি আমাকে খাওয়ালেন নানা সুখাদ্য, অথচ নিজে খেলেন শুধু ঠাণ্ডা ভাত ও চা। ভদ্রলোকটির জামাতা আমাকে একদিন সিনেমা দেখালেন আর তার বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ সিনেমা-অভিনেতা সেস্যু হওকার নিকট একখানি পরিচয়-পত্রও দিয়েছিলেন। সেস্যু হাওকা তখন ছিলেন ইউকোহামার বাইরে কামাকুরায়।

সুশীতল ফুজিসান্ আমায় ডাকছে

বেশ গরম পড়েছে। ইউকোহামা অসহ্য মনে হ'তে লাগল। দূরে মেঘের মাথায় ফুজিসানের অভ্রভেদী গিরিচূড়া আমায় ডাক দিল। পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ চূড়াটি ১২,৩৯৫ ফিট্ উচ্চ। ফুজিসান (ফুজিয়ামা) আমার ভাল লাগ্‌ল। কোনদিনই পর্ব্বতারোহী হিসেবে নাম করি নি, সাজসরঞ্জামও সঙ্গে নেই। ছাই-রঙের সুট্ প'রেই চল্‌লুম। বহু জাপানী পর্ব্বতারোহী গোটেম্বা ষ্টেশনে নাম্‌ছে—তাদের সঙ্গে মোটা মোটা লাঠি, অনেক জিনিষ-পত্তর, খড়ের মাদুর, প্রকাণ্ড টুপী, জুতোর উপরে পরবার জন্য কয়েক জোড়া ওভার সু দেখে একটু চিন্তিত ও ভীত হলুম, কারণ আমার কাছে সে-সব সাজসরঞ্জামের কিছুই নেই। সুবাশ্রীতে একটা সরাইখানায় সেখানকার মালিক্ আমার সঙ্গে বোঝা-পত্র নেই দেখে মনে মনে একটু হাস্‌লেন। নৈশ-ভোজনের সময় তিনি আমার সাম্‌নে একখানা ছাপানো ফর্দ্দ মেলে ধরলেন। কি ব্যাপার? না, ফুজিয়ামা পাহাড়ে উঠ্‌তে হ'লে কি কি জিনিষ-পত্র লাগ্‌বে তারই ফর্দ্দ। বোঝা গেল মালিকের কাছে উক্ত জিনিষপত্র সবই পাওয়া যাবে।

আমি যখন বল্‌লুম আমার কিছুই চাই না, তিনি সে কথা কিছুতেই বিশ্বাস কর্‌তে চান না। আমি বল্‌লুম, না, আমার গাইড্ চাই না, লণ্ঠন চাই না, জুতো চাই না, টুপী চাই না, মাদুর চাই না,—এমন কি, একখানা মোটা লাঠিরও আমার দরকার নেই।

বিষণ্ণ-কণ্ঠে ভদ্রলোকটি বল্‌লেন, পাহাড়ে উঠ্‌তে অন্ততঃ একখানা লাঠির যে বিশেষ দরকার।

রাত্রিবেলা বেশ ঠাণ্ডা মনে হ'ল। যদি দ্রুতবেগে আরোহণ করা য'য় তবে ভোর হ'তে না হ'তেই পর্ব্বতচূড়ায় ওঠা যাবে। পথে যেতে যেতে কয়েক জায়গায় পাথরের নির্ম্মিত বিশ্রাম-ঘরে বিশ্রী চা ও ততোধিক নিকৃষ্ট সাইডার উৎকৃষ্ট দরে পাওয়া গেল। দু'টি কি একটি ইয়েন দিলে মাটির মেজেতে খানিকটা ঘুমিয়েও নেওয়া যায়।

বৃহৎ বোঝা সঙ্গে নিয়ে বহু জাপানী-পর্ব্বতারোহী পিছন থেকে এসে আমাকে ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন। নিম্ন উপত্যকায় যতক্ষণ ছিলাম, ততক্ষণ বিশ্রীরকমের গরম বোধ হচ্ছিল, কিন্তু প্রভাত হওয়ার পূর্ব্বেই মনে হ'ল, একটা মোটা ওভারকোট সঙ্গে থাক্‌লে ভাল হ'ত।

চূড়ার কাছাকাছি বায়ু নির্ম্মল। পথ চন্দ্রালোকোদ্ভাসিত। নীচে শুভ্র মেঘপুঞ্জ। উঠ্‌তে কষ্ট হচ্ছে। মাঝে মাঝে বিশ্রাম করি। বেশীক্ষণও বিশ্রাম করা যায় না, ঠাণ্ডা হাওয়া। আবার চলা সুরু করি। ভোরের আলোর তখনও বহু দেরী। রজতশুভ্র মেঘমালা টোকিও ইউকোহামার উপর ভেসে বেড়াচ্ছে।

আকাশ স্বচ্ছ হ'য়ে এল। এবার সুবর্ণদ্যুতি! রজনীর দীপাবলী নির্ব্বাপিত। সমুদ্রগর্ভ হ'তে সূর্য্য যেন সহসা এক লাফে অনেকটা উপরে উঠে এল—সুপ্রভাত।

ফুজিয়ামার গিরিশৃঙ্গে গ্রীষ্মকালে যেন কর্ম্মব্যস্ত নগর বসে। অনেক বিশ্রামাগারে আগুন রাখা হয়। একটি গরম মেজেতে গুটিসুটি হ'য়ে ব'সে আরাম করা গেল। পথে পথে ঘুমাবার খরচ যা' দিতে হয় গিরিশৃঙ্গে ঘুমাবার ভাড়া তার চেয়ে কম। প্রতিযোগিতার জন্যই যা' একটু বেশী—তথাপি মাত্র ১৪ সেণ্ট।

সহসা আমারি মত একজন আমেরিকাবাসীর কণ্ঠস্বরে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুম-ভাঙ্গা বিস্মিত-চোখে চেয়ে দেখি সানফ্রান্সিস্কোতে যে বন্ধুটির সঙ্গে পরিচয় হ'য়েছিল ইনি তারই ভাই। এবার দু'জনে অদিম্যসহকারে বেরিয়ে পড়লাম—এ-পথ সে-পথ ঘুরে আগ্নেয়গিরির মুখে যাওয়ার জন্য একটি ঠাণ্ডা গেট দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আগ্নেয়গিরির মুখের ভিতর নাম্‌লাম। তৃষ্ণা পেয়েছিল—জল খুঁজলাম। জল পান করবার মত সাহস খুঁজে পাচ্ছিলাম



কামাকুরার বিরাটকায় ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি

না, তবু তৃষ্ণার্ত্ত ব'লে জল পান ক'রে সুস্থ হওয়া গেল। এই আগ্নেয়গিরি-মুখে লোকে কত কি যে আবর্জ্জনা ফেলে রেখেছে তার ইয়ত্তা নেই। এ যেন একটা প্রকাণ্ড ডাষ্টবিন। হাজার হাজার যাত্রী বহু দিন ধ'রে এখানে ভাঙ্গা বাসন, চাউলের বাক্স, ছেঁড়া জুতো, কাগজের টুকরো ইত্যাদি নানা প্রকারের আবর্জ্জনা জড়ো ক'রে রেখে গেছে।

প্রকৃতিই খাবার যোগাড় ক'রে রেখেছেন

পায়ে হেঁটে নীচে নেমে চলেছি। লম্বা লম্বা পা ফেলে। তালে তালে পা ফেলে চলেছি। কিন্তু মাঝে মাঝে থাম্‌তে হচ্ছে। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে শেষ যেবার এই আগ্নেয়গিরিটি সক্রিয় হ'য়েছিল তারই ছাই এই ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে জুতো থেকে ঝেড়ে ফেলছি। প্রথম যে প্রাচীন মোটা গাছটি পাওয়া গেল

তারই পাদদেশে আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় ফেলে রেখে বন্ধুটি চলে গেলেন। কোথায় যেন পড়েছি যে, ফুজিয়ামায় খুব ভালো ষ্ট্রবেরী পাওয়া যায়। ঘুম থেকে উঠেই ষ্ট্রবেরীর খোঁজ করলুম। আবর্জ্জনাস্তূপের পেছন দিক্‌টায় এক জায়গায় চমৎকার একটা ষ্ট্রবেরীর জঙ্গল পাওয়া গেল। সেদিন যে আনন্দে ষ্ট্রবেরী খেয়েছিলুম, জীবনে অত আনন্দ ক'রে আর হয় ত' ষ্ট্রবেরী খাব না।

কামাকুরায় প্রকাণ্ড একটি বুদ্ধ মূর্ত্তি দেখলুম। সেখানকার সমুদ্রতীর আমার ভাল লাগল। একটি বাসনের দোকানে, কয়েক সেণ্ট খরচ করে



নমস্কার করার প্রথাও কত সুন্দর

আমি কাঁচা পোরসেলিন কিনে, নিজে রঙ্গ করলুম, তারপর সেখানে সেটাকে পুড়িয়ে নিলুম। ছাইদানী ও চায়ের বাটীতে রসিকতা করে আমেরিকান বন্ধুদের জন্য লিখলুম, "জাপানে কামাকুরার 'বিল্ ভোনের' জন্য মহামান্য সম্রাটের খাস্ পটার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।"

একটি স্কুলের ছাত্র কৌতূহলী হয়ে দেখছিল। তার সাধ্যমত বিশুদ্ধ ইংরেজীতে বললে, "আমার একছত্র লিখে দিন না?"

সমস্ত অপরাহ্ণ বাসন চিত্র করা গেল। লিনকন্, ফ্রাঙ্কলিন প্রভৃতি আমেরিকার বড় বড় লেখকের, যাদের যাদের লেখা মুখস্ত ছিল, তাদের লেখা থেকে নানা পংক্তি উদ্ধৃত করলুম। দেখতে দেখতে বহু বালক-বালিকা দু'চার সেণ্ট দিয়ে কিছু বাসন কিনে এসে আমায় কিছু লিখে দিন, আমায় কিছু লিখে দিন, বলে কোলাহল করতে লাগল। দোকানের মালিক খুশী হয়ে আমাকে চা ও কেক কিনে খাওয়ালেন।

ইউকোহামা থেকে টোকিও আধঘণ্টার পথ। আট মিনিট অন্তর ট্রেন। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে নীল রঙের কুশন-আঁটা—ভীড়ও অসম্ভব। দ্বিতীয় শ্রেণীর দ্বিগুণ ভাড়া, কুশনের ফার্ণিচারের রঙ সবুজ—প্রায় খালিই থাকে। অল্পক্ষণের জন্য যাতায়াতের জন্য প্রথম শ্রেণীর কোন গাড়ীই থাকে না—কেবল মাত্র যখন সম্রাট যাতায়াত করেন তখন প্রথম শ্রেণীর গাড়ী জুড়ে দেওয়া হয়।

মাঝে মাঝে আমি ইম্পিরিয়াল হোটেলের লবিতে বসে বিশ্রাম করতুম—বিদেশী যাত্রীদের প্রিয় বিশ্রামের স্থান। হোটেলটি ভূমিকম্প-প্রুফ, পাহাড়ের উপর তৈরী। সেখানে একদিন একজন বিমানবিহারী বন্ধু ও আমি উইল রজার্সে'র সঙ্গে গল্প করেছিলাম।

আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ রসস্রষ্টা বিমানবিহারী বন্ধুটির উড়বার কৌশল ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা কৌতুকালাপে মত্ত ছিলেন। বন্ধুটির একটি অদ্ভুত মত এবং ধারণা এই যে বিদেশে যে, সকল জাপানী জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা স্বদেশজাত জাপানীদের চেয়ে ভাল বৈমানিক।

আর এক সময় ব্রাজিলিয়ান রাজদূত, গাবগেজ ডু আমারেলের নিকট জাপান সম্বন্ধে—জাপানীদের জীবনধারণ প্রণালী সম্বন্ধে নানা কথা শুনেছিলাম। একদিন তিনি বললেন, 'সম্রাটের প্রতি অসম্মান দেখাবার কারও অধিকার নেই। তিনি যে পথে যাতায়াত ক'রবেন সে পথের দু'ধারের উপরের জানালা বন্ধ করে দিতে হবে— তবে তিনি যাবেন। রাজার প্রাসাদের উপর দিয়ে বিমানপথে উড়ে যাওয়া নিষিদ্ধ।' "কিন্তু একজন তাঁকে নীচুচক্ষে দেখেন।"

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, কে তিনি?

"সুইস্-রাজদূত! ভদ্রলোক অসম্ভব রকমের লম্বা। রাজা রাজতক্তে বসেও উঁচু হয়ে না তাকালে তার সঙ্গে কথা বলতে পারেন না। আর রাজদূত নীচু হয়ে রাজার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন!"

রং করা নয় শুধু পালিস্ করা কাঠের ফার্ণিচার

বহুদিনের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা জাপানে বিদ্যমান থাকলেও আজও জাপান প্রকৃতির কাছাকাছি রয়েছে। জাপানে কেহ ফার্ণিচারে রং করবে

না কিম্বা বাড়ীতে কাঠের নির্ম্মিত কোন কিছুতে রং ছোঁয়াবে না। সাদা-মাঠা ঝক-ঝকে পালিস্ করা কাঠের কার্ণিচারই জাপানীদের বেশী পছন্দ। গৃহনির্ম্মাণের উপযুক্ত কাঠের কড়িবর্গাগুলি, বিশেষতঃ যেগুলি গৃহাভ্যন্তরে লাগানো হয়, চারদিকে পালিস্ করা হয় না। দু দিক বা তিন দিক পরিস্কার করলেও একটা দিক এবড়ো খেবড়ো—কাঠের প্রকৃত স্বরূপ যেটি সেইটিই বজায় রাখা হয়। গাছের খানিকটা ঠিক যেমনি অসংস্কৃত তেমনি অসংস্কৃত অবস্থায়ই লাগানো হয়।

কেবল যে শুধু পাখীরাই মাটি খড় কুটো সংগ্রহ করে বাসা তৈরী করে তাই নয়, জাপানে দেখলুম কাঠ ও মাটির দেয়াল, কাগজের দরজা, খড়ের ছাউনি-দেওয়া ঘর, প্রকৃতিজাত দ্রব্য-সামগ্রীর নানাবিধ অসংস্কৃত ব্যবহার।

গরমেরদিনে মহিলাদের দেখেছি, তাদের মধ্যে অনেকে খুব সুন্দরী, বাগানে যখন কাজ করেন কটিতটের উপরে আর কোন আবরণ থাকে না। অবশ্য এই অভ্যাস পল্লী অঞ্চলেই বেশী—এবং পুরাতন সহর যেমন নাইগাটা ইত্যাদি সহরেই মহিলাদের স্বল্পাবরণে দেখেছি। প্রকাশ্যে ছেলেমেয়েদের স্তন্যদান বোধ হয় জাপানে সর্ব্বত্রই সমান প্রচলিত।

একজন অতিথি বাড়ীতে এলে তিনি আসতে না আসতেই দরজায় কোন টোকা না দিয়ে কিম্বা কড়া না নেড়েই জোচু তার জন্য চা পরিবেশন করতে আসবে। জোচু হচ্ছে চাকরাণী বা পরিচারিকার জাপানী প্রতিশব্দ। নিকেকা সরাইখানায় আমাকে চা পরিবেশন করতে যে তরুণী পরিচারিকা এল সে সুন্দরী। লাজ-নম্রা, এবং বেশ একটু গম্ভীর প্রকৃতির। এসে ঠিক আমার সামনেই চুপ করে বসে রইল—আমার কিছু দরকার আছে কি না। আমাকে সাহায্য কি করে করবে এই তার মনোগত ভাব। আমি খাচ্ছিলাম। চুপ করে খেতেই লাগলাম। আমার পোষাক ইস্তিরি করা, মোজা রিপু করা সমস্ত কাজই সে করে দিল। সকালে যখন ঘুম ভেঙ্গে গেল তখন দেখলুম আমার মশারীটা বেলা উঠবার অনেক আগেই নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কখন এসে সে তুলে রেখে গেছে আমি জানতেও পারি নি। কখনও বা আমি অসতর্ক বসে আছি, সে ঘরে ঢুকে আমাকে তদ্রূপ অবস্থায় দেখে তক্ষুণি চলে যায় নি, কিম্বা ঘুণাক্ষরে আমায় জানতে দেয় নি যে কাজটি শোভন হয় নি—জাপানে জাপানীদৃষ্টিতে সে কিছু অশোভন মনে করে নি।

আর কেন তবে বেঁচে থাকা সহিতে দুর্গতি!

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ভ্রাতৃহিংসা-দ্বন্দ্ব-দ্বেষ মাতৃদ্রোহ কেন ক'রে সবে?
সভ্যতার একি পরিণতি!
সংসারের শান্তি যদি নাহি আসে, আর কেন তবে—
বেঁচে থাকা সহিতে দুর্গতি!
শত শত বর্ষ ধরি' যে ধরিত্রী স্তন্য দিয়া তার
পুষ্ট করে আপন সন্তানে,
তার মৃত্যুশয্যা রচি' সে সন্তান মিথ্যা অহঙ্কার
বিস্তারিল স্বার্থের সন্ধানে।

মদরসে মত্ত যুগ ধ্বংস পথে বাজায় বিষাণ,
যুগযাত্রী ক'রে দুঃখ ভোগ।
উমার তপস্যা আজি ভঙ্গ ক'রে পাশব বিজ্ঞান,
বাসবের দগ্ধ স্বর্গলোক।
বিদারণ বিদ্রাবণ রণোল্লাসে বহে রক্তধারা,
আসে মৃত্যু যন্ত্র-আমন্ত্রণে;
সভ্যতার বর্ব্বরতা কাঁপায়েছে সূর্য্যশশী তারা,
কুরুক্ষেত্র অহল্যা-ক্রন্দনে।

মাটির স্নেহের ধন করেছে যে মাটিরে বঞ্চিত,
অভাগিনী রহিবে কি বেঁচে?
যতেক সম্পদ তার সৃষ্টি হ'তে হয়েছে সঞ্চিত,
লুটিবারে দস্যু আসে নেচে।

মাটির মায়ায় কাঁদে স্রোতস্বিনী পঙ্কিল পল্বলে,
জ্বলে চিতা তপ্ত বালুচরে;
লক্ষ্মীরূপা ধান্যদেবী পুড়িতেছে বীভৎস অনলে,
কৃষাণের নাহি অন্ন ঘরে।

অশ্রুজ্বরে ক্লান্ত মাতা বসুন্ধরা শোকদুঃখ সয়ে'
হারাবে কি প্রাণের স্পন্দন?
আত্মত্রাণ শক্তিহীন প্রাণীদল মরে বিপর্য্যয়ে
থামেনাক বোমার গর্জ্জন।
শূণ্যমনে বসে আছি ভাষাহীন ব্যথা ল'য়ে বুকে,
নভে ওড়ে বিমান-কর্ব্বুর;
নভোপথ হ'তে নামে বহ্নিশিখা লোল-জিহ্ব মুখে
ভস্মীভূত স্বপন সুদূর।

রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে রণমাঝে গৃহে গৃহে চলেছে কলহ,
সমাজের ধরেছে ভাঙ্গন,
এ অশান্তি এ যন্ত্রণা দিনে-দিনে হতেছে অসহ,
অসম্ভব জীবন যাপন।
লভিব কি ধরণীতে দেবতার শান্তি-আশীর্ব্বাদ
কোন দিন জীবসিন্ধুতীরে!
প্রশান্তির স্নিগ্ধালোকে জাগিবে কি প্রসন্ন প্রভাত
বসন্তের আনন্দসমীরে!

ক্ষণবসন্ত

শ্রীরণজিৎ কুমার সেন

লোকটা শেষ পর্য্যন্ত পাগল হ'য়ে গেল।

ভগবান মানুষকে প্রতারণা ক'রলে অদৃষ্টের চাকা এম্‌নি ক'রেই ঘোরে।

দারিদ্র্যে, দুঃখে, নির্য্যাতনে লোকটা অনেক কষ্ট সহ্য ক'রে অনেক যায়গার অভিজ্ঞতা নিয়ে আজও পৃথিবীর মাটিতে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। কিন্তু বাইরের বস্তু-জগতের সহস্র ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও মনের সেই সজীবতা নিয়ে আজ আর সে বেঁচে নেই। গত দিনগুলির সত্ত্বা তার মধ্যে নিঃশেষ হ'য়ে গেছে। আজকের আকৃতি গত দীর্ঘ চল্লিশ বছরের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে লোকটাকে যেন বিদ্রূপ ক'রতে চাইছেন অথচ এমনটা তো সে কোনোদিন ভাবতেও পারে নি। চোখের সামনে সে কত মানুষকে ম'রতে দেখেছে, কত মানুষকে সে নিজের হাতে মাটি খুঁড়ে 'গোড়' দিয়েছে; কিন্তু তার আজ এমন মৃত্যু হোলো কেন? পৃথিবীর বুক থেকে কত লোকের কত প্রিয়পাত্র তো চোখের সাম্‌নে মুছে যাচ্ছে, কত লোকের কত কল-কারখানা, ইমারৎ, কত সভ্যতার সামগ্রী ধ্বংস হ'য়ে যাচ্ছে, আগুনে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে! সবাই কি এমন ক'রে পাগল হ'য়েছে,...সবাই কি অনুভূতির দ্বারে এমন ক'রে মরে' আছে? অথচ তার কেন এমন আজ মস্তিষ্ক-বিকার ঘটলো? আবার যদি কোনোদিন তার স্মৃতি-শক্তি ফিরে আসে, তবে সে বিংশ শতাব্দীর পৃথিবী-মর এই নগ্ন সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের উপরে দাঁড়িয়ে একবার ভৈরবী নাচ নেচে নেবে; ব'লবে—"আমার প্রিয়জনকে যারা আগুনে পুড়িয়ে মেরেছ, তোমাদের সেই বর্ব্বর মনের উদগ্র লালসা নিয়ে চিরদিনের মতো তোমরাও এই ভগ্নস্তূপে ঘুমিয়ে থাকো। তোমাদের আর জাগ্‌তে হ'বে না,—পৃথিবীর ত্রাণ ক'রতে আর তোমাদের প্রয়োজন হবে না।"

কবে আবার জগুয়ার মাথায় সেই সক্রীয় শক্তি ফিরে আস্‌বে? পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েই যে তার দিন গেল। কাউকে কাছে পেলে জড়িয়ে ধরে' হেসে ওঠে, কখনো বা বলে, "ছিঃ লছ্‌মি, ভয় কি? এই যে আমি র'য়েছি। লক্ষ্মী মা আমার, চুপ ক'রে ঘুমো দিকি।"...কিন্তু লছ্‌মির বুঝি আর ঘুম আসে না! মাথার উপর দিয়ে বোঁ ক'রে কখন এক-খানি টহল-প্লেন উড়ে যায়! রক্তচক্ষে দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ ক'রে জগুয়া অম্‌নি খাড়া দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—"নিকাল্ যাও।..."

টহল-প্লেন দ্রুতগতিতে নিজের শব্দে উড়ে যায়।

এ তল্লাটে জগুয়ার ইতিহাস আজ আর কারুর অজানা নেই। জীবনের প্রথম অধ্যায়টা কেটেছে ওর বাড়ী বাড়ী গোলামী ক'রে। গোলামী বৃত্তি সেই থেকে ও আর ছাড়তে পারে নি। বাবু ভায়ারা ছেলেমেয়েদের কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ ক'রেছে, ফাই-ফরমাস খেটেছে আর কর্ত্তা-মনিবের কোট-ট্রাউজারের দিকে চেয়ে চেয়ে চোখের জলে ভগবানকে অভিযোগ জানিয়েছে,—"হায় দয়াল, আমি তো তোমার কাছে কোনো অন্যায়ই করি নি যে, ছোট ক'রে, দুঃখী ক'রে আমাকে রাখলে!"...দয়াল কিন্তু তবু বালক-জগুয়াকে দয়া করেন নি কোনো দিনই।

অথচ মাঝে মাঝে মনিবের ছেঁড়া কাপড়টা, ছেঁড়া কোর্ত্তাটা যদি কখনো কৃপার দৃষ্টিতে এসে জগুয়ার ভাগ্যে জুটেছে, তবে তার সাত পুরুষের দয়ালের দান ব'লে মাথায় তুলে নিয়ে সারাদিন সে কত খুশীতেই না কাটিয়েছে! দয়াল তার অদৃশ্যে থেকে হয় তো তখন বিকৃত হাসি হেসেছেন!

পৃথিবী স্বার্থপর, দেবতা স্বার্থপর, প্রকৃতির এই অসীম শ্যামলতা—সবই এক বিরাট স্বার্থপরতায় ভরা। এত প্রতি-দ্বন্দ্বিতার মধ্যেও জগুয়া কখনো তবু নিজের কাজে বিচলিত হয় নি। অনেক দিন সে এই নিষ্ঠুর তাপদগ্ধ গোলামত্বের নির্ম্মম শৃঙ্খল-পাশ ছিঁড়ে ফেল্‌তে চেয়েছে, কিন্তু গোলামী-বৃত্তি তাকে ছাড়ে নি। যতই দিনে দিনে সে বেড়ে উঠেছে, কুলশীল প্রভুত্বের অধিকার ততই তাকে আরও নিম্নগামী ক'রে নির্য্যাতনের পথে টেনে নিয়েছে। গোলামত্ব তার অক্ষুণ্ণই র'য়ে গেছে।

এমনি ক'রেই পলে পলে জীবনের প্রথম অধ্যায় শেষ হ'য়ে কবে তার দ্বিতীয় পর্য্যায় সুরু হোলো, কোনোদিন মাস-

ফল গণনা ক'রে জগুয়ার তা' খুঁজে দেখবার বোধ জাগেনি কখনো। বাড়তি বয়সে একদিন সে হঠাৎ আবিষ্কৃত হোলো আসামের জঙ্গলে। সেটা তের শ' কত সালের কথা।

কড়া মেজাজী এক ম্যানেজার সাহেবের অধীনে সামান্য একজন কুলীর কাজ নিয়ে জগুয়া এসে ভর্ত্তি হ'য়ে পড়ে এখানকার এক চা-বাগানে। বাগানটা বড় না হ'লেও ব্যবসা বড়। ফাঁকিবাজি ধরা প'ড়বার ভয়টা সব সময়ের। জগুয়াকে বিষয়টা একদিন জানিয়ে দিলে তারই কোনো সহকর্ম্মিণী মুংলী—নামটা সুন্দর, আরও সুন্দর তার দাঁত-গুলো। বসে' বসে' শুধু ওর হাসি দেখতেই ইচ্ছে করে। জাতে হয় ত' ভাটিয়া হবে, কিন্তু চেহারাটা পেশোয়ারী। জগুয়ার মনে এতদিনে সত্যি বুঝি যৌবনের জোয়ার এলো! দারিদ্র্য আছে, দুঃখ আছে, পরাধীনতার গ্লানি আছে, তবু তার মনে হোলো—এমন কাউকে পেলে হয় ত' সমস্ত জ্বালা থেকে সে অন্ততঃ কিছুটা কালের নিষ্কৃতি পেতে পারে, যে হবে মুংলীরই মত ঋজু—কল্যাণী হাস্যময়ী।

জগুয়ার মনে মুংলী রীতিমত স্বপ্ন এনে দিল। শুক্‌নো পাতার উপর দিয়ে মুংলী যখন কোমর দুলিয়ে হেঁটে যায়, পায়ের নীচে ঝরাপাতার মর্ম্মর শব্দে তখন কি বিচিত্র সুর-ই না বেজে ওঠে! মাতাল ক'রে দেয় জগুয়াকে। কাজের ভাবনা ওর মিলিয়ে যায় আকাশে। অপলক নেত্রে চেয়ে চেয়ে মুংলীকে ও উপভোগ করে ওর সারা দিনের তৃষিত চিত্ত দিয়ে। মাঝে মধ্যে কখনো বা কর্ত্তব্যকে সজাগ করিয়ে দিয়ে মনিবের বুটের স্পর্শ এসে জগুয়ার সকল স্বপ্নকে ভেঙে দিয়ে যায় নির্ম্মমভাবে। সাশ্রুনেত্রে সে আবার ফিরে আসে এই কঠিন বাস্তবে।

দিন তার এমনি ক'রেই চলে।

সেদিন ছুটির ঘণ্টা ঘড়ির কাঁটায় বেজে গেছে। জগুয়া এসে এক ঘড়া তাড়ি খেয়ে সোজা শুয়ে পরেছে তার বস্তিতে। আকাশে ত্রয়োদশীর চাঁদের রেখা।···মুংলী এসে ডাক্‌লে,—"জগুয়া।"

নামের নেশায় ওর তাড়ির নেশা ছুটে যায়। লাফিয়ে উঠে জগুয়া এসে ঘরে ডেকে নেয় মুংলীকে।

"মহুয়া খাবি জগুয়া? তোর লেগে কত্তো এনেছি, ছাখ।" মুংলীর সারা চোখে কি অপূর্ব্ব দীপ্তি!

জগুয়ার প্রাণ আচ্ছন্ন হ'য়ে যায়। সত্যি কি মুংলী তবে ওর—! সত্যি কি মুংলী ওকে ভালোবাসে? তবু ওর ভয়, বুটের শব্দ কানে আসে না তো! চারপাশে জগুয়া একবার টালুমালু চেয়ে নিলে।

হেসে মুংলী বল্‌লে, "ভয় কি রে? আজি তো ছুটি। সায়েব কুটীরে গিয়ে খানা খাচ্ছে।"

আনন্দে জগুয়ার সারা মুখ রক্তিমতায় ছেয়ে যায়। নিজের অলক্ষ্যেই মুংলীর কোমল হাতের আঙুলগুলি কখন জগুয়ার হাতে এসে ধরা দেয়,—বুকের মধ্যে রক্তকণাগুলি ওর নেচে ওঠে। এমন ঐশ্বর্য্য সুখ সে কি কোনদিন ভাবতে পেরেছিল!

"কই, মহুয়া খেলি নে?" জগুয়ার শক্ত হাতে ঝাকানি দিয়ে মুংলী আবার ব'ললে।

কিন্তু মহুয়া খাবার উৎসাহ তো জগুয়ার নেই। মহুয়ার চেয়েও মিষ্টি যে এই মুহূর্ত্তগুলো;—এমন ক'রে আর কি সে কখনো মুংলীকে কাছে পাবে! বললে, "না, গল্প কর।"

মুংলী শুন্‌লে না। জোর ক'রে কয়েকটা জগুয়ার মুখে পুরে দিয়ে হি-হি ক'রে হেসে উঠলে, বললে, "দেখেছিস, আকাশে চাঁদ উঠেছে। পূর্ণিমাতে আমাদের মহুয়া-উৎসব; তু যাবি নে?"

জগুয়ার বিশ্বেস হ'তে চায় না—তার দিক থেকে সে-উৎসব আজকের এই নিভৃত আনন্দের চেয়েও বেশী মধুর কিছু হ'তে পারে। ব'ললে, "সেদিন কি এতো রোশনাই থাকবে রে?

মুংলীর বুঝতে বাকী থাকে না। চুপ ক'রে তাই কাটিয়ে দেয় খানিকক্ষণ।

জগুয়া অসহনীয় হ'য়ে ওঠে নিজের মধ্যে। এমন মধু-যামিনী আর কি তার জীবনে আসবে? কাছে টেনে নিয়ে ব'ললে, "তু আমারে ভালবাসিস?"

"বাসি না? তু যে আমার মরদ রে।"

মুংলীও হয় ত' এমনি একটা জবাবের প্রতীক্ষা ক'রছিল ক'দিন থেকে। আজ তার শেষ মীমাংসা হ'য়ে গেল। মুহূর্ত্তে কথাটা ব'লে তাই একেবারে ঝুকে প'ড়লে সে জগুয়ার বুকের 'পরে।

দূরে মিষ্টিসুরে কোথায় একটা জংলাপাখী ডেকে উঠলো।

এমনি ক'রেই এ'-দু'টি অজানা হৃদয়ের গোপন প্রেমে চা-বাগানের একটা এঁদো বস্তি দিনে দিনে লাবণ্য-সিক্ত হ'য়ে উঠলো। মনিবের উদ্ধত বুট তখন নিস্তেজ হ'য়ে গেছে। জগুয়ার কর্ম্মস্পৃহা বেড়েছে। মুংলীর রূপের কাছে প্রকৃতির শ্যামলতা আজ যেন তার চোখে একেবারে অর্থহীন—স্যাঁৎ-সেঁতে লাগে!

এরপর কয়েকটা বছর কেটে গেছে। কোম্পানীর কাজে জগুয়ার পদোন্নতি হ'য়েছে। মুংলী তাই ব'লে কাজ ছেড়ে দিয়ে ঘরকন্নার ভার নিয়ে ব'সে থাকে নি। পাশাপাশি দু'জনের আয়ে বস্তি তাদের পদে উঠেছে। সাথে তার টুকটুকে কোলজোড়া মেয়ে—লছমি। সাত রাজার ধন ওদের লছমি। মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী। কত বেছে তবে ঐ ওর নাম রেখেছে। জগুয়ার তবে বুঝি ভাগ্য ফিরলো! লছমিও ঘরে এলো, সেও নিরেট একজন কুলী থেকে দলের সর্দ্দারী পদ পেয়ে গেল। লছমিকে কোলে ক'রে জগুয়া আনন্দে ধৈর্য্যহারা হ'য়ে যায়।

কত আশা বুকখানিকে আজ ওর নাড়া দিয়ে যায়। নিজে কোনোদিন সুখের স্বাদ পেল না। ছোটবেলায় সংসারের আসক্তি ভুইয়ে পথে পথে গোলামী ক'রেই কাটলো। এক টুক্‌রো ন্যাক্‌ড়ার জন্যে বাবুদের মুখের পানে চেয়ে চেয়ে কত বসন্ত ওর নিঃশেষ হ'য়ে গেল। জীবনটাকে নিয়ে কতবার চিন্তা ক'রে দেখেছে,—একটা লক্ষ্যে এসেই সব ভাবনা ওর ডুবে গেছে; জেনেছে—পৃথিবী একমাত্র বড়লোকেরই লীলা-ক্ষেত্র, গরীবের সেখানে স্থান নেই। কিন্তু হিসেবের খাতায় বড়লোকের সংখ্যা কত বেশী হ'তে পারে?…হাজার? লক্ষ? কোটি?—মিথ্যে কথা। পৃথিবীর মানুষের হিসেবে তো এত বড়লোক থাকতে পারে না! যদি থাকবে, তবে গরীব কারা? কারা আজ পৃথিবীময় তারই মতো পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে? এতটুকু সুখ, এতটুকু স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে এই যে সংখ্যাতীত নর-নারী দিনে দিনে চোখের জলে কঠিন মাটিকে সিক্ত ক'রে তুলছে—এরা তবে কারা? জগুয়া তো তাদেরই একজন,—তাদেরই মতো ছন্নছাড়া, তাদেরই মতো সর্ব্বহারা। কিন্তু না, তবু তো সে শুধু নিরেট ভিখারীর মতই পথে পথে অশ্রু বিসর্জ্জন ক'রেই দিন কাটায় নি। নিজের শক্তিকে সে কাজে খাটা'তে চেয়েছে, বাঁচতে চেয়েছে তার উন্নত মনের আদর্শ নিয়ে। বাঙালীপাড়ায় থেকে থেকে বাঙালীপনায় সে এক রকম অভ্যস্ত হ'য়ে গেছে,—কত লোক কত দিন তাকে আশ্বাস দিয়েছে,—"তোকে আপিস্‌-বাবুদের আর্দ্দালীতে ঢুকিয়ে দেবো, ভালো মাইনে পাবি, কত রকমের ছুটি পাবি, বুড়ো হ'য়ে পেন্সন ভোগ করবি।" তবু জগুয়ার ভাগ্যে তা' মেপে ওঠে নি; এতটুকুও যদি সে অক্ষর চিন্‌তো—তা' হ'লে তবু হয় তো সুখের মুখ সে দেখতে পেতো। কিন্তু নসিব! অদৃষ্ট তাকে প্রতারণা ক'রেছে।

লছ্‌মিকে কোলে করে জগুয়ার আজ তাই বড় ভাব্‌না, বড় আশা,—কোনোদিন ওকে সে আর তাদের মতো ক'রে এমন ঘানি টান্‌তে দেবে না। নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে ওকে সে মানুষ ক'রে তুলবে, বড় ক'রে তুলবে। গরীব বাপের মেয়ে হ'য়ে গরীব কেন থাকবে ও? ওকে সে বিয়ে দেবে বড়-লোকের ঘরে। বিত্তশালী সেই স্বামীর অর্থ দিয়ে ও বাঁচিয়ে তুলবে হাজার হাজার নিরন্ন ক্ষুধাতুর প্রাণীকে। পৃথিবীর ওপারে থেকে সেদিন হয় তো তবে তার এতকালের এই পথ-চাওয়া তৃষিত আত্মার শান্তি আসবে!

কঠিন দু'টি বাহু দিয়ে আরও শক্ত ক'রে লছ্‌মিকে উত্তপ্ত বুকখানির মধ্যে চেপে ধ'রে জগুয়া অনর্গল ওকে চুমো খেতে থাকে,—"বাচ্চি মা আমার, সত্যি তুই বড় হ'য়ে উঠ্‌বি তো?"

লছ্‌মি শুধু হাত নেড়ে নেড়ে তুলতুলে গাল দু'টিকে বিচিত্র হাসির রঙে রাঙিয়ে তোলে।…

কিছুদিন বাদে এক নূতন ম্যানেজার এসে বাগানের পুরোনো ম্যানেজারের গদি দখল ক'রে বসলো। ডেস্‌পাস্‌-ক্লার্ক থেকে কুলীদের মনে পর্য্যন্ত একটা আশার সঞ্চার হ'য়ে উঠ্‌লো—যা' হোক্‌, এবারে বুঝি তবু কতকটা স্বস্তি পাওয়া যাবে! কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। কর্ম্মচারী-জীবন—কর্ম্মের ঘানি টেনে টেনেই জীবনের প্রদোষকালকে ঘনিয়ে তোলা মাত্র। প্রাণের আকাশে প্রথম-ওঠা সূর্য্যের কোমল তাপ এসে আর চিত্তের ফুলকে তাদের ফোটায় না। জগতে তাদের সূর্য্যাস্তটাই চিরকালের পরম সত্য।

নূতন ম্যানেজারকে নিয়ে কেউ সুখী হ'তে পারলে না। জগুয়ার আজ আর তাড়ি খাওয়ার সময়টুকু পর্য্যন্ত হয় না। কিন্তু মনীব পক্ষের এই দুঃসহ ব্যবস্থাকে চিরদিন খাড়া রেখে

কোনোদিন যে এই নির্য্যাতিত জাতির কল্যাণ-প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, এ'কথা জগুয়া থেকে ক্লার্ক রতন বক্সী পর্য্যন্ত কেউ না বুঝলেও সাধারণ সমাজ-তন্ত্রী একদল প্রগতিবাদীর তা' যথার্থ দৃষ্টি বা উপলব্ধির বাইরে ছিল না। একদিন তাই দেখা গেল—কংগ্রেসের ছাপ মারা টুপি মাথায় নিয়ে একদল যুবক জিন্দাবাদের জয়ধ্বনিতে আসামের নিভৃত জংলাভূমিকে কাঁপিয়ে তুলেছে। চা-বাগানকে ছাড়িয়ে এসে বিচ্ছিন্ন মহুয়া-বনের প্রান্তর ঘিরে যেখানেই অসংখ্য কুলী-নরনারীর তাড়ির নেশায় নাচের আড্ডা জমে' উঠেছে, যুবকেরা সেখানেই তাঁবু বেঁধে নিশান তুলে চীৎকার ক'রে ব'লছে, "ভাইসব জাগো; বুকের রক্ত জল ক'রে এমন পশুর মতো খেটে ক'পয়সা মুনফা তোমরা পাও, ব'লতে পারো? তোমরাও তো মানুষ, মানুষের মতো নিজেদের জীবনকে প্রকৃত স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে গড়ে' তুলতে কেন তোমাদের দাবী নেই? কর্ম্মক্লান্ত দেহকে তাড়ির মোহে ভুলিয়ে রেখে মহার্ঘ জীবনকে তোমরা বলি দিতে চ'লেছ। তোমাদের বিরাট সত্তাকে তোমরা চেননি, যুগের পর যুগ ধ'রে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছ। আজ নিজেদের স্বার্থের দিকে ফিরে চাও, দেশের যথার্থ কল্যাণের কথা ভাবো।"

এমনই একটা ভাবনা তারা অনেক দিন থেকে খুঁজে আসছিল; কিন্তু চিনে উঠতে পারে নি—সে ভাবনার আকৃতি কেমন, জলন্ত না শুষ্ক?

ধীরে ধীরে এই প্রথম তাই কুলীদের মধ্যে আন্দোলন দেখা দিল। মিথ্যা নিপীড়ন তারা সইবে না, বাঁচবার পক্ষে যথোপযোগী মাইনে ছাড়া কাজ করবে না, উপযুক্ত ছুটি চাই ইত্যাদি

জগুয়ার তলব প'ড়লো। বেশ ক'সে দাবড়ে দিয়ে ম্যানেজার ব'ললেন, "কখনো যদি তোমার দল থেকে আর এমন ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায়, তবে শুধু চাকরী যাওয়া নয়, হাজতে নিয়ে পুলিশকে দিয়ে দস্তুরমতো চাবুক পেটানো হবে, বুঝলে? বদমায়েসীর আর যায়গা পাওনি, না?"

জগুয়ার যেন সারা গায়ে ঘাম ছুটলো। ম্লানকণ্ঠে বললে, "আজ্ঞে, আমি তো কিছু করিনি হুজুর।"

"ওসব ন্যাকামো রাখো?" তীব্রকণ্ঠে ম্যানেজার ব'ললেন, "ডেঁপোমি তোমাদের জুতিয়ে তাড়াতে পারি, জানো?"

জগুয়ার সারা গায়ে একবার কাঁটা দিয়ে উঠলো। অনেক বুটের গুঁতো সে খেয়েছে। জীবনে তখন ছিল সে একা। আজ আরো দু'টো জীবনের সঙ্গে আত্মা তার জড়িত। নিজের সম্মান খুইয়ে তাদের সম্মানকে সে লাঘব ক'রতে চায় না। ব'ললে, "আমাকে কাজে জবাব দিন হুজুর। মিথ্যে হাঙ্গামার মধ্যে নিজেকে আমি জড়াতে চাই না।"

দৃপ্তস্বরে ম্যানেজার ব'ললেন, "ওসব চালাকি অনেক দেখেছি, বুঝলে? কাজ ছেড়ে তুমি এক পা-ও যেতে পারবে না। ব্যাটাদের খুলিয়ে দিয়ে ভেবেছ পালিয়ে বাঁচবে? হারামজাদা কোথাকার।"

গোলামী জীবনে মিথ্যে গাল-মন্দ খাওয়া যদিও তার অভ্যেস্ হ'য়ে গেছে, তবু জগুয়ার দু'চোখ ছেপে একবার জল আসতে চাইল। আর দ্বিরুক্তি না ক'রে তাই সোজা চ'লে এলো সে বস্তিতে। তখন কিছুটা রাত হ'য়েছে। অন্ধকারে বাইরের আবহাওয়া জটিল আকার ধারণ ক'রেছে। ...দুয়ারে ব'সে মুংলী এতক্ষণ জগুয়ারই প্রতীক্ষা করছিল, কাছে পেয়ে সহজকণ্ঠে জিজ্ঞেস্ ক'রলে, "সাহেব কি বললে রে?"

"সে অনেক কথা।" জগুয়ার সারামুখে বিস্ময়ের ছায়া।

"কি বল না?"

"না।" আচমকা থেমে যেয়ে কিছুক্ষণ কি চিন্তা ক'রে বললে, "চল, আমরা পালিয়ে যাই এখান থেকে, মুংলী। নকড়ি আর এখানে চলবে না। এ বাগানে আগুন লেগেছে। যা আছে সব গুছিয়ে নে। আজকের রাত্রিকে ফাঁকি দিলে কাল পুড়ে মরতে হবে। লছমি থাকবে না, তু থাকবি নে, আমি তো—"

জগুয়ার কথা শেষ হোলো না। মুংলী নিজের হাতে স্বামীর অসংযত মুখটাকে চেপে ধরে বললে, "তু এত্ত পাষাণ!"

সত্যি পাষাণ, জগুয়াকে আজ সত্যি পাষাণ হ'তে হয়েছে। বছরের পর বছর ধ'রে ক্রমাগত গোলামীবৃত্তি তাকে আজ সত্যিই পাষাণ ক'রে তুলেছে। কিন্তু স্নেহে, মমতায়, প্রেমে আসল হৃদয় যে তার পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়। লছমিকে ছেড়ে,

মুংলীকে ছেড়ে জগুয়া যে আজ তার নিজেকে মোটেই ভাবতে পারে না।

নিস্তব্ধ জংলাভূমিকে কাঁপিয়ে দিয়ে মাঝে মাঝে দূর শৈল-তট থেকে গুরুগম্ভীর বাঘের হুঙ্কার ভেসে আসে। পাশে কোথায় পাহাড়ী সাপগুলো জড়াজড়ি করে ঝরাপাতার আচ্ছাদনে প'ড়ে আছে। বুনো জন্তুর অভাব নেই কোথাও।

এই বীভৎস রজনীই আজ জগুয়ার পক্ষে প্রশস্ত। মাঝে মধ্যে কোথাও যদি দুপদাপ শব্দ হ'য়ে ওঠে, জগুয়ার তাতে জানোয়ারের ভয় আসে না, মনে ভেসে ওঠে শুধু ম্যানেজারের বুট জুটোকে। আজ সে স্বামী, আজ সে পিতা; স্বামীত্ব আর পিতৃত্বের সম্মান আজ তার আসল মানুষটাকে ছাপিয়ে উঠছে। আর সে পারে না, বুটের দুঃসহ অত্যাচারই আজ তাকে মরিয়া ক'রে তুলেছে।

লছমিকে পিঠে বেঁধে মুংলীর হাত ধ'রে জগুয়া এগিয়ে চললো সামনের পথে। শূন্যবস্তি প্রিয়বিচ্ছেদে অধীর হ'য়ে সাশ্রুনেত্রে চেয়ে রইলো পেছন থেকে। আঁকাবাঁকা কত পথ চ'লে গেছে বন পেরিয়ে নদীর পাশ দিয়ে। জীবনের দীর্ঘ একটা খণ্ডকালের সাথে বিচিত্র এই পথগুলো জগুয়ার অন্তরে গাঁথা রয়েছে। দিগন্ত-বিস্তৃত এই অন্ধকারে আজ আর জগুয়ার তাই ভয় নেই। সে জানে—বিপদের মাঝে দয়ালই তাদের রক্ষা করবে। তার সাত পুরুষের সেই দয়ালের উদ্দেশ্যে তাই একবার প্রাণভ'রে সে প্রণাম করে নিলে; পরে মুংলীর হাতটাকে ঈষৎ ঝাঁকানি দিয়ে বললে, "একটু জোড়ে হাট।"

এমনি ক'রেই দীর্ঘদিনের পথ হাটার শেষে তারা কখন একদিন বর্ম্মার রাস্তায় এসে পৌঁছাল।

কোনো এক বার্ম্মিজের সাথে সেয়ারে সম্প্রতি এক বাঙ্গালী বণিক সেখানে কি একটা ফ্যাক্টরি খুলেছে; লোকের প্রয়োজন আছে যথেষ্ট। অদৃষ্ট ভালো, জগুয়া এ সুযোগ ছাড়লে না। ডিরেক্টরদের সাথে দেখা ক'রে সাথে সাথেই কাজ একটা সে বাগিয়ে ফেল্লে। দুধ না জুটুক, শাক্ ভাত খেয়ে বাঁচবার পক্ষে মাইনে তার কম হোলো না।

মুংলী বললে, "আমি কি পা মেলে বসে' থাক্‌বো রে?"

জগুয়া আশ্বাস দিয়ে বললে, "তা কেন হবে? নূতন তো কেবল এই দেশে এসেছি। কেটে যাক না ক'টা দিন,—গতরে খেটে খাবো, কাজের ভাবনা কিরে? ঘুরে-টুরে খোঁজ ক'রে তো দেখি!"

কিন্তু সহসা তেমন কোনো কাজের খোঁজ পাওয়া গেল না, যা' দিয়ে মুংলীর নিষ্কর্ম্মা জীবনে আবার একটা সচল স্রোত বইতে পারে। খুঁজে-পেতে এখানে সম্প্রতি যে বস্তিটা পাওয়া গেছে, সারা দিন লছমিকে নিয়ে ঠায় ব'সে থেকে মুংলীর আর সময় কাটে না। ছোটলোকের জাত সে, পেটের থেকে পড়ে অবধি পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় শুধু কাজ ক'রতেই শিখেছে। নারী ব'লে মাপ নেই। ইট ভেঙে শুড়কি কেঁটে সে হাত পাকিয়েছে, চা-বাগানে পাতা মাড়িয়ে মোট বয়ে বয়ে পিঠ ও পাকে শক্ত ক'রেছে। এমনি ক'রেই তার কাজের ডিঙি ব'য়ে চলেছে জীবন ভ'রে। বিবাহিত জীবনে স্বামীর অর্থে সুখভোগী হ'য়ে নিতান্ত আলস্য-জড়িমার মধ্য দিয়ে সময় কাটানোর মতো ক'রে কোনো দিন তার শিক্ষা হয় নি। মুংলীর অবস্থায় যারা মানুষ হ'য়েছে—তারা প্রত্যেকে এই কথাটাই বিশেষ ক'রে জানে—সংসারে তাদের ব্যক্তিগত রোজগার ভিন্ন জীবন চ'লতে পারে না। এই আদর্শবাদকে কেন্দ্র ক'রেই জীবন তাদের কর্ম্মমুখর হ'য়ে উঠেছে,—পরমুখাপেক্ষিতা তাই তাদের কাছে অসহ্য।

আরো অসহ্য লাগে মুংলীর এই নূতন দেশটাকে। কোথায় ছিল সেই আসামের শ্যামল তরুশ্রেণী, স্রোতস্বিনী নদীর আধভাঙা ঢেউগুলি, মহুয়া বনের সেই নৃত্যমুখর সন্ধ্যা বাঁশী আর ঢোলকের আবেগময় ঐক্যতান, পাহারের গায়ে গায়ে পূর্ণিমা-চাঁদের ঠিক্‌রে পড়া আলো,—কী মাতাল দিনগুলি গেছে আসামের জঙ্গলে। আর অচেনা অজানা এই দেশ। বস্তির বাইরে দাঁড়িয়ে দিক দিগন্তে যতদূর দৃষ্টি প্রসারিত করা যায়,—শুধু কুঠি-বাড়ী আর প্লানে সাদায় খাড়া হ'য়ে আছে সংখ্যাতীত জিমখানা আর ইমারৎ। দিন রাত লোকচলাচল পাকা রাস্তার পাশে পাশে। তবু প্রাণহীন, অন্তঃসারশূন্য এই দেশ। নূতন-আসা শ্বশুর বাড়ীর মতো তবু মুংলীকে থাক্‌তে হবে এই আলোবাতাসকে সহ্য ক'রে—আত্মীয় ক'রে নিতে হবে এর শক্ত মাটিকে। উপায় তো নেই,—ম্যানেজার যে তাদের তাড়িয়েছে।

উঃ—কি দীর্ঘপথ কঠিন দুর্য্যোগের মধ্য দিয়েই না কেটে

গেছে। পায়ের শিরাগুলো আজও মাঝে মধ্যে টন্ টন্ ক'রে ওঠে। তবু তাদের এই দুঃসহ জীবন দিয়ে বাঁচিয়ে তুলেছে লছমিকে, বুকের মাণিক লছমি। না—কিছুতেই ওকে আর তারা গরীব ক'রে রাখবে না। দরিদ্র জীবনের বড় জ্বালা।

সে দিন অস্তসূর্য্যের রক্তিম আভায় পশ্চিমাকাশ লাল হ'য়ে উঠেছে। মুংলীর ঘরে আর মন ব'সতে চায় না। কেবলই বার বার ক'রে ফিরে আসে তার কর্ম্মমুখর গত দিনগুলির কথা। কাজের সবে ছুটি হ'য়েছে। ক্লান্ত দেহে ফিরে চ'লেছে যে যার কুঠিতে। সাহেব গিয়ে বসেছে তার খানা খেতে। রং-বেরঙের পাখীগুলো কলকণ্ঠে মাতিয়ে তুলেছে বনভূমিকে,—মজুরী-দিনের সকল ক্লান্তিকে যেন দূর ক'রে দিয়ে যেতো তাদের মিষ্টিমধুর বুনো খ্যাপামি। কী যে ভালোলাগে সে সব কথা ভাবতে—মুংলী তা' কাকে বোঝাবে? জগুয়া কি তার এতটুকুও ভাবে? কিন্তু সত্যিই তো, তারও তো কাজের চাপ একটি দিনও কম্‌লো না; ছুটি তো তার কপালে লেখেনি! কবে তাদের এমন দিন হবে—যেদিন কোনো কাজ নয়…কোনো কিছু নয়, শুধু উন্মুক্ত বাতায়নে বসে বসে তারা কেবল সারা জীবনের স্মৃতির ভাবনা নিয়ে সকল জয়-পরাজয়ের আনন্দ-ব্যথার ঊর্দ্ধে মনে মনে মুখর হ'য়ে উঠবে। এমন শান্তির যে তুলনা নেই,—ভোগ করা যায় না, শুধু উপলব্ধি করা চলে…উৎসারিত অশ্রু-ধারায়ও আনে এক পরম পরিতৃপ্তি। মুংলী তন্ময় হ'য়ে শুধু ভাবে।

যথেষ্ট চেষ্টা ক'রেও জগুয়া তবু পারলে না মুংলীকে কর্ম্মের প্রাঙ্গনে নিয়ে খাড়া ক'রতে। সকল প্রচেষ্টার অন্তরালে তবু তার একটা সান্ত্বনা মনে রইল এই যে, হাজার খাটুনি থেকে অন্ততঃ এখানে সে মুংলীকে কিছুটা মুক্তি দিতে পেরেছে। লোহার কাজ কি পোষায় মেয়েমানুষকে? লছমিকে নিয়ে সে থাকবে ঘরে,—কী সুখের ঐশ্বর্য্য তার সেই বস্তি! সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে জগুয়া যখন দিনের প্রান্তে ফিরে আসবে ঘরে—লছমি আর মুংলীর প্রাণ-ভরা হাসিতে আর হাতের লাবণ্য-পরশে শীতল হ'য়ে যাবে তার সকল ক্লান্তি। কী স্বপ্ন…কী আনন্দ তাতে! বাইরের আঘাত আছে, বিসম্বাদ আছে—তবু সেই মুহূর্ত্তের অনন্ত মাধুর্য্যের যে তুলনা নেই। ভাবতে গিয়ে জগুয়ারও তন্ময়তা এসে যায় মাঝে মাঝে।

তবু সেই নিষ্ঠুর বিধাতা পুরুষ বুঝি অলক্ষ্য হ'তে হেসে ওঠেন খল খল ক'রে!

ফ্যাক্টরী দিনে দিনে বড় হ'য়ে উঠেছে; ধীরে ধীরে তার প্রসার বাড়িয়ে সভ্যতার নূতন শিল্পে কারিগরেরা আরো নূতন নূতন কতো দালান তুলেছে; ডিরেক্টর বাহাদুরদের শরীর পুরু চর্ব্বির ভারে ক্রমশঃই স্থূল হ'য়ে উঠছে। কর্ম্মচারীদিগকে সময় বিশেষে যুক্তিসঙ্গত বোনাস্ দেওয়া সুরু হ'য়েছে। চক্‌চকে উপরি টাকাগুলো হাতের আঙুলে বাজিয়ে বাজিয়ে জগুয়া কামারের দোকানে গিয়ে ঢুকেছে, বানিয়ে এনেছে রূপোর বাজু আর আংটি লছমির জন্যে। কত খুশীর ছায়া তখন লছমির চোখে মুখে। জগুয়ার প্রাণ জুড়িয়ে গেছে।

কিন্তু দরিদ্র জীবনের এমন শান্তিটুকুও বুঝি তার ভেঙে যায়।

কোথা দিয়ে কতদিন কেটে গেছে জগুয়ার স্মরণে আসে না। একদিন সে দেখতে পেল পৃথিবীর চারিদিকে যুদ্ধ বেঁধে উঠেছে। কী কঠিন যুদ্ধ! দেশ নিয়ে, সাম্রাজ্য নিয়ে স্বার্থে স্বার্থে বেঁধেছে লড়াই। মহাযুদ্ধের মহাআয়োজন দিকে দিকে। আরও একবার যুদ্ধ বেঁধেছিল, সেটা চৌদ্দ সালের কথা। জগুয়া তখন ছোট ছিল, কিছু তার মনে নেই। আজ আবার সেই যুদ্ধ এসেছে, আরও তীব্র, আরও প্রচণ্ড। জার্ম্মানীর বিভৎসতা এক এক ক'রে দেশের পর দেশকে ধ্বংস ক'রে চলেছে, জাপানের ঔদ্ধত্য ভারতের দ্বার-প্রান্ত পর্য্যন্ত এসে পৌঁছেছে। মৃত্যু অনিবার্য্য। সমস্ত দেশ বুঝি আজ শ্মশানে পরিণত হ'তে চললো। ঘন ঘন সাইরেনের শব্দ যেন এই কথাটাই বার বার করে স্মরণ করিয়ে দেয়—'দেশবাসী সব পালা, মৃত্যুর দিন সাম্‌নে।' জগুয়ার প্রাণ যেন বের হ'য়ে যেতে চায়! কিন্তু আজ যে তার আর কোনো উপায়ই নেই। কোথায় তারা পালাবে, কারা তাদের খেতে দেবে? ফ্যাক্টরী যে তাদের সেই জীবিকা-নির্ব্বাহ বজায় রেখেছে?

মুংলী কাতর কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, "এবারে কি উপায় হবে, বল?"

সমস্ত কিছু আশঙ্কা ও ভয় বুকের মধ্যে চেপে রেখে জগুয়া বললে, "আমাদের জন্তে তো, কিছু নয় রে, লছমিকে শুধু বাঁচিয়ে রাখা।"

দেখতে দেখতে কয়েকখানি এরোপ্লেন উড়ে গেল। মুংলীর বুকের ভিতরটা দুর্‌-দুর্‌ করে উঠলো।

বাইরে কামান, মোটর-লরি আর আর্ম্মপুলিশের ভীড়। সাইরেণের সতীব্র আর্ত্তনাদ। লোকগুলো যেন সমস্বরে চীৎকার ক'রে ওঠে—"নিকালো জাপান।" জাপানী পাইলট হয় তো আকাশের ঊর্দ্ধ থেকে হাসে!

এম্‌নি ক'রেই ক্রমাগত দিনের পর দিন গড়িয়ে চলে।

চৌদ্দসালের মহাবুভুক্ষার এ যেন শেষ অন্ত্যেষ্টি! এর পরিণাম যেয়ে কোথায় পৌছাবে, কে জানে! উনচল্লিশের যুদ্ধ একচল্লিশের শেষ প্রান্তে এসে পৌচেছে। এর বিজয় অভিযানকে আজ রুখবে কে?

* * *

মাঝখানে তবু কয়েকটা দিন নিঃশব্দে কেটে গেছে। এ' ক'দিন সাইরেন অনেকটা দম নিয়েছে।

সেদিন মনে মনে অনেকটা সাহস সঞ্চয় ক'রেই প্রতিদিনের মতো জগুয়া বেরিয় প'ড়লে কাজে।…বস্তী থেকে ফ্যাক্টরী তার কাছে নয়,—প্রায় তিন মাইলের পথ। এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে প্রতিদিন ঘুন্টি বাজার পূর্ব্বেই তাকে এসে ফ্যাক্টরীর সদর দোরে পৌছতে হয়। তারপর অবিশ্রান্ত চলে তার জীবিকাসংস্থানের লড়াই।

সেদিনও তার এম্‌নি ক'রেই কৃচ্ছ্রসাধনের মুহূর্ত্তগুলি ঘড়ির কাঁটার শ্লথগতির সাথে সমাপ্তির পথে এগিয়ে চ'লছিল। গোধূলির ছায়া তখন সবেমাত্র সন্ধ্যার প্রান্তে এসে মিশেছে। বস্তীর শূন্য বাতায়নে বসে' মুংলী হয়তো তখন উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে আছে দিগন্তের পারে,—মাঝে মাঝে হয় তো তাকে সচকিত ক'রে দিয়ে লছমি ব'কে চ'লেছে কত কি আবোল তাবোল। কী মিষ্টি আমেজ র'য়েছে তার মধ্যে। হঠাৎ কখন অতর্কিত জগুয়া যেয়ে আড়াল্‌ থেকে চোখ টিপে ধ'রবে, মুংলী অম্‌নি ব'লে ব'সবে, "তু কি দুষ্টু রে!" আঃ—এমন অনাবিল স্নিগ্ধ দুষ্টুমির মাঝ দিয়েই যদি জগুয়ার দিনগুলি কেটে যেতে পারতো! ভাবতে গিয়ে মাঝে মাঝে কর্ম্মে শৈথিল্য এসে যায় জগুয়ার। কিন্তু কতক্ষণ? পাশের রোগা লোকটার বিকৃত মুখের দিকে দৃষ্টি পড়তেই সে হাতের কাজে মন দেয়। ভাবে ঐ তো ঘড়ির কাঁটায় ধীরে ধীরে ছুটির ঘণ্টা এগিয়ে এলো। তারপর সেই অফুরন্ত মাধুর্য্য। —বাবাকে কাছে না পেলে লছমির ঘুম আসে না। মাকে নিয়ে একা একা তার নাকি জুজু ডাকাতের ভয় করে! জগুয়া গিয়ে পাশে ব'সে লছমির অবিন্যস্ত চুলগুলির মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দিতে দিতে কত বীর…বীরাঙ্গনাদের কাহিনী ব'লে তাকে ঘুম পাড়া'বে। তারপর মুংলীর আধো কথা আধো হাসির মধ্য দিয়ে কী এক পরম পবিত্রতায় কেটে যাবে তার এই তন্দ্রালু রজনীর খণ্ড খণ্ড অংশগুলি।

হঠাৎ দূর থেকে সাইরেনের তীব্র ধ্বনি কানে এলো। এমন আকস্মিক সতীব্র নিনাদ আর কোনোদিন কেউ শুনতে পায় নি। সারাটা ফ্যাক্টরীর বুক জুড়ে মুহূর্ত্তে একটা ত্রস্ত হৃৎ-কম্পন ব'য়ে গেল। প্রৌঢ় ম্যানেজার সতর্ক ক'রে দিয়ে গেলেন—'কেউ যেন ফ্যাক্টরী থেকে এক পাও না নড়ে, very danger, জাপানী এসে প'ড়লো ব'লে।" সাথে সাথে কাছে দূরে অনেকগুলো প্লেনের শব্দ শোনা গেল। তারপর তুচ্ছ একটা খণ্ডকাল মাত্র। দূরে কোথায় বোমা-বিস্ফোরণের প্রচণ্ড আওয়াজ হোলো। ফ্যাক্টরীটা পর্য্যন্ত যেন অকস্মাৎ ভূমি-কম্পনে কেঁপে উঠ্‌লো।—নিশ্চয়ই দু'চার মাইলের মধ্যে হবে। জগুয়ার প্রাণ বেরিয়ে যেতে চাইল। কিছুতেই নিজেকে সে স্থির রাখতে পারলে না। এমন নিষ্ঠুর বর্ব্বরতায় মুংলী আর লছমি কি তার এখনো বেঁচে আছে?—বেঁচে থাকা কি সম্ভব? উঃ—মুহুর্মুহু কি অসম্ভব নিদারুণ শব্দ! মুংলী যদি থাকবে না, লছমি যদি থাকবে না, তবে একমাত্র তার বেঁচে থেকে কি হবে? কেমন ক'রে তাদের ফেলে সে বেঁচে থাকবে?…সমস্ত শরীর জগুয়ার থর-থর ক'রে কাঁপতে লাগ্‌লো, অনবরত চোয়াল দু'টো তার বদ্ধ হ'য়ে আসতে লাগ্‌লো। কেমন ক'রে সে ছুটে পালাবে, কেমন ক'রে সে বাঁচাবে গিয়ে তার লছমি আর মুংলীকে? একটিবার মাত্র অস্ফুট কম্পিত স্বরে মুখ দিয়ে তার ভাষা নিসৃত হোলো—'দয়াল—'। আর কথা নেই,…মুষ্টিবদ্ধ দু'হাত তুলে ঊর্দ্ধে সে একবার কি যেন নিক্ষেপ করতে চাইলে! কারুর তা' নজরে এলো না; যে যার নিজের কথা ভেবে অস্থির। এম্‌নি ভাবেই এক এক ক'রে ক'ঘণ্টা কেটে গেল জানি না।

ধীরে ধীরে ফ্যাক্টরীর গেট্ খুলে গেল। দূর-দূরান্ত থেকে সমস্বরে অসংখ্য লোকের চীৎকার, হাক্‌ডাক ও ক্রন্দনধ্বনি প্রবল বায়ুবেগে ভেসে বেড়া'তে লাগ্‌লো।···জওয়ার শিরা-গুলো যেন ছিঁড়ে যেতে চায়! জনতার ভীড় ঠেলে প্রাণপণে ছুটে প'ড়লো সে বস্তির দিকে। সাম্‌নে যতদূর দৃষ্টি যায়—শুধু ধূ-ধূ করে অগ্নি-প্রবাহ।···কোথায় তার সেই বস্তি? কোথায় মুংলী আর লছ্‌মি? বার বার চীৎকার ক'রে জওয়া গলা ফাটালে। কেউ সাড়া দিলে না,—অনন্ত অগ্নি-প্রবাহের মধ্যে তাদের কণ্ঠস্বর যে চিরদিনের মতো মিশে গেছে। প্রিয়-জীবনের অবসানে জওয়ার চোখে তবু অশ্রু রইল, কিন্তু তার এই দুঃসহ বেদনায় পৃথিবীর আর যে একটি প্রাণীও কাঁদবার রইল না।

মস্তিষ্ক-ক্রিয়া ধীরে ধীরে তার বন্ধ হ'য়ে এলো। দু'চোখে অশ্রুর বন্যা।—মুখে তার খল্‌ খল্‌ অট্ট হাসি। গোলামী-জীবনে এতকালে বুঝি তার মুক্তির দিন এসেছে!

জওয়া পাগল হ'য়ে গেল।

আকাশ ও মৃত্তিকা

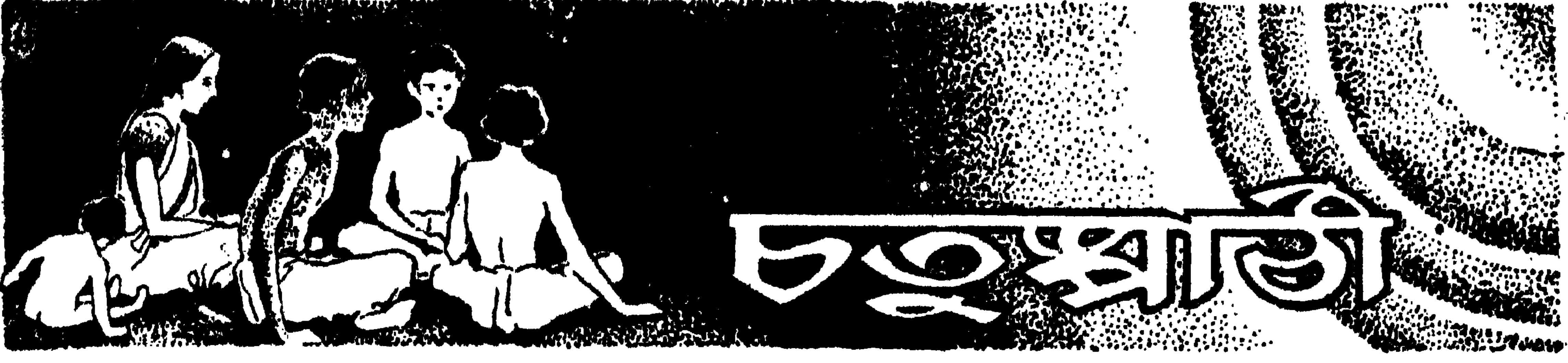
শ্রীদীনেশ গাঙ্গোপাধ্যায়

কোন্‌খানে আছ তুমি!—শাস্ত্রের গহন পারে—
অন্তহীন জটিল অরণ্যে, পথহারা বিষম বিজনে,
অথবা অসীম ব্যোমে শূন্যতার নির্গুণ রহস্যে
সমাচ্ছন্ন, চিরমৌন, আনগ্ন একাকী,
তুষার কুহেলি-ঘন অব্যক্ত অরূপ;
—স্বপ্ন ও ধ্যানেরও অতীত!
শত জপমালিকার জটে
সমাবৃত যুগ ও যুগান্ত; লক্ষ কোটি স্তবে ও কবচে—
পরম নিমগ্ন একা নিত্যদিন স্বর্গের কৈলাসে,
অনন্ত এ নিখিলের তুমি একাসন।

—কল্পনায় পারে নাই তোমারে আঁকিতে,
তুষ্টিতে পারে নি আজও লক্ষ বলি অমৃত পূজায়;—
মনো আঁখি খুঁজিয়া বিফল; মানুষের পার্থিব নয়নে
আজোবধি পড়ে নাই ছায়া।
ভাষা আজও পারে নি ডাকিতে,
গানে তুমি পড় নাই বাঁধা। প্রকাশের অতি দূরে
আপন প্রচ্ছন্ন পুরে কী রহস্যে রয়েছ লুকায়ে
কেহ নাহি জানে।—
তাই যদি হবে,
মানুষের সংসারের নিত্যকার কাজের,
অনিত্য এ ভুলের খেলায়, তুমি যদি সত্য নাহি হও,
মানুষের কাছে নাহি এস,—ধরণীর মাটির ধুলায়
এই যে মায়ায় ভরা শত লক্ষ প্রেমের কুলায়,
কালের পল্লব ছায়ে আলো আর আঁধারের তলে
জীবন মৃত্যুর দোলে বেঁধেছে ঝুলনা,
তার মাঝে তুমি যদি নাহি থাকো,
—তাদের এই ধুলার খেলায়,
পাখি আর পাখিনীর প্রেমে, মানব আর মানবীর
রসঘন রঙীন বৈচিত্র্যে—পুরুষে নারীতে আর
কোমল নির্মল শুভ্র শিশুদের মধুর মেলায়—
তুমি যদি নাহি কর খেলা,
—তবে কি মিথ্যা এই রূপায়িত লোক
প্রতিদিন চক্ষের সম্মুখে।

অনিত্য পার্থিব এই ধরণীর শুষ্ক বৃন্ত পরে
তবে কি ফোটে না তব রূপের মুকুল!
ভুবনের ঘরে ঘরে তুমি কি দাওনা ধরা
ফুলের হাসিতে আর বনান্তের শ্যামল ছায়ায়
পেলব চিক্কণ ঘন শ্যামশীর্ষ নূতন পাতায়!
তবে কি একান্ত মিথ্যা এই খেলাধুলা,
শস্যশ্যাম ধরণীর চারু দৃশ্যলোক,
অপরূপ রৌদ্র মেঘ ছায়া, রবি জ্যোৎস্না অনন্ত আকাশে
এর এই নিকলুষ ঊষা আর গোধূলীর ছবি!

—শ্যামল অঙ্গন পরে সন্ধ্যা সমাগমে
ঘরে ঘরে দিনান্তের সান্ধ্যদীপ জ্বালা,
মা'র কোলে শুয়ে থাকা শান্ত ছবিলীন
আবার জাগিয়া ওঠা প্রভাতের রোদে,
জীবনের পথে পথে নানা রঙে প্রেমের মুকুল
ফোটানো একান্তে বসি পুরুষ নারীতে,
—কোমল কমল বুকে বুকখানি রাখি'
অধরের কোটা ফুলে অন্যমনে রাখি মুখখানি
রূপের তিলেক মধু নিভৃতে ভুঞ্জন,
হৃদয়ের যত কথা নিঃশেষিয়া গুঞ্জনারে বলা
একত্রে জাগিয়া ওঠা একত্রে ঘুমানো
প্রতিদিবসের এই, এই মায়ায় পাবক ভরা মাটির সংসার
সত্য একি ভুল শুধু ভুল!
বৃথা ভুল মৃত্যুশীল মানুষের আর, দেবতার?



মৃতসঞ্জীবনী

সত্যবান

'মৃতসঞ্জীবনী' এ নামটি তোমরা অবশ্যই শুনিয়াছ, কিন্তু কিরূপে এই মৃতসঞ্জীবনীর জন্ম হইল সে কথা হয় ত' তোমরা জান না। আজ সেই কাহিনীটিই তোমাদিগকে শুনাইব।

তোমরা শুনিয়া অবাক ত' নিশ্চয়ই হইবে। কিন্তু আপ্তবাক্য অবিশ্বাস করিও না। অবিশ্বাস করিয়া করিয়া আমরা অনেক ঠকিয়াছি। ঐ দেখ আমাদের অবিশ্বাসের, পুষ্পকরথ আজ এরোপ্লেনের (aeroplane) মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীর আকাশ ছাইয়া আমাদিগকে তিরস্কার করিয়া ফিরিতেছে।

মনে রাখিও, অজ্ঞতাজনিত অবিশ্বাসেও পাপ আছে। কর্ম্মবিমুখতা বা আলস্য হইতেই অজ্ঞতা ও অবিশ্বাসের জন্ম। ইহা তমোগুণের কাজ। অমৃতের পুত্র আমরা। বস্তুতঃ সাধনানিষ্ঠ হইলে আমাদের অসাধ্য কিছুই নাই, থাকিতে পারে না। আমরা গণ্ডুষে একটা সমুদ্র কেন, কোটী সমুদ্র শোষণ করিতে পারি, কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে গোবর্দ্ধন গিরি কেন, সচরাচর নিখিল বিশ্ব ধারণ করিতে পারি। ঐ শুন চণ্ডীতে সর্ব্বশক্তিময়ী প্রকৃতিরূপিনী মা চণ্ডিকা কি বলিতেছেন,—

"যো মাং জয়তি সংগ্রামে, যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥"

অর্থাৎ,—যে আমাকে জয় করে, আমার দর্প চূর্ণ করে, অথবা আমার তুল্য শক্তিধর হয়, সেই পরিণামে আমার ভর্ত্তা হইবে। বাক্যটা গভীরার্থ-বোধক, বেশ একটু ভাবিয়া দেখিও, অলীক বা অসম্ভব হইলে বিশ্বমাতা কখনই এ বাণী উচ্চারণ করিতেন না।

যাক্, এখন যে কাহিনীটি তোমাদিগকে বলিতে যাইতেছিলাম, তাহা শোন। অতি পুরাকালের কথা। তখনও সমুদ্র-মন্থনজাত অমৃত পান করিয়া দেবতারা অমর হইতে পারে নাই। তখনও তাহারা আমাদেরই মত মৃত্যুর অধীন ছিল।

সেই সুদূর অতীত যুগে এই সচরাচর বিশ্বের উপর আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা লইয়া দেবতা ও দৈত্যদিগের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণও যে না ছিল, তা নয়। দেবতা ও দৈত্য এক পিতারই ঔরসজাত সন্তান। কশ্যপ প্রজাপতির দুই পত্নী—দিতী ও অদিতী। দেবতারা অদিতীর গর্ভজাত এবং দৈত্যরা দিতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে। অদিতীর গর্ভে দেবতাদেরই অগ্রে জন্ম হয়; সুতরাং দেবতারাই জ্যেষ্ঠ। এই জ্যেষ্ঠত্বের দাবী ও সুযোগ গ্রহণ করিয়াই দেবতারা অগ্রে স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া বসিল। দৈত্যরা যখন তাহাদের দাবী জানাইল, দেবতারা তাহাদিগকে আমলই দিল না। পরন্তু স্বর্গ হইতে একেবারে বিতাড়িত করিয়া দিল। দৈত্যরা দৈহিক শক্তিতে দেবতাদের অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। তাহারা এ নির্য্যাতন নীরবে সহ্য করিবে কেন? তাহারা স্বর্গলাভের জন্য দেবতাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল।

প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্কল্পের সঙ্গে শক্তিবৃদ্ধি ও নিরাপত্তার সঙ্কল্পও আপনিই আসিয়া পড়ে। যুদ্ধের প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই বর্ম্মের কথা মনে পড়িয়া যায়। এই স্বভাবসিদ্ধ নিয়মে অনুপ্রাণিত হইয়াই তখন যজ্ঞাদিদ্বারা শক্তি-বৃদ্ধি ও ইষ্ট লাভার্থ দেবতারা বৃহস্পতিকে এবং দৈত্যরা শুক্রাচার্য্যকে পুরোহিতের পদে বরণ করিল। উভয়েই মহাপণ্ডিত এবং নিখিল নীতিশাস্ত্রবিদ্। সম্পর্কেও ইহাঁরা পরস্পর খুবই ঘনিষ্ঠ। বৃহস্পতি অঙ্গিরার পুত্র, শুক্র ভৃগুর বংশধর। এই অঙ্গিরা ও ভৃগু উভয়েই আবার ব্রহ্মার মানসসন্তান। সুতরাং বৃহস্পতি ও শুক্র সম্পর্কে ভাই।

যাহা হউক, পরস্পর বিরুদ্ধ পক্ষের পৌরহিত্য পদে বৃত হইয়া বৃহস্পতি এবং শুক্রাচার্য্যের মধ্যেও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব জাগিয়া উঠিল, এবং একে অন্যকে সহজে অতিক্রম করিতে না পারিয়া উভয়েরই বিজীগিষা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। বৃহস্পতির একমাত্র চেষ্টা হইল, কিসে দেবতাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিবেন, পক্ষান্তরে শুক্রাচার্য্যের ঐকান্তিক কামনা হইল, কি উপায়ে দেবতাদিগের প্রাধান্যের ধ্বংস সাধন করিয়া স্বীয় যজমান দৈত্যদিগকে সস্বর্গ নিখিল বিশ্বের প্রভুপদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

উভয়েই উভয়ের যজমানের হিতচিন্তায় যখন এইরূপ অনন্যচিত্ত, সেই সময়ে শুক্রের মনে এক অদ্ভুত সঙ্কল্পের উদয় হইল। শুক্র মনে করিলেন যে, যুদ্ধে মৃত্যু অপরিহার্য্য, সুতরাং যদি মৃত্যুর কবল হইতে দৈত্যদিগকে উদ্ধার করিতে পারা যায় তবেই দেবতারা আর দৈত্যদিগের সঙ্গে আটিয়া উঠিবে না। কারণ তাহারা ত' মরিয়া মরিয়া ক্রমেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু কিরূপে ইহা সম্ভব? যেমন করিয়াই হউক, ইহাকে সম্ভবপর করিতেই হইবে।

শক্তিমান একনিষ্ঠ সাধকের চিত্তে সংশয় অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। সিদ্ধির দ্বার যোগের যাদুদণ্ডস্পর্শে আপনা হইতেই খুলিয়া যায়।

শুক্র সঙ্কল্প করিলেন যে, তিনি মৃত্যুঞ্জয় শঙ্করের তপস্যা করিয়া মৃত

সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করিবেন। যে সঙ্কল্প সেই কাজ। দৈত্যদিগকে সব কথা বুঝাইয়া বলিয়া আশ্বস্ত করিয়া শুক্র অবিলম্বে শিব সকাশে উপস্থিত হইলেন এবং ভগবান শঙ্করকে প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে স্বীয় সঙ্কল্পের কথা নিবেদন করিলেন। শিব শুক্রের অভূতপূর্ব্ব বাক্য শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—"বৎস! তুমি বড়ই দুরূহ সঙ্কল্প করিয়াছ। জীবদেহে এ বিদ্যা লাভ করা একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই পরমা ঈশ্বরী বিদ্যা লাভ করিতে হইলে দশ সহস্র বর্ষ মাত্র ধূম্র পান করিয়া কঠোর তপস্যা করিতে হইবে। নশ্বর দেহে তুমি তাহা পারিবে কি?"

শুক্র কহিলেন,—"প্রভু! আমি তাহাই করিব। কেবল কি নিয়মে তপস্যা করিতে হইবে আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সেই উপদেশ প্রদান করুন। কর্ম্মের জন্যই ত' দেহ পরিগ্রহ, অন্যথা ইহার আবশ্যকতা কোথায়? সেই কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে গিয়া যদি দেহপাত হয় ত' দেহের সদ্গতি বই অসদ্গতি হইবে না।"

যোগীশ্বর শঙ্কর শুক্রের এই প্রকার ঐকান্তিক দৃঢ়তা দেখিয়া ও হেতুযুক্ত বাক্য শুনিয়া ভাবাবেশে পুলকিত হইলেন এবং প্রসন্ন চিত্তে মৃত-সঞ্জীবনী মহাবিদ্যা লাভের উপদেশ সযত্নে তাঁহাকে প্রদান করিলেন।

শিবের নিকট দীক্ষিত হইয়া মহাতপা শুক্র দুর্গম হিমালয় প্রদেশে গমন করিয়া মহা তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন।

কত শীত, কত গ্রীষ্ম কাটিয়া গেল—ভ্রূক্ষেপ নাই। কত ঝড়-ঝঞ্ঝা বহিয়া গেল—ভ্রূক্ষেপ নাই। মাত্রাস্পর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত থাকিয়া মহাযোগী মহাযোগে মগ্ন রহিলেন। কৃচ্ছ্র তপ প্রভাবে তাহার শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর অবশেষে সূক্ষ্ম সূত্রের ন্যায় ক্ষীণতম হইতে লাগিল।

এ দিকে শুক্রের এই কঠোর তপস্যার ও সঙ্কল্পের সংবাদ স্বর্গে দেবতা-দিগেরও অবিদিত রহিল না। দেবতারা ভাবী বিপদাশঙ্কায় অতিমাত্র ভীত হইয়া পড়িল। তাহারা বৃহস্পতির শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে এই সংবাদ জানাইল। বৃহস্পতি শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু নিরুপায়! তিনি কি করিবেন? সত্যই ত', যদি শুক্র তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়াই ফিরিয়া আসিতে পারে তবে দেবতাদের সঙ্গে তাঁহার প্রাধান্যও চিরতরে অন্তর্হিত হইবে।

বৃহস্পতি অনেক ভাবিলেন। কিন্তু দেবতাদিগকে অভয় দান করিতে এবং আপনিও আশ্বস্ত হইতে আর কোন উপায়ই খুঁজিয়া পাইলেন না। অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে কহিলেন,—"মহেন্দ্র! এ বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায় আছে। তাহা হইতেছে, শুক্রের তপস্যায় বিঘ্নোৎপাদন করিয়া তাঁহার সিদ্ধিলাভ পণ্ড করিয়া দেওয়া। তুমি আর কাল বিলম্ব না করিয়া তাহাই কর। শীঘ্র স্বর্গ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী ও সুচতুরা অপ্সরাদিগকে শুক্র সন্নিধানে তাহার তপোবিঘ্নার্থ প্রেরণ কর।"

বৃহস্পতি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া ইন্দ্র তাহাতেই প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু বিষম সমস্যা উপস্থিত হইল। কোন অপ্সরাই শুক্রের নাম ও তাঁহার সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া তপস্যায় বিঘ্নোৎপাদন করিতে যাইতে স্বীকৃতা হইল না। ইন্দ্র আর কি করেন। সর্ব্বস্ব যাইতে বসিয়াছে। শেষে মান-সম্ভ্রম সব বিসর্জ্জন দিয়া স্বীয় কন্যা জয়ন্তীকেই এই কার্য্যে প্রেরণ করিতে বাধ্য হইলেন।

পৃথিবীর ভাগ্য ছিল তখন পরম সুপ্রসন্ন। সে এক অনির্ব্বচনীয় মহারত্ন লাভ করিবে। সুতরাং কিছুতেই কিছু হইল না। পিতা কর্ত্তৃক প্রেরিতা জয়ন্তী শুক্র সমীপে উপনীতা হইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার স্নেহ কোমল নারী-হৃদয় একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িল। তপোবিঘ্নের সঙ্কল্প আর স্মরণেই আসিল না। জয়ন্তী দেখিল, সহস্র সহস্র বর্ষব্যাপী কঠোর সাধনায় শুক্রের দেহ তখন সূত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছে। দেহ মধ্যে জীবন আছে কি নাই, তাহাও বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে বুঝা যায় না। সেই অপূর্ব্ব তপোধৌত পবিত্র মহিমা-মণ্ডিত মূর্ত্তি দেখিয়া জয়ন্তী আত্মহারা হইল। সত্যই ত' এ' মূর্ত্তি দেখিলে কে না আত্মহারা হয়? জয়ন্তী তখন শুক্রকে পিতার শত্রুর আসন হইতে সরাইয়া দিয়া স্বীয় উপাস্য দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার পরিচর্য্যার নিমিত্ত সেই স্থানেই রহিয়া গেল। আর স্বর্গে ফিরিল না।

ক্রমে দশ সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইল। মৃত্যুঞ্জয় শঙ্করের প্রসাদে শুক্র অভীষ্ট মৃতসঞ্জীবনী মহাবিদ্যা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। পৃথিবী ধন্য হইল। মানুষ এই প্রথম বিশ্ব বিজয় করিল।

সাধনায় সিদ্ধি লাভের পর সাধকের মনে যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হয় তাহা সাধকই জানে। ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা চলে না। সাধকের তখন মনে হয় যে, তাহার এই সিদ্ধির তুলনায় বিশ্ব-বিজয়ও অতি তুচ্ছ, নগণ্য।

যোগাসনাধিষ্ঠিত মহাসাধক সিদ্ধি লাভান্তে সমাধি ভঙ্গ করিয়া যখন চক্ষু মেলিলেন, প্রকৃতি তখন তাঁহার কাছে নূতন মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা। চক্ষু মেলিয়াই শুক্র দেখিলেন যে, এক অনিন্দ্য সুন্দরী তরুণী তখনও তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্তা রহিয়াছে। সুন্দরীর তপঃক্লিষ্ট ক্ষীণ দেহ হইতে দিব্য-জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে। শুক্র বিস্মিত হইলেন,—কে এই তরুণী! কেনই বা এই দুর্গমপ্রদেশে আসিয়া এ ভাবে তাঁহার সেবা করিতেছে? না জানি কতকাল ধরিয়াই এই কার্য্যে রত আছে!

শুক্র স্মিত হাস্যে তরুণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"ভদ্রে! কে তুমি? কি উদ্দেশ্যেই বা মানুষের অগম্য এই দুঃখময় স্থানে আসিয়া এরূপ দুঃসহ ক্লেশ বরণ করিয়া একাগ্র চিত্তে আমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিয়াছ? যদি তোমার কিছু প্রার্থনীয় থাকে ত' বল, একান্ত অসাধ্য না হইলে আমি তাহা অবশ্যই পূরণ করিব। তোমার মত কন্যা আমি আর কখনও দেখি নাই। একমাত্র উমার সহিতই তোমার তুলনা হইতে পারে।"

শুক্রের বাক্য শুনিয়া জয়ন্তী তাহার পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য আদ্যোপান্ত সকলই জ্ঞাপন করিল এবং কহিল,—"হে ভগবন! যদি আপনি আমার পরিচর্য্যায় প্রীত হইয়া থাকেন, তবে কৃপা করিয়া আমাকে

এই বর প্রদান করুন, যে আমি যেন আমার এই অধিকার হইতে বঞ্চিতা না হই।"

জয়ন্তীর প্রার্থনায় শুক্র সন্তুষ্ট হইলেন এবং প্রসন্ন চিত্তে জয়ন্তীকে সহধর্ম্মিনী করিয়া বিজয়-গৌরবে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। এই জয়ন্তীর গর্ভে শুক্রের ঔরসে দেবযানীর জন্ম হয়।

এই স্থানে আর একটি কথা তোমাদিগকে শুনাইয়া রাখি, সে কথাটিও হয় ত' তোমাদের জানা নাই। শুক্রাচার্য্যের 'শুক্র' এই নামটি প্রথমাবধিই ছিল না। এই নামটি হয় তাঁহার মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যালাভের পরে। মৃত-সঞ্জীবনী-কাহিনীটির সহিত ইহার সম্পর্ক আছে বলিয়াই এই স্থানে তাহা উল্লেখ করিলাম।

তখন নিকুম্ভ ছিল দৈত্যদিগের রাজা। এই নিকুম্ভের প্রতাপে দেবতারা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। প্রত্যেক যুদ্ধেই দেবতাদের পরাজয় ঘটিতে লাগিল। শুক্রের তপলব্ধ মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা প্রভাবে দৈত্যেরা মরিয়াও মরে না, ওদিকে দেবপক্ষে যাঁহারা যুদ্ধে নিহত হয় আর তাহাদের স্থান পূর্ণ হয় না। মহা মুস্কিল! দেবতাদিগের এই নিদারুণ দুর্গতি দেখিয়া শিবানুচর নন্দী বিষম বিচলিত হইলেন। তিনি শিব সন্নিধানে উপনীত হইয়া মহেশ্বরকে এই দুঃসংবাদ নিবেদন করিলেন। ভগবান শঙ্কর তখন গণেশকে পাঠাইয়া শুক্রাচার্য্যকে স্বীয় সকাশে আনয়ন করিলেন এবং সামান্য ভক্ষ্যদ্রব্যের ন্যায় তাহাকে মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া জঠরস্থ করিয়া রাখিলেন। ইত্যবসরে দেবতারা প্রাণপণে যুঝিয়া দৈত্যকুল নির্ম্মূল করিয়া ফেলিল। দেবতাদের বিজয় কার্য্য সমাধা হইলে ভগবান বিশ্বনাথ স্বীয় শিশ্নদ্বার দ্বারা শুক্রকে নির্গত করিয়া মুক্তি দান করিলেন। শুক্র নির্গমন পথে নির্গত হইয়াছিলেন বলিয়া এই সময় হইতে তাঁহার নাম হইল—'শুক্রাচার্য্য'।

মৃতসঞ্জীবনীর জন্ম-ইতিহাস এই তোমাদিগকে সাধারণভাবে বলিয়া শুনাইলাম। এখন ভাব দেখি, কত বড় সাধক ছিলেন এই শুক্রাচার্য্য। কি অতুলনীয় ছিল তাঁহার প্রতিভা, কি অদম্য ছিল তাঁহার অধ্যবসায়। এই শুক্রের ন্যায় মনীষীগণের মহান তপঃপ্রভাবেই একদিন ভারতীয় আর্য্য-গরিমা পৃথিবীর শিখরদেশ উদ্ভাসিত করিয়া সুরলোকের ঈর্ষা উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আর আজ আমরা কোথায়! ভাবিলে লজ্জায় মাথা অবনত হইয়া পড়ে। আজ আমরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী হইয়া গর্ব্বানুভব করি, কিন্তু অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমাদেরই পূর্ব্ব পুরুষের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার কথা চিন্তা করিবারও সামর্থ্য নাই আমাদের। অধঃপতন আর কাহাকে বলে!

শুক্রের তপলব্ধ 'মৃত সঞ্জীবনী' আসলে পদার্থ-টি কি তাহা আজ আর বুঝিবারও উপায় নাই। আয়ুর্ব্বেদ যে মৃতসঞ্জীবনীর সন্ধান দিয়াছেন তাহা মাত্র দ্রব্যাত্মক। কিন্তু শুক্রলব্ধ মৃতসঞ্জীবনী কেবল দ্রব্যাত্মকই ছিল না। উহা দ্রব্য ও মন্ত্র উভয়াত্মক ছিল। দ্রব্য অপেক্ষা মন্ত্রই ছিল উহার সমধিক সঞ্জীবনী উপাদান স্বরূপ। গুরু শুক্র জীবিত নাই, শিষ্য কচেরও তিরোধান ঘটিয়াছে, আজ আর মৃতসঞ্জীবনীর শিক্ষাবিস্তার কে করিবে? পৃথিবীর দুর্ভাগ্য—ততোধিক দুর্ভাগ্য এই ভারতের—সে তাহার এই অপূর্ব্ব সম্পদে বঞ্চিত হইয়াছে; অধিকন্তু ইহার কথা বলিতে গিয়া বিশ্বের বিদ্রূপভাজন হইতেছে। কিন্তু এমন দিন আসিবে যে দিন বিশ্বের মনীষীগণের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইবে। অন্ধকারে খুঁজিয়া বেড়াইবে মৃতসঞ্জীবনীর Theory বা বীজমন্ত্রটীকে। আজ বিশ্ববিজ্ঞান ধ্বংস-চিন্তায় উন্মত্ত। এ চিন্তার আয়ুষ্কাল দীর্ঘদিন স্থায়ী হইতে পারে না, ইহার পর বাঁচিবার ও বাঁচাইবার আগ্রহ আসিবেই।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

প্রতিযোগিতা

আগামী ৬ সরস্বতী পূজা উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের (ভাগলপুর শাখা) ব্যবস্থাপনায় বাঙ্গলা রচনা প্রতিযোগিতা হইবে।

(১) প্রবন্ধ:—"বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের ধারা।"

(২) ছোট গল্প।

(৩) কবিতা।

উপরোক্ত তিনটি বিষয়ে যে কেহ যোগদান করিতে পারেন।

স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে নিবদ্ধ প্রতিযোগিতা:—

(১) ছোট গল্প। (২) কবিতা। (৩) আবৃত্তি।

আবৃত্তি প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ও পরীক্ষার স্থান এবং সময় সম্বন্ধে সম্পাদক শ্রীনীরদচন্দ্র মিত্রের নিকট অনুসন্ধান করিতে হইবে। প্রত্যেকটি রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় লেখা থাকিবে এবং ২০শে জানুয়ারী ১৯৪৩ তাঃ মধ্যে সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে। সরস্বতী পূজার দিন ভাগলপুরে সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে সর্ব্বজনসমক্ষে পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

নূতন গুড়

শ্রীপ্রবোধ ঘোষ

সামনের হ'প্তার বিষ্যুদ আর শুক্কুর দু'দিন ছুটি আছে। তার পরের সোমবারটাও ছুটি। মাঝখানের শনিবারটা হ'লে ধীরে-সুস্থে একবার বাড়ী ঘুরে আসতে পারা যায়। কথাটা তাই ক'দিন থেকেই ভাবছিলাম এবং সেদিন সকালের দিকে এক সময়ে বরাবর বড়বাবুর কাছে গিয়ে ছুটি চাইলাম শনিবারটা। বড়বাবু আমার ওপরে প্রসন্ন ছিলেন না—কোন দিনই কোন প্রশ্রয় পাইনি তাঁর কাছে। সেদিনও হাঁকিয়ে দিলেন তিনি আমাকে—অধিকন্তু বলে দিলেন, শুক্কুরবার আপিসে আসতে।

অভাগা আর কা'কে বলে!

মনকে বোঝাতে চাইলাম—ছুটি যদি নাই থাকত—থাকেও না ত' সব সময়ে। ঠিক স্বচ্ছন্দ বোধ করতে পারলাম না তাতেও—বেশ একটু খচ্-খচ্ ক'রে উঠতে লাগল থেকে থেকে। চুপ করে তাই বসেছিলাম—ভাল লাগছিল না কিছু করতে।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করল, "কি ভাবছেন দাদা?"

আমারই মত কেরাণী সে—এক টেবিলে সামনাসামনি বসে ভূতের বেগার খাটি আমরা। বয়সে সে আমার চেয়ে বেশ ছোট। সবে চাকরিতে ঢুকেছে—বছর পেরোয় নি এখনো। ছেলেটি কিন্তু ভাল।

সব কথা তাকে ব'ললাম। শুনল সে চুপ ক'রে—কোন কথা ব'লল না—সব শুনেও।

একটু পরে সামনের দিকে চেয়ে দেখি সে নেই তার জায়গায়—উঠে গিয়েছে কোন্ ফাঁকে। এমনি সে যায় মাঝে মাঝে—চাকরিতে মন বসে নি এখনো তার।

আর একটু পরেই সে ফিরে এল এবং বেশ গম্ভীরভাবে আমার সামনে একখানা স্লিপ কাগজ লম্বা করে পেতে ধরল। আমি দেখলাম নীল পেন্সিলে আমার ছুটি মঞ্জুর ক'রে সই ক'রে দিয়েছেন বড়বাবু তার নীচে।

আমি তার মুখের দিকে চাইতে জয়ন্ত ব'লল, "আমার একটু স্বার্থ আছে দাদা—নূতন গুড় আনতে হবে কিন্তু—"

আমি চুপ ক'রে ছিলাম, চুপ ক'রেই গেলাম—কোন কথা জোগাল না আমার মুখে। ভাবছিলাম আমি জয়ন্তর কথা—অনায়াসে পরকে সে আপনার করে নিতে পারে। অবস্থা তাদের ভালই। বড় চাকরি করেন তার বাবা। বড়বাবুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে। জয়ন্তকেও তাই খাতির করেন বড়বাবু। কৃতজ্ঞতায় মন আমার ভরে উঠেছিল তার ওপরে কিন্তু মুখে বলতে পারলাম না কোন কথা—গুড় আনবার কথাটাও বলা হ'ল না।

সেই দিনই চিঠি লিখেদিলাম বাড়ীতে—কোন কিছু নিয়ে যাবার যদি থাকে লেখবার জন্য। সোমবারে চিঠির জবাব এল। বেশি কথা ছিল না তাতে—কোন দিনই থাকে না। মায়ের জন্য একখানা কম্বল নিতে লিখেছে বিভা। সে আরো লিখেছিল যে খোকা কথা ব'লতে শিখেছে এবং আমাকে ডাকে মাঝে মাঝে। সে ডাক আমি শুনতে পাই কি না জিজ্ঞাসা করে চিঠি শেষ করেছে বিভা।

*

বিষ্যুদবারে যখন বাড়ী পৌছলাম, বেলা তখন দু'টো বেজে গিয়েছে। সকাল সাতটায় পৌছতে পারতাম রাতের গাড়ীতে এলে। সে গাড়ীতে এই রকম ছুটির আগে এত ভীড় হয় যে ব'সবার জায়গাও পাওয়া যায় না সব সময়ে। সে গাড়ীতে আমি আসিনে। দু'তিন দিন ছুটি না হ'লে তাই বাড়ী আসা আমার হয়ে ওঠে না।

বিশেষ কিছু আমি আনি নি, কিন্তু বেশ একটা মোট হ'য়ে উঠেছিল সামান্য এটা ওটা যা এনেছিলাম।

আমি বাড়ী ঢুকতেই মা সারা দিলেন—এলি?

কম্বলখানা কাগজে জড়িয়ে আলাদা করে এনেছিলাম। কোন কথা না বলে কম্বলখানা মা'র সামনে ধরে তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, "দেখ ত' কম্বলখানা—শীত ভাঙবে কি না?"

মা চোখে ভাল দেখতে পান না। কম্বলখানায় একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কত দিয়ে কিনলি?"

"সাত টাকা।"

"ওরে বাবা! অত টাকা দিয়ে কিনতে গেলি কেন আমার জন্য কম্বল? ফিরিয়ে দি-গে যা, ওটা—ও আমি গায়ে দিতে পারব না।"

"কিন্তু মা কম দামের কম্বলে ত' গরম হ'ত না—আর যে শীত পড়েছে এবার এরই মধ্যে—"

"তা' পড়ুক—শীতকালে শীত পড়বে না? কিন্তু এত দামের কম্বল আমি গায়ে দিতে পারব না।"

"কিন্তু গায়ে দিয়ে শীত ভাঙবে না এমন কম্বল গায়ে দিয়ে লাভ কি?"

"লাভ-লোকসানের কথা থাক এখন—যা তুই, হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খা আগে—যা-যা—" বলে মা আমাকে আমার ঘর দেখিয়ে দিলেন।

কম্বল দেখে বিভা ব'লল, "কি সুন্দর কম্বল—যেমন নরম তেমনি গরম—"

"কিন্তু মা ত' গায়ে দেবেন না বলছেন ও কম্বল।"

"কেন?"

"অত দামের জিনিষ তিনি গায়ে দেবেন না।"

"দাম তুমি বলতে গেলে কেন মাকে?"

"বাঃ জিজ্ঞাসা করলে বলব না? মিথ্যা বলব?"

একটু কি ভেবে নিয়ে বিভা ব'লল, "আচ্ছা সে যা করতে হয় আমি করব—তোমার ভাবতে হবে না কিছু।"

"কিন্তু কি করবে তুমি—শুনিই না?"

"তু'পুরু ক'রে ওয়াড় দেব ওর ওপরে, আর মুখ দেব তার সেলাই করে। মাঝে মাঝে তু'চারটে ফোঁড় তুলে দেব—বলব কাঁথা—বুঝতে পারবেন না হাত দিয়ে।"

"ফিচেল বুদ্ধি ত' ষোল আনা আছে দেখছি!"

"তোমাদের সঙ্গে নইলে পেরে ওঠবার যো আছে? আচ্ছা ওসব বাজে কথা এখন থাক—একটু তাড়াতাড়ি এই-বার নেয়ে খেয়ে নাও।"

"বড়বাবু হ'য়ে উঠলে যে দেখছি তুমি? সামনে পেয়েছ কি ধমকাতে আরম্ভ করে দিয়েছ!"

"কি যে বল তার ঠিক নেই। কথাটা বোঝ—এই শীতেরবেলা দেখতে দেখতে এখনি সন্ধ্যা হ'য়ে যাবে। ওদিকে তোমার খাওয়া না হ'লে মা খাবেন না আর সন্ধ্যা হ'য়ে গেলেও খাওয়া হবে না তাঁর।"

"তা বটে, আচ্ছা"—বলে আমি জামা কাপড় ছাড়তে আরম্ভ ক'রে দিলাম।

দেখে বিভা ব'লল, "জল গরম চড়িয়েছি—"

"কেন গরম জল কি হবে?"

"তুমি না'বে।"

"আমার না'বার জন্য গরম জলের দরকার কি?"

"আছে দরকার—এই শীতকালের দিনে অবেলায় ঠাণ্ডা জলে নাওয়া হবে না তোমার—সে আমি বলে দিলাম"—ব'লে বিভা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

*

সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছে। পাশের রায়েদের বাড়ীর আরতির শাঁখ-ঘণ্টা থেমে গিয়েছে। বাইরের ঘরে আমি চুপ ক'রে বসেছিলাম। বাদল রাস্তা থেকে ডাকল এবং আমার সাড়া পেয়ে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল তু'হাতে তু'টো ফুলকপি নিয়ে। কপি তু'টো আমার দিকে আগিয়ে ধরে ব'লল, "কি রকম কপি ফলিয়েছি—দেখ।"

"তোর নিজের ক্ষেতের কপি নাকি ও?"

"নয় ত' কি? শুধু কপি নয়—আরও আছে, কিন্তু তাদের কথা আজ নয়—যখন হবে—দেখো—চোখ জুড়িয়ে যাবে দেখে।"

"কিন্তু ভাই আমার ত' কপি হল না।"

"ক'লকাতায় বসে তুমি করবে চাকরি আর দেশের ক্ষেতে হবে তোমার কপি? ফাঁকি পেয়েছ—না?"

"কিন্তু এত ভাল না হোক কিছু ত' হবে?"

"কিছুই হ'বে না—"

বাদলের কথার মধ্যেই দেবু আর নন্দ এসে ঢুকল ঘরের মধ্যে এবং কোন ভূমিকা না করে নন্দ ব'লে উঠল, "কাল ভোরে রস খেতে যাব—তোমায় ডাকব ঠিক সময়ে।"

"কিন্তু ও-সব দস্যুবৃত্তি আর সহ্য হবে না ভাই—আমি যাব না রস খেতে।"

"ধরে নিয়ে যাব তোমাকে—যেতে হবে তোমার, আমি বলছি।"

"কিন্তু আমি বলছি কি?—খেজুর রসের কথা এখন থাক এখন বরং চা-রস হলে মন্দ হয় না!"

"ও কথাটা মনেই হয় নি"—তাই বলে এখনি উঠে আমি রান্নাঘরে গিয়ে দেখলাম উননের ওপরে ছোট কড়াই ক'রে কি ভাজচে বিভা। আমি বিরক্তভাবে ব'লে উঠলাম, "ও-সব ঘরের রান্না পরে হবে—তখন একটু চা ক'রে দাও দেখি।"

"চা-ই ত' করছি।"

"ঐ কড়াইয়ে চা ভাজতে চড়িয়েছ নাকি?"

"চা ঐ হচ্ছে দেখ", বলে আঙুল বাড়িয়ে বিভা যেদিকে আঙুল দেখিয়ে দিল—সেখানে দেখলাম যে ঢাকা দেওয়া একটা পাত্রের পাশ দিয়ে ভাপ উঠচে গরম জলের। দেখে আশ্বস্ত হয়ে আমি ব'ললাম, "তবু ভাল, খেয়াল আছে তোমার। আমি ত' একেবারে ভুলেগিয়েছিলাম চা'র কথা।"

"কিন্তু শুধু ত' চা' হলে চলবে না—আরও কিছু চাই ঐ সঙ্গে। তাই ছোট ছোট করে দু'খানা নিমকি ভাজলাম। ভালই লাগবে গরম গরম চা'র সঙ্গে।"

মনটা ঠাণ্ডা হ'ল দেখে শুনে—তবু জিজ্ঞাসা করলাম, "কিন্তু আর দেরী কত ?"

"দেরী নেই, এই দেখ না—ঢেলে দিচ্ছি চা"—বলে' বিভা উঠে পাশের তাক থেকে চা এর বাসন নামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "ক'জন ?"

"আমায় নিয়ে চারজন।"

দেখতে দেখতে চারখানা ডিস ছোট ছোট নিমকিতে ভরে উঠল এবং চা'ও ঢালা হয়ে গেল কাপে কাপে।

চায়ের সঙ্গে তারপরে রীতিমত গল্প জমে উঠল আমাদের এবং খেয়ালই রইল না যে রাত হয়ে যাচ্ছে ওদিকে। গল্পের মধ্যে হঠাৎ মিঠে একটা সুর এক সময়ে ঘরের মধ্যে ভেসে আসতে চমকে উঠলাম আমি—জিজ্ঞাসা করলাম, "বা: বেশ গানটি ত' গাচ্ছে ও ?"

"গান নয়—হোন-বোন গাইছে চাষা পাড়ার সব ছেলেরা মিলে।"

"কিন্তু চমৎকার গাইছে—"

"হাঁ মদনদা'র ছেলেটির গলাটি বেশ মিষ্টি, ওর গানই ত' শুনা যাচ্ছে সকলের উপরে।"

"গান শুনলে হয় না একদিন ছেলেটাকে ডেকে ?"

"না সে ভাল লাগবে না তোমাদের। মেঠো সুরের ঐ ওদের গান ফাঁকা আকাশের তলায় কনকনে শীতের মধ্যেই ভাল লাগে, ঘরের মধ্যে ভাল লাগবে না ও।"

"আর, হয় ত' গাইতে পারবে না ও আমাদের সকলের সামনে বসে।"

"সম্ভব—"

"কিন্তু আর নয় ভাই,' ওরা যখন বেরিয়েছে তখন রাত প্রায় দশটা বাজবে—

"এত রাত হয়ে গিয়েছে", বলতে বলতে বাদল উঠে পড়ল। আর দুজনও উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

নন্দ যেতে যেতে বলল, "তাহলে রস খেতে যাবে না ?"

"না ভাই, ওসব আর সহ্য হবে না শরীরে—"

"তা বটে, ক'লকাতায় থেকে বাবু হয়ে গিয়েছ তোমরা, আচ্ছা তাহ'লে আর যাওয়া হবে না—"

বাইরের দোর বন্ধ করে আসতে বিভা বলল, "শোবার ঘরেই তোমার খাবার যায়গা করে রেখেছি—তুমি গিয়ে বস আমি আসছি এখনি—

"কিন্তু আজ আর কিছু খেতে ইচ্ছা হচ্ছে না," বলে তার আঁচল টেনে আটকে ফেললাম বিভাকে।

"বেশী কিছু নয়—একটু পায়স খাবে শুধু—"

"পায়েস ? নূতনগুড়ের নাকি ? কোথায় পেলে ?

দিদি পাঠিয়ে দিয়েছেন তোমার জন্য, আজ সকালে মাধব এসেছিল গুড় নিয়ে—"

মনটা ভরে উঠল দিদির গুড় পাঠানের কথা শুনে। নূতন গুড় যে আমি ভালবাসি দিদি জানে এবং আশ্চর্য্য এই যে, কোনবারই ভুল হয় না তাঁর গুড় পাঠাতে আমার জন্য। অনেক কথাই মনে আসতে লাগল ঐ গুড় পাঠানের কথার মধ্য দিয়া। আমাকে চুপকরে থাকতে দেখে বিভা বল্লে, "নাও, খেয়ে নাও রাত করছ কেন ?"

"খাব ত' কিন্তু কি খাব ? আসন ত' পাতা রয়েছে খাবার কই ?"

"ওমা" বলে জিভ কেটে বিভা তাড়াতাড়ি সে ঘর থেকে গিয়ে নিমিষের মধ্যে একবাটী পায়েস এনে রাখল আসনের সামনে।

খেতে বসে আমি বললাম—"কাল যাব আমি দিদির বাড়ী, নেবু-টেবু দুটো আছে ত' ?

"সে সব আমি আলাদা করে রেখেছি দিদির জন্য।"

আর কোন কথা না বলে আমি খেতে আরম্ভ করে দিলাম। মুখে দিতেই বুঝলাম শুধু খিদে নয় লোভও জেগে উঠেছে ভেতরে ভেতরে। তাহলেও কিছু আর চাইতে পারলাম না, বলতে পারলাম না বিভাকে আর একটু দাও।

সাময়িক প্রসঙ্গ ও আলোচনা

কলিকাতায় বিমান আক্রমণ

কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত সহরতলী অঞ্চলের উপর পর পর পাঁচ দিন বিমান আক্রমণ হইয়া গেল। ব্রহ্মদেশ আক্রান্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতাবাসীর মনে বিমান আক্রমণের আশঙ্কা জাগিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর দীর্ঘ এক বৎসর কাটিয়া যাওয়ায়, আশঙ্কা কতকটা শিথিল হইয়াছিল। অনেকে এমনও মনে করিয়াছিলেন যে, হয় ত' কলিকাতায় শত্রু-বিমান হইতে বোমা আদৌ পড়িবে না। কারণ, জাপানীরা তাহাদের অধিকৃত বিস্তীর্ণ অঞ্চলগুলি আয়ত্তে রাখিতেই অতিবড় ব্যস্ত ও হয়রাণ হইয়া পড়িয়াছে; এখন অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করিবার আর তাহাদের অবকাশ বা সামর্থ্য একেবারেই নাই। যাহা হউক, সে গবেষণা আপাততঃ ব্যর্থ হইয়াছে। বিগত ৬ষ্ঠা পৌষ, রবিবার, শুক্লা একাদশী তিথিতে জ্যোৎস্নালোকোদ্ভাসিত কলিকাতা নগরীর বহিরঞ্চলের উপর জাপানী বিমান হইতে প্রথম বোমা পড়ে। তাহার পর একদিন বাদ দিয়া পর পর চারি দিন সহরের উপরে ও উপকণ্ঠে বোমা পড়িয়াছে। অবশ্য সর্ব্বত্রই বোমাগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াই পতিত হইয়াছে, এবং ক্ষতির পরিমাণ ও হতাহত, যদিও সঠিক জানা যায় নাই, তথাপি খুব সামান্যই হইয়াছে। বোমাগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও নাকি অতি উগ্র বিস্ফোরক ছিল। জাপানী বিমানগুলি অতি উর্দ্ধাকাশে থাকিয়া এই আক্রমণ চালাইয়াছিল বলিয়াই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে, কিম্বা বৃটিশ জঙ্গী বিমানগুলির তাড়ণায় ও বিমান-বিধ্বংসী কামানের গোলা বর্ষণে ব্যতিব্যস্ত ও ভীত হইয়া এরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহা সঠিক বুঝা যাইতেছে না। যে কারণেই হউক এবং জাপানীদের এই পাঁচ পাঁচটি আক্রমণের উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, তাহা যে ব্যর্থ হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। সুদূর ব্রহ্মের রেঙ্গুন সহরের উপর প্রথম বোমা পতনের সংবাদে কলিকাতাবাসী যতটা ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এবার তাহা মোটেই হয় নাই। এবার অধিকাংশ কলিকাতাবাসীর মনোবলই অটুট ও অক্ষুণ্ণ আছে। তাই দলে দলে এখানে সেখানে ছুটাছুটি করিয়া, অর্থ ও সামর্থ্য খোয়াইয়া, অসহায় কাপুরুষের মত নানারূপ অসুবিধায় পড়িয়া ম্যালেরিয়ার ক্ষুধা মিটাইতে কেহ আর ইচ্ছুক নহে। শত্রু যেভাবে যেরূপ রুদ্রমূর্ত্তিতেই আসুক, এবার কলিকাতাবাসী তাহার সম্মুখীন হইবে বলিয়াই মনে হয়। অবশ্য এই সব আক্রমণের পর অনেক উড়িয়া ও হিন্দুস্থানী সহর ছাড়িয়া, নকড়ীর মায়া কাটাইয়া দেশে চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশই অশিক্ষিত ও শ্রমজীবী সম্প্রদায়ভুক্ত। বাঙ্গালী সহরত্যাগীর সংখ্যা গত বৎসরের তুলনায় এবং অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনায় খুবই কম। স্বয়ং বড়লাট সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া, বাঙ্গলার গভর্ণর, এমন কি, প্রধান মন্ত্রী পর্য্যন্ত সহরবাসীর এই ধৈর্য্য ও সাহসের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। করিবারই কথা। এ সময়ে ভীত হইলে মোটেই চলিবে না। বরং তাহা নানা কারণে সমধিক মারাত্মকই হইবে। কলিকাতা সমগ্র বাঙ্গলার সরবরাহ-কেন্দ্র। এই স্থান বিপর্য্যস্ত হইলে সারা বাঙ্গলাই বিপন্ন হইয়া পড়িবে। বোমার হাত হইতে বাঁচিতে গিয়া আবাহন করিয়া আনা হইবে দুর্ভিক্ষ মহামারী ইত্যাদি।

কলিকাতার উপর এই বিমান আক্রমণ সম্বন্ধে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। তাহা হইতেছে এই যে, জাপানীরা ইতঃপূর্ব্বে যে সকল স্থানে বিমান আক্রমণ করিয়াছে, সবই দিনের বেলায়। রাত্রিকালে বিমান আক্রমণ এই কলিকাতা এলাকায়ই প্রথম। অভিজ্ঞগণের মতে ইহার কারণ আর কিছুই নহে,—কলিকাতা রক্ষার সুব্যবস্থা এবং সে সম্বন্ধে জাপানীগণের অভিজ্ঞতা। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষও ইতঃপূর্ব্বে কলিকাতা রক্ষার সুব্যবস্থা সম্বন্ধে আশ্বাস দিয়াছিলেন, কার্য্যতঃও তাহাই যখন দেখা যাইতেছে, তখন সহরবাসী যে কতকটা আশ্বস্ত ও নির্ভয় হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে? জাপানীরা যদি সাহস করিয়া দিনের বেলায় কলিকাতার উপরে বিমান আক্রমণ চালাইতে না-ই পারে, তাহা হইলে সহরবাসীও একটুও দমিবে না। বস্তুতঃ দিনের বেলায় বিমান আক্রমণই অত্যধিক বিপজ্জনক; বিশেষতঃ কলিকাতার মত জনবহুল বাণিজ্য-প্রধান মহানগরীর উপরে। কলিকাতার অসংখ্য রাজপথে, পণ্য-বিথীকায়, আফিস-আদালতে, ষ্টেশনে, ডকে, জাহাজ-ঘাটায়, মিলে, কারখানায় সর্ব্বত্রই এই সময় লক্ষ লক্ষ লোক কর্ম্মব্যস্ত থাকে। বোমা যেখানেই পড়ুক, হাজার হাজার লোকের জীবন হানি হওয়া মোটেই অসম্ভব নহে। আজ কাল শীতের রাত্রি, বিশেষতঃ ব্ল্যাক আউটের কল্যাণে, দোকান-পাট এবং যান-বাহনাদি সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই বন্ধ হওয়ায়, কেহ আর অধিক সময় বাহিরে থাকে না। সকাল সকাল কাজকর্ম্ম সারিয়া যে যাহার ঘরের কোণে আশ্রয় লয়। বিমান আক্রমণ হইলেও ব্যর্থ পুরুষকার দেখাইতে গিয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া, অথবা অপরিণামদর্শীর

তার কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া কেহই অযথা বিপন্ন হয় না। অদৃষ্টের উপর একান্ত নির্ভর করিয়া সাবধানে গৃহের মধ্যেই অবস্থিত থাকে। অবশ্য বিমান আক্রমণ যে অতঃপর সম্ভবপর হইলেও, এইরূপ রাত্রিকালেই হইবে, দিনের বেলায় হইতে পারিবেই না, ইহা কেহই জোর করিয়া বলিতে পারে না। জাপানীরা বস্তুতঃ কতটা সবল আছে বা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে তাহা সঠিক কেহই জানে না, কর্ত্তৃপক্ষও নহে। সবই অনুমানের উপর নির্ভরশীল। কেহ কেহ বলেন, জাপানীদের এই বিমান আক্রমণ নিছক প্রত্যুত্তর মাত্র। বৃটিশ ও মার্কিন বিমানগুলি কিছুদিন যাবৎ ব্রহ্মদেশের উপর যে নিরবচ্ছিন্ন ও ভয়াবহ আক্রমণ চালাইতেছে ইহা তাহারই জবাব। অথবা এমনও হইতে পারে যে, বৃটিশ-সেনা আরাকান অঞ্চলে স্থলপথে ব্রহ্মদেশের উপর সাফল্যের সহিত যে অভিযান চালাইয়াছে তাহা বিপর্য্যস্ত করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই ক্ষুদ্র বিমানাক্রমণগুলি পরিচালিত হইয়াছে। যাহাই হউক, ভবিষ্যতের ভার ভবিতব্যের উপরেই ন্যস্ত থাক, সে সম্বন্ধে মাথা ঘামাইয়া কোন ফল নাই। বিশেষতঃ আমরা অসামরিক জাতি হিসাবেই যখন গণ্য; আমাদের মনোবৃত্তিও অসামরিক। তাহার উপর বর্ত্তমান যুদ্ধের ভাব গতিক এমন বেয়াড়া ও বেখাপ্পা যে, ইহার কোন সূত্র ধরিয়া কিছুই স্থির করিয়া বুঝা বা বলা চলে না।

মুদ্রা-বিভ্রাট

শত্রুর বোমার অপেক্ষাও লোক অধিক বিব্রত ও অসুবিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে খুচরা মুদ্রার বিভ্রাটে। তামার পয়সা ত বাজারে মিলে না। এতদিন আধ-আনিগুলি কতকটা সুলভ ছিল; দেখিতে দেখিতে তাহাও দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িতেছে। মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া বহু দোকান ঘুরিয়াও টাকার ভাঙ্গানী জুটিয়া উঠে না। এরূপ অবস্থা আরও কিছুদিন চলিলে খুচরা বেচা-কেনা যে সম্পূর্ণরূপে অচল হইয়া পড়িবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কর্ত্তৃপক্ষের এদিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করা একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। ব্যবসায়ীগণের সঞ্চয়বৃদ্ধির ফলেই হউক আর যে কারণেই হউক, খুচরা মুদ্রার বহুল প্রচলন বাজারে রাখিতেই হইবে। এজন্য গভর্ণমেণ্টকে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়, সেও বাঞ্ছনীয়। সহরেই যখন খুচরা ভাঙ্গানী মুদ্রার এত অভাব তখন মফঃস্বলের অবস্থা যে কিরূপ দুর্ব্বহ হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা চলে। আমরা বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের মারফত একটা সংবাদ জানিতে পারিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। দেশব্যাপী যখন তাম্রমুদ্রার এরূপ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, সেই দুর্বিসহ সময়েও নাকি ভারতের টাঁকশালে অষ্ট্রেলিয়ার জন্য তাম্রমুদ্রা তৈয়ার হইয়া চালান যাইতেছে! কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্! প্রজার সুখ সুবিধার প্রতি সর্ব্বদা অবহিত থাকাই ত ন্যায়বান রাজার কর্ত্তব্য। ভারত গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, ভারতের চল্লিশ কোটি প্রজার সুখ সুবিধা ও স্বার্থ, তাহার শক্তিতে যতটা কুলায়, তাহা বজায় রাখা, তারপর অন্যের ভাবনার অবসর থাকিলে তাহা সঙ্গত উপায়ে ভাবিবার নিমিত্ত দেশবাসীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ করা। এ একেবারেই বিপরীত! আমরা ভারত গবর্ণমেণ্টকে ব্যাপারটার প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা বিস্তারিতভাবে সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করি। কারণ, ইহার ফলে দেশব্যাপী একটা অসন্তোষের ভাব জাগিয়া উঠা এ সময়ে মোটেই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

নববর্ষের নূতন অর্ডিনান্স

গত ৯ই জানুয়ারী তারিখে ১৯৪৩ সালের প্রথম অর্ডিনান্স জারী হইয়াছে। এই অর্ডিনান্স বলে যাহারা শত্রুর এজেণ্ট বলিয়া সাব্যস্ত হইবে, অথবা যে বা যাহারা শত্রুকে সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে এমন কোনরূপ কার্য্য করিবে বা করিতে চেষ্টা করিবে, অথবা অপরের সহিত তদুদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবে, যাহা শত্রুর স্থল, নৌ ও বিমান যুদ্ধের সহায়ক স্বরূপে পরিকল্পিত বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য এবং যদ্দ্বারা রাজকীয় স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর অভিযান ব্যাহত ও লোকের প্রাণ বিপন্ন হইতে পারে, তাহার বা তাহাদিগের প্রতি মৃত্যুদণ্ড প্রদত্ত হইবে।

পীর পাগারোর গুপ্তধন

করাচী পুলিস সম্প্রতি কয়েকদিন হইল একস্থানে মাটি খুঁড়িয়া নাকি ৮০ খানা রূপার ইঁট পাইয়াছে, যাহার মূল্য হইবে অনুমান চারি লক্ষ টাকা। এই রূপার ইঁটগুলির মালিক নাকি বিখ্যাত হুর আন্দোলনের নেতা পীর পাগারো। অবশ্য ইহা এখন পর্য্যন্ত অনুমান মাত্র।

ছাড়পত্রের কড়াকড়ি

এক প্রেস নোট মারফত জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, অতঃপর যে সকল যাত্রী ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে গমন করিবেন অথবা যে সব যাত্রী বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিবেন তাঁহারা কেহই ছাড়পত্র ব্যতীত তাহাদের সঙ্গে কোনরূপ দলিলপত্রাদি, ছবি, ফটোগ্রাফ ও গ্রামোফোন রেকর্ড লইতে পারিবেন না। ভারত হইতে দেশান্তরে গমনেচ্ছু ব্যক্তিগণ ভারত ত্যাগের পূর্ব্বে নূতন দিল্লীর সিনিয়র সেন্সর আফিসে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে নীতব্য যাবতীয় অ-ডাকবাহী দ্রব্য (Non-postal articles) সেন্সর করাইয়া লইবেন এবং যাঁহারা দেশান্তর হইতে ভারতে আসিবেন তাঁহারা জাহাজ হইতে ভারতের মাটিতে পদার্পণ করিয়াই তাঁহাদের যাবতীয় অ-ডাকবাহী বস্তু জাহাজ-ঘাটায় উপস্থিত শুল্ক-বিভাগীয় কর্ম্মচারির জিম্মা করিয়া দিবেন, এবং নির্দ্ধারিত সময়ে নূতন দিল্লীর সেন্সর আফিস হইতে জিনিষ বুঝিয়া লইবেন। যাঁহারা এই বিধান লঙ্ঘন করিবেন তাঁহারা অভিযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাঁহাদের পাঁচ বৎসর জেল কিম্বা অর্থদণ্ড অথবা এককালীন জেল ও অর্থদণ্ড উভয়ই হইতে পারিবে।

মানহানীর দায়ে পিতা অভিযুক্ত

এ যুগে পিতারও পুত্রের মানহানী করিবার অধিকার নাই, অন্যেপরে কা কথা। সুতরাং পিতারা সাবধান! পুত্রকে গু, মুত খাইয়া মানুষ করিয়াছেন বলিয়া বেশী বেফাঁস হইবেন না। পুত্রের সহিত সংযত হইয়া বাক্যালাপ ও ব্যবহার করিবেন। সম্প্রতি বিহার প্রদেশের এক অসাবধান পিতা খবরের কাগজে পুত্রের মানহানীকর সংবাদ ছাপিয়া ফ্যাসাদে পড়িয়াছেন।

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"



দশম বর্ষ } ফাল্গুন—১৩৪৯ { ২য় খণ্ড—৩য় সংখ্যা

চিত্র-সূচী

বড়বাবু

শ্রীকানাই বসু

পাঁচ

দীনবন্ধু-বৎসল অরুণার সুযোগ আসিল এই নিত্যহরিকেই উপলক্ষ করিয়া। আহারে বসিয়া সুবিমলই কথাটা পাড়িল। মাছের নানাবিধ ব্যঞ্জনে রসনা পরিতৃপ্ত হইবার সময়ে মাছের প্রশংসা এক দফা হইল এবং তাহা হইতে যে ব্যক্তি মাছ কুটিয়াছে তাহার কথা মনে পড়াই স্বাভাবিক।

সুবিমল কহিল, "লোকটা কাজের লোক আছে, কয়েক জায়গায় কাজও করেছে, তুমি কি বল?"

প্রশ্নের বিষয়বস্তুটা অরুণা বুঝিল। কিন্তু না বুঝিবার ভান করিয়া কহিল, "হুঁ, মাছটাছ কুটতে জানে।"

"মাছ কোটার কথা বলছি না, আপিসের কাজের কথা বলছি। বলছি বুদ্ধি শুদ্ধি আছে, কাজ চালাতে পারবে, কি বল?"

দীনবন্ধু-সমস্যা না থাকিলে অরুণার নিত্যহরি সম্বন্ধে স্বামীর মতে সায় দিতে কোনও আপত্তিই থাকিত না। কারণ ওবিষয়ে তাহার নিজের কোনও মতামতই থাকিবার কথা নয়। কিন্তু এখন নিত্যহরিকে দীনবন্ধুর সিংহাসনের দাবীদাররূপে দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে অরুণার মত স্থির হইয়া গেল। সে গম্ভীর ভাবে কহিল, "আপিসের কাজ চালাতে পারবে কি না পারবে, সে তুমি বোঝো, আমি কি করে তবে আপিসে তোমার সময় কাটাবার জন্যে আর ভাবতে বলব? হবে না, এটুকু বলতে পারি।"

সুবিমল ঠিক বুঝিতে পারিল না অরুণার কথা কোনদিকে মোড় ফিরিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তার মানে?"

এবার অরুণা কথায় একটু জোর দিয়া বলিল, "মানে আর কি? মাছের মুড়ো কাটা ছাড়া আর কিছু কাজের পরিচয় তো এখনও পাই নি। তবে তোমার নিত্যহরি যে কথা কইতে জানে এটা বুঝতে আমার মতো বোকা লোকেরও দেরী হয় নি। অত কথা কয় যে লোক তাকে আমার তো বাপু ভালো লাগে না, তা তুমি যা-ই বল।"

নিত্যহরির এ অপবাদ অস্বীকার করা গেল না, সুতরাং তাহার অপরিমিত বচন-বিলাসের জন্য সুবিমলই লজ্জিত হইল এবং তাহার এই দোষ চাপা দিবার উপযুক্ত একটা পাল্টা গুণ হিসাবেই সে বলিল, "কিন্তু লোকটা বাঙ্গালী, তা বল?"

অরুণা বলিল, "হুঁ"।

"কি বললে শুনলে তো? আজ কাল উড়ে আর মেড়োদের জন্যে বাঙ্গালীদের আর করে খাবার রাস্তা নেই। সব আপিসেই সর্দার বেয়ারা উড়ে, আর চাপরাসী-পিওনদের জমাদার খোট্টা। তাহলে এইসব অশিক্ষিত বাঙ্গালীরা যায় কোথা বল? এই ধরো নিত্যহরির মতো পাড়াগেঁয়ে গরীব লোক, যাদের মুরুব্বির জোর নেই, এরা—"

অরুণা কহিল, "তা তোমার নিত্যহরির অন্তত: মুরুব্বির অভাব হবার কথা নয়। ওরকম খোসামোদ করলে লাট সাহেবকে মুরুব্বি করে আনতে ওর বেশী দেরী হবে না। আর অত কথায় কাজ কি, তোমারই যখন মন গলিয়েছে।"

সুবিমল ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, "তার মানে? তুমি কি বলতে চাও ও আমাকে খোসামোদ করে ভিজিয়েছে?"

অরুণা উত্তর দিল না। তাহাতে তাহার উত্তর অস্পষ্ট রহিল না। সুবিমল বলিল, "না, চুপ করে থাকলে চলবে না অরুণা, তুমি বড় ভয়ানক কথা বলেছ। এ কথা বলবার মানে কি বল?"

"মানে কিছু নয়, তুমি খেয়ে নাও। আর দুটো মাছ ভাজা দিই, কি বল?" অরুণা কথা চাপা দিবার চেষ্টা করিল।

সুবিল কহিল, "রেখে দাও তোমার মাছ ভাজা, তোমার ও কথা বলবার মানে কি আগে বল।"

তখন অরুণা যথাসাধ্য সহজস্বরে বলিল, "মানে আর আমি কি বলব? ছিচরণ, মহতের আশ্রয়, মনের মত মনিব, তারপর তোমার লক্ষ্মীনারায়ণ, এই সব কথাগুলোর মানে তুমিও জানো। আর মাছ কুটে দেওয়ার মানে বোঝাও শক্ত নয়।"

"হুঁ, ওসব কথা সে বলেছিল বটে। কিন্তু ওগুলো আমার এক কান দিয়ে ঢুকে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে মাত্র। ঐ রকম কথায় আমাকে influence করতে পারে, তুমি আমাকে এমনি হালকা মনে কর? লোকটা বাঙ্গালী, কাজ চালাতে পারবে বলে মনে হচ্ছে, তাই। তবু ওকে তো বলিনি যে ওকেই চাকরী দোব।"

স্বামীর মনে ব্যথা দেওয়া অরুণার ইচ্ছা নয়। সে কহিল "তুমি রাগ কোরো না, কিন্তু ওকে না বললেও, তোমার মনটা ওর ওপর সদয় হয়েছে কি না বল? সে কি খালি ও বাঙ্গালী বলেই?"

অরুণার সহজ সুরে সুবিমলের সুর নামিল না। বলিল, "তা না তো কি ওর খোসামোদে ওর ওপর সদয় হয়েছি? আমাকে খোসামোদ করতে এলে ওর চাকরী একদিনও টি'কবে? তুমি আমাকে এতদিনে এই চিনলে?"

"তোমাকে চিনেছি বলেই তো বলছি। ও না টে'কে আর একটা বেয়ারার বরাত খুলবে। কিন্তু সেও কদিনের জন্যে তা আমি এখনই বলে দিতে পারি। তা হলে আর বেচারা দীনবন্ধুকে মিথ্যে কাঁদানো কেন?"

সুবিমলের ভ্রূ আবার কুঞ্চিত হইল, বলিল, "কি আশ্চর্য্য! দীনবন্ধু নিজের দোষে তার চাকরী খোয়াচ্ছে, তাকে অনেকবার সাবধান করা হয়েছে, কিন্তু—"

তর্কে যোগদান করিয়াও তার্কিক মেজাজের ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া থাকা বেশীক্ষণ সম্ভব নহে। অরুণার সুর আর নিস্পৃহ সহজ রহিল না। সে বাধা দিয়া কহিল, "দোষ তো তার খোসামোদ করা? সে দোষে যদি দীনবন্ধুর চাকরি যায়, তাহলে তোমার ঐ নরহরির—"

"নরহরি নয়, নিত্যহরি।"

"নিত্যহরির চাকরি পাবার আগেই যাওয়া উচিত। নিত্যহরির কাছে দীনবন্ধু এখনও পাঁচবছর খোসামোদের শিক্ষা নিতে পারে।"

কথাটা একেবারে উড়াইয়া দিবার মতো নয় বলিয়াই মনে হয় যেন। তাই তাহাকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টায় সুবিমল হঠাৎ যুক্তিতর্কের রাশ ছিঁড়িয়া ফেলিল। অনাবশ্যক উচ্চ কণ্ঠে বলিল, "আমি তোমার দীনবন্ধুকে রাখব না, আমার খুশী। ব্যস।"

সহজেই জ্বলিয়া উঠে ও সহজেই নিবিয়া যায়, এমন দাহ্য পদার্থ পৃথিবীতে একাধিক আছে। ইহাদের যে কোনও একটির উল্লেখ করিয়া দাম্পত্য কলহের সহিত উপমিত করিতে পারা যায়। কিন্তু সে উপমা বা কোনও উপমার সাহায্যেই দাম্পত্য কলহের অজ্ঞেয় রহস্যের পরিমাপ করা যায় না। কোনও পক্ষেই ভালবাসার প্রাবল্যে বিন্দুমাত্র মন্দা পড়ে নাই, উভয় পক্ষের মনেই মালিন্যের নামগন্ধ নাই। অথচ ক্ষণে ক্ষণে মনোমালিন্য ঘটিতে পাঁচ মিনিটও লাগে না এবং তাহার কারণও যেমন অনাবশ্যক তেমনই লঘু। এই রহস্য-কৌতুকময় দুর্ঘটনা মানুষের ইতিহাসের শুরু হইতেই চলিয়া আসিতেছে। আজও ইহার পুনরাবৃত্তি হইয়া গেল এই প্রণয়ী যুগলের মধ্যে।

সুবিমল সজোরে বলিল, "ব্যস।" কিন্তু একপক্ষ 'ব্যস' বলিলেই অপরপক্ষ তাহা মানিয়া লইয়া নিরুত্তর হইবে, তর্ক-যুদ্ধের নিবৃত্তি অত সহজ নয়। অরুণা পাল্লা দিয়া স্বামীর সহিত কণ্ঠ না চড়াইলেও এবার যে সুরে কথা কহিল তাহা আর কোমল রহিল না।

"ব্যস তা আমি জানি, আর তোমারই যে খুশী তাও জানি। দীনবন্ধুকে চাকরি থেকে ছাড়ানো তোমার খুশী, আর নিত্যহরিকে চাকরি দেওয়া সে-ও তোমার খুশী। কিন্তু এর পর আর যেন বোলো না তুমি খোসামোদ পছন্দ কর না। নিত্যহরি বাঙ্গালী বলেই যে তোমার দয়া পেয়েছে এ কৈফিয়ৎ দিয়েও আর নিজেকে ঠকিও না।"

মৃদুভাষিণী অরুণার সহিত বাগ্‌যুদ্ধে বক্তৃতা-বাগীশ সুবিমলের সন্দেহ হইল যেন সে-ই পিছু হটিতেছে। চিৎকারে জিতিবার সম্ভাবনা আর নাই, যুক্তি দিয়া মান রক্ষা করিবার সময়ও চলিয়া গিয়াছে। সুবিমল কয়েক মুহূর্ত্ত গুম্ হইয়া থাকিয়া সুর নামাইয়া প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, আমার আপিসের বেয়ারা রাখা না রাখা সম্বন্ধে তোমার এত মাথা ব্যথা কেন বল তো? কী তুমি বলতে চাও? তোমার ইচ্ছে যে দীনবন্ধুকেই রাখি? তাকে যে নোটিস দিয়েছি, অবশ্য মুখের নোটিস, তা' ফিরিয়ে নিই, কেমন? এই তো তোমার ইচ্ছে?"

অরুণার মনে হইল এই পরম সুযোগ। সে তর্ক ভুলিয়া সাগ্রহে বলিল, "হ্যাঁ, সত্যিই তাই আমার ইচ্ছে। দেখ, লোকটা আমাকে বড্ড কাকুতি-মিনতি করে ধরেছে,—আহা গরীব লোক—"

সুবিমল কহিল, "হুঁ! আচ্ছা, তুমি তাকে বলতে পার—" বলিতে বলিতে সে জলের গ্লাস মুখে তুলিল। আশান্বিত হৃদয়ে অরুণা প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সুবিমল গ্লাস নামাইয়া অভ্যাসমত তাহার ভিতর হাত ডুবাইয়া ধীরে ধীরে বলিল, "তাকে বলতে পার যে বৃথা আশা করে লাভ নেই। সে আমি পারব না, এমন কি তুমি বল্লেও না। কিছু মনে কোরো না অরুণা, তোমার ইচ্ছে আমি রাখতে পারলুম না।"

স্বামীর নির্ম্মমতায় ও ভুল আশা করিবার লজ্জায় অরুণার মুখ কালো হইয়া গেল। এবং এত সহজে অরুণাকে পরাজিত করিয়া দশরথ-বিজয়ী পত্নী-প্রেমিক সুবিমল হৃষ্টচিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, "আর কিছু বলবার নেই বোধ হয় তোমার।"

অরুণা ধীরে ধীরে বলিল, "হ্যাঁ, একটা কথা বলবার ছিল। তা থাক।"

সুবিমল বাহির হইবার জন্য পা বাড়াইয়া ছিল। দরজার কাছে দাঁড়াইয়া পরম ঔদার্য্যের সহিত উৎসাহিত করিল, "বল। বল না?"

"অনেকদিন আগে পড়েছিলুম, কোন্ বইখানা তা' ভুলে গেছি, তোমার মনে থাকতেও পারে। পুরাকালে ইয়োরোপে কে একজন দিগ্বিজয়ী সম্রাট ছিলেন, তাঁর নামে সেক্সপিয়ার

একখানা নাটক লিখেছেন—সেই সম্রাট না কি গর্ব্ব করতেন তিনি কখনও খোসামোদের বশ হন না। তাঁর সম্বন্ধে সেক্সপিয়ার কী যেন বলেছেন আমার মনে নেই। তোমার কাছে সময়মত একবার শুনব সেই গল্পটা। আর ইংরিজিতে একটা প্রবাদ আছে **'Robbing Peter to pay Paul'**, এটার মানেটা যদি সময় পাও আমাকে একটু বুঝিয়ে দিও তো।"

জলদ-গম্ভীর স্বরে একটা 'আচ্ছা' বলিয়া সুবিমল বাহির হইয়া গেল।

ছয়

বৃদ্ধ প্রফুল্লবাবু বৃহৎ লেজার মিলাইয়া যখন উঠিলেন, তখন শনিবারের অফিসে বেলা অনেক হইয়াছে, তিনটা বাজিবার আর বেশী দেরী নাই। খাতাপত্র যথারীতি চাবি-বন্ধ করিয়া প্রফুল্লবাবু চাদর ও ছাতি লইয়া বড়বাবুর টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "রেখে দিন না মশাই, ক-টা বাজলো তা খেয়াল আছে। উঠুন উঠুন, শনিবারে এত বেলা পর্য্যন্ত কিসের এত কাজ?"

বড়বাবু বিরাট একটি ফাইলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বোধকরি ফাইলের অন্তর্গত বিষয়ে তন্ময় হইয়াছিল। প্রফুল্লবাবুর কথায় তাহার যেন ঘুম ভাঙ্গিল। বলিল, "হ্যাঁ, এই যে উঠি।" হাতের ফাইলটা দেখাইয়া বলিল, "এই এদের ব্যাপারটা বড্ড গোলমেলে হয়ে দাঁড়িয়েছে। কী যে করা যায়, তাই ভাবছি। সাহেব যাবার সময় বলে গেল ফাইলটা একবার ভালো করে পড়ে রাখতে।"

প্রফুল্লবাবু কহিলেন, "ও হবে হবে, সোমবারে যা-হয় করবেন'খন। কাদের ব্যাপার? সেই পিটার মার্কস-এর কন্‌ট্রাক্ট নিয়ে বুঝি?"

"না সেটা নয়। এটা সেই যে ইয়েদের,—ঐ যে কি বলে—ইয়ে—"

যে ফাইল লইয়া তাহার একাগ্র একঘণ্টা সময় অতিবাহিত হইয়া গেল, সুবিমল দেখিল, তাহার বিষয়বস্তু দূরের কথা, অপর পক্ষের নামটা পর্য্যন্ত তাহার মনে পড়িতেছে না।

তাহার মনে হইল প্রফুল্লবাবু সব ধরিয়া ফেলিয়াছেন। অফিসে বসিয়া, চোখের সামনে ফাইল ধরিয়া সে যে এতক্ষণ নিজের গৃহেই ঘুরিতেছিল, ইহা সে এতক্ষণ নিজে না জানিলেও বুড়া প্রফুল্লবাবুর কি আর বুঝিতে বাকী রহিল। অনাবশ্যক ও অর্থহীন কৈফিয়ৎ দিয়া সে বলিল, "মানে, বড্ড মাথাটা ধরেছে কি না।"

"মাথা ধরার আর অপরাধ কি বলুন? দশটায় এসে বসেছেন, আর এই তিনটে বাজল, সেই যে ঘাড় গুঁজে লেগেছেন,—দেখছি তো। নিন উঠুন, ফাইল বন্ধ করে মুখহাত ধুয়ে বেরিয়ে পড়ুন দিকি, বাইরের হাওয়ায় মাথাটা ছেড়ে যাবে। এত খাটলে বাঁচবেন কি করে?"

সুশীল সুবোধ বালকের মতো সুবিমল উঠিয়া হাতমুখ ধুইতে গেল। প্রফুল্লবাবুর কথা ঠেলা উচিত নয়।

প্রফুল্লবাবুর অপেক্ষা তাহার শুভাকাঙ্ক্ষী সংসারে আর কেহ আছেন বলিয়া তাহার মনে পড়িল না। আত্মীয় বল, বন্ধু বল, স্ত্রী বল, সকলেই কিছু না কিছু স্বার্থ মিশাইয়া তাহার সহিত স্নেহ-মমতার আদান-প্রদান করে। কিন্তু এই প্রফুল্লবাবু, শুধু আজ বলিয়া নহে, চিরকালই তাহাকে অকারণ ও আন্তরিক স্নেহ দিয়া আসিতেছেন। পৃথিবীতে এখনও প্রকৃত স্নেহ-ভালবাসার একান্ত অভাব হয় নাই এবং প্রফুল্লবাবুর ন্যায় স্বার্থহীন, অবিমিশ্র ভালো লোক এখনও অপ্রাপ্য নয়।

বাথরুম হইতে ফিরিয়া আসিয়া সুবিমল দেখিল, দীনবন্ধু তাহার টেবিল গুছাইয়া চাবি বন্ধ করিতেছে, সে কোট পরিয়া ছাতি হাতে লইতে দীনবন্ধু তাহার হাতে চাবির রিং দিয়া যুক্ত করে বড়বাবুকে ও একাউন্ট বাবুকে দণ্ডবৎ করিল।

দীনবন্ধুর ব্যবহারে এই কয়েকদিন একটা পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, তাহা যে সুবিমল লক্ষ্য করে নাই তাহা নয়। কিন্তু তাহার মুখের এ ভাব পূর্ব্বে চোখে পড়িয়াছে কি না মনে পড়ে না। আজ মনে হইল দীনবন্ধুর মুখখানা যেন বড় করুণ, বড় কাতর।

পথে আসিয়া সুবিমল হঠাৎ প্রশ্ন করিল, "প্রফুল্লবাবু, আপনি 'জুলিয়াস্ সিজার' পড়েছেন নিশ্চয়?"

প্রফুল্লবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "জুলিয়াস্ সিজার? তা, কি জানি, হয় তো পড়ে থাকব, বাল্যকালে ইস্কুলে-টিস্কুলে।"

"না না, ইস্কুলে পড়ার কথা নয়। সেক্সপিয়ারের 'জুলিয়াস্ সিজার' নাটকের কথা বলছি। কলেজে বোধহয় পড়ে থাকবেন।"

প্রফুল্লবাবু কুণ্ঠিত ও বিব্রত সুরে বলিলেন, "কলেজে পড়া? সেক্সপিয়ারের? তা—সে,—কি জানি,—তা কেন বলুন তো?"

অকস্মাৎ সুবিমলের খেয়াল হইল, প্রফুল্লবাবু হয় তো কলেজের পড়া নাও পড়িয়া থাকিতে পারেন। বৃদ্ধের হিসাব রক্ষার জ্ঞান সর্ব্ব-বিদিত, কিন্তু তাঁহার সাধারণ শিক্ষার পরিমাণ সম্বন্ধে কে-ই বা খবর রাখে। অপ্রস্তুত হইয়া সুবিমল বলিল, "না না, সে এমন কিছু নয়। এমনি একটা কথা মনে পড়ল। কোথায় যেন পড়েছিলুম, ঐ জুলিয়াস্ সিজার' নাটকেই বোধ হয়, সিজার খোসামোদকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন—"

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই প্রফুল্লবাবু মন্তব্য করিলেন, "ঠিক আপনার মতন। হাঃ হাঃ।"

এ মন্তব্যের উত্তর না দিয়া সুবিমল বলিতে লাগিল, "সিজারের বড় অহঙ্কার ছিল যে, খোসামোদে কেউ তাঁকে টলাতে পারে না। কিন্তু তাঁকেও খোসামোদ করবার মতো বুদ্ধিমান লোক ছিল। সে খোসামোদেরমন্ত্র ছিল 'সিজারকে খোসামোদে টলানো যায় না। এই কটি কথার মিষ্টত্বে 'জুলিয়াস্ সিজার' এতই টলতেন যে তাঁর সূক্ষ্ম বুদ্ধিতেও এই খোসামোদের সূক্ষ্ম রূপটি ধরা পড়ত না। 'Ceaser was best flattered—"

প্রফুল্লবাবুর একাগ্র লক্ষ্য ছিল পথের সুদূর প্রান্তে। তাঁহার গৃহমুখী যে ট্রাম, তাহারই প্রতীক্ষায় তিনি দূরে চাহিয়া 'হুঁ, হাঁ' দিয়া বুড়া বয়সে ঐতিহাসিক সাহিত্যের পাঠ লইতেছিলেন। এতক্ষণে তাঁহার ট্রাম আসিয়া পড়িল। তিনি ব্যস্ত ভাবে বলিলেন, "আচ্ছা, সুবিমল বাবু, সোমবারে বাকিটা শুনব'খন, ভারি চমৎকার গল্প, আচ্ছা চলি, নমস্কার।" বলিতে বলিতে ছাঁতাধারী হাত কপালের কাছে উঠাইয়া প্রফুল্লবাবু দ্রুতপদে ট্রামের দিকে আগাইয়া গেলেন। সুবিমল সিজারের গল্প থামাইয়া তাড়াতাড়ি তাহার পিছনে একটা প্রতিনমস্কার করিল।

সাত

একলা চলিতে চলিতে আবার প্রফুল্লবাবুর স্নেহের কথাই সুবিমলের মন জুড়িয়া রহিল এবং শোকসভায় মৃতব্যক্তির গুণরাশির মতো প্রফুল্লবাবুর সদ্‌গুণ অপরিমেয় হইয়া উঠিল।

কী সুজ্জন ও কী সহৃদয়! তাহাকে অতিশ্রমে ক্লান্ত বিবেচনা করিয়া প্রফুল্লবাবুর অনুযোগ তো লোকদেখানো ভদ্রতা নয়। তাহাতে যে অন্তরের উদ্বেগ ও স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়? আর সত্যই তো। মিথ্যা উদ্বেগের ভান করিবার তাঁহার প্রয়োজনই বা কী? বড়বাবু অপেক্ষা তাঁহার কার্য্যকাল এ অফিসে ঢের বেশী এবং বড়বাবুর অধীনও তিনি নহেন। তাঁহার বিভাগে তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা। অতএব বড়বাবুর খোসামোদ করিয়া বা মন রাখিয়া কথা কহিবার প্রফুল্লবাবুর কোন কারণ নাই, আবশ্যকও নাই। সে সকল করিবে ছোট কেরাণী ও দীনবন্ধুর দল।

দীনবন্ধুর মুখটা আজ অতি বিষণ্ণ দেখাইল বটে, তা' আজই যখন তাহার চাকরীর শেষ দিন, তখন মুখ বিষণ্ণ না হইয়া কি অট্টহাস্যময় হইবে? চাকরী তাহার শীঘ্রই জুটিয়া যাইবে। তবে ভাগ্য মন্দ হইলে জুটিতে দেরী হওয়াও বিচিত্র নয়। অন্ততঃ সম্প্রতি কিছুদিন দীনবন্ধুর চমৎকারা অন্নচিন্তার দুর্দ্দিন আসিল বটে। কিন্তু কী করা যাইবে। তাই বলিয়া ওরকম অতিভক্তি দিনের পর দিন সহ্য করা যায় না, যতই কেন দীনবন্ধু কাযের লোক হোক না।

অতিভক্তির রোগ নিত্যহরিটারও কিছু কম নয়। কম কেন বরং দীনবন্ধুর চেয়ে বেশীই হইবে। দীনবন্ধু অন্ততঃ বড়বাবুকে দেবতা বানাইবার দুশ্চেষ্টা কখনও করে নাই। আর ঐ নিত্যহরিটা তো একেবারে পাঁচমিনিটের মধ্যে অরুণাকে ও তাহাকে লক্ষ্মীনারায়ণের পদে বহাল করিয়া দিল। করিলেই কি সে মনে করিয়াছে তাহার কার্য্যসিদ্ধি হইবে। তাহা হইলে আর বেচারী দীনবন্ধুর চাকরী যাইবে কেন?

এই রকমের কথা কাল অরুণাও যেন বলিয়াছিল। সুবিমল স্মরণ করিতে চেষ্টা করিল অরুণা আর কি কি বলিয়াছিল। সকল কথা মনে নাই, তবে অরুণার শেষ উক্তি বা শ্লেষ উক্তি বলা যায়, একেবারেই বাজে। পিটারের পকেট মারিয়া পলকে দান করার কথা এখানে একেবারেই খাটে না। বাঙ্গালীকে চাকরী দিবার জন্যই কিছু উড়িয়াকে পদচ্যুত করা হইতেছে না। দীনবন্ধুর চাকরী আগে গিয়াছে তারপর নিত্যহরির কথা আসিতেছে। তবে যদি বল দীনবন্ধুর চাকরী এখনও যায় নাই, বড়বাবু একটু অনুগ্রহ করিলেই তাহা টিঁকিয়া যায়, সে কথা আলাদা। কিন্তু দীনবন্ধুরও—চুলায় যাউক দীনবন্ধু, আর চুলায় যাউক নিত্যহরি। ওরা দুইটাই সমান। ঐ বেটাদের জন্যই তো গৃহে শান্তি নাই। কাল হইতে অরুণার মুখের আলো নিবিয়া গিয়াছে।

এবং তাহার নিজের মুখেও যে একটা নামিয়াছে তাহা নিজের চোখে না পড়িলেও সুবিমলের বুঝিতে বাকী নাই। অবশ্য অরুণার মত বুদ্ধিমতী মেয়ে এত তুচ্ছ কারণে স্বামীর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া, অথচ তুমুল বাক্যালাপ করিয়া, নিজের রাগের বিজ্ঞাপন জাহির করে নাই। তাহা করিলে আর সাধারণ মেয়েদের সহিত তাহার প্রভেদ রহিল কোথায়। অরুণা সংসারের কাযও করিতেছে ঠিকমতো, সুবিমলের কাযের দিক হইতেও দৃষ্টি ফিরাইয়া লয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেই কি সব হইল? ইহা কি অরুণা বোঝে না যে, ভাত ডাল রান্নাই সংসার নহে, প্রয়োজনীয় কথা কহাই কথা কহা নয়? বোঝে সবই। বোঝে বলিয়াই ত' তাহার এই অত্যাচার। মনটি তাহার লোহার সিন্দুকে চাবি দিয়া রাখিয়াছে, কথাগুলা বাহির করিতেছে যেন বরফের বাক্স হইতে। সংসারের সকল আলোর সুইচ তাহার হাতে তাহা জানে বলিয়াই অরুণা আলো নিবাইয়া দিয়া তাহার উপর এই অত্যাচার করিতেছে। দীনবন্ধুর চাকরী থাকুক আর না থাকুক তাহাতে অরুণার কি যায় আসে? এই তুচ্ছ কারণে কাল সুবিমলকে চটাইয়া দিবার তাহার কি প্রয়োজন

ছিল? দীনবন্ধুকে যদি এবারটা মার্জ্জনাই করা যায় তাহা হইলেই কি অরুণা রাজা হইয়া যাইবে?

"বাবু গাড়ী লিবেন নাকি?"

পথের ধারে রিক্সা গাড়ীর আড্ডা। বোধ করি অন্যমনস্ক সুবিমল ইহাদের কাহারও দিকে দুই এক মুহূর্ত্ত চাহিয়া ছিল। আশান্বিত রিক্সাওয়ালা উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিয়া বলিল, "বাবু গাড়ী নিবেন নাকি?"

অন্যমনস্ক সুবিমলের উত্তর না পাইয়া আরও দুই তিনজন রিক্সাওয়ালা ডাকিল, "আইয়ে না বাবু, আইয়ে।" "কাঁহা যানে হোগা চলিয়ে।"

"গাড়ী নেহি মাংতা" বলিয়া সুবিমল অগ্রসর হইল। দুই চারি-পা আসিয়া তাহার হঠাৎ নিজেকে অতিশয় ক্লান্ত বোধ হইল। মনে হইল পথ চলিবার উপযুক্ত বল আর তাহার নাই। ফিরিয়া আসিয়া হাতের কাছে যে রিক্সাটা পাইল, তাহাতে চড়িয়া বসিয়া চলিতে হুকুম দিল।

যোয়ান রিক্সাওয়ালা ভালো ভাড়া আদায় করিবার লোভে ছুটিয়া চলিল। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে গৃহ নিকটবর্ত্তী হইতেছে এতক্ষণে সুবিমলের খেয়াল হইল কি ভুল সে করিয়াছে। মিথ্যা পয়সা খরচ করিয়া গাড়ী নিয়া শীঘ্র শীঘ্র বাড়ী ফিরিয়া লাভ কি? শনিবারের দীর্ঘ অপরাহ্ন কাটিবে কি করিয়া? অফিসের কাপড় চোপড় বদলাইতে, হাত মুখ ধুইতে ও জলযোগ সারিতে খুব বেশী সময় লাগে ত আধঘণ্টা। তাহার পর মুখ বুজিয়া নিঃসঙ্গ ঈজিচেয়ারের কণ্টক শয্যায় পড়িয়া সিগারেট টানিতে এমন কি ভাল লাগিবে যাহার আকর্ষণে সে রিক্সা চড়িয়া বসিল!

আবার বরাতক্রমে রিক্সাটাও জুটিয়াছে এমন বেয়াড়া, যে স্বভাবসিদ্ধ আসল গতি ভুলিয়া যেন রেসের বাজি মারিতে ছুটিয়াছে! ছুটিয়াছে তো ছুটিয়াছেই তাহার আর কমিবার লক্ষণ ত নাই-ই, বরং হতভাগা রিক্সাওয়ালাটার গতি যেন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

অনেক দুর হইতে সুবিমলের বাড়ী দেখা যায়। দুর হইতে সেই দিক চাহিয়া ঘরের ভিতরে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের অন্ধকার স্মরণ করিয়া সুবিমলের মুখের মেঘ আরও ঘণীভূত হইল।

শয়নগৃহের জানালা এবং দুরের বড় রাস্তা, এই দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান অনেকখানি থাকিলেও বাধা কিছু ছিল না। অতিপরিচিত ও অতিপ্রিয় ব্যক্তির অবয়বের আভাসই চিনিবার পক্ষে যথেষ্ট। জানালা দিয়া দুরে বাহিরে চাহিয়া অরুণা চমকিয়া উঠিল। আপিস হইতে বাড়ী আসিতে রিক্সা চড়িবার প্রয়োজন হইল কেন? থার্ম্মোমিটার তো কাল দুপুর হইতেই চড়িয়া আছে। কিন্তু সে তো মনের জ্বরের নোটিস। এখন কি আবার শরীরও অসুস্থ হইল? উদ্বিগ্ন অরুণার তখনই মনে পড়িল সকালে সুবিমল নামমাত্র আহার করিয়াছে, যেমন ভাত বাড়িয়া দিয়াছিল তেমনই পড়িয়াছিল। অরুণা দেখিয়াও দেখে নাই, অল্প আহারের জন্য অনুযোগ বা বেশী আহারের জন্য অনুরোধ কোনটাই করে নাই। কিন্তু এই কম খাওয়ার যে এ অর্থও হইতে পারে তাহা তাহার একবারও মনে হয় নাই। এখন স্মরণ হইল বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছে যখন ভাতে রুচি থাকে না তখন বুঝিতে হইবে দেহের অসুস্থতা আসন্ন। আজ আপিসে না যাইতে দিলেই হইত। শঙ্কিতা অরুণা রিক্সার দিকে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু রিক্সাওয়ালাটা কি হতভাগা গো। তাহার যেন ইচ্ছা নয় সামনের দিকে অগ্রসর হয়। দুর হইতে দেখিলেও লোকটাকে তো যোয়ান বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু পা দুইটা উহার অত দুর্ব্বল কেন? রিক্সা টানিতে আসিয়াছে আর ছুটিতে জানে না? নীচে আসিয়া উঠানের ধারে রকে বসিয়া স্বামীর প্রতীক্ষা করিতে অরুণা মন্দগতি রিক্সাওয়ালার কথা চিন্তা করিতে লাগিল।

মজুরী ষোল আনা লইবে কিন্তু কাজের বেলা আট আনা ফাঁকি মিশাইয়া সারিবে, এই দুর্ম্মতির জন্যই তো আজকাল মানুষের দুঃখকষ্ট এত বাড়িয়া উঠিয়াছে।

স্বামীজী কত বড় কথাই বলিয়া গিয়াছেন—"চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কাজই সম্পন্ন হয় না।" শুধু মহৎ কাজ কেন চালাকি দ্বারা কোন্ কাজই বা সুসম্পন্ন হয়? ঐ নিত্যহরি লোকটা কাল কি ভক্তি, কি কার্য্যতৎপরতা ও কি ভালমানুষির অভিনয়ই করিয়া গেল। কী তাহার বাক্‌পটুতা, অথচ আশ্চর্য্য এই যে, অতখানি বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞানের অধিকারী হইয়াও সুবিমলের চোখে এই লোকটার চালাকি ধরা পড়িল না? হয় তো এই নিত্যহরিই দীনবন্ধুর পদে নিযুক্ত হইবে।

হয় আর কি করা যাইবে? দীনবন্ধুর অদৃষ্ট। নিত্যহরিরও অদৃষ্ট। নিত্যহরির অদৃষ্টে যাহা লাভ করিবার আছে তাহা সে লাভ করিবেই। আর দীনবন্ধুর অদৃষ্টে যে ক্ষতি লেখা আছে তাহাও রোধ করা কাহারও সাধ্য নয়। তবে অরুণা আর কি করিবে? সামান্য দীনবন্ধু যে তাহার জ্ঞাতিও নয়, জ্ঞাতিও নয়, তাহারই জন্য সে স্বামীর সঙ্গে কলহ পর্য্যন্ত করিয়াছে। আবার কি করিতে পারে সে? এখন দীনবন্ধুর অদৃষ্ট!

বেচারা দীনবন্ধু কাল সন্ধ্যায় হাসিমুখে আসিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে বিদায় লইয়াছে। কিন্তু অরুণার সংসারে এই যে মনান্তর ও অশান্তি সুরু হইয়াছে ইহা কি দীনবন্ধুর

বিদায়ের সঙ্গেই বিদায় লইবে ? নাঃ, সে আশা একেবারেই দুরাশা। দীনবন্ধুর পর নিত্যহরি। নিত্যহরিকে চিনিতে বাকী নাই। আজ সুবিমল যে কেন নিত্যহরিকে চিনিতে পারিতেছে না তাহা আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু চিনিতে তাহার দেরী হইবে না। তখন ?

তখন এই নিত্যহরি আসিয়া অরুণার হাতে তাহার মামলা তুলিয়া দিবে। যেমনই হোক, নিত্যহরিও দরিদ্র, সংসারী লোক। মামলায় হারিয়া সে যখন প্রস্থান করিবে তখন তাহারও চক্ষু একদফা বর্ষাইবে এবং অরুণার চক্ষুও শুষ্ক থাকিবে না। তারপর একজন আসিবে এবং অচিরে সহৃদয় বড়বাবুর ন্যায়নিষ্ঠার আক্রমণে প্রাণভয়ে, অক্ষম তাহারই নিকট আসিবে বরাভয় মাগিয়া এবং ফিরিয়া যাইবে সজল-চোখে। এ কী অশান্তির শিকল তৈয়ারী হইতে চলিল, এ শিকলে অরুণার সংসারতরণীর স-ছন্দ গতি যে রোধ হইয়া যায়। এ কী বিড়ম্বনা! নিত্য স্বামীর সঙ্গে কলহ, নিত্য গৃহের আকাশে মেঘের সঞ্চার। অথচ সবই পরের জন্য কী দরকার তাহার তুচ্ছ বেয়ারার জন্য এত বিড়ম্বনা ভোগ করিবার ? ভবিষ্যতের কল্পিত মেঘ এখনই অরুণার মনে ও মুখে ঘনাইয়া আসিল।

আট

কিন্তু সুবিমলের ভাগ্য ভাল। কলহান্তরিতা পত্নীর একান্ত নিকটে থাকিয়া স্বেচ্ছাকৃত বিরহ ভোগ করার দুঃখ বড় দুঃখ। সেই দুঃখ হইতে তাহার ভাগ্য তাহাকে রক্ষা করিল।

যে দুঃসময়ে অভিমানভরে প্রিয়া শুধু গৃহিণীপণার গণ্ডীতে নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়া সচিব ও সখির পদে ইস্তফা দেয়, স্থূল শুষ্ক প্রয়োজনীয় কথা শেষ করিয়া অবান্তর প্রসঙ্গহীন গুঞ্জনের রস পরিবেশন করিবার জন্য আর অপেক্ষা করে না, মুখর চোখ দুইটীকে মূক করিয়া এবং চপল ঠোঁটের প্রান্ত দৃঢ়সম্বদ্ধ রাখিয়া মিশরের মমির মতো মুখ করিতে চেষ্টা পান, সেই দুর্দ্দিনের দীর্ঘ অপরাহ্ণ ও সন্ধ্যা গৃহকোণে একাকী কাটাইবার যে ভয় সে করিতেছিল তাহা মিথ্যা হইল।

রিক্সা ভাড়া দিয়া বাড়ীতে ঢুকিবার মুখেই তাহার সেই বন্ধুটির সঙ্গে দেখা, যাহার মেয়ের বিবাহ আসন্ন। কাল রবিবার বিবাহ, আর আজ পাত্রের পিতা এক নূতন দাবী তুলিয়া গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। বন্ধু আর তাহাকে বিশ্রামের অবসর দিলেন না। বৈঠকখানায় বসিয়া নূতন সমস্যার কাহিনী শুনাইয়া তিনি সুবিমলকে টানিয়া লইয়া চলিলেন পাত্রপক্ষের সহিত রফা করিবার চেষ্টায়।

বাড়ীতে ফিরিতে যথেষ্ট রাত্রি হইল। কঠিন আরাধনায় পাত্রের পিতার দংশন হইতে বন্ধুকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া সুবিমলকে বন্ধুপত্নীর আতিথেয়তার অত্যাচার সহ্য করিতে হইল। অরুণা স্বামীর খাবার লইয়া দুশ্চিন্তায় কাতর হইয়া নীচে অপেক্ষা করিতেছিল।

"কিছু খেতে পারব না, গোকুলকে বল একটা সোডা যদি পায় ত নিয়ে আসুক।" বলিয়া সুবিমল যখন উপরে চলিয়া গেল, তখন স্বামীর অসুস্থতার সম্বন্ধে অরুণার আর সন্দেহ রহিল না। সুবিমলের ইচ্ছা ছিল পাত্রের পিতার নির্লজ্জ লোভের কথা লইয়া কিছু আলাপ করে। কিন্তু উদ্বিগ্ন অরুণার মলিন মুখের দিকে চাহিয়া সে ধারণা করিল অভিমানের মেঘ এখনও কাটে নাই। অতএব দাম্পত্য আলাপ করিবার তাহার ভরসা হইল না। কাপড়চোপড় ছাড়িয়া সোডা পান করিয়া সে শয্যা আশ্রয় করিল।

কিন্তু ঘুম আসিল না। মাথার ভিতর ঘুরিতে লাগিল কন্যাদায়গ্রস্ত বাঙ্গালীজীবনের সমস্যা। অপরিমিত অর্থ লোভকে যে-ব্যক্তি ন্যায়সঙ্গত দাবী বলিয়া চীৎকার করিল, ভিক্ষা ও দস্যুতা করিতে যাহার কুণ্ঠাও নাই, গ্লানিও নাই, সে-ব্যক্তির লজ্জা হইল না, আর লজ্জা হইল তাহারই, যে সেই অন্যায় দাবী সর্ব্বস্ব দিয়াও মিটাইতে পারিতেছে না! কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, এইসব রক্তপায়ী জীবের সকাশেই কাতর মিনতি ও করজোড় প্রার্থনা করিতে হয় রক্তশোষণে সামান্যমাত্র অব্যাহতি পাইবার জন্য, এবং যদিই বা কোনও অবিবেকী তাহার দংশন সামান্য মাত্রও শিথিল করে, তবে ঘৃণা লজ্জা ত্যাগ করিয়া তাহারই উদারতার জয়গান করিতে হয় তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া!

মনে পড়িল, বরের বাপের লিপ্সা মিটাইতে না পারায় বন্ধুর কী সকুণ্ঠ মিনতি। মেয়ের বাপ হইতে পারিয়াছে অথচ প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে নাই, এই অপরাধের লজ্জায় বন্ধু মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারেন নাই। কী আশ্চর্য্য!

মনে পড়িল ভাবী বৈবাহিকের গৃহ হইতে বাহির হইয়া বন্ধু একই নিঃশ্বাসে বৈবাহিককে গালি দিতে দিতে সুবিমলের কত প্রশংসাই করিলেন। "ভাই, তুমি না এলে কী হ'ত বল দিকি! আজ রাত পোয়ালে কাল বিয়ে, আর এখন এই কাণ্ড। কিন্তু তুমি ছাড়া আর কেউ ও-শালা বুড়ো শকুনিকে টলাতে পারতো না, এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি। তুমিই যা উপকার করলে ভাই।"

মনে মনে জানিত বন্ধুর উপকার সে সত্যই করিয়াছে এবং যে-টুকু কাজ তাহার দ্বারা হইয়াছে তাহা বন্ধুবরের দ্বারা হইত না। কিন্তু সে বিনয় ও ভদ্রতার খাতিরে বলিয়াছিল, "না না, আমি আর কী এমন করেছি। ও আমি না এলেও তুমি ঠিক manage করে নিতে পারতে।"

কৃতজ্ঞ বন্ধু চক্ষুবিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "আমি ? ওরে বাপ্ রে, আমার চৌদ্দপুরুষের সাধ্যি ছিল ঐ বদ্‌মাস বুড়োকে কথার প্যাঁচে ঐ রকম কোণঠাসা করতে ? তোমার যুক্তিতর্ক, বাপ্ স্ ! কিন্তু দুঃখু এই যে ওর আদ্দেকের ওপর মাঠে মারা গেছে, বুড়োর হেঁড়েমাথায় ও-সব ঢোকে নি, এ আমি বাজি রাখতে পারি। ওর মাথায় ঢুকেছে কোনগুলো জানো ? সেই যখন তর্কের মাঝে মাঝে একটু ঢিলে দিচ্ছিলে, বলছিলে, "দেখুন, আপনারা প্রাচীনলোক, সমাজের স্তম্ভস্বরূপ। আপনারা যদি পথ না দেখাবেন তো লোকে শিখবে কি করে ?" তখন বুড়োর মুখে এক ঝলক হাসি খেলে গেল, দেখেছিলে ? তারপর তুমি যখন বল্লে, "বড় গাছেইতো ঝড় লাগে, আপনি বিষয়ী লোক, এত পরিশ্রম ক'রে এই বিষয় সম্পদ করেছেন, টাকা রোজগারের কষ্ট আপনারই তো বোঝবার কথা, মিত্তিরমশাই।" তখন তো বুড়ো বেশ নেবে এসেছে। দেখ ভাই, এইসব পাপিষ্ঠদের মনে ভগবান ঐটুকু দুর্ব্বলতা দিয়েছেন তাই রক্ষে। নিজের সুখ্যাতি নিজের কাণে শুনলে যত বড় বুদ্ধিমানই হোক্ মন নরম হতেই হবে। আর, কার্য্যোদ্ধারের জন্যে একটু আধটু মিষ্টিকথার অবতারণা করতেই হয়, কি বল ?"

বন্ধু মনের আনন্দে সারাটা পথ অনর্গল বকিয়া চলিয়াছিল এবং সুবিমল 'হুঁ' 'হাঁ' দিয়া শুধু শুনিয়া গিয়াছিল। এখন নির্জ্জনরাত্রির নিঃসঙ্গ অন্ধকারে সেই সকল কথার রোমন্থন করিতে করিতে তাহাদের মধ্যাকার আসল অর্থটি হঠাৎ প্রকাশ পাইল। চড়াৎ করিয়া সুবিমলের মাথা গরম হইয়া গেল। যতই সে ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার ধারণা দৃঢ়তর হইল যে, সে স্বার্থের জন্য,—বন্ধুর স্বার্থ এ-ক্ষেত্রে তাহার নিজেরই স্বার্থ,—এমন একজনের প্রশংসা করিয়াছে, যাহার সহিত কথা কহিতেও তাহার মন বিরূপ হইতেছিল। যাহার অসঙ্কোচ নীচতার পরিচয় পাইয়া নিরুপায় ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া যাইতেছিল, তাহারই মন ভিজাইবার অভিপ্রায়ে তাহাকে মহৎ বলিয়া বিশেষিত করিবার অপেক্ষা হীন তোষামোদ আর কী হইতে পারে ? এই আত্মগ্লানি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সে নিজেকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, তাহার উদ্দেশ্য অত হীন ছিল না, সে শুধু চাহিয়াছিল লোকটার হৃদয়ের কোমল ও উদার বৃত্তিগুলিকে উদ্বুদ্ধ করিতে। ইংরাজী করিয়া স্বগত তর্ক করিল—He was just appealing to the man's nobler instincts ; কিন্তু কোন যুক্তিই নিজের বিচারে টিঁকিল না। তোষামোদ করিবার গ্লানি ও স্বার্থসিদ্ধি প্রয়াসের লজ্জা সুবিমলের মাথায় বিছার মত কামড়াইতে লাগিল। ইচ্ছা হইল এই রাত্রেই ছুটিয়া গিয়া বন্ধুকন্যার বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিয়া নীচাশয় বৃদ্ধকে শুনাইয়া আসে তাহার সম্বন্ধে সুবিমলের প্রকৃত মনোভাব কী। যতটুকু চাটুবাক্য সারা সন্ধ্যা ধরিয়া দুই বন্ধুতে শুনাইয়া আসিয়াছে, তাহার দশগুণ গালি দিয়া আসিতে পারিলে হৃদয়ের জ্বালায় বুঝি কিঞ্চিৎ শান্তি আসে। কিন্তু তাহা হইবার নয়, তাহা হইবার নয়। আর কয়েক ঘণ্টা পরেই বন্ধুর গৃহে শানাই বাজিয়া উঠিবে। সর্ব্বস্বমূল্যে, তাহার উপর মানমর্য্যাদা ফাউ দিয়া, কন্যাপক্ষ যে আনন্দ কিনিয়াছেন, সেই মহার্ঘ আনন্দেই তাঁহারা এখন খুশী। তাঁহাদের জন্য তোষামোদ করিবার শাস্তি, নিদ্রাহীন সুবিমলকেই এখন ভোগ করিতে হইবে।

ঘণ্টা খানেক পরে গৃহস্থালীর পাট চুকাইয়া অরুণা যখন ঘরে আসিল, তখনও সুবিমল চক্ষু বুঁজিয়া গভীর অনুশোচনায় নিমজ্জিত। অরুণার পদশব্দ তাহার কাণে ঢুকিল না। অসুস্থ স্বামীকে নিদ্রিত মনে করিয়া অরুণা নিঃশব্দপদে তাহার মাথার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরে অতিস্তিমিত নীল আলো জ্বলিতেছিল। অরুণার একান্ত ও অভ্রান্ত দৃষ্টির পক্ষে সেই আলোই যথেষ্ট। সে দেখিল স্বামীর মুখে প্রচ্ছন্ন বেদনার চিহ্ন সুস্পষ্ট। বুঝিল, রোগের যাতনা সুপ্তের মাঝেও কাজ করিতেছে। জ্বর যে হইয়াছে তাহাতে তো সন্দেহ নাই, কিন্তু কতটা হইয়াছে তাহাই দেখিবার জন্য অরুণা অতি সন্তর্পণে সুবিমলের ললাটে হাত রাখিল। চমকিয়া উঠিয়া সুবিমল একবার চোখ খুলিয়াই চোখ বুঁজিল।

তারপর অরুণার হাতখানির উপর হাত রাখিয়া চাপিয়া ধরিল। সেই শীতল, কোমল স্পর্শে শুধু যে তাহার শ্রান্ত তাপিত মস্তিষ্কে আরাম বোধ হইল তাহা নয়, তাহার জ্বালা যেন অর্দ্ধেক জুড়াইয়া গেল। পরম তৃপ্তিতে সে বলিল, "আ-াঃ"।

মনে শঙ্কা ছিল বলিয়া অরুণার হাতে সুবিমলের ললাট উত্তপ্তই ঠেকিল। সে উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলিল, "বড্ড কষ্ট হচ্ছে ? মাথাটা টিপে দেব ?"

সুবিমল কহিল, "না, টিপে দিতে হবে না, তুমি শুয়ে পড় অরুণা, অনেক রাত হয়েছে।" বলিয়া সে পত্নীর হাতখানি আরও নিবিড় করিয়া নিজের ললাটে চাপিয়া ধরিল।

নয়

পরদিন রবিবারে অতি প্রত্যূষেই বিবাহবাটী হইতে গাড়ী আসিল অরুণাদের লইয়া যাইতে। সুবিধা থাকিলে পতির পদাঙ্কানুসরণ করিয়া পত্নীদিগের মধ্যেও বন্ধুত্ব অতি প্রগাঢ় হইয়া থাকে। সুতরাং অরুণার নিমন্ত্রণ মাত্র ভোজের নিমন্ত্রণই নহে, তাহা সারাদিনের আনন্দ কোলাহল ও কর্ম্মভোগেরও বটে। বিবাহ সম্বন্ধের সূচনা হইতেই সুবিমলের উপরই সকল ভার দিয়া বন্ধুবর নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টায় আছেন। বার বার

বলিয়াছেন কন্তাকর্ত্তা তিনি নন, সুবিমল; এবং শুধু বিবাহ সমাধা নয় ফুলশয্যার তত্ব পাঠাইয়া দিয়া তবেই সুবিমলের নিষ্কৃতি। সুতরাং তাহারও ঐ গাড়ীতে সকালেই যাইবার কথা।

কিন্তু অরুণা সব ব্যবস্থা উল্টাইয়া দিল। অত সকালে সুবিমলকে বিবাহ বাড়ী যাওয়া তো দূরের কথা, বিছানা হইতে নামিতেই দিল না। রাত্রিতে ভাল ঘুম হয় নাই, সারা রাত্রি জ্বর ভোগ হইয়াছে, অথচ সেখানে পৌছিবামাত্র সকল কাজের ভার নিজের মাথায় তুলিয়া লইয়া সুবিমল যে একটী মুহূর্ত্ত বিশ্রাম লইবে না এবং অসুস্থ শরীরে যে একটা কাণ্ড বাধাইয়া তুলিবে, তাহাতে অরুণার লেশমাত্র সন্দেহ নাই।

রোগের অস্তিত্ব সুবিমল পুনঃপুন, অস্বীকার করিল। কিন্তু অরুণার ধারণাও যেমন অচল, সঙ্কল্পও তেমনি অটল রহিল। অবশেষে সুবিমল থার্ম্মোমিটার দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখাইল তাহার দেহের তাপ সম্পূর্ণরূপে জ্বরের সীমানার বাহিরে। অরুণা বলিল—"তাই হোক বাপু, জ্বরটা না হয় ছেড়েইছে, তা' বলে এত ভোরে তোমাকে আমি উঠতেই দোব না, তা' বিয়ে বাড়ী যাওয়া তো দূরের কথা।"

সুবিমল হাসিয়া বলিল, "জ্বরটা ছেড়েছে কি গো? জ্বর এলো কখন যে ছাড়বে?"

"এসেছিল কি না এসেছিল, সে কি তুমি বলে দেবে তবে আমি জানব? নিজের গা গরম কি নিজে টের পাওয়া যায়? আমি দেখেছি তাই বলছি। মিছে তক্ক করে আর জ্বর টেনে এনো না তুমি, দোহাই তোমার।"

"কী আশ্চর্য্যি! রাত্তিরে আমার জ্বর এসেছিল, তুমি নিজে দেখেছ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তখন?" সুবিমল হাসিতে লাগিল।

অরুণা রাগ করিয়া বলিল, "তোমার সঙ্গে বকতে পারি না আমি। হাঁ, আমার মাথা খারাপই হয়েছিল। বেশ, তুমি যেতে চাও তো যাও। কিন্তু তা' হলে আমি আর যাব না, এই বলে রাখলুম। আর আমাকে যদি যেতে হয় তবে তোমায় এখন থেকে গিয়ে ওদের ঐ ঝঞ্ঝাটে মাতা চলবে না। এই আমার শেষ কথা।"

বিব্রত ও নিরুপায় সুবিমল বালিশটা টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল। অরুণা তাহার বুক অবধি চাদর ঢাকা দিয়া পাখাটা মৃদুগতিতে ঘুরাইয়া দিয়া গেল।

যাত্রা করিবার আগে আর একবার অরুণা স্মরণ করাইয়া দিল, আরও অন্ততঃ এক ঘণ্টা পরে গোকুল আদা সহযোগে চা ও টোষ্ট করিয়া আনিলে সুবিমল প্রাতঃরাশ করিবে। তারপর যথেষ্ট রৌদ্র উঠিলে গোকুল প্রদত্ত গরম জলে উপরের বাথরুমে গা মুছিবে,—নীচে কলতলায় নামা ও স্নান, দুই-ই নিষিদ্ধ, এবং বেলা দশটার পর গোকুল আনীত গাড়ী করিয়া সুবিমল বিবাহ-বাটীতে যাইবে ও সেখানে পৌছিয়াই অরুণার সঙ্গে দেখা করিয়া তবে তাহার অন্ত কাজ। এই কার্য্যক্রমের একচুল এদিক ওদিক হইলে তখনই অরুণা ছেলেদের লইয়া চলিয়া আসিবে তাহাও পরিশেষে জানাইয়া দিল। প্রতিবাদ করা বৃথা এবং প্রতিরোধ করা অসম্ভব বুঝিয়া অগত্যা সুবিমল স্বীকার করিল আজকের মতো সে গোকুলকেই তাহার অভিভাবক বলিয়া মানিয়া লইবে ও স্ত্রীর নির্দ্দেশও মানিয়া লইবে। মিথ্যাবাদিতার অপরাধ এড়াইতে মনে মনে বলিল, 'অবশ্য অবস্থা হিসাবে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন সহ।'

দশ

সোমবার সুবিমল অফিস হইতে সকাল সকাল ছুটি লইয়া আসিল। আগের দিন বিবাহ বাটীতে পরিশ্রম যথেষ্টই হইয়াছিল তবে সুখের কথা এই যে বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বরের বাপের সম্বন্ধেই কিছু ভয় ছিল, তাঁহার উর্ব্বর মস্তিষ্কে আবার শেষ মুহূর্ত্তে লভ্যাংশ বাড়াইবার নূতন কোনও ব্যবসায়বুদ্ধি না গজাইয়া উঠে। কিন্তু আশাতীত সৌভাগ্যের বিষয় যে, তিনি ভদ্রলোকের মতোই ব্যবহার করিয়াছেন। এই অনুগ্রহে কন্তাপক্ষ নিরতিশয় বাধিত হইয়া গেছেন। উভয়পক্ষে যথারীতি আপ্যায়নের আদান প্রদান হইয়াছে। কন্তাকর্ত্তার বিকল্প হিসাবে ও কয়দিনের পরিচয়ের দরুণ সুবিমলেরই সঙ্গে নূতন বৈবাহিকের বেশী আলাপ চলিয়াছিল। কুটুম্ব নূতন, অর্থ ও মর্য্যাদা দুয়েরই অভাব নাই, তাহার উপর বৈবাহিকমহাশয় বয়সেও প্রায় প্রাচীন। অতএব গালি দেওয়া দূরের কথা, অবস্থা ও কাল উপযোগী আলাপ করিতে সুবিমলকে অনেক মিষ্ট কথাই ব্যবহার করিতে হইয়াছে এবং সে সকল কথার অধিকাংশই তাহার হৃদয় হইতে আসে নাই। কিন্তু কী করা যায়। আপ্যায়ণ ও আন্তরিকতা এক পথে কদাচিৎ চলে এবং সৌজন্য প্রকাশে সত্য কথার স্থান খুব বেশী নাই।

আজ অফিসে বসিয়া সুবিমল প্রচলিত সভ্যতার কুরীতি চিন্তা করিয়া ও নিজের মিথ্যাচরণ স্মরণ করিয়া অস্বস্তি বোধ করিয়াছে। কিন্তু এই সঙ্গে অরুণা ও তাহার মধ্যের গুমোট ভাবটা যে অনেকখানি হালকা হইয়া গিয়াছে তাহা অনুভব করিয়া তাহার অস্বস্তি তাহাকে বিশেষ পীড়া দিতে পারে নাই।

অফিসে আসিয়া অফিসের কাজ আজ বেশী করা হয় নাই বটে কিন্তু আর একটা অপ্রিয় কর্ত্তব্য শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। তাহা দীনবন্ধু বিদায়ের সমাধান

অতি সকালেই পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিয়া নিতাহরি আসিয়া অফিসের বারান্দায় বসিয়াছিল। এবং মলিন মুখে দীনবন্ধু তাহার অভ্যস্ত টুলটি অধিকার করিয়া বিদায় অপেক্ষা করিতে

ছিল। দীনবন্ধুর মুখের হতাশার ম্লানিমা ও নিত্যহরির মুখ-ভরা আশার ঔজ্জ্বল্য দুই-ই বড়বাবুর চোখে পড়িয়াছে। নিত্যহরির কেশের তৈল চিক্কণ পারিপাট্য ও দীনবন্ধুর রুক্ষ কেশ, ইহাও তাহার চোখ এড়ায় নাই। কিন্তু সঙ্কল্প স্থির করিতে তাঁহার দেরী হয় নাই। কর্ত্তব্য অপ্রিয়, দরিদ্রের দীর্ঘশ্বাস পড়িবেই। তবু আজই ইহার নিষ্পত্তি না করিলে তাহার মনের অস্বস্তিরও নিবৃত্তি নাই। তুচ্ছ দীনবন্ধুর জন্য স্বামী-স্ত্রীতে কলহ চলিবে, ইহার চেয়ে হাস্যকর নির্ব্বুদ্ধিতা আর কিছু হইতে পারে না। কাল অরুণার ব্যবহারে মনে হয় সেও ইহা বুঝিয়াছে। দীনবন্ধু প্রসঙ্গ লইয়া সে আর বাক্যব্যয় করিবে না বোধ হয়।

অফিসে এই সকল চিন্তাই সুবিমল ভাবিয়াছে। আর বার বার তাহার মানস-চোখে ভাসিয়াছে সুসজ্জিতা অরুণার সুমোহন মুখখানি। বিবাহবাড়ীতে সুন্দরী-সমাবেশ কম হয় নাই। অলঙ্কার, বস্ত্র, আভরণে চোখ-ঝলসানো সৌন্দর্য্যের হাট বসিয়াছিল। কন্যার মাতৃস্থানীয়া হইয়া অরুণা রঙ্গীন কাপড় ও বিবিধ গহনা পরিয়া নিজের গৃহিণীপনার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করে নাই। কিন্তু সেই সৌন্দর্য্যের হাটে স্বল্প-ভূষিতা অরুণার মতো এমন নয়নানন্দ রূপ তো তাহার চোখে পড়িল না, এমন মধুর সুষমা তো আর কোনও মুখশ্রীতে লক্ষ্য হয় নাই। আরও মনে পড়িল, শত কাজের ব্যস্ততার মাঝেও বার বার অরুণার স্বামীর তত্ত্ব লওয়া ঠিক আছে। রাত বেশী হইয়াছে বলিয়া সুবিমলকে অসুস্থ জ্ঞানে পেট ভরিয়া খাইতে পর্য্যন্ত দিল না এবং ঐ কল্পিত অসুখের জন্যই শত অনুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্য করিয়া অরুণা রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

তোসামোদ রূপ পাপের স্মৃতি মধ্যে মধ্যে মনে উদয় হইতেছিল কিন্তু তাহাকে সুবিমল আমল দেয় নাই। সে অরুণার অনবদ্য মুখখানি ও তাহার অপরিমেয় ভালবাসার চিন্তা করিয়াই সময় কাটাইয়াছে। দেহের ক্লান্তি সত্ত্বেও মনের শান্তি বারো আনা রকম ফিরিয়া আসিয়াছে। বেয়ারা সমস্যার মীমাংসা করিয়া বাকি চার আনাও উদ্ধার করিবে, ইহা সুবিমল স্থির করিয়াছিল। এবং তাহাই করিয়া সে সকাল সকাল অফিস হইতে চলিয়া আসিল।

বাড়ী ফিরিয়া দেখিল অরুণা তখনও ফিরে নাই। সকালে সুবিমল বাহির হইবার পরই সে ছেলেদের লইয়া ও বাড়ীতে গিয়াছে বরকন্যাকে বিদায় দিতে। এই ব্যবস্থাই ছিল। এত শীঘ্র সে ফিরিবে এ আশা সুবিমল করে নাই।

অল্প-বিত্ত গৃহস্থ বাড়ীর উৎসব। অত্যন্ত চড়া দরে ইহা কিনিতে হইয়াছে, অচিরকালে ইহার পুনরাবৃত্তি হইবে এ আশাও নাই। তাই গরীব পেটুক বালকের সন্দেশ খাওয়ার মতো ইহা শেষ করিতে ইচ্ছা হয় না। সন্দেশ ফুরাইয়া গেলেও হাত চাটা ফুরায় না। বরকন্যাকে বিদায় দিতেই হইবে নির্দ্দিষ্ট শুভক্ষণের মধ্যে; কিন্তু আনন্দের অবসর যাহাদের অপর্য্যাপ্ত নহে, সুযোগ তাহাদের ঘন ঘন আসে না, তাহাদের মেলা ভাঙিবার সময় পাঁজিতে নির্দ্দেশ করিয়া দেয় নাই। অতএব সন্ধ্যার এ দিকে অরুণার ফিরিবার আশা করা দুরাশা। কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া সিগারেটের কৌটাটি লইয়া সুবিমল জানালার ধারে ঈজি চেয়ার টানিয়া তাহার কোলে রাত্রি জাগরণক্লান্ত শরীর সমর্পণ করিল।

কিসের শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। চোখ খুলিয়া সুবিমল দেখিল বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। শব্দ আসিতেছিল তাহার পিছনে বারান্দা হইতে। শুনিল হঠাৎ চাপা গলায় অরুণা বলিতেছে, "আচ্ছা, তুমি এখন এসো। হ্যাঁ, বাড়ীতে কালই চিঠি লিখে দিও। ক'দিন চিঠি দাওনি বলছ।"

অপর ব্যক্তি বলিল, "হ্যাঁ মা, কালই দোব। ক'দিন যে কি ভয়ে কাটছে মা তা আর বলতে পারি না।"

অরুণা বলিল, "যাক্‌, এখন তো ভয় গেছে কিন্তু তুমি তো শুনছি কাজকর্ম্ম সব জানো, ইংরেজি হরফ পড়তে পার। তোমার চাকরীর জন্যে এত ভাবনা হয়েছিল কেন? এত অপিস রয়েছে কলকাতায়।"

"আর মা, আজকাল আর সেদিন নেই। আমার মতন কত লোক বসে রয়েছে। আমার আর একটা মুস্কিল হয়েছে মা, জ্বরে ভুগে ভুগে শরীরটা বড্ডই কাহিল হয়ে গেছে, সিঁড়ি ভাঙতে আর পারি না। বড় আপিসের কাজে ওপোর নীচ করতে হয় অনেক। সে আমি পেরে উঠব না মা, চাকরী পেলেও চাকরী রাখতে পারব না। আমার এই ছোট আফিসই ভালো। আচ্ছা, আসি মা।"

"এসো। আহা, থাক থাক, ঐ হয়েছে।"

প্রসন্ন স্মিত মুখে সুবিমল ইহাদের কথোপকথন শুনিল। বুঝিল এইবার অরুণা একটি সাষ্টাঙ্গ না হইলেও ভূমিষ্ঠ প্রণাম লাভ করিল।

"বাবুর বড় দয়ার শরীর মা, দেবতার মতন বাবু।"

"এই রে! ও কথা বলো না, ও কথা বলো না, দেবতা দেবতা বলো না দীনবন্ধু। তোমার বাবু শুনতে পেলে আবার ক্ষেপে যাবেন। এবার থেকে খুব সাবধান হয়ে থেকো বাপু, ভক্তি টক্তি যা করতে হয় মনে মনেই কোরো। তোমাকে তো বলেছি উনি ঐসব মনরাখা মিষ্টি কথা ভয়ানক অপছন্দ করেন।"

যদিচ অরুণার কণ্ঠে ও কথায় পরিহাসের লেশমাত্র ছিল না, তথাপি বৈবাহিক আপ্যায়নকারী সুবিমল যেন দেখিল অরুণার চোখে মুখে চাপা হাসি খেলিয়া যাইতেছে।

পদশব্দে বোঝা গেল দীনবন্ধু প্রস্থান করিল। আর

একজোড়া কোমল পদশব্দে ইহাও বোঝা গেল যে অরুণা আসিতেছে। পরক্ষণ পরেই চুলের ভিতর লীলায়িত কোমল স্পর্শ পাইয়া সুবিমল কহিল, "এরই মধ্যে ভক্ত চলে গেল যে? দেবী বন্দনা এত শীগ্‌গীর শেষ হল?"

"ও মা! তুমি জেগে আছ? এই যে দেখে গেলুম ঘুমোচ্ছ!"

সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে সুবিমল বলিল, "ঠিকই দেখেছিলে। কিন্তু দীনে বেটা আবার কি করতে এসেছিল? দেবীর বর প্রার্থনা করতে?"

অরুণা জবাব দিল, "না বরলাভ ওর হয়ে গেছে দেবতার কাছে। তাই দেবতাকে পেন্নাম করতে এসেছিল বোধ হয়।"

"নাঃ, বেটাকে তাড়ালেই দেখছি হতো।"

পরমাদরে মাথার উপরে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে অরুণা বলিল "ঈস"। তারপর হাসিমুখে বলিল, "কী গো মশাই, তবে যে বড় বলেছিলে আমার কথা রাখতে পারবে না? ওকে চাকরীতে রাখা কিছুতেই চলবে না?"

সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়া সুবিমল বলিল, "বলেছিলুম ঠিকই কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ধোপে টেঁকাতে পারলুম না। কিন্তু তুমি যে এর মধ্যে চলে এলে? আমি তো জানতুম অন্ততঃ রাত্তির দশটার আগে আর তোমার ছাড়ান নেই।"

"ছাড়তে কি চায়? কত ঠাট্টা করতে লাগল, শেষে রাগ-দুঃখুও করলে।"

"তবে এত তাড়া করে আসার কারণ?"

"এলুম আমার খুশী। আমার মন কেমন করছিল তাই এলুম। তোমার ভালো না লাগে তো বল চলে যাচ্ছি।" বলিয়া অরুণা তাহার মাথা হইতে হাত তুলিতেই সুবিমল হাত বাড়াইয়া তাহার হাতখানি শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিল, "তা যেতে পার, আমার আপত্তি নেই।"

বহ্নিবিমান

শ্রীদিলীপকুমার রায়

[কলিকাতায় বোমা পতনের সংবাদে]

(রুদ্র)

সুন্দরের সৌধ তব অসুন্দর হীনতার পাশে
শোভে যেন আধ-আলোছায়াভরা নিলয় নিরালা,
শিল্পী যেথা রচে শিল্প, গুণী গায় গান কলোচ্ছ্বাসে,
কবি আনে ছন্দ অর্ঘ—নিবেদিতা হিয়া গাঁথে মালা।

ঊর্দ্ধ প্রগতির পথে আছে সার্থকতা নাথ, জানি
হেন ক্রম-আরোহণে। মরতার পিছুটান নিতি
সাধে বাদ অমরার আরাধনে। তাই বীণাপাণি
তীর্থপথে বসন্তের রচে পান্থশালা—গন্ধ গীতি

বর্ণরেখা স্বপ্ন মধু আবেশ কটাক্ষ শিহরণ—
প্রতি উপাদান করে লীলাময়ী মন্ত্রমান্ তার
আনন্দের ইন্দ্রজালে। তবু হে মায়াবী, পদার্পণ
নয় তো তোমার শুধু রম্যে—অগ্নি গর্জ্জেও তোমার।

দেখে না কি শাক্ত রুদ্ররূপ? মারণের অভিচারে
তোমারি কৃতান্তকান্তি কাপালিক করে না কি ধ্যান?
প্রেমালোকে বরেণ্য যে প্রাণারাম—আহুতি তাহারে
দেয় নাকি দুঃসাহসী সৃজিতে অপরাজেয় প্রাণ?

(শিব)

মানি সবই—তবু সন্ধু মনে হয়: বিভূতি তোমার
সুন্দরেরই রূপরাসে লভে চিরন্তন সার্থকতা।
শক্তি যেথা প্রেমদাস, সেথায়ই সে লভে অধিকার
বহিতে পতাকা তব: প্রাণশক্তি চিরশুভ্রব্রতা—

শ্মশানচারিণী নয়। বুঝি মোরা ফেলেছি হারায়ে
নির্ম্মল নির্দ্দেশ তব। তাই যে-বিক্রম সুষমার
শান্ত বিকাশের তরে নামে মর্ত্তে অঝোর প্রবাহে
সে-ই আনে উন্মাদনে আত্মঘাতী হিংসা-অন্ধকার।

তৃতীয় নয়ন তব তাই বর্ষে অগ্নি—সে-ঝলকে
নবদৃষ্টি জাগাতে ধরার—যার আছে দাহ জানি
তবু তার সাথী দীপ্তি সৃষ্টিমন্ত্র জপিয়া দুর্যোগে
যুগযুগান্তের রাত্রি বুকে গায় নবারুণ-বাণী—

পূর্ণতর-পরিণতি-কল্লোল-উচ্ছল—যাহা তুমি
সাধো অন্তরালে কল্প কল্প ধরি'—মোরা শুনি হায়
কতটুকু তার মহিমা-সঞ্চার? মনোবনভূমি
জানে কি কেমনে ফুল ফোটে? জানে শুধু—ঝ'রে যায়।

বঙ্কিমের উপন্যাসে বৈশিষ্ট্য

শ্রীউপগুপ্ত শর্ম্মা

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদেশে উপন্যাস-সাহিত্যের প্রবর্ত্তক। কিন্তু শুধু ইহা বলিলেই যথেষ্ট হয় না। তাঁহার স্বপ্ন, তাঁহার আদর্শ, তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী বর্ত্তমান কথা-সাহিত্যে এমন ভাবে অঙ্গীভূত হইয়া আছে যে, যখন আমরা কোন আধুনিক উপন্যাসকে পুষ্পাঞ্জলি দান করি তখন তাহার অধিকাংশ পুষ্পই তাঁহার চরণে গিয়া পৌছায়। অনুকৃতি অনেক সময় অনুকৃতকে গ্রাস করে—অনেক সময় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সেজন্য বঙ্কিমকে অনেক সময় আমরা অনুকারকদের জনতার মধ্যে ভুলিয়া যাই।

জ্ঞানগুরু, লোকশিক্ষক, চিন্তা-প্রবর্ত্তক, বর্ত্তমান সংস্কৃতির অগ্রদূত ইত্যাদি হিসাবে যখন বঙ্কিমের কথা চিন্তা করি, তখন কেবল স্বদেশের কথাই ভাবি, বিদেশের কথা ভাবি না। এদেশে তাঁহার তুলনা মিলে না। ঔপন্যাসিক হিসাবে যখন তাঁহার কথা চিন্তা করি—তখন দেশ-বিদেশের সমস্ত উপন্যাস-সাহিত্যের কথা আমাদের মনে আসে। আজকাল দেশ-বিদেশের বহু লেখকের উপন্যাস আমরা পড়িয়া থাকি। সে সকলের তুলনায় বঙ্কিমকে খুব বড় ঔপন্যাসিক বলিয়া অনেকে মনে করেন না।

দেশ-বিদেশের ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে তুলনা করিয়া বঙ্কিমের উপন্যাস-জগতে স্থান নিরূপণ বড়ই শক্ত। আমি সে চেষ্টা করিব না। আমি এদেশের কথা ভাবিয়া বলিতে পারি—ঔপন্যাসিক হিসাবে বঙ্কিমের সিংহাসন এদেশে আজিও কেহ টলাইতে পারেন নাই।

এদেশের উপন্যাস-সাহিত্য ইতিমধ্যেই দুই পর্য্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে: পুরাতন ধারা ও অভিনব ধারা। পুরাতন ধারার সম্বন্ধে ত' কথাই নাই—অভিনব ধারারও বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনার সহিতই ফল্গুধারার সংযোগ বর্ত্তমান।

বঙ্কিমের উপন্যাস আর একটি স্বতন্ত্র মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে—সে মর্য্যাদা ইতিহাসাত্মক। তিনি ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে উপন্যাস রচনা করিয়াছেন বলিয়া একথা বলিতেছি না।

তাঁহার উপন্যাসে আমাদের দেশের এক একটা যুগ, তাহার চিত্র, চরিত্র, আবেষ্টনী ও সমস্যা লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিম দূরবর্ত্তী কালের ঘটনা বা আখ্যানবস্তু অবলম্বনে উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। তাই চরিত্রসৃষ্টি ও আবেষ্টনীর মারফতে আমরা দেশের প্রাচীন সমাজ-সংসারের সহিতও পরিচিত হই। এজন্য বঙ্কিমকে অধ্যয়নাদির দ্বারা অভিজ্ঞতা ও দেশের ঐতিহাসিক পরিচয় লাভ করিতে হইয়াছে।

এই মর্য্যাদা অবশ্য শিল্পের পক্ষে একটা বড় কিছু নয় কিন্তু ঐতিহাসিক আবেষ্টনী আমাদের কল্পনাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া আকাশপথে অতীতের পানে লইয়া যায়—চারি পাশের বাস্তব জগৎ ভুলাইয়া দেয়—চিত্তকে চকিত ও বিস্ফারিত করে। একথা স্বীকার করিতেই হইবে। রস-সৃষ্টির পক্ষে ঐতিহাসিক আখ্যান ও আবেষ্টনী কতটা চমৎকার তাহা বঙ্কিম বুঝিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য ইহা কাব্যেরই বস্তু। অতীতের কল্পলোকই আমাদের কাছে স্বপ্নলোক—অতীতের কতটুকু আমরা জানি, বাকীটাও আমরা স্বপ্ন দিয়াই তৈরী করিয়া লই।

বর্ত্তমান যুগের উপন্যাসের কষ্টিপাথরে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বিচার করিলে চলিবে না। বঙ্কিমের উপন্যাসগুলিকে কেহ বলেন রোম্যান্স বা Romance, কেহ বলেন কাব্য। মোটের উপর, বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি একাধারে কাব্য, নাট্য ও কথা-সাহিত্য। দুই একখানি উপন্যাস এইগুলি ছাড়াও আরও কিছু অর্থাৎ তত্ত্ব-সাহিত্য। অধিকাংশ উপন্যাসে কাব্যধর্ম্মই প্রবল।

বঙ্কিমের অধিকাংশ উপন্যাসের কাহিনী স্বপ্নজগতের কথা। পড়িতে পড়িতে আমরা একটা অবাস্তব স্বপ্নলোকে চলিয়া যাই। এই স্বপ্নের মাধুরীর জন্য তাঁহার উপন্যাসগুলি এক একখানি কাব্য। সমগ্রভাবে না ধরিয়া যদি আমরা পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে বিচার করি তাহা হইলেও আমরা দেখিব কোথাও চিত্ররূপে, কোথাও গভীর অনুভূতির

বৈচিত্র্যরূপে, কোথাও কল্পনার অপূর্ব্ব বিলাসরূপে—কোথাও লিরিকাল ব্যঞ্জনারূপে কবিত্বেরই অভিব্যক্তি। কোন কোন উপন্যাস স্বপ্নকাহিনীর গীতি-পদ্ধতিতেই লেখা। সেজন্য অনেকস্থলে বাস্তব জগতের স্পর্শযোগ্য মাটি পাওয়া যায় না। পাঠকচিত্তে বিশ্বাস্যতা সম্পাদনের চেষ্টা নাই। হয় ত অনেক অসম্ভব, অসঙ্গত ও হেতুহীন ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে। সহসা কোন চিত্র বা চরিত্রের তিরোধান ও অন্তর্দ্ধান হইয়াছে—লেখকের পক্ষ হইতে কোন ব্যাপারের জন্য কোন কৈফিয়ৎ নাই। কোথাও কোথাও অলৌকিক কাণ্ডও আসিয়া পড়িয়াছে, প্রকৃতির বাধা যেন অনেকস্থলে একেবারে বিলুপ্ত, পাত্রপাত্রী যেন কামচারী—আকাশপথে যাতায়াত করে। উপন্যাসের পক্ষে এসব স্বাভাবিক নয়—কাব্যের পক্ষেই স্বাভাবিক।

বঙ্কিমের উপন্যাসের চরিত্রগুলি সবই রক্ত-মাংসের মানুষ নয়। স্বপ্ন-রসিক কবির উপন্যাসে তাহা না খোঁজাই ভাল। কোন কোন চরিত্র পরিমূর্ত্ত ভাবাদর্শ, কোন কোন চরিত্র পরিমূর্ত্ত স্বপ্নমাত্র, কোন কোনটি পরিমূর্ত্ত চিন্তা বিশেষ, আবার কোন কোনটি রক্ত-মাংসের সাধারণ মানুষ। ঔপন্যাসিক যদি কবিও হন তাহা হইলে তাঁহার রচনায় এইরূপই হয়। সবগুলি রক্ত-মাংসের মানুষ নয় বলিয়া তাহাদের জীবন-কাহিনীর সহিত প্রাকৃত সত্যের বর্ণে বর্ণে মিল হয় না। তাহাদের জীবনের ঘটনায় এমন কি আচরণে সাহিত্যের সত্যই খুঁজিতে হইবে—সম্ভাব্য অসম্ভাব্য, বিশ্বাস্য অবিশ্বাস্যের প্রশ্ন সে চরিত্রগুলি হইতে বাদ দিতে হইবে। সীতারাম একা একটি কামান দাগিয়া মুসলমান সৈন্যকে ব্যাহত করিতেছে—কিন্তু গোবিন্দলাল রোহিণীকে জলে ডোবার পর বাঁচাইতে গিয়া মালীর সাহায্য লইতে বাধ্য হইতেছে। গোবিন্দলাল সম্বন্ধে ইহাই সত্য। সীতারাম সম্বন্ধেও ঐ অঘটন-ঘটনা সাহিত্যের পক্ষে অসত্য নয়।

এই সকল কথা চিন্তা করিলে ও তাঁহার রচনায় কাব্য-মাধুর্য্যের ও স্বপ্নরসিকতার প্রাচুর্য্য লক্ষ্য করিলে মনে হয়—ঔপন্যাসিক হিসাবে বঙ্কিম যত বড়—কবি হিসাবে তিনি যেন আরও বড়।

ইদানীং উপন্যাসের রুচি, গতি, প্রকৃতি, পদ্ধতি সমস্ত বদলাইয়া গিয়াছে। Romance আর কাহাকেও বড় মুগ্ধ করে না। আমাদের মনের কোণে যে একটি চিরন্তন কল্পনা-রসিক শিশু আপন ভাবে বিভোর হইয়া খেলা করিত সে শিশুটিকে নানা সমস্যা ও বিজ্ঞানের জুজু তাড়াইয়া দিয়াছে। এখনকার লোকদের মন anti-romantic. তাই বঙ্কিমের উপন্যাসকে তাহারা আর উৎকৃষ্ট উপন্যাস বলিয়া স্বীকার করে না। তাই এক এক সময় মনে হয়—তাহাদের সঙ্গে তর্ক করিয়া বঙ্কিমকে ঔপন্যাসিক পদবীতে রক্ষা করিতে চেষ্টা না করিয়া বঙ্কিমকে মাইকেল, নবীন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কবি বলিয়া ঘোষণাই যদি করি, তবে তাহাদের বলিবার কি থাকে? বঙ্কিমকে অকবি বলিবার দুরাকাঙ্ক্ষা সম্ভবতঃ কাহারো নাই। তিনি গদ্যে লিখিয়াছিলেন বলিয়া কবি হইতে পারেন না। একথা আগেকার লোকে বলিলেও এখনকার পাঠকেরা নিশ্চয়ই বলিবেন না।

ইহা ছাড়া, বঙ্কিমচন্দ্রের জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে যে দৃষ্টি তাহা কবি-দৃষ্টি। চরিত্র চিত্রণে বর্ণাঢ্যতা, জীবনের কোন কোন অঙ্গে অতিরিক্ত শক্তিপ্রয়োগ (Emphasis), প্রকৃতির সহিত মানব জীবনের সম্বন্ধ পরিকল্পনা, প্রাকৃতিক আবেষ্টনী সৃষ্টি, আখ্যায়িকার ফাঁকে ফাঁকে ভাবোচ্ছ্বাস ইত্যাদি সমস্তই কবিজনোচিত।

গঠন-বৈচিত্র্য ও রূপ-বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে মাইকেল বর্ত্তমান যুগের কবিগুরু—কিন্তু কাব্যে Romantic ও Lyrical মাধুর্য্যের দিক হইতে বঙ্কিমকেই কবিগুরু বলিতে হয়।

তাই দেখিতে পাই বঙ্কিমের কথাসাহিত্যের বহু অঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শের পূর্ব্বসূচনা হইয়াছে। বঙ্কিমের উপন্যাসের সমুদ্রসৈকতে, বারুণী পুষ্করিণীর তীরে, ভীমা পুষ্করিণীর নীরে এবং সূর্য্যমুখীর তারা গৃহে বর্ত্তমান গীতিকাব্যের Neo-romantic attitude-এর সূত্রপাত হইয়াছে।

মানবিকতার প্রতি গভীর নিষ্ঠা, মানবজীবনের গূঢ়-রহস্যের অনুসন্ধিৎসা, হৃদয়াবেগের প্রতি অকপট শ্রদ্ধা, মর্ত্ত্য-মাধুরী-সম্ভোগতৃষ্ণা, সত্যের জন্য আকুলতা ও কৌতূহল, বিশ্বপ্রকৃতি ও নারীসৌন্দর্য্যের উপভোগ-ব্যাকুলতা—এই সমস্ত বঙ্কিমকে ঔপন্যাসিকের সিংহাসনে না হউক, কবির পদ্মাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

কোন কোন উপন্যাসে বঙ্কিমের নাট্যধর্ম্ম কাব্যধর্ম্মকে

অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। যেখানে তিনি অল্প পরিসরের মধ্যে জীবনকে ঘনীভূত (intensified) করিয়া দেখাইয়াছেন—দ্রুত-সংঘটিত ঘটনাবলীকে যেখানে চিত্রপরম্পরায় সাজাইয়া গিয়াছেন—সেখানে মুহুর্মুহু দৃশ্যের পর দৃশ্যের আবির্ভাবে আমাদের কল্পনাকে কুতূহলী এবং চিত্তকে বৈচিত্র্যের অপূর্ব্বতায় মুগ্ধ করিয়াছেন—যেখানে তিনি দূরকে নিকট করিয়া অতীতকে প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান করিয়া, জটিলকে সরল করিয়া, বিকীর্ণকে সংহত করিয়া, স্থূলকে সূক্ষ্ম ও শাণিত করিয়া দেখাইয়াছেন—সেখানে তিনি নাট্যধর্ম্মী।

প্রকৃত উপন্যাসধর্ম্ম কেবল বিষবৃক্ষে কতকটা—কৃষ্ণকান্তের উইলে কতকটা দেখা যায়।

বঙ্কিমের উপন্যাসগুলিকে অনেকে উদ্দেশ্যমূলক মনে করেন। উদ্দেশ্যমূলক বলার অর্থ—শিল্পগত রসকে কোন না কোন নৈতিক উদ্দেশ্য অতিক্রম করিয়া প্রকট হইয়াছে।

প্রত্যেক রচনাতেই কোন-না-কোন বৃত্তি, নীতি ভাব বা আদর্শ প্রাধান্য লাভ করে। তাই বলিয়া উক্ত বৃত্তি, নীতি, ভাব বা আদর্শের প্রতিষ্ঠা বা প্রচারকে উদ্দেশ্য বলা চলে না। শরৎ চন্দ্রের পল্লী-সমাজ ও পণ্ডিতমশাই উপন্যাস দুইখানি সম্বন্ধে কেহ যদি বলেন—পল্লী-সংস্কার সম্বন্ধে Propaganda-ই ইহাদের উদ্দেশ্য, তাহা হইলে কি বই দুইখানির প্রতি সুবিচার করা হয়?

বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির মধ্যে আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী এই দুইখানি যে কতকটা উদ্দেশ্যমূলক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ চন্দ্রশেখরকেও উদ্দেশ্যমূলক বলেন। চন্দ্রশেখর যে ভাবে সমাপ্ত হইয়াছে তাহাতে সাধারণ পাঠকের তাহাই মনে হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা উদ্দেশ্যমূলক নয়—বঙ্কিম পুস্তকখানির পর্য্যবসান করিয়াছেন হিন্দুর চিরপ্রচলিত সামাজিক সংস্কারের অনুগত করিয়া। ইহাতে শিল্পকলার দিক হইতে দোষ হইতে পারে—কিন্তু কোন বিশিষ্ট উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হইয়া তিনি শৈবলিনী দলনীর কাহিনী লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। অনেকে বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইলকেও উদ্দেশ্যমূলক বলিয়া থাকেন। চন্দ্রশেখর সম্বন্ধে যে কথা কৃষ্ণকান্তের উইল সম্বন্ধেও সেই কথা। বিষবৃক্ষের সমাপ্তি এবং মাঝে মাঝে বঙ্কিম যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সাধারণের ঐরূপ ধারণা হওয়া আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু বিষবৃক্ষকেও উদ্দেশ্যমূলক বলা যায় না।

বঙ্কিমের জীবনের একটা মন্ত্রই ছিল মানব জগতের মঙ্গল-সাধনই পরম ধর্ম্ম। তাঁহার কোন উপন্যাস এই মন্ত্রটি ভুলে নাই। শিল্পী হিসাবে এই মন্ত্র তাঁহার চরিত্রেরই অন্তর্গত; তাই পৃথক করিয়া ইহাকে একটা উদ্দেশ্য বলা যায় না। শিবের সহিত সুন্দরের মিলন তিনি সর্ব্বত্রই দেখাইতে চাহিয়াছেন—ইহা তাঁহার কবিজীবনেরই আদর্শ ছিল। এই আদর্শ যে শিল্পীরা জীবনে অনুসরণ করেন বঙ্কিম তাঁহাদেরই একজন। বর্ত্তমান যুগের Realistic Novelist কিংবা Art for art's sake-এর পক্ষপাতী শিল্পীদের আদর্শে তাঁহার বিচার না করাই উচিত।

বঙ্কিম নিজেই কোন কোন পুস্তকের বিজ্ঞাপনে ভূমিকায় গ্রন্থরচনার একটা উদ্দেশ্য স্বীকার করিয়াছেন। আমরা গ্রন্থ পড়িয়া বুঝিতে পারি না কেন তিনি এইরূপ উদ্দেশ্যের কথা বলিয়াছেন। যদি কোন উদ্দেশ্য আখ্যান-বস্তুর পরিকল্পনা কালে তাঁহার মনে ছিল বলিয়াই মনে করা যায়, বস্তুতঃ সে উদ্দেশ্য রসসৌন্দর্য্যের ও শিল্পসৌষ্ঠবের অন্তরালে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে—তাহা খুঁজিয়াও পাওয়া যায় না।

ধর্ম্ম, সমাজ ও জাতীয়জীবন সম্বন্ধে তাঁহার কতকগুলি চিন্তা তিনি প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিয়াও পরিতুষ্ট হন নাই। তাঁহার মনে হইয়াছিল—সেগুলি প্রবন্ধাকারে দেশের লোকের মর্ম্ম স্পর্শ করিবে না। যুক্তিমূলক ক্রমের দ্বারা সে সকল চিন্তার প্রচার অনেকটা ব্যর্থ। সেজন্য তিনি সেগুলিকে বাস্তবরূপে রূপায়িত ও কল্পশক্তির প্রয়োগে জীবন্ত করিয়া দেখাইবার জন্য দুই একবার উপন্যাসের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভাবের পথে যাহা দেশের অন্তর স্পর্শ করে নাই—রূপের পথে—রসের পথে তাহা করিয়াছে। বঙ্কিমের ঈপ্সিত ফল তাহাতে সহজলভ্য হইয়াছে। সেগুলি যদি শিল্পের গৌরব লাভ না করিয়াও থাকে—একশ্রেণীর উচ্চস্তরের সাহিত্যের মর্য্যাদা নিশ্চয়ই লাভ করিয়াছে। সেগুলিকে সাহিত্য-সংসার হইতে বিদায় দেওয়ার কথা কি কেহ ভাবিতে পারে? সেগুলি গীতের মর্য্যাদা পায় নাই বটে কিন্তু গীতার মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে।

বঙ্কিমের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ। তাঁহার

শিল্পিজনোচিত স্বাধীনতা, জাতিধর্ম্ম ও সমাজের নৈতিক আদর্শের দ্বারা ক্ষুন্ন হইয়াছে। চরিত্রগুলির ক্রম-পরিণতি তিনি প্রকৃতির হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হ'ন নাই, তাঁহার নিজস্ব সমাজ ও ধর্ম্মের আদর্শের দ্বারা সেগুলিকে পরিচালিত করিয়াছেন। এ অভিযোগে আংশিক সত্য থাকিতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—শিবের সহিত সুন্দরের মিলন তিনি তাঁহার রচনায় দেখাইতে চাহিয়াছেন। প্রকৃতির হাতে তাহাদের ছাড়িয়া দিলে পাছে অকল্যাণকর উপদ্রবের সৃষ্টি হয়—সেজন্য তিনি নৈতিক আদর্শের বল্গা টানিয়া রাখিতেন। আর্ট তাহাতে ক্ষুন্ন হইয়াছে কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। অনেকের মতে ইহাই প্রকৃত আর্ট। বঙ্কিম সেই শ্রেণীর আর্টিষ্ট যাঁহারা প্রকৃতির হাতের ক্রীড়াপুত্তলি হইতে রাজী নহেন—নিজের জীবনাদর্শ হইতে যাঁহারা স্বকীয় সৃষ্টিকে বঞ্চিত করিতে চাহেন না। বঙ্কিম নিজেকে দ্রষ্টা মাত্র মনে করিতেন না—নিজেকে স্রষ্টা মনে করিতেন। সেজন্য তিনি সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন—প্রকৃতির সৃষ্টির নকল করেন নাই। এই শ্রেণীর আর্টিষ্ট ইউরোপে অনেক। আমাদের দেশের কোন বড় আর্টিষ্টই এই তথাকথিত অপবাদ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন না।

সমাজকল্যাণসাধন এবং সমাজের অকল্যাণনিবারণ তাঁহার জীবনধর্ম্ম ছিল। এই জীবনধর্ম্মই তাহার জন্য দায়ী। একথাও এখানে বলিয়া রাখি—হিন্দু সমাজ ও ধর্ম্মের সংস্কার সম্বন্ধে বঙ্কিম যে নির্ভীকতা দেখাইয়াছেন তাহা তাঁহার পূর্ব্বে কেহ দেখাইতে সাহস করেন নাই। একবার প্রচলিত হিন্দু-সংস্কারগুলির কথা ভাবিয়া দেখিলে এবং সেইসঙ্গে তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্যে সংস্কারমুক্তি ও স্বাধীনতার বাণীগুলি মিলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে কতবড় বীরপুরুষ তিনি ছিলেন—সত্যের পথে কতদূর তিনি অগ্রসর হইয়াছিলেন। সত্যকে তিনি কখনও সংস্কারের নীচে স্থান দেন নাই—বলা বাহুল্য হিন্দুর যে আদর্শকে তিনি সত্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন তাহাকে তিনি বর্জ্জন করেন নাই। কিন্তু কোন অসত্যকে তিনি সমাজের বা ধর্ম্মশাস্ত্রের ভ্রুকুটীতে স্বীকার করিয়া ল'ন নাই। তাঁহার রচনা অহিন্দুভাবে পূর্ণ বলিয়া তাঁহার জীবদ্দশায় নিন্দিতই হইয়াছিল। মোটকথা, শুধু শিবসুন্দরের নয়—সত্য শিবসুন্দরের মিলনই তিনি সাহিত্যের মধ্যে দেখাইতে চাহিয়াছেন।

বঙ্কিম তাঁহার উপন্যাসের পাত্র পাত্রী ও আখ্যানবস্তু নিম্ন শ্রেণীর সমাজ হইতে নির্ব্বাচন করেন নাই। সমস্তই উচ্চ শ্রেণীর সমাজ হইতে নির্ব্বাচিত। নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালী কৃষক শ্রমিকদের প্রতি যে তাঁহার সহানুভূতির অভাব ছিল না—তাহা তাঁহার প্রবন্ধগুলি হইতে বুঝা যায়। এ দেশে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান বর্ত্তমান। তাহাদের মধ্যে সহানুভূতি নাই বলিয়া তিনি বার বারই ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন—দেশের রাজকীয় বিধান ও শিক্ষা বিধানকে এজন্য দায়ী করিয়াছেন। অথচ উপন্যাসের রচনাকালে তিনি এই শ্রেণীর লোকদের উপেক্ষা করিলেন কেন?

বলা বাহুল্য ইহা অবজ্ঞাবশতঃ নয়। তিনি সমাজের যে স্তরের লোকদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে ভাল করিয়া জানেন না—সে সমাজের আখ্যানবস্তু লইয়া কি করিয়া তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করিবেন? দেশপ্রীতির তাড়নাতেও তিনি তাহা করিতে পারেন নাই; তাহা ছাড়া তিনি বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন,—যে সমাজের লোকদের জীবনে সমস্যা, বৈচিত্র্য ও জটিলতার অভাব, সে সমাজের নরনারীর চরিত্র লইয়া কাব্য রচনা চলে—উপন্যাস রচনা চলে না। এ ধারণা তাঁহার ছিল কি না জানি না—আমাদের অনুমানমাত্র। তিনি যে সমাজে বিচরণ করিতেন, যে সমাজে পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন সে সমাজের নর-নারীগণকে তিনি অন্তরঙ্গভাবে জানিতেন—তাহাদের মধ্য হইতেই তিনি পাত্রপাত্রী নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। সে সমাজের মধ্যে আবার যাহারা অপেক্ষাকৃত ধনী, বঙ্কিম তাহাদিগকেই খুব ভাল করিয়া চিনিতেন। তাহারাই তাঁহার উপন্যাসে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। অবশ্য প্রফুল্লর দুঃখিনী জননীর অভাবের সংসারটিও তাঁহার বাড়ীর পাশে স্বচক্ষে দেখা বলিয়াই মনে হয়।

প্রকৃতি আমাদের দেশের সাহিত্যে চিরদিন নির্জ্জীব চালচিত্রের কাজই করিয়া আসিয়াছিল। এমন কি মাইকেলও প্রকৃতিকে ঐ চোখেই দেখিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথমে মানব-হৃদয়ের সঙ্গে প্রকৃতির গভীর যোগ ও রসসম্বন্ধ দেখাইয়াছেন।

মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধ সাংসারিক ও সামাজিক জীবনে কত বিচিত্র। বঙ্কিমসাহিত্য এই বৈচিত্র্যের জন্য বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করে নাই। নর-নারীর প্রণয় সম্বন্ধই বঙ্কিমসাহিত্যের

প্রধান উপজীব্য। বাকি সকল সম্বন্ধ এই সম্বন্ধের আনুষঙ্গিক—কোথাও পরিপোষক—কোথাও পরিপন্থী। বাৎসল্য সম্বন্ধের স্থান বঙ্কিম সাহিত্যে অতি সামান্য। বিষবৃক্ষে কমলমণিও দেবী চৌধুরাণীতে ব্রজেশ্বরের জননী চরিত্রে মাতৃত্বের বিকাশ দেখা যায়। হরবল্লভ ও কৃষ্ণকান্তের মধ্যে গৃহপতিত্ব পিতৃত্বকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সখ্য সম্বন্ধের স্থান বঙ্কিমসাহিত্যে নাই বলিলেই হয়। অন্য সম্বন্ধ কোন কোন স্থলে সখ্যের স্থান গ্রহণ করিয়াছে—যেমন মৃণালিনী-গিরিজায়াতে, দলনী-কুলসমে বিমলা-তিলোত্তমায়, কমলমণি-সূর্য্যমুখীতে, এবং সুন্দরী-শৈবলিনীতে। ভ্রাতৃত্বের স্থান বঙ্কিম সাহিত্যে নাই। সম্প্রদায়-গত ভ্রাতৃত্বের স্থান বরং আনন্দমঠে দেখা যায়। বঙ্কিম-সাহিত্যে দাস দাসীর অভাব নাই—কিন্তু দাস্য-সম্পর্কের মাধুর্য্য ক্বচিৎ কোথাও দেখা যায়। প্রতিদ্বন্দ্বিতা নারীদের মধ্যে যে ভাবে দেখানো হইয়াছে—পুরুষদের মধ্যে সে ভাবে দেখানো হয় নাই। পুরুষদের মধ্যে জগৎসিংহ ও ওসমানের বৈরী সম্বন্ধই প্রধান ভাবে উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমের অধিকাংশ উপন্যাসে সাধুসন্ন্যাসীশ্রেণীর চরিত্র আছে—তাহার ফলে গুরুশিষ্য সম্পর্কটা বঙ্কিম-সাহিত্যে খুবই প্রবল।

নর-নারীর প্রণয়-সম্পর্কের পরই ইহার স্থান। আদর্শ-বাদী বঙ্কিমের নিজস্ব আদর্শ উপন্যাসে সংক্রমিত করার জন্য গুরু চরিত্রের প্রয়োজন হইয়াছে।

বঙ্কিমের চিত্রিত পরিবারগুলি যেন তাহাদের প্রতিবেশ হইতে কতকটা স্বতন্ত্র! তবু প্রতিবেশীত্ব সম্পর্ককে বঙ্কিম একেবারে বাদ দিতে পারেন নাই। প্রতিবেশী সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা তাঁহার দাদার মতই ছিল। *

এক ইন্দিরা ছাড়া অন্য কোন পুস্তকে এই সম্পর্ককে মধুময় করিয়া দেখানো হয় নাই।

রাজা প্রজার সম্পর্কের কথা আছে সীতারামে। প্রজা যে রাজতন্ত্র শাসনে কত অসহায় বঙ্কিম সীতারামে তাহা দেখাইয়াছেন।

রজনী পুস্তকখানি Lord Lytton-এর Last Days of Pompei অবলম্বনে রচিত। দুর্গেশনন্দিনীতে Scott-এর প্রভাব খুব সুস্পষ্ট। তারপর নারীর পুরুষবেশ ধারণে, পুরুষের নারীবেশ ধারণে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রণয়ীদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে, দেবালয়ে প্রেমসঞ্চারে, লোক-সমাজের বাহিরে প্রকৃতির অঙ্কে প্রতি-পালিতা রমণী-চরিত্র চিত্রণে, প্রতিদ্বন্দ্বিনী প্রণয়িনীর দ্বারা প্রণয়ের ভেদসাধনে, অবিশ্বাসিনী প্রণয়িনীর বধ-সাধনে, স্বগতোক্তির দ্বারা মনোভাব প্রকাশে, পবিত্র দাম্পত্যপ্রণয়ের মর্য্যাদাঘাতক স্বামীর প্রত্যাখ্যানে, দস্যুতার দ্বারা লোকহিত-সাধন ব্যাপারে, অভিমানে স্বামিগৃহত্যাগে, দাসীর সহিত সখীত্ববন্ধনে বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব হয় ত অল্প বিস্তর আছে। কিন্তু এইগুলি তুচ্ছ ব্যাপার। বিদেশী সাহিত্যের নিকট বঙ্কিমের ঋণ আরো গভীরতর। বঙ্কিম উপন্যাস রচনার form বা technique সম্পূর্ণ বিদেশ হইতেই পাইয়াছেন।

ইহা ছাড়া বঙ্কিম বিদেশ হইতে পাইয়াছেন—বাস্তবতার প্রতি শ্রদ্ধা, সংস্কার-মুক্তির সাহস, চিরন্তন মানবধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা, জীবনের গূঢ় রহস্যের অনুসন্ধিৎসা, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, মনোবিশ্লেষণ-পদ্ধতি, ট্র্যাজেডি সৃষ্টির মূল সূত্র, সত্যনিষ্ঠা ও অপ্রিয় সত্য প্রকাশে নির্ভীকতা, মনুষ্যত্বের যথাযোগ্য দাবী-স্বীকার,—আরও অনেক কিছু। বিশ্বপ্রকৃতিকে তিনি জীবন্তরূপে দেখিতে শিখিয়াছেন—তাহার সহিত মানুষের জীবনের যে রহস্যময় যোগাযোগ তাহা লক্ষ্য করিতে শিখিয়াছেন। হৃদয়াবেগের প্রকৃত মর্য্যাদা তিনি বিদেশী সাহিত্য হইতেই উপলব্ধি করিয়াছেন। প্রণয় আমাদের দেশের সাহিত্যেও প্রধান উপজীব্য ছিল। কিন্তু প্রণয়ের নানারূপ বৈচিত্র্য তিনি দেশের সাহিত্য হইতে পান নাই। ঘটনাবলীর ও চিত্রপটের দ্রুতসংক্রমণ ও আখ্যায়িকার রস-

---

* বঙ্গে কেবল প্রতিবাসীরাই দুরাত্মা; নিন্দা যাহা কিছু শুনা যায়, তাহা কেবল প্রতিবাসীর। প্রতিবাসীরা পরশ্রীকাতর, দাম্ভিক, কলহপ্রিয় লোভী, কৃপণ ও বঞ্চক। তাহারা আপনাদের সন্তানকে ভাল কাপড়, ভাল জুতা পরায়, কেবল আমাদের সন্তানকে কাঁদাইবার জন্য। তাহারা আপনাদের পুত্রবধূকে উত্তম বস্ত্রালঙ্কার দেয়, কেবল আমাদের পুত্রবধূর মুখ ভার করাইবার নিমিত্ত। যাহাদের প্রতিবাসী নাই, তাহাদের ক্রোধ নাই, তাহাদেরই নাম ঋষি। ঋষি কেবল প্রতিবাসিত্যাগী গৃহী। ঋষির আশ্রমপার্শ্বে প্রতিবাসী বসাও, তিন দিনের মধ্যে ঋষির ঋষিত্ব যাইবে। প্রথম দিন প্রতিবাসীর ছাগলে পুষ্পবৃক্ষ নিষ্পত্র করিবে, দ্বিতীয় দিনে প্রতিবাসীর গোরু আসিয়া কমণ্ডলু ভাঙ্গিবে, তৃতীয় দিনে প্রতিবাসীর গৃহিণী আসিয়া ঋষিপত্নীকে আপনার অলঙ্কার দেখাইবে। তাহার পরই ঋষিকে ওকালতী পরীক্ষা দিতে হইবে, নতুবা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটীর জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে। —সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জাতির স্বরিতগতি তিনি এই মন্থরগতির দেশের বিলম্বিত-গতি সাহিত্য হইতে নিশ্চয়ই পান নাই। এমন কি, স্বদেশপ্রীতি পর্য্যন্ত বঙ্কিম ইউরোপীয় সাহিত্য হইতেই পাইয়াছেন।

বঙ্কিম যখন উপন্যাস রচনা করেন, তখন এদেশে ইতিহাস রচনার শৈশবকাল। তখন কাহিনী গুলিকেও (Legends) ইতিহাসের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করা হইত। সেজন্য বঙ্কিম ইতিহাসের মধ্যে উপন্যাসের উপাদান উপকরণ পাইয়াছিলেন। ইতিহাস ক্রমে এখন নিরাভরণ নিরাবরণ হইয়া পড়িয়াছে—আর ইতিহাস কোন লেখকের চিত্তে Romance বা স্বপ্নমায়ার সৃষ্টি করে না। বঙ্কিমের মত উপন্যাস লেখার দিন তাই ফুরাইয়া গিয়াছে। এখন শত সহস্র দেশী ও বিদেশী সমস্যা উপন্যাস-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া মহাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিতেছে। বঙ্কিমের সময়ে আমাদের সামাজিক জীবন এত জটিল ও সমস্যাসঙ্কুল হইয়া উঠে নাই। বঙ্কিমের উপন্যাসে একমাত্র নারীসম্বন্ধীয় পারিবারিক সমস্যা ছাড়া অন্য কোন সামাজিক সমস্যা নাই। সমস্যার জটিলতা, বহুলতা ও প্রাধান্য না থাকার জন্য বঙ্কিমের উপন্যাস কবিধর্ম্মোপেত হইতে পারিয়াছিল। বঙ্কিমের ন্যায় চিন্তাশীল চিত্তে বিদেশীগত সমস্যাগুলি যে আঘাত করে নাই—তাহা নয়। কিন্তু বঙ্কিম সে সমস্যাগুলিকে উপন্যাসে প্রবেশ করিতে দেন নাই। সেগুলি লইয়া তিনি প্রবন্ধাদি রচনা করিয়াছেন। এ দেশের একটা বড় সমস্যা তাঁহার চিত্তকে আলোড়িত করিয়াছিল—তাহা ধর্ম্ম-সমস্যা। এই সমস্যা তাঁহার উপন্যাসে ছায়াপাত করিয়াছে—সশরীরে আবির্ভূত হইতে পায় নাই। শেষ জীবনে বঙ্কিম এই সমস্যা লইয়া বহু নিবন্ধ রচনা করিয়া তাহার সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন এবং মীমাংসার সূত্র ধরাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

উপন্যাসে বঙ্কিম দেখাইয়াছেন—সমাজ-বিধির অনুগত হইয়া চলাই ন্যায়সঙ্গত। এ জন্য আত্মত্যাগ ও সংযমের প্রয়োজন হয়—সেজন্য ইহাই ধর্ম্ম। যে এ বিধি লঙ্ঘন করিবে শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে দণ্ডভোগ করিতে হইবে। উপন্যাসের বর্ত্তমান আদর্শ তাহা নয়,—কোন শাসনই কাম্য নয়—স্বাধীনতাই কাম্য। সমাজের শাসনবিধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহই শৌর্য্য। এ জন্য অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়—নৈতিক সাহসের প্রয়োজন হয়, সে জন্য ইহাই ধর্ম্ম। সমাজ মাত্রই কতকগুলি অসত্য সংস্কারকে শাসনের দ্বারা চালাইতে চায়, তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহই সত্যের সাধনা। এ জন্য সমাজ দণ্ড দিতে পারে—কিন্তু কোন আধ্যাত্মিক বা নৈসর্গিক দণ্ডের কারণ কি আছে? আর দণ্ডভোগই যদি করিতে হয়—তবে সে জন্য অনুতাপের প্রয়োজন নাই—ভীরুতাকে আশ্রয় করাই পাপ। এইরূপ বিদ্রোহের দ্বারাই সমাজের সংস্কার হইবে।

বঙ্কিমের মতে সমাজের সকল সংস্কারই অসত্য নয়। অসত্য যে কিছুই নাই, তাহা নয়। তবে শিক্ষা ও জ্ঞান-প্রচারের দ্বারা সমাজের সংস্কার কর—কিন্তু সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ভাবে বিদ্রোহী হইও না। তাহাতে নিজের ও পরের বহু অনিষ্ট হইবে। বিপ্লব বা বিদ্রোহের দ্বারা সংস্কার সম্ভব নয়, বিধিবিধানের দ্বারা সংস্কারই সম্ভব।

মদবিহ্বল মানব! বেঁচে থাক্ তোমারি আহব

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

হায়রে অভাগা! এসংসারে তোর প্রাপ্য নাহি কিছু,
অক্ষমতা তোরে করে নীচু,
দরিদ্রতা দিল ছোট করে আজ,—তুই যে মানব
কে করে বিশ্বাস! সভ্যসমাজের মাঝে বেয়াদব!
তোর নাহি বসিবার ঠাঁই,—ওরে ঘৃণ্য উপবাসী
কেবা শোনে তোর কথা? কেবা বোঝে তোর অশ্রুহাসি!

এই যে অসহ্য ক্লেশ,
অপমান অমিদর শ্লেষ,
এর চেয়ে মৃত্যু ভালো! দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা করি,
ফিরে আসা ম্লানমুখে তাজা বুকে রিক্ততারে বরি,
বেঁচেথাকা বুভুক্ষায় বৃথাবিড়ম্বনা;
অন্নের বঞ্চনা

শোনা যায়, ক্ষুব্ধ কেন তাহে ?
সমগ্র শতাব্দী ধরি সমর সঙ্গীত যেন গাহে
বেঁচে রবে যারা।
আমার নয়ন তারা
যাক্ নিবে,—দাও মোরে চলে যেতে লোক লোকান্তরে
মায়ার জিঞ্জির পরা জীবনের এই বিশ্ব পরে
সংসারের বন্দীগৃহে রাখিয়াছি শুধু যার খেতে
ধুলায় আসন পেতে !

জনহীন মধ্যরাতে ঝিল্লী ডাকা নদীতটে ডাকে
কেন যেন আমারে ! পাখী কাঁদে আর্ত্তকণ্ঠে বুঝি হাঁকে—
দিশাহারা দারুণ সন্তাপে।
কার অভিশাপে
অবজ্ঞার স্রোতোধারা এ ধরণীরে দুঃসহ দহনে
দহিতেছে দিবারাত্রি ! মানবের অন্তর গহনে
শোনা যায় পশুরই গর্জ্জন,
হোলো না অর্জ্জন
শ্রেষ্ঠধন মহামানবতা। গর্ভবেদনার মত
হৃদয়ের ভাবগুলি অবিরত
বাহিরিতে চাহে। শাসন সংযত যুগে অপরাধ
সত্যকিছু বলা,—অপবাদ
করে কশাঘাত পরদুঃখে কাঁদে যদি এই প্রাণ,
বিপদেরে নিতে হবে বুকে বিপদে করিলে ত্রাণ—
আর্ত্তজনে। নিরুপায় ভীরুতায়, প্রবঞ্চনা পেয়ে
বসে আছি মৃত্যু পানে চেয়ে।

এ সভ্যতা সংশয় দ্বিধায় ভরা, মৃত্তিকার ব্যথা
বুঝিল না, ধ্বংস করে দিল তার ক্রম-উর্ব্বরতা,
বায়ু দিল পাপে ভরি', শুনাইয়া ভদ্রতার বাণী
কার্য্যে তার পাশবতা করিছে প্রকাশ অস্ত্রহানি'
নিরীহ পান্থের বক্ষ'পরে। লক্ষ লক্ষ তৃণরাজি
দলিত মথিত। করুণার বৃষ্টিধারা তবু আজি
পড়ে নাক তাহাদের আহত জীবনে, বনস্পতি
ভূলুণ্ঠিত। এ নিষ্ঠুর সভ্যতা যে শোনে না মিনতি
সর্ব্বহারা বিধবা লতার,
—আজিকার রণস্রোতে ধ্বংসহোক যুগসভ্যতার।

এখনো কি আছে আশা !
মানুষ রহিবে বেঁচে, বিহঙ্গেরা প্যাবে খুঁজে বাসা !
পাবে ফিরে জীবন সম্পদ প্রলয়ের রাত্রিশেষে
অনাগত প্রভাতের তটে এসে ?
পাবে শান্তি সুখ ! বল কবি !
নীলাকাশে দেখা দিবে রবি
উষার অন্তরে অবগাহি ! অশ্রুধোয়া হাসি
কিশলয়ে কিশলয়ে দেবে দোল। বনপথে বাঁশী
বাজিবে আবার !
বুনিবে ফসল মাঠে কৃষাণেরা,—যাবে হাহাকার !
যাবে অন্ধকার। প্রাচীর মাঝকে ফুটি পুষ্পদল
এ ধরণীরে গন্ধদীপে আলো করি' আনন্দ বিহ্বল
করিবে একদা ! বল কবি ! এই পূর্ব্বাচলে—
অমৃতের পুত্রগণ সাধনার শক্তি মন্ত্রবলে
জাগাইবে স্বর্গজ্যোতি ভারতের চিত্ত তপোবনে।
সামের সঙ্গীতসনে গায়ত্রী বন্দনে।

শান্তি শব্দ অভিধান হতে মুছে গেছে শতাব্দীতে,
তার কথা কিবা হবে কয়ে ! আজ নিয়তি ইঙ্গিতে
জীবনের সর্ব্বোত্তম বাণী
মরণেরে করেছি বরণ। আমার কবিতাখানি
দিয়ে যাবো কারে ? রক্তসাগরের বুকে যাক্ ভবে
ভেসে,—বজ্রশিখা জ্বলে নভে।
মদ-বিহ্বল মানব !
বেঁচে থাক তোমারি আহব,
দুর্ভিক্ষ দুর্য্যোগ আর প্রাত্যহিক মারণ মরণ,
আর বিস্ফোরণ।

পঞ্চম দৃশ্য

তমিজউদ্দীনের খানখা

তমিজ, আশরফ, ফজল্ ইলাহি ও হানিফ

ফজল। আপনার বাড়ীতে কা'র ব্যারাম হ'ল মিঞাভাই ?

তমিজ। আমার পরিবারের, মানে বিবির।

ফজল। বিবি-সাহেবার অসুখটা কি ?

তমিজ। পেটের যন্ত্রণায় ছটফট্ করছে, অথচ কেন বা কোথায় বেদনা বুঝতেও পারছে না, বোঝাতেও নয়।

আশ। ডাক্তারবাবুকে খবর দেওয়া হ'য়েছে ?

তমিজ। হ্যাঁ, আব্দুলকে পাঠিয়েছিলেম; ডাক্তারবাবু এখনি আসবেন।

ফজল। মেয়ে-ডাক্তার নেই ? পুরুষ-ডাক্তার বিবি-সাহেবার রোগ নির্ণয় করবে কিরূপে ? ডাক্তারের সঙ্গে কথা কইতে হ'বে, হাত দেখাতে হ'বে, পেট পরীক্ষা করতে হ'বে।

তমিজ। একি আপনার কলকেতার সহর, যে মেয়ে-ডাক্তার পাওয়া যা'বে ? একটু দূরে আর একজন ডাক্তার আছেন বটে, কিন্তু মেয়ে-ডাক্তার এ-অঞ্চলে নেই।

ফজল। তা' হ'লে পুরুষ-ডাক্তার বিবি-সাহেবার পেট পরীক্ষা করবে ? আপনাদের আউরাতদিগের পর্দ্দা নাই ?

আশ। আগে জান্, না আগে পর্দ্দা ?

ফজল। আগে ধর্ম্ম।

হানিফ। পর্দ্দাও ধর্ম্মের সামিল না কি ?

ফজল। নিশ্চয়।

হানিফ। এই যদি আপনার ধর্ম্ম হয়, তা' হ'লে এ-ক্ষেত্রে আমরা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ করব। প্রাণ বাঁচলে তবে ত' ধর্ম্ম !

ফজল। ইতিহাস ত পড়েছ ! জান না, যে ধর্ম্মরক্ষার জন্য রাজপুতের মেয়েরা জলন্ত চিতায় প্রবেশ করেছে ? ধর্ম্মের চেয়ে কি প্রাণ বড় ?

হানিফ। সে-ত' নারীধর্ম্ম—সতীত্ব। আর এত হিন্দু-বিদ্বেষী হ'য়ে আপনি ত' সেই হিন্দুর মেয়েদেরই দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন !

ফজল। যে-টা কেতাবে পড়েছ সেই দৃষ্টান্তই দিলেম, নইলে বুঝবে কিরূপে ? তা' ছাড়া তোমরা ত' হিন্দু-ঘেঁসা।

আশ। (জনান্তিকে তমিজকে) এ-মিঞা ভাঙে ত' মচকায় না। এক কথার আর জবাব।

হানিফ। যা'র যেটা ভাল সেটাকে ভাল বলতে হ'বে না—অনুসরণ করতে হ'বে না ? নীছক গোঁড়ামি কোন বিষয়েই ভাল নয়। আপনার মনে যা'ই থাক্, মুখ দিয়ে ভাল ভাবেরই প্রকাশ হ'য়ে গেছে।

তমিজ। দেখুন হাজি-সাএব, এ-ডাক্তারকে আমার বিবি জন্মাতে দেখেছে, ন্যাংটো-বেলায় তাকে কোলে নিয়ে নিজের পেটের ছেলের মতন নাড়াচাড়া করেছে। বিবির কাছে আব্দুলও যে-রকম, এই ডাক্তারও সেই রকম। ছেলের কাছেও মায়ের পর্দ্দা রাখতে হয় না কি ? আর সে-ছেলে যে কী রত্ন তা ত' জানেন না।

ফজল। যাই হ'ক্, সে পুরুষ-মানুষ ত' বটেই, তা'র ওপর হিন্দুর ছেলে—বিধর্ম্মীর বা অধর্ম্মীর ছেলে।

আশ। তা' যদি বলেন, যদি উমাপদবাবুকে বা তাঁ'র ছেলেকে অধর্ম্মী বলেন, তা' হ'লে বলব, আপনার ধর্ম্মজ্ঞান নেই। মাপ করবেন হাজি-সাএব, স্পষ্ট কথায় কষ্ট নেই।

হানিফ। আমি আরও বলব, যে আপনি মুখে ইস্লাম ইস্লাম করেন, কিন্তু ইস্লাম যে কী তা' আপনি বোঝেন না বা বুঝতে চেষ্টা করেন না। হিন্দুর স্কুলে পড়ে আমার অন্ততঃ এইটুকু জ্ঞান হয়েছে যে, সত্য মানুষের প্রধান ধর্ম্ম, তা সে মুসলমানই হ'ক্, খ্রীষ্টানই হ'ক্ বা হিন্দুই হ'ক্। স্পষ্ট কথা বলি ব'লেই লোকে আমায় মুখফোঁড় বলে, কিন্তু সত্য কথা স্পষ্ট বলাই ভাল।

তমিজ। তা' ছাড়া আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক। আমাদের বাড়ীর ভেতর কলও নেই, পায়খানাও নেই। কাজেই আমাদের বাড়ীর মেয়েরা ঘাটে যেতে বাধ্য। যাক্, আর এ সকল কথার কাজ নেই, ডাক্তারদাদা এসে পড়ে-

ছেন। হানিফ, ডাক্তারবাবুর বাইসিকেলটা ছায়ায় রেখে দে, আর ওষুধের ব্যাগটা ভেতরে পাঠিয়ে দে।

(হানিফের প্রস্থান এবং বাইসিকেল লইয়া বিভূতির সহিত পুনঃপ্রবেশ)

বিভূ। কি হ'য়েছে তমিজ-ভাই? আব্দুল বল্লে, বৌ-দির অসুখ—পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে।

তমিজ। হ্যাঁ দাদাবাবু, কিন্তু আমরা কিছু বুঝ্তে পার্‌ছি নে। রুগী নিজেও কিছু বোঝাতে পার্‌ছে না। চল, দেখ্‌বে।

(তমিজ ও বিভূতির প্রস্থান)।

ফজল। এ-ডাক্তারটি ত' নেহাৎ ছোক্‌রা। হালে পাস্ ক'রে বেরিয়েছে বোধ হয়! এঁর ফী কত?

আশ। মানে ভিজিট কত করে'? আমাদের কাছে ইনি ভিজিটের টাকা নেন্ না। কেবল ওষুধের দামটা নেন্, তাও অনেক কষ্টে নিতে রাজী করান হ'য়েছে।

ফজল। তা' হ'লে ওঁর ব্যবসা চল্‌বে কিরূপে?

আশ। ওঁদের ব্যাবসা পরের উপকার করা। জমিদারের ছেলে, পয়সার ত' অভাব নেই। ওঁদের খেয়েই আমরা মানুষ।

হানিফ। শুন্‌ছেন ত' হাজি-সাএব? যে-হিন্দুর এ-রকম মহানুভবতা, আমাদের প্রতি এইরূপ ব্যবহার, তাঁকে মান্‌ব না, তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা বা বন্ধুতা কর্‌ব না, তাঁর গোলাম হ'য়ে থাক্‌ব না ত' কা'র কাছে গোলামী কর্‌ব, কাকে মেনে চল্‌ব, কার সঙ্গে আত্মীয়তা, বন্ধুতা কর্‌ব?

ফজল। তবু সে হিন্দু। যদি হিন্দুর তাঁবেদারী কর্‌বে, হিন্দুর গোলামী কর্‌বে, প্রাণ ভরে' হিন্দুর গুণকীর্ত্তন কর্‌বে, তা' হ'লে মুসলমান হ'য়ে জন্মেছিলে কেন? হিন্দুর কাছেও যারা জেনানার পর্দ্দা রাখে না, তাদের মুসলমান বলে' পরিচয় দেওয়াও বিড়ম্বনা।

আশ। ঐ যে বল্লুম স্পষ্ট কথায় কষ্ট নেই। কথাটা যদি কড়া মনে হয় হাজি সাএব, মাপ কর্‌বেন। আপনার কথা শুনে মনে হয়, যে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দিনরাত ঝগড়া লড়াই হয়, এই আপনার ইচ্ছে। আর কিছু না হ'ক, জমিদারের সঙ্গে লড়াই করে' চাষী প্রজা কি কখনও টি'কতে পারে? যা'র জমি থেকে দুমুটো নিয়ে পেট চালাতে হয়, তার সঙ্গে লড়াই কর্‌লে যে জমিটুকুও হাত-ছাড়া হয়ে যাবে। তখন পেট চালাব কি করে? ছেলেপিলে শুদ্ধ শেষে কি না খেয়ে মারা যাব?

ফজল। জমি হাতছাড়া হবে কেন? লাঠির জোর থাকলে কে কার জমি কাড়ে?

আশ। এটা ত' মগের মুলুক নয়। আদালত আছে, পুলিশ আছে, সরকার আছে, আইন-কানুন আছে।

ফজল। সরকার ত' এখন আমাদের হাতে বললেই হয়, কারণ, বাঙ্গালাদেশ মুসলমানপ্রধান বলে মন্ত্রিমণ্ডলীর অধিকাংশই আমাদের সম্প্রদায়ের লোক।

হানিফ। মন্ত্রীরা ত' পক্ষপাতিত্ব কর্‌তে পারেন না, হিন্দুর অনিষ্ট করে' মুসলমানের ইষ্ট সাধন করতে পারেন না। গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য একরকম বিধান এবং লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য অন্য-রকম বিধান করতে পারেন না। ন্যায়-সঙ্গত কাজ করতে তাঁরা ন্যায়তঃ, ধর্ম্মতঃ বাধ্য। সংখ্যাধিক্য বশতঃ তাঁরা গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য অধিকসংখ্যক চাকরীর ব্যবস্থা করতে পারেন, তাও উপযুক্ত লোক পেলে। বলুন ত' শিক্ষা হিসাবে হিন্দুসমাজ কি গরিষ্ঠ নয়? তা' ছাড়া কাউন্সিলে ভোট নিতে হয় এবং মন্ত্রিদের উপর লাটসাহেব আছেন। লাটসাহেব অন্যায় হতে দেবেন কেন?

ফজল। তুমি যে এঁচোড়ে পেকে গেছ—সকল বিষয়েই পণ্ডিত!

হানিফ। জ্ঞান উপার্জ্জন ত' আমাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ নয়।

ফজল। সে জ্ঞানে লাভ কি যাতে বিধর্ম্মীর পদলেহন করতে হয়?

হানিফ। ধর্ম্মের অজুহাত কেন? আমাদের বাদশা ত' ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী। লাটসাহেবরা ত' খ্রীষ্টান। তা' বলে কি তাঁরা হিন্দু-মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন? আপনার সব কথারই গোড়ায় গলদ। যা' বলেন, যুক্তি বা নজীরের দ্বারা তার সমর্থন করুন না। দুই-এ দুই-এ চার এটা যেমন সত্যি, আপনার কথা কি সেই রকম সত্যি? আমি যা' বলি তাই সত্যি, তাই মেনে চল এ কথা বল্‌লে চল্‌বে কেন? শত্রুর ভালকে ভাল বললে কি তার পদলেহন করা হয়? সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করতে হলে ভালকে ভাল বলতেই হবে।

ফজল। তোমরা আমাকে অপমান করছ।

আশ। কেঁদে জিতলে হবে কেন হাজি সাএব। অপমানের কথা কি বলা হ'ল?

হানিফ। তর্ক করলেই কি অপমান করা হয়? তর্ক না করলে আমাদের কোথায় ভুল হচ্ছে এবং কি যুক্তিদ্বারা আমাদের ভ্রমসংশোধন করবেন, সেটা আপনি স্থির করবেন কিরূপে? তবে যদি আপনি যুক্তিপ্রদর্শনে নারাজ হন, সে আলাদা কথা। যাক্, ঐ ডাক্তারবাবু আসছেন, খবরটা নেওয়া যাক।

(বিভূতি ও তমিজের প্রবেশ)

আশ। রুগী কি রকম দেখলে দাদা?

বিভূ। পেটের যন্ত্রণা খুব আছে। এক দাগ ওষুধ খাইয়ে এলুম; মনে হয় তাতেই কমে' যাবে। আমি আধ ঘণ্টা বস্‌ছি। যদি আধ ঘণ্টার মধ্যে না কমে ওষুধ বদলে দেবো।

ফজল। ডাক্তারবাবু কি এইখানেই পাকাপাকিভাবে ব্যবসা আরম্ভ করবেন?

বিভূ। সেটা এখনও definitely settled হয় নি। আপনাকে ত' চিন্‌তে পার্‌ছি না। এখানে কি-কাজে এসেছেন?

ফজল। আমি একজন ধর্ম্মযাজক। গ্রামে গ্রামে mission work করে বেড়াই।

(একটি পিতলের কলসী লইয়া আব্দুল চলিয়া যাইতেছে)

বিভূ। আব্দুল! কলসী নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস এখন?

আব্দুল। (দাঁড়াইল) বাজারে যাচ্ছি কাকাবাবু।

তমিজ। এ কলসীটা আমাদের কোন কাজে লাগে না। একটি লোক এই রকম একটা কলসী খুঁজছিল; বাজারে আজ তাঁকে কলসীটা দেখাবার কথা ছিল। তাই আব্দুল ওটা বাজারে নিয়ে যাচ্ছে।

বিভূ। আব্দুল এখন গেলে চল্‌বে না। ওকে আমার সঙ্গে যেতে হ'বে, না গেলে ওষুধ আন্‌বে কে? কলসী যদি দেখাতেই হয়, পরে দেখালে হ'বে। আব্দুল, মায়ের কাছে বস্‌গে যা। পেটের যন্ত্রণা কি-রকম থাকে, দশ-পনের মিনিট পরে আমাকে এসে বল্‌বি। (আব্দুলের প্রস্থান)

জীবন-কাকাবাবু আসছেন যে।

(জীবন প্রবেশ করিলেন এবং ফজল ব্যতীত সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল)

আশ ও তমিজ। নমস্কার কাকাবাবু!

বিভূ। কাকাবাবু হঠাৎ এখানে?

জীবন। বসো, বসো, আমি এই বস্‌ছি। শুনলেম আব্দুলের মায়ের অসুখ, তাই খবর নিতে এলাম। তুমি ত' দেখলে—কী রকম?

বিভূ। পেটে বড় যন্ত্রণা হচ্ছিল। একটু জ্বরও হয়েছে—বোধ হয় due to irritation, এক dose ওষুধ দিয়েছি, কী ফল হয় দেখবার জন্য বসে' আছি।

জীবন। এ মৌলুবী-সাএবকে ত' চিন্‌তে পারছি না।

বিভূ। ইনি একজন মুসলমান missionary, গ্রামে গ্রামে mission work করে' বেড়ান।

জীবন। আদাব, মৌলুবী-সাএব!

ফজল। আদাব, আমি হাজী।

জীবন। বেশ, বেশ! আগে কখন মুসলমান missionary দেখেছি বলে' ত' মনে হয় না। যাই হ'ক এখানে ক'দিন এসেছেন? ক'দিন থাকবেন?

ফজল। তিন দিন হ'ল এসেছি। কাল গ্রামান্তরে চলে' যাব।

(আব্দুলের প্রবেশ)

আব্দুল। (জীবনকে নমস্কার করতঃ) মা ঘুমিয়ে পড়েছেন কাকাবাবু।

বিভূ। বাঁচলেম। ঐ ওষুধটাই চল্‌বে। আব্দুল, ঘণ্টাখানেক বাদে খবর নিয়ে আমাদের বাড়ী আস্‌বি। আমি ওষুধ তৈয়েরী করে' দোবো। যদি থাকে ত' একটা শিশি বেশ সাফ করে' নিয়ে যাবি। কাকাবাবু, আমি এখুন যাচ্ছি।

জীবন। যদি কোন urgent case দেখবার দরকার না থাকে, তা' হ'লে একটু বোসো, এক-সঙ্গেই যাওয়া যাবে। যখন এসে পড়েছি, পাড়ার খবরাখবর নিয়ে যাওয়া যাক।

তমিজ। দিদিমণি কেমন আছেন, কাকাবাবু?

জীবন। মেয়ে ভাল আছে। বিভূর কল্যাণেই সে বেঁচে গেছে।

তমিজ। খোদা বাঁচিয়ে রাখুন। আপনার ওপর দিয়ে একটা ঝড় ব'য়ে গেল।

জীবন। ঝড় বলে' ঝড়! এবারে চাষের অবস্থা কেমন? দেখে ত' ভালই মনে হচ্ছে।

তমিজ। এখনও পর্য্যন্ত ভালই। কিন্তু না আঁচালে ত' বিশ্বাস নেই। গত সনেও ত' চাষ বেশ হয়েছিল, কিন্তু এক বান এসে সব নষ্ট করে' দিলে।

আশ। আচ্ছা দাদাবাবু, এই বান হয় কেন বল্‌তে পার? তোমরা ত' মানুষের রোগ ধরে' সারিয়ে দাও ওষুধ দিয়ে; পৃথিবীর রোগ ধরা যায় না?

জীবন। পৃথিবীর, অন্ততঃ এ-দেশের রোগ আমরা কতকটা ধরেছি। কিন্তু চিকিৎসা যে সরকারের হাতে। সরকার একদিকে সুবিধা করতে গিয়ে অপর দিক চিন্তা না করে' এমন কতকগুলো কাজ করে' ফেলেছেন, যা'র জন্য প্রতি বৎসর এক যায়গায় না এক যায়গায় বন্যা হচ্ছে।

তমিজ। ভাবুন দেখি গেল বছর কী কাণ্ডটা হ'য়ে গেল! গাঁয়ের ভদ্দর-লোকেরা, বিশেষ বড়বাবু—আমাদের এই দাদাবাবুর বাবা আর আপনি, যদি সাহায্য করে' না বাঁচাতেন, তা' হ'লে চাষারা সব মারা যেত। বাড়ী-ঘর পড়ে, ধান-কলাই ভেসে গিয়ে, চাষ নষ্ট হ'য়ে চাষাদের যে অবস্থা হ'য়েছিল, আপনারা না থাকলে তাদের চিহ্নও থাকৃত না।

আশ। আবার তা'র ওপর মড়ক। জলে সব পচে' অখাদ্যি-কুখাদ্যি খেয়ে বাড়ী বাড়ী এমন ব্যারাম সুরু হ'ল, যে কে কার মুখে জল দেয় তা'র ঠিক নেই। আপনারাই ত' গামলা গামলা সাগু বার্লি বেঁধে এনে যুগিয়েছেন। আপনাদের ঋণ কি কেউ কখন শোধ করতে পারব, না পারবে?

জীবন। চাষাদিগকে বাঁচিয়ে রাখা যে দরকার। চাষী না থাকলে চাষ করে কে? লোকের খাদ্যসংস্থান হয় কিরূপে?

ফজল। আপনি যে বল্‌লেন সরকার-এর কাজের দোষে বন্যা হয়, তা'র মানে কি, বাবুজি?

জীবন। মানে—রেলের লাইন, মোটরের রাস্তা, পুল, কালভার্ট। এই সকলের ফলে স্বাভাবিক জলপথ কোথাও বা বন্ধ হ'য়ে গেছে, কোথাও বা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হ'য়ে গেছে। পুল বেঁধে এবং সে-গুলোকে রক্ষা করবার জন্য ক্রমাগত পাথর ফেলে ফেলে নদীর পেট বুজিয়ে দিয়েছে। পদ্মা, গঙ্গার মত নদীতেও চড়া পড়ে' গেছে। যেখানে Hardinge Bridge হয়েছে সেখানে পদ্মার অবস্থা আগে কি-রকম ছিল এবং এখন কি-রকম হয়েছে, আর দিন দিন কি-রকম হচ্ছে নজর করেছেন কি? নদীর গভীরতা নষ্ট হ'লে তা'তে বেশী জল ধরে না, কাজেই যখন বর্ষার জল বা পাহাড়ের জল প্রবল বেগে নামে, সে-জল নিকাশ হ'বার পথ থাকে না। ফলে নদীর পাড় উপছে জল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং বন্যার সৃষ্টি হয়। জল যখন ভীষণ বেগে আসে, হাজার বাঁধ বাঁধলেও বাধা মানে না। Government টাকা খরচ করে' স্থানে স্থানে বাঁধ বাঁধেন এবং সে-গুলো বজায় রাখবার চেষ্টাও করেন, কিন্তু প্রকৃতির বেগ রোধ মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। এই রেল-টেল যখন ছিল না তখন চারিদিকেই স্বাভাবিক জলপথ ছিল। সেই জলপথ বন্ধ হওয়াতেই দেশের এই দুর্দ্দশা হচ্ছে। ব্রহ্মপুত্রের মত এতবড় নদী, তা' দিয়েও পূর্ণমাত্রায় জলনিকাশ হয় না।

ফজল। ব্রহ্মপুত্রের উপর কি পুল আছে?

জীবন। আমি যতদূর জানি, নাই। কিন্তু যে-সকল ছোট নদী ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হয়, তা'দের ওপর ত' পুল আছে। কতকগুলো ছোট নদী আছে যা'দের অন্য বড় নদীর জলে বা পাহাড়ের জলে পুষ্টিসাধন হয়, আর তা'রা আবার সেই জল অন্য বড় নদীতে সরবরাহ করে। পুল আর রেল-লাইনের জন্য সেই ছোট নদীগুলো মজে' আসছে; তা'রা আর আগেকার মত জল বইতে পারে না, কাজেই বড় নদী-গুলোর অর্থাৎ যে যে নদীতে তা'রা জল সরবরাহ করে তা'দের জলও কমে' গেছে, স্রোতও কমে' গেছে। স্রোতের বেগ যদি প্রবল থাকে এবং তা'র মুখ বন্ধ ও পার্শ্ব প্রতিহত না হয়, তা' হ'লে নদী মজে না। যদি এক পাশে চড়া পড়ে, অন্য পাশে জলপথ প্রশস্ত ও গভীর থাকে।

ফজল। যদি রেলপথ বা মোটরগাড়ীর রাস্তা না থাকে, ব্যবসা-বাণিজ্য চলে কি করে'?

জীবন। ব্যবসা-বাণিজ্য কি আগে চলত না? এখনও দেশের ভিতর জলপথে কত মাল আমদানী-রপ্তানি হয়। ভারতবর্ষ থেকে ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে রপ্তানি এবং সে-সকল দেশ থেকে ভারতবর্ষে মাল আমদানী হয় কিরূপে? রেল পথ ত' inland trade-এর জন্যে।

ফজল। নৌকা বা ষ্টীমার যোগে মাল আমদানী-রপ্তানি

করতে কত সময় লাগে বুঝতে পারেন ত'? এই দেখুন না এখন রেলগাড়ীর কল্যাণে চেরাপুঞ্জীর প্রায় গাছপাকা কমলা-লেবু (যা'কে সাধারণতঃ সীলেটের লেবু বলা হয়) ক'লকাতায় বসে' খেতে পান। আগে কাঁচা লেবুগুলো আসতে এক-মাসের বেশী সময় লাগত, আর তা'র কত যে পচে' যেত তার ঠিক থাকত্না। দুটো জিনিষের স্বাদে যে কত তফাৎ তা'ত বোঝাবার প্রয়োজন নাই। পদ্মার মাছ দু'বেলা ক'লকাতায় চালান হচ্ছে আর টাট্‌কা খেতে পাওয়া যাচ্ছে। এক সহর থেকে অন্য দূরবর্ত্তী সহরে যেতে আগে কত সময় লাগত, আর এখন কত অল্প সময় লাগে।

জীবন। আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এ-দেশের ফসলই এর ধনসম্পত্তি। প্রচুর ফসল-উৎপাদনের জন্য যদি এখানকার রেলপথ বা মোটরের রাস্তা ভেঙে দিতে হয়, আমার মতে তা'ও করা উচিত, পুলের ত' কথাই নাই। মনে করুন চাল, পাট প্রভৃতি জিনিষ যা' অল্পদিনে নষ্ট হয় না, তা'ত এখনও অনেক পরিমাণে নদীপথে আমদানী, রপ্তানি করা হয়। একটু সময় বেশী লাগে ত' ক্ষতি কি? কমলালেবু আর মাছটা আগে, না পেটের ভাতটা আগে? এখন ত' এ-দেশের চাল, পাট প্রভৃতি বিলেতে রপ্তানী হয়। জলপথ এইরূপে বন্ধ হ'বার পূর্ব্বে এ-দেশের জমির যেরূপ উর্ব্বরতা ছিল তা' যদি ফিরে আসে এবং সেই পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হয়, আর বন্যায় চাষ না ভাসে, তা' হ'লে এক ভারতবর্ষ থেকে সমস্ত পৃথিবীর অন্নের সংস্থান হ'তে পারে। তদ্ভিন্ন রপ্তানির ফলে দেশে যে খাদ্যের অভাব হয়, তা'ও হয় না। বলুন ত', ভারতবর্ষের সকল লোক কি একবেলাও পেট ভরে' খেতে পায়? দু'বেলার ত' কথাই নেই। কারণ কী? জমির উৎপাদিকা-শক্তি কমে' গেছে। আগে যে-জমিতে প্রায় বিশমণ ধান জন্মা'ত, তা'তে পাঁচ মণও জন্মায় না এখন।

কমল। জমির উর্ব্বরতা কমল কি রেল আর মোটরের জন্য?

জীবন। নিশ্চয়। তা'ছাড়া পুল তয়েরী করবার সময় যদি নদীর bed বাঁচিয়ে, অপ্রশস্ত না করে' অর্থাৎ অনেকটা দূর থেকে পুলের পত্তন করে, তা' হ'লেও নদী সহজে মজে না। শুধু নদী নয়, যেখানে বিল-টিল আছে, তা'র মাঝখান দিয়ে রেলের লাইন চালিয়ে জলের চলাচল বন্ধ করা হয়। কোন কোন যায়গায় Culvert নির্ম্মাণ করে' দেয় বটে, কিন্তু সেগুলো এমন সঙ্কীর্ণ যে জলনিকাশ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হয় না। স্বাভাবিক জলপ্রণালী বন্ধ হ'লে জমির উৎপাদিকা-শক্তির হ্রাস হয়, বন্যার উদ্ভব হয়।

কমল। সার দিলেও জমির উর্ব্বরতা বাড়ে। আজকাল কত ভাল-ভাল সার তৈয়ারী হচ্ছে—আমেরিকা প্রভৃতি দেশ থেকে আমদানী হচ্ছে। শুনেছি হাড়ের গুড়ো থেকে বেশ ভাল সার হয়।

জীবন। ফুঁকো দিয়ে গাইএর দুধ টেনে নিলে যেমন দুধটাও বিষাক্ত হয় এবং তার দুগ্ধ-প্রদান-শক্তিরও অবসান হয়, এই রকম সার দিলে জমি ও ফসলের অবস্থাও তদ্রূপ হয়।

কমল। তা' হ'লে আপনার মতে রেলপথ, মোটরের রাস্তা আর পুলগুলো ভেঙে দেওয়া উচিত!

জীবন। যদি দেশের লোকের অনশন বা অর্দ্ধাশন বন্ধ করতে হয় এবং সেজন্য জমির উর্ব্বরতা-বৃদ্ধি প্রয়োজনীয় হয়, তা' হ'লে এ-সকল ভাঙাই উচিত। আর দেখুন, রেলপথ প্রভৃতি যে কেবল ব্যবসাবাণিজ্যের বা আপনার আমার যাতায়াতের সুবিধার জন্য নির্ম্মিত হয়েছে তা' নয়। এ-গুলো নির্ম্মাণ করবার একটি প্রধান উদ্দেশ্য প্রয়োজনমতে সৈন্য ও যুদ্ধের উপকরণ স্থান হতে স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া। Mobilization-এর সুবিধা ও সময়-সংক্ষেপ করা। যুদ্ধ বাঁধলেই রেলপথ প্রভৃতির সুবিধা বা utility বোধগম্য হবে। কিন্তু আমার মত এই যে, যদি পৃথিবীর লোক পেট ভরে' খেতে পায়, যদি তাদের স্বাস্থ্যহীনতা ও অর্থকৃচ্ছ্রতা না থাকে, এবং এই ত্রিবিধ অভাবে লোকের মনে স্বভাবতঃ যে অসন্তোষ ও অশান্তির সৃষ্টি হয় তা' জন্মাতে না পারে, তা' হ'লে যুদ্ধ বাঁধবার কোন কারণ থাকবে না। এই যে পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে তার মূলে আছে ঐ তিনটি কারণ।

বিভূ। কাকাবাবু বুঝি বঙ্গশ্রী পড়েন? এই বিষয় সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ বঙ্গশ্রীতে প্রকাশিত হয়েছে। আপনার সঙ্গে বঙ্গশ্রীর যথেষ্ট মতের মিল আছে।

জীবন। আমি সুরু থেকেই বঙ্গশ্রীর গ্রাহক এবং আর কিছু পড়ি না পড়ি এই প্রবন্ধগুলি মনোযোগের সহিত

পড়ি। আমার এ-সম্বন্ধে যে-idea হয়েছে তা' ঐ বঙ্গশ্রী পড়ে'। অবশ্য আমিও এ-বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা করেছি। আমার মতে বঙ্গশ্রী খাঁটি সত্য কথা লিখেছে এবং প্রত্যেকের ঐ প্রবন্ধগুলি পড়া উচিত। শুধু তাই নয়, আমাদের দেশের leaderদের সম্বন্ধে যে-সকল কথা মাঝে মাঝে বঙ্গশ্রীতে বেরিয়েছে, সে গুলিও ঠিক কথা। Leader-দের বক্তৃতা পড়ে'ও কার্য্যকলাপ দেখে' এবং পর্য্যালোচনা করে আমার এই ধারণা হয়েছে যে, তাঁরা সব idealist, অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। কোথাকার কী গলদের জন্ম দেশের এই বর্ত্তমান দুরবস্থা, কী ভাবে কাজ করলে এই দুরবস্থা দূর হতে পারে, সেটা তাঁরা ধরতে পারছেন না। একটা constructive programme এ পর্য্যন্ত তাঁদের মাথা থেকে বেরল না।

ফজল। বঙ্গশ্রী কি বাবুজি? একখানা কেতাব?

জীবন। আপনি বাঙলা ভাষা জানেন হাজিসাএব? বঙ্গশ্রী একখানি বাংলা মাসিক পত্রিকা।

ফজল। আমি বাংলা ভাষা শিক্ষা করেছি এবং লিখতে পড়তেও পারি, বুঝতেও পারি।

জীবন। কল্‌কাতার ১১ নং ক্লাইভ রো Metropolitan Insurance House-এ এখন বঙ্গশ্রীর একটা Office হয়েছে। আবশ্যক হ'লে সেখানে কিম্বা Intally Market-এর সামনে Metropolitan Printing and Publishing House-এ খবর নেবেন। এই হানিফ, আব্দুল, এরাও ত' পড়বে বলে' আমাদের বাড়ী থেকে বঙ্গশ্রী আনে। না রে?

আব্দুল। আজ্ঞে হাঁ।

জীবন। পড়িস্ ত?

হানিফ। আজ্ঞে হাঁ দাদাবাবু, আমরা দু'জনেই পড়ি। শুধু পড়ি না, তর্কবিতর্ক, আলোচনাও করি। চাচারাও শোনেন।

জীবন। হাজি-সাএব, ব্যবসা-বাণিজ্য বলুন, আর শিল্পকার্য্য, মানে industries বা manufacture যা'ই বুলুন, সবই ত' অবশেষে পেটের জন্য। এখন পৃথিবী যদি ফসল না দেয়, টাকা রোজগার যতই করুন, খেতে পা'বেন না। আগে চাষ, তারপর trade and industry. এই যে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা, তা'রও মূল কারণ ঐ উদরান্নের অভাব, স্বাস্থ্যহীনতা ও অর্থের অনটন। বড় বড় পাণ্ডাদের মনে যা'ই থাকুক, অন্নসংস্থান থাক্‌লে সাধারণ লোক অর্থাৎ mass কখনও লাঠি ধরে' দাঙ্গা কর্‌তে বা লুঠতরাজ কর্‌তে যায় না। যা'রা চাষবাস করে' খায় তা'রাই প্ররোচনার বশে লাঠি ধরে। পাণ্ডারা তা'দিগে নাচান বটে, কিন্তু লাঠিও ধরেন না বা দাঙ্গা-হাঙ্গামার ত্রিসীমায় থাকেন না। চাষাদের সঙ্গে গুণ্ডা বদমায়েসগুলো মিলিত হয় বটে, কিন্তু তা'রা ক'জন?

ফজল। Trade and industry ত চাই। এই দেখুন না ঢেঁকিতে চাল তয়েরী—কত সময় লাগে এবং কত অল্প-পরিমাণে হয়, কিন্তু কলে কত অল্প সময়ে, অথচ কত অধিক পরিমাণে হয়।

জীবন। কলে কত ব্যাওয়া-বাল্‌তীর জীবিকা-অর্জ্জনের একটি প্রধান পথ বন্ধ হ'য়ে গেছে। আর একটি কল হচ্ছে Beri-Beri, যা'র নাম পর্য্যন্ত কিছুকাল আগে কেউ জান্‌ত না। কলের চাল আর কলের তেল স্বাস্থ্যের সর্ব্বনাশ করছে। বাবাজি, কি বল?

বিভু। Beri-Beri-র epidemic হ'লে আমরা কলের চাল এবং তেল খেতে মানা করি। ঢেঁকিছাটা চালে যে একটা ভিতরকার বা inner আবরণ থাকে, কলের সাদা ধবধবে চালে সেটা থাকে না, মানে একটা nitrogenous part বেরিয়ে যায়। অধিকাংশ কলের তেলে Beri-Beri-র পোষক কোন কোন পদার্থ মিশ্রিত। এই রকম চাল ও তেল খেলে systemটা Beri-Beri-র আক্রমণের উপযোগী হ'য়ে পড়ে।

ফজল। আচ্ছা, চালের কথা ছেড়ে দিন। ধরুন কাপড়। কলে তয়েরী না হ'লে, হাতে বোনা কাপড়ে কি দেশের অভাব পূর্ণ হয়?

জীবন। যখন এদেশে কাপড়ের কল ছিল না বা বিলেত থেকে আমদানী হ'ত না, তখন কি লোক উলঙ্গ থাক্‌ত? তা'ছাড়া তাঁতে-বোনা কাপড়ের পরমায়ু কত ভাবুন দেখি! একখানা মিলের কাপড় টেনে কসে' ছ'মাসের বেশী টেকে না, কিন্তু একখানা তাঁতের কাপড় বুকে হাঁটু দিয়ে ব্যবহার কর্‌লেও অনায়াসে এক বছর টিক্‌ত। অবশ্য কাপড়ের কল খুব useful এবং আমি তা'র বিরুদ্ধবাদী নই। কিন্তু এ-ও ঠিক যে, যখন কাপড়ের কল ছিল না, ধরুন মুসলমান বাদশা-

দের আমলে, লোকে খেয়ে পরে বাঁচত। ইতিহাস বলে যে, নবাব সায়েস্তাখাঁর আমলে বাঙ্গালা-দেশে টাকায় আটমণ চাল বিক্রী হ'ত। কেমন, নয়রে হানিফ?

হানিফ। আজ্ঞে হাঁ দাদাবাবু!

জীবন। এখন টাকায় আট সেরও পাওয়া যায় না। আমরা মিলের কাপড় পরি, কারণ, তাঁতের কাপড় মোটা, খস্‌খসে। আমি ঐ মিহি কাপড়, যা' দেশী বলে' পরিচিত, তা'র কথা বল্‌ছি না—সে-কাপড় আটপোরে হিসেবে পর্‌তে পারে এমন অবস্থাপন্ন লোক আজকাল খুব কম। আমরা হ'য়ে পড়েছি বিলাসী, সৌখীন। আমরা চাল-ডাল দেশ থেকে বের করে' দিয়ে এসেন্স, সাবান, আয়না, চিরুণী প্রভৃতি সখের জিনিষ বিদেশ থেকে আমদানী করি।

ফজল। তা'হলে আপনি ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানার বিরোধী?

জীবন। তা' কিসে বুঝলেন হাজিসাএব? তর্কের সুবিধার জন্য ভুল করবেন না। ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যতিরেকে মনুষ্য-সমাজ চলতে পারে না। কল-কারখানা ভিন্ন সমাজের সর্ব্বপ্রকার চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়—মানে আধুনিক সমাজ। কিন্তু এমন কল চাই না, যেখানে প্রস্তুত খাবার জিনিষ খেয়ে মানুষ ব্যাধিগ্রস্ত হয়। কাপড়ের কল করুন, কাগজের কল করুন, লোহা-ইস্পাতের জিনিষ গড়বার জন্য কল করুন—এ-গুলো আবশ্যক। সাবানেরও কল করুন, কারণ, সাবান আজকাল লোকে নিত্যপ্রয়োজনীয় মনে করে। সাজি-মাটী বা অন্য ক্ষার দিয়ে সিদ্ধ করে' কাপড়-কাচা ইদানীং উঠে গেছে। সর-ময়দা দিয়ে গা' পরিষ্কার করাও উঠে গেছে। ভাল করে' সরষের তেল মাখলে এবং সরের তৈলাংশ দ্বারা গাত্র-চর্ম্মের ও সাধারণতঃ দেহের যে উপকার হয় সে-কথা লোকে আর খেয়াল করে না। আসল কথা, আমি চাই চাষের প্রাধান্য, জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি, বন্যা নিবারণ।

ফজল। আর রেল-পথ, রাস্তা, পুল? চাষের সুবিধার জন্য সে-গুলিকে ভাঙতে চান?

জীবন। যদি সে-গুলোকে বজায় রেখে চাষের প্রাধান্য বজায় রাখা সম্ভব হয়, জমির উৎপাদিকা-শক্তির হ্রাস না হয়, বন্যার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়, তা' হ'লে ভাঙতে হ'বে কেন? কেউ কি সে-বিষয়ের চিন্তা করেন, না সে-দিকে নজর দেন? চিন্তা কর্‌লে, গবেষণা করলে, একটা উপায়ের যে আবিষ্কার হয় না, এ-কথা বিশ্বাস কর্‌তে পারি না। এত বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত, scientist জন্মাচ্ছেন, এ-বিষয়ে গবেষণা ক'রবার জন্য Government কি কা'কেও নিযুক্ত করেছেন? Government-এর চাড় না হ'লে কি বড় বড় কাজ হয়? এই ধরুন কল, ধরুন মোটরকার—এখানে নির্ম্মাণ করা অসম্ভব কখনই নয়। Government যত্ন করলেই হয়। সবই ত' বিদেশ থেকে আমদানী কর্‌তে হয়। বিদেশে স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ত' সে-গুলো নির্ম্মাণ করেন না, মানুষই করে। অন্য দেশে যে-কাজ সম্ভব, এ-দেশে তা' অসম্ভব হ'তেই পারে না। এখন ত' Government দেশীয় মন্ত্রীদের হাতে, তাঁ'রাই কি কোন চেষ্টা করেন, না এ-সকল বিষয়ে চিন্তা করেন? তাঁ'রা election-এর সময় যে-সকল প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট-সংগ্রহ করেন সে-গুলো পালন কর্‌তেও ভুলে যান।

বিভূ। বড় বেলা হ'য়ে যাচ্ছে কাকাবাবু। আব্দুলের মায়ের জন্য ওষুধ তয়েরী ক'রে দিতে হ'বে।

জীবন। চল বাবা, উঠি। তোমার ত' cycle আছে।

বিভূ। আমি আপনার সঙ্গে যা'ব। আব্দুল, তুই ত' খানিক পরে ওষুধ আন্‌তে যাবি, আমার cycle চ'ড়ে যাস্।

জীবন। (দণ্ডায়মান হইয়া) হাজিসাএব, এখন আপনার স্বধর্ম্মী মন্ত্রীর সংখ্যাই ত' অধিক। আপনি missionary, আপনার খাতির সর্ব্বত্র। মন্ত্রিমণ্ডলীকে বাগিয়ে দেশের আসল কাজগুলো করিয়ে নিন্ না—যা'তে লোকের আর্থিক দুরবস্থা দূর হয়, লোকে পেট ভ'রে খেতে পায়। আমার কাছে হিন্দুও যা' মুসলমানও তাই, আর হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরের লোক যা'দিগে অনাচরণীয় এবং আজকাল হরিজন বলা হয় তা'রাও সেই শ্রেণীভুক্ত। মুসলমানের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হ'লে হিন্দুর অবস্থারও উন্নতি হ'বে, অন্য জাতের অবস্থাও ফিরবে। আপনার mission কি তা' কি আমি বুঝি না? যদিও পল্লীগ্রামে বাস করি, দেশের সকল খবর কিছু কিছু রাখি—অবশ্য খবরের কাগজের দৌলতে। আপনার mission work-এর ফলে দেশের ঘোরতর অনিষ্ট হ'বে, অথচ কোন সম্প্রদায়ের মঙ্গল হ'বে না। এটাও খেয়াল রাখবেন হাজিসাএব—যে-হিন্দু প্রায় সাড়ে সাত শত বৎসর পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থেকেও তা'র ধর্ম্ম, তা'র কৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে না হ'ক, অধিকতর অংশে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছে, আপনার mission যা'ই হ'ক, ইংরেজ-রাজত্বে সে-হিন্দু সমূলে ধ্বংস হ'বে না। আদাব। [ক্রমশঃ



মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

'আমেরিকা' বলিলে আমরা সাধারণতঃ আমেরিকান বা মার্কিনী যুক্তরাষ্ট্রকেই বুঝিয়া থাকি। 'আমেরিকা ইংরেজের পক্ষে' এই বাক্যের দ্বারা মার্কিন যুক্তরাজ্যের সহযোগিতা বা সাহায্যের কথাই বুঝাইতেছে। আজ সমগ্র সভ্য জগতের দৃষ্টি মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের দিকে যত আকৃষ্ট, তত আর কোনও রাষ্ট্রের দিকে নয়। ইংরেজের দৃষ্টি এই দিকে, কারণ এই মহাযুদ্ধে এই দেশ শুধু তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহযোগী নহে, তাহার সর্ব্বপ্রধান সাহায্যকারীও বটে। এই অতি ক্ষুদ্র ও দ্বৈপায়ন দেশের পার্শ্বে বা পশ্চাতে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র দণ্ডায়মান না থাকিলে এই রুদ্র যুদ্ধে প্রচণ্ড পরাক্রমে—তীব্র তেজে অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হইত কি না সে বিষয়ে আমাদের মনে সংশয় জাগে। ইংলণ্ডের প্রধান শক্তি তাহার অধিকৃত সুমহান্ সাম্রাজ্য, তাহার নিজের দেশে তেমন কোন সম্পদ নাই বলিলে ভুল বলা হয় না। এই ক্ষুদ্র দ্বীপের অধিবাসীরা বিধাতার বিস্ময়কর বিধানে বা সৌভাগ্যবশে বিশাল সাম্রাজ্য অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অবশ্য এই সৌভাগ্যের অন্যতম কারণ এই জাতির দুর্জ্জয় সাহস ও অধ্যবসায় এবং রাজনৈতিক কৌশল। অন্যদিকে প্রকাণ্ডকায় আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র অতুলনীয় নৈসর্গিক ঐশ্বর্য্যসমূহের অফুরন্ত ভাণ্ডার স্বরূপ। এই ঐশ্বর্য্যের সাহায্যেই সে বড় হইয়াছে।


স্বভাব শোভায় সমৃদ্ধ ইয়োসেমাইট উপত্যকা

এই যুক্তরাজ্যের জন্মকাহিনী অতি বিচিত্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে যেদিন ক্রীষ্টোফার কলোম্বাস উত্তর আমেরিকার উপকূলে পদার্পণ করেন সেদিনকে যুগান্তর-আনয়নকারী দিন বলিলে ভুল হইবে না। কলোম্বাস ভারতবর্ষের সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন। তৎকালে য়ুরোপীয়দিগের অন্তরে ভারত ও তাহার রত্নরাজি সম্বন্ধে নানা-প্রকার অপরূপ ধারণা বিদ্যমান ছিল। আমেরিকার বৃক্ষশ্যাম উপকূল রেখা দেখিয়া কলোম্বাস ভাবিলেন তিনি ভারতের পূর্ব্বোপকূলে পৌঁছিয়াছেন। পোত হইতে অবতরণ করিয়া তিনি সেই নবাবিষ্কৃত দেশের বেলাভূমিতে স্পেনের বিজয়-পতাকা প্রোথিত করিলেন। যদিও তিনি নিজে জেনোয়াবাসী ইটালিয়ান, কিন্তু স্পেনের রাজ্ঞী ইজাবেলার সাহায্যে বা পৃষ্ঠপোষকতায় সেই অসমসাহসিক অভিযানে নিযুক্ত হইয়া অজানিতকে জানিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। কলোম্বাস আমেরিকাকে ইণ্ডিয়া বা ভারত ভাবিয়াছিলেন বলিয়াই তথাকার আদিম অধিবাসীদিগকে 'ইণ্ডিয়ান' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছিলেন। পরে ভুল ভাঙ্গিয়া গেল বটে কিন্তু সেই 'ইণ্ডিয়ান' নাম রহিয়াই গেল। আশ্চর্য্য ভুল বটে। সেই দীর্ঘদেহ, তাম্রবর্ণাঙ্গ জাতি শ্বেতাঙ্গ কলোম্বাস ও তাহার অনুচরগণের প্রতি বিস্ময় ও বিভ্রম বিশিষ্ট দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহাদের জীবন-প্রবাহ যুগের-পর যুগ যে পথে অবাধে বহিয়া চলিয়াছে এইবার সেই পথ রুদ্ধ হইতে চলিল, সেদিন তাহারা বোধ হয় একথা ভাবিতে পারে নাই। কে জানে কোথা হইতে গিয়া এবং কতকাল ধরিয়া তাহারা এই বিশাল দেশের বক্ষে বন্য পশুপক্ষী শিকারের সাহায্যে যাযাবর জীবন যাপন করিতেছিল—বিচিত্র চর্ম্মাবাস রচনা করিয়া তাহাতে অস্থায়ীভাবে অবস্থান করিতেছিল, বহু বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পরস্পর ভীষণ সংঘর্ষে রত রহিয়া কাল কাটাইতেছিল? অনেকে মনে করেন, উত্তর আমেরিকাবাসী রেড-ইণ্ডিয়ানরা এশিয়া হইতে বেরিং প্রণালী পার হইয়া আমেরিকায় প্রবেশ করিয়াছিল। ইহাদিগের শরীরে

মোঙ্গোলীয় শোণিত বিদ্যমান বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস। আমেরিকার উত্তরাংশের অধিবাসী অপেক্ষা মধ্যাংশ ও দক্ষিণাংশের অধিবাসীরাই সভ্যতার পথে অধিক অগ্রসর হইয়াছিল। মধ্য-আমেরিকাবাসী আজটেক ও মায়াজাতির দ্বারা যে বিচিত্র সভ্যতা জন্মলাভ করিয়াছিল আমরা মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে তাহার নিদর্শন আজিও দেখিতে পাই। দক্ষিণ আমেরিকার ইনকারা সভ্যতা-সৌধ পেরু, বলিভিয়া, চিলি প্রভৃতি রাজ্যের বক্ষে গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা আজটেক ও মায়া-সভ্যতা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নততর বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

য়ুরোপীয়দিগের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী যুক্তরাজ্যের অবস্থা আমরা কল্পনার সাহায্যে অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারি। সহস্র সহস্র বর্গমাইল ব্যাপী বিরাট দেশ হাজার হাজার নদ-নদী প্রান্তর কান্তার বুকে লইয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রগাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন ছিল। অফুরন্ত উর্ব্বরতার উৎস দিগন্তব্যাপী বিরাট মাঠ অনন্ত আকাশের নীচে নীরবে ঘুমাইতেছিল। কোন কৃষক হলস্কন্ধে আসে নাই তাহার সেই যুগযুগান্তরব্যাপী নিবিড় নিদ্রা ভাঙ্গাইতে। অনন্ত রত্নরাজি বা খনিজসমূহ বক্ষে লইয়া অভ্রভেদী শুভ্র-শীর্ষ শৈলমালা যেন কাহার আগমন-প্রতীক্ষায় নিস্তব্ধভাবে যুগযুগান্তর দাঁড়াইয়াছিল। যেন রূপকথার অপরূপ রূপবতী রাজকন্যা কোন নির্দ্দয় দৈত্যের মরণকাঠির স্পর্শে যুগের পর যুগ সুপ্তিঘোরে মগ্ন ছিল। পরে একদিন য়ুরোপ হইতে একদল সম্পদ-পিপাসু দুঃসাহসী শ্বেতাঙ্গ আসিয়া জীয়নকাঠির স্পর্শে তাহাকে জাগাইল। দূর দক্ষিণে অপার পাথার পরিবেষ্টিতা আর এক রাজকন্যা এইরূপই ঘুমাইতেছিল, পরে অসমসাহসিক য়ুরোপীয় অভিযাত্রীদের দ্বারা স্পৃষ্ট সঞ্জীবন মায়াদণ্ড সেই ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেয়। বলা বাহুল্য আমরা অষ্ট্রেলিয়ার কথা কহিতেছি। অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইবার প্রধান কারণ ছিল ইহাদিগের অভ্যন্তরে অরক্ষিত স্বর্ণরাশি। য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে উত্তর আমেরিকায় স্পেনীয়রা এবং দক্ষিণ আমেরিকায় পর্ত্তুগীজগণ সর্ব্বপ্রথম প্রভাব প্রসারিত করিতে প্রয়াস করিয়াছিল।

পূর্ব্বোত্তর উপকূলে বিরাজিত ত্রয়োদশটি রাষ্ট্রই অন্যান্য রাষ্ট্র অপেক্ষা প্রাচীনতর। ইংলণ্ড হইতে আগত 'পিলগ্রিম ফাদার' আখ্যায় অভিহিত পিউরিটানগণ ১৬২০ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যের পূর্ব্বোপকূলে পদার্পণ করেন। রোম্যান ক্যাথলিকদিগের অত্যাচারের জন্য এই চরমপন্থী প্রোটেষ্টান্টদল স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের দ্বারা স্বধর্ম্ম স্বদেশ অপেক্ষা বড় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। এই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত দেশে আসিয়া তাঁহারা দুইটি প্রতিকূল প্রবাহের সম্মুখীন হইলেন বলা চলে। প্রথমটি নানাপ্রকার হিংস্র পশু—দ্বিতীয়টি এই দেশের আদিবাসী রেডইন্ডিয়ানগণ। হিংস্র প্রকৃতিতে সভ্যতাশূন্য মানুষ এবং আরণ্য পশু প্রায়ই সমান, এই সত্য তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। নবাগন্তুকদিগের সহিত আদিবাসীদের সজ্ঘর্ষ বৎসরের পর বৎসর চলিতে লাগিল। সিয়ক্স, ইরোকুয়োইস, য়্যাপাচে, পুয়েব্লো প্রভৃতি রেডইন্ডিয়ান সম্প্রদায়গুলি ক্রমশঃ পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে পিছাইতে বাধ্য হইল। কিছুকাল সজ্ঘর্ষ চালাইবার পর এই সকল সম্প্রদায় শক্তিশালী শ্বেতাঙ্গদিগের সহিত সজ্ঘর্ষের ব্যর্থতা অনেকটা উপলব্ধি করিল এবং অনেকেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও বশ্যতা স্বীকার করিল। শ্বেতাঙ্গগণ অপেক্ষাকৃত বর্ব্বর ও অনুন্নতভাবাপন্ন প্রদেশগুলি আপনারা লইল এবং নিবিড় অরণ্যাকীর্ণ ও পর্ব্বতপূর্ণ অঞ্চলগুলি আদিবাসীদিগের বাসস্থান হইল। আরিজোনা, দক্ষিণ ডাকোটা, মণ্টানা ও ইয়াকলোহোমা এই জিলাগুলিতে আদিবাসীরা অবস্থান করিতে লাগিল।

এই বিভাগ হইবার বহু পূর্ব্বেই পিলগ্রিম ফাদারগণ যুক্তরাজ্যের পূর্ব্বোত্তর প্রান্তবর্ত্তী জিলাটিতে আপনাদিগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাঁহারা সুদূরবর্ত্তী স্বদেশকে স্মরণ করিয়া এই রাষ্ট্রটির নাম দিয়াছিলেন নিউ ইংলণ্ড। এই রাষ্ট্রটি প্রায় ১ শত ৩০ বৎসর ব্যাপিয়া বৃটিশ পতাকা বক্ষে বহন করিয়াছিল এবং বৃটেনের শাসনাধীন বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। অবশেষে উক্ত আদিম ত্রয়োদশ রাষ্ট্রের অধিবাসীরাই বৃটেনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রস্তুত হইয়া অতুলনীয় শৌর্য্য সাহস দর্শনপূর্ব্বক বিশ্ববাসীর বিস্মিত দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল। এই বিরোধিতা বা বিদ্রোহের প্রধান কারণ বৃটেন কর্ত্তৃক আমেরিকানদের নিকট হইতে গৃহীত অন্যায় কর বা শুল্ক। বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ও জনসাধারণ বা পার্লিয়ামেণ্ট বৃটেনের স্বার্থ-সাধন বা সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য আমেরিকানদের কল্যাণকে বার বার বলি প্রদান করিতে কণামাত্রও কুণ্ঠা অনুভব করিত না।

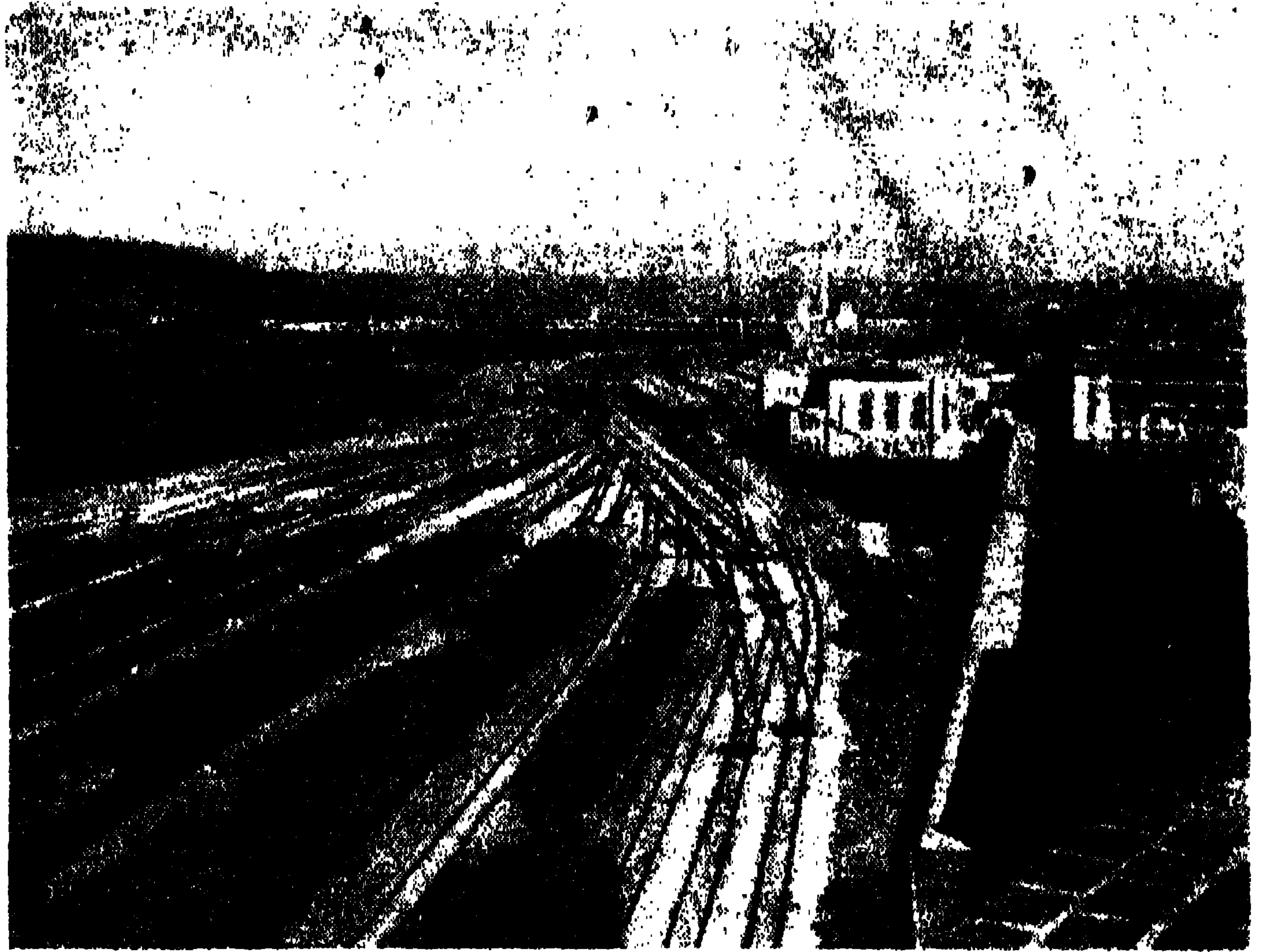
এই স্থানে ইহাও উল্লেখ প্রয়োজন যে, ক্রমশঃ য়ুরোপের অন্যান্য দেশের অধিবাসীরাও ভাগ্যপরীক্ষার জন্য এই নবাবিষ্কৃত মহাদেশে আগমন করিয়া ইহার জনসংখ্যা বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। আদিবাসী-অধ্যুষিত আরিজোনায় বহু স্পেনীয় প্রচারক প্রচার প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন করিয়াছিল। এই প্রচারকদিগের প্রচেষ্টায় আদিবাসীদের অনেকে খৃষ্টান হইয়াছিল। লুইসিয়ানা নামক রাষ্ট্রে বহু ফরাসী আসিয়া বাস করিয়াছিল। দক্ষিণস্থ আরিজোনায় এবং লুইসিয়ানায় আমরা আজিও স্পেনীয় ও ফরাসী প্রভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হই। এই প্রভাব অধিবাসীদের ভাষা, স্থাপত্য, পরিচ্ছদ এবং আচার-অনুষ্ঠানাদিতে অভিব্যক্ত। জার্ম্মান, নরউইজিয়ান, সুইড, ফিন, আইরিশ, ইটালিয়ান প্রভৃতি অন্যান্য য়ুরোপীয় জাতিরাও অসীম সাহস সহকারে বীচি-বিক্ষুব্ধ বারিধিবক্ষ অতিক্রম করিয়া ভাগ্যান্বেষণে এই সুদূর দেশে আসিয়াছে। একদিন একটি ওলন্দাজ জাহাজ ভার্জিনিয়া রাজ্যের বক্ষে প্রবাহিত জেমস্ নামক নদের উপর দিয়া আগাইয়া আসিল। এই জাহাজের বক্ষে ১৯ জন কৃষ্ণকায় নিগ্রো বিষাদ-মলিন মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়াছিল। সেই নিগ্রোগুলিকে বিক্রয় করিবার জন্য আনা হইয়াছিল। ইহাই আমেরিকার মনুষ্য ক্রয়-বিক্রয় প্রথার প্রথম প্রবর্ত্তন। এই ঘৃণ্যতম জঘন্যতম প্রথা আমেরিকায় অতি উৎকটভাবে প্রকটিত হইয়াছিল। এই নিবিড় কলঙ্ক কালিমাঙ্কিত নির্ম্মমতম প্রথা কত কর্কশ কলহ-কোলাহল, কত রক্তাক্ত সজ্ঘর্ষ, কত অশ্রু-নির্ঝরের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে?

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনের অধীনতা-বন্ধন হইতে বিমুক্ত

সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দেশ বলিয়া স্বীকৃত হইল। অবশ্য বহু দেশপ্রাণ সন্তান স্বাধীনতার জন্য আপনাদিগের জীবন স্মিতমুখে বিসর্জন করিয়াছিল। সেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের স্মৃতি যুক্তরাজ্যবাসীরা আজিও সসম্ভ্রমে পোষণ করিতেছে। যিনি এই সংগ্রামে নেতৃত্ব করেন সেই জর্জ ওয়াশিংটন সমগ্র জাতির পূজা চিরদিন প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই। ইংলণ্ডের অধীন নিউ ইংলণ্ড প্রভৃতি আদিম ত্রয়োদশ রাষ্ট্র ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া অষ্টচত্বারিংশৎ রাজ্যে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া একটি ফেডারাল জিলা এবং দুইটি টেরিটোরি রহিয়াছে। কানাডার নিকটবর্ত্তী তুষার-শীতল 'আলাস্কা' মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের অধীন অন্যতম রাজ্য এই সত্য অনেকেই জানেন। ইহা রুশিয়ার নিকট যুক্তরাজ্য ক্রয় করিয়াছিল। রুশিয়া তুষার-উষর বলিয়া এই মেরুমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী দেশটিকে অল্পমূল্যে বিক্রয় করিয়াছিল, কিন্তু যুক্তরাজ্যের সৌভাগ্যবশে সেই আলাস্কার প্রচুর স্বর্ণ বাহির হইয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগর বক্ষে বিরাজিত হাওয়াইয়ান দ্বীপাবলীও মার্কিন-যুক্তরাজ্যের অধীনস্থ রাজ্য।

এই বিরাট যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রগুলিকে মোটামুটি চারিটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। চিকাগো নগর এই চারি অংশের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বলিয়া ইহা অসাধারণ গুরুত্বের অধিকারী হইয়াছে। এই সহর মার্কিন-যুক্তরাজ্যের সুদূর প্রসারিত রেলপথসমূহেরও কেন্দ্রস্থল। কতকগুলি বড় নদ-নদী ও পয়ঃপ্রণালীও এই সহরকে কেন্দ্র করিয়া প্রবাহিত রহিয়াছে। চিকাগোর উত্তরাংশের অধিবাসীদের জীবিকার্জ্জনের প্রধান উপায় খনির কাজ, কারণ এই অংশে বিভিন্ন ধাতুর অসংখ্য খনি অবস্থিত রহিয়া এই বিশাল দেশের অতুলনীয় সম্পদের বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিতেছে। চিকাগোর দক্ষিণে যাহারা বাস করে তাহারা প্রধানতঃ চাষের সাহায্যে জীবিকার্জ্জন করে। পৃথিবীর মধ্যে মার্কিন-যুক্তরাজ্যেই সর্ব্বাধিক গোধূম উৎপন্ন হওয়ার কথা অনেকে জানেন। চিকাগোর দক্ষিণে প্রসারিত প্রদেশগুলিতে প্রবেশ করিলে অগণ্য গোধূম-ক্ষেত্র আমাদের নেত্রপথে পতিত হইবে। কার্পাস ও তামাক এই দুইটিও এই অঞ্চলগুলির প্রধান কৃষিজ পণ্যের অন্যতম বটে। চিকাগো হইতে পশ্চিমে আগাইয়া যাইলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পশুপালন-প্রতিষ্ঠানসমূহ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। প্রচুর চারণ-স্থান বিদ্যমান বলিয়াই পশুপালনই এই অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান কাজ হইতে পারিয়াছে। এই সকল পশুশালা 'র‍্যাঞ্চ' আখ্যায় অভিহিত।

যান্ত্রিক সভ্যতার যতই বিকাশ আমেরিকায় হইয়া থাকুক, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, এই দেশ এখনও কৃষিপ্রধান। অবশ্য কৃষি বলিলে আমরা শুধু গোধূমাদি শস্য যেন না বুঝি, সর্ব্বপ্রকার কৃষিজ পণ্যের কথা চিন্তা করি। ভারতবর্ষও মার্কিন-যুক্তরাজ্যের মত কৃষিপ্রধান দেশ, কিন্তু ঐ দেশের মত কৃষি-বিষয়ক উন্নতি এই দেশে কোথায়? ইহার কারণ আমরা আমেরিকানদের ন্যায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীগুলি অবলম্বন করি নাই। আমেরিকানরা বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে চাষ করিয়া যেরূপ প্রচুর ফসল উৎপন্ন করে, আমরা গতানুগতিক পন্থায় সেরূপ করার কল্পনাও করিতে পারি না। আমেরিকার কৃষিবিষয়ক গবেষণা বা অনুসন্ধান এ সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য আমাদিগের গোচরীভূত করিয়াছে। জমির উর্ব্বরতা ও শস্যদায়ী শক্তি বাড়াইবার জন্য নানা-প্রকার বিজ্ঞানসম্মত সার আমেরিকায় আবিষ্কার করার কথা আমরা জ্ঞাত আছি। শুধু কৃষি নহে, পশুপালন সম্বন্ধেও মার্কিন-যুক্তরাজ্যবাসীরা উন্নততর প্রণালী উদ্ভাবিত করিতে সমর্থ হইয়াছে।



সিনসিনাটি-ইউনিয়ন টার্মিনাস ষ্টেশনের পুরোভাগে প্রসারিত লৌহ-বর্ত্মাবলী

আমরা 'নিউ ইংলণ্ড' নামক ষ্টেটের বোষ্টন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নগরগুলিতে গমন করিলে 'পিলগ্রিম ফাদার্স' আখ্যায় অভিহিত পিউরিটানগণের বংশধর-দিগকে এখনও দেখিতে পাইব। এই সকল অপেক্ষাকৃত প্রাচীন সহরই মার্কিনী সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হইয়া রহিয়াছে বলিলে ভুল হয় না। তবে এই সকল শান্ত সুন্দর কৃষ্টি-কেন্দ্রগুলি ক্রমশঃ বাণিজ্যপ্রধান হইয়া পড়িয়া কোলাহল-মুখরিত কল-কারখানায় পূর্ণ হইতেছে। কৃষি এবং পশুপালন প্রথমে উত্তর-পূর্ব্বস্থ রাষ্ট্রগুলিতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, পরে ক্রমশঃ তথা হইতে পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত রাষ্ট্রগুলিতে প্রসারিত হইয়াছে। যাহারা ধর্ম্মের জন্য অপার পারাবার ও দুর্গম গিরি-অরণ্য অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে শঙ্কা বা সঙ্কোচ অনুভব করে নাই, আমেরিকার ঔপনিবেশিকরা সেই অসমসাহসিক পুরুষদের সন্তান। এই সকল লোকের পক্ষে সকল দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়া কৃষিকাজ ও পশুপালনের জন্য রাষ্ট্র হইতে রাষ্ট্রান্তরে গমন করা স্বভাবসম্মত কার্য্যই হইয়াছিল সন্দেহ নাই। এক প্রকার উচ্চাশা ও উদ্যম

অনুগামী দুর্দ্দমনীয় বেগ বা আবেগ তাহাদিগকে স্বচ্ছেই সন্তুষ্ট হইতে দেয় নাই। এই পায়োনীয়ার বা অগ্রবর্ত্তিগণকে পদে পদে বিপদের সহিত সংগ্রাম করিয়া আগাইয়া যাইতে হইয়াছিল এ বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নাই। সেই বিপদের বহু রোমাঞ্চকর কাহিনী আমরা জানি। আরণ্য পশু, বন্যভাবাপন্ন প্রচণ্ডপ্রকৃতি রেড-ইণ্ডিয়ানগণ ছাড়া ভূমিকম্প, সাইক্লোন বা তুফান, ব্লিজার্ড নামধেয় উন্মাদিনী ঝঞ্ঝা, দুঃসহ গ্রীষ্ম, নানাপ্রকার বিষাক্ত সরীসৃপ ও কীট-পতঙ্গ সেই অদম্য উদাসীন অগ্রবর্ত্তিগণের আগাইবার পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু বাধা দিতে পারে নাই। তৎকালে তাহারা যে ভাবে জীবন যাপন করিতেন তাহা অনেকটা যাযাবর জাতিদের অনুরূপ বলিলে অন্যায় হইবে না।

তাঁহারা বনানীর বক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'হাট' বা কাষ্ঠ-কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে কয়েক বৎসর ধরিয়া বাস করিতেন এবং ঐ সময় উহার পার্শ্বস্থ ভূমি-সমূহ লইয়া কৃষিকার্য্যে রত রহিতেন। তাহার পর তাঁহারা হয় তো সেই স্থানে স্থায়ীভাবে রহিতেন অথবা উর্ব্বর উপত্যকা বা ঊষর প্রান্তরগুলির উপর দিয়া পশ্চিমে আগাইয়া যাইতেন। অনেকে এইরূপে অগ্রসর হইয়া অবশেষে প্রশান্ত মহাসমুদ্রের তটদেশে উপনীত হইলেন। প্রশান্ত মহাসাগরের অসীম জলরাশি তাঁহাদের অশান্ত ও অক্লান্ত ভ্রমণসমূহের অবসান ঘটাইল। অবশ্য সমষ্টিগতভাবে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে অগ্রসর সেই অভিযানের অবসান এখনও ঘটে নাই। উচ্চাশামত্ত নরনারী আজিও আতলান্তিক-তীর হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরের দিকে ধীরে ধীরে আগাইয়া চলিয়াছে। সেই জন্যই আমেরিকানরা কতকটা যাযাবর জীবন আজিও যাপন করিয়া থাকে। মনোনিবেশ না করিলে এই যাযাবরত্ব উপলব্ধি করা যায় না। সত্য কথা বলিতে এই দেশ কোন য়ুরোপীয়ের স্বদেশ নহে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষরা ভাগ্যান্বেষণের অথবা লুণ্ঠন বা শোষণের জন্যই এখানে আসিয়াছিল। এই অন্বেষণ ও শোষণ এখনও চলিতেছে। স্বার্থসাধনের জন্যই শ্বেতাঙ্গগণ আজ রেড ইণ্ডিয়ানদিগের দেশকে আপনাদের স্বদেশ বলিয়া আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে।

যাঁহাদের প্রকৃত স্বদেশ ইহা, তাঁহারা আজ একান্ত উপেক্ষিতভাবে পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে এবং যাহারা শুধু সম্পদরাশি শোষণের জন্য বা রত্নরাজি লুণ্ঠনের জন্য দুর্দ্দান্ত দস্যুদলের ন্যায় আসিয়াছিল তাহারাই হইয়া পড়িল সর্ব্বেসর্ব্বা। ইহা বৃটিশজাতির পক্ষে গৌরবের বিষয় বটে যে, তাহারা আদিবাসীদের উপর স্পেনীয় ও পর্ত্তুগীজগণের ন্যায় অত্যাচার করে নাই। বিশেষ স্পেনীয়গণ যে অবর্ণনীয় অত্যাচার মেক্সিকো প্রভৃতি মধ্য-আমেরিকার অন্তর্গত দেশে করিয়াছিল তাহা স্মরণ করিলে সর্ব্ব শরীরে রোমাঞ্চ সঞ্চারিত হওয়া স্বাভাবিক। আদিবাসীদিগকে বিলুপ্ত করিয়া ইহারা চাহিয়াছিল আপনাদের অপ্রতিহত আধিপত্য এই সকল দেশের বুকে ব্যাপ্ত করিতে। মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রে আগত বৃটিশরা আদিবাসীদের প্রতি স্পেনীয়দিগের ন্যায় নির্দ্দয়তা প্রদর্শন করে নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। সত্যের খাতিরে আমাদিগকে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, বৃটিশ প্রভৃতি জাতিরা পরে রেড ইণ্ডিয়ানদিগকে সভ্যতর করিবার জন্য প্রযত্ন করিয়াছিল এবং সেই প্রযত্ন কোন-কোন সম্প্রদায়ের বেলায় সাফল্যও প্রসব করিয়াছিল। আদিবাসীদের সকল সম্প্রদায়ই একই প্রকৃতিবিশিষ্ট নহে। এমন কয়েকটি সম্প্রদায় আছে যাহারা আপনাদিগের প্রাচীন নিষ্ঠুর আচার-অনুষ্ঠান ও জীবনযাপন-প্রণালী কিছুই পরিত্যাগ করে নাই। অন্যদিকে কতিপয় সম্প্রদায় য়ুরোপীয়দিগের সংসর্গে আসিয়া সহজেই প্রাচীন প্রণালী পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহাদিগকে অনুসরণ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিল। শ্বেতাঙ্গ ও রেড ইণ্ডিয়ান শোণিতের সংমিশ্রণ কয়েক প্রকার বর্ণসঙ্কর সম্প্রদায়ও সৃষ্টি করিয়াছিল। মার্কিন-যুক্তরাজ্যে এমন পরিবারও রহিয়াছে, যাহাদের ভিতর শ্বেতাঙ্গ য়ুরোপীয়, কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান (নিগ্রো) এবং তাম্রবর্ণাভ রেড ইণ্ডিয়ান এই ত্রিবিধ শোণিত-ধারার সঙ্গম সঙ্ঘটিত হইয়াছে। শ্বেতাঙ্গ ও রেড ইণ্ডিয়ান-শোণিতের সম্মিলন হইতে যাহারা সম্ভূত হয় তাহাদিগকে 'মেষ্টিজো' আখ্যায় অভিহিত করা হইয়া থাকে।

মানুষ সহজে ত পূর্ব্বপুরুষানুসৃত পন্থাসমূহ পরিত্যাগ করিতে চাহে না, এই সত্যের নিদর্শন আমরা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই। আমেরিকার আদিবাসী-রাও শ্বেত-সভ্যতাকে বরাবর সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছে। পিতৃপুরুষের বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানগুলিকে মানুষ কিরূপ নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া থাকে তাহার দৃষ্টান্ত আমরা আমাদের প্রতিবেশী সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসীদের জীবনেই প্রকটিত দেখি। আপনাদিগের বিশ্বাসকে সকলেই শ্রেষ্ঠতর বলিয়া মনে করে এই সত্য সংশয়াতীত। মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রে আদিবাসীদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য বহু বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। তবে একটা সত্য আমরা আমেরিকায় গমন করিলে সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারি যে, যুক্তরাজ্যের শ্বেতাঙ্গ নেতারা মুখে যতই সাম্য ও মৈত্রীর উদার বাণী উচ্চারণ করুন না কেন, রেড ইণ্ডিয়ান ও নিগ্রোদের সহিত ব্যবহারে তাঁহারা অসাম্য বা বৈষম্যের পরিচয় পদে পদে দিয়া থাকেন। আদিবাসীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শিক্ষার জন্য অনেক প্রকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু সমস্তই শ্বেতাঙ্গদিগের জন্য স্থাপিত বা সম্পাদিত ব্যবস্থা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যে কারণেই হউক রেডইণ্ডিয়ানদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছিল সন্দেহ নাই। অনেকের আশঙ্কা ছিল এই তাম্রবর্ণ সম্প্রদায়সমূহ অল্পদিনের মধ্যেই বিশ্বের বক্ষ হইতে নিঃশেষে বিলুপ্ত হইবে, কিন্তু সুখের বিষয় পরবর্ত্তী আদমসুমারী প্রমাণিত করিল এই আশঙ্কা সত্য নহে, মধ্যে হ্রাস হইলেও রেডইণ্ডিয়ান নরনারীর সংখ্যা বর্ত্তমানে বর্দ্ধমান হইতেছে। তবে এ বিষয়ে সংশয় নাই যে, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশে (আফ্রিকা হইতে আনীত অতীতের ক্রীতদাসগণের বংশধর) যে সকল নিগ্রো নরনারী বাস করে তাহাদের ন্যায় উন্নতি বা বৃদ্ধি রেডইণ্ডিয়ানদের মধ্যে দেখা যায় না। ইহাতে প্রমাণিত হয় কৃষ্ণকায় নিগ্রোগণ তাম্রবর্ণশালী রেডইণ্ডিয়ান-দিগের অপেক্ষা প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রামে অধিকতর সক্ষম। প্রতিকূল প্রবাহসমূহের সহিত সংগ্রাম করিয়া টিকিয়া থাকিবার শক্তি কৃষ্ণকায় কাফ্রীদের শুধু অসাধারণ নয়, বিস্ময়কর। আমরা দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলিতে ভ্রমণ করিলে

অসংখ্য নিগ্রো নরনারীকে কার্পাস, তামাক ও ইক্ষুক্ষেত্রসমূহে শ্রমিকের কার্য্যে নিযুক্ত দেখিব। শ্রমিকরূপে নিগ্রোরা যে দক্ষতা দেখাইয়াছে রেডস্কিনরা তাহা কোনদিনই দেখাইতে পারে নাই। আমাদের বিশ্বাস রেড ইণ্ডিয়ানদের আকৃতি-প্রকৃতি বন্ধনবিহীন আরণ্য যাযাবর জীবনের অধিক উপযোগী। কৃষিক্ষেত্রে বা কলকারখানায় কুলির কঠিন কাজ করা ইহাদের স্বভাবের অনুকূল নহে। চর্ম্মের বর্ণের সহিত মানুষের স্বভাবের ও শীত-গ্রীষ্মাদি সহিবার শক্তির সম্পর্ক আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। উত্তর অপেক্ষা দক্ষিণেই রেডস্কিনদের সংখ্যা অধিক।

আমরা দক্ষিণস্থ ভর্জ্জিয়ায় গমন করিলে অ-শ্বেত জাতিদের অধিকৃত কার্পাস চাষ করিবার বা অন্যান্য কৃষিজ পণ্যপ্রসূ ক্ষেত্রসমূহও দেখিতে পাইব। এই শ্বেতেতর জাতিদের অধিকাংশই কৃষ্ণাঙ্গ অর্থাৎ আফ্রিকান বা কাফ্রী। দক্ষিণাঞ্চলের কৃষিজপণ্যের মধ্যে কার্পাসই প্রধান। পৃথিবীতে যত কার্পাস উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ৬০ ভাগ আমেরিকায় জন্মায়। কার্পাসের পরেই ফল উৎপন্ন করার কথা উল্লেখযোগ্য। ইহাও বিশেষ লাভজনক ব্যবসা। দক্ষিণের রাষ্ট্রসমূহের অধিবাসী নিগ্রোদিগের মধ্যে বিশেষ শিক্ষিত ব্যক্তিও অনেক রহিয়াছে। আমরা আমেরিকান নিগ্রোদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত বিশিষ্ট প্রতিভার পরিচায়ক নানা প্রকার কার্য্যের কথা অবগত আছি। বহু বিভাগেই তাহারা শ্বেতাঙ্গদিগের অনুরূপ শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছে। শ্বেতেতর জাতিদের শিক্ষার জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

ক্ষুদ্রকায় ইংলণ্ডের অধিবাসীদের পক্ষে বিপুলবপু আমেরিকায় শস্যপ্রসূ ক্ষেত্রসমূহ এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পশুপালনাগারগুলি কল্পনা করা কঠিন। হিমাদ্রি হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রসারিত বিশালকায় ভারতবর্ষের সন্তান আমরা, আমাদের পক্ষে ইহা কঠিন না হইলেও স্বাধীনতার লীলাস্থলী আমেরিকার আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অনুষ্ঠিত সকল লোকহিতকর ব্যাপক ব্যাপারগুলি উপলব্ধি করা সহজ নহে। প্রবল দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত করিয়া হেমচন্দ্র তাঁহার অপূর্ব্ব উদ্দীপনাপূর্ণ 'ভারতসঙ্গীত' নামক জাতীয় গীতিতে মার্কিন যুক্তরাজ্যকে লক্ষ্য করিয়াই কহিয়াছেন—

"হোথা আমেরিকা নব-অভ্যুদয়
পৃথিবী গ্রাসিতে করিছে আশয়!"

হেমচন্দ্র যখন এই জাতীয়-জাগৃতির গীতি রচনা করেন তখন আমেরিকা বর্ত্তমানের ন্যায় উন্নত অবস্থায় উপনীত হয় নাই। তবুও কবি ভাব-নেত্রে তাহার কার্য্যাবলীর ভিতর বিশ্ব-বিজয় বাসনা-বহ্নির দীপ্তি দেখিয়াছিলেন। আমরা আমেরিকার যুক্তরাজ্যে গমন করিলে অসংখ্য সমৃদ্ধ সহর দেখিতে পাইব। কোন সহরে কৃষিজীবি নরনারীর বাস, কোন সহরে শিল্পীদের অবস্থান-স্থান, কোন কোন নগর বাণিজ্যপ্রধান। আবার এমন নগর আছে যাহাকে কেন্দ্র করিয়া খনির কাজ অনুষ্ঠিত হইতেছে। জিলাগুলিকেও কৃষিপ্রধান, শিল্পপ্রধান, বাণিজ্যপ্রধান ও খনিপ্রধান—এই চারিভাগে বিভক্ত করা চলে। সহরসমূহের মধ্যে শাসন-কেন্দ্র ওয়াশিংটনকে বিশেষ সুন্দর বলিয়া আমাদের মনে হয়। ওয়াশিংটন সুন্দরতর সহরসমূহের অন্যতম হইলেও নিউইয়র্ক বৃহত্তম সে বিষয়ে সংশয় নাই। সারা পৃথিবীর সহরসমূহের মধ্যে নিউইয়র্ক নগরকে বৃহত্ত্বহিসাবে দ্বিতীয়স্থান দেওয়া যায়। বিশ্বের বৃহত্তম সহর লণ্ডন। ওয়াশিংটন রাজধানী হইলেও দেশের ধনকুবেরগণ এবং বড় বড় ব্যবসায়ীরা নিউইয়র্কে বাস করিয়া থাকে। য়ুরোপের সহরগুলি অপেক্ষা আমেরিকার নগরগুলি অধিকতর আধুনিকতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। প্রগতি যাহাকে বলা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাহার পরাকাষ্ঠা দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেখানে 'প্রাচীন' বা 'অতীত' বলিয়া কিছু নাই, যেখানে সবই নূতন সেখানে এইরূপই স্বাভাবিক।



চিকাগো নগরের রাজপথের উপর দিয়া রেলগাড়ী যাইতেছে

আমরা নিউইয়র্ক নগরে প্রবেশ করিলে (এবং আমেরিকার অন্যান্য অধিকাংশ নগরেও) গ্রীক, রুশ, ইহুদী প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়কে স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য অব্যাহত রাখিয়া অবস্থান করিতে দেখিব। দেখিয়া বুঝিব আমেরিকা একটি মাত্র জাতি বা সম্প্রদায়ের দেশ নহে—ইহা বহু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বদেশে পরিণত। নিউইয়র্কের একটি পল্লী 'লিটল ইটালী' আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। এ পাড়ার প্রায় সকলেই ইটালীয়ান। এই মহানগরের একটি পাড়া চীনা-টাউন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই পাড়ায় কেবল চীনাদের বাস। আমরা এই সহরের অপর এক পাড়ায় যাইলে নিগ্রো নরনারী ও বালক-বালিকাদল আমাদের মনে বিষুবরেখা-বিলম্বিত আফ্রিকার কথা স্মরণ করাইবে। মানুষ আজিও স্বজাতির সান্নিধ্যই

আন্তরিকভাবে কামনা করে—এই সত্যের নিদর্শন আমরা নিউইয়র্ক নগরে পদে পদে পাইব। এই স্বজাতিপ্রীতি জীবমাত্রেরই স্বভাবধর্ম্ম। পশু পক্ষী কীট-পতঙ্গ সকলেই ইহার পরিচয় প্রদান করে। য়ুরোপের বিভিন্ন জাতি ভাগ্যান্বেষণে স্বদেশ হইতে আসিয়া এই দেশে বাস করিতেছে বটে, কিন্তু তাহাদের কেহই সেই সুদূর স্বদেশকে বিস্মৃত হয় নাই—নিউইয়র্ক প্রভৃতি মার্কিনী নগরগুলি এই বার্ত্তা আমাদিগকে তারস্বরে বিজ্ঞাপিত করে।

পেন্‌সিলভানিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি বিশিষ্ট রাষ্ট্র। ইহা ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় চার্লস উইলিয়ম পেনকে প্রদান করেন। এই রাষ্ট্রটির একটি বৈশিষ্ট্য প্রচুর খনিজ সম্পদ। এই সম্পদের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যে সকল য়ুরোপীয় আসিয়াছে তাহাদিগের মধ্যে আইরিশ, হাঙ্গেরিয়ান এবং ইটালীয়ান অধিক বলিয়া আমরা এখানে প্রধানতঃ এই তিনটি জাতির নরনারীই দেখিতে পাই। পেনসিলভানিয়া, ইণ্ডিয়ানা, ওহিয়ো ও ইলিনোয়িস এই চারিটি রাষ্ট্রে কয়লা ও লৌহখনির কাজ ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। যে অঞ্চলে পাথর কয়লা নাই সেখানে লৌহ-খনির কাজ করা আদৌ সহজ হয় না। কয়লা থাকিলে লৌহ-প্রস্তর হইতে লৌহ নিষ্কাশিত করা সহজ হইয়া পড়ে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উন্নতি ও ঐশ্বর্য্য অতুলনীয় হইলেও স্থানে স্থানে দুঃখ-দারিদ্র্যের নিদর্শন আমরা দর্শন করি। মানুষ যতই চেষ্টা করুক সে দুঃখ-দৈন্যকে পূর্ণরূপে বা চিরদিনের জন্য বিদায় দিতে কখনও পারে না। কৃষি-প্রধান প্রদেশের তুলনায় খনিপূর্ণ অঞ্চলের অধিবাসীদের অবস্থা হীনতর বলিয়া আমাদের মনে হয়। যে সকল শ্রমিক খনির কাজ করে তাহাদিগকে অনেক সময় লগ-কেবিন বা কাষ্ঠনির্ম্মিত কুটিরে কষ্টপূর্ণ জীবন যাপন করিতে দেখা যায়। খনিগুলি সাধারণতঃ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অরণ্যের বক্ষে বিরাজিত। খনির কাজ সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করিবার জন্য বনের বৃক্ষগুলি কাটিয়া ফেলা প্রয়োজন হয়। যে গাছের গুঁড়িগুলি অবশিষ্ট থাকে কাষ্ঠ-কুটিরগুলির বেষ্টনীরূপে উহারা ব্যবহৃত হয় বলিলে ভুল হয় না। এক একটি খনি এক একটি বিরাট গহ্বর। এই গহ্বরের কোন-কোনটি প্রায় এক মাইল দীর্ঘ। গহ্বরগুলির গভীরতা এরূপ যে, অভ্যন্তরে যে সকল এঞ্জিন কাজ করে তাহাদিগকে উপর হইতে দেখিলে গুবরে পোকা চলিয়া বেড়াইতেছে বলিয়া মনে হইতে পারে। এরূপ বৃহৎ ও গভীর খনি পৃথিবীর অন্য কোন দেশে আছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ। মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় খনিজ সম্পদের অধিকারী অন্য কোন দেশে নহে, এই সত্য ও সংশয়াতীত। প্রায় সর্ব্বপ্রকার ধাতু বা খনিজ জিনিস এই দেশে জন্মায়। শিল্পের দিক দিয়াও ইহার শ্রেষ্ঠত্ব সকলেই স্বীকার করেন। এত পণ্য অন্য কোন দেশ প্রস্তুত করে না। অন্য দিকে কৃষিজ সম্পদেও ইহা অদ্বিতীয়। সর্ব্বপ্রকার সম্পদের আধার বা ভাণ্ডার বলিয়াই বৃটিশ, ফরাসী, ওলন্দাজ, স্পেনীয় ব্যতিরেকে মধ্য য়ুরোপ, রুশিয়া, বাল্টিক ও বল্কান রাষ্ট্রাবলীর লোকরাও দলে দলে এই দেশে আগমন করিয়াছে।

সর্ব্বজাতির মহাসম্মেলন স্বরূপ এই বিরাট দেশের কোন কোন সহরে আমরা ক্রোশিয়ান ও শ্লোভাক নারীদিগকে তাহাদিগের বর্ণ-বৈচিত্র্য বিশিষ্ট জাতির পরিচ্ছদ পরিয়া বয়ন-কার্য্যে ব্যাপৃত দেখিব। ইহারা স্বদেশীয় ভাষায় সঙ্গীত গাহিয়া বর্ণৈশ্বর্য্যশালী 'রাগ' বা কম্বল বুনিয়া থাকে। দেখিলে মনে হইতে পারে আমরা ক্রোশিয়া বা শ্লোভাকিয়ার কোন সহরে বা গ্রামে উপনীত হইয়াছি। স্থানে স্থানে আমরা হাঙ্গেরীয়ান বা মগ্যারার বালক-বালিকাকে প্রাঙ্গনে ক্রীড়া করিতে দেখিব। তাহাদের বেশ-ভূষা, কথাবার্ত্তা আমাদিগের অন্তরে দানিয়ুব-অভিষিক্ত হাঙ্গেরীর স্মৃতি উদ্রিক্ত করিবে সন্দেহ নাই। ঔপনিবেশিকরা সার্ব্বিয়ান বা বুলগেরিয়ান যাহাই হউক, প্রত্যেকেই যে ভাবে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিতেছে তাহা স্বতঃই আমাদিগের সম্ভ্রম জাগাইয়া তুলে। এই জন্যই এই যুদ্ধে আমরা আমেরিকানদের মধ্যেও মতভেদ দেখিতে পাইতেছি। যাহারা আমেরিকান কিন্তু জার্ম্মান, তাহাদের মন স্বতঃই স্বদেশীয়দিগের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইতেছে। বর্ত্তমান রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের শরীরে বৃটিশ শোণিতের পরিবর্ত্তে ইটালিয়ান বা জার্ম্মান শোণিত বিদ্যমান থাকিলে আজ আমরা ঘটনাপ্রবাহের পরিণতি অন্য রূপে দেখিতাম সন্দেহ নাই। রুজভেল্ট বংশ ওলন্দাজ ও বৃটিশ রক্তের সংমিশ্রণ হইতে সম্ভূত।

অনেকে উন্নততর অবস্থার সহিত পূর্ব্বের বাসগৃহগুলি পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন, সেই পরিত্যক্ত ভবনসমূহে পোলাণ্ড হইতে আগত পোল পরিবার সকল অবস্থান করিতেছে। দারিদ্র্যের জন্য দেশত্যাগ করিয়া বহু পোল আমেরিকায় আসিয়া বাস করিতেছে। পেন্‌সিলভানিয়ার প্রাচীন ওলন্দাজ সহরগুলিতে ঐরূপ পরিত্যক্ত গৃহ নিগ্রো শ্রমিকগণের দ্বারা অধিকৃত হইতে দেখা যায়। বহুদিন হইল যে সমস্ত ওলন্দাজ নৌ-বীরগণ পরলোকে গিয়াছেন তাঁহাদের বাসস্থল গৃহগুলি পড়িয়া রহিয়াছে। এইরূপ এক একটি ভগ্নপ্রায় অট্টালিকাকে আশ্রয় করিয়া বহু নিগ্রো পরিবার একত্র অবস্থান করিয়া থাকে। আমরা আমেরিকায় গমন করিলে শুধু ধন-কুবের বা লক্ষপতি দিগকেই দেখিব, এইরূপ ধারণা কেহ করিলে তিনি ভুল করিবেন। বহু দীন-দরিদ্র এ দেশেও রহিয়াছে। তবে পার্থক্য এই, আমাদের দেশের দরিদ্ররা অদৃষ্টের দোহাই বা দোষ দিয়া আপনাদের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে চেষ্টা করে কিন্তু এ দেশে তাহা নহে। ইহারা দারিদ্র্যকে অত্যন্ত ঘৃণা করে এবং প্রাণপণ প্রচেষ্টায় উহা দূর করিতে প্রযত্ন করিয়া থাকে। ইহার অন্যতম হেতু ভারতবর্ষ ত্যাগবাদের দেশ, অন্যদিকে আমেরিকা-প্রবল ভোগবাদের লীলাভূমি।

নিউইয়র্ক চিকাগো, ফিলাডেলফিয়া প্রভৃতি নগরগুলিতে 'স্কাইস্ক্র্যাপাস' আখ্যায় অভিহিত যেরূপ অভ্রচুম্বী বহুতলবিশিষ্ট সুবিশাল সৌধসমূহ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইবে পৃথিবীর অন্য কোথাও তাহা দৃষ্ট হয় না। যেন এক একটা ইমারতের হিমালয় দাঁড়াইয়া আছে। পেন্‌সিলভানিয়ার রাজধানী ফিলাডেলফিয়াকে 'কোয়েকার সিটি' বলা হয়। ইহা কোয়েকার নামক খৃষ্টীয় সম্প্রদায়েরদ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল। উইলিয়ম পেন কোয়েকার ছিলেন। এই সহরের 'চেষ্টনাট ষ্ট্রীট' নামক পথটির উত্তর পার্শ্বে প্রাসাদোপম প্রকাণ্ড অট্টালিকা শ্রেণী দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই সহরের 'আর্কষ্ট্রীট'

নামক রাস্তার ২৩০ নং বাড়িটি উত্তররাষ্ট্রবাসীর দৃষ্টিতে অসাধারণ গুরুত্বের অধিকারী। এই বাড়ীতেই বেটসি রস নাম্নী রমণী যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম জাতীয় পতাকাটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা জর্জ্জ ওয়াশিংটন (কংগ্রেসের সদস্য) সহকারিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া (১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে) নির্দ্ধারণ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের আর একটি বিশিষ্ট সহর বোষ্টন। ইহা ম্যাসাচুসেটস্ নামক ষ্টেটের রাজধানী। বোষ্টনের মনুমেণ্ট স্কোয়ার নামক স্থানে একটি গ্রানিট-গঠিত স্তম্ভ আছে। ইহা ২ শত ২০ ফিট উচ্চ। এই স্থানেই বিখ্যাত 'ব্যাটল অফ বাঙ্কারহিল' সংঘটিত হইয়াছিল। বৃটেনের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এই যুদ্ধই যুক্তরাজ্যবাসীর প্রথম উল্লেখযোগ্য ও সাফল্যমণ্ডিত প্রচেষ্টা। বোষ্টন শিক্ষা-কেন্দ্ররূপেও প্রসিদ্ধ।

ওয়াশিংটন নগরের ক্যাপিটল নামক ভুবন-মোহন ভবন বালুকাপ্রস্তর ও শুভ্র সুন্দর মর্ম্মরে নির্ম্মিত। এই ভবনেই এই দেশের প্রতিনিধিপরিষদ্ ও সেনেটের অধিবেশন হইয়া থাকে। ওয়াশিংটন অষ্টাচত্বারিংশৎ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত নহে। ইহা স্বতন্ত্র জিলা বলিয়া গণ্য হয়। তড়িতালোকে উদ্ভাসিত ক্যাপিটল দর্শকের অন্তরে অভূতপূর্ব্ব ভাবধারা সঞ্চারিত করা স্বাভাবিক। রোমের ক্যাপিটল মনে পড়িতে পারে, তবে উহা সাম্রাজ্য-বাদের প্রতীক এবং ইহাকে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের গৌরবস্তম্ভ বলা চলে। রোমের ক্যাপিটলে স্থাপিতা ছিলেন ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী সাম্রাজ্য-লক্ষ্মী, আর এখানে গণদেবতা মর্ম্মর মন্দিরে সুবর্ণ সিংহাসনে মহামহিমায় মণ্ডিত হইয়া বিরাজিত রহিয়াছেন। এই দেশের বন্দরসমূহের মধ্যে স্যান-ফ্রান্সিস্কো প্রধান স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহা কালিফোর্নিয়া নামক পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী রাষ্ট্রের প্রধান নগর। ইহার পার্শ্বে প্রাচী ও প্রতীচীর সংযোগসাধক প্রশান্ত মহাসাগর। আমরা যে স্যান-ফ্রান্সিস্কো বর্ত্তমানে দেখি, ইহা সম্পূর্ণ নূতন সহর। পূর্ব্বের সহর ভূমিকম্পনে ও অগ্নিকাণ্ডের ফলে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়াছিল। ১৯০৬ সালে ভূমিকম্প এবং উহার অব্যবহিত পরেই লঙ্কাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল। এই সুনির্ম্মিত নগর ও অম্বুবিচুম্বিত বন্দর অতি সুন্দর সন্দেহ নাই। স্বর্ণখনিসমূহ আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে কালিফোর্নিয়ার গুরুত্ব অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। ফিল্ম-শিল্পের কেন্দ্রস্থল হলি-উডের নাম সকলেই শুনিয়াছেন কিন্তু অনেকে হয় তো জানেন না ইহা কালিফোর্নিয়ার 'লস্ এঞ্জেলিস নামক সহরের অংশবিশেষ।

মার্কিন-যুক্তরাজ্যের নৈসর্গিক ঐশ্বর্য্যকে নিরুপম বলা চলে। এত বড় বড় নদ-নদী ও মনোমদ হ্রদ-তড়াগ অন্য কোন দেশে আছে কি না সন্দেহ। এই দেশের বৃহত্তম নদী মিসিসিপিকে উহার করদ নদ মিসৌরির সহিত ধরিলে উহা পৃথিবীর প্রকাণ্ডতম প্রবাহিণী বলিয়া বিবেচিত হইবে। সুপিরিয়র হ্রদ পৃথিবীর স্বাদুসলিলশালী হ্রদাবলীর মধ্যে বৃহত্তম। এই দেশের অতুলনীয় বনজ-সম্পদ উৎকৃষ্ট কাষ্ঠসমূহ বড় বড় নদ-নদীর জলস্রোতের সাহায্যেই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। আমাদের দেশেও নেপাল প্রভৃতি পর্ব্বত প্রদেশের কাষ্ঠগুলিকে ভেলার আকারে বাঁধিয়া গঙ্গা, গণ্ডক প্রভৃতি নদীর জলস্রোতে ভাসাইয়া নিম্নস্থ নগরগুলিতে আনার প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। আমেরিকায় এইরূপ ব্যাপার আরও ব্যাপক ও বৃহত্তর আকারে অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। এই দেশের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাষ্ঠখণ্ড সমূহের সমষ্টি স্বরূপ এই শ্রেণীর ভেলা আকারে বড় বড় জাহাজের ন্যায়। বহু সহস্র ফিট দীর্ঘ লৌহ-শৃঙ্খলের সাহায্যে কাষ্ঠগুলিকে একত্র সন্নিবিষ্ট করা হয়। আমরা তীর দেশে দাঁড়াইয়া দেখিলে নৃত্যশীল নদীনীরে ভাসমান



কালিফর্ণিয়ার স্বর্ণ-খনি অঞ্চলের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য

এই সকল বিশাল ভেলা আমাদিগের বিস্ময় উদ্রিক্ত করিবে। প্রকাণ্ডকায় ভেলার বক্ষে পরিচালক লোকগুলিকে মাতার ক্রোড়ে দণ্ডায়মান ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় মনে হয়। প্রচণ্ড প্রপাতপুঞ্জ অতিক্রম করিয়া ইহারা কিরূপে আসিয়াছে তাহা ভাবিলে আমাদের বিস্ময় আরও বর্দ্ধিত হয়।

আমরা এই দেশে অনুষ্ঠিত পশুপালনের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই ব্যাপারের সহিত নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডও সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। অনেক সময় মেষাদি পশু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পালন করার উদ্দেশ্য তাহারা পুষ্টকায় হইলে তাহাদিগকে আহার্য্যরূপে ব্যবহার করা হইবে। অবশ্য অনেকে ব্যবসারূপেই এই কাজ করিয়া থাকে। পালনের পর পুষ্টদেহ পশুগুলিকে হত্যা করা হয় এবং নিহত পশুর মাংস দেশ-দেশান্তরে পণ্যরূপে চালান যায়। চিকাগো সহর এইরূপ হত্যাকাণ্ডের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাত। চিকাগো যে-ভাবে মানুষের রাক্ষসী বুভুক্ষার খোরাক যোগায়, তাহা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য এবং বুদ্ধদেব, মহাবীরের দেশবাসী আমরা দেখিলে ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিব। প্রকৃতিদেবীর অনন্ত-ভাণ্ডারে এত সুরসাল ফসল ও ফল এবং খাদ্যপ্রাণে সমৃদ্ধ

সুন্দর শাক-সব্জী থাকিতে মানুষ পেটের জন্ম, রসনার ক্ষণিক তৃপ্তির জন্ত কেন এরূপ নৃশংস ধ্বংসকার্য্য করে তাহা আমাদের মনে বেদনাবিজড়িত বিস্ময় সত্য সত্যই জাগাইয়া তুলে। চিকাগো নগরে হত্যার্থ পালিত পশু বিক্রীত হইবার জন্ত যে বাজার বসে, পৃথিবীর এই ধরণের বাজারের মধ্যে তাহাই বৃহত্তম। চারি শত একর ব্যাপিয়া বিরাজিত স্থানে এই বাজার বসিয়া থাকে। হাজার হাজার লোক এই পশুপালন-ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেছে। ইহাদের ভিতর নানাদেশীয় লোক রহিয়াছে।

পেন্‌সিল্‌ভানিয়ার কৃষকদিগের মধ্যে জার্ম্মান উপনিবেশিকগণের সন্তান বহু সংখ্যক বিদ্যমান। ইহারা একপ্রকার জগা-খিচুড়ি জাতীয় ভাষায় কথা কহিয়া থাকে। এই ভাষার নাম 'পেন্‌সিল্‌ভানিয়ান ডাচ'। বহু কৌতুক-জনক প্রাচীন জার্ম্মান শব্দ এই ভাষায় দেখা যায়। নিউইয়র্ক ও ফিলাডেল-ফিয়ার এই দুইটি প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন নগরের চারিপার্শ্বের অধিবাসী বিশ লক্ষ লোকের দ্বারা এই ভাষা ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। আমরা কালিফর্ণিয়ায় ভ্রমণ করিলে তথায় স্পেনীয় প্রভাব এখনও দেখিতে পাইব। সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো প্রথমে স্পেনীয় উপনিবেশ ছিল বলিয়া এইরূপ হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে বিভিন্ন জাতির বাসস্থান বিভিন্ন পল্লী দেখিতে পাইব। নিউ-ইয়র্ক নগরের ন্যায় এখানেও 'চৌনাটাউন' আখ্যায় অভিহিত চীনা-পল্লী রহিয়াছে। বহু জাপানীও এই নগরে অবস্থান করিয়া একটি জাপানী পাড়া সৃষ্টি করিয়াছিল। সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো বন্দরটির সৌন্দর্য্য সকলকেই মুগ্ধ করে। ইহা একটি উপসাগরের তীরে বিরাজিত। এই উপসাগর ও খাস প্রশান্ত মহাসমুদ্র উভয়ের মাঝখানে একটি সঙ্কীর্ণ প্রণালী বিরাজিত রহিয়াছে। এই প্রণালীটিই পৃথিবী-প্রসিদ্ধ 'গোলডেন গেট' বা স্বর্ণতোরণ।

প্রবল প্রচেষ্টা সত্বেও বিশালতার জন্য সকল অংশের অধিবাসীদিগকে সমভাবে সুশিক্ষিত করা হয় তো সকল সময়ে সম্ভব হয় না। তবে আমেরিকার সরকারের শিক্ষা সম্পর্কীয় পরিকল্পনাকে অত্যন্ত উদার ও মহান্ বলিলে আদৌ অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহারা চাহেন সকলকে বিজ্ঞানসম্মত উচ্চশিক্ষা সমভাবে পরিবেশন করিতে। বিদ্যালয়সমূহ অবৈতনিক বলিয়া দরিদ্ররাও সন্তানগণকে অনায়াসে শিক্ষিত করিতে পারে। এ দেশে বালক ও বালিকা একত্র শিক্ষা করে। এই সহ-শিক্ষা আমরা সমর্থন করি না। ইহার বহু কুফলের কথা আমেরিকার পণ্ডিতরাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সে যাহা হউক, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা সম্পর্কীয় নীতিসৌধ সার্ব্বজনীন কল্যাণকে ভিত্তি করিয়াই দাঁড়াইয়া আছে, সন্দেহ নাই। শুধু সাধারণ শিক্ষা নয়, কৃষি ও শিল্প প্রভৃতি শিখাইয়া বালকবালিকাকে কর্ম্মদক্ষ করিয়া তোলাকে এখানকার শিক্ষা বিভাগের বিশেষ প্রশংসনীয় প্রয়াস বলা চলে। এইরূপ পন্থা আমাদের দেশেও অনুসৃত হওয়া আমরা আবশ্যক মনে করি।

আমরা আমেরিকার কোন শিক্ষায়তনে প্রবেশ করিলে যে দৃশ্য দেখিব, তাহা অন্য কোন দেশে দেখিবার আশা করিতে পারি না। য়ুরোপ হইতে যাহারা এই দেশে সর্ব্বাগ্রে আসিয়াছিল সেই প্রাথমিক আমেরিকানদের সন্তানগণের সহিত পরে আগত ফিনিশ, ইটালীয়ান, গ্রীক্, সুইডিশ প্রভৃতির সন্তানরা পাশাপাশি বসিয়া শিক্ষা লাভ করার দৃশ্য আমাদের মনে অদ্ভুত ভাব-ধারা সঞ্চারিত করা স্বাভাবিক। শুধু বিদ্যালয়ের শিক্ষাই অবৈতনিক তাহা নহে, অতি দরিদ্রের সন্তানের জন্যও (বিনাব্যয়ে) গৃহ-শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেখিলে পদে পদে এই সত্য উপলব্ধি করা যায় যে, ইহারা শুধু ধনশালীর সন্তানদের জন্ম নহে, বিদ্যা-মন্দিরের দ্বার দীন-ধনী নির্ব্বিচারে সকলের জন্ত সমভাবে উন্মুক্ত।

মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে 'টেক্সাস' বৃহত্তম এবং 'রোড-আইল্যাণ্ড' সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। লুইসিয়ানা নামক রাষ্ট্রটি ফ্রান্সের নিকট হইতে এবং ফ্লোরিডা স্পেনীয়গণের নিকট হইতে ক্রয় করা হয়। আলাস্কা রুশিয়ার নিকট হইতে ক্রয় করার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এক সময় উত্তরস্থ ফেডারাল রাষ্ট্রাবলীর সহিত দক্ষিণের কন্‌ফেডারেটেড্ ষ্টেটগুলির যে সঙ্ঘর্ষ ঘটিয়াছিল তাহার প্রধান কারণ ছিল 'দাস-ব্যবসা'। উত্তরের উন্নত রাষ্ট্রগুলি এই ক্রীত-দাস সম্পর্কীয় নিষ্ঠুর প্রথার বিলোপ সাধনে ইচ্ছুক ছিল এবং স্বার্থপর প্ল্যান্টার-গণে পূর্ণ দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি এই প্রথার স্থায়িত্ব কামনা করিত। অবশেষে শক্তিশালী ও সমুন্নত উত্তরই জয়লাভ করিল এবং দাসত্বপ্রথা চিরবিলুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতি এক সুনিবিড় কলঙ্ক-কালিমা হইতে বিমুক্ত হইল বলা চলে।

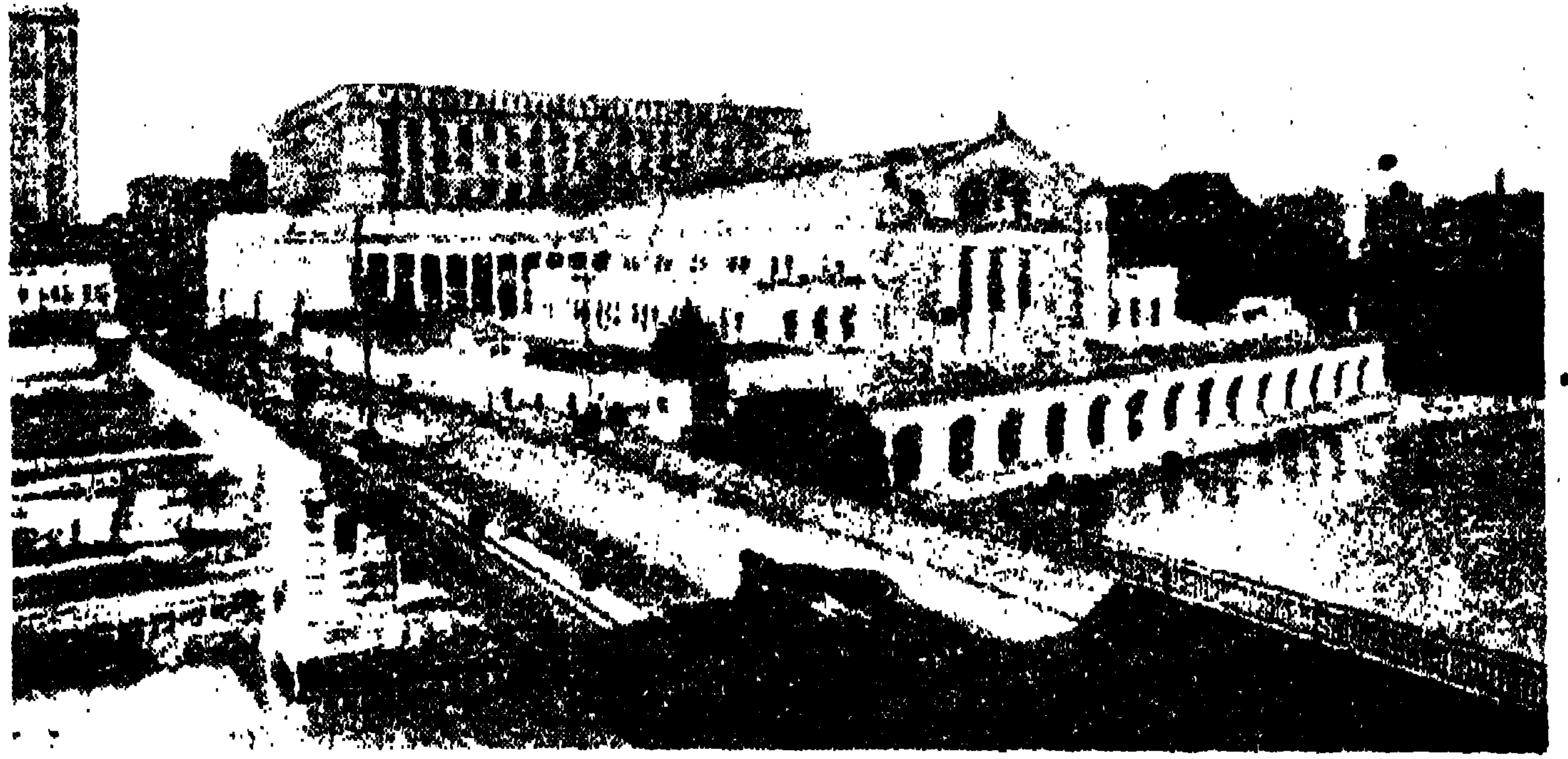
১৯১৭ খৃষ্টাব্দে মার্কিন-যুক্তরাজ্য বিগত মহাসংগ্রামে (মিত্রশক্তিসঙ্ঘের পক্ষ অবলম্বন করিয়া) প্রবেশ করিয়াছিল। তৎকালে উড্‌রো উইলসন্ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। ইনি য়ুরোপীয় শক্তিগণকে শান্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করেন। ভার্সাইয়ের সন্ধি সম্পাদিত হইবার সময় ইনি উপস্থিত ছিলেন। 'লীগ অব্ নেশন্স' প্রতিষ্ঠা ইঁহার প্রচেষ্টার ফল বলা চলে। অনেকের বিশ্বাস যুক্তরাষ্ট্রের এই রাষ্ট্রপতির সমুচ্চ আদর্শের অনুরূপ রাজনৈতিক দূর-দর্শিতা ছিল না। আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতৃগণ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় মহাসভার নাম কংগ্রেস মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় মহাসভার নামের অনুকরণে রাখিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। সত্য সত্যই নামের যদি কোন প্রভাব থাকে তাহা হইলে আমাদের 'কংগ্রেস' মার্কিনী কংগ্রেসের ন্যায় মহিমান্বিত হইবে বলিয়া, সাফল্যে মণ্ডিত হইবে বলিয়া আমরা আশা পোষণ করিতে পারি। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকান কংগ্রেস কর্ত্তৃক যে স্বাধীনতার উদাত্ত বাণী ঘোষিত হয় উহা ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে জেফারসন্ কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। কবে ভারত-বাসী ভারতবর্ষীয় রাষ্ট্রীয় মহাসভার বক্ষ হইতে মেঘ-গম্ভীর নির্ঘোষে ঐরূপ বাণী নির্গত করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইবে? কবে তাহার দেশভক্তি মুক্তি-মহিমায় মণ্ডিত হইয়া বিজয়িনী-শক্তিরূপে অভিব্যক্তি লাভ করিয়া ধন্ত হইবে?

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোর ধর্ম্মমহাসভায় যাইয়া তথায় বেদান্তের বহ্নি-বাণী প্রচার করিয়া বিজয়-মাল্য কণ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক ফিরিয়া আসিলে, আমাদের দৃষ্টি একদিন আমেরিকার এই মহানগরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। হাজার হাজার হৃদয়হীন হত্যাকাণ্ড যেখানে প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হয় সেই নিষ্ঠুরতার লীলাস্থলী নিরীহ নিরপরাধ জীববৃন্দের শোণিতে কলঙ্কিত

ভোগবাদের আগার চিকাগোর অঙ্কে দাঁড়াইয়া ভারতের কৌপীনধারী সন্ন্যাসী যে দিন সুপ্তোত্থিত সিংহের মত গর্জ্জন করিয়া জানাইলেন 'তত্ত্বমসি' এই বেদ-বাণীর জ্ঞান-গভীর ভাব-নিবিড় মর্ম্ম-মাধুর্য্য সে দিনের কথা আমরা কখনও বিস্মৃত হইতে পারিব না। সেই চীরধারী বীর সন্ন্যাসী সেদিন ভোগবাদের সেই (দুর্ভেদ্য) জর্জ্জর দুর্গ জয় করিয়াছিলেন বলিলে অন্যায় হয় না। অবশ্য এই জয় আধ্যাত্মিক ও মানসিক। আমাদের এক সন্ন্যাসী সুহৃদ্ বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুবর্ত্তন করিয়া মার্কিন-যুক্তরাজ্যে বেদান্ত প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে আমেরিকার কথা জানাইয়া পত্রও প্রেরণ করিতেন। তাঁহার কোন কোন পত্রে আশার সঙ্গীত তরঙ্গিত হইত বলা চলে। আবার কোন কোন পত্রে এমন নিরাশার সুর ধ্বনিত হইত যে, পড়িয়া আমরাও এক প্রকার নিরাশায় মগ্ন হইয়া পড়িতাম। আমেরিকার ভারত সম্বন্ধীয় মনোভাবই এই আশার আলোক ও নিরাশার অন্ধকারের কারণ।

আমাদের আর এক বন্ধু চিকাগোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব প্রদর্শনী দর্শনার্থ গিয়াছিলেন। এই বিশ্ব-মেলা এই পৃথিবীপ্রসিদ্ধ সহরের শততম সমাবর্ত্তন উৎসব উপলক্ষ্যে বসিয়াছিল। চিকাগো মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের রেলপথগুলির কেন্দ্র স্বরূপ। এই বিশ্ব-প্রদর্শনীতে এই দেশের রেলওয়ে সম্বন্ধীয় অগ্রগতির বহু নিদর্শন প্রদর্শিত হইয়াছিল। মিচিগান হ্রদের তীরে প্রসারিত একটি প্রকাণ্ড ভূখণ্ডে এই বিশ্ব-মেলা বসিয়াছিল। বিচিত্র পরিকল্পনায় প্রস্তুত একটি বিরাট বাড়ীতে ভ্রমণ ও যান-বাহন বিভাগের প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত ছিল। যান ও বাহনের সহিত সভ্যতার সন্নিকট সম্বন্ধ। বিশেষতঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মত বিরাট দেশে দ্রুতগামী যান বা বাহনের প্রয়োজনীয়তা আরও অধিক। যাঁহারা আমেরিকার রেলপথ সম্পর্কীয় উন্নতির পরিমাণ দেখিতে চান, তাঁহাদের উচিত চিকাগো গমন করা। এঞ্জিনের গর্জ্জনে ও গাড়ীর ঘণ্টার শব্দে দিবা-রাত্রি মুখরিত এই সহর সর্ব্বদাই জাগ্রত ও কর্ম্মব্যস্ত বলিয়া আমাদের মনে হইবে। রাজপথের উপর দিয়াও (ট্রামের ন্যায়) ট্রেন যাতায়াত করিতেছে। মার্কিন-যুক্তরাজ্যের রেলপথগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন "বাল্টিমোর এণ্ড ওহিয়ো রেলওয়ে।"

চিকাগোর বিশ্বমেলায় বিমান-পোত সম্বন্ধীয় প্রদর্শনীও ছিল। অনেকেই জানেন, আমেরিকাই বিমান-পোতের জন্মস্থান। এই বিমান বিভাগে সর্ব্ব-প্রকার অবস্থার ব্যোমযান প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রদর্শনীটি দেখিলে বিজ্ঞানের এই বিস্ময়কর অবদানের উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশের ইতিহাস আমরা সুন্দর রূপে অবগত হইতে পারি। আমেরিকার কিটিহক নামক স্থানে রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের দ্বারা 'মডেল এ' নামক যন্ত্রের সাহায্যে উড্ডয়নের পরীক্ষা প্রথম প্রদর্শিত হয়। পরীক্ষার পর ব্যবহার করিবার জন্য যে যন্ত্র নির্ম্মিত হয় উহা 'মডেল বি' আখ্যায় অভিহিত হইয়াছিল। মডেল 'এ' ও 'বি' দুইটি মেলায় প্রদর্শিত হইয়াছিল। ইহাদের নিকটেই ব্লেরিয়ট মনোপ্লেন নামক যন্ত্র রাখা হইয়াছিল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে লুই ব্লেরিয়ট বিমান পোতের সাহায্যে ইংলিশ প্রণালী প্রথম পার হন। এখানে "কলম্বিয়া" নামক বেলানকা জাতীয় বিমান পোতও ছিল। ইহাতে ক্লারেন্স চেম্বারলেন ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে বার্লিনে আসিয়াছিলেন।



চিকাগো মহানগর

এইখানে বিশ্বধর্ম্ম-মহাসভায় দাঁড়াইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের মূর্ত্ত-বিগ্রহ বিবেকানন্দ বেদান্তের বহ্নিমন্ত্র কম্বুকণ্ঠে উচ্চারণ করিয়া প্রতীচীকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন



বিশ্বের বিশালতা এবং বৈশ্বশক্তি

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

এই পরিদৃশ্যমান প্রাকৃতিক বস্তু সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য এই ধরাধামে কেবলমাত্র মানুষের মনে একটা স্পৃহা বা প্রশ্ন উঠিয়া থাকে। পৃথিবীবাসী অন্য কোন জীবের মনে সেরূপ জিজ্ঞাসার উদয় হয় কিনা তাহা জানা যায় না। বাহির হইতে যতদূর বুঝা যায়, তাহা হয় না। সুতরাং মানুষের মানসক্ষেত্রে এই প্রশ্ন উঠে, একটা বিশিষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য। প্রকৃতিদেবী সেই শক্তি মানুষকে দিয়াছেন। সুতরাং উহা উপেক্ষার বিষয় নহে। প্রাকৃতিক দান উদ্দেশ্য-হীন নহে। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব কি এবং ইহার স্রষ্টাই বা কে—সে প্রশ্ন কতদিন ধরিয়া মানুষের মানস-সাগরে ভাসিয়া উঠিয়াছে, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা কঠিন। ধর্ম্ম বিষয়ে যত মত পৃথিবীতে প্রচলিত আছে, তাহাতে দেখা যায় যে, এই বিশ্ব সৃষ্ট বস্তু এবং ইহার একজন স্রষ্টা আছেন। বেদ, বাইবেল, কোরাণ, জেন্দাবেস্তা—সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই—এই বিশ্ব সৃষ্ট এবং ইহার একজন স্রষ্টা আছেন—একথা বলিয়া থাকেন। মিশরের প্রাচীনতম ধর্ম্মেও বহু দেববাদের (Polytheism) অন্তরালে একেশ্বরবাদ (Monstheism) লুক্কায়িত ছিল—ইহা বুদ্ধিমান পণ্ডিতদিগের মত। মিশরীয় ধর্ম্ম বিবিধ জীবাত্মায় ঈশ্বরের পূজক (Therianthropic), কিন্তু তাহাতে এই বিশ্ব সৃষ্ট পদার্থ এবং তাহার এক সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন তাহা স্বীকার করে। প্রাচীন হিটাইটসদিগের এবং ব্যাবিলোনিয়াবাসীদিগের ধর্ম্মমতে আদিত্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী দেবতাকে বিশ্বের স্রষ্টা বলা হইয়াছে। ফলে প্রকৃতিদত্ত স্পৃহার উত্তরে মানবজাতি তাহাদের সেই প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাতে এই বিশ্বের অন্তরালে এক বা বহু শক্তিশালী কেহ আছেন এবং তাঁহারা বা তাঁহাদের দলপতি এই বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন ইহা স্বীকৃত হইয়াছে।

আদ্যাশক্তি মানুষের মনে এই প্রশ্নটি তুলিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন,—ইহার মীমাংসা মানুষ একইভাবে করিতে পারে নাই। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি (intellect) এবং চিত্তবৃত্তি ক্রমশঃ যেরূপ বিকাশ লাভ করে, এই প্রশ্নের মীমাংসাও তাঁহারা তদনুসারে করিয়া থাকেন। অর্থাৎ মানুষের ধর্ম্মসিদ্ধান্ত প্রকৃতির প্রশ্নসম্ভূত হইলেও উহার সিদ্ধান্ত মানুষ সকলে একরূপ করিতে পারে না, তাহা করে তাহাদের বুদ্ধি এবং মনোভাব অনুসারে। সেই জন্য ধর্ম্মসিদ্ধান্ত সকলের একরূপ হয় না। পাত্রভেদে ভিন্নরূপ হইয়া থাকে। মানবের মানস-সমুদ্রসম্ভূত দর্শন এবং বিজ্ঞান যেরূপ ক্রমবিকাশশীল, ধর্ম্ম-জ্ঞানও ঠিক সেইরূপ ক্রমবিকাশশীল। প্রকৃতিদেবী এই সমস্যাটী মানুষের উপর চাপাইয়া দিয়া মানুষকে তাহার সমাধান করিতে বলিয়া দিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়। সেই জন্য মানবজাতির চিন্তার ফল সম্বন্ধে যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাহা হইতে মনে হয় যে, সৃষ্টির প্রথমকাল হইতেই মানুষ তাহার জ্ঞানের পরিধি এবং পরিমাণ অনুসারে এই সমস্যার সমাধান করিতে আত্মনিয়োগ করিয়া আছে।

প্রথম যুগের আদিম মানুষ তাহার অল্পজ্ঞান অনুসারেই অনুমান করে যে, প্রত্যেক বিচ্ছিন্ন বস্তুরই একটি করিয়া অধিদেবতা বিদ্যমান। ক্রমে তাহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা সম্বন্ধে জ্ঞান পরিস্ফুট হইতে থাকে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বলেন যে, মানুষ প্রথমে কোন দেবতা কল্পনা করিয়া পরে তাহার উপাসনা করিতে থাকেন, একথা বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। পরন্তু সভ্যতা বিকাশের সহিত সামান্য বিষয়কে আশ্রয় করিয়া মানুষের দেবতা সম্বন্ধে জ্ঞান গজাইয়া উঠিয়াছে।* পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা ধর্ম্মকে উচ্চস্থান দিতে বা ঐ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে চাহেন না। এই বিশ্ব এবং বিশ্বস্রষ্টা সম্বন্ধে মানুষ তাহার স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা হইতেই অতি প্রাচীনকালেই এই সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, এই বিশ্ব সৃষ্ট বস্তু এবং ইহার একজন শক্তিশালী সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন। সকল প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রেই সেই কথা লিখিত দেখিতে পাই। সুতরাং এ-ধারণাটি মানুষের স্বভাবজাত। জীব-জগতে

* There is no reason whatever to believe that men have imagined gods and then have worshipped them, The idea of deity has grown up with civilization and in its beginnings was constructed out of the most homely of materials.

'The Growth of Civilization'—Perry.

আমরা যেমন দেখিতে পাই যে, উন্নত জীবের পূর্ব্বে অনুন্নত সাধারণ জীব দেখা দিয়াছিল, সেইরূপ এরূপ সিদ্ধান্তও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় যে, উক্ত ধারণা প্রথমে বীজাকারে সামান্ত ধারণার ভিতর গর্ভিত ছিল, বট-বীজ হইতে বট-বৃক্ষের ন্যায় তাহা মানুষের মানস-বিকাশের সহিত ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। সেই হিসাবে বিশ্ব এবং বিশ্বস্রষ্টা সম্বন্ধে বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্তও মানুষের সনাতনী পৃচ্ছার উত্তরে তাহার সদ্য মুকুলিত জ্ঞানের একটা অসম্পূর্ণ সমাধান বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে। এই সিদ্ধান্ত আরও একটু পরিস্ফুট হইলে মনে হয়, আদিতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিছুই ছিল না, পরে স্রষ্টার ইচ্ছায় ইহা সৃষ্ট হইয়াছে। স্রষ্টার এরূপ ইচ্ছা কেন হইল, মানুষের সে প্রশ্ন করিবার কোন অধিকার নাই, তাহার সমাধানও মানবীয় শক্তির সাধ্য নহে। এই সিদ্ধান্ত মতে জড়-জগৎ এবং জগৎ স্রষ্টা ঈশ্বর উভয় স্বতন্ত্র। জড় পদার্থ অণুপরমাণু-নির্ম্মিতা। উহা অবিনাশী। এই অণুপরমাণুর ওড়ন পাড়ন হইতে বিরানব্বুইটি ভূত আবির্ভূত হইয়াছে আর সেই বিরানব্বুইটি ভূত জট পাকাইয়া এই বিশ্ব গড়িয়া তুলিয়াছে। এক কথায় ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা, বিরানব্বুই ভূত সৃষ্টির উপাদান এবং অণুপরমাণু মূল বস্তু। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে এই ভূতের (elements) দল বাড়িয়া যাইতেছে। ইতিমধ্যে আরও কোন ভূতের দর্শন মিলিবে কিনা কে জানে? যাহা হউক, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষকাল পর্য্যন্ত বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছিলেন যে, পরমাণুর ধ্বংস নাই, উহা অবিনশ্বর। তাহাদের মতে উহা অনাদি। সৃষ্টি কর্ত্তা এই উপকরণ লইয়া এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন; চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, আকাশ সবই গড়িয়াছেন। ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ বলিয়া আসিতেছেন, ঈশ্বর এই সৃষ্টির কর্ত্তা হইয়া বিরাজ করিতেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ভগবানকে বড় একটা আমল দেয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানবাদীরা বলিত, "অনাদি অনন্ত অণুপরমাণু প্রাকৃতিক শক্তিবলে দৈবক্রমে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার আবার একটা সৃষ্টিকর্ত্তার অনুমান নিছক কল্পনা মাত্র। পরমাণু যখন অনাদি এবং অনন্ত, তখন তাহার আবার একটা সৃষ্টিকর্ত্তা ধরিয়া লইবার প্রয়োজন কি? তবে চৈতন্ত লইয়া একটু গোলে পড়া গিয়াছে বটে, কিন্তু উহা প্রকৃতির একটা অচিন্ত্য অবস্থার আকস্মিক ফল (accident) মনে করা যাইতে পারে। উহা জড়বস্তু সম্মিলনের রাসয়ানিক ফল বলিয়াই অনুমান হইতেছে। ভবিষ্যতে বোধ হয় বৈজ্ঞানিকগণ ঐ রহস্যের উচ্ছেদ করিতে পারিবেন।" ইহাই আধুনিকবাদী (modernist) দিগের সার কথা।

আধুনিক বিজ্ঞান এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দিয়াছে। অধিকাংশ ধর্ম্মশাস্ত্রেরই মতে ভগবান মনুষ্যকে তাঁহার প্রিয়তম জীব বলিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। বাইবেল বলেন, ভগবান মানুষকে তাঁহার মূর্ত্তির সদৃশ মূর্ত্তিতে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, অর্থাৎ মানুষের মূর্ত্তির আদর্শ-ই ভগবানের মূর্ত্তি। তাঁহার এই পৃথিবীই হইতেছে এই বিশ্বের কেন্দ্রস্থল। ভগবান তাঁহার প্রিয়তম জীব মানুষের বাসের জন্য এই মেদিনীকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কগণ ধরণীর উপর তাঁহারই নিয়োগ মত কিরণ দিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। উহারা ভগবানের নির্দ্দেশেই গগনে উদিত এবং অস্তমিত হইতেছে। নীলাকাশের ঊর্দ্ধে ভগবানের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। তথায় তিনি একাই বিরাজমান। সচ্ছিদ্র গগনের ছিদ্রপথে স্বর্গের সৌন্দর্য্যের যে রশ্মি দেখা যাইতেছে, তাহাই হইতেছে নক্ষত্র। কিন্তু মানবীয় বুদ্ধি ধর্ম্মশাস্ত্রের এই অনুশাসন চিরদিন মানিয়া চলে নাই। তাহারা এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে করিতে অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারিয়াছে। মানুষের এই অনুসন্ধানলব্ধ জ্ঞানই বিজ্ঞান (science) নামে অভিহিত।

এই অনুসন্ধানের ফলেই মানুষ বুঝিয়াছে যে, তারকানিচয় স্বর্গীয় সুষমার দীপ্তি নহে—উহা সূর্য্যসদৃশ ও সূর্য্য অপেক্ষা অনেক বৃহত্তর ভাস্বর। এই ধরিত্রীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকট তারকার দূরত্ব পৃথিবী হইতে ২৫৫,০০০,০০০,০০,০০০ মাইল। ইহা অপেক্ষা লক্ষ এবং কোটি গুণ দূরেও অনেক নক্ষত্র আছে। যন্ত্রের সাহায্য বিনা চর্ম্ম-চক্ষুর দ্বারা প্রায় ৬ হাজার নক্ষত্র দেখা যায়। কোন কোন বৈজ্ঞানিক কিছু দিন পূর্ব্বে স্থির করিয়াছেন যে, দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা মানুষ ১০ কোটি নক্ষত্র দেখিতে পায়। এখন শুনা যাইতেছে এই নক্ষত্রনিচয়ের সংখ্যা ১৬০ কোটি। অধিকাংশ নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করিয়া

অনেক গ্রহ এবং উপগ্রহ ঘুরিতেছে। উহারা পরস্পর হইতে বহু কোটি মাইল দূরে অবস্থিত। তেজস্বিতায় অনেকগুলি আমাদের ভাস্কর অপেক্ষা বহুগুণ ভাস্বর এবং প্রতপ্ত। সিরিয়াস নামক তারকা সূর্য্য অপেক্ষা ২৮ গুণ এবং ক্যনোপাস নামক নক্ষত্র সবিতৃ অপেক্ষা ১০ হাজার গুণ তীব্র আলোক বিকীর্ণ করে।

পূর্ব্বে মনে হইত যে, এই সকল তারকার মধ্যে কতকগুলি তারকা নিশ্চলা, তাহারা গগনে স্থির হইয়া আছে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। তাহারা প্রতি সেকেণ্ডে ১০ মাইল হইতে ১০০ মাইল পর্য্যন্ত অনন্ত আকাশে ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু দূরত্ব নিবন্ধন আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। আমাদের এই সূর্য্যদেবও নিশ্চল নহেন। সাধারণ লোক এখন মনে করেন যে, আমাদের এই তপনদেব স্থির হইয়া গগনের একস্থানে বসিয়া আছেন, আর পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহরা তাঁহাকে ভীমবেগে প্রদক্ষিণ করিতেছে। সে-ধারণা সর্ব্বৈব মিথ্যা। আমাদের এই মার্ত্তণ্ডদেব এই ভেগা (Vega) নামক নক্ষত্রের দিকে প্রতিদিন অন্ততঃ ১০ লক্ষ মাইল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছেন। এ গতির আরম্ভ কবে হইয়াছে এবং অবসান কবে হইবে, মানুষ তাহা ঠিক করিতে পারে না। তবে জ্যোতিষশাস্ত্রবিশারদগণ বলেন, যখন দশানন সীতা হরণ করিয়াছিল, যখন রামচন্দ্র কর্ত্তৃক লঙ্কা বিজিত হইয়াছিল, যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইতেছিল, যখন বুদ্ধদেব তাঁহার অহিংসা ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, তখনও এই রবি এইরূপ বেগে ভেগার দিকে ছুটিতেছিল, এখনও উহা সেইরূপ বেগে ভেগাকে ধরিবার জন্য ছুটিয়াছে। এ গতির বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, অনন্তের পথে ইহার এই অগ্রগতি কতদিন ধরিয়া চলিবে তাহা মানুষের বুদ্ধির অগোচর। কথাটা শুনিলে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না, ক্ষুদ্রশক্তি মানবের ধারণাশক্তি প্রতিহত হইয়া যায়, কিন্তু কথা সত্য। সেই জন্য আমি পাদটীকায় একজন বিশিষ্ট জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান-বিদের কথা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। *

ঊনবিংশ শতাব্দীর জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান মানুষকে তাহাদের বুদ্ধির এই ক্ষুদ্রত্ব কতকটা শিক্ষা দিয়াছে। কিন্তু সে পর্য্যন্ত মানুষের ধারণা ছিল যে, পরমাণুর ধ্বংস নাই—উহা অনাদি এবং অনন্তকালস্থায়ী। অতএব এক বিশ্বস্রষ্টার কল্পনা করিবার কোন কারণ নাই। তবে এই শক্তির খেলা দেখিয়া মানুষ বিস্ময়ে বিভোর হইয়া পড়িয়াছিল। তখন য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক মহলে নাস্তিক অপেক্ষা দুজ্ঞের্য়তাবাদীদিগের (Agrestics) সংখ্যা অধিক হইয়া দাঁড়ায়। ইহারা বলে যে, বিশ্বের এই বিশালতা এবং শক্তির এই খেলা দেখিয়া বুঝা যায়, এই বৈশ্ব ব্যাপারে সকল বিষয় ধারণা করিবার সাধ্য মানুষের নাই। অতএব এই বিশ্ব এবং বিশ্বস্রষ্টা লইয়া মস্তিষ্ক সঞ্চালন করা সঙ্গত নহে। উহা নিষ্ফল। এই বিশ্ব গঠনের উপকরণ পরমাণু যখন অনাদি, তখন উহা সৃষ্টবস্তু হইতে পারে না। যাহার আদি নাই তাহার সৃষ্টি কি প্রকারে সম্ভবে? সৃষ্টি না থাকিলে স্রষ্টাও হইতে পারে না। যাহার মাথা নাই তাহার মাথা ব্যথা হইতেই পারে না। পক্ষান্তরে এই বিশ্বের কার্য্য এরূপ শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইতেছে, এবং ইহার কার্য্য এমন যন্ত্রের ন্যায় ঠিকভাবে চলিতেছে যে, ইহা যেন একজন অতি বুদ্ধিমান্ যান্ত্রিকের কার্য্য বলিয়াই মনে হয়। সেই জন্যই বিখ্যাত জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক হেল্‌ম্‌হোল্‌জ (Helmholtz) বলেন যে, সর্ব্ববিধ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য হইতেছে আপনাকে যন্ত্র-বিজ্ঞানে পরিণত করা †। ইংরাজ বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন বলিয়া গিয়াছেন যে, যাহা যান্ত্রিক আদর্শে পরিণত করা যায় না, অর্থাৎ যাহা যন্ত্রের মত করিয়া বুঝা না যায়, তাহা তিনি বুঝেনই না। এখন এই বিশ্বটাকে যদি যন্ত্রবৎ মনে করা হয়,

* Through every year, every hour, every minute of human history from the first appearance of man on the earth, from the era of builders of the Pyramids, through the times of Ceasar and Hannibal, through the period of every event that history records, not merely our earth but the sun and the whole solar system with it have been speeding their way towards the star Vega on a journey of which we know neither the beginning nor the end. During every clock beat through which humanity has existed, it has moved on this journey by an amount which we cannot specify more exactly than to say it is probably between five and nine miles per second,

– Prof. Simon Newcomb.

† The final aim of all Natural Sciences is to resolve itself to mechanics.

তাহা হইলে সেই যন্ত্রের একজন যন্ত্রী থাকা চাই। যন্ত্র মাত্রই একটা মতলব করিয়া প্রস্তুত করা হয়। মতলব থাকিলে, মতলব কাহার এ প্রশ্ন মনে উঠিবেই উঠিবে। সুতরাং একজন চৈতন্যশক্তি সম্পন্ন এবং বুদ্ধিমান কাহাকেও এই বিশ্বযন্ত্রের স্রষ্টা বলিয়া অনুমান করিতে হয়। এই দোটানায় পড়িয়া উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানবাদীদের মধ্যে অনেকেই অজ্ঞেয়বাদী বা এগনষ্টিক হইয়া পড়ে। কতক অংশ নাস্তিক এবং আর কতক অংশ আস্তিক হইয়া দাঁড়ায়।

তাহার পর বিংশ-শতাব্দীতে জড়-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইল। যে পরমাণুকে অনাদি এবং অবিনাশী মনে করা হইতেছিল অকস্মাৎ পরীক্ষাক্ষেত্রে দেখা গেল—তাহা বিনাশী, সুতরাং তাহার একটা আদি আছে বা থাকিতে পারে। পরমাণু (Atom)-গুলি ঠিক জড়পদার্থ নহে। বিরানব্বুই ভূতের-যে উপাদানীভূত পরমাণু সে আর কিছুই নহে, তাহা বিদ্যুৎ-শক্তির একটা বিকার। আসলে উহার গঠন ঠিক সৌরমণ্ডলের সদৃশ। উহার কেন্দ্রস্থলে আছে পজিটোন গুরুভার ধনাত্মক বিদ্যুৎ (positive electricity) আর উহাকে বেড়িয়া সৌরমণ্ডলের চারিদিকে গ্রহের ন্যায় ইলেক্‌ট্রোন বা ঋণাত্মক বিদ্যুৎ (negative electricity) ঘুরিতেছে। কণাদের মত ভাসিয়া গেল উপনিষদের বাণীই এখন গ্রাহ্য হইল যে—মহাশক্তি হইতেই এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে। এখন সাব্যস্ত হইয়াছে, অতি-সূক্ষ্ম পরমাণু হইতে অতি বৃহৎ নক্ষত্র নীহারিকা পর্য্যন্ত সমস্তই শক্তির খেলা। শক্তিই বিশ্বে একা এবং অদ্বিতীয়া। উপনিষদ বলেন, পরমাত্মার সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইলে মহাশক্তির আবির্ভাব হয়। এই মহাশক্তিই সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনটি গুণকে আশ্রয় করিয়া এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। শক্তি জড় বটে কিন্তু পরব্রহ্ম কর্তৃক বীক্ষিত বলিয়া সচেতন। তন্ত্র সেই জন্য শক্তিকেই পরমাত্মা বলিয়াছেন।

এখন এই শক্তিই আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। পরমাত্মা বাক্য এবং মনের অতীত, অতএব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। সেইহেতু বৈজ্ঞানিকরা বাহ্য জগতের দিক হইতে অনুসন্ধান করেন বলিয়া ব্রহ্মবস্তুকে আমলে আনেন না। তাঁহারা পরে বাহ্যবস্তুর পর্য্যবেক্ষণ এবং সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণাত্মক পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে পাইলেন যে, পরমাণু শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই বিশ্বের অতিসূক্ষ্ম পরমাণু হইতে বিশাল সৌরজগৎ-নক্ষত্র নীহারিকা জগৎ সমস্তই সমভাবে গঠিত। সেই গঠনের উপাদান শক্তি মাত্র। শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নাই।* প্রকৃতির কার্য্য একইরূপ, কেন না প্রকৃতি একা এবং অদ্বিতীয়া। অধুনা পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান এই সিদ্ধান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন যে, এই বিশ্বে সক্রিয় শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নাই। যাহা আমাদের জড় বস্তু বলিয়া মনে হয় তাহা শক্তিরই অভিব্যক্তি মাত্র। বিদ্যুৎরূপেই এই শক্তি আত্মপ্রকাশ করে, আর বিদ্যুৎ ইথার বা ব্যোমের একটা অবস্থাবিশেষ মাত্র। ফলে শক্তিই সর্ব্বময়ী। শক্তি ভিন্ন বিশ্বে আর কিছুই নাই।

এই ধারণা পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান-জগতে যেমন একটা বিপ্লব ঘটাইয়াছে; হিন্দুর চিন্তা-জগতে তেমন বিপ্লব উপস্থিত করিতে সমর্থ হয় নাই। কারণ হিন্দুরা বহুকাল ধরিয়া বলিয়া আসিতেছেন যে, "শক্তিহি জগতো মূলং সৈব জগৎ-প্রসবিনী।" শক্তিই জগতের মূল, শক্তিই জগতের প্রসূতি। শব্দপদার্থী গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, "শক্তির্দ্রব্যাদিক-স্বরূপমেব" অর্থাৎ দ্রব্যাদির স্বরূপই শক্তি। চণ্ডীতেও শক্তিকে জগন্মূর্ত্তি বলা হইয়াছে। যোগাবশিষ্ঠেও শিবশক্তি এই বিশ্বের নিদানীভূত কারণ বলা হইয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞানের এই অভিনব সিদ্ধান্ত আধুনিকতার (modernism) ক্ষেত্রে যতই বিপ্লব ঘটাক না কেন, প্রকৃত হিন্দুর সিদ্ধান্তে কোন গোল ঘটাইতে পারে নাই। বরং তাহাকে সমর্থনই করিয়াছে। তন্ত্রোক্ত আগ্তাশক্তিই শিব-শক্তির সমন্বয় অর্থাৎ শক্তি এবং শক্তিমান্ উভয়কে একত্র করা হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান বাহিরের দিক হইতে এই বৈশ্ব ব্যাপার দেখিতে এবং বুঝিতে চেষ্টা করিতেছে বলিয়া উহা শক্তিকে ধরিতে পারিয়াছেন শিবকে ধরিতে পারে নাই। হিন্দুরা অন্তরের দিক হইতে দেখিয়াছেন বলিয়া শক্তি ও শিব উভয়েরই সন্ধান পাইয়াছেন।

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান চৈতন্যশক্তির মূল কোথায়

* The new theories of matter satisfies that instincts are in a remarkable degree. They reduce matter to electricity and they show the diversity of the elements to be due to the different configurations of systems of electrical corpuscles.

—Adam Gouanr Whyte.

তাহার কোন সন্ধান পান নাই। তবে তাঁহাদের মধ্যে ইদানীং সন্দেহের আবির্ভাব হইয়াছে যে, এই বিশ্বের মূলে চৈতন্য-শক্তির অস্তিত্ব রহিয়াছে। এই বিশ্ব যে কত বড় তাহার ধারণা করা অসম্ভব। ইহার কোন বস্তুই অচল নহে। সবই ভীম বেগে চলিতেছে। যদি ইহা কোন মহাজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণাধীনে না থাকিত তাহা হইলে ইহার ভিতর একটা ঘোর সঙ্কট উপস্থিত হইয়া মহাপ্রলয়ের সূচনা করিয়া দিত।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ আধুনিক গবেষণার ফলে জানিতে পারিয়াছেন যে, পরমাণুর মধ্যস্থ ইলেকট্রণগুলি বাহ্য-প্রভাবের বা প্রতিকূল অবস্থার পরিবর্ত্তন ফলে (যথা উত্তাপ) তাহাদের কক্ষপথ (orbit) পরিত্যাগ করিয়া যেন স্বেচ্ছায় অন্য কক্ষ পথে চলিয়া যায়। ইহা দেখিয়া সন্দেহ জন্মিতেছে যে, তাহাদের মধ্যে যেন চৈতন্যশক্তি গর্ভিত আছে। ইহাই চিৎশক্তির লক্ষণ; ইহার লক্ষণ জ্ঞান। ভগবান যে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ তাহার মধ্যে চিৎশক্তিই বিশেষভাবে বিবেচ্য। সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞান ক্রমশঃ বাহ্যদিক দিয়াও ক্রমশঃ এই বিশ্বের অন্তরালে ওতপ্রোতভাবে ভগবানের সন্ধান পাইতেছে বলিয়াই মনে হয়।

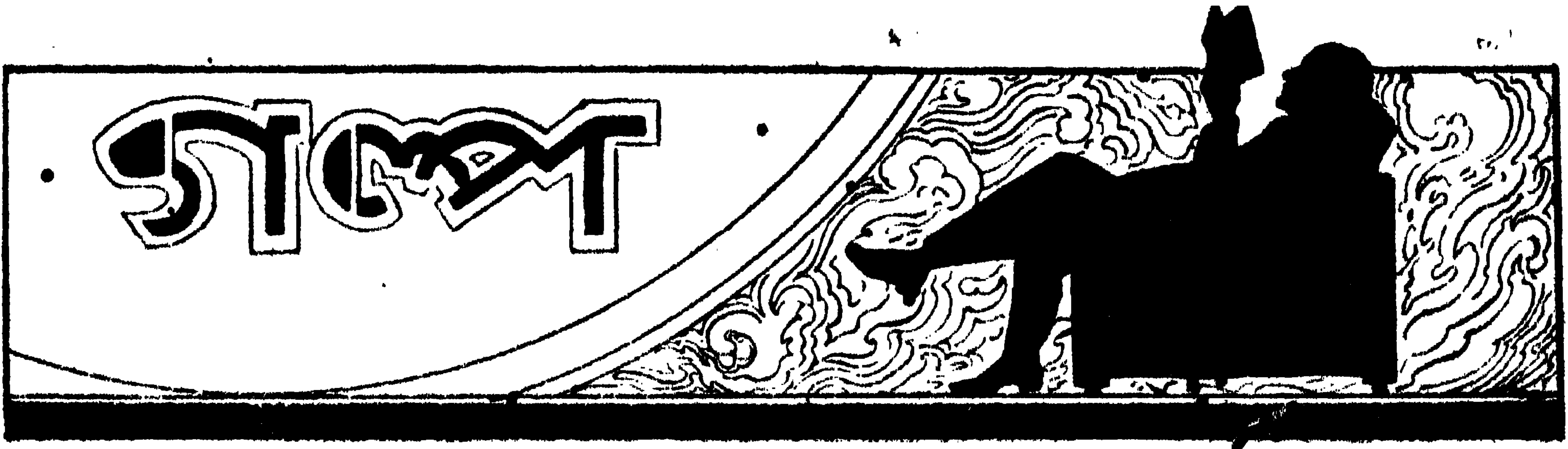
ফলে মহাশক্তিই চৈতন্যময়ী। অথবা মহাশক্তির অন্তরালে একটি চৈতন্যশক্তি লুকাইয়া আছে, আধুনিক অনেক বৈজ্ঞানিকের মনে সেই সন্দেহের উদয় হইতেছে।

হে বিধাতা ক্ষমা করো

শ্রীমোহিনী চৌধুরী

ক্ষমাহীন ঋষি, অজ্ঞানকৃত ত্রুটী মার্জ্জনা করো,
তোমার রোষের প্রলয়বহ্নি সংহরো, সংহরো।
তাপসী ধরণী পুণ্যচরণে ভুলেছে অর্ঘ্য দিতে,
অভিশাপ তাই এলো কি রিক্ত বিংশ শতাব্দীতে ?
রক্তলেখায় বহ্নিশিখায় শাশ্বত বিজ্ঞান
যুগান্ত পথে হারালো আপন সত্য-অভিজ্ঞান ;
বিস্মরণের সীমান্তে তাই বিশ্ব-রণের মোহ
ব্যর্থ ক'রেছে যুগ-সভ্যতা সৃষ্টির সমারোহ।
বিষবাষ্পের কুণ্ডলী ওঠে চাতুরী অবিশ্বাসে,
মৃত্যুবীজাণু ছড়ালো জীবনে নিঃস্বের নিঃশ্বাসে ;
নিরন্ন যারা, বঞ্চিত যারা-অভাগা সর্ব্বহারা—
লক্ষবক্ষপঞ্জর দিয়ে বজ্র গ'ড়েছে তারা।
চূর্ণ হ'য়েছে স্বর্ণসৌধ বিলাস ও ঋদ্ধির,
পূর্ণ হ'য়েছে স্বস্তিসাধনা, দেরী নেই সিদ্ধির।
মহাসাম্যের জয়রথ আসে মহাসমরের পথে,
মহাভারতের মহর্ষি জাগে পূর্ব্বাশা-পর্ব্বতে ;
গিরিসঙ্কট পার হ'য়ে ঐ আসিছে শান্তিসেনা !
দেব দুর্ব্বাসা, ক্ষোভের তূণীর এখনো কি ফুরাবে না ?
ক্ষমা করো যত অবোধ তনয়ে, অপরাধী কন্যায় ;
অক্ষম প্রাণী স্বীকার ক'রেছে আপনার অন্যায়,
নিজেই নিজের মৃত্যুদণ্ড বিধান ক'রেছে পাপী,
শীর্ষে নিয়েছে কাল-অভিশাপ ভয়াল্ সাপের ঝাঁপি।

আত্মহত্যা নয় এ মোদের, আত্মশুদ্ধি নব ;
ধ্বংসের মাঝে আমরা আবার নূতন জন্ম লবো।
মৃত্যুঞ্জয় মহাকাল আনো স্বর্গের অমৃত,
চির-অনাবিল প্রাণরসে করো সবারে সঞ্জীবিত।
অভয়মন্ত্র শুনাও সবারে, শিখাও বিশ্বপ্রেম ;
অগ্নিদাহনে পবিত্র করো হৃদি নিকষিত হেম।
দৈন্য মোদের সন্ন্যাসব্রতে দিল শুভপ্রবৃত্তি,
দুঃখের দিনে মনে পড়ে আজ ধ্যেয় দেবতার স্তুতি।
আজ মনে হয় সৃষ্টির চেয়ে স্রষ্টা অনেক বড়ো ;
মোদের স্পর্দ্ধা, 'অহং'-ভ্রান্তি হে বিধাতা ক্ষমা করো।



কুসীদজীবী

শ্রীভুবনমোহন সাহা

সকালবেলা ঘুম হইতে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া সুদের খাতা লইয়া বসা ছিল বাসুদেবের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ। অভ্যাসবশতঃ লোকে যেমন গীতা ও চণ্ডী লইয়া তাহার প্রথম প্রভাত আরম্ভ করে বাসুদেবেরও ছিল সুদের হিসাব লইয়া তদ্রূপ। অসুস্থতা বশতঃ গীতা, চণ্ডী পাঠেও লোকের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে কিন্তু বাসুদেবের সুদের খাতার হিসাব দেখিতে কখনও ভুল হয় না।

এমনি একদিন প্রভাতে বাসুদেব তাহার নিয়মবদ্ধ হিসাবের খাতা লইয়া বসিয়াছে। মেজপুত্র অমূল্য আসিয়া ডাকিল, "বাবা, শ্রীপতি এসেছে।" বাসুদেব মনে মনে সুদ কষা লইয়া এতই তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিল যে প্রথমটা অমূল্যর ডাক কানেই গেল না। অমূল্য পুনরায় ডাকিল—"বাবা, শ্রীপতি এসেছে।"

শ্রীপতির নাম শুনিয়াই বাসুদেব ক্রোধে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "বেটা এসেছে, এতদিন বাদে এসেছে, ওঃ এতগুলো টাকা সুদে বেড়েছে, বেটার টিকিটা পর্য্যন্ত দেখি না।"

অমনি তাড়াতাড়ি খাতা-পত্র হাতে লইয়া ক্ষিপ্রপদ-বিক্ষেপে বাসুদেবনন্দী তাহার বাহিরের বৈঠকখানার ঘরে আসিয়া হাজির হইল।

বাসুদেবকে দেখিয়াই শ্রীপতি করযোড়ে নমস্কার করিয়া উঠিয়া বলিল, "দাদাবাবু, বড্ড বিপদে পড়েছি। একটা টাকার জন্ম আপনার কাছে এসেছি। না দিলে আর মেয়েটাকে বাঁচাতে পারবো না।"

বাসুদেব রাগিয়া উঠিয়া বলিল, "তোর আক্কেল নেই পতে, আবার টাকা চাইতে এসেছিস। এতগুলো টাকা তোর কাছে পড়ে রইল, একটা পয়সা সুদ দিলি না, আবার টাকা!"

চার বছর হইল শ্রীপতি তাহার স্ত্রী যখন কঠিন রোগে শয্যাশায়ী, সেই সময় বাসুদেবের পিতার নিকট হইতে অতিরিক্ত সুদে একশত টাকা ধার করিয়াছিল। তাই আজ সুদে আসলে পুষ্ট হইয়া বিরাট কলেবর ধারণ করিয়াছে। স্ত্রীকে বাঁচাইবার জন্ম পৈত্রিকভিটেখানা এই টাকার দায়ে বাসুদেবের পিতার কাছে বাঁধা পড়িয়াছিল। কিন্তু শ্রীপতির দুর্ভাগ্য যে এত করিয়াও স্ত্রীকে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইতে পারিল না, আর পৈত্রিকভিটেখানাও এতদিনের মধ্যে দায়-মুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারিল না।

মিনতির সুরে শ্রীপতি বলিল, "দাদাবাবু, বলতে পার। বিপদে পড়েই ত' তোমাদের কাছে আসি।"

"তাই বলে কি আমার টাকার সুদ দিবি না।"

"ইচ্ছা করে কি তোমার সুদ বন্ধ করেছি।"

"তা নয় ত' কি। আজ চারবছর হতে চলল, একটা পয়সা সুদ দিলি না।"

শ্রীপতি আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "কর্ত্তাবাবু বেঁচে থাকতে একদিন আমার বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিয়ে বলেছিলেন, "দেখ পতে, তোর স্ত্রী যখন মরেই গেল, এ টাকার সুদ আমি চাই না, তুই আস্তে আস্তে আসল টাকাটা শোধ করে দিস।"

আমি তখন বললাম, "কর্ত্তা, আমি আর এই গাঁয়ে থাকব না, স্ত্রীই যখন মরে গেল তখন আর এখানে থেকে লাভ কি! ভিটেখানা আপনি নিয়ে নিন, লক্ষ্মীকে নিয়ে যেখানে হ'ক চলে যাব।" কর্ত্তা তখন হেসে বললেন,

"পা গলামি করিস না শ্রীপতি'। ঐটুকু দুধের মেয়ে লক্ষ্মীকে নিয়ে তুই কোথায় যাবি। টাকা যদি দিতে নাই পারিস তাই বলে কি তোকে আমি ভিটে ছাড়া করব।"

বাসুদেবের পিতা গঙ্গারাম সুদের কারবার করিয়া বিস্তর পয়সা রাখিয়া গিয়াছে। যদিও সুদের কারবারী লোকের প্রাণ প্রস্তরবৎ কঠিন হয় তাহা হইলেও গঙ্গারামের প্রাণে দয়া-দাক্ষিণ্য ছিল। কাহারও ভিটে বাটী উচ্ছেদ করিয়া অভিশাপ কুড়াইবার মত দুঃসাহস তাহার ছিল না। শ্রীপতিও তাঁহার এই স্বভার সুলভ দয়া-দাক্ষিণ্য হইতে বঞ্চিত হয় নাই। তদুপরি শ্রীপতির সরলতাও বৃদ্ধের প্রাণ আকর্ষণ করিয়াছিল। আরও একটা কারণ ছিল যে, শ্রীপতিরা ছিল বংশপরম্পরায় গঙ্গারামদের ক্ষৌরকার্য্যের বার্ষিক বৃত্তিভোগী।

শ্রীপতির এই সরল সত্যকথাই বাসুদেবের কঠিন প্রাণে বিপরিত ক্রিয়া করিল। বাসুদেব অত্যন্ত রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বুঝতে পেরেছি শ্রীপতি, কেন তুই এতদিন আমার কাছে আসিস নি। টাকা না দেবার এমনই একটা অভিসন্ধি মনে মনে এতদিন পাকাচ্ছিলি।

শ্রীপতি একটু দৃপ্তভাবে বলিল, "দাদাবাবু, গরীব বলে কি সত্য কথা বলবার অধিকারও আমাদের নেই।"

বাসুদেব অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হইয়া বলিল, "ব্যাটা, এ সত্যকথা! এতদিন বাদে সত্যকথা বলতে এসেছিস। মিথ্যাবাদী! এ সব টাকা না দেবার ফন্দি।"

"দাদাবাবু, তোমাদের পায়ে পড়ে আছি—আমরা ছোট লোক, কিন্তু ঐ অপবাদটি দিও না।"

"বলবে না, ব্যাটা সাধু সাজতে এসেছে, টাকা দিবি কি না বল। ও সব ন্যাকামি এখন রেখে দে।"

"দেখ বাবু, কর্ত্তাবাবু মরে স্বর্গে গেছেন তার নামে আমার স্বার্থের জন্য এতটুকু মিথ্যে বলব না।"

"সুদ দিবি কি না বল।"

ক্ষোভে দুঃখে শ্রীপতির চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শ্রীপতি অতি ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "হাঁ বাবু, আমি মিথ্যেবাদী। টাকা আমি দিতে পারব না, আমার ঘরবাড়ী নিয়ে আমায় মুক্তি দাও।"

বাসুদেবের রাগ কিছুতেই পড়িল না, উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল।

কড়া সুরে বাসুদেব বলিল, "তোর ঘরবাড়ী দিয়ে আমি কি করব। আমি কি সেখানে বাস করতে যাব। নিয়েছিস টাকা, দিবি টাকা।"

শ্রীপতি বলিল, "আচ্ছা, দাদাবাবু তাই হবে। আজ একটা টাকা ধার দিয়ে আমার লক্ষ্মীর প্রাণটা বাঁচাও।"

"তোমার আগেকার টাকা কিংবা সুদ না পাওয়া পর্য্যন্ত একটী পয়সা তোমায় আমি দিব না।"

বাসুদেবের কথা শুনিয়া শ্রীপতি স্তম্ভিত হইয়া মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। তাঁহার আর বাঙ্নিষ্পত্তি হইল না, শুধু ঝরণার ধারার মত দর্ দর্ ধারে গণ্ডদেশ বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। আর মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "ভগবান্ আমার লক্ষ্মীকে বুঝি আর এবার বাঁচাইতে পারিলাম না, নিয়ে নাও ওকে। ওর মার কাছে নিয়েই রেখে দাও, আমায় ভববন্ধন থেকে মুক্ত করে দাও, ওই ত' আমার একমাত্র বন্ধন।" নাঃ—বাবুকে আবার বলে দেখি, নয় ত' দুটো পায়ে ধরে মিনতি করি—দেখি, বাবুর দয়া হয় কি না, লক্ষ্মী যদি চলে যায় আমি সংসারে কি নিয়ে থাকব, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে শ্রীপতি আসিয়া বাসুদেবের পা জড়াইয়া ধরিল।

বাসুদেব তখন চাকরকে তামাক দিতে বলিয়া তাহার সুদের খাতায় ধ্যানস্থ ছিল। শ্রীপতি যখন পা জড়াইয়া ধরিল, বাসুদেব পা ছিনাইয়া লইয়া বলিল, "আঃ কেন বিরক্ত করছিস্ পতে, বলছি হবে না।" সুদ গুণিতে লাগিল, "মাসে তিন টাকা দু'আনা ক'রে সুদ হ'লে, এক বছর তিন মাস বার দিনের সুদ হবে পঞ্চাশ টাকায় ছত্রিশ টাকা বার আনা, তারপর তিন মাসের হবে এই তিন তিরিখে ন'টাকা, আর তিন দুগুণে ছ'আনা, তারপর রইল বার দিনের—পনের দিনের হ'ল এক টাকা দশ আনা তার অর্দ্ধেক..."

শ্রীপতি এদিকে অত্যন্ত কাকুতি মিনতি আরম্ভ করিল। সুদের হিসাবে ভুল হইয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখিয়া বাসুদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল "আঃ সকালবেলা এই আপদটা এসে আমার সব কাজ পণ্ড ক'রে দিল, দেখ দিখিন, করিমুদ্দির সুদের হিসাবটা ভুলই হ'য়ে গেল।"

শ্রীপতি কেবলই বলিতে লাগিল, "তোমার পায়ে পড়ি, দাও একটা টাকা দাদাবাবু।"

বাসুদেব একটু কোমলকণ্ঠে বলিল, "তোর লক্ষ্মীর কি হয়েছে ?"

"বাবু, তিন ডিগ্রী জ্বরে তিন দিন শয্যাশায়ী, ডাক্তারবাবু বলে গেলেন দুধসাবু দিতে, দু'টাকা ক'রে সাবুর সের, হাতে একটা পয়সা নেই, সাবু কিনি কি ক'রে ?"

"কিছু জিনিষ এনেছিস্, কি রেখে নিবি টাকা।"

"বাবু, জিনিষ কি এই যুদ্ধের বাজারে কিছু আছে ? সব বেচে খেয়েছি।"

"ওঃ তুই বিনা জিনিষেই টাকা ধার করতে এসেছিস, তোর স্পর্দ্ধা ত' কম নয়। যাঃ যাঃ টাকাকড়ি এখানে কিছু হবে না।" এই কথা বলিতে বলিতে খাতাপত্র বগলে লইয়া বাসুদেব আস্তে আস্তে অন্দরমহলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

উপায়ন্তর না দেখিয়া অদৃষ্টকে অশেষ ধিক্কার দিতে দিতে শ্রীপতি নিজ গৃহাভিমুখে চলিল। সহস্র সর্পদংশনে মানুষের যে জ্বালা হয় বাসুদেবের এই লাঞ্ছনা, প্রত্যাখ্যান, নির্দ্দয়তা শ্রীপতির মনে সেইরূপ জ্বালার সৃষ্টি করিল। বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছিয়া একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কি নিষ্ঠুর অভিশাপে না জানি মানুষ গরীব হয়ে জন্মায়!"

বড় কথা বড় করিয়া ভাবিবার শক্তি যাহাদের নাই তাহাদের বড় কথায় মর্য্যাদাজ্ঞান থাকে না, বাসুদেবের নিকটও হইল তাহাই, স্বর্গগত পিতৃদেবের নাম করিয়াও শ্রীপতি বাসুদেবের নিকট হইতে সদ্ব্যবহার পাইল না। শ্রীপতির কথা বাসুদেব আমলেই আনিল না, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সুদের খাতার হিসাব নিকাশই যাহার জীবনে একমাত্র সম্বল, পিতৃপ্রদত্ত বিরাট পঞ্চম শ্রেণীতে তিনবার ফেল করিবার পর সরস্বতীর সঙ্গে যে সমস্ত সম্পর্ক চুকাইয়া দিয়াছে, বাপের বনেদি ব্যবসার উপর বসিয়া অনায়াসলব্ধ সুদ গুণিয়া গুণিয়া তাহার হৃদয়ের মনুষ্যোচিত বৃত্তিগুলি শুকাইয়া যেন সব কাঠ হইয়া গিয়াছে, তবুও কেন যেন আজ অন্দরে প্রবেশ করিয়া তামাক টানিতে টানিতে শুধু শ্রীপতির কথাগুলিই ভাবিতে লাগিল। বাসুদেবের মনে কেবলই খোঁচা দিয়া উঠিতে লাগিল, 'সত্যিই কি বাবা শ্রীপতির সুদ মুকুব করিয়া দিয়া গিয়াছেন।' আবার ভাবিতে লাগিল, 'তাই যদি হ'ত মরবার সময় ত' বাবা আমাকে একবার বলেও যেতে পারতেন, এতগুলো টাকার সুদ ছেড়েই বা দেই কি ক'রে।'

শ্রীপতির কথাগুলো বাসুদেবের মনের মধ্যে এমনি করিয়া তোলপাড় করিতেছিল, এমন সময় মা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি রে বাসু, বাইরে তোর আজ এত চরাগলা শুনছিলুম কেন রে ?"

"বুঝলে মা, শ্রীপতি এসেছিল আজ টাকা ধার করতে।"

"টাকা দিলি তাকে ?"

"আমি কি অত বোকা, মা। আগেকার অতগুলো টাকা পাওনা রয়েছে তার কাছে, তার একটা পয়সা সুদ দিলে না, আবার টাকা দেব তাকে।"

"টাকা চাইতে এসেছিল কেন ?"

"ওর মেয়ে লক্ষ্মীর ভারী জ্বর। পথ্য কিনবার জন্য।"

"কতটাকা।"

"একটাকা।"

কথাটা শুনিয়া বাসুদেবের মা অত্যন্ত ব্যথিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "একটাকা! টাকা কেন দিলি না!"

একটু গরম হইয়া বাসুদেব বলিয়া উঠিল, "তুমি বলছ ওকে টাকা দিতে মা! যে এত সহজে এতবড় একটা মিথ্যেকথা বললে যে বাবা নাকি ওকে আগেকার টাকার সমস্ত সুদ মাপ দিয়ে গেছেন।"

কঠিন হইয়া মা বলিলেন, "হাঁ, বাসু, শ্রীপতি মিথ্যে বলে নি। কর্ত্তা অনেকবার আমার কাছে বলেছেন—দেখ, শ্রীপতির ত' লক্ষ্মী ভিন্ন আর কেউ নেই। টাকা না দিতে পারলেও ওকে ভিটেছাড়া করো না। বড় ভালমানুষ বেচারা, ছলচাতুরীর ধার ধারে না। সময়ে অসময়ে ওর অভিযোগের দিকে লক্ষ্য রেখো।"

মায়ের মুখের কথা শুনিয়া বাসুদেব স্তম্ভিত হইয়া গেল। কিন্তু মুহূর্ত্তেই তাহার কুসীদজীবীর বৃত্তি জাগিয়া উঠিল। সে বলিয়া ফেলিল—"মা, এমনি করে যদি সবাইকে টাকা ছেড়ে দিতে হয়, তা হলে ব্যবসা চলবে কি করে—আর এই ছেলে-পুলোগুলিকেই বা মানুষ করব কি করে ?"

মা বলিলেন, "তাই বলে কি পথ্যের ব্যবস্থা করে লক্ষ্মীর প্রাণরক্ষা করবি না। একবার দেখে আয়গে মেয়েটা কেমন

আছে। কর্ত্তার কথার মর্য্যাদাও ত' তোর রক্ষা করা উচিত।"

বাসুদেব নিরুত্তর রহিল।

বাড়ী ফিরিয়া শ্রীপতি দেখিল লক্ষ্মীর জ্বর একটু নরম পড়িয়াছে। আহারের জন্য সে বড়ই অস্থিরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। বাবাকে বলিল, "বাবা বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, আমায় কিছু খেতে দাও।"

জ্বর তখনও দেড় ডিগ্রির কম নয়।

শ্রীপতি বলিল, "কি খেতে দেব মা, কিছুই যে জোগাড় ক'রতে পারলাম না। ডাক্তার বলে গেছেন দুধ সাবু দিতে। টাকা না হলে ত' দুধসাবুর ব্যবস্থা ক'রতে পারি না।"

লক্ষ্মী কাতর কণ্ঠে বলিল, "খিদেয় আমি থাকতে পারছি না বাবা, আমার ভাত খাবার ইচ্ছে হচ্ছে।"

শ্রীপতির চোখদিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। লক্ষ্মী তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "বাবা তুমি কাঁদছ কেন? আমি কিছু খাব না। মা যেখানে গেছে আমি সেখানেই যাব। বাবা, খিদের চোটে আমি আর থাকতে পাচ্ছি না।" এই কথা বলিতে বলিতে লক্ষ্মী নীরব হইয়া গেল।

শ্রীপতি হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল এবং বলিতে লাগিল, "মা, মা, লক্ষ্মী আমার, কথা বল, চুপ করলি কেন? না খেয়ে তোকে মরতে দেব না। না খেয়ে মরবার দুঃখ রাখবার আমার ঠাঁই থাকবে না। কথা বল মা।"

শ্রীপতি বুঝিতে পারিল যে ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িতেই লক্ষ্মী দুর্ব্বল বোধ করিতেছে। অমনি সে তাড়াতাড়ি ভাতের জোগাড় করিতে গেল।

ভাতের থালা লইয়া শ্রীপতি লক্ষ্মীর বিছানার পাশে আসিয়া ডাকিল—"মা! ওঠ খাবি।"

লক্ষ্মী আহারের কথা শুনিয়া খুব উৎকণ্ঠার সহিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আস্তে আস্তে বলিল—"কি বাবা?"

শ্রীপতি বলিল, "ভাত।"

লক্ষ্মী আগ্রহ সহকারে বলিল, "খাব?"

শ্রীপতি একহাতে চোখের জল মুছিল ও অন্য হাত দিয়া মেয়েকে ভাত খাওয়াইল।

বেলা তখন পাঁচটা, ক্রমশঃ লক্ষ্মীর জ্বর বাড়িয়া উঠিল, একটু একটু করিয়া ভুল বকিতে লাগিল, বিকার আরম্ভ হইল। বিকারের ঘোরে কেবলই বলিতে লাগিল—"বাবা! মা আমায় ডাকছে, ঐ-যে-মা এসেছে, যাব-যাব আমি, ছেড়ে দাও। মার কাছে গিয়ে থাকব। মা, বড্ড খিদে পেয়েছে ভাত খাব।"

শ্রীপতি তখন ছুটিয়া ডাক্তার ডাকিতে গেল। ডাক্তারবাবু আসিলেন। বিকার তখন কাটিয়া গিয়াছে। দেহ প্রায় অসার হইয়া পড়িয়াছে। কোন কথা নেই। নাড়ীর স্পন্দন অতি ক্ষীণভাবে চলিতেছে। নাড়ী পরীক্ষা করিয়া ডাক্তারবাবু বলিয়া উঠিলেন—"এত জ্বরে ভাত খাইয়ে মেয়েটাকে মেরে ফেল্লি শ্রীপতি।"

শ্রীপতি কাঁদিয়া ফেলিল ও বলিল, "ডাক্তারবাবু বলুন, বলুন লক্ষ্মী আমার বাঁচবে কি না, একটু ভাল করে দেখুন;" ডাক্তারবাবু আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

লক্ষ্মীর আত্মা তাহার মায়ের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য চলিয়া গিয়াছে। শ্রীপতি অতি উচ্চরোলে কাঁদিয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ ক্রন্দনের পর মুখ গুঁজিয়া বসিয়া রহিল। এমন সময় মাতৃমাদেশে বাসুদেব আসিয়া ডাকিয়া উঠিল—"কিরে শ্রীপতি লক্ষ্মী কেমন আছে?"

শ্রীপতি বাসুদেবের গলার স্বর শুনিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া উন্মত্তের মত চেঁচাইয়া উঠিল—'দাদাবাবু এসেছ। লক্ষ্মী আমায় মুক্তি দিয়েছে।" এই কথা বলিয়া শ্রীপতি বাসুদেবের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল। বাসুদেব মাথা হেঁট করিয়া নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। হয় ত' বা দু'একবার বিদ্যুৎ চমকের মত সুদের হিসাবটা তাহার মনের উপর ভাসিয়া উঠিল।



চীনের সামরিক প্রতিভা

শ্রীতারানাথ রায়চৌধুরী

এক

শতধাবিচ্ছিন্ন চীন পঞ্চবর্ষব্যাপী সমরে প্রভূত শক্তির পরিচয় দিয়াও আজ জাপানের বিরুদ্ধে যে ভাবে সংগ্রাম করিতেছে তাহাতে জগতের প্রত্যেক দেশই বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে চীনের সামরিক প্রতিভার প্রতি তাকাইয়া আছে। বিচ্ছিন্ন চীনকে বর্ত্তমান সামরিক নেতা জেনারেল চিয়াং-কাইশেক কি শক্তিবলে যে একটা দুর্ব্বার অখণ্ড শক্তিমান্ জাতিতে পরিণত করিয়াছে, তাহাই সকলের চেয়ে বিস্ময়ের বিষয়। চীনের নগর, সামুদ্রিক বন্দর, প্রাচীন রাজধানী জাপান দখল করিলেও চীনের প্রভূত লোকবল ও অর্থবল নষ্ট করিলেও চীন আজও অজয় রহিয়াছে। এই প্রতিভার পশ্চাতে কি গোপন সাধনা রহিয়াছে, সে-কথা আজিকার ভারতবর্ষকে ভাবিতে হইবে। বিভিন্ন ধর্ম্মের ও সমাজের সংঘাত থাকিলেও জাতীয়তার পূত মন্ত্রে চীনের জনসাধারণ দীক্ষিত হইয়াছে, আজ জাপানের বিরুদ্ধে সমর-ক্ষেত্রে আনিবার জন্য দশ কোটী যোদ্ধা প্রস্তুত করিয়াছে। উহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? চীনের বর্ত্তমান লোকসংখ্যা প্রায় পঁয়তাল্লিশ কোটী, এই বিপুল জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় দশ কোটী যোদ্ধা, প্রয়োজন হইলে চীন যে আরও যোদ্ধার সমাবেশ করিতে পারিবে তাহাতে সন্দেহ নাই, শত্রু-পক্ষ জাপানের বর্ত্তমান যোদ্ধৃসংখ্যা এক কোটীর উপরে।

আমাদিগকে দেখিতে হইবে এইরূপ বিরাট যুদ্ধে চীন কি প্রকারে এইরূপ সুশৃঙ্খলার মরণ-জয়ী যোদ্ধৃদল প্রস্তুত করিয়াছে। দেশমাতৃকার রক্ষার জন্য রক্তদানে প্রস্তুত এই যে কোটী কোটী সন্তান—তাহাদিগকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে বন্ধন করা কি সহজ? মনে হয়, দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়াও জাপান এই বিরাট জাতির সামরিক প্রতিভাকে খর্ব্ব করিতে পারিবে না। বরং জাপান যত আঘাত করিবে, চীনের শক্তি ততই বৃদ্ধি পাইবে, হয় ত' পরিশেষে জাপানকে পরাজয়ের গ্লানি লইয়া স্বীয় দ্বীপভূমে প্রবেশ করিতে হইবে।

পাশ্চাত্ত্যের তিন বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের ইতিহাস ও চীনের পঞ্চবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে, চীনের সামরিক প্রতিভা ইউরোপের সভ্য জাতিগুলির সামরিক প্রতিভা হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে। পাশ্চাত্ত্য জাতি—যথা, জার্ম্মানী ও ব্রিটিশ, রুষ ও ইটালী ইহারা বরাবরই সগর্ব্বে নিজেদের বিজ্ঞান-প্রতিভার বড়াই করিয়া আসিয়াছে। নূতন নূতন মরণাস্ত্র আবিষ্কারের জন্য পাশ্চাত্ত্য জাতি জগতে আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের


চিয়াং-কাইশেক

বহু প্রচার-কার্য্য করিয়া আসিয়াছে, জাপান কিম্বা চীন কিন্তু আপনার ঢাক বিশ্বের বাজারে পিটায় নাই, বরং নীরবে

তাহারা শক্তি সংগ্রহ করিয়াছে—নীরবে শত্রুর সম্মুখীন হইয়াছে। দীর্ঘ দিন যুদ্ধেও যে তাহারা ক্লান্ত হয় নাই, মিত্র-শক্তির সহিত চীনের যোগদান ও ব্রহ্মদেশে জাপ-অভিযানের বিরুদ্ধে ইংরেজের পাশে চীনের উপস্থিতিই তাহার প্রমাণ।

জার্ম্মানী যখন মধ্য-ইউরোপে রাজ্যের পর রাজ্য অল্প সময়ের মধ্যে দখল করিয়াছে এবং বিপুল শক্তিমান্ রুষকে আজ ক্ষত বিক্ষত করিতেছে, জাপানও তেমনি বিপুল সংগ্রাম-কুশল ইংরেজের কয়টী প্রাচ্য দেশীয় রাজ্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে দখল করিয়া আজ ভারতের পূর্ব্বদ্বারে অভিযান করিবার অভিলাষে উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু এই পরাক্রমশালী কৌশলী জাপানকেও আজ অবহেলার চোখে চীন দেখিয়া আক্রমণ করিতে পরাঙ্মুখ হইতেছে না। চীন-জাপান যুদ্ধের পরিণাম সম্বন্ধেও দুই বৎসর পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, এই যুদ্ধে পরিণামে চীন জয়লাভ করিবে। অবস্থা এমনই দাঁড়াইয়াছে, জাপান চীনকে পরাভূত করা যতটা সহজ মনে করিয়াছিল, এখন কার্য্যকালে দেখা যাইতেছে, কার্য্যটা তত সহজ নহে।

চীন বিরাট দেশ—নদ-নদী পর্ব্বতশঙ্কুল দেশ—দেশের আবহাওয়াও বিভিন্ন ধরণের। একটী অখণ্ড জাতীয় সত্তার সুদৃঢ় বন্ধনে জাতি আবদ্ধ, ধর্ম্মমত যার যাহাই থাকুক না কেন, আজ বিপদে চীন এক ও অখণ্ড; দুর্ব্বার, অপরিমিত শক্তিশালী জাতি; সমর-সংঘটন-ব্যাপারে চীন পটু, কৌশলী, সামরিক কূটনীতিতে চীন আজ জগতে শ্রেষ্ঠ, চীনের সামরিক নেতা চিয়াং আজ জগতের রাজনীতিবিদ্‌দের মধ্যে অন্যতম অধিনায়ক।

কি করিয়া চীনের সামরিক বল সঞ্চিত হইল, ইহাই ভাবিবার বিষয়। কোন্ শক্তিদেবীর অর্চ্চনা করিয়া চীন বিজয় বর লাভ করিয়াছে উহাও ভাবিবার বিষয়। ভারতের অধিবাসীগণও আজ চীনের নিকটে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে পারে। লোকে বলে ভারতবর্ষ কম নহে, এই ভারতে চল্লিশ কোটী লোক, বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সমাজ বিদ্যমান থাকিলেও চীনের ন্যায় জাতীয়তার বেদীতে এক অখণ্ড রাজনৈতিক ভারতবর্ষ গড়িয়া তুলিতে ধর্ম্ম ও সমাজের গণ্ডি ছেদ করিয়া একটা সামরিক শক্তিমান্ জাতি গড়িতে ভারতবর্ষ সক্ষম, কিন্তু কেবল চিয়াংএর অভাব—একজন সামরিক সর্ব্বকৌশলসম্পন্ন ব্যক্তির অভাব। ধর্ম্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু রাষ্ট্র সমষ্টিগত। জাতিকে জগতের সমক্ষে শক্তিমানরূপে দাঁড় করাইতে হইলে ব্যক্তির স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া ধর্ম্মের গণ্ডি সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করিয়া একটা সম-স্বার্থের উপরে রাজনৈতিক আদর্শে জাতিকে গড়িয়া তোলাই বুদ্ধিমান্ জাতির ধর্ম্ম-কর্ত্তব্য। চীনের সামরিক নেতাগণ সমগ্র চীনবাসীকে সেই শিক্ষাই দিয়াছেন। তাই চীন আজ এত শক্তিমান্। বিপদে পড়িয়া চীনের অধিবাসীগণ নিজ নিজ স্বার্থ ভুলিয়া গিয়াছে, সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিতেছে। অকুণ্ঠচিত্তে নেতার আদেশ পালনের ধৈর্য্য ও শিক্ষা লাভ করিয়াছে। দ্বিধাহীন চিত্তে চীনের জনগণ আজ নেতার আদেশে রণক্ষেত্রে প্রাণ দিতেছে। পঞ্চবর্ষেও তাহাদের ক্লান্তি আসে নাই। "জগতের সমরের ইতিহাসে এই সামরিক প্রতিভা সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত থাকিবে। গ্রীক সমর-কৌশল জার্ম্মানী ব্যর্থ করিয়াছে, বীর ফরাসী জাতির সমর-শক্তি জার্ম্মানী ব্যর্থ করিয়াছে, কিন্তু জাপান চীনের সামরিক বল ধ্বংস করিতে পারে নাই।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে জাপান যখন হঠাৎ আন্তর্জ্জাতিক আইন কানুন ভঙ্গ করিয়া চীনের রাজ্যভাগ আক্রমণ করে তখন চীন সন্ত্রস্ত হইয়া আপনার অবস্থা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া তখনই বিপদের সম্মুখীন হয়। আজ চীন আপনাকে গড়িয়া তুলিয়াছে, প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্রে ভূষিত দুই শত ডিভিশন সৈন্যবলকে চীন বর্ত্তমানে একা তিন শত ডিভিশন সৈন্যদলে পূর্ণ করিয়াছে, পঞ্চাশ লক্ষ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে এবং এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ সৈন্য শিক্ষাক্ষেত্রে উপস্থিত আছে। আট লক্ষ গরিলা নানা যুদ্ধক্ষেত্রে জাপানের যুদ্ধোদ্যমে বাধা দিতেছে। ছয় লক্ষ চীনা সৈন্য জাপানীদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে। ইহা ব্যতীত পাঁচ কোটী সক্ষম যোদ্ধা, প্রয়োজন মত যাহাতে পাওয়া যায়, তাহারও ব্যবস্থা করা আছে। এই ক্ষেত্রে জাপানীরা কোরিয়ান্ এবং ফরমোজার লোক লইয়া সর্ব্বসাকুল্যে যুদ্ধক্ষেত্রে এক কোটী সৈন্য আনিতে পারে। চীন যে লোকবলে ও সৈন্যবলে জাপান হইতে অধিক শক্তিশালী তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে হান্‌কোর পতন হয়। হান্‌কো একটী প্রসিদ্ধ চাইনিজ নগর। এই সময়ে সৈন্যবলে ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে জাপান শ্রেষ্ঠ ছিল কিন্তু এখন চীন শক্তি সংগ্রহ করিয়াছে।

চীনের সমর নেতাগণ চীনের জনসাধারণকে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠতম সৈনিক ও নাগরিক রূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য সর্ব্বপ্রকারের সুবিধা ও সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে।

The average Chinese is intelligent and follows instructions readily. He is resourceful and commands extraordinary ingenuity. He is traditionally loyal and faithful to the point of death to a leader who treats him with consideration. He is honest and knows no fear. (*Samuel Chao, China' New Army.*)

চীনের ইতিহাস

জাপানের অত্যাচারের নমুনা

জাপান চীন দেশ দখল করিবার ফন্দী অনেক দিন হইতেই করিয়া আসিতেছে। বিগত বক্সার যুদ্ধ ও অহিফেন যুদ্ধের সময়েও জাপান চীনের রাজ্যাংশ দখল করিবার সুযোগ খুঁজিয়াছিল। ১৯০৫-৬ খৃষ্টাব্দে রুষ-জাপান যুদ্ধে জাপান কোরিয়া রাজ্য দখল করে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে কিরূপ নৃশংসভাবে জাপান, মানচুরিয়ার উপরে আক্রমণ চালাইয়া রাতারাতি সে দেশটা দখল করে, সেই সময়ের ইতিহাস যাহারা জানেন, তাহারাই বলিতে পারিবেন, লিগ-অব নেশন জাপানের এই অত্যাচার প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থাই করিতে পারেন নাই বরং আন্তর্জ্জাতিক বিধি লঙ্ঘন করিতে যাইয়া জাপান কোন বাধা না পাওয়াতে তাহার সাহসই বাড়িয়া যায়। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর জাপান তাহার চূড়ান্ত বর্ব্বরতা দেখাইয়া সাহসের মাত্রা কতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা সমগ্র জগতকে দেখাইয়াছে। ১৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রি ১০টার সময়ে কোন প্রকার যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়াই এবং পূর্ব্বে কোন প্রকারের সতর্ক বাণী না দিয়াই মুগডেন নগরীর উপকণ্ঠস্থিত চীনা সৈন্যগণের উপরে আক্রমণ চালায়। এই অকস্মাৎ আক্রমণে জাপানী-সৈন্য রাইফেল এবং কামান, দুইটী ব্যবহার করিয়া চীনা সৈন্যগণকে ধ্বংস করে। সহরের উপরে কামান চালাইয়া জনসাধারণকে নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করে, সহর লুট করে, অস্ত্রাগার লুট করে, চীনাদের সৈনিক ব্যারাক লুট করিয়া বিধ্বস্ত করে। সেই সঙ্গে চাংচুন ও কোয়াংসি ও অপরাপর স্থানের চীনা সৈন্যগণের অস্ত্রাদি কাড়িয়া লয়। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে জাপানীরা ঐ সকল নগর দখল করে। কুরিয়া সীমান্তের অনটুং ও অন্যান্য স্থানের রেলপথ ও নগর তাহারা অধিকার করে। ঐ স্থানগুলি আয়তনে ব্রিটিশ দ্বীপ পুঞ্জ হইতেও বড়। এইরূপ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত জাপানীরা নাগরিক ধ্বংস ও চীনা অধিবাসীদিগকে হত্যা করিয়াছে যে, সেই চীনের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক নেতারা উহার প্রতিবাদ করে। উক্ত সালের ২০শে অক্টোবর আমেরিকান বিশিষ্ট নাগরিক মিঃ রবার্ট লিউচ, লিগ কাউন্সিলে ১৯৩১, সি ৭৩৩ নং দলিলে পাঠান, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন—

"আমি বিশেষ ভাবে প্রমাণ পাইয়াছি যে, কুরিয়ার অংটুং হইতে জাপানীরা ১৮ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার রাত্রিতে সৈন্য বোঝাই ৭ খানি ট্রেন মাঞ্চুরিয়ায় পাঠায়। ১৯শে সেপ্টেম্বর শনিবার রাত্রিতে চারখানি সৈন্য বোঝাই ট্রেন মাঞ্চুরিয়ায় পাঠায়। ২০শে সেপ্টেম্বর রবিবার পুনরায় আটখানি ট্রেন বোঝাই সৈন্য জাপানীরা মাঞ্চুরিয়ায় প্রেরণ করে। এই সর্ব্বশুদ্ধ ১৯টী ট্রেন বোঝাই সৈন্যই মাঞ্চুরিয়া দখল করে। (অং টুং মুগডন হইতে ১৬১ মাইল দূরে অবস্থিত কুরিয়ার সীমান্ত নগর)

মিঃ সেরউড্ এডি নামক অপর একজন বিশিষ্ট আমেরিকান, চীনা প্রতিনিধি ডাঃ সে জেকে ১২ই অক্টোবর ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে একখানি টেলিগ্রাম পাঠান। ডাঃ সেজে উক্ত তারখানি ১৩ই অক্টোবর লিগ কাউন্সিলে পাঠ করেন। মিঃ সেরউড্ লিখিয়াছেন, "অধিকার ভুক্ত মুগডেনে আমি উপস্থিত ছিলাম। জাপানীরা যে পূর্ব্ব হইতে সঙ্কল্প করিয়া বিনা কারণে ও সতর্ক না করিয়া নগর আক্রমণ করে তাহার বহু সাক্ষ্য আমি পাইয়াছি। চীন তখন বন্যা বিধ্বস্ত, সেই সময়ে জাপানী সৈন্য পূর্ব্ব সঙ্কল্পিত সুযোগে চীনাগণকে আক্রমণ করে, মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণ অংশ দখল করে ও চিনচো নগরী কামানের গোলায় ধ্বংস করে। আমি সেনেডা ও নানকিংএ শপথ করিয়া বলিতে পারি, জাপানীরা মাঞ্চুরিয়ায় নিজের মনোমত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে চায়। সমগ্র জগতই লিগ অব্ নেশন এবং কেলগ চুক্তির প্রতি তাকাইয়া আছে", ইত্যাদি।

২৪শে সেপ্টেম্বরের লিগের ৬০৪ নং দলিলে ১৯৩১

খৃষ্টাব্দ আছে, "জাপানী সৈন্যেরা কুংচুলিং কিরেলে চীনা সৈন্যগণকে আক্রমণ করে। কিরিনের নাগরিকগণকে অবাধে হত্যা করে। মুগডেনের হত্যা হইতেও এখানে ভীষণ হত্যা কাণ্ড চলিয়াছিল। চীনের সামরিক ও বেসামরিক অফিসার গণকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে। এই সময় দুইশত অফিসার নির্দ্দয়ভাবে হত হয়, চ্যাংচুলে চীনা নাগরিকগণ হত হয়। চোজুজিং, চ্যাং চুন মিউনিসিপ্যালিটীর ডাইরেক্টার, তাহাকে এইরূপ ভাবে হত্যা করা হয় যে, তাহার দেহে সাতটী গুলির দাগ হইল ও একান্নটী বেয়নেটের ক্ষত হইল। তাহার পরিবারস্থ সকলকে কসাইরা যেমন পশু হত্যা করে, এমনই ভাবে হত্যা করিয়াছিল। চ্যাংচুন দখল করিবার সময় জাপানীরা নগরীর উপর পাঁচঘণ্টায় বিশ বার কামান দাগিয়া নগরের গৃহাদি ধ্বংস করে।

জাপানের চীন আক্রমণের প্রথম সময় হইতে এইরূপ নৃশংস অত্যাচারের ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এইগুলি ঐতিহাসিক সত্য।

ভারতের দ্বার প্রান্তে আজ জাপানীরা সেইরূপ বর্ব্বরতার আদর্শ লইয়া উপস্থিত হয় নাই কে বলিবে? আজ ভারতবাসীকে সতর্ক দৃষ্টিতে জাপানের এই অভিযান লক্ষ্য করিতে হইবে, এবং ভারতভূমি রক্ষার জন্য যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিতে হইবে।

সমগ্র ভারতের ঐক্যের উপরে ব্রিটিশ সহযোগিতায় আজ আমাদিগকে মাতৃভূমি রক্ষা করিতে হইবে, এই সঙ্কল্প গ্রহণ না করিলে, ভবিষ্যত ঠিক চীনের মতনই ভীষণ মর্ম্মন্তুদ হইবে।

ফাল্গুনে

শ্রীনকুলেশ্বর পাল, বি, এল

সঙ্গীতে তব ভরিল বিশ্ব
নব জাগরণ প্রভাতে;
নিখিলের রূপ এ কি অপরূপ
আজি এ আলোক সভাতে।
শিশির সিক্ত রবি ঝলমল,
নব কিশলয় হিয়া চঞ্চল;
বনানীর বুকে জাগে শিহরণ
রক্ত মদির আভাতে;
অশোক শাখায় কাঁপন জাগায়
বন মন লোভা শোভাতে।

ফাগুন তোমার বনে বনে আজি
রূপের আগুন জ্বলিছে;
ঢুলু ঢুলু আঁখি আধ অচেতন;
সরমে জড়িত শিথিল বসন;
অরুণ উষায় গোধূলির গায়
আলোকের হোলি খেলিছে;
বন বীথিকার মরমের মাঝে
মিলনের দীপ জ্বলিছে।

নিখিলের বাণী হেথা বহি আনি
জীবন জাগায় মরণে;
অস্তাচলের গোধূলির রেখা
রক্ত রাগের বরণে,—
আনে চঞ্চল প্রাণ হিল্লোল;
শাখায় শাখায় পাখী কলরোল;
গগনে পবনে মধু সমীরণে
বাজিয়ে নূপুর চরণে;
জীবনের নব চেতনা জাগায়
কার বাণী আজি মরণে?

প্রবন্ধ

যুদ্ধ ও ভারতবর্ষ

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

(তৃতীয় প্রস্তাব)

যুদ্ধকালীন ভারতবর্ষের অবস্থা বিশ্লেষণ করিতে বসিয়া যে-দৃশ্যটা আমরা প্রত্যেকে প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহার কথা না বলিলে কিছুই বলা হয় না। যাঁহারা সহরে বাস করেন, তাঁহারা, খাদ্যবস্ত্র সংগ্রহার্থ শত সহস্র নরনারীকে দোকান অথবা আড়তের সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া (যুক্তকরে ধর্ণা দিতে) থাকিতে অবশ্যই দেখিয়াছেন। সারিবদ্ধভাবে, শৃঙ্খলার সহিত দাঁড়াইয়া থাকার ইংরাজী নাম, কিউয়ে দাঁড়ান। আগেকার কালে শ্রাদ্ধ বাড়ীতে ভিখারী জমায়েত হইয়া বড় চেঁচামেচি করিত, বিশৃঙ্খলা ঘটাইত, কোন্ কোন ভিক্ষুক বার বার ভিক্ষা আদায় করিত, কিউয়ে দাঁড় করাইলে সেরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিবার আদৌ সম্ভাবনা নাই। একজন করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিবে, 'কামনার ধন' লইয়া চলিয়া যাইবে, পরবর্ত্তী ব্যক্তি অগ্রসর হইবে। ব্যবস্থা ভাল! তাই দেশশুদ্ধ লোক সকালে, বিকালে ও সন্ধ্যায় কিউয়ে দাঁড়াইয়া পড়িতেছে। রাজেন্দ্র মল্লিকের অতিথিশালায় সমাগত ভিক্ষুকের কিউয়ের সহিত এই সকল কিউয়ের ইতরবিশেষ যৎসামান্য। দ্বারবান সেখানেও ধমকায়; দোকানী বা তাহার অনুচরের রক্তচক্ষু এখানেও কম আরক্ত নহে। সেখানেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুগ্রহ-প্রত্যাশায় গৃহস্বামীর সুস্থ শরীর, বহাল তবিয়ত, খোস মেজাজের উপর নির্ভর করিতে হয়; এখানেও তদ্রূপ। পার্থক্যটা, বলিয়াছি, যৎসামান্য। অতিথিশালায় গালিটা-আসটা ধাক্কাটা-ধোক্কাটা খাইয়া বিনামূল্যে মুষ্টিভিক্ষা প্রাপ্তব্য হয়, আর এখানে উপরিগুলা অব্যাহত ত' থাকেই, উপরন্তু দ্রব্যমূল্য কড়ায় গণ্ডায় গণিয়া দিতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার মালিক যাঁহারা, তাঁহারা কলমের গুটিকয়েক আঁচড়ে দেশশুদ্ধ লোককে ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে ভাঙড়-ভোলা সাজাইয়া দিয়াছেন, ইহা কি বাহাদুরীর কথা? সেকালে পটে দেখিতাম এবং চৈত্রমাসে প্রতিমাতেও দেখিতাম, মাথায় মস্ত জটা ও ফোঁস কেউটে, ভস্মুরো ভুঁড়ির নীচে বাঘছাল, কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি, হাতে ত্রিশূল হিন্দুর দেবাদিদেব মহাদেব অন্নপূর্ণার সামনে দাঁড়াইয়া ভবতি ভিক্ষাং দেহি করিতেছেন। আজকাল বোধ হয় ফলে পৌত্তলিকদের পুতুল পূজায় আগ্রহের অভাব ঘটয়াছে, প্রগতির বড় বোল্ বোলাও প্রগতিভাবাপন্ন নারীচিত্রেরই একাধিপত্য, এই সব পট অচল হইয়া লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। তাই আজকালকার লোক হয় ত' অন্নপূর্ণা দেবীর চিত্রখানি মানস চক্ষুতে অবলোকন অথবা অনুধাবন করিতেও পারিবেন না, আমরাও অনুধাবন করাইতে পারিব না। তবে যে সকল পত্নীনিষ্ঠ পুরুষোত্তম মাসকাবারে আফিসে প্রাপ্ত যথা এবং সর্ব্বস্ব শ্রীকোমলকরকমলেষু করিয়া আফিসযাত্রার প্রাক্কালে ধড়াচুড়াবদ্ধ হইয়া পরমাগতির নিকট ট্রাম ভাড়া, জলখাবার, সিগারেটের খরচ বাবদ কয়েকটি তাম্র অথবা দস্তাখণ্ডের জন্য কৃতাঞ্জলিপুটস্থ হইতে অভ্যস্ত, তাঁহাদের বোধ হয় দৃশ্যটা পরিকল্পনা করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। রাষ্ট্র-পরিচালকগণ ইহা ভালভাবেই অবগত আছেন, তাই দেশশুদ্ধ লোকের জন্য কিউয়ের ব্যবস্থা করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। আরও একটু তারতম্য আছে। শিব ভিক্ষা মাগিয়াছিলেন পত্নীর কাছে; আমরা হাতজোড় করিতেছি, দেবতার কাছে নয়, স্বর্গের ত দূরের কথা, গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবীর কাছেও নয়, বিভীষণ-দর্শন দোকানীর কাছে, তা' ও কাঞ্চনমূল্য সহিতে। আবার কিউয়ে দাঁড়াইয়া করজোড়ে ধর্ণা দিলে যদি প্রয়োজনমত খাদ্য সামগ্রী মিলিত, তাহা হইলেও না-হয় কলির মহাদেব হইতে অগৌরব ছিল না। কিন্তু বরাত

দোষে মাসের অর্দ্ধেক দিন, এটা পাওয়া যায় ত' ওটা বাড়ন্ত, সেটা মিলে ত' অন্যটার সাপ্লাই নাই। বোধকরি কোনও ভুক্তভোগীরই ইহা অজানা নাই। সরকারী বড় কর্ত্তারা বলেন, বদমায়েসদের দোষে রেল জাহাজ চলাচল ব্যাহত হওয়ার ফলে, মাল আনা-নেওয়ায় বিঘ্ন ঘটিতেছে, তাই এত অব্যবস্থা; জনগণের তাই এত কষ্ট, এত অসুবিধা। নতুবা সকলেই দুধে-ভাতে সুস্থ সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেন।

তাঁহারা মহাশয় ব্যক্তি, আর আমরা ক্ষুদ্র প্রাণী, তাঁহাদের কথার উপর কথা কহিব না, প্রতিবাদও করিব না, কেবলমাত্র তাঁহাদের মনিবের মনিব, তস্য মনিব সেক্রেটারী অফ ষ্টেটের ২১শে জানুয়ারী তারিখের বেতার বক্তৃতার কিয়দংশ শ্রদ্ধাবনত চিত্তে এখানে উদ্ধৃত করিব।

"The food situation in India is causing considerable anxiety. Last year's food crops were in general satisfactory but the loss of Burma rice of which about one and half million tons normally go to India coupled with increased demands in the army and the serious failure of the millet crop in certain parts have caused prices to rise and food to become in many parts not only dear but scarce."

ইহার ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। মোদ্দা কথাটা এই যে, শুধু দুর্ম্মূল্য নয়, খাদ্যবস্তুর বাস্তবিক অভাব ঘটিয়াছে। ভরসা করি মহাশয় ব্যক্তিগণ এই উক্তির পরে আর আজে বাজে কথা বলিয়া অভাজনদের বক্র হাস্যের কারণ ঘটাইবেন না।

সরকারের তরফ হইতে খাদ্যবস্তুর অভাব মোচন করিবার জন্য স্থায়ী অথবা অস্থায়ী, আশু কিম্বা বিলম্বিত কোন উপায় অথবা পরিকল্পনা হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। খাদ্যবস্তুর অভাব স্থায়ীভাবে মোচন করিবার চেষ্টা করিবার মত বিদ্যাবুদ্ধি আছে কি না, সে বিষয়ে আমরা বরাবর সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছি। "বঙ্গশ্রী"র পৃষ্ঠায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় পাঁজি পুঁথি সাক্ষ্য সাবুদ এজাহার জবানবন্দী সওয়াল পাল্টা সওয়াল দাখিল করতঃ গলদ কোথায় ও কতখানি তাহাও দেখাইতেছেন এবং গলদ দূরীকরণের পন্থা ও উপায় বাৎলাইয়া দিতেও কসুর করেন নাই। কিন্তু কে কাহার কথা শোনে? সরকারী অভিধানের নির্দ্দেশমত "বিশেষজ্ঞ" হইলেও বা কথা ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ শুধুই শ্রী এবং মাত্রই ভট্টাচার্য্য! তবে মনে হইতেছে, এতো-কাল পরে খাদ্যবস্তুর অভাবটা যখন খোদ বড় কর্ত্তা কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে, তখন অভাব মোচনের সত্যকার পন্থাটা জানিবার আগ্রহও হয়ত হইবে—অন্ততঃ হওয়া উচিত।

স্থায়ীভাবে অভাব দূরীকরণের চেষ্টার কথা পরে হইবে, অস্থায়ীভাবে দূর করিবার চেষ্টা আদৌ যে হয় নাই—আজও হইতেছে না, তাহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। ভারতের খাদ্যবস্তুর অভাব যে বহুদিন যাবত ঘটিয়াছে, ভারতবর্ষে থাকিয়া রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ এতদিন পর্য্যন্ত সে কথা গোপন করিয়া মূলে ভুল করিয়াছেন। অনেককাল পূর্ব্বেই সেক্রেটারী অফ ষ্টেটকে খবর দেওয়া সঙ্গত ছিল। এই তথ্য জানা থাকিলে অস্থায়ীভাবে অভাব মোচনের চেষ্টা করিতে হয়ত তিনি পারিতেন। আর কিছু যদি না পারিতেন, আমেরিকার সহিত ধারকর্জ্জ ব্যবস্থায় ভারতবর্ষে কামান বন্দুক গোলা-বারুদের সঙ্গে জঠর-কামানের বারুদ প্রেরণের ব্যবস্থাও হয়ত করিতে পারিতেন। ভারতে খাদ্যবস্তুর অভাব ঘটিয়াছে জানা থাকিলে লক্ষ লক্ষ সৈন্যসামন্ত পাঠাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের দক্ষিণহস্তের ব্যবস্থাটা কিরূপ হইবে সে চিন্তাও তিনি হয়ত কথঞ্চিত করিতে পারিতেন। মূল রোগের চিকিৎসা হইবার সম্ভাবনা আদৌ ছিল না, এখনও নাই, তবু উপসর্গগুলাকে সাময়িকভাবে দমন করা নিতান্ত অসম্ভব হইত না। ভারতবর্ষের কয়েকটি প্রদেশে চাল, আর কয়েকটি প্রদেশে আটা প্রধান খাদ্য। কিছুকাল ধরিয়া দুইটি প্রধান খাদ্যেরই অভাব ঘটিয়াছে। পৃথিবীর অন্য কোন দেশ হইতে চাল আমদানী করা (এক ব্রহ্মদেশ ব্যতীত, এখন যাহা একেবারেই অসম্ভব) সম্ভব নয় বটে কিন্তু আটা (গম) অনেক দেশেই পাওয়া যায় এবং চেষ্টা করিলে আনানও চলে। লোকে যদি চালের পরিবর্ত্তে কতকটা করিয়া আটা পাইত, তাহা হইলেও, যাহা হয় করিয়া চালাইয়া দিতে পারিত। উদর নামক চুল্লীটির ভিতরে জ্বালানী বস্তু সব সময়েই কিছু না কিছু দিবার দরকার হয়; না দিতে পারিলেই হাহাকার! কাঠ, কাঠ না হয় কয়লা, তা'ও না জুটে, ঘুঁটে—যা' হোক্ কিছু চাই; নহিলে চক্ষুঃস্থির; হাহাকার! দেশের চারিদিকে আজ সেই হাহাকার!

আমরা কয়েকটি ছত্র আগে বলিয়াছি যে, স্থায়ী অথবা অস্থায়ীভাবে হাহাকার দুরীকরণের চেষ্টা হইতেছে বলিয়া শুনি নাই। কথাটা-ঠিক নয়। রাজধানী নয়াদিল্লী হইতে তারে ও বেতারে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে যে,শ্রীপাট বিলাত হইতে একজোড়া খাদ্য বিশেষজ্ঞ আনাইয়া ভারতের এই দারুণ সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা হইবে। গম্ভীর প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া চাপল্যের প্রশ্রয় দিতে নাই, মানুষের মর্ম্মভেদী দুঃখের কথা লইয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করাও অসঙ্গত, নতুবা নাটকের ভাষায় বলিতাম, "ফিরোজা লো শুনে হাসি পায়।" যদি শুনিতাম, প্যারী হইতে লোমনাশক সাবানের বিশেষজ্ঞ আসিতেছে, হাসিতাম না। যদি শুনিতাম, সুগন্ধ হেয়ার লোসন বিশেষজ্ঞ আমদানী হইতেছে, হাসিতাম না। যদি শুনিতাম, টিনে ভরা তাজা মাংস বিশেষজ্ঞ আনা হইতেছে, হাসিতাম না। যদি শুনিতাম, পাকা চুল কাঁচা করার বিশেষজ্ঞকে কল্ দেওয়া হইতেছে, হাসিতাম না। যদি শুনিতাম, নারীদের শাড়ী জঙ্ঘার উপরে দেড় হাত ও ব্লাউজ বুকের নীচে এক হাত নামাইয়া সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের কসরৎ শিখাইবার জন্য বিশেষজ্ঞকে এরোপ্লেন চার্টার করিয়া আসিতে আদেশ দেওয়া হইতেছে, তাহাতেও হাসিতাম না। ভাবিতাম, যার কর্ম্ম তারে সাজে! কিন্তু ভারতবর্ষের খাদ্যসঙ্কট সমস্যা সমাধান করিতে সেই বিলাত হইতে বিশেষজ্ঞ আসিতেছে যে বিলাতকে পরগাছা বলিলেও বেশী বলা হয় না। পরগাছা নানা রকমের আছে, বিলাত পরগাছাদিগের মধ্যে নৈকষ্য কুলীন স্থানীয়। খাদ্যের ভাণ্ডারে শ্রীশ্রীভবানী তাহার চিরবিরাজিতা।

বিশেষজ্ঞ প্রসঙ্গে কয়েক বৎসর পূর্ব্বের রাজকীয় কৃষি কমিশনের বিশেষজ্ঞ আমদানীর কথা মনে পড়িতেছে। মহা-সমারোহ সহকারে, বহুৎ ঢাকঢোল বাজাইয়া, অজস্র অর্থব্যয় করিয়া কয়েকটি খাসবিলাতী—বনিয়াদী বিশেষজ্ঞ আনা হইয়াছিল। তাঁহারা গবেষণা করিয়াছিলেন, গভীর; খানা-পিনা চলিয়াছিল, প্রচুর, সাক্ষ্যসাবুদ লইয়াছিলেন, বিস্তর। আশা ভরসা দিয়াছিলেন ঝুড়ি ঝুড়ি! ফলতঃ অষ্টরম্ভা কিরূপ কাঁধি কাঁধি ফলিয়াছিল তাহা কাহারও অজানা নাই। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের যিনি সর্ব্বপ্রধান রাজপুরুষ, অষ্টরম্ভার চাষে তাঁহার কৃতিত্বও বড় কম ছিল না। সুতরাং বিলাতী খাদ্য বিশেষজ্ঞদ্বয় শীঘ্র ভারতে আসিয়া খাদ্য সমস্যা সমাধান কতখানি করিবেন তাহা আমরা অনুমান করিতে একটুও কষ্ট অনুভব করিতেছি না। তবে বিনি সূতার হার বিনা, কথায় কাব্য রচিতে যাঁহারা সুনিপুণ তাঁহারা ছেঁড়াচুলে বকুল ফুলে মালা গাঁথিয়া দিতে কেন না পারিবেন?

আমাদের মূল কথা এই যে, দ্বন্দ্ব কলহ এবং যুদ্ধবিগ্রহের মূল কারণ, খাদ্যাভাব। খাদ্যাভাব ছাড়া অন্য কারণও আছে, পৌষ মাসের "বঙ্গশ্রী"র প্রথম প্রবন্ধে তাহা বিশদভাবেই আলোচিত হইয়াছে, পরেও হইবে। কিন্তু আমরা যে বলিয়াছি খাদ্যাভাবই সকল অশান্তির মূল, কতকগুলি ছোট বড় দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইব। একটি আধুনিক যৌথ অথবা একান্নবর্ত্তী সংসারের কথাই ধরা যাক। সংসারটির পুরুষ মাত্রেই যদি উপার্জ্জনক্ষম হয় এবং সংসারযাত্রা সুনির্ব্বাহ হয়, তাহা হইলে ভাইয়ে ভাইয়ে অথবা জায়ে জায়ে বিরোধ ও মন কষাকষি হইবার সম্ভাবনা অল্প নয় কি? কিন্তু একের উপার্জ্জন যদি অপরের অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে যাহার উপার্জন কম তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইবার লোকাভাব সেই সংসারে হয় না। সেই অসন্তুষ্টি প্রথমে আত্মপ্রকাশ না করিলেও ভিতরে ধূমায়িত হইতে থাকে এবং একদিন উৎকটরূপ ধারণ করিয়া সংসার অশান্তির আগার করে। এককালীন বহু সমৃদ্ধ ও সন্তুষ্ট পরিবারের ভগ্নদশার ইতিবৃত্তের সন্ধান করিলে এই উক্তির সত্যতা উপলব্ধি হইবে। হাতের পাঁচটা আঙ্গুল সমান নয়, পাঁচটা পাঁচ রকমের, সংসারের পাঁচটা লোক যে এক মনের ও এক আচার ব্যবহারসম্পন্ন হইবে তাহাও নয় বটে কিন্তু দেখা যায়, সংসারে যখন সচ্ছলতা থাকে, লক্ষ্মীশ্রী যতদিন অক্ষুণ্ণ থাকে, ততদিন—পাঁচটা পাঁচ রকমের আঙ্গুলও যেমন একযোগে তাহাদের করণীয় কর্ম্মগুলি করিয়া যায়, সংসারের পাঁচটি ভিন্ন প্রকৃতির মানুষেরও বণিবনাও করিয়া চলিয়া যাইতে বাধে না। কিন্তু অভাব সূচিত হইবামাত্র মানুষ আত্মপরায়ণ হইতে হইতে এমন আত্মসর্ব্বস্ব হইয়া উঠে যে আপনারটি ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাবে না, সহ্য করিতেও পারে না। তখন ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ উপস্থিত হয়। ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব কলহ হইবার পূর্ব্বে, সংসারে যাহারা স্থানান্তর হইতে আনীত হইয়া সযত্নে রোপিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে উষ্মা

ও অসন্তুষ্টি রূপ পরিগ্রহ করিতে সুরু করে এবং সেই তুষের আগুনই একদিন দাবানল উৎপাদন করিয়া তাহার স্বকার্য্য সিদ্ধ করে। আমাদের দেশের হিন্দু মুসলমান বিরোধের মূলগত কারণ যিনি যাহাই বলুন না কেন, খাদ্যের অভাবের মধ্যেই যে তাহার বীজ নিহিত ছিল তাহাতে আমাদের এতটুকু সন্দেহ নাই। অন্য কারণ হয় ত' ছিল, এখনও আছে, পরেও থাকিতে পারে কিন্তু সেগুলিকে গৌণ কারণ বলিয়া গণ্য করিতে আমার আদৌ দ্বিধা নাই। এই হিন্দুস্থানে একদিন হিন্দু ব্যতিরেকে অন্য জাতি বা ধর্ম্মের লোক ছিল না ইতিহাসে ইহা লিখিত আছে। মাঝে মাঝে যাহা বিজাতী, বিদেশী ও বিধর্ম্মীরা এদেশে হানা দিয়াছে এবং সে সময়ে কিছু মারামারি, কাটাকাটি হানাহানি হইয়া থাকিতে পারে; কিন্তু যে জাতি বর্ণ ধর্ম্মের লোকই তাহারা হউক না কেন, যেদিন হইতে বসবাস করিতে সুরু করিয়াছে, বন্ধু ভাবে ভ্রাতৃ ভাবে এক দেশের সন্তানের মতই বসবাস করিয়াছে। এক আকাশের তলে ঘর বাঁধিয়া, এক নদীর জল পান করিয়া একই মাটির শস্যে উদর পুরিয়া, এক রৌদ্রে তাতিয়া, এক জ্যোৎস্নায় হাসিয়া তাহারা এক দিল্ এক প্রাণ হইয়া পড়িতে খুব বেশী দেরী করে নাই, ইতিহাস একথাও গোপন করে নাই। আমার পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহারা বয়স্ক, অভিজ্ঞ এবং বাঙ্গালা দেশের পল্লীগ্রামের পুরাবৃত্তের সহিত পরিচিত তাঁহাদের পিতামহ প্রপিতামহের সহিত বিধর্ম্মী অথবা ম্লেচ্ছদিগের কিরূপ আত্মীয়তা ছিল তাহা হয় ত অবগত আছেন। হিন্দুর গৃহে করিম কাকা, রহিম মামা, জলিল জ্যাঠা, অন্য পক্ষে মুসলমানের গৃহে বনমালী খুড়া, তারক জ্যাঠা, মহিন মামার সংখ্যা অল্প ছিল না। হিন্দুর বাড়ীর পাল পার্ব্বণে এমন কি প্রতিমাপূজার দালান ও চণ্ডীমণ্ডপে ঠাকুর দেখিয়া ঠাকুরের প্রসাদ পাইতে মুসলমান নরনারীকে কম লালায়িত দেখা যাইত না। আর মুসলমানের পীরের দরগায়, মুসলমানের দেবতাকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি-অর্ঘ্য দিতে হিন্দু নরনারী সেকালে ত' ছিলই আজও আগ্রহান্বিত আছে। আজ হিন্দুর প্রতিমা দেখিলে মুসলমান লাঠি ঘাড়ে তাড়াইয়া আসে, নমাজোত্থিত আজানরবে হিন্দু নেড়া মাথা ফাটাইতে ছুটে। চিন্তা করিলে কি ইহাই মনে হয় না যে, মাথাকাটাকাটির হেতুটা উত্তরকালে গজাইয়াছে। এই উত্তরকালটার সুরু কবে হইতে এবং কেনই বা এই উত্তরকালের উদ্ভব হইল? আমি ঐতিহাসিক নহি, ইতিহাস গবেষণা করিবার অধিকারীও নহি; অত্যন্ত স্থূল বুদ্ধির মানুষ হইয়াও অকুতোভয়ে এই কথা বলিতে পারি যে, যেদিন হইতে মড়াইয়ে ধান কমিয়াছে, গোয়ালের গরুর দুধ মন্দা হইয়াছে, পুকুরে মাছের ঘাই ঘুচিয়াছে সেই দিন এই উত্তরকালের সূচনা হইয়াছে। উত্তরকালারম্ভের হেতুও ঐ। সেইদিন হইতে দ্বেষ বিদ্বেষও ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করিল। শুধু যে হিন্দু মুসলমানকে এবং মুসলমান হিন্দুকে দ্বেষ করিতে শিখিল তাহাই নহে, স্বজাতি, স্ববর্ণ ও স্বধর্ম্ম মধ্যেও দ্বেষ বিদ্বেষ প্রধূমিত হইতে আরম্ভ করিল। ব্যক্তিগত দ্বেষ বিদ্বেষ ক্রমে অভাবের বিষাক্ত বায়ুর তাড়নায় সাম্প্রদায়িক রেষারেষি কলহে, দাঙ্গাহাঙ্গামা খুন জখম করিতে লাগিল। আজ অভাব করালবদন ব্যাদান করিয়া আছে, সাম্প্রদায়িক কলহও প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ঐতিহাসিক, ইতিহাসের গবেষক, ইতিহাসের টেক্স্ট বুক লেখক হইবার সৌভাগ্য অর্জ্জন না করিয়াও এখানে সামান্য একটু ইতিহাস বলিতে চাই, আশা করি পাঠক ও পাঠিকা লেখকের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন—আর মার্জ্জনা করিতে একান্ত যদি অপারক হন তাহা হইলে উপেক্ষা করুন, ইহাই বিনীত নিবেদন।

এদেশে ইংরাজের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর, ইংরাজ স্বাভাবিক নিয়মে ও কারণে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারে যত্নবান হইয়াছিলেন। তাঁহাদের যে উদ্দেশ্যই থাকিয়া থাকুক না কেন, ভারতবাসীদিগের মধ্যে একটি বৃহৎ সম্প্রদায় ইংরাজী শিক্ষার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বুঝিয়া তৎপ্রতি অবহিত হইতে থাকেন এবং অচিরকাল মধ্যে ইংরাজীতে ব্যুৎপন্ন হইয়া পড়েন। ব্যুৎপত্তি মাত্রা অতিক্রম করিতেও বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। এমন একটা দিন এদেশে আসিয়াছিল যেদিন আহারে বিহারে, আচারে ব্যবহারে, পোষাকে পরিচ্ছদে, চলনে বলনে তাঁহাদের প্রীতি ভক্তির রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল এবং ক্রমশঃ এমন দিন আসিয়াছিল, যেদিন ইঁহাদের ইংরাজ-ভক্তি অতি-ভক্তির রূপ ধারণ করিয়াছিল। সমসাময়িক সাহিত্য যদি সমসাময়িক সমাজের দর্পণ বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলে যে দিনটির কথা আমি বলিতেছি, সে'দিন'টি দীনবন্ধু মিত্রের "সধবার একাদশী," সাহিত্যের রাজাধিরাজ

বঙ্কিমের "বিষবৃক্ষ" প্রভৃতি বহু গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। তৎকালীন নায়কদিগের নাম অথবা কার্য্যকলাপ পাঠক-পাঠিকার অজ্ঞাত থাকিবার কথা নয়। 'নিমচাঁদ,' 'দেবেন্দ্র দত্ত' প্রভৃতিকে ভুলিতে পারা কি সহজ কথা? ইহাপেক্ষাও বড় কথা আছে। বঙ্কিমচন্দ্র এমন আশঙ্কাও করিয়াছিলেন যে একদিন দুর্গা পূজার মন্ত্রও বুঝি বা ইংরাজীতে রচিত ও উচ্চারিত হইবে। আমরা উহার দোষগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হই নাই। আমাদের বক্তব্য, যে সম্প্রদায় ইংরাজ ও ইংরাজীকে সমাদরের সহিত বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, স্বাভাবিক নিয়মে ও স্বাভাবিক কারণেই সেই সম্প্রদায়ই রাজ-প্রসাদ লাভ করতঃ শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিলেন। সম্প্রদায়ের সকলেই যে সমৃদ্ধ হইতে পারিয়াছিলেন, এমন নয়; বরং একটি অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশই প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছিলেন। আর অপর যে বৃহৎ সম্প্রদায়টি ইংরাজ ও ইংরাজী শিক্ষাকে সন্দেহের চক্ষুতে দেখিয়াছিলেন, স্বাভাবিক নিয়মে ও স্বাভাবিক কারণেই রাজানুগ্রহে বঞ্চিত থাকিতে হওয়ায় তাঁহাদিগকে সর্ব্বরকমে পিছাইয়া পড়িতে হইয়াছিল। কিছুকাল পর্য্যন্ত এই সম্প্রদায়টি ভাগ্যবান সম্প্রদায়ের পানে বিস্ফারিত নয়নে ও নীরবে চাহিয়া দিনাতিপাত করিয়াছিল সত্য; কিন্তু অভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক শ্রীহীনতা আগেকার সেই বিস্ফারিত নয়নে ঈর্ষার রক্তরাগ সঞ্চারিত করিতে সুরু করিল। ইহাকেও অস্বাভাবিক ও অনিয়মানুগ বলা যায় না। রাজানুগ্রহ যে বহু কল্যাণের আকর তাহা বুঝিয়া তাহারাও ঘোড়দৌড় আরম্ভ করিয়া দিল। নিজের শ্রীবৃদ্ধি, নিজ পরিজনবর্গের শ্রীবৃদ্ধি, নিজ সমাজের শ্রীবৃদ্ধি, ও সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি না চায় কে? সেই সময় হইতেই রাজনীতি-ক্ষেত্রে, চাকরীক্ষেত্রে, ব্যবসাক্ষেত্রে হিংসা, ভাগা-ভাগি, দ্বেষাদ্বেষী, রেষারেষি চল্ হইল। জীবন-সমুদ্র তরঙ্গায়িত, অভাব-বাত্যা তাহাতে তুফান তুলিল। চতুর রাজনীতিকদের ক্ষেপণী ক্ষেপণে তরণী কখনও কখনও 'নেচে নেচে ভেসে ভেসে' কখনও ডুবু ডুবু যায় যায় করিয়া ভাসিয়া চলিল। তুফানের বিরাম নাই, ঝটিকাবর্ত্তেরও অন্ত নাই, তরণী কর্ণধারহীন, অনিপুণ হস্তের ক্ষেপণী কতক্ষণ টাল সামলাইবে? ভরাডুবী অবশ্যম্ভাবী। চক্ষুষ্মান দর্শক কি ভীতিবিহ্বলনেত্রে সেই আশু ভরাডুবিই প্রত্যক্ষ করিতেছেন না?

যাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে রাজপ্রসাদ লাভ করতঃ শ্রীসম্পন্ন হইয়া গর্ব্বস্ফীত নয়নে ধরাকে মধুপর্কের বাটী কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন, দুই তিন পুরুষান্তে তাঁহাদের যে দশা ঘটিয়াছে তাহা আমরা সকলেই সাদা চোখেই দেখিতে পাইতেছি। সে সঙ্গতি কোথায়? সে সমৃদ্ধিই বা কোথায়? সে স্বাস্থ্য কৈ? সে স্ফূর্ত্তি কৈ? সে শ্রীই বা কোথায় গেল? ধনের গৌরব, বিদ্যার গৌরব, জ্ঞানের গৌরব, পদবীর গৌরব, খেতাবের গৌরব, চাকরীর গৌরব শুষ্ক শূন্য উদরের কাছে কতখানি ম্লান, তাহা কি আমরা সকলেই অনুভব—মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব, করিতেছি না? অপর সম্প্রদায়ের অবস্থাও তথৈবচ, তাহাও প্রত্যক্ষ করা যায়।

হিন্দুরা যখন রাজপ্রসাদ লাভের সর্ব্বপ্রথম সুযোগ পাইয়াছিল, তখন রাজানুগ্রহ কেবল মাত্র কাগজে-খেতাবেই সীমাবদ্ধ ছিল না, অনুগ্রহের সঙ্গে রত্নকণাও থরে থরে সজ্জিত ছিল। দেশের শ্রী হানি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রত্নরাজিও অবলুপ্তপ্রায়। কাজেই পরবর্ত্তীকালে রাজকৃপা যাঁহাদের অদৃষ্টে বর্ষিত হইয়াছে, রাজা করুণা বিতরণে কার্পণ্য না করিলেও, পূর্ব্বের অনুপাতে তাহা সোনাদানা হীরা-জহরতে বিমণ্ডিত হইতে পারে নাই, তাই পরবর্ত্তীকালের সম্প্রদায়ের ক্ষুন্নিবৃত্তি কিছুতেই হইতেছে না। যতই পাওয়া যাক্ না কেন, সমৃদ্ধি সঞ্চয় দূরের কথা, দৈনন্দিন অভাবই ঘুচিতেছে না। আমরা দেশের যে সর্ব্বত্রই "আবার খাব" রবে আর্ত্তনাদ শুনিতে পাই, ইহা সেই ক্ষুধিতের হাহাকার ব্যতীত আর কিছুই নয়। রাজনীতিকেরা যে নামকরণই করুন না কেন, আমরা ইহাকে অন্নহীনের হা অন্ন বলিয়াই জানি।

আজ উভয় সম্প্রদায় বুঝিতে পারিতেছেন; অন্ততঃ বুঝিতে পারা উচিত যে, ইমারত তাঁহারা ভালই গড়িয়াছিলেন, উপকরণও ভালই দিয়াছিলেন, সাজসজ্জা আসবাবপত্রও খারাপ দেন নাই, তবু যে গগনচুম্বী প্রাসাদশিখর অত্যল্পকাল মধ্যেই হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া গেল, বালির উপরে রচিত সৌধ বলিয়াই এরূপ ঘটিল। বালির বাড়ীর, তাসের ঘরের ভাগ্য আদি হইতে অন্তকাল পর্য্যন্ত এইরূপই।

কথাটা আরও বিশদ করিয়া বলিতে ইচ্ছা। ইংরাজ-রাজ্যারম্ভে রাজানুগ্রহ হিন্দুদিগের শিরেই বর্ষিত হইয়াছিল। অনুগ্রহ লাভের যোগ্যতাও তাহার সম্পূর্ণ ছিল, রাজাও কৃপণ

ছিলেন না। হিন্দু ভরপুর, প্রাণ পুরিয়া অমৃত পান করিয়াছিল। ভাগ্যবশে এই পথে সে একমেবাদ্বিতীয়মই ছিল। পরে মুসলমান তাহার পূর্ব্বেকার ভ্রান্তি বুঝিয়া, ভুলের শোধ—পাওনা গণ্ডা কড়ায় ক্রান্তিতে উদ্ধার করিতে উদ্যত হইল, তখন হিন্দুরা যে সেই কাজটা ভাল চোখে দেখিতে পারিল না, ইহা বলা বাহুল্য। মাতৃক্রোড়ে ও মাতৃবক্ষে ভাগীদার দেখিলে অতি অবোধ শিশুও প্রসন্ন হয় না। দ্বেষ-বিদ্বেষ রোষ-বিরোধ তাহার কচি বুকখানিতে কুসুম-কীটের মত বাসা বাঁধিতে তখনও পারে নাই সত্য তথাপি ভাগীদার দেখিলে তাহার ভাবে ভঙ্গীতে ভাষায় যে আচরণ প্রকাশ পায়, তাহাতে আর যাহাই থাক, হৃদ্যতা থাকে না। মুসলমান সত্য সত্যই একাধিপত্য নষ্ট করিতে উদ্যত এবং তাহার অন্নের হস্তান্তরক বুঝিয়া হিন্দু কত না আপত্তি করিল; কত মিটিং করিল; কত বক্তৃতা দিল; কত প্রবন্ধ লিখিল; কত গালাগালি পাড়িল; কত কথা অকথ্য, শ্রাব্য অশ্রাব্য ভাষায় নিন্দাবাদ প্রচার করিতে লাগিল। মুসলমানেরা দেখিল, এ ত মজা মন্দ নয়! যে যত পায়, সে তত চায়। দেড়-শতাধিক বৎসর ধরিয়া সর্ব্বস্ব উদরসাৎ করিয়াও হিন্দুর দামোদর পূর্ণ তৃপ্ত নহে, রাজানুগ্রহে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বসাইতে চায়। রাজানুগ্রহ দেবানুগ্রহের মত অন্ধ নয় (?), সদ্যোজাগ্রত মুসলমানকে তাহার প্রাপ্য দিতে কুণ্ঠিত হইল না। হিন্দুদের ভাগ কমিতে আরম্ভ করিল। হিন্দু ক্ষুব্ধ, অপরে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতে লাগিল। বিরোধ বাধিল ভাল। এতকালের বুভুক্ষু মুসলমানের ক্ষুধা স্বভাবতঃই অধিক, দাবীর মাত্রা তাহার বৃদ্ধি পাইতেই লাগিল। সিংহভাগ না হইলে মন উঠে না। হিন্দুরা বড়ই অসন্তুষ্ট। মুসলমানকে গালি ত' দিলই, রাজাকেও রেহাই করিল না। সুর পর্দ্দায় পর্দ্দায় চড়িতে চড়িতে লাঠি সোটার বাস্তিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মাঝে মাঝে রক্তের নদীতেও ঢেউ উঠে।

হিন্দুর শনির দশা! মুসলমান ভাগীদারকে ঠেকাইতেই সে বিব্রত ছিল, তাহার আর এক প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া হইল। বৈষ্ণবের ভাষায় ইহারা ছিল, তৃণাদপি সুনীচেন, তরুরিব সহিষ্ণুনা। এদিক হইতে বিপদ কখনও যে আসিতে পারে হিন্দু তাহা সুদূর কল্পনাতেও চিন্তা করে নাই। কিন্তু অভাবিত বিপদ আসিল। শুধু আসিল নয়, বেশ ঘোরালো করিয়াই আসিল। শত সহস্র বৎসরের লাঞ্ছনা, উপেক্ষা, ঘৃণা প্রতিহিংসাবিষজর্জ্জরিত হইয়া আজ সহস্রফণা বাসুকীর রূপ ধরিয়া এমন মাথা নাড়া দিয়াছে যে ধরিত্রী টল্ মল্ করিতেছে। অস্পৃশ্য, অনুন্নত, উপেক্ষিত সম্প্রদায় আজ হিন্দুর ভাণ্ডোর ভাগীদার। ইহাদেরও নূতন ক্ষুধা, বহুদিনের সঞ্চিত ক্ষুধা—রাজানুগ্রহে তাহাদেরও অধিকার আছে এবং রাজা একান্ত একদেশদর্শী না হইলে তাহাতে বঞ্চিত রাখা সম্ভব হয় না। হিন্দুর ষোল আনার আট আনা আগেই পরহস্তগত হইয়াছিল, আরও দুই আনা চার আনা যাইতে বসিল। হিন্দু আর একবার তাহার অস্ত্রাগার হইতে শানিত অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

হিন্দু দেখিতেছে, মুসলমানও (বোধ হয়) দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে, নবাগত অনুন্নত সম্প্রদায় যদি আজও না দেখিতে পাইয়া থাকে—শীঘ্রই দেখিতে পাইবে যে, কাউন্সিল এসেম্বলীতে ভোটাধিকার লাভ করিলে, সদস্য হইলে, গোটা-কতক বড়, মাঝারি ও ছোট চাকুরী পাইলেই অভাব ঘুচে না; নাই-নাই রবের শেষ হয় না; সম্প্রদায় বা সমাজের অবস্থার উন্নতি হয় না। কাউন্সিল এসেম্বলীতে স্থান এত প্রশস্ত নয় যে সর্ব্বসম্প্রদায়ের সর্ব্বলোকের জন্য একটি একটি গদি মোড়া আসন ধরাইতে পারা যাইবে; সরকারী চাকুরী জাম-গাছের ফল নয় যে নাড়া দিলেই কোঁচড় ভরিয়া উঠিবে। যে সম্প্রদায়ের মুষ্টিমেয় যে কয়জন লোক কাউন্সিল এসেম্বলীতে গণ্য-আসন অধিকার করিতে পারিয়াছে আর আঙ্গুলে গণনা-করা সরকারী চাকুরীতে যে কয়টি লোক নিয়োগ পাইয়াছে, সেই সম্প্রদায়ের বাকী লোকগুলি সেই লোক কয়টির পানে ঈর্ষাপূর্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিবে ইহাও একান্তই স্বাভাবিক। একের, দুইয়ের অথবা দশের উদর পূর্ত্তিতে যদ্যপি সম্প্রদায়ের অপর সকলেরই জঠর ভরিয়া উঠিত, তাহা হইলে কোন কথা ছিল না। কিন্তু যিনি উদর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহার বিধান অন্যরূপ, প্রক্সির ব্যবস্থা তাহাতে ছিল না। তাই রায় বাহাদুর, খান বাহাদুর জাতীয় ভাগ্যবানগুলির আহারের পরের হেউ হেউ ধ্বনি অন্য সকলের নিকট ঘেউ ঘেউ বলিয়া মনে হইতেছিল। এখন সে হেউ হেউ-ও নাই।

যত মোটা মাহিনাই পান্, দেখা যায়, অভাব ঘুচে না; অভাব যদি বা ঘুচে, স্বাস্থ্যের অভাব; স্বাস্থ্য যদি বা থাকে,

মানসিক শান্তি নাই; ছেলে বয়াটে, মেয়ে বিধবা, পত্নী চিররুগ্না। উৎপাতটা কি কম? উৎপাতের মাত্রা বাড়িতে বাড়িতে চরমে পৌঁছিয়াছে। শুধু এদেশে নয়, সর্ব্বত্র ঐ এক কথা।

মহাচীনের বর্ত্তমান রাজধানী চুংকিং হইতে কয়েকদিন আগে চীনের হোষান্ প্রদেশের ভীষণ দুর্ভিক্ষের যে ভয়ঙ্কর সংবাদ পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। সংবাদটি এই—হোষান্ প্রদেশে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। কাতারে কাতারে নরনারী হোষান্ পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে। পথে হাজার হাজার লোক অনাহারে মরিতেছে। লোকে নিজ নিজ পুত্র কন্যা—বিশেষ করিয়া কন্যাসন্তান বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পিতামাতার চোখের সামনে পুত্রকন্যারা অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে। অনেকে পেটের জ্বালায় বিষাক্ত বৃক্ষের ছাল পাতা মূল ভক্ষণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে। হোষান্ যেন এক মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে। গ্রামগুলি জন-মানবহীন, বৃক্ষ পত্রবিহীন, শত শত মাইলের মধ্যে কোথায়ও একটি গৃহপালিত পশুর চিহ্ন পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না।

পাঠক ইহার সহিত আমাদের এই সোণার বাঙ্গালার এককালের চিত্র মিলাইয়া লউন।

"লোক প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, পরে কে ভিক্ষা দেয়! উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তারপর রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ী বেচিল, জোৎ জমা বেচিল। তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর, মেয়ে ছেলে কে কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল। ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল। আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুকুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল। যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।"

সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশে যে মন্বন্তর সম্ভব হইয়াছিল, অন্যত্র যে তাহা অবশ্যই হইতে পারে তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। যে ভবিষ্যদ্রষ্টা মহাপুরুষের লেখনী-মুখে ঐ ভীষণ চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তিনি সেই সময়কার দেশের এই ভয়ঙ্কর অবস্থার যে কারণ বর্ণিত করিয়াছিলেন, আজিকার দিনে, চক্ষুষ্মান ব্যক্তির চোখের উপরে সেই কারণগুলি জাজ্জ্বল্যমান কি না, পাঠক-পাঠিকাই তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

"১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ্য হইল। লোকের ক্লেশ হইল কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল।...প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস করিল, তারপর এক সন্ধ্যা আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল, তারপর দুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল।"

পাঠক স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখুন, উক্ত চিত্রের সহিত আমাদের বর্ত্তমান জীবন-চিত্রের মিলন হইতে খুব বেশী দেরী আছে কি?

তবে, আমাদের দেশের সকলেই অল্প-বিস্তর এই আশা করিয়া বসিয়া আছেন যে যুদ্ধান্তে তাঁহাদের দুঃখকষ্টের অবসান হইবে। গত ইয়োরোপীয় যুদ্ধের সময়ে যখন লোকের দুর্দ্দশা ধাপে ধাপে উঠিতে উঠিতে চরমে পৌঁছিয়াছিল, তখনও লোকে ঐরূপ দুরাশা করিয়াছিল। উত্তেজনার পরে অবসাদ স্বাভাবিক নিয়মেই আসে; যুদ্ধের পরে যে নিষ্ক্রিয়তা দেখা দিয়াছিল, তাহাতে বাঁচিয়া থাকাই দায় হইয়া উঠিয়াছিল। সে ধাক্কা সামলাইয়া উঠিতে না উঠিতে আবার এই মহাযুদ্ধ! বিগত ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধের অবসান তারিখ হইতে এই মহাযুদ্ধের আরম্ভের দিন পর্য্যন্ত পৃথিবীর বিদ্বান, বৈজ্ঞানিক, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ পৃথিবীর জনগণের দুঃখ নিবারণ-কল্পে, কষ্ট দূরীকরণজন্য, খাদ্যাভাব (অর্থাভাব) বিমোচনার্থ এমন কোন্ কাজ করিয়াছেন, যাহাতে আজিকার পৃথিবী আশা করিতে পারে যে, এই বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের পরে ধরণীর দুঃখ কষ্ট দূর হইবে? পৃথিবীর অধিবাসীরা প্রয়োজনীয় খাদ্য পাইবে? পরিধেয় পাইবে? বাসগৃহ পাইবে? আসবাবপত্র পাইবে? অতীতের ইতিহাসের কোন্ পৃষ্ঠায় সে কথা লিখিত আছে জানিতে বাসনা হয়।

সেবারেও যুদ্ধ মিটিয়াছিল, এবারেও মিটিবে। সেবারেও যুদ্ধবিরতির পরমুহূর্ত্ত হইতেই যুদ্ধায়োজন চলিয়াছিল;

এবারও, যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে উদ্যোগ পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইতে থাকিবে। যাহারা জুয়াড়ী, জুয়া খেলে, হারিলে তাহাদের জেদ চড়িয়া যায়, পুনঃ পুনঃ জুয়া ধরিতে থাকে, ভাবে যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। এই শ্বাস ও আশ করিতে করিতে সর্ব্বস্বান্ত ও প্রাণান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জেদের শেষ হয় না। মামলা-মোকর্দ্দমার পরিণতিও এইরূপ। একটি আদালতের রায়েই যদি মামলার অবসান ঘটিয়া যাইত, তবে উচ্চ আদালত হাইকোর্ট, ফেডারেল কোর্ট, প্রিভি কৌন্সিল গঠনের কোনই প্রয়োজন ছিল না। এতগুলি আদালত শেষে মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি যখন হয়, তখন যাহা লইয়া মোকর্দ্দমা তাহার ইটকাঠের চিহ্নটুকুও থাকে না। যুদ্ধ আরও বড় জুয়া; যাহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা বড় জুয়াড়ী। যে হারিবে সে যে পরাজয় মাথায় করিয়া লইয়া গিয়া খুশী থাকিবে, এমন হয় না, হইতে পারে না। পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহার সর্ব্বস্ব পণ করিতে সে এতটুকু বিলম্ব করিবে না। যে ধন পাইলে তাহার অভাব চিরতরে বিদূরিত হইতে পারে, যে শিক্ষা থাকিলে আত্মসংযমের গুণে পারিবারিক দ্বেষ-বিদ্বেষের পরিবর্ত্তে জগৎসংসার এক অখণ্ড পরিবারে পরিণত হইতে পারে—সে ধনের সন্ধান করিতে মানুষ যতদিন না পারিবে এবং সে শিক্ষা যতদিন পর্য্যন্ত আয়ত্ত না হইবে, যুদ্ধের কারণ বিদ্যমান থাকিবেই থাকিবে। সুতরাং এই যুদ্ধ ১৯৪৩তেই মিটুক আর '৪৪এই মিটুক, দশ বিশ পঁচিশ বৎসর পরে আবার যে রণদামামা বাজিবে না, দিক্‌চক্রবাল অগ্নিবর্ণে লোহিত হইয়া উঠিবে না, এ কথা কেহই বলিতে পারিবে না। বরং অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে এই কথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে, পরাজিত জাতির বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞগণ পরাজয়ের পরদিন হইতেই বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হইবেন—কেমন করিয়া আরও অমোঘ মারণাস্ত্র উৎপাদন করিতে পারেন! কোন্ গ্যাসের দ্বারা হাজারে হাজারে নয়, লাখে লাখে মানুষকে নিশ্চিত ধ্বংসপুরে প্রেরণ করিতে সক্ষম হইবেন। কোন্ নদী ধরিয়া অথবা কোন্ গিরিবর্ত্ম পার হইয়া আক্রমণ চালাইলে কোন্ কোন্ দেশকে নির্ঘাৎ ধরাশায়ী করিতে পারিবেন। এই সকল চিন্তা এবং চিন্তাকে কার্য্যে পরিণত করিবার পন্থাই বিশেষজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিকদের জপমালা হইবে।

বিজয়ীও বিজয় বহন করিয়া ঘরে গিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে না। তাহাদিগকে সর্ব্বদা সশঙ্কিত, সন্ত্রস্ত থাকিতে হইবে। বর্ম্ম চর্ম্ম খুলিয়া আরামের নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশটুকুও মিলিবে না। ঐ আসিল, ঐ গেল, এই ভয়ে তাঁহাদের বিশেষজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিকদিগকে অস্ত্রের উতোর ও কাটাম তৈয়ার করিতে করিতেই দিনাতিবাহিত করিতে হইবে।

আর পৃথিবীর লোক, যাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পাইলে সন্তুষ্ট, নীরোগ শরীর পাইলে ধন্য, অভাব না থাকিলেই কৃতার্থমন্য, তাহাদের অবস্থাটা কি হইবে? রাষ্ট্র-নায়ক ও বিশেষজ্ঞগণ ত' বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রত, মারণাস্ত্র নির্ম্মাণে নিযুক্ত, দুঃখী জনসাধারণ তাঁহাদের উচ্চ চিন্তার বিষয়ীভূত হইতে পারে না, অতএব আজিকার দশগুণ অভাব কালে শতগুণ হইবে না ত' কি হইবে? হায় বৈজ্ঞানিক, তুমি মানুষ মারার হাজার হাজার কল বাহির করিয়াছ জানি, চোখের পলক ফেলিতে যেটুকু সময়, তাহারই মধ্যে গ্রামকে গ্রাম, সহরকে সহর জ্বালাইয়া পুড়াইয়া দিতে পার মানি; আকাশে তুমি রুদ্র, স্থলে ভৈরব, জলে তোমার তাণ্ডব—সব বুঝি, সব মানি, সব স্বীকার করি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি হে বৈজ্ঞানিক, একটা মানুষের জীবন দানের চেষ্টা কেন করিলে না? একটি মানুষের অকালমৃত্যু নিবারণ করিয়া কেন তুমি ধন্য হইলে না? বিজ্ঞানের অনেক দান, তাহা ত' চোখেই দেখা যায়! কিন্তু এমন কোন্ দান আছে যাহার দ্বারা জগৎ উপকৃত, জগতের অধিবাসী উপকৃত হইতে পারিয়াছে? আমরা অজ্ঞ মূর্খ—মূর্খাধিক মূর্খ, কিন্তু তুমি ত' বিদ্বান, তুমি ত' পণ্ডিত, তুমি ত' মহামহোপাধ্যায়, তুমি বল তোমার কোন্ কোন্ কার্য্যের ফলে জগতের কল্যাণ হইয়াছে? তোমার ষ্টীম প্রস্তুত করিতে হইবে তুমি পৃথিবীর ভিত খুঁড়িয়া কয়লা তুলিয়া লইলে; তোমার কলকারখানা গড়িতে হইবে, তুমি ধরণীর ভিতে আবার গাঁইতি চালাইলে, লৌহ তুলিয়া লইলে; তোমার এরোপ্লেন, বম্বার ফাইটার না উড়াইলে নয়, তুমি ধরিত্রীর সেই ভিত্তিতে আবার শাবল হানিয়া তেল তুলিয়া লইলে; তাম্র তোমার বড় প্রয়োজন, তাহাও সেই ধরণীর মণিকোঠায় রক্ষিত, তুমি কোদাল ধরিলে। রেল চালানো তোমার বড় দরকার, বড় বড় নদ নদীকে তুমি আষ্টে পৃষ্ঠে বন্ধন করিলে। তোমার বিজ্ঞানের বুদ্ধি, বিজ্ঞানের মাথা, বিজ্ঞানের মস্তিষ্ক একটিবারও কি ভাবিল যে এই কার্য্যের অব্যবহিত ফল বসুমতী সম্পদহীন রসশূন্য শুষ্ক মৃত্তিকায় পরিণত হইয়া গেল? মাতৃবক্ষে পুণ্যপীযূষধারা উদ্বেলিত হয় বটে কিন্তু জননীর সুস্বাস্থ্যের উপরই তাহার সর্ব্বনির্ভর। মাতার স্বাস্থ্যের ধ্বংস সাধন করিয়াও যাহারা আশা করে, জননীর বক্ষঃসুধা স্বর্গের মন্দাকিনী ধারার মত অক্ষয় অব্যয় ও অক্ষুণ্ণ থাকিবে তাহাদের বুদ্ধির তারিফ করিতেই হইবে। মাতৃস্তন্যের অভাবে ফুডের যে ব্যবস্থা, তাহা বৈজ্ঞানিকেরই ব্যবস্থা আমরা তাহা জানি। ফুডে মানুষ করা ছেলের সঙ্গে মাতৃদুগ্ধপুষ্ট সন্তানের তারতম্য কতখানি তাহা অবৈজ্ঞানিকেও দেখে ও বুঝে। মা-টীর স্বাস্থ্যের পরকাল ঝরঝরে করিয়াও যাহারা আশা করে যে মা-টী তাহার দেয় দিবে এবং সেই দেয় বস্তুর দ্বারা জগতের অর্থাভাব (অন্নাভাব) দূর হইবে,

তাহাদের বুদ্ধিরও দু'শো তারিফ করিতে আমরা সকলেই বাধ্য।

মা-টীকে যে নিঃস্ব স্বাস্থ্য সম্পদহীন তাঁহারাই করিতেছেন সম্ভবতঃ ইহা বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা অসাধারণ মনুষ্য, তাঁহারা খোদারও উপরআলা, অসাধ্য সাধন করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের আছে, ইহা অস্বীকার যে করে সে মহামূর্খ। আমরা আমাদিগের সম্বন্ধে এতখানি হীন ধারণা পোষণ করি না, আমরা তাঁহাদিগের প্রাপ্য দিতে রাজী আছি। সাদাকে সাদা না বলিয়া, কালোকে ধলো বলিয়া ধিকৃত ও বিড়ম্বিত হইবার কোন হেতু নাই। চোখের উপর দেখিতেছি তাঁহারা অসম্ভবকে সম্ভব করিতেছেন তবু বলিব বিজ্ঞান কুজ্ঞান মাত্র, বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞ নহেন—অজ্ঞ, আমাদের কি উনপঞ্চাশ বায়ু এতই প্রবল হইয়াছে?

বিজ্ঞবর! তোমার কোন দাবী আমরা অস্বীকার করি না। তুমি রেল ছুটাও, দেখি; তুমি দুস্তর বারিধির বক্ষঃ চিরিয়া অর্ণবপোত চালাও, দেখি; তুমি আকাশের তারা গণিয়া শেষ করিয়াছ, শুনিয়াছি; অন্তরীক্ষের বিজলীসুন্দরীকে ধরিয়া মানুষের দাসী করিয়া দিয়াছ, শয্যাসঙ্গিনী, বিলাসরঙ্গিনী করিয়া দিয়াছ, ইহাও দেখি; তুমি বিমান যানযোগে এক মাসের পথ একদিনে আনাগোনা কর দেখি; তুমি ব্যোমযানগর্ভে অনল পুরিয়া পৃথিবী ধ্বংস নিযুক্ত করিতেছ তাহাও প্রত্যক্ষ করিতেছি, এ-সকলই অসাধ্য সাধন কিন্তু বৈজ্ঞানিক, যে মা-টীর কোন মূল্যই তোমার নিকট নাই, যে মা-টী—একমাত্র যে মা-টী কোটী অযুত সন্তানকে খাদ্য দেয়, পরিধেয় দেয়, বাসগৃহ দেয়, আসবাব-পত্র দেয়, স্বাস্থ্য দেয়, পরমায়ু দেয়, কৃতজ্ঞতাবিহীন তুমি সেই মা-টীর সর্ব্ব রত্নালঙ্কার অপহরণ করিয়া তাহাকে রিক্ত করিতেছ, সেই মা-টীর অনুরূপ একখণ্ড মাটি তুমি সৃষ্টি করিতে পারিয়াছ কি? যে বায়ু মূর্খ অবৈজ্ঞানিকের নিকট প্রাণ, জীবন বলিয়া গণ্য, অথচ তোমার বৈজ্ঞানিক কার্য্যে অহরহ তুমি যাহাকে কলুষে ভরাইতেছ সেই বায়ু সৃষ্টিতে তুমি কতদূর অগ্রসর হইয়াছ বলিতে পার কি? নদ নদীমাত্রেই বারিহীন হইয়া পড়িতেছে ইহা ত' সর্ব্বজ্ঞ তুমি, তোমার অজানা থাকিতে পারে না, খানিক জল সৃষ্টি কর না কেন ভাই? দেশে স্বাস্থ্যবান একটি মানুষও ত' দেখি না, দুর্দ্দান্ত যম অকালে কাতারে কাতারে লোক ক্ষয় করিতেছে, তুমি কেন অসাধ্য-সাধন ক্ষমতাবলে যমদণ্ড নিরোধ করিয়া লোককে স্বাস্থ্য দান করিয়া বদান্যতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কর না? তোমার কুবেরের ভাণ্ডারে ম্যানিওর, ট্রাক্টর কত মণিমাণিক্যই রহিয়াছে, জমির খানিকটা উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া দাও না দাদা, লোকে দু'বেলা দু'মুঠা খাইয়া বাঁচুক। দোহাই বৈজ্ঞানিক, এই একটিমাত্র কাজ করিয়া তুমি বিজ্ঞানের মান রাখ, কোটী কোটী মানবের প্রাণ রক্ষা কর, জগৎকে ধীর ও স্থির মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার কর। আর তা' যদি না পার, তবে ধিক্ তোমার বিজ্ঞান, শতধিক্ তাহার শক্তি!"

বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞগণ পৃথিবীর আজে বাজে (আমাদের মত) লোকগুলোকে অবজ্ঞা করেন, ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনেন না তাহা সকলেই জানেন। আমরা যে ছলছুতা করিয়া সেই জন্যই খানিকটা গালিগালাজ করিয়া লইলাম, এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। আমরা ভিক্ষুক জাতি, ভিক্ষা চাহিতেছি, অন্ন ভিক্ষা করিতেছি। ভিক্ষুক যেমন এক গৃহস্থের দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া অথবা 'হাত যোড়া' শুনিয়া বৃত্তি ছাড়িয়া যায় না—যাইতে পারে না, আমরাও তদ্রূপ এক দ্বার হইতে অন্য দ্বারে ধর্না দিতেছি। 'স্বভাবে করায় কর্ম্ম, কি দোষ আমার?' বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞগণই পৃথিবীতে পরম শক্তি ও সামর্থ্যের অক্ষয় ভাণ্ডারের অধিকারী, ভিক্ষুক তাঁহার দ্বারে শতছিন্ন বসন পাতিয়া বসিবে না ত' কোথায় বসিবে?

জানি, প্রাণহীন পাষাণ প্রাচীরে মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছি। অন্নের কণা পাইবার আশা নাই। জানি, বিজ্ঞানের দম্ভ যতই আকাশস্পর্শী হউক না কেন, বিজ্ঞানের যে খেলা আমরা প্রতি নিয়ত চাক্ষুষ করি, অনুভব করি, তাহা শুধু ধ্বংসেরই রাজত্ব রচনা করিতে সক্ষম, একমুষ্টি তণ্ডুলকণা দিবার শক্তি তাহার নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তাহা স্বীকার করেন কৈ? অসার দম্ভ তাঁহার জিহ্বা চাপিয়া ধরে; অহমিকা আত্মক্রটী স্বীকারের পথ রোধ করে।

কিন্তু একদিন কাচখণ্ড ফেলিতেই হইবে। বুভুক্ষু ধরণী বেশী দিন ভেল্কীতে ভুলিয়া থাকিবে না। সে-দিন আসিবেই এবং আসিবামাত্র এই ভারত—জগদীশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই ভারত--ঋষি-অধ্যুষিত এই ভারত সেইদিন পৃথিবীর কাণে সেই মহামন্ত্র দিবে, যে-মহামন্ত্রের বলে ভারত একদা বিশ্বের অন্নদাত্রী ছিল, আবার সেই অন্নদাত্রী জগদ্ধাত্রীরূপে বিশ্বের বন্দনা লাভ করিবেন। সেইদিন, সসাগরা ধরণীর সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের সকল বয়সের লোক বুঝিবে—"মাতা বসুমতী ধন প্রসব না করিলে ধন কেহ গড়িতে পারে না।" সেইদিন পৃথিবীর ধনী নির্ধন পণ্ডিত মূর্খ, রাজা প্রজা, বৈজ্ঞানিক অজ্ঞ সকলেই মাতা বসুমতীর করুণালাভে চেষ্টান্বিত হইবে। ভারতবর্ষ আবার অন্ধ ধরণীতে আলোকের উচ্ছ্বাস প্রবাহিত করিবে।

জাগো মা চিন্ময়ী

শ্রীঅবনীকান্ত ভট্টাচার্য্য

অজ্ঞতার অন্ধকারে চিত্ত মোর করে হাহাকার,
ঘিরিয়াছে চতুর্দ্দিক অবিচ্ছিন্ন তন্দ্র তমিস্রার ;
সর্ব্বশুক্লা মহাশ্বেতা শ্বেতপদ্মে জননী আমার—
সমাসীনা কই ?
জ্যোতির্ম্ময়ী বিশ্বরমা আবির্ভূতা হও চিরদ্যুতি,
জ্ঞানে নয়, ধ্যানে যেথা চিরাতৃপ্ত আত্মার আকুতি,
মুহূর্ত্ত মুছুক্ বিশ্ব—চিত্তে মাগি বিন্দু অনুভূতি,
জাগো মা চিন্ময়ী।

রবিকর স্পর্শে যথা একে একে মেলি' শতদল,
উন্মুখ বৃন্তের পরে কম্প্র পদ্ম বিকচ-চঞ্চল,
সুপ্রসন্ন দৃষ্টিপাতে তেমতি ফুটুক্ সমুজ্জ্বল
মানস-কমল।
তুলি' মৃদু কলালাপ ঝঙ্কারিয়া বীণা সপ্তস্বরা,
সুরে সুরে গানে গানে ছন্দিত নন্দিত কর' ধরা,
সৈকত আঘাতে রঙ্গে সিন্ধু হোক্ তরঙ্গ মুখরা—
অস্থির চঞ্চল।

জটিল জটার ভার ধূলায় লুটাল ম্রিয়মান,
জীর্ণপত্র সমাচ্ছন্ন তুহিন-রজনী অবসান,
কিশলয়ে বিভাসিত আম্রকুঞ্জে জাগে কলগান,
বসন্ত উচ্ছ্বাস !
শাখাপত্রে অরুণিমা, তাই বুঝি কোকিল-কূজন ?
অকস্মাৎ দক্ষিণের মৃদুমন্দ চকিত-স্পন্দন
অশোকের আমন্ত্রণে কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমর-গুঞ্জন,
ফুটিল পলাশ।

যে চরণ স্পর্শ লভি' উদ্বেলিত বসন্তবিলাসে,
মঞ্জুরিত তরুশীর্ষে বিহঙ্গের কল কণ্ঠ ভাসে,
পলাশ-শিমুল-চম্পা রূপে গন্ধে আনন্দে বিকাশে—
বরণে বরণে,
সে চরণে স্পর্শ মাগি অয়ি মাতা বাণী বীণাপাণি,
অজ্ঞতা-তমিস্রা-ভ্রান্তি বিদূরিত কর' কৃপা দানি,
আনিয়াছি অশ্রুসিক্ত শুচি-শুভ্র চিত্তপদ্মখানি
অঞ্জলি চরণে !



তুলি' মৃদু কলালাপ ঝঙ্কারিয়া বীণা সপ্তস্বরা,
সুরে সুরে গানে গানে ছন্দিত নন্দিত কর' ধরা

শ্রীকমলারঞ্জন ঠাকুর



মনের আগুন

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

গোবিন্দপুরের গোরাচাঁদ চাক্‌লাদার সে-দিন সন্ধ্যার পর বাহিরের ঘরে বসিয়া ঘটক-চূড়ামণি ত্রিলোচন ঠাকুরের সহিত গূঢ় মন্ত্রণায় রত ছিলেন। ত্রিলোচন বলিতেছিলেন, "একশো টাকার কমে এ-ধরণের কাজে আমি হাত দিই না।"

গোরাচাঁদ কট্‌মট্ দৃষ্টে ইঁহার দিকে তাকাইলেন। বেটা রাঘব বোয়াল। বলিলেন, "অত টাকা কোথায় পাই, বল? তোমাকে দিতে হ'বে একশো, ও-দিকে আবার—"

ত্রিলোচন বলিলেন, "ও-দিকে নগদ দু'শো খানেক টাকা ঝেড়ে দিতে হ'বে ক'নের মাতুলকে। তারপর মাতুলের অবস্থাও জান; মেয়ের মা ত' বর্ত্তমানে তাঁর গলগ্রহ হ'য়েই আছেন, চিরদিন থাকবেনও। কাজেই এই দু'শো ঝেড়েই হয় ত' জের মিটবে না; তাঁদের একটু দৃষ্টিমুখ তোমাকেই দিতে হ'বে।"

গোরাচাঁদ বলিলেন, "ভবানী ত' আমাদের গাঁয়েরই লোক, আমাকে যৌতুক বাবদ কিছু দিতে না পারে, মেয়ে বেচে আমার কাছ থেকে টাকা নিতে চক্ষুলজ্জায় তা'র বাধ্‌বে না?"

"বাধ্‌লেও বা করে কি বল? ফুটো ঘর, জলে ভিজে মর্‌ছে। বিঘে দশেক ধানের জমি ছিল, মহাজনের হাতে বাঁধা পড়ে আছে। খালাস হ'লে খেয়ে বাঁচে। মাতুলকে হাত কর্‌তে না পারলে এ-কাজ তোমার হ'বে না।"

গোরাচাঁদ বলিলেন, "তোমাকে দিতে হ'বে একশো মাতুলকে দু'শো; গয়না গেঁটে না দিতে পার্‌লে ত' আবার আজকালকার মেয়েদের মন পাওয়াই দায়। সেটাই ত' সর্ব্বাগ্রে চাই।"

ত্রিলোচন বলিলেন, "দেখ, একে তুমি হ'লে বিপত্নীক। তা'তে তুমি আমি যে কালে এসে ঠেকেছি, এ-বয়সে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়ে কৃষ্ণ ভজনা করবারই সময়। তোমার টাকা আছে, মেয়েটিও অপ্সরা; যদি হাতের মুষ্টি এঁটে থাক, এ-মেয়ে কেন, কোন মেয়েই তোমার জুটবে না।"

গোরাচাঁদ বুঝিলেন এ'ঝুনা শয়তান। বলিলেন, "তুমি বা এত টাকা কেন হাঁক্‌ছ? কমাও না একটু। তোমার অভাব কিসের?"

ত্রিলোচন বলিলেন, "মেয়েটির মুণ্ডি জড় কর্‌তে হ'বে, পেটই যদি না ভর্‌ল বৃথা অভিশাপ কুড়ুতে আমি যা'ব কেন? বোঝ ত' সব।"

গোরাচাঁদ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিয়া কহিলেন, "মুণ্ডি কেন জড় করবে? বয়েস একটু হয়েছে ব'লে কালই যে মর্‌ব এমন কোন কথা নেই। নিমতলার ঘাটে যদি খোঁজ খবর কর, দেখ্‌বে বুড়োরাই বরঞ্চ মরে কম।"

ত্রিলোচন দেখিলেন, ইহার তত্ত্বজ্ঞান অসীম। বৃথা কথা বাড়াইয়া লাভ নাই। তিনি বলিলেন, "সে তুমি যাই বল, একশো টাকার কমে আমি পেরে উঠব না, আর টাকাটা সমস্তই বিয়ের আগে আমাকে ধরে দিতে হ'বে। টাকার আমার দরকার আছে।"

গোরাচাঁদ বলিলেন, "কেন? আগে টাকা দিব কোন্ কথায়? যদি কোন রকম বাধাবিঘ্ন গোলযোগ ঘটে?"

ত্রিলোচন বলিলেন, "তা'তে আশ্চর্য্য হ'বার কিছুই নেই। এরূপ কাজে গোলযোগ ঘটবার সম্ভাবনাই বেশী। বিশেষ, আজকালকার ছেলে-ছোক্‌রাগুলো যে ধাঁচের। তা'দের কানে পড়্‌লে আর রক্ষা নেই। বল ত' মেয়েটিকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে বলি। তেমন জায়গাও আছে।"

গোরাচাঁদ বলিলেন, "দেখা যাক্, আশঙ্কার কারণ কিছু ঘটে ত' অগত্যা তাই করতে হ'বে।"

লুসির মামার বাড়ী এই গোবিন্দপুরে। তাহার পিতা ত্রিদিবনাথ পূর্ব্বাঞ্চলের অনেক বাঙ্গালীর চা-বাগানের ম্যানেজার ছিলেন। পাশাপাশি সাহেবদিগের আরও কয়েকটি বাগান ছিল। মেয়েটি সেইখানেই জন্মগ্রহণ করিল; পিতা আদর করিয়া নাম রাখিলেন, 'লুসি।'

ত্রিদিব উপায় করিতেন যথেষ্ট; কিন্তু সাহেবদিগের আবেষ্টনের মধ্যে পড়িয়া তাহাদেরই মত সুখ সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষা করিয়া চলিতে গিয়া একটি পয়সাও সঞ্চিত রাখিতে পারিতেন না। তিনি ডিনার-টেবিলে বসিয়া আহার করিতেন। বিলাতী কুকুর তাঁহার দ্বারের গোড়ায় বাঁধা থাকিত। লুসি শিস্ দিয়া তাহার সহিত কথা বলিত। গৃহের ছোক্‌রা চাকরটিকে সে 'বয়' বলিয়া সম্বোধন করিত। এইরূপে সংসারটি গড়াইয়া চলিতেছিল মন্দ নয়। কিন্তু হঠাৎ ত্রিদিব একরূপ তরুণ বয়সেই যেদিন সংসারের মায়া কাটাইয়া ঊর্দ্ধলোকে চলিয়া গেলেন, সেদিন লুসির মাতা দেখিলেন, কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবিয়াও স্বামী একটি পয়সাও সঞ্চিত রাখিয়া যান নাই। অতঃপর তিনি কন্যাটিকে সঙ্গে লইয়া গোবিন্দপুরে ভ্রাতা ভবানীপ্রসাদের আশ্রয়ে আসিয়া উঠিতে বাধ্য হইলেন। যে মেয়েটি একদিন ফিডিং বোটলের বোঁটা চুষিত, ঠেলাগাড়ী চড়িয়া হাওয়া খাইত, গরীব মাতুলের আশ্রয়ে আসিয়া তাহাকে আবার ক্রমশঃ সংসারের সর্ব্ববিধ কাজ-কর্ম্ম মায় হাঁড়ির কাজ পর্য্যন্ত শিক্ষা করিতে হইল।

লুসিকে অঙ্কশায়িনী করিবার পরামর্শই ত্রিলোচনের সহিত গোরাচাঁদের চলিতেছিল। গোরাচাঁদ বয়সে পঞ্চাশের ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন, লুসি সপ্তদশী।

লুসির দু'হাতে দু'গাছা সরু চুড়ী, গলায় একছড়া চিকণ হার ও কানে মাত্র দু'টি দুল। ভূষণের রিক্ততায় দেহের শ্রী যেন আরও অধিক উছলাইয়া পড়িতেছিল। তাহাকে দেখিয়া যুবকেরা অনেকেই 'হাঁ' করিয়া চাহিয়া থাকিত। কিন্তু টাকার জোতর নাই বলিয়া তাহাদের অভিভাবকেরা ফিরিয়াও তাকাইতেন না। এই সুযোগে গোরাচাঁদ একেবারে টোপ ফেলিয়া বসিলেন। গোরাচাঁদের প্রথম পক্ষের স্ত্রী দুই বৎসর হইল গত হইয়াছেন, কোন সন্তানাদি তিনি রাখিয়া যান নাই। স্ত্রীর মৃত্যুর পর হইতেই তিনি আর একটি বিবাহের কথা ভাবিতেছিলেন, গোপনে গোপনে চেষ্টাও করিতেছিলেন, ত্রিলোচনের শরণ লইয়াও ফল কিছুই হইতেছিল না। পঞ্চাশের সঙ্গিনী করিয়া দিতে কোন পিতাই অগ্রসর হইতেছিলেন না। ত্রিলোচন এবার বিশেষ সতর্কতা সহকারে ভবানীপ্রসাদের সহিত কথাবার্ত্তা সুরু করিয়া দিলেন। বুঝিলেন, কিছু টাকা পয়সা ব্যয় করিতে পারিলে কার্য্যটি হইতে পারে। এই সম্বন্ধ লইয়া গোরাচাঁদের সহিত দর কষাকষি অবশ্য যথেষ্টই হইল কিন্তু অবশেষে তিনি রাজী হইয়াও গেলেন।

এইরূপে টাকার অঙ্ক লইয়া যখন সকলের সহিত চুকিল, তখন ভবানী তাঁহার ভগিনীকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, যদিও পাত্রটির কিছু বয়স হইয়াছে, গোরাচাঁদের টাকা পয়সা অজস্র—লুসি জীবনে কোনদিন কষ্ট পাইবে না। এই কার্য্য হাতছাড়া হইয়া গেলে মেয়ের বিবাহ দেওয়া অসাধ্য হইবে। শত্রু-লোকের অভাব নাই, তাড়াতাড়ি করিয়া কার্য্য শেষ করিতে হইবে। কাহারও কানে ঘুণাক্ষরে কিছু পড়িলে এ সম্বন্ধ ফাসিয়া যাইবে। লুসির-মা একে হাবাগোবা মানুষ ছিলেন, তাহাতে যুবা বৃদ্ধ কাহারও সহিত দেখা হইলেই মেয়েটির একটি পাত্র জুটাইয়া দিবার জন্য তিনি কাকুতি-মিনতি করিতেন কিন্তু কাহাকেও গা মাখাইতে দেখিতেন না। তাঁহার পিছনেও আর একটি মনুষ্য ছিল না; ভ্রাতাটি যাহা করেন। তাঁহারও চেষ্টা-চরিত্রের বহর দেখিয়া তাঁহার মনের অবস্থা এইরূপ হইয়াছিল যে, কোন গতিকে মেয়েটিকে পাত্রস্থ করিতে পারিলেই হয়। সুতরাং তাঁহাকে সম্মত করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। আর গোরাচাঁদকে তিনি দেখেনও নাই, ছেলে বয়সে দেখিয়াছেন কিনা মনে পড়ে না। মনুষ্যটিকে চক্ষে দেখিলে অথবা বয়সের সঠিক খবর পাইলে হয় ত' বা তিনি বাঁকিয়া বসিতেন।

এদিকে গোরাচাঁদও বিশেষ সতর্ক ছিলেন। কিন্তু কথাটা ইতিমধ্যেই যে ফাঁস হইয়া গিয়াছে সেদিন তাহার প্রমাণ পাইলেন। গ্রামেরই ছেলে সুবোধ সেদিন তাঁহাকে পথে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এইবার ঠাকুরদার দেহের জলুস খুলেছে। হঠাৎ এমন সোনার কাঠি ছুঁইয়ে কোন্ রাজকন্যাকে জাগিয়ে তুল্লেন?"

গোরাচাঁদ প্রথমতঃ বিস্মিত হইয়া ইহার দিকে চাহিলেন। পরে আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিলেন, "জেঠোমী করিস্‌নে ছোঁড়া! সন্ধ্যেবেলা আসিস্‌, এক পেয়ালা চা খেয়ে যাস্‌।"

বলিয়াই তিনি হন্‌ হন্‌ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সুবোধ সন্ধ্যার পর ঘরের বাহির হইতেই গোরাচাঁদের কথা তাহার স্মরণ হইল। ভাবিল, ঠাকুরদাদার ঐখানেই ঘুরিয়া আসা যাউক। ডাকিয়া গিয়াছেন, ব্যাপারটা ভালমত বুঝিয়া আসা যাইবে।

গোরাচাঁদের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে সমাদর করিয়া বসাইলেন। এরূপ আদর যত্ন পূর্ব্বে সে ইঁহার নিকট হইতে কোন দিন পায় নাই। গোরাচাঁদ বলিলেন, "এবার চাট্টি ধান পাওয়া গেছে, বোধ হয় গোলাটা ভর্ত্তি হ'বে। সমস্তই ক্ষেত-খামারের ধান। গত বৎসর যে সকল বাড়ি দেওয়া রয়েছে, তাই কি আর ষোল আনা আদায় হ'বে? বেটারা ভারী বজ্জাত! আঠারআনা ফসল হ'লেও ষোল আনা বুঝিয়ে দিতে কথনও দেখলাম না। কপালে দু'মুঠো ছিল তাই ঘরে আস্‌ছে। থাক্‌গে বারভূতে। বস, চা করে আনি।"

এই বলিয়া তাহাকে বাহিরের ঘরে বসাইয়া রাখিয়া তিনি বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন এবং ভিজা চিঁড়া, ঘন-আটা দুধ ও কিছু মিষ্ট আনিয়া তাহাকে খাইতে দিলেন। বলিলেন, "খা, তোর দিদিমা বেঁচে থাক্‌লে কত আদর-যত্ন করে খাওয়াত। আমরা পুরুষ ব্যাটা-ছেলে কি চিঁড়া ভিজুতে জানি? কুঁড়োই রয়ে গে'ছে কত।"

সুবোধ বলিল, "এসকল দুঃখের কথা আর তুলবেন না। যাক্‌, এখন আবার নূতন দিদিমার হাতেই খাওয়া সুরু করা যা'বে। তিনি আস্‌ছেন কবে?"

গোরাচাঁদ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "তোরা আসতে দিলে ত'?"

ইঁহার কথার বাঁধুনিতে সুবোধের মন কিছু ভিজিয়া উঠিয়াছিল। সে কহিল, "সত্যই বলেছেন। গাঁয়ে থেকে নির্ব্বিঘ্নে কাজ আপনি সমাধা করুতে পারবেন না। কাণা-ঘুষো শুনে ছোঁড়ারা ইতিমধ্যেই ক্ষেপে উঠেছে। তা'রা এ কাজ কোন মতেই করতে দেবে না। মেয়ে পক্ষর মত হয়েছে?"

গোরাচাঁদ বলিলেন, "পক্ষ আবার কে? মেয়ের মা শুনেছি একেবারেই ভদ্র মানুষ, মাতুলই যা' করে। আবার একটা বন্ধনে পড়া আমারও তেমন ইচ্ছা ছিল না। কি করব, এখন আমিই হাত পুড়িয়ে উনুন জ্বালব, তবে তোমাকে একটু চা করে দেব। অবস্থা ত' স্বচক্ষেই দেখছ।"

"থাক্‌ না, এই ত' কত খেলাম, আবার চা কেন?"

গোরাচাঁদ বলিলেন, "থাক্‌বে কেন? এসেছ, একটু চা ক'রে খাওয়াব না?"

ইহার পর দুই জনে মিলিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা চলিল। সুবোধ বলিল, "আসছে শনিবারে মন্দির-বাজারের জমিদার বাড়ীতে সমাজ সুদ্ধ লোকের শ্রাদ্ধের একটা নিমন্ত্রণ আছে। গাঁয়ে সে দিন কেহ থাকছে না, ছেলে বুড়ো সবাই যা'বে নিমন্ত্রণ খেতে। ঐ দিনই গোধূলি লগ্নে কাজ শেষ করে ফেলুন। এমন সুযোগ আর পাবেন না।"

কথাটা গোরাচাঁদের মনে ধরিল। তিনি বলিলেন, "আমি এ বিষয়ে এখনও মনস্থির করিনি। তুমি যেন এ সকল কথা বাইরে ঢেঁড়া পিটিয়ে বস না।"

সুবোধ কহিল, "ক্ষেপেছেন আপনি? আপনার অহিত আমি কখনও করি?"

অতঃপর গোরাচাঁদ গিয়া ত্রিলোচনের সহিত পরামর্শ করিয়া আসিলেন।

বিবাহের আগের দিন আসিয়া ত্রিলোচন তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়া গেলেন যে, "গাঁয়ের লোক সব নিমন্ত্রণ খেতে চলে গেলেও ভয় ঘুচবে না দাদা? মেয়েটা সাহেব-সুবোর মধ্যে থেকে যে রকম 'বিবিয়ানা' ঢংএ গড়ে উঠেছে তা'তে বিয়ের আসরেও তা'র থেকে ভয় আছে। তোমার ঐ খোঁচা খোঁচা দাড়িগুলো ভাল করে চেঁচে নিও—যেন সাদা বেরিয়ে না থাকে। টোপরটা মাথায় একটু ঠেসে বসিয়ে দিলেই হ'বে। পাঞ্জাবী-টাঞ্জাবী আছে ত সব? পাঞ্জাবীর ওপর গরদের একটা চাদর ফেলে নিও। জুতো কি ঐ তালতলার চটি?"

গোরাচাঁদ বলিলেন, "জুতো একজোড়া কিনে নেব'খন।"

"কেনো ত' বাদামী রংএর একজোড়া এলবার্ট সু কিনো। সাদা ক্যাম্বিস টাম্বিস কিনো না—বড্ড খিটকটু। কাপড় একখানা দিও আমি বাড়ী থেকে কুঁচিয়ে এনে দেব। আমার ঘরের ওরা বেশ কাপড় কোঁচায়।"

ইহার পর নির্দ্দিষ্ট তারিখে প্রধানতঃ সুবোধেরই সাহায্যে এবং ত্রিলোচনঠাকুরের কৌশলে শুভকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেল। লুসির মাতুল ভবানীপ্রসাদ নগদ দুই শত টাকা কোঁচার খুঁটে গণিয়া লইয়া কাষ্ঠের সিন্দুকে তুলিলেন।

বিবাহের সম্বন্ধে যেমন ঢাক্ ঢাক্ চুপ্ চুপ্ ছিল আলোর সম্বন্ধেও সেইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছিল। সমগ্র বিবাহের স্থল জুড়িয়া ধূম্রাবৃত যে একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বলিতেছিল লুসি তাহার ক্ষীণালোকের সাহায্যে গোরাচাঁদের চন্দ্রবদন ভালমত দেখিয়া লইতে পারিল না। যখন উহা প্রত্যক্ষগোচর হইল, তখন সে একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। মাতা তাহার ভালমানুষ, তাঁহার উপর তাহার কিছুমাত্র ক্রোধ হইল না। যত নষ্টের মূল তাহার মাতুল। পিতা জীবিত থাকিলে কি এমন কাজ হইতে পারিত? ঘৃণায় সে একটি কথাও মুখে উচ্চারণ করিল না। সময় সময় যেন তাহার দেহের রক্তস্রোতের চলাচল বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইতে লাগিল।

যেদিন সে শ্বশুরগৃহে আসিল, সেদিন গ্রামের লোকে নিমন্ত্রণ খাইয়া ফিরিতেছেন। পথে বহু উৎসুক দৃষ্টির মধ্য দিয়া পাল্কী চড়িয়া অঙ্গন পার হইয়া সে গৃহমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার মনের মধ্যে যে অস্বস্তি এবং ক্রোধ গুমরাইয়া উঠিতেছিল গোরাচাঁদের কোঠাঘরে পা দিয়াও তাহা শান্ত হইল না।

গ্রামের অনেকেই বরবধূ দেখিতে আসিলেন। হাসি-ঠাট্টা বিদ্রূপ করা ছাড়া তখন ইঁহাদের করিবার আর কিছুই ছিল না।

ইঁহারা চলিয়া যাইবার পর গৃহটি নির্জ্জন হইলে গোরাচাঁদ এক সময় আসিয়া লুসিকে স্নান করিতে বলিলেন। কহিলেন, "ঐটি আমার অন্দরের পুষ্করিণী, চারিদিকে পাঁচিল ঘেরা, বাঁধা ঘাট; মাছও আছে বিস্তর। ওটা গো-শালা, ওটা ঢেঁকি ঘর, ওটা গোলাঘর—ধানে ভর্ত্তি। পিছনে আম-কাঁঠালের বাগান। অত খায় কে? পাড়ায় বিলিয়ে দিয়েও অনেক টাকার ফল-ফুলুরি বিক্রী হয়।"

কিন্তু এত সকল পরিচয়েও লুসির মন তিনি গলাইয়া দিতে পারিলেন না। তাহার অন্তরে বিন্দুমাত্র বিস্ময়ের সঞ্চারও হইল না।

নূতন বধূ ঘরে আসিবামাত্রই কিছু হাঁড়ি ধরিতে পারে না। পাশের বাড়ীর রায়গিন্নী দু'বেলা দু'টি রন্ধন করিয়া দিয়া যাইতেছিলেন। রান্না বিষয়ে লুসি অবশ্য একেবারেই অপটু ছিল না। মাতুলের গৃহে এ-কার্য্যে তাহার হাত পাকিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই লজ্জাকর পাপ ও দৌরাত্ম্যের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া তাহার চিত্ত সর্ব্বদাই চঞ্চল থাকিত; কোন কার্য্যেই মন বসিত না। কেবল রায়গিন্নী তাহার এই দুঃখে প্রকৃত একটু সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন।

দিন চলিতে লাগিল। লুসির মনস্তুষ্টির জন্য গোরাচাঁদের অখণ্ড মনোযোগ। লুসিকে কিন্তু সর্ব্বদা কঠোর দেখাইত। মুখে কিছু না বলিলেও তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যাইত, দিবা রাত্রি চব্বিশ ঘণ্টাই সে যেন তাঁহার সঙ্গে লড়িতেছে।

গোরাচাঁদ কত গন্ধ-তৈল, সাবান, এসেন্স, সাড়ী, ব্লাউজ প্রভৃতি আধুনিক রুচিসম্পন্ন নানাবিধ বিলাসদ্রব্য সুবোধের সাহায্যে আনাইয়া ঘর ভর্ত্তি করিতে লাগিলেন কিন্তু সকলই যেখানকার সেইখানে পড়িয়া থাকিতে লাগিল। লুসি বুঝিয়াছিল, তাহার সাজসজ্জা, বিবিয়ানা, মুখের সজীব হাসি, অপরের চক্ষে হাসি-ঠাট্টার বস্তু হইয়া দাঁড়াইতেছে। তাই এ-সকল বিলাস-সামগ্রী এখন তাহার সম্মুখে আনিয়া ধরিলে তাহার গা জ্বালা করিয়া উঠিত।

চুলগুলিও সে আর পাট করে না, অযত্নে ক্রমশঃ জট পাকাইয়া উঠিতেছে। তাহা দেখিয়া গোরাচাঁদ সুবোধকে এক বোতল সুবাসিত নারিকেল তৈল আনিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। সুবোধ উহা লইয়া যখন উপস্থিত হইল গোরাচাঁদ তখন রান্নাঘরে লুসির পাশে বসিয়া গায়ে চিমটা দিয়া কলিকার উপর আগুন তুলিতেছিলেন। সুবোধ একেবারে রান্নাঘরের দ্বার গোড়ায় বোতলটি আনিয়া হাজির করিল লুসি তাহাকে দেখিয়া বসিবার জন্য একখানা আসন বিছাইয়া দিল।

লুসি তাহার মাথার ঘোমটাটি বিশেষ নীচু করিল না দেখিয়া গোরাচাঁদ তাহার প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া রহিলেন এবং এক একবার সুবোধের প্রতিও কটমট দৃষ্টিতে তাকাইতে লাগিলেন। তাহাকে বসিতে পর্য্যন্ত বলিলেন না।

সুবোধ বলিল, "তেল আনতে বলেছিলেন, এনেছি।"

গোরাচাঁদ বলিলেন, "আচ্ছা, রেখে যাও।"

সে চলিয়া গেলে গোরাচাঁদ হুকায় টান দিতে দিতে বলিলেন, "মানুষ দেখে ঘোমটাটা একটু টেনে দিও। সুবোধ অবশ্য ঘরের ছেলে; তা' হ'লেও তুমি নূতন এসেছ, আর সে-ও একটা জোয়ান মর্দ্দ ছেলে।"

লুসি এতদিন যা' হোক্ তবুও সংযত হইয়া চলিতেছিল, কিন্তু অন্তরের সঞ্চিত বহ্নি আজ একেবারে খোলাখুলি সম্মুখে ব্যক্ত হইয়া পড়িল। সে বলিল, "আমি হ'লাম আদ্দিকেলে বুড়ি, আমার আবার ঘোমটার কি দরকার?"

এ ব্যঙ্গোক্তি গোরাচাঁদকে তীরের মত বিঁধিল। তিনি মনে মনে কিছু রুষ্ট হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তবুও ত' ইহাকে ভাল লাগে। লঘু পরিহাস ভাবিয়া ক্রোধটুকু তিনি ফুৎকারে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। কতকটা মোলায়েম সুরে বলিলেন, "এমন সুন্দর চুলগুলি তোমার, তা'র প্রতি একটু যত্ন নাও না, অযত্নে জট বেঁধে যাচ্ছে। এই তেলটা মাখ, ফুরিয়ে গেলে আবার এনে দেব।"

ভাতের হাঁড়িটা নামাইয়া একটা ঝাঁকা দিয়া লুসি বলিল, "তেলের আমার দরকার নেই। তুমি মাখ, টাকের ওপর চুল গজিয়ে উঠবে।"

গোরাচাঁদ চকিত দৃষ্টিতে ইহার দিকে চাহিলেন। ভাবিলেন, ছেলেবেলায় বিবিপাড়ায় থাকিয়া এমনটি হইয়াছে। কিন্তু এতটা তাঁহার সহ্য হইল না। তিনি কিছু রুক্ষস্বরে বলিলেন, "কোন খবরই ত' জানতে আমার বাকী নেই। সম্বন্ধ জুটেছিল ত' একটা হাড়-হা-ভাতে সহুরে ছেলের সঙ্গে। পৈত্রিক খোলার বাড়ীটাও সে রাখতে পারলে না। আর সে কিনা হেঁকে বসল গহনায় নগদে সহস্র মুদ্রা। সে হতভাগার হাতে পড়লে দু'খানা গয়না পরতে পারতে গার? পেটের ধান্ধায় ভেবে ভেবে চোখে থাকত না নিদ্, রাত্তির জেগে জেগে বাধিয়ে বসতে ডিস্‌পেপসিয়া; হাত্‌ড়ে বেড়াতে কোথায় মিছরি, কোথায় ইছবগুল, গাঁদালের ঝোল, চুনো মাছ, থর-পাতা দৈ। আর আমার এখানে গাঁতরা গয়না, কাঠের জাল, ঢেঁকিছাটা চাল, ঘানির তেল, ঘরের দুধ, এততেও মনে সুখ পাচ্ছ না?"

লুসি কোনও উত্তর করিল না।

গোরাচাঁদ বলিলেন, "আমি যদি হাই তুলি গ্রামের লোকে তুড়ি দিয়ে ফেরে। জানত বুঝ্‌ত এ-সকল বটে আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী। তোমাদের বুদ্ধি-বিবেচনারও বলিহারি!"

ইহারও কোন জবাব লুসি করিল না। হাতা বেড়ী, থালা বাটি, হাতের কাছের আরও দু'চারিটা জিনিস এখানে সেখানে ঝনাৎ ঝনাৎ করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সে রকের উপর চলিয়া আসিল, এবং বাল্‌তি হইতে খানিকটা জল হাতে পায়ে ঢালিয়া শয়নঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

দুই

দূরের একটি গ্রামে গোরাচাঁদের কয়েক ঘর প্রজা ছিল। তিনি একবার তথায় গিয়াছিলেন। তিন চার দিন পরে গৃহে ফিরিতেছিলেন। পাকুড়তলার ঘাটে নামিয়া মাঝির মাথায় মস্ত মোট-ঘাট দিয়া গ্রামের মধ্যে আসিয়া ঢুকিলে পথে ওসমান গাজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ওসমান বলিল, "বড়কর্ত্তা, তোমার ঘরে আবার আসলেন কিনি? এ-যে ভেল্কি, একেকালে ভানুমতির ভেল্কি! মোরা ত' জান্‌লাম না কিছু?"

ওসমানের নিকট গোরাচাঁদ দায়-বেদায়ে হাত পাতিয়া থাকেন। অবশ্য নিজের অভাবের জন্য নয়। কেহ আসিয়া ধরিয়া পড়িল, হ্যাণ্ডনোট লইয়া আজই তাহাকে দুইশত টাকা ধার দিতে হইবে, সুদ যত উচ্চই হউক না কেন, টাকা তাহার চাই-ই। হয় ত' সকল টাকা তাঁহার হাতে নাই, অপর জায়গায় আটক পড়িয়া আছে; ব্যাঙ্ক হইতে টাকা উঠাইতে হইলে সদরে যাইতে হইবে! তখন ডান হাত বাম হাত করিতে রহিয়াছে এই ওসমান গাজী। কাজেই তিনি গলা একটু ছোট করিয়া বলিলেন, "কি করি ওসমান, জান ত' কত তাড়াতাড়ি করেই বড় গিন্নীকে হারালাম! নির্জ্জনে বসে তাঁর জন্যে কি কম কাঁদাটা কেঁদেছি? এখন এই বুড়ো বয়সে খাবার কষ্ট, শোবার কষ্ট, এত কষ্ট কি মানুষে সহ্য করতে পারে? এই যে প্রজাবাড়ী থেকে পুঁটলি বেঁধে টাকা পয়সা আর নৌকা বোঝাই করে ডাল, কলাই, গুড়, নারকেল তরকারী-পত্তর নিয়ে এলাম এ-সকল যা খাওয়াই কা'কে? তাই অনেক ভেবে চিন্তেই নূতন ক'রে যাত্রা সুরু করেছি।"

ওসমান দুইপাটি দাঁত বাহির করিয়া বলিল, "হক্ কথাই

বলেছ। টাকা পয়সা রয়েছে, তুমি কেন দুঃখু-কষ্ট ভোগ করতে যাবে?"

"দুঃখ বলে দুঃখ ওসমান, অসুখ-বিসুখে পড়লে হাতে পাখাখানা নাড়ার মানুষ নেই। তারপর শূল-ব্যথাটা যখন জাগে তখন একেবারেই কাবু করে ফেলে।"

ওসমান বলিল, "আপনার পেরথম পক্ষির চেয়ে এনারে ত' দেখলাম ভাল। শুয়ে রয়েছে যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর পিরতিমে। এমন রং-বাহার মানুষ আমার চম্ম-চক্ষে পড়েনি।"

গোরাচাঁদ গদগদভাবে বলিলেন, "এ-বয়সে আমার বেশী ভালর দরকারই বা কি? দুটো রাঁধা ভাত পেলেই বেঁচে যাই। আমাদের ওদিকে কবে গিয়েছিলে?"

"আজ সকালে। তোমার ঠেঁয়েই দরকার ছেল। সেই পুক্কুশটে টাকা যদি—"

গোরাচাঁদ বলিলেন, "আজ লক্ষ্মীবার—আজ আর হবে না, কাল এক সময় যেও।"

ওসমান জিজ্ঞাসা করিল, "মাঠাকুরুনীর অসুখ নাকি?"

"অসুখ?"

গোরাচাঁদ দুই চক্ষু বিস্তৃত করিয়া ধরিলেন।

"হ্যাঁ! ঘরের-দোরে শুয়ে রয়েছেন দেখলাম। পাশের বাড়ীর একটা মেয়ে বল্লে,—অসুখ। তার ঠেঁয়েই তোমার কষ্টিবদলের খবর শুনলাম।"

গোরাচাঁদ আর কথা না বাড়াইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে গৃহের দিকে ছুটিলেন।

গৃহে আসিয়া পুঁটলিটি নামাইয়া রাখিয়া এবং মাঝিকে মাথার মোট নামাইয়া রাখিতে বলিয়া ধূলি পায়েই তিনি একেবারে লুসির বিছানার পার্শ্বে গিয়া হাঁটু ভাঙ্গিয়া বসিয়া পড়িলেন। কপালের উপর হাত রাখিয়া বলিলেন, "অসুখ আবার কবে হ'ল? এখন দেখি ঝিমঝিম হচ্ছে। হঠাৎ এমন জ্বর হ'ল কেন?"

লুসি অন্যদিকে মুখ করিয়া শুইল! বলিল, "নিমতলার ঘাটে যাত্রা করব বলে।"

গোরাচাঁদ কহিলেন, "ছিঃ! অমন কথা বলতে নেই।"

তিনি তাহার কপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। মিনিট দুই লুসি কিছুই বলিল না; মনে মনে বোধ করি গুম্‌রাইতে ছিল। শেষে এক সময় হাতখানা ছিটকাইয়া ফেলিয়া দিয়া পাশ-বালিশটা ক্রোড়ের দিকে আঁট-সাট করিয়া মাথাটা শয্যার দিকে আরও নামাইয়া দিল।

গোরাচাঁদ কহিলেন, "রাগ করছ কেন? কপালটা টিপে দিই, আরাম পাবে'খন।" বলিয়া পুনর্ব্বার হাতখানা তাহার কপালের উপর রাখিলেন।

লুসি বলিল, "একটু নিরিবিলি থাকতে দাও আমাকে। হেঁটে-কুটে এলে তামাক-তুমুক কি হ'ল। ডাবা হুকো? আগুনের মালসি?"

সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

এইরূপে দুইটি বিভিন্নমুখী মন পারিবারিক সুখ-শান্তির গণ্ডীর মধ্যে কিছুতেই আর ভিড়িল না। লুসির মনের আগুন ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল। গোরাচাঁদের বাহিরের খ্যাতি-প্রতিপত্তিও নিরর্থক হইয়া গেল। কেহ আর পূর্ব্বের মত শ্রদ্ধা সম্মান করে না। অশান্তির এই দাবদাহ বোধ করি মৃত্যু পর্য্যন্তই সমানভাবে জ্বলিতে থাকিবে।

গোরাচাঁদ শুষ্ক মুখে উঠিয়া গিয়া বাহিরের রকের উপর আসিয়া হাতমুখ ধুইলেন। ডাবা হুকায় তামাক সাজা আর হইল না। চৌকির উপর বসিয়া পড়িতেই দেখিলেন, আকাশে ভয়ঙ্কর মেঘ উঠিয়াছে। গত কাল সন্ধ্যার সময় তাঁহার একটি প্রজা দু'গাড়ী বিচালি আনিয়া উঠানে ছড়াইয়া রাখিয়া গিয়াছে; বৃষ্টি নামিলে ভিজিয়া যাইবে। তিনি উঠানে নামিয়া সেগুলি টানিয়া টানিয়া বহন করিয়া গোয়াল-ঘরের মাচার উপর সাজাইয়া রাখিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে জোরে এক পশলা বৃষ্টি নামিল। বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া তিনি সেগুলি রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময় ত্রিলোচন পথ দিয়া যাইতেছিলেন। গোরাচাঁদকে দেখিয়া তিনি দাওয়ার উপর আসিয়া উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, "জলে ভিজে ভিজে এত খাটছ, সংসারটা তা'হলে মজেছে ভাল। বেশ—বেশ!"

গোরাচাঁদের মুখে আগেকার মত আর প্রচুর হাস্য ছিল না। এ সকল কথায় মনে মনে তিনি বিরক্তি বোধ করিতে-ছিলেন। তবুও গৃহে আসিয়াছেন, তামাক সাজিয়া হুকাটি ইঁহার হস্তে দিয়া আপ্যায়িত করিলেন।

ত্রিলোচন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভবানী তত্ত্ব-তালাস করে ?"

গোরাচাঁদ বলিলেন, "হুঁ, তত্ত্ব-তালাস ! ভাগ্নীর জন্ম আকুল হ'য়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। আসে মাঝে মাঝে কিছু দাঁও মারবার চেষ্টায়। দুশ্‌মন !"

"গালি পাড়্‌ছ, মামাশ্বশুর না ? করেছে কি ?"

"সেদিন ঝক্‌ঝকে দু'শোখানেক টাকা নিলে পুঁটলি বেঁধে ; তারপর আজ দু'টাকা, কাল পাঁচ টাকা, এই রকম শুষে শুষে নিতেই-ত' আছে। এখন আবার কিছু জমি-জিরেট করে দাও। তা'ও যদি দেখতাম, ভাগ্নীটাকে বুঝিয়ে পড়িয়ে জ্ঞান দিয়ে মানুষ ক'রে পাঠিয়েছে, তা' হ'লেও যা' বলে গায় সইত।"

ত্রিলোচন পাকালোক। বুঝিলেন, ভবানীর সঙ্গে নয়, ঘরের মধ্যেই গোলযোগ ঘটিয়াছে। তিনি বলিলেন, "যাক্‌গে, হোক্ মাতুল ত'। তোমাদের সুখের সংসার দেখে চক্ষু কর্ণ জুড়াতে আসেন। আর অভাব-অভিযোগগুলোও অমনি আপনার জনের ঠেঁয়েই ঠেলা মেরে ওঠে। মাতুলের কথা থাক্, সংসারের কথাই বল ; দিন যাচ্ছে কেমন ?"

পুনঃ পুনঃ সংসারের খবর লইতে ইহার আগ্রহ দেখিয়া গোরাচাঁদ এবার কিছু সতর্ক হইলেন। বলিলেন, "চলেছে আর মন্দ কি ? তবে লজ্জার ভাগটা একটু কম, আমাদের চোখে বরদাস্ত হয় না।"

ত্রিলোচন বলিলেন, "আজকালকার দিনে সর্ব্বত্রই ঐরূপ। আসলে মনের মিল যদি হ'য়ে থাকে, ও এমন কিছুই নয়। বয়সে ঘোরতর অসামঞ্জস্য—বেশী হুম্‌কি টুম্‌কি ছেড় না ; সমস্ত সয়ে বয়ে নিও।"

গোরাচাঁদ ইঁহার দিকে রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকাইলেন। তাহা দেখিয়া ত্রিলোচন মনে মনে হাসিলেন এবং বৃষ্টি থামিল দেখিয়া তিনি আর না বসিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

•

লুসির সামান্য জ্বর, দু' একদিনের মধ্যেই সে সুস্থ হইয়া উঠিল। কিন্তু সেদিনকার অতটা বৃষ্টির জল মাথায় করিয়া গোরাচাঁদ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। গলায় কাশী—মাথায় শ্লেষ্মা—মাথার বাম পাশটা বেদনায় টন্ টন্ করিতেছিল। হুকার কটু জল খানিকটা মাথায় বসাইয়া ও তাহার নাস লইয়াও বেদনা কমিল না। তিনি শয্যায় আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। হাত-পাগুলা ছিঁড়িয়া যাইতেছিল, একটু টিপিয়া যদি কেহ দিত ! তাঁহার প্রথম পক্ষের স্ত্রী থাকমণি একটু অসুখের গন্ধ পাইলে তাঁহার শয্যা ছাড়িয়া উঠিত না, স্নানাহার ভুলিয়া যাইত ; সর্ব্বক্ষণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া থাকিত। লুসি কি এ সময় আসিয়া মাথাটা একটু টিপিয়া দিতে পারে না ? তিনি ঘাড় উঁচু করিয়া ডাক দিলেন, "ওগো, শুনছ ?"

উত্তর আসিল না।

"শুনছ নাকি ? হাঁগা—"

লুসি তাঁহার জন্য রুটি বেলিতেছিল। বলিল, "শুনছি না ত' কি ! কি—বল না ?"

"একবার এদিকে—"

"ওদিকে এলে এদিকে করে কে ? হাত জোড়া, দেখতে পাচ্ছ না ?"

"তা' ত' পাচ্ছি ; হাত পাগুলো বড্ড খিম্‌চোচ্ছে কি না !—"

"খিমচোচ্ছে—দড়াদড়ি দিয়ে বেঁধে রাখ।"

গোরাচাঁদ বৃহৎ একটি নিঃশ্বাস ছাড়িলেন। বুঝিলেন, তাঁহার শূন্য ঘরই ভাল ছিল। টাকা পয়সাগুলিও ঘরের বাহির হইয়া গেল, সুখ হইল না।



হর্ষ-বিষাদ

শ্রীকুঞ্জবিহারী চৌধুরী

"হের অঙ্গীকার মোর করেছি পালন কুরুকুলনাথ ;
পঞ্চ পাণ্ডবের শির লহ এই ডালি, কর পদাঘাত।"

এত বলি দ্রোণপুত্র ধৃতরাষ্ট্র-সুত চরণের তলে
রাখিল সদর্পে ছিন্ন পঞ্চশিশু-শির তীব্র কুতুহলে।

রক্তাক্ত শরীর, হত্যা যেন মূর্ত্তিমান! প্রতিহিংসা চিতে,
বদনে বিকট ভঙ্গী, বিষ-বহ্নি চোখে খেলিল চকিতে।

গভীর শর্ব্বরী, ঘন কুয়াসা-মণ্ডিত মলিন চন্দ্রিকা,
ঘুমায়ে ধরণী; শান্ত কুরুক্ষেত্র-বুকে রণ-বিভীষিকা।

ভূ-লুণ্ঠিত দুর্য্যোধন দ্বৈপায়ন-তটে, ভগ্ন উরুদ্বয়,
পাণ্ডব-নিধনবার্ত্তা শুনি অকস্মাৎ মানিলা বিস্ময়।

ভুলিয়া আসন্ন জ্বালা, রাজ্য-কুলনাশ, ক্ষিপ্তের মতন
করে ভর করি রাজা উঠিয়া বসিলা, প্রদীপ্ত বদন।

জ্বলিল উজ্জ্বল দীপ নির্ব্বাণের আগে, অতি হর্ষভরে
কহিল, ফিরায়ে মুখ অশ্বত্থামা পানে,—"দেহ মম করে

পাষণ্ড ভীমের মুণ্ড কুরুকুল রাহু, অন্য কারো প্রতি
নাহি মোর তিলমাত্র বিদ্বেষ কারণ, জিঘাংসা সম্প্রতি।

ধন্য তুমি গুরুপুত্র, নৈশ রণে একা নাশিলে সকলে;
থাকিবে এ কীর্ত্তি তব চির সমুজ্জ্বল অবনীমণ্ডলে।

কেমনে নাশিলে সবে? কহ, শুনি আহা, জুড়াই হৃদয়!
কেমনে জিনিলে বল, কপট কৃষ্ণেরে কুহেলিকাময়?"

উত্তরিল দ্বিজাধম অবনত স্বরে,—"বীরের মতন
সশস্ত্র পাণ্ডব সনে, শুন কুরুপতি, করি নাই রণ।

বিজয়-উৎসব-শেষে পাণ্ডব-শিবির হইলে নিদ্রিত,
সাহসে বাঁধিয়া বুক দ্বারদেশে তার হৈনু উপনীত।

শঙ্কর ছিলেন দ্বারী, আশুতোষ তিনি, দাসের সময়ে
তুষ্ট হয়ে দ্বার ছাড়ি করিলে প্রয়াণ, তীক্ষ্ণ অসি করে,

ঢাকি দেহ তমসায়, পিশাচের হেয় প্রতিহিংসা সনে,
সুরাপান-মত্ত অন্ধ ঘাতকের মত অস্থির চরণে

পশিলাম অন্তঃপুরে, খুঁজি একে একে প্রতিগৃহ-মাঝ
দেখিলাম যেই দৃশ্য, জ্বলিল হৃদয়, শুন মহারাজ!—

দ্রৌপদী সহিত এক শয্যায় নিদ্রিত ভ্রাতা পঞ্চজন
আলোকিত কক্ষতলে, নির্ব্বিকার মনে, পশুর মতন।

সে বিকট দৃশ্য সনে তব দশা রাজা, মনে হলো যবে
ইহ পর, ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ত্তব্য বীরের ভুলিলাম সবে।

শোণিত লোলুপমত্ত শার্দ্দূলের মত চক্ষের পলকে
স্কন্ধ হতে ছিন্ন শির করিনু সবার; ঝলকে ঝলকে

ছুটিল রুধির-স্রোত! স্নাত হয়ে তায়, উন্মাদের প্রায়,
আসিয়াছি প্রতিশ্রুত পাণ্ডবের শির অর্পিতে তোমায়!"

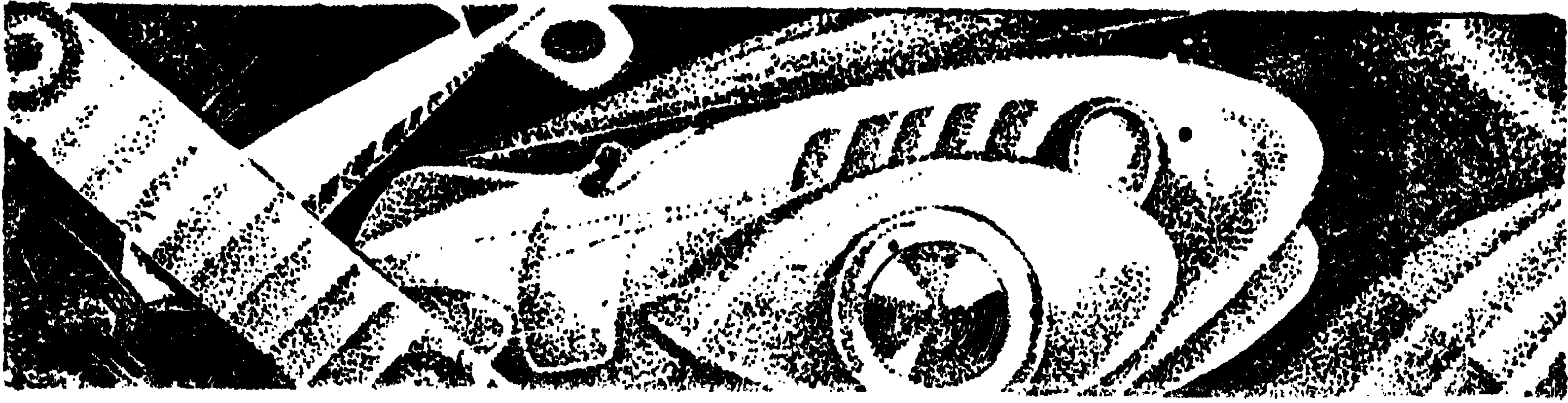
শিহরিলা দুর্য্যোধন বিস্ময় সংশয়ে!—"কি কহিলে, হায়!
ছিল সবে সুনিদ্রিত পাঞ্চালীর সনে একই শয্যায়?

আলোকিত কক্ষতলে? নির্ব্বিকার মনে? ধিক হে ব্রাহ্মণ!
পিশাচ-ঘৃণিত কার্য্য প্রতিহিংসাবশে করেছ সাধন!

কোথা ছিল নেত্র তব? এতেক উন্মাদ হইলে কেমনে?
জাগ্রতে পাণ্ডব বলি করিলে কল্পনা শিশু পঞ্চজনে?"

বলিতে বলিতে ছিন্ন শির পানে বীর বারেক চাহিয়া
ছাড়িলা নিশ্বাস, বক্ষ দারুণ আঘাতে পড়িল ভাঙ্গিয়া।

"পূর্ণ পাপ আজি!"—বাক্য সরিল না আর, ধূলিশয্যা'পরে
ঢুলিয়া পড়িল দীপ্ত রাজশ্রী নীরবে হর্ষ-শোক ভরে!



বিজ্ঞান জগৎ

বিষ-গ্যাস

অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র, বি-এস-সি (লণ্ডন)

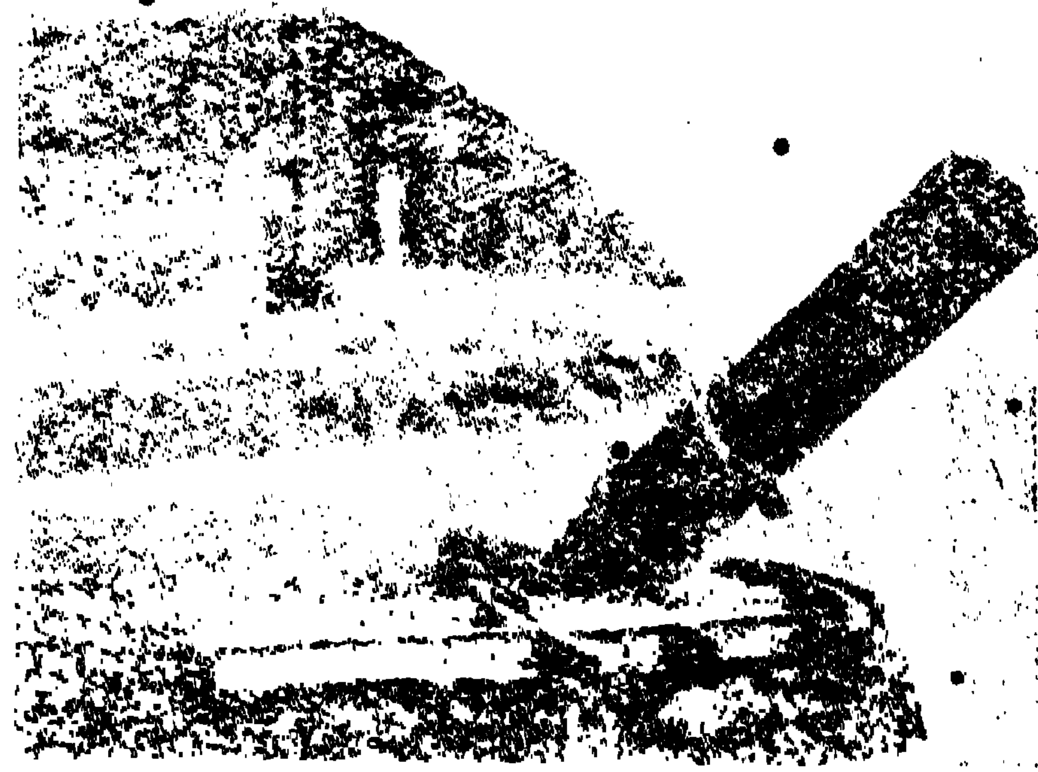
গত মহাযুদ্ধে বিষ-গ্যাসের ব্যবহার হইয়াছিল, কিন্তু সে সম্বন্ধে অনেকেরই খুব স্পষ্ট ধারণা নাই। বিষ-গ্যাসের বিভীষিকা হয় ত' অনেকেরই মনে থাকিতে পারে, কিন্তু বিষ-গ্যাস যে কি জিনিষ অথবা কিরূপে উহা ব্যবহৃত হয়, সে কথা হয় ত' অনেকেই জানেন না। বর্ত্তমান যুদ্ধে বিষ-গ্যাস কোথাও কোথাও ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মাঝে মাঝে শোনা গিয়াছে, তবে সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু এখনও জানা যায় নাই। বিজ্ঞান মানুষের আয়ত্তে যত প্রকার মারাত্মক শক্তি দিয়াছে, বিষ-গ্যাস যে তাহার মধ্যে প্রধান স্থান দাবী করিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কারণে বহু দিন হইতে আন্তর্জ্জাতিক সম্মিলনীতে যুদ্ধের উপকরণ হিসাবে এই সকল গ্যাসের ব্যবহার যাহাতে বন্ধ হইয়া যায় তাহার যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছে। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে হলাণ্ডের রাজধানী হেগ্ সহরে যে শান্তি-সম্মিলনীর (Hague Peace Conference) বৈঠক বসিয়াছিল তাহাতে সম্মিলিত জাতিগণ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, যুদ্ধে বিষ-গ্যাসের ব্যবহার তাহারা কখনও করিবে না। ১৯০৭ সালের হেগ্ সম্মিলনীতে (Hague Convention) ওই প্রতিশ্রুতির পুনরুল্লেখ হয়। এই প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও গত মহাযুদ্ধে বিষ-গ্যাসের ব্যবহার যথেষ্টই হইয়াছে। ভার্সাই সন্ধিতে বিষ-গ্যাসের ব্যবহার আন্তর্জ্জাতিক আইনের বিরুদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হয়। ১৯২২ সালে ওয়াশিংটন্ সহরে পাঁচটী জাতির সম্মিলনীতে একটী সন্ধিপত্র (Five Power Treaty) স্বাক্ষরিত হয়, তাহাতে ওই পাঁচটী জাতি বিষ-গ্যাস ও সাব্‌মেরিনের ব্যবহার আন্তর্জ্জাতিক আইন-বিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ সন্ধি শুধু কাগজে-কলমেই রহিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে ইহার ব্যতিক্রম হইতেছে তাহার প্রমাণ সাব্‌মেরিন্ যুদ্ধ হইতেই পাওয়া যাইতেছে।

গত মহাযুদ্ধে যে সকল বিষ-গ্যাস ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহাদের সাধারণতঃ ছয়টী শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

১। শ্বাসরোধকর গ্যাস (Suffocating gas or Asphyxiant)
২। ক্ষতসৃষ্টিকারক গ্যাস (Blistering gas or Vesicant)
৩। চক্ষুপ্রদাহকর গ্যাস (Tear gas or Lachrymator)
৪। নাসিকাপ্রদাহকর গ্যাস (Sneezing gas or Sternutator)
৫। বমনকারক গ্যাস (Vomiting gas)
৬। দুর্গন্ধ গ্যাস (Stink gas)

উপরোক্ত গ্যাসগুলি সম্বন্ধে কিছু কিছু পরিচয় দিতেছি।

শ্বাসরোধক গ্যাস নাক ও মুখ দিয়া দেহে প্রবেশ করে এবং শ্বাসনালী দিয়া ফুসফুসে উপস্থিত হয়। এই শ্রেণীর গ্যাস নাক, মুখ, শ্বাসনালী ও ফুসফুসে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক প্রদাহ সৃষ্টি করে এবং বেশী পরিমাণে শরীরে প্রবেশ করিলে শ্বাসরোধ ঘটাইয়া শীঘ্রই মৃত্যু আনয়ন করে। ক্লোরিন্ (chlorine), ফস্‌জেন (phosgene) ও ক্লোরোপিক্‌রিন্ (chloropicrin) এই তিন প্রকার শ্বাসরোধকর গ্যাস যুদ্ধে খুব বেশী ব্যবহৃত হয়। গত মহাযুদ্ধে ১৯১৫ সালে জার্ম্মাণরা যখন প্রথম বিষ গ্যাসের ব্যবহার আরম্ভ করে, তখন



গত মহাযুদ্ধে জার্ম্মানগণ এই ট্রেঞ্চমর্টার সাহায্যে বিষ-গ্যাসের গোলা ছুঁড়িত

তাহারা ক্লোরিন্ গ্যাসই ব্যবহার করিয়াছিল এবং ইহা দ্বারা ব্রিটিশ বাহিনীর বহু ক্ষতিসাধন করে। ক্লোরিন্ গ্যাসের রং সবুজমেশানো হলদে। ইহার গন্ধ অতীব তীব্র ও জ্বালাকরণ সাধারণ লবণ হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ইহা প্রস্তুত হয়। ক্লোরিনের সহিত কার্ব্বন্‌মনোক্সাইড্ (corbon monoxide) নামক আর একটী গ্যাস মিশাইলে ফস্‌জেন্ গ্যাস তৈয়ারী হয়। ইহা ক্লোরিন্ অপেক্ষা বিষাক্ত। ইহার গন্ধ কতকটা ছাতাধরা খড়ের গন্ধের মত এবং প্রথম আঘ্রাণে তৃপ্তিকর মনে হয়, কিন্তু নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিলে অল্পক্ষণের মধ্যে অচেতন করিয়া ফেলে ও মৃত্যু ঘটায়।

গতযুদ্ধে ফরাসীরাই ফস্‌জেন্ গ্যাস প্রথম ব্যবহার করে। ক্লোরোপিকরিন্ প্রকৃতপক্ষে 'গ্যাস্' নহে, ইহা একপ্রকার তরল পদার্থ। শত্রুসৈন্যের উপর ঝারির ন্যায় ইহা ছড়াইয়া দেওয়া হয়,—কামানের শেলের ভিতর ইহা পুরিয়া ছোঁড়া হয়। শেল ফাটার সঙ্গে সঙ্গে ইহা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ক্লোরোপিকরিন্ ফস্‌জেন গ্যাসের মত অত বিষাক্ত নয়, তবে ইহা একদিকে যেমন শ্বাসরোধকর, অপরদিকে বমনকারক। হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়া কোনও প্রকারে শত্রুর নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিলে ইহা এরূপ বমনের বেগ আনয়ন করে যে শত্রুকে মুখের আবরণ খুলিয়া ফেলিতে হয় এবং সেই সঙ্গে যদি অন্য কোনও বিষ-গ্যাস সেখানে ছড়ান হইয়া থাকে তাহা হইলে শত্রু শীঘ্রই কাবু হইয়া পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে একযোগে বহু



লেবরেটরীতে পরীক্ষার জন্য শিলকরা টিউবের ভিতর মাষ্টার্ড গ্যাস

প্রকারের গ্যাস শত্রুর উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ফলে শত্রুকে কাবু করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না।

ক্ষতসৃষ্টিকারক গ্যাস শরীরের যে কোনও অংশের সংস্পর্শে আসিলে জ্বালাকর প্রদাহ সৃষ্টি করে—চর্ম্মে, চক্ষুতে, শ্বাসনালীতে এরূপ ক্ষতের সৃষ্টি হয় যে, বহু ক্ষেত্রে তাহা দুশ্চিকিৎস্য হইয়া পড়ে। এই শ্রেণীর গ্যাসের মধ্যে মাষ্টার্ড গ্যাস (mustard gas) সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ। ইহার গন্ধ অনেকটা সরিষার মত বলিয়া ইহাকে মাষ্টার্ড গ্যাস বলা হয়। ইহা প্রকৃতপক্ষে এক প্রকার তরল পদার্থ—ক্লোরিন, গন্ধক ও অ্যালকোহল্ হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। রাসায়নিক ভাষায় ইহার প্রকাণ্ড নাম ডাই-ক্লোর্-ডাই-এথিল্-সালফাইড্ (di-chlor-di-ethyl-sulphide) এবং সাঙ্কেতিক চিহ্ন $(CH_2CLCH_2)_2S$। ইহা তরল পদার্থ হইলেও খোলা জায়গায় ছড়াইয়া দিলে আপনা হইতে ধীরে ধীরে বাষ্পীয় আকার ধারণ করে। সেই দূষিত বাষ্প যাহা কিছুর সংস্পর্শে আসে তাহা পোড়াইয়া ঝলসাইয়া দেয়। মাষ্টার্ড গ্যাস কার্য্যকরী হইতে কিছু সময় লাগে। ইহার গন্ধ খুব তীব্র নয় বলিয়া, প্রথমে ইহার অস্তিত্ব সহজে ধরা পড়ে না—তবে কয়েক ঘণ্টা পরে শরীরের বিভিন্ন স্থানে যখন ক্ষতের সৃষ্টি হইতে সুরু হয় তখন জ্বালার মাত্রা এত বাড়িয়া উঠে যে, অসহ্য হইয়া পড়ে। মাটিতে পড়িলে ইহা মাটির ভিতর অল্পে অল্পে প্রবেশ করে—মাষ্টার্ড গ্যাস-দুষ্ট মাটির বিষ দু' তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত বলবৎ থাকে। ১৯১৭ সালে জার্ম্মাণগণ প্রথম এই ভয়াবহ গ্যাস ব্যবহার করিতে সুরু করে। কামানের শেলের ভিতর এই তরল পদার্থ পুরিয়া তাহারা ব্রিটীশ ট্রেঞ্চের দিকে ছোঁড়ে, সেই শেল ফাটিয়া মাষ্টার্ড গ্যাস চতুর্দ্দিকে ঝারির মত ছড়াইয়া পড়ে, ক্রমে ট্রেঞ্চে অবস্থিত সৈনিকগণ ক্ষতের জ্বালায় ট্রেঞ্চ ছাড়িয়া পাগলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়ায়, সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মাণ গোলন্দাজ ও মেসিনগান-চালকেরা এই বিপর্য্যস্ত সৈনিকদিগের উপর নির্ম্মমভাবে শেল ও গুলি ছুঁড়িতে থাকে। এ দৃশ্য ভাবিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। পরে অবশ্য মিত্রশক্তি জার্ম্মাণীর অনুকরণ করিয়া জার্ম্মাণ ট্রেঞ্চের উপর অনুরূপ ভীতির সঞ্চার করে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে গাথ্‌রি (Guthrie) নামক এক ইংরেজ তাহার ল্যাবরেটারীতে পরীক্ষাসূত্রে মাষ্টার্ড গ্যাস আবিষ্কার করেন। ইহার ব্যবহার বিপজ্জনক বলিয়া সেই সময় হইতেই ল্যাবরেটারীতে পরীক্ষামূলক ব্যবহার ছাড়া অন্য কোনও কার্য্যে ইহা নিয়োজিত হইত না। যুদ্ধে যত প্রকার বিষ-গ্যাস ব্যবহৃত হয় তাহার মধ্যে মাষ্টার্ড গ্যাসই সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর। ইহা শরীরের সকল অংশেই ক্ষত উৎপাদন করে এবং ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিলে ব্রঙ্কাইটিস্ ও নিউমোনিয়া রোগের সৃষ্টি করে। শুধু মানুষ নহে, গাছপালাও মাষ্টার্ড গ্যাসের সংস্পর্শে আসলে শীঘ্রই শুকাইয়া মরিয়া যায়। মাটিতে পড়িয়া ইহা সহজে জলের সহিত মেশে—মানুষ, পশু পক্ষী যে কেহ সে জল পান করে তাহার সমগ্র মুখ, কণ্ঠনালী ও পাকস্থলী জ্বালাকর বিস্ফোটক ও ক্ষতে ভরিয়া যায়।

চক্ষুপ্রদাহকর গ্যাস চক্ষুর সংস্পর্শে আসিয়া এরূপ জ্বালা ও অশ্রুর সৃষ্টি করে যে কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। এই শ্রেণীর গ্যাস অল্প পরিমাণ হইলে চক্ষুকে বরাবরের জন্য জখম করে না, শুধু সাময়িক প্রদাহের সৃষ্টি করে, তবে বেশী পরিমাণ চক্ষুতে লাগিলে অন্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে। যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া বেসামরিক ব্যাপারেও যথা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় এই সব গ্যাসের ব্যবহার হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর গ্যাসের উদাহরণস্বরূপ জিলিল্ ব্রোমাইড্ (Xylyl-bromide), বেঞ্জিল ব্রোমাইড্ (Benzyl-bromide) ও ফেনিল্ ক্যারিব্লামাইন-ক্লোরাইড্ (Phenyl-caryblamine-chloride) এই তিনটি গ্যাসের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

নাসিকাপ্রদাহকর গ্যাস নাসারন্ধ্রে প্রদাহ সৃষ্টি করিয়া হাঁচি উৎপাদন করিয়া উৎপীড়ন করে। অনেক সময় নাসিকা ও কণ্ঠে যে প্রদাহ উপস্থিত হয় তাহা বহুক্ষণ থাকে এবং হাঁচির বেগের প্রশমন হইতে বিলম্ব লাগে। চক্ষুপ্রদাহকর গ্যাসের ন্যায় নাসিকাপ্রদাহকর গ্যাস সাময়িক অক্ষমতা আনয়ন করে, বরাবরের জন্য জখম করে না। এই শ্রেণীর গ্যাসের মধ্যে ডাই-ফেনিল্-ক্লোর্-আর্সাইন্ (di-phenyl-chlor-arsine) নামক গ্যাসের বেশী প্রচলন আছে। ইহা বেসামরিক কার্য্যেও ব্যবহৃত হইতে পারে।

বমনকারক গ্যাস ও দুর্গন্ধ গ্যাস বহুক্ষেত্রে বিষাক্ত নহে—কেবল শত্রুকে জ্বালাতন করিয়া তাহাদের কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটান ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

বিষ-গ্যাসের তারতম্যভেদে শত্রুর উপর ব্যবহারের বিধি বিভিন্ন হইয়া থাকে। ক্লোরিনের মত গ্যাস লোহার সিলিণ্ডারে উচ্চ চাপে পুরিয়া শত্রুর ট্রেঞ্চের সম্মুখে রাখা হয়। সিলিণ্ডারে বড় পাইপ লাগান থাকে। সে সকল পাইপের মুখ শত্রুর দিকে করিয়া খুলিয়া দেওয়া হয়। ক্লোরিন্ গ্যাস উচ্চ-চাপে সিলিণ্ডারে ভর্ত্তি থাকে বলিয়া পাইপগুলির মুখ খুললে গ্যাস আপনা হইতে ধোঁয়ার আকারে বাহির হয় এবং হাওয়ার সাহায্যে শত্রুর ট্রেঞ্চের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। দূর হইতে এই ধোঁয়া ঈষৎ হলদে রঙের মেঘের মত দেখায়। মাষ্টার্ড গ্যাস প্রভৃতি তরল পদার্থ এ ভাবে ব্যবহার করা চলে না। মাষ্টার্ড গ্যাস শেলে পুরিয়া ট্রেঞ্চমর্টারের সাহায্যে শত্রুব্যূহের উপর নিক্ষেপ করা করা হয়। ট্রেঞ্চমর্টার (Trench mortar) এক প্রকার ছোট কামান। অনেক সময় এইরূপ বিষ-গ্যাসের শেলের ভেতর ছোট ছোট আরও গোলা পোরা থাকে যাহার ভিতর ফস্ফরাস ও টিন্-ক্লোরাইড্ জাতীয় দ্রব্য থাকে। বিষ-গ্যাসের শেল ফাটার সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট গোলার ভিতরের দ্রব্যগুলি জ্বলিয়া উঠিয়া সাদা মেঘের সৃষ্টি করে। শত্রুসৈন্য সেই মেঘের মধ্যে নিজেদের গন্তব্য ঠিক করিতে পারে না এবং সঙ্গে সঙ্গে বিষ-গ্যাস তাহাদের অভিভূত করিয়া ফেলে। অনেক সময় ট্রেঞ্চ-মর্টারের সাহায্য না লইয়া চলন্ত ট্যাঙ্ক হইতে বা আকাশে এরোপ্লেন হইতে বিষ-গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করা হয়। কখনও কখনও ট্যাঙ্ক ও এরোপ্লেনের সাহায্যে সিলিণ্ডারে পোরা বিষ-গ্যাস ছাড়িবার ব্যবস্থা করা হয়। বিষ-গ্যাস হাওয়া অপেক্ষা ভারী, কাজেই সিলিণ্ডারের মুখ খুলিয়া দিলে বিষ-গ্যাস আস্তে আস্তে মাটিতে নামিয়া আসে এবং ধোঁয়ার মত মাটির উপর অবস্থান করে। বর্ত্তমান যুদ্ধে ট্রেঞ্চযুদ্ধ অপেক্ষা ট্যাঙ্ক ও এরোপ্লেন যুদ্ধই বেশী গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই বিষ-গ্যাসের বাহনস্বরূপ ট্যাঙ্ক ও এরোপ্লেনের প্রাধান্য বাড়িতেছে।

বিষ-গ্যাস হইতে আত্মরক্ষার উপায় কি? গতযুদ্ধে প্রথম যখন গ্যাস সুরু হয়, তখন গ্যাসের মুখোস (gas mask) আবিষ্কৃত হয় নাই। সৈনিকগণ বিষ প্রতিষেধক ঔষধে রুমাল ভিজাইয়া নাক ও মুখের উপর বাঁধিয়া রাখিত। পরে গ্যাসের মুখোস প্রচলিত হয়—উহার ভিতর ঔষধ লাগান বস্ত্রখণ্ড থাকিত যাহার মধ্য দিয়া হাওয়া প্রবেশ করিলে হাওয়ার সহিত বিষ-গ্যাসের বিষ অপহৃত হইত। গ্যাসের মুখোসের ক্রমশঃ উন্নতিবিধান হইয়াছে। আজকাল যে গ্যাসের মুখোসের প্রচলন হইয়াছে তাহাকে রেস্পিরেটর্ (Respirator) বলে। ইহার দুইটী অংশ—একটী অংশ মুখ বেড়িয়া থাকে, অপরটী ফিল্টার বাক্স, যাহার মধ্যে কাঠকয়লা, সোডাচূণ (Soda lime), পারম্যাঙ্গানেট্-অব-পটাশ (Permanganate of Potash) প্রভৃতি দ্রব্য থাকে। ফিল্টার বাক্সটীর সহিত প্রথম অংশটীর যোগাযোগ থাকে একটি নলের দ্বারা। হাওয়া প্রথমে ফিল্টার বাক্সটির ভিতর প্রবেশ করে, ইহার মধ্য



রেসপিরেটর

দিয়া আসিয়া নলটীর সাহায্যে মুখে উপস্থিত হয়। রেস্পিরেটর্ ব্যবহারকালে নাক দিয়া নিঃশ্বাস গ্রহণ অনুচিত, সেই কারণে ক্লিপ দিয়া নাক বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। মুখ দিয়া নিঃশ্বাস গ্রহণ করিতে হয়। ফিল্টার বাক্স হইতে যে হাওয়া মুখে আসে তাহা বিশুদ্ধ হাওয়া, কাজেই কোনও ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না।



দেশের সেবা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

এগার

শুভ্রধারা মৃত্যু নদী উচ্ছ্বসিছে গহ্বরে গহ্বরে
কে জানে গো অতর্কিতে কে কখন ডুবিবে অতলে,
নিঃশেষে পুড়িয়া নে রে নির্ব্বাণের আগে প্রাণ ভ'রে
ভালবেসে কেঁদে হেসে কামনার মায়াতরুতলে।

—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

উমা যখন মহকুমা হইতে একদিন অপরাহ্নে তাহার দরিদ্র ও অসহায় পিতাকে চিরদিনের জন্ম বিদায় দিয়া বাড়ী ফিরল, তখন সে দেখিতে পাইল, তাহাদের বাড়ীর কোন অস্তিত্বই নাই, বাড়ী ভস্মীভূত। কোথায় বা তাঁত, কোথায় বা থাকিবার ঘর! সব শূন্য! বাতাসে ভস্মীভূত ছাইগুলি উড়িয়া উড়িয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে! বাড়ীর পেছনের বাঁশের ঝাড় ও পেয়ারা গাছটা আগুনের তাপে একেবারে ঝল্‌সিয়া গিয়াছে! কয়েকটা কাক শুধু কা-কা রবে সেই শূন্য ভিটার পাশের একটা গাবগাছের ডালে বসিয়া এই শ্মশানপুরীর নীরবতা ভাঙ্গিয়া দিতেছিল।

উমা খালের ধারে কাঁঠালগাছটার গুঁড়িতে ঠেস্ দিয়া বসিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু কেহ তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিল না, বরং তাহাকে ঘিরিয়া একদল হৃদয়হীনা প্রৌঢ়া বিধবা ও বৃদ্ধা এবং ছেলেমেয়ের দল নানা অসংলগ্ন প্রশ্ন করিয়া অনাবশ্যক ভাবে বেদনা দিতেছিল। শূন্য—সব শূন্য—কেহ ত' তাহার নাই। কে তাহাকে এই দুঃসময়ে গ্রহণ করিবে, কে তাহাকে আশ্রয় দিবে। উমা দেখিয়াছিল, কি ভাবে কেমন করিয়া ডাক্তার তাহার পিতার দেহটাকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া বীভৎস করিয়া তুলিতেছিল। উমা শুধু ভাবিতেছিল, এই কি দুনিয়া? এই কি মানুষের ভালবাসা? কেন যে ভুল করিল, কেন যে ভালবাসিল, কেনই বা সে এত বড় কঠোর দণ্ড পাইল, কোন দোষ ত' তাহার ছিল না! সে যাহাকে বিশ্বাস করিয়াছিল, যাহাকে নির্ভর করিয়া হৃদয় ও দেহ দিয়াছিল, আজ কি না সেই নিষ্ঠুর তাহার সহিত সকল সম্বন্ধ যে অস্বীকার করিয়াছে তাহাই নহে, বরং তাহাকে সর্ব্ববিধ ভাবে নির্য্যাতনের দ্বারা লাঞ্ছিতা, অপমানিতা ও পদদলিতা করিয়াছে! সে কি করিতে পারে? কোথায় তার শক্তি, যে শক্তি এ বিপদের মধ্যেও ধৈর্য্য ও সাহস দিবে! উমা এই বেদনার মধ্যেও ভাবিতেছিল, একবারও কি তাহার মনের মধ্যে একটা অনুতাপ আসিবে না, একবারও কি সে ভুল বুঝিবে না! হায় রে দুর্ব্বলা নারীর মন,—কত সহজেই দুইটি সুমিষ্ট সম্ভাষণেই না সে সব ভুলিয়াছিল।

ক্রমে বেলা পড়িয়া গেল। আম বনের ও ঘন বাঁশবনের আড়ালে সূর্য্য ঢলিয়া পড়িল। আসন্ন সন্ধ্যার ধূসর ম্লানিমা চারিদিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল।

সেই পথে সে-সময়ে সুবোধ ও তাহার কয়েকজন বন্ধু বাড়ী ফিরিতেছিল, তাহারা হঠাৎ উমাকে এই ভাবে দেখিতে পাইয়া কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি, উমা-দি' যে, কখন এলে?"

উমা কথা বলিল না। তাহার দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতেছিল।

সুবোধ উমার কাছে আসিয়া কহিল, "উমাদি, ছিঃ কাঁদতে আছে? কেঁদে কি হবে বল! বিধাতা তোমার মাথায় যে ব্যথার বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন সেই বোঝাই যে বহন করতে হবে। এস দিদি, আমার সঙ্গে এস।"

উমা মাথা উঁচু করিয়া সুবোধের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কোথায় যাব ?"

"আমাদের বাড়ী।"

"তোমাদের বাড়ী—না-না, আমাকে যে তাড়িয়ে দিবে। আমি যাব যে-দিকে দুই চক্ষু যায় !"

সুবোধের বন্ধুরা কহিল, "কি আশ্চর্য্য, কখন এ-বাড়ী পুড়ে গেল ? কিছু ত' জানতে পারলুম না।"

সুবোধ কহিল, "যারা অন্যায় করে, তারা জানিয়ে শুনিয়ে কি কখনও কিছু করে ? আমাদের এই বাঙ্গালী জাতির মধ্যে হাজার হাজার নরাধম আছে যারা ভদ্রভাবে সমাজে বিচরণ করে, কিন্তু তারাই হচ্ছে শয়তান ! এ-দেশে শয়তানের অভাব নেই !"

তারপর উমার দিকে চাহিয়া কহিল, "ঠিক বলেছ উমা দি' ! আমার বাড়ী কোথায় ? তাই ত' আমার কাকা যে-সমাজের নেতা, তিনি তোমাকে ঠাঁই দিবেন না উমা দি' ! আচ্ছা তুমি এস ত' আমার সঙ্গে, যতদিন আমরা গাঁয়ে আছি, ততদিন তোমার ভাবনা নেই !"

উমা, সুবোধ ও তাহার সঙ্গীদের উৎসাহপূর্ণ কথা শুনিয়া শান্ত হইয়া কহিল, "জান সুবোধ, কত বড় অপমানের বোঝা আমাকে বইতে হচ্ছে ! আজ আমার বাড়ী নেই, ঘর নেই, সহায় সম্বল কিছুই নেই ! কোথায় যাব ভাই ! না-না, এ-গ্রামে—এ-শ্মশানে আমি থাকবো না, থাকা উচিতও নয়।"

সুবোধ কহিল, "উমা দি', নিজের বেদনাটাকে খুব বড় করে দেখছো, তার জন্যে কেঁদে ভাসাচ্ছো, আর ঈশ্বরের দোহাই দিচ্ছ, কিন্তু যারা তোমাকে এমন ভাবে নিপীড়িত করেছে, যারা তোমার বাবাকে, একজন সরল নিরীহ ব্যক্তিকে, বিনা দোষে মেরে ফেলতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই, তাদের বিরুদ্ধে একটা কথা ত' তোমায় বলতে শুনলুম না। কেঁদ না, যা হবার তা হয়ে গেছে, তোমার বাবা আর ফিরে আসবেন না। তুমি কেঁদে মরলেও চীৎকার করেও সারা গ্রামকে ব্যথিত করতে পারবে না, কোন সহানুভূতি পাবে না ! এ-কি মানুষের সমাজ ! ভুল বুঝেছ বোন্ ! শোন আমার কথা। এই ভস্মস্তূপে দাঁড়িয়ে এই ছাই মুঠো হাতে করে পণ কর, যারা নারীর অপমান করতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করে না, যারা সমাজের নিপীড়ন করতে লজ্জিত হয় না, সেই সব পাষণ্ডদের যেন তোমার নারীশক্তি ধ্বংস করে দিতে পারে। কর পণ উমাদি' !"

উমা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সুবোধের মুখের দিকে চাহিল। তাহার চক্ষু অশ্রুহীন হইয়াছিল, আর কি যেন এক দুর্জ্জয় শক্তি প্রভাবে তাহার সারা দেহ কাঁপিতেছিল।

তখন অদূরে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতেছিল। দেবতার মন্দিরে তখন সন্ধ্যারতি হইতেছিল। পশ্চিম গগনে শুকতারা উজ্জ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। বাঁশের ঝাড়ে ঝাড়ে বনে বনে পাখীদের কলরব মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিতেছিল। তারারাও দলে দলে আমাদের দেখা দিতেছিল।

সুবোধ বলিতে লাগিল, "এদেশের নারীসমাজ চিরকাল লাঞ্ছনা সহ্য করে এসেছে, কিন্তু তার কোন প্রতিকার হয় নাই, কেন জান ?"

"কেন ভাই ?"

"কেন ? এই তোমাদেরই জন্য। তোমরা আগুনে পুড়ে মরেছ—মুখ ফুটে কথা বলতে সাহস কর নি, ধর্ম্মের অবমাননা করে, মিথ্যা শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে তোমাদের অক্ষয় স্বর্গের পথের সন্ধান পুরুষরা বলে দিয়েছে, তোমরা তাই বিনা দ্বিধায় মাথা পেতে নিয়েছ। তোমরা শত শত নারী একজন অক্ষম দুর্ব্বল বৃদ্ধকে বরমাল্য দিয়েছ, নিজের জীবনের সুখশান্তি কামনা ও আকাঙ্ক্ষা সব বিসর্জ্জন দিয়ে, এই সেদিন মদ্যপায়ী স্বামী লাথি জুতো মেরেছে, কপাল কেটে রক্তধারা প্রবাহিত হয়েছে, তবু পতিদেবতার স্তবগান গেয়ে তোমরা ভারতে নারীধর্ম্মের মাহাত্ম্য ঘোষণা করেছ, তারই ফলে আজ তোমাদের সমাজ নাই, সত্ত্বা নাই, কোন অধিকার নাই, আছ নিরীহ প্রাণহীন জড়পিণ্ড মাত্র। উমাদি' ! পণ কর এই ভিটার মাটি ছুঁয়ে, বেঁধে নাও একমুষ্টি ভস্ম আঁচলে এই অত্যাচারের স্মরণ চিহ্ন ; যেদিন পারবে এর প্রতিশোধ নিতে, সেদিন আকাশে উড়িয়ে দিও এই ভস্মরাশি—চল দিদি !"

উমা সুবোধের কথায় প্রাণে নবীন বল লাভ করিল। সে বলিল, "ঠিক বলছ ভাই ! আমি সব ভুলবো ! তোমার কথাই সব মেনে নেবো।" উমা সেই পুঞ্জীভূত ভস্মরাশির মধ্য

হইতে কতকটা তুলিয়া লইয়া আঁচলে বাঁধিল—কহিল, "বাবা, মা, স্বর্গ হতে তোমরা আমায় আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি তোমাদের সকলের অপমান ও লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিতে পারি।" উমার কথার সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল একদল শিবার চীৎকার। তাহারাও যেন তাহার কথার সমর্থন করিতেছিল।

সুবোধ উমাকে লইয়া ধীরে ধীরে বরদা বন্দোপাধ্যায়ের বাড়ীতে আসিল। তাহার সঙ্গীরাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। নির্জ্জন গ্রাম্য পথ। দুই এক বাড়ীতে শুধু প্রদীপের ক্ষীণ রশ্মি বেড়ার ফাঁক দিয়া বাহিরে পড়িতেছিল।

সুবোধ বরদাকান্তের ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরের ভিতর অণিমা ও তাহার দাদুভাইয়ের মধ্যে কথা চলিতেছিল।

অণিমা বলিতেছিল, "দাদুভাই, আমার যাবার দিন ত' ঘনিয়ে এল!"

"তাইত' রে দিদি! তুই যে ক'দিন থাকিস্ সে কয়দিন আমার আনন্দ আর ধরে না। মনে হয় ত্রিশ বছরবয়স কমে গেছে রে দিদি! তারপর আবার গোকুলপুরী অন্ধকার হ'য়ে যায়, বিসর্জ্জনের বাজনা বাজে রে ভাই।"

এমন সময় বাহির হইতে সুবোধ ডাকিল, "অণিমা"!

অণিমা চমকিয়া উঠিল, কিন্তু কোন উত্তরই দিল না।

সুবোধ ঘরের ভিতর হইতে কোন সাড়া না পাইয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে ডাকিল, "অণু! শুনছিস্! আমি রে—"

বরদা বন্দ্যোপাধ্যায় সচকিত হইয়া কহিলেন, "সুবোধের গলা না?"

সুবোধ কহিল, "হাঁ, দাদামশাই!"

বাঁড়ুয্যেমহাশয় গম্ভীরভাবে কহিলেন, "এত রাত্রিতে যে।"

"ভয় নেই দাদা, সিঁদ কাটতে আসি নি! আর রাত ত' নয়টাও বাজে নি।"

"রাত্রিতে কেন এই গরীবের ঘরের দোরগোড়ায় এসে হানা দিচ্ছ বল ত!"

অণিমা ইহাদের উত্তর-প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া কপাট খুলিয়া দিল।

কপাট খুলিয়া দিবামাত্রই সুবোধ উমাকে ও তাহার সঙ্গী কয়জনকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া মাটির উপর বসিয়া পড়িল।

বরদাকান্ত তাহাদের সঙ্গে উমাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন এবং ভীত ও সচকিত হইয়া কহিলেন, "এ কি সুবোধ! রামগতির এই মেয়েটাকে কোথা থেকে নিয়ে এলে! এক্ষুণি বেরকরে দাও।"

বরদাকান্ত উত্তেজিত ভাবে তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, "আমি গরীব বলে আমার কাঁধে এই আপদটাকে এনেছ! লক্ষ্মীছাড়ি হতভাগী—" উমাকে লক্ষ্য করিয়া গালি দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু দেওয়া হইল না। অণিমা তাড়াতাড়ি দাদুর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া চুপি চুপি কহিল, "শান্ত হও, চুপ কর লক্ষ্মী দাদুভাই। সুবোধ দাদার কাছে সব কথা শুনে নিয়ে পরে কথা বলো।" তারপর উমার হাত ধরিয়া ঘরের এক পাশের তক্তপোষখানিতে বসাইয়া কহিল, "একি কাঁদছ কেন উমাদি! চুপ করো ভাই। সুবোধদাদার কাছে সব শুনে নি। দাদুভাই, অমন সবাইকে বলেন।"

সুবোধ বরদাবাবুকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "দাদাম'শায়, সবই ত জানেন, কি অত্যাচার হয়েছে এই উমাদিদির উপর। তারপর কি ভাবে তাকে ফিরে আসতে হয়েছে সবই ত জানেন। এখন ও কোথায় যায়? ক'বরাজম'শায় সহরে গেছেন একটা রোগী দেখতে, ফিরতে দু'একদিন দেরী হতে পারে। সে জন্য ওকে আপনার এখানে নিয়ে এসেছি, এক রাত্রির জন্য শুধু ওকে আশ্রয় দিন। আশ্রয় না দিলে কিন্তু উমা এখন কোথায় যাবে। কে জানে কেমন করে ওর বাড়ী ঘর পুড়ে গেল। বেচারী শূন্য ভিটার পাশে বসে কাঁদছিল—আমরা দেখে—"

বাঁড়ুয্যে ম'শায় মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিলেন, "অমনি তোমার মন গলে গেল, সুন্দর মুখ দেখলে কি না! এই ত' তোমাদের দোষ।"

অণিমা শান্তভাবে মৃদুস্বরে কহিল, "চুপ কর দাদু ভাই।"

"হুঁ, আমি কি চুরি করেছি, না ডাকাতি করেছি যে চুপ করে থাকবো? কেন চুপ করে থাকবো বল্ ত? আমি চেঁচাবো, খুব চেঁচাবো। দেখবে তবে—"

বরদাকান্তের কথা শেষ না হইতেই অণিমা বলিল,

"চেঁচিয়ে কেমন মজা হবে, হাঁপিয়ে পড়বে বিছানার উপর। যত বিপদ হবে আমার। কে তোমাকে সামলাবে তখন বল ত?"

বরদাকান্ত কহিলেন, "অই করেই ত' আমাকে জুজু করে রেখেছিস্।"

সুবোধ, বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয়ের মেজাজ বেশ ভাল করিয়াই জানিত, সে কহিল, "আচ্ছা দাদাম'শাই, আইনে এর কোন প্রতিকার নেই?"

বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয় মহাউৎসাহের সহিত কহিলেন, "কি বলিস্, আইনে বিধান নেই আছে কিসে? বলিস্ ত' কালই দিই তিন নম্বর মোকদ্দমা ঠুকে। জানিস্ ত' মহকুমার ফৌজদারী আদালতের মোক্তারেরা বলেন যে, ফৌজদারী মোকদ্দমা বুঝতে আর চালাতে যদি কেউ পারে, সে পারে এক বরদা বাঁড়ুযো।" তারপর উমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তাইত রে রামগতির মেয়ে তুই, তোকে কিনা এমন করে অপমান করলে। ওহো! কি সাদাসিদে ভালমানুষই ছিলরে তোর বাবা! কি করব দিদি সবই বরাতের কথা। সে যাক্, তুই কিছু ভাবিস্নি, বরদা বাঁড়ুযো যখন বেঁচে রয়েছেন তখন দেব বেটাদের ভিটেতে ঘুঘু চরিয়ে। আরে জানিস্ সবই বেটা মাধব আচায্যির কাজ।" তারপর ভাবিয়া বলিলেন, "তবে আপাততঃ কয়েকটা টাকা খরচ, কি বল সুবোধ, সে আমরা একরকম করে যোগাড় করে নোবো। কিছু ভাবিস্নি। আজ রাত্রিতে এখানে থাক্। কাল যা হয় পরামর্শ করে ঠিক করবো। তোর জন্যে যাব আর একবার মহকুমায়। বাঁড়ুযোকে হাকিম, মোক্তার সকলেই জানে।—না—না অমনি অমনি যেতে দেওয়া হবে না।"

সুবোধ দেখিল তাহার কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে। সে মৃদুস্বরে কহিল, "আমি কি আর জানিনে দাদাম'শাইকে, অত বড় মন আর কার হবে? তবে আপনি এ-রাত্রির মত উমাদিকে আশ্রয় দিন, কাল ওর সম্বন্ধে যা হয় একটা বন্দোবস্ত করা যাবে। তারপর দেবেন কয়েক নম্বর মোকদ্দমা ঠুকে। কি বলেন?"

বরদাকান্ত গম্ভীরভাবে কহিলেন, "তা' ত হবে। কিন্তু জানিস্ ত ভাই, অই কালাপাহাড় মাধবআচার্য্যিটা কি আর কোন খোঁজ রাখে না। সে যদি রাত্রিতে এসে একটা হাঙ্গামা বাধায় তবে যে বড় মুস্কিল হবে রে। তাইত ভয়। জানিস্ ত' তিনটি মানুষ আমরা, দুইটি মেয়ে মানুষ, আর আমি একা পুরুষ—সেই পুরুষের দেহে কি আর কিছু আছে রে! শুধু হাড় ক'খানা ঝন্ ঝন্ করছে।"

"সে ভাবনা করবেন না দাদামশাই, আমরা আজ রাত্রিতে চার-পাঁচ জন মিলে পাহারা দেব

"তা বেশ ভাই, তা বেশ। জানি সুবোধ, আমায় তোরা মামলাবাজ, ফন্দীবাজ বলে গাল দিচ্ছিস্ কিন্তু একদিন এই মন বড় কাঁচা ছিল রে কিন্তু এখন ঝুনো বাঁশ হয়েছে। এই সমাজ, এই দেশের হাওয়া যে কত বড় দূষিত তা' গ্রামে বাস করে বুঝছি, তাই মন ছোট হয়ে গেছে। সেই ছোট মন নিয়ে, মানুষের অভিশাপ মাথায় কুঁড়িয়ে নিয়েই এবারকার জীবন-যাত্রা শেষ হবে। মানুষের অবিচারে আমাকে এমন করেছে রে।"

অণিমা কহিল, "দাদুভাই! সেজন্য কোন দুঃখ করো না। সমাজ মানুষকে পশু করে, আবার সমাজই মানুষকে দেবতা করে। তুমি জানত উমাদির সব কথা, তবে কেন তার এ-নির্য্যাতন সইতে হ'ল। আমরা কি এর প্রতিকার করতে পারি না।"

সুবোধ কহিল, "আমি আর বাড়ী যাব না। বাড়ীতে কেই বা রেঁধে বসে থাকবে। বড্ড খিদে পেয়েছে। উমা কিছু খেয়েছে বলে ত' মনে হয় না। দে ত' দিদি চাল ডাল বের করে দু'টো ফুটিয়ে নি। সাবধানে ত' থাকতে হবে, মাধব-মামার চর কোথায় ফিরছে কে জানে? কাকা কোথায় তাও ত' বোঝা গেল না।"

অণিমা হাসিয়া কহিল, "সুবোধ দা', নলরাজা হ'লে কবে বল ত'? পরীক্ষায় ভাল পাস করে আমাদের তোমরা হারাতে পার, তা' বলে রান্নাবান্নায় হারাবে সে মনে করো না। ভদ্রতা করবার দরকার নেই বাবু। ও ভাবনা তোমার করতে হবে না। যাও এই লণ্ঠনটা নিয়ে পুকুর-ঘাটে গিয়ে হাত-পা ধুয়ে ফেল। তারপর চা খেয়ে দাদুর সঙ্গে গল্প কর। আমি ষ্টোভ জ্বেলে সব ঠিক করে ফেলছি। যাও তা' হ'লে উঠ ত' লক্ষ্মী ভাইয়েরা সব, আর দেরী করো না।"

অণিমার দিকে চাহিয়া সুবোধ কহিল, "এস ত' ভাই অনাথ, এসত ভাই প্রবোধ হাত মুখ ধুইয়ে আসি।"

তাহারা হাত মুখ ধুইয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া দেখিল, যোড়া তক্তপোষের উপর পরিষ্কার বিছানা প্তাতা। ঘরের মেজেটিও বেশ পরিচ্ছন্ন। তিনখানি চেয়ার বড় টেবিলের পাশে সাজানো। টেবিলের উপরটাও ঝাড়িয়া পুঁছিয়া পরিষ্কার করা। যে বাহিরের ঘরটায় কেহ বাস করিতনা, জঞ্জাল ও আবর্জ্জনায়ই শুধু পূর্ণ থাকিত এত অল্প সময়ের মধ্যে সেই ঘরের এইরূপ সংস্কার ও পরিচ্ছন্নতা দেখিতে পাইয়া সুবোধ মুগ্ধ বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। ঠিক এমনি সময়ে অণিমা চায়ের ক্যাৎলি ও কয়েকখানি পেয়ালা হাতে করিয়া সেখানে প্রবেশ করিল। আর উমার হাতে ছিল ঝক্‌ঝকে কাঁসার রেকাবিতে মুড়ি ও নারকেলের মিঠাই। উমা একখানি পরিষ্কার সাড়ী পড়িয়াছিল, কাঁদের একপাশ দিয়া তাহার বিমুক্ত কুন্তলরাজি দুলিতেছিল। ম্লান যূথিকার মত তাহার মুখখানি ক্লান্ত ও বিষণ্ণ দেখাইতেছিল। সুবোধ উমার এই পরিবর্ত্তনে আনন্দিত হইয়া কহিল, "অণু, তুই আমাকে অবাক করে দিয়েছিস্।"

অণিমা হাসিয়া বলিল, "কেন বল ত' সুবোধদা!"

"চামচিকের এই বাসাবাড়ীটাকে তুই যে একেবারে পরিপাটি ড্রইং রুম করে ফেলেছিস্! তারপর ঐ শীতের আমেজের মধ্যে গরম গরম চা আর গরম মুড়ি কি যে চমৎকার কি আর বলবো! ভাগ্যিস্ তুই ছিলি! নইলে উমাদি'কে নিয়ে যে সারা রাত গাছের তলায় বসে আগুন জ্বেলে কাটাতে হ'ত। তবে সে অভ্যেস আমার আছে। বাপ-ও নেই, মা-ও নেই, আর কাকা তিনি ত' এই বিদ্রোহী ধনুর্দ্ধর ভাইপোর মৃত্যু কামনা ক'রে নারায়ণকে রোজ হাজার তুলসী দিচ্ছেন! কিন্তু নিষ্ঠুর দেবতা ভক্তের বাঞ্ছা আজও পূর্ণ করেন নি।"

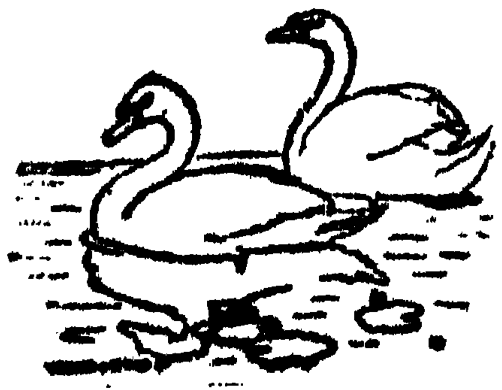
অণিমা ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, "চুপ কর সুবোধদা! কি যে ছাই মাথামুণ্ডু বল! যাই দেখিগে তোমাদের খাবার তৈরী হ'তে কত দেরী।"

অণিমা ও উমা চলিয়া গেল। তাহাদিগকে প্রবোধ আগাইয়া ঘরের দুয়ার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল।

সুবোধ গ্রামের লোককে ভাল করিয়াই জানিত। আর জানিত মাধব মামাকে। মাধব মামা যখন একবার এই গ্রামে আগুন জ্বালিয়াছেন তখন সে আগুনে যে গ্রামের অনেককেই পোড়াইয়া মারিবেন সে অভিজ্ঞতা তাহার ছিল। তারপর মাধবের অর্থের অভাব হইবে না। এই পৃথিবীতে যত কিছু অত্যাচার, অবিচার, নিপীড়ন, সবার মূলেই রহিয়াছে ধনীদের প্রভাব। কোন দেশেই গরীবের দুঃখ ঘোচে না। বাঙ্গালা দেশে ত' নহেই। বাঙ্গালার ধনী, বাঙ্গালার মহাজন, বাঙ্গলাদেশ শ্মশান হইয়া গেলেও একবিন্দু অশ্রু ফেলিবে না! ব্যক্তিগত স্বার্থকেই তাহারা সবচেয়ে বড় করিয়া দেখিবে। সমাজেও তাহাদেরই মান, গরীবের গুণের আদর করে কে? উমা মরিল কি বাঁচিল, তাহার পিতা নির্য্যাতনকারীর হাতে মৃত্যুকে বরণ করিল, তাহাতে সমাজের কি আসে যায়? এমন শত সহস্র বাঙ্গালার নারী নির্য্যাতিতা, গৃহ-পরিত্যক্তা, সমাজলাঞ্ছিতা হইয়া পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু যাহারা তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিয়া পথে বসাইয়াছে তাহারাই আজ সমাজের নেতা—দেশনায়ক। ইহার বিরুদ্ধে কে দাঁড়াইবে?

সুবোধ ভাবিল, "ইহার কি কোনও প্রতিকার নাই? কে বলিবে আছে কি না? এবং কবেই বা তাহা আসিবে"।

[ক্রমশঃ





দুহিতা ও অন্যান্য পরিজন

জনৈক গৃহী

দুহিতা—"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়া তু যত্নতঃ" ইহা যে শ্লোকের অংশ, সে শ্লোক যখন রচিত হইয়াছিল, তখন কোন বালিকা-বিদ্যালয় ছিল কি না জানি না। তৎকালীন সমাজনীতির পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, সে-সময়ে বালিকা-বিদ্যালয় ছিল না। তথাপি সে-কালে যে কন্যাগণের বিদ্যাশিক্ষা (অন্যরূপ শিক্ষার কথা এখন বলিতেছি না) হইত না এমন নহে; কারণ, খনা, লীলাবতী প্রভৃতি বিদুষী রমণীগণের স্মৃতি বা খ্যাতি অদ্যাপি লুপ্ত হয় নাই। খনার সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ শ্বশুরের উচ্চারিত বাক্যের ব্যাকরণ-ভ্রম প্রদর্শন ও সংশোধন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার জিহ্বা দ্বিখণ্ডিত করা হইয়াছিল। উদ্দেশ্য—তাঁহার উচ্চারণশক্তির লোপ এবং গুরুজনের ভ্রম-প্রদর্শন করিবার উপায়ের বিনাশ। এরূপ ভ্রম-প্রদর্শন, অন্ততঃ তখনকার দিনে, গুরুজনের পক্ষে অপমানজনক বিবেচিত হইত। ইহা হইতে সে-কালের সামাজিক নীতি ও আচারের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে, হয় ত, কেহ কেহ বলিবেন যে, যে ভ্রম প্রকাশ্য সভায় বা বাহিরের লোকের উপস্থিতিতে সংঘটিত হইলে গুরুজনকে হাস্যাস্পদ বা অপদস্থ হইতে হইত, যদি স্বগৃহে, বিশেষতঃ স্বীয় অন্তঃপুরে তাহার সংশোধন হয় ও তাহার ফলে পাঁচজনের সম্মুখে যে অপমান অবশ্যম্ভাবী ছিল তাহা হইতে গুরুজন অব্যাহতি পান, তবে ত তাঁহার আপনাকে ভাগ্যবান মনে করাই উচিত, নিকট সম্পর্কের পরিজনকে প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবার পরিবর্ত্তে কঠোর শাস্তিপ্রদান কোনমতেই ন্যায়-সঙ্গত হইতে পারে না। কিন্তু তখনকার সমাজের লোক, এরূপ কথা বলা দূরে থাক্, হয় ত, মনেও স্থান দিতেন না। হয় ত, এ প্রবাদটি অতিরঞ্জিত, কিন্তু, ইহা হইতে তৎকালে পুত্রবধূর নিকট কিরূপ আচরণ আশা করা হইত তাহার আভাস পাওয়া যায়।

বলা বাহুল্য, শিক্ষা অর্থে কেবলমাত্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ বিষয়ে শিক্ষা নহে। সংসারে শিখিবার বিষয় অনেক আছে। এমন অনেক বিষয় আছে যাহা শিখিতে হইলে গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হয় এবং অধ্যাপনার প্রয়োজন হয়। অনেক বিষয় আছে যাহা কেবল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা শিক্ষার্থীর আয়ত্ত হয় না। বহু বিষয়ে মুখে মুখে বা দেখিয়া শুনিয়া শিক্ষা হয়। কর্ম্মকারের বংশধর লেখাপড়া শিক্ষা না করিয়াও লৌহ ও ইস্পাত হইতে বঁটী, কাটারী, ছুরি, এমন কি ক্ষুর প্রভৃতি গড়িতে সমর্থ হয়। কুম্ভকার-নন্দন নিরক্ষর হইলেও হাঁড়ি, কলসী, গামলা প্রভৃতি মৃণ্ময় পাত্র নির্ম্মাণ করে। নরসুন্দরের পুত্র কৈশোর হইতেই ক্ষৌরকার্য্যে দক্ষতা লাভ করে, অথচ, হয়ত, সে কোন-দিন কোন বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করে নাই। এবম্বিধ জাতির লোক স্ব স্ব জাতীয় ব্যবসা ভিন্ন অন্য বিষয় বা কার্য্য সম্বন্ধে শিক্ষা করে না এবং করিতেও চাহে না। জাতিভেদ প্রথার ব্যবসাভেদ হইতেই উৎপত্তি, ইহা বোধ করি, কেহ অস্বীকার করিবেন না। জাতিভেদে ব্যবসাভেদ ক্রমশঃ জাতিগুলির মজ্জাগত বা প্রকৃতিগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অনুরূপ নিয়ম (ইহাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলিলে, বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না) অনুসারে রমণীগণ রন্ধন ও রন্ধনশালা সম্পর্কীয় যাবতীয় কার্য্যে সহজেই পারদর্শিতা লাভ করেন। কোন এঞ্জিনিয়ারকে বা অস্ত্রোপচারী (Surgeon)কে মাছ কুটিতে দিলে তিনি সহজে সে-কার্য্য করিতে পারিবেন না, কিন্তু যে-কোন রমণী তাহা অবলীলাক্রমে ও সুচারুরূপে করিবেন। যে-কোন রমণী কটাহস্থ তৈল বা ঘৃত কী-পরিমাণে উত্তপ্ত হইলে তরকারী ভাজিবার বা ব্যঞ্জন 'সম্বরা' দিবার উপযোগী হইবে Heat-সম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিয়াই বুঝিতে পারিবেন, কিন্তু রন্ধনবিষয়ে অনভিজ্ঞ কোন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত সহজে বুঝিতে পারিবেন না। সকল দেশেই রমণীগণ স্বতঃপ্রবৃত্তা হইয়া রন্ধনশালার ভার গ্রহণ করেন। দুহিতা, পুত্রবধূ ও দেবর-জায়াকে রন্ধনশালার যাবতীয় কার্য্যে শিক্ষিতা করিয়া তুলিতে হয়। সাধারণতঃ পিত্রালয়ে এ-বিষয়ে দুহিতাগণের প্রথম শিক্ষালাভ হয়, পারদর্শিতা-লাভ বিবাহের পরে শ্বশুরালয়েই হইয়া থাকে। বিবাহান্তে দুহিতা বধূত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং শ্বশুরালয় তাহার প্রকৃত বাসস্থান ও কর্ম্মস্থল হইবে, এইরূপ বিচার করিয়া তাহাকে শিক্ষাদান করিতে হয়। বধূত্বপ্রাপ্তির পরে শ্বশুরের সংসারে (বিশেষতঃ যদি সে সংসার পরিজনবহুল হয়) ত্রুটীর জন্য কেবল তাহার নহে, তাহার পিতামাতার, এমন কি পিতৃবংশের পর্য্যন্ত নিন্দা হইয়া থাকে। ইহার ফলে উভয় কুটুম্বগৃহে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়।

নারী-শিক্ষা (এখানে বিদ্যাশিক্ষার কথাই বলিতেছি) নিন্দনীয় নহে, প্রত্যুত বাঞ্ছনীয় ও প্রয়োজনীয়। খনার পরবর্ত্তী যুগসমূহে, অর্থাৎ আধুনিক যুগের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত নারী-শিক্ষার হ্রাস হইয়াছিল। তথাপি ভদ্র সংসারে সম্পূর্ণ নিরক্ষরা রমণীর সংখ্যা অল্পই ছিল। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত যে যুগে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল সে-যুগে পরিণত বয়স্কা রমণীগণ উভয় গ্রন্থ নিয়মিতরূপে পাঠ করিতেন। অনেক রমণী দৈনিক ব্যয়ের হিসাব স্বহস্তে রাখিতেন। কোন কোন রমণী স্বীয় পুত্রকন্যাকে

বিদ্যাসাগরের 'প্রথম ভাগ' ও "দ্বিতীয় ভাগ" নিজেই পড়াইতেন। সে-সময়ে বালিকা-বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব, অন্ততঃ বহুলতা, না থাকায় অল্পবয়স্কা বালিকাগণ বালকগণের সহিত একই গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বিদ্যা শিক্ষা করিত; সে জন্য তাহারা ধারাপাত ও শুভঙ্করী উত্তমরূপে শিখিতে পারিত। এই অঙ্ক-পুস্তক হইতে যে "মানসিক অঙ্কের" সৃষ্টি হইয়াছিল এবং যাহাতে পাঠশালার ছাত্রছাত্রিগণ বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিত তাহা এক্ষণে লুপ্তপ্রায়। অথচ এই তিনটি বিষয়েরই শিক্ষা সাংসারিক কার্য্যের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। সে-কালে রমণীগণ উপাধিলোলুপা ছিলেন না। বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার বহু পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত উপাধিলাভের স্পৃহা তাঁহাদের হৃদয়ে জাগরিত হয় নাই। অবশ্য প্রশংসা লাভের ইচ্ছা সকলেরই থাকে। নিজের প্রশংসা শুনিতে ভালবাসেন না বা বিরক্ত হন এমন লোক বিরল। কিন্তু, উপাধিলাভের সহিত প্রশংসালাভ হয় এ-ধারণা সে-কালের রমণীদের ছিল না। উপাধিলাভ করিতে হইলে পরীক্ষাপ্রদান অবশ্যম্ভাবী। পরীক্ষাপ্রদান করিতে হইলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অধ্যয়ন আবশ্যক। যিনি উপাধিলাভের অভিলাষিণী তাঁহাকে বাধ্য হইয়া উচ্চশিক্ষা অর্জ্জন করিতে হয়। উচ্চশিক্ষায় আপত্তি নাই, উপাধি-লাভে আপত্তি নাই, কিন্তু বধূত্ব-লাভের পরে দেশপ্রচলিত বধূযোগ্য আচরণের ব্যতিক্রম যাহাতে না হয় সে-বিষয়ে উচ্চশিক্ষিতা উপাধিভূষিতার বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। হিন্দুজাতি সাত শত বৎসরের অধিক কাল বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর শাসনাধীন থাকিয়াও যে নিজের কৃষ্টি, নিজের আচার, নিজের ধর্ম্ম অব্যাহত ও অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার কারণ, অন্ততঃ প্রধান কারণ রমণীর প্রভাব, রমণীর সহায়তা এবং রমণীর স্বধর্ম্মে বিশ্বাস। ন্যূনাধিক পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্ব্বেও কোন একাদশ বর্ষীয়া বালিকা দন্তধাবন ও বস্ত্র-পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে জলগ্রহণ করিত না। অল্পবয়স্কা বালিকারা, যাহারা শিব-পূজা বা যমপুকুরপূজা বা ইতুপূজা প্রভৃতি করিত, স্নান ও পূজা সমাপ্ত না করিয়া জল পর্য্যন্ত খাইত না। পল্লীগ্রামের অধিকাংশ গৃহে অদ্যাপি এই ব্যবস্থা পালিত হয়। আধুনিক সমাজে এই প্রথার বা অভ্যাসের বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অনেক আধুনিকা দন্তধাবন ও বস্ত্রপরিবর্ত্তন পরের কথা, শয্যাত্যাগের পূর্ব্বেই চা-পান করিয়া থাকেন। এরূপ অভ্যাস যে স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর ইহা তাঁহারা ভাবিয়াও দেখেন না। কোন কোন গৃহে পুরুষ-গণ বা কোন কোন পুরুষ অনাচারী বা কদাচারী হইলেও স্ত্রীলোকদিগের অনাচার প্রবৃত্তির অস্তিত্বাভাব পরিদৃষ্ট হইত।

হিন্দুর আচার ও ধর্ম্মরক্ষার বিষয়ে নারীগণের প্রভাব ও পোষকতা সমধিক হইলেও পুরুষগণের স্বধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও বিশ্বাস স্থির না থাকিলে বিশেষ ফল হইত না। যে-সকল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ঋষিপ্রণীত হিন্দুশাস্ত্রাদির অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন, সম্ভবতঃ ধর্ম্মান্তর সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি তাঁহাদের মনঃপূত হয় নাই, অথবা উঁহাদিগের নিকট সে-সকল গ্রন্থ হিন্দুগ্রন্থের সমকক্ষ বা সমযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তিমাত্রই যে শাস্ত্রানভিজ্ঞ ছিলেন এমন নয়, তথাপি তাঁহারা নিজ নিজ মতের প্রাধান্যরক্ষার চেষ্টা না করিয়া ব্রাহ্মণের উপদেশ শিরোধার্য্য ও তাহার অনুসরণ করিতেন। ফলতঃ, ব্রাহ্মণেতর জাতিগুলি অসংশয়িতচিত্তে ও অসঙ্কোচে ব্রাহ্মণের পদাঙ্কের না হউক, উপদেশ বাণীর অনুসরণ করিয়া চলিতেন। তদ্ভিন্ন "স্বধর্ম্মে মরণ শ্রেয়ঃ, অন্যধর্ম্ম ভয়াবহ" এই প্রচলিত বাক্য অনুসারে অধিকাংশ ব্যক্তি স্বধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া থাকেন।

এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সদাচার ও স্বধর্ম্মাসক্তির গুণে মাতৃজাতি সংসারের উপর এতদিন যে শুচিকর প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছেন, যাহার ফলে হিন্দুসমাজের ভিত্তি অদ্যাপি দৃঢ় রহিয়াছে, মা-লক্ষ্মীরা আচারভ্রষ্টা হইয়া যেন সে প্রভাব ব্যাহত না করেন। বলা বাহুল্য যে, দুহিতাই মাতৃকত্বের অঙ্কুরভূতা। যে-দুহিতা পিতৃগৃহে সম্যক্ শিক্ষালাভ করে, সে বিবাহের পরে শ্বশুরালয়ে পুত্রবধূর আদর্শস্বরূপ হইবে এরূপ আশা করা যায়।

দুহিতাকে জননীর প্রতীক্ বলিলে অত্যুক্তি হয়। তবে অধিকাংশ স্থলে জননীর আদর্শে কন্যার চরিত্র গঠিত হয়। যৌথপরিবারভুক্তা কন্যার চরিত্রে পিতৃব্যপত্নিগণের, বয়োজ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়াগণের, জ্যেষ্ঠা সহোদরাগণের ও পিতৃব্য-কন্যাগণের এবং অন্যান্য আত্মীয়াগণের চরিত্রের ছায়াপাত হয়। যে সকল বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষিতা হয় তাহারা তথাকার ছাত্রিবৃন্দের ও শিক্ষয়িত্রি-গণের চরিত্র-প্রভাব একেবারে এড়াইতে সমর্থ হয় না। চিন্তার বিষয় এই যে, এ-সকল প্রভাব বিভিন্ন প্রকারের বা পরস্পরবিরুদ্ধভাবাপন্ন হইতে পারে। সেইজন্য এরূপ অবস্থায় যে-কন্যার শিক্ষালাভ হয় তাহার শিক্ষা ও চরিত্রসঙ্গত আচরণের দিকে জনক-জননীর সতর্ক ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আবশ্যক। এরূপ দৃষ্টি না থাকিলে কন্যার চরিত্রের ও আচরণের সংশোধন হইতে পারে না।

নারী চরিত্রের একটি লক্ষণ বা বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা কোন অপরিচিত পুরুষের সাহচর্য্য করা দূরে থাক্, তাহার সহিত কথাও কহেন না। যুবতীর ত কথাই নাই, বালিকাগণেরও এই স্বভাবগত বিরাগ লক্ষিত হয়। সন্নিকট-প্রতিবেশী সমবয়স্ক বালকগণের সহিত স্বল্পবয়স্কা বালিকাগণকে ছুটাছুটি ও অন্যান্য খেলায় প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের এ-প্রবৃত্তি লুপ্ত হইতে থাকে। কন্যা কৈশোরে পদার্পণ করিলে সহোদরাদি নিকট আত্মীয় ভিন্ন অন্য কোন কিশোর বা যৌবনোন্মুখ বালকের সহিত যাহাতে তাহার ঘনিষ্ঠতা না জন্মে কৌশলক্রমে এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, ইউরোপীয়ান ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজে এরূপ ঘনিষ্ঠতা অ-বিরল, সুতরাং ইহা দোষাবহ নহে; কিন্তু তাঁহাদের ভ্রম—তাঁহারা এই এই সমাজের বিধান সম্বন্ধে অজ্ঞ। অপরিচিত বা স্বল্পপরিচিত অথবা প্রতিবেশী কিশোর বা যুবকের সঙ্গে তাঁহাদের 'সোমত্ত' কন্যারা ভ্রমণ করিতেও যায় না, ঘনিষ্ঠভাবে মিশামিশিও করে না। বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখরে প্রতাপ-শৈবলিনীর যে-চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন তাহাতে প্রত্যেক জনক ও জননীর চক্ষু উন্মীলিত হওয়া উচিত। অধুনা কন্যার বিবাহ-বয়স বাড়িয়া গিয়াছে। নিম্নস্তরের জাতিগুলির কথা ছাড়িয়া দিলে এবং ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ কৌলীন্যপ্রথা উপেক্ষা করিলে, সে-কালে অষ্টম বর্ষ বয়স হইতেই কন্যার বিবাহ হইত, একাদশ বর্ষ কদাচিৎ অতিক্রান্ত হইত। এক্ষণে চতুর্দ্দশের অনধিক বৎসর বয়সে কন্যার বিবাহ আইনবিরুদ্ধ। অধিকন্তু, বর্ত্তমান অর্থসমস্যাজালে

জড়িত সময়ে ও সমাজে কন্যাগণের উচ্চশিক্ষা ও উপাধি অর্জ্জনের অজুহাতে বিবাহের বয়ঃক্রমের বৃদ্ধি হইয়াছে এবং সসীমতা লোপ পাইয়াছে। সেই জন্য কিশোর-কিশোরীর ও যুবক-যুবতীর মিশামিশি ও সাহচর্য্য সম্বন্ধে জনক-জননীর প্রখরতর দৃষ্টি-নিক্ষেপ ও অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। অবশ্য সেই পুরাতন কৌলীন্যপ্রথার অস্তিত্ব এখন লোপ পাইয়াছে।

পুত্র অপেক্ষা কন্যা স্বভাবতঃ স্নেহশালিনী হইয়া থাকে। গৃহে শিশুর জন্ম হইলে কন্যা তাহার শুশ্রূষা ও লালনপালনের সাধ্যমত ভার স্বতঃই গ্রহণ করে এবং তাহাকে নিজের ক্রোড়ে লইবার ও রাখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। পিতামাতার ও অন্যান্য গুরুজনের সেবার বিষয়েও কন্যা পশ্চাৎপদ হয় না। আহারের ঠাঁই, পানীয়-প্রদান, খাদ্য পরিবেশন, আহারান্তে তাম্বুলাদি প্রদান কন্যা যত্নপূর্ব্বক করে। যে-কন্যার জননী স্বহস্তে রন্ধন করেন তাঁহাকে সে-বিষয়ে অথবা তাহার আনুষঙ্গিক কার্য্যে কন্যা সহায়তা করে। এ-দেশের রমণীসমাজ কামনা করেন যে, প্রথম সন্তান হউক কন্যা। কন্যার শৈশব অতিক্রান্ত হইলেই তাহাকে এই সকল বিষয়ে শিক্ষাপ্রদান জননীর কর্ত্তব্য। পিতামহী বর্ত্তমান থাকিলে তাঁহার কাছে এবং সুযোগ্যা পিতৃব্য-পত্নীর ও ভ্রাতৃজায়ার কাছে ও তাঁহাদের আদর্শে বালিকা বহু বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে পারে। স্বার্থপরতা মানব-চরিত্রে একটি গণনীয় ত্রুটী; ইহাকে পাশব প্রবৃত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রমণীর এ-ত্রুটী অমার্জ্জনীয়। কন্যাকে এমন শিক্ষা প্রদান করা পিতামাতার কর্ত্তব্য, যাহাতে এই ত্রুটী বা প্রবৃত্তি কন্যার চরিত্র স্পর্শ করিতে না পারে, অধিকন্তু যাহার গুণে পরার্থপরতারূপ সদ্গুণ সে সহজে অর্জ্জন করিতে সমর্থা হয়। ফলতঃ স্বার্থপরতা হইতে অনেকানেক অন্যবিধ দোষ ও ত্রুটী সঞ্জাত হয়। নারীর পরার্থপরতার দৃষ্টান্ত সমস্ত বিশ্বে লক্ষিত হয়। সকল দেশেই সেবাশুশ্রূষার কার্য্যে ব্রতী নারী। অসামরিক সাধারণ হাঁসপাতালে নারী, রেডক্রশ (Red Cross) ও অন্যান্য সামরিক হাঁসপাতালে নারী, যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যেও নারী। সন্তান-প্রসবকালেও প্রথমে ধাত্রীকেই ডাকা হয়, নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে কেহ ডাক্তার ডাকে না। সূতিকাগৃহেও প্রসূতি ও শিশুর পরিচর্য্যায় নারীই নিযুক্তা হয়।

বালিকার হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির ক্রমোন্মেষের উদ্দেশ্যে অল্প বয়স হইতেই তাহার জ্ঞানবুদ্ধির পরিমাণ অনুসারে তাহাকে পূজার্চ্চনায় দীক্ষিত করা উচিত। শিবপূজা, ইতুপূজা প্রভৃতি এই উদ্দেশ্যেই প্রচলিত হইয়াছে। সাবিত্রী-সত্যবানের গল্প এবং অনুরূপ অন্য আখ্যায়িকা শুনাইয়া বালিকাগণের চরিত্র-গঠনে সহায়তা করিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোপযোগী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এ-সকল শিক্ষা সম্ভবপর—পিতামাতার এ দিকে কথঞ্চিত দৃষ্টি থাকিলেই হয়। বরং খ্রীষ্টান-মিশনারী-স্কুলে ও কলেজে বাইবেলের অধ্যাপনা হয়, কিন্তু অন্যান্য বিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়নির্দ্দিষ্ট বিষয় ভিন্ন কোন ধর্ম্মগ্রন্থের অধ্যাপনা হয় না। ইহার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে অপরাধী সাব্যস্ত করা অনুচিত। ধর্ম্মসম্বন্ধে শিক্ষাপ্রদান স্বগৃহে যেমন প্রকৃষ্টরূপে ও গৃহস্থের রুচি-সঙ্গতভাবে সম্ভব, বিদ্যায়তনে তেমন হইতে পারে না। তদ্ভিন্ন, বিদ্যালয়ের ছাত্র বা ছাত্রিগণ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী পিতামাতার সন্তান হইতে পারে। সে-ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থের অধ্যাপনা প্রয়োজনীয় হইলেও কার্য্যতঃ বিদ্যালয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত একপ্রকার অসম্ভব। ধর্ম্মভাব-সঞ্চারের ফলে স্বভাবতঃই লোকের আচার-ব্যবহারের বিশুদ্ধতা সঞ্জাত হয়, বিশেষতঃ ললনার।

কন্যাত্ব পুত্রবধূত্বের প্রাগ্‌যুগ—ইহা বলিলে বর্ত্তমান কালে কোন দোষ হয় না, কারণ আধুনিক শিক্ষিত সমাজে প্রায় প্রত্যেক কন্যা বিবাহের পূর্ব্বে রজস্বলা হইয়া থাকে এবং কন্যাকালকে হিন্দুশাস্ত্রবিহিত দশম বর্ষে সীমাবদ্ধ না করিয়া বিবাহকাল পর্য্যন্ত প্রসারিত করিলে উহাকে একাধিক স্তরে বিভক্ত করার প্রয়োজন হয় না। সেই জন্য দুহিতার প্রসঙ্গের অব্যবহিত পরেই পুত্রবধূর প্রসঙ্গ আরম্ভ এবং তাহাতে কন্যা সম্বন্ধীয় কোন বিষয় বিবৃত করা হইতেছে।

পুত্রবধূ—হিন্দুসমাজ আধুনিকতাগ্রস্ত হইবার পূর্ব্বে পুত্রবধূগণ শ্বশুর-শাশুড়ীর সহিত কথা কহিতেন না। অবশ্য আমি খাঁটী হিন্দুসমাজের কথা বলিতেছি, কারণ, ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের পরে, বিশেষতঃ, যখন "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" গঠিত হয় তখন হইতে ঐ সমাজে উল্লিখিত রীতির অস্তিত্ব লোপ হইয়াছিল। ইহার কারণ এই যে স্ত্রী-স্বাধীনতা ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্যতম উদ্দেশ্য। মুসলমান সমাজের রীতি এই যে, রমণীগণ দশমোর্দ্ধ বয়স্ক প্রাপ্ত কোন পুরুষের সম্মুখে বাহির হয়েন না, তবে পর্দ্দার অন্তরাল হইতে পুরুষের সহিত কথোপকথন নিষিদ্ধ নহে। অন্তঃপুরের মধ্যে হিন্দুললনাগণ অবগুণ্ঠনবতী হইয়া, পরিজনের ত কথাই নাই, কোন কোন আত্মীয়ের সম্মুখে বাহির হইতেন, কিন্তু, তাঁহাদের সঙ্গে (অবশ্য সম্পর্ক হিসাবে) কথা কহিতেন না। বিমাতা প্রাপ্তবয়স্ক সপত্নিপুত্রের সম্মুখে অবগুণ্ঠন মোচন করিতেন না বা তাঁহার সহিত কথা কহিতেন না। সম্পর্কে জ্যেষ্ঠা, কিন্তু বয়ঃকনিষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া প্রাপ্তবয়স্ক দেবরের সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। অধুনা কোন কোন বাটীতে ভাসুর ও কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর মধ্যেও কথাবার্ত্তা চলে। কথিত আছে যে, ভাসুরের ছায়া মাড়াইতে নাই এবং যদি কোনক্রমে হঠাৎ স্পর্শ সঙ্ঘটিত হয়, ভ্রাতৃবধূর প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক হয়। শাস্ত্রে এরূপ বিধান আছে কি না জানি না, কিন্তু কার্য্যতঃ এক ক্ষেত্রে গোময়-ভক্ষণ প্রভৃতি দ্বারা ভ্রাতৃবধূকে শুদ্ধিলাভ করিতে হইয়াছিল ইহা শুনিয়াছি। যদি ইহা শাস্ত্রীয় বিধান না হয়, তাহা হইলে দেশাচার। দেশাচারও অমান্য করা চলে না। যে-আচার আবহমান কাল পুরুষানুক্রমে পালিত হইয়া আসিতেছে তাহার প্রবর্ত্তনের মূলে নিশ্চয় কোন গূঢ় তথ্য বা কারণ ছিল, এইরূপই বুঝিতে হইবে। সে তথ্যের উদ্ঘাটন, এমন কি অনুসন্ধানও না করিয়া সে আচার ভঙ্গ করিবার চেষ্টা নিতান্ত ধৃষ্টতার পরিচায়ক। আপাতদৃষ্টিতে অনেক কার্য্যের কারণ উদ্ভাবন করা হয় বটে, কিন্তু আপাতদৃষ্ট কারণ সকল সময়ে বা সকল কার্য্যের প্রকৃত কারণ প্রতিপন্ন হয় না। শ্বশুর-শাশুড়ী ও অন্যান্য গুরুজন-দিগের সহিত কথা না কহিবার রীতির মূলে ছিল তাঁহাদের প্রতি সম্মান। কথা কহিলেই পাছে কোন অসম্মানসূচক কথা মুখ হইতে বাহির হয়, বোধ করি, এই জন্যই এই সাবধানতামূলক রীতির প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। খনার

বিবরণ, সত্য হউক বা মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত হউক, ইহার প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। আধুনা এ-রীতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন প্রায় প্রত্যেক গৃহে পুত্রবধূ শ্বশুর-শাশুড়ীর সহিত কথা কহিয়া থাকেন। কথা কহিতে দোষ নাই, যদি পুত্রবধূ শ্বশুর-শাশুড়ীকে নিজের জনকজননী জ্ঞান করেন। কেবল "বাবা" ও "মা" বলিয়া সম্বোধন করিলেই যথেষ্ট হয় না, শ্রদ্ধা, ভক্তি, স্নেহ, ভালবাসা সমস্তই কন্যার মত হওয়া চাই। "ভালবাসা" শব্দ ব্যবহার করিলাম এইজন্য যে ইহা কতকগুলি কোমল ভাবের সমষ্টি যাহা একমাত্র এই শব্দ দ্বারাই প্রকাশিত হইতে পারে। বাঙ্গালা ভাষায় এ-শব্দটি অনেকটা সংস্কৃত ভাষার "যোগরূঢ়ী" শব্দের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কথা কহিতে দোষ নাই যদি পুত্রবধূ শ্বশুর বা শাশুড়ীর কথার উপর কথা না কহেন, যদি তাঁহাদের সহিত কোন বিষয়ে তর্ক বা বাগ্বিতণ্ডা না করেন, কোন দোষ বা ত্রুটীর (কাল্পনিক হইলেও) জন্য তিরস্কৃতা হইলে প্রতিবাদ না করিয়া নির্ব্বাকভাবে এবং ক্রোধ বা বিরক্তির লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া অবনত মস্তকে তিরস্কার সহ্য করেন। বলা বাহুল্য, শ্বশুর শাশুড়ীর নিজের কন্যাগণ বিবাহের পরে নিজের নিজের শ্বশুরালয়ে বাস করেন, মাঝে মাঝে পিত্রালয়ে আসিলেও দীর্ঘকাল অবস্থান করিতে পারেন না। পূর্ব্বকালে অর্থাৎ যে সময়ে নিতান্ত অল্পবয়স্ক কন্যার বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল, কন্যার দ্বিরাগমন বিবাহ দিবসের এক বৎসরের মধ্যে হইত না; কোন কোন স্থলে, কন্যার যুগ্মবর্ষবয়ঃক্রমের মধ্যে দ্বিরাগমন নিষিদ্ধ থাকায়, বর্ষাধিক পরে দ্বিরাগমনের দিন স্থির হইত। এক্ষণে কতক আইনের ফলে, কতক অর্থ-সমস্যার ফলে, কতক কন্যার শিক্ষাসমাপ্তির অজুহাতে এবং কতক অন্যান্য কারণে কন্যার বিবাহের বয়স বাড়িয়া গিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে পাত্রের বিবাহ-বয়সও বাড়িয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ স্থলে বিবাহের সপ্তাহকাল মধ্যেই দ্বিরাগমন সঙ্ঘটিত হয়। এ-প্রথা সঙ্গত, কারণ সাধারণতঃ যে বয়সে এখন বিবাহ হয় তাহাতে নব দম্পতীর একত্র বাস বাঞ্ছনীয় এবং কোন কোন কারণে প্রয়োজনীয়। শ্বশুর-শাশুড়ীর কন্যাগণের বিবাহ ও শ্বশুরালয়বাসের পরে তাঁহাদের যে আদরযত্ন কন্যাগণের উপর বর্ষিত হইত তাহা পুত্রবধূগণের উপরেই বর্ষিত হইতে থাকে। কন্যাগণের প্রতি তাঁহাদের যে স্বাভাবিক স্নেহ থাকে তাহা দীর্ঘকালব্যাপী অদর্শনের ফলে ক্রমশঃ কিয়ৎপরিমাণে প্রচ্ছন্নভাব ধারণ করে এবং সেই স্নেহের স্রোত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পুত্র-বধূর দিকে ধাবিত হয়। কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, অপত্যস্নেহের উপর এমন কি আবরণ পড়িতে পারে, যাহাতে সে স্নেহ প্রচ্ছন্নভাব ধারণ করে? তাঁহারা হয় ত, দেখেন নাই বা শুনেন নাই যে, মাতাপুত্রে বা মাতাপুত্রীতে কোন কোন স্থলে এমন কলহ উপস্থিত ও তাঁহাদের মধ্যে এমন মনোমালিন্য সঞ্চারিত হয় যে দীর্ঘকাল পরস্পরের বাক্যালাপ ও মুখদর্শন পর্য্যন্ত রহিত হয়। স্বীয় গর্ভজাত দুইটি সন্তানের মধ্যে একটির প্রতি জননী অত্যধিক আকৃষ্ট হন ও কার্য্যাকার্য্যের বিচার না করিয়া তাহাকে সকল বিষয়ে প্রশ্রয় দেন এবং অপরটিকে বিষ-নেত্রে দেখেন; এরূপ ঘটনা সংসারে বিরল নহে। শিশু-ভ্রাতার প্রতি কেহ কেহ এরূপ স্নেহপরায়ণ হয় যে, তাহাকে বক্ষ হইতে নামাইতে চাহে না এবং কৈশোরে তাহাকে পুত্রবৎ লালন পালন করে, কিন্তু, পৈতৃক সম্পত্তির বিভাগের সময় অধিকাংশ স্থলে তাহার সহিত বিষম কলহে প্রবৃত্ত হয়। এরূপ ঘটনা সংসারে এত অধিক পরিমাণে ঘটিয়া থাকে যে, তাহা হইতে "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" এই চলিত বাক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। স্নেহ প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি যে প্রচ্ছন্নভাব অবলম্বন করিতে পারে "out of sight, out of mind" ইংরাজীতে প্রচলিত এই বাক্য দ্বারাও ইহা প্রতিপন্ন হয়। এই বাক্যগুলি বহুদর্শিতার ফল, সুতরাং ইহাদের মূল্য আছে। কন্যার প্রাপ্য স্নেহ ও আদর-যত্ন যে পুত্রবধূ অনেকাংশে লাভ করেন এ বিষয়ে সন্দিহান হইবার কারণ নাই। এই ধারণার বশবর্ত্তিনী হইয়া যদি পুত্রবধূ শ্বশুর-শাশুড়ীকে স্বীয় পিতামাতার প্রাপ্য শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা ও সম্মান দান করেন ও প্রয়োজনমত তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষা করেন বা তৎসম্বন্ধে ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট হইতে যথোচিত প্রতিদান পাইবেন ইহা নিশ্চিত।

শ্বশুর শাশুড়ীর সহিত কথা না কহিবার রীতি অনুসরণ করিয়াও যদি কোন পুত্রবধূ প্রত্যক্ষ ভাবে (direct) জবাব না দিয়া বা তর্ক বা 'চোপা' না করিয়া পরোক্ষে (indirectly) বা অন্তরাল হইতে অথবা "তৃতীয় পুরুষের" (third person) আবরণে তাঁহাদিগকে শুনাইয়া কোন কথার জবাব দেন এবং ক্রোধব্যঞ্জক ভাষা প্রয়োগ করেন তাহা হইলেও তাঁহাদের প্রতি বিশেষ অসম্মান প্রকাশ করা হয়। ফলতঃ এরূপ আচরণ মুখামুখি তর্কের ও ঝগড়ার সমতুল্য। বর্ত্তমান যুগে নরনারী স্বাধীনতাপ্রিয়। তাঁহারা সকল বিষয়েই স্বাধীনতা (independence) চাহেন। তিরস্কার গঞ্জনা বা টিটকারী তাঁহারা নীরবে সহ্য করিতে পারেন না। নিজেরা যে-মত পোষণ করেন কেহ তাহার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করেন। শ্বশুর শাশুড়ী ও অন্যান্য গুরুজনদের বেলায় পুত্রবধূর এ-অভ্যাস পরিত্যাজ্য। সংক্ষেপতঃ, সকল বিষয়ে আত্মসংযম পুত্রবধূর একটি বাঞ্ছনীয় গুণ। দুহিতাকে কন্যাকালে পিতামাতা আত্মসংযম অভ্যাস করাইলে বধূত্ব প্রাপ্তির পরে তাহার এই গুণ স্থায়িভাবে থাকিয়া যায়। কথায় বলে "স্ত্রীলোকের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না"। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, রমণীর সহিষ্ণুতা অপরিমেয়। যাহার সহিষ্ণুতা আছে তাহার পক্ষে আত্মসংযম অনায়াসসাধ্য। সংসার আশা করে যে, নারী-চরিত্র হইবে স্নেহ, ভালবাসা প্রভৃতি কতকগুলি কোমল ভাবের, দয়া, ক্ষমা, লজ্জা, নম্রতা ও পরার্থপরতা প্রভৃতি কতকগুলি কোমল বৃত্তির, স্বার্থহীনতার, সহিষ্ণুতার ও আত্মসংযমের এবং পতিভক্তি, গুরুজনভক্তি ও ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সমষ্টি। এইরূপ চরিত্রসম্পন্না রমণীর আদর্শে যে-কন্যার শিক্ষা ও চরিত্র গঠন হয় তিনি কন্যার এবং পরিণয়ান্তে পুত্রবধূর আদর্শস্থানীয়া হইবেন। পরার্থপরতাগুণে নরনারী আর্ত্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করে, কিন্তু, পিতামাতা, শ্বশুর শাশুড়ী ও অন্যান্য পরিজনের সেবা ও শুশ্রূষার প্রবৃত্তি বা স্পৃহা বা আকাঙ্ক্ষা উদ্ভূত হয় পরার্থপরতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও ভালবাসার সংমিশ্রণে। স্নেহ, শ্রদ্ধা ও ভক্তির উল্লেখ অনাবশ্যক, কারণ, এ মনোবৃত্তিগুলির অভাব হইলে গুরুজনগণের প্রতি ভালবাসা জন্মিতে পারে না। সন্তানের প্রতি জননীর ভালবাসা জন্মে প্রথমত "নাড়ীর টানে"; জনকের ভালবাসার উৎপত্তি, সর্ব্বাংশে না হউক অনেকাংশে সেইরূপ; স্বজনবর্গের ভালবাসা উদ্ভূত হয় স্পর্শ (personal contact) দ্বারা—যে-শিশুকে সর্ব্বদা বা মাঝে মাঝে "নাড়াচাড়া" করা যায় তাহার প্রতি অল্পদিনের মধ্যেই ভালবাসা জন্মে। শৈশবের পরে বাল্য, বাল্যের পরে কৈশোর এবং কৈশোরান্তে যৌবন উদ্গত হইলে ভালবাসার পাত্রের আচরণের গুণে ভালবাসারও হ্রাসবৃদ্ধি হইতে থাকে। একাধিক সন্তানের জননীরও কালক্রমে অপত্যগণের প্রতি ভালবাসার তারতম্য হয় এ-কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পুত্রবধূর প্রতি শ্বশুর-শাশুড়ীর যে যে কর্ত্তব্য আছে যদি তাঁহারা সে-গুলির পালন না করেন, বরং অনুচিত আচরণ করেন তাহা হইলে চেষ্টা করিয়াও পুত্রবধূ তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁহাদের প্রতি নিজের কর্ত্তব্য সাধন করিলেও, ভালবাসিতে পারিবেন না। পুত্রবধূর আত্মসংযম ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার ফলে এবং তাঁহার কোমল বৃত্তিগুলির পরিচয় পাইবার পরে যদি শ্বশুর-শাশুড়ী তাঁহার প্রতি স্নেহ ও যত্ন প্রকাশ করেন তাহা হইলে পুত্রবধূও তাঁহাদিগকে "ভালবাসিবেন" এরূপ আশা করা যায়। পরস্পরের প্রতি আচরণের গুণেই পরস্পরের প্রতি এইরূপ ভালবাসা সঞ্জাত হয় এবং চিরস্থায়ী হইতে পারে ইহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ।

শ্রুতিমধুর বাক্য

শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

পীরপাহার
মুঙ্গের

ভাই অমূল্য,

তোমার পত্র পাঠ ক'রে বিশেষ প্রীত হ'লাম। তুমি যে লেখকের কথা আমায় পত্রে জ্ঞাপন করেছো তাঁর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় না থাকলেও তাঁর লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। তিনি আমাকে সম্প্রতি তিনখানা পুস্তক পাঠিয়েছেন সুতরাং তাঁর লেখার সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হ'বার সুযোগ পেলাম। তিনখানা পুস্তক বিশেষ যত্ন নিয়ে পাঠ করেছি—লেখক তরুণ, লেখকের ক্ষমতা বর্ত্তমান—তিনি সরল সুমধুর ভাষার অধিকারী—পুস্তকের নামও শ্রুতিমধুর। লেখক তরুণ ব'লেই আরো মনসংযোগ ক'রে পুস্তক পাঠ করেছি। কারণ তরুণ যুবক আমাদের দেশের আশা সম্পৎ ভরসা।

পুস্তক পাঠে এই মনে হ'ল যে, লেখকের চিন্তাধারা পাশ্চাত্য ভাব বিলাসে ভাসমান। তিনি লেখনী চালনা করেছেন যে বিষয়ে তাতে এই মনে হয় যে, লেখকের বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার বিরাট অভাব থাকা সত্ত্বেও বিষয়কে চিত্তাকর্ষক করবার technique-কে তিনি বেশ আয়ত্ত করেছেন।

তিনখানা পুস্তক যা তিনি প্রেরণ করেছেন (১) বিবাহ-সখা, (২) মধুর বিবাহ, (৩) তরুণের বিদ্রোহ। প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তকের নামকরণ অতি শ্রুতিমধুর ও তৃতীয় পুস্তকের নাম জমকালো ও গালভরা।

কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রথম দুইটী পুস্তক পাঠ ক'রে লক্ষ্য কল্লা'ম যে, বিবাহ-সখা যিনি, তিনি বিবাহিত ন'ন ও মধুর-বিবাহ পুস্তকে বিবাহের নাম গন্ধ নেই। নর-নারী স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় বসবাস করেন, কোন আইন বা আচারের দ্বারা তাঁদের প্রেম সীমাবদ্ধ নয়—সখা-সখী ভাব, ইংরাজী companionate marriage-এর বাংলা সংস্করণ ও কতকগুলো তর্ক বিতর্ক বা argument Havelock Ellis বা Freud থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। কিন্তু লেখক বোধ হয় অবগত ন'ন যে, Havelock Ellis বা Freud তাদের গবেষণার মধ্যে এমন অনেক কথা ব'লেছেন যা অনেক Psychologist বা Psycho-analyst স্বীকার করেন না। মানবের মধ্যে পশুত্ব আছেই এবং সে পশুত্ব দমন ক'রে দেবত্বকে প্রতিষ্ঠা করা প্রকৃত মানুষের কার্য্য। গ্রন্থকারের Havelock Ellis বা Freud-এর উপর অন্ধভক্তি লক্ষিত হয়। সেরূপ ভক্তি আমাদের নাই। Freud-এর theory about "conscience" "unconscious" হাস্যকর ভারতবাসীর কাছে। Havelock Ellis এত গবেষণা করে, স্নায়ুর উত্তেজনা, sex-appeal ইত্যাদি সম্বন্ধে লিখে শেষে "Dance of Life„এ দেখিয়েছেন যে বৈজ্ঞানিকদের প্রেরণা আসে যখন তাঁরা বড় কিছু আবিষ্কার করেন। আবিষ্কারের আগে তাঁরা পেয়েছেন ইনটুইসন এবং এই ইনটুইসন যে সত্যি আসে তা তিনি চেষ্টা করেছেন প্রমাণ ইত্যাদিতে প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে। এখন এই "ইনটুইসন্" যদি স্বীকার কর্ত্তে হয় Ellis থাকেন কোথায় ?

এই সব লেখকদের প্রভাবে প'ড়ে বিবাহ-সখা বা মধুর বিবাহ শ্রুতিমধুর নাম দিয়ে গ্রন্থ প্রকাশ ক'রে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করার সার্থকতাও বা কী থাকতে পারে!

পুস্তক দু'খানা পাঠ ক'রে এই মনে হ'ল যে, যিনি বিবাহ-সখা বা বিবাহ-সখী তিনি শীঘ্রই পরস্পরের সখা-সখীত্ব বর্জ্জন কর্ব্বেন ও প্রত্যেকেই নব-সখা বা নব-সখীর সন্ধানে বহির্গত হবেন ও সখা আবার নব-সখী গ্রহণ করে ধন্য হবেন ও সখীও আবার নব সখার গলায় বরমাল্য অর্পণ ক'রে জীবন মধুময় কর্ব্বেন। বিবাহের মধ্যে যে দায়ীত্ব, যে কতকগুলো কড়া নিয়ম কানুন আছে তা মধুর বিবাহে একেবারেই নেই। Free love—পুরুষ বা নারী বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে স্বামী স্ত্রীর ন্যায় জীবন যাপন কর্ব্বেন এ-idea-টা একদিকে যেমন চমকপ্রদ অপর দিকে সেই রকম স্নায়ু-উত্তেজক, সে-বিষয়ে তোমার বোধ হয় ভিন্ন মত হবে না।

কিন্তু বিবাহ-প্রথাকেই যখন গ্রন্থকার সমাজ থেকে নির্ব্বাসন দিতে চান্ তখন পুস্তকের নাম-করণে বিবাহ-সখা

বা মধুর-বিবাহ অর্থাৎ উভয় পুস্তকেই "বিবাহ" বাক্যটী ব্যবহার কল্লে'ন কেন? এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উপস্থিত হয়। আধুনিক লেখক, তা তিনি তরুণই হোন বা যুবকই হোন, প্রায় গর্ব্ব করে থাকেন এই ব'লে যে, তাঁরা যুক্তির উপাসক, তাঁরা বৈজ্ঞানিক মাইক্রোস্কোপে মানবের প্রবৃত্তিকে dissection-এর টেবিলে কচু-কাটা করে সব বিচার করেন। বিজ্ঞান সত্য, যুক্তি তাঁদের আদর্শ—বেশ ভাল কথা। ভাই অমূল্য, কিন্তু তাঁদের লেখা গ্রন্থের মধ্যে যদি যুক্তি-তর্ক ও সত্য নিষ্ঠার ঘোর অভাব ও নিছক sentimentality-র প্রবল প্রাবল্য লক্ষ্য করি তখন দুঃখ হয় না কী?

তরুণদের নিকট হ'তে প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় যে, যুবকদের আদর্শ হচ্ছে নির্ভীকতা, সরলতা, স্বাধীনতার পতাকা বহন করা অর্থাৎ তাদের চিন্তা হবে স্বাধীন, ভাবের অভিব্যক্তি হবে সরল ও নির্ভীক।

স্বাধীন ভাবে চিন্তা করা ও তাহা নির্ভীক ও সরল ভাবে ব্যক্ত করা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। আমি বা তুমি উভয়েই এইরূপ মনোভাবকে প্রশংসা করি। কিন্তু আমি ভয় করি দস্যুর মত উদ্দাম চঞ্চলতাকে। যেখানে অসংযম রাজত্ব করে সেখানে প্রবৃত্তি চঞ্চল হবেই অর্থাৎ সেখানে সাহিত্যের মাপ-কাঠি হবে "ইন্দ্রিয়-প্রধান।" কিন্তু প্রবৃত্তি চঞ্চল হয় না যখন আদর্শ সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকে। চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় তখনই যখন তার মূল ভিত্তি অর্থাৎ আদর্শ হয় ঠুন্‌কো, মেকী, অসত্য। এই বক্তব্য শুনে হয় ত' গ্রন্থকার আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে একটু ভ্রূ কুঞ্চন করে, পরে বিস্ফারিত নেত্রে বিদ্রূপের হাসি হেসে জিজ্ঞাসা করবেন, "কোন আদর্শ সত্য, কোন আদর্শ মেকী বা কোন আদর্শ সরল বা কোন আদর্শ অসরল এ সবের কী কোন ধরা বাঁধা মাপ কাঠি আছে?" তিনি এই মত প্রকাশ করলেন সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যে, জগতে সব সভ্য জাতিরই মধ্যে "Primary Truths" নিয়ে দ্বন্দ্ব নেই। গ্রন্থকার পুস্তকের নাম করণে নিজেই প্রমান ক'রেছেন যে, তার আদর্শ মেকী ও অসরল। "বিবাহ-সখা" বা "মধুর বিবাহে" বিবাহের নামগন্ধ না থাকা সত্ত্বেও যখন তিনি "বিবাহ" কথাটী ব্যবহার করেছেন তখন এ কথা বলা কঠিন যে, ঠিক সরলতা, স্বাধীনতা বা নির্ভীকতার পতাকা উড়িয়ে সাহিত্যের পোতকে তিনি সাগরে ছেড়ে দিয়েছেন।

তিনি "বিবাহ" বাক্য বিশেষ শ্রুতি মধুর সেই কারণে ঐ বাক্যটী ব্যবহার করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি বিবাহ বাক্য বেশ চিন্তা করেই ব্যবহার করেছেন যাতে পাঠক বা পাঠিকা সখাকে বিবাহ-সখা ব'লেই গ্রহণ করবেন, এবং মধুর বিবাহে এই সখা-সখী ভাবকেই লেখক বিবাহের সিংহাসনে স্থান দিয়াছেন। যদিও এটাও সত্যি যে গ্রন্থে যা আছে তা বিবাহও নয়, সখা-সখীও নয় মধুরও নয়; কিন্তু নামের কি মহিমা এই সব কারণেই কোন শ্রুতি-কটু নাম ব্যবহার না ক'রে শ্রুতি মধুর "বিবাহ" শব্দটী ব্যবহৃত হয়েছে।

এই রকম শ্রুতি মধুর বাক্য প্রয়োগ করা হয় ত' ইলেক্‌সনের বিজ্ঞাপনে বা সংবাদপত্রের হেড লাইনে দুষ্য না হ'তে পারে কিন্তু শ্রুতি মধুর বাক্যের সাহায্যে স্বৈরাচার প্রচলনের চেষ্টা মোটেই নির্ভীকতা বা সরলতার পরিচয় দেয় না—পরিচয় দেয় ভীরু মনের অভিব্যক্তির।

ভাই অমূল্য, এসো, তোমার সঙ্গে এই বিষয়ে সরলভাবে একটু আলোচনা করা যাক্। তুমি ভাই যদি লক্ষ্য ক'রো, দেখতে পাবে যে, শুধু গ্রন্থকার নয় অনেকেই শ্রুতি মধুর নামের সাহায্যে অনেক বিষয় প্রচলন করবার চেষ্টা করছেন যা আদৌ প্রচলিত হওয়া উচিত নয়।

ধ'রো তর্কের খাতিরে "জাল করা" এই বাক্যটা। অনেকে তর্ক করতে পারেন, এই ব'লে যে "জাল করা"তে দোষের কী থাকতে পারে?

অন্যের হস্তাক্ষর "জাল করা" এটা যখন বলি নিশ্চয়ই তা শ্রুতি-কটু হ'বে। কিন্তু যদি কেহ বলেন যে অন্যের হস্তাক্ষর নকল করা একটা আর্ট—বিভিন্ন ব্যক্তির হাতের লেখা নকল করা আরো বড় আর্ট—বহু বিভিন্ন হস্তাক্ষরের সঙ্গে আমার হস্তাক্ষরের একীকরণ এবং ঐ ঐক্যের মধ্যে মানবসমাজের ঐক্য বৃদ্ধি পাবে। বাংলা ভাষাতে হয় ত' এখনও "জাল করা"র শ্রুতি মধুর প্রতিশব্দ আবিষ্কৃত হয় নি, তবে চেষ্টা চ'লছে—ইরাংজীতে Homoegraphy বা Script-assimilation—এই দুটী প্রতিশব্দই "Forgery" অপেক্ষা শ্রুতি মধুর।

আমার হস্তাক্ষর আমারই থাকবে কেন? আমার লেখাকে কেবল আমার সম্পত্তি স্বরূপ গণ্য করা হবে কেন?

এই রকম নকলের মধ্য দিয়ে সমাজের একতা প্রতিষ্ঠিত হবে —একটা নাম, শ্রুতি মধুর নাম চাই।

"জাল" বা "Forgery" ও একটা শ্রুতি-কটু নাম এবং ঐ বাক্যের কদর্থের উপরে আইন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যদি কেহ ব্যাপক ভাবে নকল করার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ক'রে বিরাট প্রবন্ধ লিখতে পারেন Post Graduate ক্লাশে হয় ত এই "Homoegraphy" বা Script-assimilationকে বিষয়-বস্তু নির্ব্বাচন করে আমাদের বিশ্ব বিদ্যালয় আর্টের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রতে পারেন, কিছু আশ্চর্য্য নয়। কালের প্রভাবে সবই সম্ভব।

লেখক বোধ হয় অবগত ন'ন যে, পাশ্চাত্য জগতে ও বাংলা ভাষায় "হত্যা" সম্বন্ধেও শ্রুতিমধুর নাম আবিস্কৃত হয়েছে যথা সামাজিক-বিয়োগ বা স্বাধীন-মৃত্যু বা জীবন-নিয়ন্ত্রণ—কি সুন্দর শ্রুতি মধুর প্রতিশব্দ "Murder" বা "Suicide" এর। হত্যা বা আত্ম-হত্যা দু'টী শব্দই শ্রুতি-কটু—সামাজিক বিয়োগ বা স্বাধীন-মৃত্যু বা জীবন-নিয়ন্ত্রণ কি শ্রুতিমধুর! সত্যি নয় ভাই অমূল্য? কিন্তু কার্য্যের নাম শ্রুতি মধুর হ'লেই যে কার্য্যের ঔচিত্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল এ-রকম চিন্তা করা ভ্রমাত্মক।

আর একটা কথা "প্রচার"। অত্যন্ত শ্রুতি মধুর কথা—কিন্তু বাস্তবিক তাহা নিছক বিজ্ঞাপন ব্যতীত কিছু নয়।

তরুণ সম্প্রদায় ব'লে থাকেন বটে যে, তাঁদের যুগ, নির্ভীকতার যুগ কিন্তু আমার মনে হয় এই যুগ "বিজ্ঞাপনের" যুগ। বিজ্ঞাপন কথাটা শ্রুতি কটু ব'লে তার পরিবর্ত্তে শ্রুতি মধুর "প্রচার" শব্দটী ব্যবহৃত হ'য়েছে।

কোন পুস্তক সম্বন্ধে যখন "প্রচার" শব্দটী ব্যবহৃত হয় তখন পুস্তকের বহুল প্রচারের জন্য গ্রন্থের গুণরাশি প্রচার করা হয় অর্থাৎ সমালোচনার আকারে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়—এটা সত্যি নয় কী?

সমালোচনার অর্থ পুস্তকের দোষগুণ নিরপেক্ষভাবে আলোচনা ক'রে সর্ব্বসাধারণের নিকট উপস্থিত করা ও দোষগুণ বিবেচনা ক'রেও যদি পুস্তকের বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয়তা থাকে তবে দেশের সাহিত্যের মঙ্গল কামনায় তাহা প্রকাশ করা, এই তো? কিন্তু পুস্তকের কোন মূল্য থাকুক্ বা নাই থাকুক্, সেইরূপ পুস্তকের নির্ব্বিচারে নিছক প্রশংসাবাদ ক'রে সমালোচনার আকারে প্রচার করা দূষ্য নয় কী? এই প্রকার সমালোচনায় সত্যের অপলাপ হয় না? তুমিই ব'লো না ভাই।

ঘি বা ভাতুয়া ঘির "প্রচার" যে রকম ভাবে হয় ঠিক সমপর্য্যায়ে যদি কোন পুস্তকের সাহিত্যিক মূল্য সেইরূপ প্রচারের দ্বারা নিরূপিত হয় তা' হ'লে সেটা দুঃখের বিষয় ব'লতে হবে।

তরুণের বিদ্রোহ সম্বন্ধেও সে-কথা বলা যেতে পারে। যদি পুস্তকে বিদ্রোহ ক'রবার খাতিরেই বিদ্রোহ করতে হবে, এই যুক্তি হয় তবে আমার তাতে দস্তুর মতন আপত্তি আছে। তরুণের মনে সে-ভাব আসা স্বাভাবিক, তার সঙ্গে আমার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। কারণ আমিও একদিন তরুণ ছিলাম। কিন্তু কি হ'লো ব'ল দেখি? তরুণের মন হ'বে সুকুমার—জগতের শত কুৎসিৎ ঘটনা তার হৃদয়ে স্থান পাবে না। তরুণের হৃদয়ে কর্ত্তব্য, ভক্তি, প্রেম সুবেদনায় মূর্ত্ত জাগ্রত হবে। Microscopic dissection-এর জন্য যদি আমরা অগ্রসর হই তবু তার কিছু Justification থাকতে পারে, যদিও এই Microscopic dissection-এর বিশেষ কোন মূল্য নেই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সেই স্থলেই আর্য্যঋষিদের নিকটে ম্লান হ'য়ে যায়, তত্ত্বানুসন্ধানের দিক্ থেকে। আর্য্য-ঋষিগণ সাদা চোখে তপনের আয়ু নিরূপণ, নক্ষত্রের গতি বিশ্লেষণ ক'রতেন, টেলিস্কোপের দরকার হ'ত না। আজ অসুস্থ দেহ, অসুস্থ মন, দুর্ব্বল চক্ষু নিয়ে মানুষের তৈরী মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রের (যা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নয়) সাহায্যে কোন পূর্ণ অভ্রান্ত সত্যে উপনীত হওয়া যায় কী? জীবন সম্বন্ধে কোন কথা ব'লতে গেলেই আধুনিক ব'লে ব'সেন, "আপনার কথায় Logic নেই" কিন্তু তিনি ভুলে যান যে, Logic বিশেষতঃ পাশ্চাত্য Logic Static, Lifeটা Kinetic—স্পন্দিত গতিশীল প্রাণবন্ত জীবনের কারণ ঐ Logic দিতে পারে না। জীবনের স্পন্দন বা গতিকে থামিয়ে মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে কতকগুলো Static snap-shot নেওয়া ব্যতীত কি স্বার্থকতা আছে এই বিচারের, তাই ব'ল দেখি? প্রজাপতির জীবন পরীক্ষা করবার জন্য প্রথমেই প্রজাপতিকে প্রাণহীন ক'রে তাকে আলপিন দিয়ে গেঁথে জীবনের গতির প্রক্রিয়া পরীক্ষা হ'বে, এই তো?

Dissection-এর কার্য্য যুবকের তরুণের নয়—তরুণের মনে প্রেম, কর্ত্তব্য, ভক্তি, সমবেদনা নিয়ে যে মানসিক দ্বন্দ উপস্থিত হয় সে মানসিক যুদ্ধকে আমি সাদরে বক্ষে ধারণ করি। উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হবার শক্তি তরুণের অসীম, সে শক্তিকে আমি শ্রদ্ধা করি—সেইজন্য জীবন প্রদীপের তৈল নিঃশেষ হয়ে যাবার আগে তরুণের নির্ম্মল হৃদয়কে আলিঙ্গন ক'রে পবিত্র হ'তে চাই।

কিন্তু যখন লক্ষ্য করি যে, তরুণ লেখক মানবের প্রবৃত্তিকে dissect করে বিচারের জন্য Microscope-এ চোখ লাগিয়াছেন, তখন ভীত হই। আরো ভীত হই যখন দেখি যা মূলে অসত্য বা স্বৈরাচার তাকে শ্রুতি মধুর নাম দিয়ে সাহিত্যে প্রচার করবার অদম্য চেষ্টা। কিন্তু এ প্রচেষ্টাকে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি সহানুভূতির চক্ষে দেখ্‌তে পারেন না।

অমূল্য, এ বিষয়ে নিশ্চয়ই তুমি বিখ্যাত পাশ্চাত্য মণীষীদের লেখা পাঠ করেছ। তাদের সাহিত্যে শ্রুতি মধুর বাক্যের সর্ব্বনাশা শক্তি প্রকট হচ্ছে লক্ষ্য করে তাঁরা দেশবাসীকে সাবধান করেছেন, আমাদের দেশেও শ্রুতি মধুর বাক্যের সর্ব্বনাশা শক্তি আমদানী হ'তে আরম্ভ হয়েছে, সেই কারণে সাহিত্য ও জাতির কল্যাণ কামনায় এই পত্র লিখ্‌লাম।

পত্র দীর্ঘ হয়ে পড়লো, তোমার পাঁচুদার ঐ দোষ। আরো কয়েকদিন এখানে থাকতে বল্‌ছেন বন্ধুবর্গ, কিন্তু বাবা বলেছেন শীগ্‌গীর ফিরে যেতে হবে, মাও তাই বলেছেন—সুতরাং কালই ফিরে যাবো বাড়ীতে। বাবা ব'লেছেন বা মা ব'লেছেন এইটেই যথেষ্ট যুক্তি কী না তাই প্রশ্ন কর্ব্বে আধুনিক ছেলে মেয়ে। কী হ'ল ব'ল ত'? এটা আমরা আজ ভুলতে ব'সেছি মা, বাবা, স্ত্রী, ভাই, বোন সবই সংসারে সামাজিক বন্ধন। স্ত্রী বিবাহিত হওয়ার প্রয়োজন এই কারণে যে, স্ত্রীর স্বামীর প্রতি প্রেম ব্যতীতও অনেক কর্ত্তব্য বর্ত্তমান। স্বামীর গৃহে তাঁর পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, আত্মীয়-বন্ধু, দূরাত্মীয় সকলের সঙ্গেই যথাযথ ব্যবহার কর্ত্তে হবে। বস্তুতঃ বিবাহের প্রয়োজন মানুষের সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ় করবার জন্যই। সমাজ, আত্মীয়-পরিবার থেকে দূরে চ'লে গিয়ে কপোত কপোতীর ন্যায় সখা-সখীর মতন বিচরণ করবার জন্য নয়।

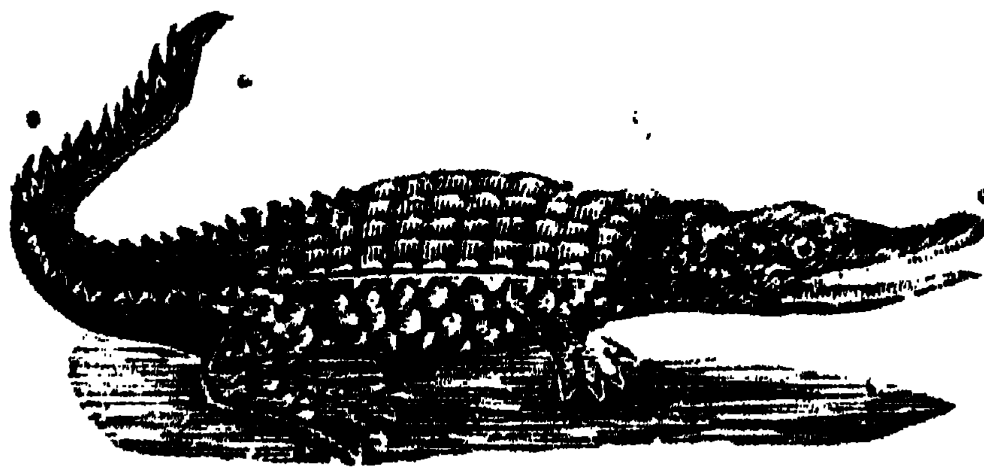
গ্রন্থকার ভারতীয় আদর্শ সম্বন্ধে এতই আস্থাহীন যে মধুর বিবাহ বা বিবাহ সখাতে এমন atmosphere এর আমদানী করেছেন যেন আমরা গৃহহীন, Hotel এ থাকি, পিতামাতা যদি থাকেন থাকুন। বিবাহ ব্যাপারে তাঁদের মতামতের প্রয়োজন নেই, তাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে Hotel-keeper বা Head-cook এর। কি ভয়ানক! কিন্তু গ্রন্থকার কী অবগত ন'ন যে, পাশ্চাত্য মণীষী ইংরাজী সাহিত্যের স্তম্ভ স্বরূপ মহামতি Carlyle সত্যিকারের শ্রুতি-মধুর বাক্যবিন্যাসের দ্বারা বহুপূর্ব্বে তাঁর লেখনীকে অমর ক'রে লিখে গিয়েছেন—

"If the paternal cottage shuts us in, it's roof still screens us; with a father we have as yet a Prophet, Priest and King and an obedience that makes us free."

সূর্য্যের শেষ কনক-রশ্মিও ক্ষীণ হ'য়ে আস্‌ছে—শেষ রশ্মি পড়েছে বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন নবাব মীরকাশেমের স্মৃতি-সৌধের উপরে।

আজ তবে আসি। আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিও। ইতি—

তোমার স্নেহতপ্ত
পাঁচুদা-





আর্য্যকৃষ্টি ও গো-জাতি

সত্যবান

গো-জাতি আজ মানুষের পরম বন্ধু, পরম আদরের সামগ্রী। পৃথিবীর সর্বত্র এবং সকল জাতির মধ্যেই গো-পালনপ্রথা অল্লাধিক দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ জীবন ধারণের পক্ষে গো-জাতির প্রয়োজনীয়তা আজ একান্ত অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে বলিলেও আর অত্যুক্তি হয় না।

কতকাল পূর্ব্বে এবং কি ভাবে মানব-সমাজে গো-জাতির এই প্রতিষ্ঠার প্রথম সূত্রপাত হইল তাহা যথাযথ রূপে অবগত হইবার উপায় নাই। বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাস তাহার কোন সঠিক সংবাদ দিতে পারে না। যেটুকু পারে, তাহা অনুমান মাত্র। মানবসভ্যতার ক্রম বিকাশের সহিত তাহার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ।

তথাকথিত ইতিহাসের মতে মানুষের আদিম অবস্থা ছিল অরণ্য। অর্থাৎ মানুষ আদিম অবস্থায় বনেই বাস করিত এবং বনচর পশুদিগের ন্যায় আম-মাংস ও ফলমূল প্রভৃতি খাইয়াই জীবন ধারণ করিত। অগ্নি, অস্ত্র বা কোনরূপ যন্ত্রাদির ব্যবহার তাহারা আদৌ জানিত না। হল-চালন, ভূমিকর্ষণ ও শস্যাদি উৎপাদনের আবশ্যকতা তখন পর্য্যন্ত তাহাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। তারপর এমন দিন আসিল, যখন প্রাকৃতিক ও নৈমিত্তিক হেতু সঞ্জাত বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনের ফলে মানুষের মনে অভাববোধের সঙ্গে সঙ্গে অভাব-মোচনোপযোগী সংস্কার ও আবিষ্কারগুলিও ক্রমশঃ জন্মলাভ করিতে লাগিল। এই ক্রমোন্নতির শিশু যুগেই একদিন মানুষ গো-জাতির স্নেহসুলভ বশ্যতায় আকৃষ্ট হইয়া এবং গো-স্তনে অমৃতের সন্ধান পাইয়া গো-জাতিকে অরণ্য হইতে লইয়া আসিয়া আপনার গৃহাঙ্গনে বন্ধন করিল। ইতিহাসের পাতায় ইহাই গো-জাতির ইতিকথা।

গো-জাতির ঐতিহাসিক গবেষণা বা তাহার সমালোচনা এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এ স্থানে আমরা কেবল এইটুকু দেখাইতেই চেষ্টা করিব, যে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জগতের জন্মেরও বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই গো-জাতি সম্বন্ধীয় অনুশীলনীর মধ্য দিয়া প্রাচীন আর্য্য কৃষ্টি কতটা প্রসার বা পুষ্টিলাভ করিয়াছিল।

একথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না, যে আর্য্য-কৃষ্টিই মানব সভ্যতার জনক, আর্য্য-কৃষ্টিই সর্ব্বাগ্রে মানুষের চক্ষুদান করিয়াছিল। অবশ্য আর্য্য-কৃষ্টির এই জনকত্বের দাবী খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক-গণ এ যাবৎ অনেক গবেষণা করিয়াছেন। মিশরীয় সভ্যতা, বেবিলোনীয় সভ্যতা, গ্রীক সভ্যতা এবং চৈনিক সভ্যতাকে আর্য্য সভ্যতার প্রাচীনত্বের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড় করাইয়া নানারূপ কাল্পনিক ও আনুমানিক যুক্তি-প্রমাণের অবতারণা করিতেও তাঁহারা লজ্জা বোধ করেন নাই। কিন্তু আমাদের নিকট তাহা মোটেই বিচারসহ নহে; সুতরাং আমরা তাহা শ্রদ্ধাসহকারেও গ্রহণ করিতে পারি নাই।

আর্য্য-কৃষ্টির প্রাচীনত্বের উপকরণগুলি তাহার মধ্যেই বিদ্যমান রহিয়াছে। অভিনিবেশ সহকারে একটু নিরপেক্ষ উদার দৃষ্টিতে দেখিলে তাহা লক্ষ্য করিতেও বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, সেই নিরপেক্ষ উদার দৃষ্টিরই একান্ত অভাব। ইহা ঈর্ষ্যাপ্রসূত অথবা অজ্ঞতা-সঞ্জাত তাহা অন্তর্য্যামীই জানেন।

অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া একমাত্র আহার্য্য বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিলেও আর্য্য কৃষ্টির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, যে আহার্য্যের সুষ্ঠু-পরিকল্পনা, প্রাচুর্য্য, বৈশিষ্ট্য এবং বিধি-নিষেধের সহিতও জাতীয় কৃষ্টির সম্পর্ক ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। কোন্ জাতি কত প্রাচীন, এবং সভ্যতার কতটা উচ্চাসনে সমাসীন এই গুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। আর্য্য জাতির বিপুল ও সমৃদ্ধ আহার্য্য সম্ভারের অর্দ্ধেকের সহিতও অদ্যাপি পৃথিবী পরিচিত হইতে পারে নাই। তদীয় দেশ-কাল-পাত্র ভেদে, বার, তিথি, নক্ষত্রাদি ভেদে আহার্য্যবিষয়ক বিধিনিষেধগুলিও আধুনিক বিজ্ঞানের চিত্তে একটা বিস্ময়েরই সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। এমন কি, এ যাবৎ তাহা সমাধানের দুঃসাহস কাহারও হয় নাই।

যাক্, এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিয়া অযথা প্রবন্ধের কলেবর বাড়াইব না। এক্ষণে গো-জাতি বিষয়ক আর্য্য-কৃষ্টিরই একটু সাধারণ আলোচনা করিব।

হলাদিসঞ্চালন জন্য পুং গো বা ষাঁড়ের প্রয়োজন, দুগ্ধাদির নিমিত্ত গাভীর আবশ্যকতা। এতদ্ভিন্ন গো-জাতির মাংস, চর্ব্বি, অস্থি, অন্ত্র, পিত্ত ও চর্ম্মাদি বিভিন্ন অংশ হইতে বিবিধ প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে। এ সবই সাধারণ কথা। ইহাই গো-জাতির সর্ব্বস্ব নহে। গো-জাতিকে সম্যকরূপে অবগত হইতে হইলে আরও অনেক কিছুর সন্ধান করিতে হইবে। সে সন্ধান মিলিবে আর্য্য কৃষ্টির ভিতরে, অন্যত্র নহে।

প্রাচীন আর্য্যগণ গো-জাতির প্রতি সামান্য পশুভাব পোষণ করিতেন না। তাঁহারা গো-দেহে সর্ব্ব দেব-দেবীর অধিষ্ঠান প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। গো জাতিকে তাঁহারা অমোঘ কল্যাণদাত্রী, পরম পবিত্র, পরম পাবনী এবং

ঐহিক ও পারত্রিকের সম্বল বলিয়াই মনে করিতেন। গো-মাতা তাঁহাদের দিব্য দৃষ্টির সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন—"মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং স্বসাদিত্যানাং অমৃতস্য নাভিঃ"—রুদ্রগণের মাতা, বসুগণের দুহিতা, আদিত্যগণের ভগিনী এবং অমৃতের নাভি অর্থাৎ মূলাধার রূপে। গো-জাতির প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধাভক্তি, প্রীতি, ভালবাসা সবই ছিল অনন্যসাধারণ। সে শ্রদ্ধাভক্তি, প্রীতি ও ভালবাসার কথা শুনিলে বিস্ময়ে অবাক্ হইতে হয়। তাঁহারা গো-জাতিকে রীতিমত অর্চ্চনা করিতেন। কৃচ্ছ্র গো-ব্রত পালন করিয়া আপনাকে পবিত্র, ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিতেন। তাঁহারা গো-চারণ করিতেন গো-জাতির ইচ্ছার অনুগমন করিয়া। গরু চরিলে চলিতেন, দাঁড়াইলে দাঁড়াইতেন, বিশ্রাম করিলে বিশ্রাম করিতেন। যে পর্যন্ত গরু স্বয়ং ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া আশ্রমাভিমুখী না হইত সে পর্য্যন্ত তাহাকে ফিরাইয়া আনিতেন না। গো-জাতিকে দেখা মাত্র প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করাই ছিল তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ। দেবল বলেন,—

"লোকেঽস্মিন্ মঙ্গলান্যষ্টৌ ব্রাহ্মণো গৌর্হুতাশনঃ।
হিরণ্যং সর্পিরাদিত্য আপো রাজা তথাষ্টমঃ॥
এতানি সততং পশ্যেন্নমস্যেদর্চ্চয়েচ্চ যঃ।
প্রদক্ষিণঞ্চ কুর্ব্বীত তথা চায়ুর্ন হীয়তে॥"

এই জগতে আটটি পদার্থ মঙ্গলবাচক। যথা,—ব্রাহ্মণ, গো, অগ্নি, স্বর্ণ, ঘৃত, সূর্য্য, জল এবং রাজা। এই অষ্টবিধ পদার্থকে যে ব্যক্তি সর্ব্বদা দর্শন করে, নমস্কার করে, অর্চ্চনা করে এবং প্রদক্ষিণ করে, তাহার আয়ু ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না।

ব্রহ্মপুরাণ বলেন,—

"সদা গাবঃ প্রণম্যাস্তু মন্ত্রেণানেন পার্থিব,—
নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য এব চ।
নমোব্রহ্ম সুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমোনমঃ॥"

গো-সমূহকে নমস্কার, শ্রীমতীগণকে নমস্কার, সৌরভেয়ীদিগকে নমস্কার, ব্রহ্মসুতা সমূহকে নমস্কার এবং পবিত্রাগণকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার—হে পার্থিব, এই মন্ত্র দ্বারা গো-গণ সর্ব্বদাই প্রণম্যা জানিবে।

ভবিষ্য পুরাণ বলেন,—

"গামালভ্য নমস্কৃত্য, কৃত্বা চৈব প্রদক্ষিণম্।
প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা॥"

যে ব্যক্তি গো-সন্নিহিত হইয়া তাহাকে নমস্কার করিয়া প্রদক্ষিণ করে, সেই প্রদক্ষিণ দ্বারাই তাহার সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা প্রদক্ষিণীকৃত হইয়া থাকে।

গো জাতির প্রতি আর্য্য ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ এরূপ শাস্ত্রনির্দ্দেশ অসংখ্য আছে। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার সবগুলির অবতারণা অসম্ভব; সুতরাং আমরা অল্পেই ক্ষান্ত হইলাম। তবে আশা করি, এই সামান্য নির্দ্দেশ কয়টি হইতেই গো-জাতির প্রতি প্রাচীন আর্য্যগণের মনোভাব কিরূপ ছিল তাহা বুঝিতে কষ্ট হইবে না।

বেদ, সংহিতা ও পুরাণাদি শাস্ত্রে যজ্ঞাদির নিমিত্ত গো-হত্যার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অতিথির উদ্দেশ্যেও গো-হত্যা করা হইত। যাহার নিমিত্ত প্রাচীনকালে অতিথির একটি আখ্যা ছিল—গোঘ্ন। কিন্তু গো-জাতির প্রতি এই নিষ্ঠুর অনুষ্ঠান বহু কাল চলিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। মা গামনাগামদিতিং বধিষ্ঠ"—অর্থাৎ অপাপবিদ্ধা পবিত্রা গাভীকে হত্যা করিও না...শাস্ত্রের এই নিষেধবাণীও আধুনিক নহে; পরন্তু বহু প্রাচীন। তাহার পর গো-বাচক সংজ্ঞাগুলিও উপেক্ষণীয় নহে। মাতা, অঘ্না, অর্জ্জুনী, ভদ্রা, কল্যাণী, পাবনী ইত্যাদি সংজ্ঞাগুলি দ্বারা যাঁহারা গো-জাতিকে অভিহিত করিয়াছিলেন, গো-হত্যার আকাঙ্ক্ষা তাহাদের চিত্তে আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। বিশেষতঃ যাঁহারা "ন গবাং দণ্ডমুদ্যচ্ছেৎ"—গো-জাতির প্রতি দণ্ড উত্তোলন করিও না—এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, তাঁহারা কি তদীয় হত্যারূপ নির্দ্দয় কার্য্য করিতে পারেন? অবশ্য কত কাল পূর্ব্বে আর্য্য-সমাজে গো-হত্যা বিধান প্রচলিত ছিল, এবং কবে তাহা নিষিদ্ধ হইয়া চিরদিনের মত বন্ধ হইয়াছে, তাহা অন্যান্য অনেক বিষয়ের ন্যায় আজিও অনির্ণীতই রহিয়া গিয়াছে।

আর্য্যগণ মাত্র গো-জাতিকেই পবিত্র মনে করিতেন না। যাবতীয় গব্য পদার্থগুলিই ছিল তাঁহাদের কাছে পরম পবিত্র ও পরম পাবনী।

বিষ্ণুপুরাণ বলেন,—

"গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং সর্পির্দধি চ রোচনা।
ষড়ঙ্গমেতন্ মঙ্গলং পবিত্রং সর্ব্বদা গবাম্॥"

গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, ঘৃত, দধি ও রোচনা (গোরোচনা—ইহা গো-জাতির পিত্ত, গরুর মস্তকে থাকে) এই ষড়্‌বিধ গব্য পদার্থ সর্ব্বদাই পবিত্র ও মঙ্গল স্বরূপ।

"অস্মৎপুরীষ স্নানেন জনঃ পূয়েত সর্ব্বদা।
শকৃতা চ পবিত্রার্থং কুর্ব্বীরন্ দেবমানুষাঃ॥"

এই শ্লোকটি মহাভারতীয় অনুশাসন পর্ব্বের। ইহার অর্থ,—গোময়-স্নান দ্বারা লোক পবিত্রতা লাভ করে। দেবতা ও মনুষ্যগণ পবিত্রার্থ গোময় ব্যবহার করিয়া থাকেন।

গোময় ও গোমূত্র সম্বন্ধে উক্ত অনুশাসন পর্ব্বে একটি সুন্দর উপাখ্যানও আছে। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়াই এই স্থানে তাহার স্থূল মর্ম্মটুকু বিবৃত করিতেছি।

একদা বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীদেবী গো-জাতির সৌভাগ্য সন্দর্শনে লোভাতুরা গো-দেহে আশ্রয় গ্রহণের নিমিত্ত গো-জাতির নিকট উপস্থিত হইলেন। গো-গণ লক্ষ্মীর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া প্রথমতঃ তাহা প্রত্যাখ্যান করিল। কহিল, "আমরা বেশ আছি। আমাদের শ্রী বা সৌভাগ্য, কিছুরই অভাব নাই। সুতরাং তোমাকে লইয়া আমরা কি করিব? বিশেষতঃ তোমার বড়ই দুর্নাম শুনিতে পাই। তুমি বড় চঞ্চলা। একস্থানে বেশী দিন থাকিতে পার না। পরন্তু যাহাকে পরিত্যাগ কর, যাইবার সময় তাহাকে একেবারেই ভ্রষ্টশ্রী ও ভাগ্যহীন, এমন কি সর্ব্বস্বান্ত করিয়া রাখিয়া যাও। তাই তোমাকে আশ্রয় দিতেও আমাদের ভয় হয়। পাছে আমরাও তোমাকে আশ্রয় দিয়া বিপদে পড়ি।"

গো-জাতির এই প্রকার কঠোর উত্তর শুনিয়া কমলা কাতর হইলেন: কিন্তু তিনি সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিলেন, যে যেকোন প্রকারেই হউক, গো-দেহে আশ্রয় গ্রহণ করিবেনই। কাজেই পশ্চাৎপদ হইলেন না। কাতর কণ্ঠে অনুনয় সহকারে কহিলেন, "আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি, যে কোন অবস্থায়ই আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিব না এবং তোমরাও কদাপি তোমাদের শ্রী ও সৌভাগ্য হইতে বিচ্যুত হইবে না। সুতরাং তোমরা আমাকে মনঃক্ষুণ্ণ করিও না।"

গো-গণ শুনিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। তারপর স্থির করিল, যে লক্ষ্মী যখন সহজে নিবৃত্ত হইবে না তখন কৌশলেই উঁহাকে নিরস্ত করিবে। এইরূপ স্থিরসঙ্কল্প হইয়া কহিল,—

"অবশ্যং মাননা কার্য্যা তস্মাদাভির্যশস্বিনি।

শকৃন্মূত্রে নিবস ত্বং পুণ্যমেতদ্ধি নঃ শুভে॥"

হে যশস্বিনি, হে শুভে! তোমার মান রক্ষা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। সেই হেতু বলিতেছি, যে তুমি আমাদের মল ও মূত্রে বাস কর; কারণ ইহা সত্যই অতিশয় পবিত্র।

মল ও মূত্রের কথা শুনিয়া লক্ষ্মী নিবৃত্ত হইলেন না; বরং সমধিক আনন্দিতা হইলেন। কহিলেন,—

"দিষ্ট্যা প্রসাদো যুষ্মাভিঃ কৃতো মেঽনুগ্রহাত্মকঃ।

এবং ভবতু ভদ্রং বঃ পূজিতাস্মি সুখপ্রদা॥"

তোমরা প্রসন্ন হইয়া আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে। আমি সুখপ্রদ পূজাই প্রাপ্ত হইলাম। অতএব তাহাই হইবে, অর্থাৎ আমি তোমাদের মলমূত্রেই বাস করিব। এক্ষণে তোমাদের মঙ্গল হউক।

এই কথা বলিয়া লোকমাতা অন্তর্হিতা হইলেন।

সামাজিক অধঃপতনের এই অন্ধকারময় যুগেও গোময় গোমূত্রের সম্ভ্রম যে আর্য্য ভূমি হইতে একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই, ইহাই বোধ হয়, তাহার অন্যতম কারণ।

পাঠক গোময়ের নাম শুনিয়া তুমি নাসিকা কুঞ্চিত করিও না। তোমার আদরের ফিনাইল ও ব্লিচিং পাউডার হইতে গোময় গুণে অনেক সমৃদ্ধ। গোময় কেবল দুর্গন্ধই নাশ করে না। ইহা রোগের বীজাণু নষ্ট করে, স্বাস্থ্য দান করে এবং শ্রীবৃদ্ধি করে। তোমার পাশ্চাত্য-রসায়ন-বিজ্ঞান যেমন মকরধ্বজের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারে নাই, ঘৃতের গুণ বুঝে নাই, সেইরূপ গোময়ের সঙ্গেও অদ্যাপি অপরিচিত রহিয়া গিয়াছে।

বস্তুতঃ গো-জাতির প্রতি প্রাচীন আর্য্য মনোবৃত্তির এই যে সামান্য পরিচয়টুকু প্রদান করিলাম, ইহার মূলে ছিল তাঁহাদের গো-সম্বন্ধীয় অনুশীলন-লব্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান। তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে, সূক্ষ্ম সমালোচনার কষ্টিতে ভাল করিয়া না কষিয়া কেহই কোন কিছুর প্রতি ঐকান্তিকভাবে আকৃষ্ট হয় না বা তৎ সম্বন্ধে নিরবচ্ছিন্ন শ্রদ্ধাভক্তি পোষণ করিতে পারে না। ইহাই হইল প্রকৃতির চিরন্তন নিয়ম। এ নিয়মের ব্যতিক্রম কদাচিৎ দৃষ্ট হইলেও তাহা ক্ষণস্থায়ী। গো-জাতির প্রতি আর্য্য মনোবৃত্তির আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইলেও অস্তিত্ব আজিও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। আজিও আমরা "ধেনুর্বৎসপ্রযুক্তা" বলিয়া যাত্রামঙ্গল পাঠ করি। পঞ্চগব্যদ্বারা শুদ্ধ হই, বা শুদ্ধি সম্পাদন করিয়া থাকি। মধুপর্ক ও পঞ্চামৃতে আর্য্য পরিকল্পনার প্রকৃষ্ট পরিবেশনের কাছে শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিতে একটুও কুণ্ঠিত হই না। সহরের পাষাণময় প্রাসাদে না হউক, পল্লীগ্রামে গৃহস্থের ঘরে গোময় আজিও পরম পবিত্র ও আদরের সামগ্রী। একথা বোধহয় অত্যুক্তি হইবে না, যে গো-জাতিকে আজিও আমরা যে চক্ষে ও যে ভাবে দেখি, পৃথিবীর অন্য কোন জাতিই সেই চক্ষে ও সেই ভাবে দেখে না। ইহার কারণ কি? কারণ কি আমাদের বংশ-পরম্পরাগত ধারাবাহিক সংস্কার নহে? যাহা সত্য ও সনাতন তাহা এই ভাবেই বাঁচিয়া থাকে। সহস্র বিপ্লব ও বিপর্য্যয়েও একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত বা বিলুপ্ত হয় না।

এখানে আর একটি কথা বলাও বোধ হয় একান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আর্য্যগণ গো-জাতিকে আরণ্য জীব হিসাবে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের প্রদত্ত গো-জাতির জন্মবৃত্তান্তও অলৌকিক।

মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বে আছে যে একদা দক্ষ-প্রজাপতি প্রজাগণের কল্যাণচিন্তায় একান্ত অবসাদগ্রস্ত হইলে অবসাদ অপনোদনার্থ সুধা পান করিয়াছিলেন। সুধা পানানন্তর পরম পরিতোষ হেতু তাঁহার উদ্গার উত্থিত হইল। সেই উদ্গার জনিত সুধার সৌরভ হইতেই সুরভির জন্ম হয়। এই সুরভিই গো-জাতির আদি মাতা। সুরভি জন্মলাভ করিয়া স্বীয় শক্তি বলেই স্ব-দেহ হইতে গো-জাতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

অবশ্য ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণে সুরভির জন্মবৃত্তান্ত অন্যরূপ। তাহাতে আছে যে, গোলোকে ভগবান বিষ্ণুর পীযূষ পানেচ্ছা হইলে, তিনি স্বীয় পার্শ্বদেশ হইতে সুরভিকে সৃষ্টি করেন। সুরভির জন্ম সম্বন্ধে মতবিরোধ থাকিলেও, সুরভিই যে গো-জাতির আদি মাতা, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। গো-জাতির সৌরভেয়ী নাম হইতেও তাহা প্রমাণিত হয়।

যাহা হউক, গো-জাতির প্রতি প্রাচীন আর্য্যগণের মনোভাব ও আর্য্য-কথিত গো-জাতির উৎপত্তির ইতিকথা এই মোটামুটি বিবৃত করিলাম। এক্ষণে গব্য সম্বন্ধীয় দুই চারিটি কথা বলিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

প্রথমতঃ দুগ্ধের কথাই ধরা যাউক। দুগ্ধ সুপথ্য। একমাত্র দুগ্ধের মধ্যে যাবতীয় খাদ্য-সার বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেরও ইহাও সিদ্ধান্ত। আয়ুর্ব্বেদ দুগ্ধের গুণাগুণ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। তন্মধ্যে সাধারণতঃ দুগ্ধের গুণ, পথ্যত্বম্, অত্যন্তরুচ্যত্বম্, স্বাদুত্বম্, স্নিগ্ধত্বম্, পিত্তবাতাময়নাশিত্বম্, মেধ্যত্বম্, কান্তিপ্রজ্ঞাঙ্গ-পুষ্টি-বৃদ্ধি কারিত্বম্,—অর্থাৎ দুগ্ধ পথ্য, অত্যন্ত রুচিকর, স্বাদু, স্নিগ্ধ, পিত্ত-বাত-আময় নাশক, পবিত্র এবং কান্তি-প্রজ্ঞা-অঙ্গ পুষ্টি ও বীর্য্য বর্দ্ধক।

আয়ুর্ব্বেদের এই পথ্যত্বম্'এর অর্থ বহুব্যাপক। ইহার দ্বারাই যাবতীয় খাদ্যসার দুগ্ধের মধ্যে বিদ্যমান ইহা ব্যক্ত করা হইয়াছে। একমাত্র দুগ্ধ পান

করিয়াই মানুষ চিরদিন সুস্থ দেহে বাঁচিয়া থাকিতে পারে, আর্য্যকৃষ্টি মুক্তকণ্ঠে এ কথা ঘোষণা করিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ দুগ্ধ সম্বন্ধে আর্য্যকৃষ্টি যতটা সমৃদ্ধ অন্য কোন জাতির কৃষ্টিই তাহার এক দশমিকও নহে। আজিও আমাদের দেশে দুগ্ধ ইহতে যতপ্রকার সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহা অন্য কোনও দেশে হওয়া সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। আর্য্যগণ দুগ্ধকে সুপথ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াই তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই। তাঁহারা বিভিন্ন সময়ের দোহন করা দুগ্ধকে ও বিভিন্ন শ্রেণীর গো-লব্ধ দুগ্ধকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া তাহাদের তারতম্য নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন।

"গবাং প্রত্যুষসি ক্ষীরং গুরু বিষ্টম্ভি দুর্জ্জরম্ ॥
তস্মাদভ্যুদিতে সূর্য্যে যামং যামার্দ্ধমেব বা।
সমুত্তীর্য্য পয়ো গ্রাহ্যং তৎ পথ্যং দীপনং লঘু ॥
বিবৎসা-বালবৎসানাং পয়ো দোষলমীরিতম্।
শস্তং বৎসৈকবর্ণায়া ধবলী-কৃষ্ণয়োরপি ॥
ইক্ষুদা মাষপর্ণাদা উর্দ্ধশৃঙ্গী চ যা ভবেৎ।
তাসাং গবাং হিতং ক্ষীরং শৃতং বাশৃতমেব বা ॥
গবাং সিতানাং বাতঘ্নং কৃষ্ণানাং পিত্তনাশনম্।
শ্লেষ্মঘ্নং রক্তবর্ণানাং ত্রীন্ হন্তি কপিলা-পয়ঃ ॥"

অতি প্রত্যুষে যে দুগ্ধ দোহন করা হয় তাহা গুরুপাক। উহা পান করিলে পেট দমসম্ হইয়া থাকে, কিছুতেই হজম হইতে চায় না। সেই নিমিত্ত সূর্য্য উদয়ের পর এক প্রহর অন্ততঃ অর্দ্ধ প্রহর অতীত হইলে তবে দুগ্ধ দোহন করিবে। কারণ এইরূপ সময়ে যে দুগ্ধ দোহন করা হয় তাহাই লঘুপাক ও অগ্নিবর্দ্ধক।

বিবৎসা, অর্থাৎ যাহার বাছুর মরিয়া গিয়াছে, এবং বালবৎসা গাভীর দুগ্ধ পান করিবে না। কারণ, উহা দুষণীয়।

সবৎসা এবং ধবল অথবা কৃষ্ণ, একবর্ণা গাভীর দুগ্ধই উৎকৃষ্ট। যে সব গাভী ইক্ষু ভক্ষণ করে অথবা মাষপর্ণী নামক বনৌষধি ভক্ষণ করিয়া থাকে, এবং যে সব গাভী উর্দ্ধশৃঙ্গ বিশিষ্ট তাহাদের দুগ্ধই পরম হিতকর। তা' পক্কই হউক আর অপক্কই হউক।

শ্বেতবর্ণ গাভীর দুগ্ধ বাতঘ্ন; কৃষ্ণবর্ণ গাভীর দুগ্ধ পিত্তনাশক, রক্তবর্ণ গাভীর দুগ্ধ শ্লেষ্মানাশক এবং কপিল অর্থাৎ স্বর্ণবৎ পীতবর্ণ গাভীর দুগ্ধ বাত, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষই নাশ করিয়া থাকে।

দুগ্ধের এবম্বিধ বিশ্লেষণ আর্য্যকৃষ্টি ভিন্ন অন্যত্র আছে কি?

দুগ্ধের পর ঘৃতই প্রধান আলোচ্য বিষয়। তৎপূর্ব্বে পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত দধি, তক্র ও নবনীতের গুণাগুণ সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

দধির গুণ,—অতি পবিত্রত্বম্, শীতত্বম্, স্নিগ্ধত্বম্, দীপনত্বম্, বলকারিত্বম্, মধুরত্বম্, অরোচকবাতামনাশিত্বম্, গ্রাহিত্বম্—অর্থাৎ দধি অতি পবিত্র, শীত, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, মধুর রস, অরুচি-বাত-আমব নাশক এবং ধারক।

তক্রের গুণ —ঘোল, মথিত, তক্র, উদশ্বিৎ ও ছচ্ছিকা এই পাঁচটি তক্রের ভেদ। তন্মধ্যে সরের সহিত জলহীন দধি মন্থন করিলে তাহাকে ঘোল বলে। সরবিহীন দধি জলের সহিত মন্থন করিলে তাহাকে মথিত বলে। চতুর্থাংশ জলের সহিত দধি মন্থন করিলে তাহাকে তক্র ও অর্দ্ধাংশ জলের সহিত দধি মন্থন করিলে তাহাকে উদশ্বিৎ এবং বহু পরিমাণে জল মিশ্রিত করিয়া মন্থন করিলে যে স্বচ্ছ পদার্থ থাকে তাহাকে ছচ্ছিকা বলে। ঘোল—বায়ু ও পিত্ত নাশক। মথিত—কফ ও পিত্ত নাশক। তক্র—ধারক, কষায়, অম্ল-মধুর রস, মধুর-বিপাক, লঘু, উষ্ণবীর্য্য অগ্নিসন্দীপক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ু নাশক। উদশ্বিৎ—কফবর্দ্ধক, বলকারক ও শ্রান্তি নাশক। ছচ্ছিকা—শীতবীর্য্য, লঘু, কফকারক এবং ইহা পিত্ত, শ্রম, পিপাসা ও বায়ু নাশক।

নবনীতের গুণ,—শীতত্বম্, বর্ণ-বল-শুক্র-কফ-রুচি-সুখ-কান্তি-পুষ্টি-কারিত্বম্, সুমধুরত্বম্, সংগ্রাহকত্বম্, চক্ষুর্হিতত্বম্, বাত-সর্ব্বাঙ্গশূল-কাস-শ্রম-সর্ব্বদোষনাশিত্বম্—অর্থাৎ নবনীত শীতগুণ, বর্ণের উজ্জ্বল্য সম্পাদক, বলকারক, শুক্র ও কফবর্দ্ধক, রুচিকর, সুখজনক, কান্তিবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, সুমধুর রস, অত্যন্ত ধারক, চক্ষুর হিতকারী, বাত ও সর্ব্বাঙ্গশূলনাশক, কাস-দোষ-নিবারক, শ্রমঘ্ন এবং সর্ব্বদোষনাশক।

ঘৃতের গুণ,—হৃদ্যত্বম্, ধী-কান্তি-স্মৃতি-বল-মেধা-পুষ্ট্যগ্নিবৃদ্ধি-শুক্র বপু-স্থৌল্যকারিত্বম্, বাত-শ্লেষ্ম-শ্রম-পিত্তনাশিত্বম্, বিপাকে মধুরত্বম্, হব্যত্বম্, বহুগুণত্বম্—অর্থাৎ ঘৃত হৃদ্য, ধী-শক্তিবর্দ্ধক, কান্তিবর্দ্ধক, স্মৃতিশক্তিবর্দ্ধক, বলকর, মেধাবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, শুক্রবর্দ্ধক, দেহের পুষ্টি ও স্থুলত্ব সম্পাদক, বাত-শ্লেষ্ম-শ্রম-পিত্তনাশক। ভোজনের পর ঘৃতের মধুর বিপাক হয়। ঘৃত বহু গুণযুক্ত। ইহাদ্বারা আহুতি প্রদত্ত হইয়া থাকে।

অত বিশ্লেষণের পরেও আবার 'বহুগুণত্বম্' এই বিশেষণের তাৎপর্য্য কি? অত বলিয়াও কি আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় নাই? বস্তুতঃ তাহাই বটে। আর্য্য-কৃষ্টি ঘৃতের গুণ-ব্যাখ্যায় পঞ্চমুখ হইয়াছে। অথচ বর্ত্তমান বিজ্ঞান, যাহার দাপটে আজ জল-স্থল-আকাশ কম্পমান, পৃথিবী রসাতলে যাইতে বসিয়াছে, যে ভিটামিন খুঁজিতে খুঁজিতে জঙ্গলে গিয়া টমেটো আবিষ্কার করিল—যাহা দশবৎসর পূর্ব্বেও এদেশে মানুষের অখাদ্য ছিল—কিন্তু এই ঘৃতের মধ্যে ভিটামিন খুঁজিয়া পাইল না! কালের পরিহাস আর কাহাকে বলে? তাহার পর ঘৃতের হব্যত্ব বর্ত্তমানের পক্ষে অতি বড় দুর্ব্বোধ, অথচ অতি বড় বৈজ্ঞানিক পরিবেশন।

"অগ্নৌ প্রস্তাহুতি সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাদ্ জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ ॥"

অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি, সূর্য্যলোকে গমন করে। সূর্য্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন অর্থাৎ আহার্য্য শস্যাদি জন্ম লাভ করে এবং আহার্য্য হইতেই প্রজাকুল জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

ইহাই সরলার্থ, ইহা হইতে আমরা কত বড় ব্যাপক অথচ কত সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম একটা পরিকল্পনা প্রত্যক্ষ করিতেছি। ঘৃত যে এমনভাবে পরিবেশিত হইতে পারে তাহা কি পৃথিবী আজিও ধারণা করিতে পারিয়াছে? পারে নাই। তাহা হইলে বৈদিক যুগের অবসান হইত না, আর্য্যভূমি হইতে যজ্ঞ উঠিয়া যাইত না।

যজ্ঞলোপের অর্থ যে একটা অনুষ্ঠান মাত্রেরই লোপ নহে, তাহা যাঁহারা একটু চিন্তাশীল ও পূতচিত্ত তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। যজ্ঞ লোপের সঙ্গে আমরা হারাইয়াছি,—আয়ু, বল, বুদ্ধি, ধী-শক্তি, আমরা হারাইয়াছি—সাধুতা, সত্যনিষ্ঠা, সরলতা, আমরা হারাইয়াছি—আমাদের আত্মিক ও দৈহিক সর্ব্ববিধ সম্পদ।

ঘৃতই একদিন আমাদিগকে দেবত্ব দিয়াছিল তার এই হব্যত্বের মধ্য দিয়া। আজ আমরা তাহা না বুঝিয়া নিজেদেরই সর্ব্বনাশ করিয়াছি। ঘৃতের অনাদর—গো-জাতির অনাদর আমাদিগকে অমানুষ করিয়াছে, খর্ব্ব-শীর্ণকায় করিয়াছে, রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্রের নিত্য-সহচর করিয়াছে, তেজ-বীর্য্য-হীন পরাধীন করিয়াছে।

'গব্যহীনং কুভোজনং'—গব্যহীন অন্ন কদন্ন—পিশাচের ভক্ষ্য। আজ আমরা সকলেই পিশাচ বনিয়াছি, তাই পিশাচের লভ্য অবজ্ঞা লাঞ্ছনাই আমাদের ভাগ্যে জুটিতেছে।

জানি, এ সকল কথা আজ অরণ্যে রোদনের মতই শুনাইবে। তা' হউক, তথাপি যাহা সত্য তাহা বলিলাম।

গোমূত্র সম্বন্ধে কিছু না বলিলে গব্য সম্বন্ধীয় বক্তব্য বিষয়টি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। গোমূত্রের গুণ—কটুত্ব, তিক্তত্ব, উষ্ণত্ব, লঘুত্ব, কফ-বাত-ত্বগ্‌-দোষনাশিত্ব, পিত্তকারিত্ব, দীপনত্ব, মেধ্যত্ব, মতিপ্রদত্ব,—অর্থাৎ গোমূত্র কটু, তিক্ত, উষ্ণ, লঘু, কফ-বাত-ত্বগ্‌দোষ নাশক, পিত্তকারক, অগ্নি বর্দ্ধক; পবিত্র এবং মতিপ্রদ।

মহাভারতের বিরাটপর্ব্বে সহদেব কর্ত্তৃক তদীয় গো-সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা বর্ণন প্রসঙ্গে বৃষ-বিশেষের মূত্র-গুণ সম্পর্কে একটি অত্যাশ্চর্য্য কথা উক্ত হইয়াছে,—'যস্য মূত্রমুপাঘ্রায় অপি বন্ধ্যা প্রসূয়তে।" এমন বৃষ সহদেব পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ ছিলেন যে, যাহার মূত্রের ঘ্রাণ লইলে বন্ধ্যা নারীও গর্ভ ধারণ করে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা শুনিয়া অট্টহাস্য করুন, ক্ষতি নাই, কিন্তু আমরা অবৈজ্ঞানিকেরা সাহস করিয়া আর্য্য-কৃষ্টির অঙ্গ হইতে এই শ্লোকাংশটুকুর গৌরব-চিহ্ন একেবারে মুছিয়া ফেলিতে পারিলাম না।

প্রেম-স্বর্গ

শ্রীকালিদাস রায়

[Lady Nairn এর Land o' the Leal কবিতার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ]

ফুরায়ে আসিছে জীবনের লীলা প্রিয়
গলিয়া আসিছে হৃদি হিমশীলা, প্রিয়
প্রেম-স্বরগের কূল যেথা রমনীয়
সেই কূল পানে প্রাণ-তরী যায় ভেসে,
নাহি তাপ দাহ সেথা কোন দুখ, প্রিয়
জ্বালা যন্ত্রণা হারা হয় বুক, প্রিয়
দিবস রজনী মধুময় কমনীয়
শুনিয়াছি সেই প্রেম-স্বরগের দেশে।
সুখে থাক হেথা সুখে ছিলে বেশ, প্রিয়
কৃত্য তোমার হয়নিক শেষ, প্রিয়
তুমিও সেথায় হবে হবে বরণীয়
একদিন এই ইহ-স্বপনের শেষে।

আমাদের 'মনু' রূপে গুণে ভালো, প্রিয়
আগে হতে তাহা করিয়াছে আলো, প্রিয়
তার পাশে ঠাঁই মোর বড় লোভনীয়,
ডাকিছে আমারে প্রেম-স্বরগের দেশে।
মুছ তবে অই জল-ভরা আঁখি, প্রিয়
পিঞ্জর ছাড়ি উড়ে তব পাখী, প্রিয়
দেবদূতগণ উড়ায়ে উত্তরীয়
লইতে এসেছে চ'লে যাই হেসে হেসে।
বিদায় বিদায় ভগ্ন হৃদয়, প্রিয়
জীবন-সমরে এইত বিজয় প্রিয়,
সেথা তোমা সনে চিরতরে স্বরগীয়
হইবে মিলন প্রেম-স্বরগের দেশে।



চীনরাষ্ট্র ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের পাঁচ বৎসর—প্রকাশক, চীন পাবলিশিং কোম্পানী, চুংকিং, চীন। মূল্য ১৲

বিগত পাঁচ বৎসর ধরিয়া চীন জাপানের সাম্রাজ্য লোলুপতার মূলে ক্রমাগত কুঠারাঘাত হানিয়া চলিয়াছে। কবে ইহার শেষ হইবে কে জানে। জাপান তাহাপেক্ষা বহুগুণ শক্তিশালী। সমরসম্ভার, যান্ত্রিক অস্ত্রশস্ত্র, বিমান ও নৌবল—ইহার প্রত্যেকটীতেই জাপান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিদের অন্যতম। কিন্তু তথাপি এই দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে চীন কেমন করিয়া এই পাঁচ বৎসর দিনের পর দিন ঠেকাইয়া আসিতেছে তাহার কারণ সম্বন্ধে এই পুস্তকখানিতে বহু তথ্য আছে।

এই দীর্ঘ সংগ্রামের ভিতর দিয়া চীন একটীর পর আর একটি জনপদ, শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র এবং শস্যপ্রধান প্রদেশ হারাইয়াছে। কিন্তু তথাপি যে শত্রু অন্যায়ভাবে তাহাকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে তাহার পদতলে মস্তক এতটুকু অবনমিত করে নাই। ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চীন রাষ্ট্রসংগঠনের দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। তাহার আভ্যন্তরীন বিভেদ মিটাইয়া সে মহাচীনরাষ্ট্র গঠনের ধারাকে ক্রমশঃ পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে।

মঙ্গোলিয়া ও তিব্বত ব্যতীত চীনে ২৮টি প্রদেশ আছে। উত্তর-পূর্ব্বের চারিটি ও উত্তর দিকের সাতটি প্রদেশ জাপানের হস্তগত। কিন্তু তথাপি চৈনিকরা স্থায়ী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের চেষ্টা স্তিমিত হইতে দেয় নাই। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেন্ট কেন্দ্রীভূত করিবার প্রচেষ্টা চলিয়াছে। সেই জু-আও হয় ত সত্যই বলিয়াছেন, "চৈনিক প্রকৃতির বিশেষত্ব এই যে বিষম বিপদের মধ্যেও সে ভবিষ্যতের কথা ভোলে না।"

চীনের নবীন সৈন্যদের যুদ্ধশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। "প্রত্যহ তাহাকে দেশ ও জাতির প্রতি কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়।" নৈতিক শিক্ষার উপদেশাবলী জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেক স্বয়ং লিখিয়া দিয়াছেন। এই শিক্ষাই হয় ত নবীন চীনকে তাহার মুক্তির পন্থা বলিয়া দিবে।

ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত থাকিলেও চীন তাহার শস্য ও খনিজ সম্পদ, পল্লী সংগঠন, শিল্প-বাণিজ্য-সমবায় ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ করে নাই। এমন কি খাদ্য সমস্যার দিক দিয়াও স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবার চেষ্টা তাহার লাগিয়াই আছে।

মোটের উপর, এই পুস্তকে যুদ্ধরত চীনের সর্ব্বরকম প্রচেষ্টার বহুতর দৃষ্টান্ত মিলে। এবং চীন সম্বন্ধে প্রামাণ্য বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ হওয়ায় বাঙালী জনসাধারণের কৌতুহল অবশ্যই চরিতার্থ হইবে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

শিশু-ভগবান ঃ কাব্যগ্রন্থ, শ্রীমতিলাল দাশ।

শিশু-ভগবানের কবিতাগুলিতে একটা বৈশিষ্ট্য আছে ও ইহাতে কবির দৃষ্টি ভঙ্গির নূতনত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। ভূমিকায় কবি নিজেই বলিতেছেন, "কবিতাগুলির মধ্য দিয়া শিশুকে ভগবানের লীলারূপ বলিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি। আশা করি এই ভাবটি প্রত্যেক মাতা ও পিতার অন্তরে নূতন ঝঙ্কার তুলিবে।" কবির নিজ পারিবারিক আবেষ্টনই এই কাব্যখানির মূল উৎস। নিজ শিশু পুত্র-কন্যাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় যে ভাব কবির অন্তরে জাগিয়াছে তাহাই এক একটি কবিতার বিষয়বস্তু হইয়া দেখা দিয়াছে। কিন্তু এই পারিবারিক প্রতিবেশ ও ব্যক্তিগত আবেষ্টন ছাড়াইয়া শিশুমনের বিচিত্র ভাবধারা এমন একটা সার্ব্বজনীন রূপ পাইয়াছে যে প্রত্যেকের জীবনে ইহা আনন্দ দিতে পারে। ইহার বিশেষত্বই এই যে বিষয়বস্তুর ব্যক্তিগত সীমারেখা অতিক্রম করিয়া কবিতাগুলি এমন একটা প্রতিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে যে ইহা পড়িতে পড়িতে প্রত্যেককেই নিজের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

শিশুর মাঝেই ভগবান বিরাজ করেন। প্রত্যেক শিশুর প্রতিটি কার্য্যে ভগবানের বিচিত্র লীলা প্রকাশ পায়। কর্ম্মব্যস্ত ক্লান্ত জীবনে আমরা কয়জনে সেই নিপুণ শিল্পী শ্রীভগবানের এই বিচিত্র শিশুমনের পরিচয় পাই! প্রাকৃতিক নিয়মে শিশুর আগমন ও গতানুগতিক ধারায় ইহার পরিসমাপ্তি আজ স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে যে কোন নূতনত্ব, ইহাতে যে কোন বৈচিত্র্য, কোন অভিনবত্ব থাকিতে পারে তাহা আমাদের কল্পনার বাহিরে। শিশু আসে তাহার শৈশব কাটিয়া যায়, তারপর বয়সের বিভিন্ন স্তরে তাহার বিকাশ হইতে থাকে। শিশুমনের সন্ধান জানিবার সময়ও আগ্রহের অভাবে ইহাদের প্রতি অবিচার ও অবহেলাই আমরা করিতে থাকি। শিশুমনের শাশ্বত ভগবান তাই ধীরে ধীরে মিলাইয়া যান ও অস্পষ্ট হইতে থাকেন। পৃথিবীর উষাকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত শিশুমনের চিরন্তন ভাবধারা, তাহাদের মাঝে ভগবানের আবির্ভাব একইরূপে, একই ভাবে চলিয়া আসিতেছে। শিশুর মাঝে এই যে ভগবান, ইনি পূজা চান না, ভক্তি চান না—ইনি চান সহজ সরল প্রীতি। প্রীতির

বন্ধনে শিশুর লীলা-খেলাকে জীবনে সার্থক করিয়া তুলিতে পারিলে শিশুর মাঝেই ভগবানকে পরিপূর্ণ ভাবে অনুভব করিতে পারা যায়।

এই শিশু-ভগবান কাব্যে কবি "সকল শিশুর মাঝে সেই ভগবান"-এর জয়গান গাহিয়াছেন। বস্তুতান্ত্রিক জগতে শিশুর আবির্ভাব—এই যে অমরার আলোদীপ, নূতন অতিথি, কে জানে কি আশা, আকাঙ্ক্ষা ও অজানা গোপন উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছে? কিন্তু সে কোথায় আসিল?

উদয় তটের সীমা পিছনে তোমার
অন্ধকার তীর,
সমুখে তরঙ্গ রঙ্গ বিশাল ভুমার,
চঞ্চল অস্থির।
আমারি কুটীর দ্বারে কি জানি কি কহি,
পোহাল রজনী?
মোর ঘাট হতে আজ কোন্ আশা বহি
বাহিবে তরণী?

কত যুগ যুগান্তর হইতে কত লীলা লইয়া ধরণীর বুকে এই যে ভগবানের আবির্ভাব কবির আশঙ্কা হইয়াছে তিনি কি তাহা সার্থক করিয়া তুলিতে পারিবেন? তাই তিনি বলিতেছেন—

পথের পাথেয় তব পারিব কি দিতে
হে নিত্য-পথিক?
ধূলি ভরা মোর ঘরে আনন্দিত চিতে
রবে কি ক্ষণিক?

বিরামবিহীন অজানার পানে এই যে যাত্রা—সেই উৎসব যাত্রার আবাহন গানই এই কাব্যখানির একটি প্রধান সুর। কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় নানা ভঙ্গিতে সেই সুর ধ্বনিয়া উঠিয়াছে।

তারপর আসিয়াছে "মায়ের খোকা"। খোকা কে? কবি বলিয়াছেন, যুগের বাণী কণ্ঠে লইয়া, চিত্তে সৃষ্টির চেতনা লইয়া স্বর্গ লোকের পুণ্য কেতনের মত যে আসিয়াছে তাহাকে—

তোমায় পেয়ে নিলেম জানি, বিশ্বলোকের মর্ম্মবাণী।

"আবির্ভাব" কবিতাতেও কবি শিশুর মধ্যে বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

জগৎ-চলার ইতিহাসের গুপ্ত ছবি, তোমার মাঝে হেরি,
সকল মনের ভাবের ধারা, সংহত আজ তোমার মানস ঘেরি।

আবার এই কবিতার অন্যস্থানে বলিয়াছেন—

সকল জ্ঞানের, সকল রসের, মূর্ত্ত প্রতীক! আয়রে বুকের পরে,
তোরে লয়ে মুগ্ধ রব, ফুল্ল রব অভয় আশা ভরে।"

"পিতৃবাণী" কবিতায় এই বিষয়টি আরও বিশদরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শিশু একদিন এই পৃথিবীর বুকেই বড় হইবে। তাহার মহান কর্ত্তব্য সম্মুখে রহিয়াছে। আদর্শের প্রতি অচল থাকিয়া তিনি তাহাকে জয়যাত্রায় অগ্রসর হইতে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। তারপর "শিশুর হাসি", "খোকার নাচ", "খোকার ভাষা" প্রভৃতি কবিতাতে সেই সুর, সেই আবেগ, সেই অনুভূতি যাহা নিরন্তর স্নেহপ্রবণ অন্তরে চিরন্তন বিরাজ করিতেছে তাহার প্রত্যক্ষ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। খোকা নাচিতেছে—কদম ফুলের ডালে ময়ূরের মত এ নাচ। অপূর্ব্ব হৃদয়াবেগে কবি বলিতেছেন—

এ যেন রে বৃন্দাবনে,
নন্দদুলাল আপন মনে,
জগৎ জনে দেখায় হাসি নাচের মোহন ছলা।

শিশুর হাসি, শিশুর ভাষা, শিশুর নাচ প্রভৃতির সহিত নিত্যকার জীবনে সকলেরই পরিচয় আছে। কবি যে দৃষ্টি লইয়া ইহা দেখিয়াছেন, যে হৃদয় লইয়া ইহা অনুভব করিয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব। শিশুর হাস্য কলরবে মুখরিত গৃহাঙ্গনে এই চিত্র প্রতিনিয়ত প্রতি ঘরে ঘরেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা উপলব্ধি করিতে চাই নূতন দৃষ্টি, নূতন ভাব, নূতন অনুভূতি। "জন্ম তিথি সম্বন্ধে তিনটি কবিতা এই কাব্যে পর পর আছে। জন্মতিথি প্রতিপালনের সার্থকতা ও উদ্দেশ্য কবি এ গুলিতে বর্ণনা করিয়াছেন। জন্মতিথির প্রতি বৎসর আসিতেছে ও আসিবে। স্মৃতির বন্ধনে অন্তরের অন্তস্থলে ইহাকে কয়জন উজ্জ্বল রাখিতে পারে? "শিশু দিগম্বর", "খোকার জগৎ", "মায়ের শিশু" এই তিনটি কবিতাতেও কবির পূর্ব্ব আশঙ্কা ও বিরাট সম্ভাবনার সুরটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি 'মায়ের শিশু" কবিতায় বলিয়াছেন—

অমলি ভেসে হঠাৎ কিরে, করলি কি রে ভুল?
মোর জীবনে মিল্‌বে কিরে চির চাওয়া কুল?

শিশুদের স্বভাবই চপলতা। একটা স্বচ্ছন্দ গতি, অশান্ত উদ্দাম ভাবাবেগ তাহাদের নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। "অশান্ত" "দুঃখের দান" কবিতায় কবি এগুলিও যে মোটেই তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর নহে তাহা অতি সুন্দর ও স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন। প্রথম স্তবকের কবিতাগুলিতে কবিহৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষাও বহু কবিতায় নানা ভাবে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি একদিকে যেমন শিশুকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন অপর দিকে তাহাদের প্রতিটি কার্য্য অতি স্নিগ্ধ ও প্রসন্ন দৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছেন। তিনি কাব্যের প্রথম স্তবক শিশু দেবতাকে "অঞ্জলি" দিয়া শেষ করিয়াছেন কবির বাসনা—

ম্লান যাহা মৃত্যু সম হোক্ সমুজ্জ্বল
বিশ্বজনে দিক বাঁটি অমৃত উচ্ছল।

এই কাব্যের দ্বিতীয় স্তবকে যে কবিতাগুলি আছে তাহার বিষয়বস্তুও একই। "মঞ্জুলি" "এক কৌটা তুই মেয়ে," "খুকুর সাথে খেলা," "কাজলি", "দুষ্টু বুড়ি" প্রভৃতি কবিতা পারিবারিক পরিবেশে বিভিন্ন অবস্থায় লেখা। ইহার সবগুলিতেই একটা স্নেহপ্রবণ পিতৃহৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাজ ও অকাজ, দুষ্টামি প্রভৃতি নিত্যকার সাধারণ কার্য্যগুলিও ছন্দে ছন্দে একটা নূতন অভিনব পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছে। অবশেষে কবি তাঁহার কাব্য শেষ করিয়াছেন "শিশু-দেবতা" কবিতায়। শিশু-দেবতার অপূর্ব্ব লীলা এই ভুবনের ঘরে ঘরে চলিতেছে। কবি তাহাদের জয় যাত্রার গান গাহিয়া বলিয়াছেন—

জীর্ণ ধরণীর মঝে আনে তারা প্রাণ,
তাই বিশ্ব বেঁচে যায় নাহি হয় বাসি,
আনে তারা নব বোধ আনে নব জ্ঞান,
আনে আশা রাশি রাশি আনে গান হাসি

তাদের অমর লীলা লিখে দিমু গানে
পূর্ণ হোক দিনে দিনে নব অবদানে।

ছন্দের বৈচিত্র্য এই কাব্যখানির অপর একটি বিশেষত্ব। ভাবের সহিত ছন্দের এমন একটা সঙ্গতি আছে যে তাহা সহজেই মনকে আকৃষ্ট করে। ছন্দগুলি সুরের মত তালে তালে ভাবধারাকে ফুটাইয়া তুলিতে সহায়তা করিয়াছে। "ঘুম পাড়ানিয়া গান"এর ছন্দ—

ঘুম ঘুম আয় ঘুম আয়রে
বন্ ভর্ সর্ব্ চুপ্ হায়রে
নাই ধুম নাই ধুম নাইরে
আয় ঘুম্ আয় ঘুম্ আয়রে।

আবার কবিতায় ভাব যেখানে সরল ছন্দও সেখানে সহজ রূপ লইয়াছে। যেমন "ইঁদুর বাবু" কবিতার ছন্দ,—

গর্ত্তে থাকেন চশ্মা পরেন স্বর্ণ কলম হাতে
ইঁদুর বাবুর দাপট ভারি দেখ্‌তে পাবে রাতে।

ছন্দের সহিত ভাবের সামঞ্জস্যের জন্য ও ইহার বৈচিত্র্যে কাব্য কোথাও একটানা ও একঘেয়ে হয় নাই। কাব্যের বিষয়বস্তু, ভাবসম্পদ্, ছন্দের বৈচিত্র্য, শব্দের বিন্যাস প্রভৃতি কাব্যখানিকে নূতন একটি রূপ দিয়াছে যাহা সচরাচর এই শ্রেণীর কবিতায় পাওয়া যায় না। ভাবের দিক দিয়া তিনি কোন তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি দেন নাই। তাই সমগ্র কাব্যে কবি-প্রাণের স্পর্শ পাওয়া যায়। আপন মনের মাধুরী ও গভীর অনুভূতি তাই কাব্যখানিকে একটি স্বচ্ছন্দ রূপ দিয়াছে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মৌলিক

কলহংস—শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট্-ল রচিত। প্রাপ্তিস্থান. বি, সরকার এণ্ড কোম্পানি, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১৷০ ; রাজসংস্করণ ২৲।

'দীপশিখা'র পরে 'কলহংস' কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। কবিতাগুলির মধ্য হইতে একটা মধুর গ্রাম্যসুর ভাসিয়া আসে। সিক্ত ঘাসের একটা গন্ধ যেন পাওয়া যায়। সেই বেনুবন, সেই কুমার নদী', সাফ্‌লিডাঙ্গার বিলে বুনোহাঁসের মেলা, সেই মেঘ্‌লা আকাশের জলে ভরা নদীর মধ্যে ভাটিয়াল সুরের নর্ত্তন, সেই অশথতলা—সমস্ত মিলিয়া একটি যে সুনিবিড় পল্লীর পরিবেশ গড়িয়া তুলে তাহা যেন একান্ত আমাদের। মহানগরীর রূপমুগ্ধ নাগরিকের প্রাণে যেন পল্লীর সেই নিভৃত কোনটীর জন্য ব্যথা জাগিয়া উঠে ; হিয়ার হংসদূত যেন দূর হইতে তাহাকে আহ্বান জানায়।

ভাবের দিক হইতে নূতনত্ব না থাকিলেও ভাষার দিক হইতে বিশেষত্ব আছে। প্রকৃত কবিমন সুরেশবাবু পাইয়াছেন। যে স্থানে যে ভাষা ভাব প্রকাশের প্রকৃষ্ট সহায়ক সেই স্থানে সেই ভাষা দিয়া আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার প্রচেষ্টা আছে। কিন্তু কবিতাগুলি রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত নহে। এবং স্থানে স্থানে শুদ্ধ পল্লী-ভাষার মধ্যে রাজধানীর ভাষা কেন অনাবশ্যক প্রবেশলাভ করিল তাহা বুঝিলাম না। 'হংসদূত', 'উৎকণ্ঠিতা', 'আমি তারি গান গাই।' 'গৌরী', 'পিছু ডাকে' ইত্যাদি কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ—আবুল হাসানাৎ। প্রকাশক—ডি, এম, লাইব্রেরী ; ৪২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মূল্য ১৷০ টাকা।

আবুল হাসানাৎ সাহেব বহু বিদেশী গ্রন্থ হইতে উক্তি দেখাইয়া প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন, এ-দেশে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের কোন প্রচেষ্টা এযাবৎ হয় নাই ; এবং তাঁহার দর্শিত উপায়ই অপেক্ষাকৃত বৈজ্ঞানিক। জন্মনিয়ন্ত্রণ মন্দ নহে। কিন্তু যে উদ্দেশ্য লইয়া তিনি জন্ম-নিয়ন্ত্রণের নির্দ্দেশ দিতে অগ্রসর হইতে সাহসী হইয়াছেন তাহা মোটেই বিজ্ঞান-সম্মত নহে।

মানুষ সন্তান কামনায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। ইহা সমাজ সংরক্ষণের প্রধান সোপান। ইহা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য নহে। এই ইন্দ্রিয় ভোগলালসার দিকটাই যে পুস্তকে প্রধান হইয়া পড়িয়াছে তাহাই নহে, উহাই যেন একটী সত্য ইহাই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এই উপভোগের দিকটা যখনই বড় হইয়া উঠে তখন স্ত্রী-পুরুষ সংযম হারাইয়া ফেলে, তাহারা আদর্শচ্যুত হয়। সুতরাং আবুল হাসানাৎ সাহেবের বর্ণিত উদ্দেশ্য সমাজের মঙ্গলদায়ক হইতে পারে না।

সুস্থ ও সবল পুত্রকন্যাই পিতামাতার কাম্য কিন্তু এই contraceptives ব্যবহারে তাহা হয় না। এই ব্যবস্থা অবলম্বন করার পরে যে শিশু জন্মগ্রহণ করে ইহাতে সেই শিশুর বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন সহজভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সবল ও সুস্থ হইয়া উঠে না এবং কোন সত্যিকারের উন্নতিবিধয়কে বৈজ্ঞানিক চিন্তাশীলতা সেই সন্তানদ্বারা সম্ভব হয় না।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ভাঁওতায় তিনি ঠকিয়াছেন। তাঁহার জন্ম নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা অনাবশ্যক।

শ্রীঅবনীকান্ত ভট্টাচার্য্য

উপহার—শ্রীকালীচরণ ঘোষ প্রণীত প্রবন্ধের বই। মূল্য বার আনা। কে, পি, বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ ১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা।

নিবেদনে গ্রন্থকার বলিয়াছেন, 'উপহার মুদ্রিত করিবার পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র কাহিনী আছে। আমার প্রথমা কন্যার বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিবার সময় আত্মীয় বন্ধু সকলকেই অনুরোধ করিয়াছিলাম যাহাতে কেহ যৌতুক উপহার প্রভৃতি না দেন। তাহা সত্ত্বেও কোন কোন স্থান হইতে উপহার প্রভৃতি আসিয়াছিল। অত্যন্ত দুঃখিত ও শঙ্কিত চিত্তে আমি তাহা গ্রহণ করিতে পারি নাই, ইহা যে চরম অশিষ্টতা তাহা আমি জানি ; সুতরাং কেন গ্রহণ করিতে পারি নাই, তাহার জবাবদিহি করিতে আমি বাধ্য। সেই কারণেই উপহার লিখিত।'

সমাজের বিবিধ প্রথা, সংসারের যাত্রাপথে চলিতে চলিতে চোখে পড়িলেও উপেক্ষা করিয়া চলি এবম্বিধ কতিপয় কু-সংস্কার প্রভৃতির উপর তীব্র কষাঘাত করিয়া আলোচ্য গ্রন্থের লেখক সহজ ও সুন্দর ভাষায় গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধগুলি গল্পে লিখিত সত্য কিন্তু রচনানৈপুণ্যে উপহার কাব্যধর্ম্মী। বস্তুতঃ, বিষয়গুলির গুরুত্ব সত্ত্বেও লিখিবার সাবলীল ভঙ্গীতে পুস্তকখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে, সর্ব্ব শ্রেণীর পাঠকের নিকটেই ইহা সমাদর লাভ করিবে। এইরূপ সামাজিক প্রবন্ধের গ্রন্থ যতই প্রচারিত হয় ততই মঙ্গল। মূল্য সুলভ। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বিশ্বাস

স্বপনকুমারী

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস, এম-এ, ব্যারিষ্টার এট-ল

রাজার কুমারী, রাজার দুলালী
নিরালা নিশীথে গভীর গোপন
স্বপন বিহারী রূপে,
কেন এলে মোর গহন মনের
সুবিপুল বনে লঘু-সঞ্চারে
অসহায় চুপে চুপে ?

পুলকে ব্যথায় রক্ত-ঝরা এ
বক্ষের মাঝে জাগে কোন্ এক
অপূর্ব্ব অনুভূতি,
সুপ্ত পূজারী অজপা-মন্ত্রে
বর্ণে ছন্দে গন্ধে ও গীতে
রচিল রূপের স্তুতি।

অরূপ কুমারী ঘন-পঙ্কিল
সরোবর হ'তে পঙ্কজকলি
তুলে এনেছিনু ভুলে,
যতনে গোপনে রেখেছি লুকায়ে,
সভয়ে সমুখে নেইনি সে ফুল—
গন্ধ-কমল তুলে।





কমল কলি যে তোমার শ্রীকরে
লীলাকমলের মতই সোহাগে
আদরে নিয়েছ বরি',
স্বপনে নেহারি' সুখে ও ব্যথায়
মুখ ঢাকি লাজে, কি শোভা সেজেছে
সে কমল মরি মরি !

আমি মাঠে মাঠে ধেনু ল'য়ে যাই
বেণু হাতে মোর ছায়াঘন বনে
বুনেলা হিজল-মূলে
তব নামখানি সুরে সুরে বাজে
বাণীতে জাগে নি, বাঁশীতে সে বাণী,
দূরে দূরে দুলে দুলে।
আকাশে বাতাসে তারায় তারায়
নিশীথ গগনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
রহিয়া রহিয়া বাজে,
চির-পরিচিতা এলে যে স্বপনে
অসম্ভবের সংঘটনায়,
আপন গোপন লাজে ?

হলুদ মাখানো সরিষার ক্ষেতে
যে রাখাল ছেলে দূরে বনে বনে
ঘুরে ঘুরে মরে একা,
মটর-সুঁটির লতার বাঁধনে
নাম ধরে তোমা নিয়ত ডাকিতে
বাঁশীটি যাহার শেখা।

হলুদ-বরণী রাজার কুমারী
অবচেতনায় গোপনে স্বপনে
নিশীথে দিয়েছ ধরা,
মেঠো বাঁশীখানি হাসিয়া কাঁদিয়া
গগনে পবনে নিখিল ভুবনে
সুরে সুরে তাই ভরা।

ফাগুন এলো

শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অশোক ফুলের পাঁপড়ী মেখে
রঙিন বেশে ফাগুন এলো ;
পলাশ-বধূ দে লো তোদের
পাঁপড়ী-পাতা মেলিয়ে দে লো
এলো ফাগুন উতল বায়ে—
উড়িয়ে আঁচল, আদুল গায়ে,
কৃষ্ণচূড়া বরণ-ডালায়
রক্ত-কেশর সাজিয়ে নে লো ?
অশোক ফুলের পাঁপড়ী মেখে—
রঙিন বেশে ফাগুন এলো।

অবাক হয়ে কুঞ্জ-বীথি
দেখ্‌লো চেয়ে নয়ন তুলি,
সরম ভাঙি ফুল-বধূরা
দোদুল বায়ে উঠ্‌লো দুলি'।
সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে
বসন্ত-দূত কোকিল হাঁকে,
দীঘির জলে কুমুদ মেয়ে
আড় চোখে চায় ঘোম্‌টা খুলি,
অবাক হয়ে কুঞ্জ-বীথি
দেখ্‌লো চেয়ে নয়ন তুলি।

আকাশ পবন উতল হোলো
বিহগ-বধূর গানে গানে,
লতায় লতায় জড়াজড়ি
কইছে কথা এ ওর কানে।
হেনার বুকে সুবাস জাগে,
যূথির প্রাণে চমক লাগে,
আড়ুরে ওঠা কুমড়ো কলি
ঘাড় তুলে চায় সরস প্রাণে ;
আকাশ পবন উতল হোলো—
বিহগ-বধূর গানে গানে।

বিলের জলে নধর কচি
এলায় দেহ কল্‌মিলতা
সুযোগ বুঝে গাছটি ধরে
শুশ্‌নি-বধূ কইছে কথা
পেঁপে ফুলের গেলাস ভরি'
মৌ বধূ মৌ করছে চুরি,
পাগল হাওয়ার উতল বুকে
জাগ্‌ছে আজি করুণ ব্যথা—
বিলের জলে নধর কচি
এলায় দেহ কল্‌মিলতা।

ফাগুন এলো ঘুমুর পায়ে
দেবদারুদের গহন বনে।
শঙ্খ বাজায় কোকিল-বধূ
নিম্ব-শাখে হরষ মনে।
বন-তটিনীর উলুধ্বনি
শুষ্ক বনে উড়্‌ছে রণি'
কবি এসব দেখ্‌ছে বসে
কাঁপ্‌ছে হৃদয় ক্ষণে ক্ষণে ;
ফাগুন এলো ঘুমুর পায়ে
দেবদারুদের গহন বনে।

সাময়িক প্রসঙ্গ ও আলোচনা

বর্ত্তমান বর্ষের পাটচাষ

বাঙ্গালার গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান বর্ষে অর্থাৎ ১৯৪৩-৪৪ সালে, ১৯৪০-৪১ সালে যে পরিমাণ জমিতে পাট চাষ হইয়াছিল তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ জমিতে পাটচাষ হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন। প্রকাশ, ১৯৪০ ৪১ সালে ৪,৯৪ মিলিয়ন একর জমিতে পাট চাষ হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষের নিমিত্ত যে পরিমাণ জমি পাটচাষের জন্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, বিগত বর্ষে তাহার দ্বিগুণ জমিতে পাটচাষ হইয়াছিল। বাঙ্গালায় যেরূপ অন্নাভাব দেখা দিয়াছে, তাহাতে পাট লাভজনক পণ্য হইলেও, ধান্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং আমরা গভর্ণমেণ্টের এই সাধু সঙ্কল্প সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আরও একটা কথা ভাবিবার আছে। পাট বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। পাট হইতে বাঙ্গালা প্রতিবৎসর প্রভূত পরিমান অর্থ পাইয়া থাকে। এই সার্ব্বজনীন দুর্ম্মূল্যের বাজারে পাটজাত অর্থ হইতে এতটা বঞ্চিত হইয়া বাঙ্গালায় যে আর্থাভাব দেখা দিবে তাহার পূরণ হইবার উপায় কি? বিক্রয়-ব্যবস্থার সংশোধন এজন্ম একান্ত প্রয়োজন বলিয়াই আমরা মনে করি।

সরিষা রপ্তানির নিষেধাজ্ঞা

ভারতরক্ষা আইনের বিধানানুসারে বাঙ্গালার গভর্ণমেণ্ট নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, অতঃপর কলিকাতা সংস্পৃষ্ট কোন ব্যবসায়-কেন্দ্র হইতে কলিকাতার রাজনৈতিক সরবরাহ বিভাগের কণ্ট্রোলারের অনুমতি ব্যতীত কেহ সাধারণ সরিষা বা রাই সরিষা উক্ত এলাকার বাহিরে রপ্তানি করিতে পারিবে না। যদি কেহ এই আদেশ অমান্য করিয়া রপ্তানি করে, তাহা হইলে কণ্ট্রোলার মাল আটক করিয়া ইচ্ছা করিলে তাহা বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

বিমান ক্রয়ে ভারতের বদান্যতা

যুদ্ধারম্ভের পর এযাবৎ ভারতবর্ষ রয়াল এয়ার ফোর্স ও ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স-এর ব্যবহারার্থ যুদ্ধ-বিমান ক্রয়ের জন্ম প্রায় ৬ কোটি ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছে। এই বিপুল অর্থরাশি কেবল মা-লক্ষ্মীর বর-পুত্রেরাই দান করেন নাই, ইহার মধ্যে যাহারা দুঃখী দিন-মজুর, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবিকার্জ্জন করে তাহাদের রক্তবিন্দুতুল্য উপার্জ্জনের ভাগও আছে।

মৃত্যুদণ্ডের নূতন আইন

বিগত ১৩ই জানুয়ারী তারিখে ১৯৪২ সালের প্রবর্ত্তিত অর্ডিনান্স সংশোধন করিয়া এক নূতন আদেশ জারী করা হইয়াছে। ঐ আদেশ বলে প্রাদেশিক সরকারসমূহকে এইরূপ ক্ষমতা দান করা হইয়াছে যে, অতঃপর তাঁহারা ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক বস্তুসমূহ সম্বন্ধীয় আইনের (Explosive Substances Act.) ৩, ৪ ও ৫ ধারানুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিবেন। উপরোক্ত ৩, ৪ এবং ৫ ধারার অভিযোগ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, যে, যাহারা কাহারও জীবন বা কোনরূপ সম্পত্তি বিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে বিস্ফোরক বস্তুর সাহায্যে বিদারণ ঘটাইবে অথবা উক্ত কার্য্যের চেষ্টা করিবে, অথবা কাহারও জীবন বা কোনরূপ সম্পত্তি বিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে, এমন কি সন্দেহজনকভাবেও, কোনরূপ বিস্ফোরক বস্তু প্রস্তুত করিবে বা কাছে রাখিবে, তাহারাই এই সকল ধারার আমলে থাকিবে।

গভর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক কংগ্রেসের ৭০০০০৲ টাকা বাজেয়াপ্ত

বোম্বাইর গভর্ণমেণ্ট সংশোধিত ফৌজদারী আইনানুসারে বাচারাজ এণ্ড কোম্পানীর উপর এক আদেশ জারী করিয়া

জানাইয়াছেন যে, গভর্ণমেণ্ট উক্ত কোম্পানীর পরিচালনাধীন শীতলপুর জেলায় অবস্থিত হিন্দুস্থান সুগার মিল লিঃ নামক চিনির কলে নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির যে ১০০০০৲ টাকা আমানত আছে তাহা বাজেয়াপ্ত করিতে মনঃস্থ করিয়াছেন। পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, বর্ত্তমানে কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের কাছে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান।

সেভিংস ব্যাঙ্কে সঞ্চয় বৃদ্ধির সুবিধা

লোকের সঞ্চয়শীলতাকে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৪৩ সালের এই ফেব্রুয়ারী মাস হইতে গভর্ণমেণ্ট সাধারণকে বৎসরে পোষ্ট আফিসের সেভিংস ব্যাঙ্কে দেড়হাজার টাকা পর্য্যন্ত জমা রাখিবার অনুমতি দিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে পোষ্ট আফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে বৎসরে সাড়ে সাতশত টাকার বেশী রাখা চলিত না। উৎসাহবাণী বড়ই দুঃসাহসিক! এই সময়ে সঞ্চয়. ত' দূরের কথা সাধারণ লোকের বাঁচিয়া থাকাই দায় হইয়া পড়িয়াছে।

ফুটা পয়সা

'ফুটা পয়সা' এতকাল ছিল একটা অসম্ভব গালি বিশেষ। আজ সেই অসম্ভব গালিটাই আমাদের বরাতের জোরে সম্ভব হইল। বাজারে হালে যে ফুটা পয়সা বাহির হইয়াছে তাহার মধ্যস্থ ছিদ্র দিয়া যেমন তেমন বালকের আঙ্গুল গলে। যাই হোক, নাই মামার চেয়ে কানা মামাও ভাল। বাজার হইতে পয়সার তিরোভাবে সাধারণের বিকিকিনির যে দারুণ অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছিল ইহার শুভাগমনে তাহার ত' নিরাকরণ হইবে। তবে একদিন টাকায় রজতাভাব দেখিয়া যাঁহারা পয়সার উপরে 'রজতমূল্য তাম্রখণ্ড' বলিয়া দক্ষিণা-বাক্যের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, সেই সব সনাতনী হিন্দু সন্তানদিগের মানসিক পবিত্রতা এই ফুটা পয়সায় রক্ষিত হইবে ত' ?

হুরদস্যুর নৃশংসতা

বিগত ২০শে জানুয়ারী তারিখে করাচী হইতে হুর দস্যুর এক নৃশংস অত্যাচারের সংবাদ বাহির হইয়াছে। প্রকাশ, পাঁচমরি গ্রামের কোয়াবুল নামক এক ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হুরগণের গোপনীয় তথ্য প্রকাশ করিয়া দেওয়ায় হুরগণ তাহার বাড়ীতে হানা দিয়া তাহার নাক, কাণের লতি ও ওষ্ঠদ্বয় কাটিয়া দিয়াছে এবং তাহার স্ত্রী তদীয় অলঙ্কারগুলি দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাহাকেও হত্যা করিয়াছে। এই হুরগণ পীর পাগারোর সাগরেত।

শবদাহের ব্যয় বৃদ্ধি

সবই যখন বাড়িয়াছে, শবদাহের ব্যয়ই বা বাড়িবে না কেন? সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের হেল্‌থ অফিসার এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন যে, শবদাহ সম্পর্কিত প্রত্যেক জিনিষেরই মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং তদুপরি মজুরদিগের পরিশ্রমের হারও অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় বাধ্য হইয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের এলাকাধীন কলিকাতার যাবতীয় শ্মশানঘাটে শবদাহের হার শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করা হইল। অর্থাৎ যাহা ছিল, বর্ত্তমানে তাহার দেড়গুণ করা হইল। অবশ্য এই ব্যবস্থা অস্থায়ী। জিনিষ-পত্রের দাম, এবং শ্রমিকের মজুরীর হার কমিলেই এ ব্যবস্থাও হয় ত' রদ হইবে।

বাঙ্গালা সরকারের বদান্যতা

মেদিনীপুরের বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলগুলির পরীক্ষামূলক সাহায্য কল্পে বাঙ্গালা সরকার এ যাবৎ চারি লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই টাকা দ্বারা বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলির রাস্তাঘাট মেরামত ও প্রস্তুত হইবে, চাষের পক্ষে প্রয়োজনীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইবে, যে সকল রাস্তা খাল ও পুকুর মজিয়া গিয়াছে তাহা পরিষ্কার করিয়া উদ্ধার করা হইবে, জলাশয়গুলি হইতে লোনাজল বাহির করিয়া দেওয়া হইবে এবং প্রয়োজনীয় স্থলে নূতন পুকুর ও দীঘি খনন করা হইবে ও জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত করা হইবে। যে সকল মজুর এই সব কার্য্যে নিযুক্ত হইবে তাহাদের মজুরী সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, তাহাদিগকে এই পরিমাণ মজুরী দেওয়া হইবে, যাহাতে তাহারা বর্ত্তমান বাজার দরের দেড়সের পরিমাণ চাউল তাহাদের দৈনিক লব্ধ মজুরী হইতে অনায়াসে ক্রয় করিতে সমর্থ হয়। সরকার এই রিলিফওয়ার্ক সম্বন্ধীয় কেরাণীর কার্য্য ও অধস্তন তত্ত্বাবধানের কার্য্যের জন্য অ-চাষী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত লোকদিগকে নিযুক্ত করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন।

হোগলার মেরাপ সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা

ভারতরক্ষা বিধানবলে বাঙ্গালাসরকার অতঃপর কলিকাতা অঞ্চলে ঘনসন্নিবিষ্ট সামিয়ানা, হোগলা, দরমা অথবা গোলপাতা দ্বারা মেরাপ বা ছাউনী বাঁধা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। এক হাজার স্কোয়ার ফুটের অধিক স্থানের উপরে উক্তরূপ মেরাপাদি বাঁধা প্রয়োজন হইলে পূর্ব্বাহ্নে কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের নিকট হইতে অথবা পুলিশ কমিশনারকর্ত্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হইতে অনুমতি লইতে হইবে। এইরূপ অনুমতি প্রদানের সর্ত্ত থাকিবে যে, যেস্থানে মেরাপাদি নির্ম্মিত হইবে সেস্থানে অগ্নিনির্ব্বাণের পর্য্যাপ্ত সুবন্দোবস্ত এবং আবৃতস্থানের চতুর্দ্দিকেই পরিষ্কার পথ থাকিবে। অধিকন্তু আবৃত স্থানের মধ্যেও যাহাতে লোকজন সহজে চলাফেরা করিতে পারে তাহারও সুবন্দোবস্ত রাখিতে হইবে। বিগত নভেম্বর মাসে উত্তর কলিকাতায় হালসি বাগানে যে দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে তাহার পুনরাবৃত্তি যাহাতে না হইতে পারে তাঁহার উদ্দেশ্যেই এই নিষেধাজ্ঞা।

পরলোকে বিকানীরের মহারাজা

গত ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে বিকানীরের মহারাজা তাঁহার বোম্বাইস্থিত বিকানীর হাউসে পরলোক গমন করিয়াছেন। সকাল প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় মহারাজার দেহত্যাগ হয় এবং বেলা ৯টার সময় এরোপ্লেন যোগে মৃতদেহ বোম্বাই হইতে বিকানীরে নীত হয়। সেই স্থানে অপরাহ্নে ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছে। সামন্ত-রাজগণের মধ্যে মহারাজা সকল বিষয়েই বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। বক্সার বিদ্রোহের সময় চীনের বিপক্ষে বৃটিশের অধীনস্থ সৈনিক হিসাবে তিনিই সর্ব্বাগ্রে ভারতের বাহিরে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। বিকানীরের উষ্ট্রসাদী সেনাদল তাঁহার বড় প্রিয় ছিল।

সিংহলে ভারতীয় মজুরের চাহিদা

সংপ্রতি রবার চাষের নিমিত্ত সিংহলে মজুরের খুব প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। এ জন্য সিংহলসরকারের প্রতিনিধি ব্যারণ জয়তিলক ভারত সরকারের নিকট কুড়ি হাজার ভারতীয় শ্রমিক চহিয়াছেন। ভারতসরকার এ সম্বন্ধে কি করিবেন তাহা তাঁহারাই জানেন। কিন্তু সিংহলের সহিত ভারতের সম্পর্কটা মোটেই মধুর নহে। ভারতীয়দিগের প্রতি সিংহলসরকারের বিসদৃশ ব্যবহারের কথাও ভারত গভর্ণমেণ্ট অনেক দিন হইতে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং আমরা জয়তিলকের এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিবার পূর্ব্বে ভারতসরকারকে ভারতীয়দিগের ইজ্জত ও স্বার্থের প্রতি একটু অবহিত হইতে বলি। ভারতীয় বণিক্ সমিতির পক্ষ হইতে এ সম্বন্ধে ভারতসরকারের উপকূল-বাণিজ্য সদস্যের নিকট টেলিগ্রাম মারফত যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতেও এই মতই জ্ঞাপন করা হইয়াছে। বণিক সমিতি বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে সিংহল সরকার কি শাসন বিভাগে, কি বিচার বিভাগে, সর্ব্বত্রই যেরূপ ভারত-বিদ্বেষী নীতির অনুসরণ করিতেছেন এবং যে ভাবে সিংহল-প্রবাসী অধিকাংশ ভারতীয়দিগের নাগরিকত্বের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া তাহাদিগকে অবমানজনক নানারূপ কঠোর অসুবিধার মধ্যে ফেলিয়াছেন, তাহাতে ভারতীয়দিগের আত্মমর্য্যাদার দিক হইতে এবং সিংহলে তাহাদের স্বার্থের দিক হইতে বিচার করিলে জয়তিলকের এ প্রার্থনা কোনমতেই মঞ্জুর করা চলে না।

অবশ্য বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য রবারের একান্ত চাহিদা বাড়িয়াছে। ওদিকে রবারের প্রধান ক্ষেত্রগুলি পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এখন বৃটিশ সরকারের বেহাত হইয়াছে, এমত অবস্থায় সিংহলের রবার চাষ ব্যাহত হউক, ইহা কাহারও ইচ্ছা হইতে পারে না। তবে ভারতীয়দিগের মান ইজ্জত ও স্বার্থকে বজায় রাখিয়া তাহা করা যখন অসম্ভব নহে, তখন সেদিকে অবহিত হইলেই ত' আর কোন গোল থাকে না। আরও একটা কথা, কোন কিছুর অভাব পড়িলেই যাহাদিগের ভারতের দ্বারে ছুটিয়া আসা ছাড়া গত্যন্তর নাই, তাহারা কিসের স্পর্দ্ধায় ভারতীয়দিগের প্রতি ঐরূপ বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে সাহসী হয়? এই সে-দিনও সিংহলের অন্ন-সমস্যা লইয়া এই জয়তিলকমহাশয়ই ভারতের দুয়ারে আসিয়া ধর্ণা দিয়াছিলেন। ভারত তাহার ভিক্ষার ঝুলি অপূর্ণ রাখে নাই। যার নুন খায় তার গুণও গাহিতে হয়। সিংহল সরকারের কি সে ভদ্রতা বা বোধটুকুও নাই?

তুর্কী সাংবাদিক মিশন

তুর্কী হইতে একদল সাংবাদিক ভারতের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভারত সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য

আসিয়াছেন। এই দলে আছেন তুরস্কের খ্যাতনামা ছয়জন অভিজ্ঞ ব্যক্তি, (১) এম, আতে, (২), এম, সাদেক, (৩) এম, মিনিমেনসিওগলু, (৪) এম, আরবেল, (৫) এম, বেল্‌জে, (৬) এম, ফিলেফ। এম, আতে এই দলের নায়ক হইয়া আসিয়াছেন। ১৬ই জানুয়ারী অপরাহ্ণে তাঁহারা জাহাজ হইতে করাচী বন্দরে ভারতের মাটিতে পদার্পণ করিয়াছেন। এই প্রতিনিধি দলের সকলেই তুর্কীর রাষ্ট্রব্যবস্থার সহিত কোন না কোনরূপে জড়িত। মোসলেম লীগের পক্ষ হইতে ইঁহাদের নিকট অনেক কিছু আশা করা হইয়াছিল। আর কিছু নাই হোক, হয় ত ইঁহারা জিন্নার সুপরিকল্পিত পাকীস্থান সমর্থন করিবেন, কিন্তু লীগের সে আশা পূর্ণ হয় নাই। আতে সাহেব লীগের আঁতে ঘা দিয়া শুনাইয়া দিয়াছেন যে, তাঁহারা রাষ্ট্রক্ষেত্রে ধর্ম্ম, জাতিভেদ বা দলাদলি পছন্দ করেন না। তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে তুর্কী তারপর মুসলমান। ধর্ম্ম যার যার নিজস্ব ব্যাপার, রাষ্ট্রের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না বা থাকা উচিতও নহে।

মরুবক্ষে রেলপথ নির্ম্মাণে ভারত-সেনার দক্ষতা

রুশিয়াকে ক্ষিপ্র গতিতে মাল যোগাইবার উদ্দেশ্যে ইরাকের দুরন্ত মরুভূমির বুকের উপর দিয়া ১২০ মাইল দীর্ঘ একটা নূতন রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। গত মাস হইতে এই রেলপথে মাল সরবরাহ কার্য্য চলিতেছে। এই রেলপথ নির্ম্মাণ করিয়াছে আমাদেরই ভারতীয় সৈনিকেরা। মরুভূমির প্রচণ্ড উত্তাপ, অগ্নিকণাতুল্য উত্তপ্ত বালুকার ঝড়-ঝাপ্‌টা ও সময় সময় মুষলধারায় বৃষ্টিপাত অগ্রাহ্য করিয়া যেরূপ ধৈর্য্য ও ক্ষিপ্রতার সহিত তাহারা দৈনিক গড়ে ১ মাইল হিসাবে এই রেললাইনের সম্পাদন-কার্য্য করিয়াছে তাহা বস্তুতঃই প্রশংসার বিষয়। ক্ষেত্র ও সুযোগ পাইলে ভারতীয়েরা যে, কোন বিষয়েই কাহারও অপেক্ষা পশ্চাৎপদ নহে, তাহা একাধিক ক্ষেত্রে প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের কর্ত্তৃপক্ষ ইহা বুঝিয়াও মানিয়া লইতে নারাজ। ইহাকে শাসক ও শাসিত উভয়েরই অদৃষ্টের পরিহাস ব্যতীত আর কি বলিব? আজ যে জাপান ভারতের দুয়ারে দাঁড়াইয়া হুঙ্কার ছাড়িতেছে, দুই বৎসর পূর্ব্বেও ভারতকে বিশ্বাস করিয়া যুদ্ধের উপযোগী করিয়া তুলিলে ইহা সম্ভব হইত কি? সমগ্রভাবে রণসজ্জিত ভারতের প্রচণ্ড প্রতাপে সত্যই জাপান ছয়ঘণ্টার মধ্যে প্রশান্তসাগরের বুকে বিলীন হইয়া যাইত।

চীনের দৈন্য-সমস্যা

ইংলণ্ডের চৈনিক দূত মিঃ ওয়েলিংটন কু'র পত্নী মিস্ ওয়েলিংটন কু সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, চীনসরকার মিতব্যয়িতার চরম সীমায় পৌছিয়াছেন। এখনও যদি আমেরিকা চীনের জনসাধারণের জন্য ও তথা যুদ্ধের জন্য মাল পাঠাইতে বিলম্ব করে তবে চীনের রাষ্ট্রতন্ত্র একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

মৈত্রীর প্রতিদান

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে চীনের সহিত সন্ধিসূত্রে ইটালী তিয়েনসিন পোর্টের উপর স্বত্বাধিকার পাইয়াছিল। সম্প্রতি জাপ মৈত্রীর নিদর্শনস্বরূপ সে এই স্থানের স্বত্বাধিকার জাপ তাবেদার নানকিন গভর্ণমেণ্টকে প্রত্যর্পণ করিয়াছে। চিয়াং-কাইশেকের বিরুদ্ধে নানকিন সরকারের শক্তিবৃদ্ধি ও জাপানের মনস্তুষ্টি এই উভয়ই ইহার উদ্দেশ্য। সাধু!

নাক ডাকায় নকরী হইতে বরখাস্ত

নিদ্রাবস্থায় খুব জোরে নাক ডাকার অপরাধে লিওনার্ড উইলিয়ম নামক এক জন মার্কিণ সৈনিকের চাকরী গিয়াছে। লিওনার্ড উইলিয়ম ক্যালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত ফ্রেসনো নামক স্থানের মার্কিণ সেনাদলে কাজ করিত। বেচারার নাসিকা ধ্বনি নাকি এমনই অদ্ভুত গুরুতর রকমের যে, নিদ্রাবস্থায় তাহার নাসিকাধ্বনি শুনা না যায় এমন স্থান পাওয়াই দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছিল; অথচ তাহার নাসা-গর্জ্জনের সীমান্তের মধ্যে তিষ্ঠানও দায় হইয়াছিল। ইহাকেই বলে খোদার মার!

মার্কিণের দৈনিক জাহাজ নির্ম্মাণের হার

মার্কিণ নৌ কমিশনের চেয়ারম্যান মিঃ এমরিস ল্যাণ্ড সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, মার্কিণ যুদ্ধসম্ভার উৎপাদক গোডের মজুত ইস্পাত হইতে এ বৎসর গড়ে দৈনিক সাড়ে পাঁচ খানা হিসাবে মোট ১ কোটি ৬০ লক্ষ টনের জাহাজ তৈয়ারী হইতে পারিবে। জার্ম্মাণ সাবমেরিণ ও ইউবোটগুলির

উপদ্রব যেরূপ ক্রমবর্দ্ধিত হারে দেখা দিয়াছে তাহাতে জাহাজ তৈয়ারীর মাত্রা এরূপ না বাড়িলে ত' আশঙ্কারই কথা।

জার্ম্মাণ সাবমেরিণ

জার্ম্মাণ সাবমেরিণ ও ইউবোটগুলিই নাকি এখন হিটলারের একমাত্র ভরসা ও যুদ্ধজয়ের একমাত্র অবলম্বন। তাই হিটলার কিছুদিন যাবৎ এই সাবমেরিণ উপদ্রব এরূপ অসম্ভব রকমে বৃদ্ধি করিয়াছেন, যাহার ফলে ইঙ্গমার্কিণ জলপথ বিপন্ন হইয়া পড়িবার আশঙ্কা কতকটা দেখা দিয়াছে। কেহ কেহ এমনও বলিতেছেন যে, সাবমেরিণ ও ইউবোটের এই উপদ্রব নিবারণ করিতে না পারিলে যুদ্ধজয়ের আশা নাই। অবশ্য, মিত্রশক্তিও এসম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত হইতেছেন। সাবমেরিণের উপদ্রব বৃদ্ধির সঙ্গে সাবমেরিণের উৎপাদনহারও জার্ম্মাণী বাড়াইয়া দিয়াছে। প্রকাশ, বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীতে গড়ে এক-খানা করিয়া সাবমেরিণ দৈনিক প্রস্তুত হইতেছে। যুদ্ধারম্ভের সময় জার্ম্মাণীর সাবমেরিণ সংখ্যায় যাহা ছিল, বর্ত্তমানে তাহার অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী, তাহার উপর এইরূপ প্রত্যহ একখানা করিয়া যোগ হইতে থাকিলে সমুদ্রপথে জাহাজের চলাফেরা যে একান্তই বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

জলপথে মার্কিণের মোট লোকক্ষয়

এযাবৎ জলপথে অর্থাৎ নৌযুদ্ধে ও সওদাগরী জাহাজ ডুবি ইত্যাদিতে মার্কিণের মোট ২২, ২২৮ জন লোক হতাহত ও নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে। হত হইয়াছে ৬৪০৩ জন, আহত হইয়াছে ৩৯১৩ জন এবং নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে ১১৯১১ জন।

কাসাব্লাঙ্কা কনফারেন্স

রাষ্ট্র জগতে হালে যে সব ঘটনা ঘটিয়াছে কাসাব্লাঙ্কা কনফারেন্সই তাহার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আতলান্তিক সাগরতীরবর্ত্তী আফ্রিকার এই কাসাব্লাঙ্কা বন্দরে চার্চ্চিল-রুজভেল্টের অপূর্ব্ব মিলন এবং ইঙ্গ-মার্কিণ সমরনায়কদের ও যুদ্ধবিশারদগণের সহিত সপ্তাহব্যাপী সুদীর্ঘ আলোচনা ও ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ এই কনফারেন্সে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সকলেই একমত হইয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছেন। আলোচনার বিস্তৃত বিবরণ বর্ত্তমানে প্রকাশ্য নহে।


মিঃ চার্চ্চিল


মিঃ রুজভেল্ট

তবে আলোচনায় ইহা স্থির হইয়াছে যে, শত্রুপক্ষকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করাই মিত্রপক্ষের একান্ত ও সুদৃঢ় সঙ্কল্প এবং যত দিনই লাগুক এবং যত কঠোরই ইহা হউক মিত্রপক্ষ সঙ্কল্প সিদ্ধ না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না।

কনফারেন্সে ষ্ট্যালিন বা চিয়াং কাইসেক অথবা তাঁহাদের পক্ষ হইতে কোন প্রতিনিধি উপস্থিত হন নাই। ইহা বস্তুতঃই লক্ষ্য করিবার বিষয়। অবশ্য, ইহার কৈফিয়ৎ দেওয়া হইয়াছে যে, ষ্ট্যালিন ও চিয়াং উভয়েই বিব্রত, এসময়ে স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশে যাওয়া তাঁহাদের পক্ষে কোন মতেই সম্ভবপর ছিল না। এ শুষ্ক কৈফিয়তে সকলের মন ভিজিবে কি ?

সমর সংবাদ

রুষ সীমান্ত—যেরূপ সংবাদ প্রত্যহ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে মনে হয় যে, সোভিয়েট সেনার মরণপণ দুর্জ্জয় আক্রমণের সম্মুখে জর্ম্মাণেরা কোথাও আর তিষ্ঠিতে পারিতেছে না। সর্ব্বত্রই জার্ম্মাণদের বিপুল ক্ষতি, অসংখ্য লোকক্ষয় ও দারুণ পরাজয় ক্রমাগতই ঘটিতেছে। ষ্ট্যালিনগ্রাড জার্ম্মাণ-দের কবলমুক্ত হইয়াছে। ককেসাস অঞ্চল হইতেও জার্ম্মাণেরা প্রায় বিতাড়িত। গত গ্রীষ্মে যে কার্চ্চ প্রণালী অতিক্রম করিয়া জার্ম্মাণেরা প্রলয় তাণ্ডবে ককেসাস অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছিল এখন আবার সেই কার্চ্চ পার হইয়াই তাহারা সঙ্গের পোটলা-পাটলি ফেলিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইতেছে। ইহা জার্ম্মাণজাতির অদৃষ্টের পরিহাস, না জার্ম্মাণ-বাহুর দুর্ব্বলতা তাহা সঠিক বুঝিবার উপায় নাই। যাহা হউক, সমগ্রভাবে রুষ সীমান্তের যুদ্ধের প্রতি লক্ষ্য করিলে একটা বিষয় বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। মনে হয় যে, যুদ্ধটা যেন দক্ষিণাঞ্চলে অর্থাৎ ককেসাসের তৈলাঞ্চল, ষ্ট্যালিনগ্রাড প্রমুখ শিল্পাঞ্চলগুলি এবং ডন উপত্যকা ও

ইউক্রেণের সমৃদ্ধ শস্যাঞ্চলগুলির উদ্দেশ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। লেনিনগ্রাড হইতে মস্কোর দক্ষিণেও কিছুদূর পর্য্যন্ত স্থান যেন ঝিমাইতেছে। কোনপক্ষেরই রণ-দামামার আর তেমন গর্জ্জন শুনা যাইতেছে না। ষ্ট্যালিন-গ্রাড-ককেসাস অঞ্চল হইতে ডন উপত্যকা ধরিয়া ইউক্রেন পর্য্যন্ত ভূভাগের গুরুত্ব যে রুষ জাতির পক্ষে বস্তুতঃই অত্যন্ত অধিক, অন্ততঃ বর্ত্তমানে গুরুতরভাবে অনুভূত হইতেছে, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং এই অঞ্চল উদ্ধার করিবার জন্য রুষজাতি তাহার প্রাণপণ চেষ্টা না করিয়াই পারে না। সমগ্র সোভিয়েট অধিকারের মধ্যে উপরোক্ত অঞ্চলগুলিই সমৃদ্ধ। বিশেষতঃ ডন উপত্যকা ও ইউক্রেনের শস্যসম্ভার হইতে বঞ্চিত হইয়া চৌদ্দ, পনর কোটী রুষ বেশীকাল বাঁচিতেই পারে না। রুষকে বাঁচিতে হইলে এই অঞ্চলও তাহার উদ্ধার করিতেই হইবে। সম্ভবতঃ, সেই একমাত্র কারণেই আজ সোভিয়েট সেনা উন্মত্তের মত মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সর্ব্বশক্তি নিয়োগে এই অঞ্চলগুলির উদ্ধার সাধনেই ব্রতী হইয়াছে। বস্তুতঃ এই সব অঞ্চল হাতছাড়া হইলে জার্ম্মাণদের যতটা বিপদ হইবে, উদ্ধার করিতে না পারিলে রুষিয়ার বিপদ হইবে তাহার বহুগুণ বেশী।

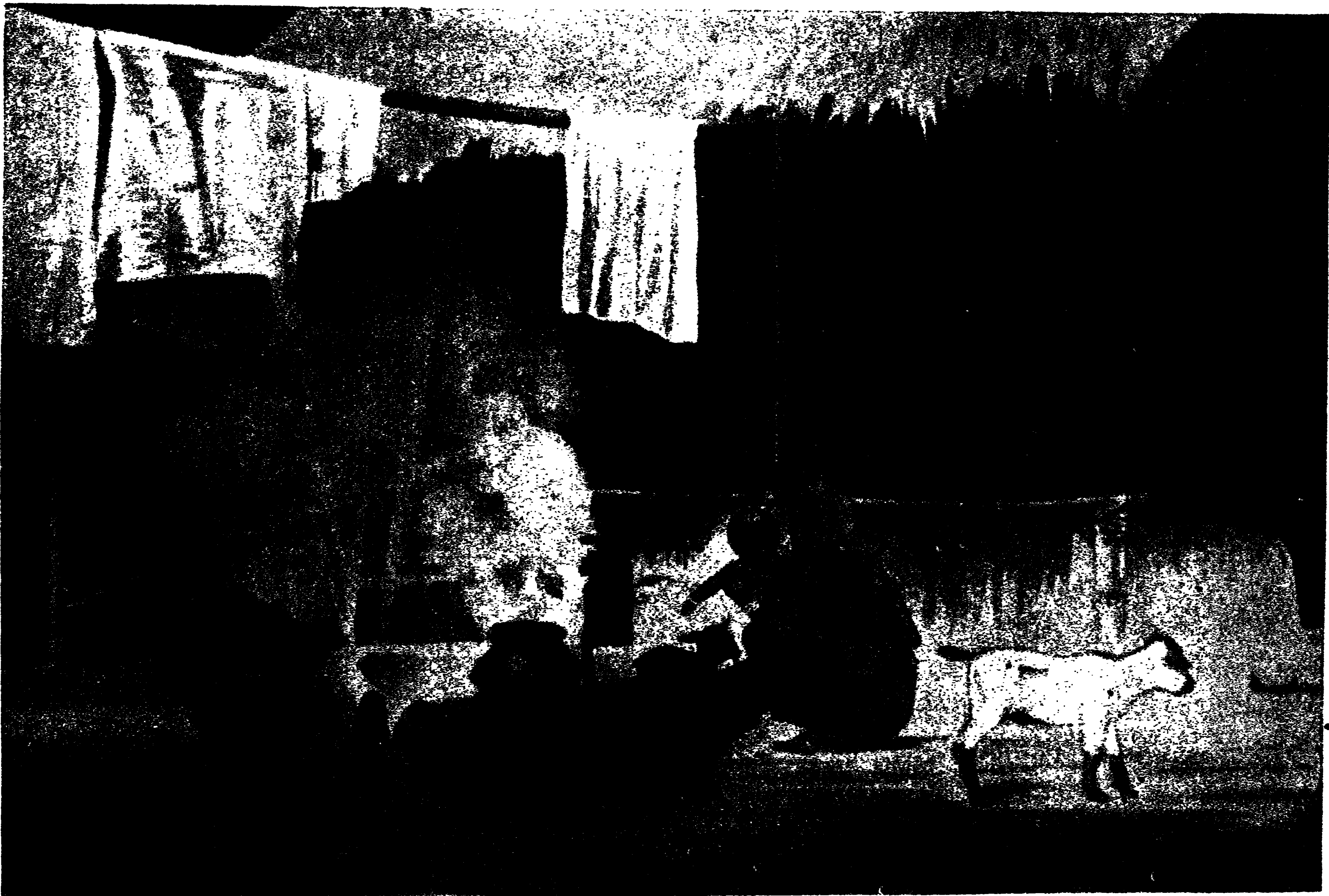
অন্যান্য সীমান্ত—উত্তর আফ্রিকা, প্রশান্ত সাগরাঞ্চল, ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত প্রভৃতি কোন স্থানেরই সংবাদ বিশেষ কিছুই নাই। মামুলি খবর যেমন আসে তাই আসিতেছে। টিউনিসিয়া সীমান্তে মিত্রপক্ষ তিনদিক হইতে জার্ম্মাণদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রবলভাবে প্রস্তুত হইতেছে। সলোমান দ্বীপপুঞ্জের যুদ্ধে জাপানীরা হটিয়া গিয়াছে। ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে আরাকান অঞ্চলে আক্রমণ চলিয়াছে। ব্রহ্মদেশের উপরে বিমান আক্রমণের বিরাম নাই—ইত্যাদি, ইত্যাদি। মোটের উপর পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয় যে, উভয় পক্ষই মতলব আঁটিতেছে ও ফাঁক খুঁজিতেছে, যে কোন মুহূর্ত্তে সর্ব্বত্রই প্রলয় তাণ্ডব আরম্ভ হইতে পারে।

জাগৃহি

শ্রীপ্রসাদ দাস মুখোপাধ্যায়

হে আমার দেশ,
জীবন বাঁচাতে গিয়ে জীবনেরে করিয়াছ শেষ,
প্রতি পদে নিষেধের বাধা মেনে মেনে,
অখণ্ডের মধ্য দিয়া বিভাগের রেখা টেনে টেনে,
দৃষ্টি তব হয়ে গেছে ক্ষীণ,
অতীতের রাজরাণী—হে মোর ভারত—
তাই তুমি সম্বল-বিহীন।
মৃত্যুরে করেছ যবে ভয়
মৃত্যু সেই দিন হ'তে তোমার সর্ব্বস্ব নিলো হরি'
নিলো করি জয়।

মরণ বেলায় তুমি—আজও আঁখি
খোলো হতভাগী
রিক্ত চিত্ত পুনর্ব্বার নবরাগে
তোলো দীপ্তরাগী
এখনও সময় আছে, জাগো তুমি
জাগো দেবী অগ্নি
মৃত্যুরে ভ্রুকুটি হানি হও নারী
হও মৃত্যুঞ্জয়ী
দেহের পীড়নে কভু মরেনাকো কোথা কোনও জাতি,
অন্তরের মৃত্যু হ'লে-মৃত্যু তা'র ধ্রুব শীঘ্রগতি।



গৃহ-শ্রী

শ্রীকমলারঞ্জন ঠাকুর

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিণাং প্রাণদায়িনী"



চৈত্র—১৩৪৯

১০ম বর্ষ ২য় খণ্ড—৪র্থ সংখ্যা

মাথুর

শ্রীকালিদাস রায়

নামে অক্রুর কিন্তু যাহার মত ক্রূর কেহ নাই সে ব্রজপুরে আসিয়াছে শ্যামকে মথুরায় লইয়া যাইবার জন্য। শ্রীমতী তখনও জানেন না, কিন্তু Coming events cast their shadows behind. শ্রীমতী ভাবিতেছেন—কোন দিকে ত' অকুশল নাই তবে—'চমকি উঠয়ে কাহে হিয়া বেরি বেরি।' এক সহচরীর সঙ্গে দেখা হইল—"মোহে হেরি সো ভেল সজল নয়ান।" ইহার কারণ কি?

মথুরা হইতে কে যেন বৃন্দাবনে আসিয়াছে। কেন আসিয়াছে কে জানে?

"তাহে হেরি কাহে জিউ কাঁপি
তব ধরি দখিন পয়োধর কুরয়ে লোরে লোচন যুগ ঝাঁপি।"

একটা বিষাদের ছায়া সর্ব্বত্র। "কুসুমিত কুঞ্জে ভ্রমর নাহি গুঞ্জরে সঘনে রোয়ত শুকসারি।" আসল কথা বেশীক্ষণ চাপা থাকিল না। সখীরা গোপন করিলে কি হইবে? শ্যামের সঙ্গে কুঞ্জে শ্রীমতীর শেষ সাক্ষাৎ হইল। বৃন্দাবন ত্যাগ করিতে হইবে—রাইকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে—শ্যামের নীরদ-নয়নে ঢর ঢর অশ্রু ঝরিতেছে। শ্রীমতী কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন—তখনও আশা আছে, ভাবিলেন বুঝি—"শ্যামের অভিমান হইয়াছে।" "যবহু পুছলুঁ বেরি বেরি সজল নয়নে রহু হেরি।" আজিকার এ মিলন বিরহ অপেক্ষা বহু গুণে করুণ ও দারুণ। চুম্বনের অমৃত-রস অশ্রুজলে লবণাক্ত। "নিবিড় আলিঙ্গনে রহু পুন ধন্দ। দরদর হৃদয় শিথিল ভুজবন্ধ।" আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় রাগরসের কি অদ্ভুত অভিব্যক্তি! কামনালেশ-শূন্য নির্লালস প্রেমের অবিমিশ্র রূপ শিথিল ভুজবন্ধে আত্মপ্রকাশ করিল। 'রভসরস কেলি'র সে উন্মাদনা কোথায় গেল? "আনহি ভাতি রভস রস কেলি।"

সখীদের সঙ্গে দেখা হইল। রাধা বলিলেন—"তুহু পুন কি করবি গুপতহি রাখি। তনু মন তুহু মঝু দেয়ত সাখী। তব কাছে গোপসি কি কহব তোয়। বজর কি বারণ করতলে হোয়।" হাত দিয়া কি বজ্র ঠেকানো যায়। কালিন্দী দেবীকে বল—তাহার পিতাকে (সূর্য্যদেবকে) ধরিয়া রাখুক—কাল যেন প্রভাত না হয়। আর সে যদি তাহা না পারে, তবে তাহার ভ্রাতা অর্থাৎ যমকে পাঠাইয়া দিক। শ্রীমতী পরক্ষণেই বলিলেন—'না না—

গমনক সময়ে রোধক জনি কোয়
পিয়াক অমঙ্গল যদি পাছে হোয়!

আমার যাহা হয় হইবে, প্রিয়ের অমঙ্গল না হয়।" শ্রীমতী চিত্তের দৃঢ়তা রাখিবার বৃথা প্রয়াস করিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"রজনী প্রভাত হৈলে কার মুখ চাব!"

"যাহে লাগি গুরু গরজনে মন রঞ্জলুঁ দুরজনে কিয়ে নাহি কেল।
যাহে লাগি কুলবতি বরত সমাপলুঁ লাজে তিলাঞ্জলি দেল॥"

সে কেমন করিয়া আমাকে ত্যাগ করিবে? ইহা কি সম্ভব? আবার

"যো মঝু সরস পরশ রস লালসে মণিময় মন্দির ছোড়ি।
কণ্টক কুঞ্জে জাগি নিশি বাসর পন্থ নেহারই মোরি॥"

সে তাহার প্রিয়তমাকে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিয়া যাইবে—একি সম্ভব?"

শ্রীমতী "উরপর করাঘাত হানিতে হানিতে" মূর্চ্ছিত হইলেন। শ্যাম অক্রুর চলিয়া গেলেন। সখীরা উচ্চস্বরে কানে বলিতে

লাগিল—তাহাতে সংজ্ঞা ফিরিল। কিন্তু তাঁহার "বিরহক ধূমে ঘুম নাহি লোচনে মুছত উতপত বারি।" তিনি ভাবিতে লাগিলেন—'কানু নহ নিঠুর চলত যো মধুপুর মঝু মনে এ বড় সন্দেহ।" তাহার প্রেম কিসে শিথিল হইল? "পিয়া বড় বিদগধ বিহি মোরে বাম।"

তারপর শ্রীমতীর দিব্যোন্মাদ—

খেনে উচ রোয়ই খেনে পুন ধাবই খেনে পুন খল খল হাস।
চীত পুতলি সম খেনে পুন হোয়ই প্রলাপই খেনে দীর্ঘশ্বাস।

[এই দিব্যোন্মাদই শ্রীচৈতন্যের জীবনেও প্রকটিত হইত। নরহরি গৌরাঙ্গের দিব্যোন্মাদ লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"রাধার পিরিতি হৈল হেন"।]

শ্রীরাধা বড় ক্ষোভেই বলিতেছেন—

"সাগরে তেজব পরাণ। আন জনমে হব কান।
কানু হোয়ব যব রাধা তব জানব বিরহক বাধা॥"

কানু রাধা হইয়া না জন্মিলে বিরহের দুর্বিসহ বেদনা উপলব্ধি করিবে না। বৈষ্ণব মনীষীরা বলেন শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে রাধার এই অভিশাপ ফলিয়াছে।

নিজের এই হাহাকারে লজ্জা পাইয়া শ্রীমতী বলিতেছেন —'শ্যাম চলিয়া গেল—দুই চোখ মেলিয়া তাহাই দেখিলাম। শূন্য গৃহে ফিরিয়া আসিলাম—তবু প্রাণ বাহির হইল না। কি নির্লজ্জ এই জীবন! "না যায় কঠিন প্রাণ ছার নারী জাতি।" "কণ রহু জীবন বড় ইহ লাজ।"

"দেখ সখি নীলজ জীবন মোর পিরীতি জানয়ত অব থন মোয়।"

কৃষ্ণহীন জীবনের মূল্য কি? "কানু বিনে জীবন কেবল কলঙ্ক।" এতদিনে বুঝিলাম—"চপল প্রেম থির জীবন দুরন্ত।" জীবন কিছুতেই যাইতে চায় না। ইচ্ছা করিয়া এ জীবন বিসর্জ্জন করাও যায় না। কারণ, আশা ত' ত্যাগ করা যায় না।—"তাহে অতি দুরজন আশ কি পাশ।" কিন্তু আশা রাখিয়াই বা লাভ কি? আশাই বা কতদিন রাখিব?

"অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব কি করব বারিদ মেহে।
এ নব যৌবন বিরহে গোয়ায়লুঁ কি করব সে পিয়া লেহে।"

যৌবন গেলে প্রিয়ের প্রসাদ লইয়াই বা কি করিব? "কনয়া বিহনে মণি কবহু না হৃদয়ে সাজ।" যৌবন বিনা প্রেমের মূল্য কি?

"সরজিস বিনু সর সর বিনু সরসিজ কী সরোসিজ বিনু সুরে।
জৌবন বিনু তনু তনু বিনু জৌবন কী জৌবন পিয়া দূরে॥"

শ্রীমতী একবার ভাবিলেন—

"মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে ভ্রমিব যোগিনী হইয়া।
কারু ঘরে যদি মিলে গুণনিধি বাঁধিব বসন দিয়া।"

এই কথা মনে করিয়াই তাঁহার দরদী অন্তরে ব্যথা বাজিল—

"বাঁধিব কেমনে সে হেন দুলহ হাতে।
বাঁধিয়া পরাণে ধরিব কেমনে তাহা যে ভাবিছি চিতে॥"

শ্রীমতী আবার ভাবিতেছেন—জীবনে প্রিয়তমকে আর পাওয়া যাইবে না—কিন্তু মরণে ত' পাওয়া যাইতে পারে। মরণে এ দেহ ত' পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে। তখন ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোমের মধ্য দিয়া যেন তাঁহারে পাই।

যাঁহা পহু অরুণ চরণে চলি যাত। তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত॥
... ...
যো সরোবরে পহু নিতি নিতি নাহ। মঝু অঙ্গ সলিল হোই তথি মাহ॥
... ...
যো দরপণে পহু নিজ মুখ চাহ। মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথি মাহ॥
... ...
যো বীজনে পহু বীজই গাত। মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃদু বাত॥
... ...
যাঁহা পহু ভরমই জলধর শ্যাম। মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম॥

এই ভাবে শ্যামকে পাইলে বিরহ-মরণের দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া যাইতে পারে। গোবিন্দ দাস একটি সংস্কৃত শ্লোকের ভাব লইয়া এই অপূর্ব্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্লোকটি এই—

পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশন্তু স্ফুটং
ধাতারং প্রণিপত্য হন্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বরং।
তদ্বাপীষু পয়স্তদীয়মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গনে
ব্যোম্নি ব্যোম তদীয়বর্ত্মনি ধরা তত্তালবৃন্তেঽনিলঃ॥"

শ্রীমতী বৃন্দাবনের বনপথ-প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন—সর্ব্বত্রই দেখিতেছেন—লীলা-মাধুরীর স্মৃতি! শ্রীমতী বলিতেছেন—

"গিরিবর কুঞ্জ কুসুমময় কানন কালিন্দী কেলি কদম্ব।
মন্দির গোপুর নগর সরোবর কো কাহা করু অবলম্ব।"

মাধবী তলে আসিয়া বলিতেছেন—

এই না মাধবীতলে আমার লাগিয়া পিয়া যোগী যেন সদাই ধেয়ায়।
পিয়া বিনা হিয়া মোর ফাটিয়া না পড়ে কেন নিলজ্ঞ পরাণ নাহি যায়।
হেরইতে কুসুমিত কেলি নিকুঞ্জ। শুনইতে পিকরব অলিকুল গুঞ্জ॥
অনুভবি মালতীপরিমল এহ। কো জানে জীউ রহত এই দেহ॥

ইহাতেও জীবন যে কি করিয়া আছে, তাহা কে জানে?

দিবস লিখিয়া লিখিয়া নখ ক্ষয় গেল—গৃহভিত্তির গাত্র কালির দাগে ভরিয়া গেল। "দিবস গণিতে আর নাহিক শকতি।" স্বপ্নেও আজ সে দুর্লভ।

নয়ক নিন্দ গেও মঝু বৈরিণি জনমহি যো নাহি ছোড়।
সপনহি যো মুখ দরশন দুলহ অতএ নহত কভু মোর।

পথ চাহিতে চাহিতে "নয়ন অন্ধায়ল।"

এখন তখন করি দিবস গোয়ায়লুঁ দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরিখ গোয়ায়লু ছোড়লুঁ জীবনক আশা।
বরিখে বরিখে করি সময় গোয়ায়লুঁ খোয়ায়লুঁ এ তনু আশে।
হিমকর কিরণে নলিনী যদি জারব কি করব মাধবী মাসে ॥

শ্রীমতীর মনে একথাও জাগিয়াছে মথুরা নগরে বিলাসিনী রাজবালাদের পাইয়া শ্যাম হয় ত' গোপবালাকে ভুলিয়া গিয়াছেন।

গ্রাম্য-কুল-বালিকা সহজে পশু-পালিকা
হাম কিয়ে শ্যাম-উপভোগ্যা।
রাজকুল-সম্ভবা সরসিরুহগৌরবা,
যোগ্য জনে মিলয়ে যেন যোগ্যা ॥

অমিয়া ফলের আস্বাদ পাইলে কি কেহ নিম্ব ফলের দিকে চায়? মালতী ফুল পাইলে কি ভ্রমর ধুতুরা ফুলে যায়? পদকর্ত্তা ইহাতে রাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু শ্রীমতীর পক্ষে এ চিন্তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

শ্রীমতী সখীদের বলিতেছেন—তোমরা প্রিয়ের কাছে গিয়া কদম্বতলের শপথ স্মরণ করাইয়া দিও। বৃন্দাবনের শুক সারী ও কপোত সাক্ষী আছে। "কহিও তাহার পাশে যাহারে ছুঁইলে সিনান করিতাম সে মোরে দেখিয়া হাসে।" তাহাতেও তাহার দয়া হইতে পারে। আমারও জীবন শেষ হইয়া আসিল। আমি রহিব না, তবু সে যেন একবার ব্রজপুরে আসে। আমার স্মৃতিচিহ্ন এখানে থাকিল।

নিকুঞ্জে রাখিলুঁ মোর এই গলার হার।
পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার।
এই তরু শাখায় রহিল শারী শুকে।
মোর দশা পিয়া যেন শুনে ইহার মুখে।
এই বনে রহিল মোর রঙ্গিনী হরিণী
পিয়া যেন ইহারে পুছয়ে সব বাণী।

আমার জন্যই শুধু এই আবেদন জানাইতে বলিতেছি না। শ্রীদাম সুবল ইত্যাদি সখাগণ আছে, তাহাদের সঙ্গে একবার যেন সে দেখা করে। আমি হয় ত' অপরাধ করিয়াছি—তাহারা ত' নিরপরাধ। আর অভাগিনী যশোদা জননী?

দুখিনী আছয়ে তার মাতা যশোমতী। আসিতে যাইতে তার নাহিক শকতি।
তারে আসি পিয়া যেন দেয় দরশন। কহিয় বন্ধুরে এই সব নিবেদন ॥

শ্রীমতীর অঙ্গের ভূষণ এখন দূষণ হইয়া উঠিয়াছে।

শঙ্খ কর চুর বেশ কর দূর তোড় গজমতি হাররে।
সিঁথির সিন্দুরম্মুছিয়া কর দুর পিয়া বিনা দেহ কাররে।

শ্রীমতী নিজ অঙ্গের ভূষণগুলি সখীদের বিলাইয়া দিয়া বলিলেন—

"সোই যদি তেজল কি কাজ ইহ জীবনে
আনলো সখি গরল করি গ্রাসে।"

আমার প্রাণহীন দেহ—"নীরে নাহি ডারবি, অনলে নাহি দাহবি"—শ্যামলরুচি তমালতরুর শাখায় বাঁধিয়া রাখিবি। কেন এই অনুরোধ জান?

"কবহু সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পাওব আমি প্রিয়া দরশনে ॥"

শ্রীমতীর আক্ষেপের মধ্যে মান অভিমান আর নাই। আপনার দীনতাই নানা ভাবে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

"প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল না ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ চাঁদ উদয় যৈছে যামিনী সুখ লব ভৈগেল নিরাশা ॥"

তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন—কোন্ অপরাধে তাঁহার এ দুর্দ্দশা। "কার পূর্ণঘট মুঞি ভাঙ্গিলু বাম পায়।" "না জানিয়া মুই কোন দেবেরে নিন্দিলুঁ।" ইহা কি অহঙ্কারের দণ্ড?

"পিয়াক গুরু গরবে হাম কবহু ধরণীতলে,
তৃণ-হু করি কাহুক না গণনা।
নৈলে কেন ঐছে গতি কাহে ভেলরে সখি
সোই অভিশাপ মুঝে ফল না ॥"

আবার বলিয়াছেন—

"পূরব জনমে বিধি লিখিল ভরমে। পিয়াক দোখ নাহি যে ছিল করমে ॥"

এত অবিচারেও শ্রীমতীর অভিমান নাই। তিনি প্রার্থনা করিতেছেন—

"জনমে জনমে রহউ সে পিয়া আমার।
বিধি পায়ে মাঙো-মুঞি এই বর সার।
হিয়ার মাঝারে মোর রহি গেল দুখ।
মরণ সময়ে পিয়ার না হেরিনু মুখ।"

শ্যামহারা বৃন্দাবনের প্রাকৃতিক দশা কবিরা নানাভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন। অল্প কথায় বিদ্যাপতি বলিয়াছেন—

"শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশদিশ শূন ভেল সগরি।
রোদতি পিঞ্জর শুকে। ধেনু ধাবই মাথুর মুখে।"

পুরুষোত্তম লিখিয়াছেন—

"তরুকুল আকুল সঘনে ঝরয়ে জল তেজল কুসুম বিকাশ।
গলয়ে শৈলবর পৈঠে ধরণিপর স্থল জল কমল হুতাশ।
শুক পিক পাখী শাখিপর রোয়ই রোয়ই কাননে হরিণী।
জম্বুকী সহ শিবা রহি রহি রোয়ই লোরহি পঙ্কিল ধরণী।"

গোবিন্দদাস বলেন—

(১) "সারী শুক পিক কপোত না ফুকরত কোকিল না পঞ্চম গান।
কুসুম ত্যেজি অলি ভূমিতলে লুঠই তরুগণ মলিন সমান।"

(২) "কুঞ্জ কুঞ্জর ভেল কোকিল শোকিল বৃন্দাবন বন দাব।
চন্দ মন্দ ভেল চন্দন কন্দন মারুত মারত ধাব।"

কেবল প্রকৃতির কথা নয়, কবিরা সখীগণ, সখাগণ ও যশোমতীর বেদনার যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাও অতি করুণ। বৃন্দাবনে সে দুর্দ্দিনের কথা বাঙ্গালার কবিরা আজিও ভুলেন নাই। বর্ত্তমান যুগের একজন কবি এক কবিতায় তাহার এক চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন। সে কবিতার প্রথম চরণ—

"গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল আঁধার হলো কুঞ্জবন।"

আর শেষ চরণ—

বিনে শ্রীহরি কেমনে করি নয়ন-বারি সংবরণ।

আর একজন কবির কবিতার নাম "অন্ধকার বৃন্দাবন"। প্রথম চরণ—

"নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।"

শেষ চরণ

"গোকুল মৃৎপিণ্ড হলো চলে না হৃৎস্পন্দ আর।"

বৈষ্ণব কবিগণ শ্যামহারা বৃন্দাবনের ও শ্রীমতীর দুর্দ্দশার বর্ণনা দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। শ্রীমতীর সখীদের মথুরায় লইয়া আসিয়াছেন। সখীরা মথুরার অধিপতিকে "ধিক্ ধিক্ তোরে নিঠুর কালিয়া" ইত্যাদি বলিয়া যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিতেছেন, সেই সঙ্গে শ্লেষব্যঙ্গও আছে।

"সোনার প্রতিমা ধুলায় গড়ায় কুব্জা বসেছে খাটে।"
"আপনি যেমন ত্রিভঙ্গ মুরারি বিধি মিলিয়েছে জেনে।"
"দেশে কে না জানে চোরা কালা কানে বিদেশে হয়েছে সাধু।"

ইহা ছাড়া সখীরা রাধার পায়ে ধাবক রচনা, দাসখৎ লেখা, ক্ষীর ননী চুরি ইত্যাদি অগৌরবের কথা এবং নানাপ্রকার লজ্জালাঞ্ছনার কথা স্মরণ করাইয়া দিল। শেষ পর্য্যন্ত অনেক আবেদন নিবেদন। রাধার দুর্দ্দশার অতি করুণ বর্ণনা। কবিরা ইহাতেই ক্ষান্ত হন নাই। শ্রীকৃষ্ণকেও বিচলিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ "কাঁহা মোর রাই" বলিয়া বৃন্দাবনের দিকে ছুটিয়া আসিলেন—এরূপ কল্পনাও করা হইয়াছে।

"বাঁধিতে বাঁধিতে চূড়া তিলক হইল মুড়া
অবসর নাহি বাঁশী নিতে।
নূপুর বিহনে পায় অমনি চলিয়া যায়
পীতধড়া পরিতে পরিতে।
ননী জিনি সুকোমল দু'খানি চরণতল
কোথা পড়ে নাহিক ঠাহর।
দয়া করি চাতকীরে পিপাসা করিতে দূরে
ধায় যেন নব জলধর।
সেই সে রাধার ধাম আসি উপনীত শ্যাম
বিরহিণী জিউ হেন বাসে।
গোবিন্দদাসে কয় মৃত তরু মুঞ্জরয়
বসন্ত-ঋতু-পরকাশে।"

ইহা ভাবসম্মিলনের পদ নয়। ইহা দরদী কবির একটা কল্পচিত্র মাত্র। অনুক্ষণ কৃষ্ণচিন্তা করিতে করিতে শ্রীমতীর মনে হইয়াছে "আমিই শ্রীকৃষ্ণ"—এই ভাব শ্রীমদ্ভাগবতে ও গীতগোবিন্দেও আছে—কিন্তু বিদ্যাপতি ঠাকুর এই তত্ত্বকে রসের নির্ঝরে পরিণত করিয়াছেন।

"অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরি ভেলি মাধাই।
ও নিজ ভাব সভাবহি বিছুরল আপন গুণ-লুবধাই।
রাধা সঙে যব পুন তহি মাধব মাধব সঙ্গে যব রাধা।
দারুণ প্রেম তবহু নাহি টুটত বাঢ়ত বিরহক বাধা।
দুহু দিশে দারু দহনে যৈছে দগধই আকুল কীট পরাণ।
ঐছন বল্লভ হেরি সুধামুখি কবি বিদ্যাপতি ভান।"

এই তত্ত্ব ও এই রস শ্রীচৈতন্যের জীবনে কিরূপ অভিব্যক্ত হইয়াছিল বৈষ্ণব-সাহিত্যের সকল রসিকই জানেন।

সখীমুখে শ্রীমতীর দশা মামুলি কবিপ্রথায় বিস্তৃতভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দুই একটি চরণে রসঘন হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন—

"নয়নক লোর লেশ নাহি আওত ধারা অব নাহি বহই।
বিরহক তাপ অবহু নাহি জানত অনিমিখ লোচনে রহই।"
"মরকত স্থলী শুতলি আছলি বিরহে সে খিন-দেহা।
নিকষ পাষাণে যেন পাঁচবাণে কষিল কনক-রেহা।"

"ক্ষণে অনুরাগে এমনি নিশ্বাস ছাড়ে নাসার বেশর পড়ে খসি।"
"শিশিরে লতা জনু বিনি অবলম্বনে উঠইতে করু কত সাধ।"
"ঘৃত দিয়া এক রতি জ্বালি আইলা যুগ বাতি
সে কেমনে রহয়ে যোগান।
তাহে সে পরাণ পুন নিভাইল বাসে। হেন
ঝাট আসি রাখহ পরাণ।
অঙ্গুরী বলয়া ভেল দেহ দাপতি গেল দারুণ তুয়া' নব লেহা।
সখীগণ সাহসে ছোই না পারই তন্তুক দোসর দেহা।"

রাধার দেহের যৌবনশ্রী, ভূষা-পারিপাট্য, রূপলাবণ্য কৃষ্ণবিরহে চৌদশী চাঁদের মত একেবারে ম্লান হইয়া গিয়াছে। এই কথা কবিরা নানাবিধ অলঙ্কারের সাহায্যে কতভাবেই না বলিয়াছেন! বিদ্যাপতি বলিয়াছেন—

"শরদক শশধর মুখরুচি সোপল হরিণক লোচন-লীলা।
কেশপাশ লয়ে চমরীকে সোপল পায়ে মনোভব পীলা।
দশনদশা দাড়িবকে সোপলক বন্ধুকে অধর রুচি দেলি।
দেহদশা সৌদামিনী সোপলক কাজর সম সব ভেলি।"

ঘনশ্যাম বলিয়াছেন—

"অঞ্জন লেই তনু রঞ্জনি নবঘন দামিনী দ্যুতি হরি নিল।
লেই যৌবন চিরি নব অঙ্কুর করি নিধুবন ঘন বন ভেল।"

গতিগোবিন্দ বলিয়াছেন—

"চামরী লইল কেশ বিদ্যাধরী নিল বেশ মুখশোভা নিল শশিকলা।
মৃগ নিল দুই আঁখি ভ্রূ নিল খঞ্জন পাখী মৃদুহাসি লইল চপলা।"

শ্রীরাধার দেহে সে কান্তি আর নাই। রাধার রূপ দেখিয়া যাহারা লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়াছিল, এখন তাহারা নিশ্চিন্ত হউক।

"এত দিনে গগনে অথিন রহু হিমকর জলদে বিজুরী রহু থির।
চামরী চমরু নগরে পর বেশউ মদন ধনুয়া ধরু ফার।
কুমুদিনী বৃন্দ দিনহু সব হাসউ বাঁধুলি ধরু নব রঙ্গ।
মোতিম পাঁতি কাঁতি ধরু উজোর কুঞ্জর চলু গতি ভঙ্গ।"

এইগুলি ছাড়া—

"দিবসে মলিন জনু চাঁদক রেহা"
"তপত সরোবরে থোরি সলিল জনু আকুল সফরি পরাণ।"
"উচ কুচ উপর রহত মুখ মণ্ডল সো এক অপরূপ ভাতি।
কনয়া শিখরে জনু উয়ল শশধর প্রাতর ধূসর কাঁতি।"
"দিনে দিনে খীন তনু হিমে কমলিনী জনু।"
"বিরহ জরে জরি কনয়া মঞ্জরি রহল সে রূপক ছাই।"

ইত্যাদি অলঙ্কৃত চরণের দ্বারা কবিগণ শ্রীরাধার দুঃসহ বিরহ-দশার আভাস দিয়াছেন। সকলেই স্বীকার করিয়াছেন—এ দুঃখ রচনাতীত।

প্রকৃতির সহিত মানবহৃদয়ের যে গভীর সংযোগ চিরন্তন তাহা কবিরা ভুলেন নাই। মাসে মাসে ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির অঙ্গে বৈচিত্র্যের অভাব নাই। এই বৈচিত্র্যের সহিত শ্রীমতীর প্রত্যেক প্রেমলীলার স্মৃতি বিজড়িত। প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যগুলি শ্রীমতীর বেদনার উদ্দীপন-বিভাবের কার্য্য করিয়াছে। কবিরা ইহাতে নূতন নূতন কবিতার প্রেরণা ও উপাদান পাইয়াছেন। এই কবিতাগুলিই শ্রীমতীর বারমাস্যা। কবিরা বলিয়াছেন—বিরহে প্রকৃতির পীড়ন দ্বিগুণিত হইতেছে, আর প্রকৃতির প্রসাদ নিগ্রহে পরিণত হইতেছে।

বসন্তে—

"চৌদিশ ভমর ভম কুসুমে কুসুমে রম নীরসি মাঁজরি পিবই
মন্দ পবন বহ পিক কুহু কুহু কহ শুনি বিরহিনী কৈসে জীবই।"

গ্রীষ্মে—

"একে বিরহানল দহই কলেবর তাহে পুন তপনক তাপ।
ঘামি গলয়ে তনু নুনিক পুতলি জনু দেখি সখি করু পরলাপ।"

বর্ষায়—

"কুলিশ কত শত পাত মোদিত ময়ুর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুক ফাটি যাওত ছাতিয়া।"

শরতে—

"আশ্বিন মাসে বিকশিত পদুমিনি সারস হংস নিশান।
নিরমিল অম্বর হেরি সুধাকর ঝুরি ঝুরি না রহে পরাণ।"

হেমন্তে—

"আঘণ মাস রাস-রস-সায়র নায়র মাথুর গেল।
পুর-রঙ্গিণিগণ পুরল মনোরথ বৃন্দাবন বন ভেল।"

শীতে—

"তুয়া গুণে কামিনী কত হিম যামিনি জাগরে নাগর ভোরি।
সরসিজ মোচন বরলোচন রহ ঝরতহি ঝর ঝর লোর।"

বারমাস্যা পদে প্রত্যেক মাস ধরিয়া রাধিকার বেদনার নব নব রূপ দেখানো হইয়াছে। এই সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যাও রচিত হইয়াছে। ঘনশ্যাম দাস, গোবিন্দ দাস ও বলরাম দাস আশ্বিন মাস হইতে ও বিদ্যাপতি আষাঢ় মাস হইতে বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন। বিদ্যাপতির অন্য একটি বারমাস্যা (চৈত্র হইতে আরম্ভ) দুই গোবিন্দ দাস পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন। বারমাস্যার পদগুলি ছন্দের মাধুর্য্যে

ভাষার চাতুর্য্যে, রসের প্রগাঢ়তায় পদবিন্যাসের পারিপাট্যে অপূর্ব্ব। এইগুলি বঙ্গসাহিত্যের গৌরব। প্রত্যেকটি হইতে এক একটি স্তবক উদ্ধৃত করি।—

"বিকাশ হাস বিলাস সুললিত কমলিনী রস জৃম্ভিতা।
মধুপান চঞ্চল চঞ্চরী কুল পদ্মিনী মুখ চুম্বিতা।
মুকুল পুলকিত বল্লি তরু অরু চারু চৌদিকে সঞ্চিতা।
হাম সে পাপিনি বিরহে তাপিনি সকল-সুখ পরিবঞ্চিতা।"

(বিদ্যাপতি)

"অব—ভেল শাঙন মাস। অব—নাহি জিবন আশ॥
ঘন—গগনে গরজে গভীর। হিয়া—হোত যেন চৌচির॥
হিয়া—হোত ভনু চৌচীর থীর না বান্ধে পলকাধো আররে।
ঝলকে দামিনি খোলি খাপসে মদন লেই তলোয়ার রে।"

(ঘনশ্যাম)

"শাঙনে সঘনে গগনে ঘন গরজন উনমত দাদুরি বোল।
চমকিত দামিনি জাগরে কামিনি জীবন কণ্ঠহি লোল।
ভাদরে দরদর দারুণ দুরদিন কাঁপল দিনমণি চন্দ।
শীকর-নিকরে থীর নহ অন্তর দহই মনোভব মন্দ।"

(গোবিন্দ দাস)

"পৌষ তুষারু তুষানলে ডারল জীবন নারির নাহ।
সুধির সমীর সুধাকর শীকর পরশ গরল অবগাহ।
অহর্নিশি ডহ ডহ হিয়া জিউ থির নহ দুঃসহ বিরহক দাহ।
উঠত বৈঠত রোয়ত রোয়ত কতয়ে করব নিরবাহ।"

(বলরাম দাসের শ্রীকৃষ্ণের বারমাস্যা)

"মাস গণি গণি আশ গেলহি শ্বাস রহু অবশেষিয়া।
কোন সমুঝব হিয়াক বেদন পিয়া সে গেল পরদেশিয়া।
সময় শারদ চাঁদ নিরমল দীঘ দীপতি রাতিয়া।
ফুটল মালতি কুন্দ কুমুদিনি পড়ল ভ্রমরক পাঁতিয়া।"

(গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী)

শারদ চন্দ্র, মলয়ানিল, ভ্রমর-গুঞ্জন, হংস-চক্রবাক-কোকিল-পাপিয়া-ডাহুক-ডাহুকীর কণ্ঠস্বর, দাদুরীর রোল, দামিনীর চমক, মেঘের মন্দ্র, ময়ূরের নৃত্য ও কেকা, মালতী, কুন্দ, কুমুদ, পদ্মিনী ও আম্রমঞ্জরীর সৌগন্ধ্য ইত্যাদি বিরহবেদনাকে নিত্য নবীভূত করিয়াছে। মাসের পর মাস চলিয়া যায়, প্রিয়ের দেখা নাই। এই কালের অতিবাহন নৈরাশ্যকে কেমন করিয়া বাড়াইয়া দিতেছে কবিরা তাহাই এইগুলিতে ফুটাইয়াছেন। এই নৈরাশ্যের বেদনা-ধারা কবিতাগুলিকে উদ্দীপন-বিভাবের নির্ঘণ্টে পরিণত হইতে দেয় নাই। শেল-সম যৌবনকে অঙ্গে ধারণ করিয়া পথপানে চাহিয়া থাকা, একেশ্বরী হইয়া প্রিয়হীন শয্যায় অবলুণ্ঠন, প্রকৃতির মধ্যে ও লোকালয়ে নিত্য নব উৎসবের মধ্যে বিরহিণীর ভাগ্যযন্ত্রণা-ভোগ কবিতাগুলিতে রস যোগাইয়াছে। কত কথাই শ্রীমতীর মনে পড়িতেছে—গ্রীষ্মের রজনীতে প্রিয়তমের কোলে তাপিত অঙ্গ জুড়াইয়া যাইত, বর্ষায় অশনি-গর্জ্জনে ত্রস্ত হইয়া প্রিয়তমকে আঁকড়িয়া ধরিত, গভীর শীতের রজনীতে প্রিয়তমের অঙ্কের উষ্ণতায় শৈত্যের বেদনা বিদূরিত হইত—শরতে ও বসন্তে তাহার সঙ্গে কত রসলীলাই না হইত!

মাথুরের বারমাস্যা কবিতাগুলি জগতের বিরহসাহিত্যে অপূর্ব্ব অবদান।

বৈষ্ণব কবিরা এইভাবে মাথুরের গান গাহিয়া গিয়াছেন। তারপর তাঁহাদের অনুকরণে এদেশে শত শত কবি রাধা-বিরহের সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে, দ্বারে দ্বারে, ক্ষেতে ক্ষেতে, পথে পথে গায়কগণ সেই সকল গীতি গাহিয়া বঙ্গদেশের হৃদয়াকাশকে মেঘমেদুর করিয়া রাখিয়াছে, গৃহস্থগণের চিত্তকে উদাসীন করিয়া তুলিয়াছে, গৃহসংসার হইতে তাহাদের মনকে কাড়িয়া লইয়া ক্ষণকালের জন্য অজানা অনন্তের উদ্দেশে লইয়া গিয়াছে—তাহাদের মনে অজ্ঞাতসারে মানবাত্মার চিরবিরহের কথা জাগাইয়াছে—সংসারের কলকোলাহলের মধ্যেও ক্ষণকালের জন্য বৈরাগ্যের উদ্দীপন করিয়াছে এবং পরিপূর্ণসুখ-সৌভাগ্যের মধ্যেও একটা অনিদান অস্বস্তি ও অপূর্ণতার বেদনার সঞ্চার করিয়াছে।

এই মাথুরের নানাভাবে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। কবিতার মধ্য দিয়া সে ব্যাখ্যাগুলির কথা বলিয়া এই নিবন্ধের উপসংহার করিব। বৃন্দাবনকে লীলাক্ষেত্র ও স্বপ্নজগৎ এবং মথুরাকে সত্যলোক বা জীবন-সংগ্রামের কর্ম্মক্ষেত্র মনে করিয়া একটা ব্যাখ্যা দেওয়া চলে। বৃন্দাবন লীলাভূমিই হউক আর স্বপ্নলোকই হউক—আর আহ্বান সত্যেরই হউক আর জীবনসংগ্রামেরই হউক—বিদায়ের বেদনা মহাবীরের পক্ষেও মর্ম্মন্তুদ। সত্যের আহ্বানে চঞ্চল বীরহৃদয়ও বলিবে—

বিদায় চন্দ্রাননে।
এসেছে আজিকে মথুরার দূত আমার বৃন্দাবনে।
সাঙ্গ আজিকে বাঁশরীর গান
হলো ব্রজে কলহাসি অবসান,
শেষ-অভিসার মান-অভিমান উজ্জ্বল রসাবেশ।

যদিও যমুনা ভরা টলমল
নীপ-নিকুঞ্জ চারু চঞ্চল
ময়ূর ময়ূরী রস ঢল ঢল গুরু গুরু ডাকে মেঘ।
তবু হায় যেতে হবে
বারতা বহিয়া মথুরার দূত দুয়ারে এসেছে যবে।

বলো সখা সখীগণ
এসেছে নিঠুর মথুরার দূত বঁধুর কুঞ্জবনে'।
জলকেলি শেষ ঝাঁপায়ে ঝাঁপায়ে
কালিদহে তটবিটপী কাঁপায়ে
বৃথা বনফলে ভরিছ আঁচল মিছে গাঁথ বনমালা।
ফুলের ঝুলনা লুটিবে ভূতলে
ভাবিতে নয়নে সলিল উথলে
যাই বুকে বহি রস রাস দোল ঝুলনের স্মৃতিজ্বালা।
মিছে আর মায়াডোর।
ভেসে যাক চলে যমুনার জলে সাধের বাঁশরী মোর।
কেমনে হেথায় রহি।
মথুরার দূত এসেছে নিদয় বিদায় নির্দেশ বহি।
ডাকিছে সত্য বিষাণ বাদন
জীবন-মরণ-রণ প্রাঙ্গণে।
ডাকে মাথুরের কাতর কাকুতি আতুরের আঁখিলোর
পাষাণ-কারার আকুল রোদন
করেছে সুপ্ত তেজের বোধন।
ভাঙ্গিতে হয়েছে রাগের স্বপন ফাগের রঙিন ঘোর
মিছে আর আঁখিজল
মথুরার দূত করিয়া দিয়াছে অন্তর টলমল।

আর একটি ব্যাখ্যান এই—

ভগবান বলেন—"ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীতি"। তিনি সখ্য বাৎসল্য মধুর রসেরই বশীভূত। মাধুর্য্যের মধ্যে ঐশ্বর্য্যভাব আসিয়া পড়িলেই বাহুবন্ধ শিথিল হইয়া পড়ে। আর তিনিও লীলাভুবন ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ইহাই মাথুর।

আপনারে সঙ্গোপন করি কতদিন রবে শ্রীমধুসূদন?
গোকুলের সখাদের সখীদের লীলারসে হয়ে নিমগন।
সখারা চড়িল কাঁধে মানিনী ধরাল পায় হইয়া ভামিনা,
জননী খাওয়াল ননী কহিল কঠোর কটু ব্রজের কামিনী।
লীলার মাধুর্য্য ভুলি' অসতর্ক একদিন দেখালে বিভূতি,
তব পীতবাস ভেদি' বিকীর্ণ হইল কবে ভাগবতী দ্যুতি।
গোকুলের সখা সখী চাহিল স্তম্ভিত নেত্রে কুণ্ঠা ভয়াতুর,
হয়ে গেল স্বপ্নভঙ্গ সমাপ্ত লীলার রঙ্গ জ্বলিল মাথুর।
মাধুর্য্য বিদায় নিল ঐশ্বর্য্যের বাধা এল জীবনের পথে,
গোষ্ঠের রাখাল, তুমি তব দুর্ব্বাদল ভুলি' আরোহিলে রথে।
সে রথ ত মনোরথ হৃদয় দলিয়া গেল। কোথায় অক্রূর?
মন ছাড়া কোথা পাবে? মনে সেই বৃন্দাবন, আর মধুপুর।
যুগে যুগে দেশে দেশে এই লীলা অভিনীত মানুষেরই মনে,
কৃতাঞ্জলি দাস্যভাব মাথুর ঘটায় হায় প্রেমের স্বপনে।

মাথুরের আর একটি ব্যাখ্যা—প্রত্যেক মানুষের জীবনেই মাথুর আসে। যৌবনই বৃন্দাবন, যৌবনাত্যয়ই মাথুর। যৌবন প্রেমের মধ্য দিয়া যাহা উপলব্ধি করে, যৌবনাত্যয়ের ভয়-কুণ্ঠা-দ্বিধাভরা দাস্যভাবে তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়।

এ অঙ্গ লালিত্যহীন দৃষ্টি হ'য়ে আসে ক্ষীণ
খালিত্যে পালিত্যে ভরে শির।
ভ্রান্তি ঘটে প্রতি কাজে ক্লান্তি আসে কর্ম্ম মাঝে
মতি আর রয়নাকো স্থির।
নৈরাশ্যে হৃদয় ভরে শুধু দীর্ঘশ্বাস পড়ে
লইয়াছে বিদায় যৌবন,
শ্যাম গেছে মথুরায় প্রাণ করে হায় হায়
অন্ধকার মোর বৃন্দাবন।
কুসুমে বসে না অলি পড়ে মধুধারা গলি
যমুনা ধরে না কলতান,
গাহেনাক পিক পিকী নাচেনাক আর শিখী
শুক সারী গাহে নাক গান।
যুগে যুগে দেশে দেশে যৌবন-লীলার শেষে
মানবেরে করিয়া আতুর,
জীবনে জীবনে হায় উল্লাস মিলায়ে যায়
হানে বজ্র এমনি মাথুর।
শিথিল স্নেহের টান বন্ধুত্বের অবসান
ম্লান হয় প্রেম প্রেয়সীর,
অক্রূরের সাথে সাথে দাস্যভাবে সন্ধ্যা-প্রাতে
মন্দিরে প্রণত হয় শির।

আর একটি ব্যাখ্যা সার্ব্বজনীন। রাধাবিরহ মানবাত্মার চিরন্তন বিরহেরই সাহিত্যরূপ। পূর্ণের সহিত, অসীমের সহিত, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যে বিচ্ছেদ, সে বিচ্ছেদের বেদনা মানবমাত্রেরই অন্তরে সুপ্ত আছে। প্রকৃতির নব নব বৈচিত্র্য সেই বেদনাকে জাগাইয়া মানবচিত্তকে অকারণে উন্মনা করিয়া তোলে। রবীন্দ্রনাথ এই বেদনার কবি। এই

বেদনাকেই বৈষ্ণব কবিরা রাধাবিরহের সঙ্গীতের মধ্য দিয়া বাণীরূপ দিয়াছেন।

অক্রুরের রথে চড়ি' লীলারঙ্গ পরিহরি' কবে শ্যাম যায়
কাঁদাইয়া গোপীগণ কাঁদাইয়া বৃন্দাবন গেল মথুরায়।
গন্ধে মিশাইল ধূপ অরূপ হইল রূপ অনির্ব্বচনীয়।
ইন্দ্রিয়ের রসায়ন ভাবে হ'য়ে নিমগন হ'লো অতীন্দ্রিয়।
উঠিল শ্রীরাধিকার বুক ফাটা হাহাকার বিদারি' গগন।
"কোথা গেলে রসরাজ দশমী দশায় আজ দাও দরশন।"
কাঁদে তায় প্রতি শাখী গোকুলের মৃগপাখী রাধিকার শোকে।
কাঁদে গোপ-গোপী যত অশ্রু ঝরে অবিরত জটিলারও চোখে
অরূপ ফিরে'ন রূপে, গন্ধ ফিরে'নিক ধূপে, কানু বৃন্দাবনে।
তাই আজো রাধিকার আর্ত্তনাদ হাহাকার ধ্বনিছে ভুবনে।
গুমরে গিরির বুকে ধ্বনিছে নির্ঝরমুখে নদী-কলকলে।
মর্ম্মরিছে বনে বনে মন্দ্রিতেছে ক্ষণে ক্ষণে বারিদ-মণ্ডলে।
জীবনে জীবনে ব্যথা জাগাতেছে ব্যাকুলতা অজানার টানে।
মুখে অন্ন নাহি রুচে চোখে ঘুমঘোর ঘুচে চাহি কার পানে।
সে বিরহ আজো বাজে মন নাহি লাগে কাজে কারে যেন চায়।
কারে নাহি পেয়ে বুকে সংসারের কোন সুখে স্বস্তি নাহি পায়।
মান যশ ধন জন তৃপ্ত করে নাক মন মিটে নাকো সাধ।
একজনে না পাওয়ায় সবি ব্যর্থ হয় হায় সকলি নিঃস্বাদ।
কাহার বরণ স্মরি' মেঘ হেরি' শির' পরি পরাণ উদাস।
প্রেয়সী রহিতে কোলে উন্মনা তাহারে ভোলে শ্লথ বাহুপাশ।
ব্রজের সজল-আঁখি যত মৃগ যত পাখী নব জন্ম লভি'
হইল কি দেশে দেশে যুগে-যুগে ফিরে এসে শত শত কবি?
রাধার বিরহরাগে তাদের কল্পনা জাগে হইয়া অরুণ
তাদের সকল গীতি ছন্দিত সকল স্মৃতি করেছে করুণ।
জাগায় সে গূঢ় ব্যথা কোন্ সুদূরের কথা পূর্ণের পিয়াসা।
তাহাদের গানে গানে ছুটেছে অনন্ত পানে অমৃত তিয়াসা।
নিখিল ভুবন ভ্রমি বিশ্বসীমা অতিক্রমি' লক্ষ্য নাহি জানি'
কাহার সন্ধানে ঘুরে দেশ-কালাতীত সুরে তাহাদের বাণী।

সাবধানী

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

জীবন নদীর দু'কূল ছাপায়ে উঠেছে ঢেউ;
এই বেলা দাও কর্ণধারী মোরে করিয়া পার—
নয়নে যখন নেমেছে বাদল, দেখেছ কেউ
তখন যতনে মুছায়ে দিয়েছ নয়নাসার?

দুস্তর মরুপ্রান্তরে যবে পড়িয়া একা,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিয়াছি: হয়ে সঙ্গীহীন,
তখন ভেবেছি এ সব আমার ভাগ্যলেখা
ব্যথার সুরেতে আছে বাঁধা তাই এ মনোবীণ!

আজিকে আমার বন্ধুজনার অন্ত নাই;
তবুও শূন্য ফাঁকা ফাঁকা সব ঠেকিছে যেন
পারের বাঁশীর সুরেতে পাগল, হয়েছি তাই—
চিত্ত উতলা হয়েছে আজিকে, তাইতে হেন!

কাণাকড়ি হায় ছিল না যখন হাতেতে মোর
কেহ ত' তখন অশ্রু মোছাতে আসে নি কাছে
এসেছে তারাই আজিকে মোছাতে নয়ন লোর,
সাবধান করে, পথের কাঁটায় পা দেই পাছে।

ঘরের কোণেতে পারের বাঁশীটী ডাকিয়া কয়—
চল্ ওরে চল্ এই বেলা ভাই ঘাটের কূলে!
এমনি করিয়া ভুলে থাকা তোর উচিত নয়,
হয় ত' আবার জড়াইবি জালে নিজেরি ভুলে।

জীবন নদীর দু'কূল ছাপায়ে উঠেছে ঢেউ,
এই বেলা নাও কাণ্ডারী মোরে করিয়া পার।
নয়নে যখন নেমেছে বাদল তখন কেউ
সযতন করে মুছেছ' গোপন নয়নাসার?



পরাজয়

শ্রীপ্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়

পৃথিবী জুড়িয়া মানুষের মেলা, অসংখ্য জীবনের স্রোত অবিরাম গতিতে বহিয়া চলিয়াছে, নূতনত্ব নাই, বিশেষ-ভাবে ভাবিতে গেলে ইহা বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হয়।

তুমি, আমি, যদু, মধু, শ্যাম ইত্যাদি হিসাব করিয়া দেখিলে এই জীবনের বহমান স্রোতে বিশেষ বৈচিত্র্য বোঝা যায় না। একই নিয়মে বাঁধা বলিয়া মনে হয়। নিতান্ত গতানুগতিক জীবন। এই সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্যে কাহারো কাহারো জীবনে এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়া যায় যে, যাহা কল্পিত উপন্যাসের ঘটনা অপেক্ষা অধিক বৈচিত্র্যময় ও উত্তেজনাপূর্ণ। কল্পনায় ভাবিয়া লিখিলে মনে হয়—ইহা গল্পই, আর কিছু নয়। আমার জীবনের ১৯২০ বৎসরের মধ্যে এমনি একটি ঘটনা বিচিত্র রূপ লইয়া কতকগুলি মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করিয়া ধীরে ধীরে সংঘটিত হইয়াছে। সেই কাহিনীটি আজ আপনাদের শুনাইব।

তখন আমি এম-এ পড়িতেছি। বিবাহ হইয়াছে দুই তিন মাস আগে। সিক্স্থ ইয়ার চলিতেছে। ইংলিশে এম্-এ। বাবা বলিলেন, এখন সময় কোনক্রমেই অবহেলা করা উচিত নহে, মন দিয়া পড়িতে। অতএব বাড়ীতে থাকিলে পড়া হইবে না বলিয়া হোষ্টেলে পাঠাইয়া দিলেন।

অত্যন্ত মন খারাপ করিয়াই হোষ্টেলে ফিরিলাম। এতই যদি পড়ার আগ্রহ তবে পড়াটা শেষ করিয়া বিবাহ দিলেই হইত। বিবাহ দিয়াই হোষ্টেলে পাঠাইয়া দেওয়া এবং নিজেরা বেনারসে চলিয়া যাওয়া, ইহার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ দর্শান যায় না।

মাসে একবার করিয়া বেনারসে ঘুরিয়া আসিতে পারিতাম কিন্তু বাবার সেরূপ কোনও অনুজ্ঞা নাই। যেদিন যাইতে লিখিবেন সেদিনই যাওয়া হইবে।

কাজেই কলিকাতায় রহিয়া গেলাম? অবশ্য পত্রলেখাটা খুব বাড়িয়াছে—একদিন অন্তর মাধবীকে পত্র দিতেছি এবং উত্তরও সেইরূপ নিয়মিত আসিতেছে।

রাত্রি জাগিয়া পড়িতে বসিলে নিস্তব্ধ রাত্রির নির্জ্জনতায় মনটা কেমন হু-হু করিয়া ওঠে। মনে পড়িয়া যায়, নোলক-পরা ঘোমটা ঢাকা একখানি মুখ। ক্রমে তাহা বইয়ের বুক জুড়িয়া বসে, কোথায় চলিয়া যায় শেলী, কীটস, বায়রণ; কোথায় থাকে ক্রিটিসিজম।

মাধবী কোন্ কথাটি বলিয়া হাসিয়াছিল, তাহার গলার স্বর কেমন মিষ্ট, স্নেহসম্ভাষণে কেমন সলজ্জ রক্তিমাভা তাহার গণ্ডে ফুটিয়া ওঠে, চোখ দু'টি আবেশে আনত হইয়া যায় ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাই ভাবিতে থাকি।

মনে হয় উঁহাদের নিয়ম কত সুন্দর, হাসিমুখে চলিয়া যাওয়া—মধুচন্দ্র যামিনী যাপন।

আর আমাদের? বিবাহ দিয়া পুত্র রহিল কলিকাতায়, আর পুত্রবধূ রহিল বেনারসে। লজ্জার মাথা খাইয়া ইহাও ভাবি যে, উঁহাদের কি সবই উল্টা নিয়ম। নূতন বধূ কি হয় নাই?

একবার ছোট ভগিনীর মুখে পিতার অভিমত শুনিয়াছিলাম, আমার বিবাহের পর হইতে পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্টের আয় বাড়িয়াছে, ইহাই নাকি তিনি রহস্যচ্ছলে বলিয়াছিলেন।

বেশ ত'! মাধবীকে নিকটে পাইব না, তাহাকে পত্রও দিব না, এগজামিনের আগে তথায় যাওয়া নিষিদ্ধ, তবে?

রীতিমত রাগ হয়। যদি না পড়ি? যদি ফেল করি? তবে? তবে—একটু ভাবিয়া দেখিলে আপনার নির্ব্বুদ্ধিতা আপনার নিকটেই প্রকাশিত হয়।

বাবার তিরস্কার পাওনা ত' রহিলই, উপরন্তু আবার পড়িবার জন্য মাধবীর নিকট হইতে নির্ব্বাসন হইবে, তাহা ত' তিরস্কারের বেশী।

বিদ্রোহ করিবার উপায় নাই। ফেল করিলে পড়িতেই হইবে। কারণ পিতা অল্পবয়সে পিতৃহীন হইয়া চাকুরী সুরু করেন। বি-এ পাশ করিয়া এম-এ পড়িবার সুযোগ পান নাই। সেইহেতু তিনি আপনার অতৃপ্ত ইচ্ছা পুত্র দ্বারা পূরণ করিতে চাহেন, অতএব হয় ত' যতবার ফেল করিব ততবারই পড়িতে হইবে।

কিন্তু মন বসিতেছে কই?

পিতা পেন্সন লইয়া কাশীতে পুণ্যসঞ্চয়ের ইচ্ছায় চলিয়া গেলেন। কেন? কলিকাতায় কিছুদিন বাস করিলেই হইত। শুনিতেছি যে, মায়ের ইচ্ছানুযায়ী কাশীতে যাওয়া হইয়াছে। মা চিরদিন বিদেশে বাস করিয়াছেন, পিত্রালয়ে আসিবার সুবিধা বিশেষ হয় নাই। কারণ পিতা বিদেশ হইতে দেশে আসিলে আপনার দেশেই ফিরিতেন, কাজেই মাকেও তথায় যাইতে হইত। সেই জন্য মা বৃদ্ধ বয়সে আজ পিত্রালয়ের নিকটে থাকিয়া ভ্রাতা ভগিনীগণের সঙ্গলাভ করিতে চান।

আমার মামারা কাশীর বাসিন্দা। বেশ ত' কিছুদিন কলিকাতায় থাকিলে ত' মামারা পলাইতেন না। নানারূপ বিরুদ্ধ কথা মনে উদয় হয়।

কিন্তু দিনের পর দিনও' কাটিতে লাগিল এবং আমার পড়াও অগ্রসর হইতে লাগিল।

অবশেষে এগজামিন দিয়া সঙ্গে সঙ্গেই কাশী রওনা হইলাম বেনারস এক্সপ্রেসে। মনের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা, কতক্ষণে কাশী পৌছিব।

ঝড়ের গতিতে এক্সপ্রেস অগ্রসর হইতেছে, মনের ভিতর ঘুরিয়া ফিরিয়া জাগিতেছে মাধবীর কথা।

আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেছি, ইহা প্রেম না প্রবল মোহ? কয়টা মাসের মধ্যে আমার জীবনে সে এমন প্রধান হইয়া উঠিল কেমন করিয়া? সকলের কথাই মনে হইতেছে কিন্তু সবাইকে ছাপাইয়া মনের মাঝে আসিয়া দাঁড়ায় মাধবী—অভূতপূর্ব্ব আনন্দে দেহমন শিহরিয়া ওঠে কেন?

কিসের জোরে সে এমনি করিয়া আমার মন হরণ করিল? এমন কোনও তাহার বিদ্যা বা বুদ্ধির প্রখরতা দেখি নাই, আমাকে সে কেমনভাবে গ্রহণ করিয়াছে তাহাও বুঝি না, তবে আমি কেন মনের দু'কূল ছাপাইয়া শুধু তাহার চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকি?

সেই নিতান্ত অল্পবয়স্কা চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কিশোরীর নিতান্ত সাধারণ কথাগুলি যেন কর্ণে মধু বর্ষণ করে।

তাহার চলার ভঙ্গী, তাহার বলার ভঙ্গী, তাহার অভিমান, তাহার হাসি—সবই যেন সুন্দর।

সময়ে সময়ে আশ্চর্য্য হইয়া ভাবি কেন এমন হইল।

দুই

বাটী পৌছিতেই পিতা, মাতা, ভগিনী সকলে আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। কুশল প্রশ্ন এবং কেমন এগজামিন দিলাম তাহার কথা চলিতে লাগিল।

ছোট ভাইটি আসিয়া ধরিয়াছে, "দাদা আমার মোতল কই?"

সকলকেই যথাযোগ্য উত্তর দানে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলাম, মা পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "বড় রোগা হয়ে গেছিস কিন্তু!" হাসিয়া বলিলাম, "তাতে কি মা, তোমার কাছে এসেছি দু'দিনে মোটা হয়ে যাব।"

ব্যাকুলনেত্র আমার চারিদিকে খুঁজিতেছিল কোথায় মাধবী? পিপাসু নেত্র বৃথাই খুঁজিয়া মরিল। নাঃ, মাধবীর কোন চিহ্নই নাই, সে এ তল্লাটেই নাই।

মুখ-হাত ধুইয়া মায়ের নিকট রন্ধনগৃহে বসিয়া জলখাবার খাইলাম, গল্প করিলাম এবং একটু পরে বলিলাম, "একটু শোব মা, মাথাটা ধরেছে।"

মা ব্যস্ত হইয়া লীলাকে ডাকিলেন, "লীলা, যা তোর দাদাকে ঘরটা দেখিয়ে দে, ও একটু শোবে। তোরা যেন জ্বালাসনি। দোরটা ভেজিয়ে তুই শুদ্ধ বাপু!"

রন্ধনগৃহের বাহিরে আসিয়াই লীলাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাঁরে তোর বৌদি কোথায় রে?"

লীলা বলিল তাহার বৌদি তেতলার ঘরে পান সাজিতেছে।

লীলার পিঠটা চাপড়াইয়া বলিলাম, "লীলু ভাই, আজ একটা বড় পুতুল কিনে দেবো তোমায়, তুমি একটু খবর দিও

তো ভাই, মা কি বাবা আমায় ডাকলে, যেন বোলো না যে আমি ওপরে গেছি।"

লীলা সানন্দ সম্মতি জানাইল ও জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখন শোবে না দাদা?"

"না ভাই" বলিয়া দ্রুত তেতলায় সন্ধানে চলিলাম। নিঃশব্দ দ্রুতপদক্ষেপে তেতলার ঘরখানির দুয়ারে পৌঁছিলাম।

থালায় পান সাজানো, মাধবী চুণ দিতেছে। আমার বুকের গতি যেন সহসা দ্রুততর হইল। মাধবী—কি সুন্দর মাধবী! একরাশ চুল পিঠের উপর ছড়ানো। নীল রংএর শাড়ি পরা মাধবী আপন মনে পানে চুণ দিতেছে। শুভ্র গৌরবর্ণ হস্তে নীলকাঁচের চুড়ি ও সোনার চুড়িগুলি মিশিয়া যেন জ্বলিতেছে। সোণার রং যেন গায়ের রংএর সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

বহুদিন পূর্ব্বের শোনা গানখানির একটি কলি হঠাৎ মনে পড়িয়া যায়।

কঙ্কণ বা মরি লা দে···

গোঁরি গোরি হাথমে···

বাস্তবিক গোরি গোরি হাতে চুড়ি যে কত মানায় তা মাধবীকে না দেখিলে বোঝা যায় না।

ধীরে ধীরে গিয়া মাধবীর চোখ টিপিলাম।

হাতের উপর হাত বুলাইয়া ত্রস্তা মাধবী মৃদুকণ্ঠে বলিল, "ছাড় ছাড় ছাতের উপর সুনন্দাদি আছেন, এখনি এসে পড়বেন।"

তাড়াতাড়ি হাত সরাইয়া লইয়া আকস্মিক রসভঙ্গের কারণ সুনন্দাদিটি কে, জিজ্ঞাসা করিতে যাইব, এমন সময় ছাদের দিকের খোলা দরজা দিয়া বৌদি বলিয়া ডাকিয়া কে একজন আসিয়া প্রবেশ করিল। ১৮।১৯ বৎসর বয়স্কা একটি মেয়ে। অপ্রতিভ আমাকে ও অবগুণ্ঠিতা মাধবীকে একবার দেখিয়া লইয়া মেয়েটি সপ্রতিভ ভাবে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল এবং হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "কেমন আছেন দাদা? আমাকে বোধ হয় চিনতে পারছেন না? আমি সন্থ।"

ওঃ হরি ভুলিয়াই গিয়াছিলাম যে ছোট মামারা এখানে আছেন এবং ছোট মাসীমাও আছেন। সন্থ হইতেছে আমার বিধবা মাসীমার একমাত্র কন্তা।

আমি ততক্ষণে কিছু সামলাইয়াছি। জিজ্ঞাসা করিলাম, সবাই কেমন আছেন এবং সে কেমন আছে?

দুই চারিটি প্রশ্নোত্তরের পর মাধবীর পানে চাহিয়া বিস্ময়ের সুরে সন্থ বলিল, "ওকি বৌদি, তুমি ঘোমটা দিচ্ছ কেন?" আমি যে তোমার ছোট ননদ।"

প্রত্যুত্তরে মাধবী দীর্ঘ অবগুণ্ঠন আরো একটু দীর্ঘ করিল। হাসিয়া সুনন্দা কহিল, "দেখুন দাদা?"

সত্যই তো! আমি একটানে মাধবীর ঘোমটা খুলিয়া দিলাম।

আরক্তমুখে সকোপ ভ্রূভঙ্গী করিয়া মাধবী আবার ঘোমটা টানিয়া দিল।

সুনন্দা হাসিয়া বলিল, "তবে আমি নাচার, আমি অনুমতি দিলুম, দাদা ঘোমটা খুলে দিলেন তবুও লজ্জা?" তারপর নত হইয়া একমুঠা পান লইয়া মাধবীর দিকে তাকাইয়া কহিল, "বাকী পানগুলো সেজে ফেল তুমি, আমি মাসীমাকে এগুলো দিয়ে আসি।"

দ্রুতপদে সুনন্দা নীচে নামিয়া গেল।

সুনন্দা অদৃশ্য হইতেই দৃঢ় বাহুবন্ধনে ধরা পড়িয়া মাধবী আরক্তমুখে বার বার বলিতে লাগিল, "এ কি মুস্কিল, তবে পানগুলো সাজবে কে?"

তিন

রাত্রিতে মাধবী সুনন্দার দুঃখময় জীবনের ইতিহাস সবিস্তারে কহিল। সুনন্দার বিবাহ অত্যন্ত মন্দ হইয়াছে। অভাগিনী মাসীমা অতি অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন। তাহার পর যাহার মুখ চাহিয়া তিনি দুঃখের মধ্যেও সুখের আলো দেখিতেন, তাঁহার সেই একমাত্র কন্তার যে এমন দুঃখময় জীবন ঘটিবে তাহা তিনি জানিতেন না। এ দুঃখ তাঁহার পক্ষে মর্ম্মান্তিক হইয়াছে।

বিদ্বান চাকুরীজীবী সৎপাত্র দেখিয়া তিনি কন্তা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন কন্তা সুখে থাকিবে। কিন্তু সেই গৃহের অস্বাভাবিক ধরণ তিনি বুঝিতে পারেন নাই। বিধবা শাশুড়ী যে কিরূপ প্রকৃতির তাহা বোঝা যায় না। তিনি তুচ্ছ কথা লইয়া কলহ করিয়া, শেষ পর্য্যন্ত বধুকে প্রহার করিয়া তবে ক্ষান্ত হন।

সুনন্দা মাধবীর নিকট বলিয়াছে যে, অপরাধ ক'রে সব

সহ্য হয়, এমন কি মার পর্য্যন্ত। কিন্তু বিনা অপরাধে ওরা শাস্তি দেয়। তা দিক, আবার নানা যন্ত্রণা দিয়ে অকৃত অপরাধকে কৃত অপরাধ বলে যখন স্বীকার করাতে চায়, তখন সেটা আমার সহ্য হয় না। মিথ্যা আমি সহ্য করতে পারি না।

মাধবী বলিল, "সুনন্দাদি ভারি ভালমেয়ে; অত্যন্ত সত্যবাদী ও স্পষ্টবাদী লোক। ও হীনতা নীচতা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সুনন্দা এখানে রয়েছে, ওর স্বামী নিতে আসে নি?"

মাধবী কহিল, "কোন্ মুখ নিয়ে নিতে আসবে বল? তিন দিন না খেয়ে ঘরের মধ্যে পড়েছিল। ওরা কেউ এমন কি স্বামী পর্য্যন্ত খোঁজ করে নি। পাশের বাড়ীর লোক ছোটমামাকে টেলিগ্রাম করে নিয়ে যায়। ছোটমামা গিয়ে ওকে আর ওর তিন মাসের ছোট ছেলেকে জোর করে নিয়ে এসেছেন। তার জন্য আবার মামার নামে কত বদনাম দিয়েছে, হতভাগা। সেই জন্য সুনন্দাদি আর কখনো সেখানে যাবেন না বলেছেন।"

শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। বড়ই দুঃখের কথা। সুনন্দার বিবাহ ভাল হয় নাই, ইহা শুনিয়াছিলাম। তাহার স্বামী পাগলাটে, তাহার শাশুড়ী লোক ভাল নয়, ইহা জানিতাম কিন্তু তাহার পরিণতি এইরূপ হইয়াছে ইহা এই প্রথম শুনিলাম।

আমাদের মনে হইয়াছিল যে, যাহা মন্দ হইয়াছে সুনন্দার ব্যবহারে ও একসঙ্গে বাস করার ফলে ক্রমে তাহা ভাল হইয়া যাইবে। কিন্তু ইহা যে এইরূপ ভীষণ হইয়াছে এবং মৃদু শিশুপুত্রসহ স্বামীগৃহ ত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছে তাহা জানিতাম না। আমার মাতা নিতান্ত মৃদুস্বভাবা। পত্রে এসকল কথা তিনি কিছুই কোনদিন জানান নাই।

চার

ইহার পর বহুদিন গত হইয়াছে। এম-এ, ল পাস করিয়াছি। মুন্সেফীর চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তাহার পর বহু উচ্চপদের চাকুরীর জন্য নানা চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়া অবশেষে স্কুল-মাষ্টারীতে আসীন হইয়াছি।

পৃথিবীর উপরকার রঙীন আবরণ সরিয়া গিয়াছে। সবুজ গাছ, নীল আকাশ, চাঁদের আলো, সুগন্ধ পুষ্প ভাল লাগিলেও আর তাহা অনির্ব্বচনীয় বলিয়া বোধ হয় না। এবং তাহারি মাধুর্য্যের প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করাটা বৃথা বলিয়া বোধ হয়। ভাল যাহা তাহা ভালই কিন্তু তাহা লইয়া কাব্য করাটা মনে হয় অবান্তর।

মাধবী গৃহিণী হইয়াছে। অনেক অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়া তাহার কৈশোর যৌবন অতিবাহিত হইয়া তাহার মনের প্রভাতের সুমিষ্ট স্নিগ্ধতা এখন যেন মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে বিকশিত হইয়াছে। তাপটা মধ্যে মধ্যে অসহ্য বোধ হয়। তবে তাহা ক্ষণিক। মনে হয় মাধবী সেই মাধবী, তাহার স্নিগ্ধতা, তাহার কঠোরতা সবই আমার নিকট মিষ্ট।

পিতামাতা স্বর্গগত হইয়াছেন। ভগিনীদিগের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ছোট ভাইটী সুদূর বোম্বে সহরে চাকুরী লইয়া বসিয়াছে। আমার বাল্যের আবেষ্টনী বদলাইয়া গিয়াছে। এখন যাহারা ঘিরিয়া আছে তাহারাও আমার সম্পূর্ণ আপনার অন্তরের অতি নিকটের জিনিষ। তাই বুঝি পিতামাতার বিয়োগ বেদনাও ইহারা ভুলাইয়া দিয়াছে।

আমার সংসারে আমার দুইটী পুত্র, দুইটী কন্যা ও মাধবী। জ্যেষ্ঠপুত্র বি-এ পড়িতেছে। জ্যেষ্ঠা কন্যা ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে, বিবাহযোগ্যাও হইয়াছে। তাহার বিবাহসংক্রান্ত খবর লইতে একবার কাশী যাইতে হইয়াছিল। উঠিয়াছিলাম মামার বাটীতে। মাসীমার সহিত, সুনন্দার সহিতও এখানে সাক্ষাত হইল। মাসীমা মায়ের জন্য কাঁদিলেন। আমার গৃহের কুশল প্রশ্ন করিলেন। মাধবীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার পর উঠিল সুনন্দার কথা। তিনি আপনা হইতেই বলিলেন, "সুনন্দা দুইবার স্বামীগৃহে গিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের অন্যায় ব্যবহার ও অত্যাচারে থাকিতে না পারিয়া পুনরায় এখানে চলিয়া আসিয়াছে। আর স্বামীগৃহে ফিরিয়া যায় নাই। তাহার স্বামী একবার আসিয়া তাহার ছেলেটি লইয়া গিয়াছেন। ছেলেটি তখন ছয় মাসের। সুনন্দাকে ফিরিয়া যাইতে তাহার স্বামী অনুরোধ করিয়াছিল, সুনন্দা সম্মত হয় নাই। তখন তাহার স্বামী পুত্রকে পরিচ্ছদ কিনিয়া দিবার ছল করিয়া লইয়া যায়, আর ফিরিয়া আসে না। সুনন্দা ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তখন খোঁজ লইয়া জানিতে পারা গেল যে, তিনি পুত্রটী লইয়া ষ্টেশনে গিয়াছেন। মামা তখনই

সুনন্দার শ্বশুরবাটি যাইতে চাহিয়াছিলেন, সুনন্দা নিষেধ করিয়াছিল। সেখান হইতে তাহার স্বামী সুনন্দাকে লিখিয়াছিলেন ফিরিয়া যাইতে, নচেৎ পুত্রকে তিনি তাহার নিকট রাখিবেন না। এবং ভয় দেখাইয়া লিখিয়াছিলেন আবার বিবাহ করিবেন। সুনন্দাকে তখন মাসীমা ও মামামারা অনুরোধ করিয়াছিলেন ফিরিয়া যাইতে।"

সুনন্দা সম্মত হয় নাই, বলিয়াছিল, "বারবার অপমানিত হয়েছি, তবুও চেষ্টা করেছি থাকতে। কিন্তু ওরা থাকতে দেবে না। অন্যায় অত্যাচার, মিথ্যা বদনাম আমি নির্ব্বিচারে মেনে নিতে পারবো না। কাজেই এই নিত্য ঝগড়া মারামারি ও জোর করে নিজেকে অপমান করার চাইতে এই ভাল। ওদের আমি সম্পূর্ণ মুক্তি দিলাম, আমিও মুক্তি নিলাম।"

মাসীমা বলিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে যে খোকাকেও হারাবি?

তাহাতে সুনন্দা কহিয়াছিল, "ওদের ছেলে ওদের মতই হবে, ভবিষ্যতে হয় ত' আমার মতে মত মিলবে না। আমি ছাড়তে পারছিলুম না, ওরা কেড়ে নিলে। এই ভাল।"

মাসীমা কাঁদিয়া আমাকে কহিলেন, "তুমি হয় ত' জান না বাবা, সনুর দু'টি মেয়ে হয়েছিল, দু'টিই দুই তিন বছরের হয়ে মারা যায়, তারপর অনেক দিন পরে এই ছেলেটি হওয়ায় ছেলের উপর ওর ভারি মায়া হয়েছিল। সেই ছেলে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, তা একটু কাঁদলে না, একটু দুঃখ একটু রাগ করলে না, যেন নির্ব্বিকার। পূজো, গান, কীর্ত্তন, কথকতা এইসব নিয়ে আছে। সংসারের ও যেন কেউ নয়। সবাই বলে, ওই নিয়ে যদি ভুলে থাকে তাই থাকুক। আর ত' ওখানের সঙ্গে ওর সম্বন্ধও রইল না। জামাই আবার বিয়ে করেছে।"

আমি স্তম্ভিত হইয়া শুনিতেছিলাম। কিই বা সান্ত্বনা দিব। চুপ করিয়াছিলাম। আমাদের কথার মধ্যস্থলে একবার সুনন্দা আসিল। মাসীমা নীরব হইয়া গেলেন।

সুনন্দা আমাকে প্রণাম করিয়া প্রশ্ন করিল, "বৌদি কেমন আছেন দাদা? আর ছেলে মেয়েরা?"

আমি বলিলাম, "আগেই বৌদির কথা?"

সুনন্দা হাসিয়া বলিল, "কি করবো বলুন, বৌদির সঙ্গে একসঙ্গে সাত আটমাস ছিলুম, কাজেই আপনাদের কাউকে দেখলে তার কথাই আগে মনে হয়।"

কথাটা সত্য। বাবা বিদেশে চাকরী করার দরুণ মামার বাড়ী খুব কম আমরা আসিয়াছি। পেন্সনের পর বাবা আসিয়া ইহাদের নিকট সাত আট মাস ছিলেন তখন মাধবীও ছিল। কাজেই সুনন্দা বৌদির কথাই বেশী করিয়া স্মরণ করে। মাধবীও সুনন্দাকে ভালবাসে, দুইজনের সখীত্ববর্দ্ধন প্রগাঢ়।

"বসুন দাদা, চা নিয়ে আসি," বলিয়া সুনন্দা চলিয়া গেল।

মাসীমা বলিলেন, "বড় বেশী অভিমানী আর তেজী মেয়ে। আমি কতবার বলেছি বাবা যে মুখবুজে সহ্য করে যা, সুদিন একদিন না একদিন আসবেই।"

ও হাসে বাবা, বলে, "মনে কর মা, আমি তোমার কুমারী মেয়ে, আমার বিয়েই হয় নি। আবার বলে যে, থাকতে হলে নিজের মর্য্যাদা রক্ষা করে থাকবো। অমন মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে, নীচতা ক্ষুদ্রতার মধ্যে বছরের পর বছর আমি থাকতে পারবো না মা, কাজেই ওকথা আর বলো না।"

জলখাবার আসিতে দেরী হইতেছে, মাসীমা আমাকে বসিতে বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

আমি তখন সুনন্দার কথাই ভাবিতেছিলাম। কি সে এমন অত্যাচার, যার জন্য সুনন্দা অনায়াসে হাসিমুখে সব ত্যাগ করিল? আর কোন্ দেবতার শরণ লইয়া সে এমন মনের জোর পাইল? মাধবীর কথা মনে আসে। তাহার ভীষণ টাইফয়েড জ্বরের পর ডাক্তার তাহাকে চেঞ্জেও লইয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। স্কুলমাষ্টারের পক্ষে ঘরভাড়া করিয়া সপরিবারে চেঞ্জে যাওয়া সহজসাধ্য নহে।

মাধবীর এক মামা শিলং থাকিতেন, তাঁহার নিকট মাধবীকে পাঠাইতে চাহিলাম। মাধবী কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইল না, কেবলই বলিতে লাগিল, "সে আমি যাব না, তোমাদের কাছছাড়া হয়ে আমি টিকতে পারবো না। এখানেই আমার শরীর সারবে। আমি যাব না" কাজেই তাহার যাওয়া আর হয় নাই। আর সুনন্দা সেও নারী। স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং…।

পাঁচ

সুনন্দার নূতনতর দুর্ভাগ্যের কাহিনী মনটাকে ভারি নাড়া

দিয়া গিয়াছিল। গৃহে ফিরিয়া নির্জ্জনে গৃহিণীকে সকল কথাই কহিলাম।

চুপ করিয়া সকল কথা শুনিয়া শুধু দাঁতে দাঁত চাপিয়া অস্ফুট শব্দ করিয়া কহিল, "হতভাগা।"

আমি কহিলাম, "কে?" আমার দুর্ভাগ্য, রসিকতা তিনি বুঝিলেন না। প্রত্যুত্তরে একটা তীব্র ঝঙ্কার ও জ্বলন্ত কটাক্ষ লক্ষ্য করিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে সেস্থল হইতে সরিয়া পড়িলাম।

রাত্রিতে শুইতে আসিয়া মাধবী প্রশ্ন করিল, "হাাঁগা সুনন্দাদি রোগা হয়ে গেছে খুব?"

আমি মনোযোগের সহিত বই পড়িতেছিলাম, উত্তর দিলাম, "খুব।"

মাধবী আমার হাত হইতে বই টানিয়া লইল এবং উদ্বেগের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "ভীষণ?"

আমি বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, "কি ভীষণ?"

"এই সুনন্দাদি রোগা হয়ে গেছে?"

"ও এই কথা, না গো না, তোমার সুনন্দাদি একটুও রোগা হয় নি বরং সেরেছে মনে হল। হয় ত' স্বামী বিরহে তোমরা একটু মোটাসোটা হও। সুনন্দাকে দেখে ত' তাই—"

মাধবী খোকাকে সরাইয়া শুইতে শুইতে কহিল, "আহা তোমার সবটাতেই আদিখ্যেতা, বল না সত্যি কথা।"

আমি বলিলাম, "একেবারে সত্যিকথা। দিব্বি আছে সুনন্দা, সংসারের ঝঞ্ঝাট নেই, ছেলের ঝক্কি নেই। দিব্য নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে ঠাকুরপুজো, কীর্ত্তন গান, গঙ্গাস্নান নিয়ে সে বেশ সুখে আছে। পরকাল তার একেবারে সাফ। স্বর্গের রাস্তা সিধে হয়ে রয়েছে। পুণ্যির একেবারে বন্যা বাঁধছে।"

রাগিয়া মাধবী উঠিয়া বসিল। "তোমরা নিজেদের মত সবাইকে দেখ কি না, তাই। এখনও মানুষ চিনতে, তাদের চরিত্র বুঝতে পার না, তাই অমন কথাগুলো মুখ দিয়ে বার করতে পারলে।"

ঝড় আসন্ন। বাম হাত দিয়া টেবল-ল্যাম্পের সুইচটা অফ করিয়া দিলাম।

ঘর অন্ধকার হইয়া গেল। সেই অন্ধকারের মধ্য হইতে মাধবীর কথার উত্তর দিলাম, মেয়েমানুষ চিনতে পারি না।

ছয়

আমার জ্যেষ্ঠাকন্যা খুকুর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সে চলিয়া গিয়াছে তাহার শ্বশুরালয়ে, এলাহাবাদে।

সে এক বিচ্ছেদ-বেদনা। এতদিন ধরিয়া যত্নে স্নেহে, কত শঙ্কা কত আনন্দের মধ্য দিয়া একান্ত আমারি ভাবিয়া যাহাকে মানুষ করিলাম তাহাকে তুলিয়া দিলাম পরের হাতে। নিঃস্ব পর, যাহাদের কোনও দিন দেখি নাই যাহারা কেমন লোক জানি না। হয় ত' তাহাদের সহিত আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, রীতি-নীতি কিছুই মেলে না। সেই তাহাদেরি গৃহে আমার স্নেহলতিকাটি উৎপাটন করিয়া রোপণ করিয়া দিলাম। আবার তেমন দিন আসিবে যখন এখানে আমি ভাবিব,—

"কেমন করে পরের ঘরে থাকিস্ উমা
বল মা তাই?"

আর আমারি দেহসঞ্জাত অন্তরের অন্তরতম স্নেহনিধি কন্যা ভাবিবে,—

"তাই ভাবি গো মনে বিনা নিমন্ত্রণে
কেমন করে যজ্ঞে যাই বল না?"

এমনই হয়।

এ-বিচ্ছেদে সুখ আছে। ইহাকে ভাবিয়া ভাবিয়া এ-বেদনা একটু একটু করিয়া ভোগ করা চলে। কারণ সে আছে। এই বিরাট পৃথিবীর কোনও একটি স্থলে, শুধু আমার আঁখির অন্তরালে সে আছে।

কিন্তু তীব্রতম জ্বালা দিয়া গিয়াছে অজয়, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র। সে জ্বালা নীরবে ভোগ করিতেছি মাধবী ও আমি। সে-বিচ্ছেদজ্বালা অসহনীয়। তাহার সান্ত্বনা ইহজগতে নাই। হঠাৎ একটি মাস কঠিন রোগে ভুগিয়া সতেজ নবীন শালতরুর মত পুত্র আমার চলিয়া গিয়াছে। আমার বার্দ্ধক্যের একমাত্র আশ্রয়, আমার জীবনের আশাদীপ নিভিয়া গিয়াছে। আমার ভবিষ্যৎকে অন্ধকার করিয়া দিয়াছে। সেই বিচ্ছেদজ্বালায় বুকের ভিতরটা জ্বলিয়া যায়। সমস্ত চিত্ত জুড়িয়া জাগিয়া থাকে সেই আয়ত উজ্জ্বল আঁখি, সেই মধুময় স্বরে বাবা ডাক। ভীষণ রোগযন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিয়া অসহায় পিতামাতাকে সান্ত্বনা দেওয়া—আমি ভাল আছি বাবা।

তাহার পর তাহার চলিয়া যাওয়া।

ভাবিতে গেলে আপনার নিকট আপনাকে লুকাইতে চাই। পুত্রশোকের তীব্রজ্বালায় মাধবীর রূপান্তর ঘটিয়াছে। তাহার গলিত মোমের মত নরম মন যাহা সংসারের ঝঞ্ঝাবাতে কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল, সে তাহার কঠিনতা হারাইয়াছে। এই অসহ অগ্নি তাহ'কে নমনীয় করিয়া দিয়াছে।

সন্ত্রস্ত, সঙ্কুচিত, অশ্রুসিক্তা মাধবী যেন অন্য কেউ।

আরো তিনটি সন্তান আমার আছে। খুকু শ্বশুরালয়ে আছে। কনিষ্ঠ দু'টি শোকের উত্তাপ বোঝে নাই, বুঝিয়াছে পিতা-মাতার বেদনা। সান্ত্বনায় চক্ষু ভরিয়া নীরবে চাহিয়া থাকে। তাহাদের ব্যাকুল স্নেহসিক্ত নীরব সান্ত্বনা মনে হয় যেন দাবদগ্ধ মরুভূমির মাঝে শান্তিবারি।

আমার এই বিপদে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন প্রত্যেকেই দুঃখিত হইয়াছিলেন; তাঁহাদের সান্ত্বনা ও দেখাশুনায় আমরা কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলাম।

কাশী হইতে সুনন্দার একখানি পত্র আসিয়াছিল মাধবীর নামে। মাধবী তখন অন্ধকার গৃহকোণে পড়িয়া থাকে, চিঠি পড়িবার মত মনের অবস্থা তাহার হয় নাই। চিঠিখানি খুলিয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু ভাল লাগে নাই। সুনন্দা তাহার বৌদির এই নিদারুণ শোকে ব্যথিত হইয়াছে—তাহা আন্তরিকতার সহিত জানাইয়াছে এবং তবু ঈশ্বর পরম মঙ্গলময় তাঁহার প্রত্যেক কর্ম্ম মানবের মঙ্গলের জন্যই হয়, ইহাও অতি আন্তরিকতার সহিত প্রত্যেক ছত্রে ফুটিয়াছে। কি জানি কেন, ভাল লাগে নাই।

বেদনার্ত্ত মন ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট বিধানকে সহ্য করিলেও মাথা পাতিয়া মঙ্গল বিধান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই।

সে-চিঠি মাধবীকে আঘাত করিবে বলিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলাম

শোকের প্রথম আবেগ ক্রমে শান্ত হইয়া আসিতে থাকে শান্তিপূর্ণ গৃহ মৃত্যু-তাণ্ডবে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, মনে হইল তাহাও ক্রমে স্বাভাবিক রূপ পাইতেছে।

দিনের পর দিন আবার অজয়হীন হইয়াও কাটাইতেছি। প্রবল রোদনোচ্ছ্বাসের সহিত ভাবি, সত্য কথাই তো? চরম সত্যকথা—

"সময় যে নাই
আবার শিশির রাত্রে তাই
নিকুঞ্জে ফোটায়ে তোলো নব কুন্দরাজি
হেমন্তের আনন্দের অশ্রুভরা সাজি।

সাত

দিনের পর দিন কাটিল, ক্রমে বৎসরের পর বৎসর ঘুরিয়া গেল। জীবনের সহস্র কোলাহল কি ক্রমে অজয়কে ভুলাইতেছে? তাহা তো নয়। অভ্যাসে নিমগ্ন থাকি, ভাবিবার সময় আমার নাই। ১০টায় স্কুলে যাই, ৪টায় বাড়ী ফিরি। ইহার ভিতর টিউসনিও সারিতে হয়।

আমার জীবনে বসিয়া ভাবিবার অবকাশ কোথায়? তবু যখন ভাবি বুকের ভিতরটা যেন মোচড় খাইয়া ওঠে—সন্তর্পণে ঢাকিয়া রাখা ক্ষতস্থানে মর্ম্মান্তিক আঘাতের মত লাগে।

মাধবীর সহিত কথা হইলে এখনও অশ্রুধারা গোপন করিতে পারি না। তখন মনে হয়, ইহাই আমার সান্ত্বনা। তাহার জন্য আর কিছু করিবার, আর কিছু দিবার নাই এই টুকুই তাহার উদ্দেশ্যে স্মৃতিতর্পণ।

বহুদিন গত হইল। কনিষ্ঠ পুত্রটি এখন ম্যাট্রিক দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। খুকু সন্তানের জননী হইয়াছে। কনিষ্ঠা কন্যাটি বিবাহযোগ্যা হইয়াছে প্রায়।

আষাঢ়ের বর্ষাচ্ছন্ন এক প্রভাত। জলধারার যেন বিরাম নাই। ঘন মেঘের স্তূপ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া অবিরল ধারা, তাহা কেবলি ঝরিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বেগে পূবে হাওয়া দিতেছে। পূবে হাওয়ার সহিত বর্ষণের দিনে যেন বিশেষ মিতালী।

বয়স হইয়াছে। ঠাণ্ডা হাওয়াটা আর যেন সহ্য হয় না। আজ রবিবার, এই রক্ষা। আজ আর স্কুলে যাইতে হইবে না। বাহিরের ঘরে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলাম। কাগজ-পড়া ভেদ করিয়া আমার ছোট ছেলেটির তাহার মায়ের সহিত বাক্যালাপ কাণে পৌঁছাইতেছে।

"মা আজ মুগের ডালের খিচুড়ী কর। তার সঙ্গে পটল ভাজা, বেগুন ভাজা, বড়ি ভাজা। হাঁা মা, পাঁপর আছে? আচ্ছা বেশ। ও মা! মাছ আসেনি? কেন মা? বৃষ্টি বলে? মাছভাজা হলে আজকের খাওয়াটা খুব ভাল হ'ত।"

কনিষ্ঠা কন্যা ধীরার গলা কানে আসে, "ছোড়দাটা কি হ্যাংলা বাবা, কত খাবারের নামই করছে। আমি ত' অত নামই জানি না।"

বিজয়ের ক্রুদ্ধকণ্ঠ শোনা গেল, "না তুমি ভাজামাছটি উল্টে খেতে জান না। হলে ত' সবই সাঁটাবে।

ধীরুর মিষ্টিগলার হাসি শোনা যায়, "তা, পেলে খাব না কেন? তবে তোমার মত পাবার আগে নামের লিষ্টি আমার মনে থাকে না।" তাহার পর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গাহিয়া উঠিল—

"এস হে সজল ঘন বাদল বরিষণে—"

বিজয়ও বোধ হয় রাগ ভুলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে গলা মিলাইয়া সেও গাহিতে লাগিল।

উভয়ের গলাই মিষ্ট। আর একটি গুণ ইহাদের, গাহিলে দু'জনেই তাহাদের রাগ ভুলিয়া যায়।

চিটৃঠি হ্যায় বাবুজী, বলিয়া পিয়ন আসিয়া দাঁড়াইল। বেচারীর ছাতা হইতে জল ঝরিতেছে। ইউনিফরম জলের ছাটে ভিজিয়াছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপিতেছে।

হাত বাড়াইয়া চিঠি লইলাম। পিয়ন চলিয়া গেল। খামে চিঠি, বেশ ভারি। অপরিচিত হস্তাক্ষর, কার চিঠি?

"হাঁ গা কার চিঠি এল", বলিয়া মাধবী নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। "খুকুর চিঠি নাকি? না, খুকুর ত' নয়, কিন্তু আমার নামে চিঠি, দেখি দেখি", ব্যগ্র মাধবী জলহাত শাড়ীতে মুছিয়া চিঠিখানি লইতে হাত বাড়াইল

কে জানে হয় ত' কি সংবাদ কোথা হইতে আসিয়াছে। মাধবীকে বলিলাম, "আমি খুলে তোমায় দিচ্ছি।"

মাধবী বুঝিতে পারিয়াছিল, কহিল, "না গো না, খারাপ খবর নয়। আচ্ছা, তুমি খুলে পড় আমি শুনি।" মাধবী নিকটে চেয়ার টানিয়া বসিল।

খুলিতেই প্রথম চোখে পড়িল, শ্রীচরণেষু ভাই বৌদি।

আমি বলিলাম, "এ যে সুনন্দার চিঠি।

মাধবী বিস্মিত হইয়া কহিল, "তাই নাকি?" তারপর গভীর আগ্রহের সহিত কহিল, "পড় পড় বহুদিন পরে সুনন্দাদির চিঠি পেলুম। সেই ওর ছেলে কেড়ে নেওয়ার পর থেকে ও আর আমায় চিঠি-পত্র দেয় নি। সে আজ ১৯।২০ বৎসর হয়ে গেল বোধ হয়। আহা কি লিখেছে গা? চেঁচিয়ে পড়।" দেখিলাম মাধবীর সুনন্দার প্রতি ভালবাসা পূর্ব্বের মতই অটুট রহিয়াছে।

পড়িতে শুরু করিলাম।

ভাই বৌদি', বহুদিন পরে আবার তোমায় চিঠি লিখতে বসেছি, তুমি পেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে হয় ত'। এই চিঠির কাহিনী তোমায় আরো আশ্চর্য্য করবে। যে কাহিনী তোমায় শোনাতে বসেছি সে কাহিনী সত্যই বিস্ময়কর। আজ যে তোমায় লিখতে বসেছি তার কারণ,—আমার মনে যে বিস্ময় যে আনন্দ সঞ্চিত হয়ে উঠেছে তা আমি বহন করতে পারি না, এর ভাগ আমি কাকে দিই? মনে পড়ল তোমার কথা। তুমি আমার মনের, আমার ভাবানুভূতির যথাযোগ্য মর্য্যাদা রাখবে, তাই তোমায় জানাচ্ছি। উপযুক্ত একজন কাউকে না জানিয়ে আমি পারছিলাম না, তাই তোমাকে জানাচ্ছি।

বৌদি, আমি ফিরে এসেছি। স্বামীগৃহে নয়, পুত্রের গৃহে। এত শ্রদ্ধায় ও সম্মানে এখানে আমায় এনেছে এবং সাদরে যে রেখেছে—সে আমার পুত্র। পক্ষী-মাতার মত সে আমার মা হয়ে আমাকে ঘিরে রেখেছে। কি আনন্দ, কি আনন্দ! ভগবান্ আমার জন্য এত আনন্দও সঞ্চিত করে রেখেছিলেন।

দিনের পর দিন আমার কেটে গেছে নিঃসঙ্গ, একাকী। সেখানে স্বামীর প্রেম, পুত্রের শ্রদ্ধা কিছুই নেই। ছিল কেবল ঈশ্বর। সেই ঈশ্বরের নিকট এই ব্যর্থ জীবনের ব্যাকুল বেদনা নিবেদন এবং নীরস, কঠোর, শূন্য, ভয়াবহ জীবন থেকে আকুল মুক্তি প্রার্থনা। কি সে জীবন এবং কি তার জীবন অতিবাহন! ভাব বৌদি, নারী তার নারীত্ব বিনা কি বাঁচতে পারে স্বামীকে ভালবাসতে পেলাম না, পুত্রকে স্নেহ করতে পেলাম না, এর চেয়ে শাস্তি আর নারীজীবনে কি আছে?

সবচেয়ে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক অদৃষ্টের উপহাস এই যে, সবই আমার আছে—স্বামী, পুত্র, সংসার—কিন্তু এদের ও আমার জীবনযাত্রা-প্রণালী ভিন্ন। তাদের সুর আর আমার সুর কিছুতেই মেলে না। একটু আধটু তফাৎ হয় ত' মিলতে পারে কিন্তু এতবড় তফাৎকে মেলানো কোনও মতেই সম্ভব নয়। যে সংসার অধর্ম্ম ও কুশিক্ষা, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনাভরা সেখানে আমি কিছুতেই থাকতে পারি নি। ১৮।১৯ বৎসর বয়স থেকে এই দীর্ঘ ৪৯ বৎসর কেটে গেল কিছু না পেয়ে কিছু না দিয়ে। ধীরে ধীরে সংসার থেকে—আমার সংসার থেকে নির্লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলাম। একমাত্র আশ্রয় বরণ করেছিলাম ঈশ্বরের নামগান ও পূজা-পাঠে, এই নিয়ে থেকেছি, সবাই জেনেছিল আমি বিবাগিনী ও সন্ন্যাসিনী, সংসার থেকে আমার স্পৃহা চলে গেছে। আমিও

তাই জেনেছিলাম, আমার ভেবেছি মানবিক স্পৃহা আর কিছুই নাই এখন বুঝেছি যে, মানুষ আপনাকেও সমগ্র চিনতে বুঝতে পারে না, কিম্বা হয় ত' মানুষের মন বহুরূপী, ক্ষণে ক্ষণে তার রং বদলায়।

স্নেহমন্দাকিনী যে আমার অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত গোপনে ছিল তা আমি বুঝতে পারি নি।

মা কাঁদিতেন আমার দুরদৃষ্ট এবং তাঁর দুরদৃষ্ট স্মরণ করিয়া, আমি কাঁদিতাম আমার লোকসমাজে উপহাস্যকর এই অবস্থা ভাবিয়া। জীবনে এমন বিড়ম্বনাও ঘটে!

আমি আমার স্বামীকে ভালবাসিতে পারি নাই, তাহার কারণ, আমার মনে স্বামীর আদর্শ অত্যন্ত উচ্চ ছিল এবং সেই আদর্শের কণামাত্র চিহ্নও আমার স্বামীর মধ্যে ছিল না। কেমন সংসারে আমি লালিত পালিত হয়েছি তা ত' তুমি জান। মা আমার বিধবা হয়েছিলেন মাত্র ১৯ বৎসরে, আমি তখন নিতান্ত শিশু। তাঁহার সংযত, সৌম্য, শান্তমূর্ত্তিতে, তাঁহার বাক্যে, তাঁহার ব্যবহারে প্রকাশ পাইত অতি পবিত্র শুচিতা। মামীমার নিকট শুনেছি তাঁহার স্বামীবিয়োগের সঙ্গে তাঁহার যৌবনের চাঞ্চল্যও বিদায় নিয়েছিল। সেদিন হ'তে তাঁহার মধুর আনন্দময় হাসিও তাঁহার মুখ হইতে চিরবিদায় নিয়েছিল। আমি তাঁহার হাসি দেখেছি, সে হাসি যেন বিষাদ আবরণে আচ্ছাদিত। আমার মনে হয়, পরিপূর্ণ স্বামী-প্রেম হ'তে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহার জীবন উদাস মরুভূমি হইয়া গিয়াছিল। এমনি এক শান্তমূর্ত্তি তপস্বিনী মায়ের কোলে আমার বাল্য অতিবাহিত হইয়াছে।

আর মামা? লোকে জানে তিনি বি-এ ফেল, স্কুলের সামান্য একজন শিক্ষক। কিন্তু এই নিরীহ প্রকৃতির স্বল্পভাষী গম্ভীর সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিটির জীবনের আদর্শ অতি উচ্চ—এক কথায় "High thinking and plain living". বাস্তবিক তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা অসামান্য। বিদ্যানুরাগ ও সুবিশাল পুস্তক সংগ্রহ দেখিলে বিস্ময় মানিতে হয়। তাঁহার নিকট আমার বিদ্যাশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা।

মানুষের ভিতরকার শঠতা, লোলুপতা, লোভ, নীচবৃত্তি দেখিলে আমার অন্তর ঘৃণায় শিহরিয়া ওঠে।

প্রথম যখন দেখিয়াছিলাম, শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাঁহার ননদের পুত্রের দুধের বাটীতে জল ঢালিয়া দুধ বাড়াইতেছেন, আপনার পুত্রকে ভাতের ভিতর লুকাইয়া মাছ দিতেছেন, গৃহের অপর সকলে রুটি খাইতেছে তাঁহার প্রিয়জনরা লুকাইয়া লুচি খাইতেছে, দেখিয়া বিস্মিত হইতাম—ইহাও হয়, এবং এমন কার্য্য করিতেছেন একজন শ্রদ্ধার্হা গুরুজন। আমি তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করি নাই। আমাকে তিনি যেদিন ডাকিয়া লইয়া এমনি একটি কার্য্যের ভার দিতে চাহিয়াছিলেন, আমি সম্মত হই নাই। তিনি আমাকে ভুল বুঝিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন, কিছু ভয় নাই কেহ জানিতে পারিবে না।

আমি আমার দৃঢ় অসম্মতি জানাইয়া বলিয়াছিলাম যে, এ রকম কাজই আমাদ্বারা সম্ভবপর হইবে না।

সেইক্ষণে তাঁহার মূর্ত্তি বদলাইয়া গেল, তিনি ভাবিলেন, ইহা আমার ভালমানুষীর অভিনয়। তাহার পর সুরু হইল আমার উপর অত্যাচার, নানা মিথ্যাপবাদ, অত্যাচার ও প্রহার। তবু তাহা আমার সহ্য হইয়াছে, তাঁহার মত নারীর নিকট ইহার বেশী প্রত্যাশা করা অন্যায়। তিনি তাঁহার প্রকৃতি অনুযায়ী করিতেন।

সব চেয়ে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল আমার স্বামীর আচরণ, একজন শিক্ষিত ব্যক্তি, বড় অফিসার, তিনি নাকি আট শত টাকা বেতন পান—ইঞ্জিনিয়ার। তাঁহার মনোবৃত্তি দেখিলে লজ্জায় মাথা হেঁট করিতে হয়।

তিনি জানিতেন, মায়ের অত্যাচার হইতে স্ত্রীকে বাঁচাইতে নাই, কারণ, তাহা হইলে তিনি লোকসমাজে স্ত্রীর অনুগত বলিয়া নিন্দিত হইবেন। সেই কারণে বরং তিনি মায়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া সর্ব্বসমক্ষে বধূকে কটুবাক্য কহিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ইহা ছিল তাঁহার পুরুষত্বের গৌরব।

তাঁহার মায়ের হীন মনোবৃত্তিসূচক কার্য্যগুলি তিনি সুমধুর হাসিয়া সমর্থন করিয়া বলিতেন, ইহা নাকি মাতৃস্নেহের প্রগাঢ় পরিচয়।

হইবেও বা!

সব সহ্য হইত—হইত না কেবল তাঁহার জঘন্য স্বার্থপরতা, ইতরতা। যে ব্যক্তি দিনের আলোকে মায়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া শত সহস্র গালি সবার সমক্ষে দিয়াছেন, সেইদিনই রাত্রিকালে সেই ব্যক্তির একেবারে ভিন্নরূপ—যুক্তিহীন যুক্তি দিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন এবং প্রেমভিক্ষা। কি সে বিড়ম্বনাময় মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণাপূর্ণ রাত্রি—সেগুলো আজও ভাবিতে হৃৎকম্প হয়।

তবু আমি ছাড়িয়া চলিয়া আসি নাই, আজ তাহা ভাবিতে আশ্চর্য্য বোধ হয়। যাহাকে ভালবাসি নাই, ভক্তি করি নাই—শুধু ঘৃণা যেখানে ছিল, তাহার সহিত বৎসরের পর বৎসর কাটাইলাম কি করিয়া? বোধ হয় শুধু বাঙ্গালীর কন্যা বলিয়া, এত সহ্যগুণ আর কাহারো নাই।

আজ তো এক মুহূর্ত্তও তাহাকে সহ্য করিতে পারিব না। আজ মনে হয়, সেই অসহায় আত্মসমর্পণ ছিল আমার রকযন্ত্রণা। সেই গৃহ ছিল আমার পক্ষে কারাগার। সেখানে আমার সত্তা, আমার স্নায় শ্বাসরুদ্ধ হইয়াছিল। স্বামীকে ভালবাসিতে পারি নাই, তবু একত্রে বহুদিন বাসের ফলে যেটুকু মমতা আসিয়াছিল, সেটুকু বন্ধন ছিল, তাহার ব্যবহারে তাহা জন্মের মত ছিন্ন হইয়া গেল। মিথ্যাবাদী যেদিন, "মা দেখিতে চাহিয়াছেন, তিনি কাশীতে আসিয়াছেন" —এই মিথ্যা কথা বলিয়া আমার স্তন্যপায়ী ছয় মাসের শিশুকে আমার বুক হইতে ছিনাইয়া লইয়া গেল, সেইদিন আমার সকল মমতার বিসর্জ্জন হইয়া গেল। আমি মুক্তি পাইলাম।

যে মা পর পর দুইটী সন্তান হারাইয়া এই শিশুকে কোলে পাইয়াছে, যে শিশুর আহার মাতৃদুগ্ধ, তাহাকে কাড়িয়া লওয়া, এ কি কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব?

আমার মন শুব্ধ হইয়া গিয়াছিল। সেই নৃশংসতায় এক মুহূর্ত্তে আমার সঙ্কল্প স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলাম। আমি স্থির করিয়াছিলাম, ওরা আমার কেউ নয়। ইহজগতে একমাত্র ভগবান্ ছাড়া আমার কেহ নাই আমি কাহাকেও চাহি না।

তবু অবুঝ অন্তর আমার কাঁদিয়া মরিত সেই শিশুর কথা স্মরণ করিয়া।

কিন্তু সকল ব্যথা ও কাতরতা চাপিয়া দিনের পর দিন মুখের হাসি অম্লান রাখিয়াছি আমার সন্ন্যাসিনী মায়ের মুখ চাহিয়া। আমার কাতরতা যে শতগুণ হইয়া তাঁহার বুকে বাজিবে? আমার মা, তাঁহার যে আর কেহ নাই!

সারাদিন গান গাহিয়াছি, পূজা করিয়াছি। রাত্রির পর রাত্রি নিঃশব্দে চোখের জলে উপাধান ভিজিয়াছে। মনে পড়িত তাহার আমার নিকট আসিবার ব্যাকুলতা। দিনের পর দিন আমাকে না পাইয়া সে কি করিতেছে? গভীর দীর্ঘশ্বাসের সহিত তীব্র আক্ষেপ মনে জাগিত ওরে তোরা কি মানুষ!

তাহার পর মাস কাটিল, বৎসর ঘুরিল।

এই জীবনে ক্রমে অভ্যস্ত হইতে লাগিলাম। শুনিলাম ইঞ্জিনিয়ার বিবাহ করিয়াছেন। তাহা করুন, তাহাতে দুঃখ বোধ হইল না।

সকালে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া পূজায় বসিতাম, পূজা সারিয়া মামার লাইব্রেরী-ঘরে পড়িতে বসিতাম। মামা আমায় নিয়মিত পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, সেই পাঠ সমাধা করিয়া মামার জ্ঞানারণ্যের নানাবিধ পুস্তক পাঠ করিতাম।

দুপুরে মা ও মামীমার নিকট শুইয়া গল্প করিতাম, গান গাহিতাম, কোনওদিন তাঁহাদের পদসেবা করিয়া তৃপ্তি পাইতাম।

সন্ধ্যায় শ্যামসুন্দরের আরতি করিয়া কীর্ত্তন গাহিতে বসিতাম। মামা, মামীমা ও মা আমার শ্রোতা ছিলেন। বৎসরে একবার করিয়া আমরা চারিজনে তীর্থ পরিভ্রমণে বাহির হইতাম। ইহা ছিল আমার মামার একটি বিশেষ ব্যসন।

দীর্ঘ ২৫ বৎসর আমার এই নিয়মেই অতিবাহিত হইয়াছে ইহার যে পরিবর্ত্তন হইবে তাহা জানিতাম না। কিন্তু দীর্ঘ ২৫ বৎসর বাদে আমার জীবনে প্রভাত আসিল—অকলঙ্ক আনন্দময় প্রভাত।

পূজা সারিয়া আসিয়া লাইব্রেরী-ঘরে বসিয়াছি। পাঠ্য-পুস্তকগুলি টেবিলে সজ্জিত করিয়া রাখিতেছি। মামা আসিলে পাঠ বুঝিয়া লইব।

মামা গিয়াছেন বাজার করিতে, দৈনিক তরিতরকারীর জন্য। মা ও মামীমা রন্ধনগৃহে রহিয়াছেন।

মামার লাইব্রেরী-ঘরটি প্রশস্ত। তাহার সম্মুখে একখানি ছোট ঘর—সেখানি বৈঠকখানা। বাহিরের কেহ আসিলে সেইখানে বসিয়া মামা কথা কহেন। বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু আসিলে তাঁহাকে মামা লাইব্রেরী-ঘরে আনিয়া বসান। এই লাইব্রেরী-ঘর ও বসিবার ঘরের মধ্যে পর্দ্দা আছে।

বাহিরের ঘরে পদশব্দ ধ্বনিত হইল। কেহ বোধ হয় আসিয়াছেন মামার সহিত সাক্ষাত করিতে। একবার পর্দ্দার পানে চাহিয়া আবার আপনার পাঠে মন দিলাম।

ভাবিলাম, মামাকে ডাকিলে তবে যাইয়া বলিব, মামা গৃহে নাই।

নিঃশব্দে খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল। যে আসিয়াছে সে ত' আমাকে ডাকিল না বা তাহার চলিয়া যাইবার কোন শব্দও কাণে আসিল না। কে আসিল? না ডাকিয়া চুপ করিয়া রহিল কেন?

কৌতূহল হওয়ায় উঠিলাম দেখি কে? কি প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিয়া লইব। এবং মামা এখন গৃহে নাই তাঁহার ফিরিতে হয় ত' বিলম্ব হইতে পারে তাহাও বলিব।

আমি মামার অনুমতি পাইয়া সকলের সমক্ষেই বাহির হইতাম। মামা বলিতেন, মানুষ মানুষকে দেখিয়া লুকাইবে কেন? মেয়েও মানুষ, পুরুষও মানুষ। নিঃসঙ্কোচে ভদ্র ব্যবহার মানুষ মানুষের সহিত করিবে, তাহাতে লজ্জার কি আছে।

কাজেই মামার অনুপস্থিতিতে প্রয়োজনবশতঃ কেহ আসিলে আমি তাহাদের সহিত প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা কহিতাম। পর্দ্দা সরাইতে দেখি, একটি যুবক দাঁড়াইয়া আছে। না, না, যুবক নয়, আমি ভুল বলিতেছি বৌদি, সে যুবক নয়, সে কি? কি করিয়া বলিব? কেমন তাহার আকৃতি শুনিবে? সেই যে বৈষ্ণবগ্রন্থে বর্ণনা আছে—

"কিশোর বয়স বেশ
মাথায় চাঁচর কেশ
মুখে হাসি আছে
মিলাইয়া রে।"

ঠিক তেমনি। আমি বর্ণনা করিতে পারিতেছি না বৌদি, আমার নয়ন ভরিয়া, আমার অন্তরে অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি ভরিয়া দিয়া, সে রহিয়াছে বৌদি, আমি কেমন করিয়া বলিব সে কেমন!

আমাকে দেখিবামাত্র সেই ছেলেটী অগ্রসর হইয়া আসিয়া আমার পদধূলি গ্রহণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আমার মুখের পানে তাকাইয়া সহজস্বরে কহিল, "মা, আমি তোমায় নিতে এসেছি।"

আমি বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, "তুমি কে? কোথায় নিয়ে যাবে?" আমি বুঝিতে পারি নাই সে কে! আমি তখন বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছিলাম এ কে? আমাকে মা বলে কেন? আমাকে কোথায় লইয়া যাইতে চায়?

আমার অদৃষ্টের এমনি বিড়ম্বনা যে আমি মা হইয়া পুত্রকে চিনিতে পারি নাই।

তাহার সেই বড় বড় চক্ষু দু'টি তখন অশ্রুপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, মুখ নীচু করিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "মা, আজ আমার কতবড় লজ্জা যে তোমার কাছে আমাকে নূতন করে আত্ম-পরিচয় দিতে হচ্ছে। মা, তুমি আমার বাবাকে, আমার ঠাকুরমাকে ক্ষমা কর। মা, আমি তাঁদের হ'য়ে তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রছি, আর আমার বাড়ীতে আমি আমার মাকে নিয়ে যেতে এসেছি মা, আমি তোমার ছেলে—শঙ্কর।'

শঙ্কর! আমার ছেলে শঙ্কর! আমার পা-দু'টি থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল, আমার মাথার ভিতর যেন কিসের বাজনা বাজিতেছে, আমার চোখের সম্মুখে অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল।

সকল বেদনাবোধ ছাপাইয়া কি তীব্র আনন্দে দেহমন অবশ করিয়া দিতেছে? শঙ্কর, আমার ছেলে শঙ্কর!

তাহার পর কি হইয়াছিল আমার মনে নাই, এ-টুকু মনে আছে যে, পড়িয়া যাইবার আগে এক সুকোমল বাহুবন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছিলাম। মায়ের ব্যাকুল কণ্ঠস্বর, মামীমার চীৎকার কাণে আসিয়াছিল। আমি অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিলাম।

জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে দেখিলাম আমি শুইয়া আছি, মা মামীমা ব্যাকুলনেত্রে আমার মুখের পানে চাহিয়া আছেন। মামা দাঁড়াইয়া আছেন। আর বৌদি, আমার ছেলে আমার নিকটে বসিয়া আমাকে বাতাস দিতেছে। পুত্রের উদ্বেগ-ব্যাকুল শুশ্রূষা।

উহারা কাড়িয়া লইতে পারে নাই, আমার অসহায় শিশুপুত্র আজ পরিণত সক্ষম হইয়া আমার ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়াছে।

ইহার পর আমি ফিরিয়া আসিয়াছি, স্বামীর গৃহে নয়, পুত্রের গৃহে। তাহার আপন সহজ অধিকারে শঙ্কর তাহার মাতাকে তাহার গৃহে ফিরাইয়া আনিয়াছে

সেই দিনটি কেবল মনে হয়, কত অকুণ্ঠ অধিকারে শঙ্কর বলিয়াছিল, "মা, আমি তোমায় নিতে এসেছি।" যেন আমি কয়েকদিনের জন্য পিত্রালয়ে আসিয়াছিলাম—আমার পুত্র লইতে আসিয়াছে। দীর্ঘ ২৪।২৫ বৎসর মনে হইয়াছিল কয়েকটা দিন মাত্র

আজ আমি আমার উপার্জ্জনক্ষম পুত্রের গৃহে শ্রদ্ধায় সম্মানে গৌরবপূর্ণ মায়ের আসন অধিকার করিয়াছি।

আমার প্রতি তাহার যত্নের, ভক্তির যেন সীমা নাই।

আমি কুণ্ঠিত হইলে সে লজ্জিত হয়, বলে, "এ-ত' তোমার নিজস্ব পাওনা মা। এতদিন আমার মাকে বঞ্চিত করে এঁরা রেখেছিলেন এবং এমন দেবীর মত মায়ের সেবা থেকে আমি বঞ্চিত ছিলাম, কাজেই পুষিয়ে নেওয়া দরকার ত'।"

তাহারই মুখে শুনিয়াছিলাম যে, জ্ঞান হইয়া পর্য্যন্ত ঠাকুরমা ও অন্যান্য পরিজনদিগের মুখে আমার কুৎসাই সে শুনিত। বালক অবস্থায় তাহা সে বিশ্বাসও করিত।

ক্রমে বড় হইয়া যখন শুনিত তখন আপনার বিচারবুদ্ধি দিয়া সে বিচার করিত যে, এ ত' কেবল একতরফা নিন্দা, তিনি যে এত নিন্দার্হ কিন্তু তবু তিনি তাঁহার কোনও দাবীই ত' এঁদের কাছে উত্থাপন করেন না। সে সর্ব্ববিষয় জানিতে চাহিত এবং সেই জানার ভিতর দিয়াই সে তাহার মায়ের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করে। এবং তখন হইতেই সে ব্যাকুল হয় মাকে নিকটে পাইবার জন্য।

তাহার ঠাকুরমা অনেক উপহাস ও কটূক্তি করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন যে, ও-সব মন্দ মেয়েরা আর ফেরে না। শঙ্কর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, মাকে সে উপার্জ্জনক্ষম হইলেই নিকটে আনিবে—মা তাহার আসিবেনই। সে যাহার গর্ভে জন্মিয়াছে সে কখনও মন্দ হইতে পারে না। এখন সে আনন্দিত হইয়াছে যে, তাহার প্রতিজ্ঞা সফল হইয়াছে।

আমার জন্য সে পূজার ঘর করিয়াছে, তাহা দেখিলে লোভ হয়। আমার চিরদুঃখিনী মা এই আনন্দ বেশীদিন ভোগ করিতে পারেন নাই। তিনি শঙ্করের কোলে মাথা রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন অল্পদিন হইল। আরো শোন, আমার শাশুড়ী আজও জীবিত আছেন এবং তাঁহার মনের পরিবর্ত্তনও হয় নাই।

পূর্ব্বে তিনি বলিতেন দাঁতে দাঁত পিষিয়া, "এইখানে থাকবি হারামজাদী, তোর ভণ্ডামী বার ক'রে দেবো, দরকার হ'লে পায়ে থেঁৎলাবো।" সেই চোখের চাহনী এখনও আছে। তবে অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, তাঁহার মুখ ফুটিবার উপায় নাই। তাঁহার পরম আদরের পৌত্র শঙ্কর জানাইয়াছে, আমার মায়ের যেন এতটুকু অসম্মান না হয়। তাহা আমি কোনও মতেই সহ্য করিব না।"

তাঁহারি চোখের সম্মুখে পরম শ্রদ্ধায় আজ আমি দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত।

কালের চাকা বেগে আবর্ত্তিত হইতেছে—সুখানি চ দুঃখানি চ—তাই নয় কি? ইতি

সুনন্দা"

মৃত্যুর গান শুনি

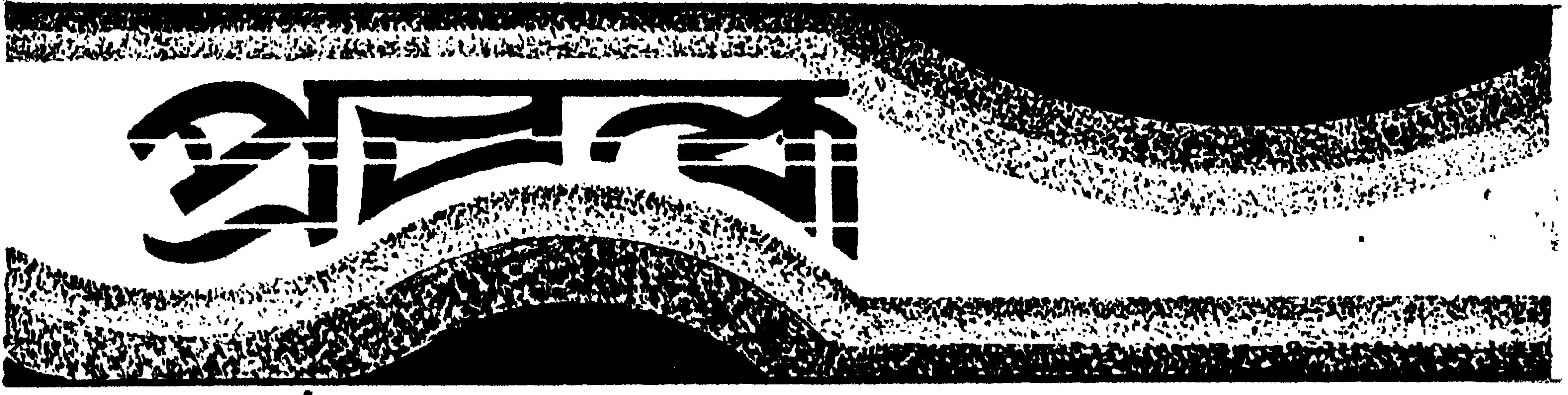
শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য

আজিকে কী সুর ধরিব কাব্যরাণী?
চারিদিকে হেরি মৃত্যু অগ্নি-শিখা!
ধ্বংশ ভয়াল স্বার্থের হানাহানি
আহতা পৃথিবী—নিঠুর ভাগ্য শিখা।
এ যুগের কবি দেখে না সুখের ছবি,
মেলে না প্রগাঢ় স্বপ্নাঞ্জন-পাখা—
মলিন আকাশ, নভোলীন ক্ষীণ রবি,
এ যুগেরে করে অশ্রুবেদনা মাখা।
হিংসা আজিকে শান্তিরে নাশ করে,
ঈর্ষা ধরায় অগ্নির দাহ আনে।
ক্ষমতা দৃপ্ত শক্তির ব্যাভিচারে,
কাঁদে ধরিত্রী—মহা আশঙ্কা মানে।
ভালবাসা নাই, নাহি প্রেম, নাহি প্রীতি
দয়ালীন হৃদিযন্ত্র জীবন-ধারা!
যুগের কাব্য মলিন অশ্রুগীতি,
সুরহীন বাণী করুণ ছন্দহারা!
এর মাঝে কোথা কাব্য কোমল কথা?
কোথা নির্ঝর, কোথা সুরজাল, গুণী?
হায় জীবনের কোথায় সার্থকতা,
শুধু সকাতর মৃত্যুর গান শুনি।

সেতু

শ্রীঅরূপ ভট্টাচার্য্য

এ-পারে ও-পারে দুটো আঁকা-বাঁকা পথ
মাঝখানে নদী যায় বয়ে
কল-কল ছল ছল তরঙ্গ উছল
ওদের প্রাণের যত কথাগুলো কয়ে।
এ-পারের তীরে তীরে জাগে ফুলদল
প্রভাতের লঘু-হিমে শিশির সজল
হায়!
দিবসের খর তাপ
মুছে নেয় তায়
প্রতিদিন।
গান আছে, আছে সুর
তবু প্রাণহীন।
ও-পারের তীরে তীরে ফোটে মেঠোফুল
ভরিয়া দুকুল
সুরভি তাহার
এ-পারের বায়ু যায়
লয়ে ঐ পার।
পাঠায় সে বাণী—
'মাঝের এ-ব্যবধান
করে দিয়ে অবসান
কেমনে তোমার সাথে
মিলিব কি জানি?'
দু'জনেই দিনে দিনে
বাঁকা পথ চিনে চিনে
নদীর কিনারে আসি
শুধাইল তারে
ব্যথাহত ভারে,
"ওগো নদী, তুমিও মিলেছ জানি
সাগরের সাথে
জীবনের ছন্দপূর্ণ কোন এক রাতে
জান ত' লতার কথা,
যে-তরু তাহারে চায়
যদি না জড়াতে পায়
কি যে তার ব্যথা?"
মেলে না উত্তর!
যেন বয়ে যায়
আপন মিলন রাগে
স্বীয় গরীমায়।
ছন্দে তার মনে হয়
মিলনের পথে বুঝি
বহু বাঁধা রয়।
কেটে গেল দিন, অগণিত দিন।
কত না চাঁদের আলো
উভয়ে বেসেছে ভালো।
হৃদয়েতে কত যে ফাগুন
দু'জনায় জেলেছে আগুন।
নাহি তার কোন ইতিহাস
কহিলে তা কারো কাছে
শুনাইবে শুধু পরিহাস।
থাকুক্ সে-কথা
তাহাদের ব্যথা
যত আবেদন
মিনতি বেদন।
তাই বুঝি কেহ
দু'য়ের মিলন হেতু
গড়ে দিল সেতু
নিয়মের মহিমায়।
নীচে তার কুলু কুলু
নদী বয়ে যায়।
বরষা আকুল যদি
ভাঙ্গে তার পার
যে সেতু গড়িল আজি
ভাঙ্গিবে কি আর?



প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও বিদ্যানুশীলন

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

দিগ্‌বিজয়ী মহাবীর সেকেন্দর শা একদিন বিস্মিত ও চমকিত হইয়া এই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"কি বিচিত্র এই দেশ!" * * * সত্য সত্যই বিচিত্র এই দেশ। বিচিত্র তার ভাবধারা, ভাষা, জাতি ও কৃষ্টি। বিচিত্র তার কাহিনী—বৈচিত্র্যময় তার ইতিহাস। প্রাচীনা এই ভারতভূমি জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রসূতি বলিয়া জরতী পিতামহীর সমুচ্চ স্থান আজিও অধিকার করিয়া আছে। কোন্ আদিম পরম রমণীয় প্রভাতে বৈদিক ঋষির সামগানে তপোবন ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল ইতিহাস তাহা সঠিকভাবে বলিতে পারে না। কেমন করিয়া অরণ্য হইতে সভ্যতার সৃষ্টি হইয়া প্রকাণ্ড সমাজ-সৌধ রচিত হইয়াছিল এবং জীবনকে পূর্ণ পরিণতির দিকে টানিয়া নিয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। শান্তরসাস্পদ তপোবনের তপোধনেরা যে মণি মঞ্জুষা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা জ্ঞান ও বিজ্ঞান-জগতে অতুলনীয় অমর অবদান। প্রাচীন ভারত সাহিত্য, কাব্য, দর্শন ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞান ব্যতীতও গণিত (জ্যামিতি, বীজগণিত) জ্যোতিষ, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, বাস্তুবিদ্যা, রাজনীতি (বার্ত্তা, দণ্ড) আন্বীক্ষিকি (Logic) সঙ্গীত এমন কি কামশাস্ত্রে পর্য্যন্ত চরম উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছে। আজও সেই সব প্রণেতাদের অতুল জ্ঞান-গাম্ভীর্য্য, অসামান্য পাণ্ডিত্য, অনুপম মনীষা, তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি দেখিয়া জগতের জ্ঞানি-গুণিবৃন্দ স্তম্ভিত ও বিস্মিত হ'ন। আমাদের ভাষা, আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের কাব্য, ললিতকলা, বিজ্ঞান, স্থপতি, ভাস্কর্য্য, পুরাণ, দর্শন, তন্ত্র, মন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতির্ব্বেদ—পরম গৌরবের সামগ্রী। আমাদের রাম, রঘু, অজ, দিলীপ, ভরত, আমাদের ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অর্জ্জুন—আমাদের বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর—আমাদের ধ্রুব, নারদ, প্রহ্লাদ, নচিকেতা, শ্বেতকেতু—আমাদের সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, সতী, মদালসা—আমাদের বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, রামানুজ, মধ্বাচার্য্য—আমাদের শবরস্বামী, উদয়ন, বাচস্পতিমিশ্র—আমাদের কপিল, কণাদ, গৌতম, পতঞ্জলি, ব্যাস—আমাদের শূদ্রক, ভাস, সৌমিল্ল—আমাদের সায়ণ, কৌটিল্য, বৃহস্পতি,—আমাদের বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, ভারবি, ভর্ত্তৃহরি, শ্রীহর্ষ, কহ্লন, দণ্ডী, বাণভট্ট,—আমাদের গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, উভয়ভারতী, লক্ষ্মীদেবী, অনসূয়া, আত্রেয়ী, যমী, অত্রি, অদিতি, দশাশ্বতী, বাক্, অপালা, বিশ্ববারা, লোপামুদ্রা, দেবহুতি, অরুন্ধতী, জবালা, সুলভা, গৌতমী প্রভৃতি চিরস্মরণীয়া মহীয়সী রমণীবৃন্দ—আমাদের শীলভদ্র, দীপঙ্কর, আর্য্যভট্ট, নাগার্জ্জুন, ভাস্করাচার্য্য, ও কুমারিল ভট্ট—আমাদের অশোক, মহেন্দ্র, সঙ্ঘমিত্রা ও সন্ন্যাসী উপগুপ্ত—আমাদের চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, লোচন-দাস, কৃষ্ণদাস, জ্ঞানদাস ও বৃন্দাবন দাস—আমাদের পক্ষধর মিশ্র, রঘুনাথ ও রঘুনন্দন—আমাদের মীরাবাঈ, অহল্যাবাঈ, করমেতিবাঈ, সংযুক্তা, পদ্মিনী, বিষ্ণুপ্রিয়া, শৈব্যা ও রাণী ভবানী—আমাদের মঠ, মন্দির, চৈত্য, বিহার, মৃগদাব, সারনাথ, কার্লে, কৈলাস, অজন্তা, ইলোরা, নালন্দা ও তক্ষশীলা—আমাদের প্রয়াগ, বারণসী, শ্রীরঙ্গম্, পুরুষোত্তম, ভুবনেশ্বর, কন্যাকুমারিকা, অনাদি জ্যোতির্লিঙ্গ উজ্জয়িনী, রামেশ্বর, সোমনাথ, দ্বারকা—আমাদের প্রাচীন তীর্থ কুরুক্ষেত্র, পুষ্কর, প্রভাস—আমাদের দেবভূমি গয়া, মথুরা, শ্রীধাম নবদ্বীপ ও শ্রীবৃন্দাবন—আমাদের পুণ্যসলিলা রেবা, যমুনা, গঙ্গা, গোদাবরী, কাবেরী—আমাদের চন্দ্রশেখর, বিন্ধ্যাচল ও দেবতাত্মা হিমালয়—ভারতের অণু, পরমাণুকে

পূত ও পবিত্র করিয়াছে। তাহারা সাহিত্য কাব্যেরও উৎস, জ্ঞান-বিজ্ঞানের হিমাচল, দর্শনের ভিত্তিভূমি ও জাতীয়তাবোধের প্রস্রবণ। তাঁহারা জোগাইয়াছেন হৃদয়ে বল, কণ্ঠে ভাষা, লেখনীতে অমৃতময়ী বাণী। হাজার হাজার বৎসর অতীত হইয়াছে ঐ সব মনীষী পার্থিব-লীলা সম্বরণ করিয়াছেন; কিন্তু বাহ্যতঃ ভারতের মূর্ত্তি বদলাইলেও সেই tradition সমান ভাবেই চলিয়াছে। তাঁহাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্রের অনুশাসন, আধ্যাত্মিক মার্গ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় সমাজ এখনও মানিয়া চলিতেছে এবং তাঁহাদের দূরসন্ধানী আঁখির, ক্ষুরধার বুদ্ধির, অদ্ভুত মনীষা ও অসীম প্রেম-ভক্তির অমৃতময় ফুল ও ফলস্বরূপ যে কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, তাহা বর্ত্তমান অবনতাবস্থায়ও বিশ্বের দরবারে আমাদিগকে একটু ঠাঁই দিয়াছে।

সত্যকথা বলিতে কি, এই ভারতে বসিয়া জীবনের অভীষ্ট সাধনের সমস্ত উপাদান ও বিবিধ সামগ্রী লাভ করা যায়। ভারতের নৈসর্গিক সংগঠন এমনই বিচিত্র, মহান্ ও মাহাত্ম্য-পূর্ণ যে উহা কর্ম্মভূমি ও আধ্যাত্মভূমি না হইয়াই পারে না। ভারতের উত্তর প্রান্তে দেবতাত্মা হিমালয় হৃদয়-কন্দরে অমূল্য রত্নরাজি ধারণ করিয়া অটলভাবে দণ্ডায়মান—আর তাহারই বক্ষোনিঃসৃত তটিনী সকল লহরীর পর লহরী তুলিয়া নৃত্য-চপল ছন্দে নূপুর-শিঞ্জিত পদে উদ্দাম বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমান যুগের উন্নত ও সভ্যতাভিমানী জাতিবৃন্দের পূর্ব্বপুরুষেরা যখন বৃক্ষবিবরে বাস করিয়া আমমাংস ভক্ষণ করিতেছিলেন, তখন ভারতবর্ষ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে সমাসীন—ভারতের জ্ঞান-সূর্য্য তখন দিগ্ দিগন্তে সহস্র রশ্মিজাল বিতরণ করিয়া মধ্যাহ্ন-আকাশে সগৌরবে—দীপ্যমান। প্রাচীর ললাট রঞ্জিত করিয়া শিক্ষা ও সভ্যতার কিরণমালা ভারতের মুখমণ্ডলকে প্রথম উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত করিয়াছিল। বিশ্বস্রষ্টা কিরূপ তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া অনন্ত শক্তিরাশির অনন্ত বিকাশ-ভাণ্ডার সাম্যাবস্থায় তুষকে থরে থরে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। ভারতবর্ষ যেন সৃষ্টিবৈচিত্র্যের পূর্ণ লীলাভূমি। ভারতের তুষারমৌলি অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ, ফুল্লকুসুমিত ও বিচিত্র সৌরভে আমোদিত বন-উপবন, যোজনের পর যোজনব্যাপী শস্যশ্যামল উর্ব্বর ক্ষেত্রসকল, কলকলনিনাদিনী তরঙ্গিণী সকলের উপমা অন্যত্র মিলে কি? এখানেই—ষড়্ঋতু পালাক্রমে হাত ধরাধরি করিয়া সখ্যভাবে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। তাই এ দেশ সকল দেশের আদর্শ ভূমি—লোকনিবাসের পূর্ণ আদর্শ স্থল। যিনি যে রসেরই রসিক হ'ন না কেন, বিচিত্র রসময়ী প্রকৃতি তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবে। ভারতের মাটিই ভারতকে প্রথম হইতে মহাকবি,জ্ঞান-বিজ্ঞান-বেত্তা, দার্শনিক, যোগী ও মননশীল অতিমানবের জন্ম দিয়াছে। তাই ক্ষেত্রানুযায়ী বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে। যে সকল অনুকূল কারণ বিদ্যমান থাকিলে দেশ শ্রী, সম্পৎ ও সৌভাগ্যশালী হয়, ভারতে তাহার কিছুরই অপ্রতুল ছিল না। অন্যান্য দেশ ভোগভূমি—আর ভারতই কেবল অধ্যাত্ম-ভূমি। বিষ্ণুপুরাণে আছে :—

"গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্তু তে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গ ভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ।"

স্বর্গের দেবত্ব অপেক্ষাও ভারতে মনুষ্যদেহ লাভ করা শ্রেয়ঃ; কেন না সুকৃতিগণই এখানে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বর্গাপবর্গ লাভ করিয়া থাকেন।

শিল্প ও স্থপতিবিদ্যা

মানুষের রুচি যখন মার্জ্জিত হয়, বুদ্ধি যখন নির্ম্মল ও সূক্ষ্ম হয়, সেই সময়ই শিল্প-প্রতিভার বিকাশ হইয়া থাকে। প্রাচীন ভারত কাহারও আদর্শ অনুসরণ বা অনুকরণ না করিয়াই শিল্প ও স্থপতি-বিদ্যায় যেরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। যাহারা রামায়ণ, মহাভারত বা প্রাচীন কাব্যাদিতে অযোধ্যানগরীর বর্ণনা, মথুরাপুরীর সেই অলোকসামান্য সাজসজ্জা, ইন্দ্রপ্রস্থ রাজসভা-নির্ম্মাণের কলা-নৈপুণ্যের কথা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বিস্মিত ও প্রশংসা-মুখর না হইয়াই পারেন না। আজিও অজন্তা, ইলোরার শিল্প-কীর্ত্তি বিশ্বের গুণিবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং সেই সব স্বপ্নসুষমাময়, রহস্যজালে-ঘেরা অনুপম শিল্পসম্ভার দর্শন করিবার জন্য অপর গোলার্দ্ধ হইতে পর্য্যন্ত কত কত গুণজ্ঞের সমাবেশ হইতেছে। কি স্থাপত্য, কি শিল্প, কি চিত্র-বিদ্যায় প্রাচীন ভারত লোক-

লোচনের সম্মুখে স্বর্গের মাধুরী সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতের দেব-মন্দিরগুলি যেন ত্রিদিবের শোভায় শোভান্বিত হইয়া কি এক মহান, অব্যক্ত, অপার্থিব গাম্ভীর্য্য ও মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছে। প্রাচীন যুগের বৌদ্ধমন্দির, সঙ্ঘারাম, মঠ, দেউলগুলি নিজের স্বাতন্ত্র্যে যেন নিজেই বিভোর। ভুবনেশ্বর, পুরী, কোণারক, মাদুরা, বা রামেশ্বরের শ্রীমন্দিরের গঠন-নৈপুণ্য দেখিলে মনে বিস্ময় ও ভক্তির উদ্রেক হয় এবং শির স্বতঃই অবনত হইয়া পড়ে।

সামরিক বিদ্যা

সামরিক বিদ্যাতে প্রাচীন ভারত যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। নীতি বা আদর্শের দিক দিয়া ত' বর্ত্তমান কালের যুদ্ধ প্রাচীন ভারতের যুদ্ধের সহিত তুলিতই হইতে পারে না। বর্ত্তমান কালের মত স্বার্থপ্রণোদিত জাতি-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া ধরণীর বুক রুধিরসিক্ত করিয়া ধ্বংস-যজ্ঞের সৃষ্টি করিত না। পদাতিক, অশ্বারোহী, রথী, হস্তিপৃষ্ঠে যোদ্ধৃবর্গ অপূর্ব্ব কৌশল প্রদর্শন করিত। তখনকার ব্যূহরচনার প্রণালী বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা অনেকাংশে উন্নত ছিল। অবশ্য মারণাস্ত্রের দিক দিয়া বর্ত্তমান কালেও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। রাম-রাবণের মহাসংগ্রামে তোপের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। তখন তোপের নাম ছিল শতঘ্নী। শতঘ্নী অর্থাৎ যাহাদ্বারা বহুলোক একেবারে হনন করা যায়। গোলার নাম ছিল 'গুড়ক'। বারুদের নাম ছিল 'উর্ব্বাগ্নি'। উহা উর্ব্বা নামক কোন এক ঋষির নামানুসারে হইয়াছে। রামায়ণে আছে :—

"পরিগৃহ্য শতঘ্নীশ্চ সচক্রাঃ সগুড়োপলাঃ।
চিক্ষিপুর্ভুজবেগেন লঙ্কামধ্যে মহাস্বনাঃ॥"
"উর্ব্বাগ্নিং প্রোথিতং কৃত্বা শতঘ্নীগুড়কৈর্যুতম্।"
(নীতিচিন্তামণি ; কৃষ্ণ ও শল্যের যুদ্ধবর্ণনা)

বেশী দূরে যাইতে হইবে না। কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বেও ভারতীয় যোদ্ধারা বল-বীর্য্যে বিখ্যাত ছিলেন। মহাবীর আলেকজাণ্ডার (Alexander the Great) পুরুরাজকে সম্মান করিতেন—সকলেই জানেন। কিন্তু, যেই আলেকজাণ্ডার সারা-জীবন হিন্দুস্থানের জন্য লালায়িত, সেই হিন্দুস্থানে আসিয়া ফিরিয়া যাইবার কারণ কি তাহা কোন বিবরণে পাওয়া যায় না। হিন্দুদিগের সাথে যুদ্ধ করিতে এত বেগ পাইতে হইত যে, আলেকজাণ্ডারের সৈন্যেরা লড়াই করিতে চাহিত না। হিন্দুদিগের পরাজয়ের কারণ কাপুরুষতা কোন মতেই নহে। যুদ্ধে শত্রুগণ ছল-চাতুরী করিত—এগুলি বীরোচিত আদৌ নহে। সেইগুলিকে হিন্দুগণ ঘৃণা করিত। তাই, তাহারা হারিয়া গেল। পাঠান অপেক্ষা মোগলগণ এত বিক্রমশালী ছিল যে, বাহাদুর শা পাণিপথের যুদ্ধকে "কাচ ও পাথরের যুদ্ধ" বলিয়া উপমা দিয়াছেন। কিন্তু, এই যুদ্ধের পরই সংগ্রামসিংহের রাজপুত সৈন্যের সম্মুখে মোগলগণকে প্রাণভয়ে পলাইতে হইয়াছিল। প্রাণভয়ে বাবর ক্রমাগত ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। তিনি জীবনের তরে মদ্যপান ত্যাগ করিবেন এই প্রতিজ্ঞা করিলেন। হিন্দুগণ যাহাকে ভীরু ও কাপুরুষের কার্য্য বলিয়া ঘৃণা করে, সেই ছলচাতুরী অবলম্বন করিয়া জিতিল বটে, কিন্তু বারবার স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, কোন যুদ্ধে আর এতটা বেগ পাইতে হয় নাই। গোলাগুলি প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত মোগলের বিপুল সেনাবাহিনীকেও প্রতাপ সিংহ পরাজিত করেন। তারপর আরও দেখা যায়, হজরৎ মহম্মদের তিরোভাবের একশত বৎসরের মধ্যে মুসলমানগণ পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা, স্পেন্ ও পর্ত্তুগাল জয় করিল। কিন্তু, ভারত জয় করিতে তাহাদের ৪০০ শত বৎসর লাগিল। সিন্ধুদেশে তাহারা প্রবেশ করিয়াছিল বটে, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই বিতাড়িত হইয়াছিল। সেদিন ভারতের বাহুবল অম্লান ছিল; ভারতের অঙ্গে তখনও ঘুণ ধরে নাই। হায়! কি কুক্ষণেই না তারপর ভারতের গৌরব-ভাস্কর মেঘাবৃত হইল। প্রাচীন ভারতে বিমানের দুর্নিবার গতি, রৌদ্রবাণ, অগ্নিবাণ, বরুণবাণ, শক্তিশেল, নাগবাণ ইত্যাদি আধুনিক মারণাস্ত্র অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন ছিল না।

জ্যোতির্ব্বিদ্যা

জ্যোতির্ব্বিদ্যায় ভারতবাসী যথেষ্ট গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। কাহারও মতে পরাশর, কাহারও মতে সূর্য্য-সিদ্ধান্ত, কাহারও মতে ব্রহ্ম-সিদ্ধান্ত প্রথম জন্মগ্রহণ করিয়া জ্যোতির্ম্মণ্ডলের গভীর তত্ত্বসমূহ আবিষ্কার করিয়া ধরায় কীর্ত্তি-স্তম্ভ রাখিয়া গিয়াছেন। বরাহমিহির ও সোমসিদ্ধান্ত জ্যোতির্ব্বিদগণের কুল অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। ৬০০ শত খৃঃ অব্দে আর্য্যভট্ট ও ১১১৪ খৃঃ অব্দে ভাস্করাচার্য্য ভারতীয়

জ্যোতিশাস্ত্রের বিস্ময়কর উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিত বেবরের (Weber) মতে—ভাস্করাচার্য্যই হইলেন ভারত-গগনের শেষ নক্ষত্র। তারপর দুই একজন রশ্মি বিতরণ করিতেছিলেন, কিন্তু ঐগুলি যেন তুলনায় খদ্যোতের দীপ্তি। তারপরই ভারত যেন অসাড় হিমাঙ্গ হইয়া সুপ্তির ক্রোড়ে আশ্রয় নিল। প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্ব্বিদগ্রগণ্য আচার্য্যগণ কিছুমাত্র সাহায্য না পাইয়াও অসাধারণ উর্ব্বর মস্তিষ্কের সূক্ষ্মবুদ্ধি ও বিচার শক্তির সাহায্যে সুদূরবর্ত্তী গগনমণ্ডল মধ্যচারী গ্রহনক্ষত্রাদির যে-সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, উহা বর্ত্তমান কালের বৈজ্ঞানিকদেরও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণ, সুমেরু,-কুমেরু, রাশিচক্র, জোয়ার-ভাটার তত্ত্বনিরূপণ ভারতীয় আর্য্যমনীষীরাই প্রথম করিয়াছিলেন। জোয়ার-ভাটা সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে আছে

"স্থালীস্থমগ্নিসংযোগাদুদ্রেকি সলিলং যথা।
তথেন্দুবৃদ্ধৌ সলিলমম্ভোধৌ মুনিসত্তমাঃ॥
ন্যূনা নাতিরিক্তাশ্চ বর্দ্ধন্ত্যাপি হ্রসন্তি চ॥
উদয়াস্তমনেষ্বিন্দোঃ পক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ॥
দশোত্তরাণি পঞ্চৈব অঙ্গুলানাং শতানি বৈ।
অপাং বৃদ্ধিক্ষয়ৌ দৃষ্টৌ সামুদ্রিনাং মহামুনে॥"

জোয়ার-ভাটায় বস্তুতঃ সমুদ্রের জলের বৃদ্ধি ও হ্রাস হয় না। হাঁড়িতে জল চড়াইয়া সরা ঢাকা দিয়া অগ্নিতাপ দিলে জল যেমন ফাঁপিয়া উপরের দিকে উঠে, সেইরূপ শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রের কলার বৃদ্ধি ও হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র জলের বৃদ্ধি ও হ্রাস বোধ হইয়া থাকে। বার তিথির ব্যবস্থাচক্র আর্য্য ঋষিরাই প্রথম আবিষ্কার করেন। রবি (Sun), সোম (Moon), মঙ্গল (Mars), বুধ (Mercury), বৃহস্পতি (Jupiter), শুক্র (Venus), শনি (Saturn) ইত্যাদি বিষয় সুশৃঙ্খলভাবে ভারতীয় পণ্ডিতেরাই প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। কোপার্নিকাসের (Copernicus) বহু পূর্ব্বে পৃথিবীর দৈনিক গতি এই আর্য্য জাতিই জ্যোতির্ব্বিদমণ্ডলীর মধ্যে প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। টলেমির (Ptolemy) বহু পূর্ব্বে বৎসরের দুইদিন দিনরাত্রি সমান হয়, এই তত্ত্ব নিরূপণ করেন। পৃথিবী যে গোল এই তত্ত্ব নাকি আমরা "পশ্চিমদেশ" হইতে ধার করিয়াছি। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা পৃথিবী যে কমলালেবুর ন্যায় গোল এই সংবাদ পরিবেশন করিবার বহু পূর্ব্বে সূর্য্যসিদ্ধান্ত বলিয়াছেন:—

"সর্ব্বতঃ পর্ব্বতারাম-গ্রাম-চৈত্য চয়ৈশ্চিতঃ।
কদম্ব-কেশর গ্রন্থিঃ কেশরপ্রসবৈরিব॥"

অর্থাৎ, কদম্ব যেমন কেশরসমূহে পরিবেষ্টিত, সেইরূপ পৃথিবীপিণ্ড সর্ব্বদিকেই গ্রাম, বৃক্ষ, পর্ব্বত, নদ-নদী, সমুদ্রাদির দ্বারা বেষ্টিত। আচ্ছা, কমলালেবুর দৃষ্টান্ত অপেক্ষা কেশর-বেষ্টিত কদম্বের দৃষ্টান্তটী ভূগোলতত্ত্বের দিক্ দিয়া অধিকতর শোভন ও সঙ্গত নহে কি?

নক্ষত্রকল্পে লিখিত আছে:—

"কপিত্থফলবদ্বিশ্বং দক্ষিণোত্তরয়োঃ সমং"

পৃথিবী কপিত্থফলের ন্যায় গোলাকার এবং উত্তর ও দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা। আজকাল ভৌগোলিক বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য যে globe বা গোলকের প্রচলন দেখা যায়, তাহাও আর্য্য-পদ্ধতির অনুকরণ মাত্র। পদার্থদীপিকাতে মহামনস্বী আচার্য্য সূর্য্যসিদ্ধান্ত লিখিয়াছেন:—

"অভীষ্টঃ পৃথিবীগোলং কারয়িত্বা তু দারবং।
তদ্বৎ খগোলকং কৃত্বা গুরুঃ শিষ্যান্ প্রবোধয়েৎ॥"

দারুময় ভূগোল ও খগোল রচনা করিয়া গুরু শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিবেন।

গুণগ্রাহী সম্রাট্ বিক্রমাদিত্যের জীবিতকালের বহু পূর্ব্বে গ্রীস দেশীয় পণ্ডিত পিথাগোরাসেরও অনেক আগে, ইটালীর পণ্ডিত কোপার্নিকাসের অভ্যুদয়ের অনেক পূর্ব্বে—পৃথিবীর যে গতি আছে তাহা ভারত-গৌরব আর্য্যভট্ট বলিয়া গিয়াছেন:—

"চলা পৃথ্বী স্থিরা ভাতি।"

পৃথিবী চলিতেছে, কিন্তু বোধ হইতেছে যেন স্থির রহিয়াছে।

"ভপঞ্জরঃ স্থিরো ভূরেবা বৃত্যাবৃত্য প্রতিদৈবসিকৌ।
উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহাণাম্॥"

ভপঞ্জর অর্থাৎ নক্ষত্রমণ্ডল রাশিচক্র স্থির রহিয়াছে, পৃথিবী পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি বা পরিভ্রমণ দ্বারা গ্রহ ও নক্ষত্রদিগের প্রাত্যহিক উদয়াস্ত সম্পাদন করিতেছে। আর্য্যভট্টের এই সিদ্ধান্ত গ্রীসদেশের ভিতর দিয়া বিলাতে দেখা দিয়াছে। ভারতের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সূর্য্যসিদ্ধান্ত, শ্রীপতি প্রভৃতি আচার্য্যগণ এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।

গতি-বিচারের দিক্ দিয়া সূর্য্যের উদয়াস্ত যে বিভিন্ন দেশে সময়ের তারতম্য ঘটাইয়া থাকে, উহা সিদ্ধান্তশিরোমণির গোলাধ্যায়ে লিখিত আছে। যথা:—

লঙ্কাপুরেঽর্কস্য যদোদয়ঃ স্যাৎ
তদা দিনার্দ্ধং যমকোটিপুর্য্যাং।

অধস্তদা সিদ্ধপুরেঽস্তকালঃ
স্যাদ্রোমকে রাত্রিদলং তদৈব ॥

লঙ্কায় যখন সূর্য্যের উদয় হয়, তখন যমকোটিপুরীতে দ্বিপ্রহর বেলা, লঙ্কার অধোভাগে সিদ্ধপুরে সূর্য্যের অস্তকাল ও রোম-দেশে রাত্রি।

"ভদ্রাশ্বোপরিগঃ সূর্য্যো ভারতেঽভ্যোদয়ং রবেঃ।
রাত্র্যর্দ্ধং কেতুমালাখ্যো কুরুবেঽস্তমনং তদা ॥"

সূর্য্য যখন ভদ্রাশ্ববর্ষে ঊর্দ্ধস্থ হন্, তখন ভারতবর্ষে উদয়কাল মাত্র আরম্ভ হয়; কেতুমাল বর্ষে যখন অর্দ্ধরাত্রি, কুরুবর্ষে তখন সূর্য্য অস্তমিত হন।

অজ্ঞ লোকেরা বলিয়া থাকে যে, সর্পের মাথার উপর আমাদের এই পৃথিবী অবস্থিত। পৃথিবী যে শূন্যমণ্ডলে আছে, বহু শতাব্দী পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় সূর্য্যসিদ্ধান্ত তাহা বলিয়া গিয়াছেন :—

"ভূগোলো ব্যোম্নি তিষ্ঠতি।"

অর্থাৎ গোলাকার এই পৃথ্বী শূন্যমণ্ডলে অবস্থিতি করিতেছে।

ভাস্করাচার্য্য সিদ্ধান্তশিরোমণিতে লিখিয়াছেন :—

"নান্যাধারং স্বশক্ত্যা বিয়তি চ নিয়তং তিষ্ঠতীহাস্য পৃষ্ঠে।
নিষ্ঠং বিশ্বঞ্চ শশ্বৎ সদনুজমনুজাদিত্যদৈত্যং সমন্তাৎ।"

পৃথিবী বিনা আধারে স্বীয় শক্তিদ্বারা আকাশমণ্ডলে অবস্থিতি করিতেছে। ইহারই পৃষ্ঠে চতুর্দ্দিকে দেব, দানব, মানবাদি সমস্ত বাস করিতেছে।

Sir Isac Newton-এর "মাধ্যাকর্ষণ" বা "Law of Grayitation" আবিষ্কারের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে ভাস্করাচার্য্য ইহার সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং এই তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন :—

"আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ
খস্থো গুরুঃ স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।
আকৃষ্যতে তৎ পততীতি ভাতি
সমে সমন্তাৎ ক পতত্বিয়ং খে ॥"—গোলাধ্যায়

অর্থাৎ পৃথিবী আকর্ষণ-শক্তি-বিশিষ্টা, কারণ কোন গুরুভার বস্তু আকাশে নিক্ষেপ করিলে পৃথিবী স্বীয় শক্তিদ্বারা তাহাকে নিজাভিমুখে আকর্ষণ করে; কিন্তু পতন হয়, এইরূপ অনুমান হয়। চারিদিকেই সমান আকাশ, অতএব পৃথিবী ভিন্ন কোথায় পড়িবে?

আর্য্যভট্টও বলিয়াছেন :—

"আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী যৎ তয়া প্রক্ষিপ্যতে
তৎ তয়া ধার্য্যতে।"

পৃথিবী আকর্ষণ-শক্তি-বিশিষ্টা; কেন না, যাহাই প্রক্ষিপ্ত হয়, আকর্ষণ-শক্তি দ্বারা পৃথিবী তাহাই ধারণ করে।

"পুরাণের" অনেক কথাই রূপকচ্ছলে বলা হইয়াছে। উহার গুহ্য মর্ম্ম-কথা অনেক সময় আমরা বুঝিতে পারি না। রাহুকে একটা দৈত্য বলিয়া কল্পনা করা হয়। এই রাক্ষসও না কি চন্দ্র-সূর্য্যকে গ্রাস করে, তাই গ্রহণ হয়। পৃথিব্যাদির ছায়ায় যে গ্রহণ হয়, আর্য্যজাতি বহু পূর্ব্বেই জগৎকে জানাইয়া দিয়াছেন।

ব্রহ্মপুরাণে ব্রহ্মা রাহুকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—

"পর্ব্বকালে তু সংপ্রাপ্তে চন্দ্রার্কৌ ছাদয়িষ্যসি।
ভূমিচ্ছায়াগতশ্চন্দ্রং চন্দ্রগোঽর্কং কদাচন ॥"

তুমি পর্ব্বকালে (পূর্ণিমা ও প্রতিপদের সন্ধি এবং অমাবস্যা ও প্রতিপদের সন্ধি) চন্দ্রসূর্য্যকে আচ্ছাদন করিবে, অর্থাৎ পৃথিবীর ছায়ারূপ হইয়া চন্দ্রকে এবং চন্দ্রগত হইয়া সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিবে।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত বলিয়াছেন :—

"ছাদকো ভাস্করস্যেন্দুরধস্থো ঘনবদ্ভবেৎ।
ভূচ্ছায়াং প্রাঙ্মুখশ্চন্দ্রো বিশত্যর্থো ভবেদসৌ।"

মেঘের ন্যায় চন্দ্র সূর্য্যের অধঃস্থ হইয়া সূর্য্যকে (সূর্য্যগ্রহণে) আচ্ছাদন করে এবং চন্দ্র (গ্রহণ কালে) ভূচ্ছায়াতে প্রবেশ করে।

গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতি দেখিয়া মহামারী, রাষ্ট্রবিপ্লব, দুর্ভিক্ষ, সুভিক্ষ, অতিরোগব্যাপ্তি কিরূপে সঞ্চার হয়; নক্ষত্র-বিশেষে গ্রহবিশেষে জন্মগ্রহণ করিলে, মানুষের সমস্ত জীবনের মধ্যে কি কি ঘটনা ঘটিবে, এই সকল জন্ম-পত্রিকাতে লিপিবদ্ধ করিতে আর্য্য-ঋষিরাই পারদর্শী ছিলেন।

ইহা গবেষণা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত গণনা করিতে এবং এক এক শূন্যযোগে দশ গুণ সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে ভারতবর্ষেই প্রথম ব্যবস্থা হয়। গণিত, বীজ-গণিত আদি শাস্ত্র ভারতবর্ষ হইতে আরবে, তথা হইতে পারস্য, গ্রীস প্রভৃতিতে এবং তথা হইতে ভূমণ্ডলের অন্যান্য স্থানে প্রচারিত হইয়াছে। জ্যামিতির জন্ম এই ভারতেই হইয়াছিল। ঋষিগণ যজ্ঞ-কার্য্যে সেই সব রেখা কোণ ইত্যাদি অঙ্কন-কার্য্য করিতেন তাহা হইতেই জ্যামিতির সৃষ্টি। এই ভারতই চিকিৎসা-বিদ্যার আদি গুরু। অশ্বিনীকুমার, ধন্বন্তরি, চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি অদ্বিতীয় পণ্ডিতগণ আয়ুর্ব্বেদ

শাস্ত্রের ধারক ও বাহক। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ চরক ও সুশ্রুতের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। পদার্থ-বিজ্ঞানে ভারতীয়েরা প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। অস্ত্র-শিক্ষায় সুশ্রুত যতটুকু অগ্রসর হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালের ইংরেজী অস্ত্র-চিকিৎসাও এতদূর অগ্রসর হয় নাই। ডাক্তার রয়েলী বিশেষ বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভারতীয় শারীরবিদ্যা-বিশারদ অস্ত্র-চিকিৎসকগণ ১২৭ খানি অস্ত্র ব্যবহার করিতেন। হায়! আমরা আজ নিজের ঘরের সন্ধান রাখি না। পরাধীনতার চাপে, অনুশীলনের অভাবে, এবং রাজকীয় চিকিৎসার বিকট চাৎকারে এই বিদ্যা আজ মূর্চ্ছাদশা প্রাপ্ত হইয়াছে।

সঙ্গীতবিদ্যা

আর্য্যজাতি সঙ্গীত-বিদ্যায় যতখানি উন্নতি সাধন করিয়াছেন, পৃথিবীর অন্যান্য জাতি সেই ধনের সন্ধানই এখন পর্য্যন্ত পায় নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বেদরাশির মধ্যে যে সামবেদকে নিজ বিভূতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই সামবেদ কেবলই সঙ্গীতময় এবং সঙ্গীত-বিদ্যার পূর্ণ পরিচয়। ভারতীয় সঙ্গীত-শাস্ত্র আধ্যাত্মিকতারই অন্যতম প্রধান সোপান। ইহা চিত্তবিনোদনের জন্য ফরমাইসী জিনিষ নয়। "গানাৎ পরতরং নহি" এই বাক্য দ্বারাই উহার আধ্যাত্মিক ভাব সূচিত হয়। স্বর-শক্তির গুহ্যতত্ত্ব আর্য্য মনীষীরা যেমন বুঝিয়াছিলেন, এখন পর্য্যন্ত পৃথিবীর অন্য কোন জাতি ততখানি হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন নাই। মনের ভাব প্রকাশের জন্য শব্দ-নাদ শরীর যন্ত্রের যেখান হইতে যাহা উদ্গত হইতে পারে, ভারতীয় পণ্ডিতেরা সেই তথ্য নিরূপণ করিয়াছিলেন। তাই, সংস্কৃত দেব-ভাষা। এই দেব-ভাষার পূর্ণতা সাধনে পঞ্চাশটী বর্ণ আবিষ্কৃত ও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উচ্চারণের মহিমায়, স্বর-বিন্যাসগুণে, এক শব্দ নানা-ভাব-ব্যঞ্জক হইয়া উঠে। এই বিচিত্র দেশ ভারতবর্ষ ভাবুকতা ও কবিত্বের দেশ। এই দেশে যত ভাবুক ও কবি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, কোন দেশে আর তত দেখিতে পাওয়া যায় না। ভরত, হনুমান্, সোম, পবন, দামোদর, নারায়ণ প্রভৃতি সঙ্গীত গ্রন্থের প্রধান রচয়িতা। ভারতের নৃত্য-শাস্ত্র বিলাসের সামগ্রী নয়। তাই, ভারতের নর্ত্তক-নর্ত্তকী শ্রীভগবানের—মাহাত্ম্যপূর্ণ লীলা-রহস্যের কতকটা উদ্ঘাটন করিয়া নৃত্যের ভিতর দিয়া বহিঃরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতের সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশ্বরপরায়ণ ও ভগবচ্চরণে নিবেদিত-প্রাণ। ভারতের অধঃপতনের সাথে সাথে সঙ্গীতের সব সাঙ্গ হইয়াছে। তাই, ত্রিভুবনজয়ী সঙ্গীতবিলাসী কামুকের বিলাস সামগ্রী বা ক্রীড়নক মাত্র। আর কি না, নৃত্য-বিদ্যার ও সঙ্গীতশাস্ত্রের অনুশীলন হয় বারাঙ্গণাগৃহে। যে বিদ্যার অনুশীলন সুর-পুরীতে পর্য্যন্ত হইত এবং অমরবৃন্দকে পর্য্যন্ত বিমুগ্ধ করিত, সেই সঙ্গীত-মূর্চ্ছনারও মূর্চ্ছাদশা আসিয়া পড়িয়াছে। অথচ দেবর্ষি নারদের বীণাতন্ত্রী হরিগুণগানেই ত্রিলোক মুগ্ধ করিত। মহাবিদ্যারূপিণী মুরারি-বল্লভা দেবী সরস্বতী নিজে বীণাপাণি হইয়া সঙ্গীত-শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। আর স্বয়ং যোগীশ্বর শঙ্কর নিজ করে সঙ্গীত-যন্ত্র ধারণ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব সঙ্গীতের সৃষ্টি করিয়া নিজে যোগানুধিতে নিমগ্ন হইতেন। পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠামে বেণু বাদন করিয়া যেই সুর ও সঙ্গীতের অপূর্ব্ব মায়াজাল সৃষ্টি করিতেন, যেই বেণুর মদির-মন্ত্রে যমুনা উজান বহিত, আভীরবালাগণ মুগ্ধচিত্তে পুরুষোত্তমের দিকে পলকহীন নেত্রে চাহিয়া থাকিতেন এবং কদম্ব-কুসুম পুঞ্জে পুঞ্জে স্বতঃপ্রস্ফুটিত হইয়া সেই বংশীধারীর রাতুল চরণে নিজকে নিবেদন করিত, সেই যন্ত্র, সেই মন্ত্র, সেই তান, সুর কোথায় গেল?

ভাষা ও ব্যাকরণ

ভাষার যেই সব শক্তি থাকিলে, জাতীয় ভাবের পূর্ণতা সম্পাদন করিতে পারে, আর্য্যজাতির সংস্কৃত ভাষায় পূর্ণরূপে তাহা বিদ্যমান আছে। ভাষার গুণে শ্রোতা ও বক্তা উভয়েরই হৃদয়ে পুলকের সৃষ্টি হয় এবং তাহাতে অপরিসীম শক্তি সঞ্চারিত হয়। সংস্কৃত সুপ্রাচীন ও অত্যুৎকৃষ্ট ভাষা। বিশ্ব-বিখ্যাত পণ্ডিত ডাক্তার মোক্ষমুলর (Maxmuller) সংস্কৃত ভাষাকে "সকল ভাষার ভাষা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষা অনুশীলনের নানা ফল। ইউরোপে শব্দ-বিদ্যার যে এত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, সংস্কৃত শাস্ত্র ও ভাষার অনুশীলনই তাহার মূল কারণ। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন দ্বারা অন্যান্য ভাষার মূল নির্ণয়, স্বরূপ পরিজ্ঞান ও মর্ম্মভেদে সমর্থ হইয়াছেন। এই পৃথিবী যে নানা মানবজাতির আবাসস্থান, তাহাদের কে কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত, কে কোন্ দেশের আদিম অধিবাসী, কে কোন্ প্রদেশে

বাস করিয়াছে ইত্যাদি নিদ্ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু, ইউরোপীয় ভাষা-বিজ্ঞান যে পর্য্যন্ত সংস্কৃত ভাষার সহায়তা লাভ করে নাই ততদিন পর্য্যন্ত এই সকল বিষয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। সংস্কৃত ভাষায় ভূরিভূরি শব্দ, ধাতু, বিভক্তি ও প্রত্যয় আছে এবং এক এক শব্দে ও এক এক ধাতুতে নানা প্রত্যয় ও নানা বিভক্তি যোগ করিয়া অসংখ্য নূতন শব্দ ও নূতন পদ সিদ্ধ করা যাইতে পারে। এইরূপ কোন মনোগত ভাবই নাই যাহা এই ভাষাতে বিশদরূপে ব্যক্ত করা যাইতে না পারে, বা এইরূপ কোন বিষয় নাই যাহা সুচারু রূপে সঙ্কলিত করা যাইতে না পারে।' স্মরণাতীত কাল হইতে প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা নানা বিষয়ে নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া এই ভাষাকে সম্যক্ মাৰ্জ্জিত ও অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। তাই এই ভাষা সর্ব্বজনমনোহারিণী। সংস্কৃত ভাষায় যেইরূপ সন্ধি, সমাস আছে এইরূপ অন্য কোন ভাষায় নাই। 'সন্ধি-প্রক্রিয়া দ্বারা ভাষার অশ্রাব্যতা পরিহার ও সুশ্রাব্যতা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।' সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা সন্ধি-সমাস পদসাধন ও প্রকৃতি প্রত্যয় যোগে নূতন নূতন শব্দ সংকলন করিবার যে সমস্ত অভিনব পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারা সংস্কৃত এক অদ্ভুত ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় কি সরল, কি বক্র, কি মধুর, কি কর্কশ, কি ললিত, কি উদ্ধত, কি প্রগাঢ় সর্ব্বপ্রকার রচনাই সমান সুন্দর রূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সংস্কৃত রচনাতে এইরূপ অসাধারণ কৌশল দেখান যাইতে পারে যে, তদ্দর্শনে বিস্ময়-বিমূঢ় না হইয়াই পারা যায় না। সংস্কৃত ভাষার বিচিত্র শব্দের প্রভাবে শিশু-প্রকৃতি, স্ত্রী-প্রকৃতি ও পুং-প্রকৃতি স্বতন্ত্র ও সুচারুরূপে সংগঠিত হইয়া থাকে। তাই সংস্কৃত-ভাষার সাহিত্য, কাব্য, ইতিহাস, ব্যাকরণ আদি সমস্তই যথাযথ প্রকৃতি গঠনের অনুকূল। সংস্কৃত ভাষায়ই আদি-কবি ছন্দোবদ্ধ বাক্য রচনা করিয়া সর্ব্বপ্রথম মহাকাব্যের সৃষ্টি করেন। ইউরোপীয় বিবুধমণ্ডলীর মতে ঋগ্বেদই জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ। সংস্কৃত-ভাষার এমনই রচনা-মাধুর্য্য, অনুপম ঝঙ্কার ও বিচিত্র মোহিনী শক্তি যে, এই ভাষায় অনভিজ্ঞ লোকও যদি উহা শ্রবণ করে তখনই মুগ্ধ হইয়া যায়। অসীম মূর্চ্ছনা ও দ্যোতনাময় এই স্বর্গীয় ভাষা প্রাণের সঙ্গে মিশিয়া মনের সঙ্গে কথা কয়। জার্ম্মাণ মহাকবি গেটে "অভিজ্ঞান শকুন্তলের" অনুবাদ মাত্র পড়িয়া এমনই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি এক বন্দনা-গান রচনা করিয়া শকুন্তলাকে প্রাণের সশ্রদ্ধ অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছেন। বিখ্যাত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ডারউইনের (Darwin) এক সাহিত্যিক বন্ধু ছিলেন। তিনি (ঐ বন্ধু) সংস্কৃত কাব্য পড়িয়া এমনই মুগ্ধ হইয়া যান যে, অন্য ভাষায় সাহিত্য-চর্চ্চা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া অনন্যমনাঃ হইয়া সংস্কৃত কাব্যও সাহিত্যের অনুশীলনে নিজকে নিয়োজিত করেন। তিনি বাকী জীবনে আর কোন ভাষার গ্রন্থ অধ্যয়নে কালক্ষেপ করিতেন না। আজও সুদূর আমেরিকা, জার্ম্মেণী, ইংলণ্ড ও প্যারিসের কত কত জ্ঞানী-গুণী সংস্কৃত ভাষা-বিজ্ঞান, কাব্য, দর্শন প্রভৃতির সাধনায় নিমগ্ন। আর আমাদের নিজ দেশে আমাদের চির-আরাধ্যা দেবী নিরাভরণা, অনর্চ্চিতাবস্থায় ম্লানমুখী হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। সেই দেব-বালার সাগরপারে কি সম্মান! কত কত সাধক—শ্রদ্ধা ও ভক্তির স্রক্‌চন্দনে সেই দেবীর রাতুল শ্রীচরণে প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া নিজকে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিতেছেন।

আখ্যায়িকা

নীতি বা উপদেশমূলক প্রবন্ধ বা আখ্যায়িকার জন্ম হইয়াছিল আমাদের এই ভারতবর্ষে। Æesops Fables নামে যে গল্পের বই পাশ্চাত্য দেশ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ভারতের 'হিতোপদেশ' 'পঞ্চতন্ত্রকথামুখং' প্রভৃতির অনুকরণ করিয়াই। ইহার উপাদান বস্তু বিষ্ণুশর্ম্মার ঐ পূর্ব্ব-বর্ণিত গল্পের পুস্তকদ্বয়। রসায়ন বিদ্যায় ভারত এতদূর অগ্রসর হইয়াছিল যে, বর্ত্তমান জগতের বিশিষ্ট বিজ্ঞানসেবীরা পর্য্যন্ত ঐ সকল তত্ত্ব নিরূপণে অসমর্থ হইয়াছেন। লৌহকে কি প্রকারে শোধন করিয়া অবিকৃতাবস্থায় রাখা যায় তাহার জলন্ত নিদর্শন দিল্লীর বিখ্যাত লৌহস্তম্ভ। কত জল, ঝড়, কত প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ঐ স্তম্ভটীর মাথার উপর দিয়া গিয়াছে, কিন্তু উহা আজও অবিকৃত অবস্থায়—মরিচাবিহীন হইয়া অক্ষত দেহে গর্ব্বোন্নত শিরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পণ্ডিত ও সাধক নাগার্জ্জুন বর্ত্তমান কালের বৈজ্ঞানিকদেরও নমস্য।

ভারতীয় বিজ্ঞান

জড়

আধুনিক যুগে তড়িৎ-বিজ্ঞানের বিপুল চর্চ্চা হইয়াছে।

অনেকের ধারণা যে, প্রাচীনকালে ভারতীয়েরা বিদ্যুতের ব্যবহার বা প্রয়োগ সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন না, পরন্তু আর্য্য মনীষীদের বিজলীর সাথে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। দশানন যে দুর্জ্জয় শক্তিশেলে সুমিত্রানন্দনকে স্পন্দনবর্জ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা ঐ বৈদ্যুতিক শক্তির প্রসাদে। "শক্তি-শেল" এই শব্দদ্বারাই উহার প্রকৃতিগত পরিচয় পাওয়া যায়। বাণের মধ্যে তাড়িৎ-শক্তি সেকালে ব্যবহার করা হইত! বেশী কথা কি, প্রাচীন কাল হইতে আমাদের দেশে মঠ, মন্দির প্রভৃতিতে ত্রিশূল বা চক্র রাখার প্রচলন আছে। তাহাও তাড়িৎবিজ্ঞান শাস্ত্রের বিপুল পর্য্যালোচনার ফল। মন্দিরে যেমন ত্রিশূল চক্রাদির ব্যবহার হয়; উচ্চ প্রাসাদ প্রভৃতিরও ছাদের উপর তে-কাটা সিজগাছ রাখা হয়। সিজগাছও বিদ্যুৎপ্রবাহক। ত্রিশূল চক্রাদি যেমন বজ্রপতন হইতে মঠ, মন্দির প্রভৃতি রক্ষা করে, সিজও তেমন গৃহ রক্ষা করিয়া থাকে।

অধ্যাত্ম

বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতি হইয়াছিল বলিয়াই সন্ধ্যাহ্নিক কালে পট্টবস্ত্র পরিধান, রোমশ আসনে উপবেশন, জল ও তাম্রপাত্রাদির প্রচলন বা ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। সধবাকে কেন মণিমুক্তাখচিত, বিবিধ স্বর্ণালঙ্কারাদিতে ভূষিত থাকিতে হয়; বিধবাকেই কেন বা ব্রহ্মচারিণী সাজিতে হয়, উহাও বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে নিরূপিত হইয়াছে। বিজ্ঞান-শাস্ত্রের যথেষ্ট চর্চ্চা হইয়াছিল বলিয়াই যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগের অবতারণা করা হইয়াছে। এই সকল বিবিধ প্রক্রিয়াবলেই তাঁহারা নীরোগ ও দীর্ঘজীবী হইতেন। এই বিজ্ঞান সিদ্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তিই দূরদর্শন, অন্তর্ধান, অন্তরীক্ষে বিচরণ প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্য সাধন করিতে পারেন। এই বিজ্ঞানসিদ্ধির ফলেই আর্য্যঋষিগণ অণিমা, লঘিমা, মহিমা, গরিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব ও বশিত্ব এই অষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া বিশ্বের সমস্ত শক্তিকে নিজশক্তির করায়ত্ত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালের জড়-বিজ্ঞান এই অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের খোঁজ রাখেন? অন্ধ আমরা, তাই পরের কথায় নিজের ঘরের জিনিষ হেলায় দূরে ফেলিয়া, অন্যের জিনিষের প্রতি লোভ করি। বিদেশের উৎকৃষ্ট বস্তু বা বিদ্যার সমাদর করা অবশ্য কর্ত্তব্য; তাহার ফলে দেশ জ্ঞান-বিজ্ঞানে ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ হয়। কিন্তু তাই বলিয়া নিজের ঘরের মহাধনের সন্ধান না রাখিয়া কেবল পরের দ্বারে দৌড়াইলে মনুষ্যত্বের ত' অবমাননা হয়ই, বিদেশীরাও অবজ্ঞাভরে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে।

সমাজ-বিজ্ঞান

সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ভারতীয় আর্য্যজাতির যে সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা বুঝি জগতের কুত্রাপি মিলা ভার। সমাজগঠন সম্বন্ধে ভারতীয় পণ্ডিতেরা যে নির্ম্মল চাতুর্য্যপূর্ণ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, এমনটি পৃথিবীর আর কোন জাতির নাই। একবার ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয়ের কথা ভাবিয়া দেখুন। সমাজ-কল্যাণ বা লোক হিতের কি উৎকৃষ্ট বিধিই না ইহাতে নিহিত আছে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থাই ভারতকে উন্নতির শিখর দেশে নিয়াছিল। দীন-দরিদ্রকে দান করিয়া, অতিথিকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করিয়া, গুরুব্রাহ্মণের শুশ্রূষা করিয়া, শাস্ত্রের অনুশাসন অবনত মস্তকে পালন করিয়া, রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ভারতীয় সমাজ ক্রমে ক্রমে আনন্দধামে গমন করিয়াছিল। তনয় জনকের আজ্ঞাকারী হইয়া, অনুজ অগ্রজের দাস হইয়া, পত্নী পতিগতপ্রাণা হইয়া, ভৃত্য প্রভুর পুত্রবৎ হইয়া, সর্ব্বভূতের মধ্যে নারায়ণকে দেখিয়া ভারতীয় সমাজ এই মর্ত্ত্যে নন্দনকানের সৃষ্টি করিয়াছিল প্রতি পল্লী, গৃহ, জনপদ সেই দিন শান্তিপূর্ণ ছিল, স্বর্গের সুষমা, অমরাবতীর ঐশ্বর্য্য তখন এখানে বিরাজ করিত। অধুনার মত পণ্ডিতম্মন্য, অহমিকাপূর্ণ, দাম্ভিক লোকের সম্মান সেই সমাজ প্রদান করিতে জানিত না; যথার্থ গুণীকে হৃদয়ের বিমল শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান করিবার জন্য করপুট সব সময়ই ব্যগ্র থাকিত। বর্ত্তমান কালের মত স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইত না। অথচ সত্যিকার স্বাধীনতার পূজারী অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত নর-নারীর অভাব ত' তখন ছিল না।

আর্য্যজাতি চিন্তায়, বাক্যে, কার্য্যে স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু দুর্বুদ্ধিপ্রসূত স্বেচ্ছাচারিতাকে স্বাধীনতা বলিয়া বুঝিতেন না। তাহাই প্রকৃত সুখ, যেই সুখ লাভ করিতে গেলে অন্যের অসুখ বা অনিষ্ট উৎপাদিত না হয়; তাহাই প্রকৃত স্বাধীনতা, যাহা স্বেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দেয় না। এই সুখই তাঁহাদের কাম্য ছিল। তাঁহাদের বল, বীর্য্য, পরাক্রম দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনেই নিয়োজিত হইত।

স্বার্থপ্রণোদিত জাতি-প্রেমে মাতিয়া যুদ্ধের নামে মহাধ্বংসের সৃষ্টি করিতেন না। আর্য্যজাতি সেই ধনকে ধন মনে করিতেন, যাহা পরার্থে ব্যয়িত হইত এবং যাহা লাভ করিলে মনের তৃষ্ণা দূর হইত ও ভোগবাসনার চন্মের মত অবসান হইত। তাঁহাদের জীবনের মূলসূত্র ছিল, "বহুজন-সুখায়, বহুজনহিতায়" এই ঋষি-বাক্য। দুঃখ এই যে, আমরা আজ জীবনের সেই মূলসূত্রটি হারাইয়া ফেলিয়াছি।

ভারতীয় দর্শন

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই ভারতকে "দর্শন ও ধর্ম্মের দেশ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ভারতীয় দর্শনই সমস্ত চিন্তার মূলাধার। ভারতের সামান্যা রমণী পর্য্যন্ত দর্শনের এই দৃষ্টি নিয়া সুগভীর তত্ত্বকে সহজ কথায় বর্ণনা করিয়া থাকেন। ভারতের দর্শন-শাস্ত্র জগতের বিস্ময়। পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডারে ভারতীয় মণীষীরা দর্শনের মারফৎ অমূল্য রত্ন দান করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দর্শন ত' হিন্দু-ফিলসফির বা দর্শনের নিকট "naked child" উলঙ্গ শিশু মাত্র। ইউরোপীয় দর্শন যেখানে শেষ হইয়াছে, ভারতীয় দর্শন সেখানে সুরু হইয়াছে। বিজ্ঞান-শাস্ত্র ভারতীয় ষড়্ দর্শনের মধ্যেই নিহিত আছে। ক্ষুদ্র কলেবর গীতাগ্রন্থখানা সমস্ত উপনিষদের সারবস্তু। এই "Divine Songs" গীতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। পৃথিবীতে এমন কোন জ্ঞানী গুণী নাই যিনি গীতাকে সমাদর করিয়া না থাকেন। ভারতবর্ষে ১২১ খানা দর্শনের বই ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেকই লোপ পাইয়াছে। ইংরাজী Religion, আর হিন্দুর 'ধর্ম্ম' শব্দ এক জিনিষ নয়। 'ধর্ম্ম' কথাটি গভীর অর্থ-বোধক ও অত্যন্ত ব্যাপক; যদিও আজকাল সাম্প্রদায়িক-বিশ্বাস অর্থে ব্যবহার হয়। ভারতীয় সাধক, ভক্ত, পণ্ডিত, বিজ্ঞানী, যোগী বা মননশীল ব্যক্তি মাত্রই দার্শনিক। দর্শনে দৃষ্টি না থাকিলে ভারতীয় কোন শাস্ত্রেই ব্যুৎপন্ন হওয়া যায় না। ইউরোপে মনস্তত্ত্ব, (psycology) বা যৌন-বিজ্ঞানই বলুন, আর- দর্শনই বলুন, তাহার অনেকটা চর্চ্চা হইতেছে সত্য, কিন্তু দার্শনিকতার দিক-দিয়া ভারতের অমূল্য রত্নরাজির সাথে ইহাদের কি তুলনা হইতে পারে? ভারতীয় দর্শন মৃত্যু, পরলোক, পুনর্জ্জন্ম বা জন্মান্তর নিয়া পর্য্যন্ত বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছে।

এক সময় ভারতীয় সভ্যতা শিক্ষা, দীক্ষা ও সমুচ্চ উন্নতির রত্নসিংহাসনে বসিয়া সমগ্র জগতের উপর একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। তখন সমগ্র জাতির শির ভারতের পূত চারু চরণতলে অবনত হইয়াছিল। তখন ভারতের রেণু তীর্থ রজের মত অঙ্গে মাখিয়া জ্ঞানী গুণীরা নিজকে ধন্য জ্ঞান করিতেন। ভারতের কথা শুনিয়া লোকে পুণ্য সঞ্চয় করিত। কিন্তু, "তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ"—সেই দিন আর নাই। সেই চাঁদের হাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু, চিরদিন ত' কাহারও সমান যায় না। ইহা যেমন ব্যক্তিবিশেষের সম্বন্ধে খাটে, তেমন দেশ বা রাষ্ট্র সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। ভারত কুটিল রাজনীতির চর্চ্চা করিয়া বা বাগাড়ম্বর করিয়া বড় হয় নাই। যথার্থ বিদ্যানুশীলন করিয়া, ত্যাগ-তপস্যাদ্বারা মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিয়া সত্যিকার 'বড়' হইয়াছিল। বলহীনের কর্ম্ম উহা নয়। ভারতের মুক্তিমন্ত্রই—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধক ভারত, তপঃব্রতী ভারত, নিজ মাহাত্ম্যবলে বিশ্বসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিল। কারণ ঋষির শিষ্য,—ঋষির বংশধর সে।

প্রাচীন গ্রীসের গৌরব ছটা আজ অস্তমিত। ভুবন-বিজয়ী রোমের সভ্যতার সমাধি কবে হইয়াছে। সেই মিশর, ব্যাবিলন আজ আর নাই! কিন্তু, ভারত আজও তাহার বৈশিষ্ট্য নিয়া টিকিয়া আছে। কারণ, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম, সভ্যতা ও কৃষ্টির একটা দুর্নিবার গতি-বেগ আছে—মহাকালের বুকে তাহার শাশ্বত আসন। কত ধর্ম্মবিপ্লব, কত বহিরাক্রমণ, কত ঘাতপ্রতিঘাত ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্ম্মের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাকে টলাইতে পারে নাই। ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টি অম্লান কুসুমের মত ছিল এবং বিদ্যানুশীলনও অক্ষুণ্ণ ছিল। এই যুগে, পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতে আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বহুাংশে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কারণ, আমারা এখন নিজের ঘরের সন্ধান রাখি না।

সেই গৌরবময় যুগ, সেই সমাজ এখন আর নাই! কিন্তু তাহার ক্ষীণ ভাবধারা এখনও অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত প্রবাহিত হইতেছে। ভরসা যে, এই ক্ষীণ ধারাই একদিন বেগবতী স্রোতস্বিনীর রূপ ধারণ করিয়া ভারতীয় সমাজকে উর্ব্বর ও শক্তিশালী করিবে। এই চলমান জগতে সবই ধ্বংসের অভিসারে যাত্রা সুরু করিয়াছে। এখানে ধ্বংসই একমাত্র পরিণাম। এখানে রূপ থাকে না, থাকে রূপক। মানুষ চলিয়া যায়, থাকে তার স্মৃতি। এই স্মৃতি নিয়াই মানুষ বাঁচিয়া থাকে। আমাদেরও আছে অতীত ভারতের মনীষীদের অমর অবদান,—আছে তাঁহাদের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি। মানস-মন্দিরে সেই স্মৃতির ধ্যান আমরা করিব। আমরা মানুষ হইব। আমরা আমাদের—হারাধন খুঁজিয়া বাহির করিব। হৃতসর্ব্বস্বা, বিগতশ্রী, নিরাভরণা জননীর মুখে আবার হাসি ফুটাইব। আমরা অতীতের মত মহান্ ও গরীয়ান্ হইয়া জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিব।

আমরা কি আবার সেই সুস্থ, সবল, ঋদ্ধ-সমৃদ্ধ, মুক্ত মানব হইতে পারিব না? আমরা কি আবার সেই গৌরবময়, ভাস্বর, মহান্ অতীতকে ফিরিয়া পাইব না?

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জীবন ঘোষের বৈঠকখানা

জীবন জলযোগ ও চা-পান করিতেছেন ও কমলা দাঁড়াইয়া আছে

উমাপদ (নেপথ্য হইতে) জীবন। জীবন বাড়ীতে আছ?

জীবন। আসুন দাদা! (উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কমলা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল) তুই পালাচ্ছিস্ কেন? জ্যাঠাম'শায়কে প্রণাম করে' যা। (উমাপদর প্রবেশ) আপনাকে আবার কি সাড়া দিয়ে আস্‌তে হয়? বসুন।

উমা। (বসিতে বসিতে) এই যে মা-লক্ষ্মী। বাবাকে চা খাওয়াচ্ছ? (কমলা ভূমিষ্ঠা হইয়া উমাপদকে প্রণাম করতঃ জীবনকে প্রণাম করিল)

জীবন। দাদাকে চা এনে দে কমলা! গরম হয় যেন।

উমা। নিজের হাতে তয়েরী করে' আনতে পার ত' খা'ব। বুঝলে মা? (কমলা ঘাড় নাড়িয়া চলিয়া গেল)

জীবন। আমাকে কমলাই চা, জলখাবার তয়েরী করে' খাওয়ায়। এক মেয়ে বটে, সংসারের অনেক কাজ করে। পাঁচজন ঝি-চাকর ত' নাই—সব দিকে খরচ কমাবার চেষ্টা কর্‌ছি। পিসীমার জন্য ঐ মেয়ে সময়ে সময়ে পুকুর থেকে জল পর্য্যন্ত এনে দেয়। পিসীমা ত' ঝি-চাকরের ছোঁয়া জল খান না।

উমা। ঝি-চাকর থাক্, আর না থাক্, বাড়ীর মেয়েরা হাত গুড়িয়ে বসে' থাক্‌লে সংসারের শৃঙ্খলাও থাকে না, সৌষ্ঠবও থাকে না। তদ্ভিন্ন, কাজ কর্ম্ম করলে শরীরও ভাল থাকে। বাটনা-বাটা, জল-তোলাতে কি কম exercise হয়? ঘর ঝাট দিলেও exercise হয়! এই সকল কাজ-কর্ম্ম কর্‌ত বলে'ই সে-কালে মেয়েদের স্বাস্থ্য ভাল থাক্‌ত। আজকাল দেখ না শতকরা পঁচাত্তর জন মেয়ের অম্বল বা dyspepsia বা আর একটা কিছু ব্যারাম লেগেই আছে।

জীবন। এ-কথা খুব সত্যি দাদা! দিনকতক hysteria-র এমন প্রাদুর্ভাব হ'ল যে বৌদিগে হেঁসেলে যেতে দেওয়া অসম্ভব হ'য়ে উঠ্‌ল।

কমলা। (চা ও জলখাবার লইয়া প্রবেশ ও উমাপদর সম্মুখে টীপয়ে স্থাপন) জ্যাঠামশাই, এ চাও আমার তয়েরী, এ নিমকি-কচুরীও আমার তয়েরী। আপনাকে সব খেতে হ'বে।

উমা। তোমার নিজের হাতে যখন তয়েরী, তখন সব খা'ব, কিছু ফেলব না।

জীবন। ওর হাতের রান্নাও ভাল, মাঝে মাঝে রাঁধতেও হয়। কেন রে বেটী, আমার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাচ্ছিস. কেন? জানিস্ ত আমার স্বভাব? আমি চিরদিনই ভালকে ভাল বলি, মন্দকে মন্দ বলি, তা' সে নিজেরই হ'ক আর পরেরই হ'ক।

উমা। ও জানুক, না জানুক, আমি জানি। তোমার মতন স্পষ্টবক্তা লোক এ-অঞ্চলে নাই। দেখ্‌ছ ত' মা, সব খেয়ে নিয়েছি। এখন তুমি ভিতরে যেতে পার। (পাত্রগুলি লইয়া কমলার প্রস্থান)

জীবন। দাদা, এদিকে কোথায় গেছলেন?

উমা। কোথাও যাইনি, তোমার বাড়ীতে সোজা চলে' এসেছি। এসেছি কেন শুনবে? আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। ক্রোধ ত' একটা পাপ? কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য মানুষের এই ষড়্‌রিপুর প্রত্যেক রিপুই পাপের উৎস। মানুষ যত-কিছু পাপকাজ করে, সমস্তই এই ষড়্‌রিপুর একটা না একটা থেকে সঞ্জাত বা তদ্দ্বারা প্ররোচিত। আমি এই ক্রোধ-রিপুর বশবর্ত্তী হ'য়ে তোমার প্রতি কী অসদ্ব্যবহার করেছি ভেবে দেখ দেখি! অসদ্ব্যবহার কেন, অত্যাচার করেছি। ক্রোধ, জীবন, ক্রোধ—লোভের বশীভূত হইনি। যা'কে ভাই বলে' কোলে ঠাঁই দিয়েছিলেম, যে আমাকে আপদে বিপদে নানাপ্রকার সহায়তা করেছে, তা'র জমিদারী নীলেম করিয়ে নিয়েছি। এর চেয়ে অমানুষিক অত্যাচার আর কী হ'তে পারে?

জীবন। দাদা, আপনি ত' তঞ্চকতা ক'রে নেন নি। আমার কাছে টাকা পেতেন, আমি দিতে পারি নি, টাকা আদায় করবার জন্ত বিষয় নীলেম করিয়ে নিয়েছেন। এতে অত্যাচার কী করা হ'ল ?

উমা। তোমার মতন লোকই এ-কথা বল্‌তে পারে, এরূপ ভাব পোষণ করতে পারে। তোমাকে বলে' পাঠালেম, তুমি একবার এলে না, তাইতে হ'য়ে গেল আমার রাগ।

জীবন। আমারও দোষ ছিল। আপনি সরকারকে দিয়ে তাগাদা কর্‌তে পাঠিয়েছিলেন, সেই জন্ত হ'ল আমার অভিমান। অভিমান ত' প্রচ্ছন্ন ক্রোধ। আমি আর আপনার সঙ্গে দেখাই করলেম না।

উমা। আমি তাগাদা করে' পাঠাই নি। বলে' পাঠিয়েছিলেম আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে। ও-শ্রেণীর লোক ধরে' আন্‌তে বল্‌লে বেঁধে আনে। হিসেব পত্র ত' ওরাই রাখে, কাজেই জানত, একেবারে তাগাদা করে' গেল। দেখছ এই প্রকৃতির লোকের দ্বারা কী অনর্থ ঘটে! রাগের মাথায় নালিশ ত' করে' দিলাম—জান ত' সে সময়ে আমার শরীর অসুস্থ ছিল, কাজেই মেজাজটাও খিটখিটে হ'য়েছিল, যেদিন শুনলেম তোমার বিষয় নীলেম করিয়ে আমার নামে ডেকে খাসদখল নিয়েছে, সেদিন থেকে এগার বচ্ছর অনুতাপে জ্বলে' পুড়ে খাগ হয়েছি—এগারটা বচ্ছর। তোমার বৌদিদি এ-বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানেন না। বিভূতি বিষয়কর্ম্মের সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখে না। আমি অন্তরে অন্তরে তুষানলে দগ্ধ হয়েছি। সেই এগার বছর পরে শান্তি পেলুম কিরূপে শুন্‌বে? এই কাগজটা পড়ে' দেখ!

জীবন। এ ত' একখানা রেজেষ্ট্রী করা দলীল!

উমা। পড়েই দেখ না!

জীবন। এ কী করেছেন দাদা? বিষয়টা আবার আমাকে লিখে পড়ে' দিলেন কেন?

উমা। এগার বছর ধরে' নরক-যন্ত্রণা ভোগ করেছি, আর পার্‌ছিলুম না। দেখ জীবন, কর্ম্মফলে লোকান্তরে স্বর্গ বা নরক ভোগ কর্‌তে হয় এ বিশ্বাস আমার নাই। কর্ম্মফলের ভোগ ইহজীবনেই হয়। সত্য হ'ক, ভ্রান্ত হ'ক এই আমার বিশ্বাস। তোমার বিষয় তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে আমি নরক থেকে মুক্ত হ'লেম। আমার নামে ডেকে রেখেছিল বলে' এইটুকু সুবিধা হ'ল যে তোমাকে ফিরিয়ে দিতে পারলেম। আর কারো হাতে গিয়ে পড়লে আমার নরকযন্ত্রণার অবসান হ'ত না। কোবালাখানা রেজিষ্টী করে' আমার প্রায়শ্চিত্ত হ'ল—আবার আমি প্রকৃতিস্থ হ'লেম। আমার স্বাস্থ্যও সেইদিন থেকে উন্নতির দিকে চলেছে।

জীবন। কিন্তু আপনার টাকা?

উমা। এগার বছর তোমার বিষয় ভোগ কর্‌লেম, উপসত্ত্ব আত্মসাৎ কর্‌লেম, তা'তেও আমার টাকা শোধ হ'ল না? হিসেব কর্‌লে আমিই এখন তোমার কাছে ঋণী।

জীবন। (উমাপদর চরণধারণ করতঃ) এ কী কর্‌লেন দাদা? আপনি মানুষ নন, দেবতা।

উমা। আমি মানুষই, জীবন, দেবতা নই। এ বিষয় তোমাকে ফিরে না দিলে আমার নিস্তার হ'ত না। গত ১লা বৈশাখ এই দলীল রেজিষ্ট্রী হ'য়েছিল। কিন্তু এই প্রায় সাতমাস কি বলে' তোমার বাড়ী আসি, কেমন করে' তোমার কাছে কথা পাড়ি, কেমন করে' তোমাকে ডেকে কথা কই, এর কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছিলেম না। তুমি দেখা হ'লে আমাকে নমস্কার করতে, সাধারণের কাজ দু'জনে মিলেমিশে করতেম, কিন্তু তুমি ত' আমার বাড়ী ঢুক্‌তে না, কোনদিন আমাকে দাদা বলে'ও ত' ডাকনি। শেষে কমলাই আমার সুযোগ ঘটিয়ে দিলে। নিজে কষ্ট পেলে বটে কিন্তু আমার কাজটা হ'য়ে গেল।

জীবন। আমার অন্যায় হয়েছিল দাদা, কিন্তু সাহসে কুলোয় নি।

উমা। আমার ভাগ্যের দোষ।

জীবন। ভগবান যা' করেন মঙ্গলের জন্য। বিষয়টা হাত ছাড়া হ'বার ফলে আমি হিসেব করে' খরচ করতে শিখেছি। তাছাড়া, আমার হাতে বিষয় থাকলে, হয় ত' আমি সঞ্চয় করে' আপনার টাকা শোধ করতে পার্‌তাম না। এখন সঞ্চয়ের স্পৃহাটা জন্মেছে।

উমা। মঙ্গলময় চিরদিন মঙ্গলই করেন। কী-ভাবে করেন তা' বোঝবার শক্তি আমাদের নাই। যা হ'ক আমি চল্‌লেম এখন; কাজ আছে। কিন্তু তোমার সঙ্গেও আমার প্রয়োজনীয় কথা আছে। তুমি আজকালের মধ্যে আমার সঙ্গে একবার দেখা কর'—বাড়ীতে। (প্রস্থান)

জীবন। আজকালকার দিনে এমন মানুষ হয়, এ ত' আমার ধারণাই ছিল না। ভাললোক বলে' সব দিকেই ভাল হচ্ছে। গৃহিণী যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। ছেলেটি রূপে গুণে রত্নবিশেষ।

হৈমবতী। (প্রবেশ) জীবন আছিস্ নাকি রে?

জীবন। এই যে পিসীমা, আমি এখানেই বসে' আছি। তুমি এত ঝাপসা দেখছ?

হৈম। আর বাবা! আমার বয়সী লোক এ গাঁয়েই আর কেউ নেই। একটি একটি করে' সবাই চলে' গেছে। আমাকে খালি কষ্ট দেবার জন্যে ধর্ম্মরাজ এখনও নিচ্ছেন না।

জীবন। তোমার কষ্ট কিসের পিসীমা?

হৈম। বেশীদিন বাঁচাই কষ্ট। আর কষ্ট কিসের? তোর মতন এমন ছেলে, লক্ষ্মীঠাকরুণের মতন অমন বউ, কমলীর মত রূপে গুণে অমন নাত্‌নী। ঐযে বলে না, রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী—কমলীও আমার তাই। আমার কষ্ট কিসের? বউ-মা ত' মাথায় করে' রেখেছে। কমল ত' ঠাকুর-মা বল্‌তে অজ্ঞান। সোণার কমল! আমার একটু সেবা করতে পেলে যেন বর্ত্তে যায়। আমার পেটের ছেলেও বুঝি এমনটি হ'ত না—এমন বউ আর নাত্‌নীও হ'ত না। দুঃখু এই যে একটি ছেলে হ'ল না।

জীবন। কমলা কি ছেলে নয় পিসীমা?

হৈম। ছেলে নয়? ও পাঁচশো ছেলে। তবে কি না শিবরাত্রিরের সল্‌তে। এই দেখ্‌না সে-দিন কী-কাণ্ডটাই হ'য়ে গেল! জগদম্বা বাঁচিয়ে দিলেন।

জীবন। তোমারই পুণ্যের জোরে পিসীমা।

হৈম। জগদম্বার দয়া। আমার আবার পুণ্যি কিসের! হাঁরে, এখানে আর কেউ আছে, না একাটি চুপ করে' বসে' আছিস্?

জীবন। এখন একাই আছি পিসীমা! উমাপদবাবু এসেছিলেন, এই চলে' গেলেন।

হৈম। আবার ঐ অমে বোসটা এয়েছেল কেন? আরও কিছু মতলব আছে নাকি? অমন একটা বিষয় ফাঁকি দিয়ে নিলে—তোকে পথের কাঙাল করলে। এমন করলে যে মেয়েটার বে দেবার টাকা জুটছে না। বলি যে আমার যে-ক'খানা কোম্পানীর কাগজ আছে তাই ভাঙিয়ে মেয়ের বে দে, কিন্তু তোর একেবারে ধনুর্ভঙ্গ পণ যে সে-কাগজ ভাঙাবি নে।

জীবন। তোমার কাগজ ভাঙিয়ে মেয়ের বিয়ে দোবো পিসীমা? তার চেয়ে মেয়ে আমার আইবুড়ো থাক্।

হৈম। কী যে বলিস্ তা'র ঠিক নেই। মেয়ে আইবুড়ো থাক্‌বে? আমার টাকা নিয়ে কি হ'বে বল্‌ত? কাগজ কি আমার চিতেয় দিবি?

জীবন। তোমার টাকা দিয়ে গ্রামে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় খুলে' দোবো—নাম হ'বে "হৈমবতী দাতব্য-চিকিৎসালয়"। কত গরীব লোক, যা'রা ব্যারাম হ'লে ওষুধ পায় না, পয়সার অভাবে ডাক্তার কবিরাজ দেখাতে পারে না, তা'রা বেঁচে যাবে। কত লোক অকাল-মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাবে।

হৈম। আমার নামে কেন? যদি করাই হয়, তোর ঠাকুরদাদার নামে করে' দিস্।

জীবন। আমার নিজের টাকায় যদি কিছু কর্‌তে পারি, বাপ-ঠাকুরদার নামে করে' দোবো।

হৈম। তা' হ'তে পার্‌ত, জীবন, যদি অমে বোস তোর বিষয় ফাঁকি দিয়ে না নিত।

জীবন। ফাঁকি দিয়ে নেবেন কেন? বাবার আমলে যে-সকল দেনা হয়েছিল, সে-গুলো যে উমাপদবাবুর কাছে ধার করে' শোধ করেছিলেন। টাকা ত' দিতে পারিনি। উনি বিষয়টা না নিলে দেনা-শোধ হ'ত কি করে'?

হৈম। তা' বলে' কি ঐরকম কর্‌তে হয়? তুই ওর কী না করেছিস্? আমি কি জানি না?

জীবন। আমি যা' করেছি, গতরে করেছি। তা'তে কি দেনার টাকা শোধ হয়? কিন্তু সেজন্য আর দুঃখ কর্‌তে হ'বে না পিসীমা! আয় থেকে পাওনা টাকা উসুল করে' নিয়ে উমাপদবাবু সে-বিষয়টা আমায় ফিরে দিয়েছেন।

হৈম। কি-রকম? কবে?

জীবন। গত ১লা বৈশাখ কোবালা লিখে পড়ে' রেজিষ্ট্রী করেছিলেন, আজ এসে দিয়ে গেলেন। ঐজন্যই আজ এখানে এসেছিলেন।

হৈম। তা' হ'লে উমাপদকে ত' ভাল বল্‌তে হয়।

জীবন। সত্যিই উমাপদবাবু ভাললোক। যদি বিষয়

ফিরে না দিতেন, তা' হ'লেও ওঁকে ভাল লোক বল্‌তেম। আমার মুখে কোন দিন উমাপদবাবুর নিন্দা শুনেছ কি পিসীমা?

হৈম। তোর কথা ছেড়ে দে। তোর মুখে ত' কারো নিন্দে কখনও শুনি নি। তাই বলে' কি সকলেই ভাল লোক? কিন্তু উমাপদ যে ভাল লোক তা'ত আমিও বল্‌ছি। সে চিরজীবী হ'য়ে থাক্, তা'র ছেলেটি চিরজীবী হ'য়ে থাক, উমাপদর বউ সুখে ঘরকন্না করুক। আহা, বউমাটিও বড় ভাল।—যাই, আমার সন্ধ্যাহ্নিকের সময় হ'ল। —ওলো কম্‌লি—

কমলা। (প্রবেশ) কি বল্‌ছ ঠাকুরমা?

হৈম। আমার হাতটা ধরে' ঠাকুর-ঘরে নিয়ে চল্ না দিদি! অন্ধকার হ'লে আর কিছু দেখতে পাই নি।

কমলা। এস ঠাকুরমা, তোমাকে ঠাকুরঘরে দিয়ে আসি। (হৈমবতীকে লইয়া প্রস্থান)

জীবন। পিসীমা আছেন বলে' মায়ের অভাব বুঝতে পারি না।

সৌদামিনী। (হারিকেনলণ্ঠন হস্তে প্রবেশ) হ্যাঁগা, বোসের বাড়ীর বটঠাকুর হঠাৎ এয়েছিলেন কেন গা?

জীবন। (হাসিতে হাসিতে) তুমি বড় বিচ্ছু! সব কথা আড়ালে দাঁড়িয়ে শোনা হয়েছে, আর এসে ন্যাকামি হচ্ছে

সৌ। বাঃ! তুমি যে অন্তর্যামী হ'লে! আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনেছি তোমাকে কে বল্‌লে? কেবল ধাপ পাবাজী!

জীবন। ধাপ্পাবাজ আমি, না তুমি? তোমার চোখ মুখ দেখে যদি পেটের কথা ধর্‌তে না পারব, তা' হ'লে এ-বিশ বছর তোমায় নিয়ে ঘর কর্‌লুম কি কর্‌তে প্রেয়সি?

সৌ। আঃ, কি কর? মেয়েটা শুন্‌তে পেলে কি মনে করবে?

জীবন। মেয়ে তা'র ঠাকুরমাকে ঠাকুরঘরে পৌঁছে দিতে গেছে। তা'ত জান। ঐখানেই ত' ছিলে, পিসীমা ছিলেন বলে' ঘরে ঢুকতে পার নি। আর কি অন্যায় কথাই বলেছি? তুমি যে আমার আঁধারের আলো। ঘরে প্রবেশ কর্‌লে, আর অমনি আমার ঘর আলো হ'য়ে গেল!

সৌ। ঠাট্টা কর কেন বল দেখি? আমি এলুম বলে ঘর আলো হ'ল, না লণ্ঠনটা আন্‌লুম বলে আলো হ'ল? ভুতো বাজারে গেছে কখন, এখনও আসবার নাম নেই। তা'কে আজ বক্‌ব—কখনও ত' কিছু বলি না। এই আলোর পাট কে করে বল ত'? কেবল মিষ্টি কথায় আর কাজ হয় না।

জীবন। মিষ্টি কথায় চাকর-বাকর যত্ন করে কাজ করে। কড়া কথায় যদি তা'দের মেজাজই বিগড়ে যায়, যত্ন আসবে কেমন করে'—তা'রা "দিনগত পাপক্ষয়ের" মত কাজ করে। তা'রাও ত' মানুষ, তা'দেরও ত' অনুভবশক্তি আছে, তা'রাও ত' মিষ্টি কথায় সুখী এবং কড়া কথায় দুঃখিত বা ক্রুদ্ধ হ'তে পারে। তদ্ভিন্ন, তা'রা machine নয় যে নাগাড় কাজ কর্‌তে পারে, তা'দেরও শ্রান্তি, ক্লান্তি হয়, তা'দেরও বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। এই দেখ আমাদের বাড়ীতে চাকর-বাকরের ওপর খিটখিট করা হয় না বলে', তাদের কড়া কথা বলা হয় না বলে', যথোচিত বিশ্রামের অবসর দেওয়া হয় বলে' এবং খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে যত্ন করা হয় বলে' তা'রা এবাড়ী ছেড়ে যেতে চায় না। পুরোণো চাকর-বাকর বড় useful হয় তা'ত বোঝা'তে হ'বে না।

সৌ। ঐ sermon ম'শায়ের কাছে ত' বহুবার শোনা হয়েছে। এ-বাড়ীতে এর বিরুদ্ধ কাজ যখন হয় না, অন্ততঃ এ যাবৎ হয়নি, তখন পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক।

জীবন। তুমি যে ভুতোর ওপর চটছিলে, তাই স্মরণ করিয়ে দিলেম।

সৌ। নাও, তোমারই জিৎ। আমি ত তোমার কাছে হার মেনেই আছি।

জীবন। তোমার হারই হ'ত যদি কমলার মতন কন্যা-রত্নটী আমাকে উপহার না দিতে। শুধু প্রসব করে'ই ক্ষান্ত হওনি, সর্ব্ববিষয়ে নিজের মতন করে' গড়ে' তুলেছ।

সৌ। আমি তোমার model নাকি?

জীবন। তোমার চেয়ে ভাল model-এর আমার প্রয়োজন হয় নি।

সৌ। কমলাকে লেখাপড়াও কি আমি শিখিয়েছি?

জীবন। তুমি পার্‌তে, যদি বাধ্য হ'য়ে সংসারের কাজে তোমাকে ব্যাপৃত না থাকতে হ'ত। অগত্যা আমাকে ঐ

ভারটা নিতে হয়েছে। কিন্তু, সদু, কেবল পুঁথিগত বিদ্যে হ'লে পূর্ণ শিক্ষা লাভ হয় না। চরিত্রগঠন ত' তুমিই করেছ —নিজের আদর্শে। আজকাল অনেক মেয়েই ত' লেখাপড়া শেখে, B. A., M. A, পাস করে, কিন্তু সকলের চরিত্র কি কমলার মত গঠিত হয়?

সৌ। নিজের জিনিষটিকে সকলেই ভাল দেখে।

জীবন। আমি কি-ধাতুতে গঠিত তা' কি তুমি জান না সদু?

সৌ। আমার পুনর্জন্ম হ'লেও তোমার মতন হ'তে পারব না। এখন কাজের কথা শুনবে, না কেবল lecture শোনাবে? আমার যেন সন্ধ্যেবেলায় আর কাজ নেই?

জীবন। তোমাকে দেখলে আমি কাজ ভুলে যাই।

সৌ। সত্যি নাকি? তবে আমি চল্লুম, তোমাকে কাজ ভোলাতে চাইনে।

জীবন। আচ্ছা, রাগ কর কেন? কী কাজের কথা বলবে বল, আর রাগারাগিতে কাজ নেই। বলে' ফেল, আমি উৎকর্ণ হ'য়ে রইলুম।

সৌ। আমার সঙ্গে কি চিরদিন রঙ্গ করবে? বয়েস হচ্ছে না কি? এখন যে তুমি কর্ত্তা, আমি গিন্নী। দু'এক বছর বাদে যখন নাতি হ'বে তখন হ'ব বুড়োবুড়ী।

জীবন। বয়স বেশী হ'লেই যদি লোকে বুড়ো বলে, আমরা শুনব কেন? মনটাকে বুড়ো হ'তে দোবো কেন? স্বভাবটাকে আজীবন childlike রাখতে হ'বে।—নাও, কি বলবে বল। আবার কেউ এসে পড়লে এখন আর বলা হ'বে না।

সৌ। সে-দিন বোসের বাড়ীর দিদি বিভুর সঙ্গে কমলার বিয়ের কথা বলছিলেন। কমলা হ'বার পর তিনি আমার সঙ্গে বেয়ান পাতিয়েছিলেন মনে আছে?

জীবন। আছে বৈ কি। বলেছিলেন ঐ-মেয়ের সঙ্গে বিভুর বিয়ে দেবেন।

সৌ। এখন সেই বিয়ে দিতে চান। তোমাকে এখন বলতে মানা করেছিলেন। আমি যে তোমার কাছে কোন কথা চেপে রাখতে পারিনে তা'ত তিনি জানেন না। ক'দিন চেপে চেপে আমার পেট ফুলে গেছে।

জীবন। হিসেব মত বিভুর সঙ্গেই কমলার বিয়ে হওয়া উচিত, কারণ, বিভুই ওর প্রাণ রক্ষা করেছে, জল থেকে তুলে ওকে কোলে করে' বাড়ী নিয়ে গেছে।

সৌ। বিভুর মা-ই ত' নিজের মুখে কথা পেড়েছেন। কর্ত্তাকে একবার জিজ্ঞেস না করে' ত পাকাপাকি করতে পারেন না, সেই জন্যে তোমাকে বলতে বারণ করেছেন। তবে গিন্নীর যখন পছন্দ হ'য়েছে, কর্ত্তারও হ'বে।

জীবন। কর্ত্তাও আমাকে তাঁ'র বাড়ী যেতে বলে' গেলেন—বললেন প্রয়োজনীয় কথা আছে। হয়ত, ঐ-কথাই হ'বে।

সৌ। খুবই সম্ভব। তুমি তা'হলে দেরী কর' না। কালই কর্ত্তার সঙ্গে দেখা কর।

বিভূতি। (প্রবেশ করিতে করিতে) কাকাবাবু!—এই যে কাকীমাও এখানে।

জীবন। এস বিভু! হাতে instrument bag দেখছি যে—কোন case দেখতে যাচ্ছ, না দেখে ফিরছ?

বিভু। সাদেক আলির ছেলের কলেরা হ'য়েছে বলে' ডাকতে এয়েছেল। কিন্তু এদিকে কী ব্যাপার হ'য়েছে শুনেছেন?

জীবন। না, আমি ত' কিছু শুনি নি। কী হয়েছে?

বিভু। শুনলুম সাদেক আলির কাছে খাজনার তাগাদা করতে একজন পাইক গেছল, সাদেক তাকে হাঁকিয়ে দিয়েছে, আর বলেছে যে বারো বছরের বেশী সে যে-জমি দখল করছে, সে-জমি তারই হ'য়ে গেছে।

জীবন। বেটা দেখছি, আইন পুড়িয়ে খেয়েছে। ওগো, বিভুকে কিছু খাবার এনে দেও না। cholera case দেখতে যাচ্ছে—শুনেছি খালি-পেটে যেতে নাই। অবশ্য আমার শোনা-কথা।

বিভু। কথাটা ঠিক, তবে ডাক্তারেরা সব সময়ে ওটা মেনে চলতে পারে না। সময় হয় না—case-গুলো খুব urgent ত'।

সৌ। খাবার তৈরী আছে। চা করতে সামান্য একটু দেরী হ'তে পারে।

বিভু। খাবারের সঙ্গে চা না খাওয়াই ভাল।

সৌ। তা' হ'লে আমি কমলাকে দিয়ে খাবার এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি। (প্রস্থান)

জীবন। খাবারের সঙ্গে চা না-খাওয়া ভাল কেন?

বিভূ। চা-এ tanic acid আছে তা'ত জানেন-ই। তেমনি প্রায় সব খাবারেই অল্প বিস্তর albumenous substance আছে; তা'র ওপর tanic acid পড়লে precipitate হ'য়ে যায়, কাজেই সহজে হজম হয় না। সেই জন্য অনেকের মতে চা খা'বার কিছুক্ষণ পরে খাবার খাওয়া উচিত। লক্ষ্য করে' থাক্‌বেন যে খালি-পেটে চা খেলে তা'র কিছুক্ষণ পরে ক্ষিদে পায়।

সৌ। (প্রবেশ করতঃ বিভূতির সম্মুখে খাবার রাখিয়া) খাও বাবা!

বিভূ। আপনি নিজেই কষ্ট করে' আনলেন যে কাকীমা!

সৌ। এতে আর কষ্ট কি বাবা? ছেলের জন্য খাবার আন্‌তে কি মায়ের কষ্ট হয়? কমলা যে আস্‌তে পারলে না।

বিভূ। (খাবার ও জল খাইবার পর) সাদেকের ঐ-রূপ ব্যভারের পর আশরফ ও তমিজ এসেছিল। তা'রা বল্‌লে সেই হাজী সাদেকের কাণে কী মন্তর দিয়ে গেছে, তা'র ফলে সাদেক হিন্দু-বিদ্বেষী হ'য়ে উঠেছে।

সৌ। তা' হ'লে তা'র বাড়ী যাওয়াটা কি ভাল হ'বে?

বিভূ। না গেলে যে ডাক্তারের কর্ত্তব্য পালন হয় না কাকীমা!

জীবন। যেতে হ'বে বৈকি, তবে সাবধান হ'য়ে যেতে হ'বে।

বিভূ। বাবা চারজন পাইক সঙ্গে দিয়েছেন, তা'দের দু'জনের হাতে বন্দুক আছে। আমিও revolver নিয়েছি। তা' ছাড়া তমিজ আর আশরফ বলে' গেল যে তা'রা সাদেককে ঢিট করে' দেবে। জানেন ত' এখানকার মুসলমানের ওপর ওদের কত influence? ওদের অবাধ্য কেউ হবে না।

জীবন। চল, আমিও revolverটা নিয়ে যাই।

[ক্রমশঃ

এরাও মানুষ

শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

মাঠের বুকে প্রাণের সুখে রৌদ্রধারায় নেয়ে,
গাঁয়ের কৃষাণ খাটছে নিতুই, ঘাম ঝরে গা' বেয়ে।
নিদ্রা নাহি চোখের কোণে আলস্য নাই দেহে মনে,
দেশের ভাগ্য করছে শ্যামল, নিজের ভাগ্য ধূ ধূ,
এরাও মানুষ সবার মতন, নয় আকারেই শুধু।

এরাও মানুষ দেশের বোঝা বইছে হ'য়ে কুলি,
ধূলায় মলিন, মানের বালাই নিঃশেষে সব ভুলি'।
এরাও মানুষ মেথর, মুচি, অনুন্নত নয় অশুচি,
রক্তে এদের দেশের তরী ভাস্‌ছে অনুক্ষণ,
চিত্ত এদের নয়কো নরক, মধুর বৃন্দাবন।

কামার যে আজ টান্‌ছে হাফর, কর্‌ছে লোহার কাজ,
কুমার গড়ে মাটির দ্বারা "মেটেপাত্র" আজ।
নয়কো তারা কামার, কুমার দেখ্‌তে যে সব একই প্রকার,
কর্ম্মেতে হয় ছুতোর, চামার, কেবল বিভেদ-ভরা,
মানুষ এরাও, রক্তে হাড়ে শরীর এদের গড়া।

এদের ঘৃণা তুচ্ছ ক'রে র'য়ো না আজ দূরে,
নিজের কাজে মত্ত থাকি' নিত্য বিলাসপুরে।
ভাই হ'য়ে নাও ভা'য়ের মত বুকের কাছে এই ত' ব্রত!
বৎসলতার বৃষ্টিপাতে করাও অভিষেক,
ভা'য়ের বুকের আলিঙ্গনে কাটুক্ মনের মেঘ।



সুখের পিছে মরি ঘুরে

শ্রীরেখা দেবী

অন্যান্যবারে আমি আপনাদের কাছে নিয়ে আসি হয় রান্না, না হয় সেলাই, না হয় তো হাতের কাজ ইত্যাদি কিছু না কিছুর নূতন খবর ; কিন্তু এবার আমি খবরের ঝুলি নিয়ে আসি নি—এসেছি শূন্য হাতে কিন্তু ভরা মনে। তাই বলছি আসুন আজ আমরা কিছুক্ষণের জন্য রান্না ঘরে শিকল দিয়ে সেলাই-বোনার থলি সরিয়ে রেখে সবাই মিলে বসে দু'টো মনের কথা কই। আগেই বলেছি যে আজ আমি আপনাদের মাঝে এসেছি ভরা মনে, যে কথাগুলি মনের মাঝে জড় হয়ে তাকে' ভারাক্রান্ত করে তুলেছে তারই আলোচনা আজ আপনাদের সঙ্গে করে তাকে ভার মুক্ত করবো।

আর কিছু বলবার আগেই আমার পাঠিকাদের আজ আমি একটী প্রশ্ন করবো ঠিক করেছি—আর সে প্রশ্নের উত্তরে আপনারা যে যা বলবেন তারই মধ্যে থেকে আমি খুঁজে পাবো যা বলতে চাই তার উপকরণ। দেখতে পাবো আপনাদের মনের ভিতরকার একটী নূতন দিক। প্রশ্নটী হচ্ছে,—আমরা কি চাই—কোন জিনিষটীকে জীবনে সবচেয়ে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি? আমি জানি আমার প্রশ্নের উত্তর আপনারা দেবেন নানা রকম—কেউ বলবেন "অর্থ", কেউ বলবেন "স্বাস্থ্য",—কেউ বলবেন "নাম যশঃ-খ্যাতি"—ইত্যাদি—এক কথায়—এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা জানাবো আমাদের যার যা অভাব তারই নালিশ,—যা পাইনি তাকে' পাওয়ার সমস্যা। আমরা সবাই যে যার অভাব অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর নাম করবো বটে—কিন্তু আসলে এই সব বিভিন্ন চাওয়া থাকবে একই সূত্রে গাঁথা। কারণ এরা সবাই একই উৎস হতে উৎসারিত—আর সেই প্রধান উৎসটীর মূলেই আছে আমাদের সবাইকার কামনার ধন, মানুষের চিরবাঞ্ছিত বস্তুটী—যাকে' পেয়ে কখনও আশ মেটে না। যার অল্প আছে সে বেশী চায়—যার বেশী আছে সে আরও চায়—আর যে এ হতে বঞ্চিত তার তো চাওয়ার সীমাই নেই।

যেমন একটী বড় নদী হ'তে অসংখ্য ছোট ছোট শাখা-প্রশাখা বিভিন্ন পথে বয়ে যায়, আর মানুষ আবার সেই ছোট ছোট নদীগুলির আলাদা আলাদা নাম দেয়—তেমনি আমাদের 'চাওয়া'কেও বিভিন্ন নামের আবরণ দিয়ে আমরা মনে করি বুঝি তারা অন্যের থেকে পৃথক। আলাদা নাম-করণ হলেও যেমন শাখানদীগুলি 'প্রধান' নদীরই অংশ থাকে—আর তাদের উৎস কোথায় তার খোঁজ নিতে গেলে যেমন মানুষকে এসে জমা হতে হয় সেই প্রধান স্রোতস্বিনীটীরই কাছে—তেমনি আমাদের সকলকার আলাদা আলাদা আকাঙ্ক্ষিত বস্তুরও উৎসের খোঁজে বেরুলে আমাদেরও এসে জমতে হবে একই জায়গায়। বিভিন্ন নামের অন্তরালে থেকে ভিন্নরূপে দেখা দিলেও আসলে এরা সবাই এক-একটী সাধারণ সূত্র এদের সবাইকে পরস্পরের সঙ্গে গেঁথে রেখেছে—কাজেই সেই প্রধান বস্তুটী, যা থেকে এদের জন্ম তার নাম করলেই একাধারে আমাদের সব কামনার ধনেরই নাম করা হবে। আর সে বস্তুটী হচ্ছে "সুখ",—যার সন্ধান মানুষ চিরন্তন কাল হতে করে চলেছে—জন্ম হতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রতি পলে, প্রতি কাজে, প্রতি অনুভূতির মধ্যে দিয়ে চায় যার পরশ পেতে। এই যে আমরা অর্থ চাই, স্বাস্থ্য চাই, প্রতিপত্তি চাই,—কেন? 'সুখী' হব বলেই নয় কি? আজ আমি যে প্রশ্ন আপনাদের কাছে করেছি তার উত্তরে যে বলবে, "অর্থই সব চেয়ে বাঞ্ছনীয়"—সে বিপুল অর্থের অধিকারিণী হওয়ার যে আত্মগরিমা, যে তৃপ্তি, যে সুখ—সেই সুখের আস্বাদ পেতে; আর চায় 'অর্থ' তাকে এনে দিতে পারবে যে বিলাসিতার সুযোগ, সেই বিলাসিতার সুখ উপভোগ করতে—তাই সে চায় 'অর্থ।' যে মনে করে "স্বাস্থ্যই মানুষের প্রধান কাম্য", সে চায় অটুট স্বাস্থ্যের যে আনন্দ, যে জীবনী-শক্তি, যে উত্তেজনা তার অধিকারী হওয়ার সুখ; এবং প্রাণ ভরে উপভোগ করতে চায় জীবন ও জগতের সব কিছু উৎকৃষ্ট বস্তুকে। যে বলে "নাম-যশঃ-খ্যাতি"—সে চায় উন্নতির চরম শিখরে ওঠার গর্ব্বের অধিকারী হতে—সাফল্যের আনন্দ ও আত্মতৃপ্তির পরম সুখ উপভোগ করতে। কাজে কাজেই দেখা যাচ্ছে যে সবারই চাওয়ার মূলে আছে "সুখ"—সুখী হওয়ার বাসনা।

এই যে দুর্লভ বস্তু "সুখ", যাকে প্রতি মানব সন্তান পাবার আশায় ব্যাকুল হয়ে রয়েছে—সে আছে কোথায়? কোনটী তার আত্মগোপনের স্থান! সে স্থান কি এতই দুরভিগম্য যে সেখানে কোন মতেই পৌঁছিতে পারা যায় না? তাই কি আমরা তাকে খুঁজে পাই না? না, যে পথ ধরে মানুষ তার সন্ধানে বার হয় সেইটাই ভুল? কে আমাদের বলে দিতে পারে কোথায় গেলে, কি করলে তাকে পাবো?" যখন আমরা বহু সাধ্য-সাধনাতেও সুখের ছায়াটুকু ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাই না তখন এমনি হাজার রকমের প্রশ্ন মনে জাগে—কিন্তু সুখের লোভে আমরা প্রায় যেন আত্ম-হারা হয়ে উন্মত্ত ভাবে তাকে আয়ত্ত করবার চেষ্টায় ছুটে বেড়াই বলেই একটু বুঝতে পারি না বা বুঝে চিন্তা করে দেখবার সময় পর্য্যন্ত পাই না যে তাকে পাওয়ার সন্ধান কেউ বলে দিতে পারে না। কোন পথে গেলে পাবো তা কেউ দেখিয়ে দিতে পারে না—আর তার প্রয়োজনও নেই; কারণ যার সন্ধানে আজ মানুষ পথে পথে কাঙাল হয়ে বেড়াচ্ছে সে রয়েছে

মানুষেরই অন্তরে! আর সে দিকে একবার তাকিয়ে দেখবার, সেখানে একবার খোঁজ নেবার পর্য্যন্ত তাদের সময় মেলে না—"বাইরে" তাকে, খুঁজতে তারা এমনি ব্যস্ত! এই দোষেই, এই অন্তর ছেড়ে বাইরে খোঁজার দোষেই মানুষ তার কাম্য বস্তুর সন্ধান পায় এত কম। যেদিন আমরা এ স্বভাব ত্যাগ করতে পারবো সে দিন আমাদের বাঞ্ছিত ধনও আর আয়ত্বের বাইরে বেশীক্ষণ থাকবে না। আমাদের দেশেরই একজন কবি ৺অতুলপ্রসাদ মানুষের এই সুখের সন্ধানে যাত্রা ও বিফলতা দেখেই বোধ করি লিখেছিলেন—

"সুখের পিছে মরি ঘুরে তাই তো রে সুখ পালায় দূরে,
সে আনন্দ ওরে অন্ধ বন্ধ মনের সিন্ধুকে"—

সত্যই আমরা অন্ধ তাই মনের ভিতরে লুকিয়ে আছে যে অতুল ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার তাকে দেখতে পাই না—কিন্তু যতদিন না আমরা ঐ "মনের—সিন্ধুক" খুলতে শিখবো ততদিন কিছুতেই যা চাই তা পাবো না—'সুখে'র সন্ধান মিলবে না। আর যদি সত্যিই সুখের সন্ধান পেতে চাই তাহলে যে মনের সিন্ধুকে তা লুকিয়ে আছে তাকে খোলবার কৌশল শিখবার উপযুক্ত করে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে—আমাদের ব্যাধিগ্রস্ত, পঙ্গু মনের ক্ষমতা নেই সে ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারের দুয়ার খোলবার, তাই আগে তাকে করতে হবে ব্যাধিমুক্ত, সুস্থ, পবিত্র এবং উন্নত। স্বার্থপরতা, দুর্ব্বলতা, অকৃতজ্ঞতা ইত্যাদি ব্যাধিই মনকে করে তোলে বিষাক্ত, তার দৃষ্টিশক্তিকে করে তোলে ক্ষীণ—যার দরুণ যা সত্য তা সে দেখতে পায় না, আর যা মিথ্যা তাকেই বড় করে তোলে, আর এই জন্যই সত্যের সন্ধান পাওয়া হয় মানুষের পক্ষে এত কঠিন।

আমরা সবাই মনে করি যে, আমার দুঃখটাই বুঝি জগতে সব চেয়ে বেশী—এমন কষ্ট বুঝি আর কারো নেই, আর এই মনোভাবেই প্রকাশ পায় আমাদের মনের 'অকৃতজ্ঞতা'। কেবল আমার জীবনের দুঃখটাকে, তার অভাবের দিকটাকেই বড় করে দেখছি—যা নেই যা পাইনি, তারই বিফলতার কাঁটা মনের মধ্যে জাগিয়ে রেখে তার ঘায়ে নিজেদের ক্ষত-বিক্ষত করছি। কিন্তু কই একবারও তো ভাবি না 'আমার কি আছে'? ভগবানের আশীর্ব্বাদে কত অমূল্য ধনের অধিকারী আমি? জীবনের আর সব পাওয়ার কথা ভুলে যদি কেবল দুঃখ-অভাবের কথাটাই মনে গেঁথে রাখি তাহলে সে যে আরও বড়, আরও ভীষণতর হয়ে দেখা দেবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? মন যে অকৃতজ্ঞতারূপ ব্যাধির কবলে পড়ে কতদূর অসহায় হয়ে পড়েছে তা' এই সবের মধ্য দিয়ে বেশ ভালো ভাবেই বোঝা যায়; কাজেই এখন আমাদের প্রধান কাজ ঐ ব্যাধি নাশের চেষ্টা করা; তাকে নাশ করতে হলে সর্ব্বদা মনে জাগিয়ে রাখতে হবে একটী চিন্তা—"ভগবান আমাদের কত দিয়েছে"—আঘাত পেলে, দুঃখ পেলে ভেবে দেখতে হবে, তুলনা করবার চেষ্টা করতে হবে যে অন্যের তুলনায় সে দুঃখ কত কম জগতে এমন অনেক লোক আছে যার সব আশা আকাঙ্খা চিরদিনের মত নিরাশার অন্ধকারে ডুবে গেছে—যার জীবনে এমন কোন স্নেহ ভালবাসার রূপ নেই—কোন অবলম্বন নেই যাকে আশ্রয় করে তারা আবার নিভে যাওয়া আশার প্রদীপ জ্বালাতে পারে! হয় তো বা আবার জ্ঞানের তার উপর অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান পর্য্যন্ত নেই, হয় তো বা তারা আশ্রয়হীন, ব্যাধিগ্রস্ত! একবার ভেবে দেখুন দেখি ঐ সব দুর্ভাগাদের অভিশপ্ত জীবনের সর্ব্বগ্রাসী দুঃখের তুলনায় আপনাদের দুঃখ কত তুচ্ছ, কত সামান্য! আপনাদের আছে গৃহ, আছে অন্ন-বস্ত্র, আর আছে ভগবানের শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদী ফুল সন্তান-সন্ততি! যাদের সুন্দর নির্ম্মল মুখের দিকে চেয়ে আপনারা সব দুঃখ, সব অভাব ভুলতে পারেন, যাদের আশ্রয় করে জ্বালিয়ে রাখতে পারবেন জীবনে শত-দুঃখ-দারিদ্র্যের মাঝে আশার আলো। এত পেয়েও কি সে সব কথা ভুলে গিয়ে চরম অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে কেবল নিজের দুঃখ আর অভাবের কথাটাই মনে করে কষ্ট ও অশান্তি ভোগ করা উচিৎ? কখনই নয়—এই অকৃতজ্ঞতার কবল থেকে মনকে মুক্ত করতে হবে, সর্ব্বদা মনে রাখুন আপনারা অন্যের তুলনায় কত সুখী, কত বেশী সৌভাগ্যশালিনী। ভগবানকে প্রাণভরে ধন্যবাদ জানান, যা তিনি আপনাদের দিয়েছেন তার জন্য। এ কাজটী যদি করতে পারেন দেখবেন, আপনি মন থেকে সরে যাবে দুঃখ ও নৈরাশ্যের ভারি পাথর—আর তার জায়গায় বিরাজ করবে অপার আনন্দ ও শান্তি। তখন আজ যাকে পাওয়া অসম্ভব মনে করছি, সেই দুর্লভ বস্তু 'সুখ'কে পাওয়া যে সত্যিই 'অসম্ভব', তা' আর মনে হবে না। তাহারা "মনের সিন্ধুকের" চাবি খোলবার কৌশল এর ভিতর দিয়েই অনেকখানি শিখে ফেলা হবে, আর যেটুকু তখনও শিখতে বাকী থাকবে তাকে আয়ত্ত করতে হবে মনের বাকী ব্যধিগুলিকে নাশ করে।

পৃথিবীতে জন্ম নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হয় জীবনের শেষ মুহূর্ত্তের দিকে এগিয়ে চলা। মৃত্যু একদিন না একদিন আমাদের দ্বারে এসে দাঁড়াবেই, একথা আমরা সবাই জানি কিন্তু কই প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত্ত আমাদের এই সুন্দরী-ধরণীর কোল থেকে কেড়ে নেবার, সুখ-দুঃখ বিজড়িত সংসার থেকে সরিয়ে নেবার, ভালবাসার জনদের বাহুবন্ধন হ'তে ছিনিয়ে নেবার সময়ের দিকে মৃত্যু আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলেছে, তা' নিয়ে তো আমরা দুঃখ করে, কষ্ট পেয়ে, মন খারাপ করে বসে থাকি না! কেন? কারণ আমরা জানি যে, "জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?" জীবন ও মৃত্যু পরস্পর অনিবার্য্যরূপে জড়িত জানি বলেই তাকে নীরবে মেনে নিই। তেমনি মানুষের জীবনের সঙ্গে যে বিধাতা সুখ ও দুঃখকেও অবিভাজ্যভাবেই গেঁথে দিয়েছে, সে কথাও তো জানি? তবে কেন সব জেনে শুনেও দুঃখের আগমনে বা তার আগমন সম্ভাবনায় এত ব্যাকুল হই? তার কারণ আর কিছুই নয় 'দুর্ব্বলতা'। মনের দুর্ব্বলতাই সেই অকারণ অশান্তির কারণ, আর এই দুর্ব্বলতাকে সময় থাকতে উৎপাটন না করলে, সে আগাছার মত দ্রুত বেড়ে চলে, ক্রমে তার ডাল-পালার আড়ালে আমাদের সমস্ত মনকে ঢেকে ফেলবে, তখন আর তার হাত থেকে শত চেষ্টাতেও উদ্ধার পাওয়া যাবে না। কাজে কাজেই সময় থাকতে মনের এই প্রধান শত্রুকে নাশ করতে হবে। জানি যখন যে দুঃখ আমার দ্বারে আসবেই তখন সে এলে তাকে বাইরে রাখার বৃথা চেষ্টা করলেই বাঁধবে গোলমাল। তাকে সাহসে বুক বেঁধে আমাদের মেনে নিতে শিখতে হবে, তা' না করে যদি ভয়ে ভাবনায় অস্থির হই আর দুঃখকে দুয়ার বন্ধ করে বাইরে রাখতে চাই তাতে লাভ তো হবেই

না উল্টে হবে ক্ষতি।" কারণ তখন সত্যকার দুঃখের সঙ্গে মিশবে আমাদের দুর্ব্বল মনের কল্পনা, যা তাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে করে তুলবে আরও বড় আরও বেশী ভয়াবহ। রবীন্দ্রনাথ আমাদের এই দুঃখ জয় করবার মন্ত্র শেখাতেই উপদেশ দিয়ে বলেছেন—

"দুঃখ যদি আসেই দ্বারে ;
ভয় পেও না দেখে তারে ,
রঙ্গীন রাখি পরিয়ে হাতে
বরণ করে নিও।"

সারা বিশ্বের সত্য জড় হয়ে আছে এই ক'টি কথায় 'রঙ্গীন রাখি' পরিয়ে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে, আর 'বরণ' করে অর্থাৎ আদরে গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। কারণ যারা তাকে সাদরে গ্রহণ করতে পারে একমাত্র তারাই পারে তাকে জয় করতে। ঐ মেনে নেওয়ার মধ্য দিয়েই হবে তাকে জয় করা। হয় তো বা আপনারা বলবেন যে, "বলা সহজ কিন্তু করা কঠিন", ঠিক কথা, কঠিন যে তা' আমিও স্বীকার করি, কিন্তু কঠিন হলেও অসম্ভব নয়, কাজেই যে কঠিন কাজটী করবার ইচ্ছাও হওয়া উচিৎ প্রবল। বাধা হয় যত বেশী তাকে অতিক্রম করতে পারতে থাকে তত আনন্দ। শক্তিশালী শত্রুকে পরাস্ত করায় যে আনন্দ, দুর্ব্বল শত্রুর পরাজয় স্বীকারে কি তা' পাওয়া যায়? যেমন যে সবল, এমন কি যার শক্তি আমাদের চেয়েও বেশী বলে মনে করি তাকে পরাস্ত করাতেই দেওয়া হয় যথার্থ শক্তির পরিচয়, তেমনি যদি দুঃখের কাছে পরাজয় স্বীকার না করে তার দেওয়া আঘাতে ভেঙ্গে না পড়ে তাকে স্থিরভাবে মেনে নিতে পারা যায় তবেই দেওয়া হবে যথার্থ ধৈর্য্য ও সাহসের পরিচয়। পৃথিবীতে কোন কিছুই বিনা প্রয়োজনে ঘটে না। যখন দুঃখ আসে আঘাত পাই, তখন যদি এই কথাটী মনে রেখে অস্থির না হয়ে একটুখানি তলিয়ে বুঝে, খুঁজে দেখবার চেষ্টা করি যে কি প্রয়োজনে বা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে দুঃখের সৃষ্টি তা' হলে অনেক সময় চোখে পড়বে যে, কোন না কোন মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনার্থে-ই তার সৃষ্টি। আর তার কারণ জানতে পারার পর আর ব্যথাও অতো তীব্র হয়ে বাজবে না, যতন বাজে কারণ না জানলে। হয় তো আবার অনেক সময়েই তখনই কারণের খোঁজ পাওয়া নাও যেতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ না তার কারণ বুঝতে পারি ততক্ষণ যদি এ বিশ্বাসটুকু মনে রাখতে পারি যে, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন, তা' হলে কিছুদিনের মধ্যেই যিনি দুঃখ দিয়েছেন তিনিই আমাদের দেখিয়ে দেবেন, বুঝিয়ে দেবেন কোন মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনার্থে তার সৃষ্টি হয়েছে।

"স্বার্থপরতা" রূপ ব্যধি মানুষ মাত্রেরই মনে আছে, কিন্তু কোথাও বা আছে একটু বেশী আর কোথাও বা একটু কম, এই যা তফাৎ—তবে আজ আমরা মনের ব্যাধি নাশ করে তাকে মুক্তি দেবার উদ্দেশ্যেই যখন আমাদের আলোচনা সুরু করেছি তখন বেশীই থাক আর কমই থাক আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ একে সমূলে নির্ম্মূল করা। আমরা সকলই চাই যা নেই তাকে পেতে, যা যা আছে তাকে আরও বাড়াতে, কেমন নয়? অথচ যা করলে ঐ 'পাওয়া' এবং 'বাড়ানোর' আশা পূর্ণ হবে সেটাই যদি না করি তবে 'আরও পাওয়া' এবং "যা নেই তা পাওয়ার" ইচ্ছা সফল হবে কেমন করে? কাজেই আমাদের পাওয়ার পথের প্রধান বাধা মনের এই স্বার্থ-পরতার ভাবকে নষ্ট করে আগে আমাদের শিখতে হবে 'দিতে'—তবেই আমাদের পাওয়ার আশা পূর্ণ হবার সম্ভাবনা থাকবে। স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র মহাশয় এ বিষয়ে তাঁর অতুলনীয় রচনাগুলির মধ্যে একটীতে কয়েকটী অত্যন্ত মূল্যবান কথা লিখে গেছেন—তিনি লিখেছেন—"যাকে দিই নি তার কাছে চাইবো কেমন করে?" অথচ আমরা ঠিক তাই করি, দেওয়ার কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে কেবল চাইতেই থাকি, আর সে চাওয়া পূর্ণ না হলে ভাবি, আমার মত হতভাগ্য আর কেউ নেই—আমি কিছুই পাই না। জীবন এবং জগতের কাছে 'পাওয়ার' দাবী জানাবার আগে যদি শেখা যায় তাদের দাবী মেটাতে তবে এই "চাওয়া-পাওয়া" সমস্যার সমাধান হয়ে যায় অতি সহজেই ; কিন্তু সেটাই শেখা মানুষের থেকে যায় বাকী। একটী কাজ এসবের মধ্যে সন্ধি-স্থাপন করে, মানুষের মনের স্বার্থপরতার অন্ধকার ভেদ করে তাকে যেমন তৃপ্তি, আনন্দ ও পবিত্রতার আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলতে পারে তেমন আর কিছুই পারে না—সে কাজটী হচ্ছে "দান"। কি ধনী কি দরিদ্র, ইচ্ছা করলে এই দানের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সবাই নিজের মনের স্বার্থপরতা ব্যাধি নাশ করে তাকে উন্নত, পবিত্র এবং মনের ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারের বন্ধ দুয়ার খোলবার উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারি। 'দান' বলতে এখানে আমি কেবল অর্থ দানের কথাই বলছি না। অর্থ দ্বারা দূর করা যায় অর্থাভাব ; কিন্তু জগতে আরও অনেক অভাব আছে যা অর্থের দ্বারা মোচন করা যায় না। মানুষ মাত্রেই তো আর অর্থের কাঙ্গাল নয়, অনেক ধনীর জীবনে হয় তো এমন অভাব আছে যা একজন নিঃসম্বল ব্যক্তিও অনায়াসে পূর্ণ করতে পারে। সে ক্ষেত্রে দরিদ্র হলেও সেই হ'ল 'দাতা'—আর সে দানের পুণ্য, আনন্দ ও তৃপ্তির সেই হবে প্রকৃত অধিকারী। অন্ধ-আতুরের হাতে সামান্য কিছু অর্থ তুলে দিতে পারলে, ক্ষুধার্ত্তকে একমুঠো অন্ন দিতে পারলে, নিরাশ্রয়কে একটু আশ্রয় দিতে পারিলে মনে যে শান্তি, যে আনন্দ আসে তার তুলনা নেই। যাঁদের এ ভাবে দান করবার ক্ষমতা আছে তাঁরা যেন কখনও এ হতে বিরত না হন, কারণ ভগবানের দয়ায় তাঁরা যে অর্থ-সামর্থ্যের অধিকারী হতে পেরেছেন এই ভাবে দরিদ্রের অভাব মোচনের মধ্যে দিয়েই করা হবে তার প্রকৃত সদ্ব্যবহার। কিন্তু তাই বলে যার সে ক্ষমতা নেই তাকে যে অর্থের অভাবে দানের আনন্দে বঞ্চিত হতে হবে এমন কোন কথা নেই। যে কোন অভাব পূরণ করতে পারাই 'দান' করা—সে যে অভাবই হোক না কেন। অনেক সময় দুঃখী-দরিদ্রের মন দু'টো মিষ্টি কথাতেই এমন ভাবে স্পর্শ করা যায়, তাকে এমন আনন্দ দেওয়া যায় যে তা রাজ-ঐশ্বর্য্য দান করেও পারা যায় না। যে হয় তো একটু সান্ত্বনা, একটু স্নেহই চায়—তার কাছে দু'টো মিষ্টি, দরদভরা কথাই হবে সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু, ঐশ্বর্য্যে তার সে অভাব তো আর পূর্ণ হবে না। যাকে দেব তার অভাব কোথায় এটুকু বুঝতে পারলেই ধনী হই আর নির্ধন হই দানের আনন্দ ও তৃপ্তি হতে কেউ আমাদের বঞ্চিত করতে

পারবে না। সংসারে সকলেরই কিছু না কিছু অভাব আছে যা অন্যের দ্বারা পূরণ হতে পারে। যার জগতে কোন স্নেহ-ভালবাসার টান অবশিষ্ট নেই, অদৃষ্টের অভিশম্পাতে যার জীবনের বৃন্ত হতে সব ভালোবাসার ফুলগুলি ঝরে পড়েছে, তার আর যাই থাকুক না কেন ভালবাসার স্নেহ-যত্ন করবার লোক নেই। তাই সে ভালোবাসার কাঙাল—একটুখানি স্নেহ, মমতা, দরদ তার ক্ষত বিক্ষত মনে অমৃতের প্রলেপ দেবে—এ ক্ষেত্রে একটু স্নেহ-যত্ন করাই হবে প্রকৃত 'দান'।

যে পীড়িত তার কাছে একটু সেবা, যে শোকার্ত্ত তার কাছে দু'টো সান্ত্বনা বাণীই সব চেয়ে মূল্যবান বস্তু—আর এগুলি যদি তাদের আমরা দিতে পারি তাহলেই যথার্থ দানের, আনন্দের ও তৃপ্তির অধিকারিণী হতে পারবো। আর এমনি করে ক্রমশঃ যদি মনের পাত্রে বিন্দু বিন্দু করে শান্তি, সাহস, কৃতজ্ঞতা ও পবিত্রতা সঞ্চয় করতে পারা যায় তবে আপনিই তা থেকে সব অন্ধকার, সব দুর্ব্বলতা, সব ব্যধি দূর হয়ে গিয়ে সেখানে বিরাজ করবে পবিত্র শান্তি ও আনন্দের আলো—যার আভায় পথ চিনে আমাদের কাম্য বস্তুটীর দিকে এগিয়ে চলা মোটেও কষ্টসাধ্য হবে না…হয়ে উঠবে অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। ভগবান মানুষের মনে দয়া, স্নেহ, ভালোবাসা ইত্যাদি অনুভূতিগুলি দিয়ে যে জগতে পাঠিয়েছেন সে কি শুধু তাদের নিজেদের মনের ভেতরে তাদের বন্দী করে রাখবার জন্য? না—তা নয়—তা যদি হ'ত তা'হলে জীবের শ্রেষ্ঠ মানুষরূপে আর ঐসব অনুভূতি সঙ্গে দিয়ে তিনি আমাদের পাঠাতেন না। তাই বলি ভগবানের শ্রেষ্ঠ দানগুলির অমর্য্যাদা করে তাদের বন্দী রেখে হত্যা করবেন না, সেগুলির সদব্যবহার করুন। তিনি আমাদের ঐসব ধনরাশি দিয়ে পাঠিয়েছেন এই জন্য যে, যাতে তাদের উপযুক্তভাবে ব্যবহার করে তাদেরই সাহায্যে আমাদের কাম্য বস্তুটী লাভ করতে পারি অর্থাৎ সুখী হতে পারি, শান্তি পেতে পারি। যদি সত্যই সুখের সন্ধান পেয়ে তাকে আয়ত্বাধীন করতে চান তবে নিজেদের মনের সিন্ধুক খোলবার কৌশলটী শিখে সেই মহৎ কাজের উপযুক্ত করে নিজেদের গড়ে তুলুন, তখন দেখতে পাবেন যে যাকে এতকাল বাইরে বৃথাই খুঁজে ফিরেছেন সে আছে কত কাছে, আর তাকে পাওয়াও কত সহজ।

প্রলয়

শ্রীসুবর্ণা দেবী

[মেদিনীপুরের প্রলয় স্মরণে]

মহাসপ্তমী দ্বিপ্রহরের খর তপনের আলো,
ম্লান হয়ে আরও হ'ল ম্রিয়মাণ, আকাশ হয়েছে কালো।
তার মাঝে হাসে পরমাপ্রকৃতি সাজায়ে পূজার ডালা,
হাতে বরাভয়, গলে দোলে তার বৈজয়ন্তী মালা।
ক্ষীণ বারিধারা ঝরিছে, বহিছে বাতাস ক্রমশঃ দূরে,
কোন্ এ বিষাণ, সহসা ঈশানে বাজিল মেদিনীপুরে?
রুদ্র! তোমার ডমরু বাজালে বিরাট নাচের তালে,
তাণ্ডবে তার আর্ত্ত ধরণী মাতে কি প্রলয় কালে?
তোমার নাচের মহাভঙ্গীতে, জাগে ইঙ্গিত রূঢ়
চরণ আঘাতে মহাবিশ্বেরে করি'দিলে তুমি গুঁড়ো।
সহসা তোমার ঘূর্ণী নাচের ওড়না উড়িল ঝড়ে
হর্ম্ম্য আলয়, পর্ণকুটীর তরু-লতা ভেঙ্গে পড়ে।
চরণ আঘাতে ওড়ে ধূলিরেণু, উঠে মহাকলরোল,
রত্নাকরের ঊর্ম্মিমালায় লাগিল নাচের দোল।
নাগিনীর মত ফণা ধরে ছুটে বারিধি আসিল রোষে
অনন্ত-ক্ষুধা মিটাইবে তার আজি মহা আক্রোশে।
গরজিয়া চলে তরঙ্গকুল, গ্রাসিল যা পুরোভাগে
গ্রামে গ্রামন্তে মিটাইতে তার ক্ষুধার খাদ্য মাগে।
চলে তাণ্ডব জীবন মথিয়া, দয়া নাই মায়া নাহি
জীবনের হাট লুটে লয়, জীব কাঁদিছে পরিত্রাহি!
ছিনাইয়া নিল মার বুক হ'তে শিশুরে নিঠুর হেসে
স্বামী জায়া সহ কত পরিবার নিমেষেতে গেল ভেসে।
পাষাণ দেবতা দেখিল না চাহি, প্রাণের মর্ম্মতলে
প্রাণ কাঁদে প্রাণ আঁকড়িয়া হৃদে, টুটে প্রাণ পলে পলে।
নিঠুর! একি কৌতুক তব? কেন এ ভয়াল বেশ,
পিণাকী তোমার বিষাণে সহসা কেন এ প্রলয় বেশ?
জটা গেছে খুলে, ললাটে ঠিকরে ত্রিনেত্র খরধারে
গরজে সর্প, হুঙ্কারে বৃষ, ত্রিশূল হানিছ কারে?
তোমার তাথৈ নৃত্য-ছন্দে, ভৈরব একি বাণী?
তোমার প্রকৃতি জগৎপালিকে, কেমন সে কল্যাণী?
কি বাণী পাঠালে, জানি না কিসের ইঙ্গিত অভিনব,
মূঢ় জড় হৃদে বুঝিতে পারি না কি কথা রুদ্র তব?



(উপন্যাস)

শ্রীকুমুদিনীকান্ত কর

তবে এত দর্প, এত দম্ভ, এত অহঙ্কার কিসের মানুষের? কিছুই ত' কিছু না! জগতের অণু পরমাণুতে একটী অস্থিরতা, চঞ্চলতা, অবিনশ্বরতা, —এই আছে, এই নাই! এই সুখ, এই দুঃখ! এই শান্তি, এই অশান্তি! এই সৃষ্টি, এই ধ্বংস! জগতময় সৃষ্টি ও ধ্বংসের লীলা! জগতের যাবতীয় সৃষ্ট জীব ও পদার্থ, অণু-পরমাণু যেন প্রতিযোগিতা করিয়া চলিয়াছে ধ্বংসের মুখে! চতুর্দ্দিকে অনিবার্য্য ধ্বংস ও সৃষ্টি, সৃষ্টি ও ধ্বংস। তবে? মানুষ তবে এত সুখ সুখ করিয়া মরে কেন? মানুষ দেখে সব, তারই উদ্ভাবিত জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, কলা-কৌশল দ্বারা বোঝেও সব; কিন্তু কাজের সময় করে বিপরীত, ভুলিয়া যায় সব! মানুষের যেটা ঠিক থাকিলে সব ঠিক, বে-ঠিক হইলে সব বে-ঠিক, সেই মনই ত' অবশ। যুগ যুগ তপস্যা করিয়া যোগী যাহা অর্জ্জন করিল মনের মুহূর্ত্তের অসাবধানতায় তাহা রসাতলে গেল। মহাজ্ঞানী গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, মন সংযত কর, সব হইবে। কিন্তু মন সংযত করিতে পারিল ক'জন? মনকে ইচ্ছামত খেলাইতে পারে এমন খেলোয়াড় ত' দেখি না। মন যখন গঙ্গা-যমুনা-বারিপূত নির্ম্মল, পবিত্র, শান্ত, সংযত, তখন আনন্দ অসীম, সুখ অনন্ত; মন তখন বিশ্ব-প্রেমে লীন, আত্ম-হারা; জগত তখন আনন্দময়। কিন্তু মুহূর্ত্তের তাড়নায় বিক্ষুব্ধ, চঞ্চল, উদ্বেলিত, মত্ত, দিশা-হারা, অন্ধ মন ভয়াবহ অনল-উদ্গিরণকারী আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হয়; অগ্নির লেলিহান রসনা দিকে দিকে বিশ্বধ্বংসের জন্য ছুটিয়া যায়! শুধু মুহূর্ত্তের ব্যবধানে এই পরিবর্ত্তন! কি আশ্চর্য্য! এই মুহূর্ত্তে স্ত্রী-পুত্র, ধন-জন পরিবেষ্টিত মানুষ ভাবিতেছে সত্যই সে সুখী! সে সুখের গৌরবে সে কত গর্ব্বিত! পরমুহূর্ত্তে সে ক্ষণেকের উন্মাদনায় সুখে জলাঞ্জলি দিয়া নিজেকে ধ্বংস করিয়া ফেলিল! একটী মাত্র কথায়, একটু মাত্র চ'খের ইসারায়, ঈষৎ অঙ্গুলি হেলনে, একবার মাত্র অঙ্গসঞ্চালনে, মুহূর্ত্তের মধ্যে দেশ, রাজা, রাজ্য, কত জীবন, কত সুখের সংসার, পরিবার, পরিজন ধ্বংস হইয়া গেল! নিষ্ঠুরতা! কিন্তু কেবল এক মুহূর্ত্তের ব্যাপার! কি আশ্চর্য্য! কাহার আদেশে, কি বিধানে এ জগত চলিতেছে; কাহার এ পাগলামী, কাহার এ খেলা, কে জানে? কিছুই বুঝি না; ভাবিয়া কেবল অবাক্ হই...

যাহার কথা মনে হইতেই আজ এতগুলি কথা আমার মনে মাথা ঠেলিয়া উঠিল, তাহার জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্কের কথাই বলিব। বড় দুঃখময় কাহিনী! তবুও বলিব, হয় ত' তাহাতে মনে একটু শান্তি পাইব। সে আমার বন্ধু হিরণ্ময়—বাল্যসুহৃদ্, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। তাহাকে ডাকিতাম হিরু বলিয়া। আমরা দু'জনে দু'কথা বলা দূরে থাকুক দু'কথা ভুলেও ভাবিতেও যেন জানিতাম না; উভয়ের অজ্ঞাতসারে ভিন্নভাবে কাজ করিতে গেলেও যেন দু'জনের একই উদ্দেশ্য প্রকাশ পাইত। এমনই অভিন্নহৃদয় ছিলাম হিরু আর আমি যে ইহার পরিচয় পাইয়া, অন্যের কথা কি, আমাদের পিতা-মাতা পর্য্যন্ত চমৎকৃত হইতেন!

বাল্যে শুভদিনে একসঙ্গে আমাদের বিদ্যারম্ভ হইয়া একদিন যৌবনের কোন এক স্তরে আসিয়া হঠাৎ আবার একসঙ্গেই আমাদের বিদ্যার্জ্জন শেষ হইল। হিরু প্রসিদ্ধ ধনবান্ জমিদার চিন্ময় রায়ের একমাত্র পুত্র। এতদিন তাহার বিবাহ না হওয়ায় দেশের লোক সব বিস্মিত হইয়াছিল। চিন্ময় রায়ের ধৈর্য্যও বড় কম নয়। হয় ত' তাঁহার ইহাতে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যও ছিল। কিন্তু এবার তিনি শুভকার্য্যটি যতশীঘ্র সম্ভব সম্পন্ন করিতে অতিশয় ব্যস্ত হইলেন। চিন্ময় রায় প্রতিপত্তিশালী ধনবান্ জমিদার হইলেও সামাজিক হিসাবে খাটো ছিলেন, দেশের অভিজাতবর্গের মধ্যে গণ্য ছিলেন না। তিনি বহু চেষ্টা, বহু অর্থব্যয় করিয়াও অভিজাতশ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন নাই। তাহারা তাঁহাকে সারাজীবন ধরিয়া দয়া করিয়া 'ছোটলোক' না বলিলেও 'ওরা ছোট' 'ওরা নূতন ভদ্রলোক' বলিয়া তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সহিত তাঁহার নামোল্লেখ করিতেন; অথচ তাঁহাদের কেহই অন্য কোন বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। তাঁহাদের প্রত্যেকেই তাঁহার নিকট ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার মুঠার মধ্যে ছিলেন। তিনি ঐ এক বিষয়ে তাঁহাদের সম্মুখে মাথা উঠাইতে না পারায় অন্তরে অন্তরে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেন। তাই এই সুযোগে আভিজাত্যের সম্মান লাভ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। দেশের সমাজ-কর্ত্তার ঘরই তাঁহার প্রথম লক্ষ্য হইল। তাঁহারাও জমিদার বংশ, কিন্তু পড়ন্ত ঘর। তাঁহারা তাঁহাকে নিজের বাড়ীতেও

সম্মানের আসন দিলেন না, অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সহিতই তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কন্যাদানে প্রস্তুত হইলেন। চিন্ময় রায় সানন্দে গৃহে ফিরিয়া গৃহিণীকে উলুধ্বনি দিতে বলিয়া বিবাহের প্রাথমিক কার্য্যের একটা শেষ করিলেন।

হিরু একদিন ছুটিয়া আসিয়া আমাকে গ্রামের এক নিভৃত প্রান্তে টানিয়া নিয়া রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "শুনেছিস্ রণেন্?"

আমার নাম রণেন্দ্র। হিরু আমায় রণেন্ বলিয়া ডাকিত আমি অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

"শুনিস নাই এখনো পর্য্যন্ত কিছু তুই?"

"কি শুনব? হয়েছে কি খুলেই বল্ না ছাই?"

"খুলে ব'লব আমার মাথা···"

সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া রহিল আমি তাহার দিকে ক্ষণেক চাহিয়া দেখিলাম, তাহার চোখ-মুখ লাল হইয়া যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। বলিলাম, "বেশ! কিছুই যদি না বল্‌বি ত' আমি চললাম···"

এই বলিয়া এক পা বাড়াইয়া চলিয়া যাইবার ভান করিতেই সে বলিল, "আমার বিয়ে! শুনলি ত' এবার? শীঘ্রই নাকি হবে, মানুষের জীবনে সব চেয়ে বড় দায়িত্ব যেটা তা নিয়ে হেলা ফেলা, মন নিয়ে খেলা—মধ্যযুগের বর্ব্বরদের মত এখনও সেই সব—খামখেয়ালি বা স্বার্থের যজ্ঞে দু'টী জীবনের পূর্ণাহুতি—তাদের অজ্ঞাতসারে—কিছুতেই তা হ'তে পারে না—আজই মাকে বলব, এ বিয়ে আমি করব না —কিছুতেই না—না-না—না—"

আমি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, "চুপ! জানিস গাছপালারও কান আছে, ভুলে যাচ্ছিস বুঝি তুই কার ছেলে? চিন্ময় রায় যার নাম, একবার যদি ঘুণাক্ষরেও শুনতে পায় তোর অবাধ্যতার কথা তবে সেই মুহূর্ত্তে তোকে বিষয়ে বঞ্চিত করে বাড়ী থেকে বিদায় করে দেবে, তা জানিস্? তোর মা'র দশা তখন কি হবে তা একবার ভেবে দেখেছিস্?"

"তা যা হবার হবে, কিন্তু এ অত্যাচার আমি কিছুতেই সহ্য করব না—"

"অত ব্যস্ত হ'চ্ছিস কেন তুই? একবার ভেবেই দেখা যাক না ব্যাপারটা ভাল করে? তুই যা ভাবছিস বা ভয় করছিস তা নাও হতে পারে ত'? হয় ত' সেই মেয়েটী তোর অযোগ্যা নাও হ'তে পারে—"

"হ্যাঁ, তাও কখন হয়, ও রকম পাড়াগাঁয়ে, আর ওই রকম ঘরে?"

"কেন হ'বে না? শিক্ষা কি কেবল ঐ স্কুলে কলেজেই হয়? ঐ গণ্ডীর বাইরে কি কেউ শিক্ষিতা হ'তে পারে না? আমি এরূপ অনেক শিক্ষিতা মেয়েকে জানি, যাদের শিক্ষা-দীক্ষা-জ্ঞান এবং মার্জ্জিত রুচি দেখলে অবাক হ'তে হয়। যাদের কাছে তোদের ওই স্কুলে-কলেজে-পড়া মেয়েরা মলিন হ'য়ে যায়।"

"দূর—ও আমার বিশ্বাস হয় না—"

"ও শ্রেণীতে কেবল তুই একা নস্, আরো অনেকে আছে, তোদের চোখ হয় ত' খুলবে শীঘ্রই—"

আমার কথায় সে যেন অনেকটা দো-মনা হইয়া বলিল, "তবে তুই কি করতে বলিস?"

"বোস এখানে, একটা কিছু ভেবে ঠিক করবই—"

তাহাকে হাতে ধরিয়া আমার পাশে বসাইলাম। অনেক চিন্তা, অনেক কথার পর আমার একটি দৌত্যকার্য্য মিলিল। হিরুর ভাবী পত্নীর পিত্রালয় ও আমার মাসীমার বাড়ী একই গ্রামে। আমাকে সেই মাসী-বাড়ী কিছুকাল বাস করিয়া তাহার ভাবী পত্নীর সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জানিয়া আসিয়া তাহাকে বলিতে হইবে। হিরু আশ্বস্ত হইয়া গৃহে ফিরিল।

পরদিন মাসীবাড়ী যাইব বলিয়া মার নিকট বিদায় লইয়া গন্তব্য পথে যাত্রা করিলাম। গ্রাম পার হইয়া যখন মাঠে পড়িয়াছি তখন দেখিলাম অদূরে এক গাছতলায় রাস্তার উপরে একটা লোক যেন ছটফট করিতে করিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আর একটু অগ্রসর হইবার পর তাহার দিকে চাহিয়া বুঝিলাম ব্যক্তিটি আর কেহ নয়, আমারই বন্ধুবর। তাহার এ অবস্থার কারণ বুঝিতেও আমার বিলম্ব হইল না। আমার বড় হাসি পাইল। তাহার নিকটে আসিয়া হাসিয়া বলিলাম, "সেনাপতি স্বয়ং দূতের পথ অবরোধ ক'রে দাঁড়িয়ে? না পাহারা? দূতকে পাহারা দিতে পথে পথে আরো অনেক সান্ত্রী বসেছে বোধ হয়···"

হিরু এ সব কথা মোটেই কানে না তুলিয়া দুই হাতে

আমার দুই কাঁধ ধরিয়া একটু গম্ভীর ভাবে বলিল, "রণেন্! সেখানে ত' তুই যাচ্ছিস, তোকে কি আর বলব…তোর একটী মাত্র কথার উপর আমার ভবিষ্যৎ জীবন, আশা, আকাঙ্ক্ষা, সব—সব নির্ভর করছে…শুধু তোর একটী মুখের কথার উপরে…নিশ্চয়ই ভুলে যাস নি আমার আদর্শের কথা …সেই যে আমরা দু'জন নদীর ধারে শুয়ে শুয়ে আদর্শ স্ত্রীর কথা বলতাম…"

আমি তাহাকে ধমক দিয়া থামাইয়া দিলাম। সত্যি আমার অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হইতেছিল। একটু রাগ করিয়াই বলিলাম, "ভাবুকতাটা একটু কম-টম কর…ধরা ছেড়ে শূন্যে চড়া ছেড়ে দাও…একটু মানুষের মত হও…"

আমার নিকট এ ব্যবহার অপ্রত্যাশিত। সে মুখখানা মলিন করিয়া বলিল, "রাগ করলি রণেন্?…আমি—আমি তোকে…"

আমি জীবনে তাহাকে কোনদিন একটীও কড়া কথা বলি নাই। আমার বড় অনুতাপ হইল। ব্যাপারটা লঘু করিবার জন্য আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া হাসিয়া বলিলাম—

"পাগল হয়েছিস্ তুই, আমি তোর উপর রাগ করব? আচ্ছা তুই এত ভাবছিস্ কেন হিরু, বল্ ত'? আমি ত' বলেছিই সব ঠিক করে জেনে আসব, তোর কি বিশ্বাস নেই আমার উপর?"

সে সবলে আমায় বুকে চাপিয়া ধরিয়া হাসিয়া বলিল, "তোকেও অবিশ্বাস!"

আমি তাড়াতাড়ি তাহার আলিঙ্গন মুক্ত হইয়া বলিলাম, "তবে শীঘ্র বাড়ী যা। আমি চল্লাম, আর দেরী না।"

জমিদারবাড়ীর গায়েই আমার মাসীবাড়ী। আমার গোপন অনুসন্ধান এবং অলক্ষ্যে থাকিয়া মেয়েটীকে দেখার খুবই সুযোগ হইবে ভাবিলাম। বড় লোকের দাস-দাসীদের নিকট প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সমস্ত সংবাদই সংগ্রহ করা যায়। আমি তাহাদের দু'টী একটীর সঙ্গে ভাব করিয়া লইলাম। তাহারা সকলেই একবাক্যে রাজকুমারীর প্রশংসা করিল। তাহারা প্রভুকন্যাকে রাজকুমারী বলিয়া সম্বোধন করিত। সত্যই এ বংশটি এককালে রাজা বা রাজার মতনই ছিল। এখনো সে পুরানো ঠাঁট বজায় রাখিবার আপ্রাণ চেষ্টা। দাসদাসীদেরও সে সম্ভ্রম বজায় রাখিবার শিক্ষার অভাব ছিল না। আমি মনে মনে হাসিলাম। কিন্তু পুনঃপুনঃ তাহাদের নানারূপ প্রশ্ন করায় তাহারা ক্রমে আমার উপর সন্দিহান হইয়া ওঠে আমি এই ভয়ে সে পথ পরিত্যাগ করিয়া মাসীমাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি বলিলেন, "ওমা! তুই এতদিন আমায় বলিস্ নি কেন? সে যে সর্ব্বদাই আমার এখানে এসে থাকে? এই দু'তিন দিন আসে নি, বল্‌তে পারি না কেন? আজই হয় ত' সে আস্‌বে, দেখিস্, চমৎকার মেয়ে, সুলক্ষণা, তোর বন্ধুর সম্পূর্ণ যোগ্য, সব বিষয়ে শিক্ষিতা।"

মাসীমা মেয়েটীর রূপগুণ সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তোর সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দেব, তুই সন্তুষ্ট না হয়েই পারবি না।"

আমি আশ্বস্ত হইলাম।

সত্যই সেদিন বিকালবেলা সে আসিল আমি অলক্ষ্যে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। দেখিলাম সত্যই সে সুন্দরী! বিস্তৃত ললাট, কুঞ্চিত কেশ-গুচ্ছের নিম্নে তাহার মাধুর্য্য-ভরা হসিত বয়ান সত্যই অপূর্ব্ব দেখাইতেছিল। সে পৃষ্ঠে বিলম্বিত কেশরাশি দোলাইয়া অবাধ স্বচ্ছন্দ চঞ্চল গতিতে নিকটে আসিয়া ডাকিল, 'মাসীমা!' এমন সুন্দর কণ্ঠস্বর যে, আমার কানে ঠিক যেন বীণার ঝঙ্কারের মত শুনাইল বলিলে এতটুকু অত্যুক্তিও হয় না! মাসীমা গৃহাভ্যন্তর হইতে উত্তর করিলেন, "কে?" পরে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ওমা, মীনা—এস, এস, ঘরে এস মা,…"

সে গৃহে প্রবেশ করিল।

মীনা—নামটীও সুন্দর! ভাবিলাম রূপের পরিচয় ত' পাইলাম, এখন গুণের পরিচয়ও যদি এরূপই পাই তবে হীরু সত্য সত্যই ভাগ্যবান্।

মাসীমা ও সে চুপি চুপি ভিন্ন ঘরে কি কথা কহিতেছিল। আমি তখনও সেই একই স্থানে দাঁড়াইয়া মনে মনে হীরুর ভবিষ্যৎ জীবনের রঙিন চিত্র একটীর পর একটী আঁকিয়া যাইতেছিলাম। এমন সময় মাসীমা হঠাৎ ডাকিলেন, 'রণি—'

ধীরে ধীরে মাসীমার কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করিলাম। মেয়েটী অপরিচিত যুবককে

দেখিয়া একটু জড়সড় হইয়া মাসীমার গা ঘেঁসিয়া বসিল। আমি ভিতরে যাইব কিনা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। মাসীমা তাহা লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ওমা, তোদের এত লজ্জা হ'ল কেন? তুই যেমন আমার ছেলে, মীনাও তেমনি আমার মেয়ে, রণি, আয় তোদের পরিচয় করিয়ে দি।"

মাসীমা পরিচয় করাইয়া দিলেন। কিন্তু সেদিনের আলাপ একরূপ মাসীমার মধ্যস্থতায়ই হইল, নেহাৎ দু'টী একটী প্রশ্নোত্তর আমাদের মধ্যে সোজাসুজি হইল। সঙ্কোচ দূর হইল না।

পরদিন হইতে সমস্ত সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। আলাপের মধ্য দিয়া তাহাকে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে নিয়া তাহার অন্তর বাহির তিল তিল করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতেছিলাম। কিন্তু কথায় বা কার্য্যে ঘুণাক্ষরেও তাহাকে বুঝিতে দিলাম না যে আমি তাহাকে পরীক্ষা করিতেছি। যতই তাহার সহিত আলাপ করিলাম ততই আমি মুগ্ধ হইলাম। দেখিলাম আধুনিক সমস্ত শিক্ষাই সে পাইয়াছে। কেবল তাহাই নয়, কোন কোন বিষয়ের অন্তর্দৃষ্টি তাহার এত প্রখর বোধ হইল যে, তাহার কাছে আমার মাথা নত করিতে এতটুকু দ্বিধাও হইল না।

সেদিন আমার শেষ দিন। কথায় কথায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, এ অঞ্চলে সব চেয়ে সম্মানী ঘর কারা?

মীনা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "যেন আপনি তা জানেন না!"

"সত্যি জানি না, জানব কি ক'রে বলুন, বিদেশে বিদেশেই ত' জীবন কেটে যায়, এ সব জানবার সুযোগ কোথায়।"

মীনা গ্রীবা বাঁকাইয়া একটু গম্ভীর ভাবে বলিল, "কেন কৈলাশপুরের রায়দের কথা কে না জানে? দুগ্ধপোষ্য শিশুরাও এক ডাকে ব'লে দেবে আপনাকে এ কথা।"

বলিতে বলিতে গর্ব্বে যেন তাহার বুক ফুলিয়া উঠিল। বলিলাম, "আমি কিন্তু শুনেছি বিলাসপুরের চিন্ময় রায়েরা সব চেয়ে বড় প্রতিপত্তিশালী, তার সমকক্ষ……"

আমার এই সামান্য কথা কয়টাই বোধ হয় তাহার সম্মান ক্ষুণ্ণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল। আমাকে বাধা দিয়া দৃপ্তস্বরে সে বলিল, "আপনি কা'র সঙ্গে কা'র তুলনা করছেন! তারা ত'……হ্যাঁ……কি যে বলব, চিন্ময় রায় বাবার সামনে এলে অনুমতি হ'লে তবে বসতে পান, সামাজিক নিমন্ত্রণে উচ্চশ্রেণীতে তাঁর স্থান নাই, কি যে বলছেন আপনি।"

মুখে তাহার অবজ্ঞার ঈষৎ হাসি ফুটিয়া উঠিল।

"কিন্তু তাঁর যথেষ্ট টাকা আছে, তা জানেন ত'? ধরুন যদি টাকার জন্যই কোন কালে তাঁর সঙ্গে আপনাদের কুটুম্বিতা হয়, তখনও কি এরূপ সম্মানই তিনি পাবেন?

"নিশ্চয়, আভিজাত্যের সম্মান তিনি কি করে পাবেন?"

আমি এখানেই নীরব হইলাম। কিন্তু ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, সে কিছুই জানে না? আর কিছুদিন পরেই চিন্ময় রায়েরই পুত্রের সঙ্গে যে তাহার বিবাহ হইবে তাহা কি সে আভাসেও শোনে নাই—হইতেও বা পারে, ব্যাপারটা সবই হয় ত' এখনও গোপন রাখা হইয়াছে। আমি কথাবার্ত্তার মধ্যে এ বিষয়ে যথেষ্ট আভাস দিয়াছি। কিন্তু সে নিঃসঙ্কোচে প্রত্যুত্তর করিল, সে জানিলে নিশ্চয়ই এরূপ করিতে পারিত না।

*

চাহিয়া দেখিলাম ঠিক গ্রামে প্রবেশ-পথের ধারে হিরু একাকী উপবিষ্ট। আনমনে দাঁতে খড় কাটিতে কাটিতে মাঠের অপর প্রান্তস্থিত গ্রামটীর দিকে চাহিয়াছিল। বুঝিলাম এ আমারই প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষা। আমি সংবাদ না দিয়া আসিলেও যখন সে এখানে আমার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে তখন সে যে প্রত্যহই এ কর্ত্তব্য যথারীতি পালন করিয়াছে তাহা স্পষ্টই বোঝা গেল। পাগল! পাগল! একেবারে বদ্ধ পাগল! বসিয়াছিল পথের ধারেই বটে, কিন্তু পথের দিকে দৃষ্টি এতটুকুও ছিল না। এবার স্থির করিলাম হাসিব না, খুব গম্ভীরভাবে ওর সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইব। কিন্তু গম্ভীর হওয়া আমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল; ভিতর হইতে হাসি ঠেলিয়া আসিতেছিল। শেষে জোর করিয়া যথাসম্ভব গম্ভীর হইলাম এবং দৃষ্টি নত করিয়া পথ দিয়া হন্ হন্ করিয়া ছুটিয়া চলিলাম। তাহাকে ছাড়াইয়া চলিয়া গেলাম, তবুও হতভাগার চৈতন্য নাই! একেবারে তন্ময়! নিশ্চয়ই তখন সে ভাবী পত্নীর কল্পনা-মূর্ত্তি গড়িতেছিল! কি করি আমাকেই আসিতে হইল। আমার উপস্থিতি জানাইবার জন্য হঠাৎ একটা শব্দ করিয়াই অন্যদিকে

মুখ ফিরাইয়া পুনরায় গম্ভীর হইবার চেষ্টায় থাকিলাম। হিরু চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমায় দেখিয়াই ডাকিল,

আমি তখনও ফিরিলাম না। বুঝিলাম, হিরু দুই পা অগ্রসর হইয়াই থামিয়া গিয়াছে; আমার দিকে সন্দিগ্ধ নয়নে চাহিয়া ভাবিতেছে, সত্যই আমি কি না। আমি হঠাৎ তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম, "র···র···র··· রণেনই বটে? আর তুই সত্যি একটা আস্ত গা...গা··গা ···গাধা···"

অনেকগুলি বাছা বাছা গালি জিবের আগে আসিয়াছিল, তীক্ষ্ণ শেলের মত সেগুলিকে হিরুর অঙ্গে নিক্ষেপ করিব সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার আর অবসর হইল না। সে ছুটিয়া আসিয়া আমাকে বুকে চাপিয়া ধরিল। তাহার সেই বিশাল বপুর চাপ সহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। আমি হাঁপাইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিলাম, "ওরে হতভাগা ছাড় ছাড়, মেরে ফেল্লি যে···"

হতভাগা আমায় শূন্যে তুলিয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়াছিল; এবার ধরাতলে নামাইয়া দিয়া বলিল, "বাঃ তুই—কেমন ক'রে এলি রণি?"

বলিলাম, "হুঁা, এসেছি ঐ বায়ুর ভিতর দিয়ে সূক্ষ্ম দেহ ধ'রে···হতভাগা কোথাকার···"

"বাঃ! আমি দেখতেই পেলাম না? আমি যে তোরই জন্য এই পথের দিকে চেয়ে বসেছিলাম?"

"হুঁা, পথের দিকে চেয়ে বসেছিলে না মাথা করেছিলে··· সামনে দিয়ে ছুটে এলাম হন্ হন্ করে, হতভাগার হুঁস্ নেই···বল্, হাঁ ক'রে ঐ গ্রামের দিকে চেয়ে কি ভাবছিলি···"

"সত্যি রণি, তুই চলে গেলে আমার বাড়ী তিষ্ঠানো দায় হ'য়ে উঠল; একটার পর একটা, কত ভাবনাই যে ছাই মনে আসতে লাগল তা আর কি বলব তোকে...সে যে কি অবস্থা তা প্রকাশ করা যায় না···একেবারে পাগল হয়ে যাবার জোগাড়···শেষে এই পথের ধারে আশ্রয় নিয়ে তোর পথ চেয়ে রইলাম···সে যে কি আশা-আকাঙ্ক্ষা···হুঁ···তারপর··· তারপর কি?"

"হুঁ, তোর 'তারপর' 'তারপর' কি তা বুঝতে পারছি, হবে না, যে সুন্দরীকে মনে মনে কল্পনা ক'রতে ক'রতে মসগুল হ'য়ে ছিলি, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আগে তার বর্ণনা কর। আমি ইঞ্চি ইঞ্চি ক'রে মীনার সঙ্গে মিলিয়ে নেই; যদি মিলে যায় তবে জানব তোর অদৃষ্টে অনিবার্য্য সুখ···"

হীরু চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "মীনা! মীনা কে?"

আমি হাসিয়া উঠিলাম এবং তাহার চমক থাকিতে থাকিতে অংকিতে তাহার হাত ছাড়াইয়া বাড়ীর দিকে দৌড়াইলাম, কিন্তু সে ছাড়িবার পাত্র নয়; ছুটিয়া আসিয়া দুইহাতে আমায় শূন্যে তুলিয়া বলিল, "চল।"

তখনও আমার হাসি কমে নাই, কোনরকমে বলিলাম, "আরে কোথা নিয়ে যাচ্ছিস আবার, বাড়ী চল না? হবে এখন।"

সে বলিল, "না এখানেই —"

নিকটেই মাঠের মধ্যে একটী পুকুর ছিল। তার উঁচু পাড়ে দুটী একটী গাছও ছিল। আমায় একটী গাছের নীচে একেবারে বসাইয়া দিয়া নিজে পাশে বসিয়া বলিল, "বুঝতে পারছিস্ না বোধ হয় তুই আমার ভিতরের অবস্থাটা, তাই! তুই এখন কি দেখে এলি বল সব খুলে, মীনা কে?"

আমি আবার হাসিলাম। কিন্তু বুঝিতে পারিলাম বন্ধুর অবস্থা সত্যই সঙ্কটাপন্ন, আর দেরী করিলে আমার অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন হইতে পারে। এবার সব বলিতেই হইবে। অল্প কথায় বলিলেও চলিবে না, খুঁটিনাটি বর্ণনা করিতে হইবে। ক্ষণেকের মধ্যে যথাসম্ভব প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলাম, "শোন তবে—"

সে বলিল, "বড্ড ক্লান্ত মনে হচ্ছে তোকে, আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়।"

আমি তাহার কথামত শুইয়া পড়িয়া সত্যই একটু আরাম পাইলাম। হিরু আমার জামার বোতামগুলি খুলিয়া দিল।

আমি আর ভণিতা না করিয়া সমস্ত বিস্তারিত করিয়া বলিতে লাগিলাম। শুনিবার জন্য তাহার ব্যাকুলতা দেখিয়া অবাক হইলাম। সে কি একাগ্রতা! আমার কথা শুনিতে শুনিতে সেই যে সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল এর মধ্যে তাহার চোখের একটু পলকও পড়িল কি না সন্দেহ। আমি কথা শেষ করিয়া বলিলাম, "তোকে মুখে অনেক ধমক

টমক দিলেও এমন একটী মেয়ে গিয়ে দেখতে পাব এমন আশা আমি মনেও করতে পারি নাই, সব রকমে তোর যোগ্য, যে রকমটি তুই চেয়েছিলি প্রায় ঠিক তেমনটিই—আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাকে নিয়ে তুই খুসী হবি—"

তাহার সুদীর্ঘশ্বাস পতিত হইল। মনে হইল যেন একটা অত্যন্ত গুরুভার তাহার মনের উপর হইতে সরিয়া গেল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন ঝঙ্কার দিয়া উঠিল; বোধ হয় পুলক! ওষ্ঠদ্বয় নড়িয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গেই সে বলিল, "সত্যি তবে সব দেখে শুনে তুই সন্তুষ্ট হয়েছিস রণি?"

"নিশ্চয়।"

সে সময় আমার মনে এক নূতন ভাব জাগিয়া উঠিল—এক নূতন অনুভূতি! মনে হইল আমাদের এই আশৈশব প্রেম, যাহা আজ মনে হইতেছে অচ্ছেদ্য, আর কতদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে? শীঘ্রই একজন তাহার নূতন প্রেমের দাবী লইয়া আমাদের মধ্যে উপস্থিত হইবে! সে নূতনের দাবী হিরুর যথাসর্ব্বস্ব, সে দাবী অদম্য এবং সর্ব্বদা গ্রাহ্য; হিরুকে সেই আগন্তুককে দিতেই হইবে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া; উহা নর-নারীর প্রকৃতিগত স্বার্থবিনিময়। আমাদের আবাল্য বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইবে; একেবারে ছিন্ন না হইলেও অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইবে। হিরুর ভাবী-পত্নীর উপর বড় হিংসা হইতে লাগিল। ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে ভাবিতে মুহূর্ত্তে মনটা কেমন বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। হঠাৎ চাহিয়া দেখিলাম, হিরু আমায় লক্ষ্য করিতেছে; আমি কেমন জড়সড় হইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িলাম, তাহার দিকে চাহিয়া থাকিতে পারিলাম না।

হিরু আমার মাথার উপর হাত রাখিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "রণি! সব কথা কি আমায় খুলে বলিস নাই?"

বিষণ্ণতার ছাপ আমার মুখে নিশ্চয়ই পড়িয়াছিল। বুঝিলাম তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারি নাই। বলিলাম, "সব বলেছি, কিছু বাদ রাখি নি।"

"অমন বিষণ্ণ হ'য়ে কি ভাবছিস তবে এতক্ষণ?"

"তোর আর আমার ভবিষ্যতের কথা।"

"কি সে-কথা যা তোকেও আজ এমন বিষণ্ণ করতে পেরেছে রণি?"

"আজ থাক্।"

আমি উঠিয়া বসিলাম। উভয়ে কিছুকাল নীরব হইয়া রহিলাম। মনে মনে অনুভব করিলাম যে আমারই দোষে এই একটু আগের আনন্দটুকু নষ্ট হইয়াছে। হঠাৎ এমন একটা গুরুতর কথা মনে হইল যাহা হিরুকে বলা উচিত। বলিলাম, "হুঁ, দ্যাখ হিরু, একটা বিষয়ে কিন্তু তোকে বেশ একটু সাবধান হ'তে হবে।"

হঠাৎ এমন একটা অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে সে চমকিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল।

"মীনার বিষয়ে।"

সে আরো একটু গম্ভীর, বিস্মিত এবং ভীত হইয়া বলিল, "কোন্ বিষয়ে?"

"তার আভিজাত্যের গর্ব্ব।"

সে পুনরায় চমকিয়া উঠিয়া শঙ্কিত চিত্তে বলিল, "তবে—তবে ত' সে আমায় তাচ্ছিল্যও করতে পারে—সত্যি কি আমি তবে সুখী হ'তে পারব?"

"দ্যাখ—সবতাতেই তোর একটু বাড়াবাড়ি, এতটুকু সুখে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে যাস্, আবার সামান্য একটু দুঃখেই একেবারে মুসড়ে পড়িস; ঈশ্বর না করুন, কখনো যদি তুই মনে হঠাৎ বিষম একটা আঘাত পাস্ তবে হয় ত' এমন একটা অভাবনীয় কাণ্ড করে বসবি যা শুনে মানুষ শিউরে উঠবে, এই আমি বলে রাখছি, তোর প্রকৃতিতে এটা রয়েছে, তুই, খুব সাবধান—আভিজাত্যের গর্ব্ব মীনার একটু রয়েছে। তাতে বিশেষ কি এমন আসে যায়? এটা কি তার দোষ? এটা এসেছে বংশানুক্রমে রক্তের সঙ্গে মিশে, সে কি করবে? তা ছাড়া জন্মাবধি যে আবহাওয়ায় সে মানুষ হয়েছে সেটাও একবার বিবেচনা করতে হয়। মনোজগতের আদর্শ আর বাস্তবজগতের বস্তুকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখবার ক্ষমতা যে তোর নাই—এটাই আশ্চর্য্য, এ দু'টা কখনও মিলে?"

হঠাৎ তাহার ক্লিষ্ট মুখের দিকে দৃষ্টি পড়ায় থামিয়া গেলাম। তাহা না হইলে আরো কতক্ষণ তাহাকে ভৎসনা করিতাম বলা যায় না। তিক্তকণ্ঠে কথাগুলি বলিয়া বড় অনুতপ্ত হইলাম। সে একটীও কথা কহিল না, যেন আমার বর্ণিত চরিত্রের দুর্ব্বলতার জন্য লজ্জিত হইয়া সঙ্কুচিত হইয়া রহিল। ধীরে ধীরে তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিলাম, "হিরু! তুই ভাবিস না, এটা কিছু অস্বাভাবিক

নয়, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের। পিতৃকুলের জন্য গৌরব বোধ একটু বেশীই হয়ে থাকে, তুই দেখিস তোর সঙ্গে মিলনের পর তার সে-ভাবের চিহ্নমাত্র হয় ত' থাকবে না। আমি প্রাণপণ করে নানা উপায়ে তাকে পরীক্ষা করেছি, সত্যি, মীনা অপূর্ব্ব, তুই সুখী হবি হিরু, এখন চল্ বাড়ী যাই।"

লক্ষ্য করলাম তাহার মুখ আনন্দে আবার একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

যাইতে যাইতে হঠাৎ সে কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "রণি! তুই যা বলছিস আমার সম্বন্ধে তা সবই ঠিক; আমি নিজেও সময় সময় লক্ষ্য করেছি এ সব, এটা আমার প্রকৃতিগত হয়ে রয়েছে, কিন্তু উপায় কি? হয় ত' একদিন সত্যি সত্যি—"

"চুপ, ওসব কথা আর মনেও আনতে পারবি না—"

হাসিয়া বলিলাম, "সে আর আমি দু'জনে মিলে তোকে সুখী করব—"

সে হাসিল।

তিন

হিরুর বিবাহের পর তিন বৎসর অতীত হইয়াছে। ইহার ভিতর রায়-পরিবারে দুইটী বিশিষ্ট ঘটনা ঘটিয়াছে—চিন্ময় রায় ও তাঁহার পত্নীর মৃত্যু। পতির পরলোক গমনের মাত্র সাত দিনের মধ্যে সাধ্বী পত্নী তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন। মানুষের যেমন হইয়া থাকে হিরুরও তাহাই হইল—স্নেহময় পিতামাতার শোকে কিছুদিন সে মুহ্যমান হইয়া রহিল; তারপর ধীরে ধীরে সময়ের গুণে স্বাভাবিক নিয়মে পুনরায় সে প্রকৃতিস্থ হইল। বিশাল জমিদারী হাতে পাইয়া সে বহু জনহিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিল। লোকের দুরবস্থা দেখিয়া তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে সে দেশ ও সমাজ-হিতকর বহু অনুষ্ঠান গড়িয়া তুলিল। তাহার এই শুভানুষ্ঠানগুলির প্রধান সহায় হইল তাহার সহধর্ম্মিণী মীনা। সহধর্ম্মিণীর স্বরূপ কি, মীনা তাহা কর্ম্মক্ষেত্রে দেখাইয়া দিল। মীনা কেবল হিরুর সহায় নয়, বহু কার্য্যে সে-ই অগ্রণী এবং বহু অনুষ্ঠান তাহারই কল্পনা-প্রসূত। লোকে দুই হাত তুলিয়া এই আড়ম্বরবিহীন উপকারী দম্পতী-যুগলকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিল।

তাহারা উভয়ে উভয়কে পাইয়া সুখী হইল।

এই সময় একটী সুন্দর শিশুপুত্র মীনার কোল আলো করিল।

আমি তাহাদের প্রধান কর্ম্মী। আমায় ছাড়া তাহাদের যেন চলিত না। আমাদের কর্ম্মজীবন বড় আনন্দে কাটিতে লাগিল। কিন্তু এত আনন্দ যেন আমার সহিল না। হঠাৎ একদিন আমি মনে মনে একটা সঙ্কল্প করিয়া বসিলাম। সেই সঙ্কল্প অনুসারে একদিন গ্রাম ত্যাগ করিব বলিয়া বিদায় চাহিলাম। প্রথমতঃ তাহারা অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিল; পরে কথাটা মিথ্যা বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিল। কিন্তু আমি যখন গম্ভীর ভাবে বিষয়ের গুরুত্বটা বুঝাইয়া দিলাম, তখন তাহারা ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলিল, "অসম্ভব, এ হ'তেই পারে না…"

হিরু বলিল, "সত্যি যদি তোর রোজগার ক'রেই খেতে হয় তবে এই জমিদারী রয়েছে, চালিয়ে খা, যে রকম তোর ইচ্ছা, কেউ কোন দিন একটী কথাও তোকে বলবে না, কিন্তু তুই আমায় ছেড়ে যেতে পারবি না…"

আমি বলিলাম, "কিন্তু তুই ভেবে দেখ হিরু, এ ভাবে প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ উপস্থিত হ'লে আমাদের আবাল্য বন্ধুত্ব…"

হিরু দুঃখিত কণ্ঠে বলিল, "তুই আমায় এতই হীন মনে করিস রণি…আর প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ হবে কেন? তুই কি আমার জিনিষকে নিজের ব'লে মনে করতে পারিস না? এতটুকু স্বত্ব কি আমার উপর তোর নাই…"

তাহার চোখে জল দেখিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলাম। আমার চোখ জ্বালা করিয়া জল আসিতেছিল। ক্ষণপরে বলিলাম, "ভাখ্ হিরু, আমরা মানুষ—অ'ত সাধারণ মানুষ, শেষে কি তোকেও হারাব?"

মীনা সহসা বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা কাজ কি ওতে, এক কাজ করা যা'ক,—পরগণাটা আপনাকে লিখে দি, পুরুষানুক্রমে ভোগদখল স্বত্ব থাকবে, দান বলে লিখব না, বিক্রী বলেই লিখব, মূল্যও নেব যৎসামান্য, তা হ'লে ত' আর আপনার মনে হবে না পরের অন্নে জীবন ধারণ করছেন বলে?…সত্যি কি আমরা আপনার এতই পর? আমি জানতাম আপনারা দু'জন অভিন্ন…"

তাহার চোখ দু'টিও জলে ভরিয়া আসিল। সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

মনে দারুণ ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলাম মনের আবেগ সম্বরণ করিতে নীরবে কিছুকাল মাটির দিকে চাহিয়া রহিলাম। কিন্তু তবুও সঙ্কল্প অটল রহিল।

একদিন সত্যসত্যই গ্রাম ত্যাগ করিলাম। তাহারা সজল নয়নে আমায় বিদায় দিল। আমার অশ্রুও সেদিন আর বাধা মানিল না। মীনার শিশুপুত্রটি মায়ের কোলে থাকিয়া এ দৃশ্য দেখিয়া যেন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। আমি তাহাকে তাহার কোল হইতে টানিয়া লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া পুনঃ পুনঃ মুখচুম্বন করিলাম। তারপর হঠাৎ অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে মীনার বুকে শিশুকে একরূপ ফেলিয়া দিয়াই বেগে পথ চলিতে লাগিলাম। আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল তাহাদিগকে আর একবার দেখিবার জন্য, তাহাদের কাছে ফিরিয়া গিয়া আর একটু কথা কহিবার জন্য, কিন্তু কিছুতেই ফিরিয়া চাহিলাম না, মনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ, ক্ষত-বিক্ষত করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম।

সেদিন যে ভুল করিয়াছিলাম সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আজও করিতেছি; আমরণ তাহার জন্য অনুতাপ করিব। আমার আজ কেবলই মনে হয়, আমি যদি তাহাদিগকে ওভাবে ছাড়িয়া না আসিতাম!

আজ পুনঃ পুনঃ মনে এই প্রশ্ন উত্থিত হয়—ওভাবে মনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কি লাভ করিয়াছি…মন আমার অহরহ কেবলই বলিয়াছে, ফিরিয়া যাও, ফিরিয়া যাও তাহার কাছে, কিন্তু মনের কথায় কাণ দিই নাই…আজ মনে হইতেছে আমার মন যাহা প্রথম বলিয়া দেয় তাহাই আমার শ্রেষ্ঠ পথ। অন্যের কথা জানি না, আমার পক্ষে ইহাই নিয়ম। এই নিয়মের অন্যথায় আমার যত দুর্ভাগ্য!

চার

ইহার পর বহুদিন অতীত হইয়াছে। বর্ত্তমানকে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে বন্ধু এবং বন্ধু-পত্নীর মায়া কাটাইতে চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু ফল বিপরীতই হইতেছিল। ইহাতে তাহাদের জন্য আমার প্রাণের টান যেন শতগুণ বর্দ্ধিত হইতেছিল। এই সময় সহসা একদিন রাত্রি তৃতীয় প্রহরে আমার কর্ম্মস্থল ক্ষুদ্র সহরের রাজপথ অশ্বপদশব্দে মুখরিত হইয়া উঠিল। আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। বিস্মিত হইয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলাম। মনে হইল, তীর-বেগে ধাবিত অশ্ব যেন আমারই গৃহের সম্মুখে আসিয়া সহসা থামিয়া গেল। আমি উদ্বিগ্ন চিত্তে রুদ্ধশ্বাসে আরও কিছু শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অশ্ব হ্রেষারব করিয়া উঠিল। অশ্বারোহীর অশ্ব হইতে অবতরণের শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। উত্তেজিত অশ্বকে শান্ত করিবার জন্য উহার পৃষ্ঠে মৃদু করাঘাতের শব্দও শ্রুত হইল। পরমুহূর্ত্তে সে যেন ছুটিয়া আসিয়া আমার রুদ্ধদ্বারে পুনঃ পুনঃ করাঘাত করিতে করিতে ডাকিল, "কর্ত্তা! কর্ত্তা!…" কণ্ঠস্বর ভীত, কম্পিত, যেন আবেগরুদ্ধ! আমার কৌতূহল অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলেও চলিত জন-প্রবাদ অনুসারে তিন ডাক পর্য্যন্ত অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে অপেক্ষা করিয়া চীৎকার করিয়া উত্তর করিলাম, "কে?…"

"কর্ত্তা! কর্ত্তা! শীঘ্র—শীঘ্র খুলুন, আমি।"

কণ্ঠস্বর পরিচিত। আমি একলাফে তৎক্ষণাৎ শয্যাত্যাগ করিয়া ছুটিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিলাম। সম্মুখেই আগন্তুককে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম, "ভজু সর্দ্দার!"

ভজু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "হাঁ কর্ত্তা, সেই গোলামই বটে।"

"এত রাত্রে ঘোড়-সওয়ার হ'য়ে এভাবে ছুটে এসেছ কেন ভজু?"

ইত্যবসরে ভজু সর্দ্দার অবসন্ন দেহে হতাশভাবে উভয় হস্তের মধ্যে মস্তক রাখিয়া নতদৃষ্টিতে মাটির দিকে চাহিয়া নীরব হইয়াছিল। আমি সন্দিগ্ধ হইয়া বলিলাম, "একি! চুপ করে র'লে যে? ভজু!…"

অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া তাহার হাত সরাইয়া মুখ তুলিয়া ধরিয়া সবিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিলাম, "একি! ভজু, একি! তোমার চোখে জল! কি হয়েছে—কি হয়েছে? শীঘ্র আমায় খুলে বল।"

ভজু সর্দ্দার তখন আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "কর্ত্তা, কর্ত্তা! শীঘ্র চলুন, শীঘ্র, সব বুঝি গেল—সব।"

আমি কিছু না বুঝিয়া গুরুতর বিপদ আশঙ্কা করিয়া যেন পাগল হইয়া উঠিলাম। সবলে তাহার কাঁধ ধরিয়া

ঝাঁকিয়া চীৎকার করিয়া বলিলাম, "শীঘ্র বল তারা সব কেমন আছে···হিরু? মীনা? খোকা?

ভজু হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "উঃ!" আমার দিকে কাতরদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় বলিল, "কর্ত্তা, কর্ত্তা চলুন—চলুন, এক্ষুণি চলুন।"

এমন সময় আরো একটী অশ্বারোহী আমার গৃহের সম্মুখে আসিয়া থামিল। আগন্তুক ছুটিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার রুক্ষ কেশ, রুক্ষ বেশ, ললাটে স্বেদবিন্দু, ঘর্ম্মাক্ত অবসন্ন দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। দুইবার তাহার ওষ্ঠদ্বয় নড়িয়া উঠিল। সে কথা কহিবার প্রয়াস পাইল, কিন্তু তাহার কথা ফুটল না। আগন্তুক যুবক হিরুর প্রিয় কর্ম্মচারী। আমি স্তব্ধ হইয়া চেতনাহীনের ন্যায় কতক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়াছিলাম জানি না। হঠাৎ তাহার কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিলাম।

"রণেন্—রণেন্‌বাবু! সব..."

তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া কাঁপিয়া আবেগে যেন রুদ্ধ হইয়া গেল। চাহিয়া দেখিলাম তাহার মুখ বিষণ্ণ, চোখ অশ্রু-ভারাক্রান্ত। আমি উন্মত্ত হইয়া কি যেন বলিতে যাইতে-ছিলাম। সে আমায় দক্ষিণ হস্তের ইঙ্গিতে নীরব থাকিতে বলিয়া একহাতে দেওয়াল ধরিয়া নতদৃষ্টিতে মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার কথা কহিবার কিম্বা দাঁড়াইবারও শক্তি ছিল না। আমি গৃহমধ্যে ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম। বোধ হয় পাঁচ মিনিট অতীত হইয়াছিল। আমার সহিবার শক্তি নিঃশেষ হইয়া আসিলে তাহার সম্মুখীন হইয়া বলিলাম, "বল শীঘ্র কি হয়েছে, আমি পাগল হয়ে উঠেছি।"

যুবক এবার স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সে গম্ভীর কিন্তু বিষণ্ণ। বলিল, "আজই রাত্রি দশটায় কর্ত্তা—"

আর সে বলিতে পারিল না। আবার তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। আমি ক্ষিপ্তের ন্যায় তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলাম, "কর্ত্তা কি—কি করেছেন—"

"আমাদের সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।"

"সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ হয়েছে সর্দ্দার?"

"কর্ত্তাবাবু আর নেই!"

বোধ হয় একটা অস্বাভাবিক আর্ত্তনাদ আমার কণ্ঠ হইতে নির্গত হইয়াছিল। আমার মনে আছে, তাহারা আসিয়া আমায় ধরিয়াছিল। আমি বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া গেলাম। হস্তদ্বয় শিথিল হইয়া উভয় পার্শ্বে ঝুলিয়া পড়িল। পরে সর্ব্বাঙ্গ পুনঃ পুনঃ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। পদদ্বয় যেন দেহের ভার বহিতে অস্বীকার করিল। ধীরে ধীরে আমার চেতনা লুপ্ত হইল।

তারপর যখন চেতনার সঞ্চার হইল তখন দেখিলাম, ভজু চোখের জলে বুক ভাসাইয়া আমার মাথায় পাখার বাতাস করিতেছে। আমাকে সচেতন দেখিয়া বলিল, "কর্ত্তা! কর্ত্তা! উঠুন—উঠুন, চলুন, শীঘ্র, না হ'লে মীনারাণীকেও পাওয়া যাবে না।"

আমি চমকিয়া উঠিয়া বসিয়া তাহার দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলাম। পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কক্ষে পদচারণা করিতে লাগিলাম। হঠাৎ আপন মনে বলিয়া উঠিলাম—"হিরু চলে গেল—আমায় একবারও কিছু জানালে না—উঃ!" আমার দীর্ঘশ্বাসের শব্দে তাহারা চমকিয়া আমার দিকে চাহিল। আমি হঠাৎ যুবকের সম্মুখীন হইয়া বলিয়া উঠিলাম, "আজ এসেছ আমায় নিতে, একদিন আগে যদি আমায় জানাতে, কিছুই কি তোমরা বুঝতে পার নি? ঘুণাক্ষরেও না? তার আচরণে কি এতটুকু পরিবর্ত্তনও কেউ লক্ষ্য কর নি? হায় অদৃষ্টের পরিহাস!"

যুবক কাতরকণ্ঠে বলিল, "আমরা কেউ কিছু বুঝতে পারি নি রণেন বাবু, যদি বুঝতেই কিছু পারতাম তবে কি"···

তাহার দীর্ঘশ্বাস পতিত হইল। পরে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া বলিল, "আর দেরী করবেন না এক মুহূর্ত্তও, এখন যান আপনি, নইলে মীনারাণীকেও হয় ত' হারাতে হবে।"

আমি চমকিয়া ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন, কেন? মীনা, মীনা? কি করছে সে? খোকা?"

"মীনারাণী সেই ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন, আমরা বহু চেষ্টাতেও আর তা খোলাতে পারি নি, ভয়ে দরজা ভাঙ্গি নি, যদি কিছু একটা ভয়ানক ক'রে বসেন, নানা রকমের শব্দ শুনতে পেয়েছি ভিতরে, মনে হয় যেন পাগল হয়ে গেছেন, আর খোকা বাইরে দাসীর কোলে, 'মা' 'মা' চীৎকারও মীনারাণীকে টলাতে পারে নি, আপনি আমার ঘোড়া নিয়ে শীঘ্র যান, আমি কাল দিনে ফিরব।"

আমি অবিলম্বে যাত্রা করিলাম। সঙ্গে পশ্চাতে অশ্বারোহণে ভজু। [ক্রমশঃ

লালন-গীতিকা

শ্রী মতিলাল দাশ

আমরা বর্ত্তমানে যে সাহিত্য রচনা করিতেছি তাহার সহিত দেশের নাড়ীর যোগ নাই বলিলেই চলে। আমরা সচরাচর বিদেশীয় ভাবধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই যে সমস্ত সমস্যা আলোচনা করি, যে ভাবে রূপশিল্প গঠন করি, তাহা দেশের জন-চিত্তকে স্পর্শ করে না। দেশের অসংখ্য নর ও নারী শিক্ষার আলোক পায় নাই, তাহারা পশ্চিমের সংস্কৃতির কোনও পরিচয়ই রাখে না, তাই তাহারা বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্যের রসের ভোজে উপেক্ষিত অতিথি। তাহার দূর হইতে উৎসবক্ষেত্রের দীপালোক, পত্রপুষ্পতোরণ, পুষ্পমালা এবং সমারোহ দেখে, কিন্তু ভিতরে আসিয়া যোগ দিতে পারে না। কিন্তু আমরা জনকয়েক ইংরেজী-শিক্ষিত লোকই ত' দেশ নয়। বার্ণাড শ, ইবসেন, ফ্রয়েড আমাদের যত প্রিয়ই লাগুক, এই সমস্ত সাধারণ নর ও নারী তাহার মধ্যে কোনও আলোকই পায় না, কোনও আনন্দই উপভোগ করে না।

বাঙ্গালাদেশের নদীরূপমালা-ধৃত-প্রান্তরে আমাদের যে সব স্বদেশবাসী সনাতন জীবনধারা যাপন করিতেছে তাহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার সহিত আমরা দিনে দিনে বিচ্ছিন্ন হইতেছি। এই কারণেই লোক-সাহিত্য আলোচনা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

বাঙ্গালার যে নিজস্ব রূপ তাহার তুলসীতলায়, তাহার মসজিদে, তাহার আনন্দের আয়োজনে ফোটে, লোক-সাহিত্যের মুকুরে আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পারি। শতাব্দীর যে ভাবধারা আমাদের মানুষচিত্তকে উল্লসিত ও তৃপ্ত করিয়াছে তাহার সাক্ষাৎ পাইব।

এই সমস্ত লোক-সাহিত্যের মধ্যে আবার কতকগুলি রচনা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের রুচিকর। আমাদের দেশে অনেক সাধক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাহারা এই দুই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত ও কল্পনার মধ্যে এক পরম ঐক্যের সন্ধান পাইয়া গান রচনা করিয়াছেন। আজ হিন্দু-মুসলমান বিরোধের দিনে এই সমস্ত অসাম্প্রদায়িক মহামনা সাধকদের সঙ্গীত আলোচনা করা বাঞ্ছনীয়।

লালন ফকিরের গানের মধ্যে আমরা এই ঐক্যের সুর এই মিলনের মন্ত্র দেখিতে পাই। কুষ্টিয়ায় আমি লালন ফকিরের ৩৭০টি গান সংগ্রহ করি। এই সমস্ত গানের মধ্যে লোকপ্রিয় উপমা ও বাক্যরীতি দিয়া গভীর তত্ত্ব পরিবেশন করা হইয়াছে। আজ তাহার কতকগুলি গান পাঠকবর্গকে উপহার দিয়া লালনফকিরের শ্রদ্ধাতর্পণ করিব।

আমার আপন খবর আপনার হয় না
আপনারে চিনলে যায় আপনারে চেনা।
সাঁই নিকট থেকে দূরে দেখায়
যেমন কেশের আড়ে পাহাড় লুকায় দেখনা
আমি ঢাকা দিল্লী হেতড়ে ফিরি,
আমার কোলের ঘোর ত যায় না।
আত্মারূপে কর্ত্তা হরি
মনে নিষ্ঠা হলে মিলবে তারি ঠিকানা
বেদ বেদান্ত পড়বি যত বেড়বে তত লখনা
আমি আমি কে বলে মন
যে জানে তার চরণ শরণ লেনা
সাই লালন বলে মনের ঘোরে মলাম
চোখ থাকিতে কানা।

এই গানের মধ্যে উপনিষদের আত্মতত্ত্বের কি সুন্দর সরস বর্ণনা। মানুষ সিদ্ধিলাভের জন্য ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাতে জীবনের অন্ধকার দূর হয় না—আপনাকে চিনিতে পারিলেই আপনাকে সত্যভাবে চেনা যায়। মানুষ যে দেহ নয়, শরীর নয় বরং আত্মময় পুরুষ—এই তত্ত্বোপলব্ধিই সাধনার চরম বাণী। বেদ বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রাধীতি করিলেই তাহা জানা যায় না—যিনি তাহাকে জানিয়াছেন তাঁহার চরণ শরণ লইলেই মুক্তি। সেই গুরু বা সাঁইয়ের শরণ নিতে হইবে, কারণ তিনি নিকট থাকিয়া দূরকে দেখিতে পারেন।

এই আত্মবিদ্যা বর্ত্তমানে য়ুরোপেও মানুষকে মুগ্ধ করিতেছে। Spiritual Science নামক পুস্তক পড়িতেছিলাম। গ্রন্থকার মানুষের আত্মার কথায় লিখিতেছেন :—

He has been kept in ignorance of the

supreme truth that this conscious personality, this infinitesimal spark of the All-pervading Divine Essence which is immanent in every sentient entity, is his real self.

He has never really understood that this essential part of his own being which imbues every fibre of his material body with life and motion, as the mighty source whence it is derived moves and impels and animates all Matter in the broad expanse of the visible universe, is part of the indistinctible principle and God Himself."

লালনের বহু গানে এই আপনাকে জানার হদিস পাই।

মন রে আত্মতত্ত্ব না জানিলে
সাধন হবে না, পড়বি গোলে,
আগে জানগে কালুল্লা, আয়নাক হক আল্লা,
যারে মানুষ বলে, পড়ে ভোক্তা মন।
মন আর হসনে বারংবার একবার দেখনারে
প্রেম নয়ন খুলে।
আপনি সাঁই ফকির, আপনি হয় ফিকির
ও সে নিলে ছলে আপনারে আপনি ভুলে
রব্বানি আপনি ভাসে আপন প্রেম জলে।
লায়েলাহা তোল ইল্লিল্লা জীবন
আছে প্রেম যুগলে, লালন ফকিরে তা কয়, তা কয়।
সেই আমি কি আমি, আমি তাই জানিলে যায় দুর্গামি
লালন ফকির কয়, তবে কি ভ্রমি ভব কূপায়।

আত্মতত্ত্ব জানিবার চেষ্টাই সাধনার চরম সম্পদ। সেই পরমাত্মাকে প্রেম করিতে করিতে মানুষের দৃষ্টি পরিস্ফুটিত হয়। কিন্তু এই আমি কি তাহা জানা সহজ নয়। ফকির তাই গান বাঁধিতেছেন :—

আমি কি তাই জানলে সাধন সিদ্ধি হয়
আমি শব্দের অর্থ ভারি, আমি সে ত আমি নয়।
অনন্ত সহর বাজারে, আমি আমি শব্দ করে,
আমার খবর নাই আমি, বেদ পড়ি পাগলের প্রায়।
যখন না ছিল এই স্বর্গ মর্ত্ত্য, তখন কেবল আমি সত্য,
পরেতে হইল বর্ত্ত, আমি হইতে তুমি কায়।
মনছুর হাল্লাজ ফকির সেত, বলেছিল আমি সত্য
সেই পেলো সাঁইর আইন মত, সবায় কি তার মর্ম্ম পায়।
কুমবেজ নিকুম বায়েজ নিল্লা, সাঁইর হুকুম দুই আমি হেল্লা,
লালন বলে এ ভেদ খোল্না, আছেরে মুরসিদের ঠাঁয়।

যিনি গুরু তিনিই মুরসিদ। তাঁর কৃপায় মানুষের চোখ খোলে মানুষ আপনা আপনি ত' সত্যের সাক্ষাৎ পায় না। গুরুকৃপায় মানুষ ভবমুক্তি পায়, তাই ফকির বারংবার গুরুর চরণ শরণ করিতে বলিতেছেন :—

দিন থাকতে মুরসিদ রতন চিনলে না,
এমন সাধের জনম বয়ে গেলে আর হবে না।
মুরসিদ আমার দয়াল নিধি, মুরসিদ আমার বিষয় আদি,
পারে যেতে ভবনদী, ভরসা চরণখানা ?
কোরাণে সাক শুনতে পাই, গুণী গাওগে মুরসিদ সাঁই
ভেবে বুঝে দেখ মন তাই, মুরসিদ সে কেমন জনা
মুরসিদ বস্তু চিনলে পরে, চেনা যায় মন সখিনারে
লালন কয় সে মূল ধরে' নজর হবে ততখনা।

গুরুবাদ ভারতীয় সাধনার বড় অঙ্গ। মানুষ নিজে নিজে পথ চলিতে পারে না—পথ দেখাইবার জন্য তাহার চাই লোক, যিনি নিজে সত্যকে জানিয়াছেন। সত্যদ্রষ্টা সেই গুরুর কৃপা না হইলে অজ্ঞান-তিমিরান্ধকার দূর হয় না, দূর হইতে পারে না। গুরুর শরণ নিয়া গুরুনির্দ্দিষ্ট পথে সাধন করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হয়—চিত্তশুদ্ধি হইবার পর মানুষ মুক্তি পায়।

এই গুরুশরণাগতির কথা আরও বহু গানে আছে।

তোমার মত দয়াল বঁধু আর পাব না,
দেখা দিয়ে ওহে রসুল ছেড়ে যেও না
তুমি হে খোদার দোস্ত, ওপারের কাণ্ডারী সত্য
তোমা বিনে পারের লক্ষ্য আর দেখা যায় না।
আমরা সব মদিনাবাসী, ছিলাম জনম বনবাসী
তোমা হতে জ্ঞান পেয়েছি, পেয়েছি সান্ত্বনা।
আসমানি আয়েস দিয়ে আমাদের সব আনলে রাহে
আজ কি মোদের ফাঁকি দিয়ে ছেড়ে পালাবা।
তোমা বিনে এরূপ শাসন, কে করবে আর দীনের কারণ
লালন বলে এমন বাতি আর জ্বলবে না।

এই কবিতায় মহম্মদকেই রসুল বলিয়া হৃদয়ে বাতি জ্বালাইবার জন্য উপাসনা করা হইয়াছে। দৃষ্টি যতই বাড়ে ততই মানুষ বোঝে রাম ও রহিমের ভেদ নাই। মানুষ খোদাই বলুক আর হরিই বলুক, একজনেরই উপাসনা করে।

ও মন যে যা বোঝে সেইরূপ সে হয়,
সে যে রাম রহিম করিম কালা, একই আল্লা জগন্ময়,
করে সাঁই সহিত খোদা, আপন জবানে কয় সে কথা,
যার নাইরে আচার বিচার, বেদ পড়িয়ে গোল বাধায়।

আকার সাকার নিরাকার হয়, একেতে অনন্ত উদয়,
নির্জ্জন ঘরে রূপ নেহারে, এক বিনে কি দেখা যায়।
একে নেহার দেও মন আমার, ভজনারে দোনোদায়,
লালন বলে এক রূপ খেলে ঘটে পটে সব যায়গায়॥

সাধনা যখন সত্য হইয়া ওঠে, তখন মানুষ এই একেরই সন্ধান পায়। সমস্ত সত্যকার সাধকের জীবনে আমরা তাহার পরিচয় পাই।

লালনের কবিতা নানামুখী। সমস্ত কবিতা তুলিয়া দিবার স্থান নাই। লালনের কবিতায় মুসলমানধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের ভাবধারা নিয়া নূতন এক মৈত্রীর ধ্বনি ফুটিয়াছে।

ধন্য মায়ের নিমাই ছেলে।
এমন বয়সে নিমাই ঘর ছেড়ে ফকিরি নিলে।
ধন্যরে ভারতী যিনি, সোনার অঙ্গে দেয় কৌপীনি
শিখালি হরির ধ্বনি, করেতে করঙ্গ নিলে।
ধন্য পিতা বলি তারি ঠাকুর জগন্নাথ মিশ্রী
যার ঘরে গৌরাঙ্গ হরি, মানুষরূপে জন্মাইলে
ধন্যরে নদীয়াবাসী, হেরিল গৌরাঙ্গশশী
যে বলে সে জীবন সন্ন্যাসী
লালন কয় সে ফেরে পলে।

এই গান শুনিলে মনে হইবে লালন যেন চৈতন্যভক্ত বৈষ্ণব। বৈষ্ণব-প্রেমে মাতোয়ারা প্রভু চৈতন্যের গুণকীর্ত্তন করিতেছেন। আবার নীচের কবিতায় দেখি তাহার অগাধ কৃষ্ণপ্রেম।

ওগো রাই-সাগরে নামল শ্যামরায়,
তোরা ধরগে হরি ভেসে যায়।
রাই প্রেমের তরঙ্গো ভারি,
তাতে থাই দিতে কি পারলে গো হরি
ছেড়ে রাজত্ব, প্রেমে উদাস্ত
কৃষ্ণের চিন্তা-কাঁথা ওড়ে গায়
ওগো চার যুগেতে ঐ কেলে সোনা
তবু শ্রীরাধার দাস হতে পাল্লে না।
যদি হইত দাস, যেত অভিলাষ,
তবে আসবে কেন নদীয়ায়?
তিনটি বাঞ্ছা অভিলাষ করে,
হরি জন্ম নিলেন শচীর উদরে,
ছেরাজ চরণ ভেবে কয় লালন,
সে ভাব জানিনে।

এই সহজ সুর কিন্তু সহজিয়া গানের মধ্যে রহস্যময় হইয়া দেখা দিয়াছে। এই সমস্ত ভাব ও কল্পনা আমরা ভুলিতে বসিয়াছি, তাই ইহাদের তাৎপর্য্য সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না।

না জেনে ঘরের খবর তাকাই আনমানে,
চাঁদ রয়েছে চাঁদে ঘেরা ঘরের ঈশাণ কোণে।
প্রথমে চাঁদ উদয় দক্ষিণে
কৃষ্ণ পক্ষে আধা হয় বামে,
আবার দেখি শুক্ল পক্ষে কিরূপে যায় দক্ষিণে?
খু জিলে আপন ঘরখানা
পাইবে সকল ঠেকানা
বারমাসে চব্বিশ পক্ষ
অধর ধরা তাঁর সনে
স্বর্গ চন্দ্র মজি চন্দ্র হয়,
তাহাতে বিভিন্ন কিছুই নয়
এ চাঁদ ধরলে সে চাঁদ মেলে
লালন কয় তাই নির্জ্জনে।

ছোট একটি গানে জ্যোৎস্নার মাধুরীভরা চাঁদকে শ্রোতার হৃদয়ে নিয়া যায়। মানুষ যে স্বর্গ-চন্দ্র চায়, তাহারই সুধাধারা গলিয়াই ত' প্রাকৃতিক চন্দ্র। প্রাকৃতিক চন্দ্রকে তাই প্রেমের ও রসের আয়নায় দেখিতে পারিলে সাধকের সাধনা সফল হয়। তত্ত্ব ত' বেশী নয়, একই প্রেম শতদল যোগযাগ আচার অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই—একের অনুভূতি হইলেই সকলই বিকশিত হয়।

এই সহজিয়া ভাবধারা মানুষ তত্ত্বে প্রস্ফুট হইয়া উঠে।

মানুষ তত্ত্ব যার সত্য হয় মনে,
সে কি অন্য তত্ত্ব মানে?
মাটীর ঢিপি কাঠের ছবি, ভুতভাবি সব দেব দেবী
ভোলে না সে এসব রূপি, ও যে মানুষ রতন চেনে।
জোরই সোরই নোলা পেছু পেখি
এলো ভোলা তাতে নয়নে ভোলনে আসা
মানুষ ভজে দিব্য জ্ঞানে
কেও কেপি কে কলা যারা, ডাকা ডুকয় ভোলে না তারা
লালন তায় চটা মারা
'ও ঠিক দাঁড়ায় না একখানে।

অন্য গানেই আবার এই কথা ভালভাবে বলা হইয়াছে।

এই মানুষে সেই মানুষ আছে
কত মুনি-ঋষি যারে যুগ ভরে বেড়াচ্ছে খুঁজে

জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়, ধরতে গেলে হাতে কে পায়,
তেমনি সাদায় আছে আলেক বসে'
অচিন দলে বসতি ঘর, দ্বিদল পদ্মে বারাম তার,
ও সেঁদিল নিরূপণ হবে যাহার, দেখবে অনায়াসে।
আমার হলো কি ভ্রান্তি মন, বাইরে খুঁজি ঘরের ধন,
দরবেশ সেরাজ সাঁই কয়,
ঘুরবি লালন আত্মতত্ত্ব না বুঝে।

এই আত্মতত্ত্বের গহন কথা আর বলিব না। আর কয়েকটী সহজ গান তুলিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব।

হায়, চিরদিন পুষলাম এক অচিন পাখী,
ভেদ পরিচয় দেয় না আমায়, ঐ খেদে ঝরে আঁখি।
পাখী বুলি বলে শুনতে পাই
রূপ কেমন দেখিনে ভাই,
বিষম ঘোর দেখি
আঁখি চিনাল বোলে চিনে নিতাম
যেত মনের চুকচুকি।
পুষে পাখী চিনলাম না, এ লজ্জা ত যাবে না
উপায় করি কি?
পাখী কখন উড়ে যাবে ধুলো দিয়ে দুই চখি'
আছে নয় দরজা যাহাতে যায় আসে পাখী,
কোন পথে চোখে দেবেরে ভেলকী
দরবেশ সেরাজ সাঁই কয়
ধর লালন ধর ফাঁদ পেতে ঐ পদ্মমুখি!

কেমন চমৎকার উপমা। সাধারণ পাখীর সহিত জীবাত্মার তুলনা কি স্বচ্ছন্দ চাতুর্য্যে করা হইয়াছে। এটী হিন্দুভাবের কথা। মুসলমান ভাবধারা অনুরূপ গান আছে—

আল্লা বলো মনরে পাখী,
ভবে কেউ কারো দুখের নয় দুখী।
ভুলনারে ভবে ভ্রান্ত কাজে,
আখেরে এসব কাণ্ড মিছে,
মনরে আসতে একা যেতে একা
এ ভব পিরীতের ফল আছে কি
হাওয়া বন্ধ হলে সুপদ কিছুই নাই
বাড়ীর বাহির করে সবাই মনরে
কেবা আপন পর কে তখন
দেখেশুনে খেদে ঝরছে আঁখি।
গোরের কিনারে যখন লয়ে যায়,
কাঁদিয়ে সবাই জীবন ছাড়তে চায়
ফকির লালন বলে,
কারো গোরে কেউ ত যায় না,
থাকতে হয় একাকী।

পাঠকগণের ভাল লাগিলে বারান্তরে অন্য কবিতা দিব।

আজ হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধের দিনে আমরা এই সমস্ত মহাপুরুষ সাধকদের অবদানের কথা শ্রদ্ধায় স্মরণ করি। মানুষে মানুষে যে ভেদ সত্য নয় রাষ্ট্রনীতি তাহাকেই বড় করিয়া তোলে। মানুষ সেই অন্ধতায় যাহা আসল তাহা ভুলিয়া যায়।

বাঙ্গালার পল্লীর কোণে পাখীর মেঠো গানের মেঠো সুরের সঙ্গে এই সমস্ত সহজ গান আপন স্বকীয়তায় প্রস্ফুট হইয়াছিল। গৃহস্থ সারাদিনের ক্লান্তিতে যখন অবসন্ন হইত, তখন এইসব গান তাহাদের মনে বীর্য্য ও আনন্দ আনিত। বাঙ্গালায় সেই শান্ত, সরল, সংগ্রামহীন জীবন ফিরিবে কি না জানি না।

জীবন-সংগ্রাম কঠোর হইয়া উঠিতেছে। অন্নের হাহাকার মানুষকে সুখহীন ও শান্তিহীন করিয়া তুলিয়াছে। এই গতির দিনে, এই নিরন্তর ব্যগ্রতার মাঝে বিগত দিনের এই পরিপূর্ণতার গান আমাদের হৃদয়ের দ্বারে হয়ত ঘা দিবে না। কিন্তু যদি দিত, হয় ত ভাল হইত।

বিজ্ঞান অসম্ভব সম্ভব করিয়াছে, কিন্তু সে মানুষের দানবিকতাকে শেষ করে নাই। পশ্চিমে যে প্রলয়ঙ্কর রণ-তাণ্ডব তাহাই আমাদের বুঝাইতেছে যে, আমরা ভুল পথে চলিয়াছি।

নবযুগ গঠনের দিনে আমাদের নূতন করিয়া সমন্বয় করিতে হইবে। সেই সমন্বয়ের উপকরণ অবশ্য পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত লইয়া হইবে। কিন্তু পণ্ডিতেরাই ত' দেশের সব নয়। দেশের অগণ্য নর ও নারী যাহারা শিক্ষার আলোক পায় নাই তাহারা এই সব লোকসঙ্গীতে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিল। এই লোক-সঙ্গীতের কথা, এই লোক গীতির ভাবধারাকে যেন আমরা নব সমন্বয়ের দিনে শ্রদ্ধায় আলোচনা করি।

চলিতে চলিতে হঠাৎ সৌরভ আসিয়া পথিককে মুগ্ধ করে—সে সৌরভ আসে বনপ্রান্তের অযত্নরচিত লতাপুষ্প হইতে—এই লোক-সঙ্গীত তেমনই। ইহাদের অনির্ব্বচনীয় সৌরভ আমাদের সাহিত্যের দেবায়তনকে আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে। রসিক যাঁহারা, তাঁহারা এই হারামণি সংগ্রহ করিয়া সাহিত্যসরস্বতীর পূজা-বেদী অলঙ্কৃত করুন এই কামনা করি।

একদিনের নাটক

শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু

[ঘড়িতে বারোটা বাজার শব্দ পাবার পর আস্তে আস্তে পর্দা উঠলো। খুব অন্ধকার একটা কক্ষ এবং তার মধ্যে কালো কোট এবং কালো ট্রাউজার পরা দু'জন লোকের গলার স্বর লঘুভাবে ভেসে এল এবং তখন বোঝা গেল কক্ষ জনশূন্য নয়।]

প্রথমব্যক্তি। বাজার চিনি কিনা বুঝতে পেরেছেন এখন? কি মাল কি ভাবে কাটাতে হয়—সেটা জানি হালদার সাহেব।

হালদার সাহেব। জানো বলেই ত' তোমার শরণাপন্ন হয়েছি গোস্বামী। কি অবস্থা থেকে কি অবস্থায় এসে উঠেছি তা' ত' বুঝতে পারছি এবং এতে তোমার সুকৌশলের প্রশংসা না করে আমার আর উপায় নেই।

গোস্বামী। ও কথা বলবেন না সাহেব। আপনি না থাকলে আমার বাচ্চা-কাচ্চাদের কি দু'বেলা দু'মুঠো ভাত জোটাতে পারতাম আমি? আমার অবস্থা ত' আরো সরেস ছিল সাহেব; ধার করে চালাতাম, এর কাছ থেকে ধার করে ওকে, ওর কাছ থেকে তাকে শোধ ক'রতাম। খাল কেটে খাল বোঝাই করতে হতো! আপনি না থাকলে আমাকে পথে বসতে হতো, ভাগ্য সুপ্রসন্ন না হলে হয় ত' জেলেও থাকতে হতো।

হালদার সাহেব। তুমি হাসালে গোস্বামী! বিনয়েরও একটা সীমা রেখ হে; তোমার মাহাত্ম্য অমন করে চেপে রেখো না, ওতে যেমন ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, তেমনি অশ্রদ্ধা জাগে! আমরা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক, বুঝলে—

গোস্বামী। আজ্ঞে বুঝলাম; এখন আমার প্রাপ্য গণ্ডা চুকিয়ে দেন, আর ডজন দুই বোতল প্যাক করে রাখবেন, কাল সন্ধ্যায় লোক আসবে জিনিষ নিতে, কিংবা আমিই নিজে আসবো।

হালদার সাহেব। বেশ। এই নাও তোমার টাকা। (গোস্বামী হালদার সাহেবের দেওয়া দু'খানা দশটাকার নোট হাতে নিলে।)

গোস্বামী। আপনাকে অনুরোধ করছি সাহেব, সাহেব-পাড়ার মদের দোকানে এ জিনিষ চালান করবেন না। এতে আমাদের আপাতদৃষ্টিতে লাভ মনে হলেও, আসলে কিন্তু লোকসান হচ্ছে খুব। ওখানে মাল না দিয়েও ব্যবসায় জমিয়ে দিচ্ছি।' গোপন ব্যবসা কিনা, লোকের কাছে with good faith and with good motive হাজির হতে পারি না। তা' ছাড়া পুলিসে জানতে পারলে—

হালদার সাহেব। থামলে কেন গোস্বামী? জানতে পারলে কি? জেল? এই চোরাই মদ তৈরীর ব্যবসা করে যে টাকা সঞ্চয় করে গেলাম, খোকা, আই মীন, আমার ছেলে, সারাজীবন বসে ওড়ালেও তা' শেষ করতে পারবে না! হ'লই বা আমার জেল!

গোস্বামী। না, না, আমি সে কথা বলিনি, আমি সে কথা বলিনি। আমি বলছি আইনের কথা। Wood alcohol তৈরী করার বিধিমত license পাওয়াই কঠিন, তার ওপর গোপনে গভীর রাত্রে এইভাবে বে-আইনী মদ তৈরী করে বাজারে চালান করাটা পুলিসের কাণে উঠলে শুধু civil জেল হবে, এমন কথাই বা ভাবছেন কেন? ওর চেয়ে গরীয়ান্ শাস্তির প্রতি দৃষ্টিটা উঁচু করলে ক্ষতি কি?

হালদার সাহেব। তাতেও শ্যামচরণ হালদার হৃষীকেশ গোস্বামীর মত পশ্চাৎপদ নয়। বলেছি ত' খোকা থাকবে,—

গোস্বামী। দোহাই হালদার সাহেব, খোকার কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক, আপনি আপনার নিজের কথাই বলুন।

হালদার সাহেব। তার মানে?

গোস্বামী। মানে অত্যন্ত সরল। খোকা আর সৎপথে নেই। আপনার ছেলে অত্যন্ত গভীরভাবে মদ্যপ হয়ে উঠেছে।

হালদার সাহেব। (অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে) কি বলছ তুমি গোস্বামী? খোকা, আই মীন, আমার খোকা, বি-এ তে ফার্ষ্টক্লাস অনার্স পেয়েছে যে, কি বলছ তুমি গোস্বামী?

গোস্বামী। যা বলছি তা' আপনি বুঝতে পেরেছেন, তবুও যখন বিস্ময় প্রকাশ করছেন; তখন সরল কথাটা আরো তরল করতে হচ্ছে, আমাদের তৈরী জিনিষের চেয়েও তরল।

সাহেব পাড়ার দোকানে বসে খোকাকে আমি বহুদিন এই পচা সুগন্ধি wood alcohol পান করতে দেখেছি এবং সেই জন্যে আজ নিয়ে প্রায় বারোবার আপনাকে ওখানে চালান পাঠাতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু আপনি শুধু লাভের অঙ্কই দেখেছেন।

হালদার সাহেব। আমি বিশ্বাস করি না গোস্বামী, এ তুমি মিথ্যে বলছ! আমার সৌভাগ্যে তুমি ঈর্ষ্যা পোষণ করো গোস্বামী।

গোস্বামী। এর পর আমার নীরব থাকাই ভাল, রাত হয়েছে, চলি।

(গোস্বামী বেরিয়ে গেল। অন্ধকারে যতদূর বোঝা গেল হালদার সাহেব একখানা আরাম কেদারায় গা হেলিয়ে দিলেন। ক্লান্ত দুশ্চিন্ত মনে তিনি নিঝুম হয়ে পড়ে রইলেন সেখানে।)

[ভোর হল, প্রভাতের নূতন আলোয় ঘরখানা দৃশ্যমান হয়ে উঠল। হালদার সাহেবের বৈঠকখানা। কয়েকটা আলমারি বইয়ে ভর্ত্তি হয়ে বিশৃঙ্খল ভাবে সাজানো রয়েছে; বইগুলি সবই প্রায় রসায়নশাস্ত্রের। একদা হালদার সাহেব রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপনা করতেন। আজ দুর্ব্বল স্বাস্থ্যের অজুহাতে তিনি তা' থেকে নিরস্ত হয়েছেন। হালদার সাহেবের চাকর শ্রীকৃষ্ণ এক বাটী কফি নিয়ে ঘরে ঢুকল :]

শ্রীকৃষ্ণ। কফি।

হালদার সাহেব। এই টেবিলে রাখ্, আর শোন্, খোকাকে এখানে পাঠিয়ে দে এখুনি।

শ্রীকৃষ্ণ। এখুনি? এত ভোরে?

হালদার সাহেব। হাঁ, এত ভোরে। বলবি আমি ডাকছি। বুঝলি?

(ঘাড় নেড়ে শ্রীকৃষ্ণ জানালে যে সে বুঝেছে, এবং তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।)

হালদার সাহেব। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ—শোন্।

(শ্রীকৃষ্ণ আবার এসে দাঁড়াল)

হালদার সাহেব। যদি ঘুমিয়ে থাকে, তা' হলে আর ডাকিস্ নি, ঘুম ভাঙলেই আমার কাছে পাঠিয়ে দিস্।

শ্রীকৃষ্ণ। আচ্ছা বাবু।

হালদার সাহেব। না, আচ্ছা নয়; ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ ধোবার পর, চা খাবার পর, কাগজ পড়বার পর আমার কাছে পাঠিয়ে দিবি, বুঝলি?

শ্রীকৃষ্ণ। অনেকক্ষণ আগেই তা' বুঝেছি বাবু, আপনি না বললেও তা' বুঝতে পারতাম।

হালদার সাহেব। হ্যাঁরে শ্রীকৃষ্ণ, একটা কথা বলবি সত্যি করে, লুকোবি না, বল্?

শ্রীকৃষ্ণ। (অল্প ঘাবড়ে গিয়ে) তা বাবু, এতে আর লুকোচুরির কি আছে? এত দিন আছি আপনার পায়ে—বাজার-হাটটা করে যদি দু'টো একটা পয়সা না নিই বাবু, তবে আমাদের কি করে চলে? গরীব মানুষ আমরা।

হালদার সাহেব। না, সে কথা নয়, খোকা নাকি আজকাল অনেক রাত করে বাড়ী ফেরে, আর যখন বাড়ী ফেরে তখন টল্‌তে টল্‌তে আসে, কোন জ্ঞান থাকে না?

শ্রীকৃষ্ণ। আমরা নীচমানুষ বাবু! খোকাদাদাবাবুর কথা আমরা কি বলবো? তা টলেন বৈ কি! বমি করেন, যা-তা কথাও বলেন শুনি।

হালদার সাহেব। কতদিন থেকে খোকা এরকম করছে?

শ্রীকৃষ্ণ। মদ উনি অনেক কাল থেকেই ধরেছেন বাবু, প্রায় তিন চার বছর হবে। (হঠাৎ বাইরের দিকে চেয়ে) ওই যে খোকাদাদাবাবু বেরিয়ে যাচ্ছেন—ডেকে দিচ্ছি আমি।

(শ্রীকৃষ্ণ অতি দ্রুত বেরিয়ে গেল। হালদার সাহেব অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে পড়লেন। গতরাত্রে স্বল্প নিদ্রাজনিত অস্বস্তিকর শ্রান্তি চোখে মুখে ফুটে রয়েছে—তার ওপর গাম্ভীর্য্য এসে রেখাপাত করতেই হালদার সাহেবকে ভয়াবহ মনে হতে লাগল। মিনিট পনের পরে খোকা এল—স্লিপিং সুটপরা, চোখে গগল্‌স্—বেশ সুশ্রী চেহারা, দীর্ঘ এবং সৌম্য।)

হালদার সাহেব। খোকা, তোমার কাছে একটি প্রশ্ন আছে আমার। যদিও জানি তুমি তার স্পষ্ট এবং নির্ভীক উত্তর দেবে, তবু তার আগে তোমাকে সংযত এবং সাবধান হবার সুযোগ ও সময় দিচ্ছি।

খোকা। এবং আপনার প্রতি আমারও একটা প্রশ্ন আছে বাবা। আপনি কি আজো আমাকে মাতৃহীন অনাথ শিশুর মতো স্নেহান্ধভাবে লালন করবেন? মুক্তির নিশ্বাস থেকে বঞ্চিত থাকা আর যাই হোক, সুখের নয়। আমি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই।

হালদার সাহেব। খোকা—

খোকা। এখনো আমার ভাষণ শেষ হয়নি। আমি সে স্বাধীনতার কথা বলছি না। নিজস্ব চিন্তাধারার, স্বকীয় মননশীলতার ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার অতিরিক্ত বিধি-বিধানে আমি আপনার পরামর্শকে এখন অকিঞ্চিৎকর এবং অর্থহীন মনে করি। আমাকে ক্ষমা করবেন আপনার প্রশ্ন থেকে।

হালদার সাহেব। খোকা, ভুলে যাচ্ছ যে তুমি আমার ছেলে।

খোকা। সম্মানের দিক থেকে কখনও আপনাকে অমান্য করি নি বাবা; সে ধৃষ্টতা আজো আমার নেই। কিন্তু আমি চাই আমার কর্ম্মপদ্ধতিকে স্বাধীন করে গড়ে তুলতে।

হালদার সাহেব। শুনলাম তুমি নাকি আজকাল একটু বেশী রাত করে বাড়ী ফিরছ? আর যখন বাড়ী ফেরো পূর্ণ সম্বিৎ থাকে না তোমার?

খোকা। এ প্রশ্নের জবাব সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করে আমি নীরব হ'লাম। তবে প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলতে পারি—গোস্বামী কাকাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে আমার প্রতি এতটা অমর্য্যাদা দেখাবেন না!

হালদার সাহেব। তাই বল। আমি জানি খোকা তুই এখনো সেই রকমই আছিস। সেই অসহায় ভীরু ছোট্ট শিশুর মতই। বেশী ধমকালে কেঁদে ফেলিস, কোলে নিলে মাথায় ওঠবার চেষ্টা করিস। আমি তোর মুখের দিকে চেয়েই বুঝতে পেরেছি তুই এখনো তেমনি সরল আর তেমনি হাবোলা আছিস। হাঁরে, আজকাল চোখে তুই সবসময় গগল্‌স্ পরে থাকিস্ কেন! এক বছরেরও বেশী দেখছি চোখে একটা না একটা আবরণ দিয়ে রাখিস। অথচ চোখ দুটো তোর অস্বাভাবিক সুন্দর যে রে, তাকেই তুই বাইরে থেকে লুকিয়ে ফেলতে চাস?

খোকা। চোখে মাঝে মাঝে যন্ত্রণা হয় একটা, আবছা আবছা দেখি—আর সব সময় লাল হয়ে থাকে। তাই গগল্‌স্ পরেছি।

(শ্রীকৃষ্ণ এসে ঢুকল)

শ্রীকৃষ্ণ। বাবু ফোনে আপনাকে কে ডাকছে।

হালদার সাহেব। আচ্ছা যাচ্ছি, যা। খোকা, সোফারকে বলে গাড়ীটা বের করে নাও—হেঁটে যেয়ো না।

খোকা। বেশীদূর নয়—গাড়ীর দরকার নেই। সামান্য পথ, বাসেই যাবো।

(হালদার সাহেব ও শ্রীকৃষ্ণ এক দিকে এবং খোকা অন্য দিকে বেরিয়ে গেল। কক্ষ কয়েক ঘণ্টার জন্য জনশূন্য। বিকালের পরে শ্রীকৃষ্ণ এসে একটু আধটু গোছগাছ করে গেল। তখন গোস্বামীকে বাইরে থেকে ঢুকতে দেখা গেল এবং দু'তিন মিনিট পরে কালো সুট পরে হালদার সাহেবও এলেন।)

গোস্বামী। হিসাব করে দেখলাম কাল আমার কুড়ি টাকা প্রাপ্য নয়। আঠার টাকা চার আনা আমার অংশ,—এক টাকা বার আনা ফেরেৎ এনেছি। খরচ খরচা বাদে আপনার লাভ তিনশো পঁয়ষট্টি টাকা—five percent আঠার টাকা চার আনা হয়।

হালদার সাহেব। তোমার সততাকে আরো একবার প্রশংসা জানালাম এবং প্রত্যেকবারের মতো এবারও বাকী টাকা তোমার ছেলে-মেয়েদের মিষ্টি কিনে দিও। কিন্তু গোস্বামী, খোকা আজ আমার সামনে কি বলেছে জানো।

গোস্বামী। হালদার সাহেব, সেই দু'ডজন মালের এক্ষুণি দরকার। আমি গুদাম থেকে নিয়ে যাচ্ছি চাবি ত' আমার কাছেই আছে। পরে এসে কথা কইব—রাত্রে।

(গোস্বামী ত্বরিতপদে বেরিয়ে গেল। বাইরে শ্রীকৃষ্ণের গলা পাওয়া গেল, হাঁা, বাবু আছেন বৈঠকখানায়।)

হালদার সাহেব। কে শ্রীকৃষ্ণ?

(বাইরে শ্রীকৃষ্ণের গলা পাওয়া গেল—খোকাদাদাবাবু, কেমন করছেন তিনি।)

হালদার সাহেব। কে? খোকা—এখানে নিয়ে আয়।

(শ্রীকৃষ্ণ খোকাকে ধরে নিয়ে এল, খোকা মাতাল হয়ে এসেছে; চোখে গগল্‌স্ নেই চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল, পা টল্‌ছে, মাথার চুল উস্কো খুস্কো।)

হালদার সাহেব। খোকা—

খোকা। (জড়িতভাবে) কে, বাবা? গোস্বামী যা বলেছেন আমার সম্পর্কে তা অংশতঃ সত্য; আমি তার চেয়ে অনেক নীচে অবতরণ করেছি। Leave all hopes of me.

ওয়েটার বলে দেশী মদ এ, আমাদের দেশেই তৈরী হয়; খুব ভালো, wood alcohol, কোনো ক্ষতি নেই।

(হালদার সাহেব নীরব হয়ে রইলেন। তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথা সরল না, শুধু ইসারায় শ্রীকৃষ্ণকে জানালেন, খোকাকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে। খোকা যাবার সময় শ্রীকৃষ্ণকে বলছে শোনা গেল: চোখ আরো জ্বালা করছে কৃষ্ণ। ভীষণভাবে জ্বলে যাচ্ছে চোখ। তুই সেই ডাক্তারকে ডেকে আন এক্ষুণি—এই নে তার কার্ড, এখানে ঠিকানা লেখা আছে। বুঝলি শ্রীকৃষ্ণ—)

[হালদার সাহেব শুম হয়ে বসে রইলেন। শ্রীকৃষ্ণের বেরিয়ে যাবার শব্দ পর্য্যন্ত কাণে এসে আঘাত করল। তিনি মূঢ়ের মতন কতক্ষণ বসেছিলেন তা নিজেরই খেয়াল ছিল না, গোস্বামী এসে গায়ে হাত দিয়ে ডাকতেই তাঁর খেয়াল হল।]

হালদার সাহেব। গোস্বামী, তুমি আমার সর্ব্বনাশ করেছ! কেন তুমি আমাকে জানালে যে খোকা আমাদের গোপনে তৈরী এই মদ ধরেছে। আমি জানতাম আমার শিক্ষা সাধনায়,আমার মন্ত্রে-তন্ত্রে তাকে দেশের একজন মানুষের লোক করে তুলব। আমি ত' কাল পর্য্যন্ত জানতাম খোকা আমারই আদর্শের পথে অগ্রসর হচ্ছে—এই জানিই থাকতো আমার সর্ব্বস্ব হয়ে, গৌরবের ঐশ্বর্য্য হয়ে। সে নেমে এসেছে এই নরকে, স্খলিত হয়েছে আমার ধ্যানের কেন্দ্র থেকে, কেন জানালে তুমি এ কথা! আমি ত' বেশ জানতাম মা-মরা স্নেহাদৃত অসহায় খোকা আজো আমারই কণ্ঠলগ্ন আছে। গোস্বামী You have murdered me, destroyed me though it is you who have made me rich.

গোস্বামী। ব্যস্ত হবেন না সাহেব।

হালদার সাহেব। (পাগলের মত বাইরের দিকে চোখ পড়তেই) শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ, ডাক্তার বাবু বেরিয়ে যাচ্ছেন যে, আমার কাছে ডেকে আন একবার।

গোস্বামী। এখন ডাক্তারবাবুকে এই ঘরে ডেকে আনা বিশেষ নিরাপদ হবে কি সাহেব? রাত প্রায় বারোটা বাজে!

(শ্রীকৃষ্ণ এবং ডাক্তারবাবু এসে ঢুকলেন, ডাক্তারবাবু প্রৌঢ়, অমায়িক দরদী ভদ্রলোক। বাংলা পোষাক পরা। মাথার চুল কিঞ্চিৎ শাদা হয়েছে, চোখে চশমা।)

ডাক্তারবাবু। শ্রীকৃষ্ণের কাছে সব শুনলাম। কোন উপায় নেই মিঃ হালদার। আপনার ছেলের কাছে জগৎ চিরদিনের জন্য অন্ধকার হয়ে যাবে, ওঁর চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। এই কোলকাতা সহরে কোন দুষমন এসে জুটেছে—দেশের সর্ব্বনাশ করে ছাড়ছে। গোপনে সেই দস্যু এই wood alcohol তৈরী করছে—যা পানের আশু ফল অন্ধ হয়ে যাওয়া। এই দেশেই এই অন্ধতার বীজ উপ্ত হয়েছে, একে সমূলে বিনষ্ট করতে না পারলে দেশের ও দশের কখনও কল্যাণ হবে না। শুধু আপনার ছেলেই আজ অন্ধ হয়ে যায় নি, এমনি শিক্ষিত, সভ্য সম্ভাবনাশীল বহু যুবকই মোহাবিষ্ট হয়ে এই অন্ধত্বকে অস্বীকারের সঙ্গে গ্রহণ করেছে। পুলিশ চেষ্টা করছে সেই চোর ব্যবসায়ীকে ধরবার জন্যে, কিন্তু এখনও সফল হয় নি। আমরা সভ্য-সমাজের জীব—সেই বদমায়েস শয়তান ধরতে আমাদেরও উচিত পুলিশবাহিনীকে সাহায্য করা, কিন্তু আমরা তা ভাবি না পর্য্যন্ত। নিজেদের ব্যক্তিক চেতনা ও স্বার্থকে ঘিরেই মশগুল হয়ে থাকি।

হালদার সাহেব। ডাক্তারবাবু—

ডাক্তারবাবু। কোন উপায়ই নেই মিঃ হালদার। আমি আজ এক বৎসর ওর চিকিৎসা করছি, বিলাতে আমার অধ্যাপকের সঙ্গে পর্য্যন্ত দীর্ঘ আলোচনা করেছি, সব নিষ্ফল হয়েছে। আর কোনো উপায় নেই, আপনার ছেলে অন্ধ হয়ে গেল।

হালদার সাহেব। গোস্বামী, গোস্বামী—you better had not said this to me!

(ঢং ঢং করে রাত বারোটা বাজার শব্দ পাওয়া গেল, এবং সে মুহূর্ত্তেই যবনিকা পড়ল)

———

সাহিত্য ও সমালোচনা

শ্রীননীগোপাল গোস্বামী, বি-এ

সাহিত্য সত্যের সন্ধানী। সত্যই সুন্দর। জাতি সুন্দরের প্রতীক। যে জাতির সাহিত্যে সুন্দরের রূপ যত পরিষ্কার ভাবে প্রস্ফুটিত হয়, সেই জাতিই তত বরণীয়, মহনীয়। যুগে যুগে কত জাতি কতভাবে সৌন্দর্য্য-রস আহরণে নিজের তৃপ্তিসাধন করিয়াছে, তবু ইহার কিছুমাত্র ক্ষয় নাই—এ অনন্ত, নীট্‌শেও বলিয়াছেন,—

"A thousand paths are there which never have been trodden—a thousand salubrities and hidden islands of life still unexhausted and undiscovered is mankind and man's world."

ধর্ম্ম ও সাহিত্য একানুবর্ত্তী। ধর্ম্ম ভিন্ন কোন জাতিই বড় হয় নাই, আবার ধর্ম্ম ভিন্ন কোন সাহিত্যেরই শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই। ব্যাপকভাবে দেখিতে গেলে উভয়ে একই কার্য্যে নিয়োজিত, উভয়েরই উদ্দেশ্য জীবনে সত্যানুভূতি। এই জন্য প্রত্যেক ধর্ম্মের বহিরাবরণ তাহার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি দ্বারাই প্রকাশিত। আবার অন্যদিক দিয়া দেখিতে গেলে ধর্ম্ম অপেক্ষা সাহিত্যদ্বারা মানব-জীবন অধিকতর প্রভাবান্বিত। একটা গল্পের চরিত্র, একটা নাটকের দৃশ্য-বিশেষ, মানব-মনকে যতখানি বিক্ষোভিত করে, একশখানা ধর্ম্মপুস্তক পাঠেও তা' সম্ভব হয় কিনা জানি না। ধর্ম্ম জ্ঞানবৃদ্ধের মত অন্তরে ভয় দেখাইয়া কাজ করাইয়া লয়, আর সাহিত্য "প্রেমসুধায় কানায় কানায় সমস্ত হৃদয় ভরিয়া তোলে।" ধর্ম্ম অন্ধকার হইতে আলোকের পথে টানিয়া আনে, আর সাহিত্য অন্ধকারে আলোকের সৃষ্টি করে।" ধর্ম্ম অন্ধকারকে ছাড়িয়া চলে, আর সাহিত্য তা'র রূপ দেয়। কিন্তু তবু আবার বলিতে হয় যে, "ধর্ম্ম এবং সাহিত্য একই সন্ধানের সন্ধানী। অন্তরের সহিত বাহিরের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। কাজেই যাহার জীবনীশক্তি আছে, সেই তাহার অন্তর্নিহিত পরম সত্যকে বহির্লোকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে পারে।

ইংরাজী শিক্ষা যখন এদেশে প্রচলিত হইল, তখন আমরা তাহার খোসা লইয়াই মাতিয়া উঠিয়াছিলাম—ভিতরের বস্তু আমাদিগকে উদ্বোধিত করিতে পারে নাই। যে হিন্দু-বাঙ্গালী চিরদিনই শৌর্য্যে অর্জ্জুন, বীর্য্যে ভীমসেন, প্রতিভায় ভীষ্মবীর, আত্মোৎসর্গে সীতা-সাবিত্রীর আদর্শের মুখে নিজেকে বিদায় করিয়া দিয়া আসিয়াছে, সে তাহার নিজের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া একেবারে পুরাদস্তুর সাহেব সাজিয়া বসিল। বুঝিতে পারিল না যে, তাহার ধর্ম্ম, কৃষ্টি, সাধনা সবই যেখানে কাব্য-কলায় বিকশিত হইয়া বিশ্বমানবতার বাণী বহন করিয়া আসিতেছে, সেখানে পাশ্চাত্ত্যবাসী তাহার ধর্ম্ম-কর্ম্মকে, 'সেফার্ড জেকব,' 'মোজেস্', 'মার্ক', 'মাথিউ,' Reverend Father-এর ধর্ম্মবক্তৃতা প্রভৃতির জন্য পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। তাই তাঁহাদের নিকট 'Portia', 'Hamlet'-এর চরিত্র অনুসরণ অসম্ভবের চেয়েও অশোভনীয়, Desdemona-কে অনুসরণ দোষনীয় বলিয়াই গণ্য। কাজেই সেখানে বাইবেল নির্দ্দেশিত মতে পৃথকভাবে তাহাদের জীবনপদ্ধতি সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

কিন্তু বাঙ্গালীর ত' তাহা চলিবে না। বাঙ্গালার বহিঃ-প্রকৃতির মধ্যে চিরদিনই একটা গভীর সত্য নিহিত আছে। বাঙ্গালার জল, বাঙ্গালার মাটি, বাঙ্গালার তুলসীবন, বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে ছবির ন্যায় কুটীর-প্রাঙ্গণ, আবার সন্ধ্যা-সমাগমে স্নিগ্ধশ্যাম বনানীর অন্তরালে গন্ধধূপচর্চ্চিত, শঙ্খ ঘণ্টা-মুখরিত তাহার মন্দির-অঙ্গন—সবই যে সেই প্রাণধারারই শতধারায় বিভক্ত হইয়া ভাসিতেছে, চলিতেছে। কাজেই বাঙ্গালী তাহার সাহিত্যের আর কোন রূপ 'চখের সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিলেও তাহার নিজের বলিয়া ধরিবে কি করিয়া? তাই রামায়ণ-মহাভারত—বাঙ্গালীর একাধারে ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য সব কিছুই; সেক্সপিয়রের গ্রন্থাবলী পাশ্চাত্ত্য প্রদেশে তা' নয়।

বাঙ্গালার বুকে একদিন দুর্দ্দিন দেখা দিয়াছিল, তবে যুগ-প্রবর্ত্তক বঙ্গদর্শন সম্পাদকের দারুণ কশাঘাতে বাঙ্গালী নব-পর্য্যায়ে গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছিল। কিন্তু কতকাল পরে আজ আবার সেই দুর্দ্দিনের সূচনা দেখিয়া অনেকে ভীত, সন্ত্রস্ত। বর্ত্তমানে আবার অনেক সাহিত্য রচিত হইতেছে,

কিন্তু তাহা যে কাহার জন্য, কিসের জন্য হইতেছে, তাহা সেই সব পুস্তকের লেখকগণই বলিতে পারেন। যশোলিপ্সা তাঁহাদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে সত্য, কিন্তু সাহিত্য কেবল আকাশেই জাল-বোনা কিনা তাহা তাঁহারা একবারও লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন কি? যে নিজেকেই নিজে বুঝে নাই, সে পরকে বুঝাইবে কি করিয়া? বাস্তব-জীবনের সম্ভাব্যের মধ্যে যাহা নাই, তাহা কি করিয়া পাওয়া যাইবে? যে জীবন আমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত—বহির্লোকে যাহা আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সত্তা মনের মণি-কোঠায় উপলব্ধি না করিয়া শুধু কল্পনা-জল্পনায় লেখনী চালাইলে তাহা ত' কথার কথাই হইয়া থাকে। শ্রদ্ধেয় হেমন্তকুমার সরকার মহাশয় তাই বড় দুঃখেই বলিয়াছেন, "একটা রামছাগল, একটা মর্কট, একটা ভল্লুক যেমন বেদের (বেদিয়ার) অর্থোপার্জ্জনের সম্বল, বাঙ্গালার অনেক নভেলের সম্বল তেমনি একটি বিধবা মেয়ে, একটি মেস্ এবং একটি অকর্ম্মা ছোকরা!...নায়ক-নায়িকার জীবনে crisis আনিতে হইলে লেখক একজনের তীব্র জ্বর ঘটাইয়া বসেন, সেবা-পরায়ণা নায়িকা নায়কের কপালে হাত দিয়া চমকিয়া উঠেন এবং তাড়াতাড়ি হাতপাখা লইয়া জোরে বাতাস আরম্ভ করিয়া দেন। আর সুস্থ অবস্থায় চা করিয়া লুচি ভাজিয়া খাওয়ান।" ইহাই হইতেছে অনেক আধুনিক কথা-সাহিত্যের অন্তরের রূপ।

প্রতিভার কি আত্মপ্রতারণা? কথা-সাহিত্যের সম্বন্ধে যা', কাব্য-সাহিত্য সম্বন্ধেও তাহাই। যে-দেশের কবি একদিন বৈষ্ণব ভাবের ছায়া স্পর্শ না করিয়াও কেবল কল্পনা ও লিপিচাতুর্য্যের বলে 'ব্রজাঙ্গনা' লিখিতে পারিয়াছিলেন, সেই দেশেরই কোন কোন কবির মনে যে আবার নূতন করিয়া সেই ভাবধারা জাগিয়া উঠিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? উপনিষদের ঋষি-কবি হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলেই প্রজ্ঞার জ্যোতিঃতে সেই অখণ্ড সত্যকে ধরিবার জন্যই নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পৃথিবীতে পৃথিবীর চিত্রই বুঝি বিরল! যে মানুষ স্বর্গ-দেবতা উদ্দেশ করিয়াই এতদিন আকুলি-বিকুলি করিয়া আসিয়াছে, সেই শ্রেষ্ঠ মানুষের দিকে বুঝি কেউ একবারও সতৃষ্ণ নয়নে চায় নাই। তাই কবির প্রাণ ব্যর্থতার আকুল-আহ্বানে আজ কাঁদিয়া উঠিল,—

১। "মিসেস পিথেক্যান থ্রোপাস্ ইরেক্টাস (অব জাভা) থেকে
আজকের এমি, অ্যানি, সীতা, গীতা,
নারী সব মেয়েলীতে ভরা,
ব্যক্তিত্বের পাত্তা নেই মোটে।
পিথাগোরাস, প্লেটো, সুইফ্‌ট, ওয়েগুনার—ক্রিশ্চিয়ানিটি
এবং ইবসেন, বৃথাই কাঁদলেন।"

২। "আকাশ ছোঁয়া বিরাট Studio
হাজার power-এর punchlight
Microphone
Camera
তার সামনে ধুতি আর শাড়ী-পরা
মাংসের automobile."

৩। "ধরো দান্তের ই-স্পাতি-সৃষ্টি, খানের ইরাণী
নীল গম্বুজ, রবীন্দ্রনাথের "প্রাণগঙ্গা" কবিতা,
সোভিয়েট কল্পনা, পাশকরে জলপানি,
মোগল বাগান, হিন্দুকুশ, টেলিভিশন, প্রসন্ন মধ্যবিত্তঘর,
চাঁপাগাছ, মিকি মাউস;'

৪। "হও স্ত্রী, হও স্ত্রীলোক—দয়ার শ্বেতদেবী নয়,
নয় ছন্দের সুষমায় ঢালা মহিলা!
অনেক দেখেছি তোমার দয়া—শ্বেত ভালবাসার লীলা—
আর নয়?"

৫। "স্যাকারিনের মতো মিষ্টি একটি মেয়ের প্রেম।
—উজ্জ্বল, ক্ষুধিত জাগুয়ার যেন
এপ্রিলের বসন্ত আজ।"

৬। "কে বুঝেছে সব নয়?—জনতার হৃদয়ের ভীতি
মেধা নয়—সেবা চায়;—তাই ভেঙে ধ্বংসে গেল
অমোঘ সমিতি;—
অশ্বীক্ষার উচ্চারণে রয় কি হাঁসের ডিম মৃত্তিকায় খাড়া?"*

কি সুন্দর ভাবের অভিব্যক্তি? পাঠ করিতে বসিলে শুধু এই কথায় বার বার মনে হয়,—

"কবিতার পাশে আজ গবিতা, যেন সৎমার ছেলে আর মেয়েটি,
ছন্দের বন্ধন নাই যার—কবন্ধ বল্য তায় ক্ষতি কি?"
—দেবনারায়ণ গুপ্ত

এই শ্রেণীর কবিতার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উপস্থিত

* এই কবিতাগুলি 'শনিবারের চিঠি' হইতে উদ্ধৃত হইল। (দ্রষ্টব্য শঃ চিঃ কার্ত্তিক, ১৩৪৭, পৃঃ ১৪২-৪৩)

হইলে যাঁহারা ইহার পোষকতা করেন, তাঁহারা 'art' ও 'psychology' রূপ দুইটি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। কিন্তু 'art'এর গতি যে কত দিকে ধাবিত হইতে পারে তাহা একবারও তাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি? 'আর্টের' কল্যাণে মহাকাব্য রচিত হইতে পারে; আবার যিনি মজবুত লোহার সিন্দুক বেমালুম খুলিয়া ধন-দৌলৎ অপহরণ করিতে পারেন, তাঁহাকেও আর্টের কম কৌশল শিক্ষা করিতে হয় নাই। 'যে বায়ুর অবস্থান আলোকের প্রাণ, সেই বায়ু একটু জোরে বহিলে প্রদীপ নিভাইয়া দেয়, আবার ঐ বায়ু-স্রোতই যন্ত্রসাহায্যে অধিকতর বলে প্রয়োগ করিয়া কর্ম্মকার লোহা গলাইয়া লয়।' যৌন-বিহারের নিখুঁৎ চিত্রের প্রতি কয়জন লোকে ভক্তি-বিহ্বল নেত্রে চাহিয়া থাকিতে পারে? এমন কি শ্রীমৎ তৈলঙ্গ স্বামী, যাঁহার দেহবেধ-জ্ঞান কিছুই ছিল না বলিয়া জানা যায়, তিনিও কোনদিন কাশীর চকের পথে নগ্ন মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। অনেকে হয় ত' বলিবেন যে, সৌন্দর্য্য সৃষ্টিই কলাবিদের উদ্দেশ্য, নীতির সঙ্গে তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। ইহার উত্তরে রসরাজ-অমৃতলাল বসু মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন যে,—"সুস্থ, সবল, তীব্র জারকশক্তি যাঁহার জঠরের অনলকে জাগাইয়া রাখিয়াছে, তিনি তাঁহার নিজের বাড়ীতে বসিয়া বিবিধ অন্ন-পদার্থের সাহায্যে যতদূর ইচ্ছা রসনার তৃপ্তিসাধন করিতে পারেন; কিন্তু কাসুন্দি চাটিতে চাটিতে হাঁসপাতালের জ্বরগ্রস্ত রোগীর বিভাগে বেড়াইবার তাঁহার কোন অধিকার নাই।" জ্ঞান ও বিজ্ঞান আমাদিগকে যথেষ্ট দিয়াছে সত্য, তবু সেই এক ক্ষুদ্র আলোক কণিকার জন্যই আবার মানুষ কাঁদিয়া মরে। তাই বলিতেছি যে, শুধু জ্ঞান নহে, প্রজ্ঞায় সমুজ্জ্বল হইয়া আসল রূপদক্ষের মত আমাদের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, তবেই আমাদের কাব্য-কলা আবার অক্ষয় অনন্ত রত্নমালায় বিভূষিত হইয়া উঠিতে পারিবে, জননী সরোজবাসিনীর পূজা সার্থক হইবে। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও বলিয়াছেন,—"ভারতবর্ষে ঈশ্বরের দেওয়া কি কি সম্পদ্ আছে তাহা যদি আবার ভারতবাসিগণ চিনিয়া লইতে পারেন এবং ঐ ঐ সম্পদের সদ্ব্যবহার কি করিয়া করিতে হয় তাহা যদি তাঁহারা আবার চিন্তা করিয়া ঠিক করিতে পারেন, তাহা হইলে আবার পৃথিবী অবনতির চরমাবস্থা হইতে উন্নতির উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিবে।"

(লেখকের মতামত তাঁহার নিজস্ব,—বঃ সঃ)

মুক্তি-মন্ত্র

শ্রীযতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

'মুক্তির' মোহিনী-মন্ত্র মৃদু মন্দ সুরে,
হেমন্তের তরুশাখা মুঞ্জরিত করি,
বিশ্বের বিক্ষিপ্ত কক্ষে নব মূর্ত্তি ধরি,
বহিতেছে আনমনে, সম্মুখে অদূরে।

কহিতেছে নরনারী আকুলিত মনে
'মুক্তি চাই,' 'মুক্ত কর,' এ কারা বন্ধন,
ঐশ্বর্য্য সম্পদ লহ, লহ এ জীবন;
তবুও লভিতে দাও 'মুক্তি' সন্ধিক্ষণে।

নাহি চাহে তারা দম্ভ, অফুরন্ত ধন,
নাহি চাহে জাতি বর্ণ, দ্বেষ, দৈন্য, ক্লেশ,
বাস্তবের স্পর্শ চাহে, চাহে না স্বপন,
হাহাকার পুনঃ আর চাহে না অশেষ।

বাজে মন্ত্রে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনার বাণী,
ম্লান হয়ে আসিতেছে বিশ্বে হানাহানি।



বিজ্ঞান জগৎ

বেলুন

অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র, বি-এস্‌-সি (লণ্ডন)

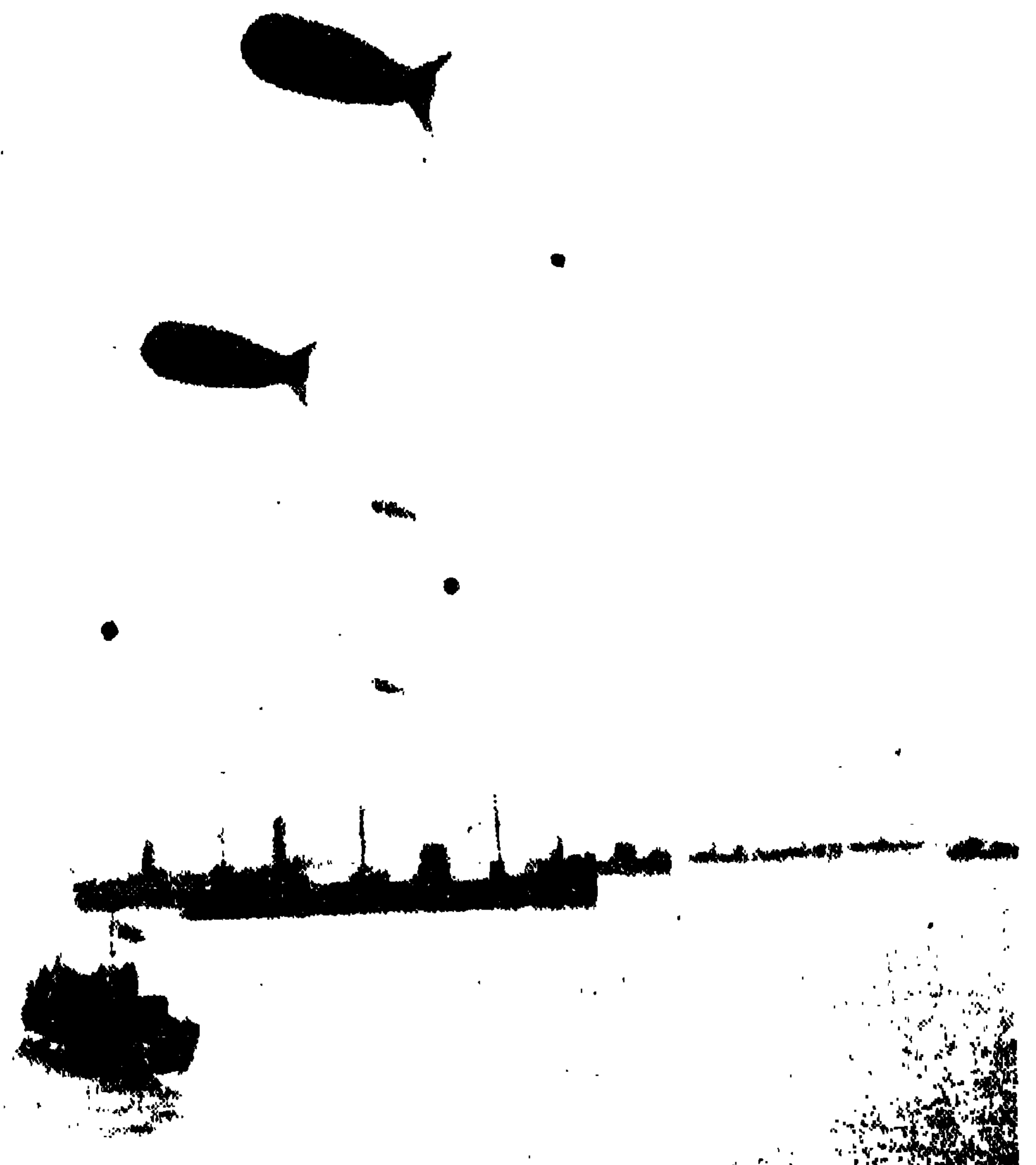
শত্রুর এরোপ্লেনের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার যতগুলি উপায় প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে 'বেলুন ব্যারাজে'র ব্যবহার অন্যতম। সারি সারি বেলুন তার দিয়া নিচে বাঁধিয়া উচ্চে উড়াইয়া রাখিলে তাহারা একটী প্রতিরোধক প্রাচীরের মত কার্য্য করে, এই জন্য তাহাদের ব্যারাজ (barrage) বা প্রাচীর বলা হয়।

বেলুন ব্যারাজের উদ্দেশ্য এরোপ্লেনের ডাইভ্ বোমা নিক্ষেপ (dive bombing) ব্যর্থ করান। এরোপ্লেন খুব উচ্চ হইতে বেগে মাটির নিকট নামিয়া আসিয়া বা ডাইভ্ করিয়া পুনরায় উর্দ্ধে উঠিবার মুহূর্ত্তে বোমা নিক্ষেপ করিলে তাহাতে লক্ষ্যবস্তু ঠিকমত আঘাত করার সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে। বেলুন ব্যারাজের বেলুনগুলি এইরূপ ডাইভ্ বোমা নিক্ষেপে অন্তরায় সৃষ্টি করে। বেলুনগুলিকে সাধারণতঃ মাটি হইতে ৫০০০ হাজার ফিটের মধ্যে উড়াইয়া রাখা হয়। এই ৫০০০ হাজার ফিটের মধ্যে কোনও এরোপ্লেন ডাইভ্ করিবার চেষ্টা করিলে বেলুনের সহিত কিংবা বেলুনবাঁধা তারের সহিত ধাক্কা লাগে এবং এই ধাক্কার ফলে জখম হইয়া মাটিতে পড়ে।

এই স্থানে বলিয়া রাখি যে, বেলুন ব্যারাজ ব্যতীত এরোপ্লেনের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার আরও দুইটী উপায় আছে—ফাইটার প্লেন (fighter plane) ও বিমানধ্বংসী কামান (anti-aircraft gun)। কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকেরই ব্যবহারের একটু তারতম্য আছে। মাটি হইতে ৫০০০ হাজার ফিট পর্য্যন্ত উর্দ্ধে বেলুন ব্যারাজ, ৫০০০ ফিট হইতে ২০,০০০ ফিট পর্য্যন্ত বিমান-বিধ্বংসী কামান এবং ২০,০০০ ফিটের উর্দ্ধে ফাইটার্ প্লেন্ সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী হয়। বিমানধ্বংসী কামান ৫০০০ ফিটের নিচে অধিকাংশ সময় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তাহা ছাড়া এরূপ নিচে এই সকল কামানের গোলার টুকরা গৃহাদির উপর পড়িয়া অনিষ্ট সৃষ্টি করে এবং লোক জখম করে। অপর পক্ষে এই সকল কামানের গোলা ২০,০০০ ফিটের উপর উঠিতে পারে না। কাজেই ৫০০০ ফিট হইতে ২০০০০ ফিট পর্য্যন্ত উর্দ্ধে শত্রুর এরোপ্লেন থাকিলে এই সকল কামান কাজে লাগে। ৫০০০ ফিটের নিচে বেলুন ব্যারেজ ও ২০০০০ ফিটের উচ্চে ফাইটার প্লেনের সাহায্য লইতে হয়।

প্রয়োজন মত 'বেলুন ব্যারাজ' সমুদ্রগামী কনভয়ের (convoy-র) জাহাজের সঙ্গেও লাগান থাকে। শত্রুর এরোপ্লেন জাহাজের উপর যাহাতে ডাইভ্ বোমা নিক্ষেপ করিতে না পারে, সে জন্য জাহাজ হইতে তার দিয়া বেলুন উড়াইয়া রাখা হয়।

বেলুনগুলি সাধারণতঃ হাইড্রোজেন (hydrogen) গ্যাস দিয়া ভর্ত্তি করা হয়। হাইড্রোজেন গ্যাস হাওয়ার তুলনায় অধিকতর হাল্কা বলিয়া বেলুন ঘুঁড়ির ন্যায় আকাশে উড়িতে থাকে। এই কারণে ইহাদের ঘুঁড়ি বেলুন (kite balloon) বলা হয়। বেলুনগুলির লেজের দিকে তিনটী করিয়া মাছের ডানার ন্যায় পুচ্ছ থাকে। এই পুচ্ছগুলি থাকার জন্য বেলুন হাওয়ার গতির দিকে মুখ করিয়া স্থিরভাবে আকাশে উড়িতে থাকে, পুচ্ছগুলি না থাকিলে ইহা লাটুর ন্যায় ঘুরিতে থাকিত এবং বাঁধিবার তারগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিত। আগেকার বেলুন গোলাকৃতি বা পেয়ারার ন্যায় আকৃতির



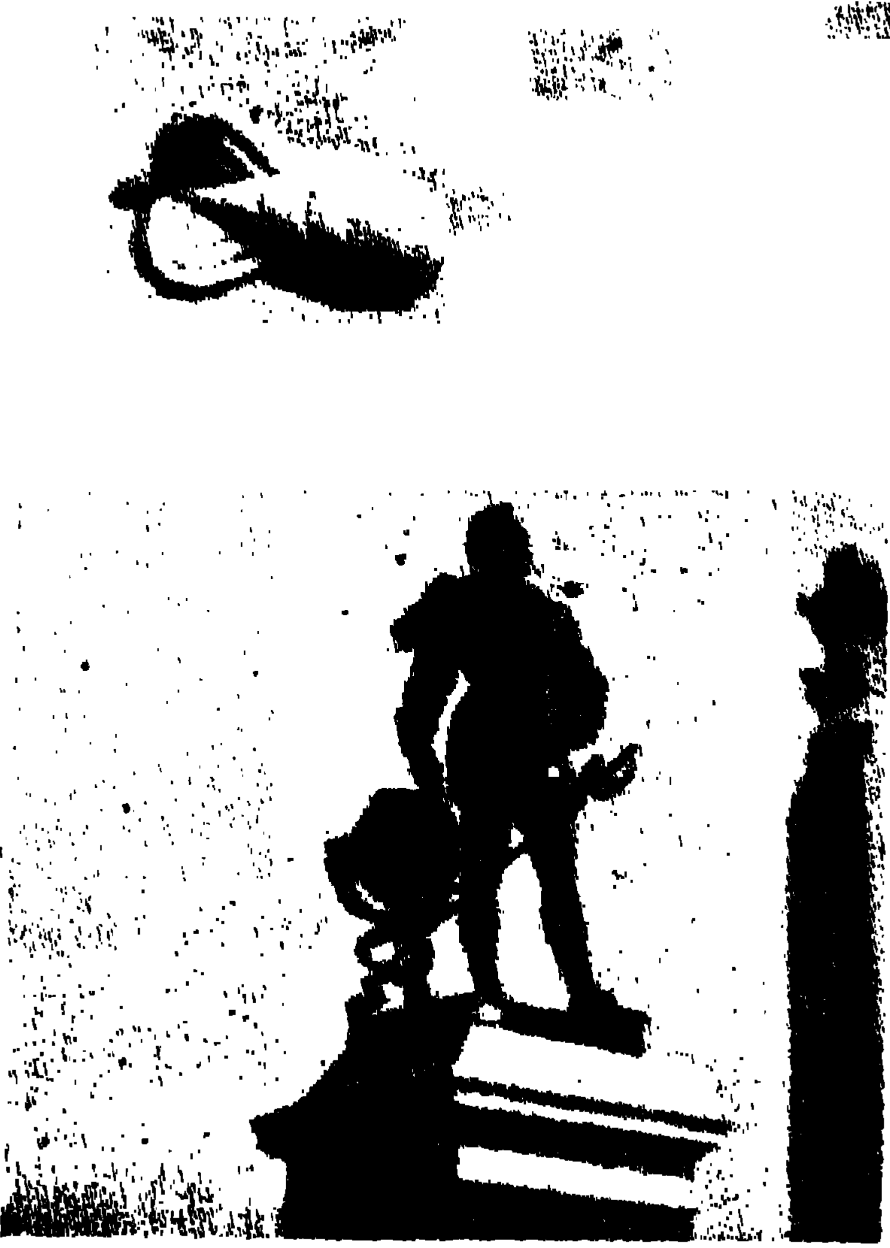
বেলুন-ব্যারাজ

হইত কিন্তু সে বেলুনকে ছাড়িয়া না দিয়া মাটির সহিত তার দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে হাওয়ার জোরে উহা এরূপ ঘুরিত যে অনেক সময় তার ছিঁড়িয়া

যাইত। সেই কারণে আজকাল বেলুনকে মৎস্যাকৃতি করা হয় এবং পিছনে তিনটী পুচ্ছ লাগাইয়া দেওয়ার ফলে উহা স্থিরভাবে উপরে থাকে। জলের মধ্যে মাছ যেমন ভাসিয়া বেড়ায়, হাওয়ার মধ্যে বেলুনও তেমনি ভাসিতে থাকে।

বেলুনগুলির গাত্র হইতে ঝালরের ন্যায় কয়েকটি তার ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, ইহাকে এ্যাপ্রন (apron) বলে। অনেক সময় এরোপ্লেন বেলুনের সংস্পর্শ এড়াইতে পারিলেও এই এ্যাপ্রনের জালে জড়াইয়া পড়ে এবং জখম হয়। বেলুনগুলিকে ইচ্ছামত উঠাইবার ও নামাইবার জন্য উহাদের তার দিয়া বাঁধিয়া সে তারগুলি একটী তার গুটাইবার যন্ত্রের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হয়। এই যন্ত্রের নাম উইঞ্চ (winch), ইহা মোটরের দ্বারা চালিত। ইহা দ্বারা তার গুটান ও তার ছাড়া খুব শীঘ্র সম্পাদিত হয়। জাহাজের নোঙর গুটাইবার জন্য যে প্রকার উইঞ্চ ব্যবহার করা হয়, বেলুনের তার গুটাইবার জন্য সেইরূপ উইঞ্চ ব্যবহৃত হয়। বেলুনগুলিকে যাহাতে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইতে পারা যায়, সে জন্য উইঞ্চ যন্ত্রটীকে অনেক ক্ষেত্রে মোটর ট্রাকের (motor truck) উপর বসান হয়। নদী থাকিলে মোটর ট্রাকের পরিবর্তে ষ্টীমলঞ্চেও উইঞ্চ বসান হয় এবং লঞ্চের অবস্থিতির পরিবর্তন করিয়া বেলুন ব্যারাজের আকৃতির পরিবর্তন করা হয়।

বেলুন ব্যারাজ ব্যতীত অন্যান্য অনেক কাজেই বেলুন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে বেলুন শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিবার কার্য্যে যথেষ্ট



বন্দী বেলুন

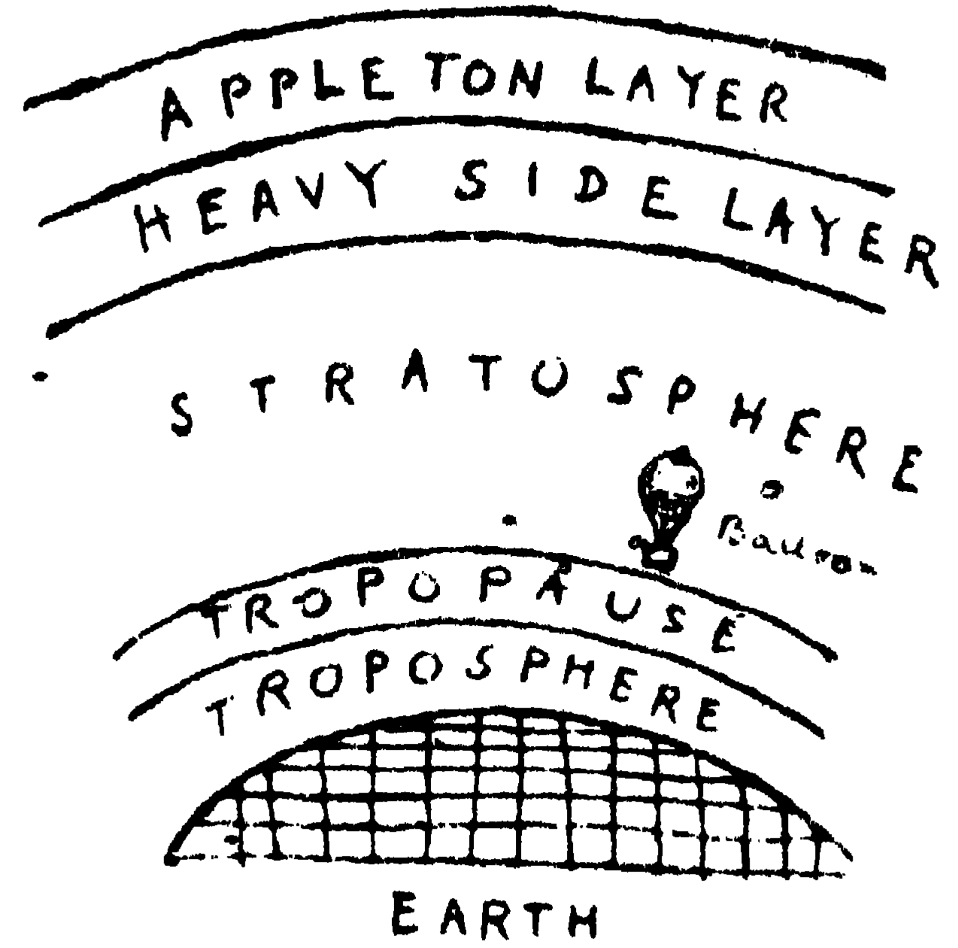
উপকারে আসে। এই সকল বেলুনগুলি ব্যারাজের বেলুনের অপেক্ষা আকৃতিতে বৃহৎ। এই বেলুনের নিচে একটী দোলার মত বাস্কেট ঝোলান থাকে, সেই বাস্কেটে একজন সঙ্কেতকারী সৈনিককে চড়াইয়া বেলুনটিকে আকাশে তোলা হয়। যে তার দিয়া বেলুনটী মাটিতে বা মোটরট্রাকে বাঁধা থাকে সেই তারের সঙ্গে টেলিফোনের একটী তারও জড়ান থাকে। বেলুনের সৈনিকটীর নিকট একটী দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও একটী টেলিফোন থাকে। সেই টেলিফোনের সাহায্যে সৈনিকটি উপর হইতে শত্রুর গতিবিধির খবরাখবর নিয়ে পাঠায়। দূর হইতে শত্রুর উপর কামান ছুঁড়িবার পূর্ব্বে শত্রুর গতি-বিধির এইরূপ সন্ধান পাওয়া যাইলে লক্ষ্য স্থির করিবার পক্ষে খুবই সাহায্য হয়। এই সকল বেলুনকে অব্জারভেশন্ বেলুন (observation balloon) বলে। সমুদ্রগামী জাহাজের সঙ্গেও অনেক সময় এইরূপ বেলুন থাকে। সাবমেরিন্ আক্রমণ হইতে বাঁচিবার জন্য জাহাজ হইতে এইরূপ বেলুন উড়াইয়া রাখা হয়। সাবমেরিন্ কাছাকাছি আসিলে বেলুন হইতে লক্ষ্য করা খুবই সহজ হইয়া পড়ে, কেন না বেলুনগুলি জাহাজের ওয়াচ্ টাওয়ার (watch tower) বা লক্ষ্যমঞ্চ হইতেও অনেক উচ্চে থাকে। যুদ্ধ জাহাজে এই প্রকার বেলুনের সাহায্যে সাবমেরিনের অবস্থিতির ঠিকমত খোঁজ লইয়া ডেপ্‌থ চার্জ্জ (depth charge) বা সাবমেরিন্ ধ্বংসকারী গোলা ছোঁড়া হয়।

ব্যারাজের বেলুন ও অবজারভেশন্ বেলুন উভয়কে বন্দী বেলুন (captive balloon) বলা হয়, কেন না উহারা তার বা চেন দিয়া মাটিতে বাঁধা থাকে। এই প্রকার বেলুন ব্যতীত মুক্ত বেলুনেরও (free balloon) ব্যবহার অনেকক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। আবহাওয়া নির্দ্দেশকার্য্যে ও বায়ুর উপরস্থিত স্তরগুলির সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকার্য্যে এই সকল মুক্ত বেলুন যথেষ্ট সাহায্য করে। বেলজিয়মের প্রখ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ডাঃ পিকার্ডের বেলুন ভ্রমণের কথা অনেকেরই কাছে বিদিত আছে। ১৯৩২ সালে ডাঃ পিকার্ড বেলুনে চড়িয়া প্রায় ১০॥০ সাড়ে দশ মাইল উচ্চে আরোহণ করেন। ডাঃ পিকার্ডের উদ্দেশ্য ছিল বায়ুর উচ্চস্তরের অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা। মাটি হইতে প্রায় ৫ মাইল ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত বায়ুস্তরকে বৈজ্ঞানিকগণ 'ট্রপোস্ফিয়ার' (troposphere), ৫ মাইল হইতে প্রায় ৭ মাইল পর্য্যন্ত স্তরকে 'ট্রপোপজ' (tropopause) এবং তদুপরি বায়ুস্তরকে 'ষ্ট্রাটোস্ফিয়ার' (stratosphere) বলেন। এই শেষোক্ত ষ্ট্রাটোস্ফিয়ার প্রায় ২৫ মাইল চওড়া বেল্টের ন্যায় পৃথিবীর ঊর্দ্ধ বায়ুস্তর বেষ্টন করিয়া আছে। ষ্ট্রাটোস্ফিয়ারের উপর পর পর আরও দুইটী স্তর আছে, তাহাদের নাম হেভি সাইড স্তর (heavyside) ও এ্যাপল্‌টন্ স্তর (appleton)। ডাঃ পিকার্ড ষ্ট্রাটোস্ফিয়ার সম্বন্ধে তথ্য আবিষ্কারের জন্য নানা প্রকার যন্ত্রপাতি লইয়া বেলুনে করিয়া ঊর্দ্ধে আরোহণ করেন। ডাঃ পিকার্ডের বেলুনের গ্যাসের থলিটির নিচে একটী গোলাকৃতি এলুমিনিয়মের তৈয়ারী গণ্ডোলা (gondolla) বা নৌকার মত ঘর ঝোলান ছিল, তাহাতে কাঁচের জানালা ছিল। ডাঃ পিকার্ড একজন সঙ্গীর সহিত এই এলুমিনিয়মের ঘরের ভিতর বসিলে বেলুনটিকে উপরে উঠিতে দেওয়া হয়। ঘরটির ভিতর বসিয়া ডাঃ পিকার্ড যন্ত্রপাতির সাহায্যে বহু নূতন তথ্য সংগ্রহ করেন এবং ১২ ঘণ্টা উপরে থাকিয়া পুনরায় নিচে নামিয়া আসেন। উপরের বায়ুস্তর খুব পাতলা বলিয়া ডাঃ পিকার্ডকে শ্বাসপ্রশ্বাসের সাহায্যের জন্য সঙ্গে অক্সিজেন সিলিণ্ডার লইয়া যাইতে

হইয়াছিল। ডাঃ পিকার্ডের পূর্ব্বে ও পরে অন্যান্য অনেক বৈজ্ঞানিকই উপরের বায়ুস্তর সম্বন্ধে গবেষণার জন্য বেলুনে চড়িয়া উপরে উঠিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়েন, কেহ কেহ বেলুন ছিঁড়িয়া যাওয়ায় বা আগুন লাগিয়া যাওয়ায় প্রাণ হারান—বিজ্ঞানের জন্য এরূপ স্বেচ্ছাগৃহীত নিগ্রহের উদাহরণ বহু দেখিতে পাওয়া যায়।

বেলুন-দুর্ঘটনায় প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকায়, অনেকক্ষেত্রে আরোহী না লইয়া বেলুনকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই সকল বেলুনের মধ্যে এরূপ যন্ত্রপাতি রাখিয়া দেওয়া হয়, যাহা আপনা হইতেই উত্তাপ, শৈত্য, উচ্চতা, হাওয়ার চাপ, হাওয়ার জলীয়তা প্রভৃতি বিষয় প্রদর্শন করে। বেলুন অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া পরে যখন নামিয়া আসে, তখন এই সকল যন্ত্রপাতি বাহির করিয়া লইয়া বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের প্রদর্শিত তথ্যগুলির আলোচনা করেন। এইরূপ চালকহীন (unmanned) বেলুন আবহাওয়ার অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য নির্দ্ধারণের কার্য্যে যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এরোপ্লেন ও জেপেলিন্ আবিষ্কারের পূর্ব্বে বেলুন এক দেশ হইতে অন্য দেশে গমনের কাজে লাগিত। জুল্ ভার্ণ (Jules Verne) নামক বিখ্যাত ফরাসী লেখকের পুস্তকে বেলুন ভ্রমণের যে কাল্পনিক চিত্র আছে, তাহা অনেকেই পড়িয়াছেন। কিন্তু এইরূপ বেলুন ভ্রমণ বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। আজকাল দেশ ভ্রমণের জন্য এরোপ্লেনই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।



পৃথিবীর উপর বিভিন্ন বায়ুস্তর

আকাশ

শ্রীরবি চক্রবর্ত্তী

হৃদয়মাঝে দেখছি হঠাৎ আকাশখানার ছোট্ট রূপ,
নীরব নিঝুম সকল দিকেই বাতাস কেনই নিথর চুপ?
কখন্ দেখি শরৎরাণী জ্বালায় এসে রঙের দীপ,
হঠাৎ কাহার পরশ পেয়ে উঠল নেচে বনের নীপ?
আকাশখানা হয়ে গেল উদার বিপুল আলোকময়,
কাহার বাঁশী কানায় কানায় আনন্দেরই বার্ত্তা বয়।
শরৎরাণী পালায় কখন্ ছুটে আসে শীত-বাতাস,
রঙ সায়রে ফুরায়ে গেল নূতন যতো নায়ের রাশ।
আকাশখানার আলো নিভে হয়ে যে যায় রঙ ধূসর,
বিহঙ্গের ঐ পাখার আওয়াজ শোনায় যেন করুণতর।
বসন্তেরই দখিণ আশা আবার তোলে মধুর তান,
মুক্তি-মহাসাগর হ'তে ছোটে বুঝি ছুটির বান।

আবার হঠাৎ দেখনু একি তীব্র তেজের অগ্নিধার,
পুড়ে সবই খাঁক্ হোল যে রূপমাধুরী আকাশটার।
তারপরেতেই গলে গিয়ে উষ্ণতার এ তীব্র ঝাঁজ;
বাদল বাউল বাজায় মাদল, চলে বৃষ্টিধারার নাচ।
অশ্রুজলে দুঃখতাপে জর্জ্জরিত আকাশ তাই,
জানায় বুঝি দুঃখকাশে অভাগাদের বেদনটাই।
তাইতো বলি, আকাশ ওগো, দিয়ে তোমার সুখ ও দুখ,
হৃদয়মাঝে সবার কেন উদারতায় ফেরাও মুখ?
রঙ্‌টা তোমার অশ্রুধারা, সবার মাঝেই বাঁধল ঘর,
তোমার মতো আকাশ তবু, ভুললো না সব আপন-পর?



ভিখারী

শ্রীঅবনীকান্ত ভট্টাচার্য্য

অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে বিহরে
জটাপুটে যার গঙ্গা,
ভিখারী সে আজ ভিখারী!
কুটিল-সর্প জড়িত শিখরে
উন্নত মহাশঙ্কা;
ভিখারী আমার ভিখারী।
রজত শুভ্র বর্ণ
ধুতুরা ভূষিত কর্ণ,
চরণে বিল্ব-পর্ণ,
ভাব-বিহ্বল কান্তি!
কটিতটে কই বাঘছাল,
ডম্বরু-নাদে নাচে কাল
ভৈরব-রবে বাজে গাল,
হিন্দোল-তালে ক্লান্তি?

শশীমৌলীর বৃষভ সহসা
গিরিশিলা রোষে উপাড়ে,
ভিখারী আমার ভিখারী।
ত্যজিয়া নন্দীভৃঙ্গি বচনা
ধূলিতলে তনু আছাড়ে।
ভিখারী আমার ভিখারী।
অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে বিহরে
জটাপুটে যার গঙ্গা
ভিখারী সে আজ ভিখারী।
অনশনে তনু জরিছে,
বিগলিত ধারা ঝরিছে,
বিস্মৃতি জ্ঞান হরিছে
ধ্বনিত মন্ত্র হা সতি!
শঙ্কর একি আচরণ
পথে প্রান্তরে বিচরণ,
নাই আভরণ আবরণ,
ত্রিলোচন একি মুরতি?
ধূর্জ্জটি তব দুর্জ্জয় ক্রোধ
সম্বর ধর ধৈর্য্য,
ভিখারী আমার ভিখারী।
কোথা গেল তব সম্ভ্রম-বোধ
হারালে সকল স্থৈর্য্য!
ছি, ছি, ছি, মলিন ভিখারী!
অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে বিহরে
জটাপুটে কলগঙ্গা,
ভিখারী সে আজ ভিখারী।
ভোলানাথ ঝোলা অঙ্কে
কি যাচ' নর-করঙ্কে?
ধূলায় মলিন পঙ্কে
অঙ্গের করি' বিভূতি;
সতীহারা পশুপতি হায়!
সতি সতি কহি' মুরছায়,
সে রোদন-রোল শোনা যায়—
করুণ কাতর আকুতি!
অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে বিহরে
জটাপুটে যার গঙ্গা,
ভিখারী সে আজ ভিখারী।

জটিলতা

শ্রীকল্যাণী রায়চৌধুরী

কয়েক বৎসর পূর্ব্বের মত সহজ সরল গতি সমীরের জীবনে আর নেই। কিছুই সে একমনে করিতে পারে না। অতৃপ্তিতে তাহার মন বিষাইয়া ওঠে। কঠিন জটিলতা তাহাকে অক্টোপাশের মত জড়াইয়া ধরিয়াছে। কোনটাকেই সে উপেক্ষা করিতে পারে না—দুইটাই যেন তাহার কাছে সমান প্রধান। স্ত্রী না-হয় দুইদিন না খাইয়া থাকল—কিন্তু তাহার অতটুকু মেয়ে, বুকের মাণিক, সে যে আজ দুইদিন না খাইয়া আছে। হঠাৎ তাহাকে কে যেন চাবুক মারিল। আজ দুইদিন সে এমনই তন্ময় হইয়াছিল যে; নিজে খায় নাই সে হুঁসও তাহার ছিল না, মনে পড়িতেই হাতের কাজ ফেলিয়া ল্যাবরেটারি হইতে তাহার জরাজীর্ণ বাসাটীর দিকে ছুটিল।

ল্যাবরেটারি আর সমীরের বাসা পাপাশাশি—একটু জোরে কথা কহিলে প্রায়ই শোনা যায়। সমীর আজ বছর চারেক হইল ভালভাবে এম-এস-সি পাশ করিয়াছে। ক্লাসে সে সব চেয়ে ধারাল ছেলে ছিল। রিসার্চে তাহার মাথা খেলে খুব—আর আগ্রহও অসাধারণ। এম-এস-সি ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়াই সে বিধবা মায়ের একান্ত আগ্রহ ও অনুরোধে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছে। মা তাহার সমস্ত পুঁজি প্রায় নিঃশেষ করিয়া ছেলেকে পড়াইয়াছেন। আজ তিন বৎসর হইল তাহারও গঙ্গাপ্রাপ্তি হইয়াছে। বিজ্ঞান চর্চ্চায় এক প্রকার উন্মত্ত সমীর স্ত্রীর গায়ের গহনা হইতে আরম্ভ করিয়া আর সমস্ত কিছুই খোয়াইয়াছে। ধার-কর্জ্জ আর কে কতদিন দিতে পারে? বন্ধুরাও একে একে জবাব দিয়াছে।

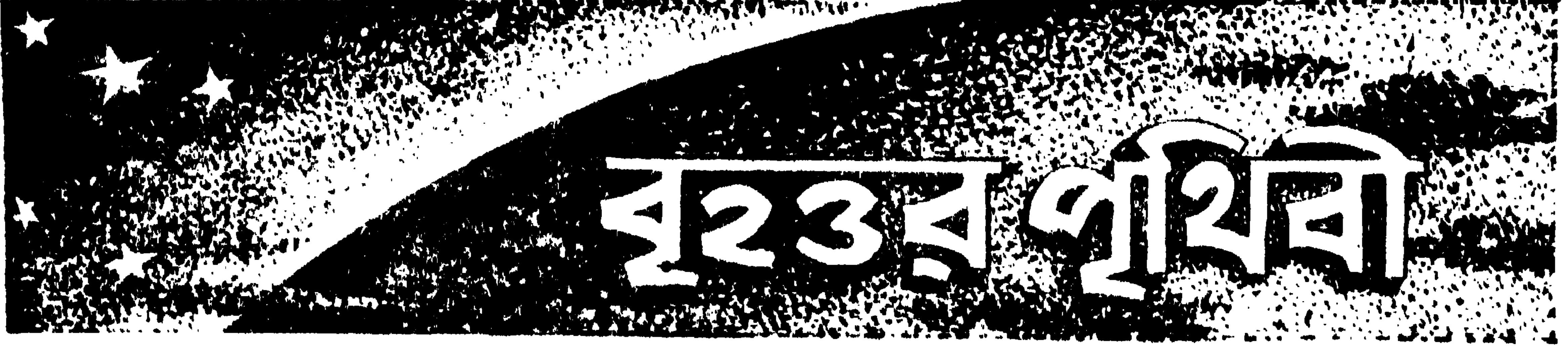
ল্যাবরেটারিতে আসিয়া সমীরকে দেখিলে মনে হয়, রিসার্চই তাহার আজন্মের সাধনা—আর কোনদিকেই তাহার কোন খেয়াল নাই। কিন্তু মাঝে মাঝে নিজেরও অজান্তে একটী করিয়া দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া পড়ে।

নিঃশব্দে সে বাহিরের ভেজান দরজাটী খুলিল। কিন্তু অদ্ভুত! শত আঘাতের মধ্যেও আবিষ্কারের চিন্তা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। রিসার্চটী শেষ হইয়া গেলে কি তৃপ্তি, কি আনন্দ, কেমন জগৎজোড়া খ্যাতি সে পাইবে! তখন অর্থেরও অভাব হইবে না। তাহার মেয়ে—তাহার সোণামণিকে প্রাণ ভরিয়া খাওয়াইবে, পরাইবে; বৌকে মনের মতন করিয়া সাজাইবে। ধীরে অতি ধীরে সে মেয়ের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল—গায়ে একবার হাত দিবার, একটী স্নেহচুম্বন দিবার অধিকারও যেন তাহার নাই। ক্ষুধার্ত্ত নির্জ্জীব মেয়েটীর কাঁদিবার শক্তিও বহুপূর্ব্বেই ফুরাইয়া গিয়াছে। পাশেই তাহার স্ত্রী একটুকরা কাপড় দিয়া দেহ ঢাকিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও অৰ্দ্ধনগ্ন অবস্থায় চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে, যেন কাহারও বিরুদ্ধে তাহার কোন অভিযোগ নাই। সমীরের বুকের ভিতরটা কে সজোরে মুচড়াইয়া দিল।

নিশ্চল পাথরের মত এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। এইবার তাহার মাথায় খুন চাপিয়াছে—যে করিয়াই হোক টাকা তাহার চাই-ই। তাহার সোণামনিকে বাঁচাইতে হইবে, বৌকে—কিন্তু কোথায় চলিয়াছে সে? সহসা সে থামিল, কি একটা জিনিষের উপর সে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। এতদিন পরে কি একটা অমূল্য রত্নের সন্ধান যেন সে পাইয়াছে। সে আবার ছুটিল ল্যাবরেটারির দিকে।

আবার সে তন্ময় হইয়াছে তাহার একান্ত সাধনায়—অধিকতর উৎসাহে, শুধু তাহার দুর্ব্বল ও অবসন্ন হাত দু'খানি দিয়া মাঝে মাঝে আহত বুকখানা চাপিয়া না ধরিয়া পারিতেছে না।

অতি অপ্রত্যাশিত ও নিষ্ঠুরভাবে তাহার সাধনা ভঙ্গ করিল তাহার স্ত্রীর বুকফাটা আৰ্ত্তনাদ! হায়! এমনি করিয়া এ দুর্ভাগা দেশের কত রত্ন নষ্ট হইতেছে তাহার হিসাব কে রাখে?



আধুনিক জগতের বিভিন্ন মতবাদ

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

আজ পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের দৃষ্টি একটা বিষয়েই নিবদ্ধ হয়েছে—বর্ত্তমান বিশ্বসংগ্রামে। যে দিকেই সে তাকায়, দেখে যুদ্ধ—সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যুদ্ধ বেধেছে নাৎসীবাদের, যুদ্ধ হচ্ছে নাৎসীবাদের সঙ্গে গণতন্ত্রবাদের। দিন যত চলেছে এগিয়ে, মানুষের মধ্যে ততই সৃষ্টি হচ্ছে নূতন নূতন মতবাদ, আর হানাহানিরও অন্ত নেই তাদের মধ্যে। কিন্তু কি এই মতবাদ, যার জন্ম মানুষ আজ দলে দলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিচ্ছে? কয়েক হাজার বছর যদি আমরা পেছিয়ে যাই তা হলে দেখি এ সব মতবাদের বালাই তো তখন ছিল না মানুষের মধ্যে, জীবনটাকে নিয়েও তো তারা তখন এমন ভাবে মরণের নেশায় মেতে উঠত না!

রজনীর অন্ধকারের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির উষালোক যখন প্রথম ধীরে ধীরে নয়ন মেলছিল, তখন আমরা মানুষকে দেখি তার আদিম অবস্থায়। নগ্ন দেহে, কাঁচা মাংস আহার ক'রে, দল বেঁধে বেড়াত তারা। সংগ্রাম তাদের করতে হ'ত—তবে সে প্রকৃতির সঙ্গে, আত্মরক্ষার জন্যে। বিভিন্ন দলের মধ্যেও ঝগড়া তাদের বাধত, আবার নিজ দলের মধ্যেও দেখা দিত হানাহানি। এই দ্বন্দ্বের মূলে নিজ আধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। তারপর কাল চলল এগিয়ে, এল ধাতু—সোনা, রূপো, লোহা, নূতন অস্ত্র হ'ল তৈরী, সৃষ্টি হ'ল দলপতির, আবিষ্কার হ'ল চাষ বাস, দেখা দিল ধর্ম্ম। মানুষের বসবাস হ'ল প্রধানতঃ নদীতীরে। আরও কিছু দিন কাটল, দেখা গেল দলপতি হয়েছে রাজা। আর একটা জিনিষ স্পষ্ট ক'রে তখন চোখে পড়ল—মানুষের মধ্যে শ্রেণীভেদ। একটা দল তখন ধনের মালিক, রাজা এবং রাজপুরুষরা; আর একদল করে পরিশ্রম। এই শ্রমজীবীদের মধ্যে একটা ভাগ হচ্ছে ক্রীতদাস।


চার্চিল

বিশদভাবে আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই; গ্রীস, রোম, প্রভৃতি দেশের ইতিহাসই এর সাক্ষ্য দিচ্ছে। জনসংখ্যা বাড়ে, উচ্চশ্রেণীর সম্পদ আহরণের নেশা বাড়ে, কিন্তু জমির পরিমাণ সেই অনুপাতে সব সময় বাড়তে পারে না; কায়িক পরিশ্রমীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আবার সব দেশের অবস্থা একই ভাবে চলে না, কালের অগ্রগতির সঙ্গে বিভিন্ন অবস্থা দেখা দেয় বিভিন্ন দেশের মধ্যে, ইংল্যণ্ডে দেখা যায় সামন্ত প্রথা। রাজা জমি ভাগ ক'রে দেন ভূস্বামীদের, তারাও আবার ভাগ ক'রে দেয় অধীনস্থকে। শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রজা পায় এক টুকরো জমি ভরণ-পোষণের জন্যে, প্রতিদানে রাজার পক্ষে তাকে যুদ্ধ করতে হয় প্রয়োজন হ'লে। এদিকে লোকসংখ্যা বাড়ে, অন্যান্য আর পাঁচটা প্রয়োজনীয় শিল্প-কাজও করতে হয় মানুষকে—তাঁত বোনা, অস্ত্র তৈরী করা, এমনই আরও কত কি! উদ্বৃত্ত মাল চালান যায় বিদেশে, আসে ব্যবসা বাণিজ্য আর একটা শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এই শেষোক্ত শ্রেণী দেখে আপন কাজ সহজসাধ্য হয় যদি তারা থাকে রাজার স্বপক্ষে।


রুজভেল্ট

এরা করে ব্যবসা, টাকা এনে ঘরে তোলে। ইতিহাসের আরও কয়েকটা পাতা ডান দিক থেকে যায় বাঁ দিকে—আসে শিল্প বিপ্লব। উৎপাদন ব্যবস্থা চলে যন্ত্রে। যন্ত্রের মালিক যারা তারা পায় লভ্যাংশ, আর যারা পরিশ্রম করে, তারা পায় মজুরী। যন্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বাড়ে, শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ে, বাজারে আসে প্রতিযোগিতা, মালিকের সংখ্যা কমে, কিন্তু সম্পত্তি তাদের বেড়ে চলে। এদিকে ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হয়, অপর দেশে উৎপন্ন দ্রব্য পাঠিয়ে ধনের পরিমাণ বাড়াবার ব্যবস্থা চলে। চলে দেশ জয়, সৃষ্টি হয় উপনিবেশের। কিন্তু দেশ তো আর যন্ত্রে তৈরি হ'য়ে প্রতিদিন সংখ্যায় বাড়ছে না। ফলে শেষে অপর দেশে মূলধন ফেলতে হয় মুনাফার জন্যে। আগেই বলেছি, এই ব্যবসায়ীর দল প্রথম থেকেই থাকত রাজার পক্ষে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা যেমন এল নিজেদের হাতে, তেমনই শাসনের ক্ষমতাও হাতের মুঠায় রাখলে এরাই, ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধার জন্যে। শাসন পরিষদে ক্ষমতা এদেরই, আইন তৈরি করে এরাই আপন সুবিধার দিকে তাকিয়ে। ফলে নিছক শ্রমিক যারা, উৎপাদন যন্ত্র যাদের হাতে নেই, তাদের বাঁচতে হয় দৈহিক শক্তিকেই মূলধন ক'রে। একদিকে পুঁজিবাদী চলেছে আপনার মূলধন বাড়িয়ে বিভিন্ন দেশে অর্থ আমানত এবং উপনিবেশে আর্থিক শোষণ চালিয়ে, আর একদিকে রয়েছে শ্রমিক, যারা পরিশ্রম ক'রে চলেছে মজুরীর বিনিময়ে আত্মরক্ষার প্রয়াসে, আর এর মাঝে রয়েছে একটা মধ্যশ্রেণী, যারা পরিশ্রম করে শুধু দেহের নয়, প্রধানতঃ মস্তিষ্কের, এই শাসন ব্যবস্থাকে অব্যাহত

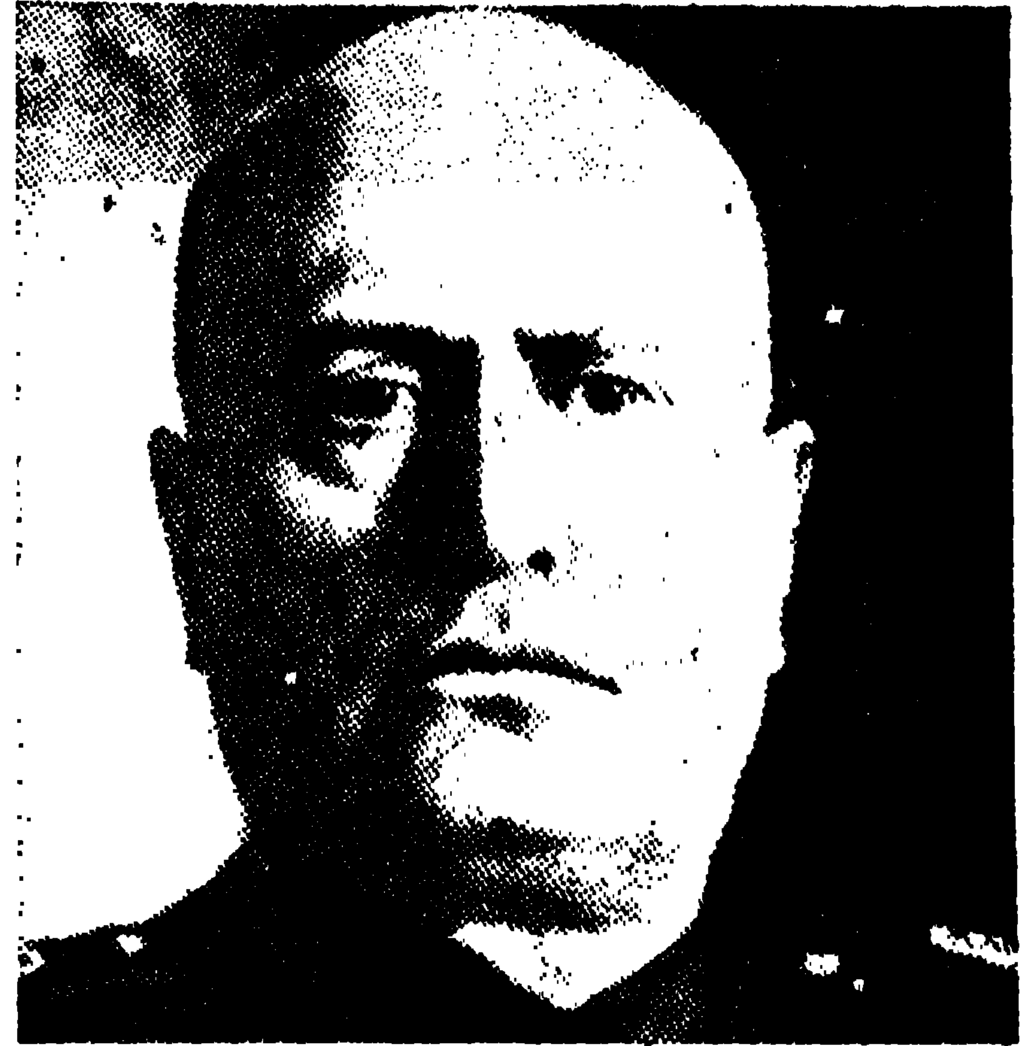
রাখবার জন্যে। এই পদ্ধতির অনুসারকবর্গকে বলে সাম্রাজ্যবাদী, আর এই নীতিই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ।

কিন্তু সকল রাষ্ট্রের অগ্রগতি তো আর সমান ভাবে একই সঙ্গে বেড়ে চলে না, কারণ বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে এই অগ্রগতি। আর, সকল দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা একই সময়ে একই রকম থাকতে পারে না। কাজেই এক রাষ্ট্রকে অন্য রাষ্ট্র হ'তে পেছিয়ে থাকতে হয় অনেক সময়ে। কিন্তু যে সব রাষ্ট্র পেছিয়ে রয়েছে, একদিন তারা দেখতে পায় নূতন ক্ষেত্র আর কোন নেই যেখানে তারা মূলধনের বিনিময়ে মুনাফা আদায় করতে পারে। যে সব সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র পূর্বেই উৎপাদন-শিল্পকে চরমে নিয়ে গেছে, তারাই মূলধন খাটাচ্ছে উপনিবেশে, হাজার হাজার মাইল দূরের দেশও তাদেরই অধিকারে। যে সব রাষ্ট্র ধীরে ধীরে উঠছে, তারা ঠিক করতে পারে না এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে কেমন ক'রে। যন্ত্র-শিল্পের উৎপাদনেও তাদের সঙ্গে পারা যায় না, অথচ নিজের দেশের পুঁজিবাদীর স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে, কারণ রাষ্ট্রের কর্ণধার এবং পুঁজিবাদীদের দল পৃথক নয়, অভিন্ন; আবার এদিকে দেশের জনসাধারণকে দিতে হবে পেটটা ভরবার মত আহার, যাতে পুঁজিবাদীর উৎপাদন ব্যবস্থা থাকে অব্যাহত। ফলে তারা নজর দেয় অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের দিকে। পুঁজিবাদীদের টাকা খাটাবার একটা উপায় হয়, শ্রমিকরা কাজ পায় কল-কারখানায়। কিন্তু এটা সাময়িক। স্থায়ী ব্যবস্থা এর দ্বারা সাধন করা যায় না, দেশবাসীর অন্নবস্ত্রের অভাব এতে মেটে না। ফলে সিংহভাগ-ভোগী রাষ্ট্রের সঙ্গে লিপ্সু উপবাসী রাষ্ট্রের সঙ্ঘর্ষ ওঠে অনিবার্য হয়ে, আর



হিট্লার

এই সঙ্ঘর্ষ ভবিষ্যতে একদিন আসবে জেনেই শেষোক্ত রাষ্ট্র পূর্ব হ'তেই করে অস্ত্রোৎপাদন আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে লাগে সংঘাত। তখন যে ক'টা রাষ্ট্র যথেষ্ট শক্তিশালী হ'য়ে উঠেছে তারা করে বৈঠক—পৃথিবীটাকে ভাগ ক'রে নেয় আপন কয়েক জনের মধ্যে



মুসোলিনী

নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী। কিন্তু এই ব্যবস্থাও শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয় না। বৈঠকের সময় যে সব দেশ যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল, তাদের অনেকের শক্তি পরে আর নাও বাড়তে পারে, কারও বা যায় কমে। আবার বৈঠকে স্থান পায়নি এমন দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্র ওঠে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে, ফলে আবার বাধে যুদ্ধ পৃথিবীকে আর একবার নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী ভাগ ক'রে নেবার জন্যে। ফলে যে দেশ আগে হতেই সিংহভাগ নিয়ে বসে আছে আর যারা লোলুপ হয়ে উঠেছে অংশ লাভ করবার জন্যে নিজেদের কিছুই নেই বলে—এদের মধ্যে আবার বাধে সংঘাত। এই শেষোক্ত শ্রেণী, যারা মূলধন আমানতের নূতন ক্ষেত্র না দেখতে পেয়ে দেশের মধ্যে তৈরী করে একটা সামরিক শক্তি, নির্মাণ করে সমরোপকরণ, নিজেদের দেশের শিল্পজাত দ্রব্যের ওপর আত্মনির্ভর করতে চায় অপর দেশের হাতে টাকা না দেবার জন্যে—এই শ্রেণীর উক্ত মতবাদকে বলে নাৎসীবাদ, আর এরাই হচ্ছে নাৎসী। ইটালীতে এদেরই বলে ফ্যাসী এবং ফ্যাসীবাদ। নাৎসীবাদ ও ফ্যাসীবাদে বিশেষ প্রভেদ কিছু নেই—দুজনের মূল নীতি এবং উদ্দেশ্য একই।

কিন্তু বিপদ এখানেই শেষ হয় না। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র, ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্র, নাৎসীবাদী রাষ্ট্র—প্রত্যেকের মধ্যেই একদল লোক থাকে যারা সন্তুষ্ট হ'তে পারে না, কারণ তারা দেখে তারা চিরকাল বঞ্চিত হয়েই চলেছে, আর এদের সংখ্যাই বেশী। এরা করে পরিশ্রম, মুনাফা যায় পুঁজিবাদীর ব্যাঙ্কে। এরা করে পশুর মত মেহনত, অথচ থাকে বস্তীতে, না পায় ভাল খাদ্য, না জোটে ভাল আশ্রয়। এদের ছেলেরা মানুষ হয় নিরাশ্রয় ভিখারীর মত। তারপর একটু বয়স হ'লেই বাপ ঠাকুর্দার মত মিল মালিকের লাভ বাড়াবার জন্য নিয়োগ করে নিজের দৈহিক শক্তিকে। অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্য এদের মনে আনে বিতৃষ্ণা, বিদ্বেষবহ্নি ধূমায়িত হ'তে থাকে ধীরে ধীরে এদের মনের

মধ্যে। রাষ্ট্রের কর্ণধাররা তখন এদের চায় ভোলাতে। বলে—শাসন ব্যবস্থা তো তোমাদেরই হাতে। তোমাদের প্রতিনিধি রয়েছে শাসন পরিষদে। এরা বোঝে না, বলে—প্রকৃত গণতন্ত্র একে বলে না, প্রকৃত গণতন্ত্র আসতে পারে না এই দ্বৈতবাদী সমাজে। মানুষের জন্যে মানুষের দ্বারা মানুষের যে শাসন সেই হচ্ছে প্রকৃত গণতন্ত্র. (Government of the people for the people by the people). কিন্তু তা হয় কৈ? মতামত প্রকাশ করবার স্বাধীনতা আছে, কিন্তু সেটা ততক্ষণ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেটা শাসন কর্ত্তৃপক্ষের মনঃপুত হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও আছে—কিন্তু আসলে মানতে হবে সংবাদ-পত্রের মালিকের মতকে। আর মালিকের মত পুঁজিবাদীর মত,—কারণ মালিক তো একজন পুঁজিবাদী। এই ভাবে সব দিকেই আছে বাধা। এরা চায় সকল মানুষের সমান অধিকার। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বৈষম্য যাক বরবাদ হয়ে। সম্পত্তি রাষ্ট্রের, আর রাষ্ট্র হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিয়ে। নিজের পেটের জন্য প্রত্যেকেই করবে পরিশ্রম, পরশ্রমজীবী হয়ে থাকা চলবে না। আর রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আছে প্রত্যেকেরই অধিকার। রাষ্ট্রের হয়ে তুমি কাজ করবে, তোমার সকল ভার রাষ্ট্রের। যা তোমার প্রয়োজন দেবে রাষ্ট্র। ভোগ সুখ কিছু বাদ যাবে না এতে, বরং বাড়বে। কারণ একের উৎপাদন শক্তিতে অপরে ভাগ বসাচ্ছে না। ফলে উৎপাদন বাড়ছে যথেষ্ট, এ দিকে একজনের ঘরে সকল সম্পত্তি জমা না হওয়ায় সেই সম্পত্তি যাচ্ছে দেশময় ছড়িয়ে। একজন



কার্ল মার্কস্



ষ্টালিন

যখন মোটরে চড়ে বেড়াবে, আর একজনকে তখন তার চাকার কাদায় হবে না বহুরূপী সাজতে; একজনের ছেলে যখন প্রাসাদে তাপনিয়ামক ঘরে করবে বিশ্রাম, আর একজনের ছেলেকে তখন পূতিগন্ধময় বস্তিতে মাটির ওপরে ছেঁড়া কাঁথা বিছাতে হবে না। যুদ্ধও এ সমাজে ঘটতে পারে না, কারণ শ্রেণী যার মধ্যে নেই, শ্রেণী সংঘাত তার মধ্যে আসবে কেমন ক'রে? এই মতবাদকে যারা সমর্থন করে তারা হচ্ছে সমাজতন্ত্রী, আর মতবাদকে বলে সমাজতন্ত্রবাদ বা বৈজ্ঞানিক সমূহতন্ত্র (Scientific communism)।

পথ ও লক্ষ্য

শ্রীকালিদাস রায়

দীর্ঘ তীর্থযাত্রী যথা পথভ্রান্ত হ'য়ে
পথে ভোগ্যবস্তু লভি মগ্ন রহে তায়,
ভুলে যায় লক্ষ্য নিজ আত্মহারা র'য়ে
ভাবে সে চরম কাম্য মৃগতৃষ্ণিকায়;

তেমনি আমরা হায় নিত্য করি ভুল,
সাধন-পন্থায় ভাবি সাধনার শেষ,
সূক্ষ্মেরে হারায়ে শুধু বরি' লই স্থূল,
করণে হারায়ে ফেলি কর্ম্মের উদ্দেশ।

রাজা ভাবে রাজ্য বুঝি ভোগের সহায়,
তন্ত্র মন্ত্র লোকাচারে ধর্ম্ম শেষ হায়।

একটা বিড়ি

শ্রীমোহিনী চৌধুরী

অকাল বর্ষা নেমেছে।

সন্ধ্যারাতে নিরীহ পথচারীদের বিপর্যস্ত করাই তার মতলব। ভিজতে ভিজতে গিয়ে ট্রামে উঠলাম, বেহালার ট্রামে। পিসিমার বাড়ীতে যেতে হবে। ফাষ্টক্লাসে বেশী প্যাসেঞ্জার নেই। আমরা তিনজন বাঙ্গালী আর একটী কাবুলীওয়ালা।

পুরোনো ধরণের ট্রাম—জান্‌লার ফাঁক দিয়ে জলের ছাট আসে, ছাদের ফাটল দিয়ে টপ্‌টপ্‌ ক'রে জল পড়ে। কয়েকমিনিটের ভেতরেই শরীরের ভেতরদিকটা পর্য্যন্ত স্যাঁৎসেঁতে হ'য়ে উঠলো।

ট্রাম ছুটেছে ময়দানের মাঝখান দিয়ে।

আর ছ'টী বাঙ্গালী ভদ্রলোক দিব্যি আষাঢ়ে গল্প জুড়ে দিয়েছেন। আমি চুপচাপ এককোণে ব'সে আছি। কাবুলীওয়ালা কাঁচের শাসির ভেতর দিয়ে ক্রমাগত এদিক-ওদিক দেখবার চেষ্টা ক'র্‌ছে। কাঁচের শাসি বৃষ্টির জলে ঝাপসা হয়ে গেছে, বাইরেও আবছা অন্ধকার—ভালো ক'রে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। জলপড়ার আওয়াজ আর ট্রামের একটানা হাঁপানীর সুরে বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের খোসগল্পের রসাস্বাদনেও ব্যাঘাত ঘটছে। নিজের পকেট হাতড়ে ভাবছি একটু মৌতাত করা যাক্। হঠাৎ শুনি বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের উচ্চকণ্ঠের অট্টহাসি। ওদের গল্পটা এতক্ষণে ক্লাইম্যাক্সে পৌছুলো বোধ হয়। চেয়ে দেখি, বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের দৃষ্টি গিয়েছে কাবুলীওয়ালাটীর দিকে, যে-বেচারী এতক্ষণ ধ'রে অনেক বিচিত্র এবং উদ্ভট উপায়ে জান্‌লার শার্সি খুল্‌বার চেষ্টা ক'রছে; আর তার পৌনঃপুনিক ব্যর্থতাকে বিদ্রূপ ক'রবার উদ্দেশ্যেই বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা তাদের উচ্চ পরিহাসের সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবাণ বীরদর্পে নিক্ষেপ ক'রছেন। কাবুলীওয়ালাটীর অক্ষমতা দেখে সহানুভূতি হ'ল। কণ্ডাক্টারকে বল্‌লাম, "জান্‌লাটা খুলে দাও না হে।"

সে বল্‌ল, "বলেন কী বাবু? এখন জান্‌লা খুলে দিলে সমস্ত গাড়ীটা একদম ভিজে যাবে যে।"

দেখলাম, কথাটা মিথ্যে নয়, তবু তাকে বল্‌লাম, "দেখ না তবে কী চায় বেচারী?"

কণ্ডাক্টার ওর কাছে গেল। হিন্দীতে ব'ল্‌ল, "বৈঠিয়ে আপ আভি তো বহুত দের হ্যায়।"—এই এক কথাতেই কাবুলীর উদগ্র কৌতুহল মিটলো। সে আবার স্থির হ'য়ে নিজের সীটে গিয়ে ব'স্‌লো।

রেসকোর্সের কাছাকাছি আসতেই মোটা ভদ্রলোকটী ধরালেন চুরুট, লম্বা ভদ্রলোকটী ধরালেন সিগারেট, আমিও ছোটখাটো একটা নেশার খোঁজে পকেট হাতড়াতে সুরু ক'রলাম। কাবুলীওয়ালাটী দেখি হাত বাড়ালো ভদ্রলোকটীর দিকে, সোস্তভাষায় একটা সিগারেট চাইলো। মোটা ভদ্রলোকটি মাথা নাড়লেন, লম্বা ভদ্রলোকটী ব'ল্‌লেন, "নেই হ্যায়।"

বিফলমনোরথ হ'য়ে কাবুলীওয়ালার লৌহকঠিন মুখখানাও যেন কাঁচুমাচু হ'য়ে গেল। কাবুলীওয়ালা করুণদৃষ্টি মেলে একবার আমার দিকে তাকালো।

আমি পড়লাম মহাসঙ্কটে। ওঁদের আছে, ভালো জিনিষই আছে—তবু ওরা দিলেন না। আর আমি কিনা সামান্য সম্বল নিয়ে ওঁদের ওপর টেক্কা মেরে যাবো! নিজের ধৃষ্টতা দেখে নিজেই লজ্জিত হ'লাম। কিন্তু বেশীক্ষণ নিষ্ক্রিয় হ'য়ে থাকতে পারলাম না। একটু পরেই কাবুলীওয়ালা আমার কাছে হাত পাতলো, মিনতি ক'রে ব'লল, "যদি একটা বিড়ি-টিড়ি থাকে।" পকেটে ছিল একটী বিড়ি—'একমেবা-দ্বিতীয়ম্।' সসঙ্কোচে সেটাই বের ক'রে দিলাম, আর দিলাম একটা দেশলাই। কাবুলীর মুখে-চোখে কৃতজ্ঞতা ফেটে বেরুতে লাগলো। ওর নিজস্ব খট্‌খটে ভাষায় অনেক কিছু সে ব'লে গেল। মোটামুটি বুঝলাম, আর ছুটি ভদ্রলোকের অভদ্রতায় সে মর্ম্মাহত হ'য়েছে, কিন্তু আমার সহৃদয় ব্যবহারে সে ভারি খুশী।

সে বিড়ি ধরালো—বিড়ির প্রত্যেকটি টান সে পরম আরামে উপভোগ ক'রতে লাগলো। আমি নির্ব্বাক হ'য়ে

চেয়ে রইলাম। নিষ্পলক লুব্ধচোখে দেখতে লাগলাম তিনটি বিভিন্ন ওষ্ঠপ্রান্ত থেকে তিনটি স্বতন্ত্র ধোঁয়ার কুণ্ডলী নানা বিচিত্র ভঙ্গীতে নিঃসৃত হচ্ছে।

কাবুলীর হঠাৎ নজর প'ড়লো আমার মুখের দিকে। আমার মুখে বিড়ি নেই দেখে সে রীতিমত উদ্ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো। জিজ্ঞাসা ক'রলো, আমার কাছে আর একটাও বিড়িটিড়ি নেই নাকি? আমি বল্লাম, "আমার এখন না হ'লেও চ'লবে।"

কাবুলীওয়ালা কিন্তু ভয়ানক লজ্জিত হ'য়ে প'ড়লো।

তাড়াতাড়ি সে তার বোঁচকা খুলে বের ক'রলো একগাদা বাদাম-পেস্তা-আখরোট-কিস্‌মিস্‌, দুটো টুকটুকে আপেল, একটা বড়ো নাসপাতি। বল্লো, আমাকে সেগুলো নিতেই হ'বে। আমি নাকি আজ তার মহা-উপকার ক'রেছি। আরেকদিন তার ডেরায় গিয়ে আমার পায়ের ধুলো দিতে হবে। ডায়মণ্ডহারবারে বাসষ্ট্যাণ্ডের কাছে কাবুলীপট্টিতে তার আস্তানা। নাম তার সর্দ্দার সিং।

ট্রাম এসে থাম্‌লো শা'পুরের মোরে। সর্দ্দারসিং নাম্‌লো সেখানে এক নম্বর বাস ধরবার জন্যে। নামবার আগে সে বারবার ব'লে গেল যে, আমার এ-ঋণ সে জীবনে কখনো শোধ করতে পারবে না।

মোটা ভদ্রলোক ও লম্বা ভদ্রলোক আর একবার দাঁত খুলে হেসে নিলেন।

* *

এ-ঘটনার পর তেরো বছর কেটে গেছে।...

সর্দ্দারসিংকে আমি ভুলি-নি। তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আমার দিনে দিনেই বেড়ে উঠেছে। রেসকোর্সের সামনে দাঁড়িয়ে আজ আবার একটা বিড়ি নিয়ে সর্দ্দারসিংকে সাধছি। তার কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। বলিষ্ঠ হাতে আমার জামার কলারটা সে টেনে ধ'রেছে, কর্কশ স্বরে ব'লছে, "রূপেয়া লে আও।" যত তাকে বোঝাতে চাইছি যে, আজ নেহাৎ ফেভারিট বাজীটা আপ্‌সেট হ'য়ে গেল' নইলে...সে কিন্তু সেদিকে কর্ণপাতও ক'রছে না।

তার হিসেবে দশবছর আগে নেওয়া পঞ্চাশ টাকার ঋণ আজ সুদে-আসলে পাঁচশো টাকায় দাঁড়িয়েছে।

অবাক হ'য়ে ভাবছি, রবীন্দ্রনাথের কাবুলীওয়ালা আর আমার কাবুলীওয়ালার কত তফাৎ!

কোথা ভগবান

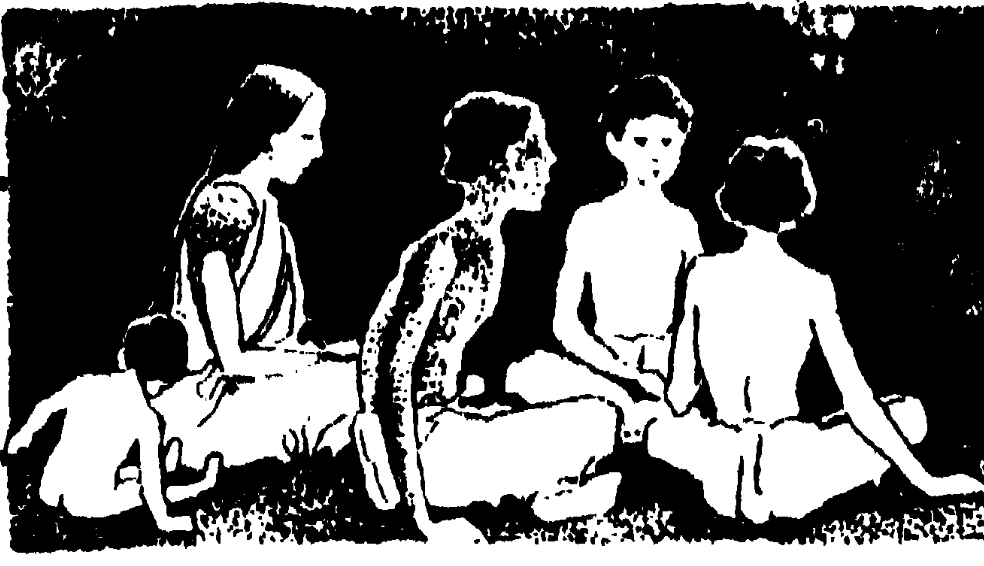
শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বেদনা দিলে প্রচুর
দুঃখ দিলে গো অপার
তবু নিশিদিন মানুষের মন
ডাকিছে তোমারে বার বার॥

মানুষের অন্তরে কাঁদে হাহাকার
বুকে বাজে তার
শত শৃঙ্খল ভার
মুক্তি দাও, মুক্তি দাও
মুক্ত করো তারে ভগবান॥

কোথা ভগবান!
কোথা গো ভয়ত্রাতা!
কোথা বিধাতা,
ফুকারি কাঁদিছে মানবের
রুদ্ধ আত্মা।

বন্ধন তার কর গো ছিন্ন
হউক তোমাতে সে অভিন্ন
শান্ত হোক—নির্ম্মল হোক
সুন্দর হোক,
হউক তোমাতে সে অভিন্ন॥



চতুষ্পাঠী

আর্য্যকৃষ্টি ও বর্ণাশ্রম

সত্যবান

বর্ণাশ্রমধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা আর্য্যকৃষ্টির একটা বড় দান। এই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সাহায্যেই একদিন আর্য্য জাতির চাতুর্ব্বর্ণিকী প্রতিভা পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

অধুনা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিলুপ্ত না হইলেও অবসাদগ্রস্ত হইয়া একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ভগ্ন প্রাচীর মধ্যস্থ বিগ্রহহীন পরিত্যক্ত মন্দিরের মত তাহার যে স্মৃতিচিহ্নটুকু আছে, তাহাও অন্তঃসারশূন্য। তাহাকে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের খোলস মাত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠায় আর্য্যকৃষ্টির গৌরবের দাবী কতখানি, তাহার বিচার করিবার পূর্ব্বে বর্ণ ও আশ্রমের স্বরূপ কি, কোন সূত্র ধরিয়া বর্ণাশ্রমের উদ্ভব, ইহা নিছক কল্পনাপ্রসূত, না হেতুসম্ভূত, অর্থাৎ প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতেই ইহার উপকরণগুলি আহৃত হইয়াছে কিনা, তাহার একটু পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক।

বর্ণাশ্রমের উপাদান-বর্ণ চারিটি,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ লইয়াই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আর্য্যকৃষ্টির অবদান হইলেও পৃথিবীর সমগ্র মানবগোষ্ঠীই এই চারিবর্ণের অন্তর্গত। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে মৎকর্ত্তৃক চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্ট হইয়াছে।

এই ভগবদুক্তি হইতে স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, চতুর্ব্বর্ণ ভগবৎসৃষ্ট বা স্বাভাবিক; পরন্তু মনুষ্যপরিকল্পিত নহে। অধিকন্তু ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে, চতুর্ব্বর্ণের অতিরিক্ত আর বর্ণ নাই; যাবতীয় মানবই এই চতুর্ব্বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, তাহা না হইলে, অর্থাৎ চতুর্ব্বর্ণকে নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করিলে গণ্ডীর বাহিরে যাহারা থাকিয়া যায়, তাহারা ভগবানেরও সৃষ্টির বাহিরে গিয়া পড়ে; যেহেতু ভগবদ্বাক্যে চতুর্ব্বর্ণের অতিরিক্ত সৃষ্টির স্বীকৃতি নাই কিন্তু ইহা ত' সম্ভবপর নহে।

বেদের পুরুষসূক্তেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

'ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥'

মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্রের উৎপত্তির কথাই ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে। তারপর মনুসংহিতায়ও এই চারি বর্ণেরই সন্ধান মিলে।

"সর্ব্বস্যাস্য তু সর্গস্য গুপ্ত্যর্থং স মহাদ্যুতিঃ।
মুখবাহূরুপজ্জানাং পৃথক্ কর্ম্মাণ্যকল্পয়ৎ॥"

সেই মহাদ্যুতি, অর্থাৎ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সমস্ত জগতের পরিপালনহেতু মুখ, বাহু, উরু ও পাদজাত বর্ণ চতুষ্টয়ের,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের নিমিত্ত পৃথক পৃথক কর্ম্মসমূহ কল্পনা করিলেন।

এক্ষণে কথা হইতেছে এই যে, যদি যাবতীয় মানবগোষ্ঠীই এই চতুর্ব্বর্ণের অন্তর্গত হয় তবে পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম স্বীকৃত হইল না কেন? একমাত্র ভারতীয় আর্য্য-গোষ্ঠীর মধ্যেই ইহা সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিবারই বা কারণ কি? এই স্থানেই বর্ণাশ্রম সম্বন্ধীয় আর্য্যকৃষ্টির উৎপত্তি ত' তাহার অসামান্য বৈশিষ্ট্য।

প্রথমতঃ দেখা যাউক, পৃথিবীর যাবতীয় মানব উক্ত চারি বর্ণের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইবার উপযুক্ত কারণ আছে কি না। কারণ, চতুর্ব্বর্ণের স্বাভাবিকত্ব সম্বন্ধে যাহারা শাস্ত্রোক্তিতে শ্রদ্ধাশীল ও বিশ্বাসবান্, তাহাদের নিমিত্ত স্বতন্ত্র প্রমাণের প্রয়োজন না থাকিলেও, যাহারা শাস্ত্রবাক্যমাত্রকেই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অসমর্থ তাহাদিগের দিক হইতেও বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

সাধারণ বুদ্ধিতে বিষয়টা বিচার্য্য বলিয়াই হয় ত' গ্রাহ্য হইবে না, কিন্তু সংস্কারমুক্ত নিরপেক্ষ শুদ্ধ চিত্তে একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলেই ইহার সূক্ষ্মতত্ত্ব অন্তরে উপলব্ধি হইবে। গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারেই চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি, ইহাই ত' ভগবদ্বাক্য। গুণ বলিতে কি বুঝায় এবং কর্ম্ম বলিতেই বা কি বুঝায়? গুণ বলিতে,—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি এবং কর্ম্ম বলিতে,—শম, দম, শৌর্য্যবীর্য্যাদি বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্মসমূহ বুঝায়। যাঁহারা সত্ত্বগুণপ্রধান তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম,—

"শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥"

শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এই নয়টি ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত ধর্ম্ম। সত্ত্ব ও রজোগুণপ্রধান ব্যক্তিরাই ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম,—

"শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥"

পরাক্রম, তেজ, ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান এবং ঈশ্বরভাব, অর্থাৎ প্রভুত্ব করিবার সহজাত বৃত্তি, এইগুলি ক্ষত্রিয় জাতির সহজাত ধর্ম্ম।

রজঃ ও তমোগুণপ্রধান ব্যক্তিরা বৈশ্য এবং তমোগুণপ্রধান ব্যক্তিরাই শূদ্র নামে অভিহিত। বৈশ্য ও শূদ্র জাতির ধর্ম্ম,—

"কৃষি গোরক্ষ বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥"

কৃষিকার্য্য, গবাদি পশু পালন, ও বাণিজ্য বৈশ্য জাতির স্বভাবজাত ধর্ম্ম এবং পরিচর্য্যাত্মক কর্ম্ম, অর্থাৎ সেবা-শুশ্রূষাসম্বন্ধীয় কার্য্যই শূদ্র জাতির স্বভাবজাত ধর্ম্ম।

গুণ ও ধর্ম্মের এই চাতুর্ব্বর্ণিকী পরিকল্পনার বাহিরে আর কি থাকিতে পারে? বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি বর্ণ সংজ্ঞা বাদ দিয়া হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি আখ্যায় বিশেষিত যাবতীয় সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের কথা বিস্মৃত হইয়া সমগ্রভাবে পৃথিবীর মানবজাতির প্রতি লক্ষ্য করিলেও উপরোক্ত গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুরূপ পরিবেশই প্রত্যক্ষীভূত হইবে। বর্ণ নিত্য, ব্যাপক এবং স্বাভাবিক। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ সর্ব্বত্র যাবতীয় মানবজাতিতে ব্যাপ্ত হইয়া চিরকালই আছে এবং চিরকাল থাকিবেও। ইহা স্বীকার কর আর নাই কর, তাহাতে কিছুই আসিয়া যাইবে না।

ভারতীয় আর্য্য মনীষার লক্ষ্য পথে ধরা পড়িয়া এই চাতুর্ব্বর্ণিকী পরিবেশ-রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল মাত্র বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মধ্য দিয়া। অন্যত্র তাহা সম্ভবপর হয় নাই। কেন হয় নাই, তাহার কারণ অজ্ঞাত। হয় ত' অনবধানতাপ্রযুক্ত উপেক্ষিত হইয়াছে; নয় ত ইচ্ছাকৃত হইয়াই প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। এ কথা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, আর্য্য-কৃষ্টি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মেরই জনক, কিন্তু বর্ণের স্রষ্টা নহে। যে গুণ ও গুণানুযায়ী কর্ম্মবিভাগ-হেতু চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি ও বিকাশ তাহা মানুষের স্বীকার অস্বীকারের অপেক্ষা না রাখিয়াই সর্ব্বত্র স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া আছে। স্বভাবজাত ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ না বলিয়া চণ্ডাল নামে অভিহিত করিলেও তাঁহার স্বভাবধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্য লোপ পায় না, অর্থাৎ সে অব্রহ্ম—চণ্ডাল হয় না। সেইরূপ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকেও যে যে নামেই অভিহিত কর না কেন, তাহাদের সহজাতধর্ম্মবলে তাহারা স্ব স্ব রূপেই অধিষ্ঠিত থাকিবে; তাহা হইতে তিলমাত্র বিচ্যুত হইবে না।

"যে নাম ধরিয়া কেন ডাক না গোলাপে
গোলাপের মিষ্ট গন্ধ গোলাপেই থাকে।"

বস্তুতঃ নাম লইয়া হানাহানি এক্ষেত্রে একেবারেই অর্থহীন। গুণ ও স্বভাবজাত ধর্ম্ম লইয়াই মানুষ জন্মগ্রহণ করে। মানুষের বর্ণবিচার হয় ঐ গুণ ও স্বভাবজাত ধর্ম্ম দ্বারা; কারণ উহাই তাহার প্রকৃত পরিচয়। কোন দেশের কোন জাতির মধ্যেই উল্লিখিত চাতুর্ব্বর্ণিকী গুণ ও ধর্ম্মের, সুসমঞ্জস পরিবেশ নাই হউক, অভাব পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং যদি পৃথিবীর যাবতীয় মানবগোষ্ঠীকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণে শ্রেণী বিভাগ করিয়াই অভিহিত করা হয়, তাহাতেও এমন কিছু অপরাধ বা আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। বর্ণ ও বর্ণাশ্রম এক কথা নহে। চতুর্ব্বর্ণের স্বীকৃতির সঙ্গেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকেও যে মানিয়া লইতে হইবে তাহারও কোন হেতু নাই। বর্ণাশ্রমবিশিষ্ট জাতির পক্ষেও ইহাতে ক্রুদ্ধ বা ক্ষুব্ধ হইবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। যেহেতু এ কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না, যে স্বয়ং ভগবান যখন মাত্র চতুর্ব্বর্ণেরই সৃষ্টি স্বীকার করিয়াছেন তখন তিনি সমগ্রভাবেই সে কথা বলিয়াছেন; পরন্তু কেবল বর্ণাশ্রমবিশিষ্ট ভারতীয় আর্য্যগোষ্ঠীই তাঁহার বক্তব্যের বিষয়ীভূত হইতে পারে না।

অতএব এক্ষণে ইহা বোধ হয় বলা যাইতে পারে যে; দেশ, কাল, শিক্ষা ও সংস্কৃতিভেদে যে যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, পৃথিবীর সমস্ত মানুষই যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের অন্তর্গত ইহার সত্যতা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। সুতরাং বর্ণের উৎপত্তি ও পরিস্থিতি সম্বন্ধীয় বক্তব্যের এই স্থানেই পরিসমাপ্তি করা যাউক।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত চতুর্ব্বর্ণ অবিচ্ছিন্নভাবেই বিদ্যমান ছিল, যেরূপ অদ্যাপি আর্য্যগণ্ডীর বাহিরে সর্ব্বত্র আছে। কতকাল পূর্ব্বে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার সঠিক সময় নির্দ্ধারণ করা আজি আর সম্ভবপর নহে; সুতরাং সে সম্বন্ধে ব্যর্থ গবেষণা করিতে না যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত। এক্ষণে সাধারণভাবে একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে কি না এবং হইয়া থাকিলেই বা তাহার যোগ্যতা কতখানি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্মবলেই একদিন আর্য্যপ্রতিভা পরি-পূর্ণতা লাভ করিয়া সর্ব্বতোভাবে পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। সাধনার পৌনঃপুন্যের দ্বারা সমগ্র বৃত্তিরই যে উৎকর্ষ লাভ হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। এই স্বতঃসিদ্ধ বিষয়কে ভিত্তি করিয়াই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উদ্ভব। সম্ভবতঃ বর্ণাশ্রমধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার সঙ্গেই আর্য্য-শব্দেরও উৎপত্তি হইয়াছিল। আর্য্য শব্দের অর্থ—আত্মার উৎকর্ষসাধক। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে আর্য্য জাতি নামে অভিহিত কোন জাতি ছিল কি না তাহা সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত বিষয় হইলেও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সঙ্গেই আর্য্যকৃষ্টির ঔৎকর্ষিক সম্বন্ধের অবিমিশ্র বিদ্যমানতানিবন্ধন বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সহিতই আর্য্য সংজ্ঞার উৎপত্তিও সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়।

এইরূপ মনে করিবার আরও একটি কারণ আছে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সূতিকাগার এই ভারতভূমি। ভারতের বর্ণাশ্রমী জাতিরাই আর্য্য নামে অভিহিত ছিল। ভারতের বাহিরে আর্য্য শব্দের বা তদর্থবোধক কোনরূপ শব্দদ্বারা কোন জাতি আখ্যায়িত ছিল বা আছে বলিয়া কেহ প্রমাণ করিতে পারেন না। ঐতিহাসিকগণ ভারতীয় আর্য্যগণের আদি বাসভূমি নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া অনেক স্থানের সন্ধান দিয়াছেন এবং অনেক জাতিকে আর্য্য শোণিতের ধারা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের বাহিরে যে নামের অস্তিত্ব নাই, তাহার উৎস অন্যত্র ইহা স্বীকার করিতে সহজে প্রবৃত্তি হয় না। তবে ইহা সম্ভবপর যে, আর্য্য নামে অভিহিত বা পরিচিত হইবার

পূর্ব্বে এই জাতি অন্যত্র ছিল এবং তখন ইহারা অন্য নামে পরিচিত হইত। উত্তর মেরু অঞ্চল অথবা ককেসাসের দুর্গম পার্ব্বত্যভূমি যেখানেই ভারতীয় আর্য্য জাতির পূর্ব্বপুরুষেরা থাকুন না কেন, সেখানে তাঁহারা যে আর্য্য নামে অভিহিত ছিলেন না, ইহা নিশ্চয়। ভারতে আসিয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা আর্য্য পদবী লাভ করিয়াছিলেন। উৎকর্ষ-বিধায়ক বর্ণাশ্রমধর্ম্মই উৎকর্ষ-প্রকাশক আর্য্য শব্দের উৎপত্তির হেতু—ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বাদ দিলে আর্য্য-শব্দের ভিত্তিই মুছিয়া ফেলা হয়; সুতরাং ইহা একেবারেই নিরর্থক হইয়া পড়ে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সূত্রগুলির মধ্যেই আর্য্য শব্দের মূলতত্ত্ব নিহিত।

চতুর্ব্বর্ণ বিশ্লেষণ করিয়া যথাযোগ্যভাবে স্ব স্ব ধর্ম্মানুশীলনের ব্যবস্থা ও তাহার উৎকর্ষ সাধনই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের স্বরূপ। ভারতে আগত আর্য্য-পিতৃগণ তাঁহাদের দিব্য দৃষ্টিদ্বারা ইহার পরিণাম প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, চতুর্দ্ধা বিভক্ত বর্ণ-চতুষ্টয়কে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই যৌগিক চতুরাখ্যায় অভিহিত করিয়া ইহাদের সমন্বয়ে গুণকর্ম্মানুসারে একটি সুদৃঢ় সমাজ-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে মানুষের যাবতীয় বৃত্তিগুলির সম্যক অনুকূল পরিবেশন হইবে এবং অনুশীলনের ফলে ক্রমোৎকর্ষ লাভ করিয়া কালে তাহার সবগুলিই পরিপূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইবে। হইয়াছিলও তাহাই। প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভারতের মানচিত্র সম্বন্ধে যাঁহাদের সামান্যমাত্র অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারাই এ কথা স্বীকার করিবেন। বর্ণাশ্রমশিষ্ট ভারতের প্রাচীন ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি আজ জগতের বিস্ময়ের বস্তু।

সুপরিকল্পিত একনিষ্ঠ সাধনা ব্যতীত অত বড় জাতির সৃষ্টি অসম্ভব। সম্ভবপর হইলে আজিও হইতে পারিত। হইতে যে পারিতেছে না, ইহাতেই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা ও যোগ্যতা স্বভাবতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে।

ব্যক্তি-স্বাধীনতার পক্ষপাতী তথাকথিত প্রগতিপন্থী একদল উদ্‌ভ্রান্ত-মস্তিষ্কের লোক এই মহান্ বর্ণাশ্রমের গণ্ডীকে সমাজের অনাবশ্যক ও কলঙ্কময় বন্ধন বলিয়াই মনে করেন। তাঁহাদের মতে সমাজ-বন্ধনের কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই। দুঃখের বিষয়, ইঁহাদের ধারণাশক্তি বড়ই দৈন্যগ্রস্ত। ইঁহারা সমষ্টির চরম কল্যাণ সমগ্রভাবে চিন্তা করিতেই পারেন না। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ইঁহারা সর্ব্বত্রই যে অর্থে ব্যবহার করেন তাহা উচ্ছৃঙ্খলতারই নামান্তর মাত্র। উচ্ছৃঙ্খলতাদ্বারা কোন বিষয়েই সম্পূর্ণ সফলতা অর্জ্জন করা যায় না, পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন প্রতিষ্ঠা ত' দূরের কথা। শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হইতে হইলে সুপরিকল্পিত শৃঙ্খলার অধীনে থাকিয়া শ্রেষ্ঠত্ববিধায়ক বৃত্তিগুলির যথাযথ অনুশীলন করিতে হইবে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে সাধনার অনুকূল করিয়া তুলিতে হইবে।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মে আছে তাহারই সুচিন্তিত সুষ্ঠু পরিকল্পনা। অতঃপর একে একে তাহারই সামান্য পরিচয় প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।

[ক্রমশঃ

কাছে ও দূরে

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ রায়

তুমি যবে বসে থাক পাশে
কণ্ঠ মোর রুদ্ধ হ'য়ে আসে,
দু'টি আঁখি ব্যাকুল আগ্রহে
শূন্য পানে শুধু চেয়ে রহে।
তুমি যদি বল কোন কথা
বাড়ে তাহে শুধু ব্যাকুলতা,
চ'ক্ষে ঝরে মিলনের জল
আবেগে অধীর চঞ্চল।
তুমি যবে যাও দূরে চলে
আঁখি দু'টি ভরে ওঠে জলে,

গাই একা বিরহের গান
সৃজে সে ব্যথার ব্যবধান।
রচিয়া কথার সেতু তাই;
তোমারে যে ফিরে পেতে চাই।

কাছে যবে ছিলে তুমি, বুঝেছি তখন
কভু আমি নই সাধারণ।

দূরে গেছ, আজ মনে হয়
মোর যেন নাই পরিচয়।

সঙ্কীর্ণ ছ'পেয়ে পথ। পথের মধ্যে কোথাও বাঁশের ঝাড় আসিয়া নুইয়া পড়িয়াছে, কোথাও বা কোন বাড়ীর মাদার গাছের ডালটা আসিয়া কাপড়ে লাগিতেছে, কোথাও বা বেতের ঝোপ। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। সে-আলোতে পথ দেখার চেয়ে বিপথেই টানিয়া নিতেছিল বেশী।

চলিতে চলিতে হঠাৎ দলু আশরফকে কহিল, "বাড়ুয্যের বাড়ীর কাছে ঐ লোকগুলি কে রে?"

আশরফ কহিল, "একটু খাড়ও 'চাচা, দেখি কোন্ হুমুন্দিরা ঐ খানে তাল পাকাইছে! তুমি লাঠিটা ঠিক কইরা রাখ!

আশরফ যুবক। বয়স তার সাতাইশ আঠাশের বেশী নয়! শক্তিশালী পুরুষ সে। বংশপরম্পরায় তারা লাঠিয়াল বলিয়া পরিচিত। চৌধুরীবাবুদের হইয়া তাহাদের বাপ, জ্যেঠা কত জমি দখল করিয়াছে আর কতবার ফৌজদারী মোকদ্দমায় যে জেল খাটিয়াছে তাহার ঠিক্ নাই। সাহসিকতার ও নির্ভীকতার একটা ভাব তাহাদের রক্তের ধারার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল।

আশরফ দেখিল প্রায় দশজন লোক বরদা বাড়ুয্যের বাড়ী ঘেরাও করিয়াছে এবং আস্তে আস্তে বেড়ার বাঁধ খুলিতেছে! আর ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলিতেছে। ঐ সময়ে ঝম্ ঝম্ করিয়া বেশ বৃষ্টি পড়িতেও আরম্ভ করিয়াছিল। বাড়ী একেবারে নীরব। কোন ঘরেই আলো নাই। আশরফ পুকুর পাড়ের বড় বকুল গাছটার পাশে দাঁড়াইয়া ঐ লোকগুলির কাজ দেখিতেছিল! মাঝে মাঝে দুই একটি টর্চের আলোও দেখা যাইতেছে। আশরফ অতি সন্তর্পণে দলুর কাছে আসিয়া কহিল "চাচা, ব্যাপারটা বড় খারাপ!"

দলু কহিল, "কি রে?"

আশরফ, "বাঁড়ুয্যের বাড়ী ডাকাত পরছে!"

দলু সেই অন্ধকারের মধ্যেও গর্জ্জিয়া উঠিল! কহিল, "আশরফ, বামন বেটাদের চালাকি মালুম করলি ত'! দেখি আমাদের গাঁয়ে কে ডাকাতি করে!"

সেই অন্ধকারে দলু ও আশরফ দুইজনে লাঠি বাগাইয়া বাঘ যেমন অতি সন্তর্পণে শিকার ধরিতে অগ্রসর হয়, তাহারা দুইজনেও তেমনি করিয়া বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের ঘরের পেছনের ঝোপের আড়ালে আসিয়া ফাঁদ পাতিয়া রহিল।

এ-সময়ে বৃষ্টি আরও জোরে পড়িতেছিল। আশরফ কহিল, "চাচা?"

দলু কহিল, "চুপ!"

ও-দিকে বেড়ার নীচের অংশটা কাটিয়া ফেলিয়া যেমন চারিজন লোক ভিটার মাটি সরাইয়া ঘরের ভিতর ঢুকিতেছিল, অমনি নিমেষ মধ্যে দলুর ইঙ্গিতে আশরফ লাঠি তুলিয়া লইয়া পেছন হইতে ভীষণ ভাবে তাহাদের উপর আঘাত করিল।

আসরফের সঙ্গে সঙ্গে দলুও অন্ধকারের মধ্যে ভীষণ বেগে লাঠি চালাইতে লাগিল। লোকগুলি এইরূপ আক্রমণ আশা করে নাই! তাহারা উঃ উঃ করিয়া ছটফট্ করিতে লাগিল। কিন্তু কেহই তখন পলাইতে পারিল না!

আসরফ পাগলের মত চীৎকার করিতে লাগিল—"কর্ত্তারা জাগেন না! ডাকাইত পড়ছে! ডাকাইত পড়ছে!"

সুবোধ ও প্রবোধ অনেক রাত্রি জাগিয়া বৃষ্টি ও ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা ভাবিয়াছিল যে রাত্রিতে কোন বিপদ ঘটিবে না! কে জানিত এইরূপ একটা অঘটন ঘটিবে!

সুবোধ আসরফের চীৎকার শুনিবা মাত্রই জাগিয়া উঠিল এবং প্রবোধ প্রভৃতিকে জাগাইয়া তুলিয়া নিমেষমধ্যে লণ্ঠন জ্বালাইয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিল। প্রবোধ ও অন্যান্য দুই চারিজন সঙ্গীও ছুটিয়া আসিল। তাহাদের হাতেও ছিল লাঠি।

এই গোলমালের মধ্যে কয়েকজন দস্যু পালাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পারিল না! আসরফ, দলু, সুবোধ, প্রবোধ প্রভৃতি উন্মাদের মত লাঠি লইয়া আনাচে-কানাচে, বনে-জঙ্গলে পুকুর পাড়ে ছুটিয়া যাহাকে পাইল তাহাকেই প্রহার করিতে লাগিল!

এদিকে উমা ও অনিমা গোলযোগ ও হৈ-চৈএর মধ্যে জাগিয়াছিল এবং বসিয়া কাঁদিতেছিল। বাঁড়ুয্যে মহাশয় বিছানার উপর বসিয়া হাঁপাইতেছিলেন!

সুবোধ লাঠি হস্তে লণ্ঠন লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া সকলকে আশ্বস্ত করিয়া কহিল, "আজ দলু ও আসরফ যে উপকার করেছে, সে ঋণের শোধ কোন দিন হবে না উমাদি!"

উমা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "আমার জন্যই ত এত বিপদ! আমার ইচ্ছা করে এই মুহূর্ত্তে প্রাণটা শেষ করে দিই। অশান্তির আগুন নিবে যাক্!"

সুবোধ কহিল, "উমাদি, শত্রুকে ক্ষমা করতে নেই! সে ক্ষমাকে কেহ ক্ষমার চক্ষে দেখে না! তুমি কি ভুলে গেলে তোমার সেই পণের কথা! এখনই প্রাণ দিতে চাও? না না সে হবে না। প্রাণ দেবে যেদিন প্রাণ নিতে পারবে! আজ আর নয়! রাত্রি অনেক হয়েছে।

আমাদের দেখতে হবে এই শয়তান গুণ্ডাদের বদমাইসি কতদূর চলে!"

বাঁড়ুয্যে মশায় বলিলেন—"সুবোধ! ঠিক্ ঈশ্বর আছেন! ভয় করিসনে, কাল দিব তিন নম্বর মোকদ্দমা ঠুকে, দেব হুঁ!" বরদাকান্ত পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ একটা অশান্তি ও উৎপাতের সম্ভাবনা করিয়াছিলেন।

সুবোধ ও প্রবোধ আসরফ ও দলুকে কহিল, "তোমরা

আজ আমাদের যে উপকার করলে তার তুলনা নেই ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করবেন।"

দলু ও আসরফ দুইহাত কপালে ঠেকাইয়া কহিল, "হুজুর, মানুষ হইয়া যদি নেমক হারাম হই তবে আর মানুষ বইলা কইমু কেমনে কয়েন ত?"

প্রবোধ কহিল, "লোকগুলিকে এবার ধরে বেঁধে নিয়ে এস। শেষটায় বিপদ বড় কম হবে না।"

আসরফ কহিল, "বুঝলেন কর্ত্তা, তারা কি এতক্ষণ আছে? সব পলাইয়াছে।"

তাহারা সকলে টর্চ্চ ও লণ্ঠন জ্বালাইয়া ঝোপ জঙ্গল চারিদিক খোঁজ করিল, কিন্তু কাহাকেও দেখা গেল না। বোধ হয় দলের লোকেরা তাড়াতাড়ি তাহাদের সরাইয়া ফেলিয়াছে। বেড়ার অর্দ্ধেকটা কাটা। মাঝে ধসিয়া পড়িয়াছে। বৃষ্টির জল পড়িয়া ইতিমধ্যেই অনেকটা কাদা হইয়া গিয়াছে। বাকী রাত্রিটা নিরাপদে কাটিয়া গেল।

এদিকে দলু ও আসরফ চলিয়া আসিলে মোহন চট্টোপাধ্যায় হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"দেখলে ত ভাই আচার্য্যি, কতগুলি টাকা বাঁচিয়ে দিলাম। বেটারা কি ধর্ম্মপুত্তর যুধিষ্ঠির। আমি জানতাম দলু ও আসরফ ছোঁড়াদের কেনা গোলাম। এতটা সময় এখানে আটকে রেখে ভালই হল, ওদিকে নিশ্চয়ই সব সাবাড়! এ তুমি দেখে নিও।

মাধব আচার্য্য বলিল, "ভাই তুমি খাঁটি পুলিশের লোক। আমার মাথায় এতটা বুদ্ধি কখনই খেলত না। ভিন গাঁয়ের লোকগুলো পারবে ত ঠিক মত কাজ উদ্ধার করতে!"

মোহন চট্টোপাধ্যায় তক্তপোষের উপর খুবজোরে একটা থাপড় ঝাড়িয়া কহিলেন, "আলবৎ পারবে! অমনি কি একহাজার টাকা কবুল করেছি নাকি! পাঁচশো টাকা ত' আগামো দিয়েছি, কাজ হাঁসিল হলে বাকী পাঁচশো দিয়ে দিব।"

"হুঁ কিছু টাকা রেখে যেও আচার্য্যি!"

"সে ভাবনা করবেন না চাটুয্যে মশাই। তা'হলে আমি অতীনকে লিখে দিই যে, কোন ভাবনা তুমি করো না। উমার নামমাত্র চিহ্নও এ গাঁয়ে থাকবে না, আর ঘুণাক্ষরেও কোন কথা প্রকাশ পাবে না, এ স্থির জেনো। ছেলেটা বড্ড ভয় পেয়ে গেছে। কোন রকমে একটু জানাজানি হলে ভয়ানক বিপদ ঘটবে।

মোহন চট্টোপাধ্যায় খুব জোরে হুঁকোতে একটা টান দিয়া কহিলেন, "ধর্ম্ম বল, মান বল, যশঃ বল সব এই টাকার কাছে। জান ত' এসব ক্ষেত্রে কাঁটার চিহ্নও রাখতে নেই! উঃ! ছোঁড়ারা ফেরে গাছের ডালে ডালে, আমি ঘুরে ফিরি পাতায় পাতায়! সন্ধ্যের পর থেকেই লোকগুলোকে লুকিয়ে রেখেছিলাম, বাঁড়ুযোদের পুকুরপাড়ের জঙ্গলের ভিতর। আর এ সময়ে বৃষ্টিটা হয়ে কাজেরও বেশ সুবিধে হয়েছে! উঃ! রাত ত' প্রায় শেষ হয়ে গেলো, এইবার শুয়ে পড়। সকালবেলাই ত' সব খবর পাবে!

মাধব কহিল, "এ গাঁয়ে ভাই তুমি ছাড়া আমার ত' আর কোন বন্ধু নেই। সব বেটা শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন যতীন বাবাজীকে বাঁচাতে পারি তবেই হয়!"

মোহন হাসিতে হাসিতে বলিল, "দেখ ভাই সবই রূপচাঁদের খেলা। রূপচাঁদ বাবাজী সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য করতে পারেন, কিছু ভেবো না। বাবাজীর কাছে আরও দু'তিন হাজার টাকা পাঠাতে লেখ। গাঁয়ের সব বেটার মুখ বন্ধ করতে হবে। আর দেখ রামগতির বাড়ীটাতে লাঙ্গল দিয়ে চষে ফেলে কাপাস বুনে দোবো—একেবারে নির্ঘাত স্বদেশী। কি বল! হা-হা-হা—"

মাধব চিন্তিত ভাবে বলিল, "পুলিশের লোক দাদা তুমি, এতদিন কত চোর বদমায়েসের হিল্লে করেছ, এ আর কি তেমন কঠিন কাজ! তবে সাবধানের মার নেই। তোমার ভাইপো সুবোধটাই ত' কালনেমী হয়ে দাঁড়িয়েছে! ছোড়ারা সব Rural up lift করবেন। আর অই যে ক'লকাতা থেকে ছোড়াটা এসেছে, দাও ত' ও বেটাকে একদিন ঠ্যাং দুটো ভেঙ্গে। রাতারাতি তিনি করবেন গ্রামের উদ্ধার!"

মোহন কহিল, "জান ত' কেমন প্রচার করে দিয়েছি আমি বাড়ী নেই! আর তুমি ত' তীর্থভ্রমণেই বেরিয়েছ। ধরায় কে? আচ্ছা তুমি তা হলে একবার ক'লকাতা যেতে চাও। তাই না?"

মাধব বলিল, "অতীনের সঙ্গে একবার দেখা করার দরকার। চিঠিটা কাল ডাকে দিব। কিন্তু টাকাটা ত' আর ডাকঘরের মারফতে আনানো ঠিক হবে না। সবটাই ধরি মাছ না ছুঁই পানির মত ব্যবস্থা করতে হবে!"

মোহন মাধবের এ কথাটায় সায় দিল। তারপর সে-রাত্রির মত দুই জনেই শুইয়া পড়িল।

ভোর হইবার একটু আগেই আসরফ ও দলু সুবোধ ও প্রবোধ প্রভৃতির নিকট হইতে বিদায় লইবার পূর্ব্বে বাড়ীর চারিদিকটা ঘুরিয়া আসিয়া কহিল, "যা কইছিলাম কর্ত্তা, একেবারে হুবহু মিইল্যা গেছে। বাছাধনেরা একজনও পইরা নাই—সকলেরেই লইয়া গেছে।—আইগ্যা যাই কর্ত্তারা—সেলাম।" তাহারা দুইজনে চলিয়া গেল।

সুবোধ মনে মনে কহিল, এমন করিয়াই ঈশ্বর মানুষকে বিপদের হাত হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। শুভকার্য্যে তিনিই আমাদের সহায় হইবেন। [ক্রমশঃ

প্রস্তাবিত হিন্দু বিবাহ আইন

শ্রীসুধীরচন্দ্র মিত্র, ব্যারিষ্টার-এট্-ল

বিবাহটা মানুষের জীব-ধর্মের এবং সমাজ-ধর্মের একটা অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার; কাজেই সে সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ আইন যে মানুষের সমাজ গঠনের উপর একটা গভীর ও সুদূর প্রসারী প্রভাব-বিস্তার করবে, সে কথা বলাই বাহুল্য। সমস্যাটির আলোচনার এই যে প্রচেষ্টা, তা' একান্তই ব্যবহার-জীবীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তার কারণ, অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে আমাদের কাজের একটা উদ্দেশ্য হলো যথাসম্ভব অভিজ্ঞতার নির্দ্দেশ অনুসরণ করে আগে থেকে দেখতে চেষ্টা করা, কি কি দুরূহতা কোন বিধিবদ্ধ আইনের প্রয়োগকালে এসে উপস্থিত হ'তে পারে। আইন-বিধিবদ্ধ করা সহজ কাজ নয়, বিশেষতঃ যখন, পূর্ব্ব প্রচলিত কয়েকটি বিধি কে একত্র গ্রথিত করে নয়, প্রাচীন পুঁথি ও আদালতের সিদ্ধান্ত-রাজি আশ্রয় করে কোনো বিধিকে (code) খাড়া করে তুলতে হয়, তখন কাজটা আরও কঠিন হয়ে উঠে। এদিক দিয়ে বিচার করলে হিন্দু আইন-সমিতির প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়; ভারতসরকারের ১৯৪২ সালের ৩০শে মে তারিখে প্রকাশিত গেজেটের পঞ্চম খণ্ড ১১৫ পৃষ্ঠা থেকে আরম্ভ করে হিন্দু বিবাহ আইনে সংক্রান্ত যে প্রস্তাবিত আইনের খসড়াটি লিপিবদ্ধ হয়েছে, সে সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করা সমীচীন।

খসড়াটির মোটামুটি পরিকল্পনায় দু'রকমের হিন্দু বিবাহের ব্যবস্থা আছে: (১) আনুষ্ঠানিক (sacramental) ও (২) সামাজিক (civil)। চতুর্থ বিধানটিতে (clause 4) অন্যান্য কথার মধ্যে বলা হয়েছে যে, কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তে আনুষ্ঠানিক বিবাহ সম্পন্ন হ'তে পারবে। সপ্তম বিধানে বলা হয়েছে যে, এই আইন কার্য্যকরী হবার পরে কোন আনুষ্ঠানিক বিবাহ একবার যদি সুসম্পন্ন হয়, তবে শুধু নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য তাকে আর বে-আইনী মনে করা চলবে না; (ক) বিবাহিত পাত্র-পাত্রীর জাতি এক নয়; (খ) তারা সগোত্র; অথবা (গ) কন্যার অভিভাবকের অনুমতি নেওয়া হয় নি, অথচ ছলনা বা বল প্রয়োগ যদি হয়ে থাকে ত' সে কথা আলাদা।

খসড়াটির সঙ্গে যে ভাষ্য দেওয়া হয়েছে দেখা যায় যে সপ্তম (ক) ও (খ) বিধান দু'টি Factum valet নীতিরই সম্প্রসারণ, অর্থাৎ যা ঘটছে তা' মানতে হবে। এর ভিতরকার কথাটা হচ্ছে এই যে, যদি ভিন্নজাতীয় বা সগোত্রীয় পাত্র-পাত্রীর মধ্যে ভ্রম ক্রমে আনুষ্ঠানিক বিবাহ সংঘটিত হয়ে যায়, তবে যেন তাদের প্রতি ন্যায়বিচারে ত্রুটি না হয়। ঐ ভাষ্যে আরও বলা হয়েছে, "সেজন্য", "এমন ব্যবস্থা রাখতে হ'য়েছে, যাতে সংঘটনের পর এই সব বিবাহের ন্যায়সঙ্গতি সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না উঠতে পারে, যদি চ উপযুক্ত ক্ষেত্রে সংঘটনের পূর্ব্ব আদালতের নিষেধাজ্ঞা জারি করে এমন বিবাহ বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারবে।

অতএব, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে চতুর্থ (খ) ও (গ) বিধানে ব্যবহৃত বাক্যগুলির নিরসন হ'য়ে যায়। যথা—যদি ভিন্ন জাতীয় বা সগোত্রীয় প্রাপ্তবয়স্ক দুই ব্যক্তির বিবাহ সংঘটিত হয়, তবে সপ্তম বিধান অনুযায়ী সে বিবাহ আইন সঙ্গত বিবেচিত হবে—পাত্র-পাত্রী কর্ত্তৃক ইচ্ছা করেই চতুর্থ (খ) ও (গ) বিধান লঙ্ঘন করা সত্ত্বেও। যদি চ ভাষ্যে এমন ভাষা প্রকাশ করা হ'য়েছে, যে "উপযুক্ত ক্ষেত্রে" নিষেধাজ্ঞা জারি করে এমন বিবাহ বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারবে। তথাপি খসড়াটিতে এমন কোনো ব্যবস্থা চোখে পড়ে না, যাতে আদালতকে এমন বিবাহ নিবারণ করার ক্ষমতা দেওয়া হ'য়েছে। যদি কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে এমন বিবাহ ন্যায়সঙ্গত করাই খসড়াটির উদ্দেশ্য হয়, তবে অন্ততঃ সে কথা সুস্পষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্ট করে বলা উচিত।

তারপর পঞ্চম বিধানটি পরীক্ষা করে দেখা যাক্। এখানে বলা হয়েছে, আনুষ্ঠানিক বিবাহের ন্যায়সঙ্গতি রক্ষার জন্য দুটি ক্রিয়া অপরিহার্য্য; হোমাগ্নির (Sacred fire) সম্মুখে বন্দনা (invocation) এবং সপ্তপদী, অর্থাৎ হোমাগ্নির সম্মুখে বর-কন্যার একত্র সাত পা অগ্রসর হওয়া।" Invocation কথাটির প্রতিপদ হিসাবে এই আলোচনায় "বন্দনা" কথাটি ব্যবহার করলাম। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় বন্দনা কথাটির অর্থ যতটা সুস্পষ্ট, ইংরাজী ভাষায় "invocation" কথাটির অর্থ ততটা সুস্পষ্ট নয়। ঠিক কি অর্থে এখানে শব্দটি ব্যবহৃত

হয়েছে ? পকেট অক্সফোর্ড অভিধান অনুযায়ী "invocation" কথাটির মানে "appeal to Muse for inspiration" অর্থাৎ অনুপ্রেরণার জন্য বাগদেবীর নিকট আবেদন। যদি একটা সম্পূর্ণ বিধিবদ্ধ আইনের অংশ হিসাবে এই খসড়াটিকে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে, তবে এই বাক্যটির সংজ্ঞানির্ণয় করা হয় নি কেন ?

পঞ্চম বিধানে ব্যবহৃত "sacred fire" বাক্যটি সম্বন্ধেও ঐ একই টিপ্পনী প্রযোজ্য। ইহাছাড়া এখানে আরও একটা অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন উঠে: ব্রাহ্মণের উপস্থিতি কি আবশ্যক ? (বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ ও স্ত্রীধন, ৫ম সংস্করণ পৃষ্ঠা ১০৫-১০৭)

এবারে সংজ্ঞানির্ণয় বিধান সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক্। দ্বিতীয় (গ) (১) বিধান অনুসারে কোন ব্যক্তির সপিণ্ড সম্পর্ক মাতার দিকে পাঁচ পুরুষ ও পিতার দিকে সাত পুরুষ ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত ধার্য্য হয়েছে। আবার দ্বিতীয় (গ) (২) বিধান অনুযায়ী দুজন ব্যক্তিকে সপিণ্ড সম্পর্কিত বলে নির্দ্দেশ করা হয়েছে, যদি একজন অন্যের পূর্ব্বপুরুষ হ'ন অথবা যদি দু'জনের এমন কোন একজন পূর্ব্ব পুরুষ আছেন যিনি প্রত্যেকেরই সপিণ্ড সম্পর্কের অন্তর্গত। কিন্তু এই পূর্ব্বপুরুষ পিতার পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে কেউ, না মাতার পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে কেউ, না উভয়েরই হতে পারেন, সে সম্বন্ধে কিছু সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ নেই।

এই বিধানে যে দৃষ্টান্তগুলি দেওয়া হয়েছে তা মোটেই সন্তোষজনক নয়, এবং মনে হয় তার মধ্যে কিছু বস্তুগত হেত্বাভাসত্ব (material fallacy) নিহিত আছে। কয়েকটা দৃষ্টান্তে দেখা গিয়াছে যে তাহাদের প্রয়োগের যে ফল দাঁড়ায়, তা অসম্ভব। স্থানাভাবে সেগুলোর সম্পূর্ণ আলোচনা এখানে সম্ভব হোলো না। তিন গোত্র ব্যবধানে কন্যার পাণিগ্রহণে কোন কোন ক্ষেত্রে বাধা থাকে না যে নিয়ম অনুসারে, সে নিয়মটির কোন উল্লেখ কিন্তু এই খসড়াটির মধ্যে দেখা গেল না।

এ ছাড়া আরও কয়েকটী প্রশ্নের একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনাও স্থানাভাবে সম্ভব হলো না, যথা: বহুবৎসর যাবৎ পরিত্যাগ ও বিচ্ছেদের পর দ্বিতীয়বার বিবাহের সমীচীনতা, অথবা বিবাহ ব্যাপারে অভিভাবকত্বের অধিকার সম্বন্ধে মাতামহের পূর্ব্বে পিতার দিকে অনুপুরুষ আত্মীয়ের দাবীর বিবেচনা (২৩ বিধান দ্রষ্টব্য)। বিবাহযোগ্য বয়সের অঙ্কটা কমান বা বাড়ানোর গুরুতর প্রশ্নটা কঠিনও বটে, কিছুটা সঙ্কোচজনকও (delicate) বটে এবং এই আলোচনার বিষয়বহির্ভূত।

কিন্তু লর্ড ডেভির (Lord Davey) একটা উক্তি বিশেষ প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক, সেটার উল্লেখ করি "কোন বিধির সার হচ্ছে সেই সমস্ত বিষয়েরই পরিপূর্ণ উল্লেখ ও আলোচনা, যে সমস্ত বিষয়ের আইন সেই বিধিতে প্রচারিত হচ্চে এবং সেই বিধিতে যে বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে, যথাযথ ব্যাখ্যায় তার যা অর্থ দাঁড়ায় তার বাইরে যাবার কোন কর্ত্তব্যই বিচারকের উপর ন্যস্ত নেই।" অতএব আমি বলতে চাই যে, এই বিশিষ্ট নির্ভরযোগ্য নিয়মের আশ্রয় আমাদের কোন মতেই ত্যাগ করা উচিত নয় এবং সেই উদ্দেশ্যে এই খসড়াটি আইনে পরিণত হবার পূর্ব্বে এটাকে সুনির্দ্দিষ্ট ও স্বয়ং সম্পূর্ণ করবার ব্যবস্থা করা উচিত।

বাঙ্গালার শিক্ষায়তন, ছাত্রছাত্রী, গড়পড়তা

বাঙ্গালা দেশে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষায়তনের সংখ্যা ৬১,২৪৯, তাহাতে সর্ব্বপ্রকার ছাত্র পড়ে ৩৯,৩৫,২৬৭ ; তন্মধ্যে পুরুষ ৩১,০৫,৯২৬ ও স্ত্রী ৮,২৯,৩৪১। বাঙ্গালার মোট লোকসংখ্যা ৬,০৩,০৬,৫২৫ ; সেই হিসাবে ভারতীয় অধিবাসীর মধ্যে শতকরা মাত্র ৬·৫ জন লোক বিদ্যালয়ে যায়, পুরুষ অধিবাসীর শতকরা ৯·৭ এবং স্ত্রীলোকের ২·৯। একশত ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৭৯ পুরুষ ও ২১ স্ত্রী। ইউরোপীয় ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছাত্রছাত্রীর অনুপাতে ৫৪·৩ : ৪৫·৭।

দেব-শিশু

শ্রীকানাই বসু

যেদিন হইবার হয় এমনি হয়। সকালবেলা মিছামিছি নীচের ফ্ল্যাটের সরসীবাবুর সহিত খানিক বচসা হইয়া গেল। বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমারই দোষ মনে হইবে। কিন্তু আরও বিবেচনা করিলে সরসীবাবুর জেল হওয়া উচিত, কমপক্ষে ছয়মাস। তবে সরসীবাবুদের সৌভাগ্য যে, প্রকৃত বিবেচনা করিবার মতো লোক বিধাতা বেশি সৃষ্টি করেন না।

অতটুকু ছেলে ঐ বুদ্ধু। পুত্রস্নেহের কথা ছাড়িয়া দিলেও মায়া-মমতা বলিয়া একটা কথা তো আছে। কিন্তু নিজের ছেলের সম্বন্ধে সরসীবাবুর হৃদয়ে ওসকল বালাই নাই। অথচ আপনার আমার কাছে কী ভালোমানুষটি। চীৎকার কাহাকে বলে জানে না, ঠোঁটে হাসিটি লাগিয়াই আছে, সদাই সবিনয়নিবেদনমিদং ভাব। মানুষ চেনা সত্যই অসম্ভব!

ভোরবেলায় সবে বিছানায় শুইয়া দুর্গানাম করিতেছি, বুদ্ধুর পরিত্রাহি আর্তস্বর কানে আসিল। ইহা নূতন নহে। কিন্তু অনেকক্ষণ সহ্য করিয়া শেষে আর থাকিতে পারিলাম না, উঠিয়া গেলাম।

ফল অবশ্য ভালো হইল না। প্রতিবাদ প্রায় কলহে দাঁড়াইল এবং বেচারা বুদ্ধু দ্বিগুণ প্রহার খাইল। অনুভব করিলাম ইহার একভাগ আমারই উদ্দেশে, আমাকে না পাইয়া ছেলের উপর পড়িল। পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

ইহা তো গেল এক পালা। অফিসে বাহির হইতেছি, দেখি রাস্তার ওপারে পাড়ার ছোট ছেলেদের একটি জনতা জমিয়াছে। নিবিড় আগ্রহে কী যেন বস্তুকে ঘিরিয়া তাহাদের কলরব চলিতেছে। কাছে গিয়া দেখিলাম একটি চিল। ডানা মেলিয়া ঘাড় গুঁজিয়া পথের উপর পড়িয়া আছে। ডানার পালকগুলি থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, নিষ্প্রভ চোখে দৃষ্টি আছে কি নাই বোঝা যায় না, মধ্যে মধ্যে ঠোঁট দুইটি ফাঁক করিয়া কী যেন চাহিতেছে।

পড়িয়া থাকিবার ভঙ্গী দেখিয়া বুঝিলাম এ পড়া হইতে আর তাহাকে উঠিতে হইবে না। আশে-পাশের বাড়ীর ছাদে, কার্ণিশে, পাঁচিলে অসংখ্য কাক এই মৃত্যুপথযাত্রীর জন্য শোকসভা করিতে বসিয়াছে, অথবা পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর পতনে আনন্দ-উল্লাস তুলিয়াছে।

একটা আস্ত জীবন্ত চিল, এত কাছে, এত শান্ত ভাবে পাওয়া ছেলেদের জীবনে পূর্ব্বে ঘটে নাই। সুতরাং তাহাদের কৌতূহলের ও আগ্রহের সীমা নাই। কয়েকজন উবু হইয়া বসিয়া গিয়াছে, কেহ বা চিলকে সম্বোধন করিয়া বাক্যালাপ জুড়িয়া দিয়াছে। একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, চিল কলা খাইবে কি না। আর একজন কবিতায় প্রস্তাব করিল, 'চিলমশাই চিলমশাই মাংস যদি চাও, রাজহংস খেতে দোবো হিংসা ভুলে যাও'।

অসীম আকাশের স্বচ্ছন্দবিহারী স্বাধীন জীবের এই অসহায় দুর্গতির অবস্থা দেখিয়া মনটা অতিশয় খারাপ হইয়া গেল। কয়েক পা চলিয়া গিয়া ফিরিয়া আসিলাম, যদি কিছু উপায় করিতে পারি।

ফিরিয়া দেখি ইতিমধ্যে একজন কোথা হইতে একটি ভাঙ্গা ছাতার শিক আহরণ করিয়া আনিয়াছে। সেইটি অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে চিলের উন্মুক্ত ঠোঁটের দিকে। তাহাকে বারণ করিতে করিতে আর একটি ছেলে হঠাৎ মুঠা দুই ধূলা বালি চিলের পিঠের উপর ফেলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে এক ধমক দিলাম, শিকওয়ালা ছেলের হাতের শিক ফেলাইলাম এবং নিরীহ জন্তুকে বিনাদোষে কষ্ট দেওয়া যে ভাল নয়, ওর দেহেও যে আমাদেরই মতো আঘাতের বেদনা বাজে, তাহা উভয়কেই বুঝাইলাম। ছেলে দুইটি চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু তাহাদের পিছন হইতে আর একটি অদৃশ্য হাতের কাজ দেখা গেল, ছোট একটুকরা ইট আসিয়া চিলের প্রসারিত ডানার উপর পড়িল। চিল যেমন চুপচাপ পড়িয়াছিল, তেমনই পড়িয়া রহিল। ছেলেরা বলিল, "বুদ্ধু, ঐ বুদ্ধু মারলে, ঐ দেখুন।" দেখিবার পূর্ব্বেই বুদ্ধু ছুট দিয়াছে।

কি করিব, ভাবিতেছি, অকস্মাৎ চিল চঞ্চল হইয়া ডানা ঝাপটাইল ছেলের দল ত্রস্ত হইয়া দূরে পলাইল। প্রাণপণ আয়াসে বাঁকিয়া চুরিয়া কয়েক গজ উড়িয়া গিয়া চিল, পুনরায় ধরা আশ্রয় করিয়া হাঁপাইতে লাগিল। ছেলেরা একে একে আবার চারিদিকে ঘিরিয়া বসিল ও দাঁড়াইল।

আমি পিছন ফিরিলেই যে বুদ্ধু ফিরিয়া আসিবে এবং অতি অল্পকালের মধ্যেই বুদ্ধুর দলই ভারি হইয়া উঠিবে, লাঠি, শিক, ইট-পাটকেলেরও অভাব হইবে না, তাহা জানিতাম। তাই অফিসের দেরি হওয়ার বিপদ মাথায় করিয়াও ছেলেদের বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম।

মনে হইল তাহারা বুঝিয়াছে। তখন এক অভিনব পন্থা উদ্ভাবন করিলাম। তাহাদেরই ভিতর হইতে কয়েকজনকে লইয়া একটি চিলরক্ষা-কমিটি গঠন করিলাম। নাম দিলাম 'দেব-শিশু দল।' ভাল নাম পাইলে নামের উপযুক্ত হইয়া উঠিতে মানুষের ইচ্ছা হয়ই। ছেলেরা খুশী হইল বলিয়া মনে হইল। বুদ্ধুকে ডাকিয়া করিয়া দিলাম দলপতি। তাহার নাম বুদ্ধুদেব এই কথাটা বার বার স্মরণ করাইয়া এই নামের মর্য্যাদা সম্বন্ধে তাহার মনে একটা উচ্চ ধারণা জন্মাইয়া দিলাম। নামের গৌরবে বুদ্ধু বুদ্ধদেব বনিয়া গেল। সে প্রবল উৎসাহে সকলকে চিলের সান্নিধ্য হইতে দূরে সরাইয়া দিল। বুদ্ধুর সহকারী হইবার জন্য বাড়ী হইতে আমার পুত্র ত্রিদিবকে ডাকিয়া আনিলাম। নয় বৎসরের ছেলে ত্রিদিব, অহঙ্কার করিতেছি না, কিন্তু কথায় বার্ত্তায়, বুদ্ধিতে বিবেচনায়, দয়াদাক্ষিণ্যে ওর মতো ছেলে যে কোনো বংশের গর্ব্বের বিষয়। ত্রিদিব আসিয়াই একজনকে আদেশ করিল বাড়ী হইতে একটু গরম দুধ লইয়া আসিতে। চিলের ঠোঁট খুলিবার কারণ যে তাহার প্রবল পিপাসা ইহা বুঝিতে কোমলচিত্ত ত্রিদিবের এক মুহূর্ত্তের বেশি লাগিল না।

দুধ পান করুক আর নাই করুক, অতঃপর বৃদ্ধ চিলের শেষ সময়টা যে সুখে না হইলেও অন্ততঃ শান্তিতে কাটিবে, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া অফিসের পথে পা বাড়াইলাম। বংশানুক্রমে ভাল কাজ করায় আত্মপ্রসাদে ছোটসাহেবের তর্জ্জনকেও তুচ্ছ করিবার উপযুক্ত সাহস তখন সঞ্চয় করিয়াছি।

অফিস হইতে ফিরিবার পথে গলির মোড়ে সরসীবাবুর সঙ্গে দেখা হইল। কর্ণের সহজাত কবচ-কুণ্ডলের মতো তাঁহার মুখে প্রসন্ন হাসিটি শোভা পাইতেছে। সকালের কথা তুলিয়া সরসীবাবু দুঃখ প্রকাশ করিলেন, বলিলেন, "সুকুমারদা, কিছু মনে করবেন না, আপনার সঙ্গে সকালে বড়ই—মানে ক্ষমা করবেন।"

নিয়ম মতো মিথ্যা কথা বলিলাম, "না না, আমি কিছুই মনে করিনি, কিছু মনে করিনি। এ আর মাপ চাইবার কী আছে।"

"সত্যি বলছি, অসহ্য হয়েছে দাদা, একেবারে অসহ্য হয়েছে। ইচ্ছে করে চুলোর সংসার-ফংসার ছেড়ে দিয়ে একদিকে চলে যাই। আপনি বিরক্ত হয়েছিলেন, সত্যিই বিরক্ত হবার কথা, হাজারবার বিরক্ত হবার কথা। কিন্তু কী শয়তান ছেলে যে হয়েছে দাদা সে আপনি ধারণা করতে পারবেন না। করেছিল কী জানেন? তবে বুলি—"

বলিলাম, "জানি, সকালে বলেছিলেন। কিন্তু কেন ওরকম করে আপনার ছেলে, তা বলুন তো?"

-"শয়তানি, আবার কেন।" তবে আর শয়তানি বলেছে কেন।"

—"না শয়তানি নয়। ঐখানেই তো আপনার সঙ্গে আমার মেলে না। শয়তানি ওর নয়, শয়তানি আপনার। মানে আপনাকে বলছি না, বলছি ছেলের গার্জ্জেনদের। আপনারাই ছেলেকে বিগড়ে দেন, অতিরিক্ত শাসন করে আপনারাই ছেলেকে শয়তান করে তোলেন। এই তো এতদিন এক বাড়ীতে আছি, পরস্পর সব কথাই শুনতে পাওয়া যায়। ক'দিন শুনেছেন আমার ছেলেকে মারধর করছি?"

হাসিয়া সরসীবাবু বলিলেন, "কিসে আর কিসে! আপনার ত্রিদিবের মতন অমন ছেলে কী মানুষের হয়! সত্যিই ত্রিদিবকুমার।"

আমার ছেলের প্রশংসা করিয়াছেন বলিয়া বলিতেছি না, সরসীবাবুর বুদ্ধি-বিবেচনা ভালোই। তবে ছেলে-মেয়ে সম্বন্ধে জ্ঞান অতি কম।

বলিলাম, "সব ছেলেই ত্রিদিবকুমার, সরসীবাবু, আমরাই তাদের রসাতলকুমার করে তুলি। যিশুখ্রীষ্ট বলেছেন স্বর্গরাজ্য শিশুদের। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছেন ছেলেরা সদা স্বর্গ

থেকে আসে, পৃথিবীতে এসেও অনেক দিন তাদের মন স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ থাকে। বুঝলেন? হিংসা-দ্বেষ আমরাই শেখাই তাদের।"

আমার ওপর শ্রদ্ধায় না হোক বিশুশ্রীষ্ট ওয়ার্ডসওয়ার্থের নামের ভারে বোধ করি ভদ্রলোক আমার কথার প্রতিবাদ করিলেন না, কিন্তু পুরা মানিয়া লইতেও পারিলেন না। বলিলেন, "তা ঠিকই বলেছেন, তবে কী জানেন দাদা, ওসব অদৃষ্টের কথা। সুসন্তান লাভ করা ভাগ্যে না থাকলে হয় না, এই তো আমাদের মনে হয়।"

শিশু-মনস্তত্ত্ব ও শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে সম্প্রতি কিছু পড়াশুনা করিয়াছি। নিজেও কিছু মৌলিক চিন্তা করিয়া থাকি। সুতরাং সরসীবাবুর অদৃষ্টবাদে অন্ততঃ আমি সায় দিতে পারি না। কথা কহিতে কহিতে তখন আমরা বাড়ীর সামনে আসিয়া পৌছিয়াছি। সরসীবাবু নিজের ফ্লাটের দরজা ঠেলিয়া প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। আমি বলিলাম, "দাঁড়ান, সরসীবাবু, ওকথা বলে নিজেকে ঠকাচ্ছেন। অদৃষ্ট কিছু নেই এ ব্যাপারে, সবই দৃষ্ট। আমার হাতে আপনার ছেলেকে এক বছর রাখুন, দেখুন আপনার 'বুদ্ধু'কে আমি বুদ্ধ করে তুলতে পারি কী না। না না হাসি নয়। আমার এ চ্যালেঞ্জ (challenge) করা রইল। যত দুষ্টু হ'ক— আচ্ছা কথার দরকার কী, আপনি রাজি আছেন আমার হাতে আপনার ছেলেকে ছেড়ে দিতে?"

সরসীবাবুর মৃদু হাসি উচ্চ হইল। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বেঁচে যাই সুকুমারদা, বেঁচে যাই।"

"কিন্তু আমি যা করব তাতে আপনি কথাটি কইতে পারবেন না।"

"কথা কওয়া কী মশাই, আমি ফিরে দেখবও না। আপনি ওকে মারুন, কাটুন, বাড়ী থেকে বার করে দিন—" বলিতে বলিতে তিনি হাতের ছাতি চৌকাঠের উপর ঠুকিলেন।

"ঐ তো। গোড়া থেকেই ভুল করছেন। মারব কাটবই যদি, তা হলে তো আপনার হাতে থাকলেই চলতো। ও লাইনে আপনিই এক্সপার্ট। আমার পন্থা ও নয় সরসীবাবু। ছেলেদের দিতে হবে ভালবাসা, তাদের অন্তরের মধ্যে যে দেবতার আছে, তারই পোষকতা করতে হবে। তাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে হবে—যাক, সে সব ডিটেল্‌স্‌ আপনার কাছে বলে লাভ কী। আপনি কাজে দেখে নেবেন, আমার শিক্ষা, আর তার ওপর ত্রিদিবের দৃষ্টান্ত, এই দুইয়ে মিলিয়ে—"

সরসীবাবু পুনরায় চৌকাঠ ডিঙাইতে উদ্যত হইলেন। আমার মাথায় এক মতলব আসিল। বলিলাম, "সরসীবাবু, পাঁচ মিনিটের জন্যে একবারটি ওপোরে আসতে পারবেন? অবশ্য যদি কষ্ট না হয়। একটা বিশেষ কথা বলব।"

"না না কষ্ট আর কী, চলুন না।"

সরসীবাবুকে লইয়া আমার ঘরে আসিয়া যথারীতি ডাক দিলাম, "ত্রিদিব।"

"যাই বাবা", বলিয়া ত্রিদিব তাহার খাতাখানি লইয়া আসিয়া সামনে ধরিল। খাতায় আজিকার তারিখ দিয়া ত্রিদিবের মুখের দিকে চাহিলাম। বড় বড় সরল চোখ দুইটি আমার চোখে মিলাইয়া ত্রিদিব বলিল, "এক নম্বর, ছুটে যেতে যেতে সকালে পা লেগে দুধের বাটিটা উল্টে গিয়েছিল বাবা।"

সেইটি লিপিবদ্ধ করিয়া কলম থামাইলে ত্রিদিব বলিল, "দু'নম্বর, খুকীর দুটো ল্যাবেঞ্চুস আমার মনে করে গালে পুরে দিইছিলাম।"

"হুঁ, আর কিছু?"

"আর কিছু নেই বাবা, আজ।"

"আচ্ছা, এবার থেকে সাবধান হয়ে চলবে, কেমন? আর একটা কাজ করলেও হয়। কালকে তুমি তোমার ভাগ থেকে খুকুকে দুটো ল্যাবেঞ্চুস দিয়ে দিতে পারো, যদি ইচ্ছে কর, কী বল।"

ভবিষ্যতে সাবধান হইয়া চলিবে এবং খুকীর লোকসান কালই পূরণ করিয়া দিবে, ইহা জানাইতে ত্রিদিব ঘাড়টি হেলাইয়া দাঁড়াইল। কাছে টানিয়া লইয়া আদর করিয়া তাহার দুইটি মুঠায় চকোলেট ভরিয়া দিলাম। ইহা সত্য-কথা বলার পুরস্কার। এক হাতের মুঠা মুখের মধ্যে খালি করিয়া দিয়া খাতা লইয়া ত্রিদিব প্রস্থান করিল।

সরসীবাবু অবাক হইয়া চাহিয়া আছেন। থাকিবারই কথা। জিজ্ঞাসা করিলাম, "বুঝতে পারছেন, সরসীবাবু?"

সরসীবাবু হাসিমুখে বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, বুঝতে পারছি

বই কি। কিন্তু ব্যাপারটা কী বলুন তো? আর ঐ খাতার লেখা?"

সরসীবাবু যাহা বুঝিয়াছেন তাহা বুঝিলাম। বলিলাম, "ব্যাপার বলবার জন্যই তো আপনাকে ডাকলুম ওপরে। ও খাতাটির নাম হচ্ছে "কুকীর্ত্তির খাতা"। আর এই যা দেখলেন, শাসনই বলুন আর শিক্ষাই বলুন, এই আমার সব। নিজের দোষ নিজে থেকে এসে প্রকাশ করার সাহস দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেছেন তো? কিন্তু আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। আপনার আমার কাছে এ অবশ্য খুবই শক্ত ব্যাপার। কিন্তু শিশুদের কাছে এইটেই সহজ, এইটেই স্বাভাবিক। মিথ্যে, কপটতা, নৃশংসতা, হিংসা এসব ওরা পাবে কোথায়। ওরা যে নন্দন-কাননের কুসুম—"

হঠাৎ নীচের রাস্তা হইতে একটা কোলাহল শোনা গেল। বক্তৃতা থামাইলাম। জানালার ধারে গিয়া দেখিলাম সকালের সেই মৃতপ্রায় চিল। সকালের মতোই ছেলের দল চিলের দেহ ঘিরিয়া রহিয়াছে। চিলের একটী পা হইতে একগাছি লম্বা দড়ি চলিয়া গিয়াছে আমার দৃষ্টির বাহিরে। ঐ দড়ির টানেই ইহাকে এখানে আনা হইয়াছে এখন। দু' একজন ছেলের হাতে বাঁকারি বা কঞ্চির টুকরা। উদ্দেশ্য বলা বাহুল্য। বৃদ্ধ চিলের কী নিগ্রহ হইয়াছে, এবং সারা পাড়াটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া সারাদিনই যে তাহার পরলোকের যাত্রা চলিয়াছে, তাহা বুঝিতে বেশি অনুমান-শক্তির প্রয়োজন করে না। দেহ ক্ষত-বিক্ষত, ডানার পালক অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে, জলে কাদায় ধূলায় বালিতে গায়ের রঙ প্রায় বদলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু কী কঠিন প্রাণ, বেচারি এখনো শান্তি পায় নাই, এখনো তাহার লুপ্তপ্রায় ডানা রহিয়া রহিয়া থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

উপর হইতে ধমক দিয়া দুর্বৃত্তদের তাড়াইতে চেষ্টা করিলাম। চিলরক্ষা-কমিটির কাজ সার্থক হইয়াছে এমন ভরসা পাইলাম না। তবু ত্রিদিবকে ডাকিয়া নীচে পাঠাইয়া দিলাম দেব শিশুর কাছে।

চিলের ইতিবৃত্ত বলিতে বলিতে সরসীবাবুকে লইয়া নীচে নামিলাম। চিল রক্ষার কাজে বুদ্ধুর উৎসাহ ও ত্রিদিবের সহৃদয়তার কাহিনী শুনিয়া সরসীবাবুর মুখে কথা সরিল না। সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছিয়া উভয়ে দাঁড়াইলাম। ফ্ল্যাট-বাড়ীর সিঁড়ি, একেবারে সদর দরজা হইতে উঠিয়াছে।

সরসীবাবুর মন্তব্যের প্রতীক্ষা করিয়া আছি, কানে আসিল রাস্তা হইতে ত্রিদিবের সুমিষ্ট কণ্ঠ।

…"এই বুদ্ধু, দেখ না ভাই, বারণ করছি তবু ভোলা চিল ছুঁড়ছে। ওর তিনবার হয়ে গেছে তো। এই ভোলা, বলছি আগে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাই। যাও অমন করলে ভোলাকে নিয়ে খেলব না। আমি বলে কত কষ্ট করে দড়ি বাঁধলুম, চৌবাচ্চায় চান করালুম। এই ভোলা, ফের। বাবাকে ব'লে দেবো যখন তখন দেখবে।"

সরসীবাবু বুদ্ধুকে মানুষ করিবার ভার লইবার কথা কী যেন বলিলেন এবং সহাস্যবদনে জবাবের আশায় আমার মুখের পানে চাহিলেন। এ তাঁহার সাধারণ অর্থহীন হাসি, অথবা অর্থপূর্ণ বিশেষ হাসি, তাহা বুঝিলাম না। বুঝিবার চেষ্টাও না করিয়া দ্রুতপদে বাহিরে গিয়া ত্রিদিবের কাণ ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিতে টানিতে উপরে লইয়া চলিলাম। না চাহিয়াও দেখিতে পাইলাম সরসীবাবু হাসিমাখা মুখে চাহিয়া আছেন আমাদের দিকে।

বাঙ্গালার বিদ্যায়তন বা পাঠশালা

ভাগ করিলে দেখা যায়, মাত্র ৮৩টী কলেজ; হাইস্কুল ১,৫৫৭, মধ্য ইংরাজি ২,৬০০, প্রাথমিক ৫১,৮৮০ ও শিল্প প্রভৃতি বিশেষ শিক্ষার জন্য ৩,৮৭০ আছে।

সর্ব্ব সাকুল্যে শিক্ষার জন্য খরচ হয় ৫,৪৭,৫৮,২৫৫ টাকা। তাহার মধ্যে অভিভাবকেরা মাহিনা দেয় ২,২৯,২৪,৩২৭ টাকা অর্থাৎ শতকরা ৪১·৮; সরকারী খরচ ১,৮৪,৮৮,৮১৯ বা ৩৩·৭%. ডিষ্ট্রিক্ট (বা জেলা) বোর্ড ৩০,৮৯,১৫৯ বা ৫·৬, মিউনিসিপ্যাল তহবিল হইতে ২০,৩৮,৮৮ টাকা বা ৩·৭ এবং অপরাপর (দান প্রভৃতি) ৮২,১৬,৯৮২ টাকা বা ১৫·০%।



আফ্‌গানিস্থান

পরিব্রাজক

পশ্চিম সীমান্ত পার হইয়া ভারতবর্ষ যদি স্থলপথে বহির্জ্জগতের দিকে অগ্রসর হয় তবে তাহার সহিত যে বিদেশিনীর সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাৎ হইবে তিনি ইরাণীয়া। পারস্ত, আফ্‌গানিস্থান ও বেলুচিস্থান এই তিনটি দেশকে এক নামে চিনিতে হইলে ইরাণীয়া নামে ডাকিতে হইবে। বস্তুতঃ ইরাণীয়া বলিলে সিন্ধুনদ ও টাইগ্রিস্‌ নদের মধ্যবর্ত্তী যে বিস্তীর্ণ মালভূমি বিরাজ করিতেছে তাহার সমস্তটাই বুঝায়। অনেকে অনুমান করেন, ইহাই আর্য্যদের আদি বাসভূমি। অবশ্য কাস্পিয়ান্‌ হ্রদের অতি সন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহই আদি আর্য্য-বাসভূমি এ ধারণাও অনেকে পোষণ করেন।

ভারতবর্ষের মানচিত্রের সহিত যুক্ত হইয়াও বেলুচিস্থান রাজনীতি সমাজনীতি ও সকল নীতিতে ভারতবর্ষ হইতে স্বতন্ত্র। ঝোড়ো হাওয়া



পুরাতন স্তম্ভ

ও বৃষ্টিপাত প্রভৃতি মনসুনের প্রকোপ হইতে বেলুচিস্থান মুক্ত। শুষ্ক মরুময় মালভূমি এই বেলুচিস্থান। যে স্থানগুলি ইংরেজের অধিকারভুক্ত সে স্থানগুলি অপেক্ষাকৃত উর্ব্বর। নেটিভ্‌ ষ্টেটের মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ নেটিভ্‌ ষ্টেট্‌ কালাত্‌। এই অনুর্ব্বর বেলুচিস্থানে প্রতি বর্গমাইলে মাত্র ছয়জন লোক বাস করে। অধিকাংশ লোকই ভবঘুরে বা যাযাবর সম্প্রদায়ের। গরু, মেষ, ঘোড়া, উট্‌, স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি সঙ্গে সঙ্গে লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া কালাতিপাত করে। স্থাবর সম্পত্তিই যদি থাকিবে তবে আর যাযাবর বৃত্তি কেন? মরুদেশের পোড়ামাটির মায়া তাহাদের বাঁধিতে পারে নাই। গ্রীষ্মকালে বৃক্ষশাখা-নির্ম্মিত আচ্ছাদন-বিশিষ্ট স্থানে, কখনও বা ভেড়ার লোমের কম্বলে আবৃত তাঁবুতে তাহারা আস্তানা গাড়ে। শীতের সময় গ্রামের মধ্যে মাটির ঘরে আশ্রয় লয়। কেবল মাত্র এই শীতের সময়ই তাহারা মাটি মায়ের স্নেহের আঁচলে বাঁধা পড়ে।

'শিবি'র সৈন্য-শিবির ও রাজধানী কোয়েটায় যা একটু প্রাণস্পন্দন। এই তো মাত্র দুইটি সহর। কোয়েটার ভূমিকম্পের পর ঐ নামটির সহিত বিশেষ ভাবে আমাদের পরিচয় হইয়া গিয়াছে। কোয়েটায় সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার জন্য একটি দুর্গ আছে। মরুভূমিতে একমাত্র বাহন উট। 'কুব্জ পৃষ্ঠ কুব্জ দেহ' সারি সারি উট চলিয়াছে, চিত্রটি সহজেই মানসনেত্রে উদিত হয়।

ভারতবর্ষের সহিত নিকটতম সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে বোলান পাস্‌। এই স্থানে সীমান্ত রক্ষার বিধিব্যবস্থা আছে।

বেলুচিস্থান, পারস্ত ও আফ্‌গানিস্থান এই তিনটি দেশই ইরাণীয়া। পারস্যের প্রসঙ্গ আজ তুলিব না। আমানুল্লার নামের সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত এই আফ্‌গানিস্থান। অতি আধুনিকতা আফ্‌গানিস্থান কেন সহিতে পারিল না তাহা বুঝিতে হইলে আফ্‌গানিস্থানকে সকল রকমে চেনা দরকার।

উত্তরে রুশীয় তুরস্ক, (বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বের সীমানা) পশ্চিমে পারস্ত, পূর্ব্বে ও দক্ষিণে কাশ্মীর, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশ ও বেলুচিস্থান।

আফ্‌গানিস্থানের জলবায়ু সম্বন্ধে যতটা অবগত হওয়া যায়, তাহাতে জানিতে পারা যায়, উত্তরের জলবায়ু অতি শীতোষ্ণ, অর্থাৎ শীতের সময় সেখানে খুব বেশীরকম শীত পড়ে, আর গ্রীষ্মের সময় খুব বেশীরকম গরম। 'কাবুলে' বৎসরের দুই তিন মাসের উপর বরফ পড়ে। ঘরের ভিতর আগুনের পাশে কাটানো ছাড়া শরীর গরম রাখিবার কিম্বা শীতের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় থাকে না। এই কাবুল হইতে কাবুলীওয়ালা নাম আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ঐ নামের গল্পটী এই সূত্রে মনে পড়ে। আর

মনে পড়ে সুদখোর কাবুলীওয়ালা সম্প্রদায়ের কথা। দীর্ঘ দেহবিশিষ্ঠ ও দীর্ঘ যষ্ঠিধারী কাবুলীওয়ালা আমাদের দেশে 'সাইলক্ দি জু' নামক প্রসিদ্ধ সেক্সপীয়ারের অমর সৃষ্ট নায়কের মতই অর্থলিপ্সু এই কল্পনা আজও আমাদের মনে বিরাজ করিতেছে। যাক্ সে কথা। 'গজনী' সহরেও খুব তুষারপাত হয়। কথিত আছে যে, তুষার-ঝঞ্ঝাপাতে প্রতি বৎসরই গজনী সহরের প্রভূত ক্ষতিসম্পাদন হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে সর্ব্বত্রই গ্রীষ্মের উত্তাপ খুব বেশী পরিমাণে অনুভূত হয়। বিশেষতঃ 'কান্দাহারের' নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে গ্রীষ্মের মাত্রা সব চেয়ে বেশী। 'হিরাতে' উত্তর-পশ্চিমের প্রবল বায়ু প্রবাহিত হওয়াতে এখানকার গ্রীষ্মের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। শীতকালেও হিরাতে বরফ বেশীদিন স্থায়ী হয় না।

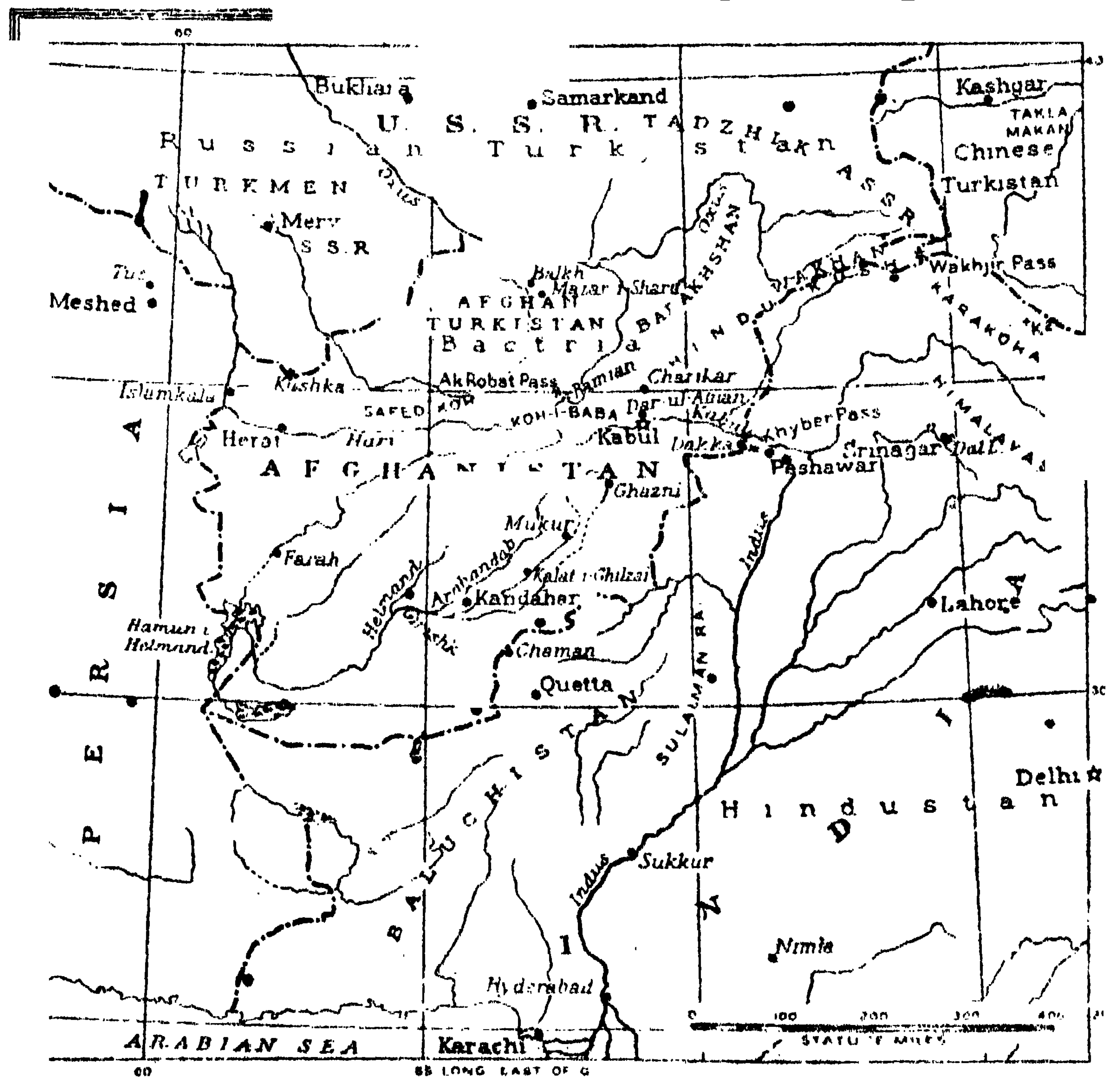
আফ্‌গানিস্থানের অধিকাংশ স্থানই ৪০০০ ফুটেরও উচ্চ এবং অনেক পর্ব্বতশৃঙ্গ ১৫,০০০ ফুট কি তাহার চেয়েও উচু। এই সব পাহাড়ের উপর বড় বড় অনেক পাহাড়ী গাছ রহিয়াছে, তন্মধ্যে কর্ণিকার জাতীয় গাছগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ইউ, হ্যাজেল, জুনিপার, ওয়ালনাট, বন্যপীচ ও অলমণ্ডও প্রচুর পাওয়া যায়। এই সকল গাছের নিম্নদেশে নানা জাতীয় গোলাপ, হানিসাকেল, ক্যাকেট, গুজ্‌বারী, হউথর্ণ, রডোডেনড্রন্ প্রভৃতি পুষ্প হয়। লেমন ও বন্য-মদ্য উত্তর পর্ব্বতাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। যেখানে চাষাবাদ সম্ভব সেখানে জল সরবরাহের বন্দোবস্ত করিয়া তবে চাষাবাদের ব্যবস্থা করিতে হয়।

ভারতবর্ষের মতই আফ্‌গানিস্থানে দুইটি ফসল জন্মে। একটি ফসলের বহারক বা বসন্তের ফসল—অন্যটির নাম পাইজা, (অথবা তিরমাই) বা হেমন্তের ফসল। বহারক হেমন্তঋতুর শেষভাগে বোনা হয়, ফসল কাটা হয় বসন্তে। আর তিরমাই, বোনে বসন্তের শেষে, শস্য কাটিয়া ঘরে তোলে হেমন্তে। ধান্য, মিলেট, সোরগম, তামাক, বীট ইত্যাদি ফসলও পাওয়া যায়। উচ্চভূমিতে মাত্র একটি ফসল জন্মে। পূর্ব্ব পাহাড়তলীতে বাজরা প্রধান ফসল। সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে তরমুজ, বাঙ্গি বা ফুটি ইত্যাদি গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ফল ইত্যাদিও জন্মিয়া থাকে।

কাবলী-বেদানার নাম পূর্ব্বপদে কাবলীযুক্ত কেন হইল তাহা সহজেই অনুমেয়। আঙ্গুর ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

আকৃতি দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হইলে, আফ্‌গান জাতি অতি সৌম্যদর্শন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। একজন বিদেশী লেখক বলিতেছেন, "হিরাত সহরে আমি একজন প্রৌঢ় আফ্‌গানের ফটো তুলিয়াছিলাম—তাহার নয়ন তারকার ন্যায় ঐরূপ সম্মোহিনী নয়ন-তারকা, দীর্ঘ নাসিকা, দৃঢ় ওষ্ঠ ও শ্বেত শ্মশ্রু যে কোন জনতার ভিড়ে তাহাকে আলাদা করিয়া স্বতন্ত্ররূপে নয়নের সম্মুখে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবে। একটি শুভ্র টার্‌বান্ তাহার পরা ছিল: ওয়েষ্ট কোট ও দোদুল্যমান বহির্ব্বাস, সমস্ত মিলিয়া তাহাকে অপূর্ব্ব শ্রী-মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল।"

যদিও আমরা আফ্‌গানিস্থান (বা আফ্‌গানদের বাসভূমি) বলিয়া উক্ত দেশকে অভিহিত করি, তথাপি নিজেদের মধ্যে উহারা ঐ নাম ব্যবহার করে না। তাহারা নিজেদের বেন্-ই-ইস্‌রাইল্ বা ইসরাইলের সন্ততি বলিয়া পরিচয় দেয়। গ্রীক, খালিফ, ঘোর, মঙ্গল, ও মোগল আধিপত্যের ভিতর দিয়া আফ্‌গানিস্থান বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। অতীতের ইতিহাস লইয়া আলোচনা না করিয়া বিংশশতাব্দীর আফ্‌গানিস্থানের কিছু পরিচয় আমরা লইব। আব্দার রহিম ২১ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৯০১ খৃষ্টাব্দে মারা যান। আব্দার রহিমের রাজত্বকাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, তিনি এমন একটি গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন যাহা পূর্ব্বে কখনও সম্ভবপর হয় নাই। ফিউডাল্ সময় সজ্ঞের পরিবর্ত্তে তিনি ট্রাইবাল্ প্রধানদের



আফ্‌গানিস্থান

অধীনে সমরশক্তি নিয়ন্ত্রিত করেন। এই শক্তিকে যথোপযুক্ত মাহিয়ানা দেওয়া হইত এবং স্থায়ী শক্তিরূপে তিনি ইহাদিগকে নিযুক্ত করেন। সৈন্যগণ সুশিক্ষিত, অস্ত্র-শস্ত্র শোভিত এবং নিয়মিতভাবে বেতন পাইতে

লাগিল। তাহারা কেবল আব্দার রহিমেরই আনুগত্য স্বীকার করিবে, অন্য কাহারও নহে। এই সৈন্য শক্তির সাহায্যে তিনি কেন্দ্রস্থ গভর্ণমেণ্ট চালাইতে লাগিলেন। সমস্ত শক্তি তিনি নিজের হাতে রাখিলেন এবং সমস্ত কর ধার্য্য করিয়া সুনিয়মিতভাবে তাহা আদায় করিতে লাগিলেন। তিনি দুর্দ্ধর্ষ



আফগান প্রৌঢ়

ও নিষ্ঠুর ছিলেন বটে, কিন্তু প্রজাদের সুখ সুবিধার জন্য স্থানীয় প্রধান ব্যক্তিদের অত্যাচার, ডাকাতী ও খুন প্রথম অচিরেই দমন করিয়া ফেলিলেন। যদিও তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, দেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য বিস্তারকল্পে রেল, টেলিগ্রাফ ইত্যাদির প্রয়োজন, তথাপি অন্য দেশীয় লোক তাহার মাতৃভূমিতে প্রবেশ করিয়া অদূর ভবিষ্যতে প্রাধান্য লাভ করিয়া বসে এই আশঙ্কায় তিনি উক্তবিধ আয়োজনে নিরস্ত ছিলেন। তাহার মৃত্যুর দুইদিন পরে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হবিবুল্লা পৈত্রিক সিংহাসন অধিকার করেন। হবিবুল্লা শুল্কের হার কমাইয়া দিয়া গরীব প্রজাদের উপকার সাধনে মনোনিবেশ করেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধের সময় হবিবুল্লা ইংরাজ সরকারের সহিত সন্ধিবদ্ধ হইয়া আফগানিস্থানকে নিউট্রাল বা যুদ্ধ-বিরত রাজ্যরূপে রাখেন এবং বিগত যুদ্ধে শেষ পর্য্যন্ত আফগানিস্থান নিউট্রাল দেশই ছিল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে গুপ্ত ঘাতকের হস্তে হবিবুল্লা নিহত হন। তদীয় ভ্রাতা নসিরুল্লা খাঁ মাত্র ছয়দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার পরেই তাহার আত্মীয় আমানুল্লা সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। তখন জনসাধারণের মন বিক্ষুব্ধ, সকলে ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার জন্য উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। আমানুল্লা বাধ্য হইয়াই যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২রা মে ভারত-সীমান্ত অতিক্রম করিয়া আফগান সৈন্যগণ ভারতে প্রবেশ লাভ করিল। কিন্তু এ খণ্ডযুদ্ধ উক্ত বর্ষের ৮ই আগষ্টের সন্ধিপত্রেই শেষ পরিণতি লাভ করে।

আমানুল্লা পাশ্চাত্য সভ্যতায় মুগ্ধ হইয়া অপ্রস্তুত আফগানিস্থানকে লইয়া কিরূপ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন—তাহা বেশী দিনের ঘটনা নহে। অনেকেরই সে কথা স্মরণে আছে। সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা নারী-শিক্ষা ও নারী-জাগরণের প্রচেষ্টা—এ বিষয়ে তাহার বিদুষী ভার্য্যা বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। কোন চেষ্টাই বিফলে যায় না। আঘাত এক সময় আসিবেই। কোন কোন ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যে ক্ষুদ্র আলোড়ন অঙ্কুরিত হইয়া ওঠে, অকস্মাৎ তাহা পূর্ণ বিকশিত হইয়া কখন বিশাল মহীরূহে প্রকাশিত হয় তাহা সকলের চোখে ধরাও পড়ে না। আফগানিস্থানের এই নব জাগরণ, সমস্ত জগতের সঙ্গে সঙ্গে, তালে তালে পা ফেলিয়া চলিবার অদম্য আগ্রহ নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইবে না। বহুদিনের সংস্কৃতি ও সভ্যতার সহিত বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা ও সাধনা নিশ্চয়ই অচিরে শুভফলপ্রসূ হইবে।

বাঙ্গালার শিক্ষা—প্রাথমিক অবস্থায় (Primary Stage):

ছাত্রছাত্রী মোট ২৯,৮১,০৫৩; পাঠশালা সংখ্যা—৫১,৮৮০; মোট ব্যয় ১,০২,১৮,৬৮২ টাকা; সকল প্রকার আয় হইতে প্রতি ছাত্রছাত্রী জন্য ব্যয় হয় ৩।৶৩ পাই, তন্মধ্যে সরকারের অংশ ১।৶১১ পাই।

ভারতীয় (পুরুষ) ছাত্র প্রতি ব্যয়:

মোট ছাত্র সংখ্যা ২২,৮৩,১২৬; মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৮৫,২০,৯৬৮ টাকা। সকল প্রকার আয় হইতে প্রতি-ছাত্রের জন্য ব্যয় হয় ৩।৶৩ পাই, তন্মধ্যে সরকারের অংশ ১।৶১১ পাই।

মধুসূদন, মোদো ওরফে টেঁপু

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

(মেস-চিত্র)

গ্রামের লেখাপড়া শেষ করিয়া যখন সহরে পড়িতে আসিবার কথা হইল, তখন বড়ই চিন্তায় পড়িলাম। মা, পিসিমা, ছোটবোন লক্ষ্মী আর পুরাতন লোক রহিমকে ছাড়িয়া কখনও কোথায় থাকি নাই; বড়ই চিন্তায় পড়িয়া গেলাম।

মেসে আসিয়া সে চিন্তা বহুগুণ বাড়িয়া গেল। কাহারও সহিত আলাপ করিতে পারি না। প্রথম প্রথম সকলকেই দেখি আমাপেক্ষা ধনী, আমাপেক্ষা বুদ্ধিমান, কর্ম্মব্যস্ত। সামান্য দু'চারটা মামুলী কথা ছাড়া বিশেষ কাহারও সহিত আলাপ হয় না।

একটা স্থান পাইয়াছিলাম বটে, শুনিলাম সেইখানে একখানি চার হাত লম্বা এবং দুই বা আড়াই হাত চওড়া তক্তপোষ পাতিতে হইবে। আমার বাসের সীমানা প্রায় তাহাতেই নিবদ্ধ। আর, একটী ছোট টেবিল পাতিয়া লইয়া মাসে চার টাকা দিতে হইবে। চক্ষু কপালে উঠিল। গ্রামে আমাদের সমস্ত বাড়ীটার ভাড়া কেহ চার টাকা দেয় না। বিছানা প্রভৃতি করা অভ্যাস ছিল না; মা পিসিমা করিতেন। তবে গরীবের ঘরের ছেলে বলিয়া কাজ চালাইয়া লইতে বিলম্ব হইল না। গোল বাঁধিল খাবার সময়; কখন ঠাকুর চাকর কি শব্দ করে আর চট্‌পটাপট্‌ শব্দে সিঁড়ি ধ্বনিত হইয়া উঠে ঠিক বুঝিতে পারিতাম না। পরে বুঝিতে শিখিলাম, সেটা খাইতে যাইবার অভিযান। ধীরে ধীরে গিয়া দেখি খাবার ঘর ভর্ত্তি, এমন কি যাঁহারা ছুটিয়াছিলেন, তাঁহারাও কেহ কেহ বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতেছেন; কারণ, আরও চতুর যাঁহারা তাঁহারা 'সিগন্যাল্‌' পড়িবার পূর্ব্ব হইতেই স্থান অধিকার করিয়া আছেন। এই আগে বসার কি গুরুতর অর্থ তাহা অনুধাবন করিতে অনেক সময় লাগিয়াছিল।

খাইতে বসিলে কেহ জিজ্ঞাসা করিত না, আমার আর কিছু চাই কি না। চাহিতে পারিতাম না, বলিতে পারিতাম না; দেখি অপর অনেক থালায় বাটীতে যাহা পড়ে, তাহা আমার কপালে জোটে না, পেট ভরিত না। ঘরে বসিয়া ক্ষুধায় ছটফট্‌ করিতাম, নীরবে কাঁদিতাম, মার উপর রাগ হইত। কিন্তু উপায় কি! আমার লেখাপড়া শিখিবার আশায় মা কষ্ট করিয়া মুঠা মুঠা টাকা খরচ করিতেছেন, সুতরাং কষ্ট সহ্য করিতে হইত। অপর অনেকে যে ভাবে আহারাদি, বাসস্থান এবং ঠাকুর-চাকরের সুবিধা করিয়া লইতেন, তাহার অনেকগুলিই আমার শক্তি বা সাহসের বাহিরে, অনেকগুলি আমার নীচুতা বলিয়া মনে হইত বলিয়া উপেক্ষা করিতাম। মোটের উপর গেঁয়ো গোবেচারা হইলে যাহা হয়, তাহাই হইত। অন্যান্য দুঃখ যে জুটিত না, অন্ততঃ মেসে থাকার যে সকল সুখ তাহা ভোগে আসিত না, তাহাও সহ্য করিতাম। কিন্তু মেসজীবনের বিচিত্রতায় ইহার অনেকটা গা-সওয়া হইয়া আসিল।

আমার প্রধান সঙ্গী হইল, অর্থাৎ যাহার সঙ্গে একটু প্রাণ খুলিয়া কথা বলিতাম সে মেসের সহকারী কর্ম্মচারী বা পরিচারক মধুসূদন, মোদো ওরফে টেঁপু বা ট্যাপা। যিনি 'হেড' বা প্রধান পরিচারক তিনি বড় বড় বাবু লইয়া বিব্রত, আমার মত লোকের প্রতি তাহার দৃষ্টিপাত করিবার সময় ছিল না। কখনও তাহাকে কোনোও কাজ করিতে বলিতাম না; যদিই বা সাহস সঞ্চয় করিয়া কিছু বলিয়া ফেলিতাম, তাহা সম্পাদন করিতে সে যে ভাব প্রকাশ করিত তাহার পর আরও দুই চার দিন কাটিয়া যাইত তাহাকে দ্বিতীয় অনুরোধ করিতে। কিন্তু টেঁপু ছিল ভিন্ন রকমের; ফাঁক পাইলেই সে সুখ-দুঃখের কথা বলিত এবং এক আধটা হুকুম বিনা ওজর আপত্তিতে তামিল করিত। লোকে তাহাকে বোকা বলিয়া মনে করিত এবং তাহার সহিত কিছু বিদ্রূপও করিত।

হঠাৎ মধুসূদন হইতে টেঁপু নাম হওয়ার কারণ বুঝিলাম, তাহার ভাত 'সেবনের পূর্ব্বের ও পরের অবস্থা' হইতে। ভাত খাইবার পূর্ব্বে তাহার ছাতিতে ও উদরের পরিধিতে তফাৎ থাকিত না; কিন্তু দুপুর বেলা খাইবার পর ব্যবধান কতখানি দাঁড়াইত কেহ না মাপিলেও সে পার্থক্য সহজেই বোঝা যাইত। তখন তাহার উদরের ছাল প্রায় স্বচ্ছ হইয়া উঠিত এবং শিরাগুলি বেশ পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিত। কেহ বা তাহাতে যত্নে হাত বুলাইত, কেহ বা দুষ্টামি করিয়া আঙ্গুলের খোঁচা দিত; টেঁপুর মুখে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিত।

টেঁপু সকালে সকলের জল খাবার আনিত, পয়সায় একখানা গরম জিলাপী খাওয়ার রেওয়াজ তখন মেসে চলিতেছিল। কাঁচা জিলাপীর প্যাঁচ শেষ হওয়ার স্থানে ময়দার একটী পুঁটলী বা ডেলা থাকে, ভাজিয়া রসে ফেলিলে তাহা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলে ভোক্তার জিলাপী ও পান্তুয়া খাওয়ার স্পৃহা তৃপ্ত লাভ করে। একদিন সকালে দেখি টেঁপুর উপবিষ্ট অবস্থায় সামনে এক শালপাতায় কয়েকটা রসগোল্লা ও জিলাপী রহিয়াছে। সকালেই মধুসূদনের 'টেঁপ' ফুলিয়া গিয়াছে,

চক্ষু দিয়া অজস্র ধারা নামিতেছে এবং মেসের দলপতিরা তাহার সামনে ভিড় করিয়াছে। টেঁপুর স্বভাব আমার



টেঁপু পথ চলিতে চলিতে রসগোল্লা উচ্চে তুলিয়া টিপিতেছে…

জানা ছিল, কারণ সকালে জল-খাবার খাইবার আমার সঙ্গতি ছিল না; কচিৎ ক্ষুধার তাড়নায় খাবার আনিতে গেলে আসিবার সময় টেঁপুর সহিত সাক্ষাৎ হইত। দূর হইতে দেখিতে পাইতাম টেঁপু রসগোল্লা উচ্চে তুলিয়া টিপিতেছে, আর রস নিঙড়াইয়া তাহার গালে ক্ষীণ ধারায় পড়িতেছে। মেসের নিকট আসিয়া রসগোল্লা টিপিয়া-টাপিয়া গোল করিয়া লইত। দোষ বুঝিতাম, কিন্তু আমার মত ক্ষুধা উহারও পায় মনে করিয়া আমি কখনও, কাহাকেও বলি নাই। জিলাপী সম্বন্ধে তাহার দুর্ব্বলতা ছিল কিনা আমার জানা ছিল না।

সকালের কাণ্ড হইতে বুঝিলাম, আমাদের রতনবাবু সেদিন তাহাকে জিলাপী আনিতে দিয়াছিলেন। এ কার্য্য রতনবাবু কখনও করিতেন না, কারণ তাঁহার বাড়ীর অবস্থা ভাল থাকিলেও পাঠ্যাবস্থায় এসকল অপব্যয় তিনি কখনও পছন্দ করিতেন না। তিনি জিলাপী না কিনিলেও জিলাপীর পূর্ণাবস্থায় কোথায় কোন্ অঙ্গ বর্ত্তমান তাহা তাঁহার ভাল রকমই জানা ছিল। সেদিন তাঁহার জিলাপী আসিলেই প্রথম লক্ষ্য করিলেন জিলাপীর টাঁপ বা পুটুলি অন্তর্হিত হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ তিনি গোলমাল করিয়া উঠিলেন এবং দলপতিদের নিকট তাঁহার নালিশ পেশ করিলেন। বিচারের রায় তিনিই দিয়া দিলেন—"ব্যাটাকে পুলিশে দেওয়া হউক, আর না হয় আচ্ছা ঘাকতক দিয়া, তাহার বাকী মাহিনা না দিয়া, তাড়াইয়া দেওয়া হউক।" কেহ বলিলেন যে, তাঁহারা রোজ জিলাপী খান, কিন্তু ঐ অংশ তাঁহারা কোনও দিন দেখেন নাই। সুতরাং সম্ভবতঃ উহা হয় ত' তৈয়ারী হয় না। রতনবাবু তৎক্ষণাৎ দেখাইয়া দিলেন যে, জিলাপীর amputated (বিচ্ছিন্ন) অংশ হইতে তখনও রস নির্গত হইতেছে। সুতরাং যাঁহারা টেঁপুর পক্ষাবলম্বন করিতেছিলেন তাঁহারা এই অকাট্য প্রমাণের পর আর কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহারা বুঝিলেন টেঁপু রোজই ঐরূপ করে। এমন সময় একজন বলিয়া দিলেন, টেঁপু রসগোল্লার রস নিংড়াইয়া খায়। আর যায় কোথায়? এই দুই ঘোরতর অপরাধ সপ্রমাণিত হইবার পর গুরুদোষে লঘু সাজা দিবার অভিপ্রায়ে সংখ্যা-গুরুর মতে স্থির হইল, তাহাকে ভরপেট রসগোল্লা জিলাপী এমন খাইতে হইবে, যাহাতে ভবিষ্যতে তাহার ঐ লোভ আর না হয়। চালাকী করিয়া 'পারিব না' বলিলে ছাড়া হইবে না। রতনবাবু মনে করিলেন টেঁপুকে ভরপেট খাওয়াইবার খরচ বুঝি তাঁহার ঘাড়ে পড়িবে। অনুমান মিথ্যা নয়; যখন তাঁহাকে ঐ উদ্দেশ্যে খোঁজ করা হইল, তখন তিনি ঘরে গিয়া আপন কাজে গভীর মনোনিবেশ করিয়াছেন।

উৎসাহীদের চাঁদায় জিলাপী রসগোল্লা আসিয়াছে। দেখা গেল জিলাপীর অঙ্গাবয়ব সম্পর্কে রতনবাবুর কথাই ঠিক। টেঁপু তোড়জোড় দেখিয়া ভ্যাবাচাকা হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর যখন কতগুলি খাইবার পরও তাহাকে চাপ দেওয়া হইল, তখন তাহার অসামর্থ্য প্রকাশ করিয়াছে। এখনও এতগুলি পড়িয়া রহিল, বা সত্যই আর সে খাইতে পারে না, ইহার যে কোনও একটী কারণে টেঁপুর চক্ষে অজস্র ধারা নামিয়াছে। যখন আরও চাপ চলিতে লাগিল, তখন মরিয়া গেলে পুলিশের নিকট দায়ী হইতে কেহই স্বীকৃত না হওয়ায় টেঁপু সে যাত্রায় রক্ষা পাইয়াছিল।

টেঁপু বা ট্যাপা নাম বাবুদের মেজাজ বা mood-এর উপর নির্ভর করিত। কিন্তু এ নামও বেশী দিন চলিল না। আবার সে মধুসূদন, মধু বা মোদোতে পরিণতি লাভ করিল; সে ব্যাপারটা সংক্ষেপতঃ এইরূপ:

মধুসূদন রসগোল্লা জিলাপী ভক্ষণের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর সে ভীষণ সাধু ও কর্ম্মতৎপর হইয়া উঠিল। সে-সময় যে তাহার চাকুরিতে জবাব দেওয়া হইল না, ইহাই বোধ হয় তাহার উৎসাহের কারণ।

আমাদের সাধারণের দাদা বৈশ্বানরবাবু মেসের মধ্যে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। সন্ধ্যা-আহ্নিকেরও ব্যবস্থা মেসের মধ্যেই ছিল। টেঁপু তাঁহার একটী প্রিয়-পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল। একদিন সন্ধ্যার সময় তিনি তারস্বরে "মোদো মোদো" বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতেছিলেন। ঘাড় তুলিয়া দেখিলেন মোদো তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সাড়া না দিয়াই সে সেখানে

উপস্থিত হইয়াছে। বৈশ্বানরবাবু রাগিয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার ডাকে সাড়া না দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে যাহা শুনিলেন, তাহাতে তিনি হতভম্ব হইয়া গেলেন।

মোদো বলিল, "মোদো ব'লে আপনি ডাকলে মোটে শুনতে ভাল লাগে না; উত্তর দিতেও ইচ্ছে করে না; মধু ব'লে ডাকলে ত' বেশ মিষ্টি শোনায়। কিন্তু মধুসূদন ব'লে ডাকলে আমার মার কথা মনে আসে। মা কখনও আমায় অন্য নামে কাউকে ডাকতে দিত না, রাগ ক'রত। বুড়ি আরও বলত 'মধুসূদন বলে যে ডাকবে তার পরকালেরও কাজ হ'য়ে য'বে।' তা কর্ত্তা, আপনি ত' আমায় মধুসূদন ব'লে ডাকতে পারেন; মার কথা মিথ্যে হবার নয়।"

বৈশ্বানরবাবু যে কি বলিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। উঠিয়া আসিয়া তাহাকে ধরিয়া বলিলেন, "বড় শিক্ষা দিয়েছিস রে! তোর এত বুদ্ধি ছেল কোথায়?"

"আমার কথা নয় বড়বাবু, আমার মার কথা; আর কাকেও বলতে ভরসা হয় নি, যদি রাগ করেন।"

বৈশ্বানরবাবু ত' আর মোদো, এমন কি মধু বলিয়াও ডাকিতেন না। মেসে যখন সকলকে কথাটা বলিলেন, তখন অনেকেই বলিল, "বেটার টাঁপটা দুষ্ট বুদ্ধিতে ভরা, বোকা সেজে থাকে বই ত' নয়।" আবার তাহার রসগোল্লার রস ও জিলাপী ভাঙ্গিয়া খাওয়ার কথা উঠিল, কাহার টেবিলের ছয় পয়সার মধ্যে দুই পয়সা পাওয়া যায় নাই, তাহা উঠিল, কাহার এক আনার সাবান, মধুসূদন সে দিন যাহা আনিয়াছিল তাহা রেবতীবাবুর এক আনার সাবানের মাপের আধখানা ইত্যাদি ইত্যাদি বহু কথার উল্লেখ করিয়া তাহার তত্ত্বজ্ঞান বা ধর্ম্মজ্ঞানের বুজরুকি লইয়া কিছুক্ষণ আলোচনা চলিয়াছিল। কিন্তু তখন হইতে টে'পু একেবারে মধুসূদন বা মধু পর্য্যায়ে উঠিয়া পড়ে।

আমি দেখিলাম, আমায় যখন জগু, জগা প্রভৃতি নামে ডাকে আমারও ত' বেশ খারাপ লাগে, কিন্তু লোককে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতাম না যে, আমার পুরা নাম জগন্নাথ বলিলে আমার ভালই লাগে। তখন হইতে স্থির করিলাম, চাকর হইলেও নাম বিগড়াইয়া ডাকার কদর্য্যতা আছে, তত্ত্বজ্ঞান তাহাতে নাইই থাকুক।

কিন্তু মধুসূদনের তখনও ফাঁড়া কাটে নাই। একদিন মেসের মধ্যে ঘোরতর তর্ক আলোচনার মধ্যে বুঝিলাম শাস্ত্রকারের মতে যে যৌবনে উপনীত হইয়াছে, অথচ তাহার শ্মশ্রুগুম্ফের রেখা নাই, তাহাদের মুখ দর্শন করিয়া দিন সুরু করা বা শুভকার্য্য আরম্ভ করা চলে না। এই ঘটনার প্রকাণ্ড নজির রহিয়াছে ভীষ্মবধ কাব্যে। শিখণ্ডীর মুখ দেখিয়া মহামতি ভীষ্ম ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন, অর্জ্জুনের বাণে জর্জ্জরিত হইয়াও আর নিজ ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করেন নাই।

আমাদের মধুসূদন চৌদ্দ, পনেরো, ষোলো বা ততোধিক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে কি না তাহা লইয়া মহাবাদানুবাদ হইয়াছে। অনেকেরই মতে তাহার বয়স এখনও অনেক কম, সুতরাং গোঁফের রেখা না থাকায় বিশেষ দোষের কিছু নাই। কিন্তু অনেকে ত' আছেন যাঁহারা মুখ দেখিলেই বয়স স্থির করিতে পারেন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন সকালে উঠিয়াই মধুসূদনের মুখ দেখা চলে না। গুম্ফউৎপাদনের সহায়তা করিবার পক্ষে তাহার বয়স হইয়া গিয়াছে। রতন, ঘনশ্যাম, ত্রিশূলপাণি, চিদানন্দ, রূপনারায়ণবাবুর দল একযোগে বলিলেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহে বলিতে পারেন মধুসূদনের যে বয়সই হউক, এতদিনে গোঁফের রেখা সুস্পষ্টই হওয়া উচিত ছিল। প্রমাণ তাঁহাদের হাতে হাতে। তাঁহারা সকাল হইলে গৃহত্যাগ করিতে পারেন না, কারণ বাহির হইয়াই প্রথমেই মধুসূদনের



ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাসের মধ্য দিয়া গোঁফের রেখা ফুটিয়া উঠিল

মুখ দেখিতে হইতে পারে। যাঁহারা একঘরে শয়ন করেন সকালে উঠিয়া যদি পরস্পরে মুখ দেখাদেখি করেন তাহা শাস্ত্রীয় মতে সিদ্ধ নহে। সুতরাং তাঁহারা রুম মেট (room

mate) ছাড়া অপরের মুখ দেখিয়া দিনের কার্য্যারম্ভ করিতে চান। সেই সময় মধুসূদনের মুখ দেখা চলে না। সুতরাং অপর ঘরের কেহ আসিয়া দরজা ধাক্কা না দিলে ইঁহাদের দল প্রায়ই বাহির হইতেন না। আমরা প্রথমে ইহা জানিতাম না, প্রয়োজনও হয় নাই। কিন্তু যখন বিতণ্ডা বাধিয়া উঠিল, তখন তাঁহারা মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন। তাঁহারা অজস্র উদাহরণ দিলেন,—ভোরে সকালে মধুকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করার ফলে সিঁড়িতে পা মচ্‌কাইয়া গিয়াছিল, পাকা চাকুরী হাত ছাড়া হইয়াছিল, যে টাকা শোধ করিবে বলিয়াছিল সে তাহা করে নাই, গলায় মাছের কাঁটা ফুটিয়াছিল, চক্ষে কুটা পড়িয়াছে, ছুরিতে হাত কাটিয়াছে, অন্ধকারে তক্তপোষে পা ঠুকিয়াছে, বই কিনিতে দোকানদার ছয় আনা পয়সা কমিশন দেয় নাই, এমন কি সমস্ত সপ্তাহ বিরহের পর শনিবার দিন দেশে যাইবার সময় ঘনশ্যাম বাবু ট্রেণ ফেল করিয়াছেন। আরও কত উদাহরণ দিব! পাঁচ সাতজনে পড়িয়া যে সকল গুরুতর accident বা দুর্ঘটনার বিবরণ দিলেন তাহার পর আর অবিশ্বাস করিবার উপায় রহিল না।

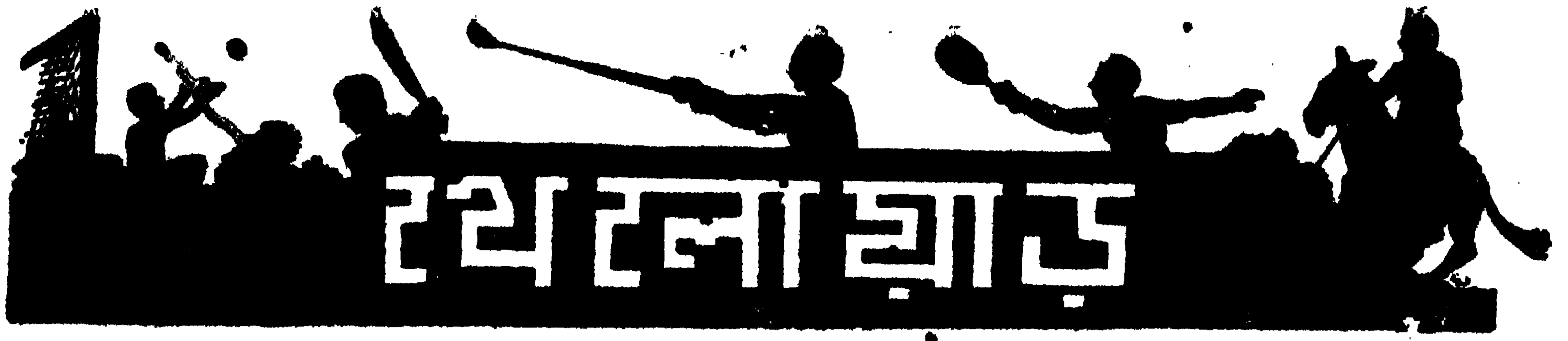
ছোকরার দল নিতান্ত অন্যরকম ভাবিল। তাহারা দুই ঘটনার মধ্যে কোনও যোগাযোগ পাইল না। যাঁহারা মধুকে দেখিয়া বিছানা পরিত্যাগ করেন নাই, তাঁহাদেরও ঐরূপ অনেক ক্ষতি হইয়াছে, অসুবিধায় পড়িয়াছে। কিন্তু তাহারা নিতান্ত ছোকরা, তাহাদের কথা কেহ শুনিতে প্রস্তুত নয়; তাহা ছাড়া anti-মধু দলেও ত' কয়েকজন কমবয়সী লোক রহিয়াছেন, তাঁহারা যে তীব্রবেগে আপত্তি আরম্ভ করিলেন তাহাতে মেসের মধ্যে বিশেষ অশান্তি হইবার উপক্রম হইল।

সায়েন্টিফিক মাইণ্ড (scientific mind) বা বিচারশীল মনের অধিকারীরা এর একটা সুমীমাংসা করিতে চাহিলেন। তাঁহারা বহুমতে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন মধুর এখনও কৈশোর কাটে নাই। তাহা গৃহীত হইল না। আরও অন্যান্য যুক্তি খণ্ডিত হইয়া গেল। তখন আমাদের মধ্যে একজন বিজ্ঞ একখানি "আতস কাচ" বা magnifying glass লইয়া আসিলেন, ঘনশ্যামবাবুর দলকে সংবাদ দিয়া সভা করিলেন এবং মধুকে দাঁড় করাইয়া উপরোষ্ঠের উপর magnifying glass ধরিলেন, তখন তাহার মধ্য দিয়া গোঁফের রেখা ফুটিয়া উঠিল। ভবিষ্যতের আশা পোষণ করিয়া কেহ কেহ তখনকার মত নিশ্চিন্ত হইল। আর যাহাদের তখনও কিছু সন্দেহ রহিল, তাহাদের শান্তি দিবার জন্য মধুকে একখানি 'সেফ্‌টী' দেওয়া হইল; মধু নিত্য গোঁফ কামাইবে। তাহাতে দুইটি শুভ ফল আশা করা যাইতে পারিবে। প্রথম, গোঁফ আর না উঠিলেও কেহ টের পাইবে না, কোন্ সময় বয়ঃসন্ধিক্ষণ পার হইয়া মধু যৌবনে পড়িল তাহা লইয়া মন খুঁৎখুঁত করিবে না। আর যদি সত্যই ভবিষ্যতে মধুর গুম্ফ-নিষ্ক্রমণের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে ক্ষুরস্পর্শে তাহা শীঘ্র আত্মপ্রকাশ করিবে। তখন পুরুষের এই একচেটিয়া সম্পত্তি এবং 'কেয়ারী' করিতে পারিলে যে শোভা, তাহা রাখা না রাখা সম্বন্ধে মধুকে পূর্ণ স্বাধীনতা, স্বরাজ বা complete independence দিলেই চলিবে।

আমি দূর পল্লীর জগন্নাথ সিংহ, প্রথমে ঘনশ্যামবাবুর দলেই পড়িয়াছিলাম। কিন্তু মধুর প্রতি মমতাবশতঃ আমি প্রত্যহই তাহার গুম্ফের কিছু উন্নতি দেখিতে পাইতাম; কিন্তু কেহই এ বিষয়ে আমায় সমর্থন করিতেন না। পরে বৈজ্ঞানিক মতবাদের দলে প্রবেশ করি, তাহা হইলেও ঘনশ্যামবাবুর মতের প্রভাব আমাকে একেবারে মুক্তি দেয় নাই। তাহার পর যখন ক্ষুরের সাহায্যে একটা সুমীমাংসা হইয়া গেল, তখন মনে করিলাম গ্রামে গিয়া সকলকে আমার মুখমণ্ডলের শোভা দর্শাইয়া চমৎকৃত করিয়া দিব। তখন বুঝি নাই, মধুসূদনের আদর্শ বাঙ্গালা দেশে এমনভাবে অনুসৃত হইবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা (Secondary Stage)

মোট (বাঙ্গালী অবাঙ্গালী) ছাত্র সংখ্যা ৬,৩০,৮২৬ ; তাহাদের জন্য ব্যয় হয় মোট ১,৯৭,৫৩,৯৬৩ টাকা এবং প্রতি-ছাত্রের জন্য সর্ব্ব প্রকার আয় হইতে ব্যয় হয় ৩১/০। ভারতীয় ছাত্রের সংখ্যা ৫,৬৯,৩২১ ; মোট ব্যয় ১,১৯,৩৫,২৬১ টাকা ; সরকারী তহবিল হইতে প্রতি-ছাত্রের জন্য পাওয়া যায় ২॥৵০ পাই।



খেলোয়াড়

শ্রী দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শীতের প্রধান খেলা হ'চ্ছে ক্রিকেট। প্রত্যেক বৎসর ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় 'রণজি' প্রতিযোগিতা এবং যুদ্ধের আগেকার দিনে তা' ছাড়া বিদেশাগত ক্রিকেটদলের ক্রীড়া-নৈপুণ্য উপভোগের সুযোগে সহরে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'ত। খেলার জগতে এই মাসটি আরও নানা কারণে একটু বিশিষ্টতা লাভ ক'রে থাকে। চারদিকে টেনিসের হিড়িক পড়ে যায়। প্রদেশের বাইরে থেকে খেলোয়াড়রা এসে ক্রীড়ামোদীদের মন জুড়ে বসেন। এ মাসে পিং পং (টেবিল টেনিস), ব্যাডমিণ্টন-প্রতিযোগিতা, কুস্তি, মুষ্টি যুদ্ধ, ক্লাবের বাৎসরিক সমাবর্ত্তন উৎসব, স্পোর্টস্, প্রদর্শনী প্রভৃতির মধ্যে নানা ভাবের আকর্ষণ যেন ভীড় ক'রে দাঁড়ায়। এমন অনেক সময় আসে যখন বাস্তবিক ঠিক করতে পারা যায় না যে কি ফেলে কি দেখি।

এ বারের ডিসেম্বর মাস কেটেছে অসাধারণ এক মানসিক উদ্বেগের মধ্যে। বোমার ভয়, সহর ছেড়ে পালাবার আয়োজন, এই সবই বিশেষভাবে আমাদের ব্যস্ত রেখেছিল এবং খেলার দিকে নজর দেবার ফুরসুৎ আমরা প্রায় পাই নি বললেই হয়। নূতন বছরের জানুয়ারী মাসও প্রায়ই এক ভাবের অশান্তিতে কেটেছে। তারপর, ফেব্রুয়ারী; এ'মাসটা হকি খেলার মাস। নানা গোলমালের ভেতরও এই খেলার ফিক্সচার করা সম্ভব হয়েছিল।

ক্রিকেট

এ বছর প্রথম দিকে ক্রিকেট খেলার যে উৎসাহহীনতা দেখা দিয়েছিল তা'রই শেষ রক্ষা হয়েছে দু'টি বিশেষ খেলায়। তার একটি হচ্ছে রণজি ক্রিকেট-প্রতিযোগিতা। এই খেলার পূর্ব্ব অঞ্চলের জোন ফাইনাল হয় বাংলা ও আসাম এবং হোলকারের মধ্যে। খেলায় বাংলাকে পরাজয় বরণ ক'রে নিতে হয়।

হোলকারদল ২৯৭ রাণে বাংলা দলকে পরাজিত করে। প্রথম ইনিংসের ফলাফলে জয়পরাজয় নিষ্পত্তি হয়।

হোলকার দলের ৬১৮ রাণে প্রথম ইনিংস শেষ হয়। বাংলা দল প্রত্যুত্তরে মাত্র ২২১ রাণে খেলা শেষ করে।

ঐ রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার দু'টি সেমি-ফাইনালের একটি খেলা হয় হোলকারের সঙ্গে হায়দরাবাদ দলের। হায়দরাবাদ দল প্রথম ইনিংসে ৮৭ রাণে অগ্রগামী হয়। হায়দরাবাদ দল প্রথম ইনিংস ৩৫৫ রাণে শেষ করলে হোলকার দল প্রথম ইনিংস ২৬৮ রাণে শেষ করে। খেলার ফলাফল :—

হায়দরাবাদ দল :—৩৫৫ রাণ। আসাদুল্লা ১৪৮, আইবরা ৪৮, ভরতচাঁদ ৫৭, ইব্রাহিম খাঁ ২৭; সি, কে, নাইডু ১০৩ রাণে ২টি, জাগদেল ৫৯ রাণে ৩টি, নিম্বলকার ৭০ রাণে ৩টি, মুস্তাক আলী ৬২ রাণে ২টি উইকেট পান।

হোলকার দল :—২৬৮ রাণ। (মুস্তাক আলী ৭৮, নিম্বলকার ৬১, ভায়া ৩৫; গোলাম মহম্মদ ৫৮ রাণে ৬টি, মেটা ৪০ রাণে ৩টি উইকেট)।

আর একটি সেমিফাইন্যাল খেলায় বরোদা দল এক ইনিংস ও ৩৫৬ রাণে বিজয়ী হয়। রাজপুতানা দল দ্বিতীয় ইনিংসে ১৩৩ রাণ করে। সি এস, নাইডুর বোলিং বিশেষ কার্য্যকারী হয়। খেলার ফলাফল :—

বরোদা প্রথম ইনিংস :—৫৪৩ রাণ। (সি, এস, নাইডু ১২৭, এম, এস, নাইডু ১৯৯, ঘোরপদে ৯৭, ইন্দুলকার ৪২; মাসুম আলী ১৪৩ রাণে ৪টি আমেদ আলী ২৯ রাণে ২টি উইকেট)।

রাজপুতনা প্রথম ইনিংস :—৫৪রাণ। (ভি, হাজারী ১৭ রাণে ৬টি, সি, এস, নাইডু ২১ রাণে ৭টি উইকেট)।

রাজপুতানা দ্বিতীয় ইনিংস :—১৩৩ রাণ। (ভি, হাজারী ৩১ রাণে ২টি, সি এস নাইডু ৩৬ রাণে ৭টি উইকেট পান)।

আর যে একটি বিশেষ ক্রিকেট খেলা—যা কলিকাতার ইডেন উদ্যানে এ বৎসর অনুষ্ঠিত হয়—সে হয় বাঙ্গালা গভর্ণরের দল এবং কুচবিহারের মহারাজার দলের মধ্যে। মেদিনীপুরের বাত্যাবিধ্বস্ত ও বন্যাপীড়িত নরনারীর সাহায্যকল্পে তিনদিন ব্যাপী এক প্রদর্শনী খেলার আয়োজন করা হয়। এ খেলায় সি, কে, নাইডু, মুস্তাক আলী, রামসিং, নিম্বালকার প্রভৃত খ্যাতনামা খেলোয়াড়রা যোগদান করেন। বাংলার গভর্ণরের দল ১৪৯ রাণে বিজয়ী হয়। গভর্ণর দলের অধিনায়ক নাইডু 'টসে' জয়ী হয়ে নিজ দলকে ব্যাট করবার সুযোগ দেন।

গভর্ণর দলের প্রথম ইনিংস :—২৮১ রাণ (এস, গাঙ্গুলি ৬২, কার্ত্তিক বসু ৭২, এন, চ্যাটার্জ্জি ৩৮, খাজা ৩৭ রাণ নট-আউট, মুস্তাক আলী ৭৭ রাণে ৪টি, কে, ভট্টাচার্য্য ২২ রাণে ২টি উইকেট লাভ করেন)।

কুচবিহার দলের প্রথম ইনিংস :—২৩১ রাণ, (আর, গ্রাণ ৪১, মুস্তাক আলী ২০, ফানসালকার ২৬, ধ্রুব দাস ৩৬, হর্ণ ২২, বি, মিত্র, ৫০ রাণে ২টি, রাম সিং ৫৩ রাণে ৩টি, সি, কে, নাইডু ৬৭ রাণে ৪টি এন, সেন ৩৮ রাণে ১টি উইকেট পান)।

বাঙ্গালার গভর্ণরের এক'দশ (দ্বিতীয় ইনিংস) :—এস, গাঙ্গুলী ২৮; এন, সেন ১; ই হার্ভে জনষ্টন ১; নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জ ২৬; সি, কে, নাইডু (নট-আউট) ১১২; রাম সিং (নট-আউট) ১; অতিরিক্ত ৭। মোট ১৪৯ রাণ। (৪ উইঃ ডিক্লেয়ার্ড)

বোলিং: রঙ্গরাজ ৬ রাণে ১টি; মুস্তাক আলী ৬১ রাণে ১টি; কে, ভট্টাচার্য্য ৪৪ রাণে ১টি ও আর, গ্রীণ ৬৫ রাণে ১টি উইকেট পান।

কুচবিহারের মহারাজার একাদশ (দ্বিতীয় ইনিংস):—মুস্তাক আলী ১৫; আর, গ্রীণ ০, বি, বি, নিম্বলকার ৮, গুরুদাস ২; ফানসালকার ২৮; কমল ভট্টাচার্য্য ১৩; কে, এস, রঙ্গরাজ ৩; ক্যাপ্টেন এস, রায় ৩৩; এইচ, ডব্লিউ, হর্ট ৩; মেজর এ, আর, এম, ওয়ার্ড ৩০; এস, মিত্র (নট-আউট) ৭; অতিরিক্ত—৪। মোট ১৪৭ রাণ।

বি, মিত্র ২৪ রাণে ২টি; এস, সেন ৩৭ রাণে ৩টি; রাম সিং ৪২ রাণে ২টি; সি, কে নাইডু ২৯ রাণে ৩টি।

হকি

৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সরকারীভাবে হকি-খেলা আরম্ভ হবার কথা ছিল। হয়েছিলও তাই। তবে সেদিন জুনিয়র লীগ-প্রতিযোগিতার খেলাই হ'য়েছিল, সিনিয়র খেলা হয় দু'দিন পরে; নীচে পর পর যে সব খেলা হ'য়ে গেছে তাদের একটা ছোট তালিকা দেওয়া গেল:—

১০ই ফেব্রুয়ারী—পোর্ট কমিশনার্স ১: জ্যাভেরিয়ানস্ ২; রেঞ্জার্স ৪: লিলুয়া ০। ১১ই ফেব্রুয়ারী—মেসারাস ১: কাষ্টমস্ ০; মিঃ মেডিক্যালস্ ৩: ডালহাউসী ০। ১২ই ফেব্রুয়ারী—বি, জি, প্রেস ২: মোহনবাগান ১, আরমেনিয়ান্স ২: পুলিশ ১। ১৩ই ফেব্রুয়ারী—ইষ্টবেঙ্গল ৩: লিলুয়া ০; রেঞ্জার্স ১: গ্রীয়ার ০। ১৫ই ফেব্রুয়ারী—আরমেনিয়ান্স : মিঃ মেডিক্যালস্ ০। ১৬ই ফেব্রুয়ারী—মোহনবাগান ১ : মেসারাস ০; পোর্ট কমিশনার্স ৩: গ্রীয়ার ০। ১৮ই ফেব্রুয়ারী—মিঃ মেডিক্যালস্ ৩: বি, এন, আর, ০; কাষ্টমস্ ১: লিলুয়া ১। ১৯শে ফেব্রুয়ারী—বি, জি, প্রেস ১: জ্যাভেরিয়ান্স ০; পুলিশ ৩: গ্রীয়ার ০। ২০শে ফেব্রুয়ারী—মোহনবাগান ৩: লিলুয়া ০; মেসারার্স ১: ডালহাউসী ০। ২৩শে ফেব্রুয়ারী—ডালহাউসী ১: কাষ্টমস্ ০; জ্যাভেরিয়ান্স ১; আরমেনিয়ান্স ০। ২৫শে ফেব্রুয়ারী—মোহনবাগান ১: গ্রীয়ার ০; বি, এন, আর, ৫: লিলুয়া ১; মেসারার্স ৩: মহামেডান স্পোর্টিং ০। ২৬শে ফেব্রুয়ারী—ইষ্টবেঙ্গল ৩: মিঃ মেডিক্যালস্ ০; বি, জি, প্রেস ৩: গ্রীয়ার ১; ডালহাউসী ১: লিলুয়া ১। ২৭শে ফেব্রুয়ারী—জ্যাভেরিয়ান্স ২: মোহনবাগান ১; বি, এণ্ড এ, আর, ২: মহামেডান স্পোর্টিং ০; রেঞ্জার্স ৪: মেসারার্স ০।

এ্যাথ্‌লেটিক স্পোর্টস

কলিকাতার পরিস্থিতি ক্রমে উন্নতিলাভ করলে, ফেব্রুয়ারী মাসে বিভিন্ন বাৎসরিক সমাবর্ত্তন উৎসবগুলি অনুষ্ঠিত হতে আরম্ভ করে। বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের বিংশতি বার্ষিক খেলাধুলায় বিভিন্ন বিভাগে বহু এ্যাথলেটদের সমাবেশ দেখা যায়। মিঃ সি, ই, এস, ফেয়ারওয়েদার, কলিকাতার পুলিশ কমিশনার, ক্যালকাটা ফুটবল মাঠে ১১ই ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সভাপতি স্যার টমাস ল্যাম্বের পরলোকগত আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবার উদ্দেশ্যে এ্যাথলীটগণ দুই মিনিট নীরব দাঁড়িয়ে থাকেন। ঐ দিন কতকগুলি বিষয়ের হিট ও ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়। পরের দুইদিন অবশিষ্ট আর আর বিষয়ের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়।

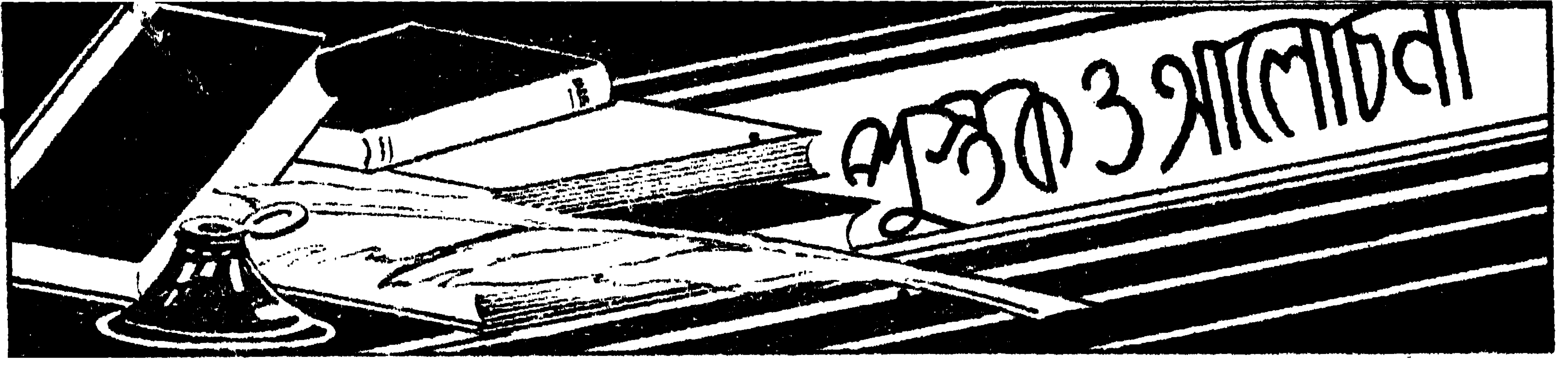
রয়াল এয়ার ফোর্সের আর, সি, ম্যানলে ১৫০০ মিটার দৌড়ে নূতন বঙ্গীয় 'রেকর্ড' স্থাপন ক'রে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ৪ মিনিট ২৫ ১।১০ সেকেণ্ডে তিনি ঐ দূরত্ব অতিক্রম করেন। ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাবের পি গডফ্রে 'হপ ষ্টেপ ও জাম্পের' অতীতের রেকর্ড ভেঙ্গে ফেলেন ৪৩ ফিট ৯ ইঞ্চি লাফিয়ে। ৩০০০ মিটার সাইকেল রেসের নির্দ্ধারিত সময় ৫ মিনিট ৩০ সেকেণ্ডে কোন প্রতিযোগী পৌঁছিতে না পারায় সাইকেল রেসটি নাকচ করা হয়েছে।

ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাবের সভ্য ও সভ্যাবৃন্দ অধিকাংশ বিষয়ে সাফল্য অর্জ্জন করেছেন। তাঁহারা ৯৭ পয়েন্টে সাধারণ বিভাগে এবং ৮০ পয়েন্টে মহিলা বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেছেন। ঐ ক্লাবের মিসেস ই, জনসন ও মিস আর, ফেরণ উভয়েই ২৪ পয়েন্ট লাভ ক'রে মহিলা বিভাগে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশিপ পেয়েছেন। সাধারণ বিভাগে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছেন রয়াল এয়ার ফোর্সের আর, সি, ম্যানলে। তিনি মোট ৩৬ পয়েন্ট পেয়েছিলেন।

স্যার রবার্ট রিডের সভাপতিত্বে লেডী রিড প্রতিযোগিবৃন্দকে পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র বিতরণ করেন।

একত্রিংশৎ বার্ষিক কালীঘাট এ্যাথলেটিক স্পোর্টস বৃহস্পতিবার ১৮ই ফেব্রুয়ারী ইডেন উদ্যানে আরম্ভ হয়। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে হপষ্টেপ এণ্ড জাম্পে বাঙ্গালার নূতন রেকর্ড সৃষ্টি হয়। ১৫০০ মিটার ভ্রমণ-প্রতিযোগিতাটিতে অন্য কোন প্রতিযোগী উপস্থিত না হওয়ায় একটি মাত্র প্রতিযোগী এই দূরত্ব ভ্রমণ ক'রে প্রথম স্থান অধিকার করেন। আর একটি প্রতিযোগী কয়েক মিনিট পরে উপস্থিত হয়ে নির্দ্দিষ্ট স্থান থেকে ভ্রমণ আরম্ভ করে ও বিচারকগণ তাঁহাকে যোগদান করবার অনুমতি দেন নি। ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাবের সভ্য ও সভ্যাগণ বিভিন্ন বিভাগে সাফল্য লাভ করে। পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগের দলগত ও ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেছেন। মিঃ আর, মেলার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও মিসেস ডবলিউ, স্যাণ্ডেজ পুরস্কার বিতরণ করেন।

২০শে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে ল কলেজের বার্ষিক স্পোর্টস সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বহু সংখ্যক ছাত্র যোগদান না করলেও বিভিন্ন বিষয়ে তীব্র প্রতিযোগিতা অনুভূত হয়। শ্রীযুত সিদ্ধার্থ রায় প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে সাফল্যলাভ ক'রে চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেন। প্রতিযোগিতার শেষে মাননীয় পি, এন, ব্যানার্জ্জি সভাপতির আসন থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন।



[সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠাইবেন]

মা—ম্যাক্সিম্ গর্কী ; অনুবাদক—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

বিশ্ব সাহিত্য দরবারে যে সব গ্রন্থ আসন লাভ করে নিখিল বিশ্বকে চমৎকৃত করেছে, রুষীয় সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গর্কীর "মা" তাদের অন্যতম। যে সব সাহিত্য-পুস্তকের অনুপ্রেরণায়, নিপীড়ক 'জার' নিপীড়িত, নবুত্থিত রুষবাসীর হাতে সবংশে নির্মূল হল ;—বিশ্বের শোষিত সম্প্রদায়, যুগ যুগ সঞ্চিত ব্যথার নিপাত করতে বদ্ধপরিকর হল, অন্যায় রাজতন্ত্রের অপসারণ ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা লাভ করল—সে সব সাহিত্য-সারথিবৃন্দের মধ্যে মনিষী ম্যাক্সিম গর্কী অন্যতম মহাপুরুষ।

তাঁহাকেও রাজ-লাঞ্ছনা সইতে হয়েছিল। তাই তাঁর মানস-পুত্র পাভেল যুগ যুগান্তের মূক মায়ের মুখে ভাষা ফুটিয়ে তুললেন। তারই প্রচেষ্টায় "মা" নব-জীবন, সত্যিকার মানব জীবন লাভ করলেন।

"মা" যখন পড়তে বসি,—১৯১৭ সালের পূর্ব্বের অভিশপ্ত রুষের পুতিগন্ধময় একখানি অতীত জীবনের চিত্র মানচিত্রের মত মনশ্চক্ষে প্রোদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। যেন পাঠক কল্পনার রথচক্রে ঘন তুষরাবৃত বনানীর আড়ালে, খানিক পর্ণ-কুটীরের অদূর বৃক্ষান্তরালে, নিঝুম নিশীথ রাতে, খানিক মেঘের আড়ালে আড়ালে থেকে পাভেল, মা, লিটল-রাশিয়ান, নিকোলে, এণ্ড্রুশ, শাশা, আইভানোভিচ, লুডমিলা, ইগনেষ্টি রাইবিন ও সুফিয়া আর শ্রম-জর্জ্জরিত রুষ শ্রমিকদের নব-জাগরণের একটা হৈ-চৈ, গোপন পরামর্শ সবই স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন! যেন চোখের সম্মুখেই লিটল রাশিয়ান দরজা খুলে, দু'হাতে দু'পাশ ধরে খুণক্ষরা অন্তরের বেদনা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতন, আগ্নেয়গিরির লাভা প্রবাহের মত বক্তৃতার ধারায় বমন করছেন।

অতীতের হারানো 'মা'কে সত্যিকার মাতৃত্বের রূপ দিতে, সর্ব্বহারা রুষ-তরুণদের যে আত্মোৎসর্গ, মূর্খ, আর্ত্তক্লিষ্ট হতভাগ্যদের উদ্ধার করতে, তাদের মানব-জীবন ভোগ করবার অধিকারী করে তুলতে, রুষীয় তরুণদের যে ত্যাগ, যে সাধনা ; যুগ-যুগান্তর ধরে, তাঁদের বিলাস-জীবন ভোগ করতে—তারা যত বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে নিজেরা লাঞ্ছনা গঞ্জনা, অশান্তি ভোগ করতো ;—শোষিতের এতই আত্মবিস্মৃত হয়েছিল যে নিজেদের নিজেরা জানতো না,—সে তাদের জাগাতে, তাদের আত্মবঞ্চিতদের আত্মোদ্বুদ্ধ করতে তরুণদের যে অসীম ধৈর্য্য, যে একাগ্র সাধনা, সঞ্চিত সম্মিলিত শক্তির প্রয়োগ—এ শুধু মা-'রই অনুপ্রেরণা হতে।

দেশের লোকেরা এত খাটে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উদয়াস্ত খাটে, তবুও তাদের মধ্যে যেন শান্তি নেই - তার কারণ কি? তার কারণ, একদল বুকের রক্ত দিয়ে রাস্তা তৈরী করছে আর একদল তাতে গাড়ী হাঁকায়! একদল হাড় মাংস গুঁড়ো করে সৌধ নির্ম্মাণ করে আর একদল নৈতিক চরিত্রহীন নারীদের বিলাসের সামগ্রী করে ত্রিতলে বসে আত্মপ্রসাদ ভোগ করে—'মা' তাই দেখিয়ে দিয়েছে।

পৃথিবীতে অনেক জাতি সাহিত্যের ভেতর দিয়ে স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু নিদ্রিত, ঘুমন্ত জাতির আত্মপ্রকাশ কিরূপে সম্ভব এবং নিপীড়িত, শোষিত ও ব্যথিতদের দুঃখ কোনখানে, সুখের মূল কোথায়, উত্থান-পতনের কারণ কি—"মা"তে অপূর্ব্বরূপে বিকশিত হয়েছে।

মূল বইটা কেমন করে লেখা হয়েছে জানি না। নৃপেনবাবুর লেখা পড়ে মনে হতো না যে তিনি একার্য্যে সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হবেন। কিন্তু যেদিন "মা" হাতে নিই—তাকে শেষ না করে উঠতে পারিনি।

দ্বিতীয় ভাগের শেষাশেষি অনুবাদক একটু অধৈর্য্য হয়ে যাচ্ছেন বলে মনে হয় নাকি? মাঝে মাঝে খুব সংক্ষেপ করতে চেয়েছেন হয় তো বা। কিন্তু এরূপ চমৎকার অনুবাদ বাংলা গল্প-সাহিত্যে বিশেষ হয়নি বললে বড় বাড়া-বাড়ি হয় না। আজ বাংলা-সাহিত্য বড়-মানবীতে ভরা।

এমন যুগোপযোগী বই যে এতদিনে অনুদিত হল—তজ্জন্য অনুবাদকের নিকট বাংলার অনাগত পাঠকও ঋণী হয়ে থাকবে।

তবে মাঝে মাঝে অসাবধানতা দৃষ্ট হয় বই কি! 'যাইলে' যদি তিনি অতি আধুনিকতাকে এক সোপান নীচে রেখে অতিতম আধুনিকরূপে ব্যবহার করতে চান ত' তার জন্যে 'তিন খুন মাফ'।

পরিশেষে বলবার লোভ সামলাতে না পেরে বলতে ইচ্ছে হয়—"মা" যিনি পড়েন নি তিনি বড় রকমে বঞ্চিত।

আবদুস সালাম

আরতি—শ্রীপ্রবোধ ঘোষ প্রণীত ছোট গল্পের বই। আলোচ্য পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিয়াছেন শ্রীপ্রমথ চৌধুরী মহাশয়। 'সবুজপত্রে' প্রবোধ বাবুর ছোট গল্প বাহির হইত, সেই সূত্রে লেখকের লেখার সহিত প্রমথ বাবুর পরিচয়।

কেবলমাত্র ছোট গল্প লিখিয়া যাহারা সাহিত্য জগতে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন শ্রীপ্রবোধ ঘোষ তাঁহাদেরই অন্যতম। অল্প পরিসরে কয়েকটি রেখার টানেই চরিত্র অঙ্কিত করিবার ক্ষমতা এই লেখকের আছে। বই খানি একবার আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ফেলিয়া রাখা যায় না। গল্পগুলি গীতি-কবিতার মত। মনে হয় 'লিরিক' কবিতা পড়িতেছি। "আরতি" বাংলা গল্প-সাহিত্যে স্থায়ী স্থান অধিকার করিবার দাবী রাখে।

ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর, মূল্য ১।০। সকল সম্ভ্রান্ত পুস্তকের দোকানে প্রাপ্তব্য।

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস

যুদ্ধ-সাহিত্য

বিগত ১৯১৭-১৯১৮ সালের, মহাসমরের পর হইতে, মানুষের জীবনে, সমাজ-জীবনে ও প্রত্যেকটী চিন্তায় ও কর্ম্মে যে বিরাট বিপর্য্যয় ও পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছিল, তাহা হইতে সাহিত্য মুক্ত হইতে পারে নাই। অবশ্য সাহিত্য সমাজ-জীবনের বহির্ভূত বস্তু নয়, বরং সমাজ-জীবনের সহিত প্রত্যেকটী কর্ম্মে ও চিন্তায় এক আত্মার আত্মীয়তার অঙ্গীকারে আবদ্ধ। বিগত মহাসমরের প্রতিক্রিয়া সমাজ জীবনে যে গভীর আঘাত হানিয়াছিল তাহা হইতে সাহিত্য কোনরূপেই মুক্ত থাকিতে পারে না। সমাজের উপর সুতীব্র আঘাত, তাহার প্রতিক্রিয়া মানব মনের উপর ও মানব মস্তিষ্ক প্রসূত চিন্তাধারায় অবশ্যই প্রতিফলিত হইবে ও হওয়াও স্বাভাবিক। বিগত মহাসমরে বহু কবি, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, শিল্পী ও স্থপতি, যোগদান

করিয়াছিল। যুদ্ধের পর যুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা, নিষ্ঠুর দানবীয় কার্য্যাবলী সংহার লীলা, অর্থাৎ যুদ্ধের ফলে যে বিষ উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা সেই সব লেখক ও শিল্পী সম্প্রদায়, যুদ্ধ বিরতির পর, তাঁহাদের তিক্ত দুঃখে লব্ধ অভিজ্ঞতা পুস্তকাকারে বর্ণনা করিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের মনে প্রথমেই যে যুদ্ধ উপন্যাসের নাম মনে হয়, সেখানি হইতেছে—All Quiet on the Western Front'। ইহা বোধ হয় যাবতীয় সমর উপন্যাসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বিক্রয় হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যে গত মহাযুদ্ধের উপর লিখিত বহু পুস্তক উহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যেমন, ওয়েলস্-এর—"Mr. Britling Sees It Through." এই পুস্তকখানি একখানি অপূর্ব্ব সমর-উপন্যাস। ইহার বর্ণনা, লেখনী-চাতুর্য্য, রূপ ও রসের সমাবেশ ও ঘটনার সামঞ্জস্য ও চাতুর্য্যতায় অপরূপ। ইহার চরিত্রাঙ্কণও আর্টের দিক হইতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। গত মহাসমরের উপর ভিত্তি করিয়া, বহু ছোট বড় উপন্যাস ছোট গল্প ও কবিতা, নানা গাথা, নানা সমর-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ, অজস্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাদের বিষদ সমালোচনা ও আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। ইহার ভিতর আমি মাত্র উপন্যাস—যাহা সমর-উপন্যাস তাহারই আলোচনা করিব। প্রথমত: যুদ্ধ সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা লইয়া, আয়ান্ হের প্রথমতঃ পুস্তক রচনা করেন। তৎপরবর্ত্তী, জন্ বুকান্ ইংরাজী সাহিত্যে সামরিক উপন্যাস রচনা করেন। তৎপর এড্‌ওয়ার্ড ফ্রাঙ্কস, বানষ্টেড, সমারসেট্ মমাম, ফরেষ্টার প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ সমর-উপন্যাস রচনা করেন।

মিঃ বুকান্-এর Thirty-nine Steps, Green Mantle, ও 'Mr. Standfast, এই তিনখানি পুস্তক সমর-উপন্যাস হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে ও সাহিত্য রসিকগণের নিকট বিশেষরূপে আদৃত। Peter Jackson, Cigar Mechant, Four Horsemen, The way of Revelation প্রভৃতি সমর উপন্যাসগুলি সত্যই সু-লিখিত এবং জনপ্রিয়। উইলিয়ম এম্‌ফ্রি—Command এবং সি, ই, মণ্টাসুভার এর Fiery Particles—এই দুটী উপন্যাস লিপি-কুশলতায় পরিপূর্ণ। ইহার পর, The Memories of a Fox-hunting Man, A farewell to Arms, Her Private We, The Path of Glory, Death of a Hero, The Spanish Farm প্রভৃতি সমর-পুস্তকগুলি প্রণিধানযোগ্য।

বিষয় নির্ব্বাচনে, সাহিত্য প্রকাশের ভঙ্গী প্রভৃতিতে, ইহা সমর-সাহিত্যের উৎকর্ষ বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। গ্রন্থকার পুস্তকের নায়ককে' পারিপার্শ্বিক জগতের মহৎ, তুচ্ছ যাবতীয় ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে রাখিতে পারিয়াছেন বলিয়া বই দু'খানি শেষপর্য্যন্ত সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই পুস্তকখানির একটা অংশ উল্লেখযোগ্য—"যুদ্ধক্ষেত্রের একটা শান্ত রাত্রি। ফ্রান্সের পঙ্কিল, রক্তময় দুর্গন্ধযুক্ত ট্রেঞ্চের মধ্যে পুস্তকের নায়ক ল্যাম্-এর সাহিত্য পড়ছেন। দীর্ঘকায় মোমবাতির অস্ফুট স্বল্প আলোক—ভারী বিষাক্ত দুর্গন্ধ আবহাওয়া, আশেপাশে মৃত সৈনিক বন্ধু, অন্যপাশে সুপ্ত সৈনিক ও ও অফিসারদের দুঃস্বপ্নভরা অস্ফুট উক্তি—আর বাহিরে তিমিরাচ্ছন্ন দিগন্ত আকাশে, আলোর ও মারণ অস্ত্রের দীপ্ত শিখা।"

ইহারপর, The General, No Hero this, The Last Brigade, প্রভৃতি অজস্র সমর-উপন্যাস দেখা দিল।

বিগত ১৯১৪ সালের যুদ্ধ ১৯১৮ সালে আসিয়া বিরাম লাভ করে। যুদ্ধ থামিয়া গেলেও সমাজ জীবনে জনগণের উপর ও ব্যক্তিবিশেষের মনে, গত মহাযুদ্ধের স্মৃতি খুব অল্প আয়াসেই যে লুপ্ত হইয়াছে, তাহা নয়। অবশ্য সেই রক্তাক্ত ক্ষত নিঃশেষে শুকাইতে না শুকাইতে, আবার বিশ্বব্যাপী মহাপ্রলয়ের ধ্বংস লীলা চলিয়াছে। গত মহাযুদ্ধের পর, ইউরোপে যেমন যুদ্ধের বর্ণনা লইয়া অজস্র ছোট বড় উপন্যাস বাহির হইতে লাগিল, তেমনি অন্যান্য দেশেও তাহার কিছু কিছু প্রকাশ পাইতে লাগিল। কিন্তু যাহা ঠিক মহাযুদ্ধের উপর নহে, তবুও তাহার ছোঁয়াচ হইতে উক্ত পুস্তকগুলি মুক্ত নয়।

যেমন চীনের সাম্প্রতিক সাহিত্যিক হুসিয়াও চুন্-এর, Aug st Village, হসিয়াও হুঙ্-এর, "Life and Deathfield", মাও তুন এর Twlight ও Spring Sick Worms', এই বইগুলি মাঞ্চু জনগণের সংগ্রামের কাহিনী ও বৈদেশিক ধনতন্ত্রের দ্বারা চীনের জাতীয় ধনতন্ত্রের সমর কাহিনী। ঠিক এইরূপ, স্পেনের সাহিত্যিকগণের মধ্যে, বিগত ফ্রাঙ্কো গভর্ণমেন্টের সহিত জাতীয় গভর্ণমেন্টের সংগ্রামের উপর অজস্র কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প ও উপন্যাস লিখিত হইয়াছে। উহার মধ্যে স্কটস্-এর লিখিত, Lean men, The Olive field, ও রেমন্ সেণ্ডর-এর লিখিত "Seven Red Sundays, Im'ar. The wind in Moncloa goal প্রভৃতি অন্যতম। জগতের নানা দেশের জাতীয় সংগ্রামের উপর অজস্র উপন্যাস লেখা হইয়াছে। গত মহাযুদ্ধের উপর অজস্র উপন্যাস লেখা হয় সেগুলি পড়িতে পড়িতে, পাঠকের মন তিক্ত ও বীভৎসতায় ভরিয়া যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাহাতেও যুদ্ধ সম্বন্ধীয় উপন্যাসের রেওয়াজ কমে নাই। কারণ বিগত মহাযুদ্ধে, যাহারা মেসোপটিমিয়া, প্যালেষ্টাইন, ফ্রান্স, বেলজিয়ম ও ফ্লাণ্ডার্স এ যুদ্ধ করিয়াছিল, ও যাহারা সেই যুদ্ধে প্রাণদান করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সেই সব বীর সেনানীদের যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া যুদ্ধের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিবার প্রবৃত্তি অবশ্যই স্বাভাবিক।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই, কবে শেষ হইবে কেহ জানেন না। এই যুদ্ধ থামিয়া গেলে আমরা আবার এই যুদ্ধের উপর লিখিত অজস্র উপন্যাস দেখিতে পাইব। অবশ্য উহা নুতন ভঙ্গির প্রত্যাশা আমরা সকলেই করিতে পারি। এই মহাযুদ্ধের উপর এখনই বহু গল্প ও কবিতা, সচিত্র কার্টুন প্রভৃতি দেখা গিয়াছে। ইহার মধ্যেই চীন জাপান এর যুদ্ধের উপর ভিত্তি করিয়া বহু উপন্যাস, শিশু-উপন্যাস, গল্প, কবিতা, সচিত্র পোষ্টার, জন-নাট্য প্রভৃতি প্রত্যহই দেখিতে পাইতেছি। রুশ ফিনিশ যুদ্ধের উপর লিখিত, "In the rear of the Enemy" নামক পুস্তক ইতিমধ্যেই বাজারে দেখা গিয়াছে।

বর্ত্তমানে ডন্ ও ভলগা নদীর পারে যে বীভৎস সংগ্রাম অহর্নিশ চলিতেছে, যেখানে মানুষের প্রাণ প্রতি মুহূর্ত্তে শূন্যে মিলাইতেছে—নরনারী, বৃদ্ধ, ও শিশুর মেদ ও মজ্জার লাল রক্তে, যেখানকার রাস্তাঘাট প্লাবিত; খণ্ড মৃতদেহ, ধ্বংসস্তূপ, ভগ্ন অট্টালিকা, যে ষ্টালিনগ্রাড আজ আচ্ছন্ন, সেই ডন্ ও ভলগার জল আজ লাল বীর সেনানীর রক্তে লাল। ষ্টালিনগ্রাডের আকাশে আজ চাঁদ উঠে না বারুদের ধোঁয়ায় সুনীল আকাশ নক্ষত্র খচিত নৈশ গগন আচ্ছন্ন। কামান-ট্যাঙ্ক, বোমারু বিমানের শব্দে, আকাশ বাতাস মুখরিত,—দুরন্ত ফ্যাসিষ্ট বাহিনীর আক্রমণে সমগ্র রুশিয়া বিপন্ন ও বিধ্বস্ত। এই ভয়াবহ যুদ্ধের উপর, লাল সেনানী, রুশ নরনারী, শ্রমিক কৃষকদের সুদীর্ঘ সাধনা, তাহাদের ধৈর্য্য, তাহাদের বীরত্ব, তাহাদের জননী জন্ম ভূমির উপর ভালবাসা, সোভিয়েটের উপর আস্থা ও সর্ব্বোপরি রুশিয়ার মহান্ নেতা, মহান্ ও গরীয়ান্ বীর ও বিরাটপুরুষ ষ্টালিন,—এই সবের উপর যে উপন্যাস বাহির হইবে, আমরা তাহার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছি।

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

সাময়িক প্রসঙ্গ ও আলোচনা

মহাত্মার অনশন

বিগত ১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে দীর্ঘ একুশ দিন ব্যাপী অনশন ব্রত পালন করিয়া গত ৩রা মার্চ্চ পূর্ব্বাহ্ণে কমলালেবুর রস ও মধু পান করিয়া মহাত্মাজী অনশনব্রতের উদ্‌যাপন করিয়াছেন। মহাত্মা অনেক বিষয়েই সাধারণের কাছে দুর্ব্বোধ্য। সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বোধ্য—তাঁহার এই মাঝে মাঝে অনশন-ব্রত। উপনিষদের মর্ম্ম অনুভূত হয়, ন্যায়ের কূটযুক্তি বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু মহাত্মার এই উপবাসের মর্ম্ম বুঝা যায় না। বিশেষতঃ, মহাত্মা স্বয়ং সময়ে সময়ে ইহার যেরূপ ভাষ্য করেন তাহাতে ইহা প্রহেলিকার মতই উত্তরোত্তর দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। অপরের চিত্তশুদ্ধির জন্য বা শুভ-বুদ্ধি উদয়ের নিমিত্ত অনেক সময়ে তিনি অনশন অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহার সে সময়ে এটুকু পর্য্যন্ত হুঁস থাকে না যে, উহা সম্ভবপর হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সন্তান হীরালালের চিত্ত অমন অস্থির হইয়া নানা ধর্ম্মের ও নানা কাজের যোলাগুলে অদ্যাবধি ঘুরপাক খাইত না। তাঁহার এবারের অনশনের ফল আমরা মোটামুটি যেটুকু প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাতে দেখিতে পাইতেছি যে, বড়লাটের শাসন-পরিষদ হইতে শ্রীযুক্ত আনে, শ্রীযুক্ত এইচ, পি, মোদী ও শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার—এই তিনটি নক্ষত্র খসিয়া পড়িলেন।

ডাল-ভাত সমস্যা

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট অনেক তদ্বির করিয়া বিহার গভর্ণমেণ্টকে বিহার হইতে মাসে ৫০ হাজার মন ডাল বাঙ্গালাদেশে সরবরাহ করিতে রাজী করাইয়াছেন। ডালের অভাব ইহাতে কতকটা মিটিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সমস্যার ইহাতেই সমাধান হইল না। চাউলের দাম চড়িতে চড়িতে পঁচিশের কোঠায় উঠিয়াছে। মানুষের বহন ও সহন শক্তি এদেশে কতটুকু তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সুতরাং এই দর অল্পকাল স্থায়ী হইলেও অনেককে যে অনশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে তাহাতে তিলমাত্রও সন্দেহ নাই। অতএব আমরা কর্ত্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে অচিরে অবহিত হইতে ও এই দারুণ সমস্যার অনুকূল সমাধান করিতে ঐকান্তিক ভাবে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। অধিকন্তু আমরা অতর্কিত চিত্তে কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইতেছি যে; এই দারুণ অবস্থার ফলে দেশময় অরাজকতা ও সর্ব্বপ্রকার বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়াও অসম্ভব নহে।

বাঙ্গালার রাজনৈতিক বন্দীসংখ্যা

বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক্ সাহেব গত জানুয়ারী মাসের শেষ পর্য্যন্ত ধরিয়া বাঙ্গালার রাজনৈতিক বন্দীদের যে একটা হিসাব সম্প্রতি দিয়াছেন তাহাতে মোট বন্দী সংখ্যা ৭১১০ জন দেখা যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে ভারতরক্ষা আইনের ২৬ ধারা বা ১২৯ ধারা অনুযায়ী আটক বিশেষ সিকিউরিটী বন্দী ২৩৫৫ জন, অন্যান্য বন্দী ১৬৭৩ জন, ভারতরক্ষা আইনের ২৬ ধারা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত অপরাধী ১৪৮৪ জন ও অন্যান্য বন্দী ১৬৯৮ জন। ইতঃপূর্ব্বে হকসাহেব এসেম্ব্লির আলোচনায় ভারতরক্ষা আইনে বন্দীর সংখ্যা চারিহাজারেরও কিছু কম বলিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান হিসাবে বন্দীর সংখ্যা সাতহাজারেরও উপরে উঠিয়াছে। ইহার পরে আবার ভারতরক্ষা আইন অনুসারে যাঁহারা আদালত কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা ১১৫৯ জন যাহা হক সাহেবের পূর্ব্ব বিবৃতিতে ছিল, এবারে তাহার কোন উল্লেখ নাই। ব্যাপারটা এইখানেই গোলমেলে হইয়া গিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালাদেশে সর্ব্বসাকুল্যে ভারতরক্ষা আইন অনুসারে দণ্ডিত বন্দীদের সংখ্যা কত, কর্ত্তৃপক্ষ অনুগ্রহ করিয়া তাহার যথার্থ সংবাদটা সাধারণকে জানাইবেন, কি?

অপ্রাপ্তবয়স্কদের মুক্তি

১৮ আঠার বৎসরের কম বয়স্ক যে সব বালককে কেবল কংগ্রেস-কর্ম্ম-সূচীর কোন ব্যাপারে যোগদান অথবা এতৎসম্পর্কীয় কোন অপরাধ করার নিমিত্ত আটক করিয়া কিম্বা কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে বাঙ্গালা সরকার তাহাদিগকে মুক্তি দানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তানুসারে স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগকে তাহাদের নিজ নিজ এলাকায় এইরূপ যে সব অপ্রাপ্তবয়স্ক বন্দী আছে তাহাদিগকে মুক্তি দিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

এতৎসম্পর্কে যে প্রেসনোট বাহির করা হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান গোলযোগে অল্পবয়স্ক ব্যক্তিগণ জড়িত হইয়া পড়ায় গভর্ণমেণ্ট অত্যন্ত দুঃখিত। ইহাদের মধ্যে অনেককে হয় কোন অভিযোগে অথবা মাত্র আটক করিয়া রাখিবার নিমিত্ত গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সাধারণ নীতি হিসাবে গভর্ণমেণ্ট ১৮ বৎসরের কম বয়স্ক বালকদিগকে আটক করিয়া রাখা অবাঞ্ছনীয় মনে করেন। অতএব গভর্ণমেণ্ট স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগকে এইরূপ নির্দ্দেশ দিতেছেন যে, এইরূপ অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগকে মুক্তি না দেওয়ার পক্ষে বিশেষ কোন সঙ্গত কারণ না থাকিলে তাহাদিগের পিতামাতা অথবা অভিভাবকগণ যদি এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাহারা ভবিষ্যতে কোনরূপ গোলযোগে যাহাতে জড়িত হইয়া না পড়ে তাঁহারা তাহার ব্যবস্থা করিবেন, তবে তাহাদিগকে মুক্তি দিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত এই শ্রেণীর বিচারাধীন ব্যক্তিগণকে অবাধে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইবে এবং যে সমস্ত অল্পবয়স্ক ব্যক্তিকে ভারতরক্ষা বিধানাবলীর ১২৯ ধারা অথবা ২৬ (১) খ ধারা অনুসারে

আটক করিয়া রাখা হইয়াছে, অথবা যাহারা কোন নির্দ্দিষ্ট অভিযোগে দণ্ডিত হইয়াছে, তাহাদিগকেও মুক্তি দিতে হইবে। কোন কারণ বশতঃ এইরূপ কোন ব্যক্তিকে যদি আটক করিয়া রাখিতেই হয়, তবে সে যাহাতে সাধারণ শ্রেণীর অপরাধীদের সহিত মেলামেশা করিতে না পারে তদুদ্দেশ্যে তাহাকে সম্পূর্ণ আলাদা করিয়া রাখিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এইভাবে যাহাদিগকে পৃথক করিয়া রাখা হইবে তাহাদিগকে পড়িবার নিমিত্ত পুস্তক দেওয়া হইবে।

গভর্ণমেণ্টের এই নির্দ্দেশটুকুর মধ্যে যে একটু কিন্তু রহিয়া গিয়াছে তাহা না থাকিলেই আর কোন গোল থাকিত না। প্রথমতঃ স্থানীয় কর্ম্মচারীদের বিচারবুদ্ধির উপর সরকার ব্যবস্থার ভারটি সম্পূর্ণরূপে চাপাইয়া দিয়াছেন। স্থানীয় কর্ম্মচারীদের বিচারবুদ্ধি প্রায় সর্ব্বত্রই দমননীতি প্রবণতা দ্বারা প্রভাবিত। তারপর পিতামাতা ও অভিভাবকদিগের নিকট হইতে অপরাধীরা ভবিষ্যতে যাহাতে কোনরূপ তথাকথিত অপরাধের সংস্রবে না যায় তাহার প্রতিশ্রুতি আদায়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাদ্বারা আইনের মারপ্যাচে পিতামাতা বা অভিভাবকদিগকে অভিযুক্ত করিবার ক্ষমতাও হাতে রাখা হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করিবার কি কারণ নাই ?

বিপ্লবের ফলাফল

ভারতের বিভিন্ন অংশে যে সব বৈপ্লবিক কার্য্য চলিতেছে তাহার ফলে বিগত ১৯৪২ সালের ৯ই আগষ্ট হইতে ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত মোট এক হাজার আঠাশ জন লোক প্রাণ হারাইয়াছে এবং তিন হাজার দুইশত পনর জন লোক সামান্য অথবা গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। ঠিক এই সময়ের মধ্যেই খাস বৃটিশ-শাসিত ভারতে ৯৫৮ নয় শত আটান্ন জনকে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। অবশ্য ইহাদের মধ্যে যুক্তপ্রদেশে যত লোক বেত্রদণ্ড ভোগ করিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ধরা হয় নাই ; কারণ যে সময়ে ভারত সচিব মিঃ আমেরি কর্ত্তৃক উপরোক্ত হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে সে সময় পর্য্যন্ত ভারত সচিবের দপ্তরে যুক্তপ্রদেশের সংখ্যা পৌঁছায় নাই।

ভারতীয় কাগজের ভাগ বণ্টন

ভারতীয় কাগজ-কল সমিতির নিকট গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি যে পত্র দিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ, ভারত গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে উৎপন্ন কাগজের মোট পরিমাণের শতকরা ৩০ ভাগ বেসরকারী জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিবেন এবং ৭০ ভাগ সরকারী কাজের জন্য রাখিবেন। কাগজ-কল সমিতির পক্ষ হইতে বেসরকারী জনসাধারণের ব্যবহারের নিমিত্ত উৎপন্ন কাগজের শতকরা ৪০ ভাগ কাগজ ছাড়িয়া দিবার অনুমতি চাহিয়া এক প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। তাহারই উত্তর স্বরূপ গভর্ণমেণ্ট এই পত্র দিয়াছেন। যুদ্ধের ফলে চারিদিকেই যেরূপ অভাবনীয় দারুণ অনটন দেখা দিয়াছে তাহাতে কাহার কথা রাখিয়া কাহার কথা বলিব ? আর, বলিলে শুনিবেই বা কে ?

ছুটির দিনের জরিমানা

রবিবার এবং সাধারণ ছুটির দিনে ষ্টীমার চালাইবার দরুণ যে জরিমানা ফি ধার্য্য আছে ভারত সরকার এক আদেশ জারী করিয়া যুদ্ধকালের জন্য আপাততঃ তাহা রহিত করিলেন বলিয়া জানাইয়াছেন। এই ফি উঠাইয়া দিবার জন্য বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স সরকার সমীপে যে আবেদন করিয়াছিলেন, সেই আবেদনের ফলেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে।

জাপানের সামরিক সম্পদ্

বিগত ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি-পরিষদে বক্তৃতা দানপ্রসঙ্গে চীনের জননেত্রী মাদাম চিয়াংকাইসেক এক সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এখনও সাধারণের ইহাই বিশ্বাস যে, জার্ম্মাণী পরাজিত হইলেই জাপান পরাজিত হইবে, কিন্তু এ ধারণা ভুল। আমাদের ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, বর্ত্তমানে জাপানের অধিকারে যে বিশাল ভূভাগ রহিয়াছে তার সামরিক সম্পদ্ জার্ম্মাণীর অপেক্ষা অনেক বেশী এবং উহা যতদিন নির্ব্বিবাদে জাপানের অধিকারভুক্ত থাকিবে ততদিন জাপান জার্ম্মাণী অপেক্ষাও শক্তিমান্ থাকিবে।

ব্রহ্মদেশ ও ফিলিপাইনে স্বায়ত্তশাসন

গত ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে জাপানী রেডিওর যে সকল ঘোষণা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুনা গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, জাপানীরা তাঁবেদার নানকিং গভর্ণমেণ্টের মতই ব্রহ্মদেশে ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে স্বাধীন তাঁবেদার গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে। প্রকাশ, রেঙ্গুনে আহূত এক সম্মেলনে ব্রহ্মদেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা স্থির হইয়া গিয়াছে বলিয়া টকিও রেডিও ঘোষণা করিয়াছে। ঐ ঘোষণায় ইহাও বলা হইয়াছে যে, 'বৃহত্তর পূর্ব্ব এশিয়া' প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত যাহাতে উভয় দেশ মিলিত ভাবে কার্য্য করিতে পারে তজ্জন্য জাপান এবং ব্রহ্মদেশের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে স্বাধীনতা দিবার যে সঙ্কল্প জেনারেল তোজো ঘোষণা করিয়াছেন তজ্জন্য ফিলিপাইনের অধিবাসীদের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে জাপানীরা ম্যানিলায় এক সোমবারে সরকারী ছুটির ব্যবস্থা করিয়াছিল বলিয়াও প্রকাশ। যাহা হউক, এ সবই যে অধিকৃত ভূখণ্ডের অধিবাসীদিগকে খুসী করিয়া আপাততঃ অনায়াসে হাতে রাখিবার উদ্দেশ্যেই করা হইতেছে তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই।

এই বৎসরেই যুদ্ধ শেষ

জেনারেল তোজো বলিয়াছেন যে, এই বৎসরেই যুদ্ধ শেষ হইবে। আমরাও বলি তথাস্তু। জেনারেল তোজোর মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। এ মহাপ্রলয়-তাণ্ডব এখন যত শীঘ্র শেষ হয় ততই মঙ্গল। পৃথিবী এ তাণ্ডবের দাপটে পড়িয়া ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। সর্ব্বত্র দুর্ভিক্ষ, মহামারী, করাল-বদন বিস্তার করিয়া মানুষের বংশ উজাড় করিবার উপক্রম করিয়াছে, এখন ইহা অল্পে অল্পে না থামিলে আর রক্ষা নাই।

হিটলারের দম্ভোক্তি

নাৎসী দলের জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে জার্ম্মাণ বেতারে গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে হিটলারের এক ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছে।

হিটলার স্বয়ং "এখন পূর্ব্ব-রণাঙ্গনে অর্থাৎ রুশ সীমান্তের যুদ্ধক্ষেত্রে রহিয়াছেন। হিটলারের বাণী পাঠ করিয়াছেন মিউনিক সহরে জার্ম্মাণ রাষ্ট্রসচিব। বাণীতে হিটলার বলিয়াছেন যে, জার্ম্মাণীর শত্রুদের সজ্ঘ যত বড়ই হউক, শক্তি হিসাবে উহা বলশেভিক ধনিক ধ্বংস-শক্তির সম্মুখীন জাতিসমূহের মৈত্রীর শক্তি অপেক্ষা হীনবল।

হিটলার বলেন, "আমাদের এই নাৎসী দল বরাবরই কোন অবস্থারই আত্মসমর্পণ না করিতে এবং আমাদের শত্রুদের ষড়্‌যন্ত্র মূলোচ্ছেদ করিয়া বিলোপ না করা পর্য্যন্ত সংগ্রাম পরিত্যাগ না করিতে অনমনীয় সঙ্কল্পে বদ্ধ-পরিকর। তোমরা আমার নিকট হইতে এই উন্মাদনাময় নিষ্ঠা শিখিয়াছ। এখন এই নিশ্চয়তা গ্রহণ কর যে, এখনও ঐ একই উন্মাদনাময় নিষ্ঠায় একই রূপ তীব্রভাবে আমি অনুপ্রাণিত আছি এবং যতদিন আমি জীবিত থাকিব, ততদিন উহা আমাকে পরিত্যাগ করিবে না। আমরা ইহুদী বিশ্বসঙ্ঘকে চূর্ণবিচূর্ণ করিব এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত মানবজাতি এই যুদ্ধে চরম জয়লাভ করিবে। এ কথা বিশ্বাস করিবার অধিকার আমার আছে যে, এই কার্য্য সম্পাদনের জন্যই বিধাতা আমাকে মনোনীত করিয়াছেন। এই বিশ্বাস না থাকিলে জার্ম্মাণীর ক্ষমতা লাভের পথে যে সকল বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এবং যে সকল আঘাত উহার উপরে পড়িয়াছে তাহা অতিক্রম করিয়া আমি টিকিয়া থাকিতে পারিতাম না, পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয় জয়ে জার্ম্মাণ জাতিকে মণ্ডিত করিতে পারিতাম না। অধিকন্তু যে সকল দুঃখ-ক্লেশে অপর কোন অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী চিত্ত একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে তাহা সহ্য করিতে পারিতাম না। পরবর্ত্তী কয়েক মাস, অথবা হয় ত' কয়েক বৎসর এই নাৎসী দলকে তাহার দ্বিতীয় মহৎ ঐতিহাসিক কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে, সে কর্ত্তব্য হইতেছে,—জাতিকে অবিরাম তাহার বিপদের গুরুত্ব সম্বন্ধে জাগ্রত রাখা, পবিত্র বিশ্বাসকে দৃঢ় করা, দুর্ব্বল চরিত্রে শক্তি সঞ্চার করা, এবং ধ্বংস-কার্য্যব্রতী দেশকে নির্ম্মমভাবে ধ্বংস করা। সন্ত্রাসকে দশগুণ অধিক সন্ত্রাস দ্বারা ধ্বংস করিতে হইবে। বিশ্বাসঘাতক যাহারাই হউক এবং যে ছদ্মবেশেই তাহারা থাকুক না কেন, তাহাদিগকে নাৎসী দলের ধ্বংস করিতেই হইবে। আমাদের শত্রুদের পরিকল্পনা অনুযায়ী মনুষ্যজাতির আর্য্য অংশের বিলোপে এই যুদ্ধের অবসান হইবে না, অবসান হইবে ইউরোপ হইতে ইহুদীদের বিলোপসাধনে। ইহুদীরা মনে করিতেছে যে, তাহারা সুখ-রাজ্যের দুয়ারে পৌছিয়াছে, কিন্তু গত বৎসরের ন্যায় এবৎসরও তাহাদের ভাল করিয়াই মোহের অবসান হইবে। যে সকল দেশ এই যুদ্ধ বাধার জন্য দায়ী, তাহাদিগকে এই মারাত্মক সংগ্রামে তাহাদের অংশ গ্রহণের জন্য তলব করিতে আমরা এক মুহূর্ত্তও ইতস্ততঃ করিব না। যে কালে আমাদের নিজেদের জীবন এমন কঠোর ভাবে ক্ষয় করা হইতেছে সেই সময়ে বিদেশীদের জীবন সম্বন্ধে আমরা কোন দ্বিধা করিব না।"

হিটলারের এই দম্ভোক্তিতে বিশেষ গুরুত্ব নাই থাক, তাঁহার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য অভিব্যক্ত হইয়াছে।

বৃটিশ নৌবহরের ক্ষতি

বর্ত্তমান যুদ্ধে আজ পর্য্যন্ত বৃটিশ নৌবহরের যে পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে, তাহার একটা মোটামুটি হিসাব বাহির হইয়াছে। উহাতে প্রকাশ, সর্ব্বসাকুল্যে বৃটিশের ক্যাপিটেল সিপ ৫ খানি, বিমানবাহী জাহাজ ৭ খানি, ক্রুজার ২৬ খানি, অস্ত্রসজ্জিত বাণিজ্য-ক্রুজার ১৪ খানি, ডেষ্ট্রয়ার ৯৪ খানি, কর্ভেট ১৪ খানি, সবমেরিন ৪৪ খানি, মনিটর ১ খানি, স্লুপ ৮ খানি, মাইন সুইপার ২২ খানি, ট্রলার ১৫৩ খানি, ড্রিফটার ১৪ খানি, মাইনলেয়ার ১ খানি, ইয়চ ৩ খানি, গানবোট ৫ খানি এবং ৬ খানি কাটার বিনষ্ট হইয়াছে। বাণিজ্য-জাহাজ যে এ যাবৎ কতগুলি বিনষ্ট হইয়াছে তাহার কোন সঠিক হিসাব এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। তাহার সংখ্যা যে বিস্ময়কর অধিক তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে বৃটিশের অফুরন্ত ভাণ্ডারে টান ধরান সহজসাধ্য নহে।

বিমান হানায় ১৭৮ জনের জীবনান্ত

গত ১৯শে ফাল্গুন বিলাতের খাস লণ্ডন সহরের ভূগর্ভস্থ আশ্রয়স্থলের প্রবেশপথে জার্ম্মাণ বিমান হানার ফলে এক অতি বড় শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ঐ দিন জার্ম্মাণ বিমান লণ্ডন সহরের উপর হানা দিলে, জনতা ভূগর্ভস্থ আশ্রয়স্থলে প্রবেশ করিতে গেলে একটি স্ত্রীলোক সহসা একটি পুটুলিতে বাঁধিয়া তাহার শিশু সন্তান সহ ভূগর্ভে অবতরণের সিঁড়ির উপর পড়িয়া যায়। পিছনের লোকেরা ইহা জানিতে না পারায়, পর পর পড়িতে ও চাপ খাইতে থাকে। এইরূপ পতনের ফলে ১৭৮ জন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৬০ জনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসার্থ প্রেরণ করা হইয়াছে। বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, ভীতিবিহ্বলতার দরুণই এই দুর্ঘটনা ঘটে নাই। কারণ দুর্ঘটনার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত কাহারও মনে ত্রাসের সঞ্চার হয় নাই। এ সব মনস্তত্ত্ববিদের কথা, সমালোচনা না করাই ভাল। কিন্তু যে শোচনীয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল, ইহাতে তাহার সান্ত্বনার সম্ভাবনা আছে কি?

ভবিষ্যৎ সংগঠন

যুদ্ধের পরিসমাপ্তি কবে হইবে তাহার স্থিরতা না থাকিলেও ইতিমধ্যেই বিলাতে ভবিষ্যৎ সংগঠন কার্য্যের আলোচনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে বিদ্যুৎ, গ্যাস, জল, যানবাহন, গৃহাদি নির্ম্মাণ ও প্রধান পয়ঃপ্রণালীগুলি অন্যতম। এতদ্ভিন্ন যুদ্ধোত্তরকালে স্থানীয় শাসন সংস্কার কিরূপ প্রণালীতে পরিবর্ত্তিত হইবে এবং বি, বি, সি, অথবা লণ্ডন-প্যাসেঞ্জার বোর্ডের আদর্শ কিরূপ শাসন প্রণালী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলে তাহা সাধারণের সুবিধাজনক হইবে তৎসম্বন্ধেও আলোচনা চলিতেছে।

বিদ্যুতের জন্য পূর্ব্ব হইতেই একটী কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ বোর্ড (Central Electricity Board) আছে। কিন্তু গ্যাস বা জলের নিমিত্ত কোনও কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান নাই। গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহের কার্য্য মিউনিসিপ্যালিটি ও কোম্পানীর মধ্যে বিভক্ত অবস্থায় আছে। জলসংক্রান্ত সমস্ত বিষয় পার্লামেণ্টের সভ্যদের ব্যক্তিগত বিল দ্বারা আলোচিত হয়।

বিলাতী সংবাদপত্রের সুর

ইংলণ্ডের সংবাদপত্রগুলিতে সামাজিক বিশেষ পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে অনেক লেখালেখি চলিয়াছে। একমাত্র সামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন দ্বারাই ইংরেজজাতি আমেরিকার প্রগতিবাদীদলের ও সোভিয়েট রুশিয়ার বিশ্বাসভাজন হইতে পারে ইহাই সাংবাদিকগণের দৃঢ় বিশ্বাস। মিঃ মরিসন ও ডাঃ ডালটন বিগত নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা হইতেও ইহার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

রাশিয়া সাহায্য তহবিল

রাশিয়া হইতে প্রথম সাহায্য প্রার্থনা আসিবার পর হইতে বিগত অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত ১৮ দফায় মোট ২১৭১ টন মাল রাশিয়ায় প্রেরিত হইয়াছে এবং ঔষধপত্র ও তৎসংক্রান্ত জিনিষপত্র সমূহ এখনও পাঠান হইতেছে। এতদ্ব্যতীত সহজে বহনোপযোগী কতকগুলি রঞ্জনরশ্মির সরঞ্জাম, মোটর রঞ্জনরশ্মির সরঞ্জাম ও এম্বুল্যান্স ছাড়াও নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি প্রেরিত হইয়াছে—

(১) ৫০০০০০ খানা কম্বল, (২) ৫০০০০ প্রাথমিক চিকিৎসার দ্রব্যাদি, (৩) ৫০০০০ শিশুদের কোট, (৪) ৪০০০০ ব্রিচেট্, (৫) ২ টন ক্লোরোফরম্, (৬) ২/টন ইথার, (৭) ১০৫০০ কিলোগ্রাম সালফারী লেমাইড, (৮) ৫০০০ কিলো ক্লোরো মাইন, (৯) ১৫০০০০ অস্ত্রোপচারের কয়সেপ্, (১০) ৭৭০০০ হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ, (১১) ২০০০০ এম্পুলস্ ষ্ট্রোকানটিন, (১২) ৫০০০০ কিলো সোডিয়ম ব্রোমাইড, (১৩) ১৮০০০০ অস্ত্রোপচারের ক্ষুদ্র ছুরি, (১৪) ৬০০০০ অস্ত্রোপচারের কাঁচি, (১৫) ১১০০০ ষ্টেরিলাইজার, (১৬) ৩২৭০০০ অস্ত্রোপচার সম্বন্ধীয় দস্তানা, (১৭) ৬৩০০০ গরম জলের বোতল, (১৮) ৫৫০০০ রক্ত নিরোধক ব্যাণ্ডেজ এবং (১৯) ৫২০০০০ গজ রবার সিটিং।

ইহার পরে ঐ সময়ের মধ্যে রাশিয়া হইতে আরও অনেকগুলি দ্রব্যের অর্ডার আসিয়াছে এবং তাহাও যথাসম্ভব অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই পাঠান হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল। মোটের উপর রাশিয়া-সাহায্য তহবিলের কার্য্য পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে।

উপনিবেশের ক্ষতিপূরণ

বিলাতের কমন্স সভায় রাজ-কোষাগারের প্রধান কর্ত্তা স্যার কিংসলি উড ঘোষণা করিয়াছেন যে, যুদ্ধের দরুণ উপনিবেশ সমূহের দ্রব্যগত অথবা সম্পত্তিগত যে সব ক্ষতি হইবে সামর্থ্যানুসারে তাহা যথাসম্ভবরূপে ও যথাসম্ভব সময়ের মধ্যে পুনর্গঠন বা মেরামত করিয়া দেওয়া হইবে। এই পুনর্গঠন বা মেরামতকার্য্য সম্পূর্ণ করিতে যদি ক্ষতিগ্রস্ত উপনিবেশের আর্থিক সামর্থ্যে না কুলায় সে ক্ষেত্রে রাজকীয় তহবিল হইতে যথাসম্ভব সাহায্য করা হইবে। কোষাধ্যক্ষের এ বিবৃতি হইতে স্পষ্ট কিছুই বুঝা গেল না। কারণ, এতগুলি যথাসম্ভাব্যতার মধ্যে পড়িয়া আসল কথাটা একরূপ চাপা পড়িবার মতই হইয়াছে। যতটা ক্ষতিপূরণ সম্ভবপর হইবে, যতদিনে সম্ভবপর হইবে স্থানীয় সরকারী তহবিলে যতটা কুলায় তাহাতেও না হইলে রাজকীয় মূলতহবিলের বলাবল বিবেচনা করিয়া তবে এই ক্ষতিপূরণের সমাধান হইবে। কাজেই যা বলিয়াছি এতটা সম্ভাব্যতা উত্তীর্ণ হওয়া তখন একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে।

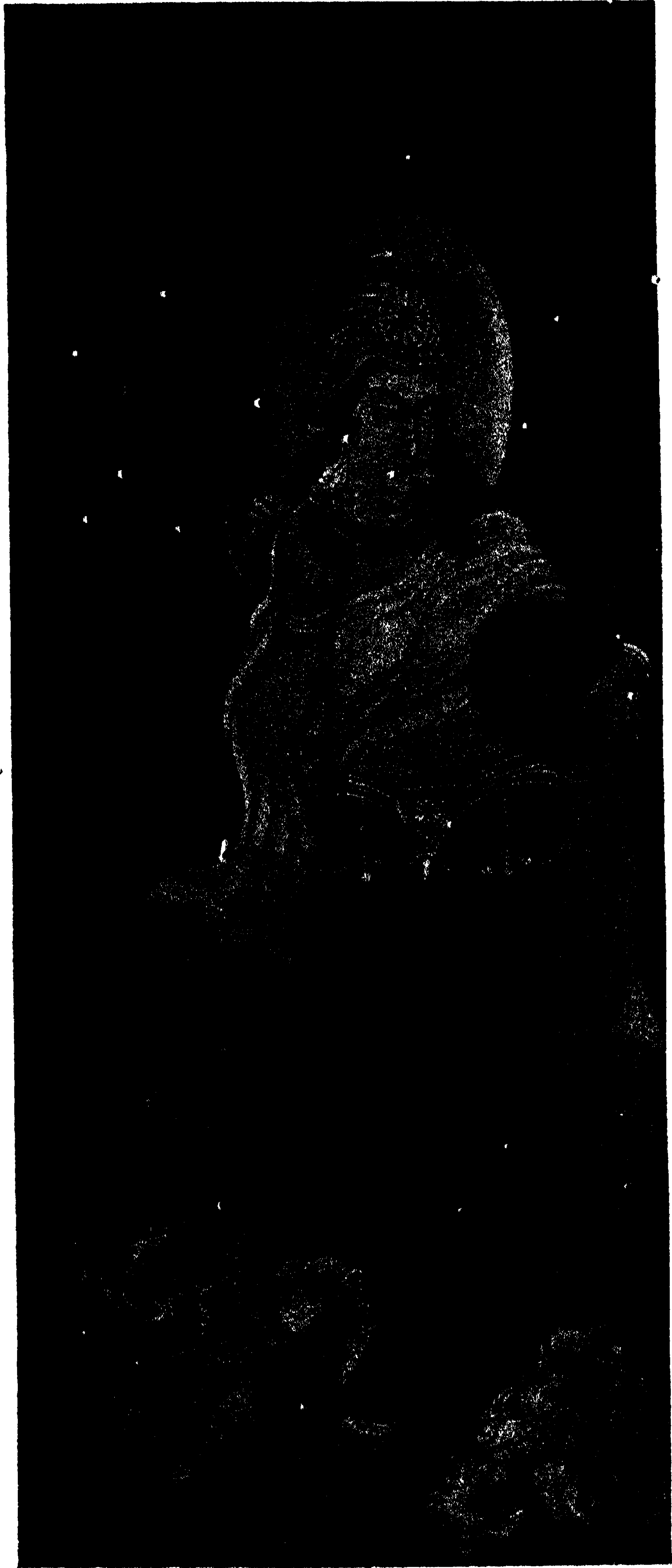
সমর-সংবাদ

রুশসীমান্ত—ক্রমাগতই জার্ম্মাণদের পরাজয় ঘটিয়াছে, ইহাই সাধারণতঃ রুশ-সীমান্তের যুদ্ধের স্থূল সংবাদ। তবে যুদ্ধটা এখন দক্ষিণ প্রান্ত হইতে মধ্য প্রান্তের ওরেস-স্মলেনস্ক সীমান্তের দিকে মোড় ঘুরিয়াছে বলিয়া মনে হয় এবং জার্ম্মাণদেরও শীতটা ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে বোধ হয়। কারণ, মস্কোর ১০ই মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, রাশিয়ানরা ক্রতাসনোগ্রাড প্রভৃতি কয়েকটী স্থান হইতে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। যাহা হউক, এখনও বরফ গলিয়া রুশসীমান্ত জার্ম্মাণদের সহজ যুদ্ধোপযোগী হইতে মাসাধিক কাল বিলম্ব আছে, ইতিমধ্যে সোভিয়েট সেনা যদি জার্ম্মাণ প্রধান আত্মরক্ষা ব্যূহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে আগামী গ্রীষ্মেও জার্ম্মাণেরা তেমন সহজে সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিবে না।

উত্তর-আফ্রিকা—উত্তর আফ্রিকায় টিউনিসিয়া সীমান্তে যুদ্ধটা এখনও তেমন বড় রকমের হইয়া বাধিয়া উঠে নাই। উভয় পক্ষেই যেন পাঞ্জাকষাকষি চলিতেছে। মিত্রপক্ষ তিনভাগ হইয়া তিন দিক দিয়া টিউনিসিয়াস্থ এক্সিস বাহিনীকে ঘিরিয়াছে। এক্সিস বাহিনীও ত্রিধাবিভক্ত হইয়া তিনদিকে মিত্রশক্তিকে আক্রমণ করিতেছে। কোথাও সময়ে জার্ম্মাণেরা হটিতেছে, কোথাও সময়ে মিত্রবাহিনীর একাংশ হটিতেছে, এই রূপই আগুপাছু চলিতেছে। তবে শীঘ্রই যে টিউনিসিয়া সীমান্তে একটা বড় রকমের সংঘর্ষ হইবে তাহা লক্ষণ দেখিয়া বেশ বুঝা যাইতেছে।

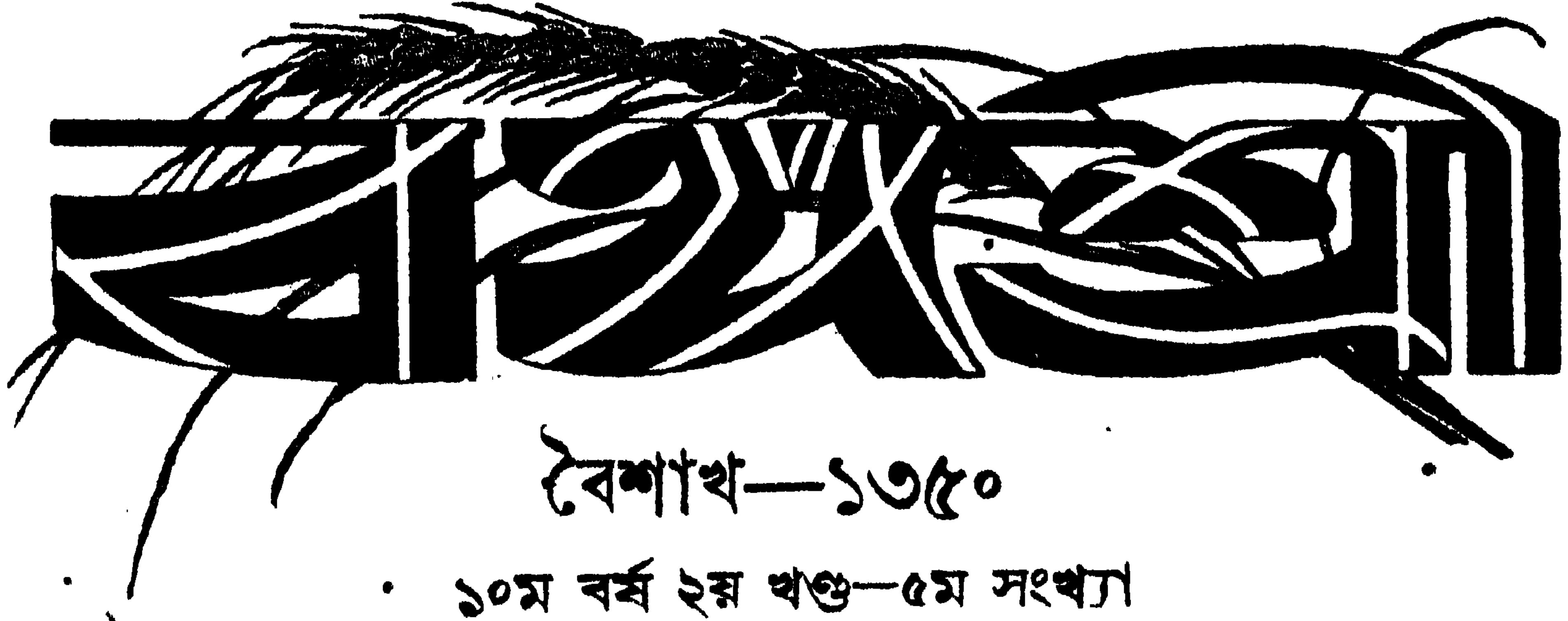
প্রশান্তসাগরাঞ্চল—প্রশান্তসাগরাঞ্চলে মিত্রপক্ষীয় নৌ ও বিমান বহরের আক্রমণে জাপানীদের বহু জাহাজ ও বিমান বিধ্বস্ত হইয়াছে। ইহার ফলে জাপানীদের অষ্ট্রেলিয়া আক্রমণের দুরভিসন্ধি নাকি আপাততঃ ভেস্তাইয়া গিয়াছে। জেনারেল ম্যাক আর্থার তাঁহার অষ্ট্রেলিয়াস্থিত হেড কোয়ার্টার হইতে যে সংবাদ দিয়াছেন তাহাতে ইহাই মনে হয়। আবার সম্প্রতি ইহাও প্রকাশ পাইতেছে যে, যত জাহাজ এবং যত বিমানই নষ্ট হইয়া যাক না কেন, জাপানীরা তাহাতে মোটেই দুর্ব্বল হয় নাই; অধিকন্তু তাহাদের শক্তি উত্তরোত্তরই ঐ অঞ্চলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। সংবাদটা পড়িয়া রক্তবীজের উপাখ্যানটা মনে পড়ে।

ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত—বৃটিশের ব্রহ্ম অভিযান বোধ হয় আপাততঃ স্থগিত রহিবে। কারণ, বর্ষা আগত প্রায়। এ সময়ে ব্রহ্মদেশের স্যায় দুর্গম অঞ্চলে যুদ্ধ পরিচালনা অসম্ভব ব্যাপার। এই সীমান্তে জাপানীদেরও তেমন কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাইতেছে না। তবে ইতিমধ্যে পূর্ব্ব আসামে অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ভাবে একটা বিমান আক্রমণ হইয়া গিয়াছে। এই আক্রমণে জাপানীদের ত্রিশখানা বোমারু বিমান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। মিত্রপক্ষ তাহার ছয়খানিকে ধ্বংস করিয়াছেন। আক্রমণের ফলে ক্ষতি অতি সামান্যই হইয়াছে।



মহালক্ষ্মী

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিণাং প্রাণদায়িনী"



বৈশাখ—১৩৫০

১০ম বর্ষ ২য় খণ্ড—৫ম সংখ্যা

বুদ্ধি-সারথি

শ্রীগৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

মানব স্বাধিকার-ভ্রষ্ট। সত্য হইতে কত দূরে আসিয়া পড়িয়াছে তাহা আর বুঝিবার শক্তি নাই। মদ্যপায়ীর মাদকতা অবসানে শারীরিক ও মানসিক অবসাদ আসে; অধিক পানাসক্ত ব্যক্তি সেই অবসাদ অপনোদনের জন্য পানের মাত্রা বৃদ্ধি করে। বর্ত্তমান কল্পনাজড়িত জ্ঞানে ভ্রান্তি বুঝিয়া যদিও কখন আত্মকার্য্যে সন্দেহ বা অনুশোচনা জন্মে, কল্পনা-মুগ্ধ মনই বিচারপতি হইয়া বসে। সেই মনের মীমাংসাও কল্পনাপ্রসূত; এই ভাবে চিন্তাপ্রবাহ ও কার্য্য চলিতেছে। জ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থায় ভ্রান্তি দূর করিবার চেষ্টা হইতেই পারে না।

এই জ্ঞানে তিনটি অবস্থাকে সত্য বলিয়া মনে হয়। (১) জ্ঞান বা চৈতন্য; (২) দেহ, যাহার ভিতর দিয়া চৈতন্য কার্য্য করে; (৩) চৈতন্যের অনুভাব্য বাহ্য জগৎ।

বাহ্য জগতের প্রকৃত অবস্থার অনুভূতি নাই; যাহার যেরূপ আকাঙ্ক্ষা বা "গরজ" সেই ভাবেই সে তাহার সকল জ্ঞেয়কে মূর্ত্তিমান্ করিয়া তোলে। বর্ত্তমান জ্ঞানের বিচারেও দেহ ও চৈতন্যের পার্থক্য উপলব্ধি সত্ত্বেও দেহই সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করি, চৈতন্যের অস্তিত্ব কেবল কথায় থাকিয়া যায় মাত্র। দেহাতিরিক্ত চৈতন্য বর্ত্তমান কল্পনামুগ্ধ জ্ঞানের বিষয় হইতেই পারে না। কারণ—ঐ জ্ঞান কল্পনাজাত দেহজ্ঞানের আবরণে আবৃত। চৈতন্য স্বরূপজ্ঞানের বিষয়। জ্ঞানের এই ভ্রান্ত অবস্থায় সংসারযাত্রা চালাইয়া যাইতেছি।

সংসার-রঙ্গমঞ্চে অভিনয় চলিতেছে; রথ আসিয়াছে, সেই রথ দেহ, জীব সেই রথের রথী, বুদ্ধি তাহার সারথি, ইন্দ্রিয়াদি সেই রথের অশ্ব, বুদ্ধিরূপ সারথির হস্তের রজ্জুই মন। বুদ্ধি ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণকে সেই রজ্জুদ্বারা চালিত করিতেছে। গন্তব্যপথ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদি। বুদ্ধি-রূপ সারথি অভিজ্ঞ চালক হইলেই ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণ তাহার বশীভূত থাকে। অশ্বের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বুঝিতে না পারিলে সারথি অশ্বরজ্জু আয়ত্তে রাখিতে পারে না; ফলে ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণ বিপথগামী হয় ও ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়ে। বুদ্ধিরূপ সারথির দোষেই ইন্দ্রিয়াদি অশ্বগণ প্রকৃত পথ ধরিতে পারে না; সুতরাং বুদ্ধিরূপ সারথির নৈপুণ্যের অভাবই সর্ব্ব অনিষ্টের মূল। এই সারথিই নিপুণ হইলে জীবকে তাহার গন্তব্যস্থানে অর্থাৎ ব্রহ্মধামে লইয়া যাইতে পারে; কিন্তু তদবস্থায় এই সারথির বেশ পরিবর্ত্তন হয়। বুদ্ধি তখন কল্পনা-শূন্য, সমাহিত ও শুদ্ধ। এই দুই বুদ্ধির রূপের বা জ্ঞানের পার্থক্য কিন্তু অনেক। জ্ঞান সর্ব্বাবস্থায় এক বিষয়ে তন্ময়। যতকাল সংসারের অনিত্য বা কাল্পনিক বিষয়ে সত্যজ্ঞান থাকিবে, ততকাল সংসারগতির পরপারে অবস্থিত নিত্য সত্য সেই বুদ্ধির পক্ষে অসত্য থাকিবে। বর্ত্তমান জ্ঞানে যাহা ধারণা করি তাহা এক কল্পনা হইতে কল্পনান্তরে যাওয়া মাত্র। সেই নিত্যজ্ঞান—অনুভূতি হইলে সংসারের অনিত্যতায় আর আস্থা থাকে না। কেন না, জ্ঞান মিথ্যাতে কখনও থাকিতে রাজি নয়। সেই পরাগতি বা গন্তব্য জীবের অবশ্য প্রাপ্তব্য।

অন্তঃকরণের দুইটি বৃত্তি আছে। একটি সংশয়াত্মিকা, যাহার নাম মন, অন্যটি নিশ্চয়াত্মিকা, যাহার নাম বুদ্ধি। কোন কার্য্য করিতে হইলে স্থিরসিদ্ধান্তে উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত কার্য্য সম্পাদিত হয় না। মানসিক সঙ্কল্প-বিকল্পের মধ্যে করণীয়

করিয়াছেন। জীব ভোগাসক্ত হইয়া অবিদ্যার কার্য্যস্বরূপ ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া রহিয়াছে। সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মার আশ্রয়েই জীব বিষয় ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ, জীব অজ্ঞ। জীব, ভোগ্যবস্তু ও সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বর—এই তিনই এক, অর্থাৎ সর্ব্বত্র পরমাত্মারই বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নাই। সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়, এই চিন্তা ও জ্ঞান প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সর্ব্ববিষয়ের আবির্ভাব ও তিরোভাব এক পরোক্ষ শক্তির চালনায় ঘটিতেছে; জীব আসে যায়, কাহারও মায়া-মমতার বন্ধনের জন্য অপেক্ষা করে না। আসক্তিজাত গভীর মনোবেদনায় বা শোকার্ত্তের কাতরতায় কেহ ফিরিয়া দাঁড়ায় না! নিত্য এই ঘটনা দেখিয়াও চৈতন্য হয় না। তাহার কারণ আসক্তি, এবং এই আসক্তির মূল কাল্পনিক আমিত্ব।

এই 'আমি' বা 'অহং'এর পাশমুক্ত হইবার জন্য মানব মাত্রেরই প্রচেষ্টা হওয়া উচিত। বাসনা থাকিলেও কল্পনাই প্রতিবন্ধক হইয়া উঠে, কারণ শিবকে আত্মস্বরূপ চিন্তা না করিয়া কেবল প্রতিমাতে উপাসনা 'হস্তস্থং পিণ্ডমুৎসৃজ্য লিহ্যাৎ কূর্পরমাত্মনঃ' মতই হয়; অর্থাৎ হাতের গ্রাস ত্যাগ করিয়া শূন্য হস্ত লেহনের মত করিতেছি। পরমাত্মাকে যিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান উপলব্ধি করেন, তাঁহারই আত্মাতে পরমাত্মা প্রকাশমান হন। নানাতীর্থে পর্য্যটন না করিয়া স্বদেহস্থ তীর্থে অবগাহন করিবার যত্ন করিলে অনেক সহজে ফললাভ হইয়া থাকে। কল্পনা ত্যাগ করিয়া মনকে আত্মস্থ করিলে পরমা শান্তি মন ও বুদ্ধিকে অভিষিক্ত করে। এই কল্পনাহীন অবস্থা হয় কিরূপে? এই প্রশ্ন সকলের হৃদয়ে উঠা স্বাভাবিক। উপনিষদ্‌কার ঋষিগণ কল্পনাভারাক্রান্ত মানবের শান্তিবিধানের উপায় উপনিষদ মাত্রেই ঘোষণা করিয়াছেন।

ঋষিবৃন্দের একবাক্যে উপদেশ এই যে, প্রণবদ্বারা মনন করিলে আত্মা অনুভবগম্য হয়। 'ওম্' এই অক্ষর আত্মপ্রকাশের শ্রেষ্ঠতম উপায়। ওঁকার পরম ব্রহ্মের অবলম্বনস্বরূপ, তাহাকে আশ্রয় করিলেই ব্রহ্মবিজ্ঞান হয়। 'ওম' এই অক্ষরই পরমব্রহ্মস্বরূপ ও বিশ্বের আধার। এই অক্ষরই সর্ব্বময়। ওঁকারকে অবলম্বন করিয়া পরমাত্মার ধ্যানের বিধি নির্দ্দিষ্ট। কঠোপনিষদে যমরাজ নচিকেতাকে বহুবিধ পরীক্ষার পর যখন দেখিলেন যে, তিনি আত্মজ্ঞান লাভে দৃঢ়সঙ্কল্প, তখন তাঁহাকে উপদেশ দিলেন—

> "সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি
> তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
> যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি
> তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবী-ম্যোমিত্যেতৎ।

অর্থাৎ সমস্ত বেদ যাহাকে প্রাপ্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, যাহার প্রাপ্তি কামনায় সমস্ত লোকের তপস্যা, যে পরমপদ লাভের অভিলাষে সাধুগণের ব্রহ্মচর্য্যাদির আচরণ, যাহা জানিবার জন্য তোমার উৎকট আগ্রহ, সেই পদ তোমাকে 'সংগ্রহেণ' অর্থাৎ সংক্ষেপে বলিতেছি, 'ওম'ই সেই 'পদ'। হে নচিকেতঃ, তুমি ঐ ওঁকার পদের তত্ত্বানুসন্ধান কর, তাহা হইলেই আত্মতত্ত্ব জানিয়া ব্রহ্মপদ লাভ করিবে। বৃহদারণ্যকের খিল কাণ্ডে ব্রহ্মের উপাসনার 'ওঁখং ব্রহ্ম' এই মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট, এই ওঁকার সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতীক।

উপনিষদকে প্রসিদ্ধ মহাস্ত্র ধনুঃ বলিয়া মুণ্ডকোপনিষদ বর্ণনা করিয়াছেন। সেই মহাস্ত্র ধনুঃ গ্রহণ করিয়া নিয়ত ধ্যান দ্বারা সূক্ষ্মীকৃত তীক্ষ্ণীকৃত শর সন্ধান করিবার ব্যবস্থা। সেই তীক্ষ্ণীকৃত শরই বিশুদ্ধ বুদ্ধি-সারথি। ওঁকারই ঐ উপনিষদ ধনুঃ, ঐ ধনুঃ আকর্ষণ করিয়া সুসংস্কৃত বুদ্ধিরূপ শর যোজনা করিবে; অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণকে নিজ নিজ বিষয় হইতে নিবারিত করিয়া ব্রহ্মভাবনতৎপর বিশুদ্ধ, একাগ্রতাসম্পন্ন একতানের শব্দভেদী চিত্তরূপ শরসন্ধান করতঃ এক মাত্র লক্ষ্য ব্রহ্মকে বেধ করিবে। সেই ওঁকারের সাহায্যেই বিশুদ্ধ বুদ্ধিরূপ আত্মা ব্রহ্মধামে যাইতে পারে। এই প্রণবধনুর শর আত্মা, লক্ষ্য ব্রহ্ম। এইখানে উপনিষদই ওঁ প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাহার পরই বলিতেছেন 'অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ'। এই সূক্ষ্মীকৃত বুদ্ধিরূপ আত্মা, অপ্রমত্ত চিত্ত-ও উপরোক্ত নিপুণ সারথি একই।

এই মহান আশ্বাসবাণী সংসারাসক্তির ভারে অবসন্ন হৃদয়ে শক্তি দেয়। কিন্তু স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, সেই শর সন্ধানের ক্ষমতা বিশুদ্ধ চিত্তের আয়ত্তাধীন। সকল কর্ম্ম আত্মসম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া করিতে পারিলেই সেই শক্তি হৃদয় উদ্দীপিত করে, চিত্তের বিশুদ্ধতা হয়! এই আত্মসম্বন্ধ বা কাল্পনিক আমিত্ব ত্যাগই যোগবাশিষ্ঠের প্রতিকার।

বর্ত্তমান কাল্পনিক জ্ঞানের 'আমি' কল্পনা রহিত অবস্থায় যাইতে পারে না, কারণ কল্পনারাহিত্যে সেই আমিরও অস্তিত্ব থাকে না। এই কল্পিত আমি প্রতিদিনই মরিতেছে। সুষুপ্তিতে ইহাকে পাওয়া যায় না। সুষুপ্তি কিন্তু সমাধি নয়। সমাধিতে প্রকৃত আমি বা স্বরূপ জ্ঞান উদ্ভাসিত হওয়ায় জ্ঞানের অবস্থা তখন কল্পনাহীন, স্বপ্রকাশ শুদ্ধ ও মুক্ত। জীবের বুদ্ধি-সারথি তখন ব্রহ্মাভিমুখী, পরাগতি তখন তাহার গন্তব্যস্থান। সারথি তখন তাহার প্রাপ্তব্যস্থান দেখিয়াছে, ইন্দ্রিয়াদি মন, বুদ্ধি তখন নিপুণ সারথির সম্পূর্ণ বশীভূত, সমস্তই একাভিমুখী, একতান, চিত্ত তখন অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দে বিভোর, সে আনন্দ নির্দ্দেশ করা বর্ত্তমান কল্পনা-মোহাচ্ছন্ন আমিত্ব-পূর্ণ বুদ্ধির সম্ভব নয়।

ওঁকার সেই পরমানন্দ প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠতম পথপ্রদর্শক ও উপায়। এই প্রণবাবলম্বনেই জিতেন্দ্রিয় হইয়া মনকে বশীভূত করা যায়। প্রথমাবস্থায় বল প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও জ্ঞানের পরিবর্ত্তন ভিন্ন পরিণামে সেই বশীকরণ অসম্ভব। 'তখন ইন্দ্রিয় সমুদায় প্রসন্ন হইয়া পরমাহ্লাদে ঈশ্বরে লীন হয়'—ইহাই মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের উপদেশ।

উপনিষদ, সংসার-ভারপীড়িত মানবের পরিত্রাণের জন্য, তাহার অবসাদ নিবারণের উপায় স্বরূপ, হতাশার আতঙ্ক দূরীকরণার্থ বিশ্বব্যাপী প্রণবধ্বনি শুনাইয়াছেন। যখন ভারতে তপস্যানিরত মুনিবৃন্দের আশ্রম হোমাগ্নি-ধূমের সৌরভে সুরভিত হইত, প্রণবধ্বনিতে বনমণ্ডলী প্রতিধ্বনিত হইত; যখন শুদ্ধচিত্ত অহঙ্কারশূন্য বুদ্ধির প্রতিভায় উপনিষদের সৃষ্টি হইয়াছিল, তখনও অজ্ঞানের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের ও শান্তি প্রাপ্তির যে উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, বর্ত্তমান কাল্পনিক আমিত্বের অভিমানে স্ফীত, হিংসাদ্বেষাদির পীড়নে অবসন্ন, কল্পনার মোহে নিমজ্জমান ভ্রান্ত বুদ্ধি-সারথির নৈপুণ্যের একমাত্র উপায়ও সেই 'প্রণব'। এই ওঁকারই মানবকে অপ্রমত্ত করে। তাহাই ইন্দ্রিয়দিগকে আকর্ষণ করে, পরিণামে সকলে প্রসন্ন হইয়া ঈশ্বরে লীন হয়।

সুতরাং প্রণবের গতি ধরিয়া চলিলে, অনিপুণ বুদ্ধি-সারথির অভিজ্ঞতা জন্মায় ও প্রকৃত গন্তব্যস্থান সহজেই মিলে। প্রণবানুসন্ধানই সেই নৈপুণ্যলাভের একমাত্র উপায়।

আমার কবিতা

শ্রীমোহিনী চৌধুরী

আমার কবিতা বিলাসিতা নয়, আমার কবিতা প্রাণের পিপাসাভরা,
চিরদুরাশার পাষাণপ্রতিমা শ্রীহীন ছন্দে রূপায়িত হ'য়ে জাগে:
স্বপ্নছায়ার আল্পনা আমি চাই না রচিতে কল্পনা-অনুরাগে,
মানসী আমার মর্ম্মবেদনা, আত্মা যে তার দুঃখ-স্বয়ম্বরা।
নয়নঝরানো শ্রাবণধারায় জীবনে যাদের বহিছে অশ্রুনদী,
যারা বিধাতার ত্যাজ্যপুত্র, চির-অসহায়, চিরবঞ্চিত যারা;
পথহারা যারা আদর্শহীন-যাদের আকাশে জাগে নাকো ধ্রুবতারা,
আমার তৃপ্তি, প্রাণের পাথেয় তাদের হৃদয়ে এনে দিতে পারি যদি।

যদি কোনদিন মরুপ্রান্তরে স্বপ্নরঙীন নববসন্ত আসে,
কুহেলীমলিন দিগন্তে যদি দেখা দেয় ক্ষীণ অরুণ আশার আলো;
অভাগারে কেউ টেনে নেয় বুকে, অনাদৃতারে কেহ যদি বাসে ভালো,
আমার লেখনী বাণীবীণা হ'য়ে বাজিবে সেদিন কুসুমিত মধুমাসে।
আজিকে আমায় ক্ষমা করো সখি, ক্ষমা করো এই কবির অক্ষমতা,
তোমার নূপুরশিঞ্জিনী সাথে মিলাতে পারি না আমার ছন্দবেণু;
আমি খুঁজে মরি কণ্টক-পথে কোথা মিশে আছে তাপসীর পদরেণু;
রূপালী জ্যোৎস্না মোর আঙিনায় ছড়ায় না আর অপরূপ রূপকথা।

মালবিকা তব মণিমালা রাখো, আমার মনের একটী মিনতি শোনো:
মধুমালঞ্চে নাই বা সাজালে কবি-বরণের রত্ন প্রদীপশিখা,
আজ একবার আঁকো মোর ভালে চিরভাস্বর দুঃখের ললাটিকা,
মৃত্যুবাসরে শুনায়ো না মিছে কামনামুখর প্রণয় গীতালি কোন।
রোগ পাণ্ডুর তনুর অণিমা, মনে অবসাদ পুঞ্জিত হ'য়ে আছে,
সংশয় বাতে ভেঙে গেছে আজ তোমার আমার পুণ্যমিলন সেতু;
কেন যে সরল হাসির রেখাটী মুছে যায় ঠোঁটে বোঝো না কি তার হেতু!
জীবনযাত্রা ফল্গু সমাধিধুসর উষর মরুভূ আমার কাছে।

আমার কবিতা কঙ্কালময়ী, আমার কবিতা পরে না রত্নভূষা,
আমার কবিতা শিবের যজ্ঞে আত্মআহুতি দিল যোগিনীর মতো;
অমারাত্রির শবাসনে ব'সে শক্তিসাধিকা সাধে কল্যাণব্রত,
প্রতীক্ষা শুধু কখন্ আসিবে অরুণোজ্জ্বল প্রত্যাশা-প্রত্যুষা।
ভাব ও ভাষার সম্পদহীন আমি একজন অভাবতাপিত কবি,
মৃত্যুঞ্জয়ী খ্যাতি চাই নাকো, যেন মানুষের মনের পরশ লভি



দীপধারী

শ্রীউৎপলাসনা দেবী

মস্ত উঁচু মোটা সোটা ছু-পাশে থাম দেওয়া গেটের কাছে একজন আধা বয়সী লোক ছেঁড়া একটা কোট গায়ে দাঁড়াইয়া তোয়ালে ঢাকা বড় একথালা সন্দেশ নিয়া, তার মোটা পেটটিকে দোলাইতে দোলাইতে পাহারা-রত দরোয়ানকে মস্তবড় এক সেলাম করিল। তারপর তার মসী-বিনিন্দিত রংয়ের উপর শুভ্র দন্তপাটি বিকশিত করিয়া দু'ফোঁটা নাল ফেলিয়া বোকার মত হাসিয়া বলিল, "সাহেবজী, বাবুর শ্বশুরবাড়ী হ'তে মিষ্টি এনেছি, তা কোথা দিয়ে যাব গো ?"

দরোয়ান ! জমকালো পোষাকের উপর বাবুর বাড়ীর তক্‌মা আঁটিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া খৈনী টিপিতেছিল। "সাহেবজী" সম্বোধনে সে মহাপ্রীত হইয়া বলিল, "আরে তুম্ লোক-রাজাবাবুকো শ্বশুরবাড়ীসে আয়া হ্যায়, তুম্ ভিতরমে যায়েগা, তো ডর কাহে ? সোজা সিঁড়িসে উপর যাও ; রাজাবাবু গাড়ী বারান্দাকো ছাদমে বৈঠা হ্যায়, তুম যাও।"

তত্ত্ববাহক আবার দরোয়ানকে মস্ত এক সেলাম ঠুকিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। গাড়ীবারান্দার ছাদে আসিয়া একেবারে বাড়ীর কর্ত্তার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। কর্ত্তা পরেশবাবু তখন ইজিচেয়ারে শুইয়া আলবোলা টানিতেছিলেন। তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া মনে হয় তিনি বৈকালিক ভ্রমণে বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন। তত্ত্ববাহক হাঁপাইতে হাঁপাইতে গিয়া দাঁড়াইতে, কর্ত্তা তাঁহার মুখ হইতে নলটা সরাইয়া নিয়া বলিলেন, "তুই কে রে ?"

তত্ত্ববাহক ভয়ে জড়সড় হইয়া জোড়হাত করিয়া বলিল, "কর্ত্তা, আমি এস্তেছি শ্যামবাজারের মিত্তিরদের বাড়ী থেকে গো। ও বাড়ীর মাঠান আমায় পাঠালেন আপনাদের জন্ত এই সন্দেশ কিছু দিয়া।"

কর্ত্তা ভ্রূ কুঁচকাইয়া বলিলেন, "তোকে তো ও-বাড়ীতে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।"

তত্ত্ববাহক বোকার মত হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে, আজ দিন পনের হ'ল আমি ও-বাড়ীতে কাজে লেগেছি। ওই যে গো হোথা বিপিন বলে যে নোক্‌টা কাজ কর্‌তেছেল না, আমি তার যায়গায় কাজে লেগেছি। মাঠাকুরুণ ক'দিন ধরে বল্‌তেছে, শ্যামচাঁদ, যা বাপু, আমার মেয়ের বাড়ী কিছু ফল মিষ্টি নিয়ে, তা আমি পাঁড়াগাঁয়ের নোক, কোল্‌কেত্তার পথ-ঘাট ভাল করে চিনি নে, আস্‌তে সাহস পাচ্ছিলাম না। তা, কর্ত্তা, এই কোলকাতা সহরে তোমার বাড়ী চেনে না এমন লোক দেখলাম না। যাকেই জিজ্ঞাসা করি সেই বলে, চেনে না, এমন নোক কোল্‌কেতায় আছে নাকি ? এমন বাড়ী আর কোল্‌কেতায় নেই ?"

বাবু বেশ খুসী হইয়া বলিলেন, "ওরে এই কল্‌কাতা সহরে সাত পুরুষ ধরে টাকার গদি পেতে বসে কাটিয়ে গেলুম। বনকাটা বসুতি আমাদের, সেই মীরজাফরের আমলের, বুঝলি ? এই ইংরেজরাজত্বির আগে ছিল মুসলমান রাজত্বি, জানিস্ ?"

তত্ত্ববাহক বোকার মত হাসিয়া হাত কচ্‌লাইতে কচলাইতে বলিল, "আজ্ঞে আমি মুরুক্ষু মানুষ, এত সব কি করে জানবো ? তা ও যে গল্পে শুনেছি আমীর বাদসা, তাই বুঝি তোমরা ছিলে গো ? তা হবে বৈকি, তা হবে। তোমাদের বাড়ী তো আমাদের মুকুস্‌দাবাদের নবাবের বাড়ীর চাইতে অনেক বড়ো। আর জামাইবাবু আপনার চেহারা যে রাজার মত। যাকে বলে একেবারে রাজপুত্তুর।"

কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন, "দিগ্‌গজ।"

পরেশবাবু একটি ছোট মেয়েকে ডাকিয়া বলিলেন

"তপতী, বিধুকে ডেকে বলে দাও, এই মেধোকে নিয়ে যাক্ তোমার বৌদির কাছে, ও শ্যামবাজার থেকে এসেছে।" তপতী এতক্ষণ মেধোর দিকে কৌতূহলিত হইয়া তাকাইয়াছিল, দাদার আদেশে সে লাফাইতে লাফাইতে বিধুঝিকে ডাকিতে চলিয়া গেল।

ঝি বিধুমুখী আসিয়া মেধোকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "বাবু, একে ?"

পরেশবাবু বলিলেন, "হাঁ্যা ওকে তোমার মায়ের কাছে নিয়ে যাও।" তারপর তপতীকে বলিলেন, "হাঁ্যারে তপতী, মেধো নামটা কেমন চাকর-মার্কা, নয় রে, বেশ ডেকে সুখ আছে, আর আমাদের বাড়ীতে চাকরদের কী দাঁত-ভাঙ্গা নাম বলতো। ডাকতেই দু-মিনিট সময় খরচ।" তপতী খিল খিল করিয়া হাঁসিয়া উঠিল।

মেধো দালানটা পার হইয়া যাইতে যাইতে বলিল, "রাণীমা, আর কত দূর যাব ?"

বিধুমুখী তার রাণীমা সম্বোধনে পরম পুলকিত হইয়া বলিল, "এই তো গিন্নীমার ঘর। তা গিন্নামা এখন ঘরের মধ্যে সাজ-পোষাক করছেন, তুমি থালাখানা বরং এই দুয়োরের সামনে রাখো।"

মেধো থালাখানা রাখিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "রাণীমা, বড্ড জলতেষ্টা পেয়েছেন, অগ্রে তো জল একটু না খেয়ে দাঁড়াতে পাচ্ছি না, কোথাকে জল খাব গো।"

বিধু গিন্নীমার শয়নকক্ষের সঙ্গে যে কল-ঘরটা ছিল, সেইটা দেখাইয়া বলিল, "উই হোথাকে কলে জল আছে, তুই কলে মুখ দিয়ে খাগে যা।"

মেধো আবার আকর্ণ বিস্তৃত করিয়া হাঁসিয়া বলিল, "রাণীমা, আপনার ঘরে কত মিষ্টি আসুছেন, আমরা গরীব গুরো নোক, আমরা তো আপনার খেয়েই মানুষ, আজ্ঞে, তা—তা, শুধু জলটা খাব, হেঁ, হেঁ, আপনার নক্ষীর ভবন ?"

বিধুমুখী থালা হইতে দুটি মিষ্টি তুলিয়া বলিল, "তা, যা বলছিস্, আমাদের এই মিষ্টি ঘেঁটে ঘেঁটে অরুচি ! তা এই মিষ্টি দুটো খেয়ে, ওই ঘরের কলে জল খাগে যা, আমায় আবার রাজাবাবু কি জন্য যেন ডাকতেছে ; আমার বলে মরবার অবসর নেই, ছিষ্টি সংসারই আমার হাতে—" বলিতে বলিতে বিধুমুখী কিছুদুর গিয়া আবার পিছন ফিরিয়া বলিল, "হাঁ্যা দেখ, আবার যাবার সময় ছিষ্টি বাড়ী কি জন্মে ঘুরে যাবি, ওই হোথাকে যে ঘোরান সিড়ি রয়েছে না, ওই যে রে, কল ঘরের পিছন দিয়ে, ওখান দিয়ে নীচেয় নেমে যাস্।" বলিয়া চলিয়া গেল।

মেধো বাথরুমের ভিতরে গিয়া সন্দেশ খাইতে খাইতে ঘরের চতুর্দ্দিকে সুতীক্ষ্ন দৃষ্টিতে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সব দেখিল। তারপর জল খাইয়া চারিদিকে তাকাইয়া একটা মস্ত বড় আলমারীর পিছনে গিয়া দাঁড়াইল।

"ও চমক, চমকলতা !" মেধো চম্‌কাইয়া উঠিল। মনে মনে বলিল, "বাবা তোমার চমকলতা কোথায়, আমি তো চম্‌কে উঠছি।" বলিয়া সে একটু হাসিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল, পাশের ঘরে ড্রেসিং টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া একটি সুন্দরী তরুণী নৃত্যের নানা রকম ভঙ্গিমা করিতেছে। বুঝিল চমকলতা কে ! কর্ত্তা বাহির হইতে আবার ডাকিলেন, ও চমক্, হ'লো ?"

চমক তখন হেলিয়া দুলিয়া নাচিতেছে। মেধো বিড় বিড় করিয়া বলিল, "চমকলতা নয় তো, চমক রাধা ! তা বলি ওগো বাছা, তোমার স্বামীমশাইত তোমাকে ডেকে গলা শুকিয়ে ফেললেন, উত্তর দাও না বাপু। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা, আর কি হবে।"

তারপর কর্ত্তাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "তা বাপু তোমার কপালে চ্যাঁচানই আছে কি আর করবে।"

"ও চমকরাণী !" বলিয়া কর্ত্তামহাশয় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

"একি এখনও তোমার কিছু হয় নি ? এদিকে যে সাড়ে পাঁচটা বাজতে চললো, ছ'টা পনেরয় শো। কখন যাবে তা' হলে ?"

চমক তখন তার অসম্পূর্ণ পরা টিসুসাড়ীখানার আঁচল দুলাইয়া নৃত্যের ভঙ্গিমা করিয়া গাহিতে লাগিল, "আজ সবার রঙে রং মেশাতে হবে ?" দেখ কাননবালা যদি এই গানটা গাইতে গাইতে নাচতো, তবে ছবিটা আরও এক্সেলেন্ট হতো। ওরা কিচ্ছু জানে না।"

কর্ত্তা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "একেবারেই না।"

"যত সব বাজে ছবি করে।"

"ওই বাজে ছবিই না বার সাতেক দেখেছো ?"

"না. মোটে তেরবার! ওটা যদি ভাল হত, তা' হলে আরও বেশী দেখতাম।"

কর্ত্তা তখন বোধ হয় মনে মনে বলিলেন, "ভাগ্যে ছবিটা তোমার মনমত হয় নি, না হলে আরও অনেক পয়সা আমার ওরা ঠকিয়ে নিত। কর্ত্তা বলিলেন, "তা কাপড় পরাটা এইবার শেষ কর।"

চমকলতা বলিল, "হাাগা, যে ছবিটা আমরা দেখতে যাবো, সে ছবিটা কেমন?"

"এটা খুব চমৎকার ছবি।"

"কে বলছে?"

কর্ত্তা একটা ঢোক গিলিয়া বলিলেন, "এই সেদিন মণি বলছিল।"

চমক তখন একটা কোচে ঝাকিয়া বসিয়া বলিল, "বল না গা, গল্পটা।"

কর্ত্তা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সেই জন্যেই ত' বলছি, তাড়াতাড়ি চল, ভাল করে দেখেশুনে আসবে। মুখে শুনলে কি আনন্দ হয়।"

"কোন সাড়ীটা পরব বল না গা।"

কর্ত্তা অকুল সাড়ী-সমুদ্রে পড়িলেন। আলমারির ড্রয়ারগুলি কাপড়ে ভর্ত্তি। এক একটি ড্রয়ার টানিয়া এক একখানা সাড়ী চমক বাহির করিতে লাগিল। তারপর সেগুলি নিজের গায়ের উপর ফেলিয়া আবার বলে, এটা কি আমায় মানাবে, না এ খানা পরব, না এইটে ভাল।"

কর্ত্তা দেখিলেন, তাঁকে এ সমুদ্র মন্থন করিতেই হইবে। তিনি তাড়াতাড়ি একখানা দামী ক্রেপ সাড়ী তুলিয়া বলিলেন "এইখানা পরো, এখানা পরলে তোমায় যা দেখায়, যেন স্বপনপরী।"

চমকলতা নৃত্যের একটা লীলায়িত ভঙ্গির ঢেউ তুলিয়া বলিল, "ঠিক বলেছ! সেবার যে আমরা ফাষ্ট এম্পায়ারে 'বসন্ত জাগ্রত' প্লে করেছিলাম, এই সাড়ীখানা আর ওই ব্রোকেডের জামাটা পরে, তা দেখে মনীষা বলেছিল আমাকে, তোকে দেখে চমক, আমার লোভ লাগছে। সত্যি সেবার সে আমার নাচটা হয়েছিল গ্রাণ্ড! কি বল?"

"নিশ্চয়।"

চমক আবার গুন গুনিয়া গান করিতে করিতে আয়নার সম্মুখে নাচিতে লাগিল।

পরেশ বাবু হতাশ হইয়া বিছানার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, "চমক, আমায় ডোবালে।"

আলমারীর পিছন হইতে মেধো একটু উঁকি দিয়া দেখিল, তাহারা মানভঞ্জনের পালা নিয়ে ব্যস্ত।

তরুণী গৃহিণী মুখখানা ভার করিয়া কর্ত্তাকে বলিতেছিল, "তুমি আমায় একটুও ভালবাস না। ঘরে এসে অবধি কেবল চমক হলো-চমক হলো—এই রকম মিলিটারি ভাবে আমার কাপড় পরা অভ্যেস নেই, আমি সিনেমায় যাবো না।"

পরেশবাবু বলিলেন, "লক্ষী সোনা, পাগ্‌লামী ক'রো না, তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নাও, সময় আর নেই। ষোলটাকা দিয়ে সিট্ রিজার্ভ করেছি, না গেলে টাকাগুলো একেবারে মাঠে মারা যাবে।"

মেধো আলমারীর পিছন হ'তে গলা বাহির করিয়া দেখিল। তারপর স্বগত বলিল, "তা বাপু চমক্, এ তোমার বড় অন্যায়! ওদিকে ভদ্রলোক তো হিম-সিম্ খেয়ে যাচ্ছেন, আমিও এদিকে এই আলমারীটার পিছনে চিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেলুম। যাও না, লক্ষী মেয়ে, 'স্বামীর সহধর্ম্মিণী হয়ে বায়স্কোপটা দেখে এস। বলি, এত যে অনিচ্ছা কেন? তোমার স্বামী কি তোমায় দণ্ডকারণ্যে নিয়ে যাচ্ছেন, না সহমৃতা হ'তে বলছেন? হায়, সেকালের আর্য্য নারীরা বায়না তুলে স্বামীর সঙ্গে বনে গমন করতেন, আর একালের সতীদের পতির সঙ্গে সিনেমা দেখতে যেতেও ইচ্ছে করে না। ঘোর কলি, ঘোর কলি!" মেধো আবার বকের মত গলা বাহির করিয়া দেখিল। 'চমকলতা'র তখন কাপড় পরা সমাপ্ত হইয়াছে, কর্ত্তা গৃহিণীর গলায় মুক্তার কারুকার্য্য খচিত একটি নেক্‌লেশ পরাইয়া দিতেছেন। মেধো মুগ্ধ হইয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "বাঃ!" কোন্‌টা দেখিয়া সে মুগ্ধ হইল সেই জানে!

চমকলতা আস্তে আস্তে নেক্‌লেশটা খুলিয়া বলিল, "আজ এটা আর পরবো না, এ হলো দামী জিনিষ, এটা কোন রাজারাজড়ার বাড়ী যাওয়ার সময় পরবো।" বলিয়া সে অত্যন্ত যত্নের সহিত সেটাকে আলমারীতে তুলিয়া রাখিল। সাজ সমাপ্ত হইলে গৃহিণী বলিলেন, "সিন্দুকের চাবি?"

কর্ত্তা বলিলেন, "নিয়েছি। ডুপ্লিকেটটা কোথায়?"

চমক্‌লতা মেধোর ঘরের দিকে আঙ্গুল নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ওই ঘরের সব্বার নীচের ট্রাঙ্কটার মধ্যে আছে।"

পরেশ বলিলেন, "তা থাক্, এসো।"

মেধো স্বগত বলিল, "যাও তো লক্ষ্মীটি, যাও! দেখ দিকি নি, আমার কত কাজের ক্ষতি করলে? আমরা হলুম গে কাজের লোক, আমরা কি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারি।"

চমক্ দরজা পর্য্যন্ত গিয়া আবার দ্রুতপদে সরিয়া আসিয়া বলিল, "দাঁড়াও এক সেকেণ্ড" বলিয়া সে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, কাপড়টা আর একটু এদিক ওদিক ঘুরাইল, পরে মুখে আর একটু পেণ্ট লাগাইয়া, মাথার চুলগুলি আর একটু সমান করিয়া হাসিয়া বলিল, "চল।"

তাহা দেখিয়া তাহার পাষাণ হৃদয়ের মধ্যে কোথায় লুকান অজানা স্নেহ বাহির করিয়া মেধো বলিল, "আহা! একেবারে ছেলেমানুষ।" নিজের গলার স্বরে নিজেই চমকাইয়া উঠিল।

ঘরে তালা লাগাইয়া উভয়ে বাহির হইয়া গেল। নীচে মোটরের শব্দ শুনিয়া মেধো তাড়াতাড়ি জানালা দিয়া দেখিল, গাড়ী গেট ছাড়িয়া বাহির হইল। সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। তাহার পর সে আস্তে আস্তে বন্ধ জানালার খড়খড়ি অতি সন্তর্পণে তুলিয়া নিকটে কাহাকেও না দেখিয়া পরেশবাবুর শুইবার ঘরে প্রবেশ করিল এবং অতি সন্তর্পণে বাক্সগুলি নামাইয়া নিজের কোমর হইতে একগোছা চাবি বাহির করিল। গোটা পাঁচ ছয় চাবি লাগানর পর, একটি চাবি দিয়া বাক্সটী খুলিয়া গেল। ডালাটা তুলিয়া সর্ব্বপ্রথম নজরে পড়িল, গাঁটছড়া বাঁধা বেনারসী সাড়ী ও ধুতি। সেটা সে নিল না। তারপর দেখিল, রেশমী রুমালে জড়ান কতকগুলি চিঠি। তার দু-এক লাইন পড়িয়া, একটু হাসিয়া সেগুলি রাখিয়া দিল। বাক্সটির সর্ব্বনিম্নে পাইল ডুপ্লিকেট চাবি। চাবির রিংটা বাহিরে রাখিয়া বাক্সগুলি যেমন সাজান ছিল ঠিক তেমনি রাখিয়া দিল। লোহার আলমারী খুলিয়া গহনা যাহা পাইল সবই লইল। আকবরি মোহর ছিল। সেগুলি কিছু লইল, কিছু রাখিল। পরে কাঠের আলমারীটা খুলিল, তার ড্রয়ারে দেখিল সেই দামী নেকলেশটি। মুহূর্ত্ত তার মানসচক্ষে ভাসিয়া উঠিল, সেই নেক্‌লেশ পরার ছবিটি। সেই ছবিটি যেন তাহাকে কী এক নেশায় পাইয়া বসিয়াছে। নেক্‌লেশটিকে সে রাখিয়া দিল, আবার কি ভাবিয়া সেটিকে লইল এবং সমস্ত মাল কোমরে একটা থলে'র মধ্যে রাখিল।

হঠাৎ নজরে পড়িল টেবলের উপর রক্ষিত একটি ফটোর উপর। ফটোটি সস্ত্রীক পরেশবাবুর। সে কিছুক্ষণ ধরিয়া ফটোটিকে দেখিল, তারপর মৃদুস্বরে বলিল, "তুমিও চল। বড্ড ভারি হবে বটে, তবু তোমাকে নেওয়ার লোভটা সামলাতে পারছি নে।"

বাড়ীর পিছনের লোহার সিঁড়িটা বাহিয়া সন্তর্পণে সে নীচে নামিল। তারপর সভয়ে সতর্কে চলিল পাঁচিলের গা ঘেঁসিয়া। গেটের কাছে প্রায় আসিয়াছে, এমন সময় কর্কশ গলায় কে বলিল, "কোন হ্যায় রে?" মেধো সভয়ে তাকাইয়া দেখিল, দারোয়ান।

মেধো বোকার মত হাসিয়া বলিল, "সাহেবজী, গেট্‌টা কোন বাগে, আমাকে একটু দেখিয়ে দাও না গো?"

দারোয়ান কহিল, "হ্যাঁ দেখলিয়ে দেগা," বলিয়া সে মেধোর ঘাড় ধরিল।

মেধো তবু হাসিয়া বলিল, "দিদিঠাকরুণ আমাকে কলঘরে আটকিয়ে কোথায় যে গেল, আমি ঠাওর করতে পারনু না, কত ডাকনু, কেউ সাড়া দিল না, তখন পিছনের দরজা দিয়ে—"

দারোয়ান সগর্জ্জনে কহিল, "কাহে তুম্ বাথরুমে গিয়াথা?"

মেধো মুখখানি কাঁচু মাচু করিয়া বলিল, "আজ্ঞে জল খেতে গিয়েছিনু গো!"

দারোয়ান মেধোর রগের উপর ধাঁ করিয়া একটি চড় মারিল। মেধো ভেঁউ ভেঁউ করিয়া কাঁদিয়া বলিল, "আর মেরো না সাহেবজী, আমি অভি চলে যাচ্ছি গো।"

দারোয়ান সরোষে কহিল, "নেহি যায়েগা তুম্, সব কাপড়া-উপড়া দেখলাও, তব হাম্ তুমকো ছোড়েগা!"

মেধো একটু ইতস্ততঃ করিতেই দরোয়ান তার লাঠিটাকে উঁচু করিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্তে মেধোর চক্ষু দুইটি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গেই সে রিভলভার ছুঁড়িল।

পর মুহূর্ত্তেই পড়িল তার বাহুর উপর দরোয়ানের লাঠি। মেধো শুধু উঃ করিয়া গেটের কাছে দৌড়িয়া যাইতে যাইতে শুনিল, দরোয়ান চীৎকার করিতেছে—"এ ভেইয়া সব, ইধার আও, হামারে খুন করনে ওয়াস্তে ডাকু আয়া হ্যায়।"

মেধো বাহিরে আসিতে, একটি মোটর হর্ণের শব্দ করিয়া তার নিকটে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। এ হর্ণের শব্দ মেধোর খুবই পরিচিত; সে কোন দ্বিধা না করিয়া সেই গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

দুই

এই ঘটনার প্রায় বছর খানেক বাদে।

মধুপুরের ষ্টেশনে পাঞ্জাব এক্সপ্রেস্ থেকে সুন্দর গৌরকান্তি একটি অল্পবয়স্ক যুবক নামিল। সঙ্গে একটি সুটকেশ, ও মস্ত একটি পোঁটলা। পোঁটলা যদিও বাস্তব পোঁটলা নয়, সেটি একটি পাখীর খাঁচা। রেল কোম্পানীকে ঠকাইবার জন্য, মানুষের চোখে ধুলি দেওয়ার ব্যবস্থা। এই যুবকটীকে অভ্যর্থনার জন্য আর একটি সুবেশ যুবকও দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল, "বিজয়দা এবার বেশ ভাল করে সেরেছো তো?" হাড়ের মধ্যে বোধ হয় আর ডিফেক্ট নেই, কি বল?"

বিজয় হাসিয়া বলিল, "ডাক্তাররা যখন বলেছেন সম্পূর্ণ সুস্থ তখন মনে তো হচ্ছে আমি সুস্থ। এখন হাড় নেড়ে পরীক্ষা না করে কি সঠিক কিছু বলতে পারি!" তাহারা দু'জনে রাস্তায় আসিয়া একটী গাড়ী লইল। শেঠ-ভিলার কাছে গিয়া গাড়ীটিকে ছাড়িয়া দিল। ট্যাক্সিওয়ালা চলিয়া গেলে, দুই বন্ধুতে সদর রাস্তা ছাড়িয়া মাঠের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিল। কিছুদূর গিয়া জনশূন্য মাঠের মাঝে একটী বহুদিনের পুরাণ বাংলোয় দু'জনে গিয়া উঠিল। তাহাদের দেখিয়া আরও গুটি কয়েক যুবক সেই বাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিল। সকলেই জিজ্ঞাসা করিল, "বিজয়দা, তোমার হাত এবার জোড়া লেগেছে তো?"

বিজয় বলিল, "হ্যাঁ, এবার ডাক্তাররা তো বলেছেন, কোন ভয় নেই, এখন একদিন বৈদ্যনাথে গিয়ে পূজো দিয়ে আসতে হবে।" সকলে মিলিয়া পাখীর খাঁচার আবরণ মুক্ত করিয়া, পাখাটীকে আদর করিতে লাগিল।

"এটী কী পাখী বিজয়দা?"

"এটা অষ্ট্রেলিয়ান পাখী, খুব দাম নিয়েছে রে।"

"এর নাম কি রেখেছ বিজয়দা?"

বিজয় বলিল, "ওর সরকারী নাম একটা আছে বটে, তবে আমি সে নামে ডাকি নে।"

"কি নামে ডাক বল না।"

"আমি ডাকি চমকলতা।"

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। জ্ঞান বলিল, "বৃদ্ধস্য তরুণী—আর কি কিনেছো?"

"আর একটা কোট কিনেছি।"

"তার কি নাম রেখেছ?"

"তার নাম রেখেছি সাহেবজী।"

ঘণ্টে বলিল, "কিক্ষণে গিয়েছিলে পরেশ বাবুর বাড়ী, সব রোমান্স ক'রে তুল্লে যে?"

বিজয় বলিল, "আমার সব সেকেলে প্ল্যান। রোমান্স তোমরা করো।"

"যা বলছো বিজয়দা! আমার ওরকম চাকর-বাকর সেজে কোথাও যেতে ভাল লাগে না। আমি বেশ সাহেব সেজে যাবো, বন্দুক দেখিয়ে বাড়ীসুদ্ধ লোককে থ করে দিয়ে চাবি নিয়ে কাজ সেরে আসব, পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগবে না। তোমাদের আইডিয়া বাপু বড্ড সেকেলে।"

লালু বলিল, "পিস্তলের কাজ তো সেদিন বিজয়দাও দেখিয়ে এসেছেন, সেদিনকার এড্‌ভেঞ্চার কম হাল ফ্যাসনের হয় নি। কিন্তু দারোয়ান ব্যাটার কিছু হয় নি। সেদিন পিস্তলে টোটা ভরে নিয়ে যাও নি বিজয়দা?"

"নিয়েছিলাম, কিন্তু দরোয়ানকে মারবার ইচ্ছে তো ছিল না। তাই অন্যদিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছিলাম। সঙ্গে ভোজালিও ছিল। যদি তেমন কিছু হতো, তা'হলে ভোজালিই আমার সবচেয়ে বন্ধুর কাজ করতো। আমি বাপু চাষাভূষা লোক। সেই ১৯৩৫ সনে যে স্বদেশী ডাকাতি আরম্ভ হলো না, সেইবারকার দল আমাদের। তখনকার দিনে অবশ্যি এই ঘণ্টের মতনই আমাদের প্ল্যান ছিল। তবে আমরা এপর্য্যন্ত খুন-জখম কোনদিন করি নি। আজ প্রায় আট বছর এই করে বেড়াচ্ছি। এখন জীবনে ঘেন্না এসেছে, যে উদ্দেশ্যে হারণদা আমাদের দল গঠন করলেন সে উদ্দেশ্য তো কোথায় কোন অতলে তলিয়ে গেল, এখন দেখছি ভদ্রলোকের ছেলে আমরা সকলে দস্যু বনে গেলাম

রীতিমত।" বলিয়া বিজয় উদাসনেত্রে অন্য দিকে চাহিয়া রহিল।

সকলেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বিজয় বলিল, "ঘণ্টে, তুই তো বি-এ পাশ করেছিস, আমার মতে তো মূর্খ নোস্, তুই এখন থেকে কোন সৎকাজে যোগ দে।"

ঘণ্টে বলিল, "যখন এ দলে আসি, তখন ভেবেছিলাম এর চেয়ে বড় সৎকাজ আর জগতে নেই, তা' এখন কি করতে বল আমাকে ?"

"তুই তোর বাড়ী ফিরে যা। তারপর ভাল কোন ব্যবসা বা চাকরী-বাক্‌রী কর।"

"আর তুমি।"

"আমাকে বোধ হয় সারাজীবন এই করেই খেতে হবে রে! এই আবার বেরুতে হবে, তারপর যদি কোনদিন ধরা পড়ে যাই, তবে এ থেকে নিস্তার পাব।" বলিয়া সে করুণ নেত্রে ঘণ্টের দিকে তাকাইল। লালু বলিল, "দেখ, বিজয়দা, এখন তোমার প্রতিভা একটু ঠাণ্ডা রাখো। সেই জমিদার পরেশ মুখুজ্যে সি, আই, ডি তো লাগিয়েছে, উপরন্তু কাগজেও বিজ্ঞাপন দিয়েছে, যে চোর ধরিয়ে দিতে পারবে, তাকে মোটা টাকা পুরস্কার দেবে।"

কত দেবে বলেছে ?

"পাঁচ হাজার।"

"তা' বেশ! আমাদের তো গহনা বিক্রী ক'রে পাঁচ হাজার হ'লো না। তুই কেন আমায় ধরিয়ে দে না ?"

লালু বিজয়ের পায়ের ধুলো নিয়া বলিল, "বিজয়দা, আমাকে যদি কেউ টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কাটে, তা হ'লেও আমার মুখ দিয়ে আমাদের এই সমিতির গুপ্তকথা কেউ জানতে পারবে না।" সেখানে আর যাহারা ছিল সকলেই একে, একে বিজয়কে ভক্তিভ'রে প্রণাম করিয়া বলিল, "আমাদের গায়ে কণামাত্র রক্ত থাকতে তোমার যে আমরা ছোট ভাই, সে-কথা আমরা ভুলব না। যত বিপদই কেন আমাদের আসুক না, পরস্পরের জন্য বুক পেতে দেবো।"

বিজয় সকলকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিল। তারপর হাসিয়া বলিল, "তোদের সবাইকেই আমি তোদের চাইতে বেশী চিনি রে।" তারপর ঘণ্টেকে বলিল, "ওরে আমার ভাগের দুধটাকে তুই ক্ষীর করে রাখিস্, আমি দুধ খাবো না।" ঘণ্টে হাসিয়া বলিল, "দুধ খাওয়ার বুঝি ইচ্ছে নেই, ক্ষীরে রুচি আছে ?"

বিজয় লজ্জিত ভাবে বলিল, "ওই পাখীটাকে খাওয়াবো।" সকলে হাসিয়া ফেলিল। লালু একটা ডিসে করিয়া পুরু খানিকটা সর আনিয়া বলিল, "বিজয়দা, খাও।"

বিজয় উৎফুল্ল মুখে বলিল, "বাঃ! বেশ জিনিষ এনেছিস্ তো। দে, দে, বেচারা অনেকক্ষণ কিছু খায় নি।" বলিয়া পাখীটাকে সর খাওয়াইতে লাগিল। লালু ক্ষুণ্ণ ভাবে বলিল, "বেশ বিজয়দা, সরটা সবই ওকে দিলে, তুমি কিছু খেলে না ?"

বিজয় সস্নেহে বলিল, "আহা! ও বেচারা যে এই সবই খেয়েই থাকে, না খেতে পেয়ে ও এ-দু'দিনে কি রকম রোগা হ'য়ে গেছে দেখ্ তো!" বলিয়া সে পাখীটাকে আদর করিতে লাগিল। সকলে তাহা দেখিয়া হাসিয়া খুন।

লালু বলিল, "বিজয়দা নেক্‌লেশটাকে এবারেও বেচ্‌লেন না ?"

"না সেটাকে বেচ্‌বো না রে।"

"কিন্তু সেটা বেচ্‌লে যে হাজার পাঁচেক হ'তো বিজয়দা!"

"তা জানি, কিন্তু ওটা বেচ্‌তে পারবো না।"

ঘণ্টে বলিল, "ওটা বিজয়দা ভবিষ্যতে ওঁর বিজয়িনীর জন্য তুলে রাখছেন; না, বিজয়দা ?" বিজয় তার কথার কোন উত্তর না দিয়া অন্যমনস্ক ভাবে তাকাইয়া রহিল। মনে তার তখন ভাসিয়া উঠিয়াছে, সেই নেক্‌লেশ পরার ছবি। তুচ্ছ গোটা কয়েক কথার সঙ্গে সেই মেয়েটির নিবিড় আনন্দে সাজ করার কাহিনী। নেক্‌লেশটা সে কী আনন্দেই গলায় পরেছিলো! আহা! কত যত্নেই না আবার তুলে রাখলো! নেক্‌লেশ পরা ঝলমলে দীপ্তিময়ী নারী-মূর্ত্তিটি আজকাল তাহাকে কি এক নেশায় পাইয়া বসিয়াছে। যখন, তখন তার মনটাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া সকল কাজে বাধা দেয়। নেক্‌লেসটি সে কোন দিনও বেচিতে পারিবে না।

[ক্রমশঃ]

মুরলী-বিলাস

অধ্যাপক শ্রীরামশশী কর্ম্মকার

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চার

দিনের পর দিন গত হইতে লাগিল। জাহ্নবী দেবীর শোকে ম্রিয়মাণ রামাই দিবানিশি কৃষ্ণগুণগানে রত থাকিয়া প্রসাদমাত্রজীবী হইয়া গোপীনাথ-মন্দিরে পড়িয়া রহিলেন। কোন উদ্যম নাই। ক্বচিৎ রূপ-সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। উদ্ধারণ দত্ত ও অপরাপর সহচরগণ রহিতে বাধ্য হইয়াছেন।

অতঃপর একদিন দত্ত মহাশয় ঠাকুরকে কহিলেন—

'এক বর্ষ হৈলা, তভু তত্ত্ব না পাইলা।' (পুথি, পৃঃ ১০৭ক)

খড়দহ ত্যাগের পর (কিম্বা জাহ্নবী দেবীর দেহত্যাগের পর) একবৎসর অতীত হইয়াছে; বীরচন্দ্রের নিকট সংবাদ পাঠান হয় নাই; বড় দোষের কথা। ঠাকুর সেস্থান ত্যাগে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অনেক আলোচনার 'পর উদ্ধারণ দত্ত লোকজন সহ গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; মাত্র দুইজন ঠাকুরের নিত্য-সহচর রূপে তথায় রহিয়া গেল। আলোচ্য পুঁথির ১৪১খ পাতায় উক্ত আছে যে, রামাই পিতৃগৃহ হইতে দুইজন সঙ্গী খড়দহে আনিয়াছিলেন; তাহারা উভয়েই পরে ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন; একজন ঠাকুরের সহপাঠী ব্রাহ্মণবালক হরিদাস; অপর কৃষ্ণদাস নামক জনৈক কায়স্থ-বালক।

উদ্ধারণ দত্ত প্রমুখাৎ সমস্ত সংবাদ শুনিয়া মাতার বিয়োগ-শোকে বীরচন্দ্র অত্যন্ত কাতর হইলেন। তাঁহার হৃদয়াবেগ যেন দ্রবীভূত হইয়া বিরহ-স্তব রূপে বাহির হইল। পত্নী সুভদ্রা দেবী সেই শোকগাথা লিখিয়া রাখিলেন; সেই শোকগাথাই শতশ্লোকা 'অনঙ্গকদম্বাবলীস্তব' নামে পরিচিত।

পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে। রামাই অকস্মাৎ একদিন স্বপ্ন দেখিলেন—জাহ্নবী দেবী তাঁহাকে গৌড়ে গিয়া বৈষ্ণব সেবা করিতে আদেশ করিতেছেন। পর পর দুই রাত্রি একই স্বপ্ন দেখিলেন। তথাপি সেস্থান ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন না। তৃতীয় রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন—রামকৃষ্ণ তাঁহাকে গৌড়ে পূজা প্রচারের ভার দিতেছেন। ঠাকুর পরদিন প্রাতঃকালে অভ্যাস মত যমুনা-স্নানে গমন করিলেন; জলের উপর ভাসমান রামকৃষ্ণ-বিগ্রহ দেখিতে পাইয়া তুলিয়া আনিলেন। রূপ-সনাতন সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া অবিলম্বে গৌড়ে যাইতে উপদেশ দিলেন; আর বলিলেন—

'কোথায় থাকহ তোমার সেই বৃন্দাবন।' (পুথি, পৃঃ ১১২খ)

রূপ-সনাতন স্বরচিত গ্রন্থ তাঁহাকে উপহার দিলেন। তন্মধ্যে ছিল—

'রসামৃতসিন্ধু উজ্জ্বলনীলমণি জাথে কৃষ্ণলীলা।' (পুথি, পৃঃ ১১৩ক)

সঙ্গী দুইজন, রূপ-সনাতন প্রদত্ত গ্রন্থরাজি এবং শ্রীবিগ্রহ স্বয়ং লইয়া ঠাকুর রামাই গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন।

'শ্রীমতির সঙ্গে ঠাকুর জবে ব্রজে গেলা।
একাক্রমে পঞ্চবর্ষ তাহাঞি রহিলা॥
পঞ্চ বর্ষান্তর পরে মাঘমাসের শেষে।
দেখি ব্রজে চাড়ি আইলা পথে দুইমাসে॥
বৈশাখে আসিয়া বনে হৈলা উপনীত।' (পুথি, পৃঃ ১১৫খ)

১৪৬৯ শকের মাঘমাসে অর্থাৎ ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে জাহ্নবী দেবীর সহিত রামাই বৃন্দাবন যাত্রা করেন। জাহ্নবী দেবী হিসাব করিয়াছিলেন, বৈশাখে পৌঁছিবেন; কিন্তু অযোধ্যার পথে গমনে বোধহয় সময় বেশী লাগিয়াছিল। পুথির ১০২খ পাতায় দেখা যায় ২।৩ মাস বৃন্দাবনে ভ্রমণের পর যখন কাম্যবনে গোপীনাথজীর মন্দিরে সকলে যান, তখন কার্ত্তিকী পূর্ণিমা। সুতরাং শ্রাবণের পূর্ব্বে বৃন্দাবনে পৌঁছেন নাই। জাহ্নবীদেবী ১৪৭০ শকের কার্ত্তিক মাসে মানবলীলা সংবরণ করেন। খড়দহত্যাগের এক বৎসর পরে অর্থাৎ ১৪৭০ শকের মাঘমাসে উদ্ধারণ দত্ত বৃন্দাবন ত্যাগ করেন। ঠাকুর রামাঞি পূর্ণ পাঁচ বৎসর রহিয়া যান। পঞ্চবর্ষ পরে অর্থাৎ ১৪৭৪ শকের (অর্থাৎ ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের) মাঘমাসের শেষে স্বপ্নাদেশ পাইয়া গৌড় যাত্রা করেন।

ঠাকুর এবার অযোধ্যার পথ ত্যাগ করিয়া মধুপুর হইতে সোজা চিত্রকূটের পথে প্রয়াগে আসেন। তথা হইতে বারাণসী দিয়া চাকিপরের পথে গঙ্গা পার হইয়া যান। ক্রমে

কণ্টকনগরের পথে গঙ্গাতীর ধরিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। এক অরণ্য পান।

'গঙ্গার কিনারে বন কণ্টক অপার।
সেই বনের ভিতরে রহে সদা হাহাকার।'
(পুথি, পৃঃ ১১৫খ)

তখন গৌড় দেশ আরম্ভ হইয়াছে। গৌড় দেশান্তর্গত সেই কণ্টকময় অরণ্যে যখন ঠাকুর রামাঞি আসিয়া উপনীত হইলেন তখন বৈশাখমাস (১৪৭৫ শকাব্দ=খৃঃ ১৫৫৩। এপ্রিল, মে)।

যে গভীর কণ্টকতরুপূর্ণ বনে ঠাকুর আসিলেন, তাহার সহিত কণ্টকনগরের কিছু সম্বন্ধ থাকা উচিত মনে হইতেছিল; কিন্তু কণ্টকনগর আজ যে স্থানে কাটোয়া নামে অবস্থিত, তথা হইতে এই বনের দূরত্ব অকিঞ্চিৎকর নহে, ৩৬ মাইল। সুতরাং নামের সাদৃশ্য সম্বন্ধনির্ণয়ের নিদান হইতে পারে না, দেখা যাইতেছে।

সেই গভীর বনমধ্যে ঠাকুর রামাঞি সঙ্গিদ্বয় সহ বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। এমন সময় এক ভীষণ ব্যাঘ্র অদূরে দৃষ্ট হইল। সঙ্গীরা ভয়ে বিহ্বল হইল। ঠাকুর নির্ভয়ে ব্যাঘ্রের অভিমুখী হইয়া মধুর ভাষায় হিংসার নিন্দা করিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন এবং কৃষ্ণনাম শুনাইলেন। মনুষ্য-ভাষা বুঝিয়াই হোক, আর ঠাকুরের প্রভাবেই হোক ব্যাঘ্র অবনত মস্তকে সে স্থান ত্যাগ করিল। পরে শুনা গিয়াছিল একটা ব্যাঘ্র গঙ্গার গর্ভে ডুবিয়া মরিয়াছে। ঠাকুর নির্ব্বিঘ্নে তথায় রহিয়া গেলেন। একদিন রাত্রে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকেরা এক হারাণ গরুর সন্ধানে সেই স্থানে আসিয়া সাধুদিগকে সেই ভীষণ বনে দেখিতে পায়। তাহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেও ঠাকুর গ্রামে যাইবেন না। ব্যাঘ্রের ভয়ও ছিল না। গ্রামবাসীরা তথাপি তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিল না। প্রভাতে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। বহু লোকের অনুরোধ এড়ান অনুচিত বুঝিয়া ঠাকুর বিগ্রহদ্বয় লইয়া গ্রামে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু এ কি! বিগ্রহ যেন সে স্থানে গ্রথিত। দেবতার ইচ্ছা বুঝিয়া সেই স্থানেই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইল। বৈশাখী পূর্ণিমায় প্রতিষ্ঠা হইল। 'পূর্ণচন্দ্র সন্ধ্যাকালে উদয় হইলা'—পুথিতে আছে। (পৃঃ ১১৮খ)

বন কাটিয়া ফেলা হইল। নানা গ্রাম হইতে বহু লোক-জন আসিয়া তথায় বসবাস আরম্ভ করিল। বহু ধনী অর্থ দিয়া মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন; এবং মন্দিরের পশ্চিমে একটি পুষ্করিণী খনন করা হইল; ঠাকুর পুষ্করিণীর নাম দিলেন 'যমুনা' (পৃঃ ১২০খ); এবং নিজহস্তে তাহার তীরে আম্রাদি বৃক্ষ রোপণ করিলেন।

ক্রমে সেই স্থান একটি সুন্দর গ্রামে পরিণত হইল। গ্রামের নাম হইল 'বাঘনাপাড়া।' আজও ঐ গ্রাম ঠাকুরের কীর্ত্তি বক্ষে ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছে। বর্ত্তমানে ই, আই রেলওয়ের যে শাখা ব্যাণ্ডেল হইতে বারহারোয়া গিয়াছে, সেই শাখা-লাইনের একটি ষ্টেশন ঐ গ্রামপ্রান্তে স্থাপিত। বাঘনাপাড়া ষ্টেশন কালনাকোর্ট ষ্টেশনের পরবর্ত্তী এবং তিনমাইল দূরবর্ত্তী—উত্তরদিকে। ইহার পূর্ব্বদিকে ২১ মাইলের মধ্যে রেললাইনের সহিত প্রায় সমান্তরাল থাকিয়া ভাগীরথী দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত। রামাই ঠাকুর যে ব্যাঘ্রকে মুক্তিমন্ত্র উপদেশ করিয়াছিলেন, পুথিতে উক্ত আছে—

'এতেক শুনিয়া ব্যাঘ্র দণ্ডবত হঞা।
প্রণাম করিয়া চলে পুর্ব্ব দীষা দীয়া॥
গঙ্গায় প্রবেশ করি দেহত্যাগ কৈলা।' (পুথি, পৃঃ ১১৬ক)

একটি পোষ্ট-আফিসও এ গ্রামে স্থাপিত হইয়াছে। দোল-যাত্রার সময় এখানে মেলা হয় এবং মাঘের ২১শে তারিখে ঠাকুর রামাঞির তিরোভাব উপলক্ষে এখানে মহোৎসব হইয়া থাকে। বহু লোকের সমাগম হয়।

প্রভাতে উঠিয়া ঠাকুর গঙ্গাস্নানে যান। স্নানান্তে ফিরিয়া রামকৃষ্ণজীর পূজা ও ভোগ সারিয়া সমাগত বৈষ্ণবগণকে প্রসাদ বণ্টন করিয়া দেন। এই মতে প্রাত্যহিক সেবাকার্য্য চলিতে লাগিল। যে ধনী শ্রেষ্ঠী মন্দিরাদি নির্ম্মাণে প্রভূত ধন দান করিয়াছিলেন, তিনি দেবতার রাজভোগের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

একদিন স্বপ্নে ঠাকুর শ্রীদুর্গা ও মহাদেবকে দেখিলেন। তাঁহারা ঠাকুরকে স্ব স্ব পূজার জন্য নির্দ্দেশ দিলেন। ঠাকুর পরদিন প্রভাতে উঠিয়া স্নানাদি সমাপনান্তে ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া একটি স্থল দুগ্ধাদি দিয়া পবিত্র করিলেন। সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া হঠাৎ 'লিঙ্গরূপী মহাদেব

হৈলা অধিষ্ঠান।' (পুথি, পৃঃ ১২১ক) ঠাকুর রামাঞি-সেবিত এই শিবলিঙ্গ অদ্যাপি বাঘনাপাড়ায় আছে কি না জানিতে পারি নাই।

দেবসেবা ও জীবসেবা এই উভয়বিধ সেবাকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়া চিরকুমার চিরবিনয়ী ঠাকুর রামাই বাঘনাপাড়ায় অবস্থান করিলেন। এখানে তাঁহার যশঃসৌরভ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া খড়দহে পৌছিল। বীরচন্দ্র শুনিলেন। বৈষ্ণব সমাজে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাবশালী এবং কীর্ত্তিমান্ তিনি। যশের প্রতিদ্বন্দ্বীর উদয়ে বোধ হয় অন্তরে কিছু বেদনা পাইলেন। তাই নূতন যশস্বীর যশোগরিমার কঠোর পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। বীরচন্দ্রের আহ্বানে বারশত 'নেড়া' প্রস্তুত হইল।

এই 'নাড়া' বা 'নেড়া' বৈষ্ণব সম্প্রদায় নিত্যানন্দ ও তৎপুত্র বীরচন্দ্রের মহান্ কীর্ত্তিস্তম্ভ। বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনকালে যে সকল বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুণী ভগবান্ বুদ্ধের মহান্ বৈরাগ্যাদর্শ ধরিয়া রাখিতে পারে নাই, তাহারা কালক্রমে হিন্দুসমাজেরও ঘৃণ্য হইয়া অতি দীনহীন ভাবে পশুবৎ জীবন যাপন করিতে থাকে। কোন সামাজিক নিয়ম তাহাদের মধ্যে বলবৎ না থাকায় নৈতিক অবনতির শেষ সীমায় উপনীত হইয়া ঘৃণিত আবর্জ্জনারূপে কাল কাটাইতে থাকে। কালক্রমে দয়াল নিত্যানন্দের দৃষ্টি তাহাদের উপর পতিত হয়। নিত্যানন্দ ১২০০ পতিত বৌদ্ধ এবং ১৩০০ তাদৃশ বৌদ্ধ নারীকে দীক্ষিত করিয়া সংযমের এবং নিয়মের বাঁধনে বাঁধিয়া পবিত্র করিয়া হিন্দুসমাজে গ্রহণযোগ্য করেন। বীরচন্দ্র পিতার কার্য্যের সমর্থন করিয়া নিত্যানন্দের সমান শ্রদ্ধা নেড়াদের নিকট লাভ করেন। এই নেড়াসম্প্রদায় কালে অত্যন্ত শক্তিমান্ হয়। আলোচ্য পুথির ১২৩ খ পাতায় ইহাদের মহিমা কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইয়াছে—

'যে নাড়ার তেজে কাঁপে জগৎসংসার।
সে নাড়া ঠাকুর স্থানে করে পরিহার॥
যবনের সঙ্গে জেহোঁ বিবাদ করিয়া।
সহর ভাসাল্য জারা পদ্মাপ করিয়া॥
জারে থানা দিয়া পাঠাইল গৌড়েশ্বর॥
সেই থানা হৈল পুষ্প পরশিতে কর॥
ক্রোধ করি জার ঘরপানে দৃষ্টি চায়।
সেইক্ষণে কোপানলে পুড়ি ভস্ম জায়॥'

এইরূপ শক্তিশালী এবং দুর্দ্দান্ত নেড়ার দল বীরচন্দ্রের আদেশমাত্র মাঘের রাত্রি দ্বিপ্রহরে রামাঞির আশ্রমদ্বারে আসিয়া করাঘাত করিল। ১২০০ নেড়ার উপস্থিতিতে যে অদ্ভুত ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল, তাহাতে ভীত না হইলেও বিস্মিত রামাঞি ধীরভাবে আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নেড়ারা বলিল—

'ক্ষুধার্ত্ত আছি যে মোরা করাহ ভোজন।' পুথি, পৃঃ ১২২ খ
'ইলিষ মৎস আম্র সহিত করাহ ভোজন।' পুথি, পৃঃ ১২৩ ক

ঠাকুর রমাই একান্তে গিয়া গুরুপাদ স্মরণপূর্ব্বক নিজের সঙ্কট কথা তদ্গোচর করিলেন। এমনি একদা রাত্রিকালে সহস্র শিষ্যসহ সমাগত কোপনস্বভাব দুর্ব্বাসাকে আতিথ্যদানে সামর্থ্য প্রার্থনা করিয়া অরণ্যবাসী পাণ্ডবগণ করুণাময় ভগবানের নিকট নিবেদন জানাইয়াছিল। ভগবানের কৃপায় সে সঙ্কটে পাণ্ডবগণ পরিত্রাণ পাইয়াছিল। 'পাথা' অর্থাৎ চুল্লী প্রজ্বলিত করিয়া হাঁড়ীতে জল ও চাল ফেলিয়া দিয়া ঠাকুর পুষ্করিণীতীরে গমন করিলেন। পুষ্করিণী ও আম্রবৃক্ষ সকলকে লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। অত্যাশ্চর্য্যের বিষয়!

'জলে হৈতে মৎস আসি পড়িলা আড়ায়।' পুথি, পৃঃ ১২৩ ক
'ইহা বলিতেই আম্র হৈল কান্দি কান্দি।' ঐ

এই সকল অদ্ভুত ঘটনার সমর্থক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া কাজ নাই। বাইবেল, বৌদ্ধ জাতক, হিন্দুর পুরাণ, এমন কি কালিদাসের লৌকিক কাব্য শকুন্তলা নাটকও ঈদৃশ অদ্ভুত ঘটনার দৃষ্টান্তস্থলে হইয়া রহিয়াছে। শকুন্তলাকে স্বামীগৃহে পাঠাইতে হইবে; কিন্তু বনবাসী ঋষি-তনয়াকে রাজমহিষীযোগ্য বসন-ভূষণ যোগাইবেন কিরূপে? আশ্রমোদ্যানস্থ তরুরাজি মহর্ষির সে অভাব পূরণ করে।

'ক্ষৌমং কেনচিদিন্দুপাণ্ডু তরুণা মাঙ্গল্যমাবিষ্কৃতং
নিষ্ঠ্যূতশ্চরণোপরাগসুলভো লাক্ষারসঃ কেনচিৎ।
অন্যেভ্যো বনদেবতাকরতলৈরাপর্ব্বভাগোত্থিতৈ—
দত্তান্যাভরণানি তৎকিসলয়োদ্ভেদপ্রতিদ্বন্দ্বিভিঃ॥' শকুন্তলা অ ৪,

এইরূপ অদ্ভুত ঘটনার সম্ভাবেও শকুন্তলা নাটকের জগদ্বিখ্যাত সুনাম ঘটিয়াছে। অবশ্য নেড়ারা ইলীশ মৎস্যের স্বাদ পুকুরের মৎস্যের মধ্যে পাইয়াছিল কি না পুথিতে উক্ত হয় না। মোটের উপর তাহারা পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করিয়া ঠাকুরের জয় করিল।

নাড়াগণ খড়দহে প্রত্যাগমন করিয়াছে। তাহাদের মুখে ঠাকুরের গুণগান, এবং হস্তে ঠাকুর লিখিত পত্রিকা। প্রশংসা শুনিয়া এবং পত্রিকাপাঠে রামাইকে চিনিয়া বীরচন্দ্র তদ্দর্শনার্থ উৎসুক হইলেন। অবিলম্বে বাঘনাপাড়া গমনোদ্দেশে বাহির হইলেন।

'অগ্রদ্বীপে একদিন করিলা বিশ্রাম।
গঙ্গাপার হইয়া প্রাতে করিলা পয়ান॥
উপনিত হৈলা আসি শ্রীবাঘ্নাপাড়ায়।' পুথি, পৃঃ ১১৪ ক

চব্বিশ-পরগণার মধ্যে কলিকাতা গোয়ালন্দ রেল লাইনের খড়দহ একটি ষ্টেশন,—কলিকাতা (শিয়ালদহ) হইতে উত্তরে ১২ মাইল। আর একমাইল উত্তরে টিটাগড়। অপর পারে অগ্রদ্বীপ বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত ব্যাণ্ডেল বারোহারোয়া রেল লাইনের একটি ষ্টেশন,—হাবড়া হইতে ৮২ মাইল উত্তরে এবং নবদ্বীপের ১৬ মাইল উত্তরে। এই দুইটি রেল লাইন কতকাংশে গঙ্গার পূর্ব্ব ও পশ্চিম তীরের সহিত প্রায় সমান্তরাল হইয়া চলিয়াছে। বঘনাপাড়া উক্ত বারোহারোয়া লাইনের বর্দ্ধমান জিলাস্থ একটি ছোট ষ্টেশন,—হাবড়া হইতে ৫৪ মাইল এবং কালনাকোর্ট ষ্টেশন হইতে মাত্র ৩ মাইল উত্তরে এবং নবদ্বীপ ষ্টেশন হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে। সুতরাং স্পষ্ট হইতেছে, বাঘনাপাড়া, নবদ্বীপ ও অগ্রদ্বীপ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী; আর খড়দহ ভাগীরথীর পূর্ব্ব-তীরোপান্তে। খড়দহ হইতে বাঘ্নাপাড়া যাইতে অগ্রদ্বীপে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। যদি বা যাওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলেও অগ্রে গঙ্গা পার হইয়া তবে অগ্রদ্বীপ পৌছান যায়। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত 'The Times Atlas and Gezetteer of the World'এর ৫৯ পাতায় ম্যাপে অগ্রদ্বীপ গঙ্গার পশ্চিম তীরে মুদ্রিত রহিয়াছে। কিন্তু পুঁথির কথায় অগ্রদ্বীপের পশ্চিমে গঙ্গা দেখা যাইতেছে বিষয়টি খুব গবেষণার যোগ্য।

যাহা হউক, এই বক্রপথে বীরচন্দ্র বাঘনাপাড়ায় উপনীত হইলেন। এই ভ্রাতৃস্নেহাবদ্ধ মহাজনদের মিলন অতি করুণ ও স্নিগ্ধ হইয়াছিল। ঠাকুর রামাই বীরচন্দ্র প্রভুর চরণে পড়িয়া নিজের ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মাকে হারাইয়া তিনি খড়দহে ফিরিয়া মুখ দেখাইতে পারেন নাই। গৌড়ে আসাই সম্ভব হইত না, যদি স্বয়ং মা দুইবার এবং শ্রীরামকৃষ্ণজী একবার তাঁহাকে স্বপ্নাদেশ না দিতেন। শ্রীরূপ-সনাতনও তাঁহার গৌড়াগমন অনুমোদন করিয়াছেন এবং স্বরচিত গ্রন্থরাজি উপহার দিয়াছেন। 'উজ্জ্বলনীলমণি' এবং 'রসামৃতসিন্ধু' নামক শ্রীরূপরচিত গ্রন্থদ্বয় ঠাকুর বীরচন্দ্র প্রভুকে দেখাইলেন। রূপের 'বিদগ্ধমাধব' এবং সনাতনের 'হরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থদ্বয়ও দেখাইলেন। সচরাচর কথিত হয়, নরোত্তম, শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দ শ্রীজীবের আদেশে বাংলায় ধর্ম্মপ্রচারার্থ প্রত্যাগমনকালে উক্ত গ্রন্থাবলী সঙ্গে আনেন; সে ত অনেকদিন পরের কথা। আলোচ্য পুঁথি অনুসারে তৎপূর্ব্বেই উক্ত গ্রন্থ বাংলায় আনীত হইয়াছিল। বীরচন্দ্র বাঘ্নাপাড়ায় একমাস অবস্থান করিয়া ঐ সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিলেন।

অতঃপর দুই ভাই অনেক কথাবার্ত্তা কহিলেন। শেষে রামাই বলিলেন—

'ঠাকুর কহেন সেবা কেমনে চলিব।
সেবা অধিকারি জগা কাহারে থাপিব॥' পুথি, পৃঃ ১৩০ ক

বীরচন্দ্র প্রভু উপদেশ দিলেন—

'প্রভু কহে জ্ঞাতিবন্ধু কেহো যদি হয়।
তারে সেবা দীতে উপযুক্ত ভাল হয়।'

ঐ ভ্রাতৃদ্বয়ের উল্লিখিত বাক্যদ্বয় হইতে দুইটি প্রশ্নের সম্ভব ঘটিয়াছে—একটি ঐতিহাসিক, অপরটি নৈতিক। সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া রামাই বাঘ্নাপাড়ায় আশ্রম স্থাপন করিলেন। আজই সেই সেবাব্রত অপরের স্কন্ধে চাপাইবার চিন্তা তাঁহার মনে জাগিয়াছে। পুথি সুনির্দ্দেশ না দিলেও, পরবর্ত্তী কার্য্য-প্রণালী দ্বারা আমরা ধারণা করিতে বাধ্য হইব যে, বীরচন্দ্রের সহিত প্রথম সাক্ষাৎই অর্থাৎ গৌড়াগমনের বৎসরমধ্যেই বীরচন্দ্র জ্ঞাতিবন্ধু আনিয়া সেবার ভার ন্যস্ত করিতে উপদেশ দেন নাই।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি নৈতিক; সকলের শ্রুতিসুখকর না হইতেও পারে, কারণ এমনও শোনা যায় যে, বহু আজন্ম-ব্রহ্মচারী সুদীর্ঘ জটাজুট প্রভাবে কিংবা তপঃশক্তিপ্রভাবে বিমুগ্ধ ভক্তগণের শ্রদ্ধাদত্ত ধনে বিরাট বিরাট মঠ স্থাপন করিয়া মঠের অধিকার দান করিয়াছেন আত্মীয়স্বজনকে। বীরচন্দ্র ঠাকুর রামাইকে বলিলেন—জ্ঞাতি বন্ধুকে আশ্রমের ভার

দাও। যে দুই শিষ্য নিত্য ছায়ার ন্যায় ঠাকুরের অনুগমন করিয়া আসিয়াছে, বিপদে আপদেও সঙ্গ ত্যাগ করে নাই, তাহাদের দাবী অস্বীকৃত হইল। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ঠাকুর রামাঞির একজন ব্রাহ্মণ ও একজন কায়স্থ নিত্যসহচর ছিল। জানি না কোন্ সম্প্রদায়িক নীতি এখানে কার্য্যকরী হইয়াছে। কিন্তু গৃহস্থাশ্রমী বীরচন্দ্রের এই পরামর্শ আজন্ম ব্রহ্মচারী ঠাকুর রামাঞির অনুসরণীয় হইল ইহাই অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়।

অচিরে নদীয়ায় লোক প্রেরিত হইল। তখন পিতামাতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা শচীনন্দন জ্যেষ্ঠের আহ্বানে পরদিন প্রভাতেই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। অচিরে বাঘ্নাপাড়ায় দুই সহোদরের মিলন হইল। বনবাসকালে রামচন্দ্রের সহিত ভরতের মিলনের ন্যায় এই ভ্রাতৃদ্বয়ের মিলন করুণ হইয়াছিল। শচীনন্দন বালক পুত্রকে ঠাকুরের চরণতলে ফেলিয়া দিলে ঠাকুর তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন এবং বলিলেন—

"ঠাকুর কহেন তুমী রহ এই স্থানে।
কৃষ্ণ-বলরামের সেবা কর কায়মনে॥
তব যেষ্ঠ পুত্র মোরে দেহ অকাতরে।'

শচীনন্দন জ্যেষ্ঠের হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করিলেন এবং ঠাকুরের আদেশে অবিলম্বে নবদ্বীপের বিষয়-আশয় গুছাইয়া পত্নী ও শিশুপুত্র সহ পুনরায় তথায় আসিলেন। শচীনন্দনের জ্যেষ্ঠ পুত্রই আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীরাজবল্লভ। ঠাকুর তাঁহাকে দীক্ষিত করিলেন।

ঠাকুর রামাই যুগলমন্ত্রের উপাসক ছিলেন। এ যাবৎ কেবল রাম-কৃষ্ণেরই পূজা করিয়া আসিয়াছেন। রাধা ও রেবতীর শ্রীবিগ্রহ সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহার প্রবল ইচ্ছা জাগিল। এমন সময় দুইজন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ব্রজধাম হইতে রাধা ও রেবতী বিগ্রহ দুটি আনিয়া রামাঞি আশ্রমে উপনীত হইলেন। অভীষ্ট বিগ্রহদ্বয় পাইয়া রামাঞির আনন্দের সীমা থাকিল না।

পরবর্ত্তী ফাল্গুনী পূর্ণিমায় যুগলমিলন উৎসবের ব্যবস্থা হইল। নিমন্ত্রিত হইয়া চৌষট্টি মহান্ত আসিলেন। আর—

'বিরচন্দ্র প্রভু আইলা মিলন উৎসবে।
শান্তিপুর হৈতে আইলা শ্রীঅচ্যুতানন্দ।
নিজ নিজ গণ সঙ্গে পরম আনন্দ॥
অভিরাম গোপাল খণ্ডের শ্রীরঘুনন্দন।
গৌরিদাস পণ্ডিত লইয়া আইলা সগণ॥
দাস গদাধর আইলা আপহ সঙ্গি লঞা।'

দোলপূর্ণিমার দিন হইতে সপ্তদিবস ব্যাপী মহোৎসব হইল। আজও শ্রীপাট বাঘ্নাপাড়ায় ঐসময় শ্রীরামকৃষ্ণের উৎসব হইয়া আসিতেছে।

ঠাকুর রামাঞির গৌড়ে প্রত্যাগমনের কত বৎসর পরে এই মহোৎসব প্রথম অনুষ্ঠিত হয় তাহা গ্রন্থে উক্ত নাই। কিন্তু এই উৎসবের সময় অভিরাম গোস্বামী, গৌরীদাস পণ্ডিত, গদাধর দাস, শ্রীঅচ্যুতানন্দ ও রঘুনন্দন জীবিত ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে রামাঞির যে বয়স গণনা করিয়াছি তাহাতে তাঁহার বাঘ্নাপাড়ায় উপস্থিতি ঘটে মাত্র ২০ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৪৭৫ শকাব্দের বৈশাখ মাসে (১৫৫৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ কিম্বা এপ্রিল মাসে)। ঘরবাড়ী পুষ্করিণী নির্ম্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে এবং যশস্বী হইতে অন্ততঃ ৫ বৎসর লাগিলেও রামাঞির বয়স হইবে মাত্র ২৫ বৎসর। এই সময়ে তাঁহার সহিত বীরচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব। কিন্তু তৎকালেই অপরের স্কন্ধে মঠ-পরিচালনার ভার স্থাপনের কথা উঠা অসম্ভব। স্বয়ং সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া তাহা বিনা শারীরিক বাধায় পরিত্যাগ ত্যাগীর ধর্ম্ম নয়।

অপিচ কনিষ্ঠ ভ্রাতা শচীনন্দন দুই পুত্রের পিতা। প্রথম পুত্রের সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগে পিতা চৈতন্য দাস যদি অল্প বয়সেই শচীনন্দনের বিবাহ দিয়া থাকেন এবং যদি অল্প কালেই শচীর পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলেও শচীর বয়স ২০ বৎসরের কম কোন মতে ধরা যাইতে পারে না। কাজেই তৎকালে রামাঞির বয়স হওয়া উচিত ৩২।৩৩। শচীকে আনিতে পাঠাইবার কালে রামাঞির মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করিলে তাহাকে তদপেক্ষা অধিক বয়সের বলিয়া মনে হয়।

'ঠাকুর কহেন সেবা কেমনে চলিবে।
সেবা অধিকারিজর্ণ্যা কাহারে যাপিব॥' পুথি, পৃঃ ১৩০ ক

নিজের দ্বারা যেন আর সেবাকার্য্য উচিতমত চলিতেছে না। তাই সেবাধর্ম্মী চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং ঠাকুরের সহিত শচীনন্দনের মিলন ১৪৮৫-।৮৭ শকাব্দেরও পরবর্ত্তী কালে ঘটিয়া থাকিবে।

পুঁথির রচনানুসারে মিলনমহোৎসব শচীনন্দনের সমাগমের পরে লিখিত হইলেও পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

যুগল উপাসক নিশ্চয়ই দীর্ঘকাল অসম্পূর্ণ পূজা লইয়া থাকিতে পারেন নাই। পুঁথিতে উক্ত আছে জনৈক কায়স্থ মাধবদাস

"বৃন্দাবন গেলা জবে জাহ্নবী রামাঞি
কথোদীন বই তেহো চলিলা ধায়াই ॥
তাহা শুনিলেন সকল সমাচার।
পরিক্রমা করি কাম্য বন কৈলা সার ॥
মীনকেতন ঠাকুরের সঙ্গে তাহাঞি মিলনি।
মহা প্রেমময় তেহোঁ নিত্যানন্দ যেন ॥
গোপীনাথে দুই মুত্তি অপুর্ব্ব দেখিয়া।
দুই জনা আর্ত্তি করি লইলুঁ মাগিয়া ॥
তাহাঞি শুনিলা গৌড় গেলেন রামাঞি।
ব্রজ হৈতে নঞা গেলা কানাঞি বলাই ॥
দুহাঁ মিলাইব নঞা দুই ঠাকুরাণি।
এই প্রেমানন্দে দুহেঁ করিলা উঠানি ॥ পুথি, পৃ ১০২ ক

জাহ্নবী দেবী নবদ্বীপ হইতে রামাঞিকে যেদিন লইয়া আসেন সেইদিন গঙ্গাতীরবর্ত্তী কোন গ্রামে মাধবদাস নামক কায়স্থ ধনী সগণ জাহ্নবী দেবীর আতিথ্য করিয়াছিলেন। তিনি কতদিন পরে শুনেন, দেবী জাহ্নবী রামাঞিকে লইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন। তিনিও যাত্রা করেন; বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া 'সকল সমাচার' পান। যথন কাম্যবনে গমন করিলেন এবং মীনকেতন নামক গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ তীর্থযাত্রীর সহিত মিলিত হইলেন, তথন তথায় শুনিলেন 'গৌড়ে গেলেন রামাঞি।' পুথির ভাষায় মনে হয় রামাঞি কাম্যবন ত্যাগ করিবার অনতিকাল পরেই মাধব গোপীনাথ মন্দিরে যান। তারপর ঠাকুর রামাঞির রাম ও কৃষ্ণবিগ্রহ গ্রহণের কথা শুনিয়া এবং গোপীনাথমন্দিরে অতিরিক্ত দুইটি রাধা ও রেবতী মুর্ত্তি দেখিয়া তাঁহারা মুর্ত্তিদ্বয় সংগ্রহপূর্ব্বক গৌড়ে রামাঞি মিলনোদ্দেশে প্রত্যাগমন করেন। এই সকল দেখিয়া মনে হয় রামাঞির গৌড়ে বাঘ্নাপাড়ায় উপস্থিতির অনতিকাল পরেই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

আর একটি কথা। মহোৎসবে আসিয়াছেন পণ্ডিত গৌরীদাস এবং দাশগদাধর। বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী মতে গদাধর দাশ দেহত্যাগ করেন ১৫০৩ শকে (ইং ১৫৮১ অব্দে), এবং গৌরীদাস পণ্ডিত অপ্রকট হন ১৪৮১ শকে (ইং ১৫৫৯ অব্দে) অপরাপর গ্রন্থের মতে ইহাঁদের আরও পূর্ব্বে মৃত্যু উক্ত হইলেও, দিগ্‌দর্শনীর মত স্বীকারে রামাঞির মহোৎসব ১৪৮১ শকাব্দের পূর্ব্বে অবশ্যই ঘটিয়াছিল। সুতরাং আমরা অনুমান করি শচীর বাঘ্নাপাড়ায় আগমন মহোৎসবারম্ভের পরে—ঠাকুরের জীবনের শেষদিকে ঘটিয়াছিল। তথন মঠ সুপ্রতিষ্ঠিত, সুসমৃদ্ধ; নতুবা শচীনন্দনকে নদীয়ায় সামান্য হইলেও স্থায়ী বিষয়-আশয় ত্যাগ করিতে বলা সম্ভব হইত না। মঠের আয় একটি গৃহস্থের পক্ষে প্রচুর নিশ্চয়ই তথন হইয়াছিল এবং তাহা হইতে ১০।১৫ বৎসরের কম সময় লাগিতে পারে না। কিন্তু গ্রন্থকার বলিয়াছেন—এই মিলন-মহোৎসবে

'প্রত্যক্ষ দেখিয়া লিখি শুন সজ্জন।' পুঁথি, পৃঃ ১৩৪ ক

একাগ্রচিত্তে দেবসেবা ও জনসেবা করিয়া ঠাকুর ৫০ বৎসর উপনীত হইয়াছেন। বসন্তকাল তথন সমাগত ;(সম্ভবতঃ) শুক্লপক্ষ পড়িয়াছে, সন্ধ্যার সময়ই চন্দ্র উদিত। ঠাকুর আজ শিষ্যকে এক অদ্ভুত আদেশ দিয়াছেন। তদনুসারে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ভিন্ন ভিন্ন 'বারামে' রাধাকৃষ্ণকে এবং রেবতী-বলরামকে সুসজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছে। ঠাকুর দেবতার সম্মুখে স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া—

'ভূমে পড়ি গড়ি জায় না হয় সম্বিতে।' (পৃঃ ১৪৬)
'রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ কহিতে কহিতে।
সিদ্ধ প্রাপ্তি হৈলা এই নামের সহিতে ॥' পুঁথি, ১৪৬ খ

এইরূপে এক ত্যাগের মহান্ আদর্শ সেবা-ধর্ম্মের মুর্ত্ত-বিগ্রহ পৃথিবী হইতে বিদায় লইলেন। বাঘনাপাড়ায় অদ্যাপি ঠাকুরের তিরোভাব মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। উৎসবের তারিখ ২১শে মাঘ। কিন্তু আলোচ্য পুথি অনুসারে তাঁহা বসন্তকালে হওয়া উচিত।

'চন্দ্রশত পঞ্চাব্দে জনম লভিলা।
পঞ্চদশ চতুর্থে স্বেচ্ছায় লিলা সম্বরিলা ॥ পুঁথি, পৃঃ ১৪৭

*

ঠাকুর রামাঞির সাতজন প্রধান শিষ্য ছিলেন :—

১। সহপাঠী ব্রাহ্মণ হরিদাস

২। কায়স্থ কৃষ্ণদাস

এই দুইজনের কথা গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত আছে।

৩। গ্রন্থকার রাজবল্লভ। (ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র)

৪। ঠাকুর হরি

ইনি পরম বিদ্বান্ ছিলেন। দীক্ষাকালে তিলক করিতে বসিয়াছেন, এমন সময় ঠাকুর কর্তৃক আহূত হইয়া অসমাপ্ত তিলকেই গমন করেন ও দীক্ষা নেন। গুরুর আদেশে তাঁহার অর্দ্ধতিলকই বিধান হইল। বহুদিন গুরুসেবা করিয়া গুরুর আদেশে ঠাকুর হরি 'পানাগড়ে' বাস করেন। তাঁহার বহু শাখা-প্রশাখা আছে। বর্দ্ধমান জিলায় পানাগড় একটি ষ্টেশন।

৫। ঠাকুর বড়ু

ইনি মহাধীর, গোপাল সেবাপরায়ণ্। গুরুর আদেশে 'শালডাঙ্গা মনস্থরপুর' নামক স্থানে অবস্থান করেন। ইঁহারও বহু শাখা-শিষ্য আছে। শালডাঙ্গা গ্রাম জলপাইগুড়ি জিলার অন্তর্গত।

৬। শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী

ঠাকুর কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ইনি বৃন্দাবন যান। তথায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রত্যাদেশ পাইয়া বিগ্রহ সংগ্রহ পূর্ব্বক গুরুর স্থানে প্রত্যাগমন করেন। ঠাকুর তাঁহাকে নিজগ্রাম মল্লভূমের অন্তর্গত কাটাবনীতে গিয়া বাস করিতে বলেন। ইঁহার শক্তি সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্য প্রবাদ গ্রন্থকারই আমাদেরই গোচর করিয়াছেন।

'সেই বনে বুক্ষে দুই ব্রহ্মদৈত্য হয়।
তারে শিষ্য করি কার্য্য সাধে মহাশয়॥'

(পুথি, পৃঃ ১৪২ক)

৭। বিপ্র রামচন্দ্র—

গঙ্গাস্নানকালে ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ হয়। উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। ঠাকুর দীক্ষা দেন। রামচন্দ্র 'ঠাকুরের সঙ্গে আইলা গৃহাদীক ছাড়ি' (পুঁথি, পৃঃ ১৪২ খ)। কিন্তু কিছুকাল পরে রামচন্দ্রের পিতা আসিয়া নিবন্ধ করিলে, ঠাকুর শিষ্যকে গৃহে গমনপূর্ব্বক বিবাহাদি করিয়া সংসারী হইতে অনুমতি দিলেন। পিতার সহিত রামচন্দ্র নিজগ্রাম ধমনি যাত্রা করিলেন।

'দামোদর পার হঞা আইলা মল্লভৌমে।
ক্রমে চলি আসি উত্তরিলা তপবনে॥
সেই বনে বৈসে পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারি।
রামচন্দ্রের মাতুল তারে রাখিলা আদরি॥
ঘটনা করিয়া তারে করাইল বিভা।'

(পুথি, পৃঃ ১৪৩ক)

বাঁকুড়া হইতে ৩ মাইল পূর্ব্বে দ্বারকেশ্বরের পূর্ব্বতীরে 'তপোবন' নামক যে প্রসিদ্ধ দেবস্থান-সংলগ্ন গ্রাম আছে এইটি গ্রন্থোক্ত গ্রাম কি না অনুসন্ধেয়।

শিষ্যসংখ্যা গণনাবসরে পুঁথিতে একই সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

তথাহি কবীন্দ্র কাব্যে।

ঠাকুর হরিদাসশ্চ কৃষ্ণদাসস্তথৈব চ।
শ্রীরাজবল্লভো নাম ঠাকুর হরিরেব চ॥
বড়ু শ্রীগোকুলানন্দ রামচন্দ্রস্তু সপ্তমঃ।
এতানি তেব শাখায়া তেভ্যো নিত্যং নমোনমঃ॥'

(পুথি, পৃঃ ১৪১খ)

এই কবীন্দ্র কে? ইহাঁর কাব্যেরই বা নাম কি? দীনেশবাবু কবীন্দ্র উপাধিধারী বহু ব্যক্তির নামোল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই বাংলা কবি।

আলোচ্য পুঁথিতে অষ্টম শাখার লক্ষণ দেওয়া আছে, কিন্তু কোন শিষ্যের নামধাম দেওয়া নাই। যথা—

'অষ্টম শাখার ইবে কহিয়ে লক্ষণ।
ধর্ম্মজ্ঞ ধার্ম্মিক গুরুভক্তিপরায়ণ॥
পরম উদার সর্ব্বশাস্ত্রেতে নিপুণ॥
প্রভু আজ্ঞায় জেহোঁ কৃষ্ণ নাম দীয়া।
তারিলা অনেক জীব ভক্তি লয়াইয়া॥'

(পুথি, পৃঃ ১৪৬খ)

*

পুঁথির আখ্যানবস্তুর আলোচনা শেষ হইল। লেখকের রচনারীতির (style) কিছু আলোচনা করিব। ইতিপূর্ব্বে দুই চারিটি রচনার নমুনা দিয়াছি। গ্রন্থোক্ত দুইটি মধুর পদ উদ্ধৃত করিতেছি। দুইটিই মিলনমহোৎসবের বর্ণনায় যোজিত। একটি রেবতীবলরামের, অপরটি রাধাকৃষ্ণের রূপ-মাধুরীর বর্ণনা। যথা—

'বসন্ত রাগশ্চ

দেখ অপরূপ রূপের ঠান, রেবতিরমণ শোভিত রাম,
সিতাম্বুজ জমু কনকদাম, উজোর কাঁতি কুন্দকুসুম ভাতিয়া।
রাতাউতপল নয়ন ভঙ্গি, বিম্বু অধর বয়ন রঙ্গি,
হেরি উনমত জুবতি মান, কামমদে মত্ত মাতিয়া॥
চাঁচর চিকুরে চুড়াটি ঠান, তাহে নানা সোভে ফুলের দাম।
ভ্রমরা ভ্রমরি উড়ে মধুলোভে, বর্হা মুকুট সোভনি।
কম্বুকণ্ঠে কনকহার, বাহু বলন বলয়াতাড়,
রাতিউতপল কর-কিসলয়, নখ-মণিগণ সোভণি॥

ভ্রসর হৃদয় উন্নত তাল, রতনে জড়িত বিবিধ মাল,
নাভি সরক্হ কিঙ্কিনিজাল, নিলবাস তহি সাজনি।
চরণে নুপুর অধিক রঙ্গ, পদ-নখ-মণি-সুষম পুঞ্জ,
কোকনদে মধু ভকত ভ্রমর, লোভে অনুদিন ভাবনি॥

বামে সোভিত, রাম রমণি,	রোচনে রুচির সোভা।
নিল উড়নি, জলদে দামিনি,	বলদেব-মন-লোভা॥
কবরি নাল, ছুলিছে ভাল,	ভাঙ ধমুয়া বাণে।
কানপাল, হৃদয়ে মাল,	ললিত থলিত বামে॥
বারুণি মদ মত্ত চালিত,	নয়ন ঘোর ঘুর্ণিতে।
কুন্দকোরক দসন-পাতি,	মন্দ মধুর হাঁসিতে॥
অপরূপ দুহু রূপের অবধি,	দেখিতে নঞান ঝামরে।
অধিক রাগ, হৃদয়ে জাগ,	কাগুয়া রঙ্গ-সমরে॥
রাস-রসিক সরস হুচিতে,	কুমিনি মনলোভা।
তোহারি দাস করত আশ	দেখিতে চরণ-সোভা॥'

(পুথি, পৃঃ ১৩৩খ)

'যথা রাগঃ।

অপরূপ রূপের অবধি।	চাঁদ চকোরে যেন মিলায়ল বিধি॥
মেঘে যেন চান্দের উদয়।	চান্দে যেন রাহু গরাসয়॥
গিরিধরে যেন চান্দমালা।	নব গোরোচনা ঘন কালা॥
মরকত যেন হেমমণি।	অপরূপ রূপের লাবনি॥
বিনদীয়া চুড়া পিঞ্ছ সাজ।	বিনদিনির বেণি-ফণিরাজ॥
কপালে চন্দন সসি ভাতি।	সিন্দুর বিন্দু অরুণিম কাতি॥
ভুরু ধনু নঞান বিকাল।	রাধা নঞানাঞ্জন মাতোয়াল॥
মুখশশি অরুণিম ভাস।	রাধাবদন কোকনদ পরকাস॥
ভুজজুগ ভোগি নালাম্বুজে।	রাধা বক্ষ প্রফুল্ল সরোজে॥
পীতবাস ঝটকে দামিনি।	লিল লোচন পহিরিনি॥
মণিমঞ্জির কোকনদে।	ধ্বজ বজ্রাঙ্কুষ আদী সো পদে॥
বিদ্যুত পুঞ্জাত পদসোভা।	জাবক রঞ্জিত দুটি পা॥
আমার প্রভুর প্রাণনাথ।	এ রাজবল্লভ করু আস॥'

(পুথি, পৃঃ ১৩৪খ)

অতঃপর কয়েকটি শব্দের আলোচনা করিব। পুঁথির ২থ পাতায় দেখা যায়

'জাহ্নবীর কাছে কহে জোড় হাথ করি।
তোমার স্মরণ মোরে রাখ প্রাণেশ্বরি।'

এখানে 'শরণ' স্থলে 'স্মরণ' হইয়াছে কি না আলোচ্য বটে। কিন্তু 'প্রাণেশ্বরি' শব্দ অধিক মনোযোগ দাবী করিতেছে। 'প্রাণেশ্বরী' শব্দের ব্যাপকভাবে মাতার উপর প্রয়োগ দেখিয়া পরবর্ত্তীকালে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃত্তিকাকুল-বল্লভ' বিশেষণ পদের কার্ত্তিকেয়ের উপর ব্যবহার অপূর্ব্ব বলিয়া মনে হইবে না। ৬১ খ পাতায় পাওয়া যায়—

'চৈতন্য বিরহে ভক্ত আগল পাগল'

পুনশ্চ ৬২৮ ক পাতায় দেখা যায়—

'প্রেমেতে আগল।'

'পাগল' শব্দ পালি 'পুগল' শব্দ হইতে আগত বলিয়া শব্দবিদ্‌গণের মত। 'পাগোল' বানানও রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পাওয়া যায়। কিন্তু 'আগল' শব্দের অর্থ কি? সং অর্গল শব্দের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট চলিত কথায় 'আগল' বাধা-অর্থে পাওয়া যায়। এখানে অন্য অর্থ অনুমেয়।

'দিনে দিনে বন কাটি করিল চৌগান।' (পুথি, পৃঃ ১২০ক)
'কোড়া আনি পুষ্করিণির করিল আরম্ভ।' ঐ
'তারা (ধনীরা) সব নিছারি করিল বহু ধন।'

(পুথি, পৃঃ ১২০খ)

উল্লিখিত কয়টি পঙক্তিতে ব্যবহৃত 'চৌগান' 'কোড়া' এবং 'নিছারি' শব্দের মূল অনুসন্ধেয়। 'কোড়া' পদ খনক অর্থে প্রচলিত আছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের প্রকৃতিবাদ অভিধানে 'কোল' (জাতিবিশেষ) হইতে 'কোলা' ও 'কোড়া' অর্থাৎ কুলি দেখা যায়।

পুঁথির ৪ থ পৃষ্ঠায় শ্রীরাধিকার জন্মবিবরণ দেওয়া আছে। দ্রষ্টব্য বলিয়া উল্লেখ করিলাম।

'বৃসভানু রাজার পত্নি কিত্তিকা সুন্দরী।
মুস্নানেতে জল খেলে সঙ্গে সহচরি॥
সুবর্ণের পুষ্প এক ভাসিয়া আইলা।
আচম্বিতে কিত্তিকার কোলে সাম্ভাইলা॥
পাইয়া অমূল্য নিধি ঘরেতে আইলা।
নিজ ঘরে রম্য স্থলে সজত্নে থুইলা॥
আচম্বিতে প্রকাসয়ে রূপের মাধুরি।
তাহার ভিতরে দেখে শিশুবেশ নারি॥'

চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে লিখিয়াছেন—

'তে কারণে পদুমা উদরে।
উপজিল্য সাগরের ঘরে॥'

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডের ১৭শ অধ্যায়ে উক্ত আছে—

বৃষভানু মূর্দা যুক্তঃ প্রাপ্য তাঞ্চ কলাবতীম্।
রেমে সুনির্জ্জনে রম্যে বুবুধে ন দিবানিশম্॥ ১৪২
তয়োঃ কন্যা চ কালেন রাধিকা সা বভূব হ। ১৪৩
অযোনিসম্ভবা সা চ কৃষ্ণপ্রাণাধিকা সতী। ১৪?'

পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীরাধা-জন্মাষ্টমী ব্রত কথায় (১৬২ অধ্যায়ে) উক্ত আছে—

'বৃষভানু-পুরীরাজো বৃষভানু মহাশয়ঃ।
বৈশ্যঃ সদন্তঃকরণঃ কুলীনঃ কৃষ্ণদৈবতঃ॥
তস্য ভার্য্যা মহাভাগা শ্রীমৎশ্রীকীর্ত্তিদাহ্বয়া।
তস্যাং শ্রীরাধিকা জাতা শ্রীমদ্বৃন্দাবনেশ্বরী॥'

বোধ হয় পুরাণের 'কীর্ত্তিদা' বাংলা পুঁথিতে 'কিত্তিকা' হইয়াছে। 'কলাবতী' এবং 'পদুমা' (পদ্মা) নাম স্বতন্ত্র। পুরাণ দুটির একটিতে 'অযোনিসম্ভবা' বিশেষণ সত্ত্বেও মানুষী-গর্ভ-সম্ভব সুস্পষ্ট। আলোচ্য পুঁথির জন্মবৃত্তান্তের মূল অনুসন্ধেয়।

পুঁথির ৯ ক পাতায় শ্রীকৃষ্ণের বেশরচনার বেশ রসময় ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যথা—

'গোপাঙ্গনা-নেত্রোৎপলে কৃষ্ণ প্রপুজিত।
সদাই কৈসোর দেখে অনঙ্গ-মোহিত॥
সেই নেত্রসোভা কৃষ্ণ দুর্লভ মানিঞা।
মউর-চন্দ্রিকা পরে ভাবাবিষ্ট হঞা॥
'শ্রীরাধীকার অঙ্গকান্তি বিদ্যুত সমান।
সেই ভাবে পরে পীতবাস পরিধান॥
'রাধা-প্রেম-অনুরাগ সদাই অন্তরে।
সেই অনুরাগে গুঞ্জামালা সদা ধরে॥'

(পুঁথি, পৃ ৯ক)

বৈষ্ণব-কবিরা এই ব্যাখ্যা স্বীকার করিয়াছেন। জ্ঞানদাস পদে লিখিয়াছেন—

'আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া
পীতবাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক করের মুরলী
লইতে আমার নাম॥'

"বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস" গ্রন্থে ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। ডক্টর সেন উক্ত গ্রন্থের ৫০৭ পৃষ্ঠায় 'মুরলীবিলাসে'র বিস্তৃত বিষয়-সুচী দিয়াছেন। তাহা দেখিয়া উভয় পুথির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তবে উভয় পুঁথিই ২১ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। আমি আলোচনার প্রারম্ভেই বলিয়াছিলাম এই পুঁথিখানি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পক্ষে খুব ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ। সেনমহাশয়ও বলিয়াছেন 'মুরলীবিলাস'ও ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব ইতিহাসের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান্। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ইতিহাসে ইহা নূতন আলোকপাত করিতে পারে। (P. 511) আমি এই পুঁথিখানির ঐতিহাসিক মূল্য দেখাইবার জন্যই এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধ চারি খণ্ডে প্রকাশ করিলাম। যদি আমার এই প্রবন্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিবৃত্তে কিঞ্চিৎমাত্র আলোকও দান করে, আমি শ্রম সার্থক মনে করি।

(সমাপ্ত)

অভিশপ্ত

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

বাহিরে বিপুল বিশ্বে ঋতুরাজ অকুণ্ঠিত চিতে
নিত্য নব ফুলে ফলে পুজা করে পরিবর্ত্তনের,
গোধূলি গলিত স্বর্ণে আলো জ্বলে মৃত্যুর ইঙ্গিতে,
সিত তুষারেতে লেখা ইতিহাস আগামী দিনের।

আমার এ ছোট ঘরে কেঁদে মরে রোগাতুর মন,
সৃষ্টি সুখ উল্লাসের কণামাত্র আজ বেঁচে নাই,
শিয়রে প্রহর জাগে স্নেহ অন্ধ মায়ের নয়ন,
ব্যর্থ বাসনার জ্বালা অসহায় অশ্রুতে নিভাই।

জানি আমি বেঁচে আছি, বেঁচে থাকা বুঝিতে পারি না,
ছোট ঘরে ছোট মন বড়রে ভাবিতে ভয় পায়,
আঁধারে আড়াল করা আঁখির সমুখে দেখি কালো,
শুধাতে সাহস নাই আজও সেই চাঁদ ওঠে কি না,
যে চাঁদ দিয়েছে দোলা সবুজের বুকের সীমায়,
কঠিন পাথরে ঘেরা এতকাল জীবন জাগালো।

(উপন্যাস)



শ্রীকুমুদিনীকান্ত কর

পাঁচ

গ্রাম্যপথে আমাদের ঘোড়া বেগে ছুটিয়া চলিয়াছিল। গভীর রাত্রে অশ্বপদশব্দে আশে-পাশের লোকেরা জাগিয়া উঠিতেছিল। গ্রাম্য-কুকুরগুলি ঘোড়ার পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে অনবরত চীৎকার করিতেছিল। ঘোড়া বিরক্ত হইয়া মাঝে মাঝে হ্রেষারব করিয়া উঠিতেছিল।

গ্রামের সন্নিহিত হইলে নিজের গৃহের দিকে স্বতঃই আমার দৃষ্টি আরোপিত হইল। অমনি আমার স্বর্গীয়া স্নেহময়ী জননীর কথা মনে হইল। হায়! কত স্মৃতি-জড়িত ঐ পৈতৃক ভিটা! মুহূর্ত্তে মন স্মৃতির জাল বুনিতে বুনিতে কখন আপনাকে হারাইয়া ফেলিল!...

ভজু আগে আগে যাইতেছিল। হঠাৎ আমাকে এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে বিস্মিত হইয়া ডাকিয়াছিল। আমি কখন ঘোড়া থামাইয়া বাড়ীর দিকে চাহিয়া স্থির হইয়াছিলাম তাহা আমার মনে নাই। তাহার ডাকে চমকিয়া উঠিয়া সে দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া সম্মুখে চাহিলাম। বড় জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস পতিত হইল। ভজু একটু বিস্মিত হইয়া নিকটে আসিয়া বলিল, "কি হয়েছে কর্ত্তা!..."

তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কেবল বলিলাম, "চল যাচ্ছি..."

আর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ভজু বলিল, "কর্ত্তা! অনুমতি হ'লে আমি একটু ছুটে যাই, আপনি ধীরে ধীরে আসুন..."

কি আশ্চর্য্য! ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কেন জানি না আমারও একাকী হইতে প্রবল ইচ্ছা হইতেছিল। আমি তৎক্ষণাৎ "বেশ" বলিয়া তাহাকে অনুমতি দিলাম। সে ঘোড়া ছুটাইয়া মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু আমি তখনও একই ভাবে নিশ্চেষ্ট হইয়া ঘোড়ার উপর বসিয়া রহিলাম। ধীরে ধীরে মন যেন কিসের তাড়নায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। কি যেন ছিল, হারাইয়া গিয়াছে; মন যেন তার বিফল অনুসন্ধানে ক্লান্ত হইয়া ছটফট করিতে লাগিল! বেদনা-কাতর অন্তরের আর্ত্তনাদ যেন সুস্পষ্ট হইয়া আমার কানে ধ্বনিত হইতে লাগিল! আমি আচ্ছন্ন হইয়া রহিলাম...এই অবসরে ঘোড়াটি তাহার স্বাভাবিক গতি পরিত্যাগ করিয়া ধীর মন্থর গতিতে সঙ্গীর অনুসরণ করিয়া এক আম্র-কুঞ্জে প্রবেশ করিয়াছিল...

চতুর্দ্দিকে একটা বিরাট অন্ধকার! স্তব্ধতা! সব স্তব্ধ, বৃক্ষশীর্ষ, আকাশ, বাতাস, বিশ্ব প্রকৃতি, সব স্তব্ধ! উভয়ের মিলন-প্রসূত বিরাট গাম্ভীর্য্যে আমার অন্তর বাহির অভিভূত, স্তম্ভিত! সেই গাম্ভীর্য্যের আকর্ষণ কি দুর্দ্দমনীয়! উহার বিরাটত্বে এই ক্ষুদ্র মানবের অস্তিত্ব যেন কোথায় লুপ্ত হইয়া গেল...

এ কি! এ কি! এ কি হাহাকার! নাই সে, নাই সে, চতুর্দ্দিকে এই একই আর্ত্তনাদ! হিরু! হিরু! চলে গেলি ভাই! আমায়...আমায়ও কিছু না ব'লে! বড় সাধের মীনা, খোকা যে পড়ে রইল! কিন্তু কি দুঃখে...

কার এ রোদন...এ কণ্ঠস্বর? ওই ত', ওই ত' সে ডাকছে আমায় কাতর কণ্ঠে 'রণি' 'রণি' ব'লে? রণি! শোন্, বড় দুঃখ ভাই, না ব'লে পারছি না, সেই যে বলেছিলি একদিন, শেষে তাই ঘটেছে, অতৃপ্ত বাসনা আমার, উঃ! তাকে বড় ভালবাসি, মীনা, মীনা...অসহ্য অসহ্য হয়েছিল বড়, তাই তোকেও বলবার সময় হয় নাই, কিন্তু তোদের কাউকেই ত' ছেড়ে যেতে পারছি না ভাই, রণি! রণি!

তার তপ্ত দীর্ঘশ্বাস যেন আমার গায়ে লাগিল! হিরু! হিরু! এই ত, এই ত এসেছি ভাই! ভয় কি, ভয় কি, আমি তোর সব দুঃখ দূর করব, হিরু! হিরু আয়...

"কর্ত্তা কর্ত্তা!"

সহসা কে একজন আমার গাত্রস্পর্শ করিয়া ডাকিল।

আমি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চাহিয়া দেখিলাম আমার চারিদিকে বহুলোক। তাহাদের হস্তধৃত মশালের আলোকে আম্র-কুঞ্জ আলোকিত। আমি পথ হইতে কিয়দ্দূরে একটী গাছের নীচে ঝোপের মধ্যে দাঁড়াইয়া! আমার সম্মুখে মশাল হস্তে ভজু সর্দ্দার। তাহার ভীত বিস্মিত দৃষ্টি আমার মুখের উপর স্থাপিত। আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "একি ভজু! তোমরা সব এভাবে এখানে কেন?"

সে ততোধিক বিস্মিত হইয়া বলিল, "আপনার আসতে দেরী হচ্ছে কেন আমরা সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, এমন সময় খালি ঘোড়া চীৎকার করতে করতে বাড়ী এসে ঢুকল। নিশ্চয়ই কোন বিপদ হয়েছে মনে ক'রে যে যেখানে ছিলাম সব বেরিয়ে পড়েছি মশাল হাতে লাঠি হাতে আপনার খোঁজে, আপনাকে খুঁজে না পেয়ে পাগল হ'য়ে উঠছিলাম, এমন সময় শুনতে পেলাম কর্ত্তার নাম ধরে কে একজন ডাকছে, ছুটে এসে দেখি আপনি এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে কর্ত্তাকে ডাকছেন…"

আমার দীর্ঘশ্বাস পতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ভজুর মুখখানা বড় বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। নীরবে বিগত ঘটনা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কখন ঘোড়া হইতে নামিয়াছিলাম, কখন এই ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, আর কখনই বা কি করিয়াছিলাম তাহা কিছুই মনে পড়িল না। কেবল হিরু বলিয়া ডাকের শব্দ যেন তখনও আমার কানে লাগিয়া ছিল।

ভজু সভয়ে বলিল, "কর্ত্তা!"

"হুঁ, চল, ভজু! ও কিছু নয়…"

আমি অগ্রসর হইলাম। পশ্চাতে লোকজনেরা আসিতে লাগিল। জোর করিয়া সব চাপা দিতে চাহিলাম বটে, কিন্তু আমার মন মুহুর্মুহুঃ 'হিরু' 'হিরু' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

জমিদার বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গনে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম ভরা লোক—হিরুর আত্মীয় স্বজন এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রজারা; বৃদ্ধ দেওয়ান প্রাঙ্গনে পাগলের ন্যায় কেবল ছুটাছুটি করিতেছেন এবং হঠাৎ একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া দ্বিতলের এক কক্ষের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া কি দেখিবার এবং শুনিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি ছুটিয়া আসিলেন এবং আমাকে বুকে টানিয়া নিয়া আবেগরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "ভাই, ভাই, হিরু—হিরু চলে গেছে, আমায়…আমায় সে একা রেখে…"

তিনি আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

অপুত্রক বৃদ্ধ দেওয়ান হিরুকে অপত্যস্নেহে লালন-পালন, রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। কখনও প্রভু-পুত্রের ন্যায় তাহাকে দেখেন নাই। হিরুও তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিত।

আমার চোখ অশ্রুজলে ঝাপসা হইয়া আসিল। নীরব অশ্রু অদূরে দণ্ডায়মান সর্দ্দার এবং আরো অনেকের বুক ভাসাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে একটা বিষণ্ণতার গাম্ভীর্য্য!

বৃদ্ধ দেওয়ান আমাকে ধীরে ধীরে বক্ষচ্যুত করিয়া বলিলেন, "ভাই, যে-টী আছে সে-টীকে এখন তুমি রক্ষা কর…"

তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া বাটীতে প্রবেশ করিলেন। পশ্চাতে ভজু সর্দ্দার। দ্বিতলের সম্মুখে সহসা দাঁড়াইলেন। তাঁহার দীর্ঘশ্বাস পতিত হইল। ক্ষণেক অপেক্ষার পর অঙ্গুলি নির্দ্দেশে একটি কক্ষ দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ—ঐ সেই ঘর, ঐখানেই…"

আমি চাহিয়া দেখিলাম আমার চিরপরিচিত গৃহ—হিরুর শয়ন কক্ষ। এই ত' সেই ঘর যেখানে আবাল্য আমরা দুই বন্ধু আনন্দে দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি কাটাইয়াছি। সময় গিয়াছে জলস্রোতের ন্যায় অজ্ঞাতসারে; কত আলাপন, কত নিশিজাগরণ, কত সুখস্বপ্ন, কত কল্পনা, কত ভবিষ্যৎ রচনা এইখানে—এইখানে, এই ঘরে, কেবল আমরা দুটীতে, এই ত সেই ঘর, এখানে কি? কি হইয়াছে এখানে!

"ভাই…"

কতক্ষণ সেই কক্ষের দিকে চাহিয়া একই স্থানে নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া অতীতে বিচরণ করিতেছিলাম মনে নাই। হঠাৎ বৃদ্ধের আহ্বানে চমকিয়া বর্ত্তমানে ফিরিয়া আসিলাম। আমার বুক চিরিয়া বড় জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস পতিত হইল।

আমি একাকী অন্ধকারে নীরবে যন্ত্রচালিতের ন্যায় সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। সহসা সঙ্গীত শুনিয়া চমকিত হইয়া মধ্যপথে থমকিয়া দাঁড়াইলাম। বিস্মিত হইয়া ভাবিলাম, সঙ্গীত! সঙ্গীত কোথা হইতে আসিল এখানে! এমন সময়ে!…বড় করুণ কণ্ঠ! সঙ্গীতের মুর্চ্ছনায় মুর্চ্ছনায় করুণা-ধারা! কি যেন ছিল, কি যেন নাই, হারাইয়া

গিয়াছে! সুর গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল, সুরে আকুল-প্রাণের ক্রন্দন···একটা হাহাকার! কোথায়? কোথায় এ সঙ্গীত? ওই ত', ওই ত' ওখানেই, সেই—সেই কক্ষে··· ও কণ্ঠ কা'র? কার ও কণ্ঠ? পরিচিত—পরিচিত কণ্ঠ! নিশ্চয়—নিশ্চয় সে! সে-সে···

আমি ছুটিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে গিয়া পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেলাম। রাত্রি বলিয়া ভয়ানক একটা শব্দ হইল।

"দাঁড়ান, আলো আনছি..." বলিয়া ভজু সর্দ্দার মশাল হাতে ছুটিয়া আসিল।

মশালের আলোতে পরিধেয় বসন এবং হাতের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলাম।

"একি! একি! ভজু! রক্ত! রক্ত কোথা থেকে এল! অ্যা—অ্যা···"

হঠাৎ সম্মুখে চাহিয়া দেখিলাম উপরের কক্ষের দিক হইতে ক্ষীণ শোণিত-ধারা ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিতেছে! "হিরু! হিরু! শেষে তোর—তোর রক্তে···"

একটা তীব্র আর্ত্তনাদ আমার মর্ম্মভেদ করিয়া বহির্গত হইল। সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। দুই হাতে দেওয়াল ধরিয়া সিঁড়ির উপরে বসিয়া পড়িলাম। ভজু আর্ত্তনাদ করিতে করিতে নীচে নামিয়া গেল···

হঠাৎ মনে হইল সে-সঙ্গীত আর নাই। তবুও আমি কাণ পাতিয়া রহিলাম, আরো কিছু যদি শুনিতে পাই··· ও কি? ও কি! রোদন শব্দ নয়? বুক ফাটা কান্না! হিক্কা! অস্থি-পঞ্জর যেন চূর্ণ হইয়া যাইতেছিল, ব্যর্থ জীবনের হাহাকার, অদৃশ্য প্রিয়তমের জন্য আকুল আহ্বান, আবেগরুদ্ধ কণ্ঠের করুণ স্বর ক্রমশঃ অস্পষ্ট, ক্ষীণ, আরো করুণ, মর্ম্মান্তিক করুণ, এ ও সে, তারই কণ্ঠ, আকুল প্রাণের কান্না প্রিয়তমের উদ্দেশে অশ্রু-তর্পণ···

আমার অন্তরের সমস্ত তন্ত্রী ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়া এক সুরে বাজিয়া উঠিয়াছিল, তাহার করুণ বিলাপে প্রাণ আমার কাঁদিতেছিল, অশ্রু কতক্ষণ ধরিয়া আমার দ্রবীভূত হৃদয়ের কথা নিবেদন করিতেছিল তাহা আমার জানা নাই, কান্না আর শুনা যাইতেছিল না, সবই যেন একটা স্বপ্ন! যেন স্বপ্ন-রাজ্যে বিচরণ করিতেছিলাম, মোহাবিষ্টের ন্যায় কখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম মনে নাই; কিন্তু এক পা'ও অগ্রসর হই নাই, একই স্থানে দাঁড়াইয়া পুনরায় কিছু শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া সেই কক্ষের দিকে চাহিয়াছিলাম, বহুক্ষণ—বহুক্ষণ কাটিয়া গেল, কোন শব্দ নাই কক্ষে, চতুর্দ্দিকে একটা বিশ্রী নীরবতা প্রাণে আতঙ্ক জাগাইয়া তুলিল, হঠাৎ বিজলি চমকের ন্যায় আমার মনের উপর দিয়া একটা ভয়ঙ্কর কথা খেলিয়া গেল। আমি চমকিত ভীত হইয়া উঠিলাম, তবে কি—তবে কি সে ও···উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া গিয়া সেই কক্ষের দ্বারে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া ডাকিলাম, "মীনা! মীনা! বোন্! বোন্!"

কোন উত্তর নাই। হঠাৎ এই সময় নর্দ্দমার মুখে তাজা জমাট রক্তের দিকে আমার চোখ পড়িল। আমি শিহরিয়া উঠিয়া চোখ বুজিলাম, তবে কি সবই শেষ হইয়াছে? মীনার রক্তও কি তার রক্তের সঙ্গে মিশিয়াছে? মীনা কি তবে শোণিতে শোণিতে তার শেষ মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছে?··· আমি পাগল হইয়া রুদ্ধদ্বারে পুনঃ পুনঃ করাঘাত করিয়া ডাকিতে লাগিলাম, "মীনা! মীনা! বোন্! বোন্!"

তথাপি উত্তর নাই। আমি উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিয়া ডাকিলাম, "ভজু! ভজু!"

ভজু ছুটিয়া আসিল। বলিলাম, "এখনি দরজা ভেঙ্গে ফেল, এক মুহূর্ত্ত দেরী না আর···"

যখন দরজা ভাঙ্গা শেষ হইল, তখন ভোর হইয়াছে।

চতুর্দ্দিকে একটা গভীর নিস্তব্ধতা। জগতের চাঞ্চল্য, চেতনা যেন লুপ্ত! যেন স্বপ্ন-রাজ্য! আমি সেই কক্ষের ভগ্ন দ্বারে একাকী; কিন্তু বাক্‌শক্তিহীন; গতিশূন্য স্পন্দন-হীন দেহ। কেবল আমার সজীব চক্ষু সম্মুখে চাহিয়া কক্ষের ভিতরের মর্ম্মান্তিক দৃশ্য দেখিতেছিল—

কক্ষের প্রায় মধ্যস্থলে হীরুর মৃতদেহ। কাৎ হইয়া পড়িয়া একখানি রক্তলেপা চেয়ার, একটু দূরে মেঝেতে একটা বন্দুক—তার অগ্রভাগে বিন্দু বিন্দু শোণিত, মৃতদেহের চতুর্দ্দিকে জমাট রক্ত, ঘরময় রক্তের ছিটা, রক্তের একটা ক্ষীণ ধারা নর্দ্দমার মুখ পর্য্যন্ত প্রসারিত, মীনা মৃত স্বামীর বুকের উপর নিস্পন্দদেহে পতিত। তাহার সর্ব্বাঙ্গ, আলুলায়িত

কেশ, পরিধেয় বস্ত্র সমস্ত রক্তাক্ত…উঃ! আমার চোখ আপনা-আপনি বুজিয়া আসিল, এরপর যখন চোখ মেলিয়া চাহিলাম তখন মীনা উঠিয়া বসিয়া স্বামীর মুখের দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল; কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলাম—তার সমস্ত মুখখানি স্বামীর রক্তে রাঙ্গা! একটা অস্ফুট আর্তনাদ আমার মুখ হইতে নির্গত হইল, কিন্তু তাহাতেও তাহার কোন ভাবান্তর লক্ষ্য হইল না। বিশ্বের যাবতীয় চৈতন্যের নিকট তাহাকে মৃত বলিয়াই বোধ হইল…হঠাৎ তাহার কথা শুনিতে পাইলাম, অতি মৃদু শব্দ বোধ হইল যেন স্বামীর সঙ্গে সে নিভৃতে কথা কহিতেছে—তোমার শোণিত পবিত্র, যদি কারো গায়ে লাগে, না, থাকবে না, একটু চিহ্নও আমি রাখব না, যত্নে মুছে নিয়ে অতি গোপনে রাখব, পুরুষ পুরুষান্তর ধরে এ চিহ্ন পবিত্র বলে জ্ঞান করবে, এ ঘরে আর কারো প্রবেশের অধিকার থাকবে না চিরদিন তোমার স্মৃতি-পূজার ঘর হ'য়ে থাকবে, চ'লে গেলে আমায় রেখে! অভিমান, অভিমান ক'রে গেলে আমার উপর, এ দুঃখ আমার চিরদিন শেলের মত বাজবে বুকে, আমি ত বুঝতে পারি নি তোমায়-তাই…তাই আমি অমন কথা…আমি তবে কেন থাকব একা? কার জন্য? কিসের জন্য? আমিও তবে যাব তোমারই সাথে…না-না, তোমার আদেশ শিরোধার্য্য…থাকব, থাকব প্রিয়তম, বাঁচতে হবে আমার খোকার জন্য, তোমারই চিহ্ন বাঁচিয়ে রাখবার জন্য, কিন্তু অভিমান, অভিমান করে গেলে…"

অশ্রুধারা তাহার গণ্ড প্লাবিত করিতেছিল। সে পরিধেয় বস্ত্রাঞ্চলে অতি সন্তর্পণে স্বামীর অঙ্গের রক্ত মুছিতে লাগিল।

সহসা যেন আমি চমকিয়া জাগিয়া উঠিলাম। উন্মাদের ন্যায় কক্ষের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া বন্ধুর রক্তে হস্ত-পদ রঞ্জিত করিয়া মীনার দেহ স্পর্শ করিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলাম, "মীনা! মীনা! বোন্! বোন্!" কেবল একটা অস্ফুট আর্তনাদ শোনা গেল। পরক্ষণে মীনার চেতনাহীন দেহ আমার হাতের উপর লুটাইয়া পড়িল।

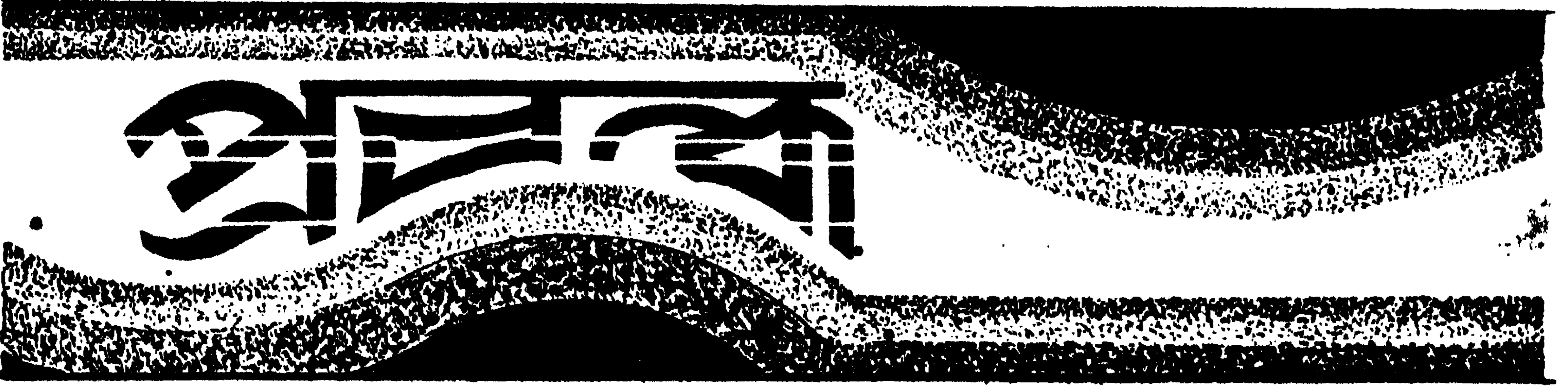
[ক্রমশঃ

আড়াল ভেঙ্গে

শ্রীমণিকান্ত হালদার

ঐ আকাশের আড়াল ভেঙে
ফুটবে না কি রঙীন্ আলো!
তাহারি সেই লীলায় আমার
ডুব্‌বে না কি আঁখির কালো?
তাই নীলিমার তোরণ-পানে
চাই ব'সে আজ শূন্য-প্রাণে,
মনের খোলা জান্‌লা দিয়ে
নিমেষগুলি সব ফুরালো!
ফুটবে না কি রঙীন্ আলো!

সোনার পাখায় রতন-গাঁথা
সোনার শাড়ী উড়িয়ে দিয়ে,
আসবে কি কেউ সোনার পরী
মুখে সোনার হাসি নিয়ে।
কোন উৎসবে জগৎ সেদিন
সোনার রঙে হবে রঙীন্,
আনন্দে তার ভাসবে নিখিল
সবই সবার লাগ্‌বে ভালো,
ফুটবে না কি রঙীন্ আলো!



১২০ গুপ্তাব্দের অপ্রকাশিত কলইকুড়ি তাম্রশাসন

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম.এ., পি. আর. এস., পি.এইচ.ডি.

প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে রাজশাহী জেলার অন্তর্গত নওগাঁর উকীল শ্রীযুক্ত রজনীমোহন সান্যাল কলইকুড়ি গ্রামবাসী জনৈক মুসলমান-গৃহস্থের নিকট হইতে একখানি লেখসমন্বিত তাম্রফলক ক্রয় করেন। কলইকুড়ি গ্রামটী নওগাঁ শহর হইতে আট মাইল দূরে বগুড়া জেলার সীমা মধ্যে অবস্থিত। পাঠোদ্ধারের জন্য তাম্রফলকখানি অবিলম্বে রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই দীর্ঘকাল মধ্যেও সমিতির কর্তৃপক্ষ কোন লিপিতত্ত্ববিদের সাহায্য লইয়া কলইকুড়ি তাম্রশাসনের পাঠ প্রকাশ করিতে সমর্থ হন নাই। তাম্রফলকের ক্রেতা রজনীবাবু এবং তাঁহার ভ্রাতা কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত গিরিজামোহন সান্যাল উভয়ে অবিলম্বে লিপিটীর পাঠ প্রকাশ করিতে, অন্যথা ফলকটী ফেরৎ পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া সমিতির কর্তৃপক্ষকে বার বার তাগিদ দিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হয় নাই। বিগত ফাল্গুন মাসের মধ্যভাগে আমি শ্রীযুক্ত সান্যাল মহাশয়দিগের নিকট হইতে উল্লিখিত কাহিনী অবগত হই। তাঁহারা আমাকে কলইকুড়ি তাম্রশাসনের দুই সেট প্রতিলিপি দিলেন এবং অবিলম্বে উহার পাঠ প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিলেন। পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে প্রতিলিপি দুইটী সুস্পষ্ট না হইলেও উহার সাহায্যে (অর্থাৎ মূল তাম্রফলকের সাহায্য ব্যতীত) লিপিটীর পাঠোদ্ধার অসম্ভব নহে। অতঃপর সপ্তাহকালের চেষ্টাতেই আমি কলইকুড়ি লিপির পাঠ ও ব্যাখ্যাসম্বলিত একটী প্রবন্ধ সমাপ্ত করিতে সমর্থ হই। সেই বিস্তৃত প্রবন্ধের মূলাংশ এস্থলে প্রকাশিত হইল।

কলইকুড়ির তাম্রশাসনটী একখানি মাত্র তাম্রফলকের উভয় পৃষ্ঠায় উৎকীর্ণ। ফলকের আকার ৯৷৷০ × ৫৷৷০ ইঞ্চি। ইহার প্রথম পৃষ্ঠায় ১৬ পঙ্‌ক্তি এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১৮ পঙ্‌ক্তি লেখ উৎকীর্ণ আছে। লিপির তারিখ ১২০ সংবৎসর; ইহা যে গুপ্ত সংবতের ১২০ অব্দ, অর্থাৎ ইংরেজী ৪৩৯ খ্রীষ্টাব্দ, তাহাতে সন্দেহ নাই। লিপিতে কোন রাজার উল্লেখ নাই; কিন্তু সকলেই অবগত আছেন যে এই সময়ে উত্তরবাংলা গুপ্তবংশীয় সম্রাট্ কুমার গুপ্তের (৪১৪-৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। লিপি, ভাষা ও বিষয়বস্তুর দিক হইতে বর্তমান তাম্রশাসনখানি বাইগ্রাম, পাহাড়পুর, দামোদরপুর ও নন্দপুরে আবিষ্কৃত এবং উত্তরবাংলার সহিত সম্পর্কিত পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর অন্যান্য তাম্রশাসনসমূহের অনুরূপ।

কলইকুড়ি লিপিতে শৃঙ্গবের বীথীর অন্তর্গত পূর্ণকোশিকা (বা পূর্ণকৌশিকা) হইতে অচ্যুত দাস নামক আয়ুক্তক এবং ঐ বীথীর অধিকরণ কর্তৃক তিনজন ব্রাহ্মণকে অক্ষয়নীবীস্বরূপ ভূমিদান সম্পর্কে হস্তিশীর্ষবিভীতকী, গুল্মগন্ধিকা, ধান্যপাটলিকা এবং সংগোহালি গ্রামের ব্রাহ্মণাদি কুটুম্বীদিগের প্রতি প্রদত্ত নির্দ্দেশ লিপিবদ্ধ আছে। উক্ত বীথীর অধিবাসী কুলিক ভীম এবং কতিপয় কায়স্থ ও পুস্তপাল পূর্ব্বোক্ত আয়ুক্তক এবং কয়েকজন বীথামহত্তর ও কুটুম্বীর নিকট আবেদন করেন। ঐ বীথীতে অক্ষয়নীবীদানের উপযুক্ত অপ্রতিকর পতিতক্ষেত্র প্রতিকুল্যবাপ দুই দীনার হিসাবে বিক্রীত হইত। আবেদনকারিগণ প্রার্থনা করেন যে ঐ হিসাব অনুসারে তাঁহাদের নিকট হইতে ১৮ দীনার মূল্য লইয়া ৯ কুল্যবাপ ভূমি বিক্রয় করা হউক; কারণ তাঁহারা ঐ ভূমি পুণ্ড্রবর্দ্ধন-

বাসী দেবভট্ট, অমরদত্ত এবং মহাসেনদত্ত নামক তিনজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রবর্ত্তনের জন্য অক্ষয়নীবী স্বরূপ দান করিতে ইচ্ছুক। অতঃপর কর্তৃপক্ষ আবেদন অনুযায়ী ভূমি বিক্রয় সম্ভব কি না তাহা পুস্তপাল-সংজ্ঞক কর্ম্মচারীর সাহায্যে স্থির করিলেন এবং আবেদন মঞ্জুর করা হইল। যে ৯ কুল্যবাপ ভূমি বিক্রীত এবং অক্ষয়নীবী স্বরূপ প্রদত্ত হইল, তন্মধ্যে ৮ কুল্যবাপ হস্তিশীর্ষবিভীতকী, ধান্যপাটলিকা এবং সংগোহালিক গ্রামে অবস্থিত ছিল; বাকী ১ কুল্যবাপ ধান্য-পাটলিকা গ্রামের উত্তর পশ্চিমাংশে বাটানদী এবং গুল্ম-গন্ধিকা গ্রামসীমার সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। পূর্ব্বোক্ত ৮ কুল্যবাপ মধ্যে আবার ২ দ্রোণবাপ (অর্থাৎ ।০ কুল্যবাপ) ছিল গুল্মগন্ধিকাগ্রামের পশ্চিমদিকে আম্রপথের পূর্ব্বে; বাকী ৭ কুল্যবাপ ৬ দ্রোণবাপ (অর্থাৎ মোট ৭৸০ কুল্যবাপ) হস্তিশীর্ষপ্রাবেশ্য তাপসপোতক ও দয়িতাপোত্তকে এবং বিভীতকপ্রাবেশ্য চিত্রবাতঙ্গরে অবস্থিত ছিল। শাসনের শেষাংশে ভবিষ্যৎকালের বিষয়পতি, আয়ুক্তক, অধিকরণিক, কুটুম্বী প্রভৃতিকে উক্ত অক্ষয়নীবী প্রতিপালন করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। হস্তিশীর্ষবিভীতকী সংজ্ঞক গ্রামসমষ্টির নাম হস্তিশীর্ষ এবং বিভীতক আখ্যাধারী দুই ব্যক্তির নাম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া বোঝা যায়।

এস্থলে সংক্ষেপে তাম্রশাসনে উল্লিখিত কতিপয় দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যাসম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। গুপ্তযুগে উত্তরবাংলার রাজশাহী-দিনাজপুর-বগুড়া অঞ্চল পুণ্ড্রবর্দ্ধন নামক ভুক্তি বা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই ভুক্তির রাজধানী পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর (অর্থাৎ বর্ত্তমান বগুড়া জেলার অন্তর্গত মহাস্থান) এই লিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে। ভুক্তিগুলি উপরিক প্রভৃতি কর্ম্মচারী দ্বারা শাসিত হইত। উহা বিষয় প্রভৃতি অংশে অর্থাৎ জেলায় বিভক্ত ছিল। বিষয় বা জেলার অংশের অর্থাৎ মহকুমার (অথবা বিষয় অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর প্রদেশাংশের) নাম ছিল বীথী। বিষয়-পতি শ্রেণীর কর্ম্মচারীরা বিষয়ের এবং আয়ুক্তক শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণ বীথীর শাসন পরিচালনা করিতেন। শাসন-কার্য্য পরিচালনায় তাঁহারা অধিকরণ বা শাসনসভার সাহায্য লইতেন। গ্রামাষ্টকুলাধিকরণ, বীথ্যধিকরণ, বিষয়াধিকরণ প্রভৃতি কতকটা আধুনিক যুগের ইউনিয়নবোর্ড, লোকাল বোর্ড, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতির অনুরূপ ছিল বলিয়া মনে হয়। অধিকরণের সদস্যগণকে অধিকরণিক বলা হইত; তাঁহাদের নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল কি না, তাহা জানা যায় না। মহত্তর বলিতে প্রধান অর্থাৎ মাতব্বরদিগকে বুঝাইত। কুলিক=শিল্পকর, কায়স্থ=লিপিকর, পুস্ত-পাল=দলিলপত্রাদির রক্ষক। কুটুম্বী=কৃষিব্যবসায়ী সাধারণ গৃহস্থ; অনেক ব্রাহ্মণও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কোন কোন স্থলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি কুটুম্বীদিগকে নিজেদের চাষের জমির বাহিরে শাসনোল্লিখিত ভূমি মাপিয়া দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান লিপিতে কুটুম্বীদিগের তালিকায় কতকগুলি স্বামী ও শর্ম্মান্তক নাম দেখা যায়। গুপ্ত রাজগণের স্বর্ণমুদ্রাকে দীনার এবং রৌপ্যমুদ্রাকে রূপক বলা হইত। ১৬টী রূপক এক দীনারের সমান ছিল। কুল্যবাপ আধুনিক মাপের আনুমানিক ১২৮ বিঘা এবং উহার অষ্টমাংশ দ্রোণবাপ আধুনিক মাপের আনুমানিক ১৬ বিঘা জমি বুঝাইত বলিয়া মনে হয়। অপর এক প্রকারের হিসাবে, কুল্যবাপ আনুমানিক ৪০ বিঘা এবং দ্রোণবাপ আনুমানিক ৫ বিঘা হয়; কিন্তু এই পরিমাপ গ্রহণীয় বোধ হয় না। প্রবেশ (অর্থাৎ কর বা আয়) শব্দ হইতে প্রাবেশ্য শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে; ইহা অধিকার-জ্ঞাপক। যথা, হস্তিশীর্ষপ্রাবেশ্য=হস্তিশীর্ষ নামক ব্যক্তির অধিকারভুক্ত। সাধারণতঃ অপ্রতিকর বলিতে নিষ্কর অর্থ অনুমান করা হইয়া থাকে; কিন্তু সম্ভবতঃ যে জমির জন্য কাহাকেও ক্ষতিপূরণ দিতে হইত না, তাহাকেই অপ্রতিকর বলা হইত। অক্ষয়নীবীর অর্থ চিরকাল ভোগের জন্য প্রদত্ত সম্পত্তি, অর্থাৎ আধুনিক কথায় ভোগোত্তর, দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর ইত্যাদি। অক্ষয়নীবীমর্য্যাদা=অক্ষয়নীবী সম্পর্কিত সুপ্রচলিত বিধি বা রীতি। পঞ্চমহাযজ্ঞ=নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ গৃহস্থের অবশ্য পালনীয় দৈনিক কর্ত্তব্যপঞ্চক। অধ্যাপন, তর্পণ, হোম, বলি এবং অতিথিপূজন, ইহাই পঞ্চ মহাযজ্ঞ। অনেক সময়ে ইহাকে বলি, চরু, বৈশ্বদেব, অগ্নিহোত্র এবং অতিথি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। আমার Select Inscriptions bearing on Indian History and Civilization নামক গ্রন্থে তাম্রশাসনাদিতে উল্লিখিত অনুরূপ দুরূহ শব্দসমূহের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা

কলইকুড়ি লিপিতে যে তিন জন ব্রাহ্মণের উল্লেখ দেখা যায় তাঁহাদের নামের শেষাংশ ভট্ট অথবা দত্ত। আজকাল বাঙালী ব্রাহ্মণসমাজে দত্ত পদ্ধতি দেখা যায় না। বাংলা অঞ্চলে আবিষ্কৃত প্রাচীন লিপিমালায় অনেক ব্রাহ্মণাখ্যার শেষাংশে আধুনিক বাঙালী কায়স্থগণের পদ্ধতি লক্ষ্য করিয়া ভাণ্ডারকর প্রমুখ পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে প্রাচীন যুগের অনেক ব্রাহ্মণ-পরিবার বর্ত্তমান বাঙালী কায়স্থসমাজের অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। এই সিদ্ধান্ত সমর্থনযোগ্য। কারণ কায়স্থ (লিপিকর) এবং বৈদ্য (চিকিৎসক) অবশ্যই বৃত্তি বা ব্যবসায়মূলক সম্প্রদায়। এই দুইটী বৃত্তি কোন নির্দ্দিষ্ট বর্ণে সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয় না। গুপ্ত যুগে শূদ্রগণের সামাজিক অবস্থা উন্নত হওয়ায় তাহারা বৈশ্যগণের সমান মর্য্যাদা লাভ করিয়া উহাদের সহিত মিশিয়া যাইতে থাকে। শূদ্রেতর অন্ত্যজ সম্প্রদায়গুলির কথা ছাড়িয়া দিলে তখন বর্ণগত পঙক্তিভোজন সম্পর্কিত কড়াকড়ি দেখা যায় না। অসবর্ণ বিবাহ যে অপ্রচলিত ছিল না, তাহারও প্রমাণ আছে। তাম্রশাসনাদি হইতে অনেক ক্ষেত্রে বৃত্তি বা ব্যবসায় অবলম্বন ব্যাপারে লোকের স্বাধীনতার আভাষ পাওয়া যায়। পশ্চিমাঞ্চলের একটী পট্টবস্ত্র-বয়নকারী শিল্পিশ্রেণীর বিষয় জানা যায়। পরবর্ত্তী কালে ইহার অনেক লোক ঐ তন্তুবায়ের ব্যবসাতেই টিকিয়া ছিল; কিন্তু কেহ কেহ আবার ধনুর্ব্বেদী, কথক, ধর্ম্মতত্ত্বব্যাখ্যাতা, জ্যোতিষী, যুদ্ধব্যবসায়ী বা সন্ন্যাসীর জীবন বরণ করিয়াছিল। যাহা হউক, গুপ্তযুগের প্রারম্ভের দিকেই সম্ভবতঃ কায়স্থ-সংজ্ঞক কর্ম্মচারীর উদ্ভব হয়; কিন্তু গুপ্তরাজগণের আমলে কায়স্থ 'সম্প্রদায়' গঠিত হয় নাই। বর্ত্তমান কলইকুড়ি লিপিতে কুলিক, কায়স্থ এবং পুস্তপালদিগকে কুটুম্বী অর্থাৎ কৃষিজীবী গৃহস্থগণ হইতে পৃথক্ ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু নবম শতাব্দীর রাষ্ট্রকূট লিপিতে বালভকায়স্থ-বংশ, দ্বাদশ শতাব্দীর গাহড়বাল লিপিতে শ্রীবাস্তব্যকুলোদ্ভূত-কায়স্থ প্রভৃতির উল্লেখ হইতে বোঝা যায়, যে মধ্যযুগের প্রথম ভাগেই কায়স্থগণ বৃত্তিমূলক শ্রেণীর পরিবর্ত্তে একটী সাম্প্রদায়িক জাতিতে পরিণত হইতেছিল। একাদশ শতাব্দীতে অলবীরুণীও বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে পঙক্তিভোজন সম্পর্কিত নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য সাম্প্রদায়িক শোণিত-পবিত্রতা রক্ষার দিকে বাঙালীর দৃষ্টি সে যুগে কতটা আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। কারণ, উনবিংশ শতাব্দীতেও ব্রাহ্মণাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাঙালীর মধ্যে অজ্ঞাতজাতিকুলশীলা ও পিতৃপরিচয়হীনা "ভরার মেয়ে" বিবাহ প্রচলিত ছিল। এমন কি, আজিও কৃষিজীবী সম্প্রদায়সমূহ হইতে বাঙালা কায়স্থ সম্প্রদায়ের এবং অযাজ্য সম্প্রদায়সমূহের স্বজাতীয় বা বিজাতীয় তথাকথিত পুরোহিত শ্রেণী হইতে উচ্চশ্রেণীর বাঙালী ব্রাহ্মণসমাজের অঙ্গপুষ্টি ঘটিতেছে বলিয়া মাঝে মাঝে অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়।

অনেকে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছেন, যে বাংলা অঞ্চলের প্রাচীন লিপিতে উল্লিখিত ব্রাহ্মণাদির নামের শেষাংশকে পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ না করিয়া নামৈকদেশরূপে লওয়া যাইতে পারে কি না। এ স্থলে সংক্ষেপে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। অনেকেই জানেন যে বাংলা দেশে হিন্দু-পদ্ধতিসমূহের অধিকাংশ পরিবারবর্গের একজন পূর্ব্ব-পুরুষের নামের শেষাংশ উত্তরপুরুষগণ কর্ত্তৃক নামান্ত হিসাবে অবলম্বনের ফলে উদ্ভূত হইয়াছে। গুপ্তযুগের কিয়ৎকাল পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ নামশেষ হইতে পদ্ধতির উদ্ভব আরম্ভ হইয়াছিল। গুপ্ত বংশের প্রথম পরিচিত ব্যক্তির নাম গুপ্ত; তাঁহার পুত্র ঘটোৎকচ। ঘটোৎকচের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার পর তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ সকলেই গুপ্তান্ত নাম গ্রহণ করিতে থাকেন। ফলে চন্দ্রগুপ্তের বংশ গুপ্তবংশ বলিয়া বিখ্যাত হয়। কিন্তু অনেককাল পরেও দেখা যায়, যে নামান্ত হইতে পদ্ধতিগঠন তখনও চলিতেছে। অষ্টম শতাব্দীতে দয়িতবিষ্ণু নামক একব্যক্তির বপ্যট নামে এক পুত্র জন্মে। বপ্যটের পুত্র গোপাল কর্ত্তৃক একটী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ পালান্ত নাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে গোপালের বংশ পালবংশ নামে পরিচিত হইল। সুতরাং প্রশ্ন এই, যে, প্রাচীন লিপির ব্রাহ্মণাখ্যা সমূহের মধ্যে অন্ততঃ কতকগুলির শেষাংশকে পদ্ধতি বলা যায় কি না, অর্থাৎ অন্ততঃ কোন কোন পরিবারে একই নামান্তের ব্যবহার স্থিরনির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল কি না। আমার বিবেচনায়, কোন কোন ব্রাহ্মণ-পরিবারে নির্দ্দিষ্ট নামান্ত বা পদ্ধতির ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত

করা চলে। দামোদরপুর লিপিমালা হইতে দেখা যায়, যে অনেক সময় কোন কর্ম্মচারীর নামান্তের সহিত তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের নামান্ত অভিন্ন। হিন্দু আমলে কর্ম্মচারী নিয়োগ অনেক ক্ষেত্রে পরিবারগত ছিল। আর একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যে-লিপিতেই আমরা কতকগুলি নামের লম্বা তালিকা পাই, সেখানেই দেখা যায় সমনামান্তবিশিষ্ট নাম সমূহ সাধারণতঃ পর পর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এক নামান্ত-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ একই পরিবারের অন্তর্গত না হইলে, নামগুলির এইরূপ একত্র সন্নিবেশের অর্থ করা দুরূহ। এই সম্পর্কে নিধনপুর তাম্রশাসনে ব্রাহ্মণাখ্যার সুদীর্ঘ তালিকা দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমান কলাইকুড়ি লিপির নামতালিকাতেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। এই লিপির কুটুম্বীদিগের নামান্তসমূহের সহিত অন্যান্য শাসনের কুলিক, পুস্তপাল, কায়স্থ, সার্থবাহ ও শ্রেষ্ঠীদিগের নামান্ত তুলনা করিলে মনে হয়, গুপ্তযুগের বাংলায় নামান্ত ব্যবহারে বর্ণগত ভেদ কম ছিল।

কলাইকুড়ি তাম্রশাসনের পাঠ

[প্রথম পৃষ্ঠা]

১। স্বস্তি (॥*) শৃঙ্গবেরবৈথেয়পূর্ণকৌশিকায়াঃ আয়ুক্তকাচ্যুতদাসো-
ধিকরণঞ্চ হস্তিশীর্ষ[বিভীতক্যাং গুল্মগন্ধি]-

২। [কায়াং] ধান্যপাটলিকায়াং সংগোহালিষু ব্রাহ্মণাদীন্ গ্রাম-
কুটুম্বিনঃ কুশলমনুবর্ণ্য বোধয়ন্তি (।*) বিদিতম্বো

৩। ভবিষ্যতি যথা ইহবীথীকুলিকভীম-কায়স্থপ্রভুচন্দ্ররুদ্রদাসদেবদত্ত-
লক্ষ্মণক × × বিনয়দত্ত (?)কৃষ্ণ-

৪। দাস-পুস্তপাল সিংহনন্দিযশোদামভিঃ বীথীমহত্তরকুমারদেবগণ্ড-
প্রজাপতিউমযশোরামশর্ম্মজ্যেষ্ঠ-

৫। দামস্বামিচন্দ্রহরিসিংহ-কুটুম্বিযশোবিষ্ণুকুমারবিষ্ণুকুমারভবকুমারভূতি-
কুমারযশ × গুবৈলিনক (?)-

৬। শিবকুণ্ডবসুশিবাপরশিবদামরুদ্রপ্রভমিত্রকৃষ্ণমিত্রযশশর্ম্মঈশ্বরচন্দ্ররুদ্র-
ভব × × × -

৭। শ্রীনাথহরিশর্ম্মগুপ্তশর্ম্মসুশর্ম্মহরিঅলাতস্বামিব্রহ্মস্বামিমহাসেনভট্টস্বাম্য
× × × রূপশ (?)-

৮। রুদ্রশর্ম্মকৃষ্ণদত্তনন্দদামভবদত্তঅহিশর্ম্মসোমবিষ্ণুলক্ষ্মণশর্ম্মকীর্ত্তিবিষ্ণুরু-
দ্রশর্ম্ম (?) গু-

৯। রু শর্ম্মসপ্ত পালিতকুক্কুটিবিশ্বশঙ্করজয়স্বামিকৈবর্ত্তশর্ম্মহিমশর্ম্মপুরন্দর-
জয়বিষ্ণু × × × ×

১০। সিংহ(দ*)ত্তবোন্দনারায়নদাসবীরনাগরাজ্যনাগগুহমহিভবনাথ-
গুহবিষ্ণুশর্ব্ববিষ্ণুবি × × × কুলদাস × × -

১১। শ্রীগুহবিষ্ণুরামস্বামিকামনকুণ্ডরতিভদ্রঅচ্যুতভদ্রলীঢকপ্রভকীর্ত্তি-
জয়দত্তকলিক(?)অচ্যুতনরদেবভব-

১২। ভবরক্ষিতপিচ্চকুণ্ডপ্রবরকুণ্ডশর্ব্বদাসগোপাল-পুরোগাঃ বয়ং চ
বিজ্ঞাপিতাঃ (।*) ইহ বীথ্যামপ্রতিকরখিলক্ষেত্র-

১৩। স্য শশ্বৎকালোপভোগায়াক্ষয়নীব্যা দ্বিদীনারিকাখিলক্ষেত্রকুল্যবাপ-
বিক্রয়মর্যাদয়া ইচ্ছেমহি প্রতি-

১৪। প্রতি মাতাপিত্রোঃ পুণ্যাভিবৃদ্ধয়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনকচাতুর্ব্বিদ্য-
বাজিসনেয়চরণাভ্যন্তরব্রাহ্মণদেব-

১৫। ভট্টঅমরদত্তমহাসেনদত্তানাং পঞ্চমহাযজ্ঞপ্রবর্ত্তনায় নবকুল্যবাপান্
ক্রীত্বা দাতুং এত্তিরেবোপ-

১৬। রিনির্দ্দিষ্টকগ্রামেষু খিলক্ষেত্রাণি বিক্রয়ে তদর্হথাস্মত্তঃ অষ্টাদশ-
দীনারান্ গৃহীত্বা এতান্নবকুল্যবাপা-

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠা]

১৭। ন্নু[পাদয়িতুং] (।*) যতঃ এষাং কুলিকভীমাদীনাং বিজ্ঞাপ্য-
মুপলভ্য পুস্তপালসিংহনন্দিযশোদা[ম্নোশ্চা ?]-

১৮। বধারণয়াবধৃত্বাস্ত্যয়মিহবীথ্যামপ্রতিকরখিলক্ষেত্রস্য শশ্বৎকালোপ-
ভোগায়াক্ষয়নীব্যা দ্বিদীনা-

১৯। রিক্যকুল্যবাপবিক্রয়োনুবৃত্তস্তদ্যয়তাং নাস্তি বিরোধঃ কশ্চিদিত্যবস্থাপ্য
কুলিকভীমাদিভ্যো [অষ্টাদশ]-

২০। দীনারানুপসংহরিতকানায়ীকৃত্য হস্তিশীর্ষবিভীতক্যাং ধান্য-
পাটলিকায়াং [সংগোহালিক ?]গ্রামেষু × × × × -

২১। স্যাং দক্ষিণোদ্দেশেষু অষ্টৌ কুল্যবাপাঃ ধান্যপাটলিকগ্রামস্য
পশ্চিমোত্তরোদ্দেশে [সন্তঃখাত]পরিখাবেষ্টিত-

২২। মুত্তরেণ বাটানদী পশ্চিমেন গুল্মগন্ধিকাগ্রামসীমানমিতি
কুল্যবাপ[মেকো] গুল্মাগন্ধিকায়াং পূর্ব্বে-

২৩। ণান্তপথঃ পশ্চিমপ্রদেশে দ্রোণবাপদ্বয়ং হস্তিশীর্ষপ্রাবেশ্যতাপস-
পোত্তকে দয়িত্তাপোত্তকে চ বি-

২৪। ভীতকপ্রাবেশ্যচিত্রবাতঙ্গরে চ কুল্যবাপাঃ সপ্ত দ্রোণবাপাঃ ষট্
এষু যথোপরিনির্দ্দিষ্টকগ্রামপ্র-

২৫। দেশেষ্বেষাং কুলিকভীম-কায়স্থপ্রভুচন্দ্ররুদ্রদাসাদীনাং মাতাপিত্রোঃ
পুণ্যাভিবৃদ্ধয়ে ব্রাহ্মণ-

২৬। দেবভট্টস্য কুল্যবাপাঃ পঞ্চ কু ৫ অমরদত্তস্য কুল্যবাপদ্বয়ং
মহাসেনদত্তস্য কুল্যবা[পদ্বয়ং]

২৭। কু ২ এষাং ত্রয়াণাং পঞ্চমহাযজ্ঞপ্রবর্ত্তনায় নবকুল্যবাপানি
প্রদত্তানি (।*) তদ্যুষ্মাকং × × × × ×

২৮। তি লিখ্যতে চ সমুপস্থিতকালে যেপ্যস্মে বিষয়পতয়ঃ আয়ুক্তকাঃ
কুটুম্বিনোধিকরণিকা বা সব্যব-

২৯। হারিণো ভবিষ্যন্তি তৈরপি ভূমিদানফলমবেক্ষ্য অক্ষয়নীব্যানুপালনীয়া (।*) উক্তঞ্চ মহাভারতে ভগব-

৩০। তা ব্যাসেন (।*) স্বদত্তাং পরদত্তাম্বা যো [হরেত বসুন্ধরাং (।*)] [স] বিষ্ঠায়াং ক্রিমিভূ র্ত্বা পি তৃ ভিঃ সহ পচ্যতে (॥*)] [ষষ্টিঃ বর্ষসহস্রাণি]

৩১। স্বর্গে মোদতি ভূমিদঃ (।*) আক্ষেপ্তা চানুমন্তা [চ] তান্যেব নরকে বসেৎ (॥*) কৃশায় কৃশবৃত্তয়ে বৃত্তিং × × × × × × (।*) [ভূমং ?]

৩২। বৃত্তিকরীন্দত্বা সুখী(?) উবতি কামদ(ঃ*) (॥*) [বহুভির্বসুধা] ভুক্তা ভুজ্যেত চ পুনঃ পুনঃ (।*) যস্য [যস্য যদা ভূ মস্তস্য তস্য]

৩৩। তদা ফলং (॥*) পূর্ব্বদত্তাং দ্বিজাতিভ্যো যত্নাদ্রক্ষ্য যুধিষ্ঠির (।*) মহীম্মহীমতাং শ্রেষ্ঠ দানাচ্ছে য়োনুপালনং (॥*)

৩৪। সম্বৎসরে ১০০ ২০ বৈশাখদি ১ (?)

এস্থলে আমরা উদ্ধৃত পাঠের ভাষা এবং ব্যাকরণগত অশুদ্ধ আলোচনা করিলাম না। স্থলান্তরে এই বিষয় আলোচিত হইবে। আশা করি পূর্ব্বালোচিত দুরূহ শব্দাবলীর ব্যাখ্যার সাহায্যে সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষে লেখটীর অর্থবোধে কোন বাধা হইবে না।

কলইকুড়ি তাম্রশাসনের ভাবানুবাদ

স্বস্তি। শৃঙ্গবের নামক বীথীর অন্তর্গত পূর্ণকোশিকা হইতে আযুক্তক অচ্যুতদাস এবং বীথীর অধিকরণ হস্তিশীর্ষবিভীতকী, গুল্মগন্ধিকা, ধান্যপাটলিকা ও সংগোহালিতে বাসকারী ব্রাহ্মণাদি কুটুম্বীদিগকে কুশলপ্রশ্ন করিয়া ঘোষণা করিতেছেন। তোমরা অবগত হও, যে এই বীথীর ভীম নামক কুলিক, প্রভুচন্দ্র, রুদ্রদাস, দেবদত্ত, লক্ষ্মণ, ক× ×, বিনয়দত্ত ও কৃষ্ণদাস নামক কায়স্থ এবং সিংহনন্দী ও যশোদাম নামক পুস্তপাল আমার এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের সমক্ষে আবেদন জানায় —বীথীমহত্তর কুমারদেব, গণ্ড, প্রজাপতি, উমযশা, রামশর্ম্মা, জ্যেষ্ঠদাম, স্বামিচন্দ্র ও হরিসিংহ, এবং কুটুম্বী যশোবিষ্ণু, কুমারবিষ্ণু, কুমারভব, কুমারভূতি, কুমারযশা, ×স্ত, বৈলনক, শিবকুণ্ড, বসুশিব, অপরশিব, দামরুদ্র, প্রভমিত্র, কৃষ্ণমিত্র, মঘশর্ম্মা, ঈশ্বরচন্দ্র, রুদ্রভব, × × × ×, শ্রীনাথ, হরিশর্ম্মা, গুপ্তশর্ম্মা, সুশর্ম্মা, হরি, অলাতস্বামী, ব্রহ্মস্বামী, মহাসেন, ভট্টস্বামী, × × × ×, রূপশর্ম্মা, কুষ্টশর্ম্মা, কৃষ্ণদত্ত, নন্দদাম, ভবদত্ত, অহিশর্ম্মা, সোমবিষ্ণু, লক্ষ্মণশর্ম্মা, কীর্ত্তিবিষ্ণু, ক্রমশর্ম্মা, শুক্রশর্ম্মা, সর্পপালিত, কুক্কুটি, বিশ্ব, শঙ্কর, জয়স্বামী, কৈবর্ত্তশর্ম্মা, হিমশর্ম্মা, পুরন্দর, জয়বিষ্ণু, × × × ×, সিংহদত্ত, বোন্দ, নারায়ণদাস, বীরনাগ, রাজ্যনাগ, গুহ, মহি, ভবনাথ, গুহবিষ্ণু, শর্ব্বসিংহ, বি × × ×, কুলদাস, × × শ্রী, গুহবিষ্ণু, রামস্বামী, কামনকুণ্ড, রতিভদ্র, অচ্যুতভদ্র, লীচক, প্রভুকীর্ত্তি, জয়দত্ত, কালক, অচ্যুত, নরদেব, ভব, ভবরক্ষিত, পিচ্চকুণ্ড, প্রবরকুণ্ড, শর্ব্বদাস এবং গোপাল। আবেদনটী এই—“এই বীথীতে চিরকালভোগার্থক অক্ষয়নীবী-হেতু অপ্রতিকর পতিত ক্ষেত্রের প্রতিকুল্যবাপ দুই দীনার মূল্য হিসাবে বিক্রয়ের চিরাচরিত রীতি অনুসারে আমরা আমাদের প্রত্যেকের মাতাপিতার পুণ্যবৃদ্ধির জন্য নয় কুল্যবাপ জমি কিনিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনবাসী বাজসনেয় চরণের চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ দেবভট্ট, অমরদত্ত ও মহাসেন দত্তকে পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রবর্ত্তনের জন্য দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। উপরিনির্দ্দিষ্ট গ্রামগুলিতে পতিত ক্ষেত্রসমূহ রহিয়াছে। অতএব আমাদিগের নিকট হইতে অষ্টাদশ দীনার গ্রহণপূর্ব্বক আমাদিগকে এই নয় কুল্যবাপ জমি বিলি করিতে আজ্ঞা হউক।” অতঃপর কুলিক ভীম প্রভৃতির আবেদন পাইয়া সিংহনন্দী ও যশোদাম নামক পুস্তপালদ্বয়ের হিসাবের বিবরণ দ্বারা কর্ত্তব্য স্থির করা হইল; উহা হইতে জানা গেল, “এই বীথীতে চিরকালভোগার্থক অক্ষয়নীবী-হেতু অপ্রতিকর পতিত ক্ষেত্রের প্রতি কুল্যবাপ দুই দীনার মূল্যে বিক্রয় প্রচলিত আছে; অতএব জমি দেওয়া হউক; ইহাতে কোন অসঙ্গতি নাই।” তখন কুলিক ভীমাদির নিকট হইতে স্বীকৃত অষ্টাদশ দীনার মূল্য লওয়া হইল। হস্তিশীর্ষবিভীতকী, ধান্যপাটলিকা ও সংগোহালিকগ্রামে × × × × দক্ষিণভাগে আট কুল্যবাপ এবং ধান্যপাটলিকগ্রামের পশ্চিমোত্তরাংশে বাটানদীর দক্ষিণে, গুল্মগন্ধিকাগ্রামসীমার পূর্ব্বে সন্তঃখাতপরিখাবেষ্টিত এক কুল্যবাপ; পূর্ব্বোক্ত আট কুল্যবাপ মধ্যে দুই দ্রোণবাপ (½ কুল্যবাপ) গুল্মগন্ধিকার পশ্চিমাংশে আম্রপথের পূর্ব্বে এবং বাকী সাত কুল্যবাপ ছয় দ্রোণবাপ (মোট ৭½ কুল্যবাপ) হস্তিশীর্ষের অধিকারভুক্ত তাপসপোত্তক ও দায়িতাপোত্তকে এবং বিভীতকের অধিকারভুক্ত চিত্রবাতঙ্গরে অবস্থিত—উপরি নির্দ্দিষ্ট গ্রামপ্রদেশসমূহে কুলিক ভীম এবং কায়স্থ প্রভুচন্দ্ররুদ্রদাসাদির পিতামাতার পুণ্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ দেবভট্টের পাঁচ কুল্যবাপ, অমর দত্তের দুই কুল্যবাপ এবং মহাসেনদত্তের দুই কুল্যবাপ ইঁহাদের তিনজনের পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রবর্ত্তনের জন্য মোট এই নয় কুল্যবাপ জমি প্রদত্ত হইল। অতএব তোমরা × × × × × ×। আরও লিখা যায়, যে

বর্ত্তমান কলিযুগে যে সকল বিষয়পতি, আযুক্তক, কুটুম্বী বা অধিকরণিক শাসনকার্য্যে অংশ গ্রহণ করিবেন, তাঁহারাও যেন ভূমিদানের ফল লক্ষ্য করিয়া অক্ষয়নীবীধর্ম্মানুসারে এই দান পালন করেন। মহাভারতে ভগবান্ ব্যাসও বলিয়াছেন, "স্বদত্তই হউক, আর পরদত্তই হউক, ভূমি যে ব্যক্তি বাজেয়াপ্ত করে, সে পিতৃপুরুষের সহিত বিষ্ঠায় ক্রিমি-রূপে জন্মিয়া পচিতে থাকে। ভূমিদাতা ষাট হাজার বৎসর স্বর্গে সুখভোগ করেন, আর বাজেয়াপ্তকারী এবং তাহার মন্ত্রণাদাতা তত কাল নরকে বাস করে। দরিদ্র এবং ক্ষীণবৃত্তি ব্যক্তিদিগকে বৃত্তি × × × × × × ; বৃত্তিকরী ভূমি দান করিয়া কামনাপূরণকারী সুখী হইয়া থাকেন। বহু নরপতি পৃথিবী ভোগ করিয়া গিয়াছেন এবং ক্রমাগত রাজগণ পৃথিবী ভোগ করিয়া যাইবেন; কিন্তু প্রদত্ত ভূমি যখন যাঁহার রাজ্যাধীন হয়, তিনিই তখন দানের ফল ভোগ করিয়া থাকেন। হে যুধিষ্ঠির, পূর্ব্বরাজগণের দেওয়া ভোগোত্তর যত্ন সহকারে রক্ষা করা উচিত। হে নৃপশ্রেষ্ঠ, স্বয়ং ভূমি দান করা অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের দান রক্ষা করা শ্রেয়ঃ।" ১২০ সংবৎসরের বৈশাখমাসের প্রথম দিবসে এই শাসন প্রদত্ত হইল।

পরিশেষে একটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেনের সদ্যঃপ্রকাশিত Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal নামক গ্রন্থের ভূমিকার একটী পাদটীকায় কলাইকুড়ি তাম্রশাসন সম্বন্ধে বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীরদবন্ধু সান্যাল মহাশয় রচিত একটী অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। উহা হইতে বোঝা যায়, যে সান্যালমহাশয় তাম্রশাসনের কিয়দংশ মাত্র পাঠ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সেই অসম্পূর্ণ পাঠ এবং উহার ব্যাখ্যারও অনেকস্থল ভ্রমপ্রমাদযুক্ত। Indian Historical Quarterly, March, 1943 দ্রষ্টব্য।

আশা

শ্রীহেমন্তকুমার তর্কতীর্থ

কৈশোরে সে যে জনম লভিল
কল্পনা মোর তনয়া,
যৌবনে তারে দিয়েছিনু আমি
তোমার চরণে সঁপিয়া!
তোমার শ্যামল রূপের মাধুরী
অভাগিনী সে ত জানে নাই,
প্রগতির দিনে প্রকৃতির দান—
লজ্জার বাধা মানে নাই।
অভিমানভরে কত দিন-রাত
কাটাইল তোমা' ছাড়িয়া,
বিজনে সখীর প্রণয়-নিবিড়
অঞ্চলখানি ধরিয়া—

শুধাইল কত গোপন-বারতা
স্বপন-মাখানো বাসনা
রঙিন মনের রঙ-মাখা যত—
সোহাগ-স্বরগ-রচনা।
সরস্বতীর মন্দিরদ্বারে
বিদ্বেষভরে গেল না,
লক্ষ্মীর সাথে পরিচয় তার
হ'ল না ক' হায় হ'ল না!

যতদিন চলে চলুক এ ভাবে;
যত দিন যাবে চলিয়া
স্বপনের সুখ শূন্যে মিলাবে
বেদনায় মন ছলিয়া!
অশ্রু-সলিলে চোখ যদি খুলে
ভেসে যাবে সব অভিমান,
ম্লান হবে যত জগতের রূপ
অপরূপ হবে তব দান।



বিজ্ঞান জগৎ

আপেক্ষিকতাবাদের শিক্ষা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম-এ

উপক্রমণিকা

আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ (Theory of Relativity) আটত্রিশ বৎসরের পুরানো কাহিনী হ'লেও শুধু এর নামের সঙ্গেই আমাদের দেশের জনসাধারণের যা' কিছু পরিচয়। শিক্ষিত সমাজেও এর বিষয়বস্তুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের দাবী করতে পারেন এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা বেশী নয়।

এর একটা কারণ, এই থিওরির গাণিতিক দুর্গমতা। স্বীয় মত প্রতিষ্ঠাকল্পে আইষ্টাইনকে উচ্চগণিতের গহন অরণ্য ভেদ ক'রে বহু লুপ্তপ্রায় পথের নূতন ক'রে আবিষ্কার করতে হয়েছে। এই সকল পথ, সাধারণের পক্ষে দূরের কথা, বিশিষ্ট গাণিতিকের পক্ষেও সহজগম্য নয়। তবু একথা বলতে পারা যায় যে, আপেক্ষিকতাবাদের মূলতত্ত্ব বোঝবার জন্য ওর গাণিতিক দুর্গমতায় প্রবেশের একান্তই প্রয়োজন হয় না। এই মতবাদ এত সর্ব্বজনীন এবং এর প্রয়োগক্ষেত্র এত ব্যাপক যে, একাধিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিষয়টার আলোচনা করা চলে। আমরা ওর সর্ব্বজনীনতাকে ভিত্তি ক'রে এবং কালোপযোগিতার দিকে লক্ষ্য রেখে মূল কথাগুলি উপস্থিত করতে চেষ্টা করবো।

কিন্তু বিষয়টা দুর্ব্বোধ্য হবার পক্ষে আরো একটা বিশিষ্ট কারণ এই যে, এই থিওরি গোড়াতেই আমাদের এমন সকল উদ্ভট কথা শোনায় যা' আমাদের অভ্যস্ত চিন্তাপ্রণালীর সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না। এই নূতন মতকে সহজ সত্য বলে অনুভব করতে হ'লে প্রচলিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত অনেক সংস্কার ও মতবাদকে মন থেকে একেবারে মুছে ফেলতে হয়। যা'কে চিরদিন ভেবে এসেছি একান্ত আপন বা স্বতঃসিদ্ধ সত্য তা'কে ভাবতে হবে নিতান্ত পর বা অলীক ব'লে। এ বড় কম ত্যাগ স্বীকার নয়। নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে, প্রতি পদে ভুল ক'রে, ভুলের সংশোধন করতে করতে এর বিচার প্রণালীর অনুসরণ করতে হয়। বিষয়বস্তু আয়ত্ত করবার পক্ষে এইটাই হ'ল সব চেয়ে বড় অন্তরায়। এই সকল বাধা-বিঘ্ন ঠেলে একে সাধারণের বোধগম্য করতে হ'লে বিজ্ঞানের 'ক' 'খ' থেকে কথা আরম্ভ করাই সমীচীন। কিন্তু তা'তে দোষ হয় এই যে, আলোচনা দীর্ঘ হওয়ায় পাঠকের পক্ষে তাল ঠিক রাখা কঠিন হয় এবং ধৈর্য্যচ্যুতিরও আশঙ্কা থাকে। সুতরাং আমাদের লক্ষ্য হবে, উভয় অবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে যথাসম্ভব সংক্ষেপে মূল কথাগুলি এবং আনুষঙ্গিক যুক্তিগুলি প্রকাশের চেষ্টা করা।

থিওরির লক্ষ্য

সংক্ষেপে বলতে পারা যায়, এই থিওরির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সার সত্যের অনুসন্ধান—পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাকে ভিত্তি ক'রে খাঁটি অ-খাঁটির বিচার দ্বারা জড় বিশ্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন। বিশ্বপ্রকৃতির দ্রষ্টা (Observer) হিসাবে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সত্যকার সম্বন্ধ কি, খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়মের লক্ষণ কি, কোন্ পথ ধ'রে অগ্রসর হ'লে ঐ সকল নিয়মের আবিষ্কার সম্ভব এই সকল এর গোড়ার কথা এবং থিওরিটা পরিণতির পথে অগ্রসর হয়েছে পুরাতন ও সঙ্কীর্ণ দেশব্যাপী নিয়ম সমূহের সংস্কার সাধন এবং ব্যাপক ও সর্ব্বজনীন নিয়ম সমূহের আবিষ্কার দ্বারা।

আপেক্ষিকতাবাদের শিক্ষা

এই মতবাদের স্পষ্ট ইঙ্গিত এই যে, প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর দ্রষ্টাগণের সম্বন্ধ কতকটা জননীর সঙ্গে সন্তানের সম্বন্ধের অনুরূপ। সুতরাং এক মাতৃত্বের অনুরোধে, আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ - দেশ-কাল-নির্ব্বিশেষে ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ। মানুষকে এই সম্বন্ধ স্বীকার ক'রে ও এর মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে চলতে হবে। কেবল পৃথিবীর মানুষেরই নয়, মঙ্গল, বুধ প্রভৃতি সকল জগতের সকল দ্রষ্টারই জননীর মর্ম্মবাণী সংগ্রহে প্রকৃতি-দত্ত সমান অধিকার রয়েছে। দ্রষ্টাগণের জগৎভেদ বা ঐ সকল জগতের আপেক্ষিক বেগ (পরস্পর সম্পর্কে ছুটো-ছুটি) প্রাকৃতিক রহস্য উদ্ঘাটনে বিন্দুমাত্র বাধা স্বরূপ উপস্থিত হয় না। এই অধিকারের ভিত্তিতে এবং প্রাকৃতিক নিয়মের সর্ব্বজনীনতাকে সম্বল ক'রে, পরস্পরের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠাই হবে সকল জগতের সকল দ্রষ্টার পক্ষে, দ্রষ্টা হিসাবে এবং প্রকৃতির সন্তান হিসাবে, সাধারণ কাম্য।

প্রকৃতির বাণী মূর্ত্ত হয়ে ওঠে প্রাকৃত ঘটনার প্রকাশভঙ্গীর ভেতর দিয়ে এবং বিবিধ সম্বন্ধের আকারে—ঘটনার বর্ণনা দান ও প্রাকৃতিক নিয়মের আবিষ্কারে দ্রষ্টাগণকে দেশ, কাল, বেগ, বস্তু প্রভৃতি সম্পর্কে যে সকল রাশির (পদার্থের দৈর্ঘ্য, ঘটনার কাল প্রভৃতির) পরিমাপ করতে হয় তাদেরই মধ্যে

বিভিন্ন সম্বন্ধের আকারে। এই সকল সম্বন্ধের প্রচলিত নাম 'প্রাকৃতিক নিয়ম' (Laws of Nature)। এইরূপ এক একটি সম্বন্ধ বা সম্বন্ধ প্রকাশক সূত্রই এক একটি প্রাকৃতির নিয়ম নির্দ্দেশ করে। নিয়ম আবিষ্কারের সাধারণ পদ্ধতি হচ্ছে পরস্পর-সম্বন্ধ ঘটনাবলীর পর্য্যবেক্ষণ, ওদের অন্তর্গত পরিবর্ত্তনশীল রাশিগুলির (দূরত্ব, কাল, বস্তু প্রভৃতির) পরিমাপ এবং বিচার বুদ্ধির সাহায্যে ঐ সকল রাশিকে যোগ বিয়োগ প্রভৃতি গাণিতিক চিহ্ন দ্বারা যথাযথভাবে সংযুক্ত ক'রে সূত্র গঠন, এবং এইরূপে ঐ ঘটনাবলীর অন্তর্গত সম্বন্ধটাকে একটা বিশিষ্ট 'আকার' প্রদান। নিয়মের আকার বলতে এই সকল সূত্রের বা ওদের রেখাচিত্রের আকারকেই বোঝায়। যে নিয়ম সকল জগতের সকল দ্রষ্টার কাছে, তাদের অবস্থা-বৈষম্য (ভৌগলিক ও ভৌতিক বৈষম্য) সত্ত্বেও একই আকারে আত্মপ্রকাশ করে তাকে বলা যায় দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ বা সর্ব্বজনীন নিয়ম। সেইরূপ যদি পরিমাপলব্ধ কোন রাশি, আপেক্ষিক বেগ সম্পন্ন সকল জগতের সকল দ্রষ্টার কাছে, একই আকারে আত্মপ্রকাশ ক'রে বা একই পরিমাণ জ্ঞাপন করে তবে ঐরূপ রাশি বা পদার্থকে বলা যায় দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ রাশি। ইংরেজিতে এদের বলা হয় Invariant. দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ নিয়ম ও দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ পদার্থের উদাহরণ আমরা পরে দেবো। অন্যপক্ষে, দ্রষ্টাভেদে বা দ্রষ্টার জগৎভেদে—তাদের আপেক্ষিক বেগের ফলে—যে সকল নিয়মের আকার বা যে সকল পদার্থের পরিমাণ (আমরা দেখবো দৈর্ঘ্য, বস্তু প্রভৃতি এই ধরণের রাশি,) বদলে যায় তাদের বলা যায় আপেক্ষিক বা ব্যক্তিগত সত্য। আপেক্ষিক সত্যও সত্য কিন্তু ওদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য হয়, কোন্ জগৎ বা কোন দ্রষ্টা সম্বন্ধে সত্য? নিরপেক্ষ সত্য সম্বন্ধে এরূপ প্রশ্ন ওঠে না এবং ওঠে না বলেই সকল জগতের কাছে ওদের সমান মর্য্যাদা। আপেক্ষিকতাবাদিগণ এই সর্ব্বজনীন সত্যেরই (দ্রষ্টা নিরপেক্ষ নিয়ম ও পদার্থের) সাধক এবং তাদের সাধনার পথও অগ্রসর হয়েছে এইরূপ লক্ষণ বিশিষ্ট নিয়মসমূহের আবিষ্কারে।

আইনষ্টাইনের মতে খাঁটি নিয়ম মাত্রেরই বিশিষ্ট লক্ষণ হচ্ছে দ্রষ্টা-নিরপেক্ষতা বা সর্ব্বজনীনতা—সকল জগতের সকল দ্রষ্টার কাছে, তাদের অবস্থা-বৈষম্য (আপেক্ষিক বেগ) সত্ত্বেও, একই আকারে আত্মপ্রকাশের জন্য উন্মুখতা। নিয়মের আকার বলতে বোঝায়—আমরা বলেছি—প্রাকৃত ঘটনা সম্পর্কীয় দেশ কাল প্রভৃতির সংযোজনের চিত্রটা। আমাদের বুঝতে হবে যে, এই সকল রাশির পরিমাপের ফল জগৎভেদে বদলে যেতে পারে—দেশ, কাল, বস্তু প্রভৃতি আপেক্ষিক ব'লে প্রতিপন্ন হ'তে পারে; কিন্তু ওদের সংযোগ সাধন ক'রে যে নিয়ম গড়ে ওঠে, ঠিকমত গড়তে পারলে দেখা যাবে যে, তার চিত্রটা সকল জগতের সকল দ্রষ্টার কাছে উপস্থিত হয় একই আকারে। এ কথা যেমন গতিবিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মসমূহ সম্পর্কে, সেইরূপ আলোক বিজ্ঞান, তাড়িত বিজ্ঞান, চৌম্বক বিজ্ঞান, প্রভৃতি পদার্থ-বিজ্ঞানের অন্তর্গত সকল নিয়ম সম্বন্ধেই খাটে, এবং যেমন পৃথিবীবাসীর পক্ষে, সেইরূপ আপেক্ষিক বেগসম্পন্ন অন্যান্য জগতের দ্রষ্টাগণের পক্ষেও সমভাবে খাটে। এক কথায়, খাঁটি নিয়ম মাত্রেই মুদ্রিত হয়ে রয়েছে পক্ষপাতিত্বের



আইনষ্টাইন

লেশমাত্র শূন্য সর্ব্বজনীনতার ছাপ। এইরূপ নিয়ম সমূহকেই গ্রহণ করতে হবে সত্যানের প্রতি জননীর শ্রেষ্ঠ দানরূপে, এবং ওরাই হবে সকল জগতের সকল দ্রষ্টার সাধারণ কাম্য। প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহকে সর্ব্বজনীন আকারে পাবার অনুরোধে যদি আমাদের পুরানো সংস্কারগুলি ত্যাগ করতে হয় বা দেশ, কাল, বস্তু প্রভৃতির সর্ব্বজনীনতার দাবি অস্বীকার করতে হয় তবে তা'তে কুণ্ঠিত বা পশ্চাৎপদ হ'লে চলবে না।

এই মতবাদ বিভিন্ন জগতের দ্রষ্টাগণের মধ্যে গোড়াতেই একটা বৈষম্য—ভৌগলিক ও ভৌতিক বৈষম্য—স্বীকার করে নেয় এবং এর ফলে যে, জগদ্দর্শন ব্যাপারে, দ্রষ্টাগণের মধ্যে, কোন কোন বিষয়ে, (দেশ, কাল প্রভৃতি সম্বন্ধে) দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ঘটতে পারে ও ঘটে, তাও স্বীকার করে নেয়। কিন্তু আপেক্ষিকতাবাদের বিচারে, এদের সম্বন্ধে মতভেদ একটা বড় কথা নয়। বড় কথা এই যে, এই মতানৈক্যগুলিকে পূর্ণমাত্রায় আমল দিয়েই, ওদের মধ্যে এমন সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব, যা'র ফলে খাঁটি প্রাকৃত নিয়মমাত্রই একটি সর্ব্বজনীন আকার গ্রহণ করতে পারে, এবং বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর-সম্পর্কে ধাবমান সকল জগতের সকল দ্রষ্টাই একটি সাধারণ জগতের অস্তিত্ব উপলব্ধি ক'রে একই বিশ্বপ্রকৃতির সন্তানরূপে পরস্পরে আলিঙ্গনবদ্ধ হতে পারে। আপেক্ষিকতাবাদের প্রধান শিক্ষা এই-ই এবং এইরূপ উদার মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ব'লেই ওর মহত্ব।

ওপরের কথাগুলি সংক্ষেপে এইরূপে প্রকাশ করা যেতে পারে। যদিও

প্রকৃতির বিধানে আমরা গ্রহ-নক্ষত্ররূপ বিভিন্ন জগতের অধিবাসী, যদিও এই সকল জগৎ যার যার অধিবাসিগণকে বক্ষে ধারণ ক'রে পরস্পর সম্পর্কে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে এবং ফলে কোন কোন ছোটখাটো বিষয় সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে অল্পবিস্তর পার্থক্য এসে পড়েছে, তবু খাঁটি নিয়মরূপে আমরা প্রকৃতির যে শ্রেষ্ঠ দানগুলি পাচ্ছি বা পেতে পারি, তাদের মূর্ত্তি সম্বন্ধে আমাদের ঐ সকল ভৌগলিক বা ভৌতিক বৈষম্য কোন মতভেদই সৃষ্টি করতে পারে না; পরন্তু ওদের আকার-সাদৃশ্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রেই যেন প্রকৃতি আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে, মূলতঃ আমরা একই জননীর স্নেহসম্পৃক্ত—ভাই-ভাই। পৃথিবীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্তের ব্যবধান দূরের কথা, কুটিরবাসী পরাণ মণ্ডল থেকে অ্যাণ্ড্রোমেডা নক্ষত্রের অধিবাসীর ব্যবধান বা ওদের আপেক্ষিক গতি এই ভ্রাতৃত্বের অনুভূতিতে বিন্দুমাত্র শিথিলতা আনতে পারে না। বহুত্বের ভেতর একত্বের, দূরত্বের পটভূমিকায় নৈকট্যের, বৈষম্যের অন্তরালে সাম্যের প্রতিষ্ঠাই আপেক্ষিকতাবাদের লক্ষ্য। এই জন্য এই মতবাদকে আপেক্ষিকতাবাদের পরিবর্ত্তে "বিজ্ঞানে সাম্যবাদ" বলাই সমীচীন।

নূতন ও পুরাতন মতের সংঘর্ষ

খাঁটি নিয়মের লক্ষণ সম্বন্ধে পুরাতন যুগেও একটা মত প্রচলিত ছিল — সে হচ্ছে নিয়মের সরলতা (Simplicity)। বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও বিজ্ঞান জগতে এইরূপ একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে, একই ব্যাপার সম্পর্কীয় নিয়ম, বিভিন্ন জগৎ থেকে আবিষ্কারের ফলে—শুধু ওদের বেগের জন্যই—বিভিন্ন আকার গ্রহণ করতে পারে ও ক'রে থাকে। এর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সরল আকারকেই গ্রহণ করতে হবে, ঐ নিয়মের খাঁটি আকার ব'লে, এবং যে জগৎ থেকে পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের ফলে নিয়মটা ঐ আকার গ্রহণে সক্ষম হয়েছে তাকেও প্রাধান্য দিতে হবে খাঁটি মানমন্দির ব'লে। অন্য পক্ষে আপেক্ষিকতাবাদ খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়মের বিভিন্ন মূর্ত্তি গ্রহণের সম্ভাবনামাত্রকে অস্বীকার ক'রে, সারল্যের পরিবর্ত্তে সর্ব্বজনীনতাকেই নিয়মের শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট লক্ষণ ব'লে নির্দ্দেশ করেছে এবং ফলে, আপেক্ষিক-বেগ সম্পন্ন সকল জগৎকেই খাঁটি মানমন্দিররূপে সমান মর্য্যাদা দান করেছে। বস্তুতঃ এই মত যেমন অভিনব, তেমনি উদার।

নূতন ও পুরানো মতের সংঘর্ষের কাহিনী এইরূপ। বহুকাল যাবৎ আমরা—পৃথিবীর অধিবাসিগণ—মহাশূন্যের ভেতর পৃথিবীকে একান্ত অচলারূপে কল্পনা ক'রে এবং ওর ঐ অবস্থাকে 'নিরপেক্ষস্থিতি' (Absolute Rest) নাম দিয়ে, বিশ্বদর্শন ব্যাপারে একমাত্র পৃথিবীকেই খাঁটি মানমন্দিরের মর্য্যাদা দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম। অন্যান্য জগৎ আমাদের দৃষ্টিতে বেগবান প্রতিপন্ন হওয়ায় তারা, আমাদের বিচারে, মানমন্দিরের মর্য্যাদা থেকে বঞ্চিত হলো, সঙ্গে সঙ্গে ওদের নিরপেক্ষবেগ (Absolute Velocity) বা নিরপেক্ষ গতির (Absolute Motion এর) কল্পনাও আমাদের মনে স্থায়িত্ব লাভ করলো। "মঙ্গলের নিরপেক্ষ বেগ" কথাটার অর্থ হলো শূন্য সম্পর্কে (বা শূন্যের ভেতর দিয়ে) মঙ্গল গ্রহের বেগ। এইরূপ বেগ পরিমাপের জন্য খাঁটি ভিত্তিভূমিরূপে (Frame of Reference) স্বীকৃত হলো একমাত্র পৃথিবী, যা' শূন্যের ভেতর একেবারে স্থির, সুতরাং যা'কে মহাশূন্যেরই একটা বিশিষ্ট চিহ্নরূপে গ্রহণ করে পরিমাপের ভিত্তিবিন্দু (Origin) বলে মনে করতে আমাদের কিছুমাত্র বাধা নেই। বৃহস্পতির অধিবাসীও অবশ্য তার জগৎ থেকে মঙ্গলের নিরপেক্ষ বেগ মাপতে পারে কিন্তু তা' পৃথিবীবাসীর মাপের সঙ্গে মিলবে না; কারণ আমাদের দৃষ্টিতে বৃহস্পতি চঞ্চল গ্রহ। সুতরাং মঙ্গলের বেগ সম্বন্ধে বৃহস্পতির বর্ণনাকে একটা নিছক আপেক্ষিক বেগের বর্ণনা ব'লে উপেক্ষা করতে হবে এবং ওর খাঁটি (নিরপেক্ষ) বেগের বর্ণনা দানের জন্য হয় বৃহস্পতিকে পৃথিবীতে নেমে এসে নূতন ক'রে মাপ-জোখ করতে হবে নয় ত মহাশূন্যে নিজের বেগটাকে (শূন্য সম্পর্কীয় বেগটাকে) কোন উপায়ে জেনে নিতে হবে এবং তার পরিমাপের ফলের সঙ্গে এর সংযোগ সাধন ক'রে তার আগেকার বর্ণনার সংশোধন ক'রে নিতে হবে। পৃথিবীবাসীও মঙ্গলের একটা আপেক্ষিক বেগই (পৃথিবী সম্পর্কীয় বেগ) নির্ণয় করে বটে, কিন্তু তার পক্ষে এরূপ কোন সংশোধনের প্রয়োজন হবে না, কারণ পৃথিবীর নিজস্ব (বা নিরপেক্ষ) বেগ কিছু নেই। সুতরাং পৃথিবীবাসীর মাপে মঙ্গলের যে বেগ ধরা পড়বে তা' একটা আপেক্ষিক বেগ হ'লেও মঙ্গলের নিরপেক্ষ বেগকেই নির্দ্দেশ করবে। এইরূপ চিন্তার ফলে বিজ্ঞান জগতে যেমন আপেক্ষিক স্থিতি ও গতির ধারণা, সেইরূপ নিরপেক্ষ স্থিতি ও গতির ধারণাও প্রতিষ্ঠা লাভ করলো এবং তার মধ্যে বিশেষ মর্য্যাদা লাভ করলো শেষোক্ত ধারণা দু'টো; কারণ পদার্থ বিশেষের বেগের বর্ণনায় বিভিন্ন জগতের দ্রষ্টাগণের পক্ষে একমত হবার সুযোগ রইলো নিরপেক্ষ স্থিতি ও গতির ধারণাকে অবলম্বন করেই। কিন্তু এ যুক্তিতে একটা ফাঁক রয়ে গেল এই যে, পৃথিবী বা অপর কোন জড়-দ্রব্য যে সত্যই মহাশূন্যের ভেতর একেবারে স্থির হয়ে রয়েছে (নিরপেক্ষ স্থিতির অবস্থা লাভ করেছে) তা' পরীক্ষালব্ধ সত্যকে ভিত্তি ক'রে জোর ক'রে বলবার মত কোন সুযোগই উপস্থিত হলো না; পরন্তু প্রত্যেক যুগের বৈজ্ঞানিকগণ, ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের স্কন্ধে ঐ কার্য্যের ভার ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত হ'তে চাইলেন। যাই হোক, পৃথিবীকে স্থিরত্ব দানের ফলে এইরূপ কল্পনা স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ালো যে, পৃথিবীবাসী আমরা জড় বিশ্বের যে চিত্র দেখছি ওই ওর একমাত্র খাঁটি চিত্র এবং পৃথিবী বেগহীনা বলে—ঐ চিত্রের ওপর ওর বেগের ছাপ পড়তে পায় না বলে—ওর সরলতম চিত্রও বটে। জ্যোতির্ব্বিদ টলেমির শিষ্যরূপে আমরা এই ধ্রুবা-কেন্দ্রিক (Geocentric) মত বেশ জোরের সঙ্গেই আঁকড়ে ধরেছিলেম। সে প্রায় আঠারো শ' বছরের পুরানো কথা।

কিন্তু কালক্রমে এই মত বদলে গেল। পৃথিবীর জ্যোতির্ব্বিদগণই দেখলেন যে, পৃথিবী থেকে পর্য্যবেক্ষণের ফলে মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহগণের গতিপথ বা গতিবেগ এমন জটিল আকার ধারণ করে যে, ওদের একটা সরল নিয়মের বা কোন একটা নিয়মের অন্তর্গত করা এক প্রকার অসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, মনোরথে চ'ড়ে সূর্য্যলোকে

উপস্থিত হ'লে এবং সেখান থেকে গ্রহগণের দূরত্ব মাপলে (অর্থাৎ পৃথিবীবাসীর পরিমাপকে, সূর্য্যের মুখ তাকিয়ে, যথাযথভাবে সংশোধন ক'রে নিলে) এই সকল অতি জটিল গতিবিধির মধ্যেও একটি সুন্দর শৃঙ্খলা ও সরল নিয়মের অস্তিত্ব আপনি ফুটে ওঠে। কারণ তখন দেখা যায় যে, ঐ সকল গ্রহ, পৃথিবীকে তাদের দলভুক্ত ক'রে নিয়ে এবং সকলেই সূর্য্যকে কেন্দ্র ক'রে, ভিন্ন ভিন্ন, অথচ সুনিয়ত মণ্ডলাকার পথে ঐ গ্রহপতিকে প্রদক্ষিণ কচ্ছে। সুতরাং কোপনিকস্ (১৪৭৩-১৫৪৩ খৃঃ) এই মত প্রচার করলেন যে, বিশ্বদর্শন ব্যাপারে, অন্ততঃ সৌরমণ্ডলের গ্রহগণের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণের জন্য, সূর্য্যদেহকেই গ্রহণ করতে হবে খাঁটি মানমন্দির রূপে। এই সূর্য্যকেন্দ্রিক (Heliocentric) মত প্রবর্ত্তনের ফলে পৃথিবীর বদলে সূর্য্যই সৌরজগতে অচল ভিত্তিভূমি (Absolute Fame of Reference) রূপে, অথবা অন্ততঃ অপেক্ষাকৃত অচল ভিত্তিভূমি রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীকে, তার স্থিরতার দাবি ত্যাগ ক'রে 'সচলা' রূপে প্রতিপন্ন হতে হলো। সুতরাং পৃথিবীর একটা নিরপেক্ষ বেগও (শূন্যের ভেতর বেগ) স্বীকৃত হলো, যা' কোন স্থির জগতের—বা সূর্য্য যদি সম্পূর্ণ নিশ্চল হন সূর্য্যের অধিবাসীর—মাপে নিশ্চয়ই ধরা পড়বে। পার্থিব দ্রষ্টার-মাপে গ্রহগণের ভ্রমণের নিয়ম যে এ যাবৎ এত জটিল আকার ধারণ করে এসেছে তার জন্য দায়ী করা হলো পৃথিবীর এই নিরপেক্ষ বেগটাকেই। ফলে এইরূপ কল্পনা প্রাধান্য লাভ করলো যে, কয়েকটি সৌভাগ্যবান জগৎ ছাড়া অন্যান্য প্রত্যেক জগতেরই এক একটা নিজস্ব বা নিরপেক্ষ বেগ রয়েছে যা' ওর মাত্রানুযায়ী ঐ সকল জগতের পরিমাপের ওপর প্রভাব বিস্তার ক'রে ওদের নিয়মের আকার অল্পবিস্তর বদলে দেয়। পৃথিবীর নিরপেক্ষ বেগ নিশ্চয়ই নগণ্য নয়, সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মসমূহকে আমরা কখনো সরলতম আকারে পাবার প্রত্যাশা করতে পারিনে,—অন্ততঃ বিনা সংশোধনে পারিনে। সৌরজগতে সূর্য্যের নিরপেক্ষ বেগ শূন্য পরিমিত বা অতি সামান্য, তাই গ্রহগণের গতিবিধি ঐ জগতে অত সরল আকার ধারণ করে। অন্যান্য প্রাকৃতিক নিয়মও যে ঐ জগতে অপেক্ষাকৃত সরল আকার ধারণ করবে এইরূপ প্রত্যাশাই স্বাভাবিক। এই ধরণের যুক্তির ফলে তখন থেকে আমরা সূর্য্যের অধিবাসীকেই প্রকৃতির বরপুত্র ব'লে মেনে নিয়ে, আমাদের অনুরূপ দাবি মন থেকে একেবারে ঝেড়ে ফেললাম এবং বিশ্বদর্শন ব্যাপারে সূর্য্যের অধিবাসিগণের সঙ্গে দৃষ্টি মেলাবার প্রয়োজন বোধে অভ্যস্ত হলাম। এই ত্যাগ স্বীকারের মূলে রইলো প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহকে সরল আকারে পাবার প্রতি একটা অনির্দ্দেশ্য আকর্ষণ।

এইরূপ কল্পনার একটা সুফল দেখা গেল এই যে, এর কিছুকাল পরেই এই সূর্য্যকেন্দ্রিক মতকে ভিত্তি করে কেপ্‌লার (১৫৭১-১৬৩০ খৃঃ) গ্রহগণের সূর্য্য প্রদক্ষিণ ব্যাপারে তিনটি সরল নিয়মের আবিষ্কারে সমর্থ হলেন যা কেপ্‌লারের নিয়ম নামে কথিত হয়ে থাকে। এই নিয়ম থেকে আমরা গ্রহগণের প্রদক্ষিণ পথের বা কক্ষার আকার এবং সূর্য্য থেকে যার যার দূরত্বের সঙ্গে যার যার প্রদক্ষিণ কালের সম্বন্ধ জানতে পারি। নিউটন (১৬৪২-১৭২৭ খৃঃ) কেপ্‌লারের নিয়মত্রয়কে একই সূত্রের অন্তর্গত ক'রে ওদেরকে আরো সংক্ষিপ্ত ও সরল আকার দান করলেন। নিউটন শিক্ষা দিলেন যে, প্রত্যেক গ্রহের ওপর সূর্য্যের অভিমুখে একটা বিশিষ্ট ধরণের 'বল' বা Force প্রযুক্ত হয়ে থাকে, যাকে বলা যায় মহাকর্ষণ-বল (Force of Gravitation) এবং এর জন্যই ওরা নির্দ্দিষ্ট কক্ষায় সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করতে বাধ্য হয়। তিনি এও প্রমাণ করলেন যে, প্রত্যেক গ্রহের বস্তুমান (mass) এবং দূরত্বের সঙ্গে ওর ওপর সূর্য্যের আকর্ষণ বলের একটা পরিমাণগত সম্বন্ধ রয়েছে এবং তা' এই যে, প্রযুক্ত বল ও দূরত্বের বর্গের পূরণফলটা গ্রহের বস্তুমানের সমানুপাতিক হয়ে থাকে। নিউটন এও প্রতিপন্ন করলেন যে, এই নিয়মের প্রয়োগক্ষেত্র কেবল সৌরমণ্ডলেই নয়, অন্ততঃ নক্ষত্র-জগৎ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং এই নিয়ম মহাকর্ষণের নিয়ম (Law of Gravitation) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই নিয়ম থেকে দেখা যায় যে, কোন গ্রহ বা নক্ষত্রকে মহাকর্ষণ-বলের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হ'তে হ'লে অন্যান্য জগৎ থেকে তাকে অসীম দূরে স'রে যেতে হবে। সূর্য্য এই প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নন, সুতরাং পৃথিবীর তুলনায় সূর্য্যকে অপেক্ষাকৃত অচল জ্যোতিষ্ক ব'লে স্বীকার করলেও মহাশূন্যের ভেতর ওকে সম্পূর্ণ নিশ্চল ব'লে গ্রহণ করা যায় না। নিউটন এইরূপ মত প্রকাশ করলেন যে, সম্পূর্ণ অচল জগতের সন্ধানে সুদূর নক্ষত্র রাজ্যের শরণাপন্ন হ'তে হবে। ওর আবিষ্কার কঠিন হলেও ঐরূপ জগৎ যে রয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

এইরূপে, যেখানে ছিল বিশৃঙ্খলা সেখানে এসে দাঁড়ালো সহজ সরল নিয়ম, যাদের আকার যেমন সংক্ষিপ্ত, প্রয়োগক্ষেত্রও তেমন ব্যাপক। ফলে সরলতাই যে, প্রাকৃতিক নিয়মের বিশিষ্ট লক্ষণ এবং সম্পূর্ণ স্থির (নিরপেক্ষ স্থিতির অবস্থাপন্ন) জগতে যে, নিয়ম সমূহকে সর্ব্বাপেক্ষা সরল আকারে পাওয়া যাবে তা' এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ সত্য রূপেই স্বীকৃত হলো। এইরূপে প্রাকৃত নিয়মের আকার-বৈষম্যকে গোড়াতেই মেনে নিয়ে এবং ঐ বৈষম্যকে ভিত্তি করে জগতে জগতে একটা প্রাদেশিকতা এবং দ্রষ্টায় দ্রষ্টায় একটা জাতিভেদ আপনি গড়ে উঠলো। প্রত্যেক জগৎকে তার স্থিরতার দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য এই অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হলো—প্রাকৃতিক নিয়মসমূহকে সরল আকারে লাভ করবার পক্ষে তার অধিবাসিগণের যোগ্যতা রয়েছে কতটা? কিন্তু কোন্ সূর্য্য বা কোন্ নক্ষত্র ঐরূপ দাবি জানাতে সত্যই সক্ষম আঠারো শ' বছরেও তার কোন মীমাংসা হ'ল না। আইনষ্টাইন্ এই জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটালেন নিরপেক্ষ স্থিতি (ও নিরপেক্ষ গতির) কল্পনাটাকেই অমূলক বা অর্থহীন বলে প্রচার ক'রে, এবং আপেক্ষিক বেগ সত্ত্বেও, প্রত্যেক দ্রষ্টার জগৎ যে তা'র কাছে একান্তই স্থির এই সহজ সত্যের ভিত্তিতে তার স্থিরতার দাবিকে পূর্ণমাত্রায় মেনে নিয়ে। এইরূপে প্রাকৃত ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ ও পরিমাপের জন্য, আপেক্ষিক বেগসম্পন্ন সকল জগতেই, স্থির ভিত্তিভূমি বা খাঁটি মানমন্দির রূপে সমান মর্য্যাদা প্রাপ্ত হলো। সঙ্গে সঙ্গে এও স্বীকৃত হলো যে জড়-জগতে আপেক্ষিক বেগ ভিন্ন অন্য কোন বেগের (নিরপেক্ষ বেগের) অস্তিত্ব নেই, সুতরাং জগৎ ভেদে, ঐরূপ কোন বেগের জন্য, খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়মের আকার বদলে যাবে তার কোন সম্ভাবনাও নেই। কেপ্‌লার ও নিউটনের নিয়ম সূর্য্যকে বস্তুতঃই স্থির এবং গ্রহগণকে বস্তুতঃই বেগবান্ রূপে কল্পনা ক'রে রচিত হয়েছে, সুতরাং ওরা ঠিক খাঁটি নিয়ম বলে গণ্য হতে পারে না। [ক্রমশঃ]

নীরব-বীণা

শ্রীনীহার দাশগুপ্তা, বি-এ

সেন সাহেব আফিস ঘরে বসিয়া দুই পাশে দুই পর্ব্বত-প্রমাণ আইন গ্রন্থের মাঝে মুখ গুঁজিয়া কি লিখিতেছিলেন। একটি কিশোরী কলেজে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বই-খাতা লইয়া পর্দ্দা সরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। আসমানী রঙের শাড়ী তাহার দেহলতা ঘিরিয়া স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য শতাধিক বর্দ্ধিত করিয়াছে। অণীতাকে সুন্দরী বলিতেছি, কিন্তু অনেকেই হয় ত বলিবেন না। অণীতা একটী পাথরে খোদা মূর্ত্তি নহে। তাহার দেহের রং মার্জ্জিত ও তাহাকে কৃশা বলিলেও ভুল হয় না। কিন্তু তাহার মুখমণ্ডলে এরূপ একটি লাবণ্য ছিল—যাহা সহজেই হৃদয় আকর্ষণ করে। এক জোড়া আয়ত চক্ষুর ভিতর দিয়া তাহার স্বভাবের কোমলতা ও নম্রতা প্রকাশ পাইত।

অণীতাকে দেখিয়া তাহার কাকা বলিলেন, "কি মা? আয় কাছে আয়! ক'দিন তোকে দেখি না কেন, ইস্ এত রোগা হ'য়ে গেছিস্—বড্ড পড়ছিস বুঝি? তোদের এগ্‌জামিন কবে?"

সেন সাহেব একা ছিলেন না। একটী যুবক সেই ঘরে বসিয়া পার্শ্বস্থ আলমারী হইতে পাড়িয়া একখানা ইংরাজী সাহিত্যের সমালোচনা পুস্তকে মনোনিবেশ করিয়াছিল। ঘরে ঢুকিতেই অণীতার দৃষ্টি এই যুবকটীর উপর পড়িল! অপ্রস্তুত হইয়া সে ফিরিয়া আসিবে কি না ভাবিতেছিল—এমন সময় কাকার আহ্বানে তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। তিনি সস্নেহে পিতৃহারা ভ্রাতুষ্পুত্রীর পৃষ্ঠে মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে সম্মুখে উপবিষ্ট যুবকটীর পানে তাকাইয়া বলিলেন, "শুভেন্দু, তুমি যদি রণিকে পড়িয়ে সময় পাও তবে ওকেও একটু দেখো। ও আমার খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে—তোমায় বেশী কষ্ট করতে হবে না।"

মিঃ সেনের কথায় সচকিত হইয়া যুবকটি অণীতার দিকে চাহিল। মুহূর্ত্ত পরে সেন সাহেবের দিকে ফিরিয়া ঘাড় নাড়িয়া স্বীকৃতি জানাইল।

অণীতা দুই হাত ললাটে ঠেকাইয়া তাহাকে নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে লীলাসুন্দর-গতিতে গাড়ীতে গিয়া বসিল। তাহার আজ কলেজ হইতে ফিরিতে রাত হইবে, একথা জানাইতে সে কাকার ঘরে গিয়াছিল; কিন্তু এই সব কথা-বার্ত্তার মধ্যে কিছুই আর বলা হইল না। এদিকে স্কুলযাত্রী দীপা, শ্যামল ও সমীর দিদির অপেক্ষায় গাড়ীতে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

বীরেন্দ্রকিশোর সেন পূর্ব্বে কলিকাতার কোনও এক কলেজে অধ্যাপক ছিলেন, পরে অধ্যাপনা ছাড়িয়া তিনি আইন ব্যবসা করিতে আরম্ভ করেন এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই বেশ পশার জমাইয়া ফেলেন। তিনি আচার ব্যবহারে পুরাদস্তুর সাহেব ছিলেন এবং মেলামেশাও করিতেন সাহেবী-ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে। কিন্তু ছোট বড় সকলের সঙ্গেই সমানভাবে মিশিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের স্বার্থপরতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সংসার সম্বন্ধে তিনি চিরদিনই উদাসীন ছিলেন। লাইব্রেরীগৃহে কাজ এবং অধ্যয়ন লইয়া থাকিতেন—সংসারের কোনও খবর রাখিবার প্রয়োজন অনুভব করিতেন না। অর্থ উপার্জ্জন করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন, কারণ সংসারের কোনও ব্যাপারে তাঁহার হস্তক্ষেপ করা, তাঁহার পত্নী পছন্দ করিতেন না। সেন-গৃহিণীর পরিচালনায় সেই ছোট পরিবারটির জীবন-যাত্রা সুন্দরভাবেই চলিত। বিশেষ লোকের সহিত বিশেষভাবে মেলামেশা, সাহেবীয়ানার কোনও ত্রুটী না ঘটে, পোষাক-পরিচ্ছদে পারিপাট্য ইত্যাদি কোনও বিষয়েই "মডার্ণ" নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারিত না। মিসেস্ সেনের কর্ত্তৃত্বের উপর কাহারও কথা বলিবার উপায় ছিল না—সকলেই নীরবে তাঁহার আদেশ মানিয়া চলিত। সেন-গৃহিণীকে বেশ "রাসভারী" লোক বলা যাইতে পারে। বহুদিন গৃহিণীর কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়া সেনমহাশয় বাড়ীর ভিতরে আসিলেই নিজের সত্তা হারাইয়া ফেলিতেন। স্ত্রীর সম্মুখে পড়িলে তিনি যে শুধু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিতেন তাহা নহে, চেষ্টা করিয়া একটু আবশ্যকের অধিক হাসিতেন, যেন তিনি স্ত্রীর প্রীত্যর্থে সব কিছুই করিতে প্রস্তুত। তাঁহার প্রস্থানের সঙ্গে

সঙ্গেই সেন সাহেবের মুখের হাসি মিলাইয়া যাইত—তিনি ভাবিতেন, দেবী আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হ'ন নাই তো ? কোনও অপরাধ করিয়া ফেলি নাই তো ? উপার্জ্জনের চেষ্টায় তাঁহাকে সারাদিন কাটাইতে হইত, সংসারের প্রতি উদাসীন তাঁহাকে থাকিতে হয়, অতএব তাঁহাকে গৃহমধ্যে একটু সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতেই হইবে ইহা তিনি বুঝিতেন। কোনও প্রতিকার নাই ভাবিয়া চুপ করিয়া থাকেন। সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গতি হইয়াছিল তাঁহার পুত্রকন্যা রঞ্জিত, শ্যামল ও দীপার। তাহারা মায়ের রুচী অনুযায়ী পোষাক পরিত, আহার করিত ও কথাবার্ত্তা বলিত। ইহাতে তাহাদের রুচিভেদের কোনও কথা উঠিতে পারে না—কারণ তাহারা আশৈশব এই আবহাওয়াতেই মানুষ। সেনমহাশয়ের মতামত বুঝা যাইত না, কারণ তিনি তাঁহার মত প্রকাশ করিতে সাহস পাইতেন না। মিসেস্ সেনের কড়া হুকুম ছিল যে, সকলেই ইংরাজীতে কথা বলিবে। মিঃ সেন পত্নীর সম্মুখে পুত্রকন্যার সহিত ইংরাজীতে কথা বলিতেন। আড়ালে মাতৃভাষায় কথা বলিয়া কিঞ্চিৎ আরাম পাইতেন বলিয়া মনে হয়। মিসেস সেন তাঁহার সাধের ইংরাজী প্রায়ই ভুল বলিতেন —কিন্তু সেদিকে তাঁহার লক্ষ্যমাত্র ছিল না। ভুল বলিয়াই তিনি সুখ পাইতেন। তাঁহার পুত্রকন্যারা লজ্জিত হইত—অতিথিরা হাসিত, সেনমহাশয় তাঁহার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতেন। যাহা হউক, মিসেস্ সেনের ভৃত্যেরা তাঁহাকে "মেমসাহেব" বলিয়া ডাকিত।

শুভেন্দু রায় এম-এ, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। ধনী-সন্তান রঞ্জিত সেনের ওরফে রণির লেখাপড়ায় কোনও দিনই মন ছিল না। দরিদ্র শুভেন্দু কিঞ্চিৎ অর্থাগমের ইচ্ছায় তাহাকে পড়াইবার ভার লইয়াছিল। সে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একটি রিসার্চ স্কলারশিপ পাইয়াছিল এবং সারাদিন গবেষণা লইয়া ব্যস্ত থাকিত। সন্ধ্যায় রণিকে পড়াইয়া মেসে ফিরিত। তাহার সরল ও অমায়িক ব্যবহারে সেন-পরিবারে সে অল্পকালের মধ্যেই বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। মিঃ সেন তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং পুত্রতুল্য দেখিতেন।

প্রত্যহই পড়াইবার সময় শুভেন্দু দরজার দিকে তাকাইত, যেন কাহারও আশায় তাহার অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠে। একদিন সে রণিকে বলিয়া ফেলিল, "কৈ তোমার বোনের পড়তে আসবার কথা ছিল যে ?"

রণি তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দিল, "আপনি বুঝি জানেন না, ও যে বড্ড ভীতু—আপনার কাছে পড়বে কি—লজ্জায়ই মরে যাবে। মেয়েগুলির এই লজ্জা আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।"

শুভেন্দু চুপ করিয়া রহিল—সেদিন আর কিছু বলিল না। শুভেন্দুর একান্ত আগ্রহে ও রণির ঠাট্টাতে অনীতা একদিন মনের সঙ্কোচ কাটাইয়া ধীরে ধীরে রণির পড়িবার ঘরে ঢুকিল। শুভেন্দু মুগ্ধদৃষ্টিতে তাহার সুন্দর মুখখানার দিকে চাহিয়া ভাবিল, "কৈ এতদিন এই বাড়ীতে আসছি এঁকে তো কখনও দেখি নি।"

অনীতাকে দেখিয়া রণি বলিয়া উঠিল, "এই যে এতদিনে পড়তে আসা হ'ল। মেয়ে মচকাবেন তবুও ভাঙ্গবেন না। জানেন স্যর, সেদিন ওকে আমি বললাম, আপনি ওকে পড়তে আসতে বলেছেন, তার উত্তরে বল্লে, আমার তো এমন কিছু বুঝবার দরকার নেই, প্রয়োজন হলে পরে যাব। ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ পেয়েছে কি না, তাই ধরাকে সরা জ্ঞান করে। ইউনিভারসিটি যে কেন এই মেয়েগুলিকে একচোখমী করে স্কলারশিপ দেয় বুঝি না।"

রণির মন্তব্যে অনীতা লজ্জায় জড়সড় হইয়া টেবিলের একপাশে বসিয়া পড়িল। শুভেন্দু সস্মিত হাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কোন স্কুল হ'তে ম্যাট্রিক পাশ করেছেন ?"

শুভেন্দু যে তাহারই দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকাইয়া আছে ইহা বুঝিতে পারিয়া অনীতা কোনও জবাব না দিয়া চুপ করিয়া রহিল। শুভেন্দু তাহার মৌনভাব দেখিয়া মনে মনে একটু আহত হইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি বুঝবার আছে ?"

অনীতা তাহার ইংরাজী পাঠ্যপুস্তকের একখানা বই দেখাইয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, "এই বইখানা এখনও আমাদের ক্লাশে পড়ানো হয় নি, আপনার অসুবিধে না হ'লে—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া মহা উৎসাহভরে শুভেন্দু বলিল, "না—না আপনি কোনও সঙ্কোচ না করে যখন যা দরকার বলবেন, আমি সাধ্যমত আপনাকে সাহায্য করব।"

[ক্রমশঃ

ভারতের প্রাচীন লৌহ-শিল্প

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

"প্রস্তর" হইতে লৌহ নিষ্কাসন-কার্য্য ভারতবর্ষে যে কতদিন চলিতেছে তাহা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায় না। তবে ইহা যে অতিশয় পুরাতন, এমন কি অন্যান্য জাতি এই বিদ্যা অবগত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে ভারতবাসী তাহা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা মনে করা অস্বাভাবিক নহে।* ভারতের প্রায় সর্ব্বস্থানে মাক্ষিক পাওয়া যাওয়াতে লৌহ-উদ্ধারকার্য্য খুব ব্যাপক ছিল।† ভারতের প্রায় সমস্ত জনপদে লৌহ-মল বা গাদ ছড়াইয়া রহিয়াছে, বিশেষতঃ ভারতের উত্তর অংশে এমন স্থান নাই যেখানে পুরাতন লৌহ-শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায় না।

ভারতের পুরাতন চুল্লী

পাথুরে কয়লার পরিচয় হইবার পূর্ব্বে কাঠ-কয়লার তাপে লৌহ-নিষ্কাসন করা হইত। সকল দেশেরই এই এক ইতিহাস। কিন্তু ভারতবর্ষের চুল্লী বা furnace-এর বিশেষ গঠন এবং তাহার কারিকরের বিশেষ জ্ঞান ভারতের লৌহকে লোভনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। কোনও কোনও আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভারতের চুল্লীর মধ্যে বিশেষত্ব কিছুই পান নাই; উপরন্তু ইহা কিছু কৃপা, কিছু অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে যে কালে এই চুল্লীর গঠন সম্ভব হইয়াছিল, তাহার তুলনামূলক হিসাব করা প্রয়োজন। তাহা ছাড়া হয় ত' পুরাতন চুল্লীর যে রূপ ছিল, তাহার বিকৃত সংস্করণ বর্ত্তমানে আমরা দেখিতে পাই। ভ্যালেন্টাইন বল (V. Ball) প্রভৃতি পণ্ডিতেরা মনে করেন, যেমন বর্ত্তমান জীবসকল প্রাচীনকালের বিরাটদেহ জীবজন্তুর ক্ষুদ্র সংস্করণ, সেইরূপ সে যুগের চুল্লী বিপরীত বিবর্ত্তনের ফলে আকারে হ্রস্ব হইয়াছে। পরে আবার বিজ্ঞানের যুগের আবির্ভাবের সঙ্গে নূতন কারখানা দেখা দিয়াছে।‡

ভারতের ইস্পাত

কেবল চুল্লীর গঠনের জন্য নয়, লৌহ-নিষ্কাসনের প্রাচীন কর্ম্মপন্থা লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাহা কোনও উন্নত প্রণালীর ক্ষুদ্র সংস্করণ। ভারতের ইস্পাত আবিষ্কার আজ এক বিস্ময়ের বস্তু। সেই জ্ঞান সেই শিল্প কি ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা বহু অনুসন্ধান দ্বারাও স্থির করিতে পারা যায় নাই। ভারতের ইস্পাতের সুখ্যাতি তাহার পর্ব্বত-সীমা পার হইয়া দূর-দূরান্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং বিদেশী বণিককে অর্থ-উপার্জ্জনের লোভ দেখাইয়া এ দেশে টানিয়া আনিয়াছিল। ইস্পাতের তেলিঙ্গা নাম উট্‌স্ (wootz); ইহাই যে দামাস্কাসের প্রসিদ্ধ তরবারি নির্ম্মাণের উপাদান ছিল এবং তাহা যে জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছিল, তাহা আজ অনেকেই বিশ্বাস করিবেন না।§ বিদেশী নিরপেক্ষ পণ্ডিতগণ ভারতীয়

(*) "In purity, and in antiquity of its working, the iron deposits of India ranks amongst the first of the world." W W. Hunter, C.S.I., C.I.E., LL.D.—Imp. Gaz. of India (1886) Vol. VI. p. 618.

"It appears probable that iron was first obtained from its ore in India"—Roscoe & Schorlemmer.

(†) Iron-smelting was at one time a widespread industry in India, and there is hardly a district away from the great alluvial tracts of the Indus, Ganges and Brahmaputra, in which slag heaps are not found." Rec, Geo. Sur, India—Vol. XXXIX (1904-8) p. 99.

(‡) "As in the animal world, the process of degeneration has produced forms which are but dwarfed representatives of their earliest progenitors, so it is with the rude smelting furnaces of the natives, which, though they may not now in some cases be much superior to those which the Celts erected on hill tops to catch the passing breezes, are probably to a great extent the lineal descendants of a system of iron manufacture, which in the earliest times of which we have any record must have been on a scale of considerable magnitude."

V. Ball—A Mannual of the Geology of India—Part III—Economic Geology p. 338

(§) If we take a survey of the systems of iron manufacture as practised by the natives of India, we meet here traces of what may be the remnants of higher systems of working than those now existing. They

ইস্পাতের গুণাগুণ সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়া না গেলে বিদেশীরা ভারতকে যে অসভ্য, বর্ব্বর, অজ্ঞ, শিল্পজ্ঞানহীন জাতি বলিয়া জগৎসমক্ষে প্রচার করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করা সম্ভব হইত না।

দামাস্কাসের তরবারি ভারতীয় ইস্পাতে নির্ম্মিত হইয়াছে, সুতরাং আরবদেশীয় শিল্পীর কৃতিত্ব প্রচার করে বলিয়া অনেকে ভারতের গৌরব ক্ষুণ্ণ করিতে চান। কিন্তু ভারতের প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্রাদি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতীয় "কর্ম্মকার" অপর দেশ হইতে হীন ছিল না। প্রাচীন শিল্পের ধারা বিদেশী উৎপাতের মধ্যেও যে আজ বাঁচিয়া আছে এবং পুরাতন কৃতিত্বের সাক্ষ্য দিতেছে, তাহাই এক মহান্ গৌরবের বস্তু।

বেদাদি গ্রন্থে উল্লেখ

ভারতীয় লৌহ ব্যবহারের কথা বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্যে ও মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখ আছে। সুশ্রুত-সংহিতায় শতাধিক ক্ষুরধার অস্ত্রের নাম এবং বিবরণ দেওয়া আছে।* চক্ষু, উদরের উপরিভাগ ও অভ্যন্তর, ভ্রূণ প্রভৃতি দেহের সমস্ত অংশেই অস্ত্রোপচারের জন্য এই সকল অস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহাদের তীক্ষ্ণতা ও সূক্ষ্ম ব্যবহারের উদ্দেশ্য হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, তাহারা বিশেষ গুণসম্পন্ন ইস্পাত দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। কোন কোনও অস্ত্র মনুষ্যকেশ লম্বালম্বিভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে সক্ষম ছিল। খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে মনুষ্যদেহের উপযোগী করিয়া চিকিৎসায় লৌহ ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।†

পুরাতন নিদর্শন

লৌহদ্রব্য জল হাওয়া মাটির সংস্পর্শে মরিচা ধরিয়া শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং অত্যন্ত পুরাতন দ্রব্যাদি পাওয়া যায় না। কিন্তু মাদ্রাজের তিনেভেলী জেলায় কয়েকটী সমাধি-ক্ষেত্র খনন করিতে করিতে যে সকল দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে, তাহার কাল নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার। তরবারি, ছোরা, বর্শা, ত্রিশূল, তীর, কোদালি, বর্ত্তিকা, আলনা, লোহার কড়ি (beam) প্রভৃতি দ্রব্য বহু সংখ্যক পাওয়া গিয়াছে। এই সমাধিস্থানগুলির মধ্যে আদিত্যানল্লুরস্থিত সমাধিই প্রধান; ইহা খনন করিয়া বহুবিধ তৈজসপত্রাদি উদ্ধার হইয়াছে। অনুমান, ইহাই ভারতবর্ষের সর্ব্বপুরাতন লৌহশিল্পজাত বস্তুর নিদর্শন।

পিপরাওয়া-স্তূপ

নেপাল সীমার অতি সন্নিকটে এবং পুরাতন কপিলবাস্তুর

are quite independent of obvious local differences as to the forms and size of the furnaces and the bellows, or difference in the nature, size and subsequent treatment of the bloom. First in importance is the manufacture of the cast steel, in crucibles, which attracted so much notice many years ago. For a time Indian *wootz* or steel was in considerable demand by cutlers in England. Its production was the cause of much wonderment and became the subject of various theories. The famous Damascus blades had long attained a reputation for flexibility, strength and beauty before it was known that the material from which they were made was produced in an obscure Indian village, and that traders from Persia found that it paid them to travel to this place, which was difficult of access in order to obtain the raw material.

There are reasons to believe that 'woo tz' was exported to the West in very early times—possibly 2,000 years ago."

V. Ball—Econ. Geo, Pt. III p. 339-340.

*। একশত একটী যন্ত্র (এস্থলে শত শব্দ অসংখ্যের বাচী)। মন ও শরীরের পীড়াদায়ক দ্রব্যকে শল্য কহে, শল্যসমূহের আহরণোপায়কেই যন্ত্র বলা হয়। যন্ত্র ছয় প্রকার: স্বস্তিকযন্ত্র, সন্দংশযন্ত্র, তালযন্ত্র, নাড়ীযন্ত্র, শলাকাযন্ত্র ও উপযন্ত্র। তন্মধ্যে স্বস্তিকযন্ত্র চব্বিশ প্রকার, সন্দংশযন্ত্র দুই প্রকার, তালযন্ত্র দুই প্রকার, নাড়ীযন্ত্র কুড়ি প্রকার, শলাকাযন্ত্র আটাইশ প্রকার এবং উপযন্ত্র পঁচিশ প্রকার। এই সকল প্রায়ই লৌহ নির্ম্মিত যন্ত্র, উপযন্ত্রের সমস্তই লৌহব্যতীত দ্রব্যাদি, যথা দন্ত, শৃঙ্গ, দারু, তন্তু প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত।

শস্ত্র বিংশতি প্রকার, যথা মণ্ডলাগ্র, করপত্র, বৃদ্ধিপত্র, নখশস্ত্র, মুদ্রিকা, উৎপলপত্র, অর্দ্ধধার, কুশপত্র, আটীমুখ, শরারিমুখ, অন্তর্মুখ, ত্রিকূর্চ্চক, কুঠারিকা, ব্রীহিমুখ আরা, বেতসপত্র, বড়িশ, দন্তশঙ্কু ও এষণী।

(সুশ্রুত সংহিতা সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়)

(†) যাঁহারা বেদ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থাদিতে লৌহের ব্যবহারের বিশেষ বিবরণ জানিতে চান তাঁহারা E. R. Watson M.A (Cantab), B Sc. (Lond.) I.E.S. লিখিত "A Monograph on Iron & Steel Works in the Province of Bengal (1907) pp. 1-5 এবং P. Neogi, M.A., F.C.S লিখিত "Iron in Ancient India"—Bulletin No. 12 (1914) of The Indian Association for the Cultivation of Science পুস্তক দুইখানি সযত্নে পাঠ করিবেন।

চৌদ্দ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত পিপরাওয়া-স্তূপ খনন করিয়া একটী বর্ষাফলক, দুইটী পেরেক ও একটী বক্র ছড় বা শিক্ পাওয়া গিয়াছে।* ইহা খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম বা দ্বিতীয় শতকের শিল্প বলিয়া স্বচ্ছন্দেই মনে করা যাইতে পারে।

বুদ্ধগয়ার মন্দিরের মধ্যেও লৌহের এবং লৌহ-মল বা গাদের নিদর্শন বর্ত্তমান আছে।

দিল্লী স্তম্ভ

পুরাতন শিল্পের মধ্যে যাহা বাঁচিয়া আছে, তন্মধ্যে কুতব-মিনারের নিকট স্তম্ভটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা রৌদ্রবৃষ্টি, হিম শিশিরের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া ভারতের অদ্ভুত জ্ঞানের পরিচয় দিতেছে। দামাস্কাস-তরবারির ইস্পাতের কথা যদি বিদেশী বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক লিখিয়া থাকে, দিল্লীর স্তম্ভের কথা তদপেক্ষা অধিক স্থানে আলোচিত হইয়াছে এবং সকলেই যে বহুমুখে তাহার প্রশংসা করিয়াছে তাহা নহে, ভারতের প্রাচীন বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা-বিমিশ্রিত ঈর্ষ্যা বা দ্বেষের পরিচয়ও দিয়াছে। দেশে বা বিদেশে প্রাচীন লৌহ-শিল্প সম্বন্ধে যিনিই লিখিয়াছেন, তিনিই দিল্লীর স্তম্ভের কথা অল্পবিস্তর লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।† ইহার গাত্রে মরিচা ধরে নাই বলিয়া প্রধান বিস্ময়ের কারণ হইলেও ২৩ ফুট ৮ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ৬ হইতে ৮ টন ওজনের লৌহপিণ্ডকে কি করিয়া আকৃতি দেওয়া সম্ভব হইয়াছিল, তাহাও বিস্ময়ের অপর এক কারণ।‡ কিছুকাল পূর্ব্বেও এই বিরাট পিণ্ড লইয়া কাজ করিবার যন্ত্রপাতি ইউরোপের বড় কারখানায় ছিল না। কেহ কেহ মনে করেন, স্তরের পর স্তর বিভিন্ন খণ্ড সাজাইয়া স্তম্ভটী নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহাই যদি হইয়া থাকে, লৌহ জোড়া দিবার জ্ঞান ও কৃতিত্ব কত বিরাট ছিল যে বিভিন্ন স্তরের সংযোগ-স্থলে চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান নাই।

অনেকের ধারণা স্তম্ভটী নানা রকম খাদ মিশ্রণের ফলে মরিচার কবল হইতে মুক্ত। বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে, ইহা বিশুদ্ধ লৌহ ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে; অন্য কোনও প্রকার ধাতু-সংস্পর্শের লেশমাত্র নাই।§ তাহাও যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রাচীন হিন্দুদের অপর দিকের জ্ঞান সম্বন্ধে আমরা কিছু ধারণা করিতে পারি।

ধর স্তম্ভ

দিল্লীর স্তম্ভ যেরূপ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, মধ্য-ভারতের মালোয়া (মালব) স্থিত স্তম্ভটী সে হিসাবে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ৪৩ ফুট ৮ ইঞ্চি পরিমাণ, সুতরাং দিল্লীর স্তম্ভ হইতে অনেক দীর্ঘ। বর্ত্তমানে ইহা তিন অংশে বিভক্ত হইয়া তিন স্থানে পড়িয়া আছে, সুতরাং সাধারণতঃ ইহা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে না। কিন্তু ইহাও যে হিন্দুস্থানের এক গৌরবময় নিদর্শন, সে বিষয়ে কোনও বিতণ্ডা নাই।¶ এই সঙ্গে রাজপুতানার আবু পর্ব্বতের স্তম্ভের কথাও একবার স্মরণ করা প্রয়োজন।

(*) P. Neogi—'Iron in Ancient India' p.13 (Journal of the Royal Asiatic Society, 1898, pp. 573-88 and 588. Do 1899, p. 570 and in the Indian Antiquary 1907). Vol. XXXVI, p. 117.

(†) "The iron pillar, which stands in the centre of courtyard of the Kutub Mosque at Old Delhi, is a solid shaft of iron, 23 ft. high. Mr. Fergusson assigns to it the mean date of A.D 400 and observes that it opens our eyes to an unsuspected state of affairs to find the Hindus at that age capable of forging a bar of iron larger than any that has been forged in Europe up to a late date, and frequently even now. After an exposure of fourteen centuries, it is still unrusted, and the capital and inscription are as clear and as sharp as when the pillar was first created,"—Geo. C. M. Birdwood, C.S.I., M.D. (Edin)—The Industrial Arts of India p. 154.

(‡) "To this day, the method by which it was produced is a mystery greater than the Pyramids"—L. Fraser in Iron and Steel in India, p. 1.

(§) সার রবার্ট হ্যাড্‌ফিল্ড (Sir Robert Hadfield) এই লৌহের বিশদ বিশ্লেষণ করিয়া ইহাতে ৯৯·৭২০ লৌহ; কার্ব্বণ সিলিকা ·০৪৬, সল্‌ফার (গন্ধক) ·০০৬ ও ফস্‌ফরাস্ ·১১৪ পাইয়াছেন। ইহাতে বিন্দুমাত্র ম্যানগানিজ নাই।

"Analysis of the iron have been made.........it consists of pure malleable iron without any alloy. It has been suggested that this pillar must have been formed by gradually welding pieces together. If so, it has been done very skilfully. Since no mark of such welding are to be seen."—V. Ball—Econ. Geo. pt III. p. 339.

(¶) Vincent Smith (Journal of the Royal Asiatic Society, 1898) ধর-স্তম্ভ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "While we marvel at the skill shown by the ancient artificers in forging a

মন্দিরাদিতে লৌহ

প্রাচীন মন্দিরাদিতে লৌহের থাম, ছড় বা bar বাঁধনের জন্য নানাবিধ "কোণ" (angle) প্রভৃতি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধ গয়া, ভুবনেশ্বর, পুরী, কোণারক প্রভৃতি স্থানের মন্দিরে বিভিন্ন কার্য্যে নানা আকারে লৌহ ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই সকল প্রমাণ হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, বিদেশী নানা উপদ্রবের মধ্যেও ভারতে লৌহ-শিল্পের ধারাবাহিকতা একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই। মুসলমান আমলে আসামে বৃহদাকার কামান তৈয়ারী হইয়াছে, বাঙ্গালার মধ্যেও এই সকল কামান তৈয়ারী হইত সেরূপ প্রমাণের অভাব নাই। বাঙ্গালার স্থানে স্থানে বিশেষতঃ মুর্শিদাবাদে এই জাতীয় কামান বা আগ্নেয়াস্ত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আধুনিক যুগে অর্থাৎ ইংরেজ আমলেও ভারতীয় লৌহের বিশেষ গুণ সম্বন্ধে দেশবিদেশের লোক অবহিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইংলণ্ডে ব্যবহারের প্রয়োজনে ভারতীয় লৌহ লইয়া গিয়া নিজেদের কারখানায় ঢালাই প্রভৃতি করিয়া তাহারা কার্য্যোপযোগী করিয়া লইত। ওয়েল্‌সে মেনাই প্রণালীর উপর পুল নির্ম্মাণ করিবার সময় ভারতীয় লৌহ এখান হইতে আমদানী করা হইয়াছে বলিয়া বহু প্রমাণ আছে।*

ভারতের প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্রাদির উপর যে সকল শিল্পের পরিচয় এখনও কোনও রকমে টিকিয়া আছে তাহাতে ভারতীয় লৌহ-শিল্প সম্পর্কিত অপরাপর জ্ঞানেরও অদ্ভুত নিদর্শন রহিয়াছে। লৌহের উপর অক্ষর বা মূর্ত্তি খোদাই, মূল্যবান্ ধাতু প্রস্তরাদিযুক্ত বা নিবদ্ধ করার বিদ্যায় (মীনার কাজে) তাহারা বিশেষ পারদর্শী ছিল। ইংরেজ আমলেও দেশের মধ্যে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রাদি ব্যতিরেকে একটা জাতির প্রয়োজনের সমস্ত দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া লইত।

পূর্ব্বাভাষ

ভারতে আধুনিক কলকারখানা দ্বারা লৌহ নিষ্কাষণের পূর্ব্বে বিদেশীরা এখানকার লৌহ দ্বারা নিজেদের প্রয়োজন মত ঢালাই প্রভৃতি করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিত। মেনাই প্রণালী সংক্রান্ত লৌহের রপ্তানীর কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই সকল কার্য্যের জন্য তাহারা স্ব স্ব কারখানা স্থাপন করিয়াছিল। উড়িষ্যার বালেশ্বর অঞ্চলে তাহাদের কারখানার উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে।‡ এই সময় তাহারা প্রাচীন প্রথায় নিষ্কাষিত লৌহ ঢালাই করা ব্যতীত অন্যদিকে মন দেয় নাই। ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ সকলের মধ্যেই তখন বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিয়াছে; ক্রমে ইহার সূত্র ধরিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নূতন কারখানা স্থাপনের চেষ্টা চলিতে থাকে। এই সকল চেষ্টার মধ্যে আমরা তাহার পূর্ব্বাভাষ দেখিতে পাই।

great mass of the Delhi pillar, we must give a still greater measure of admiration to the forgotten craftsmen who dealt so successfully in producing the still more ponderous iron mass of the Dhar pillar.—"(Vide p. 27, Neogi's "Iron in Ancient India").

(*) "Its (Indian iron's) superiority is so marked that at the time when the Britannia Tubular Bridge across Menai Straits was under construction preference was given to the iron produced in India.........". T. H. D. La Touche—An Annotated Index of Minerals of Economic Value, p. 233.

(†) In many towns in India, chiefly the sites of former capitals, iron work still attains a high degree of artistic excellence. The manufacture of arms, whether for offence or defence, must always be an honourable industry; and in India it attained a high pitch of excellence, which is not yet forgotten. The magnetic iron-ore, found commonly in the form of sand, yields a charcoal steel which is not surpassed by any in the world. The blade of the Indian *talwar* or sword is sometimes marvellously watered, and engraved with date and name; sometimes sculptured in half-relief with hunting scenes; sometimes shaped along the edge with teeth or notches like a saw. Matchlocks and other fire-arms are made at several towns in the Punjab and Sind, at Monghyr in Bengal (now in Behar) and at Vizianagram in Madras.

"Chain armour, fine as lacework..........is still manufactured in Kashmir, Rajputana and Cutch. Ahmadnagar is famous for its spearheads. Both fire-arms and swords are damascened in gold, and covered with precious stones.

Hunter—Imp. Gaz. of India, Vol. VI. p. 606.

(‡) "The earliest reference to the manufacture of iron in Orissa dates back to 1708. It is Capt. Hamilton ('A New Account of the East Indies, Vol. I, p. 392) who says that iron was so plentiful at Balasor that anchors were cast there is moulds, but that they were not so good as those made in Europe. It is not stated by whom the process of working in cast iron was introduced, but there were at the time factories belonging to the English, Dutch and French. In all probability this was the first locality in India where the manufacture of iron by the English method was introduced."

V. Ball.—Econ. Geology, Pt. III p. 361.

বহুরূপী

শ্রীকাশীনাথ চন্দ্র

আপনারা শান্তিপুরেরচরের মতিরায়ের 'রূপসজ্জা' দেখেছেন? দেখেন নি? তা'হলে আর দেখতে পাবেন না। কেন না, আজ কয়েক বছর হ'ল মতিরায় মারা গেছে।

আমি দেখেছি। সত্যিকথা বল্‌তে গেলে বল্‌তে হয় ছেলেবেলায় আমি বহুরূপী মতিরায়ের জন্যে এক রকম একটি একটি করে দিন গুণতাম। দুর্গাপূজার প্রায় মাস-খানেক আগে সে আমাদের গ্রামে আসত। আমি সমস্ত বছরটা তার আসা-পথ চেয়ে কাটাতুম। বহুরূপী মতিরায়কে আমি প্রথম যখন দেখি, তখন আমার বয়স খুব কম, বোধ হয় বছর পাঁচেক। তখন আমরা দেশের বাড়ীতে। কি জানি কি একটা কারণে বাবা ক'লকাতার বাসা তুলে দিয়ে হঠাৎ আমাদের দেশে নিয়ে গিয়ে তুলেছিলেন। নিজে কিন্তু ক'লকাতার মেসেই থাকতেন। তবে হ্যাঁ, প্রত্যেক শনিবারের দিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ী যেতেন।

তখন শীতকাল; বাড়ী যাবার দিন চার পাঁচ পরে একদিন বিকেলের দিকে আমাদের বাড়ীর সামনেকার রোয়াকটায় বসে ছোট ভাইটিকে খেলা দেবার নামে কাঁদাবার চেষ্টা করছিলাম। মা আমাদের কাছ থেকে একটু দূরে বসে রোদ্দুরের দিকে পিঠ দিয়ে চুল শুখোচ্ছেন আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে কাঁথা সেলাই কি এই রকম ধরণের কী একটা কাজ করছেন। এমন সময় আমাদের বাড়ীর উঠানের মধ্যে একদল ছেলে হুড়মুড় করে এসে ঢুকল, আর তাদের পিছনে পিছনে একটা বিশ্রী কদাকার লোক এসে ঢুকল। লোকটার গায়ে হাজার রকম টুকরা দিয়ে তৈরী এক প্রকাণ্ড আলখাল্লা, মাথায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লম্বা চুল; দুই কাণে দুটো বড় বড় লোহার বালা, নাকটা চ্যাপটা, একটা চোখের একটা মণি প্রায় চোখের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। কাঁধে বাঁক, সেই বাঁকের দু'ধারে দুটো বড় বড় বেতের ঝাঁপি, এক হাতে একটা প্রকাণ্ড গোখরো সাপ, আর এক হাতে তুবড়ী বাঁশী। লোকটা উঠানে পা দিয়েই তার তুবড়ী বাঁশীটা বাজাতে সুরু করেছিল। হঠাৎ এক সময়ে বাঁশী বাজান থামিয়ে সে হাতের সাপটাকে দোলা'তে দোলাতে চীৎকার করতে লাগল, "দেখো বাবা মা-মনসার বাহন দেখো"—বলেই সুর করে গাইতে লাগল,—

> "কেন আইল নিদির ঘোররে আইল নিদির ঘোর
> কালনাগিনী কেটেছে আজ সোনার লখিন্দর রে
> সোনার লখিন্দর"—

আমি ভয় পেয়েছিলুম; লোকটার বীভৎস আকৃতি, বিকৃত কণ্ঠস্বর, তার ওপর হাতের প্রকাণ্ড সাপ একটা পাঁচ বছরের ছেলেকে ভয় পাইয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। ভয় পেয়ে মার কাছে সবে যেতেই মা আমাকে তাঁর কাছে টেনে নিয়ে বল্‌লেন, "ভয় পেয়েছিস্, নারে খোকা"—

মার কাপড়ের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বল্‌লুম, "হুঁ, কত বড় সাপ"—মা আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে হেসে বল্‌লেন, "দূর বোকা ছেলে, ও-যে রবারের সাপ। শোন শোন কেমন খাসা গান গাইছে—"

আমাদের মাতাপুত্রের কথা বহুরূপীর কাজে বাধা দেয় নি। সে মহানন্দে হাতের সাপটাকে নানারকম ভঙ্গীমায় দোলাতে দোলাতে গাইছিল,—

> "কলার মান্দাস 'বেনিয়ে' দাও গো শ্বশুর সওদাগোর
> সেই মান্দাসে চড়ে যাবে 'বেউলো' লখিন্দর;"—

তারপর আবার কিছুক্ষণ তুবড়ী বাঁশী বাজিয়ে হাতের সাপটাকে প্রচণ্ড এক ঝাঁকানি দিয়ে আবার সুরু করল,—

"দেখো বাবা, মা মনসার বাহন, দেখো। কেমন করে বেউলো সতী বাসর ঘরে বিধবা হল দেখো।"—

> "মাতালি পর্ব্বত সেথা, লোহারি বাসর রে লোহারি বাসর
> তারি মাঝে থাকে বসে বেউলো লখিন্দর—"

উন্নুন্‌···

মুখে একটা বিশ্রী শব্দ করার সঙ্গে সঙ্গে সে আমাদের বাড়ী ছেড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলের দলও চলে গেল। আমি তখনও ভয়ে থর্ থর্ করে কাঁপছিলাম। আগের দিন রাত্রে সদুঠাক'মা রূপকথা শুনিয়েছিলেন, "লালকমল, নীল-

কমল"। লালকমল যে রাক্ষসটাকে তালপাতার খাঁড়া দিয়ে কেটে ফেলেছিল, সেটাই যেন হঠাৎ বেঁচে উঠে এতক্ষণ আমাদের উঠানে দাপাদাপি সুরু করেছিল। মা আমার ভাব দেখে আমায় সাহস দেবার জন্যে বার বার বলতে লাগলেন, "দূর বোকা ছেলে, ভয় করতে আছে"—তার পরের দিনও বহুরূপী আমাদের বাড়ী এসেছিল, কিন্তু সে-দিন আর সে সাপুড়ে সেজে আসে নি, এসেছিল মেয়েমানুষ সেজে। আমাদের বাড়ীর উঠানে পা দিয়েই ডাকল, "কই গো মাঠাকরুণ, বছর পরে গিরিবালা এসেছে"—বলেই হাতের করতালি বাজাতে বাজাতে গেয়ে উঠল,—

"আমার নাম গিরি গয়লানী ছিটে কোঁটা কতই জানি।"

সঙ্গীত শাস্ত্রে আমি কোন কালেই পারদর্শী নই, তখন ত' ছিলাম ছেলেমানুষ, তবু সে-দিন গিরিগয়লানীর গান আমার কাণে দূরাগত কোকিলের স্বর বলে মনে হয়েছিল।

সেই আমি বহুরূপীকে প্রথম দেখি। কিন্তু প্রথম দিন থেকেই সে যে আমায় কি ভাবে যাদু করেছিল তা' জানি না, কিন্তু সেই প্রথম দিন থেকেই, বিশেষ করে তার করতালি বাজিয়ে গান গাহিবার ভঙ্গীমাটুকু আমার খুবই ভাল লেগেছিল, তাই তার গান শোনবার জন্যে আমাকে প্রতি বৎসর দিন গুণতে হ'ত।

বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সম্বন্ধে সকল খবরই সংগ্রহ করেছিলাম। তার বাড়ী কোথায়, কি জাতি, নাম কি, এই সব। কেন করেছিলাম তা' বলতে পারব না, তবে করেছিলাম। আমাদের গ্রামের স্কুলটা মাইনর স্কুল। সুতরাং সেখানকার গণ্ডী পার হতে আমার খুব বেশী দেরী লাগে নি। কয়েক বছরের মধ্যেই সেখানকার পড়া শেষ করে আমি আবার ক'লকাতায় ফিরে এলাম।

ক'লকাতার পারিপার্শ্বিক অবস্থার এমন একটা গুণ আছে যে, সে সহজেই গ্রাম্য জীবনের কথা ভুলিয়ে দেয়। আমারও আমার গ্রাম্য জীবনের কথা ভুলে যেতে দেরী হল না। এখানে কত নট-নটীর গান শুনলাম, কত ওস্তাদের, কত কালোয়াতের গান শুনলাম, কতবার কত রকম অভিনয় দেখতে গিয়ে কত বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন লোকের রূপসজ্জা দেখলাম এবং সে ভিড়ের মধ্যে আমার গ্রাম্য বহুরূপীটি কোথায় হারিয়ে গেল। তাকে আমি একেবারেই ভুলে গেলাম। তার গান শোনবার জন্য যে এককালে উন্মুখ হয়ে বসে থাকতাম, সে কথা তখন আর মনেই পড়ে না।

আরও কয়েক বছর পরের কথা। তখন আমি রেঙ্গুনে চাকুরী করি। কিছুদিন যাবৎ মা চিঠির পর চিঠিতে তাগাদা দিচ্ছিলেন যে, তাঁর বয়েস হয়েছে, কবে আছেন কবে নেই, তার ঠিক নেই। এখন সকলের মত তাঁরও আন্তরিক ইচ্ছে যে, তিনি পৌত্রমুখ দর্শন করে তবে স্বর্গলাভ করবেন। কিন্তু আমি তাঁর যে অবাধ্য ছেলে এবং যেহেতু বিবাহ-ব্যাপারটাকে আদৌ আমি আমল দিতে চাই না, তাতে তাঁর আজীবনের বাসনা বোধ হয় অপূর্ণই থেকে যায়।

বিবাহ করার মত বুদ্ধি হয়েছিল কি না জানি না, কিন্তু বয়স হইয়াছিল। তাই একদিন মায়ের অপূর্ণ মনস্কামনাকে পূর্ণ করবার জন্য দেশে ফিরে এলাম। সেই সময় একদিন এক বাল্যবন্ধুর সঙ্গে গ্রামদেবতা রাধাবল্লভের মন্দিরের পাশে ইন্দুমাধব ঘোষের দোকানে দাঁড়িয়ে পাণ খাচ্ছি, এমন সময় একটি নারী এসে সেই দোকানে প্রবেশ করল। প্রথম দৃষ্টিতে না বুঝতে পারলেও একটু পরে বুঝতে পারলাম যে, আসলে সে স্ত্রীলোক নয়, পুরুষ, নারীর ছদ্মবেশ ধারণ করেছে।

লোকটা দোকানের মধ্যে পা দিয়েই বলল, "কই গো দোকানদারকর্ত্তা, গিরিবালা আজ আবার তোমায় দেখতে এসেছে। বছর পরে তোমার জন্য মনটা যেন বড্ডই কেমন করতে লাগল, তাই ভাবলাম যে যাই কর্ত্তাকে একবার দেখেই আসি। তা' কই গো মুখখানা না হয় একবার বার কর"—বলেই করতালিতে ঠুং ঠাং আওয়াজ করে গান সুরু করল—

আমার নাম গিরিগয়লানী
ছিটে কোঁটা কতই জানি—

এ গানটা আমার মনে ছিল। সুতরাং চিনতে দেরী হল না। তবু যেন মনে হল, আমি যে গিরিগয়লানীকে চিনতাম এ যেন সে নয়, তার কঙ্কাল। বন্ধু বললে, "হাঁ করে কি দেখছ বল ত' ও মেয়েমানুষ নয় পুরুষ।"

উত্তর দিলাম, "তা' জানি, আর জানি বলেই ত' দেখছি—"

"কি, শুনি—"

"ওর মেক আপ"—

বন্ধু তাচ্ছিল্য সহকারে বল্‌ল, "হুঁ ভারী ত' চোটের 'মেক আপ' তার আবার দেখবে কি? আমাদের এখানকার ঘোষ কোম্পানী অপেরাপার্টিতে যে ওর চেয়ে ভাল মেক আপ করে। মুখে খুবখানিক রং ধ্যাবড়ালেই বুঝি মেক আপ হয়?"

বল্‌লাম, "না হে না, এখন বুড়ো হয়ে গেছে তাই, নয় ত' ও এককালে নামজাদা বহুরূপী ছিল—"

বন্ধু ঠোঁট উল্টে বল্‌ল, "ছাই, ওতো সেই "মতে বউরূপী", চিরকালই দেখছি ঐ এক সাজ—"

বহুরূপী আমাদের কথায় কাণ না দিয়ে ঈষৎ আর্দ্রস্বরে বল্‌তে সুরু করল, "মা বাপ নাম রেখেছিল গিরিবালা, বর জুটেছিল যেন কলির কার্তিক, তা কি বলব কর্ত্তা বরাতে সইল না, সতের বছর বয়সে বিধবা হলাম। নবদ্বীপের শ্যামা-দাস বাবাজী তুক-তাক করে ঘর ছাড়িয়ে সেবাদাসী করে সঙ্গে নিয়ে গেল, কিন্তু লোকটার কি আক্কেল। কুড়ি বছর বয়সেই আমায় বলে কি না বুড়ী, তাই চলে এলাম—" বলেই আবার গান ধরলে—

"ভোমরা, কে তোমারে চায়"

গান শেষ করে বল্‌লে, "কইগো বিদায়টা দাও, আবার পাঁচ জাগায় যেতে হবে—"

বিদায় দেবার সময়েই গোলমাল সুরু হল। দোকানী দু'পয়সার বেশী দেবে না, বহুরূপীও চারটে পয়সার কম ছাড়বে না। শেষ পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে হাতাহাতি হবার উপক্রম। বন্ধু আমায় এক ধাক্কা দিয়ে বল্‌ল, "ওর আবার কি শুনছ, চলে এস, শ্রাদ্ধ এখনও অনেক দূর গড়াবে—"

পরদিন সকালে কি একটা কাজে ষ্টেশনে গিয়েছি, দেখি একটা চায়ের দোকানে বসে বহুরূপী বসে বসে চা খাচ্ছে। তখন তার রূপসজ্জা ছিল না। তাই এগিয়ে বল্‌লাম, "এই কি বহুরূপের স্বরূপ নাকি—"

সে আমায় চেনে না, চেনা তার পক্ষে সম্ভবও নয়। তবু চায়ের গেলাস শুদ্ধ হাতখানা কপালে ঠেকিয়ে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, এই স্বরূপ—আসুন—"

দোকানীকে এক পেয়ালা চা দিতে বলে তার কাছে গিয়ে বস্‌লাম, বল্‌লাম, "কাল আপনি সেজেছিলেন বেশ, আর করতালিও যা বাজান চমৎকার—"

সে খুশী হয়ে বল্‌ল, "আর কি সেদিন আছে ম'শায়, বয়েস হয়ে গেছে। ব্যবসাতেও মন্দা ধরে গেছে। দুটো চারটে পয়সার জন্যে আর সাজতে ইচ্ছে করে না। তাই আজকাল সাজলে লোকে বলে সং সেজেছে।" একটু থেমে আবার বলতে সুরু করল, "তখনকার দিনে কি আর এরকম লোকের দরজায় দরজায় ছুটোছুটি করে বেড়াতাম বাবুম'শায়! তখনকার সে সব দিন ছিল কি রকম। রাজা মহারাজা জমীদারদের বাড়ী সব যাওয়া হত, সাজ দেখাব শুনলে তাঁরা সব আদর করে ডেকে নিতেন, থাকবার খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতেন, আর সে সব খাওয়া কি—চোব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়—একরকম রাজভোগ বললেই হয়। তিন দিন সাজ দেখান হত—হুকুম হলে পরে কখন কখন চার পাঁচদিনও দেখান হত। বিদায়ের দিন পঞ্চাশ, একশ বক্‌শিস্, শাল দোশালা এই সব দিয়ে গুণীলোকের গুণের আদর করতেন। আর এখন দুটো পয়সার জন্যে টানা-হেঁচড়া করতে হয়। সে সব দিন কি আর আছে—সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই"—একটু থেমে আবার বল্‌ল, "এ ব্যবসা ছেড়েই দিতাম, কিন্তু কি করি, নিজের পেটটাও আছে তারপর একটা আইবুড় মেয়ে গলায় ঝুলচে। বামুনের ঘরের মেয়ে, তাকে ত' আর রাখা চলে না। দেন না বাবু মশায়, একটা পাত্তর দেখে—"

পাত্র অনুসন্ধান করবার প্রতিশ্রুতি দিতে হল। তারপর আরও বছর দুই কেটে গেছে। আমি রেঙ্গুন থেকে ক'লকাতায় হেড-অফিসে বদলী হয়ে এসেছি। একদিন অফিসের কি একটা কাজে রাণাঘাট যেতে হয়েছিল। কাজ সেরে ষ্টেশনে এসে দেখি ফেরবার গাড়ীর তখনও ঘণ্টা-খানেক দেরী। কাজে কাজেই মধ্যাহ্নের স্নানাহারটা ষ্টেশনের সামনের পবিত্র হিন্দু হোটেলেই সারব স্থির করে তাদের দ্বারস্থ হয়ে পড়লাম। স্নান সেরে খেতে বসতে গিয়ে দেখি কয়েক বছর আগেকার গিরিগয়লানী-বেশধারী ব্রাহ্মণ আমার ভাতের থালা নিয়ে আসছে। বিস্মিত হয়ে বললাম, "রায় ম'শায়!"

ব্রাহ্মণ থমকে আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌ল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই—কি করি বলুন, পেটের জ্বালা বড় জ্বালা।"

"কেন, আপনার আগেকার পেশা—"

ব্রাহ্মণ সখেদে বল্‌ল, "সে আর চলল না, বলে সং দেখে আবার পয়সা দেয় কে?"

খেতে বসলাম, ব্রাহ্মণ একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল। খেতে খেতে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার মেয়ে—তার বিয়ে হয়ে গেছে?"

ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে বল্‌ল, "তার বিয়ে দেবার দরকার হয় নি বাবুম'শায়, বিয়ের আগেই মা আমার আমায় ফাঁক দিয়েছে।"

সেই তার সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ! কারণ মাসখানেক পরে আবার রাণাঘাটে গিয়ে আর তার সন্ধান পাই নি। শুনলাম মারা গেছে। দেখা না হওয়াতে মনটা ক্ষুণ্ণ হল বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবলাম ভালই হয়েছে। মরে সে অনেকদিন আগেই গিয়েছিল, বেঁচে যা ছিল সে শুধু তার পাঞ্চভৌতিক দেহটা।



আলাস্কা

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

এমন একটি জায়গা আছে যেখানে অর্ব্বাচীনতম মহাদেশ আমেরিকা প্রাচীনতম মহাদেশ এশিয়ার দিকে সাগ্রহে হাত বাড়াইয়াছে বলা চলে। আমেরিকার এশিয়ার দিকে বিস্তৃত হস্তস্বরূপ সেই দেশটির নাম আলাস্কা। এই দেশ উত্তর-আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত এবং ইহার উত্তরাংশ উত্তর মেরু-মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী। আমরা এই বিচিত্র পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে চাহিলে দেখিতে পাইব আর্কটিক সার্কল বা উত্তর-মেরু-মণ্ডল নামক কল্পিত রেখা গ্রীণ-ল্যাণ্ডের দিক হইতে আসিয়া কানাডার উত্তর প্রান্তের উপর দিয়া আলাস্কায় উপনীত হইয়াছে এবং অবশেষে (আমেরিকা ও এশিয়ার মধ্যবর্ত্তী) বেরিং প্রণালী পার হইয়া এশিয়াটিক রাশিয়ার তুষার-উষর বুকে প্রবেশ করিয়াছে। আলাস্কার প্রায় তৃতীয়াংশ বা তিন ভাগের একভাগ মেরু-মণ্ডলের মধ্যে। এই অংশেই অরোরা-বোরিয়ালিস বা মেরু-জ্যোতি নামক বিচিত্র আলোক প্রকাশিত হইয়া দর্শককে বিস্ময়-বিজড়িত সম্ভ্রমে স্তম্ভিত করিয়া তোলে। এই আলোককে বিশ্ব-নিয়ন্তার অনন্ত অনুকম্পার অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি বলা চলে। এই পরমরমণীয় বিস্ময়কর রশ্মিকে নর্দার্ণ-লাইটস্ বা উত্তরালোক আখ্যাও দেওয়া হয়। আকাশের কোলে স্পন্দমান এই আলোকের বিচিত্র বর্ণচ্ছটার আশ্চর্য্যজনক সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য ঘোর-অবিশ্বাসীর বক্ষেও বিশ্বাসের বীজ বপন করিতে পারে। অনেকেই জানেন, মেরুতে শীত ও রাত্রি ছয় মাস ব্যাপিয়া বিরাজিত থাকে। এই সুদীর্ঘ শীতার্ত্ত রাত্রিকে আলোকিত করাই মেরু-জ্যোতির প্রধান কার্য্য। শীতের শান্ত ও শীতল, নিস্তব্ধ ও নির্ম্মল নভোমণ্ডলেই এই অপূর্ব্ব আলোকের অপরূপ রূপ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ; সুতরাং যাঁহারা মেরু-রশ্মির সম্পূর্ণ শোভা উপভোগ করিতে চান তাঁহাদের উচিত সেই সময় মেরু-মণ্ডলে যাওয়া।

আলাস্কা নামটি আমাদিগকে রুশীয় প্রভাবের বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিতেছে। রুশরাই ইহার আবিষ্কর্ত্তা এবং আলাস্কার প্রথমে কর্ত্তাও ছিল তাহারাই। আলাস্কার পার্শ্ববর্ত্তী বেরিং সাগর ও প্রণালীও দেশনেফ নামক একজন রুশের দ্বারাই আবিষ্কৃত হয়, কিন্তু ভিটাস বেরিং নামক দিনেমার নাবিকের স্মৃতি-রক্ষার্থ তাঁহার নামের সহিত উহাদিগকে সংযুক্ত করা হইয়াছিল। আলাস্কা বিশাল দেশ হইলেও রাশিয়া ইহা হইতে কোন লাভের আশা দেখিতে পাইল না। সুতরাং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ইহা ক্রয় করিতে চাহিলে সে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ১৪ লক্ষ ৪০ হাজার পাউণ্ডের বিনিময়ে এই দেশ যুক্তরাষ্ট্রকে বিক্রয় করিল। রাশিয়া ও আলাস্কার মধ্যস্থলে বেরিং প্রণালী। এই প্রণালী না থাকিলে রাশিয়ার পক্ষে হয় তো আলাস্কা লাভজনক হইতে পারিত। এই প্রণালীর উপর দিয়া যাতায়াত কষ্টকর কার্য্য। জুন হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত কোনরূপে যাতায়াত চলিতে পারে। অবশিষ্ট ছয় মাস বরফ ও কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া ইহা অধিকতর দুর্গম ও দুঃখসঙ্কুল হইয়া পড়ে। যাহা রাশিয়ার পক্ষে প্রায়ই ব্যর্থ হইয়াছিল বলা চলে যুক্তরাষ্ট্র তাহাই কিনিয়া বিশেষ লাভবান্ হইল। যুক্তরাষ্ট্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই দেশ হইতে ১৪ কোটি পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ, পশু-লোম এবং উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দেশে উৎপন্ন পণ্যসমূহের মধ্যে স্বর্ণ ও পশুলোমই প্রধান। যুক্তরাষ্ট্র যে মূল্যে এই দেশ কিনিয়াছিল ৬০ বৎসরের মধ্যে সে সেই অর্থের শতগুণ প্রাপ্ত হইল। ব্যক্তি বা পরিবারের ন্যায় জাতি বা দেশের অদৃষ্টভাগ্য আছে। ভাগ্যদেবতা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি পদে পদে প্রসন্নতা প্রকাশ করিয়াছেন ;



উত্তর-আমেরিকার অসভ্য আদিবাসী

বলিয়াই তাহার পক্ষে অতি দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইয়াছে। রাশিয়ার পক্ষে যাহা ব্যর্থতাই প্রসব করিয়াছিল যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে তাহাই হইল স্বর্ণ-প্রসূতি। ইহাকেই বলে অদৃষ্ট।



উত্তর মেরু-মণ্ডলের নিসর্গশোভা

আলাস্কা অতি প্রকাণ্ড দেশ। ইহার আয়তন ৫ লক্ষ ৯০ হাজার বর্গ-মাইল। আমাদের বাঙ্গালা দেশ ৮২ হাজার ২ শত ৭৭ বর্গ মাইল। ইহা হইতে আমরা কল্পনা করিতে পারি আলাস্কার আকার কি প্রকার প্রকাণ্ড। যদি আমরা উত্তর-আমেরিকাকে একটি বিপুলবপু বিচিত্রকায় প্রাণীর সহিত তুলনা করি তাহা হইলে আলাস্কা হইবে তাহার মুখ, কানাডা হইবে তাহার বিস্তৃত বক্ষঃস্থল, যুক্তরাজ্য হইবে তাহার বিশাল উদর-দেশ এবং মেক্সিকো হইতে পানামা পর্য্যন্ত প্রসারিত সঙ্কীর্ণ ভূভাগ হইবে তাহার সুদীর্ঘ পুচ্ছ। নৈসর্গিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে এই দেশকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করা চলে। প্রথমেই ফিয়র্ডপূর্ণ উপকূলাংশ। য়ুরোপের সুদূর উত্তরে বিরাজিত তুষারশুভ্র পর্ব্বতপূর্ণ সুইডেন ও নরওয়ের মত এই দেশেও ফিয়র্ড জাতীয় জলাশয় বা হ্রদ বহুসংখ্যক বিদ্যমান। হ্রদাবলী-ভূষিত উপকূলাংশের পর পর্ব্বত-প্রধান প্রদেশ প্রসারিত আছে। তদনন্তর আরও অভ্যন্তর ভাগে বিরাট বনানীর দেশ বিদ্যমান। এই অরণ্য প্রদেশ হইতে যতই উত্তরে আগাইয়া যাওয়া যায় ততই একপ্রকার বিরলবৃক্ষ অথচ শৈবালশ্যাম দিগন্ত-প্রসারিত প্রান্তর দৃষ্টিগোচর হয়। এই প্রান্তর বিল বা জলায় পূর্ণ। শৈবাল ছাড়া এক জাতীয় ক্ষুদ্র ও খর্ব্বকায় তৃণ-গুল্ম এই প্রদেশে জন্মায়। এইরূপ সুদূর প্রসারিত প্রকাণ্ড প্রান্তরকেই টুণ্ড্রা বলা হয়। এই প্রান্তরগুলি বহু-সংখ্যক বিস্তৃত জলার জন্য গ্রীষ্মকালে দুর্গম হইয়া পড়ে, কিন্তু শীতাগমে জল যেমন জমিয়া যায় অমনই সেই দুর্গমতা দূর হয়। তখন শিলার ন্যায় সুকঠিন তুষাররাশির উপর দিয়া কুকুর ও বল্গা হরিণের দ্বারা চালিত স্লেজ জাতীয় শকটের সাহায্যে সহজেই যাতায়াত চলিতে পারে। এই টুণ্ড্রাগুলি মেরু-মণ্ডলে বিরাজিত। এই প্রদেশের লোকালয়গুলি এরূপ বিপুল ব্যবধানে বিরাজিত যে পরস্পর আদান-প্রদান সহজ নহে। এই লোকালয়-গুলিতে বৎসরে একবার বা দুইবার মেল অর্থাৎ ডাক আসে। শত শত মাইল কেনু বা কুকুরটানা শকটের সাহায্যে অতিক্রম করা অতি কঠিন কার্য্য সন্দেহ নাই। এই তুষারাবৃত টুণ্ড্রা অঞ্চলের আবহাওয়ার টেম্পারেচার জিরো অপেক্ষাও ৬০ হইতে ৭০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত নিম্নবর্ত্তী।

আলাস্কার প্রায় অর্দ্ধাংশকে উকন নদের অববাহিকা বলিলে ভুল হয় না। এই বিখ্যাত নদী এই দেশের মধ্যস্থল দিয়া বহিয়া গিয়াছে। এই নদী এবং ইহার শাখা ও করদ নদগুলিই এই দেশের অধিবাসীদিগের পক্ষে যাতায়াতের প্রকৃষ্ট পথ। আলাস্কার প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধ স্বর্ণখনিগুলির অধিকাংশ উকন নদের তীরদেশে বিরাজিত বলিয়াই এই নদ বিশেষ প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই নদী কানাডার উকন প্রদেশ হইতে অগ্রসর হইয়া আলাস্কার ভিতর দিয়া বেরিং সাগরে পতিত হইয়াছে। রকি পর্ব্বতশ্রেণীর অংশবিশেষ হইতে ইহা জন্মলাভ করিয়াছে। এই নদীর যে অংশ কানাডায় বিরাজিত উহার তটদেশেও স্বর্ণখনিসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। আলাস্কার বহু অংশ, বিশেষ উকন নদের দক্ষিণস্থ অংশগুলি পর্ব্বতপুঞ্জে পরিপূর্ণ। আলাস্কার অন্তর্গত এই পার্ব্বত্য প্রদেশেই ম্যাকিনলী নামক ২০ হাজার ফিট উচ্চ পর্ব্বত অবস্থিত। ইহাই উত্তর-আমেরিকার উচ্চতম পর্ব্বত।

আলাস্কার সকল অংশের আবহাওয়া একই প্রকার নহে। এই দেশের দক্ষিণাংশের, উপকূলাংশের এবং পার্ব্বত্যপ্রদেশের দক্ষিণে বিরাজিত গভীর বনভূমি-ভূষিত বিভাগের জলবাতাস স্কটল্যাণ্ডের জল-বায়ুর অনুরূপ কিন্তু অভ্যন্তর-ভাগের আবহাওয়া অন্যরূপ। আর্কটিক সার্কল বা উত্তরমেরু-চক্রের উত্তরস্থ ও দক্ষিণস্থ অংশগুলিতে টেম্পারেচার ৯০ হইতে ১০০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে এবং শীতকালে উহা জিরো অপেক্ষা ৫০ ডিগ্রি নিম্নবর্ত্তী হইয়া পড়ে। এই দেশের সর্ব্বোত্তর সীমান্তের অর্থাৎ টুণ্ড্রা-অঞ্চলের ভূমি শীতের সময় ১ শত ফিট ঘন তুষারের স্তরে আচ্ছাদিত হওয়া অসম্ভব নহে। অথচ গ্রীষ্ম আসিলে রবি-রশ্মির সংস্পর্শে তুষাররাশি দ্রবীভূত হইবামাত্র সেই ভূমি বর্ণ-বৈচিত্র্যে চিত্তাকর্ষক প্রচুর পুষ্পপুঞ্জে পূর্ণ হইয়া পড়ে।

মেরু-অঞ্চলের অবস্থা বড়ই বিচিত্র। এখানকার ছয়মাসব্যাপী গ্রীষ্মকে একটী সুদীর্ঘ দিন এবং ছয়মাস-ব্যাপী শীতকে একটি সুদীর্ঘ রাত্রি বলা চলে। আমরা সুস্নিগ্ধ সন্ধ্যার শান্ত-শীতল স্পর্শের প্রত্যাশা করি বলিয়াই গ্রীষ্মতপ্ত দিবস আমাদের পক্ষে দুঃসহ হয় না। সুতরাং মেরু-মণ্ডলের ছয়মাস-ব্যাপী রৌদ্রদীপ্ত নিরবচ্ছিন্ন দিন বিরক্তিকর হওয়া অসম্ভব নহে। তখন মানুষের মন তন্দ্রালস সান্ধ্য-অন্ধকারের জন্য বিশেষ ব্যাকুলতা লাভ করিতে পারে। কিন্তু সে ব্যাকুলতার কোন ফল হয় না। বিধাতার বিচিত্র

বিধানের বা প্রকৃতির কঠোর নিয়মের কণামাত্রও ব্যতিক্রম হইতে পারে না। অবশ্য একদিন সেই রৌদ্রদীপ্ত দীর্ঘ দিবাও শেষ হয় এবং তুষারশুভ্র শীত ও তাহার সহচরী রহস্যময়ী রাত্রি আসে তন্দ্রাচ্ছন্ন সান্দ্র অন্ধকারে দশদিক্ আবৃত করিয়া। এই সময় সূর্য্যদেব দিক-চক্র-রেখার অনেক নীচে চলিয়া যান বলিয়াই রাত্রির আবির্ভাব হয়। সূর্য্যদেব অন্তর্হিত হইলে আলোক দিবার জন্য চন্দ্রদেব আসেন, ইহাই চিরন্তন নিয়ম। মেরুর আকাশেও চন্দ্রদেব মন্দ-পদে আবির্ভূত হন অন্ধকাররাশি অপসারিত করিবার জন্য। কিন্তু সূর্য্যের কার্য্য চন্দ্রের পক্ষে করা সম্ভব হয় না। ক্ষীণ চন্দ্রকরেরেখা অন্ধকারের অল্পাংশই অপসারিত করিতে সমর্থ হয়। এই সময় বিধাতার বিচিত্র বিধানে মেরুর আকাশে দেখা দেয় এক বিস্ময়কর আলোক। ইহাই অরোরা-বোরিয়ালিস বা মেরু-জ্যোতি।

সুতীব্র শীতের আবাসস্থল উত্তর-মেরুকে সম্পূর্ণ ঊষর প্রদেশ বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উত্তরমেরু তাহা নহে। সুতীব্র শীত সত্ত্বেও বৃক্ষলতার বিস্ময়কর বিকাশ এখানে দেখা যায়। অন্যান্য দেশের তরুলতা ১২ ঘণ্টার বেশী সূর্য্যালোক পায় না, কিন্তু মেরু-মণ্ডলের উদ্ভিদগণ (গ্রীষ্মকালে) ২৪ ঘণ্টাই রবি-রশ্মি পাইয়া থাকে; সুতরাং তাহারা অপেক্ষাকৃত অধিক বিকাশ লাভ করিলে তাহা স্বভাব-সঙ্গতই হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। উত্তর-মেরু-অঞ্চলের গাছ-পালা আকারে বৃহত্তর, এই সত্য হয় তো অনেকেই অবগত নহেন। মেরু সম্বন্ধে যে সকল ভ্রান্ত ধারণা সাধারণের মনে বদ্ধমূল ছিল, সত্যানুসন্ধিৎসু ভ্রমণকারিগণের বৃত্তান্ত তাহা ক্রমশঃ অপগত করিতেছে।

আলাস্কার রাজধানী ও প্রধান বন্দরের নাম জুনের্ড। ইহা এই দেশের দক্ষিণোপকূলে অবস্থিত এবং উপনিবেশগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। পশ্চিমোপকূলের নোম নামক নগর স্বর্ণখনির জন্য বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। ধাতুসমূহের মধ্যে স্বর্ণই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান; সুতরাং স্বর্ণের জন্য প্রবল প্রতিযোগিতা চলিলে তাহাকে বিস্ময়ের বিষয় বলা চলে না। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে সুবর্ণের জন্য এই অঞ্চলে যে বিপুল চাঞ্চল্য ও তুমুল প্রতিযোগিতা দেখা গিয়াছিল তাহাকে অতুল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নোমের সমুদ্রোপকূলস্থ স্বর্ণখনগুলিতেই সর্ব্বাধিক স্বর্ণপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। এই সকল স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইবামাত্র পৃথিবীর প্রায় সকল অংশ হইতে উচ্চাশা-মত্ত প্রস্পেক্টারগণ এই দুর্গম চির-তুষারের দেশে সাগ্রহে আগমন করিয়াছিল। তৎকালে এখানে যে সকল বিচিত্র ঘটনা ঘটিয়াছিল সেগুলি রোমাঞ্চকর রোমান্সের বিষয়ীভূত হইতে পারে।

আলাস্কার নগরগুলির মধ্যে স্কাগোয়েকে সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিজ্ঞাত বলিলে ভুল হয় না। পর্য্যটকগণের পক্ষে এখানে আসা অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ। ইহা কানাডা ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্ত্তী প্যান হ্যাণ্ডল (দক্ষিণ আলাস্কার অন্তর্ভুক্ত) নামক সঙ্কীর্ণাকার ভূভাগের বক্ষে বিরাজিত। ফিয়র্ড সমূহের শান্ত-সুন্দর এবং পর্ব্বতশ্রেণীর গুরু-গম্ভীর দৃশ্য দর্শনের জন্য ভ্রমণকারিগণ দলে দলে এখানে আসিয়া থাকেন। রাজধানী জুনের্ডও কানাডার পশ্চিম সীমান্তরেখা স্বরূপ, অথচ আলাস্কার অন্তর্গত এই সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্বল্প-পরিসর প্রদেশেই অবস্থিত।

শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকগণ ছাড়া আলাস্কায় বহু রেড-ইণ্ডিয়ান বাস করে। আলাস্কার অধিবাসীদিগের মধ্যে রেড ইণ্ডিয়ানের সংখ্যাই অধিক। এই সকল আদিবাসীদিগের সকলে একই সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। ইহারা কয়েকটি বিভিন্ন দলে বিভক্ত। পশুপক্ষীর নামানুসারে প্রত্যেক দলের পৃথক পৃথক নাম আছে। কোন সম্প্রদায়ের নাম "ভল্লুক"। কোন সম্প্রদায়ের আখ্যা "ঈগলপক্ষী"। কোন সম্প্রদায় "সমুদ্র-সিংহ" আখ্যায় অভিহিত। সভ্যতার সংস্পর্শে বা য়ুরোপীয়দিগের সংসর্গে ইহাদিগের জীবনযাত্রার প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তন কোন কোন বিষয়ে তাহাদের উন্নতির কারণ হইলেও সত্যের খাতিরে একথা বলিতেই হইবে যে, শ্বেতাঙ্গদিগের সংসর্গ বা সভ্যতার প্রভাব শুধু যে তাহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে বিনষ্ট করিয়াছে ইহা নহে, তাহাদিগকেও ক্রমশঃ বিনাশের পথে লইয়া চলিয়াছে। কৃষ্টি বা আচার অনুষ্ঠানগত বৈশিষ্ট্যই জাতিকে বাঁচাইয়া রাখে। বর্ণসাঙ্কর্য্য যত বৃদ্ধি পায় জাতি ততই মৃত্যুর পথে আগাইয়া যায়।

এই সকল আদিবাসী সম্প্রদায় পূর্ব্বে সম্পূর্ণরূপে যাযাবর জীবন যাপন করিত। যখন যেখানে পশুপক্ষী শিকারের সুবিধা মিলিত তখন সেইখানে চর্ম্মনির্ম্মিত শিবির বিস্তৃত করিয়া বাস করিত। শুধু সুদীর্ঘ শীতের সময় তাহারা একই স্থানে অধিককাল বাস করিতে বাধ্য হইত। বর্ত্তমানে রেড-



উত্তর-মেরুমণ্ডলবাসী এস্কিমোগণ ও তাহাদের ব্যবহৃত গ্রাম্য গীর্জ্জাগৃহ

ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়দিগকে পূর্ব্বের মত যাযাবর জীবন যাপন করিতে আর দেখা যায় না। আলাস্কাবাসী রেড-ইণ্ডিয়ানদিগের কতিপয় আচার ও অনুষ্ঠান দেখিয়া অনুমান করা হয় তাহারা আদিতে (প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণাংশে বিরাজিত) পলিনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ হইতে আসিয়া এই দেশে বাস করিয়াছে। ইহাদের দেহ চিত্রিত করিবার বিচিত্র প্রণালী, আহার সম্পর্কীয় বিধি-নিষেধাত্মক ব্যবস্থাবলী, কাঠের উপর কারুকার্য্য করিবার প্রশংসনীয় কৌশল কতিপয় পলিনেশিয়ান দ্বীপের অধিবাসীদিগের আচার-ব্যবহার ও শিল্প-নৈপুণ্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কোন রেড ইণ্ডিয়ান পল্লীতে প্রবেশ করিলে কতিপয় চিহ্নের সাহায্যে বুঝা যায় আমরা কোন সম্প্রদায়ের বাসস্থলে আসিয়াছি। পল্লীর বুকে দণ্ডায়মান কারুকার্য্যমণ্ডিত এক প্রকার দীর্ঘ দারু-দণ্ড ইহাদিগের সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যের বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করে। লিনগিট নামক (আলাস্কাবাসী) রেড-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় এই সকল দারু-দণ্ডের গাত্রে যে সকল বিচিত্র চিত্র উৎকীর্ণ করে তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই সকল দারু-দণ্ড বৃক্ষকাণ্ড ব্যতিরেকে অন্য কিছু নহে। বৃক্ষ-কাণ্ডগুলির বক্ষকে ক্ষোদিত করিয়া নানা আকার ও প্রকারের মূর্ত্তি এবং মুখ-চোখ রচনা করা হয়। কোন মুখ শান্ত ও সুন্দর, কোন মুখ বিকট ও বীভৎস। উৎকীর্ণ চক্ষুগুলি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় প্রদান করে। শুধু এই সকল সচিত্র ও বিচিত্র দণ্ড নয়, বৃক্ষকাণ্ডের বক্ষ খোদিত করিয়া কেনু বা ডিঙ্গি রচনা করিতেও ইহারা দক্ষ। এইরূপ বৈশিষ্ট্য-বিজ্ঞাপক কারুকার্য্য মণ্ডিত দীর্ঘ দণ্ড আমরা প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণাংশে বিরাজিত দ্বীপপুঞ্জেও দেখিতে পাই। তথাকার অধিবাসীরা এইরূপ নৌকা নির্ম্মাণেও দক্ষতা দেখায়। লিনগিট সম্প্রদায়ের শিল্পীরা পলিনেশিয়ানদিগের মতই তাহাদিগের যুদ্ধ-নৌকাগুলিকে নানাপ্রকার খোদিত চিত্রে মণ্ডিত করিতে ভালবাসে। দণ্ডের গাত্রে যে সকল চিত্র রচিত থাকে তাহারা সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত নহে, লিনগিট সম্প্রদায়ের এবং উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত বংশবিশেষের পূর্ব্বপুরুষগণের ইতিহাসের সহিত ইহাদিগের সম্পর্ক আছে। পলিনেশিয়ানদিগের ন্যায় আলাস্কার লিনগিট সম্প্রদায় একটি মাত্র বৃক্ষকাণ্ডকে খোদিত করিয়া একখানি সুদৃশ্য কেনু নির্ম্মাণ করে। ইহাদিগকে ডাগ-আউট বা ডিঙ্গিও বলা যায়। উত্তর আমেরিকার অন্যান্য রেড-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় বার্চ্চ-বৃক্ষের বল্কলে নৌকা নির্ম্মাণ করে। সুতরাং এ বিষয়ে লিনগিটগণ স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহারা সমরসম্পর্কীয় কেনুগুলিকে নানাপ্রকার কারুকার্য্যে এরূপ চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলে যে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া থাকা যায় না। কাঠের উপর এরূপ কারুকার্য্য করিয়া যে কোন সভ্য সম্প্রদায়ও গৌরব ও গর্ব্ব অনুভব করিতে পারে। এক-একটি কেনুতে ৫০ জনেরও অধিক যোদ্ধা আরোহণ করিতে পারে। তবে এখন আর সেরূপ প্রকাণ্ড কেনু ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। ছোট ছোট নৌকা তাহাদিগের স্থান অধিকার করিয়াছে। পূর্ব্বে সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে যরূপ তুমুল সঙ্ঘর্ষ চলিত শ্বেতাঙ্গ-দিগের আগমনের পর হইতে তাহা আর ঘটে না বলিলেও চলিতে পারে, সুতরাং বড় বড় যুদ্ধ-নৌকার প্রয়োজনও আর অনুভূত হয় না। মাছ-ধরা প্রভৃতি কার্য্যের জন্য ছোট নৌকাই অধিক উপযোগী।

আলাস্কার উপকূলাংশের এবং মেরু অঞ্চলের বহু স্থানে এস্কিমোরা বাস করে। এস্কিমো এবং আলাস্কার কোন কোন আদিবাসী সম্প্রদায়ের নরনারীর মুখমণ্ডলের আকৃতি দেখিয়া তাহাদিগের দেহে মঙ্গোলীয় শোণিত বিদ্যমান বলিয়া বুঝা যায়। আলাস্কাবাসী এস্কিমোদের অধিকাংশই সীল এবং ওয়াল-রাস নামক সামুদ্রিক প্রাণী শীকার করিয়া জীবিকার্জ্জন করে। এই সকল সীল ও ওয়ালরাস শীকারী এস্কিমোকে সর্ব্বদা ঝঞ্চা-ক্ষুব্ধ সমুদ্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া জীবিকা সংগ্রহ করিতে হয়। পূর্ব্বে আলাস্কার পার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্রে তিমি ধরাই এই দেশের উত্তরোপকূলের অধিবাসী এস্কিমোদিগের জীবিকার্জ্জনের প্রধান উপায় ছিল। ইহারা চর্ম্মনির্ম্মিত কেনুতে চড়িয়া "হার্পুনিং" নামক প্রক্রিয়ার সহায়তায় সেই সকল প্রকাণ্ড প্রাণীকে ধরিত। হার্পুন তিমির দেহ বিদ্ধ করিবার উপযুক্ত এক প্রকার দীর্ঘাকার সূক্ষ্মাগ্র অস্ত্র। পরে এই প্রাচীন পন্থা পরিত্যাগ করিয়া তিমি ধরিবার জন্য যে নৃশংস প্রণালী অবলম্বিত হইল তাহাতে আলাস্কার পার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্র হইতে এই বিপুল-বপু জলচর জীবগণ সবংশে ধ্বংস পাইল বলিলেও ভুল হয় না। সুতরাং তিমি-ধরার বৃত্তি বা ব্যবসাও এই দেশ হইতে ক্রমশঃ উঠিয়া গেল।

এস্কিমোরা সুদক্ষ শীকারী। তাহারা যে ভাবে বারিধি-বক্ষে বিরাজিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তুষারখণ্ডে চড়িয়া "পোলার বিয়ার" বা মেরু-ভল্লুক শীকার করিয়া বেড়ায় তাহা দেখিয়া বিস্ময় উদ্রিক্ত হইতে পারে। এই ব্যাপার বিপ-জ্জনক বটে; বিশেষ, বসন্তাগমে যখন তুষাররাশি সহসা বিগলিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। সমুদ্র-সলিলে ভাসমান এই সকল তুষারখণ্ডের কোন কোনটি আকারে কয়েক বর্গ মাইল। সময়ে সময়ে শীকারীরা এই সকল তুষারখণ্ডে আরোহণ করিয়া শীকার করিতে গিয়া আর ফিরিয়া আসে না। সম্ভবতঃ তুষাররাশি সহসা দ্রবীভূত হওয়ায় শীকারীরা সমুদ্র-সলিলে সমাধিলাভ করে। আলাস্কাবাসী এস্কিমোরা সীল এবং ওয়ালরাসের চর্ম্ম হইতে পরিচ্ছদ ও পাদুকা প্রস্তুত করে। পরিচ্ছদ ও পাদুকা প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিচিত্র। সাধারণতঃ এস্কিমো-রমণীরাই এই কার্য্য করে। তাহারা বহুক্ষণ-ব্যাপী চর্ব্বণের সাহায্যে এই সকল চর্ম্মকে কোমল করিয়া লয়। ইহাতে ফল এই হয় যে, এস্কিমো-নারীদের দাঁত দুই এক বৎসরের মধ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আলাস্কার অন্তর্গত সিৎকা নামক স্থানের বাজারে বসিয়া এস্কিমো নারীরা যে সকল জুতা বিক্রয় করে, তাহার গাত্রে নানা প্রকার কারুকার্য্য দেখা যায়। সিৎকা এক সময় আলাস্কার রাজধানী ছিল। পরে রাজধানী জুনেউতে স্থানান্তরিত হয়।

"প্রয়োজনই আবিষ্কারের জননী" প্রতীচীতে প্রচলিত এই প্রবচন সম্পূর্ণ সত্য সন্দেহ নাই। আলাস্কাবাসী এস্কিমোদিগকে সর্ব্বদা ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তুষারখণ্ডপূর্ণ সমুদ্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া জীবিকা সংগ্রহ করিতে হয় বলিয়া তাহাদিগের পক্ষে এমন এক প্রকার নৌকা আবিষ্কার করা সম্ভব হইয়াছে যাহা অতি সহজেই সঞ্চালিত হয় এবং অতি দ্রুতগতিতে গমন করে। যখন ঝঞ্চার তাণ্ডব নর্ত্তনে সমুদ্র রুদ্রতম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সুদক্ষ নাবিকের বক্ষেও শঙ্কার সঞ্চার করে, তখনও এস্কিমোরা এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

নৌকায় চড়িয়া উত্তাল তরঙ্গমালার উপর দিয়া নির্ভয়ে আগাইয়া যায়। আলাস্কার চিরতুষারমণ্ডিত উত্তরোপকূলের অধিবাসী এস্কিমোরা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, নিরানন্দ অন্ধকার এবং রাক্ষসী বুভুক্ষার সহিত যুদ্ধ করিয়া যে ভাবে জীবন যাপন করে তাহা দেখিলে আমাদের মনে হইতে পারে, এইরূপ বৈচিত্র্য-বিরহিত, উৎসববিহীন, হর্ষহারা জীবনের দুর্ব্বহ ভার ইহারা বহন করে কেমন করিয়া? একটু তলাইয়া দেখিলেই আমরা এই প্রশ্নের উত্তর পাইব। আমাদের ধারণা ভুল। স্রষ্টার বিস্ময়কর কৌশল প্রত্যেক অবস্থাতেই মানুষকে সন্তুষ্ট রাখিয়াছে। মেরুবাসী এস্কিমোরা তুষারশুভ্র মেরুকেই ভালবাসিয়াছে, সে মেরুর পরিবর্ত্তে ভূ-স্বর্গ সদৃশ দেশকেও কামনা করে না। অন্য দিকে বেদুইন প্রভৃতি মরুচারী জাতিরা তরুতৃণহারা চির তপ্ত মরুর মধ্যেই আনন্দের সন্ধান পাইয়াছে।

পূর্ব্বে আলাস্কায় রেন-ডিয়ার বা বল্গা-হরিণ ছিল না। কিছুকাল হইল সাইবেরিয়া হইতে বল্গা-হরিণ আনাইয়া এখানে উহাদিগকে প্রধান পালিত পশুতে পরিণত করিবার প্রযত্ন করা হয়। আলাস্কায় শিকারের উপযুক্ত ভূচর ও জলচর জীবের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হওয়ার জন্যই এইরূপ প্রযত্নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছিল। এই দেশে বল্গা-হরিণ পালন করিবার প্রয়াস বিশেষ সাফল্যে ভূষিত হইল। পরমকারুণিক স্রষ্টা তুষার-শীতল মেরুমণ্ডলের জন্য এই বিচিত্রাকৃতি প্রাণীকে সৃষ্টি করিয়াছেন সন্দেহ নাই। যে সুতীব্র শৈত্য অপর পশুদের পক্ষে প্রাণান্তকর বল্গা হরিণের জীবন ধারণের জন্য তাহাই প্রয়োজন। যেমন বারিবিরহিত তৃষাতুর মরুবক্ষে অশেষ কষ্টসহ উষ্ট্র, শিহরণপূর্ণ তুষার-ঝঞ্ঝার লীলাস্থল তিব্বতের সমুচ্চ মালভূমিতে ইয়াক নামক (অত্যুচ্চ প্রদেশের সূক্ষ্ম বায়ু স্তরে প্রাণ ধারণক্ষম) বিচিত্র স্বভাব প্রাণী, তেমনই চিরতুষারমণ্ডিত মেরুমণ্ডলের পক্ষে বল্গা-হরিণ। আলাস্কায় এস্কিমোরাই বল্গা-হরিণ পুষিয়া থাকে। বল্গা হরিণ পুষিবার পর হইতে এস্কিমোদের জীবন যাপন প্রণালীর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখনও যাযাবর জীবনযাপন করিলেও আর পূর্ব্বের ন্যায় অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করিতে হয় না। পূর্ব্বে শুধু শিকারের সাহায্যে জীবন-ধারণ করিত বলিয়া তাহাদিগকে যে ভাবে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত এখন তাহা না করিয়া অন্যান্য পশুপালক যাযাবর জাতিদিগের মত যখন যেখানে বল্গা-হরিণের চরিবার উপযুক্ত চারণ-স্থান পাওয়া যায় তখন সেইখানে কিছুকাল স্থিরভাবে বাস করা হয়।

আলাস্কায় কয়েকটী ছোট ছোট রেলপথ প্রস্তুত হইয়াছে বটে, কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য বা যাত্রীদের যাতায়াত সাধারণতঃ জলপথের সাহায্যেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। যখন জল জমিয়া যাওয়ার জন্য নৌকাদি অচল হইয়া পড়ে তখন বল্গা-হরিণ বা কুকুরের দ্বারা চালিত স্লেজ-গাড়ীর সাহায্যে তুষারে রূপান্তরিত রৌপ্যশুভ্র জলরাশির উপর দিয়া যাওয়া আসা অনায়াসে চলিতে পারে। আলাস্কার নদ-নদীসমূহের মধ্যে উকন প্রধান বা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ইহাকে পৃথিবীর বারোটি বৃহত্তম নদীর অন্যতম বলা চলে। এই নদীর মোহনা বা মুখ অগভীর বলিয়া বড় বড় জলযান তথায় প্রবেশ করিতে পারে না। এই দোষটুকু না থাকিলে উকন আলাস্কার পক্ষে আরও কল্যাণসাধক হইত।

আলাস্কার অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত স্থানগুলিতে শীতকালে কুকুর-টানা স্লেজই যাতায়াতের প্রধান অবলম্বন। এক একটি স্লেজ টানিতে পাঁচটি কুকুর আবশ্যক হয়। পাঁচশত হইতে আটশত পাউণ্ড পর্য্যন্ত ওজন ইহারা টানিতে পারে। আমাদের দেশের কুকুরকুলের সহিত ইহাদের তুলনা চলিতে পারে না। মেরুমণ্ডলের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ইহারা যে ভাবে সহ্য করে তাহা দেখিলে বিস্ময়াভিভূত হইতে হয়। অবশ্য দয়াবতী প্রকৃতিমাতা সেই সুতীব্র শীত সহ্য করিবার উপযুক্ত আচ্ছাদন ইহাদের দেহের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন। ইহাদের দেহের লোমগুলি দীর্ঘ ও ঘন-সন্নিবিষ্ট এবং লোমশ লেজটি বিশেষ লম্বা। এই প্রকৃতিপ্রদত্ত পুরু আচ্ছাদনের জন্যই ইহারা অনাবৃত স্থানে অনায়াসে ঘুমাইতে পারে।

বর্ত্তমানে আলাস্কা খনির কাজের জন্যই সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাতিলাভ করিয়াছে। এখানকার ভূগর্ভে যত স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, প্লাটিনাম এবং নিকেল নিহিত রহিয়াছে আমেরিকার কোন অংশেই তাহা নাই এই সত্য অনেকের নিকট বিস্ময়কর বোধ হইতে পারে। প্রায়ই নূতন খনি এখানে আবিষ্কৃত হইতেছে। পূর্ব্বে লোকে উত্তর-মেরুর অন্তর্ভুক্ত এই দেশকে ব্যর্থ ও গুরুত্বহীন বলিয়া মনে করিত। পরে উকনতটে স্বর্ণখনিসমূহ আবিষ্কৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে লোকে বুঝিল তাহারা এতদিন ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছে। এই আবিষ্কারই আলাস্কার উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিল।

সীল এবং স্যালমন নামক মৎস্য এখানকার অধিবাসীদের জীবিকার্জ্জনের অন্যতম উপায়। আলাস্কার উপকূলে প্রচুর সীল ধরা হইত। কিছুকাল পূর্ব্বে আশঙ্কা জন্মিয়াছিল শীঘ্রই আলাস্কার পার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্র সম্পূর্ণরূপে সীল-শূন্য হইয়া পড়িবে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্র যখন রুশিয়ার নিকট হইতে আলাস্কা ক্রয় করে তখন হিসাব করা হইয়াছিল ৫০ লক্ষ সীল সেখানকার সমুদ্রে রহিয়াছে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ২ লক্ষের বেশী সীল সেখানে ছিল না। সুখের বিষয় পরবর্ত্তী অভিনব অবস্থা ও ব্যবস্থার ফলে সীলের সংখ্যা হ্রাস না হইয়া বাড়িতে আরম্ভ করে। আলাস্কার নদী ও হ্রদে ট্রাউট প্রভৃতি যে সকল মৎস্য দেখা যায় তাহারা আকারে অতি বৃহৎ হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে একটি এক পাউণ্ড ওজনের ট্রাউট কেহ পাইলে মনে করে বেশ বড় ট্রাউট সে পাইল কিন্তু আলাস্কার নদী ও হ্রদাদিতে ৫০ পাউণ্ড ওজনের ট্রাউট পাওয়া যায়। ইহাতে প্রমাণিত হয়, মেরুর বারিরাশিতে মৎস্যাদি প্রাণীর দেহ অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বহুগুণ অধিক বৃদ্ধি বা বিকাশ লাভ করে। শুধু জলচর জীব নয় আলাস্কার স্থলচর প্রাণীরাও আকারে বৃহত্তর। এখানে এমন একপ্রকার ভল্লুক আছে যাহারা পৃথিবীর মাংসভুক্ প্রাণীদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এক জাতীয় একরকম হরিণ এখানে দেখা যায়। এই সকল হরিণের শিং ছয় ফিট অপেক্ষাও দীর্ঘ। সুতরাং ইহারা বিচিত্র-দর্শন ও বিস্ময়জনক সন্দেহ নাই। টুণ্ড্রা নামক জলা-বহুল প্রান্তরগুলিতে কারিবু নামক মৃগের দলকে চরিতে দেখা যায়। ভারতবর্ষের কোন

কোন প্রদেশের জলায় বা বিলেও একপ্রকার সুদৃশ্য হরিণের দল দৃষ্ট হয়। ইহারা ইংরেজী ভাষায় 'সোয়াম্প ডিয়ার' আখ্যায় অভিহিত হয়। টানানা এবং উকন এই নদদ্বয়ের দ্বারা অভিষিক্ত ভূভাগের মধ্যবর্তী জলাগুলিতে কারিবু হরিণরা বড় বড় দলে বিভক্ত হইয়া চরিয়া বেড়ায়।

আলাস্কা স্বর্ণপ্রসূ দেশ। স্বর্ণপ্রসূ দেশের পক্ষে দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়াই স্বাভাবিক। চির-দুর্গম মেরু-মণ্ডলের অন্তর্গত না হইলে এই উন্নতির গতি আরও দ্রুত হইত সন্দেহ নাই। তবুও যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালনায় এই দেশের অপ্রত্যাশিত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বৃটিশ কলম্বিয়ার বিখ্যাত বন্দর ভ্যাঙ্কুভার ও ভিক্টোরিয়া হইতে আলাস্কা বন্দরগুলি পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে বাষ্পীয় পোত যাতায়াত করে। যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রসিদ্ধ বন্দর স্যানফ্রান্সিস্কো হইতেও নিয়মিত ষ্টিমার যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে।

পূর্ব্বে দূরবর্ত্তী দেশসমূহের অধিবাসীদের নিকট উত্তর মেরুমণ্ডলের অন্তর্গত আলাস্কা প্রভৃতি দেশ দুর্ভেদ্য রহস্য-তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল। বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং জিজ্ঞাসু পর্য্যটকগণের অক্লান্ত অনুসন্ধানের ফলে সেই রহস্য-যবনিকা আজ উত্তোলিত হইয়াছে। রেল ও ষ্টিমার প্রভৃতি দ্রুতগামী যান যে দূরত্বকে দূর করিতে পারে নাই, বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অবদান ব্যোমযান বা বিমান তাহাও অপগত করিয়া সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিভিন্ন-জাতি অধ্যুষিতা বিচিত্রা বসুন্ধরাকে বিশ্বমানবের বাসস্থলী একটি বিশাল মহাদেশে পরিণত করিয়াছে বলিলে ভুল হয় না। সভ্যতার আলোক আজ নিশীথ-সূর্য্যের দেশ উত্তর-মেরুকেও উদ্ভাসিত করিয়াছে এবং সুদূর দক্ষিণে নিউজীল্যাণ্ডকেও উদ্ভাসিত করিয়া দুর্গমতম দক্ষিণ-মেরুর বক্ষেও বিচ্ছুরিত হইতেছে।

সত্যেন্দ্র স্মরণে

শ্রীনকুলেশ্বর পাল, বি-এল

রবিকর সমুজ্জ্বল গৌরীশৃঙ্গ হ'তে
তুহিনের স্বপ্ন ভাঙ্গা প্রাণ পাওয়া স্রোতে;
শিলার শৃঙ্খল টুটি উষ্ণ খরতাপে,
আসে নেমে নির্ঝরিণী প্রচণ্ড প্রতাপে।
জাহ্নবীর ধারা বহে দু-কূল প্লাবিয়া;
ফলে পুষ্পে ধরা বক্ষ তোলে উচ্ছ্বসিয়া।
হাস্যোজ্জ্বল ঝলমল তুষারের কণা;
ঝরণা ধারার মাঝে হয় সে উন্মনা।

হে অমর কবিবর! তোমার প্রতিভা
জাহ্নবী ধারার সম নিত্য মনলোভা;
কুলু কুলু ছুটিয়াছে মধু কলতানে
ছন্দোময়ী নৃত্যময়ী মিলনের গানে।
অস্ফুট ধ্বনীর মাঝে ফুটাইয়া ভাষা;
প্রাণের সঞ্চার দিলে, জাগাইয়া আশা;
জ্বালাইলে 'হোমশিখা' প্রদীপ্ত প্রভায়,
উজলিয়া দশদিক কাব্য প্রতিভায়।

বৈশাখের রুদ্র বীণা বাজে তালে তালে,
আষাঢ়ের বাণী আনে নব মেঘ জালে;
বিরহীর ব্যথা ঝরে শ্রাবণ ধারায়
বাতাস কাঁদিয়া ফেরে ব্যর্থ হতাশায়।

ঝরা শেফালীর বুকে কার ব্যথা ফোটে
হেমন্তের অশ্রুকণা কার লাগি লোটে।
শীতের কুহেলি অঙ্গে ধরিত্রী মলিনা;
সুজলা সুফলা বঙ্গ যেন দীন হীনা।

বসন্ত এল যে দ্বারে, ফুল ফুটে তাই;
কে গাহিবে জয়গান, আজ তুমি নাই।
দীনা জননীর বক্ষে এসেছিলে তুমি
ভারতীর বরপুত্র, ধন্য বঙ্গভূমি।
মায়ের চরণ পদ্মে রক্ত শতদল;
অর্ঘ্য দিলে প্রাণ মন যা ছিল সকল।
ভারতীর কণ্ঠে শোভে রত্ন কণ্ঠহার;
বঙ্গভাষা মাঝে নাই তুলনা যাহার।

তুমি গেছ রেখে তব সুরের মূর্চ্ছনা;
ছন্দের তরঙ্গ খেলে, বাজে বিশ্ববীণা।
'তীর্থ সলিলে'তে স্নাত কাব্য মাল্যখানি;
সকল ভাষার রত্ন আহরিয়া আনি,
রচিল বিশ্বের বুকে সৃষ্টি নব নব;
মাতৃভাষা মঞ্জুষায় রত্ন অভিনব—
তোমারে ক'রেছে কবি চির মহীয়ান,
কালের তরঙ্গ গাহে তব জয়গান।

সবুজের তৃষা

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত

ভোরের আকাশ কাঁপাইয়া কারখানার প্রথম বাজিয়া উঠিল। ঘরের মেঝেতে একখানা চাটাইয়ের উপর ছেড়া কম্বল মুড়ি দিয়া লগন ঘুমাইতেছিল, রাধা ঘর নিকানো রাখিয়া তাহার পাশে আসিয়া বসিল, কাঁদামাখা হাতখানার উল্টাপিঠ দিয়া স্বামীকে নাড়া দিতে দিতে ডাকিল, "ওরে শুনছিস্, বাঁশী যে বাজি গেল।"

লগন ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "চেঁচামেচি করতি নেগেছিস্ কেনে ?"

রাধা একটুখানি হাসিয়া বলিল, "কামে যাতি হবে না ? উঠার যে নামই নাই।"

লগন চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল, "দেহটা তত সুবিদে ছেল না, এখনও যেন কেমন কেমন ঠেক্‌তিছে।"

"তা ত' হতিই পারে। বুড়া হাড্ডিতে আর কত সয়। কতদিন বলনু কারখানার কাম তুই ছাড়ি দে, তা ত' কাণে তুলবি নি।"

"কাম ছাড়লে চল্‌বে ক্যামনে ?"

"যেটুক জমি আছে চাষবাস করি কোন মতে-সতে চলি যাবে।"

"বাজে বকিস্ নি", লগন ধমক দিয়া উঠিল, "হাত ধুয়ে চাট্টি পান্তা দিবি চ'।"

কাজ ছাড়িয়া দিতে লগন কিছুতেই রাজি নয়, ষোল বছর বয়স হইতে আজ পঞ্চাশ বছর বয়স পর্য্যন্ত সে কারখানায় কাজ করিতেছে। বা হাতের দুটো আঙুল পর্য্যন্ত কারখানার যন্ত্রে কাটা পড়িয়াছে, তবু সে কাজ ছাড়ে নাই। একবার শ্রমিকদের মজুরী কমিয়া গেল, সকল শ্রমিক মিলিয়া করিল ধর্ম্মঘট। কিন্তু কয়েকদিনের বেশী ধর্ম্মঘট আর টিকিল না। তিন চারদিন কারখানা বন্ধ থাকিলে মালিকদের ক্ষতি সামান্তই, কিন্তু মজুররা খাইবে কি ? তাই অনেকেই সেই অল্পমজুরীতে কাজ করিতে বাধ্য হইল। যাহাদের অন্ত সংস্থান কিছু আছে তাহারা অনেকেই কাজ ছাড়িয়া দিল। কোনমতে খাইয়া থাকিবার মত জায়গা-জমি লগনেরও আছে। অনেকে তাহাকেও পরামর্শ দিল কাজ ছাড়িয়া দিতে। কিন্তু তবু লগন কাজ ছাড়িল না। কারখানায় কাজ করা তাহার একটা বংশগত সংস্কার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

বিরাট লোহার কারখানা। চারিদিকে শুধু লোহা আর লোহা। অনবরত লোহার সংসর্গে ওখানকার শ্রমিকদের মন এবং দেহও লোহা হইয়া গিয়াছে। লৌহযন্ত্রের মতই তাহারা একটানা ভাবে কাজ করিয়া যায়।

এই নিরস লৌহশালার মাঝে কেমন করিয়া যেন একটী মাত্র প্রাণী দিন দিন সরসতায় নবীন হইয়া উঠিতেছিল। সে একটী বকুলগাছ। এই কঠিন আবেষ্টনীর মধ্যে অপ্রয়োজনে অনাহূতভাবে কেমন করিয়া যে তাহার প্রথম আগমন হইয়াছিল তাহা জানি না। যুবক লগন যখন একদিন একটী ফাঁকা জায়গায় কতকগুলি জঞ্জালের মধ্যে ইহাকে প্রথম আবিষ্কার করিল, তখন প্রথম শৈশবের কয়েকটী মাত্র সবুজপত্র সে আকাশের পানে তুলিয়া ধরিয়াছে। লগনের মনে হইল যেন সে একটা বিরাট গুপ্তধনের সন্ধান পাইয়াছে। চারিপাশে জঞ্জালস্তূপ আরও একটু উচু করিয়া সে শিশুবৃক্ষটীকে গোপন করিয়া রাখিতে চাহিল, পাছে অন্ত কেহ তাহার লুক্কায়িত রত্নভাণ্ডারের সন্ধান পায়।

তারপর লগনের সঙ্গে সঙ্গে গাছটীও ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া উঠিয়াছে। কেহ তাহাকে যত্ন করে নাই, কেবল লগনের আগ্রহই যেন দিনের পর দিন তাহাকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। আশে পাশে চারিদিকে অন্ত কোন বৃক্ষ তো দূরের কথা, কঠিন প্রাণ ঘাসেরও বড় একটা চিহ্ন নাই। নির্ম্মমচিত্ত অপরিচিত বিদেশীদের মাঝখানে ও যেন কোন্ পরিচিত স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের সবুজ অভিব্যক্তি! রবির আলো সে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অনুভব করে, বাতাসের স্পর্শে আনন্দে দুলিয়া ওঠে।

লগন আজ যৌবনকে অতিক্রম করিয়া বার্দ্ধক্যের সীমানায় পদার্পণ করিয়াছে, আর তাহার চিরসাথী বকুলবৃক্ষটী প্রথম যৌবনের অজস্র ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার দেহে আজ পত্রপুষ্পের বিরাট সমারোহ। লগনের জীবনের

সহিত সে এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে, তাই তাহার সুনিবিড় আকর্ষণ এই বৃদ্ধ শ্রমিককে আজও নিষ্ঠুর লৌহশালার মাঝখানে টানিয়া আনে।

সমস্ত দিন কাজের মধ্যে মধ্যাহ্নের ছুটির অবসরটুকু সে উহারই কাছে অতিবাহিত করে। বাড়ীর পাশের একটী ছেলে রোজ লগনের জন্য খাবার লইয়া আসে। লগন সেখানে বসিয়াই সেটুকু শেষ করে। তারপর গাছের গুড়িতে ঠেস্ দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। দুই চক্ষু দিয়া বৃক্ষটীর সঘন সবুজ স্নেহ সর্ব্বাঙ্গে অনুভব করে যেন।

আর একটী প্রাণীও প্রত্যহ একবার করিয়া ওই বকুল গাছটীর তলায় আসিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া থাকে। সে ম্যানেজারের শিশুপুত্র লগনের 'খোকাবাবু'। কারখানার কাছেই তাহাদের বাড়ী। রোজ ছুটির সময়টীতে সেও বকুল গাছের তলায় আসিয়া জোটে। বৃদ্ধ লগনের সহিত তাহার বড় ভাব। কোনদিন বা বকুল গাছের পাতার অন্তরালে কোন ক্ষুদ্র পাখীর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া সে লগনকে তাহা ধরিয়া দিতে বলে, কোনদিন বা বকুলফুল কুড়াইয়া লগনকে বলে, "বুড়ো, তুমি মালা গাঁথতে জান?"

লগন হাসিমুখে ঘাড় নাড়িয়া মালা গাঁথিতে প্রবৃত্ত হয়। শেষ হইয়া গেলে মালাগাছি খোকার গলায় পড়াইয়া দেয়। অপ্রসন্ন মুখে খোকা বলে, "এই বুঝি! তুমি কিচ্ছু পার না; দিদি কেমন গাঁথে!"

তারপর কোলে বসিয়া, কাঁধে চড়িয়া খোকা তাহার বুড়োকে অস্থির করিয়া তোলে।

কাজের ঘণ্টা বাজিতেই লগন উঠিয়া দাঁড়ায়; খোকা বলে, "এখুনি কোথায় যাচ্ছ বুড়ো, আর একটু বোসো না ভাই।"

"না খোকাবাবু, ঘণ্টা বাজি গেছে।" লগন বলে।

খোকা আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করে, "ঘণ্টা বাজলে কি হয়?"

কি হয় তাহা বুঝাইয়া বলিবার মত সময় আর থাকে না, লগন দৌড়াইয়া নিজের কাজে চলিয়া যায়। খোকা চেঁচাইয়া বলে, "বুড়ো, তোমার সঙ্গে আড়ি।"

পরদিনই আবার আসিয়া সে নানা আব্দার সুরু করে; আবার তেমনি করিয়া আড়ি দেয়। এ যেন তাহার প্রত্যহের খেলা।

শ্রমিকদের বিন্দু বিন্দু রক্তে কারখানার উন্নতি হইতেছে। বিরাট লৌহশালা ক্ষুধিত রাক্ষসের মত চারিধারের উন্মুক্ত স্থানটুকুকে ধীরে ধীরে গ্রাস করিয়া লইতেছে। যন্ত্রদৈত্যের অগ্রগতির পথে সকল বাধাই তুচ্ছ! একদিন লগন শুনিতে পাইল কারখানার মধ্যে অপ্রয়োজনীয় ওই বকুল গাছটীকে কাটিয়া ফেলা হইবে। তাহার স্থানে নির্ম্মিত হইবে কারখানার একটী নূতন গৃহ। লৌহদানবের অগ্রগতি এবার এপথে পা বাড়াইবে। লগন যেন কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহার ক্ষুদ্রতম একটু সুখ, তুচ্ছতম একটু আনন্দ হইতে কেহ যে তাহাকে এমনভাবে বঞ্চিত করিতে পারে তাহা যেন লগনের ধারণার বাহিরে। কিন্তু লগনের ধারণা নিয়া জগৎ চলে না, তাই একদিন দেখা গেল কুঠার হস্তে কয়েকজন শ্রমিকসহ ম্যানেজার স্বয়ং গিয়া লগনের রত্নভাণ্ডারের কাছে হাজির হইয়াছেন। তিনি আপন মনেই বলিলেন, "আগে থাকতে লক্ষ্য ক'রলে গাছটা আর এতবড় হ'তে পারত না। ইস্, ফুলে পাতায় তলাটা একেবারে নোংড়া হ'য়ে আছে।" শ্রমিকদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, আজকেই এটাকে শেষ করে দে, কাল থেকেই বিল্ডিং তৈরীর কাজ সুরু হবে।"

লগন নিজের কাজ করিয়া যাইতেছিল; খবর পাইয়া তাহার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল, হাত আর চলিল না। কাজ ফেলিয়া সে ম্যানেজারের কাছে দৌড়াইয়া আসিল, তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "এ গাছটা কাটি ফেলো না সাহেব, বরং আমার মজুরী কমায়ে দাও।"

ম্যানেজার অত্যধিক আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "এ বুড়ো আদমী কি পাগল হ'য়ে গেল নাকি?" তারপর শ্রমিকদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দাঁড়িয়ে কেন, কাজ আরম্ভ করে দে।"

একজন গিয়া কুঠার হাতে তুলিয়া লইতেই লগন পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া গাছটাকে জড়াইয়া ধরিল, চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "না না, আমি কাটতি দেব নি, কাটতি দেব নি।"

একটা গোলমাল বাধিয়া গেল। ম্যানেজারের আদেশে কয়েকজন শ্রমিক আসিয়া বুড়ো পাগলাকে একদিকে টানিয়া লইয়া গেল। গোলমাল শুনিয়া লগনের খোকাবাবু কখন

আসিয়া বাবার কাছটীতে দাঁড়াইয়াছিল। লগনকে টানিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়া ভয়ে ভয়ে সে তার বাবাকে মিনতির সুরে বলিল, "বাবা, এ গাছটা কেটো না বাবা।"

একটুখানি হাসিয়া সস্নেহে ম্যানেজার বলিলেন, "দূর বোকা! এখানে যে মস্ত দালান তোলা হবে।"

খোকা তবু আব্দার ধরিয়া বলিল, "না বাবা দালান তুলো না।"

বিরক্ত হইয়া এবার ম্যানেজার তাহাকে এক ধমক দিলেন, সে ম্লানমুখে চুপ করিয়া একদিকে দাঁড়াইয়া রহিল। টানা চোখ দুটী জলে ভরিয়া আসিল।

অসময়ে কারখানা হইতে স্বামীকে বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া রাধা আশ্চর্য্য হইয়া গেল, বলিল, "কি রে, চলি আস্‌লি কেনে?"

দাওয়ায় বসিয়া পড়িয়া লগন বলিল, "কারখানায় আর কাম করব নি বউ, ভাল লাগে নি।"

"কি হয়েছে, বল্ দিকি।"

"হবে আবার কি? বুড়া ত' হয়ে গেলাম।" বলিয়া লগন চুপ করিল, শত প্রশ্নেও তাহার মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না।

সন্ধ্যাবেলা প্রতিবেশীরা অনেকে আসিয়া জুটিল। লগনের সঙ্কল্প শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইল; বার বার করিয়া বলিল, যে শীঘ্রই তাহাদের মজুরী বাড়িতেছে, সুতরাং লগন যেন এখন কাজ না ছাড়ে।

লগন আর কিছু বলিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সেদিন সারা রাত্রি দুইটী প্রাণী মুহূর্ত্তের জন্যও চোখ বন্ধ করিতে পারিল না না। একজন বৃদ্ধ, অন্যজন শিশু।

সত্য সত্যই লগন কাজ ছাড়িয়া দিল। শত দুঃখ, কষ্ট, অত্যাচার, অবিচারের মধ্যেও যে কাজ সে সমভাবে করিয়া আসিয়াছে, আজ অকারণেই সে তাহার নিকট হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিল।

নবযুগ

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

পুরোনো কপোতগুলো নীড় ছেড়ে দূরে আজ হ'য়েছে উধাও,
নবীন বলাকা-শিশু কচি তার ডানা মেলে উড়ে উড়ে আসে;
সমুখে নয়ন মেলি' পথের প্রান্তে তুমি যাহারে শুধাও,
শুনিবে গাহিয়া যায়—নূতনের স্পর্শ নামে ধরণীর ঘাসে।

বিকৃত কলঙ্কে লেখা বিগত দিবসগুলি হোলো আজ গত,
কালের শিবিরে হের' আঘাত হানিছে নব তরুণ প্রভাত;
দুর্যোগের অন্ধকার অবসান হোলো আজ ব্যথা অশ্রু যত,
এলো দিন শুভদিন আনন্দ-মুখর দিন—হাসির প্রপাত্।

তোমার পুরোনো পুঁথি রেখে দাও দূরে আজ বিভোল্ বেলায়,
এস' এস' নেমে এস' রূপালি কিরণ-পাতে ঊষা-প্রাঙ্গণে;
পুরোনো কপোতগুলো নীড় ছেড়ে দূরে কোথা নিয়েছে বিদায়।
নবীন বলাকা-শিশু নূতনের সাথে সুর মৃদু-গুঞ্জনে।

উঠেছে দিনের রবি ছোট ছোট মুহূর্ত্তের খণ্ড ইতিহাসে,
নূতন যুগের পায়ে এস' এস' রাখি আজ প্রাণের প্রণাম;
তারপরে চৈত্র এলে মোরাও বিদায় লবো দীর্ঘ অবকাশে,
কালের প্রাচীর-গাত্রে লিখে রেখে যাই শুধু আমাদের নাম॥

যুদ্ধ ও ভারতবর্ষ

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমার মনে হইতেছে যে, আমার যাহা বক্তব্য ছিল, তাহা আমি নিবেদন করিয়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছি। তথাপি যে আবার লিখিতে বসিলাম, সে কেবল 'আমার কথাটি ফুরালো, ন'টেগাছটি মুড়ালো' করিবার জন্য। এবার তাহাই করিব।

পাঠক পাঠিকা সংবাদ অবগত আছেন যে, বোম্বাইয়ের গভর্ণমেণ্ট এক বিজ্ঞপ্তির দ্বারা প্রদেশবাসীর পক্ষে কোন ভোজে অথবা উৎসবে ঊনপঞ্চাশ জনের অধিক লোককে ভোজনে আপ্যায়িত করা নিষিদ্ধ করিয়াছেন! কোনও কাজে বা ব্যাপারে পঞ্চাশ বা তদূর্দ্ধ সংখ্যক লোককে ভোজনে আপ্যায়িত করিতে হইলে হোতাকে গভর্ণমেণ্টের অনুমতি লইতে হইবে; বিনা অনুমতিতে কেহ হোতা সাজিলে আইনানুসারে দণ্ডযোগ্য হইবেন। আজ ইহা বিজ্ঞপ্তির দ্বারা প্রদেশবাসীকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কাল, অর্থাৎ দু'এক-মাসের মধ্যেই আইন রচনা করিয়া পাকাপাকি ব্যবস্থা করা হইবে। আমরা খবর পাইয়াছি, বঙ্গদেশেও অনুরূপ একটি আইন প্রণয়নের জন্য তোড়জোড় সুরু হইয়াছে।

ইহাতে বিস্মিত হইবার কোনও কারণ নাই। খাদ্য বস্তুর নিদারুণ অভাব মোচনের উপায় যখন জানা নাই তখন তাসের বাজীর হাতের পাঁচ লইয়াই ইস্তকবিন্তি কাবারের চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাকে সেই কাবার-ইস্তকবিন্তি বলাই সুসঙ্গত।

আরও একটা খবর আছে, তাহাও কম জবর নয়। বোম্বাই প্রদেশে র‍্যাসন কার্ড প্রবর্ত্তনের আশু সুব্যবস্থা হইয়াছে। র‍্যাসন কার্ড (Ration card) নামক বস্তুটির কথা এদেশের লোকের উর্দ্ধতন বাহাত্তর কিংবা অধস্তন ছিয়ানব্বই পুরুষের জানা ছিল না। আমরাও জানিতাম না। আমাদের বিদ্যার দৌড় ছিল, মিলিটারী র‍্যাসন্ শব্দদ্বয় পর্য্যন্ত। মিলিটারীকে বরাদ্দমত খাদ্যবস্তু দেওয়া হয়, ইহা আমরা শুনিতাম; তাহাকেই মিলিটারী র‍্যাসন বলে জানিতাম। যাঁহাদের বিদ্যার পরিধি আরও কিছুদূর বিস্তৃত ছিল, তাঁহারা ইহাও শুনিতেন যে সেকালের অনেক ভারতীয় কমিশেরিয়েটে মিলিটারী র‍্যাসন যোগান দিয়া হাজারে হাজারে লাখে লাখে টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে। র‍্যাসন শব্দের সহিত অধিক পরিচিত হইবার সুযোগ ভারতবর্ষের লোকের হয় নাই। কখনও হইবে এমন সম্ভাবনা তাঁহাদের 'মনের কোণেও ঠাঁই পায় নাই। যুদ্ধ অনেক অঘটন ঘটায়। প্রাচুর্য্যের দেশ, অন্নদাত্রী জগদ্ধাত্রীর লীলাভূমি ভারতবর্ষেও সেই অঘটনই ঘটিল। ভারতবাসীকেও র‍্যাসন কার্ডের সহিত প্রণয়বন্ধনে বাঁধা পড়িতে হইল। এই অদৃষ্টপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব, অচিন্ত্যপূর্ব্ব বস্তুটি কি, এখন তাহাই বলা দরকার! র‍্যাসন কার্ড একখানা কাগজ। সেই কাগজে গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা প্রতি গৃহের অবস্থান ও সংখ্যা, গৃহস্বামীর পোষ্যবর্গের নাম, বয়স ও সংখ্যা ইত্যাদি লিখিয়া, প্রতিমাসে বা প্রতি সপ্তাহে কে কতটা খাদ্যসামগ্রী বাজার হইতে কাঞ্চন (অভাবে রৌপ্য, তদভাবে কাগজ) মুদ্রাব্যয়ে ক্রয় করিতে পারিবে তাহার পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। রামা কতখানি ভাত খায়, শ্যামা কয়খানা রুটি খাইলে তাহার পেটের পীড়া হয় না, হেমা কতটা আলু খাইয়া অনায়াসে হজম করিবে, রামা দুধের বদলে ভাতের ফেন (মাড়) খাইয়া কেন না বাঁচিবে সর্ব্বজ্ঞ সরকারী কর্ম্মচারীরাই তাহার বিচার ও বিশ্লেষণ করিবেন। ধরুন রামার পেটের খোলটা তম্বুরোর মত, দু'বেলা সে দেড় সের চালের ভাত গিলে। তাহার বিশেষ দোষ নাই। বেচারা চা, পাঁউরুটী, কচুরী, সিঙ্গারা, মুড়ী, মুড়কী, হালুয়া কিছুই পায় না—সেই দুপুরে ভাত, আর রাত্রে ভাত। কাজেই তাহার ভাতের পাহাড়টা কাবলি বেরালেও লং জম্পে ডিঙ্গাইতে পারে না। কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারী দেখিলেন, একা রামাই দেড় মণ চাউল মারিয়া দিতেছে, একে চালের অভাব, বর্ম্মা শত্রুকরকবলিত, রামাকে ততখানি দেওয়া যায় না। রামার দেড় সেরের আধ সের কাটা গেল। রামা কেঁউ কেঁউ করিল বটে কিন্তু হাকিমের হুকুম নড়ার রেওয়াজ নাই। লক্ষ লক্ষ অথবা কোটী কোটী রামা পথে ঘাটে কেঁউ কেঁউ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। র‍্যাসন কার্ডে যে মাপ

দেওয়া আছে, তাহার অধিক কোন দোকানীই দিবে না—অন্ততঃ দিলে, আইনভঙ্গ করা হইবে; আইনভঙ্গ করার দুঃসাহস কয়জনেরই বা আছে?—কাজেই যাহা পাওয়া যায়, 'তাই ঘরে লয়ে যাই!' ইহার পরে সরকার বাহাদুর যখন দেখিবেন র‍্যাসন কুলান হইতেছে না, আরও ছাটাই দরকার, রামা পরের বার তাহার কার্ড লইয়া যাইবামাত্র চাল—এক সের কাটিয়া তিন পোয়া করিতে তাঁহারা বাধ্য। রামা কেঁউ কেঁউ ছাড়িয়া একেবারে ঘেউ ঘেউ ধরিল কিন্তু হাকিমের হুকুম! এইরূপ লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী রামা ঘেউ ঘেউ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। যম আর গভর্ণমেণ্ট প্রায় এক জাতীয় জীব, কান্নায় কাণ দিতে গেলে তাহাদের রাষ্ট্র অচল হয়। সে শুধু এদেশে নয়—সর্ব্বদেশে। গবর্ণমেণ্ট মাত্রেরই সকল দেশের বেশীর ভাগ লোকের দস্তুরমত রাগ আছে। এদেশে সেটা আছে এবং বেশী করিয়াই আছে। তাই গালা-গালি, শাপমণ্যির বহর ও বাহার এখানে অধিক।

আমাদের বিশ পঞ্চাশ কিংবা শ' দুই-চার ইয়োরোপ-ফেরত বন্ধুবান্ধব আছেন। খাদ্যাভাবের (scarcity of food) কথা উঠিবামাত্র টেবিল চটাপট করিয়া তাঁহারা ইয়োরোপে সুপ্রচলিত ঐ র‍্যাসন কার্ডের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠেন। তাঁহারা বলেন, এদেশের গভর্ণমেণ্টগুলা একেবারে অপদার্থ, এতদিনেও র‍্যাসন কার্ড বাহির করিতে পারিল না! র‍্যাসন কার্ড করিয়া দিলে লোকের সর্ব্বদুঃখ দূর হইত। আমাদের মত ইয়োরোপ-না-দেখা কোন লোক যদি এ কথা বলিবার সাহস রাখে যে, হে সায়েব মশাই, আমরা পৃথিবীর লোককে অন্নদান করিয়াছি আর আমাদের দেশে কি না র‍্যাসন কার্ড! তাহা হইলে তখনই সায়েব মশাইদের খাদ্যাখাদ্য-পুষ্ট মণিবন্ধের ঘুঁষিতে টেবিলের বিগতজীবনের দেহের শিকড়ে পর্য্যন্ত ভূমিকম্প লাগে। অভাগা আমরা, ইয়োরোপ মহাতীর্থের মৃত্তিকা স্পর্শের সৌভাগ্য আমাদের হইল না, এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই স্বীকার করিতেছি। কিন্তু আমাদের প্রবন্ত-পরিচয় সজ্জনসুহৃদ্‌গণ এই অভাগাদের দেশ, অভাজনগণ-জননী ভারতভূমিকেও দেখেন নাই, মাতার ষড়ৈশ্বর্য্যের কোনও খবরই রাখেন নাই, কেন এদেশের মা-টীকে জগন্মাতার রত্নসিংহাসনে বসাইয়া পূজার ব্যবস্থা ছিল তাহার কোন তত্ত্বই অবগত হইবার বাসনা পোষণ করেন নাই, এখনও করেন না, ইহা দুরদৃষ্ট অথবা শুভদৃষ্টের লক্ষণ? রসাচার্য্য অমৃতলাল বসুর ভঙ্গীতে বলিতে গেলে তাঁহাদের সম্বন্ধে কি এ কথা বলা যায় না যে, নিজের মা খেতে পায় না, ভারত-মাতার জন্যে কেঁদে আকুল! কেন ভারতবর্ষকেই বসুমতী আখ্যায় আখ্যাত করা, কেন আমাদের জন্মভূমিকে গর্ভধারিণী জননীর সমতুল্য ও উভয়কেই স্বর্গাদপি গরীয়সী বলিয়া স্তুতি করা হইত, শুধুমাত্র ইয়োরোপের বিদ্যাবারিধি মন্থন ক'রলে তাহার হদিস পাইবার সম্ভাবনা কোথায়?

যাক্ র‍্যাসন কার্ডের কথা ঐ পর্য্যন্ত। র‍্যাসন কার্ডের ফলে দুঃখের কষ্টের অনুচ্ছেদে পূর্ণচ্ছেদ পড়িবে একথা আমরা আদৌ মনে করি না। বরং সর্ব্বদাই আতঙ্কিত হইয়া আছি ও রহিব—অপরস্থা কিং ভবিষ্যতি।

আমরা ইহাও অবগত আছি যে বোম্বাইয়ের অনুকরণে বঙ্গদেশেও র‍্যাসন কার্ড প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব কাণাঘুষায় চলিতেছে। অনেক তথাকথিত মান্যগণ্য লোক (যে-সে লোক নহে।) সংবাদ ও সাময়িক পত্রাদিতে তথাকথিত সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়া (ছাই পাঁশ নহে!) সত্বর র‍্যাসন কার্ড চালু করিয়া লোকের অবর্ণনীয় দুঃখ দূরীকরণার্থ সরকার বাহাদুরকে সাধ্য সাধনা করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছেন। রবিবার ১৪ই ফেব্রুয়ারী অমৃতবাজার পত্রিকায় এক নামজাদা উকীল (পেশা ডাক্তারী।) র‍্যাসন কার্ডের ওকালতী প্রসঙ্গে 'খাদ্য ফসল বাড়াও' (Grow more food) জমির সার (manure) ইত্যাদি সম্পর্কে মামুলী গবেষণার হদ্দমুদ্দ করিয়া ছাড়িয়াছেন। এই ব্যক্তি বিদ্বান, অতএব বিশেষজ্ঞ। সব শেয়ালের এক রা, সব বিশেষজ্ঞেরও এক বুলি। বৈজ্ঞানিক সার না দেওয়াতে, ফসলের বীজ সম্পর্কে চাষীরা সচেতন না হওয়াতে এবং ইত্যাদি ও প্রভৃতিতেই আমাদের খাদ্যশস্যের অভাব ঘটিয়াছে, তাই র‍্যাসন কার্ড চাই। তাঁহাদের বিশ্বাস ও ধারণা যে আমাদের লম্বকর্ণজাতীয় চাষাদের বিদ্যাহীনতা, বুদ্ধিহীনতার ফলে ফসল কম জন্মিতে-ছিল, তদুপরি দুইটি অঘটন সংঘটিত হওয়ায় আক্কেলগুড়ুম হইয়া পড়িয়াছে, শয়তান তোজো ব্রহ্মদেশ কাড়িয়া (এখানকার মত!) লইয়াছে; দুই, যুদ্ধের জন্য লাখ কতক সৈন্য সামন্ত আসিয়া খাদ্যে ভাগ বসাইয়াছে বলিয়াই এই হাহাকার। হাসির কথা। কিন্তু হাসিব না, হাসিলেই বিপদ।

বিদ্বানের কথা শুনিয়া মূর্খেই হাসে, কেন না বুঝিতে পারে না, তত্ত্ব গ্রহণের অক্ষমতা হাসিয়া পূরণ করিতে বাসনা। অতএব আমরা হাসিব না, গম্ভীর হইয়া থাকিব। গাল বাড়াইয়া চড় খাইতে কাহার সাধ? কিন্তু কথাটা কি অত্যন্ত অন্তঃসারশূন্য নয়? ভারতভূমি স্বর্গভূমি কি না, ভারত ঐশ্বর্য্যশালিনী কি না সে সম্বন্ধে আমরা আমাদের ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ না করিয়া একজন খাঁটি ইংরাজ, মুনা আই-সি-এসের লেখনী প্রসূত বাণী উদ্ধৃত করিতেছি। "The country as a whole is rich in natural resources and it is for this reason that it has for centuries been an irresistible prize to the covetous nations of the world. Century after century they (including the British, if you like!) have poured into India by land and by sea. Why? Because India is a tempting prize." (মিঃ পি, জে, গ্রিফিথস লিখিত 'Why can't he mind his own business' নামক সুলিখিত পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত)।

দেশ নদী মাতৃক। নদীর জল অতীব সুস্বাদু, স্বচ্ছ, সুশীতল। দিগন্ত হইতে দিগন্ত বিস্তৃত শ্যামল বনরেখা, তাহারই ক্রোড়ে ধূসর ক্ষেত্র - ঋতুর রঙ্গে সঙ্গে তাহার রূপ পরিবর্ত্তন। কখন শ্যাম, কখনও সবুজ, কখন হরিৎ। ক্ষেত্রে ক্ষেত্রভরা ফসল। ফসল ত' নয়, সোণা। আকাশ নীল। নীল আকাশে দিবসে প্রখর সূর্য্য, নিশীথে মধুময়ী চন্দ্রমা। আকাশের নিবিড় নীল ঢাকিবার কেহ নাই, কিছু নাই, সূর্য্য কাহারও ভয়ে বা দাপটে আত্মগোপনে অনভ্যস্ত। সূর্য্যতাপে তাপিত বিশ্ব চন্দ্রমাশালিনী নিশীথিনীর শান্ত-শীতল ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়ে। বৃষ্টির সময়ে বৃষ্টি। বৃষ্টি সৃষ্টি ভাসাইয়া দিয়া যায়, সূর্য্য সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া শুকাইয়া লয়। নীল সাগরশীকর ধরিত্রীর অঙ্গে ব্যজন করে। এই আমার দেশ, এই আমার মা, এই আমার ভারতবর্ষ, এই মাটির সকল অঙ্গ বেড়িয়া নদ-নদীগুলা রত্নালঙ্কার বিভূষিতা করিয়া রাখিয়াছিল। বৈজ্ঞানিক জানুন আর নাই জানুন যেখানে নদীর জল টল টল ছল ছল কল কল, সেখানেই কৃষকের একগুণ শ্রম দশগুণ পুরস্কৃত। সেই জন্যই রত্নপ্রসবিনী স্বর্ণভূমি ভারত, খাইয়া, ফেলিয়া, ছড়াইয়া, বার মাসে তের পার্ব্বণে বাহুল্য, অতিশয় বাহুল্য করিয়াও বিশ্বের ক্ষুধিতের মুখে অন্ন তুলিয়া দিত, ভিক্ষুক-বিশ্ব যুগে যুগে শতাব্দীতে শতাব্দীতে বিরস আননে বিশুষ্ক উদরে বিশ্বের গোলাঘরে (granary) ভারতের দ্বারে ধর্ণা দিত। র‍্যাসন কার্ড করিয়া নয়, মাপজোক করিয়া নয়, থরে থরে ভারে ভারে অন্ন দিয়া ক্ষুধিতের ক্ষুধা মিটাইত, আর আজ? দশ বিশ লক্ষ বিদেশী সৈন্য সামন্ত আসিয়াছে বলিয়াই আমাদের অন্নকষ্ট হইয়াছে বিদ্বানের, বৈজ্ঞানিকের এই সিদ্ধান্ত! হারে দগ্ধ অদৃষ্ট!

যে দেশে বার মাসে তের পার্ব্বণের সূত্র ধরিয়া কত গাথা, কত কাহিনী, কত কাব্য রচিত হইয়াছিল, যে তের পার্ব্বণের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ ছিল ভূরিভোজন, যে দেশের একটা গ্রামের পার্ব্বণোপলক্ষ্যে দশ বিশটা গ্রাম উৎসবের রূপ ধরিত, ভিখারীরও অগ্নিমান্দ্য হইবার উপক্রম করিত, যে দেশের কাঙ্গের বাড়ীতে যথাসম্ভব অতিথি সমাগম না হইলে গৃহস্বামীর মনঃপীড়ার অন্ত থাকিত না, ছুতানাতায়—তা ষষ্টিপূজা, মাকাল পূজাই হোক আর নাতি নাতনীর আটকৌড়ে, অন্নপ্রাশন, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী খনন, চতুর্থীশ্রাদ্ধ প্রভৃতির উপলক্ষ্য ধরিয়াই হোক, কতকগুলা পাতা পাড়ানোই যে দেশের লোকের লক্ষ্য ছিল, সেই দেশ আজ উনপঞ্চাশজনের অধিক লোককে এক সাথে এক পাত দিলেই রক্তচক্ষু প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে; সেই দেশের লোকের র‍্যাসন কার্ড হাতে লইয়া দৈনন্দিন জীবনধারণোপযোগী আহার্য্য সংগ্রহ করিবার দরকার হইল। আমাদের ভ্রমও আশঙ্কা আছে যে এমন একটি দিন আসিবে যেদিন র‍্যাসন কার্ড অক্ষুণ্ণ থাকিলেও র‍্যাসন ওমিশন হইলেও হইতে পারে।

যাঁহারা নিজের দেশকে ভালবাসেন, স্বদেশের খবর রাখেন, রাখিয়া আনন্দ বোধ করেন, তাঁহারা দেশের বার মাসের তের পার্ব্বণেরও খবর জানেন, আর তেরো পার্ব্বণে তিন সাঁজ চর্ব্বচূষ্য লেহ্য পেয়ের কথাও শুনিয়াছেন। সে কালের একটি শ্রাদ্ধবাড়ীর আলেখ্য আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। কোথা হইতে উদ্ধৃত করিলাম তাহা বলিব না, বলিবার প্রয়োজন আছে বলিয়াও মনে করি না। হয় ত' যাহাদের নিকট বিলাতী পণ্ডিত হইতে বিলাতী কুকুর ছাড়া অপর কিছু সমাদৃত নহে, তাহারা উদ্ধৃতাংশের অবস্থিতি ও রচয়িতার সংবাদ জ্ঞাত নহেন, কিন্তু তাহাতে কিছু আসে

যায় না, তাহাদের নিকট দেশী কথা মাত্রেই রাবিশ ; বাঙ্গালা সাহিত্য, বাঙ্গালা মাসিকপত্র, তাহার প্রবন্ধ সবই আবর্জ্জনা ; কেবল গর্ব্ব বুঝাইবার কাজে লাগে। চিত্রটি এই—

"দিনকতক মাছির ভন্‌ভনানিতে, তৈজসের ঝন্‌ঝনানিতে কাঙ্গালীর কোলাহলে, নৈয়ায়িকের বিচারে, গ্রামে কান পাতা গেল না। সন্দেশ মিঠাইয়ের আমদানি, কাঙ্গালীর আমদানী, টিকি নামাবলীর আমদানী, কুটুম্বের কুটুম্ব তস্য কুটুম্ব তস্য কুটুম্বের আমদানী, ছেলেগুলা মিহিদানা সীতাভোগ লইয়া ভাটা খেলাইতে আরম্ভ করিল ; মাগীগুলা নারিকেল তৈল মহার্ঘ দেখিয়া মাথায় লুচিভাজা ঘি মাখিতে আরম্ভ করিল ; গুলির দোকান বন্ধ হইল, সব গুলিখোর ফলাহারে ; মদের দোকান বন্ধ হইল, সব মাতাল টিকী রাখিয়া নামাবলী কিনিয়া উপস্থিত বিদায় লইতে গিয়াছে। চাল মহার্ঘ হইল, কেননা কেবল অন্ন ব্যয় নয়, এত ময়দা খরচ যে আর চালের গুঁড়িতে কুলান যায় না ; এত ঘৃতের খরচ যে মাগীরা আর ক্যাষ্টর অয়েল পায় না ; গোয়ালার কাছে ঘোল কিনিতে গেলে তাহারা বলিতে আরম্ভ করিল "আমার ঘোলটুকু ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে দই হইয়া গিয়াছে।"

শ্রাদ্ধ—তাও হয় ত' বড়লোকের ও বুড়া লোকের শ্রাদ্ধ, এতটা হইলেও হইতে পারে। ভাল, সামান্য একটা জামাই আসার ব্যাপারে কি ঘটিত, তাহারই একটা চিত্র উদ্ধৃত করিতেছি। চিত্রকর উভয় ক্ষেত্রে একই মনীষী।

"তখনকার দিনে একটা জামাই আসা সহজ ব্যাপার ছিল না।......পুকুরে পুকুরে মাছ মহলে ভারি হুটাহুটি ছুটাছুটি পড়িয়া গেল। জেলের দৌরাত্ম্যে প্রাণ আর রক্ষা হয় না। জেলে মাগীদের হাঁটাহাটিতে পুকুরের জল কালী হইয়া যাইতে লাগিল। মাছ চুরির আশায় ছেলেরা পাঠশালা ছাড়িয়া দিল। দই, দুধ, ননী, ছানা সর মাখনের ফরমাইসের ঠেলায় গোয়ালার মাথা বেঠিক হইয়া উঠিল। সে কখনও এক সের জল মিশাইতে তিন সের মিশাইয়া ফেলে, তিন সের মিশাইতে এক সের মিশাইয়া বসে। কাপড়ের ব্যাপারীরা কাপড়ের মোট লইয়া যাতায়াত করিতে করিতে পায় ব্যথা হইয়া গেল ; কাহারও পছন্দ হয় না, কোন্ ধুতি চাদর কে জামাইকে দিবে। পাড়ার মেয়ে মহলে বড় হাঙ্গামা পড়িল। যাহার যাহা গহনা আছে, তাহারা সে-সকল মাজিতে, ঘষিতে, নুতন করিয়া গাঁথাইতে লাগিল। যাহাদের গহনা নাই, তাহারা চুড়ি কিনিয়া, শাঁকা কিনিয়া, সোনারূপা চাহিয়া-চিন্তিয়া একরকম বেশভূষার যোগাড় করিয়া রাখিল—নহিলে জামাই দেখিতে যাওয়া হয় না। যাঁহাদের রসিকতার জন্য পসার আছে—তাঁহারা দুই চারিটা প্রাচীন তামাসা মনে মনে ঝালাইয়া রাখিলেন ; যাহাদের পসার নাই, তাহারা চোরাই মাল পচার করিবার চেষ্টায় রহিল। কথার তামাসা পরে হইবে—খাবার তামাসা আগে। তাহার জন্য ঘরে ঘরে কমিটি বসিয়া গেল। বহুতর কৃত্রিম আহার্য্য, পানীয়, ফলমূল প্রস্তুত হইতে লাগিল। মধুর অধরগুলি মধুর হাসিতে ও সাধের মিশিতে ভরিয়া যাইতে লাগিল।"

কতদিন আগের এ চিত্র? দেড় শত, বড়জোর দুইশত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালার এই ছবি।

আজও জামাই শ্বশুরগৃহে আসে—চোরের মত চুপ চাপ আসে—চুপে চুপে চলিয়া যায়। মধুর অধরগুলি মধুর হাসিতে না ভরিলেও, দুশ্চিন্তায় কুঞ্চিত হয় নিশ্চয়ই। কোথায় চাল-ডাল, কোথায় ঘি, কোথায় আটা, কোথায় মাছ? জামাই আনিতে অবশ্য সকলেই চায় কিন্তু আজ ঠেলা সামলাইতে গৃহস্থের জান্ নিকলাইবার অবস্থা।

বড় লোকের বাড়ী জামাই আসিলে ঘটাপটা হইত, পাঠক ইহা মনে করিতে পারেন। ভাল। একটা অজ পল্লীগ্রামের একটি ক্ষুদ্র আলেখ্য দেখাইব। আলেখ্যকার একই—স্মরণীয় ও বরণীয় পুরুষ।

"একটা বৃহৎ আম্রকানন মধ্যে একটি ছোট বাড়ী, চারিদিকে মাটির প্রাচীর, চারিদিকে চারিখানি ঘর। গৃহস্থের গরু আছে, ছাগল আছে, একটা ময়ুর আছে, একটা ময়না আছে, একটা টীয়া আছে। একটা বাঁদর ছিল কিন্তু সেটাকে আর খাইতে দিতে পারে না বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। একটা ঢেঁকি আছে, বাহিরে খামার আছে, উঠানে লেবু গাছ আছে কিন্তু এবার তাহাতে ফুল নাই। সব ঘরের দাওয়ায় [মাটির বাড়ী নিশ্চয়, কেন না কোঠা বাড়ীর দাওয়া হয় না, রোয়াক হয়।—লেখক] একটা একটা চরকা আছে কিন্তু বাড়ীতে বড় লোক নাই।" সামান্য—অতি সামান্য গৃহস্থ সন্দেহ নাই। একদা মধ্যাহ্নে প্রায় অসময়ে অতিথির আগমন হইল। গৃহ-

স্বামিনী "পিঁড়ি পাতিয়া জলছড়া দিয়া জায়গা মুছিয়া, মল্লিকা ফুলের মত পরিষ্কার অন্ন, কাঁচাকলাইয়ের ডাল, ডুমুরের ডালনা, পুকুরের রুই মাছের ঝোল এবং দুগ্ধ আনিয়া" অতিথি সৎকার করিল। কিন্তু অতিথির উদরটি জালা বিশেষ, সৎকার পুরাপুরি হয় নাই দেখিয়া অনুপস্থিত গৃহস্বামীর জন্য যে অন্ন রাখা ছিল গৃহস্বামিনী তাহাও আনিয়া ঢালিয়া দিল। তাহাতেও সে দামোদর ভরে না, একটি পাকা কাঁঠাল আনিয়া দিল, অতিথি সেটিও সেই ধ্বংসপুরে প্রেরণ করিলেন। কেমন পাঠক, গরীব গৃহস্থের গৃহের এই রমণীয় চিত্র আজ কি কোথাও দেখিতে পাইবেন?

যুদ্ধ যদি আরও অনেকদিন চলে, (দশ-বিশলক্ষ বিদেশী সৈন্য সামন্ত খাদ্য নিঃশেষে খাইতেছে বলিয়াই যে আমরা এ কথা বলিতেছি তাহা নয়, পাঠক পরে তাহা বুঝিবেন!) ধরিত্রীর মণিকোঠানিহিত খনিজ মণি মাণিক্যের যথারীতি বিলোপ সাধন ঘটিতে থাকে এবং আগ্নেয়াস্ত্র (বোমা ইত্যাদি) পড়িতে থাকে, তাহা হইলে ভূমির যেটুকু উৎপাদিকাশক্তি আজও আছে তাহাও যে অন্তর্হিত হইবে তাহা অবধারিত সত্য। হের হিটলার ইয়োরোপের বহু জনপদ জয় ও দখল করিয়াছেন। অধিকৃত দেশসমূহ হইতে বলপূর্ব্বক হোক আর প্রলোভন দেখাইয়াই হোক চাষী আনাইয়া খাদ্যবস্তু উৎপাদনের বহু আয়াস ও প্রয়াস করিতেছেন কিন্তু দুঃখের কথা এই যে এই দিগ্বিজয়ী মহাবীরের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। জমি, যুদ্ধের আগে যেটুকু দিত, এখন তাহাতেও অক্ষম। ইয়োরোপে হিটলারের যে দশা, এশিয়ায় তাহার এশিয়াটিক দোস্ত তোজোরও সেই হাল। চীনের কোরিয়া অধিকৃত করিয়াও দেখা গেল যে, যে পরিমাণ তণ্ডুল পাইলে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, কোরিয়ার মৃত্তিকা তাহা দিতে পারে না। মাঞ্চুকো দখল করিয়া দেখিল, আশা মিটে না। অতঃপর চীনের দিকে হাত বাড়াইতে হইল। আর একটি হাত ভারতের পানে বিস্তৃত হইল। ক্ষুধিতের আশা—খাদ্যবস্তু।

খাদ্যবস্তু বলিতে আমরা (বঙ্গদেশবাসী) মূলতঃ চাউল বুঝি, তাই আমরা চাউলের অভাব লইয়াই আলোচনা করিয়াছি। তা' বলিয়া কেহ যেন ইহা মনে না করেন যে, একমাত্র ঐ বস্তুটিরই অভাব ঘটিয়াছে। অভাব সর্ব্ববিধ এবং সর্ব্বদ্রব্যেরই। তবে ঐ বস্তুট থাকিলে এবং অন্য কোন বস্তু না থাকিলেও চলিতে পারে বলিয়া আমরা খাদ্যবস্তু বলিতে চাউলের উল্লেখ করিয়াছি। প্রধানকে প্রধানের আসন দিয়া কোনও অপরাধ হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। আমাদের মধ্যে বহুলোক আছেন, যাঁহারা আজ দারুণ অন্নাভাবের মধ্যে পড়িয়া যুদ্ধকে এবং যুদ্ধজনিত ব্রহ্মদেশের পতনই চাউলের অভাবের মুখ্য কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে দ্বিধা করিতেছেন না। বাস্তবপক্ষে তাহা যে সত্য নয়, নিম্নলিখিত সংবাদ পাঠ করিলে তাহা স্বীকৃত হইতে বাধ্য। ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে টোকিও হইতে বেতারে বলা হইয়াছে যে জাপানী রাজসরকারের কৃষিমন্ত্রী এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি দিতেছেন যে সমগ্র জাপানের বিলাস ভোজন ও পানশালাগুলি বন্ধ করিবার আদেশ অবিলম্বে দিবেন। ইহার উদ্দেশ্য সৎ ও মহৎ, কারণ, তিনি বলিয়াছেন, দেশের খাদ্যবস্তু যাহাতে যথাপরিমিতভাবে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বণ্টিত হইতে পারে তাহারই জন্য ঐ ব্যবস্থা। খাদ্যবস্তুর যতদিন প্রাচুর্য্য ছিল, ততদিন যাহা সম্ভব হইয়াছিল, আজ যখন অভাব ঘটিয়াছে, তখন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেই হইবে! ইহাও সেই একটা গর্ত্ত খুঁড়িয়া আর একটা গর্ত্ত বুজাইবার সুব্যবস্থা। আমাদের দেশে না হয় ব্রহ্মের চাউল আসে না বলিয়া দুর্দ্দশা কিন্তু জাপানীরা ত' ব্রহ্মদেশ জয় করিয়াছে, ব্রহ্মের সমস্ত চাল আজ তাহার। তথাপি তাহার এমন দুরবস্থা কেন?

বসুমতী ধন প্রসব না করিলে ধন কেহ গড়িতে পারে না ইহা সাধুর উক্তি, জ্ঞানবানের কথা। আমরা পাঠককে সেই কথাই ইতঃপূর্ব্বে স্মরণ করাইয়াছি, আজও সেই কথাই স্মরণ করাইতেছি। মূল ছাড়িয়া শিরে জল সিঞ্চন করিয়া কি ফল হইবে তাহাই ভাবিতে হইবে। ইয়োরোপ, আমেরিকা, এসিয়া, ইংলণ্ড, জার্ম্মেনী, জাপান, ভারতবর্ষ সর্ব্বত্র এবং সকল মানুষেরই এক সমস্যা—সেই একটি বস্তু, তাহারই জন্য সাচ্ছন্দ্য, আবার তাহারই অভাবে হাহাকার।

আজ সে বস্তু, সে ধন এমনই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে যুদ্ধ আর অধিক দিন চলিলে সেই বস্তু, সেই ধন যে আদৌ অপ্রাপ্য হইয়া উঠিবে বাস্তব পৃথিবীর পানে চক্ষু মেলিয়া চাহিলে কি তাহাই দেখিতে হয় না? মনকে আঁখি ঠারিয়া আর কতকাল চলিবে?

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চারিটি পন্থা (মাঘ—বঙ্গশ্রী উপক্র-

ধনিকা অধ্যায় দ্রষ্টব্য) যাঁহারা মনোযোগ পূর্ব্বক পড়িয়াছেন, তাঁহারা স্মরণ করিতে পারেন, মর্ম্মবিদারক ভাষায় তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—"কে যেন বলিতেছেন যে মানব সমাজ বড় ক্লান্ত। কতকগুলি দয়ামমতাহীন দাম্ভিকতাপূর্ণ মানুষের ভ্রান্তির জন্য অনেক নিরীহ মানুষ বড় হৃদয়বিদারক অবস্থায় নিপতিত হইয়াছে। এখন জগৎকে ভারতীয় ঋষির কথা শুনাইবার সময় আসিয়াছে।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "যিনি আমাদের কলমের ভিতর দিয়া এই কথাগুলি শুনাইতেছেন তাঁহারই কার্য্যের ফলে মানুষ এই কথাগুলি শুনিবেন।" কি অবিচলিত বিশ্বাস! কি কুণ্ঠাবিবর্জ্জিত অভিব্যক্তি! ভারতের ঋষির কথায় অপরিসীম শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তির মুখে যখন ঐ কথা শুনি এবং যখন আরও শুনি যে "ভারতবর্ষের জমির প্রাকৃতিক উর্ব্বরাশক্তি এখনও যাহা আছে, তাহা আর হ্রাস না পাইলে, ঋষির পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া উহা আগামী সাত বৎসরের মধ্যে পুনরুদ্ধারিত করা সম্ভব এবং তখন যে দেশে যে কাঁচা মালের যে পরিমাণের অভাব আছে তাহা ভারতবর্ষ হইতেই পূরণ কর সম্ভব হইবে," তখন আশার অফুরন্ত আলোকজ্জ্বল ভবিষ্যতের আলেখ্যখানি কি প্রোজ্জ্বল, মধুর ও মহিমময় হইয়া উঠে না? ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধাবলীর নিয়মিত পাঠকের মনে এই ধারণা জাগা অস্বাভাবিক নহে যে, যুদ্ধবিগ্রহে পরিশ্রান্ত ও একান্ত ক্লান্ত জগৎ শান্তির সন্ধান করিতেছে এবং তাহারই সন্ধানে শান্তির তপোবন প্রাচুর্য্যের পুণ্যভূমি রবিকরোজ্জ্বল ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতীয় মন্ত্রে দীক্ষা লইবার সময় তাহার সমাগতা? এই কথাই কি মনে অহরহ জাগে না যে, হে ঈশ্বর জগতের সেই সুমতি ফিরিয়া আসুক, আমরা পৃথিবীবাসী বাঁচি, পৃথিবী নিশ্চিত ধ্বংস হইতে বিমুক্ত হোক্?

তারপরই যখন চার্চ্চিল সাহেবের মুখের কড়া চুরুটের চড়া দুর্গন্ধ ভেদ করিয়া শত্রুর রক্ত চাই রবে নির্ঘোষ বাহির হইতে শুনি, রুজভেল্ট সাহেব তুলাদণ্ড ধারণ করিয়া বিশ্ব একদিকে আর শত্রু নিপাতন অন্যদিকে বলিয়া বজ্রনাদ করেন শুনি, তখন বিহ্বলচিত্তে এই প্রশ্নই কি বারম্বার উদিত হয় না যে, কোথায় শ্রান্তি? কোথায় ক্লান্তি? শোণিত নদীতে শোণিতের প্রবাহ বৃদ্ধির জন্যই শক্তিমানগণ সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিয়া বসিয়া আছেন, শান্তির কামনা কোথায়? উপরে আমরা যে দুই ব্যক্তির নাম করিলাম, তাঁহাদের তুল্য শক্তিধর বর্ত্তমান জগতে কেহ না থাকিতে পারেন, জগতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার তাঁহারাই হাতে লইয়াছেন। চার্চ্চিল সাহেবের চুরুটের দৈর্ঘ্য প্রস্থ, তাহার ছাইয়ের রঙ, পরিমাণ নির্দ্ধারণে ইংলণ্ডের সংবাদপত্রগুলি আকুল, ইহাতেই তাঁহার লোকপ্রিয়তা হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। ইনি ইংলণ্ডের—তথা বৃটিশ সাম্রাজ্যের লোকগুলিকে রক্তপিপাসু করিয়া রক্তের সন্ধানে প্যারেড করাইতে বদ্ধপরিকর। আমেরিকা আধুনিক জগতে সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী, সর্ব্বশক্তির অধিকারী, তাহার সর্ব্বনিয়ন্তারও সেই এক কথা—রক্ততৃষা! যুদ্ধ জয়! যুদ্ধ জয়ের পরে তাঁহারা পৃথিবীতে শান্তির ফসল বপন করিবেন। ভরসা আছে এই দুই শক্তিমানের নির্দ্দেশে পৃথিবী জুড়ি জুড়ি শান্তি রূপী কদলী প্রসব করিবেন। এ কথা তাঁহারা কবে বুঝিবেন যে যুদ্ধে জয় পরাজয় স্থির করিয়া যুদ্ধের প্রবৃত্তির উচ্ছেদ সাধন কখনও করা যায় না? ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত এই সত্যই বা তাঁহারা কবে পাঠ করিবেন যে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইয়া কখনও কোন সাম্রাজ্যকে দীর্ঘস্থায়ী করা যায় নাই। সাম্রাজ্যকে দীর্ঘস্থায়ী করিতে হইলে যুদ্ধবিগ্রহ কি করিয়া চাপা দিতে হয় তাহারই বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হয়।...ইতিহাসে পাঁচশত বৎসরের অধিক স্থায়ী রাজ্যের কথা দেখা যায় না। ইতিহাসে যে সমস্ত রাজ্যের কথা আছে তাহাদের অধিকাংশই দুই শত বৎসরের অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। কেন পারে নাই তাহার কারণ সন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, অধিকাংশ রাজত্বই যুদ্ধে মূলতঃ পরাজয়ের ফলে নষ্ট হয় নাই। যুদ্ধ জয় করিতে করিতে যুদ্ধপ্রবৃত্তি বাড়িয়া গিয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে দৌর্ব্বল্য আসিয়াছে, অবশেষে পরাজয় ঘটিয়াছে অথবা রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে।"

আমরা চার্চ্চিল ও রুজভেল্ট নামধারী দুই মহাপুরুষ মাতব্বরের মন্তব্য করিলাম, হিটলারের কথা বলিলাম না, ইহাতে সেই মহাজনের রোষের সঞ্চার হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে; মাতব্বর তিনিও কম নহেন। অতএব সুবোধ বালকের মতো, তাঁহার মন্তব্যটাও বলি। তাঁহারও সেই মাভৈঃ! যুদ্ধ প্রায় ফতে করিয়া ফেলিয়াছি। যেটুকু বাকী আছে, তাহা রক্তনদীর বানে ভাসাইলাম বলিয়া!

কই! তিনজন বিশ্ব-নিয়ন্তার কথায়, ভঙ্গীতে, ভাবে

শ্রান্তি ও ক্লান্তির কোন লক্ষণই ত দেখি না ; দম্ভের লাঘব এতটুকুও হয় নাই। তা হয় নাই সত্য ; তাঁহাদের শ্রীমুখ হইতে শ্রান্তি ও ক্লান্তির আভাষ ইঙ্গিতে বাহির হইলে তিন তিনটা মহাজাতির যোদ্ধৃকুল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িবে বলিয়া তাঁহারা শ্রান্ত ও ক্লান্ত বাহুর আস্ফালন করিয়া বায়ুমণ্ডল বিখণ্ডিত করিতে বাধ্য, ইহাও সত্য ; তবু মনে হয় পৃথিবী সত্য সত্যই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে ; তাহার প্রাণশক্তিটুকু কণ্ঠনালীর নীচে আসিয়া ধুক্ ধুক্ করিতেছে এ-কথাগুলা আমি আমার নিজের মনের ভাব বিচার করিয়াই বলিতেছি। আমাকে, তোমাকে ও তাহাকে লইয়া যদি এই জগৎ গঠিত হয়, তবে তোমার ও তাহার মনের গহন অন্বেষণ করিলে ঐ কথাই পাইবে, জগৎ অত্যন্ত ক্লান্ত, অতিশয় শ্রান্ত। তোমার মন, তাহার মন, আমার মন—সবগুলি মনই একটা শেষ দেখিতে চাহিতেছে ; শান্তি চাহিতেছে ! মনে হয় জগতের যেখানে যে মানুষ মানুষী থাক্ না কেন, সকলেই শ্রান্ত ক্লান্ত চিত্তে শান্তির জন্ম বিশ্ববিধাতার কাছে কায়মনে প্রার্থনা করিতেছে।

আর নয়—কথা শেষ করিতে হয়। পাঠককে নূতন কথা কিছুই বলিতে পারিলাম না। পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি করিলাম মাত্র। নূতন কথা কেইবা শুনাইতে পারে ? চার্চ্চিল বলুন, রুজভেল্ট বলুন, হিটলার বলুন, তোজো বলুন, মুসোলিনী বলুন, সকলের মুখেই সেই পুরাতন কথা—বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী, রক্ত চাই, রক্ত চাই। ইহারই মধ্যে এই রণদামামার লহমা অবসরকাল মধ্যে, এই রক্ত নদীর কলধ্বনির অবিশ্রান্ত ঝঙ্কারের একটি ক্ষণমাত্রস্থায়ী নিঃশব্দ কালমধ্যে মাত্র একজন ভারতীয় একটি নূতন কথা বলিতে অগ্রসর হইয়াছেন। কথা নূতন নয়, অতি পুরাতন। কিন্তু অজ্ঞানতার অন্ধকার হইতে এই সর্ব্বপ্রথম লোকশ্রবণের গোচর হইল বলিয়া ইহাকে নূতন বলিলাম। কিন্তু সে কথা শক্তিমানের দম্ভাচ্ছন্ন কর্ণে পশিবে কি ? যদি পশে, তবে সে কবে ?

একদিন একটা মহাযুদ্ধের পরে জগতে কেবল মাত্র বিধবার বিলাপ শ্রুত হইয়াছিল একথা আমরা সকলেই বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থে পাঠ করিয়াছি। জগতে কি সেই দিনই পুনরাগমন করিতেছে ? পৃথিবী ব্যাপিয়া বিধবার করুণ ক্রন্দন যতদিন না পৃথিবীকে বিক্ষুব্ধ করিতেছে ততদিন কি জগতের শোণিত তৃষা মিটিবে না ?

যুদ্ধে জয় পরাজয়ের উপর যুদ্ধের অবসান যে আদৌ নির্ভর করে না, তাহা আমরা নানা দৃষ্টান্তের দ্বারা পাঠককে বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছি। আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস, তাঁহারা নিজেরাও ইহা বুঝিতে পারেন। রক্ত দিয়া রক্তের পিপাসা ঘুচে না। সে পিপাসা মিটাইতে হইলে উপায়ান্তরের সন্ধান করিতে হয়। সে উপায়ান্তর কি ? উপায়ান্তর, পৃথিবীতে খাদ্যের প্রাচুর্য্যের সংস্থান করা। সমগ্র মানব-সমাজের প্রত্যেকের খাদ্যাভাব, অর্থাভাব যতদিন না বিদূরিত হইবে, ততদিন মানবসমাজে চোর, ডাকাত হইতে সুরু করিয়া ধাপে ধাপে চড়িতে চড়িতে তোজো হিটলারের-আবির্ভাব ঘটিবেই। চৌর্য্যবৃত্তিও থাকিবে, যুদ্ধের প্রবৃত্তিও জাগ্রত রহিবে।

অনেকে মনে করেন (আমরাও সেই অনেক ছাড়া নহি) যে সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেকটি মানুষের অর্থাভাব দূর করা সম্ভব নয়। কিন্তু ভারতীয় ঋষিবাক্যে অবিচল বিশ্বাসী ভট্টাচার্য্য মহাশয় অকুণ্ঠ কণ্ঠে বলিতেছেন, "সম্পূর্ণ সম্ভব।"

কি করিয়া সমগ্র মানব সমাজের প্রত্যেকের অর্থাভাব দূর করিয়া আজিকার এই নরকতুল্য পৃথিবীকে প্রত্যেকটি মানুষের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে স্বর্গতুল্য সুখময় আবাসস্থল করিতে পারা যায় তাহার কর্ম্মযোগ্য পন্থা ভারতবর্ষের ঋষিগণ দেখাইয়াছেন। ঐ কার্য্যযোগ্য পন্থা ভট্টাচার্য্য মহাশয় মানবসমাজকে শুনাইবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। দুঃস্থ, দুর্দ্দশায় কাতর, ম্লানমুখ ক্লান্তহৃদয় শ্রান্ত মানব সেই পন্থার কথা শুনিবার আশায় উদগ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

কর্ম্মযোগ্য কথাটির প্রতি আমরা সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। পন্থা বহুবিধ থাকিতে পারে, তন্মধ্যে সম্ভব ও অসম্ভব—যাহা মানুষের সাধ্যায়ত্ত এবং যাহা আমাদের অর্থাৎ মানুষের সাধ্যাতীত। যে পন্থা মানুষ অবলম্বন করিতে পারে, যে পন্থা অবলম্বিত হইলে সকলমনোরথ হওয়া যায়, তাহাকে কার্য্যযোগ্য পন্থা বলা যায় এবং অসম্ভব কার্য্য-কলাপ দ্বারা কণ্টকিত, যাহা মানুষ আয়ত্ত করিতে পারে না, সাফল্যলাভ করাও চলে না, তাহাকে কার্য্যযোগ্য পন্থা বলা চলে না। যদি আমি বলি, ভারতবর্ষের তিন শত নব্বই কোটী নরনারী যত্তপি আহারনিদ্রা পরিহরি অহরহ

চরকা কাটিতে পারে তাহা হইলে তিন মাসে অর্থাৎ নব্বই দিনের মধ্যে স্বরাজ অথবা পূর্ণ স্বাধীনতা আনিয়া দিব—এই প্রস্তাব ও পন্থা কি কার্য্যযোগ্য ? যদি আমি বলি, তিনশত নব্বই কোটী লোক যম্যপি কেবল মাত্র মাঠের ঘাস খাইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে—বেশী দিন নয়, মাত্র তিনটি মাস, তাহা হইলে তোমাদের অন্নকষ্ট ঐ তিন মাস পরে এক তিলও থাকিবে না। অতএব এই পন্থা গ্রহণ কর। এই পন্থা কি কার্য্যযোগ্য ? যিনি এমন জোর গলায় বলিতে পারেন যে, কার্য্যযোগ্য পন্থা ভারতবর্ষের ঋষিগণ দেখাইয়াছেন, তিনি যে উদ্ভট কিছু বলিতে কোনক্রমেই পারেন না, তাহা সুনিশ্চিত। অধিকন্তু তিনি বলিয়াছেন যে, সেই পন্থা জগতের বর্ত্তমান প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক অবস্থায় একমাত্র ভারতবর্ষেই অবলম্বিত হইতে পারে। এই উক্তির মধ্যে ইহাও প্রচ্ছন্নভাবে সুস্পষ্ট যে, আমাদের অর্থাৎ ভারতবর্ষের বর্ত্তমানকালের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক, দৈহিক ও মানসিক, পারিপার্শ্বিক, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক—এক কথায় সর্ব্ব অবস্থার কথা বিশদভাবে বিবেচনা করিয়াই (যাহাকে stock taking বলা চলে) তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষেই অবলম্বিত হইতে পারে। আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা নাই বলিয়া সেই পন্থা অবলম্বিত হওয়া সম্ভব নয়, অথবা আমাদের ধর্ম্মনৈতিক ঐক্য নাই বলিয়া সেই পন্থা অবলম্বিত হওয়া অসম্ভব, অথবা আমাদের অর্থনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক, প্রভৃতি মতের সাম্য নাই বলিয়া সেই পন্থা অবলম্বন করা চলে না, করিলেও কার্য্য সফল হইবে না, এইরূপ বায়নাক্কার কোন ইঙ্গিতও তাঁহার উক্তিতে নাই। ঋষি কথিত ও প্রদর্শিত পন্থা ভারতবর্ষে অবলম্বিত হইলে আগামী সাত বৎসরের মধ্যে সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের অর্থাভাব দূর করা যাইতে পারে। কালের পরিমাণে সাত বৎসর আদৌ দীর্ঘ নহে। মানুষের আধুনিক কালের স্বল্পায়ু মনুষ্যজীবনের পরিমাপেও সাত বৎসর যথেষ্ট দীর্ঘ নহে। আজিকার জগতের শোচনীয় পরিস্থিতিতে শ্রান্ত, ক্লান্ত, ক্ষুধিত ও অবসাদগ্রস্ত জগৎ সাত বৎসরের জন্ত একটা পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে পারে না কি ?

"চারিটি পন্থার" উপক্রমণিকা অধ্যায়ে কথিত প্রায় সমস্ত কথার প্রতিধ্বনিই প্রত্যেক মানুষ তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে শুনিতে পাইবেন। তাহাতে আমাদের এতটুকু সন্দেহ নাই। যাঁহারা জাগিয়া নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন অথবা যাঁহারা যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারাই জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার দুঃস্বপ্নে বিভোর, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যদি একথা সত্য হয় যে, দুর্দ্ধর্ষ ও যুদ্ধেলিপ্সু জাতিসমূহও একদিন যে কারণেই হোক্, খাদ্যাভাবেই হোক্ অথবা রক্তের বিভীষিকা দেখিয়াই হোক্ বা লোকবিরল মলিন পৃথিবীর ম্লানমুখ দেখিয়াই হোক্—যুদ্ধে ক্ষান্ত হইবেই, তখন যাহারা সেই ভগ্নাংশ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবে, তাহারা তাহাদের অন্তরে ঐ কথাগুলিরই প্রতিধ্বনি শুনিবে। সে-দিন তাহারা সেই কথাই চিন্তা করিতে বসিবে এই নরকতুল্য পৃথিবীকে আবার কিরূপে সকলের পক্ষে স্বর্গতুল্য সুখময় আগারে পরিণত করা যায়। সেইদিন ঋষি-অধ্যুষিত ভারতের ঋষি-প্রোক্ত পন্থাই জগতকে নিশ্চিত ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করিবে। এইখানে একটি 'মারাত্মক' কথার কথাও আমাদিগকে বলিতে হইবে। কার্য্যযোগ্য পন্থা অবলম্বন করিতে হইলে অন্যান্য কয়েকটি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের সঙ্গে "স্বাধীনতার প্রস্তাব" প্রত্যাহার করিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। পরামর্শটা অনেকেরই ভাল লাগিবে না। আমরা স্বাধীনতার অর্থ বুঝি আর নাই বুঝি, গুরুত্ব অনুভব করি আর না করি, কথাটার মধ্যে যে মোহ মাদকতা আছে তাহাতে উদ্বুদ্ধ না হইয়া উঠে এমন হৃদয় অল্পই আছে ইহা স্বীকার করিবই। যাহারা স্বাধীনতার প্রস্তাব সমর্থন করে না, তাহারা দেশদ্রোহী, কুলাঙ্গার, নরপাংশুল, এইরূপ একটা ধারণা ধীরে ধীরে আমাদের মনোবৃত্তিকায় শিকড় গাড়িয়া বসিয়া পড়িয়াছে। এখন ক্ষুদ্র তরু বিরাট মহীরুহের আকার ধারণ করিয়াছে। ছেলে, যুবা, প্রৌঢ়, বুড়া, কচি, তরুণী, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা সকলেই বলে স্বাধীনতা চাই। এই স্বাধীনতার রূপ কি, গুণ কি, কেহই হয় ত' তাহা জানে না ; স্বাধীনতা পাইলে তাহা রক্ষা করিতে হয় কেমন করিয়া, সে-সম্বন্ধেও কাহারও কোন আবছা ধারণাও নাই, তথাপি স্বাধীনতা চাই, স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার, ইত্যাকার রবে গগন দীর্ণ হইয়া থাকে। আমাদিগের এমত ধারণা জন্মিয়াছে, আজকালকার ছেলেরা (মেয়েরাও) পিতা মাতা অভিভাবক শিক্ষক প্রভৃতি গুরুজনকে ডোণ্ট কেয়ার করিয়া, নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া

বাড়ীতে গোঁসা, স্কুলে ধর্ম্মঘট, রাস্তায় শোভাযাত্রা ও পার্কে মিটিং করিয়া বেড়াইয়া, পরাধীনতার অবসান ঘটাইয়া ও স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতেছে, স্বাধীনতার ইহাই মাপকাঠি হইতেও পারে, জানি না। আজকালকার আলোকবিভূষিত-চিত্ত নারীরা পুরুষের সম-মর্য্যাদা লাভ করতঃ (equal status) স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট স্বাধীনতার উচ্চাদর্শ হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই গৃহে স্বাধীন হইয়াছেন, বাহিরেও স্বাধীনতার মলয়ানিল হিল্লোল গায়ে লাগিতে সুরু করিয়াছে মনে করিতেছেন। সামান্ত যে দেরীটুকু আছে, তাহা চীৎকার করিয়া অতিবাহিত করা প্রয়োজন। ইহার ব্যতিক্রম করিতে তাঁহারা দিবেন না। ব্যতিক্রমের কথা কেহ যদি উচ্চারণ করে তবে তাহার কুশ-পুত্তলীদাহের বিধান স্বরাজ-পঞ্জিকায় শুভ দিনের নির্ঘণ্টে লিপিবদ্ধ আছে। ভারত মহানদীতে স্বাধীনতা শব্দতরঙ্গের যখন তুমুল তুফান, সেই সময়ে স্বাধীনতার প্রস্তাব তুলিয়া লইতে বলার ধৃষ্টতা ত' আছেই, বিপদও না থাকিতে পারে এমন নহে। ইংরাজের স্তাবক, চিরদাস, গোলাম ইত্যাদি ইত্যাদি শব্দবোধ অভিধান উজাড় ত' হইবেই, অহিংস ভাবে অনুবিধ ব্যবস্থা হওয়াও অসম্ভব নহে। স্বাধীনতা মহাসংগ্রামেলিপ্ত অধীর বীরবৃন্দকে যুক্তি দ্বারা নিরস্ত করিতে পারি এমত ভরসা আমাদের নাই, তাহারা যুদ্ধই জানে, যুদ্ধই বুঝে—অন্ত কথাও জানে না, অন্ত কাজও বুঝে না, বীরের জাতি, বীরের হৃদয়, বীরের বেশ, তাহাদের এক লক্ষ্য, এক উদ্দেশ্য, তাহা যুদ্ধ। কিন্তু স্কুলের ও কাছারী ব্যাক্ বেঞ্চার অথবা রণাঙ্গণের বহুদূরে যে-সকল কাপুরুষ আছে তাহাদের উদ্দেশেই বলিব যে, যদি ঋষিপ্রোক্ত ব্যবস্থা ভারতবর্ষে অবলম্বিত হওয়ার ফলে মানুষের অর্থাভাব ঘুচে, মানুষ তাহার প্রয়োজনীয় খাদ্য পায়, খাদ্য পাইলে স্বাস্থ্য পায়, স্বাস্থ্য লাভে দীর্ঘায়ু হয়: তাহার প্রয়োজনীয় বাসগৃহ পায়, পরিধেয় পায়, আসবাব ও সরঞ্জামাদি পায় তবে সে কেন রাস্তায় রাস্তায় ঝাণ্ডা ঘাড়ে টহলদারী করিয়া বেড়াইবে? স্বাধীনতা বস্তুটি কল্পতরুর সুপক্ক ফল নহে যে খপ করিয়া গালে পুরিয়া টুপ করিয়া গিলিয়া ফেলা যাইবে এবং গিলিতে পারিলেই ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ: চতুর্ব্বর্গ করায়ত্ত। স্বাধীনতা বস্তুটি কামধেনুর দুগ্ধ নহে যে কোনও সুযোগে ধেনুটিকে ধৃত করিয়া চ্যাক্ চুক শব্দে দোহন করিয়া খানিকটা গিলিয়া ফেলা যাইবে এবং গিলিয়া ফেলিতে পারিলেই জরা মরণ ক্ষুধা ক্ষিতিতল ত্যাগ করিয়া যাইবে, আমাদেরও অটুট যৌবন, অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য, অফুরন্ত কুবেরের ঐশ্বর্য্য! রাজনীতিকগণ আমাদিগকে বুঝাইয়াছেন, দেশ স্বাধীন হইলে আমাদের খাদ্যাভাব থাকিবে না, আমাদের মুখের লাগাম রাখিতে হইবে না, কলমে আগুন ছুটাইলেও ভয় ডর রাখিতে হইবে না, রাজা প্রজা বিভেদ থাকিবে না, জমিদার রেয়ৎ তারতম্য থাকিবে না, ধনবান ও দরিদ্র থাকিবে না—পৃথিবীর পাহাড় পর্ব্বত খানা খন্দ না থাকিয়া সমতল ভূমি হইয়া যাইবে—চাই কি টারম্যাকাডামড‌ও হইতে পারে। আমরা তাহাই বুঝিয়াছি এবং তাঁহাদের দেওয়া মন্ত্রে শেখান বুলিতে কপচাইয়া ভারী সোরগোল বাধাইয়া দিয়াছি। জাপান স্বাধীন, জাপানে জাপানীই রাষ্ট্রধর, জার্ম্মানী স্বাধীন, জার্ম্মানীতে জার্ম্মান রাষ্ট্রপরিচালক; ইংলণ্ড স্বাধীন, ইংলণ্ডে ইংলিশম্যান রাষ্ট্র-নায়ক কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কে কতটা স্বাধীন? খাদ্যসম্পর্কে পরিধেয় সম্বন্ধে স্বাধীনতা কাহার আছে? শান্তি কোথায়? দলাদলি কোথায় নাই? দ্বেষ বিদ্বেষ রেষারেষি মারামারি কাটাকাটির অন্ত হইয়াছে কোথায়?

হায় ভারত! এ প্রশ্নের উত্তর দিতে তুমি পার, কিন্তু তুমি যে 'পতিত' 'নীচ', নীচের কথা কোন্ সুবুদ্ধির নিকট কবে বা সমাদৃত হইয়াছে?

উচ্চ শিক্ষা (College & University Education)

ছাত্র সংখ্যা ৩২,১১৫ ; মোট ব্যয় ৪৩,০১,২৫৫ টাকা। সর্ব্ব সূত্র হইতে প্রতি-ছাত্রের জন্ত ব্যয় ১৩০৸/১ পাই; সরকারী তহবিল হইতে খরচ ৪৩৷৵৬ পাই।

বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ছিন্নমস্তা সম সভ্যতা ছেদিয়া আপন শির—
পান করে তার লোহিত রুধির—দেখেছ তরুণ বীর!
স্তম্ভিত কেন? দুঃসহতম দুঃখ বরিতে হবে,
বিঘ্নবিপদ দূর করি' সবে বিজয় গর্ব্বে র'বে।
গোধূলি গিরির নির্ঝর তলে এসেছ সৈন্যদল,
অস্ত রবির শেষ নিঃশ্বাসে কেন এত বিহ্বল?
শোণিতের স্রোতে দিতে হবে পাড়ি অন্ধকারের মাঝে,
চল দুর্জ্জয় দুর্দ্দম সেনা! যুগের বিদায় সাঁঝে।
মরণেরে হেরি শিহরিবে কেন?—তোমাদের বুক তাজা,
আলো-ছায়া সম মায়ার ভুবনে মানুষের মরা বাঁচা।
সন্ধ্যা ঘনায় মহাদুর্য্যোগে বজ্র-বিজলী সনে,
ভীম ভৈরব ঝঞ্ঝাবাদল নামিছে নিশীথরণে।
প্রাণের পতাকা বহন করিয়া হও সবে আগুয়ান্,
দুর্গম পথে দুর্ব্বার বেগে গেয়ে চলো জয় গান।
মাথার উপরে বিমান-দানব মৃত্যুরে নিয়ে আসে,
গোলার আগুনে জলে চারিদিক,- জলুক্ - তবুও ত্রাসে
পিছনে ফিরো না, বোমার আঘাতে যে মরে মরুক যেতে,
চল, চল বীর! উন্নত শিরে, শিব সত্যেরে পেতে।
দুঃখ করার দিন নহে আজ হেরিয়া হাজার শব,
শত মৃত্যুরে পায়ে ঠেলে দিয়ে ক'র সবে ভেরী রব।

নিমাই, বুদ্ধ, নানক, কবীর, যীশু, হজরত এসে
বৃথাই মানবে বিলায়েছে প্রেম। দারুণ সর্ব্বনেশে
শিখায় জলিছে প্রেমকল্যাণ; নিখিল বৃন্দাবন
করে হাহাকার, কোথায় কৃষ্ণ! কম্পিত তনু মন।
জ্ঞান বিজ্ঞান হোল শয়তান, ভদ্রতা ঘুষখোর,
সাধুতা কোথায়? পান্থের কাছে সাজিয়াছে জুয়াচোর।
শঠতার সনে করে কোলাকুলি মর্য্যাদা পায় লোভ,
বিশ্ব-চিত্ত-সরে সারল্য শতদল পায় লোপ।

নব জীবনের দুঃখজয়ীরা! যুদ্ধ চালাও জোরে,
আসুক ঝঞ্ঝা আঁধার রাত্রি ভীমগর্জ্জন ক'রে।
ভেঙ্গে ফেলো বীর! শৈল শিখর, সাগরে তুফান তোলো,
মেদিনী কাঁপাও, বজ্র নাচাও, মরণের কথা ভোলো।

পণ্যশিল্প বিনিময় যোগে যায় না পেটের ক্ষুধা,
উদর গরলে হয়েছে পূর্ণ, কোথায় লভিব সুধা?
সকল দেশের ভাগ্যতরণী ডুবিছে সিন্ধুতলে,
সকল দেশের জীবন-সূর্য্য নিবিছে চোখের জলে।
দেশের ভাগ্য বিদেশের পানে চেয়ে থাকে প্রতিদিন,
দেশপানে চায় বিদেশী বন্ধু হয়ে সম্পদ হীন।
জড়ভরতের দর্শন আর ভীষণ ভ্রান্ত নীতি
আনিবে কেমনে সর্ব্বকাম্য ধরার শান্তি প্রীতি?

সর্ব্বপ্রয়োজন মিটিত স্বদেশে, এ নহে কথার কথা,
একদা জগতে প্রতি দেশে ছিল আত্মস্বতন্ত্রতা।
প্রাচুর্য্যেরই বসতি ছিল যে সকল দেশের বুকে,
পণ্য আদান প্রদান ছিল না, মানুষেরা ছিল সুখে।
আজিকার মত উর্ব্বরহীনা ছিল না পৃথ্বী মাতা,
বর্ব্বরতার অভিজ্ঞতার ছিল না আসন পাতা।
বায়ু বারিভূমি বিষায়ে ওঠেনি, দূষিত হয়নি ধরা,
সেদিন মানব আজিকার মত ধরারে ভাবেনি সরা।
কোন মতবাদে যায় না দুঃখ, সীমাহীন দুর্গতি,
যুদ্ধ বিরতি আনিতে বিশ্বে যুদ্ধেই দাও মতি।

সুস্থস্বস্থ মানবজাতিরে বিশ্বে পাই না খুঁজে,
কঙ্কালসার দেহ নিয়ে নর মরণের সাথে যুঝে।
নারী হোলো কাম ভোগের বস্তু,—সহধর্ম্মিণী নয়,
নর এসে তার লালসা জোগায় চিত্ত করিতে জয়।
নারীপুরুষের অবাধ বিহারে সংসার ভেঙ্গে যায়,
স্নেহের শিশুরা মায়ের অঙ্কে উঠিতে নাহিক পায়।
বধূ-শাশুড়ীর দ্বন্দ্ব-কলহে ছিন্ন প্রাণের নাড়ী,
পুত্র পিতায় নাহি সদ্ভাব,—সবাই স্বেচ্ছাচারী।

মানুষের মাঝে মানুষ কোথায় ?—অকেজো দেখায় কাজ,
তণ্ডুল নাহি ঘরে ঘরে তবু চলে তাণ্ডব নাচ।
প্রাক্ ইতিহাস-যুগের মানব জীবন পূজারী রূপে
এই ধরণীরে করেছে আরতি প্রেমের গন্ধধূপে।
জানিত তাহারা যত বিজ্ঞান তারি এক কণা লভি'
বর্ত্তমানের মানব হেরিছে আকাশকুসুম ছবি।
আকাশকুসুমে আগুন ধরেছে, আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে!
যুদ্ধ চালাও সৈনিকদল দীঘল রাতের ঝড়ে।

সবার উপরে মানুষ সত্য—মানুষের কই দাম!
জাতির বিভেদ যায় নাক আর চলে নিতি সংগ্রাম।
এক বিধাতাই রচেছে সবারে উদার আকাশ তলে,
সকল জীবের সম-অধিকার ধরার স্থলে ও জলে।
পাশাপাশি ঘর বেঁধেছে যাহারা ভালোবাসাবাসি নিয়ে,
বহুযুগ পরে সেই ভালোবাসা গেল যে রক্ত পিয়ে।
হিংসা তবে কি বেঁচে র'বে শুধু, প্রেমের সমাধি হবে ?
হৃদয়ের নীড়ে বসিবে না পাখী! মরিবে আর্ত্তরবে!

আসে বিপ্লব বীভৎসতায় বিদ্বেষ নিয়ে সাথে,
শান্তিকুটির রক্ত প্রবাহে ডুবে যায় অমারাতে।
শ্যামল তরুর নব কিশলয় অসহায় হয়ে রয়,
বনস্পতির মরণ হেরিয়া পেয়েছে আজিকে ভয়।
যাতনায় জীব মরে যায় পেয়ে বোমার ফলক ছোঁয়া,
পুষ্পিতবনে লেগেছে আগুন, বাতাসে বিষের ধোঁয়া।
সব উৎসব নীরব মলিন দেউল-দেবতা নাহি,
উৎস আজিকে পাষাণেতে চাপা,—কার পানে বলো চাহি!
চিহ্ন বিহীন প্রান্তর ভূমি, ভগ্ন সৌধ সারি,
সকলি হারায়ে কাঁদিছে বিরলে বিশ্বের নরনারী।
বিষাদ জমানো রক্তের দাগে রক্তলোলুপ যারা,
জানোয়ার সম হুঙ্কার করি' হর্ষে আপন হারা।
মেঘ চুম্বিত প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া পড়িছে পথের 'পরে,
পৃথ্বী কাঁপিছে যুদ্ধ রথের চক্রের ঘর্ঘরে।

ভেঙে ফেলো আজ যত জিঞ্জীর কঠিন পাষাণে ঢাকা;
তীব্র আঘাতে অরাতির বুক কর গো রক্ত মাখা।

লুপ্ত করেছে শান্তি যাহারা, নিয়েছে ঋদ্ধি হরি'
বৃদ্ধি তাদের দুঃসহ হবে নিখিল বিশ্বোপরি।
দুঃখ কিসের চক্রবালের হেরিয়া অস্তরবি,
যুদ্ধ চালাও—যুদ্ধ চালাও অগ্নিমন্ত্র লভি'।

ভবিষ্যতের আসিবে প্রভাত মিলনের মহাগানে,
স্বার্থ-প্রাকার ভেঙে যাবে সব প্রেমের বন্যা টানে।
লৌহযুগের মানুষ যাহারা, লভিবে স্বর্ণ যুগ
শৃঙ্খল পরা বন্দী জীবন বরিবে মুক্তি সুখ।
মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব বিভেদ র'বে না বিশ্বে আর,
শোণিত-সিন্ধু সে দিন হবে যে শান্তির পারাবার।
মরে যাবে কাল যন্ত্র দানব। উটজ শিল্প এসে
তাহারি সমাধি বক্ষে প্রাণের মালা রচিবে শেষে।

কৃষক আবার বুনিবে ফসল অগ্নিদগ্ধ মাঠে,
পূর্ব্বগগনে নূতন দিনের সূর্য্য বসিবে পাটে।
কূজনকাকলী বসিয়া কুটিরে শুনিবে নবীন প্রাণ,
ভগবান আর ভাগবত নিয়ে জাগিবে জীবন গান।
স্বর্গপ্রবাহে শীর্ণানদীর সুপ্তি ভাঙ্গিয়া যাবে,
শ্মশান-জড়িত নদীর দুকূল সোনার ফসল পাবে।
ভাঙনের গান শুনিবে না আর কীর্ত্তিনাশার কূল,
তাহারি মূলেতে ফুটিবে আবার দেব-সৃজনের ফুল।
সেদিন ভারত বিশ্বনরের হবে যে মন্ত্রগুরু,
ভারতেরে নমি' নব সভ্যতা যাত্রা করিবে সুরু।
প্রথম ধরার সভ্যতা যার গর্ভে করেছে বাস,
সেই ভারতের মন্ত্রে হবে যে অজিতের অধিবাস।

তোমাদের লাগি রিক্ত করেছি যত সঞ্চিত ধন,
তোমাদের জয়-গর্ব্বের পথে পড়ে আছে তনুমন।
সকলরকমে সেজেছি কাঙাল রচিতে সাঁজোয়া তব,
মহাদুর্য্যোগ-রাত্রি ভেদিয়া আসিবে প্রভাত নব।
যুদ্ধ চালাও জীবনের গানে মেশিন গানের ধূমে,
শত্রু আহুতি দাও বীরগণ মারণ যজ্ঞভূমে।
অমন করিয়া অশ্রুসিক্ত থেকো না সৈন্যদল,
হও আগুয়ান, মরদ জোয়ান দেখাও আত্মবল।

মর্ত্ত্যলোকে নাট্যকলার প্রথম প্রচার

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

সর্ব্বপ্রথম মর্ত্ত্যে নাট্যের প্রচার কিরূপে হইল, তাহার একটি অপূর্ব্ব বিবরণ সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক শ্রীশারদাতনয় (খ্রীঃ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী) তাঁহার 'ভাবপ্রকাশন'-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন *। মহর্ষি ভরতের নাট্যশাস্ত্রেও এই সম্বন্ধে একটি ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে †। কিন্তু শারদাতনয়-কথিত আখ্যানটি ভরতোক্ত উপাখ্যান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ও অভিনব। এ কারণে পাঠকবর্গের কৌতূহল পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে শারদাতনয়ের বিবরণটি নিম্নে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল।

পুরাকালে মহীপাল মনু সপ্তদ্বীপা পৃথিবী পালন করিতে করিতে দুর্ব্বহ রাজ্যভারে শ্রান্ত-চিত্ত হইয়া পড়েন। 'কি উপায়ে এই ভূমি-ভার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া বিশ্রাম-সুখ লাভ করিব'—এই চিন্তায় আকুল হইয়া মহারাজ মনু তাঁহার পিতা জগৎ-প্রসবিতা সবিতৃদেবের শরণ গ্রহণ করিলেন। পুত্র-বৎসল দেব ভাস্কর ও পুত্রের স্মরণে চঞ্চল হইয়া মনুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন মহীপতি মনু তাঁহাকে দুর্ভর ভূভার-বহন-ক্লেশের কথা সবিনয়ে নিবেদন-পূর্ব্বক উহা হইতে মুক্তির উপায় জানিতে চাহিলেন। সকল ঘটনা শুনিয়া সূর্য্যদেব ভাব-খিন্ন মনু মহারাজকে যে বিশ্রামোপায়ের কথা বলিয়াছিলেন তাহা এইরূপ—

সৃষ্টির আদিতে দুগ্ধাব্ধিনাথ শ্রীভগবান্ নারায়ণের নাভি-কমল-সম্ভব ব্রহ্মা এই সমগ্র চরাচর ভুবন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই বিরাট সৃষ্টি-ক্রিয়ার আয়াসে পরিখেদিত হইয়া তিনি বিশ্রাম-সুখ লাভের আশায় শ্রীপতির শরণাপন্ন হন। প্রজা সৃষ্টি ও প্রজাপালন ব্যাপারে তাঁহার যে দারুণ খেদ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা হইতে পরিত্রাণের উপায় শ্রীভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলে দেবদেব নারায়ণ দেখিলেন যে, তাঁহার আত্মজ পদ্মযোনি সত্যই অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তখন তিনি চিন্তাকুল হইয়া উঠিলেন—'তাই ত! কি করা যায়? কিরূপ বিনোদনেই বা ইঁহার বিশ্রাম সম্ভব হইতে পারে'? কিয়ৎকাল চিন্তার পর তিনি স্ব-ক্ষেত্র-সম্ভূত বিধিকে নির্দ্দেশ দিলেন—"হে ব্রহ্মন্! পুরারাতি অম্বিকাপতি ঈশ্বরের সন্নিধানে তুমি গমন কর। তিনি তোমার বিশ্রান্তি-সুখের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন।"

এইরূপ সমাদিষ্ট হইয়া ব্রহ্মা দেবাদিদেব উমাপতির নিকট গমনপূর্ব্বক বহুবিধ স্তুতিদ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া নিজ খেদের বিষয় নিবেদন করিলেন। ভগবান্ শম্ভু তাঁহার পরিশ্রান্ত ভাব দর্শনে সদয় হইয়া ভগবান্ নন্দিকেশ্বরকে বলিলেন, "নন্দিন্! তুমি আমার নিকট হইতে সমগ্র নাট্যবেদ অধ্যয়ন করিয়াছ। এখন সেই অখিল-নাট্যবেদ প্রয়োগ-বিজ্ঞান সহ সবিস্তরে পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে অধ্যাপনা কর।" ভগবান্ নন্দিকেশ্বরও "যথা আজ্ঞা" বলিয়া পিতামহ ব্রহ্মাকে নিঃশেষে নাট্যবেদের শিক্ষা প্রদান করিলেন। তদনন্তর তিনি ব্রহ্মাকে বলিলেন—"ব্রহ্মন্! এই নাট্যবেদের প্রয়োগদ্বারাই আপনি জগতের সৃষ্টি ও পালনজনিত আয়াস হইতে বিশ্রান্তি-সুখ লাভ করিতে পারিবেন।"

ভগবান্ নন্দিকেশ্বর-কর্ত্তৃক এইরূপে উপদিষ্ট হইয়া পিতামহ স্বধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অনন্তর একদিন দেবী ভারতীর সহিত একান্তে সমাসীন পদ্মযোনি ব্রহ্মা নাট্যবেদ-প্রয়োগের উপযুক্ত পাত্র হইতে পারেন এমন কোন গুণবান্ ব্যক্তির কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। পিতামহ সত্যসঙ্কল্প—সত্যকাম। তাঁহার স্মরণ ত' বৃথা হইতে পারে না। তাই স্মরণমাত্র পঞ্চ শিষ্য সহ কোন এক মুনি ভারতী-সনাথ সৃষ্টি-কর্ত্তার পুরোভাগে আবির্ভূত হইলেন ‡। পিতামহ সানন্দে এই সশিষ্য মুনিকে আদেশ দিলেন—"তোমরা নাট্যবেদ ভরণ কর ("নাট্যবেদং ভরত")। তাহার পর তাঁহারাও ব্রহ্মার নিকট সরহস্য সপ্রয়োগ সমগ্র নাট্যবেদ যথাবিধি অধ্যয়ন করিলেন।

* শারদাতনয়-কৃত ভাবপ্রকাশন, গাইকোয়াড় ওরিয়েণ্টাল গ্রন্থমালা, দশম অধিকার, পৃঃ ২৮৪-২৮৭।

† মহর্ষি-ভরত-কৃত নাট্যশাস্ত্র, বারাণসী সংস্করণ, ৩৬শ অধ্যায়।

‡ "স্মৃতমাত্রে মুনিঃ কশ্চিচ্ছিষ্যৈঃ পঞ্চভিরন্বিতঃ।
পুরোঽভবত্তস্তে ভারত্যা সহিতস্যাত্মজন্মনঃ"।
—ভাবপ্রকাশন, ১০ম অধিকার, পৃঃ ২৮৫।

ইহার পর সেই সশিষ্য মুনি দেবগণের নানাবিধ পুরাবৃত্ত বিভিন্ন প্রবন্ধাকারে গ্রথিত করিয়া নাট্যবেদোক্ত বিচিত্র রস-ভাব-অভিনয়-প্রয়োগে পদ্মযোনিকে সবিশেষ প্রীতি প্রদান করিতে পারিয়াছিলেন। পরম পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান্ কমলাসন তাঁহাদিগকে অভীষ্ট বর প্রদান-পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "যে হেতু আমি বলিয়াছি—'তোমরা এই নাট্যবেদ ভরণ কর'—অতএব, অদ্য হইতে ত্রিজগতে তোমরা 'ভরত' নামে বিখ্যাত হইবে। আর এই নাট্যবেদও অতঃপর তোমাদিগের নামেই পরিচিত হইবে।" *

পূর্ব্বোক্ত আদেশ দিবার পর হইতেই ব্রহ্মা সেই সকল ভরতের সাহায্যে ত্রিভুবনের সৃষ্টি-স্থিতি-নাশ-জনিত নিজ শ্রম বিনোদন করিয়া আসিতেছেন।

এই উপাখ্যানটি বর্ণনা করিবার পর দিবাকর আত্মজ মনকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "হে মনো! তুমিও সেই অচ্যুত-স্বরূপ ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া বিশ্রামোপায় জানিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট বসুধাপালন-জনিত ক্লেশের কথা নিবেদন কর। তাঁহার কৃপায় তৎপ্রণীত নাট্যের ভরত কর্ত্তৃক প্রয়োগ ভূমিতলে প্রচারিত হইলে ভূভার-শ্রান্ত তুমি যথেচ্ছ চিত্ত-বিনোদ লাভ করিতে পারিবে।"

এইরূপ উপদেশ দিবার পর দিনকর স্বর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এ দিকে মহারাজ মনুও ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইয়া পিতামহকে প্রণিপাত-পূর্ব্বক অতি করুণভাবে আপনার ভূভার-শ্রান্তির কথা নিঃশেষে নিবেদন করিলেন। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাও মনুর ভূমি-ভার-ক্লান্তির বিষয় অবগত হইয়া ভরতগণকে আহ্বান-পূর্ব্বক বলিলেন, "হে বিপ্রগণ! তোমরা এই ত্রিদিব ত্যাগ করিয়া এখন মনুর সহিত মহীতলে গমন কর। তথায় মনুর সহিতই তোমাদিগকে বাস করিতে হইবে। আর এই বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল—ভারতবর্ষে।"

পদ্মযোনি পিতামহ ব্রহ্মার এই আদেশে ভরতগণ মানবেন্দ্র মনুর † সহিত অযোধ্যায় গমন করিলেন। তথায় কিছুকাল বসবাস করিতে করিতে তাঁহারা পূর্ব্ব-পূর্ব্ব কল্পে যে সকল প্রখ্যাতনামা রাজর্ষি ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের পূত চরিত্র অবলম্বনে বহু নাট্য-প্রবন্ধ রচনা করেন। এই সকল নাট্য-রচনার রস-ভাব-পূর্ণ অভিনয়দ্বারা নেতা ও অন্যান্য চরিত্রের বিকাশে ও নাট্যবেদোপদিষ্ট সঙ্গীত-মার্গের বিচিত্র প্রয়োগে তাঁহারা মনুর ভূভার-বহন-শ্রান্তি সম্যগ্রূপে অপনোদিত করিয়াছিলেন।

ইহার পর কতিপয় দ্বিজাতি নট শিষ্যরূপে সংগ্রহ-পূর্ব্বক এই আদি ভরতগণ একটি নাট্য-সম্প্রদায় গঠন করেন ও সেই সম্প্রদায়-দ্বারা তাঁহারা দেশে দেশে নরেন্দ্রগণের চিত্ত-বিনোদন করাইয়াছিলেন। এই সকল প্রাদেশিক নাট্যাভিনয়ে প্রযুক্ত দেশ-রীতি-দ্বারা পরিষ্কৃত ‡ সঙ্গীত-প্রয়োগ বৈচিত্র্য-বশতঃ 'দেশী' আখ্যা লাভ করিয়াছিল।

অতঃপর মনুর সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনায় ভরতগণ আদি নাট্যবেদ হইতে সার উদ্ধৃত করিয়া কয়েকখানি সংগ্রহ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একখানির শ্লোক-সংখ্যা ছিল দ্বাদশ সহস্র। আর একখানির শ্লোকসংখ্যা ইহার অর্দ্ধ পরিমাণ, অর্থাৎ—ষট্ সহস্র। নাট্যবেদের যে সংগ্রহ-গ্রন্থখানি ষট্-সহস্র-শ্লোকাত্মক, তাহা ভরতগণের নামানুসারে প্রখ্যাত হইয়া 'ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র' নাম ধারণ করিয়াছে §। মহারাজ

* "নাট্যবেদমিমং যস্মাদ্ ভরতেতি ময়েরিতম্॥
তস্মাদ্ ভারতনামানো ভবিষ্যথ জগত্রয়ে।
নাট্যবেদোঽপি ভবতাং নাম্না খ্যাতিং গমিষ্যতি"॥
—ভাবপ্রকাশন, ১০ম অধিকার, পৃঃ ২৮৬।

শারদাতনয়ের এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে তিনি 'ভরত' নামক কোন মুনির অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। তবে নাট্যবেদের আদি শিক্ষার্থী পঞ্চ মুনিরই সাধারণ নাম হইয়াছিল 'ভরত'। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন গুরু এবং অপর চারিজন শিষ্য॥

† মানবেন্দ্র মনু—মনুর অপত্য বলিয়াই আমাদিগের নাম 'মানব' বা 'মানুষ'। মনুই মানবগণের আদিপুরুষ। প্রতি কল্পে (এক কল্প ব্রহ্মার এক দিন বা এক রাত্রি=চারশত বত্রিশ কোটি মানব বৎসর) চতুর্দ্দশ মনু আধিপত্য করেন। ইনি কোন্ মনু—শারদাতনয় তাহার বিশিষ্ট উল্লেখ না করিলেও—বোধ হয়, বর্ত্তমানে যে মনুর অধিকার চলিতেছে, ইনি সেই সপ্তম বৈবস্বত মনু। বৈবস্বত—বিবস্বান্ সূর্য্যের পুত্র। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে ইঁহাকেই মহীপতিগণের অগ্রগণ্য বলিয়াছেন [রঘু ১।১১]। অষ্টম মনু সাবর্ণিও সূর্য্যতনয়। তবে অদ্যাপি তাঁহার অধিকার আসে নাই।

‡ দেশরীতি-পরিষ্কৃত—'মার্গ'-রীতি বড়ই গহন। দেশী রীতি সরল। পরিষ্কৃত—সরলীকৃত। মার্গ সঙ্গীত—Classical Music. দেশী—Folk.

§ "নাট্যবেদাচ্চ ভরতাঃ সারমুদ্ধৃত্য সর্ব্বতঃ।
সংগ্রহং সুপ্রয়োগার্হং মনুনা প্রার্থিতা বধুঃ॥

মনুই ছিলেন ভারতবর্ষে এই ভরত-নাট্যশাস্ত্রের প্রথম প্রকাশক। এই সঙ্গীতশাস্ত্রখানি মনু-কর্ত্তৃক সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়া ভারতের সর্ব্বপ্রদেশের রাজগণের বিশ্রান্তি-সুখপ্রদ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

মর্ত্ত্যে নাট্যপ্রচার প্রথমে কিরূপে হইয়াছিল, তদ্বিষয়ক এই অপূর্ব্ব বিবরণটি শারদাতনয়-কর্ত্তৃক তাঁহার ভাবপ্রকাশন-গ্রন্থে অতি মধুর ভাষায় ও সবিস্তরে বর্ণিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্রের বিবরণ সম্পূর্ণ অন্যরূপ। তাহা পরবর্ত্তী আর এক সংখ্যায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

একং দ্বাদশসাহস্রৈ শ্লোকৈরেকং তদর্দ্ধতঃ।
ষড়্‌ভিঃ শ্লোকসহস্রৈর্যো নাট্যবেদস্য সংগ্রহঃ॥
ভরতৈর্নামতস্তেষাং প্রখ্যাতো ভরতান্বয়ঃ।
যদিদং ভারতে বর্ষে মনুনা সুপ্রকাশিতম্॥
সঙ্গীতশাস্ত্রং সর্ব্বত্র রাজ্ঞাং বিশ্রান্তিসৌখ্যদম্।" ইত্যাদি
—ভাবপ্রকাশন, দশম অধিকার, পৃঃ ২৮৭।

বর্ত্তমানে 'ভরত-নাট্যশাস্ত্র' নামে যে গ্রন্থখানি প্রচলিত, তাহা দেখিলেই মনে হয়, উহা কোন এক বা একাধিক প্রাচীনতর গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত সংগ্রহ-গ্রন্থ মাত্র। ভাবপ্রকাশনের উক্তি হইতেও স্পষ্টই বুঝা যায় যে, 'ভরত-নাট্যশাস্ত্র'* গ্রন্থখানি সংগ্রহ-গ্রন্থ। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, বর্ত্তমানে উপলভ্যমান নাট্যশাস্ত্র আর শারদাতনয়ের উল্লিখিত নাট্যশাস্ত্র একই গ্রন্থ কি না? শারদাতনয়ের উল্লিখিত নাট্যশাস্ত্রের শ্লোক-সংখ্যা ছয় হাজার। বর্ত্তমানে উপলভ্যমান নাট্যশাস্ত্রের একাধিক সংস্করণ পাওয়া যায়। বারাণসী সংস্করণে যে সমগ্র নাট্যশাস্ত্র ছাপা হইয়াছে, উহার শ্লোক-সংখ্যা ৫৫৫৪। ইহা ছাড়া উহাতে গদ্য-চূর্ণক প্রভৃতি আছে। গাইকোয়াড় ওরিয়েণ্ট্যাল গ্রন্থমালায় নাট্যশাস্ত্রের যে কয় অধ্যায় এ পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে, তাহার প্রায় প্রত্যেকটির শ্লোক-সংখ্যা বারাণসী সংস্করণের শ্লোক-সংখ্যা অপেক্ষা অনেক অধিক। এ কারণে মনে হয় বরোদা সংস্করণের সমগ্র নাট্যশাস্ত্রের শ্লোক-সংখ্যা ছয় হাজারের কম ত' হইবেই না—বরং বেশী হইতে পারে। অতএব, এরূপ অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে—বর্ত্তমানে উপলভ্যমান নাট্যশাস্ত্রেরই কোন একটি সংস্করণ শারদাতনয়-কর্ত্তৃক এ স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে।

চরকারাণী

কে ঐ ওরে, ধূলির 'পরে
মরছে ঘুরে ঘুরে?
হায়, দুঃখিনী 'চরকা-রাণী'
কাঁদছে করুণ সুরে!
রেখেছিল ঘরেরি মান,
পড়শীরেও দিয়েছে দান,
পতির সেবা শেষে সতী
রই তো প'ড়ে দূরে!
প'ড়ে আছে অশোক-বনে
নির্ব্বাসিতা সীতা,—
মাটির কোলে লুটিয়ে শুধু
গাইছে করুণ গীতা!
কোথায় হে রাম, ত্বরা ক'রে
লও গো এসে বুকের 'পরে,
নইলে এবার অভিমানে
পশবে পাতাল-পুরে!

হে আমার প্রাণ

আকাশ পৃথিবী যথা নাহি পায় ভয়,
বাধায় আনত নয়—
তেমনি আমার প্রাণ, করিও না ভয়।

দিবস রাত্রি যথা নাহি করে ভয়,
বাধায় করিছে ক্ষয়,
তেমনি আমার প্রাণ, করিও না ভয়।

ভাবী, অতীতের যথা নাহি কোনো ভয়,
বাধায় করিছে জয়,
তেমনি আমার প্রাণ, হও নির্ভয়!

শ্রীঅনিলা দেবী

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্কুলবাটীর কক্ষ

বিনোদ ও বীরেন্দ্র।

বীরেনের হার্মোনিয়াম বাজাইয়া গান

(ভূপালী—ঢিমে তেতালা)

দীপ কেন যায় নিবে।
জ্বলিল অন্তরে কতবার নিবিয়া,
নিবে গেলে পুনঃ কেবা জ্বালাইবে।
নিবিল দীপ, পথভ্রান্ত অন্ধকারে আমি,
পথ, না এলে সে, কেবা দেখাইবে॥

বিনোদ। "ঘুঘারোয়া মেরে বাজে"—নকলটা হ'য়েছে বেশ! তোমারও ক'দিনের চেষ্টায় মন্দ হয় নি। এইবারে তান-টানগুলো অল্পে অল্পে শেখাব। চল, এখন বাড়ী যাওয়া যাক্—রাত হ'ল। ভজহরি! এ-গুলো বন্ধ-টন্ধ করে' রাখ, আমরা যাচ্ছি।

তৃতীয় দৃশ্য

উমাপদর বৈঠকখানা

উমাপদ ও বিভূতি

উমা। কাল সাদেকের ছেলের কি সত্যি কলেরা হয়েছিল? তোমরা অনেক রাতে এলে বলে' খবর নেওয়া হয় নি। তা' ছাড়া দেখলুম তোমরা নির্বিঘ্নে ফিরে এলে, বন্দুকের আওয়াজও শুনলুম না, কাজেই খবর নেওয়া দরকার মনে করলুম না।

বিভূ। Case টা সত্যি, তবে real cholera নয়। Saline injection দেবার জন্য সরঞ্জাম নিয়ে গেছলুম, কিন্তু দরকার হ'ল না। ওষুধ এক dose খাইয়ে কী ফল হয় দেখবার জন্য তমিজের খান্‌খায় জীবন-কাকাবাবুর সঙ্গে ক্ষণিক বসেছিলুম। পাইকদের সেখানেই রেখে গেছলুম। তমিজ আর আশরফ আমাদের সঙ্গে সাদেকের বাড়ী পর্য্যন্ত গেছল।

উমা। জীবনও গেছল?

বিভূ। যাবার সময় ওঁকে খবর দিয়ে যাওয়া সঙ্গত মনে করলুম। উনি কিছুতেই আমাকে একলা ছাড়লেন না। নিজের revolver নিয়ে আমাদের সঙ্গে গেলেন।

উমা। জীবনের মত লোক আজকাল দেখতে পাওয়া যায় না।

(জনৈক পাইকের সহিত সাদেক প্রবেশ করতঃ সেলাম করিল)

উমা। কি খবর সাদেক? ছেলে কেমন আছে?

সাদেক। ভাল আছে কাকাবাবু! তাই ডাক্তার-দাদাবাবুকে খবর দিতে এলুন। ডাক্তার ত' নয়, ঐ যে বলে সাক্ষাত ধন্বন্তরী। একদাগ ওষুধে অতবড় ব্যামো কোথায় পালিয়ে গেল। আর ওষুধ দেবেন দাদাবাবু? কী পত্যি দেওয়া যাবে?

বিভূ। ওষুধ আর নয়। কচি ডাবের জল আর বার্লির জল খেতে দেবে। বার্লি যেন বেশ সিদ্ধ হয়।

জীবন। (প্রবেশ) কি, সাদেক যে? ছেলে কেমন আছে?

সাদেক। (সেলাম করিয়া) ভাল আছে কাকাবাবু। ধন্বন্তরীর হাতে পড়লে ব্যামো কতক্ষণ থাকে?

উমা। বসো জীবন!

জীবন। এই যে বসি দাদা! দেখ সাদেক, আমরা অনেক বিষয়েই ধন্বন্তরী—বুঝেছ? তোমার সে হাজিসাহেব কোথায়? তাঁকে ত' দেখলুম না।

সাদেক। সেই যেদিন তমিজ ভাইএর খানকায় বসে' আপনার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়, সেই রাত্তিরে আমার বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করে' পরের দিন সকালে চলে গেল। কোথায় যাবে জিজ্ঞেস করলুম, বললে না।

জীবন। তোমার কাণে মন্তরটা কি সেই রাত্রিতেই দিয়েছিল?

সাদেক। ও কথা তুলে আর লজ্জা দেন কেন কাকা-বাবু? সারারাত্তির বক্ বক্ করে' আমার মাথা খারাপ

করে' দিয়েছিল। আমি গোঁয়ার-গোবিন্দ লোক, পাড়াগেঁয়ে চাষা, তাঁর কথার প্যাঁচ বুঝব কেমন করে'?

উমা। সে কি সত্যি হাজী, না একটা বুজরুক? যে হজে যায় তার ত' কিছু ধর্ম্মজ্ঞান থাকে। এ-লোকটার আদৌ ধর্ম্মজ্ঞান আছে বলে ত' মনে হয় না।

জীবন। হয় ত' বুজরুক। কিন্তু একখানি চীজ। ঐ শ্রেণীর লোক আরও কত আছে। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিয়ে সরে' পড়ে, নিজেদের গায়ে আঁচড়টি পর্য্যন্ত লাগে না। আর দু'টো দল লাঠালাঠি, খুন জখম, মামলা, ফ্যাসাদ ইত্যাদিতে সর্ব্বস্বান্ত হয়। আমি ত' দুইয়ে দিয়ে গেলুম, তারপর উকীল মোক্তারের ফী দিতে হয় তোরা দিগে, জেল খাটতে হয় তোরা খাটগে, ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হয় তোরা ঝুলগে। ডাক্তারের ভিজিটের টাকা দিয়েছ? ওষুধের দাম দিয়েছ?

সাদেক। না কাকাবাবু, হাটবার সন্ধ্যেবেলায় দোবো—এখন ঘরে পয়সা নেই।

জীবন। বোঝ সাদেক! যদি আদালতে মামলা করতে যাস্, উকীল ধারে কাজ করবে, না কোর্টফী ধারে পাবি?

সাদেক। মামলা মোকদ্দমা করবার ক্ষ্যামতা আমাদের আছে?

জীবন। দাঙ্গাহাঙ্গামা করলেই ত' মামলায় পড়তিস্।

সাদেক। দাঙ্গা হাঙ্গামা কে করত কাকাবাবু? ও-শালা বলে' গেল বলে'ই কি আপনাদের সঙ্গে ঝগড়া করব? আমার এত বড় বুকের পাটা?

জীবন। গালাগালি দিস্ নে। তবে এইটুকু বোঝ্ সাদেক, যদি এই হিন্দু ডাক্তার না থাকত, আর তার পয়সার কামড় থাকত, তা' হলে তোর ছেলের চিকিৎসা হ'ত না।

সাদেক। সে-কথা হাজারবার বলুন কাকাবাবু! এই নাক কাণ মলছি যদি ও-রকম কোন বিদেশী লোক পাড়ায় ঢুকে দুষ্টবুদ্ধি দিতে আসে, তা'কে পিটে নর্দ্দমা বানিয়ে গাঁয়ের বার করে দোবো।

জীবন। তা'কি সম্ভব সাদেক? তা'র চেয়ে নিজের মনটা শক্ত কর্। বুঝে দেখ্—আমরা হিন্দু-মুসলমান যদি মিলে মিশে থাকতে পারি, দরকার হ'লে পরস্পরকে সাহায্য করি, তা' হ'লে আমাদের সকলেরই মঙ্গল।

সাদেক। হাজারবার। আর সে-মুন্সির ভাই সব উল্টো বলে' গেল। কী বলব কাকাবাবু, রাগে গা কশ-কশ করছে। এখন যদি একবার তা'কে ধরতে পারি, গর্দ্দানটা মুচড়ে ভেঙে দিই।

জীবন। তা'র মতন একটার নিপাত হ'লে আর একটার আবির্ভাব হ'বে। সব চেয়ে ভাল নিজের মেজাজ ঠাণ্ডা রাখা। যে যা' বলে, যদি মামুলী কাজের কথা না হয়, তখনি না করে', ভেবে দেখতে হ'বে কাজটার ফল কী হ'তে পারে। মনে মনে আলোচনা করতে হ'বে, তা'হলেই বিচারের ক্ষমতা বেড়ে যা'বে। যখন নিজের বুদ্ধিতে না কুলোবে, অন্যের পরামর্শ নিতে হ'বে। নিজের স্বভাবের উন্নতি করবার চেষ্টা কর্, মেজাজ দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা কর্। যদি না পারিস্, রাগের সময়ে ভগবানকে মনে কর্বি, কিম্বা যা'কে সব চেয়ে ভালবাসিস্ বা ভক্তি করিস্, তাকে মনে কর্বি।

সাদেক। খোদার মর্জ্জি। এখন যাই কাকাবাবু, ডাব পাড়তে হ'বে।

উমা। এই টাকাটা নিয়ে যা। বলছিস্ হাতে পয়সা নেই, ছেলের পত্যির যোগাড় কর্বি কেমন করে'?

সাদেক। পায়ের ধুলো দিন কাকাবাবু! মুন্সির ভাই বলে কি না আপনাদের সঙ্গে ঝগড়া, লাঠালাঠি করতে। কাকাবাবু, হাটবারের আগে এ-টাকা শুধতে পারব না।

উমা। কে তোকে এখনি শুধতে বলছে?

(সকলকে সেলাম করিয়া সাদেকের প্রস্থান)

ভৃত্য। (প্রবেশ) দাদাবাবু, মা ডাকছেন।

উমা। বিভূতি, কাকাবাবুকে চা পাঠিয়ে দিতে বল্।

(বিভূতি ও তৎপশ্চাৎ ভৃত্যের প্রস্থান)

জীবন। চা যে এই খেয়ে এলুম। মেয়ের জন্যে, যত সকালেই বেরোই, চা না খেয়ে বেরোতে হয় না। যদি দৈবাৎ না-খেয়ে কোন দিন বেরোই, তা'র অভিমান দেখে কে?

উমা। যেমন মা তেম্নি মেয়ে। মেয়েটিকে আমায় দাও না ভাই!

জীবন। এ'ত আমার পরম সৌভাগ্য দাদা! কিন্তু আমার বর্ত্তমান অবস্থা ত' জানেন? এখন খরচ করবার ক্ষমতা নেই। অন্ততঃ ছ'মাস দেরী করতে হ'বে।

উমা। প্রয়োজনীয় খরচ করবার ক্ষমতা তোমার যথেষ্ট আছে। অবস্থা মন্দ কিসে? হিসেব ক'রে দেখেছি যে, ক'বছরের আয় থেকে আসল, সুদ, মোকদ্দমা-খরচ, সরঞ্জামী খরচ সমস্ত আদায় হ'য়ে গত সন পর্য্যন্ত পাঁচ হাজার টাকার ওপর মজুত আছে। আর এ-বছরের আশ্বিন কিস্তী পর্য্যন্ত আমি প্রায় দেড় হাজার টাকা আদায় করেছি, তা' থেকে সরঞ্জামী খরচটা বাদ যা'বে। তা'র মানে আমার কাছে তোমার প্রায় সাড়ে ছ'হাজার টাকা পাওনা আছে। আমি হিসেবটা দেখে আজকেই তোমাকে টাকা দেবো। কিন্তু এ-বিয়েতে টাকা-কড়ির কথা ত' কিছু নেই। শাঁখা, সাড়ী আর নোআ—এর বেশী সিকি পয়সার জিনিষও আমি নিতে পারব না।

জীবন। সবস্ত্রা ও সালঙ্কারা কন্যা যে দান করতে হয়।

উমা। বস্ত্রের কথা ত' বললেম। শাঁখা ও নোআর চেয়ে অধিক মূল্যবান অলঙ্কার সধবা স্ত্রীলোকের আর কী হ'তে পারে? সধবা রমণীকে কী বলে' আশীর্ব্বাদ করে—হাতের শাঁখা বজায় থাক্, হাতের নোআ বজায় থাক্, সীঁথের সিঁদুর বজায় থাক্, এই ত'? হাতের ব্রেস্‌লেট বজায় থাক, গলার হার বজায় থাক এ-বলে' কি কেউ আশীর্ব্বাদ করে?

জীবন। বরকে অন্ততঃ একটা বরণের আংটী, অন্ততঃ পেতল কাঁসার বাসন, আর অন্ততঃ একটা খাট বিছানা ত' দিতে হয়!

উমা। না হয়, তা'ও দিও।

জীবন। আর লোকজন খাওয়ান?

উমা। তোমার যতদূর সামর্থ্য, খাওয়াতে পার।

জীবন। দাদা, আমার যে ঐ একমাত্র মেয়ে!

উমা। বিয়ের পর মেয়ে-জামাইকে যত খুসী দিতে পার। তা'তে মানা নেই।

জীবন। বৌদিদির সঙ্গে কথা ক'য়েছেন?

দয়াময়ী। (চা ও খাবার লইয়া প্রবেশ) আমারও ঐ মত। এখন চা খাও। খেয়ে বেরিয়েছ, এই ত'? উপরোধে ঢেঁকি গেলা যায়, আর, একটু চা-খাওয়া চলে না?

উমা। তুমি যে সটান সদরে চলে এলে! কখন এস না ত'।

দয়া। আনন্দের বন্যা'য় ভেসে এসেছি? আজকালের কত মেয়েছেলে সদর রাস্তায় বেরুচ্ছে, আমি না হয় সদর ঘরে এসেছি। তবু দরোয়ানকে সাবধান করে' এসেছি। চা খাও বেই!

জীবন। আগে তোমাদের পায়ের ধুলো নিই, তা'র পর খা'ব। (তথাকরণ) লোকে বলে লাখ কথা না হ'লে বিয়ে হয় না, আমাদের এক আসরে এক কথায় সব মিটে গেল। (চা খাইতে লাগিলেন)

দয়া। পুরুত-ঠাকুরকে দিয়ে আজকালের মধ্যে একটা আশীর্ব্বাদের দিন দেখিয়ে নাও। এই অগ্রাণ মাসের মধ্যেই বিয়ের দিন স্থির করতে হবে। বুঝলে?

জীবন। আপনারা ফর্দ্দ-ফারাক করুন। আমি কাছারী বাড়ীতে যাব মনে করে' বেরিয়েছি, কিন্তু বাড়ীতে খবরটা দিয়ে যাই। [ক্রমশঃ

চম্পার জয়

শ্রীকালিদাস রায়

কাল-বৈশাখীর ঝড় বিশ্ব কাঁপে থর থর
গাছপালা পড়িছে ভাঙ্গিয়া,
চমকিয়া কোলাহলে ঘুমন্ত পাতার তলে
চম্পা কলি উঠিল জাগিয়া।

অশনি মেঘের সাথে স্তব্ধ ঝঞ্ঝা মধ্যরাতে
লুপ্ত হলো বায়ুর গৌরব,
প্রভাতের সূর্য্যালোকে চম্পা চাহে স্নিগ্ধ চোখে
জয়ী শেষে তাহারি সৌরভ।

খাদ্যশস্যের চাষ বর্দ্ধন

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন

আজকাল পৃথিবীর সকল দেশেই খাদ্য-শস্যের চাষ বর্দ্ধনের জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। বহুদেশের লোক বাণিজ্য-ফসলের চাষ অপেক্ষা খাদ্যশস্যের চাষ বাড়াইতেছে। সরকারও এবার ভারতে খাদ্য-ফসলের অধিক চাষ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন কিন্তু ভারতের রাজনীতিক অবস্থা যেরূপ তাহাতে বাণিজ্য-ফসল উৎপাদন করিবার ক্ষেত্রের সঙ্কোচ সাধন পূর্ব্বক খাদ্য-ফসল উৎপাদন করিবার ক্ষেত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে তাহা সঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ বহির্বাণিজ্যের দ্বারা বিদেশ হইতে দেশে টাকা আসে। আমাদিগকে নানা বাবদ বিদেশকে বিস্তর টাকা দিতে হয়। সে টাকা না দিতে পারিলে চলিবে না। উহা বিদেশ হইতে সংগৃহীত করিতেই হইবে। নতুবা দেশ অধিক দরিদ্র হইয়া পড়িবে। আমাদের ইদানীং বিদেশে শ্রম-শিল্পজ পণ্য বেচিবার মত পণ্য নাই। কারণ শ্রম-শিল্পজ পণ্য প্রস্তুতে আমরা ঘোর পশ্চাৎপদ। কাজেই আমাদিগকে বাণিজ্য-ফসল বেচিয়াই বিদেশকে টাকা দিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া দেশের প্রয়োজনীয় খাদ্য শস্য দেশে উৎপাদন করিতে হইবে। অন্নবস্ত্র সম্বন্ধে পরমুখাপেক্ষী হওয়া ঘোর বিপজ্জনক। বর্ত্তমান সময়ে তাহার প্রমাণ হাতে হাতে মিলিতেছে। এখন দেশে বহু গরীব এবং মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক দুইবেলা পূর্ণমাত্রায় খাইতে পাইতেছে না। চাউল, আটা, ময়দার দর দ্বিগুণেরও অধিক, তরিতরকারীর মূল্য চতুর্গুণ। ব্রহ্মদেশের উপর চাউলের ভার দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম বলিয়া আজ এই বিপদ। তাহার উপর মার্কিণের ইজারা ও ঋণ দানের টাকা কি ভাবে পরিশোধিত হইবে তাহা কিছুই বুঝা যাইতেছে না। যুদ্ধ আর এক বৎসরের অধিক কাল চলিবে না বলিয়াই মনে হইতেছে। তখন কি ব্যবস্থা হয় তাহাই দ্রষ্টব্য। ইতিমধ্যে ইঙ্গ-মার্কিণ এক বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। উহার ভিতরের কথা কি তাহার কিছুই প্রকাশ নাই, অন্ততঃ আমরা তাহা জানিতে পারি নাই। শুনিতেছি উহা অবাধ বাণিজ্য-নীতি পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য পরিকল্পিত হইয়াছে। অবাধ বাণিজ্য-নীতিতে অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের পক্ষে ভাল হয় নাই। সেই জন্য সেই সম্ভাবনায় অনেকে চিন্তিত হইয়াছেন। যাহা হউক, উপস্থিত ভারতকে বিদেশে বাণিজ্য-ফসল রপ্তানী করিতেই হইবে। কিন্তু স্বদেশে শ্রম-শিল্পের প্রতিষ্ঠা না করিলে ভারতবাসীর আর নিস্তার নাই। সেজন্য ভারতবাসীকে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে খাদ্য-শস্যের এবং কাঁচামালের উৎপাদন বাড়াইতে হইবেই। বৈজ্ঞানিক উপায়ে ফসল বৃদ্ধিই তাহার একমাত্র উপায়। ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রতি একরে ৭৭১ পাউণ্ড চাউল উৎপন্ন হইয়াছে। জাপানে হইয়াছে ২৩০৭ পাউণ্ড।

একে ফলন কম, তাহার উপর খাদ্য-শস্যোৎপাদনের জমিও কমিতেছে। ইহার তালিকা দ্রষ্টব্য।

খৃষ্টাব্দ	কত একর জমিতে খাদ্য শস্যের চাষ হইয়াছে
১৯৩০-৩১	২১,৩৮,৪৮ হাজার
১৯৩১-৩২	২১,৬৮,৪৪ ,,
১৯৩২-৩৩	২১,৩১,৩১ ,,
১৯৩৩-৩৪	২১,৭৬,৫৫ ,,
১৯৩৪-৩৫	২১,২৬,৪৪ ,,
১৯৩৫-৩৬	২১,২৬,০৮ ,,
১৯৩৬-৩৭	২১,৬২,৮৯ ,,
১৯৩৭-৩৮	১৯,৭২,২২ ,,
১৯৩৮-৩৯	১৯,৩১,৭১ ,,

এই তালিকা হইতে দেখা যায় যে, নয় বৎসরে বৃটিশ-ভারতে সর্ব্ব রকম খাদ্য শস্যের উৎপাদন-ক্ষেত্র পৌণে দুই কোটি একারের (বা প্রায় সাড়ে তিন কোটি বিঘার) অধিক কমিয়া গিয়াছে। খাদ্য শস্যের মধ্যে দেখা যাইতেছে যে, ধানের উৎপত্তিক্ষেত্র সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। অথচ ভারতের অধিকাংশ লোকই চাউল খাইয়া থাকে। বাঙ্গালী, আসামী, উড়িয়া, নেপালী, মাদ্রাজী, বেহারী এমন কি মারহাট্টিরাও চাউল খায়। সিন্ধু প্রদেশের প্রায় অর্দ্ধেক লোক তণ্ডুলভোজী। অথচ এই চাউলের চাষ

ভারতে কত কমিয়াছে, তাহা একবার দেখুন। প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে যখন ভারতে লিনলিথগো-কমিশন বসিয়াছিল, তখন ভারতে ৮ কোটি একারের (২৪ কোটি বিঘার) অধিক জমিতে ধানের চাষ হইত। আর এখন ভারতে ৭ কোটি একারের (২১ কোটি বিঘার) কম জমিতেই ধানের চাষ হইতেছে। এক কোটি একার (৩ কোটি বিঘা) জমিতে ধানের চাষ কমাতে প্রায় ১০ কোটি মণ চাউলের ফলন নিশ্চয়ই কমিয়াছে। এখন ১০ কোটি মণ চাউল ২ কোটি পূর্ণবয়স্ক লোকের সাম্বৎসরিক খোরাক। একে চাউলের উৎপত্তির দিকে ২ কোটি লোকের খোরাক কমিল, আবার এই ১৫ বৎসরে ৭ কোটি লোক বাড়িল। ফলে ৯ কোটি লোকের খাদ্যাভাব ঘটিল। পক্ষান্তরে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ২৫ লক্ষ একার জমিতে পাট চাষ হইয়াছিল আর ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে ৩১ লক্ষ ৬৫ হাজার একার জমিতে এবং ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে ৩১ লক্ষ ১৯ হাজার একার জমিতে পাট চাষ হইয়াছে। পাট চাষ বাড়িয়াছে সত্য কিন্তু মারাত্মক ভাবে বাড়ে নাই। তবে ইহা সত্য, পাটের উৎপত্তি প্রয়োজনের অতিরিক্ত হিসাবে বৃদ্ধি হইতেছে, অতএব পাট চাষ কমাও ইহা বলা সত্ত্বেও পাটের চাষ বাড়িয়াছে ইহাই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। এ-দেশের চাষীরাই যে হুজুরের হুকুম মতে কাজ করিতে চাহে না, তাহা নহে, বিলাতের চাষীরাও তাহা করে না। বিগত যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে খাদ্যাভাব ঘটিয়াছিল বলিয়া রাজ্যপালগণ খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে বলিয়াছিলেন। রাজারক্ষা আইন অনুসারে সরকার খাদ্যশস্য উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ভার লইয়াছিলেন। যতদিন বিলাতের সরকার বিলাতে এই খাদ্যশস্যের উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন ততদিন গমের এবং আলুর চাষ অধিক হইয়াছিল। আবার যেমন সরকারী নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া গেল, তখনই চাষের যথা পূর্ব্বং তথা পরং অবস্থা ঘটিল। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় বিদেশ হইতে শস্য আমদানী করিতে হয় বলিয়া গ্রেটবৃটেনবাসীদিগকে কম কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই। সেই জন্য তাহারা সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে চাষ চালাইতে সাহলাদে সম্মত হইয়াছিল। কিন্তু যেমন যুদ্ধ মিটিয়া গিয়াছিল অমনই তাহারা সব কথাই ভুলিয়া গিয়াছিল। বিধি-ব্যবস্থা বলে যে গমের চাষ শতকরা ৫ অংশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা আবার কয়েক বৎসরের মধ্যেই পূর্ব্ব অবস্থায় ফিরিয়াছিল। বাসের জমি ভাঙ্গিয়া যাহা চাষের জমিতে পরিণত করা হইয়াছিল, তাহা আবার বাসের জমিতে পরিণত হইল। গমের ক্ষেত যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী পরিমাণে ফিরিয়া গিয়াছিল, আলুর চাষ কেবল কিছু বাড়িয়াছিল। গ্রেট-বৃটেনের শিক্ষিত চাষীরা দেশাত্মবোধসম্পন্ন। তাহারাই যখন লাভের জন্য বা সুবিধার জন্য খাদ্যশস্য ছাড়িয়া অন্য চাষ করে, তখন পরাধীন এবং দেশাত্মবোধের অনুভূতিশূন্য ভারতীয় নিরক্ষর কৃষীবলকে কথায় কর্ত্তব্যপরায়ণ করিতে পারা যাইবে ইহা মনে করাই বাতুলতা মাত্র।

তবে এখন উপায় কি? অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে সত্বর একটা উপায় না করিলে এ দেশে ঘোর দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইবে। বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানীর পথ রুদ্ধ, দেশে খাদ্যশস্যের অভাব। এমন ভীষণ অবস্থা ভারতের সম্মুখে আর কখনও উপস্থিত হয় নাই। বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আমাদের রাজনীতিবিশারদদিগের চিন্তা এ বিষয়ে এতদিন আকৃষ্ট হয় নাই। লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির স্কন্ধে দোষ চাপান বিশেষ অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। কারণ বর্দ্ধিত লোকের খাদ্যসংস্থানের উপায় সর্ব্বজনবিদিত। কেবল এ বিষয়ে পূর্ব্ব হইতে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সদ্য সদ্য এ সকল কাজ করা যায় না। ইহা সময়সাপেক্ষ। বাঙ্গালায়, কেবল বাঙ্গালায় কেন সমস্ত ভারতের কৃষিব্যাপারের প্রধান দুর্ভাগ্য এই যে, এ দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা কৃষিকার্য্যে একেবারেই দৃষ্টি দেন না। কেবল অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের হস্তে কৃষিকার্য্য ছাড়িয়া দিলে যাহা হইবার তাহাই হইতেছে। গত ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে ভারতে ২ কোটি সাড়ে ১৮ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্ব বৎসর জন্মিয়াছিল ২ কোটি ৫৮ লক্ষ টন। কিন্তু একটু চেষ্টা করিলেই এই ধানের ফলন প্রায় উহার আড়াই গুণ বৃদ্ধি করা যাইত। অর্থাৎ ৬ কোটি ৪৫ লক্ষ টনে পরিণত করা সম্ভব হইত। ইহার জন্য জমিও বৃদ্ধি করিতে হইত না, অন্য ফসলের চাষও কমাইতে হইত না। প্রতি একার ধান্যক্ষেত্রে যদি ১ শত মণ গোবরের সার দেওয়া যায়, তাহা হইলে ধানের ফসল শতকরা ১৫৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে বিনা সারে ১০০ মণ ধান জন্মিত, সেই ক্ষেত্রে ২৫৯ মণ ধান্য উৎপাদন করা সম্ভব। ইহা ভিন্ন বিচালীর

ফলনও প্রায় শতকরা ১০৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইত। ইহা পরীক্ষিত সত্য।* এত ধান জন্মিলে ভারতে কখনই খাদ্যাভাব হইতেই পারিত না। বলা বাহুল্য অস্থিচূর্ণ এবং সোরার সার দিলে ধান্যের ফলন শতকরা ২২০ ভাগ এবং বিচালীর ফলন শতকরা ১৮৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অশিক্ষিত চাষীদের পক্ষে ইহার ব্যবস্থা করা বড় কঠিন। প্রথমতঃ তাহাদিগকে এই বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা সহজসাধ্য নহে। তাহারা গতানুগতিক ন্যায়ে চাষ করিতেই চায়। অধিকন্তু তাহারা চাষের জন্য অর্থব্যয় করিতে অক্ষম। অথচ ইচ্ছা করিলে তাহারা গোবরের সার দিতে পারে। কিন্তু গোবর তাহারা ইন্ধনরূপে ব্যবহার করে। দ্বিতীয়তঃ, আমন ধানের জমিতে সার দিতে হইলে অনেক সময় বরাতের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। আমন ধান প্রায় নিম্নভূমিতে জন্মে। উহা রোপণের সময় জমিতে কিছু জল থাকা চাই। যদি আচম্বিতে অধিক বর্ষা হয় তাহা হইলে ধানগাছ পঁচিয়া গলিয়া এবং সার ধুইয়া যায়। ধান লাগিয়া গেলে জল কিছু অধিক হইলে কোন ক্ষতি হয় না। তবে ধানগাছ ডুবিয়া গেলেই ক্ষতি। সেই জন্য ক্ষেতের জল বাহির করিয়া দিবার ব্যবস্থা করা চাই। তাহার পর সার দিতে হইলে জমি পরীক্ষা করা আবশ্যক। সকল জমিতেই যে বিঘা প্রতি ৩৩ মণ গোবরসার দিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। ক্ষেত বুঝিয়া পাইট করাই কৃষির সনাতনী ব্যবস্থা। ক্ষেত বুঝিয়া কিছু সোরা, কিছু কেনাইট (Kainit) দিলে ভাল হয়। সারের জন্য গোবর রাখিবার কতকগুলি নিয়ম আছে। বাঁকুড়া জিলায় চাষীদিগকে জমিতে গোবরসার দিতে দেখা যায়। উহাতে গোবরের আসল সারাংশ অনেক নষ্ট হইয়া যায়। শিক্ষিত ব্যক্তিরা এ সব কার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করিলে ভাল হয়। গমের ক্ষেতে বিঘা প্রতি এক মণ সোরা দিলে ফসল প্রায় দ্বিগুণ হয়। অধুনা ভারতে প্রায় ১ কোটি টন গম উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু যদি বিশিষ্টভাবে চাষ করা যায় (Intensive Cultivation) তাহা হইলে এই ভারতের এই পরিমাণ জমিতেই দুই কোটি বা অন্ততঃ দেড় কোটি টন গম জন্মে, তাহা হইলে ভারতকে অন্নাভাবের আশঙ্কায় এরূপ ভাবে চক্ষু কপালে তুলিতে হয় না।

এখানে বলা আবশ্যক যে, কৃষিসেবা খেলার ব্যাপার নহে। উহাকে উপেক্ষা করিলে অন্নাভাবে কষ্ট পাইতে হইবে। কৃষিসেবা করিতে হইলে সম্যকভাবে সেচের ব্যবস্থা করিতেই হয়। কেবল দেবতার প্রসাদাকাঙ্ক্ষী হইয়া আকাশপানে চাহিয়া থাকিলে লক্ষ্মী লাভ হয় না। রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় সমাগত দেবর্ষি নারদ প্রথমেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, মহারাজ, আপনার রাজত্বে কৃষিবলকে শীর্ণকায় কৃপা-ভিখারী হইয়া কৃষিসেবা করিতে হয় না ত? ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে কূপ, বাপী, তড়াগ, পুষ্করিণী প্রভৃতিতে জল সঞ্চয় করিয়া রাখিতে বলিয়াছিলেন। ইহা মহাভারতের কথা। অতি প্রাচীনকালে ভগীরথকর্ত্তৃক গঙ্গা আনয়নের উপাখ্যানের মধ্যে যে তৎকর্ত্তৃক বাঙ্গালায় খাল খননের কথা লুক্কায়িত আছে তাহা নব্য যুগের য়ুরোপীয় সেচবিদ্যা-বিশারদ সার উইলিয়ম উইলকক্স স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন। বার্ণিয়ার লিখিয়া গিয়াছেন যে, বাঙ্গালার রাজমহল হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ স্থানে যে সকল নদী বহিয়াছে, তাহা এ দেশবাসীর অসাধারণ পরিশ্রমের ফল, উহা কাটা খাল। সার উইলিয়ম উইলকক্স যে কথা তাঁহার Irrigation in Bengal নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ঐ কথার সমর্থন করিয়াছেন। হিন্দু, বৌদ্ধ এবং মুসলমান রাজগণ এই সকল সেচের ব্যবস্থা বজায় রাখিয়াছিলেন, কিন্তু মুসলমান সাম্রাজ্যের পতন হইবার পূর্ব্বে আফগান-মারহাট্টা সংগ্রামের সময় হইতে এই সকল সেচের ব্যবস্থা বিফল হইয়া যায়। ইংরাজ-বণিকরা কেবল নিজ লাভের দিকেই নিবদ্ধদৃষ্টি ছিলেন। এ সকল দিকে দৃষ্টিপাত করিবার সময় পাইতেন না। অধুনা নিখিলভারতে প্রায় ২১ কোটি একর ভূমিতে চাষ হইতেছে, ৪ কোটি একর জমি পতিত থাকিতেছে। এই ২৫ কোটি একর ভূমির মধ্যে কেবলমাত্র ৫ কোটি ৩৭ লক্ষ একর জমিতে জল সেচনের ব্যবস্থা হইয়াছে। অর্থাৎ শতকরা ২০ ভাগ জমিতে সেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। অবশিষ্ট ৮০ ভাগ জমির চাষীদিগকে হতাশভাবে জলের জন্য আকাশপানে চাহিয়া থাকিতে হয়। এই ২০ ভাগ জমিতে যে সেচের ব্যবস্থা আছে বর্ত্তমানে তাহাকে ঠিক বৈজ্ঞানিক সেচের ব্যবস্থা বলা যায় না। বৈজ্ঞানিক সেচের ব্যবস্থায় কৃষিক্ষেত্রে জল সেচনের এবং জল নিষ্কাশনের উভয়েরই ব্যবস্থা থাকা চাই। বন্যার জল সত্বর বাহির করিয়া দিবার উপায় করা চাই। তাহা সর্ব্বত্র

* John Kenny's Intensive Farming in India দ্রষ্টব্য।

আছে বলিয়া মনে হয় না সেইজন্য এই সেচের ব্যবস্থাতেও কৃষকরা আপনাদিগকে উপকৃত মনে করে না। কারণ আচম্বিতে প্রবল বৃষ্টি হইলে তাহাদের মাঠের ধান ডুবিয়া যায়, অথচ সেচের জন্য করভার বহন করিতে হয়। সেচের খাল দ্বারা জল নিকাশের ব্যবস্থা না করিলে প্রজার প্রকৃত উপকার করা সম্ভবে না।

এদেশে যে কৃষির জন্য জলের বিশেষ প্রয়োজন তাহা য়ুরোপীয়রাও ভাবেন। পাদটীকায় জনৈক বিশিষ্ট য়ুরোপীয়ের মত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তিনি বলিয়াছেন, প্রাচীন ভারতের এবং মিশরের অধিবাসীরা যে জলের অভাব ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর অভাব বিশেষ অনুভব করিত না, এই উভয় দেশের শত শত দেবমন্দির শীর্ষে শোভী পদ্মই তাহার প্রমাণ। ভারতীয় শাসকদিগের উহা উপেক্ষা করা উচিত নহে এ কথাও তিনি বলিয়াছেন। * আসল কথা কৃষির উন্নতিসাধন-কার্য্য উপেক্ষিত হওয়াতে এতদিনে তাহার ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বার্ণিয়ার সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালাদেশ হইতে ভূরি পরিমাণে কার্পাস, রেশম, চাউল এবং চিনি বিদেশে রপ্তানী হইত। † আর আজ সেই বঙ্গদেশে সাড়ে ৫ কোটি মণ বা ৬ কোটি মণ চাউলের অভাব! মুসলমান বণিক্-সভার সভাপতি মিষ্টার এ, আর, সিদ্দিকি তাহার বক্তৃতায় একবার বলিয়াছেন, বাঙ্গালায় আজ ৫ কোটি মণ চাউলের অভাব। ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে ধানের চাষ আরও কমিয়া গিয়াছে। উহা ১ কোটি ৯৫ লক্ষ একরের কিছু অধিক দাঁড়াইয়াছে। এখন বিদেশ হইতে চাউল আমদানী করিবার পথও বন্ধ হইল। এখন কোন উপায়ই ত' দেখা যাইতেছে না।

ফলে খাদ্যশস্য চাষের বিস্তার সাধন করিতে বলিলেই এই সমস্যার সমাধান হইবে না। মানুষের বংশবৃদ্ধি অনুসারে জমির আয়তন বৃদ্ধি পায় না। মানুষকে প্রজ্ঞাবলে ক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্য বৃদ্ধি করিয়া এই সমস্যার সমাধান করিতে হয়। ইহা করিতে হইলে মানুষকে কৃষির ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। একদিনেই তাহা করা যায় না। ক্ষুধা নিবারণের এবং লজ্জা নিবারণের ব্যবস্থা সম্বন্ধে মানুষের কখনই সাধ্যপক্ষে পরবশ হইতে নাই। আজ এই অন্ন-সমস্যা কেবল বাঙ্গালার নহে—নিখিল ভারতের। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশের লোকই এখন তাহাদের দেশ হইতে বিদেশে শস্য রপ্তানী বন্ধ বা সঙ্কুচিত করিয়া দিতেছেন। সেদিনও পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছেন যে, যুক্তপ্রদেশে খাদ্যাভাব ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এখন কেহ কেহ সে কথায় সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। যুদ্ধের জন্য খাদ্য-শস্যের প্রয়োজন অধিক হইতে পারে। গাড়ীর অভাবের জন্য পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ হইতেও খাদ্যশস্য আমদানী করা কষ্টকর হইতেছে। কাজেই ব্যাপারটা অধিকতর জটিল হইয়া পড়িতেছে।

বাঙ্গালায় এই সমস্যা বহুদিন পূর্ব্বেই উপস্থিত হইয়াছে।

* The Lotus placed aloft in the thousand temples of India and Egypt demonstrates the strong traditional veneration for the acquatic element amongst a people who knew no other want. Can we, in thus cruelly ignoring the great instructive worship of our subjects deny that we have deserved the enemity of millions of the present generations or escape the contempt of those who are to come? Those who carefully and without prejudice will examine the present condition of public works in India, must acknowledge that the millions of India have more reason to bless the period of 30 years passed under the Afgan Ferose than the century wasted under the vaunted influence of the Honorable East India Company's rule.

† The knowledge I have acquired of Bengal in two visits inclines me to believe that it is richer than Egypt. It exports in abundance cottons and silks, rice, sugar and butter. It produces amply for its own consumption of wheat, vegitables, grains, fowl, ducks and geese. It has immense herds of pigs and flocks of sheep and goats. Fish of every kind it has in profussion. From Rajmahal to the sea is an endless number of cannals cut in by gone ages from the Ganges by immense labour for navigation and irrigation, while the Indian consider the Ganges water as the best in the world.

Sir William Welcock's
Irrigation in India—P. 18.

প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে তেওতার স্বনামধন্য ভূম্যধিকারী স্বর্গীয় পার্ব্বতীশঙ্কর রায় মহাশয় ধর্ম্মগোলা স্থাপনের চেষ্টা করিয়া দেশে খাদ্যশস্য সঞ্চয়ের চেষ্টা করেন। তাহার পর বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় বরদাপ্রসাদ বসু অন্নরক্ষিণী সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত সভার পক্ষ হইতে বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখকের তদানীন্তন বঙ্গীয় সরকারের প্রধান সেক্রেটারী মিঃ কার্লাইলের সহিত এই বিষয়ের আলোচনা হয়। আমরা বলিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালায় যে পরিমাণ ধান্য উৎপন্ন হয় তাহাতে সকল বাঙ্গালীর স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে না। তখন বাঙ্গালার লোকসংখ্যা এত অধিক ছিল না। উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ অনেকটা অনুমান করিয়া লইতে হয়। সেদিন মিঃ সিদ্দিকী বলিয়াছেন যে, প্রতি একার জমিতে ১২ মণ চাউল জন্মে। এ অনুমান ভুল। কারণ সর্ব্বত্র বারিপাত সমান হয় না। তদ্ভিন্ন লেদা পোকা, নলী পোকা, মধু পোকা, প্রভৃতির উপদ্রব আছে। ইহা বাদ দিলে দশমণ চাউল প্রতি একারে জন্মে কি না সন্দেহ।

যাহা হউক, এখন শিয়রে সংক্রান্তি উপস্থিত। এখন পাট চাষ কমাইয়া দিবার প্রস্তাব হইতেছে। কিন্তু তাহাতে কি সমস্যার সমাধান হইবে? কখনই না। বাঙ্গালায় প্রায় ২৫ লক্ষ একারের কিছু অধিক জমিতে পাটের চাষ হয়। কিন্তু এ প্রদেশের চাউলের এই অভাব পূর্ণ করিবার জন্য যদি বর্ত্তমান প্রথায় চাষ করা হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বিগুণ জমির প্রয়োজন। কিন্তু অত জমি পাওয়া সম্ভব নহে। অথচ নিখিল-ভারতে ৯ কোটি ১৮ লক্ষ একার পতিত জমিতে চাষ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। সে জমিতে চাষ কিরূপ হইবে তাহা বুঝা দুর্ঘট। এরূপ অবস্থায় সারাদি দিয়া এবং সেচের ব্যবহার করিয়া অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন করাই শ্রেয়ঃ। কিছু দিন পরে আশু ধান্য বপনের সময়। এই সময় জমিতে গোবর সার বা ধৈঞ্চার সার খাওয়াইলে ভাল হইত। কিন্তু সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেল। এখন আমাদিগকে ঔদাসীন্যের ফল ভোগ করিতেই হইবে। মারা যাইবে গরীব লোক। কিন্তু এখনও চৈতন্য হইতেছে না।*

* মতামত লেখকের নিজস্ব—বঃ সঃ

বিরহ সুখ

শ্রীকুঞ্জবিহারী চৌধুরী

বিফল হ'ল বড় সাধের
মিলন-বাসর পাতা,
জেগে থাকা, হোক, তাতে কি দুখ?
মর্ম্মে মরুক জ্বালার মত
থাক বিরহ গাঁথা,
অশ্রু ঝরে ভিজাক না'ক বুক;
যে জন তোমার পরম প্রিয়,
তারে তোমার বক্ষে নিয়ো,
চেয়ে রব তাহার হাসি মুখ;
তোমার প্রেমে পাগল আমি—
সেই ত আমার সুখ!
এত ছোট হৃদয়খানির
সোহাগটুকু দিয়ে
ওগো প্রিয়! তোমায় পেতে যাওয়া,
সেত শুধু শিশুর মত
ব্যর্থ প্রয়াস নিয়ে
সুধাকরে হাত বাড়ায়ে চাওয়া।

চাই না ওগো সে সুখ আমি,
তোমায় বুকে ধরব স্বামি,
ফুরাবে এ আঁখির জলে নাওয়া
চির দিনের তৃষ্ণা আকুল,
প্রাণের দাবী-দাওয়া।
ভ্রান্ত আমি, তাইত ছিল
অমন অভিমান,
আজি বঁধু, সকল ঘুচে গেছে;
আড়াল পথে আনা গোনা
শুনব পেতে কান,
চরণ-ধ্বনি উঠবে বুকে নেচে;
যা কিছু মোর উজাড় করে
দিয়ে তোমার ডালা ভরে
রিক্ত হয়ে থাকব শুধু বেঁচে;
তোমার প্রেমের স্পর্শ আমার
স্বপন ভেঙে দেছে।

খৃষ্টীয়-মিশন ও হিন্দুসমাজ

শ্রীঅনিলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার-এট্-ল

[লণ্ডন ইয়ংমেন্স্ খৃষ্টান এসোসিয়েশনে প্রদত্ত বক্তৃতা অবলম্বনে]

সূচনা

কিম্বদন্তী আছে যে যীশুখৃষ্টের দ্বাদশ পার্ষদের মধ্যে অন্যতম সেণ্ট টমাস খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে শুভাগমন করিয়াছিলেন। ইতিহাস কিন্তু সে-বিষয়ে নীরব। ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, ভারতবর্ষে খৃষ্টীয়-ধর্ম্মের প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল চতুর্থ খৃষ্টাব্দে। সে সময়ে সিরীয়াবাসী একদল খৃষ্টধর্ম্মযাজক মালাবার অঞ্চলে বসবাস করিয়া স্থানীয় কয়েকজনকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন এবং তাঁহাদের নানাবিধ কীর্ত্তি অল্পবিস্তর এখনও দক্ষিণভারতে বর্ত্তমান।

পর্ত্তুগীজ মিশন

ব্যাপকভাবে, সঙ্ঘের উপকরণে প্রচার—অর্থাৎ মিশন বলিতে যাহা বুঝায়—তাহার জন্ম পঞ্চদশ শতাব্দীতে। পর্ত্তুগীজগণ ভারতবর্ষে প্রথম আসিয়াছিলেন বাণিজ্য-সূত্রে; তাঁহাদের ভাগ্যে সাম্রাজ্যলাভের যোগাযোগও ঘটিল। অতঃপর ধর্ম্মপ্রচারে তাঁহাদের অদম্য উৎসাহ দেখা গেল। সে যুগে ইউরোপ ভূ-খণ্ডে পোপের একচ্ছত্র আধিপত্য। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের নামে পোপের মনোরঞ্জন করিয়া, পর্ত্তুগীজগণ ভারতবর্ষে আধিপত্য-বিস্তারের নানাবিধ সুযোগ লাভ করিলেন। বিজিত জাতিকে খৃষ্টধর্ম্মাধান করিবার জন্য পর্ত্তুগীজগণ বদ্ধ-পরিকর ছিলেন। দুই শত বৎসরের চেষ্টাতে ১৫ লক্ষ ভারতবাসী ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত হইল।(১) কিন্তু এই আকস্মিক ধর্ম্মান্তর-গ্রহণের ইতিহাসে অনেক কিছু অত্যাচার উৎপীড়ন, আঘাত-আক্রমণের কদর্য্য কাহিনী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। রেভারেণ্ড ক্যাম্পবেল এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের শান্ত-স্নিগ্ধ পল্লীবক্ষে ধর্ম্মের নামে হিংসা ও অত্যাচারের নৃশংস নৃত্য চলিতে লাগিল।(২) ধর্ম্মপ্রচারের মাদকতায় পর্ত্তুগীজগণ কেবল মন্দির-ভাঙ্গা ও বিধর্ম্মী-পীড়নে ক্ষান্ত হন নাই। সমুদ্রের মধ্যে জাহাজ আক্রমণ করিয়া তাঁহারা আরোহিগণকে বলিতেন,—"খৃষ্টধর্ম্মগ্রহণ অথবা সলিল-সমাধি"—"নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে পরিত্রাণায়।"(৩)

এই ভাবে প্রথম যুগে যাঁহারা বলে ও কৌশলে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, মিশনের ইতিহাসে হয় তো তাঁহাদের অশেষ গৌরব—মোট ২১,১৩৬৫৯ ক্যাথলিক ভারতবাসীর মধ্যে ১৫,০০,০০০জনের ধর্ম্মান্তর গ্রহণ তাঁহাদেরই কীর্ত্তি (৪) কিন্তু কোথায় প্রেমের ঠাকুর যীশুখৃষ্টের উদার বাণী, আর কোথায় এই আসুরিক, হিংসা-মূলক দুর্নীতি!

ভারতবাসীর সৌভাগ্যের বিষয়—ধর্ম্মপ্রচারে পর্ত্তুগালের উদ্যম-উৎসাহ কিছুদিনের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া গেল। বাণিজ্য ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে অন্যান্য ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই পর্ত্তুগীজ ধর্ম্মানুরাগের তিরোভাব ঘটিল। তৎপরে, জার্ম্মান, ফরাসী, ইতালীয় ও ওলন্দাজ মিশনারীগণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন কেন্দ্রে অল্পবিস্তর প্রচারকার্য্য করিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। অবশেষে ইংরেজের আগমনে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল—পৃথিবীতে তাহার তুলনা নাই।

যুগ-সন্ধি

ভারতবর্ষের অবস্থা তখন বড়ই শোচনীয়—ভগ্নাবশেষ মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তিমকাল আসন্ন; রাষ্ট্রবিপ্লব ও বৈদেশিক আক্রমণের ফলে দেশবাসী ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত। এমন সময়ে উপস্থিত হইল প্রবল পরাক্রমশালী ইংরেজের একচ্ছত্র আধিপত্য—Pax Britanica—খৃষ্টীয় মিশনের পক্ষে সে এক সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু এই সু-যোগের মধ্যেই নিহিত ছিল দুর্যোগের দূষিত বীজ। পর্ত্তুগীজের ন্যায় ইংরেজেরও মুখ্য

(১) In 1700 A. D. there were 15,00,000 Roman Catholic in India—Encyclopaedia of Religion and Ethics Vol VIII, p. 714.

(২) "The tranquil habitations and peaceful villages were converted into scenes of violence, spoliation and friendish barbarity"—British India by Rev. W. Campbell.

(৩) Catholic Encyclopaedia Vol. VII, p. 731.

(৪) Census of India 1931.

উদ্দেশ্য ছিল—স্বার্থসিদ্ধি। ছলে-বলে-কৌশলে ভারতবর্ষে বৃটিশ আধিপত্য বিস্তার ও পরিপোষণ ছিল তাঁহাদের একমাত্র সাধনা। তাঁহারা ছিলেন কর্ম্মবীর; ধর্ম্মপ্রচারের সময় বা সুমতি কখনোই তাঁহাদের হয় নাই।

মিশনের প্রতি ইংরেজের বৈরাচরণ

ধর্ম্ম প্রচার দূরের কথা, বাস্তবিক পক্ষে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রীয় স্বার্থের জন্য সে-যুগের ভারতীয় ইংরেজ-সম্প্রদায় খৃষ্টীয় মিশনের প্রতি প্রকাশ্যে বিরুদ্ধাচরণ করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে স্থানীয় ধর্ম্মব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলে অপ্রীতির কারণ ঘটিতে পারে—হয় তো ধর্ম্মপ্রবণ ভারতবাসী-সাধারণ নবাগত শাসকগণকে সন্দেহের চক্ষে দেখিবে। কৃষ্ণজাতিকে অন্ধকার হইতে আলোকেতে লইয়া যাওয়া ইংরেজের ব্রত—এ বুলি তখনকার ইংরেজ আয়ত্ত করিতে শেখে নাই। রাজনীতির প্রয়োজনে খৃষ্টীয় মিশনকে প্রকাশ্যভাবে অত্যাচার উৎপীড়ন করিতে তাহার কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ ছিল না। জীব তরাইবার জন্য আমেরিকা ও ইংলণ্ড হইতে কত জাহাজ বোঝাই মিশনারী বাইবেল-হস্তে ভারত যাত্রা করিয়াছিলেন—কিন্তু কোম্পানীর রাজত্বে তখন তাঁহাদের প্রবেশ নিষেধ। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী কোম্পানীর কর্ত্তাগণ খৃষ্টীয় মিশনের পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। কোম্পানীর অধীনস্থ কোনও ভারতীয় কর্ম্মচারী খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাঁহারা ভীত হইতেন এবং তাহাকে জরিমানা করিয়া চাকরী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেন—যাহাতে ধর্ম্মান্তরগ্রহণের সংক্রামকতা অন্য ভারতীয় কর্ম্মচারীদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে। রাজনীতির দিক্ দিয়া হয়তো এরূপ ব্যবস্থার সার্থকতা ছিল। ব্যক্তিগতভাবেও তখনকার ভারতীয়-ইংরেজের জীবনে ধর্ম্মের স্থান ছিল অল্পই। আসুরিক শক্তি ও অতুল সম্পদ্ ছিল তাঁহাদের ঐকান্তিক সাধনা।(১)

(১) "The Court of Directors frankly favoured heathenism and hated the 'Saints' for this further reason that the Anglo-Indians felt themselves embarrassed by them in their own immoral life."
—Outline of a history of Protestant Mission. By Gustav Warneck.

উইলিয়ম কেরী

কোম্পানীর কর্ত্তাদের অনুকম্পায় ভারতবর্ষে খৃষ্টীয় মিশন নিষ্পেষিতপ্রায়, এমন সময়ে কয়েকজন নির্ভীক আদর্শানুরাগী মিশনারীর চেষ্টাতে ইতিহাসের ধারা পরিবর্ত্তন হইল।

মহামতি উইলিয়ম কেরী বুঝিলেন যে, ইংরেজ রাজত্বে ধর্ম্মচর্চ্চা অসম্ভব। তিনি শ্রীরামপুরে ডেনিশ সরকারের আশ্রয়ে খৃষ্টীয় মিশনের ভিত্তি স্থাপন করিলেন এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইংলণ্ডবাসীকে—বিশেষতঃ বৃটিশ পার্লামেণ্টকে বুঝাইলেন যে তাঁহারই সমধর্ম্মী ভারতীয় ইংরেজগণ খৃষ্টীয় মিশনের প্রতি যেরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিতেছেন তাহাতে জগতের চোখে ইংলণ্ডের কলঙ্কের সীমা থাকিবে না। উইলিয়ম কেরীর চেষ্টা ফলবতী হইল।

১৮১৩ সালে বৃটিশ পার্লামেণ্টের আইনের(২) বলে মিশনারী-সম্প্রদায় বৃটিশ-ভারতে বসবাস ও প্রচার-কার্য্যের জন্য অনুমতিলাভ করিলেন। এই আইন পাশ হওয়াতে ভারত-সরকারের ঘোরতর আপত্তি ছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আইনের আশ্রয়ে খৃষ্টীয় মিশন তাহার প্রথম ও প্রধান শত্রু ভারতীয় ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়কে—পরাভূত করিল! অতঃপর ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট খৃষ্টধর্ম্মসম্বন্ধে অনেকটা নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করিয়া আসিতেছে বলা যাইতে পারে।

হিন্দু-খৃষ্ট-সংঘর্ষ

কেরী ও মার্শম্যান প্রমুখ কয়েকজন উৎসাহী মিশনারীর উদ্যোগে ভারতবর্ষে ইংরেজের মারফৎ খৃষ্টীয় মিশনের সূত্রপাত হইল। তাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে ভারতবর্ষ লাভ করিল—ছাপাখানা, সংবাদপত্র, বিদ্যালয় এবং দেশীয় ভাষার বাহনে খৃষ্টীয় উপদেশ ও চিন্তাধারা। মিশনারীর প্রভাব মননশীল হিন্দুর চিত্তস্পর্শ করিল। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুসমাজের মধ্যেই আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মরক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হইল। তাহারই ফলে গড়িয়া উঠিল ব্রাহ্মসমাজ এবং হিন্দু কলেজ। খৃষ্টান প্রভাবের বন্যায় দেশ অভিভূতপ্রায় হইয়াছিল; সে-যাত্রা বাঁচিয়া গেল যুগপ্রবর্ত্তক রামমোহন রায়ের অসাধারণ প্রতিভা এবং ব্যক্তিত্বের বলে।

কিছুদিন একভাবে চলার পর হিন্দুসমাজের উপর আবার

(২) Government of India Act 1813.

একটা বড় ধাক্কা আসিল—এ্যালেকজাণ্ডার ডাফের চেষ্টায়। স্কটল্যাণ্ডের এই মনীষী মিশনারী উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মন অধিকার করিবার এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন—ডাফ কলেজ। সে-যুগের তরুণ-বাঙ্গালার উপর ডাফ সাহেবের প্রভাব ছিল যেমন ব্যাপক তেমনি গভীর। তাঁহার কলেজের ভিতর দিয়া দেশের যুব-সম্প্রদায়ের মনে পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারা প্রবেশ করিল। বাঙ্গালীর মনে জিজ্ঞাসা ছিল, আদর্শানুরাগ ছিল, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ছিল; কিন্তু নিজেদের শাস্ত্র সম্বন্ধে ছিলেন তাঁহারা অজ্ঞ, স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। ব্রাহ্মণের দাপট, ধর্ম্মে পৌত্তলিকতা, আচারে কুসংস্কার ইত্যাদি হিন্দু-সমাজের অনেক কিছু তাঁহাদের সত্য-সন্ধানী মনকে ক্লেশ দিত। আধ্যাত্মিক জীবনের সমস্যা ছিল তাঁহাদের কাছে জটিল, সমাধান দুরূহ। তাঁহাদের অবস্থা ছিল—কাণ্ডারীহীন নৌকার মতন। এমন সময়ে উপস্থিত হইল যীশুখৃষ্টের বাণী। মিশনারীগণ শিখাইলেন আধ্যাত্মিক জীবনের সহজ সত্য কথা; বোঝা যায়, ধরা-ছোঁয়া পাওয়া যায় এমন এক ভগবৎ-তত্ত্ব।

উপনিষদের অবাঙ্মনসোগোচরব্রহ্ম-পরিকল্পনা সাধারণ মর্ত্ত্যবাসীর সাধ্যাতীত; আবার ইতুপূজা, বারব্রত, মনসা, শীতলা ইত্যাদি ব্যাপারে নব্যশিক্ষিত মন কোনও মতেই সাড়া দেয় না। সুতরাং খৃষ্টধর্ম্মের সংস্পর্শে হিন্দু যুবকদের মধ্যে কেহ কেহ যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। মধুসূদন দত্ত, লালবিহারী দে ইত্যাদি কয়েকজন বিশিষ্ট হিন্দু ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেন। খৃষ্ট মিশনের ইতিহাসে আবার এক সুবর্ণসুযোগ আসিল। কোনও কোনও মিশনারী আশা করিয়াছিলেন যে অল্পকালের মধ্যে সমগ্র ভারত খৃষ্টান হইবে। নানাদিক দিয়া মিশনের প্রসার বিস্তার হইতে লাগিল। হিন্দুকে খৃষ্ট-বাণী শুনাইবার জন্য আমেরিকা ও ইউরোপ হইতে দলে দলে মিশনারী সমাগম হইল এবং কালক্রমে ভারতবর্ষের বিভিন্ন-স্থানে ১৫০টি মিশন অনুষ্ঠান গঠিত হইল।

মিশনের উদ্যোগে বর্ত্তমানে ৫৩টি কলেজ, ৩১৫টি উচ্চ বিদ্যালয়, ন্যূনাধিক ৩০০ মধ্য-বিদ্যালয়, ২৫০ হাঁসপাতাল, ৬৮ কুষ্ঠাশ্রম, ১১ ক্ষয়কাসাশ্রম, ৪০ ছাপাখানা এবং অন্যান্য অনেক অনুষ্ঠান সুচারুরূপে কাজ চালাইতেছে। মিশনের পশ্চাতে অর্থ আছে, শিক্ষিত কর্ম্মী আছে, বিপুল সঙ্ঘশক্তি আছে। কিন্তু তথাপি মোট ৩৮৮,৮৫২,০০০ ভারতবাসীর মধ্যে মাত্র ৬,২৯৬,৭৬৩ জন খৃষ্টান—অর্থাৎ শতকরা আন্দাজ ১·৭ জন। তাহার মধ্যেও আবার ১৬৭,৭৭১ জন ইউ-রোপীয় এবং ১৩৮,৭৫৮ জন এংলোইণ্ডিয়ান।(১) খৃষ্ট মিশনের প্রতি ভারতবাসীর এরূপ উদাসীনতার কারণ কি?

ইংরেজ যুগে খৃষ্ট-মিশনের ব্যর্থতার কারণ

প্রথমতঃ, ভারতবর্ষে তখন এক যুগ-সন্ধিক্ষণ—জীবনযাত্রার অবস্থান্তর আরম্ভ হইয়াছে এমন সময়ে খৃষ্টধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বোধ্য অথচ চমক-প্রদ নানারকম চিন্তা-প্রণালী সাগর-পার হইতে উপস্থিত হইল। আগষ্ট কোমৎ-র প্রত্যক্ষবাদ (Positivism); মাদাম ব্লাভাৎসকীর দৈববিদ্যা (Theosophy); তা' ছাড়া জাতীয়তাবাদ, মানবতাবাদ ইত্যাদি নানাবিধ নবাগত তত্ত্বের প্রাদুর্ভাবে ভারতের মস্তিষ্ক ক্লান্ত-অভিভূত হইয়া পড়িল। কাহাকে বর্জ্জন করিয়া কাহাকে গ্রহণ করা শ্রেয়ঃ? সকলেই যে বলে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" তখন হিন্দু হৃদয়ঙ্গম করিল "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

দ্বিতীয়তঃ খৃষ্টধর্ম্মেরই মধ্যে দেখা গেল বহু জাতিবিভাগ—ক্যাথলিক, প্রটেষ্টাণ্ট, পিউরিটান ইত্যাদি প্রত্যেকেই বলে "আমি-ই শ্রেষ্ঠ"। সমন্বয়ের বাণী পাওয়া গেল না—শুধু সংঘাত, সংঘর্ষ, শ্রেষ্ঠত্বাভিমান।

তৃতীয়তঃ খৃষ্টীয় মিশন যেমন একদিকে বাইবেল ধর্ম্ম প্রচার করিল, অপর দিকে মিশনারী কলেজের ভিতর দিয়া হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, হক্সলী ও ভারতবাসীর মনোরাজ্য অধিকার করিয়া বসিল। বিজ্ঞানানুশীলনের ফলে ভগবৎতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্ত্তন হইল। নাস্তিকতা হইয়া উঠিল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ফ্যাশন। বুদ্ধি-কৌলিন্যের গৌরবে তাঁহারা যুক্তি দ্বারা ভগবানের অস্তিত্ব খণ্ডন করিলেন; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের স্পর্দ্ধায় ইন্দ্রিয়াতীত চৈতন্যকে উড়াইয়া দিলেন।

চতুর্থতঃ হিন্দুর মনে যেটুকু নিষ্ঠা ও ধর্ম্মানুরাগ ছিল তাহা কতকটা লোপ পাইল মিশনারীদেরই সাহচর্য্যে। স্বার্থ

(১) The Indian Year Book and Who's Who 1942-43—p. 31 and 415.

সিদ্ধির জন্য মিশনারীগণ ভারতবাসীকে শিখাইতে চাহিলেন যে হিন্দুধর্ম্ম অন্তঃসারশূন্য। তাঁহাদের মন্ত্রণাতে যাহারা মুগ্ধ হইল, তাহারা কেহ কেহ হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল; সেই সঙ্গে অনেকেরই ধর্ম্মভাবেরও বিসর্জ্জন হইয়া গেল। শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ধর্ম্মের প্রধান ভিত্তি—যুগযুগান্তরের সাধনাসাপেক্ষ সংস্কার। এই সংস্কারের মূলে কুঠার আঘাত করিয়া মিশনারীগণ অর্ব্বাচীনতার পরিচয় দিলেন। তাঁহারা ভাঙ্গিয়াছিলেন—গড়িতে পারেন নাই।

বিভিন্ন চিন্তাধারার ঘূর্ণাবর্ত্তে হিন্দু বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। পাশ্চাত্ত্যের মোহে তখন সে অভিভূত, নূতনত্বের নেশায় নিজেকে ভুলিতে বসিয়াছিল। জাতীয় জীবনের এহেন দুঃসময়ে সৌভাগ্যক্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ কয়েকজন ধর্ম্মাত্মা মনীষীর আবির্ভাব হয়। হিন্দুকে আত্ম-স্থ করিয়া স্বীয় মহিমায় তাহাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা ছিল তাঁহাদের জীবনের ব্রত। তাঁহাদের সাধনা সফল হইল। হিন্দুর হিন্দুত্ব তাঁহারা বাঁচাইয়া রাখিলেন। হিন্দু বুঝিল যে, স্বধর্ম্ম ত্যাগ না করিয়াও খৃষ্টধর্ম্মের সারাংশ গ্রহণ করা যায়। সভ্যজগতে হিন্দুর গৌরবের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।(১)

খৃষ্ট-মিশনের অবদান

মিশনারীদের মধ্যেও অন্ততঃ কয়েকজন ছিলেন যাঁহাদের নিঃস্বার্থ সেবা ও নিবিড় আদর্শানুরাগ পৃথিবীর মধ্যে বিরল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে কতকটা পরাভূত হইয়া, তাঁহারা হাঁসপাতাল, অনাথ-আশ্রম, বিদ্যালয় ইত্যাদি অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া জনসেবা দ্বারা দেশবাসীর-বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর-হৃদয় অধিকার করিতে চেষ্টা করিলেন। তাহাতে কিছু ফলও হইল। লোকে যত্নসহকারে যীশুর মহিমা শ্রবণে প্রবৃত্ত হইল এবং কয়েকজন সাধু-প্রকৃতির মিশনারীকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে লাগিল। সেই সুযোগে কোনও কোনও মিশনারী নির্ম্মমভাবে হিন্দুকে শুনাইয়া দিলেন, "টুমাডের কৃষ্টো চোর, লম্পট; টুমাদের কালী ন্যাংটা।" হিন্দুর মন স্বভাবতঃ তাঁহাদের প্রতি বিরূপ এবং বীতশ্রদ্ধ হইয়া গেল। সেই সময় হইতে মিশনের প্রতিপত্তি লক্ষিত হইল প্রধানতঃ নিম্নশ্রেণীর মধ্যে—বিশেষতঃ মান্দ্রাজ ও ছোটনাগপুরের কোল ভীল জাতির মধ্যে—যাহাদের তখনও পর্য্যন্ত ধর্ম্ম বলিতে বিশেষ কিছুই ছিল না এবং অর্থের অভাব ছিল ততোধিক। মিশনারীর আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাহারা ধর্ম্ম-অর্থ দ্বিবর্গ লাভ করিল। বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় বর্গের প্রতি আকর্ষণই অনেকক্ষেত্রে তাহাদের ধর্ম্মান্তর গ্রহণের প্রধান কারণ।

হিন্দু প্রতিক্রিয়া

এদিকে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুসমাজ তখন আত্মরক্ষায় বদ্ধ-পরিকর। মিশনের বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগ ছিল প্রধানতঃ দুইটি—প্রথমতঃ ধর্ম্মের দিক দিয়া, দ্বিতীয়তঃ রাজনীতির দিক দিয়া। মিশনারী সাহেবরা হিন্দুর ধর্ম্ম ও কৃষ্টির যথোচিত গুণগ্রহণ দূরের কথা, এদেশের ইতিহাস ও দর্শন অধ্যয়নেও বিরত ছিলেন এবং অনেক সময়ে নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য হিন্দুশাস্ত্রের কদর্থ করিতেন। তাঁহাদের সমালোচনার মধ্যে না ছিল অন্তর্দৃষ্টি, না ছিল সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা। নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বাভিমানে তাঁহারা ছিলেন মুগ্ধ; অন্যকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করিতে পারিলে গৌরব লাভ করিতেন। সহকর্ম্মীদের আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া রেভারেণ্ড শিফ্‌ লিখিয়াছেন যে, "মিশনারীগণ ভুলিতে পারিলেন না যে তাঁহারা শাসকের জাত; বংশমর্য্যাদার দম্ভ তাঁহাদের অনেকের মধ্যে মজ্জাগত এবং তাঁহারা ভারতবাসীর প্রতি ঘৃণা পোষণ করিতেন,"(১) বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের বাণী তাঁহারা প্রচার করিতেন—কিন্তু নিজেদের আচরণে তাহার আন্তরিক পরিচয় পাওয়া গেল না।

ভারতবাসী স্পষ্টই বুঝিল যে ধর্ম্মের নামে ধীরে ধীরে দেশের মধ্যে এক "Theocratic Imperialism" গড়িয়া উঠিতেছে। সেই সময়ে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বজ্রনির্ঘোষে প্রচার করিলেন যে, ভারতবাসীকে স্বীয়ধর্ম্ম এবং নিজস্ব শাসনতন্ত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। খৃষ্টান প্রভাব বিলুপ্ত

(১) The *New York Herald* spoke of Swami Vivekananda :—

'He is undoubtedly the greatest figure in the Parliament of Religions. After hearing him we feel how foolish it is to send missionaries to this learned nation.'

—Life of Swami Vivekananda, published by the Advaita Ashram, Mayavati p. 379.

(১) Present Conditions of India. By Rev. Leonard Schiff.

হইবার আশঙ্কাতে মিশনারীগণ নির্ম্মমভাবে ভারতীয় ধর্ম্ম ও আচারের বিরুদ্ধে কটূক্তি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এই অ-খৃষ্টীয় আচরণে রেভারেণ্ড সি, এফ, এণ্ডরুজ মর্ম্মান্তিক লজ্জা পাইয়াছিলেন।(২) বাস্তবিক, খৃষ্ট-মিশনের কলঙ্কের কথা—ঊনবিংশ শতকের শেষার্দ্ধে S. P. C. K. (Society for Propagation of Christian Knowledge) যে-সব বই প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার অনেক ক্ষেত্রে মিস্ মেয়ো-সুলভ মনোভাবের পরিচয় সুস্পষ্ট। ধর্ম্ম-গুরুর আসন দাবী করিয়া যাঁহারা ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের পক্ষে এরূপ আচরণ অশোভন এবং আত্মঘাতী।

উপসংহার

মিশনারীদের অপচেষ্টা সত্ত্বেও যাহা সত্য তাহা কালক্রমে আত্ম-প্রকাশ করিল—প্রকাশই সত্যের ধর্ম্ম। একদল ইউরোপীয় জ্ঞান-তপস্বী সংস্কৃত ভাষার সোনারখনি হইতে আবিষ্কার করিলেন সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন-অনুভূতির অফুরন্ত ভাণ্ডার। কালিদাসের কাব্য বিশ্বকবি গ্যয়টে (Goethe)-কে মুগ্ধবিস্ময়ে অভিভূত করিল। জগদ্বরেণ্য সোপেনহাওয়া (Schopenheur) বিশ্ববাসীর হিতার্থে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন যে, উপনিষদ তাঁহার জীবনে-মরণে শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। মোক্ষমূলর (Maxmuller) একখানি বই লিখিয়া সভ্যতা-মদমত্ত পশ্চিমকে স্তম্ভিত করিলেন—"India, what can it teach us?"

শতাব্দী-পরিবর্ত্তনের প্রাক্কালে এবং বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভে সুপ্তপ্রায় হিন্দুর জীবনে জাগরণের লক্ষণ চারিদিকেই ফুটিয়া উঠিল। সাহিত্যে বঙ্কিম, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ; রাজনীতি-ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, তিলক; সমাজ-সংস্কারে বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, রাজনারায়ণ; ধর্ম্মে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ। সনাতন হিন্দুত্বের সার-সত্য মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিল পরমহংসদেবের বাণী ও জীবনের মধ্যে। "যতো মত ততো পথ" এই অমর সত্য প্রচার করিয়া তিনি জগৎকে দেখাইলেন যে, হিন্দু সভ্যতার মহত্ত্ব ও মাধুর্য্য সমন্বয়ের মধ্যে। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম এই সমন্বয়ের সত্যে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই তাহা সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ নহে—বিশ্বমানবের অবলম্বন।

(২) "The policy of attacking non-christian religions pursued by the missionaries was un-christian in spirit and opposed to the word of the master—He came not to destroy, but to fulfil." True India by Rev. C. F. Andrews.

বারাঙ্গনা

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

ঘৃণা স'য়ে আর ঘৃণিতা হইয়ে কোনমতে আছ বেঁচে;
রাজ-রাস্তায় রূপের পসরা খুলিয়াছ—নিজে যেচে।
তাইত ঘৃণার ভার,—
তোমার স্কন্ধে চাপিয়াছে এত, তিলে তিলে অনিবার!
এক অপরাধে শত অপরাধ তোমার স্কন্ধে তাই
চাপিয়াছে; আরো কত যে চাপিবে সংখ্যা তাহার নাই।
তুমি মরে আছ; বেঁচে নাই মাগো! পড়ে আছ এককোণে
মরার ঘরেতে মরিতে আসিয়া যারা গালাগালি শোনে—
তারাও মানুষ, তারাও পুরুষ, তবু তুমি নারকী যে!
অপরাধী নয়—স্বেচ্ছায় যারা অপরাধ করে নিজে।
জমার খাতায় নাই মা কিছুই—সকলেই দেছে ফাঁকি,
সকল দেনার সুদ গুনিয়াছ, যার যাহা ছিল বাকী।
নিত্য নূতন পাওনাদারের তাগাদায় দে'ছ সাড়া,—
বাকী-বকেয়ায় তোমার পাওনা পড়ে থাকে নাই তাড়া।
এম্‌নি করিয়া কাটাইবে মাগো! জীবনের শেষ দিন
তবু মানুষেরা করিবে যে ঘৃণা বলিবে যে ডাষ্টবীন্!
ডাষ্টবীন্ হয়ে থাকো।—
পাশবিকতার আঁধার হইতে আলো দিয়ে তুমি রাখো।
পান খেয়ে ঠোঁট রাঙাইয়া যারা রাজপথে পিক্ ফেলে,
কৃতজ্ঞতায় ভুলে যায় তারা—সত্যেরে অবহেলে!
নিত্য তাহারা যে পথে চলিছে সেই পথে করে ঘৃণা।
শত কাজ তবু হয় নাকো তার, সেই পথটুকু বিনা!
সব সয়ে তুমি রাজপথসম তবু বেঁচে আছো মাগো!
শৃঙ্খলতার শিয়রে বসিয়া পসারি বাসরে জাগো।

নাৎসী-অধিকৃত ইয়োরোপের অভ্যন্তর

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

বহুদিন হইতে ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির আলোচনা আমরা শুনিয়া আসিতেছি। রুশিয়া বৃটেনকে ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করিবার জন্য একাধিকবার অনুরোধ জানাইয়াছে এবং আজও রুশিয়ার প্রত্যেক নরনারী কবে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের অভিযান সুরু হইবে তাহারই জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া আছে। মিত্রশক্তির সামরিক ও রাজনীতিক কর্ণধারগণ কর্ত্তৃক একাধিকবার দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সৃষ্টিবিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে এবং সম্ভাব্য সময় উপস্থিত হইবামাত্র যে ইয়োরোপে মিত্রশক্তি কর্ত্তৃক অভিযান পরিচালিত হইবে সে আশ্বাসও প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু অবিলম্বে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির জন্য চারিদিকে এত আলাপ-আলোচনা ও আগ্রহ কেন?

বর্ত্তমান যুদ্ধের রূপ

আমাদের প্রথমেই স্মরণ রাখা প্রয়োজন—বর্ত্তমানের যুদ্ধ সমষ্টি-যুদ্ধ। যুদ্ধের সে প্রাচীন রূপ আর নাই। এমন একটা দিন ছিল যখন নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সৈন্য বধ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে মহাবীর ভীষ্ম শঙ্খধ্বনি করিয়া আপন শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন, সেদিনের মত যুদ্ধও শেষ হইল। এই সেদিন, এখনও দুইশত বৎসর পূর্ণ হয় নাই, এক আম-বাগানের যুদ্ধে বাংলার ভাগ্য নির্ণীত হইয়া গেল। অর্থাৎ কিছুদিন পূর্ব্বেও যুদ্ধের এক বিভিন্ন রূপ ছিল, স্থান কাল পাত্র ছিল। তখন যুদ্ধ হইত দুই যুযুধান রাষ্ট্রের বেতনভোগী সৈন্য-দলের মধ্যে, রাষ্ট্রের আবালবৃদ্ধবনিতা সেই সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া পড়িত না। যুদ্ধ হইত উন্মুক্ত প্রান্তরে, নদীতীরে, অথবা অনুরূপ কোন স্থানে, সমগ্র যুযুধান রাষ্ট্র তখন যুদ্ধ-ক্ষেত্রে পরিণত হয় নাই। যুদ্ধ পরিচালনার একটা নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল, রাতের অন্ধকারে গোপনে মারণাস্ত্র লইয়া শত্রু-শিবিরে আক্রমণ তখন ন্যায়-যুদ্ধের মধ্যে পরিগণিত হইত না। কিন্তু গত ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের সময় হইতে সংগ্রামের রূপ পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ঐ সময়ে বহুবিধ নূতন সমরোপকরণের আবির্ভাব হইয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে বিমানের ব্যবহারের ফলে ভৌগোলিক দূরত্ব দূর হইয়াছে। বহুপ্রকার রণসম্ভার ও তাহার আনুষঙ্গিকের আবিষ্কারের ফলে নৈশ আক্রমণের অসুবিধাও আর নাই। কিন্তু তখনও এই যুদ্ধ ছিল প্রধানতঃ স্থিতির যুদ্ধ। কাঁটা তার খাঁটাইয়া, পরিখার আড়ালে থাকিয়া যুদ্ধ চলিত দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। কিন্তু ১৯২০ হইতে ১৯৪০ সালের মধ্যে সামরিক জগতে বিরাট পরিবর্ত্তনের ফলে যে বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে বর্ত্তমান যুদ্ধের একেবারে রূপান্তর ঘটিয়াছে। বিমানবিধ্বংসী কামান, ট্যাঙ্ক, প্যারাসুট সাহায্যে সৈন্য স্থানান্তর করণ, বহুবিধ বোমা ও বিষবাষ্পের আবিষ্কার, যুদ্ধে ব্যাপকভাবে বিমান নিয়োগ, মাইন, সাব-মেরিণ, ইউবোট প্রভৃতির ব্যবহার—ইত্যাদির ফলে যুদ্ধের রূপ সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমানের সংগ্রামকে বলে গতির যুদ্ধ। সমষ্টি-সংগ্রাম ইহার বিশেষত্ব। সমরোপ-করণের মধ্যে যেমন যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইয়াছে, রণনীতির মধ্যেও আসিয়াছে তেমনই পরিবর্ত্তন। আধুনিক যুদ্ধ কোন এক নির্দ্দিষ্ট রণক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, যুদ্ধ-পরিচালনার ভারও একদল বেতনভোগী বাহিনীর মধ্যে সমাপ্ত হইয়া যায় নাই। লুইস্-গান্ লইয়া যে সৈনিক প্রকৃত রণক্ষেত্রে শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করে সে যেমন যোদ্ধা, তেমনই যে কৃষক সৈন্যদের আহারের জন্য রণক্ষেত্র হইতে শত শত মাইল দূরে শস্য উৎপাদন করে, যে শ্রমিক আপন দৈহিক শক্তিতে কারখানায় সমরসম্ভার প্রস্তুত করে, যে বৈজ্ঞানিক আপন বীক্ষণাগারে সাধনায় নিরত, যে নাগরিক রণক্ষেত্রে সৈন্যদের আহার্য্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রেরণে নিযুক্ত—তাহারাও প্রত্যেকে রণক্ষেত্রস্থিত সৈন্যের মতই যোদ্ধা। আজকের যুদ্ধও তাই আর উন্মুক্ত প্রান্তর অথবা আম-বাগানে সীমাবদ্ধ নহে। তাই আজ রণক্ষেত্র হইতে পাঁচশত মাইল দূরেও যুযুধান রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে বিমান আক্রমণ পরিচালন করিতে হয়। তাই আজ সামরিক ও বেসামরিক নরনারী

বলিয়া উভয় দলের মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট ভেদরেখা টানা যায় না। এতদ্ব্যতীত, বেতনভোগী সৈনাদলই শুধু যুযুধান রাষ্ট্রের একমাত্র শক্তি নহে, সামরিক শক্তির পিছনে আর একটি শক্তি সকল সময় কার্য্যকরী রহিয়াছে এবং যুদ্ধনিরত রাষ্ট্র এই শক্তিকেই ভয় করে বেশী। এই শক্তি হইতেছে যুধ্যমান রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের নৈতিক শক্তি। এই নৈতিক শক্তির প্রতিরোধ ক্ষমতার প্রাবল্য যুধ্যমান রাষ্ট্রবর্গের অজ্ঞাত নয়। এই নৈতিক শক্তির মূলে আঘাত হানাব জন্যই জার্ম্মানী কর্ত্তৃক রুশিয়ার একাধিক অঞ্চলে নির্ব্বিচারে বোমা বর্ষিত হইয়াছে, এই নৈতিক শক্তির দৃঢ়তার জন্যই অপ্রচুর সমরোপকরণ লইয়াও পৃথিবীর এক প্রথমশ্রেণীর সামরিক শক্তি জাপানকে চীন দীর্ঘ সাত বৎসর ধরিয়া ঠেকাইয়া রাখিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রণনীতির মধ্যেও আসিয়াছে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন। স্থিতি-যুদ্ধে যে রণপদ্ধতি কার্য্যকরী হইত গতি-যুদ্ধে তাহা অচল। পূর্ব্বে এক সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে এক বিরাট বাহিনী লইয়া মার্চ্চের তালে তালে শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হওয়া চলিত। রণকৌশলের জন্য প্রত্যেক সৈন্যের তখন চিন্তা করিবার বিশেষ প্রয়োজন থাকিত না। সে ভার থাকিত অধিনায়কের উপর। সৈন্যেরা ছিল যন্ত্রের ন্যায়, তাঁহারই নির্দ্দেশ অনুযায়ী তাহারা যুদ্ধ করিত। কিন্তু বর্ত্তমান সমষ্টি-যুদ্ধে সৈন্যরা আর শুধু যন্ত্র নহে, তাহারা যেমন সক্রিয়, তেমনই সজীব। কোন্ পদ্ধতিতে যুদ্ধ পরিচালিত হইবে তাহা নির্ণীত হয় সৈন্যাধ্যক্ষের দ্বারা, কিন্তু রণক্ষেত্রে কোন্ রণকৌশল অবলম্বন করিতে হইবে তাহা বিচার করে যুদ্ধরত সৈন্যরাই। সেই বিশাল বাহিনীর যুদ্ধও আজ সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে, প্রয়োজন মত সৈন্যদল অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া প্রয়োজনানুযায়ী রণকৌশল অবলম্বন করিয়া সংগ্রাম পরিচালনা করে। বন-জঙ্গলের যুদ্ধে এই ধরণের সংগ্রামের বিশেষ প্রয়োজন। মূল বাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কয়েক দিনের উপযোগী রসদ ও খাদ্যাদি সঙ্গে লইয়া সৈন্যেরা অতি ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া প্রয়োজন মত ঝোপের আড়ালে অগ্রসর হয়। কোন্ দিক দিয়া যাইতে হইবে, শত্রুকে কোন্ দিক্ দিয়া আক্রমণ করা তাহাদের পক্ষে সুবিধা, তাহা সৈন্যাধ্যক্ষকর্ত্তৃক পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় না, সে বিচারের ভার থাকে প্রকৃত সৈনিকের উপর, কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবস্থা সে অবলম্বন করে। মালয়ের সংগ্রামে জাপ-সৈন্য বন-জঙ্গলের যুদ্ধে এই বিষয়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে; মিত্রশক্তি-বর্গের সৈন্যদেরও এই পদ্ধতি সুশিক্ষিত করিয়া তোলার সংবাদ সামরিক বিভাগ হইতে প্রদান করা হইয়াছে।

ইহাই হইল বর্ত্তমান যুদ্ধের রূপ এবং এই সমষ্টি-যুদ্ধে সমষ্টিগত বাধা প্রদান প্রয়োজন। যুযুধান রাষ্ট্রের এক পক্ষ যখন আপনার সকল সামরিক শক্তি, সৈন্যবল ও সমরোপকরণ লইয়া অভিযানে অগ্রসর, প্রতিপক্ষেরও তখন তাহার প্রতিরোধের জন্য সমগ্র শক্তি নিয়োগ করা আবশ্যক। সমষ্টি-যুদ্ধের ইহাই বিশেষত্ব। এই জন্যই রুশিয়া, বৃটেন, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতের জনসাধারণ মিত্রশক্তিকে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করিতে দেখিতে আগ্রহান্বিত। যে কোন যুযুধান রাষ্ট্রের পক্ষে একাধিক রণক্ষেত্রে একই সঙ্গে সংগ্রাম-পরিচালনা বিশেষ আয়াসসাধ্য। উভয় রণক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের সৈন্যবলের উপযোগী বাহিনী নিয়োগ করিতে হইবে, তাহাদিগকে প্রয়োজনানুযায়ী রণসম্ভার ও খাদ্যাদি প্রেরণ করিতে হইবে, সংযোগ রক্ষার ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে, ইহার উপর আবার যুদ্ধনিরত সৈন্যদের সাহায্যের জন্য নূতন সৈন্য প্রেরণের প্রশ্ন আছে। ইহার সঙ্গে আবার জড়িত আছে দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থা, শ্রমিক সমস্যা এবং আরও কত কি!

ইয়োরোপে মিত্রশক্তি কর্ত্তৃক জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্ট হইলে তাহা যে জার্ম্মানীর চরম পরাজয়কে আরও নিকটবর্ত্তী করিয়া দিবে ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু যুযুধান প্রতিপক্ষ কর্ত্তৃক দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সৃষ্টি না হইলেও যুদ্ধনিরত যে রাষ্ট্রের অদূর ভবিষ্যতে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে, অনেক সময়েই তাহাকে এক দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সম্মুখীন হইতে হয়। রাষ্ট্রের মধ্যে একাধিক রাজনীতিক মতাবলম্বী দলের অস্তিত্ব বিশেষ বিস্ময়ের বিষয় নহে এবং রাষ্ট্রের পরাজয় অনিবার্য্য হইয়া উঠিলে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ঐ সকল বিভিন্ন সংগঠন মাথা নাড়া দিয়া উঠে। ইতিহাসে ইহার নিদর্শনের অভাব নাই এবং খাস জার্ম্মানীতেও একাধিকবার এই ঐতিহাসিক অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এই আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ তখন রাষ্ট্রের নিকট দ্বিতীয় রণাঙ্গন হইয়া দাঁড়ায়।

এই আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ একদিকে যেমন রাষ্ট্রকে বিব্রত করিয়া তোলে, তেমনই ইহা রাষ্ট্রের দৌর্ব্বল্য ও আসন্ন পরাজয়ের নিদর্শন। নাৎসী-অধিকৃত ইয়োরোপের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিক অবস্থাকে এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া বিচার করিলে বর্ত্তমানে জার্ম্মানীর শক্তি কতখানি সংহত আছে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

ফ্রান্স

জেনারেল দ্য-গল অথবা জেনারেল জিরো যে জার্ম্মানী কর্ত্তৃক ফ্রান্স অধিকারের একমাত্র প্রতিবাদ তাহা নহে। গত ১৯৪২ সালে শীতের প্রারম্ভে রুশিয়ায় জার্ম্মানীর সামরিক বিপর্য্যয় আরম্ভ হওয়ার সময়ে জার্ম্মান-বিরোধী মনোভাব ফ্রান্সে বিশেষ পরিস্ফুট হয়। ইহার পূর্ব্বেই ম লাভালের প্রতি গুলিবর্ষণ, জার্ম্মানীতে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক শ্রমিক প্রেরণে ম লাভালের অক্ষমতা প্রভৃতি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল যে. ফ্রান্সে জার্ম্মান-বিরোধী মনোভাব ক্রমশঃই ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছে। গত ১৯৪২ সালের মধ্যভাগে মাত্র ছয় সপ্তাহে ফ্রান্সে ১২৮৮৫০ জন সাম্যবাদীকে বন্দী ও গুলি করিয়া হত্যা করা হয় পাঠকবর্গের তাহা বোধ হয় স্মরণ আছে। ১৯৪২-৪৩ সালের শীতে রুশিয়ায় জার্ম্মানীর ক্রম-পশ্চাদপসরণের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সে জার্ম্মান বিরোধী মনোভাব অতিশয় তীব্র হইয়া উঠে এবং সংগঠনের সৃষ্টি হয়।

ফ্রান্সে বর্ত্তমানে গেরিলা বাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই বাহিনীর ফ্রান্সস্থিত প্রধান কেন্দ্র জেনারেল দ্য-গলের সহিত সংযোগ রক্ষা ও সংবাদ আদান-প্রদান করিতেছে। জেনারেল দ্য-গল এই গেরিলা বাহিনীর যে প্রথম সংখ্যক ইস্তাহার পাইয়াছেন তাহাতে প্রকাশ যে, চালোন্‌স্ অঞ্চলে গেরিলা বাহিনী জার্ম্মান সৈন্যপূর্ণ একখানি ট্রেণ উল্টাইয়া দিয়াছে, ২৫০ জনের উপর জার্ম্মান সৈন্য নিহত ও শতাধিক আহত হইয়াছে। কোৎ-ডি-ওর অঞ্চলে সমরোপকরণপূর্ণ একখানি ট্রেণ ইহারা ধ্বংস করিয়াছে। ইস্তাহারে প্রকাশ, ১৪টি ট্রেণ, ৯৪ ইঞ্জিন ও লরী ও ৪৩৬ খানি অশ্ববাহী গাড়ী ইহারা বিনষ্ট করিয়াছে, ৪টি সেতু উড়াইয়া দিয়াছে, ৩২টি স্থানে অগ্নিসংযোগ করিয়াছে এবং ১০টি শ্রমিক-সংগ্রহ-কেন্দ্র ধ্বংস করিয়াছে। রয়টার কর্ত্তৃক বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে ২৫০,০০০ শ্রমিককে জার্ম্মানীতে প্রেরণের জন্য ম লাভালের উপর যে আদেশ ছিল তাহা অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ম লাভালকে তিন দিনের সময় দিয়া এক চরমপত্র প্রদান করা হইয়াছে। জার্ম্মানী কর্ত্তৃক শক্তি প্রয়োগ করিয়া



ম লাভাল (ফ্রান্স)

শ্রমিক সংগ্রহের বিরুদ্ধে ফ্রান্সে দৃঢ় প্রতিবাদ উঠিয়াছে। যে ৭০০০ স্বদেশপ্রেমিক ফরাসী হট্ স্যাভয়-এর পর্ব্বতে জার্ম্মান ও ভিসি সৈন্যের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছে তাহাদিগকে আত্মসমর্পণের চরম পত্র প্রদত্ত হয়। কিন্তু মাত্র কয়েকজন ব্যতীত আর কেহই আত্মসমর্পণ না করায় এই আদেশ প্রত্যাহৃত হইয়াছে। এই সকল ফরাসী শ্রমিককে ধরিবার জন্য বন্দু পথে কাঁটা-তারের বেড়া দেওয়া হইয়াছে, স্থানে স্থানে টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রায় দুই হাজার সশস্ত্র সৈন্য উক্ত অঞ্চলের গ্রামগুলিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু শ্রমিক-বাহিনী দৃঢ়তার সহিত এখনও আত্মরক্ষা করিয়া চলিয়াছে। সুইস্ সংবাদপত্র 'কিউরিও'তে প্রকাশ যে, জার্ম্মান গুপ্তচর বিভাগের লোকেরা ফ্রান্সের পথ হইতে যুবকদের ধরিয়া গাড়িতে করিয়া জার্ম্মানীতে লইয়া যাইতেছে। এই শ্রমিক সংগ্রহ কার্য্যে হিমলারের অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের নিষ্ঠুরতা ও বর্ব্বরতা কল্পনাতীত। সহরতলীতে ফরাসী শ্রমিকদের কারখানা হইতে প্রত্যাগমনের পথে ট্রামগাড়ী হইতে তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক

টানিয়া নামাইয়া জার্ম্মানীতে প্রেরণ করা হইতেছে। অনেক ক্ষেত্রে ফরাসী তরুণ ও যুবকেরা শ্রমিকের কার্য্য হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য স্বেচ্ছায় আপনাদিগকে বিকলাঙ্গ করিতেছে! কিন্তু তবুও ফরাসী শ্রমিক স্বেচ্ছায় জার্ম্মানীর নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতেছে না। হট্স্যাভয় এ ৭০০০ শ্রমিকের সংখ্যা বর্ত্তমানে বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ১২,০০০-এ! বন্দুক, মেসিন-গ্যন এবং গোলাগুলিও না কি তাহারা লাভ করিয়াছে।

ফ্রান্সের অভ্যন্তরে জার্ম্মানী ও ভিসি সরকারের প্রবল পেষণের পশ্চাতে এই যে নাটকের অভিনয় হইয়া চলিয়াছে, তাহা জার্ম্মানীর আভ্যন্তরীণ অবস্থাকেও পরিস্ফুট করিয়া তুলিবে। জার্ম্মানীর উৎপাদন-ব্যবস্থায় শ্রমিকের অভাব কি ভীষণ এবং ফ্রান্সের সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যেও স্বদেশ-প্রেম ও জার্ম্মান-বিরোধী মনোভাব কি প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে, ফ্রান্সের এই আভ্যন্তরীণ চিত্রই তাহার পরিচয়।

যুগোশ্লাভিয়া

নাৎসী অধিকৃত যুগোশ্লাভিয়ার স্বদেশ-প্রেমিকগণ ও নাগরিকদের একাংশ যুগোশ্লাভিয়ার পতনের প্রথম দিন হইতে আপন সরকারের অধীনে নাৎসীদের বিরুদ্ধে গেরিলা-



প্রিন্স পল (যুগোশ্লাভিয়া)

যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছে। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে ইহাদের তৎপরতা এত অধিক বৃদ্ধি পায় যে, হিটলারের গুপ্তচর বিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ হের হিমলার যুগোশ্লাভিয়াতে আরও ছয় ডিভিসন জার্ম্মান সৈন্য প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। রুশিয়ায় জার্ম্মানীর শীতকালীন বিপর্য্যয় যে এই গেরিলা বাহিনীকে উৎসাহিত ও অধিকতর শক্তিশালী করিয়াছে ইহা নিঃসন্দেহ। গত জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে সোভিয়েট সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ—এই গেরিলা বাহিনী সৈন্যদের বসতিপূর্ণ একটি বড় সহর অধিকার করিয়াছে এবং বহু সৈন্যকে বন্দী করিয়াছে। বহু বন্দুক, ২০০০ রাইফেল, গুরুভার হাউইজার কামান, যানবাহন, মালগাড়ী এবং খাদ্য ও গোলাবারুদ রাখিবার কয়েকটি স্থান তাহারা হস্তগত করিয়াছে। নাৎসী সামরিক কর্ত্তৃপক্ষগণ নিরীহ সাবিয়ান্ নাগরিক ও বন্দী যুগোশ্লাভিয়ার সৈন্যদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়া গেরিলা প্রতিরোধের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেছে। কিন্তু নূতন নূতন সৈন্য আনয়ন করিয়াও জার্ম্মান সামরিক কর্ম্মচারীরা এই গেরিলা বাহিনীকে দমন করিতে পারে নাই। উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ অধিনায়ক কর্ণেল নেগার অধীনে এই গেরিলাবাহিনী জার্ম্মান সৈন্যদের দিনের পর দিন ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া চলিয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, জেনারেল মিহাইলোভিচ্ এই গেরিলা-বাহিনীর অধিনায়ক নন। প্রকৃতপক্ষে মিহাইলোভিচ্ একজন বিশ্বাসঘাতক। রয়টার কর্ত্তৃক যে সকল সংবাদ আমাদের নিকট প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয় প্রধানতঃ তাহারই উপর আমাদের নির্ভর। রয়টার কর্ত্তৃক জেনারেল মিহাইলোভিচ্ একজন নিষ্ঠাবান্ স্বদেশ প্রেমিক ও যুগো-শ্লাভিয়ায় অবস্থানরত নাৎসী সৈন্যের উচ্ছেদকারী বলিয়া আমাদের নিকট জানান হইয়াছিল। কিন্তু পরে প্রকাশ, লণ্ডনস্থ যুগোশ্লাভ-সরকারের নিকট মিহাইলোভিচকে বিশ্বাস-ঘাতক ও অক্ষশক্তির সাহায্যকারী বলিয়া সোভিয়েট সরকার কর্ত্তৃক অভিযোগ-পত্র প্রেরিত হয়। সোভিয়েট সরকার জানান, এই অভিযোগের দৃঢ় ও সন্দেহাতীত প্রমাণ তাঁহাদের নিকট আছে। সিড্নির সাপ্তাহিক পত্র 'ফরোয়ার্ড'-এ মিহাইলোভিচ্-এর বিশ্বাসঘাতকতার কথা দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করা হইয়াছে। 'প্রগ্রেস' পত্রিকায় 'স্বাধীন যুগো-শ্লাভিয়া বেতার-কেন্দ্র' হইতে কর্পোর্যাল জ্যাক ডেন্ভার প্রদত্ত যে আপন অভিজ্ঞতার বক্তৃতা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে সকল সন্দেহের নিরসন হয়। কিন্তু মিহাইলোভিচ্-এর

বিশ্বাসঘাতকতা যুগোশ্লাভিয়ার গেরিলাবাহিনীদের ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে নাই। কর্ণেল নেগার সুদক্ষ পরিচালনাধীনে গেরিলা-বাহিনী বহু নগর ও রেলকেন্দ্র হইতে জার্ম্মান ও ইটালীয় বাহিনীকে তাড়াইয়া দিয়াছে।

রুমানিয়া

বিগত শীতে রুশিয়া জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যে বিজয় অভিযান পরিচালনা করিয়াছে, রুমানিয়ার কৃষক-বিদ্রোহ তাহারই প্রতিধ্বনি। ককেশাশ রণক্ষেত্রে বহু রুমানিয়ান্ বাহিনী হিটলারের বিজয়লিপ্সার বেদীমূলে আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছে। স্ট্যালিন্‌গ্রাড হইতে পশ্চাদপসরণের সময় রুমানিয়ান্ সৈন্যদের পুরোভাগে রাখিয়া জার্ম্মান বাহিনী পশ্চিমে পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। জার্ম্মান-বাহিনীর প্রথম অগ্রবর্ত্তী শ্রেণীতে যুদ্ধনিরত এই রুমানিয়ান্ বাহিনীর নাম আত্মোৎসৃষ্ট বাহিনী (Sacrifice Troops). সোভিয়েট সৈন্যের অগ্রগতির সম্মুখে এই সৈন্যদল সমূলে ধ্বংস হইয়াছে। সোভিয়েটের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অগণিত রুমানিয়ান্ সৈন্য বিনষ্ট হওয়ায় রুমানিয়ায় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং কৃষকদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সূত্রপাত হয়। য্যান্টনেস্কুর সরকারের বিরুদ্ধে কৃষকরা ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ করে। ফলে বুখারেষ্টে সামরিক আইন জারী করা হয় এবং ৪০০ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। কৃষক অসন্তোষ চূর্ণ ও রুমানিয়ান্ সরকারের উপর নাৎসীমুষ্টি দৃঢ় করিবার জন্য 'আয়রণ গার্ড' কঠোর ভাবে দমন কার্য্য চালাইতেছে।



ক্যারল (রুমানিয়া)

বুল্‌গেরিয়া

বুল্‌গেরিয়ায় নাৎসী-বিরোধী মনোভাব ক্রমশঃ তীব্র আকার ধারণ করিতেছে। নাৎসী অধিকার ও তাহার



বোরিস (বুল্‌গেরিয়া)

অর্থনীতিক ও রাজনীতিক ফলাফলের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতেছে। সম্প্রতি বহু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং তাহারা 'সাম্যবাদী' এই অপ্রমাণিত অভিযোগে তাহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছে। নাগরিকদের মনোভাবকে অন্যপথে পরিচালিত করিবার জন্য বুল্‌গেরিয়া-তুরস্কের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে বুল্‌গেরিয়াস্থ নাৎসীরা প্রবল করিয়া তুলিতে সচেষ্ট। বুল্‌গেরিয়া-তুরস্ক সীমান্তে প্রতিরোধ-প্রাচীর নির্ম্মিত হইতেছে এবং বুল্‌গেরিয়ার নাগরিকগণের মনে তুরস্ক-বিরোধী মনোভাব তীব্রভাবে জাগাইবার চেষ্টা করা হইতেছে।

হঙ্গেরী

হঙ্গেরীতেও নাৎসী-বিরোধী মনোভাব বর্ত্তমানে পরিস্ফুট। প্রাচীর-পত্র, গোপন ইস্তাহার প্রভৃতির দ্বারা যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাবকে তীব্র করা হইতেছে। সমরোপকরণ নির্ম্মাণের বহু কারখানায় শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট করিতেছে। অনেক কারখানায় অক্ষশক্তি-বিরোধী সংগঠন প্রতিষ্ঠার সংবাদও আসিতেছে।

ইটালী

খাস-ইটালীতেও অক্ষশক্তি-বিরোধী মনোভাব আর গোপন নাই। মুসোলিনী ও তাঁহার সামরিকশক্তি ও গুপ্তচর-



মুসোলিনী (ইটালী)

বর্গের যথেষ্ট তৎপরতা সত্ত্বেও জনসাধারণের ফ্যাসিস্ত-বিরোধী মনোভাব ক্রমশঃই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। এমন কি ইটালীর প্রকাশ্য রাজপথে শোভাযাত্রা সহকারে 'ক্ষুধিত-অভিযান' পরিচালিত হইয়াছে!

বেল্‌জিয়াম্

বেল্‌জিয়ামে নাৎসী-বিরোধী মনোভাব বর্ত্তমানে ফ্রান্সের ন্যায় তীব্র। বেল্‌জিয়াম্ হইতে জার্ম্মানী যে শ্রমিক চাহিয়াছিল আজিও তাহা সংগৃহীত হয় নাই; ফ্রান্সের ন্যায় বেল্‌জিয়ামেও জোর করিয়া পথ হইতে শ্রমিকদের গ্রেপ্তার করিয়া জার্ম্মানীতে চালান দেওয়া হইতেছে। সুচতুর বেল্‌জিয়ান্‌রা শ্রমিক সংগ্রহকারী নাৎসী কর্ম্মচারীদের কোটের পকেটে গোপনে ইস্তাহার গুঁজিয়া দিতেছে। ইস্তাহারের মর্ম্ম—একজন বেলজিয়ান্ শ্রমিক সংগ্রহের অর্থ রণক্ষেত্রে একজন নাৎসীর প্রাণনাশ! এই সুন্দর ইস্তাহারের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। শ্রমিক সংগ্রহকারী নাৎসী কর্ম্মচারীদের মনে এই ইস্তাহার যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সমরোপকরণ নির্ম্মাণে ধাতুর প্রয়োজন যথেষ্ট, এবং এই অভাব মিটাইবার জন্য বেল্‌জিয়াম্-এর গির্জ্জাসকল হইতে ঘণ্টাগুলি খুলিয়া লইয়া জার্ম্মানীতে চালান দেওয়া হইয়াছে। গত ২৪-এ মার্চ্চ বেল্‌জিয়াম্-এর ধর্ম্মযাজকগণ ঘণ্টা অপসারণ ও বলপূর্ব্বক শ্রমিক সংগ্রহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

যুযুধান রাষ্ট্রের শক্তির পরিমাণ জানার জন্য যেমন তাহার সৈন্যবল ও সমরোপকরণের হিসাব লওয়া আবশ্যক, তেমনই তাহার আভ্যন্তরীণ অবস্থাও পরিজ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। ফ্রান্স, যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া, বুল্‌গেরিয়া, হঙ্গেরী, ইটালী ও বেল্‌জিয়াম্-এর আভ্যন্তরীণ অবস্থার যে আভাস উপরে প্রদত্ত হইল, তাহা হইতে জার্ম্মানীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা যথেষ্ট পরিস্ফুট হইবে বলিয়াই বোধ হয়। এ-ক্ষেত্রে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, গ্রীসেও নাৎসী-বিরোধী কার্য্যাবলী বর্ত্তমানে যুগোস্লাভিয়ার অনুরূপ এবং খাস জার্ম্মানীতেও যে অনেকের মনে নাৎসী-বিরোধী মনোভাব জাগরূক ও ক্রম-তীব্র



লিওপোল্ড (বেল্‌জিয়াম্)

হইতেছে হিটলারের সাম্প্রতিক বক্তৃতাই তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।



দুহিতা ও অন্যান্য পরিজন

জনৈক গৃহী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পুত্রবধূ—কথিত আছে "নারীণাং ভূষণং লজ্জা"। পূর্ব্বকালে লজ্জার বশে বধূ স্বামীর সহিত বালক-বালিকা ভিন্ন অন্য কাহারও সম্মুখে কথা কহিতেন না, স্বামী এইরূপ অন্তলোকের সমীপে থাকিলে অবগুণ্ঠন মোচন করিতেন না, স্বামী দিবাভাগে শয়নকক্ষে থাকিলে গুরুজনের সমক্ষে সে-কক্ষে প্রবেশ করিতেন না, শয়নকক্ষে স্বামীর সহিত একান্ত অনুচ্চস্বরে কথা কহিতেন যাহাতে কক্ষের বাহিরে সে-কথা কেহ শুনিতে না পায় এবং গুরুজন সমীপবর্ত্তী কক্ষে থাকিলে স্বামীও প্রায় তদ্রূপ অনুচ্চস্বরে পত্নীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন। স্বামী বা গুরুজনস্থানীয় পুরুষের উপস্থিতিকালে বধূ আহার করিতেন না, স্বামী ও স্ত্রী একত্র বা একই সময়ে ভোজনে প্রবৃত্ত হইতেন না—প্রবাদ ছিল যে, স্বামী ও স্ত্রী একই সময়ে ভোজন করিলে অলক্ষ্মীর দৃষ্টি পতিত হয়। স্বামীর ভোজন যতক্ষণ সমাপ্ত না হইত ততক্ষণ পত্নী অভুক্তা থাকিতেন এবং অন্য খাদ্যের সহিত পতির ভুক্তাবশেষ উপযোগ করিতেন। আধুনিক সমাজে এই সকল রীতির বহুল পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইয়াছে এবং আধুনিক সমাজ এগুলিকে নিতান্ত বাড়াবাড়ি মনে করেন। অধুনা নানা কারণে রমণীর লজ্জা অপগত হইয়াছে ও হইতেছে। গৃহস্থের কন্যারা ও বধূগণ পদব্রজে, ট্রামগাড়ীতে বা বাসে স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনাগমন করেন। আর্থিক সমস্যা ইহার অন্যতম কারণ। শ্যামবাজার হইতে কালীঘাট ঠিকা গাড়ীতে যাতায়াত করিতে অন্যূন ছয়টাকা ভাড়া দিতে হয়, অথচ ট্রামে বা বাসে মাত্র চারি আনায় একজনের যাতায়াত হয়, অধিকন্তু, সময় অল্প লাগে।

সহরের ছোট ছোট বাড়ীতে অন্তঃপুরচারিণিগণ সে-কালে কয়েদীর মত আবদ্ধা থাকিতেন, এখন তাঁহারা পার্কে (Park) এবং কেহ কেহ সুবিধামত গড়ের মাঠে মুক্তবায়ু সেবন করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান জাপানী যুদ্ধের পূর্ব্বে পর্দ্দানশীন রমণিগণ নির্দ্ধারিত পর্দ্দা-পার্কে ভ্রমণের সুবিধা পাইতেন, সেখানে পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল ; বিমান-আক্রমণ সম্ভাবিত হইবার পরে কতক-গুলি সাধারণ পার্কের সঙ্গে পর্দ্দা-পার্কও A. R. P.-র হস্তগত হইয়াছে। কোন কোন সাধারণ পার্কে প্রাতঃকালে রমণিগণের বায়ু সেবনের পৃথক সময় নির্দ্দিষ্ট আছে—সে সময় তথায় পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। পার্ক সম্বন্ধে এইরূপ বিধি-নিষেধ থাকিলেও রাজপথ ও গড়েরমাঠ তাহার অন্তর্ভুক্ত নহে এবং রাজপথ জনাকীর্ণ হইলেও রমণিগণকে রাজপথ বাহিয়া কথিত পার্কে যাইতে ও তথা হইতে প্রত্যাগমন করিতে হয়—গাড়ীতে গমনাগমন শতকরা একজন করেন কিনা সন্দেহ। রাজপথে চলিয়া এবং গড়েরমাঠে বেড়াইয়া অনেক রমণীর সাহস বাড়িয়া গিয়াছে। এখন পুরুষসঙ্গ-বিরহিতা অনেক রমণী ট্রামে ও বাসে স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনাগমন করেন। বায়োস্কোপে একাকিনী যাইতে বা পুরুষ দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে একাকিনী বসিতেও অনেকে সঙ্কোচবোধ বা ইতস্ততঃ করেন না। সকল পরিবারের (family-র) রমণিগণেরই যে এইরূপ আচরণ তাহা নহে, তবে বহুসংখ্যক আধুনিক পরিবারের, বিশেষতঃ যে-সকল পরিবার সহরবাসী বা সহরে সর্ব্বদা যাতায়াত করে তাহাদের অন্তর্ভুক্তা রমণিকুলের যে এইরূপ আচরণ প্রায়ই পরিদৃষ্ট হয় সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। অদ্যাপি কলিকাতা ও অন্যান্য সহরে এমন পরিবার দেখা যায় যাহাদের রমণিগণ সম্পূর্ণ পর্দ্দানশীন। তাঁহারা পাদুকা বা ছাতা ব্যবহার করেন না, পদব্রজে রাজপথে বাহির হয়েন না বা স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করেন না অথবা ট্রামে বা বাসে আরোহণ করেন না। কোন কোন সমাজের স্ত্রীলোক-গণ কিছুদিন পূর্ব্বে সেমিজ ও পেটিকোট পর্য্যন্ত পরিধান করিতেন না। ইহার কারণ তাঁহারা পদব্রজে বাটীর বাহিরে যাইতেন না। সেমিজ ও পেটিকোট লজ্জা নিবারণের জন্য পরিধান করা উচিত, বিশেষতঃ যখন মিহি সাড়ী পরিতে হয়। অধুনা কথিত সমাজেও পুরাতন রীতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বস্তুতঃ এখন সকল সমাজের রমণিগণ সেমিজ, সায়া ও ব্লাউজ প্রভৃতি পরিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে নিন্দার কথা কিছু নাই। অধিকন্তু, যখন রেলওয়ে ট্রেণে চড়িয়া যাতায়াত করিতে হয় তখন এইরূপ বেশই যুক্তিযুক্ত। অনেক বর্ষীয়সী সধবা গৃহিণী রেলযোগে যাইতে হইলে অদ্যাপি একখানি মোটা চাদরে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করেন। বিধবা রমণিগণকে এইরূপ করিতেই হয়, কারণ, হিন্দুবিধবা ব্রহ্মচর্য্যব্রত এবং নিতান্ত বাল-বিধবার সম্বন্ধে এ-নিয়মের অল্পাধিক ব্যতিক্রম হইলেও, সাধারণতঃ কার্পাস বা রেশমের সাদাধুতি বা থান ও নামাবলী অথবা সাদা চাদর মাত্র হিন্দু-বিধবার লজ্জানিবারণের জন্য ব্যবহার্য্য। বর্ত্তমান যুগে কোন কোন বিধবাকে সাদাধুতির সঙ্গে সেমিজ, ব্লাউজ, পাদুকা ও ছাতা ব্যবহার করিতে দেখা যায় বটে কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। পরন্তু, তাঁহারা হিন্দু কিনা সকল সময়ে তাহা জানিতে পারা যায় না।

কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালী হিন্দুর চিরন্তন প্রথা অনুসারে বধূর কোন দ্রব্য খাইতে অভিলাষ হইলে, এমন কি ক্ষুধার উদ্রেক হইলেও তিনি মুখ ফুটিয়া কাহাকেও সে-কথা বলিতেন না। অবশ্য বয়স্কা ও স্নেহময়ী শাশুড়ী বা

বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্না গৃহিণী বধূর আহার ও জলযোগের বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতেন অথবা স্বীয় সংসারের প্রচলিত নিয়মানুসারে এরূপ ব্যবস্থা করিতেন যে বধূকে ক্ষুধার তাড়না সহ্য করিতে হইত না। কোন কোন আধুনিক সংসারে এই পুরাতন প্রথার আমূল পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইয়াছে।॥ সেখানে বধূরা শ্বশুর শাশুড়ীকে বা গৃহিণীকে খাদ্যের বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে কোন ফরমাস বা হুকুম করেন না বটে, কিন্তু পরোক্ষভাবে অর্থাৎ তাঁহাদিগকে শুনাইয়া চাকর-বাকরকে ফরমাস ও হুকুম করেন—"অমুক জিনিষ লইয়া আয়," "অমুক জিনিষ আনিলি না কেন?" "আমার অমুক জিনিষের প্রয়োজন, তোকে আনিতেই হইবে" ইত্যাদি। এ-হুকুম পাকে প্রকারে শ্বশুর-শাশুড়ীকেই করা হইল, কারণ চাকর ত' নিজের পয়সায় কিছু কিনিবে না, পয়সা দিবেন হয় শ্বশুর না হয় শাশুড়ী। কোন কোন গৃহে বধূ শাশুড়ীকে নিজের অভিরুচি অনুযায়ী ব্যঞ্জনাদি রন্ধনের জন্য ফরমাস করিয়া থাকেন এবং বলেন যে খাদ্যবিশেষ প্রস্তুত না হইলে চলিবে না; যদি কোন কারণে সে-খাদ্য প্রস্তুত না হইয়া উঠে, আহারের সময়ে নানারূপ অনুযোগ ও অভিযোগের অবতারণা হয়। অবশ্য আধুনিক সমাজে এ-বিষয়ে আপত্তির কোন কারণ হয় না যদি বধূ শ্বশুর-শাশুড়ীকে নিজের পিতামাতার মত আন্তরিকভাবে শুধু শ্রদ্ধাভক্তি করেন না, প্রকৃত প্রস্তাবে "ভালবাসেন" এবং সর্ব্বদা সকল বিষয়ে তাঁহাদের সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করেন। এরূপ ক্ষেত্রে যদি বধূ সরলান্তঃকরণে ও সরল ভাষায় শাশুড়ীকে বলেন "মা, আজ অমুক জিনিষ রাঁধিলে হয় না?" কিম্বা "মা, অনেকে অমুক খাদ্য ভাল বলে ও তাহা সুস্বাদু বলিয়া প্রশংসা করে, আমাদের একবার পরখ করিয়া দেখিলে হয় না?" অথবা "আইসক্রীম সন্দেশ ও দধি গ্রীষ্মকালে বড় উপাদেয় মনে হয়।" তাহা হইলে বধূর মনোভাব কোন স্নেহপরায়ণা শাশুড়ীর বুঝিতে বাকী থাকে না এবং আর্থিক অসচ্ছলতা না থাকিলে বধূর ইচ্ছানুরূপ খাদ্য সংগৃহীত হয়। বলা বাহুল্য, বধূর উল্লিখিত ভাবে প্রকাশিত মনোভাব শাশুড়ীর গোচর হইলে তাহা শ্বশুরেরও কর্ণগোচর হয়, বিশেষতঃ যেখানে সাংসারিক ব্যয়ের তহবিল গৃহস্বামীর নিজের হাতেই থাকে; সাধ্যাতীত না হইলে পুত্রবধূর এরূপ সাধ অপূর্ণ রাখেন এমন লোক বিরল। অবশ্য যে-বধূ শ্বশুর-শাশুড়ীর সুবিধা-অসুবিধার প্রতি দৃক্‌পাত করেন না, তাঁহাদের আহারাদির বিষয়ে যত্ন বা তত্ত্বাবধান করেন না, "নিজেরটি হইলেই হইল" এই-রূপ মনোভাব পোষণ ও কথায় না হউক, কার্য্যে ও আচরণে ব্যক্ত করেন এবং "নিজেরটি না হইলে" ভাগ্যনিন্দা বা বিরক্তিপ্রকাশ বা অনুযোগ করিয়া থাকেন, সে-বধূ ও তাঁহার শ্বশুর শাশুড়ীর মধ্যে পিতা-পুত্রী ও মাতা-পুত্রীর প্রকৃত সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই এ-কথা বলিতেই হইবে। এরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত ও তদনুরূপ ব্যবহার প্রচলিত হইলে শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছে বধূর "আব্দার" অসঙ্গত হয় না। যাহার কাছে কিছু প্রাপ্তির আশা করা যায় তাহাকে কিছু দিবার প্রবৃত্তি থাকা উচিত। যে-স্ত্রী স্বামীর ভালবাসা চাহেন তিনি যদি স্বামীকে ভালবাসিতে না পারেন, তাঁহার প্রতি স্বামীর ভালবাসা চিরস্থায়ী হয় না, এইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কোন ব্যক্তি তাঁহার হিতৈষী ও আন্তরিক বন্ধুভাবাপন্ন বন্ধুর প্রতি স্বার্থপরতার বশে পুনঃ পুনঃ বিসদৃশ বা বন্ধুর অনুচিত আচরণ করেন সে বন্ধুতা অচিরেই লুপ্ত হয়। পিতার পর-লোকান্তে সহোদরগণ যখন পিতৃত্যক্ত সম্পত্তির বিভাগকালে কেবলমাত্র নিজ নিজ স্বার্থরক্ষায় প্রবৃত্ত হয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থও পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হয় তখন তাহাদের ভ্রাতৃস্নেহ ও ভ্রাতৃভক্তি বিলুপ্ত হয়। দাও ও লও—give and take—এই সূত্র-অনুসারেই সংসার ও সমাজ চালিত। যে-ব্যক্তি আশা করেন যে অপরে তাঁহার প্রতি উদারভাবাপন্ন হউন অথচ নিজে এরূপ সঙ্কীর্ণচেতা যে সূচাগ্র পরিমাণে স্বার্থত্যাগ করেন না, তিনি কখন অপরের প্রীতিভাজন হইতে পারেন না। যে-বধূ শ্বশুর-শাশুড়ীকে কোন বিষয়েই তত্ত্ব করেন না—তাঁহারা আহারে বসিলে আহার-স্থলের ত্রিসীমায় আসেন না, কোন দ্রব্যের, এমন কি পানীয় জল বা লবণের প্রয়োজন হইল কি না তাহাও দেখেন না, সখের রান্না রাঁধিয়া তাঁহাদিগকে খাইতে দেওয়া পরের কথা, আহারান্তে একটা পান সাজিয়াও খাইতে দেন না অথবা আর কেহ দিল কি না সে-খবর রাখেন না, দাস দাসাকে শ্বশুর বা শাশুড়ী কোন কার্য্য করিতে আদেশ করিলে তাহা সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে বা তাহাদিগকে নিজে কোন আদেশ করেন এবং সে-আদেশ তৎক্ষণাৎ পালিত না হইলে তিরস্কার করেন এবং কল্পিত বা অবাস্তব ত্রুটীর জন্য সর্ব্বদা অনুযোগ বা অভিযোগ করেন তিনি স্বগৃহের কাহারও স্নেহ, প্রীতি বা অনুরাগ অর্জ্জন করিতে পারেন না শ্বশুর-শাশুড়ীরও নয়।

"ননদিনী রাইবাঘিনী" এই চিরপ্রচলিত বাক্য হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, ননদ ও ভ্রাতৃজায়ার মধ্যে বিদ্রোহভাব চিরন্তন ও প্রায় স্বাভাবিক। ভ্রাতৃজায়া ননদের সহিত স্বীয় ভগ্নীর মত ব্যবহার করিলে বয়স ভেদে তাহাকে শ্রদ্ধা বা স্নেহ, আদর ও সোহাগ করিলে, সকল বিষয়ে তাহাকে যত্ন করিলে, কোন ত্রুটীর জন্য তাহাকে তিরস্কার বা তাহার সহিত কলহ না করিয়া মিষ্ট কথায় সে-ত্রুটী সংশোধনের চেষ্টা করিলে বিদ্রোহভাব জন্মিতেই পারে না—বিশেষতঃ ভ্রাতৃজায়ার নিজের কোন ত্রুটী হইলে যদি তাহা তিনি স্বীকার করেন এবং কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া বলেন—"কিছু মনে করবেন না দিদিমণি" বা "কিছু মনে কোরো না ভাই" কিম্বা "কিছু মনে করিস্ নে বোন।" বলা বাহুল্য ননদের সহিত সম্প্রীতি থাকিলে বধূর বহু সাংসারিক অসুবিধা তিরোহিত হয় এবং খাদ্য ও অন্যান্য সখের জিনিষ পাইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠে, কারণ কন্যার সুপারিশে শ্বশুর-শাশুড়ী তৎসম্বন্ধে বিবেচনা ও বন্দোবস্ত করিতে পারেন। সমবয়স্কা ননদ হইলে ত' কথাই নাই, বয়োকনিষ্ঠা ননদের দ্বারাও এইরূপ সুবিধা হইতে পারে। বয়সে ও সম্পর্কে জ্যেষ্ঠা এবং প্রবীণবয়স্কা ননদকে প্রায় শাশুড়ীর মত জ্ঞান ও তাঁহার সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিতে হয়। অল্পবয়স্কা কুমারী ননদের চুল বাঁধিয়া দিলে, সাবান ও অন্যান্য প্রসাধন-দ্রব্য সহযোগে তাহার শরীরচর্চ্চা করিলে, সুচারুরূপে তাহার বেশবিন্যাস করিয়া দিলে, চিড়িয়াখানা, চিত্রশালা ও সুকুমারমতি বালক-বালিকাগণের উপযোগী কৌতুকাগার ও প্রদর্শনীতে মধ্যে মধ্যে সঙ্গে লইয়া যাইলে সে-ননদ ভ্রাতৃজায়ার একান্ত বশীভূতা হইয়া পরে। কিন্তু এ-সকল

কার্য্য আন্তরিক স্নেহপ্রসূত না হইলে এরূপ বাধ্যবাধকতা স্থায়ী হইতে পারে না। উৎকোচ-প্রদানে কার্য্য সিদ্ধ হয় বটে কিন্তু যাহাকে উৎকোচ দেওয়া হয় সে উৎকোচেরই বশীভূত হয়, যে উৎকোচ প্রদান করে তাহার নয়।

যে-রমণী প্রণয়, ভালবাসা ও ভক্তির বশে এবং তজ্জনিত আচরণের গুণে নিজের সত্তা ও অনুভূতি স্বামীর সত্তা ও অনুভূতির সঙ্গে মিশাইয়া দিতে পারেন—তাঁহার সহিত অভিন্ন বা এক হইয়া যাইতে পারেন যেমন সাধনার উচ্চতম স্তরে উন্নীত হইয়া সাধক পরমাত্মার সহিত স্বীয় সত্তা ও আত্মা মিশাইয়া "সোঽহং"-জ্ঞান লাভ করেন—তিনিই স্বামীর পিতামাতাকে নিজের জনকজননী এবং স্বামীর ভ্রাতাভগ্নীকে নিজের সহোদর সহোদরা জ্ঞান করিতে সমর্থা হয়েন। ভক্তির কথা বলিলাম এইজন্য যে, প্রণয় ও ভালবাসা অপেক্ষা শ্রদ্ধা ও ভক্তি হইতে বিনয় ও নম্রতা অধিকতর পরিমাণে সঞ্জাত হয়, "পতি পরম দেবতা" হিন্দুসমাজে আচরিত বা আচরণীয় নারীধর্ম্মের এই সূত্রের অনুসরণে নহে। যে-পত্নীর নম্রতা আছে তিনিই প্রকৃতরূপে আপনাকে স্বামীর সঙ্গে মিলাইয়া দিতে পারেন; যাঁহার চরিত্রে সে-গুণের অভাব তাঁহার পক্ষে ইহা সম্ভবপর নহে। আধুনিক সমাজে পতির সহিত পত্নীর সখিত্ব সম্বন্ধ। পত্নী মনে করেন তিনি ও তাঁহার পতি একই স্তরে অবস্থিত এবং এই ধারণা-বিষয়ে পতিও পত্নীকে প্রশ্রয় দেন। "পতি রমণীর পরম দেবতা" এ-সূত্র আধুনিক সমাজে বাক্যেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইহা, সম্ভবতঃ, বৃটিশ মহিলাগণের Suffregette movement-এর (ভোটাধিকার সম্বন্ধীয় আন্দোলনের) অন্যতম ফল। বর্ত্তমান যুগে কি পুরুষ, কি নারী, সকলেই সমান অধিকার পাইতে চাহেন। কেহ কেহ পুরাকালীন ঋষিগণ-প্রণীত উত্তরাধিকারসম্বন্ধীয় বিধিব্যবস্থার নিন্দা করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। অনেকেই হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধ মানিতে প্রস্তুত নহেন। ইঁহারা বলেন এই সকল বিধি, ব্যবস্থা ও নিষেধ পর্য্যুষিত (Stale) হইয়া গিয়াছে—বর্ত্তমান সমাজের উপযোগী নহে। যাঁহারা সচ্ছন্দে এবম্বিধ মন্তব্য প্রকাশ করেন, হয় ত' তাঁহাদের অধিকাংশের সংস্কৃতবিদ্যার দৌড় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঋজুপাঠ বা ঐ-শ্রেণীর কোন গ্রন্থ। কিন্তু যে-বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ তাহা নিজের অধীত বিদ্যার বহির্ভূত বা বিরুদ্ধ হইলে তাহার প্রতিকূল সমালোচনা আধুনিক সমাজের ধারা বা অভ্যাস। অবশ্য ইহাকে সমালোচনা বলা যায় না, ইহা শূন্যগর্ভ বিদ্যাভিমানীর নিন্দোক্তি। যে-বিষয়ে আমি কৃতবিদ্য নহি, যে-গ্রন্থ-অধ্যয়নে আমি অক্ষম তাহার সমালোচনা আমার অনধিকার চর্চ্চা, আমার ধৃষ্টতার পরিচায়ক। উল্লিখিত বিধি, ব্যবস্থা ও নিষেধ যে যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে তাহার একটি মাত্র পৃষ্ঠা না "উল্টাইয়া," কেবল লোকমুখে শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের সমালোচনা প্রগল্ভতামূলক ইহা ভিন্ন কিছু বলা চলে না। আসল কথা আমরা অনুকরণপ্রিয়; নূতন কিছু দেখিলেই ভাল মন্দ বিচার না করিয়া তাহার অনুকরণ করি এবং কেহ তদ্বিরুদ্ধ কথা বলিলে বা উপদেশ দিতে আসিলে বিদ্রোহী হইয়া উঠি। যদি কোন ব্যক্তি পত্নীসমভিব্যাহারে জনতার মধ্যে বা নির্জ্জন স্থানে ভ্রমণ করিতে যান, কেহ প্রতিবাদ করিলে বা তৎসম্বন্ধে বিরুদ্ধ উপদেশ দিলে তিনি বলিবেন—"কেন? সাহেবরা ত' স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যেখানে-সেখানে বেড়াইতে যান।" অথচ জনতার মধ্যে কেহ পত্নীর সম্বন্ধে কোন অপমানসূচক কথা বলিলে বা কোন অপমানসূচক বা গর্হিত ব্যবহার করিলে তাঁহার প্রতিবাদ করিবার সাহস হইবে না এবং নির্জ্জন স্থানে কোন মাতাল বা গুণ্ডা পত্নীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করিলেও সে-বিষয়ে তিনি প্রতিবাদ করার জন্য যদি সে মাতাল বা গুণ্ডা তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হয় তিনি হয় ত' পত্নীকে একাকিনী ফেলিয়া সার্জ্জেণ্ট বা পাহারাওয়ালা খুঁজিতে ছুটিবেন। সাহেবের অন্য যত দোষই থাকুক, তিনি এরূপ ক্ষেত্রে কাপুরুষের কার্য্য করিবেন না। এরূপ অবস্থায় সাহেব স্বভাবতঃ কি করিয়া থাকেন তাহা অবগত আছে বলিয়া কোন বদমায়েস সজ্ঞানে কোন সাহেবসমভিব্যাহারিণী মেমের ত্রিসীমায় যায় না। পরন্তু, মেমও আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের ন্যায় ভয়বিহ্বলা ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া না হইয়া আত্মরক্ষায় ও সাহেবকে সাহায্য-প্রদানে প্রবৃত্ত হয়েন।

এ-দেশের রমণিগণ যে ক্রমশঃ লজ্জা-ভূষণ পরিহার করিতেছেন সেজন্য আধুনিক স্বামিগণ অত্যধিক পরিমাণে দায়ী। এ-কথা সত্য যে, অধুনা স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই "স্ব স্ব প্রধান"-ভাব পোষণ করেন। এমন কি যৌবনোদ্গমের পূর্ব্বেই অনেক বালক-বালিকা পিতামাতার উপদেশ বা অনুজ্ঞা বা অভিমতের অপেক্ষা না করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করে। তথাপি স্বামী দৃঢ়চিত্ত হইলে শিক্ষা ও উপদেশ প্রদান করতঃ বিরুদ্ধমতাবলম্বিনী পত্নীকে স্বীয় মত গ্রহণ করাইতে পারেন। শ্বশুরের ত' কথাই নাই, শাশুড়ীর দ্বারাও এ-কার্য্য সম্ভবপর হয় না, কারণ কাহারও স্বভাবের বা অভ্যাসের সংশোধন করিতে হইলে যিনি সংশোধনের ভার গ্রহণ করেন তাঁহাকে যুগপৎ কোমল ও কঠোর হইতে হয়। শাশুড়ী এরূপ ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করিলে অচিরে "বউ-কাঁট্‌কী"-খ্যাতি লাভ করিবেন। স্বামীই এই সংশোধন বা সংস্কারের ভার লইবার উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু কয়জন স্বামী এ-ভার গ্রহণ করেন? যে-সকল ব্যবহারজীবীর "পসার" আছে তাঁহাদের সময় মক্কেলের কার্য্যে, হয় আদালতে, নচেৎ গৃহে অতিবাহিত হয় এবং কখনও কিঞ্চিৎ অবসর হইলে অবসরকাল ক্লাবে ব্যয়িত হয়। যে-ব্যবহারজীবিগণের "পসার" কম, তাঁহাদের অবসরকাল পসারওয়ালা কর্ম্মপ্রবীণ সমব্যবসায়ীর গৃহে অথবা ক্লাবে কিম্বা যথায় যথেষ্ট লোক সমাগম হয় এরূপ কাহারও বৈঠকখানায় অতিবাহিত হয়। চিকিৎসাব্যবসায়ীগণের প্রথা প্রায় অনুরূপ, কেবল তাঁহাদের কর্ম্মস্থল বিভিন্ন। উচ্চপদস্থ কৃতবিদ্য রাজকর্ম্মচারীগণের অধিকাংশ সাহেবিয়ানার পক্ষপাতী; তাঁহারা সহধর্ম্মিনী সমভিব্যাহারে বায়ুসেবনে নির্গত হয়েন, বায়োস্কোপ প্রভৃতি প্রমোদগৃহে গমন করেন, সমপদস্থ বন্ধুর গৃহে বিশ্রম্ভালাপে বা তাসখেলায় রত হয়েন অথবা একাকী কোন Fashionable ক্লাবে সময়ক্ষেপ করেন। মধ্যবিত্ত গৃহের যাঁহারা সামান্য চাকরী করেন এবং যাঁহাদিগের সাধারণ আখ্যা "কেরাণীকুল" তাঁহাদের পূর্ব্বাহ্নে বাজার করিতে ও কর্ম্মস্থলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেই সময় কাটিয়া যায়; তাঁহারা অপরাহ্নেও কিছু কিছু বাজার করিবার জন্য ব্যস্ত থাকেন এবং সায়াহ্নে পল্লীস্থ বা পল্লীর সমীপস্থ কোন ক্লাবে বা কাহারও বৈঠকখানায় তাস, পাশা, দাবা প্রভৃতি খেলেন বা সঙ্গীতানুশীলন করেন অথবা অভিনয়ের উদ্দেশ্যে নাটকের মহলায় নিযুক্ত থাকেন। সাহিত্যিকগণ অধ্যয়ন, গবেষণা ও নিজের রচনা লইয়াই ব্যস্ত থাকেন, অন্য কোন কাজ করিতে তাঁহারা অবসর খুঁজিয়া পান না। এই সর্ব্বশ্রেণীর লোকই পুত্রকন্যার শিক্ষাবিষয়ে অল্পবিস্তর যত্নবান; যাঁহার অর্থ-সঙ্গতি আছে, তিনি গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন, যাঁহাদের এরূপ সঙ্গতির অভাব

তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজে অধ্যাপনা করেন এবং অধিকাংশ ব্যক্তি পুত্রকন্যাগণ বিদ্যালয়ে যে-শিক্ষা প্রাপ্ত হয় তাহারই উপর নির্ভর করেন, পুনরাবৃত্তি বিষয়ে তাহাদিগকে বিন্দুমাত্র সহায়তা করেন না। এইরূপ যাঁহাদের অভ্যাস ও জীবন-যাপনের রীতি তাঁহারা কোন কালেই সহধর্ম্মিনীকে শিক্ষাদান করিবেন না। আরও একটি বিষয় তাঁহাদের শিক্ষাদানের অন্তরায় —তাঁহারা কোন বিষয় সম্বন্ধে কোন স্বাধীন মত পোষণ করেন না। যে-কোন বিষয়ে নিজ মত গঠন করিতে হইলে যে-পরিমাণ অনুশীলন, চিন্তা ও গবেষণার প্রয়োজন তাহা করিবার অবসর তাঁহারা খুঁজিয়া পান না। কথায় বলে 'কালি, কলম, মন লেখে তিন জন", কিন্তু মন ঠিক না থাকিলে কালি-কলমও জুটে না, লেখাও হয় না এবং মন ঠিক থাকিলে কালি-কলম জুটিয়া যায়। মনোগত না হইলে কোন কার্য্যেরই সাধন হয় না। যাঁহারা আমোদ-প্রমোদেই অবসরকাল অতিবাহিত করিতে চাহেন তাঁহাদের দ্বারা গুরুত্ব-পূর্ণ কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না। তাঁহারা বলেন—আফিসে এত কাজ করিতে হয় যে বাটীতে অন্য কাজ করিতে ইচ্ছা হয় না এবং অন্য কাজে মনোনিবেশ করা যায় না। অবশ্য কোন কার্য্যে অনিচ্ছা থাকিলে অছিলার অভাব হয় না। যাঁহার কোন বিষয়ে নিজ মত দৃঢ় নহে [আয়াসগঠিত স্বাধীন মতের কথা বলিতেছি না] তাঁহার দ্বারা অপরের মত—ভ্রান্ত হইলেও—পরিবর্ত্তনীয় নহে। ভিত্তি দৃঢ় না হইলে মত দৃঢ় হইতে পারে না। ভিত্তিহীন বা সারবত্তাহীন মত তর্কের স্রোতে সহজেই ভাসিয়া যায়। আধুনিক পরিণয়ার্থী শিক্ষিতা পাত্রী অন্বেষণ এবং, সম্ভব হইলে, বিবাহ করেন। শিক্ষিতা স্ত্রী গৃহে আনিয়া তিনি মনে করেন তাঁহার সংসারযাত্রা ও জীবনযাত্রা 'সুশৃঙ্খলে ও সুচারুরূপে' নির্ব্বাহিত হইবে এবং ইহা মনে করিয়া অর্থ ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভ করিলেই শিক্ষার পরিসমাপ্তি হয় এবং পূর্ণ শিক্ষা লাভ করা যায় এই ভ্রান্ত ধারণাই তাঁহার চিন্তাহীনতার কারণ। বিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট যে শিক্ষা পাওয়া যায় তাহা প্রকৃত মানুষ হইতে হইলে, বিশেষতঃ গার্হস্থ্যধর্ম্ম সম্যক-রূপে পালন করিতে হইলে যে-শিক্ষা আবশ্যক, তাহার একটি শাখা না উপশাখা মাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্যবহারজীবিগণের কথাই বলিতেছি। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আদালতের সনন্দ পাইলেই তাঁহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণতা লাভ করিল এ-কথা কোনক্রমেই বলা চলে না। প্রথমতঃ কোন কর্ম্মপ্রবীণ ব্যবহারজীবীর গৃহে বা চেম্বারে মোকদ্দমার কাগজপত্র পাঠ করিতে হয়, তাঁহার উপদেশ অনুসারে আইন দেখিতে হয়, তিনি কি-পদ্ধতিতে মোকদ্দমা চালাইতে চাহেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হয় এবং মোকদ্দমার শুনানির সময়ে আদালত কক্ষে উপস্থিত থাকিয়া মোকদ্দমার গতি, অপরপক্ষীয় আইন-জীবীর কর্ম্মপদ্ধতি ও বিচারকের মতামত লক্ষ্য করিতে হয়। আদালত কক্ষে উপস্থিত থাকিয়া অন্যান্য মামলা মোকদ্দমার বিচার (নথী বা brief পড়িবার সুবিধা না হইলেও) লক্ষ্য করিতে হয়। একজন প্রবীণ ব্যবহার-জীবী বলিয়াছেন যে, অন্ততঃ এক বৎসরকাল আদালতে উপস্থিত থাকিয়া মামলা মোকদ্দমার বিচার না দেখিলে কোন নবীন ব্যবহারজীবীর কোন মামলা মোকদ্দমার brief গ্রহণ করা সমীচীন নহে।

বলা বাহুল্য বিদ্যালয়ে সুশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বালক-বালিকা ও যুবক-যুবতিগণ কিছু কিছু কুশিক্ষা লাভ, অন্ততঃ কোন কোন কু-অভ্যাস অর্জ্জন করিয়া থাকে। এজন্য বিদ্যালয় বা তথাকার শিক্ষকগণ দায়ী এ-কথা বলিতেছি না। প্রায় পাঁচশত বা ততোধিক বিভিন্ন চরিত্রের শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থিনীর সংসর্গে আসিয়া ও কার্য্যাকার্য্য লক্ষ্য ও কথোপকথন শ্রবণ করিয়া তরলমতি বালক-বালিকাগণ ও অপক্কমতি যুবক-যুবতিগণ দোষগুণ-বিচারশক্তির অভাব বশতঃ তদ্দারা আকৃষ্ট হয়। এইরূপে তাহাদের চরিত্রে যে অঙ্কপাত হয় তাহা মুছিয়া নিশ্চিহ্ন করা নিতান্ত কঠিন। শিক্ষাকালে তীক্ষ্ণদৃষ্টি পিতামাতার যত্নে এরূপ কু-অভ্যাসের দমন সম্ভবপর এবং সংসার-প্রবেশের অর্থাৎ গার্হস্থ্য জীবনের প্রারম্ভেই তাহার নিরাকরণ একান্ত আবশ্যক। রমণিগণের প্রকৃত সংসার-প্রবেশ বিবাহের অব্যবহিত পরে আরব্ধ হয়, বিশেষতঃ আধুনিক সমাজে—যেখানে কতকটা আইনের বশে, কতকটা শিক্ষার অজুহাতে ও কতকটা পণপ্রথা ও আর্থিক সমস্যার ফলে বাল্যবিবাহ বা চতুর্দ্দশবর্ষের ন্যূনবয়স্কা বালিকার বিবাহ রহিত হইয়াছে। বক্ষ্যমান যুগে বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পরে যখন কন্যার পরিণয় হয়, সেই সময় হইতেই তাহার পিতামাতার কাছে শিক্ষালাভের পন্থা রুদ্ধ হইয়া যায় এবং সেই শিক্ষার ভার কিয়দংশে শাশুড়ীর বা শ্বশুরালয়ের গৃহকর্ত্রীর উপর ও কিয়দংশে স্বামীর উপর ন্যস্ত হয় এইরূপ মনে করা এবং তদনুসারে কার্য্য করা উচিত ও আবশ্যক। স্বামী সকল বিষয়ে, বিশেষতঃ জীবন-যাপনের রীতি সম্পর্কে, কু-অভ্যাস-দমন সম্পর্কে, চরিত্র-সংগঠন বিষয়ে এবং সংসারস্থ পরিজনবর্গের সহিত যথাযোগ্য আচরণ সম্বন্ধে স্ত্রীকে শিক্ষা দিবার অধিকারী এবং এরূপ শিক্ষা-প্রদান তাঁহার অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য। যে স্বামী এ কর্ত্তব্যপালনে বিরত তিনি যে কেবল কর্ত্তব্যচ্যুত হয়েন তাহা নহে, ক্ষেত্র বিশেষে ও অবস্থা বিশেষে নিজের সংসারের অকল্যাণ সাধন করেন। যে-স্ত্রী স্বামীর উল্লিখিত অধিকার মানিতে না চাহেন, তিনি একদিকে যেমন কর্ত্তব্যভ্রষ্টা ও সম্ভবতঃ, স্বীয় সংসারের অহিতকারিণী হয়েন তেমনি অন্যদিকে তাঁহাদের দাম্পত্য সম্বন্ধ পূর্ণবিকাশ লাভ করিতে পারে না। সধবা হিন্দুমহিলা যতই উচ্চশিক্ষিতা হউন, এ-যুগেও প্রতিদিন নিয়মিতরূপে সীমন্তে সিন্দুরচর্চ্চা করিয়া থাকেন। ইহা "লোক-দেখান" কিম্বা সধবা রমণীর নিদর্শনস্বরূপ আচরিত কিনা বলা যায় না, তবে সকলে পতিকে পরম দেবতা গণ্য না করিলেও অধিকাংশ রমণীর ইহাই ধারণা যে সধবা নারীর সীমন্ত সিন্দুর-বিরহিত হইলে স্বামীর অকল্যাণ হয়। সেইজন্যই সধবা হিন্দুরমণী দীর্ঘ কেশ মুণ্ডন করিয়া বাউরীতে বা bobbed hair-এ পরিণত করেন না—বহুতর পাশ্চাত্য প্রথার ও পদ্ধতির তীব্র অনুকরণ-স্পৃহা সত্ত্বেও এ-পদ্ধতি অদ্যাপি হিন্দুর গৃহে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে নাই। যদি পতির এই কল্যাণ-কামনা বণিতার আন্তরিক কামনা হয় তাহা হইলে নিজের সংসারের কল্যাণকল্পে তিনি পতিপ্রদত্ত শিক্ষা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইবেন কেন ইহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। যদি দম্পতীর মধ্যে প্রণয় প্রগাঢ় ও অকপট হয়, যদি স্বামী বিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্রী সম্পর্ক স্থাপন করিতে না চাহেন এবং বেত্রহস্তে শিক্ষা দিতে অগ্রসর না হয়েন অথবা শিক্ষাদানবিষয়ে পত্নীকে নিতান্ত অর্ব্বাচীনা জ্ঞান ও তাঁহার সহিত তদনুরূপ আচরণ করিতে প্রবৃত্ত না হয়েন, তাহা হইলে স্বামীর নিকট শিক্ষালাভ করিতে কোন রমণীর আপত্তি বা অনিচ্ছা প্রকাশ করা উচিত নহে; ফলতঃ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পবিত্র অথচ সুকোমল ও সুমধুর গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইবে ও দাম্পত্য-প্রণয় ঘনীভূত হইতে থাকিবে এইরূপ আশা করা যায়। পতিকে দেবতাজ্ঞান না করিলে সংসারের যে ক্ষতি হয়, গুরু বলিয়া না মানিলে তদপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষতি হয়। অথচ স্বামীর নিকট গুরুজ্ঞানে শিক্ষা গ্রহণ করিলে রমণীর কোন ক্ষতি হয় না, বরং প্রভূত লাভ হইয়া থাকে। যে-রমণী সকল বিষয়ে শিক্ষা-লাভে অভিলাষিণী তাঁহার কাছে স্বামীপ্রদত্ত শিক্ষা মূল্যবান।

পুত্রবধূর প্রসঙ্গে স্বামীর সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইল। আশা করি পাঠক-পাঠিকা এ-সকল কথা অবান্তর মনে করিবেন না। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ এবং তাঁহারা পরস্পরের সহিত এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে একের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে অন্যের প্রসঙ্গ স্বতঃই উপস্থিত হয়।

এ সংখ্যাতেও প্রবন্ধের সমাপ্তি হইল না। হয় ত' ইতিমধ্যেই পাঠক-পাঠিকাগণ মনে করিতেছেন যে আধুনিক সমাজের নিছক নিন্দাবাদ এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তাঁহাদের প্রতি অনুরোধ—ইহার সমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত ধৈর্য্য অবলম্বন করুন।

[ক্রমশঃ

বঙ্কিমের উপন্যাসে নারী

শ্রীউপগুপ্ত শর্ম্মা

এক

এ দেশের নারীর দুঃখ, অবলতা, অসহায়তা ও লাঞ্ছনা বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্ত বিগলিত করিয়াছিল। তাহাদের চরিত্রের মাধুর্য্য, শুচিতা, ধীরতা, সহিষ্ণুতা ও ত্যাগ তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। এ দেশের পুরুষের চরিত্রের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। তাহার বোধ হয় একটি কারণ, যাহারা দেশের জাতীয় গৌরব ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারে না, তাহারা মনুষ্যত্বে হীনতর। যে দেশের নারী কোন দিন মৃত্যুকে ভয় করে নাই, হাসিতে হাসিতে পতির চিতায় আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে, ত্যাগ, তিতিক্ষা ও ধৈর্য্যের সহিত সকল দুঃখলাঞ্ছনা বরণ করিয়াছে, সে দেশের নারী, জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য দৃঢ়ব্রত, দেশভক্ত বঙ্কিমের সহানুভূতি, মমতা ও শ্রদ্ধা সহজেই আকর্ষণ করিয়াছিল। সেজন্য বঙ্কিমের উপন্যাসে নারীচরিত্রগুলিই জীবন্ত ও জ্বলন্ত এবং পুরুষগুলি তাহাদের কাছে ম্লান, অনুজ্জ্বল ও কতকটা বৈচিত্র্যহীন ও বৈশিষ্ট্য-হীন।

নারীর নৈসর্গিক ও শারীরিক দুর্ব্বলতা তাঁহাকে ব্যথিত করিয়াছিল। তাই তিনি কি করিয়া নারী দেহে মনে বলীয়সী হইয়া উঠিতে পারে, সে বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়াছিলেন। কি করিয়া তাহারা আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে, কি করিয়া তাহারা তাহাদের বাহুতে শক্তি সঞ্চার, হৃদয়ে উৎসাহ সঞ্চার, সাধনায় আনন্দ সঞ্চার করিতে পারে, কি করিয়া তাহারা জাতীয় ও সামাজিক জীবনে নব-নব আদর্শ দান করিতে পারে, বঙ্কিম ইহাই চিন্তা করিয়া তাঁহার অধিকাংশ শক্তিসামর্থ্য নারীচরিত্র-অঙ্কনে নিয়োজিত করিয়াছেন। নারীর রূপযৌবন নারীর একটা শক্তি বটে, কিন্তু রূপযৌবনের মায়াজাল পুরুষের পৌরুষ হরণ করিয়া লয়। তাহার সহিত এমন কোন শক্তি চাই, যাহা তাহার পৌরুষকে উদ্দীপিত করে,—তাহার চরিত্রকে আত্মোৎসর্গে প্রণোদিত করে। বঙ্কিম সাহিত্যক্ষেত্রে অবলা নারীকে নানা ভাবে সবলা করিয়া তাঁহার অন্তরের ক্ষোভও মিটাইয়াছেন। একজন্য তিনি নারীত্বের কতকগুলি আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই আদর্শসৃষ্টির ফলে তাঁহার সাহিত্য-গৌরব হয়ত অনেক স্থলে ক্ষুন্ন হইয়াছে—অনেক স্থলে হয়ত রসসৃষ্টি ব্যাহত হইয়াছে,—কিন্তু তিনি মনে করিয়াছেন—নারীত্বের দিক হইতে—জাতীয় জীবনের দিন হইতে—সামাজিক আদর্শের দিক হইতে—সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি মহত্তর ব্রত পালন করিতেছেন।

তাই দেখি তাঁহার উপন্যাসে নারী কোথাও রণরঙ্গিণী হইয়া পুরুষের সহিত সমরক্ষেত্রে চলিয়াছে—কোথাও দেখি কঠোর সাধনার দ্বারা, জ্ঞানানুশীলনে পুরুষের সমকক্ষ হইয়া, ব্যায়াম-ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদির দ্বারা দেহে মনে বলীয়সী হইয়া পুরুষগণের পরিচালিকা হইতেছে,—কখনও দেখি কঠোর সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য পালনে মহিমময়ী হইয়া রাজাকে রাজর্ষিরূপে গঠিত করিয়া তুলিতেছে,—স্বামীকে ইন্দ্রিয়লালসার ভ্রান্ত পথ হইতে ধর্ম্ম পথে আনিবার চেষ্টা করিতেছে। কোথাও দেখি সিংহবাহিনী মূর্ত্তিতে জনসংঘকে অন্যায়ের প্রতিকারে উত্তেজিত করিতেছে—কোথাও দেখি সংসারের বাহিরে কঠোর সাধনায় দেহে মনে বলীয়সী হইয়া সংসারে ফিরিয়া আদর্শ গৃহিণী হইতেছে, কোথাও দেখি নারী আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য আততায়ীর বক্ষে ছুরিকাঘাত করিতেছে, কোথাও দেখি রাজধর্ম্মে সহায়তার জন্য দারুণ দণ্ড শিরে ধারণ করিতেছে, কোথাও দেখি নারীত্বের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য এবং পুরুষ যেখানে পশুর অধম হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে তাহার মনে মনুষ্যত্ব জাগরণের জন্য, অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া নগরের জনতার সভামঞ্চে আসিয়া নিরপরাধা মহিলাকে অন্তরাল করিয়া দাঁড়াইতেছে।

শক্তির উপাসক মহাশাক্ত বঙ্কিমচন্দ্র নারীকে কেবল সংসার-সঙ্গিনী রূপে ভাবিতে পারেন নাই—তিনি নারীকে শক্তির অংশরূপিণী বলিয়া মনে করিতেন। সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষের যোগতত্ত্বের কথা তিনি কোথাও ভুলিতে পারেন নাই। নিষ্ক্রিয় পুরুষকে ক্রিয়াশীল করিবার জন্য প্রকৃতিরূপিণী নারী-শক্তির প্রয়োজন—ইহা তিনি অনুভব করিতেন। নারীর এই

আদর্শকে অবাস্তব মনে করিয়া বর্ত্তমান যুগের সমালোচকগণ উপন্যাসের উপযুক্ত উপজীব্য বলিয়াই গণ্য করেন না। তাহা ছাড়া—তাঁহারা মনে করেন ইহাতে আর্টকে ধর্ম্মের তত্ত্ব দিয়া ক্ষুণ্ণ করা হইতেছে।

যাহাই হউক, বঙ্কিম মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার দেশের নারীজাতি যে অবস্থায় আছে, তাহা আদৌ গৌরবজনক নয়। নারী যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় থাকুক, অথচ পুরুষদের মনে নারীর প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হউক—ইহাও তাঁহার অভিপ্রেত নয়। নারী শ্রদ্ধেয়া হইবার জন্য সাধনা করুক—জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, তেজে, ত্যাগে তাহারা মহীয়সী হউক—এমন কি দৈহিক বলেও বলীয়সী হউক। আদর্শ গৃহিণী ও পুরুষের জীবন-সঙ্গিনী হইতে হইলে কেবল রূপযৌবনই যথেষ্ট নয়, তাহাকে উচ্চতর ব্রতের জন্যও স্বতন্ত্র সাধনা করিতে হইবে। অন্ধসংস্কারগত পতিভক্তির মূল্যও তিনি স্বীকার করেন নাই। নারী জ্ঞানের আলোকে—ভক্তি-সাধনার মূল সূত্র বুঝিয়া পতিকে চিনিয়া লউক,—শত প্রলোভনের মধ্যে সে আত্ম জয় করিতে শিখুক, বঙ্কিমের আদর্শ-সৃষ্টির মধ্যে ইহাই অভিপ্রেত ছিল। এ দেশের পুরুষের জীবন-ক্ষেত্র অপেক্ষা নারীর জীবন ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা অধিক। তিনি তাহা অনুভব করিয়া যে আক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহা রামপ্রসাদের ভাষায়

এমন মানবজীবন রইল পতিত আবাদ করলে ফলত সোনা।

তুই

প্রণয় সম্বন্ধে বঙ্কিমের ধারণা ছিল একটু বিচিত্র। বর্ত্তমান যুগের লেখকদের সঙ্গে তাহা সম্পূর্ণ মিলিবে বলিয়া মনে হয় না। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, "প্রেম, যাহা পুস্তকে বর্ণিত, তাহা আকাশকুসুমের মত কোন একটা সামগ্রী হইতে পারে;—যুবক-যুবতীগণের মনোরঞ্জনের জন্য কবিগণ কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে বোধ হয়। সংসারে ভালবাসা-স্নেহ ভিন্ন প্রেমের মত কোন সামগ্রী দেখিতে পাই না।

যাহার সংসর্গে অনেককাল কাটাইয়াছি। বিপদে সম্পদে সুদিনে দুর্দ্দিনে যাহার গুণ বুঝিয়াছি—সুখ-দুঃখের বন্ধনে যাহার সঙ্গে বদ্ধ হইয়াছি—ভালবাসা বা স্নেহ তাহার প্রতিই জন্মে।"

বঙ্কিমের বক্তব্য—যাহার সহিত বিবাহ হয়, তাহার সঙ্গেই এই সম্পর্ক ঘটে। দাম্পত্য জীবনের ফলেই ভালবাসা জন্মে। ইহাকে প্রেম বলিতে হয় বল। "দেখিলাম আর মজিলাম" এইরূপ ধরণের প্রেম কাব্যেই দেখা যায়, সংসারে দেখা যায় না।

আর এক প্রকারের আসক্তি অবশ্য আছে। উভয়ে উভয়ের রূপ দেখিয়া পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইয়া থাকে। গুণের পরিচয় একত্র জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ ছাড়া সম্ভবে না। অতএব গুণের কথা এখানে ছাড়িয়া দিতে হইবে। এই যে আসক্তি ইহা প্রথম প্রথম রূপজ মোহের গণ্ডী ছাড়ায় না। সাংসারিক জীবনে মিলন ঘটিয়া গেলে তখন পরস্পর পরস্পরের গুণের পরিচয় লাভ করে, দোষের পরিচয়ও লাভ করে। তখন একে অন্যের দোষগুলিকে ক্ষমা করে এবং গুণের বন্ধনে বন্দী হয়। রূপ যাহাদের মিলিত করিয়া দেয়, গুণ তাহাদের মিলন বন্ধন রক্ষা করে। তখন রূপাসক্তিই ভালবাসায় পরিণত হয়।

বঙ্কিম বিষবৃক্ষে হরদেব ঘোষালের মারফতে বলিয়াছেন, "রূপেও প্রণয় জন্মে, গুণেও প্রণয় জন্মে। কেননা উভয়ের দ্বারা আসঙ্গ-লিপ্সা জন্মে। আসঙ্গ-লিপ্সা হইতে সংসর্গ, সংসর্গ ফলে প্রণয়। প্রণয়ে আত্মবিসর্জ্জন। আমি ইহাকেই ভালবাসা বলি।"

বঙ্কিম কিন্তু গুণেও প্রণয় জন্মে, ইহার দৃষ্টান্ত দেখান নাই। ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইলে তাঁহাকে রূপহীনা গুণবতী নায়িকার সৃষ্টি করিতে হইত। গুণবতী ভ্রমরকে তিনি শ্যামাঙ্গী করিলেও একেবারে রূপহীনা করেন নাই, কিন্তু রূপোৎকর্ষ না থাকায় কেবল গুণের বন্ধনে ভ্রমর গোবিন্দলালকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। রূপই প্রণয়ের প্রধান নিদান ইহাই তিনি দেখাইয়াছেন, তাই তাঁহার প্রত্যেক নায়িকা অসামান্যা রূপবতী। পাছে পাঠক তাহার রূপের ধারণা করিতে না পারে, সেজন্য প্রাচীন কবিদের মত রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, এবং নানা ভাবে তাহার রূপের আকর্ষণীয়তাও দেখাইয়াছেন। রূপের সঙ্গে অন্য প্রভাব কিছু কিছু জড়িত আছে, তাহাও অবশ্য তিনি দেখাইয়াছেন কিন্তু তাহা গৌণভাবে।

দুর্গেশনন্দিনীতে জগৎসিংহ তিলোত্তমার রূপ দেখিয়াই আসক্ত হইল, গুণের পরিচয় সে কিছুই পায় নাই। আয়েষা জগৎসিংহের রূপ দেখিয়াই মোহিত হইয়াছিল—শৌর্য্যের পরিচয় সে বন্দীর কাছে কিছুই পায় নাই।

হেমচন্দ্র মৃণালিনীর রূপেই মুগ্ধ হইয়াছিল, তবে তাহার সহিত কিছু করুণাও মিশ্রিত থাকিতে পারে। গোপন বিবাহের পর সে অবশ্য গুণের পরিচয় লাভ করিয়াছিল।

পশুপতি মনোরমার কথা সাংঘাতিক। পশুপতি মনোরমার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে পত্নীরূপে (?) লাভ করিবার জন্যই সে নিজের দেশ পর্য্যন্ত বিদেশীর হাতে স'পিয়া দিল, ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিল, শেষ পর্য্যন্ত প্রাণও বিসর্জ্জন করিল।

নবকুমার কপালকুণ্ডলার রূপেই আসক্ত হইয়াছিল, উহার সহিত একটু কৃতজ্ঞতা মিশ্রিত ছিল। মতিবিবির রূপেই সম্রাট সেলিম আকৃষ্ট।

শ্রীর রূপেই সীতারাম আকৃষ্ট হইল। দৈব নিষেধ থাকা সত্ত্বেও সীতারাম তাহাকে চাহিয়াছিল? বৃক্ষশাখায় তাহার রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি তাহার রূপকেই আরও আকর্ষণীয় করিয়াছিল। তাহার সন্ন্যাসিনী মূর্ত্তিও রূপকেই শতগুণে বাড়াইয়াছিল।

সীতারামের রূপমোহের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। দুইটি রূপবতী পত্নী তাঁহার অন্তঃপুরে আছে, তবু তাঁহার এই মোহ কেন? সীতারামের বিবাহিতা স্ত্রী শ্রীর প্রতি কর্ত্তব্যবোধের কথা এখানে বড় কথা নয়,—নূতনের আকর্ষণীয়তার কথা বঙ্কিম যাহা বলিয়াছেন তাহাও বড় কথা নয়। নগেন্দ্রনাথের কথা আর সীতারামের কথা এক নয়! সীতারাম রাজা ও মহাবীর। তাঁহার মোহেরও তদুপযোগী বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি শ্রীর রূপে একটা রাজশ্রী (Majesty) দেখিয়াছিল। বঙ্কিম শ্রীকে অকারণে বৃক্ষশাখার পটভূমিকায় রণচণ্ডীরূপে স্থাপিত করেন নাই। তাহার সেই সিংহবাহিনী রূপশ্রী সীতারামকে মুগ্ধ করিয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত ইহা ইন্দ্রিয়লালসাতেই পরিণত হইয়াছিল। শ্রীর ভৈরবী মূর্ত্তি সে লালসাকে দমন করিতে পারে নাই বরং বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। 'নূতনের মোহ' না বলিয়া ইহাকে 'বিচিত্রের মোহ' বলা যাইতে পারে।

প্রফুল্ল দেবীচৌধুরাণী হইবার আগেই ব্রজেশ্বরের হৃদয় জয় করিয়াছিল রূপের বলেই, তাহার সঙ্গে করুণার ভাবও হয়'ত' মিশ্রিত ছিল।

ললিত লবঙ্গলতার প্রতি অমরনাথের প্রণয়কে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। উহাও সম্পূর্ণ রূপজ। রজনীর রূপ ছিল, কিন্তু চোখ দুটী ছিল দৃষ্টিহীন। চোখের অভাবে তাহার রূপের অঙ্গহানি ছিল—তাই তাহাকে ভালবাসাইবার জন্য বঙ্কিমকে অনেক চেষ্টা করিতে হইয়াছে। তাহার গুণ, এমন কি ঐশ্বর্য্যও অঙ্গহানির ক্ষতিপূরণ করিতে পারে নাই।

কৃষ্ণকান্তের উইলে রূপসী রোহিণী গোবিন্দলালের হৃদয় জয় করিল, কালো ভ্রমর গুণবতী হইয়াও তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না।

আনন্দমঠে শান্তির রূপ জীবানন্দের ব্রত বিচলিত করিল। কল্যাণীর রূপ ভবানন্দের মত বীরপুরুষকেও টলাইল।

চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর রূপ দেখিয়াই ভুলিয়াছিলেন। প্রতাপই বা শৈবলিনীর গুণের পরিচয় কি পাইয়াছিলেন? তাহার রূপই তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বাল্যপ্রণয় এত দুর্ব্বার হইতে পারে না। তাহা হয়ত কাঁদায়, তাতায় না, মাতায় না। বাল্যপ্রণয় প্রতাপের মনে সুপ্ত ছিল। তাহাত প্রতাপের পত্নীগ্রহণে বাধা দেয় নাই। রূপবতী পূর্ণযৌবনা শৈবলিনীর আত্মনিবেদনই প্রতাপের চিত্তকে আবার উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। "প্রতাপ প্রদীপালোকে দেখিলেন—শ্বেতশয্যার পরে কে যেন কুসুমরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে—মনোমোহিনী স্থির শোভা, প্রতাপ সহসা চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না···অনেক দিনের কথা মনে পড়িল··· অকস্মাৎ স্মৃতিসাগর মথিত হইয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গ প্রহত হইতে লাগিল।" প্রতাপের আত্মসংযমের গভীরতা দেখাইবার জন্য শৈবলিনীর রূপটাকেই বড় করিয়া দেখানো হইয়াছে।

রাজসিংহে মবারক-জেবউন্নিসার প্রণয়টা সম্পূর্ণ রূপজ মোহ ছাড়া আর কিছুই নয়। বঙ্কিম এই রূপজ মোহকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। শেষে ইহাকেই অনেকস্থলে গভীর প্রণয়ে পরিণত করিয়াছেন

বিষবৃক্ষে বঙ্কিম দেখাইয়াছেন—দেবেন্দ্রের পত্নীর রূপ বা গুণ কোনটাই ছিল না। সে দেবেন্দ্রকে দাম্পত্যবন্ধনে বন্দী করিয়া রাখিতে পারিল না। আবার সূর্য্যমুখীর রূপ গুণ দুই-ই ছিল, তবু নগেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখীকে ভুলিয়া কুন্দের বশবর্ত্তী হইল। নগেন্দ্রনাথ কুন্দের রূপেই ভুলিল। সে নিজেই বলিয়াছে—"কুন্দের বয়স ১৩ বৎসর। এই সৌন্দর্য্যের সময়। প্রথম যৌবনসঞ্চারের অব্যবহিত পূর্ব্বেই যেরূপ মাধুর্য্য ও সরলতা থাকে পরে তত থাকে না···এমন সুন্দরী কখনও দেখি নাই।" পরে আবার বলিয়াছে—"এখন বুঝিতেছি সে



চতুষ্পাঠী

এরোপ্লেন চেনা

অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র বি-এস্-সি (লণ্ডন)

আকাশে এরোপ্লেন উড়িয়া যাইতে দেখিলে যদি কেহ একটু সজাগদৃষ্টিতে উহার আকৃতির দিকে লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, এরোপ্লেন নানাপ্রকারের। ছোট বড় এই সাধারণ প্রভেদ না ধরিলেও, গঠন ও আকৃতির দিক দিয়া বহু বৈচিত্র্য বিভিন্ন এরোপ্লেনের মধ্যে দেখা যায়।

এরোপ্লেনের আকৃতি ও গঠনের বৈচিত্র্য আলোচনা করিবার পূর্ব্বে প্রথমে উহার প্রধান প্রধান অবয়বগুলির কিছু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। পাখীর অবয়বের সঙ্গে এরোপ্লেনের অবয়বের অনেক সাদৃশ্য আছে। পাখীর যেমন ডানা থাকে, এরোপ্লেনেরও সেইরূপ ডানা বা উইঙ্গ (wing) থাকে, পাখীর লেজের ন্যায় এরোপ্লেনেরও লেজ বা টেল্ইউনিট্ (tailunit) আছে এবং পাখীর দেহ যেমন ডানায় ভর করিয়া ও লেজের সঞ্চালনে হাওয়ায় ভাসিয়া থাকে, এরোপ্লেনেরও কাঠাম বা ফিউসিলেজ (fuselage) সেইরূপ উইঙ্গের ও টেল্-ইউনিটের সহায়তায় হাওয়ায় ভাসে। তবে পাখী হাওয়ার মধ্য দিয়া ডানা নাড়িয়া অগ্রসর হয়, কিন্তু এরোপ্লেন অগ্রসর হয় এক বা ততোধিক ইঞ্জিনের সাহায্যে। ইঞ্জিন সাধারণতঃ এরোপ্লেনের সম্মুখভাগে থাকে। দুই একটী ক্ষেত্রে ইঞ্জিন ডানার পিছন দিকেও লাগান থাকে, শেষোক্ত ইঞ্জিনগুলির একটা বিশেষ নাম আছে। ইহাদের পুসার (pusher) ইঞ্জিন বলে। পাখীর সহিত আরও কয়েকটী বিষয়ে এরোপ্লেনের মিল আছে। মাটিতে নামিলে পাখী পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়ায় এবং আকাশে উড়িবার সময় পা গুটাইয়া লয়। সেইরূপ এরোপ্লেনের কাঠামের নীচে দুইটী করিয়া চাকাযুক্ত ফ্রেম থাকে যাহার উপর ভর করিয়া এরোপ্লেন মাটিতে দাঁড়াইতে পারে। ইহাকে আণ্ডারক্যারেজ (under-carriage) বলে। যে সকল এরোপ্লেন মাটিতে না নামিয়া জলে নামে, তাহাদের কাঠামের তলায় চাকার পরিবর্ত্তে দুইটী করিয়া ছোট নৌকার মত ভেলা বা ফ্লোট (float) লাগান থাকে। এই সকল এরোপ্লেনকে সিপ্লেন (seaplane) বলে। সিপ্লেন ফ্লোটের সাহায্যে জলের উপর ভাসিতে পারে। খুব বড় সিপ্লেনকে ফ্লাইংবোট (flying boat) বলা হয়। ইহাদের কাঠাম অনেকটা নৌকার মত—কাজেই ইহাদের জলে ভাসিয়া থাকিতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না।

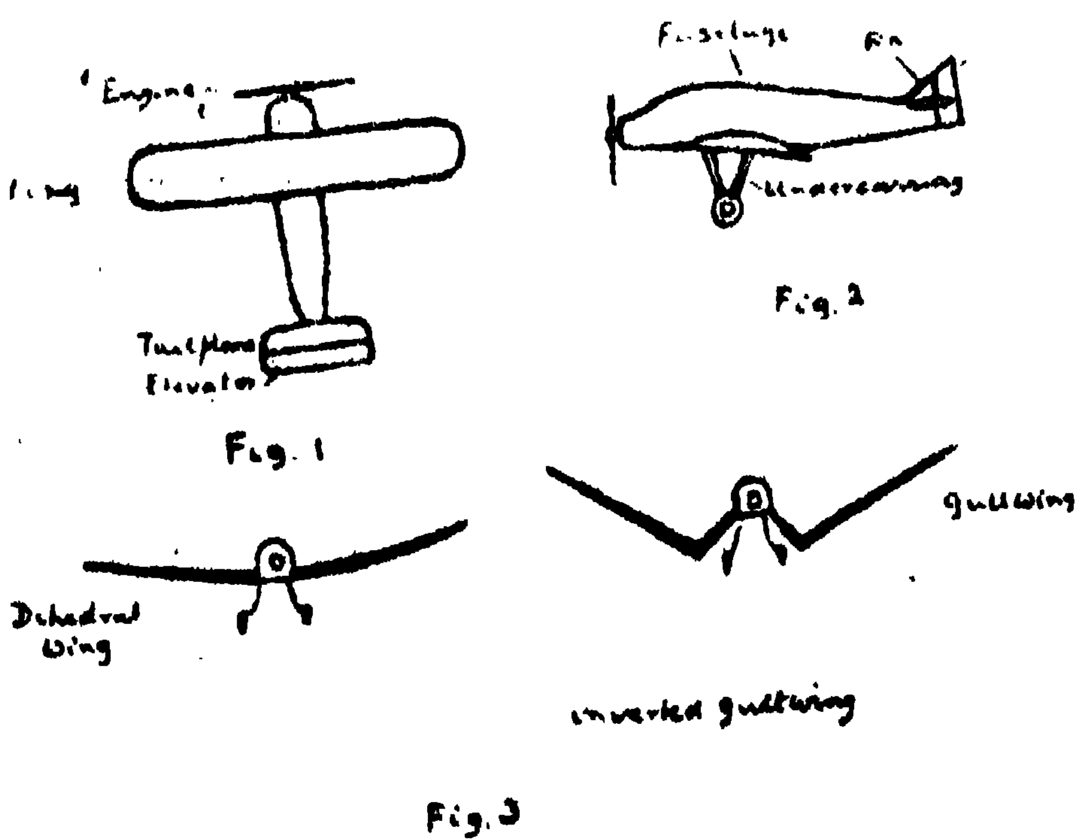


Fig. 1. এরোপ্লেনের তলার দৃশ্য।

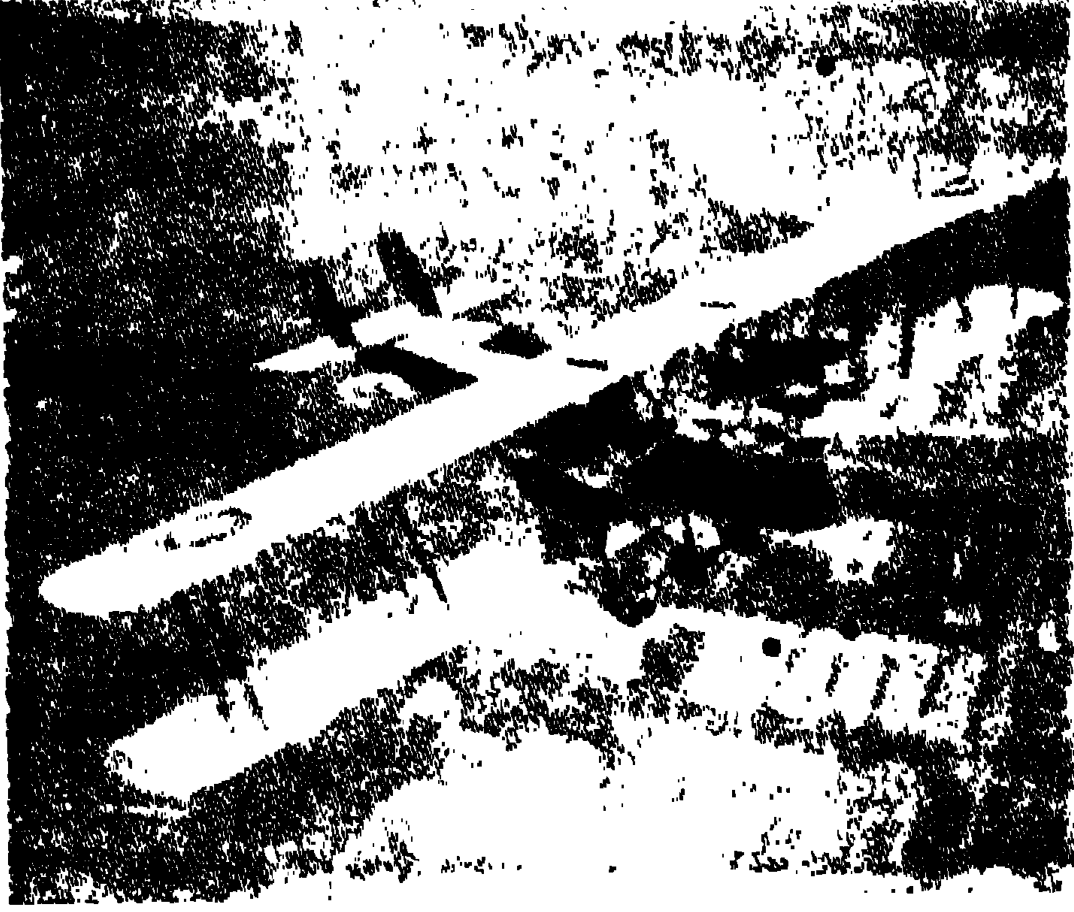
Fig. 2. এরোপ্লেনের পাশের দৃশ্য।

Fig. 3. তিনটী বিভিন্ন এরোপ্লেনের দূর হইতে দৃশ্য।

উপরোক্ত ৫টী অবয়ব—ডানা, টেল্ইউনিট্, ইঞ্জিন, কাঠাম ও আণ্ডারক্যারেজ প্রত্যেক এরোপ্লেনেই আছে। কিন্তু এই অবয়বগুলির আকৃতি প্রকৃতি ও সংখ্যার বহু তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। অনুমান প্রায় ৬০০ প্রকার বিভিন্ন ধরণের এরোপ্লেন প্রচলিত আছে এবং ইহাদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপরোক্ত অবয়বগুলির তারতম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এখন এই তারতম্যগুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক্। এরোপ্লেনের সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য উহার ডানার সংখ্যা। এরোপ্লেন চিনিতে গেলে প্রথম লক্ষ্য করিতে হইবে উহাদের ডানার সংখ্যা কয়টি। একখানি ডানা থাকিলে এরোপ্লেনকে

মনোপ্লেন (monoplane) বলে, উপরে নীচে দুইখানি ডানা থাকিলে বাইপ্লেন (biplane) বলে। মনোপ্লেন ও বাইপ্লেনের প্রভেদ সহজেই চোখে পড়ে। আজকাল বাইপ্লেন অপেক্ষা মনোপ্লেনই বেশী প্রচলিত দেখা যায়।



বাইপ্লেন

ইহার পর ইঞ্জিনের দিকে লক্ষ্য করা দরকার। কোনও এরোপ্লেনে মাত্র একটী ইঞ্জিন থাকে, কোনটিতে দুইটি, কোনটিতে তিনটী আবার কোনটিতে চারটী ইঞ্জিনও দেখা যায়। একটি ইঞ্জিন থাকিলে উহাকে 'সিঙ্গল-ইঞ্জিন-এয়ার ক্র্যাফট' (single engine aircraft) বলে, দুই বা ততোধিক ইঞ্জিন থাকিলে যথাক্রমে টুইন্, থ্রি, ফোর-ইঞ্জিন-এয়ারক্র্যাফট বলে। এক ইঞ্জিন ও দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট এরোপ্লেনের চলন খুবই বেশী এবং বড় বড় এরোপ্লেনে অনেক সময় চার ইঞ্জিন দেখা যায়। কিন্তু তিন ইঞ্জিন বিশিষ্ট এরোপ্লেন অপেক্ষাকৃত বিরল।

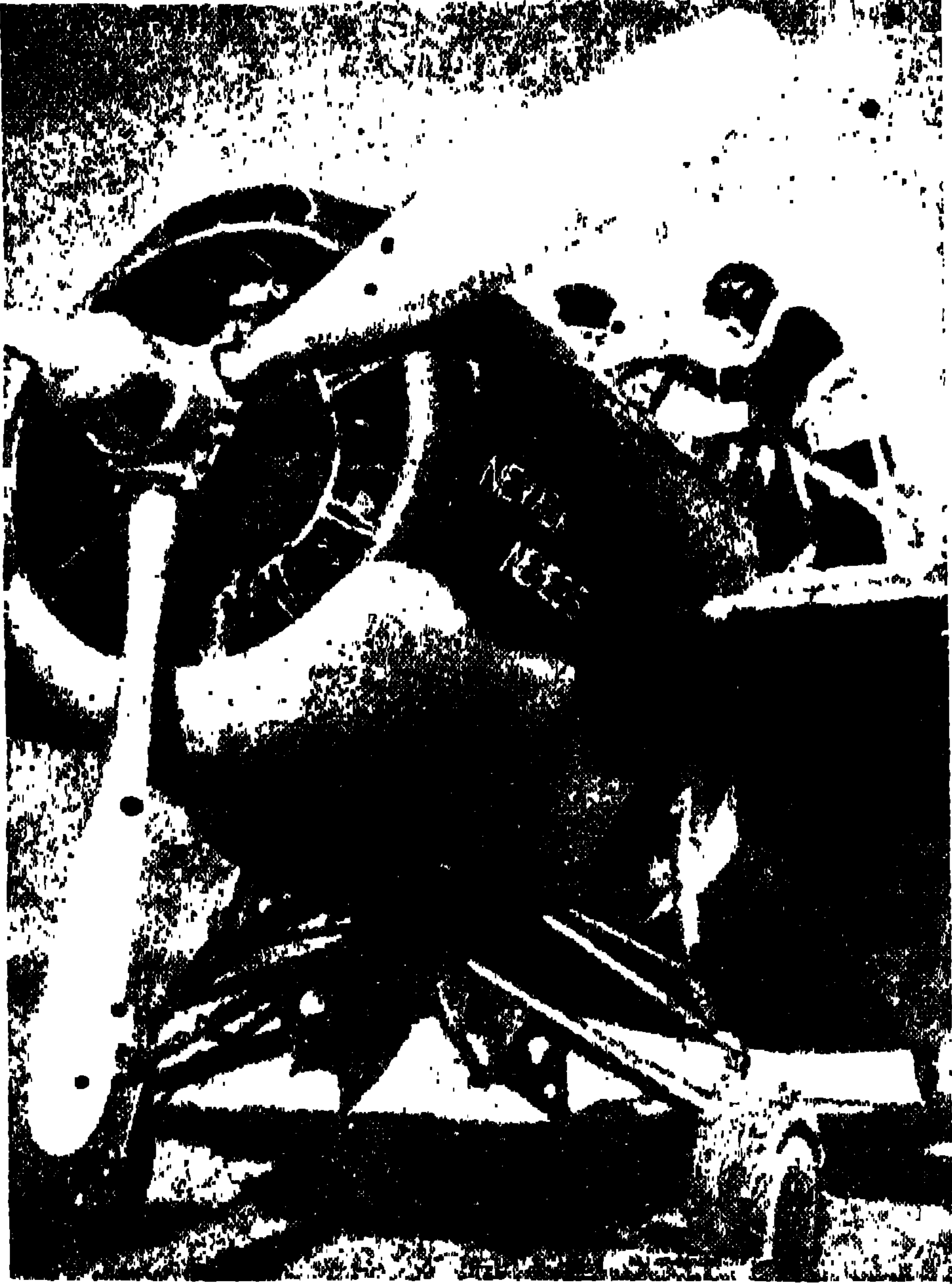
ইহা ত' গেল ইঞ্জিনের সংখ্যার দিক্ হইতে তারতম্য। আকৃতির দিক্ দিয়াও এরোপ্লেনের ইঞ্জিনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। আকৃতি হিসাবে ইঞ্জিন দুই প্রকার—ইন্‌লাইন্ (inline) ও র‍্যাডিয়াল (radial)। প্রথমটির মুখ ছুঁচালো, দ্বিতীয়টীর ভোঁতা। এই দুইপ্রকার ইঞ্জিন সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। প্রত্যেক ইঞ্জিনের ভিতর কয়েকটি করিয়া গ্যাস চলাচলের ঘর বা সিলিণ্ডার (cylinder) থাকে, এই সিলিণ্ডারগুলির মধ্যে গ্যাস যাতায়াত করিলে ইঞ্জিনের পাখা ঘুরিতে থাকে। কিন্তু এইরূপ গ্যাস চলাচলের ফলে সিলিণ্ডারগুলি শীঘ্রই গরম হইয়া উঠে, তখন উহাদের ঠাণ্ডা করা প্রয়োজন। ঠাণ্ডা করিবার জন্য হয় জলের কিম্বা হাওয়ার সাহায্য লইতে হয়। মোটর গাড়ীর ইঞ্জিনের র‍্যাডিয়াটারের (radiator) ভিতর জল ঢালিয়া উহাকে যেমন ঠাণ্ডা করা হয়, এরোপ্লেনের ইঞ্জিনকেও সেইরূপ জলের সাহায্যে ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এইরূপ ইঞ্জিনকে ওয়াটারকুল্ড (water-cooled) বলা হয়। অপর পক্ষে, যে-সকল ইঞ্জিনকে হাওয়ার সাহায্যে ঠাণ্ডা করিতে হয়, তাহাদের এয়ারকুল্ড (air-cooled) বলা হয়। জলের দ্বারা ঠাণ্ডা করিবার উপায় যে-সব ইঞ্জিনে থাকে, তাহাদের সিলিণ্ডারগুলিকে একটির পর একটি করিয়া এক লাইনে (inline) সাজাইয়া বসান যায়, কাজেই ঐ সকল ইঞ্জিনের মুখ ছুঁচালো হয়। কিন্তু এয়ারকুল্ড ইঞ্জিনের সিলিণ্ডারগুলিকে চক্রাকারে সাজাইতে হয় (radial) যাহাতে প্রত্যেক সিলিণ্ডার সমানভাবে হাওয়া পাইতে পারে। এই চক্রাকারে সাজাইবার ফলে ঐই সকল ইঞ্জিনের মুখ ভোঁতা দেখিতে হয়। ছুঁচালোমুখ ইঞ্জিন দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, খুব সম্ভবতঃ উহা ওয়াটারকুল্ড ইঞ্জিন, ভোঁতামুখ ইঞ্জিন হইলে বুঝিতে হইবে যে, উহা এয়ারকুল্ড



চারিটী "ইনলাইন" ইঞ্জিনযুক্ত "Halifax" Bomber.

এইবার এরোপ্লেনের লেজের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাউক। এরোপ্লেনের লেজকে টেলইউনিট (tailunit) বলা হয়। ইহার চারিটী অংশ—টেল্‌প্লেন (tailplane), এলিভেটর (elevator), ফিন্ (fin) ও রাডার্ (rudder)। যে-কোনও

এরোপ্লেনের ছবি দেখিলে ইহাদের বসাইবার রীতি সহজেই বোধগম্য হইবে। টেল্‌প্লেন ও ফিন্ নাড়ান যায় না। কিন্তু



র‍্যাডিয়াল (Radial) ইঞ্জিন্

এলিভেটর্ উঠাইতে ও নামাইতে পারা যায় এবং রাডার্ বাঁ-দিকে ও ডানদিকে ইচ্ছামত ঘুরাইতে পারা যায়। এলিভেটরের উঠান ও নামানর সাহায্যে এরোপ্লেন উচ্চে উঠে ও নীচে নামে। রাডারের ঘুরানর সাহায্যে এরোপ্লেনের গতির দিক্ পরিবর্ত্তন করা যায়। মাটি হইতে আকাশে উঠিবার সময় এলিভেটর কার্য্যকরী হয়, আকাশে উড়িতে উড়িতে সম্মুখে অগ্রসর না হইয়া ডানদিকে বাঁদিকে বাঁকিবার প্রয়োজন হইলে রাডার্ ব্যবহার করিতে হয়। সাধারণতঃ এরোপ্লেনের টেল্‌ইউনিটে মাত্র একটী ফিন্ ও একটী রাডার্ থাকে, এরূপ টেল্‌ইউনিট্‌কে সিম্পল্ (simple tailunit) বলে। কোনও কোনও এরোপ্লেনে একটী টেল্‌প্লেন ও একটী এলিভেটরের উপর দুইটী করিয়া ফিন্ ও রাডার্ বসান থাকে। এইরূপ দুইটী ফিন্ ও দুইটী রাডার্‌যুক্ত টেল্‌ইউনিটকে কম্পাউণ্ড (compound tailunit) বলে। কম্পাউণ্ড টেল্‌ইউনিটযুক্ত লেজের আকৃতি কিছু অসামান্য দেখিতে হয় বলিয়া সহজেই এই বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে।

সম্মুখে ডানা ও পিছনে লেজ, ইহার মধ্যে এরোপ্লেনের যে অংশটী থাকে তাহাকে কাঠাম (fuselage) বলা হয়। এরোপ্লেনের চালক ও অন্যান্য যাত্রীগণের বসিবার স্থান এই অংশের মধ্যে থাকে। ছোট এরোপ্লেন হইলে কাঠামে মাত্র একটী বসিবার স্থান থাকে, এই প্রকার এরোপ্লেনকে সিঙ্গল্-সিটার (single-seater) বলে। দুইটী বসিবার স্থানবিশিষ্ট এরোপ্লেনকে টু-সিটার (two-seater) বলা হয়। টু-সিটার এরোপ্লেনের সামনের আসনে চালক এবং পিছনের আসনে লক্ষ্যকারী (observer) বা যাত্রী (passenger) বসে। এরোপ্লেন অতিকায় হইলে অনেক সময় উহার কাঠামের ভিতর ঘরের ন্যায় স্থান থাকে এবং উহাতে বহু লোক বসিবার বন্দোবস্ত থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই ঘরের ভিতর দুইটী করিয়া ডেক্ (deck) থাকে এবং প্রত্যেক ডেকে বসিবার আসন থাকে। এইরূপ এরোপ্লেনকে ডবল্‌ডেকার (double-decker) নাম দেওয়া হয়। যে-সকল বিরাট এরোপ্লেন বা ফ্লাইংবোট যাত্রী ও মাল লইয়া এক দেশ হইতে আর এক দেশে নিয়ম মত গমনাগমন করে, তাহাদের অধিকাংশই এই শ্রেণীভুক্ত।

এরোপ্লেনের ডানা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই কিছু বলিয়াছি। এখানে মনোপ্লেনের ডানা সম্বন্ধে বিশেষ কয়েকটী কথা



লো-উইঙ্গ ও কম্পাউণ্ড-টেল্‌ইউনিট যুক্ত "Hudson" Bomber

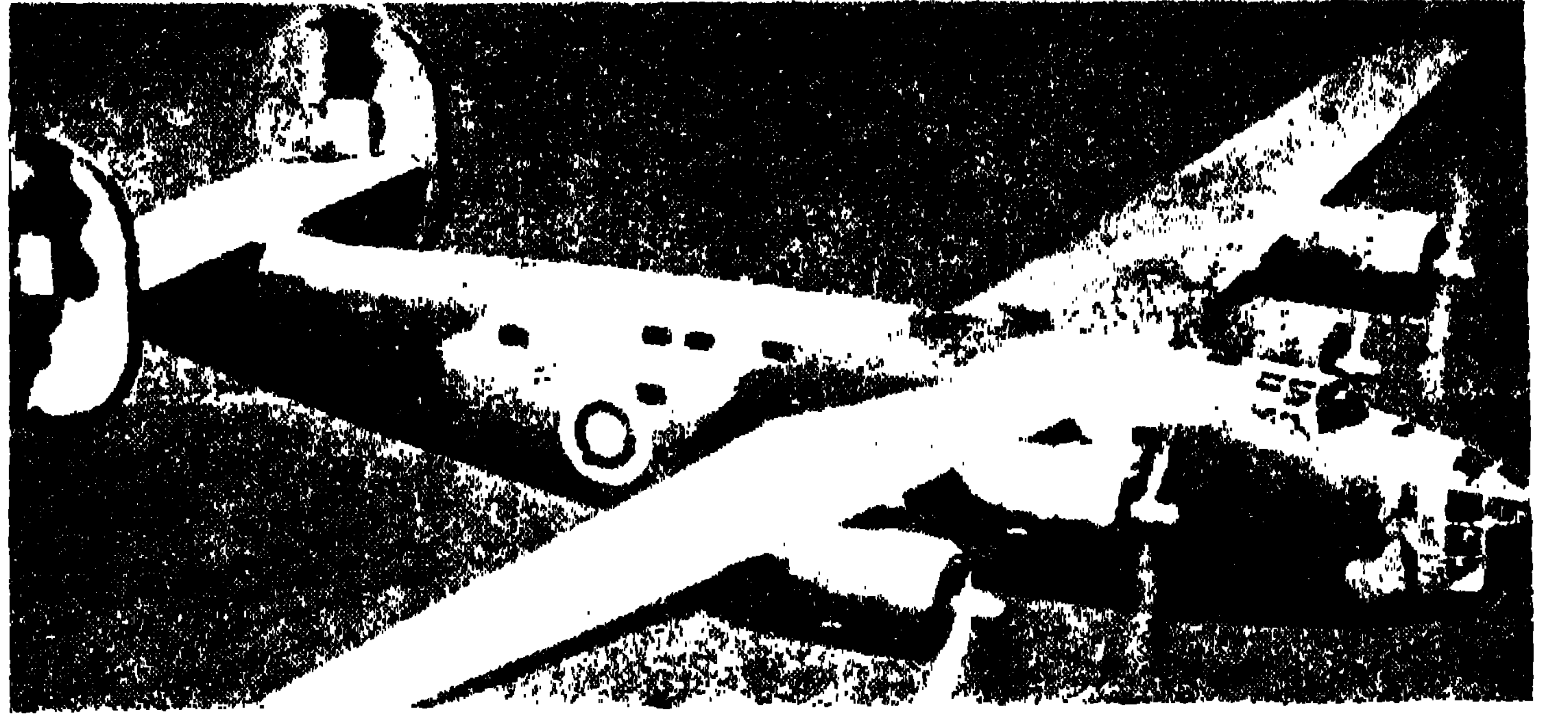
বলিতেছি যাহা বাইপ্লেন্ সম্বন্ধে খাটে না। মনোপ্লেনগুলিতে কাঠাম ও ডানার সন্নিবেশ প্রণালী লক্ষ্য করিবার বিষয়। কোনও কোনও মনোপ্লেনে ডানাগুলি নীচে থাকে এবং

কাঠাম তাহার উপর বসান হয়, এইরূপ মনোপ্লেনকে লো-উইঙ্গ (low-wing monoplane) বলা হয়। ইহার ঠিক বিপরীত দেখা যায়, যেখানে কাঠামের ঘাড়ের উপর ডানা বসান হয়, এরূপ স্থলে কাঠাম নীচে ঝুলে এবং ডানা কাঠামের উপরে থাকে। এরূপ মনোপ্লেনকে হাই-উইঙ্গ (high-wing monoplane) বলা হয়। এই দুই প্রকারের মাঝামাঝি ধরণের মনোপ্লেনকে মিড্-উইঙ্গ (midwing monoplane) বলে। মিড্-উইঙ্গ মনোপ্লেনের ডানাগুলি কাঠামের দুই পার্শ্বের ঠিক মধ্যভাগে সংলগ্ন থাকে। আজ-কাল অধিকাংশ মনোপ্লেন লো-উইঙ্গ।

এরোপ্লেনের ডানার আরও বহু তারতম্য দেখা যায়। আকাশে ঠিক মাথার উপর দিয়া উড়িবার সময় লক্ষ্য করিলে দেখা যায় কোনও কোনও এরোপ্লেনের ডানার মধ্যভাগ চওড়া এবং প্রান্তভাগ ছুঁচালো। এরূপ ডানাকে টেপারিং (tapering) ডানা বলা হয়। কোনও কোনও এরোপ্লেনের ডানা মধ্যভাগে যেরূপ চওড়া শেষের দিকেও সেরূপ, ইহাকে ষ্ট্রেট্ এজেড (straight-edged) ডানা বলে। আবার কোনও এরোপ্লেনের ডানার আকৃতি ডিমের ন্যায় (oval or elliptical); ইহা ছাড়া অন্যান্য বহু আকৃতির ডানা লক্ষ্য করা যায়। এরোপ্লেনের ডানার আকৃতি দেখিয়া উহা কি ধরণের এরোপ্লেন তাহা নির্ণয় করা অনেক ক্ষেত্রে খুবই সহজ। প্রত্যেক বিভিন্নশ্রেণীর এরোপ্লেনের ডানার আকৃতির বৈশিষ্ট্য আছে এবং যাহারা ইহার খবর রাখেন তাহারা মোটামুটি ডানা দেখিয়া এরোপ্লেনের গোত্র নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হন।

অনেক সময় দুইটি বিভিন্নশ্রেণীর এরোপ্লেন মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেলে মনে হয় উহাদের ডানা এক রকম, কিন্তু বহু দূরে চলিয়া গেলে দেখা যায় একটির ডানা ধনুকের ন্যায় বাঁকা দেখায় এবং অপরটির ডানা সোজা দেখায়। যখন দূর হইতে এরোপ্লেনের ডানা ধনুকের ন্যায় বাঁকা দেখায় উহাকে একটী বিশেষ নাম দেওয়া হয়, উহাকে ডাইহেড্রাল (dihedral) ডানা বলে। ইহা ছাড়া কোনও কোনও এরোপ্লেনের ডানা ইংরাজি ডব্লিউ (w)র মত দেখায়, এরূপ ডানাকে গাল-উইঙ্গ (gullwing) নাম দেওয়া হয়, কেন না, গালপক্ষীদের ডানার আকৃতি এইরূপ। আবার আরেক প্রকার এরোপ্লেনের ডানা দূর হইতে উল্টা ডব্লিউর ন্যায় দেখায়, এইপ্রকার ডানাকে ইনভারটেড গালউইঙ্গ (inverted gullwing) বলা হয়। এই সকল তারতম্যগুলি দূর হইতে দেখিলে নজরে পড়ে, ঠিক মাথার উপর থাকিলে উহা লক্ষ্য করা যায় না।

যে সকল এরোপ্লেন মাটির উপর নামে, উহাদের কাঠামের নীচে চাকাযুক্ত ট্রলির ন্যায় অংশ থাকে, উহার নাম আণ্ডার ক্যারেজ (under-carriage)। এই আণ্ডার-ক্যারেজের অনেক প্রকার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কোনও

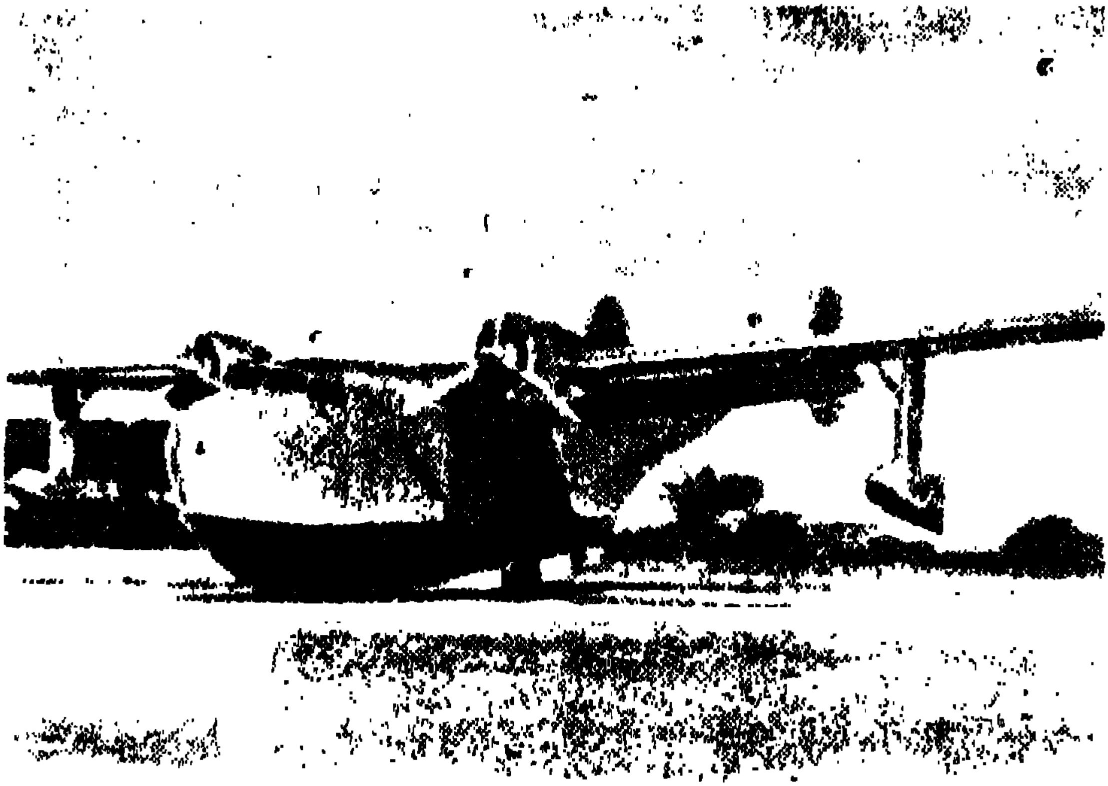


কম্পাউণ্ড টেল্ইউনিট (Compound Tailunit) ও হাই উইঙ্গ (Highwing) যুক্ত "Liberator" Bomber

কোনও এরোপ্লেনের আণ্ডারক্যারেজ আকাশে উড়িবার সময় কাঠামের ভিতরে সম্পূর্ণ গুটাইয়া নেওয়া যায়, ইহাকে রিট্রাক্টেবল (retractable undercarriage) বলা হয়। কোনও কোনও এরোপ্লেনে আণ্ডারক্যারেজ আধখানা মাত্র গুটাইবার ব্যবস্থা আছে, সে সকলকে সেমিরিট্রাক্টেবল (semi-retractable undercarriage) বলে। অনেকক্ষেত্রে আণ্ডারক্যারেজ একেবারে গুটান যায় না। ইহাদের ফিক্স্ড আণ্ডারকারেজ (fixed undercarriage) বলা হয়। শেষোক্ত আণ্ডারকারেজ কখনও কখনও ঢাকনি দিয়া ঢাকা থাকে। এইরূপ আবরণ থাকিলে ইহাদের ট্রাউজার্ড (trousered) বা স্প্যাটেড (spatted) নাম দেওয়া হয়।

এরোপ্লেন চিনিতে গেলে উপরোক্ত সকল খুঁটিনাটিগুলি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। (১) ডানার সংখ্যা ও আকৃতি (২)

ইঞ্জিনের সংখ্যা ও আকৃতি (৩) টেল্ইউনিট্ (৪) কাঠামের আকৃতি (৫) আণ্ডার কারেজ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি ঠিকমত নির্দ্ধারণ করিলে কোন্ এরোপ্লেন কোন্ শ্রেণীভুক্ত তাহা বলা



ফ্লাইংবোট্

সহজ হইয়া উঠে। উদাহরণস্বরূপ "হাডসন্" (Hudson) বোমারু এরোপ্লেনের বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা যাইতে পারে। ইহা মনোপ্লেন শ্রেণীভুক্ত। ইহার ডানা লো-উইঙ্গ, টেপারিং ও ডাইহেড্রাল; ইহার দুইটী র‍্যাডিয়াল্ ইঞ্জিন; ইহার টেল-ইউনিট্ কম্পাউণ্ড, ফিউসিলেজ বা কাঠাম ডবলডেকার ও বৃহদায়তন, আণ্ডার ক্যারেজ রিট্র্যাক্‌টেবল্। ইহা ব্যতীত ইহার পিছনে মেসিন্-গান্ ছুঁড়িবার জন্য কাঠের ছাত বিশিষ্ট একটী ঘর আছে, উহাকে গানটারেট্ (gunturret) বলে। হাডসন্ এরোপ্লেনের গতি ঘণ্টায় প্রায় ২৮০ মাইল। একেবারে না থামিয়া ইহা ১৭০০ মাইল পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিতে পারে। ইহাকে টহলদারী বোমারু (reconnaissance bomber) বলা হয়। সমুদ্রে শত্রুর জাহাজ বা সাবমেরিনের গতিবিধি লক্ষ্য করা এবং প্রয়োজন হইলে বোমা নিক্ষেপ করা ইহাদের দৈনন্দিন কাজ।

নিম্নে আরও কয়েকটি বিভিন্ন ধরণের এরোপ্লেনের পরিচয়ের তালিকা দেওয়া হইল।

নাম	ব্যবহার	ডানার সংখ্যা	ডানার আকৃতি	ইঞ্জিনের সংখ্যা	ইঞ্জিনের আকৃতি	টেলইউনিট্	ফিউসিলেজ	আণ্ডারক্যারেজ	গতি প্রতি ঘণ্টায়
স্পিট্‌ফায়ার (Spitfire)	ফাইটার	মনোপ্লেন	লো-উইঙ্গ ডাই-হেড্রাল elliptical	১	ইন-লাইন্	সিম্পল	সিঙ্গলসিটার	রিট্র্যাক্‌টেবল্	৩৬০ মাইল
ব্লেনহাইম (Blenheim)	বম্বার	মনোপ্লেন	মিড-উইঙ্গ মাঝারী ডাই-হেড্রাল ও টেপারিং	২	র‍্যাডিয়াল্	সিম্পল	মাল্‌টিসিটার	রিট্র্যাক্‌টেবল	২৯০ মাইল
লাইস্যাণ্ডার (Lysander)	আর্ম্মি-কো-অপারেশন্ (Army co-operation) যুদ্ধের অগ্রভাগে টহলদারী	মনোপ্লেন	হাই-উইঙ্গ	১	র‍্যাডিয়াল্	সিম্পল	টু সিটার	ফিক্‌সড ও স্প্যাটেড	২৩০ মাইল
সাণ্ডারল্যাণ্ড (Sunderland)	টহলদারী	ফ্লাইংবোট মনোপ্লেন	হাই-উইঙ্গ সামান্য ডাই-হেড্রাল	৪	র‍্যাডিয়াল্	সিম্পল	মাল্‌টিসিটার	ফিক্‌সড ফ্লোট	২১০ মাইল

এরোপ্লেন একবার দেখিলে ঠিকমত চেনা সম্ভবপর নয়। দেখিতে দেখিতে অভ্যাস হইলে, খুঁটিনাটির তারতম্যগুলি আপনা হইতে নজরে পড়ে এবং কোন্‌টি কোন্ শ্রেণীভুক্ত তাহা নির্দ্ধারণ করা সহজসাধ্য হইয়া উঠে।



[বিবাহ-বাসর। শঙ্খধ্বনি হইল। পুরোহিত মন্ত্র পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন—Siren (সাইরেন) বাজিয়া উঠিল। পুরোহিত দৌড়াইয়া পলাইবার উপক্রম করিল ।]

কনের বাপ। এ কি! কোথায় যাচ্ছেন?

পুরোহিত। ম'শায়, আগে প্রাণ,—তার পর বিয়ে!

—সে কি! লগ্ন চ'লে যা'বে যে—!

—যদি লগ্নের ভিতর বিয়ে দিতে চান, তবে দক্ষিণা ডবল দিতে হবে।

বর। আমিও বোমার 'রিস্ক' মাথায় নিয়ে দু'হাজার টাকায় বিয়ে করতে পারব না;—ডবল দিতে হবে।

... ...

অমল। পঁচিশ টাকা চাউলের মণ—এখন উপায় কি হবে?

রমেশ। আরে ভাই, বল কেন; অত্যন্ত বেগতিক! আমার একটা চাকর আছে, সে একাই দু'বেলা দেড় সের খেয়ে ফেলে, এখন তাকে রীতিমত চা দিতে সুরু করেছি।

—চাকরটী দেখছি খুব পিয়ারের তা' হ'লে!

—না-না—তা' নয়। চা দিচ্ছি ক্ষুধা মরবার জন্য, কিন্তু তাতেও ত' ভাত কম খাচ্ছে না!

... ...

খদ্দের। শুনলাম, আপনাদের এখানে না কি সুবিধাদরে চাউল পাওয়া যায়?

দোকানি। হ্যাঁ—চাউল নিতে হ'লে তেল নিতে হবে।

খদ্দের। ভাল, তেল দিতে হবে না ত'?

... ...

[অনেক দিন বাদে দেখা]

প্রশ্ন। কেমন—হাল-চাল কি?

উত্তর। হ্যাঁ ভাই, হাল আছে চাল নাই।

সতীশ। এত দাম দিয়ে ত' আর চাউল কিনে খাওয়া যায় না?

বিপিন। কণ্ট্রোলের দোকান থেকে নেবার ব্যবস্থা কর না কেন ভাই!

সতীশ। ঐ লাইন ধ'রে দু' ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা কি সম্ভব?

বিপিন। ছেলেপিলেদেরকে পাঠিয়ে দাও না। আমি ত' আমার তিনটী ছেলেকে এই কাজে লাগিয়েছি। রোজ বিভিন্ন কণ্ট্রোলের দোকান ঘুরে বার সের ক'রে চাউল সংগ্রহ করে। ভোর ৪টেয় উঠে তারা এই কাজে লাগে; অধিক পরিশ্রম হয় ব'লে তাদের প্রত্যেককে ১ পো' ক'রে দুধ দিচ্ছি।

... ...

ভদ্রলোক। কি রে বিশু, আজকাল কি ভিক্ষে করা ছেড়ে দিয়েছিস্?

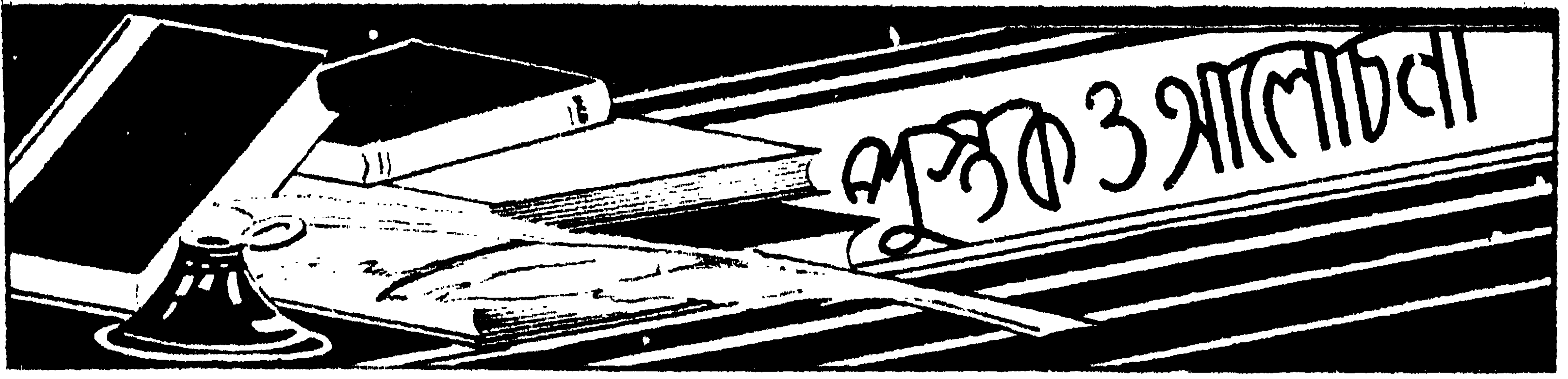
ভিখিরী। হাঁ বাবু। এক পয়সার ভিক্ষে ত' পয়সার অভাবে উঠেই গেছে, লোকে ভিক্ষে দেবে কি ক'রে?—তার-পর চাউল যা' মাগ্‌গি হ'য়েছে—গৃহলক্ষ্মীরা আর ভিক্ষে দিতে চায় না।

ভদ্রলোক। তোর তবে চলে কি ক'রে?

ভিখিরী। গভর্ণমেণ্ট কণ্ট্রোলের দোকান ক'রে আমাদের ভাল ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে। ভোরবেলা উঠেই লাইনে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাই—এক লাইনের কাজ হ'য়ে গেলে আর এক লাইনে গিয়ে দাঁড়াই, এমনি ক'রে বেশ-কিছু চাউল ও চিনি জমে যায়, তাই দোকানে গিয়ে চড়া দামে বিক্রি করি—দু' পয়সার কাজ হ'য়ে যায়। বেশ আছি, ভিক্ষের দরকার কি?

ভদ্রলোক। কিছু জমিয়েছিস্?

বিশু। হাঁ বাবু, আমাদের কারবারে লোকসান নাই, দু' মাসে খেয়ে খরচে তা' প্রায় বাইশ টাকার মত মুনাফা ক'রে ফেলেছি।



"বঙ্গশ্রী" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

সাহিত্যচর্চ্চা করি নাই, করিও না। "জনৈক বিশিষ্ট বন্ধুবরের অনুরোধে" কলম ধরিয়াছিলাম, বিষয় বস্তু খুঁজিয়া না পাওয়ায় আপনাদেরই সমালোচনা করিয়াছি। যদি মনোনীত হয়, কৃপাপূর্ব্বক ছাপাইবেন, আর যদি না হয়, তাহা হইলে খাতাখানি ফেরৎ পাঠাইবেন, কারণ, বর্ত্তমান কাগজ-পরিস্থিতিতে কয়েকপৃষ্ঠা অলিখিত কাগজ বড়ই মূল্যবান। এই রচনায় তিক্তরস হয় ত' থাকিতে পারে; তাহাতে বিচলিত হইবেন না; কারণ, চিকিৎসা-শাস্ত্রে তিক্তরসও মধ্যে মধ্যে উপকারী বলিয়া বিবেচিত হয়। অলমতিবিস্তরেন। ইতি—

শ্রীঅশোক মিত্র

উপক্রমণিকা

নিষ্প্রাগন্তিতা পৃথিবীর এক কোনে বসিয়া যখন পুরাতন বন্ধু গ্রেটকে কোথায় পাওয়া যায়, এই চিন্তায় মগ্ন ছিলাম, এমন সময়ে পুস্তক সমালোচনার উৎকট প্রবৃত্তি আমার মধ্যে কোথা হইতে আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং কেন, তাহা বুঝিতে পারি না। এই সাধু সঙ্কল্প মস্তিষ্কে প্রবেশ করামাত্রই হাতে-কলমে পুস্তক-সমালোচনা অথবা "সঙালোচনা (সং-এর দ্বারা আলোচনা)" আরম্ভ করিলাম—"অমারম্ভঃ শুভায় ভবতু।"

"সঙালোচনা" আরম্ভ করিলাম, কিন্তু আলোচ্য বিষয় কি? সহসা হেরিনু সম্মুখে, মোড়ক বাঁধা চৈত্রমাসের "বঙ্গশ্রী", অপঠিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। আর যায় কোথা! তৎক্ষণাৎ দ্রুতগতিতে পাঠান্তে কার্য্যারম্ভ করিলাম। এই কার্য্যে আমার মত সমালোচকবৃন্দের শুনিয়াছি বিদ্যাবুদ্ধি অনাবশ্যক। আমারও ত' "বিদ্যাস্থানে ভয়েবচ" সুতরাং নির্ভয়ে কলম চালনা করা যাউক। উপরন্ত দেখিলাম কর্ত্তারা নিজেদের পত্রিকায় অপরের সমালোচনা করিয়া কাহাকেও ডাণ্ডা এবং কাহাকেও মণ্ডা বিতরণ করিয়াছেন, কিন্তু নিজেদের সম্বন্ধে নীরব। অবশ্য ইহাই বাস্তব নিয়ম, যাহা হউক, আমার কল্পনায় যখন রং চড়িয়াছে, তখন এই পত্রিকারই সমালোচনায় ডাণ্ডা-মণ্ডা বিতরণের কার্য্য গ্রহণ করিতে হইবে—কার সাধ্য রোধে তার গতি?

কার্য্যারম্ভ

বঙ্গশ্রীর সমালোচনা করিতে হইলে প্রথমেই শ্রীশ্রী৺পুরীধামে পুণ্যক্ষেত্রে আসিতে হয়; কারণ পত্রিকার প্রচ্ছদপটেই শ্রীধামের শ্রীমন্দির দেখিতে পাইব। Travel only when you must নীতি বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও অতিকষ্টে শ্রীধামে উপনীত হইলাম। (বলা বাহুল্য, কল্পনালোকে আজিও কোনও রেলপথ বা জলপথ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং আমার মত পরিব্রাজকগণ বিনাব্যয়ে বিমানপথে উর্দ্ধলোকে যথেচ্ছা ভ্রমণ আজিও করিতে পারেন)। দেবদর্শনের পুণ্য সঞ্চয়ান্তে সমুদ্রতীরে গিয়া কয়েকটি কুটীর দেখিতে পাইলাম। বহুদূরে দেখিলাম এক ব্যক্তি চতুষ্পদ জীববিশেষ (ছাগল বলিয়া মনে হইল) তাড়না করিতে করিতে নিকটে আসিতেছে। সৌভাগ্যক্রমে তাহার সহিত পরিচিত হইলাম এবং তাহার অতিথিবৎসলতা-গুণে তাহারই কুটীরে আশ্রয় লাভ করিয়া আনন্দিত হইলাম। এই স্থান হইতেই "Business drive" অর্থাৎ কি না কাজ চালানো যাইবে। সৌভাগ্যক্রমে শ্রীক্ষেত্রে এখনও food rationing আরম্ভ হয় নাই।

কার্য্য

বঙ্গশ্রীর সাহিত্যালোকে অভিযানারম্ভের প্রারম্ভেই বিজ্ঞাপনারণ্যে (নৈমিষারণ্যে নহে) কিছুকাল বাধাপ্রাপ্ত হইলাম। শত্রুপক্ষকে বাধা দানের জন্য বহুবিধ barrier বা বাধা সৃষ্টি করা হয়, ইহাই স্বতঃসিদ্ধ রণনীতি। পত্রিকার কর্তৃপক্ষেরও এই নীতির প্রশংসা করিলাম, কিন্তু তাঁহাদের এই বেড়াজাল ও camouflage আমার বজ্রের আক্রমণে ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই বিজ্ঞাপনারণ্যে বিচরণ করিতে করিতে অভিযাত্রী সৈন্যদলের মত কিছু অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিলাম। বাল্মীকি রামায়ণ অবিনশ্বর কীর্ত্তি বলিয়াই জানিতাম কিন্তু উহার কীর্ত্তি আদি কবিগুরু বাল্মীকির অথবা মেট্রোপলিটনের তাহাতে বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত। আমরা কল্পনালোকের বাহিরে মেট্রোপলিটন নামে কোনও বীমা প্রতিষ্ঠানের সংবাদ রাখি বটে। তবে কি কবিগুরু তাঁহার কীর্ত্তিগ্রন্থ উক্ত প্রতিষ্ঠানে তস্কর কীটাদির দৌরাত্ম্য রক্ষায় বীমা করিয়াছিলেন? ইহার মীমাংসা করিতে পারিলাম না। মহাযুদ্ধের সমস্যা সমূহের সমাধান কল্পে মোহিনী বিড়ির অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা দর্শনে মুগ্ধ হইলাম; দুঃখের বিষয়, ধূমরসে বঞ্চিত আমি, সুতরাং পরখ করিতে পারিলাম না। এই ক্ষুদ্র নৈমিষারণ্যেও কতিপয় ব্যক্তিও পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়া উদ্‌ভ্রান্ত পথিককে আহ্বান করিতেছে। আমার পকেট খালিই ছিল, সুতরাং বিনা বাধায় সাহিত্যপুরীর সম্মুখে উপনীত হইলাম। দেখিলাম আমার সামনে একটি পল্লীগৃহের মনোরম চিত্র, ভোরের আলোর অতি মনোরমভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই কুটীর পার হইলেই বঙ্গশ্রীর সাহিত্যপুরে প্রবেশ লাভ করা যায়। ভোরের আলোয় আমারও কল্পনার রঙ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে দেখিতেছি।

বঙ্গশ্রীর প্রথম রচনা কবিশেখর কালিদাস রায়ের "মাথুর"। রচনার মাধুর্য্যে মোহিত হইলাম। আজ পর্য্যন্ত এত সরল ও সুন্দর ভাষায়ও

চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে রচনার বিষয়বস্তুকে বুঝিতে পারি নাই। রচনাটি একাধিকবার পড়িতে ইচ্ছা হয়। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের ও রবীন্দ্রনাথের কাব্য সমন্বয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবধারার সৃষ্টি করিয়া যশস্বী লেখকবর পাঠকগণের চিত্ত হরণ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তাঁহার নিজের রচনার মৌলিকতা ত' আছেই। কবিবরের রচিত ক্ষুদ্র কবিতা "পথ ও লক্ষ্য"ও বর্ত্তমান সংখ্যার সম্পদ।

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্তের কবিতা "সাবধানী", অসাবধান ব্যক্তিদের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। কবির উক্তি—

"আজিকে আমার বন্ধুজনার অন্ত নাই;
তবুও শূন্য ফাঁকা ফাঁকা সব ঠেকিছে যেন
... ...
কানাকড়ি হায় ছিল না যখন হাতে মোর
কেহ ত তখন অশ্রু মোছাতে আসেনি কাছে
এসেছে তারাই আজিকে মোছাতে নয়ন লোর
সাবধান করে, পথের কাঁটায় পদেই পাছে।"

ইত্যাদি, বাস্তব জীবনের পরীক্ষিত সত্য। কবির নৈপুণ্যে সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু, আজিকে যখন মুদ্রার প্রসাদে বন্ধুজনার অন্ত নাই, তখন জীবন নদীর পারে যাইবার আগ্রহ কেন? জীবন নদীতে Submarine কিম্বা Ferry steamer চলে না। সুতরাং "দুকূল ছাপায়ে উঠেছে ঢেউ" যতক্ষণ না স্তব্ধ হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত খেয়া নৌকায় কাণ্ডারীর অপেক্ষা করিতেই হইবে। কবিবর যদি ভাগ্যবান্ হন, তবে "দিনের শেষের শেষ খেয়ায়" হয় ত' আসন লাভ করিতে পারেন, একবার enquiry officeএ সংবাদ লইতে পারেন।

"পরাজয়" (বড় গল্প)—লেখিকা শ্রীপ্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়। সাধারণ সাংসারিক সুখদুঃখের ছবি। গল্পের ভঙ্গী ও গতিতে স্বাভাবিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"মৃত্যুর গান শুনি" (কবিতা)—রচয়িতা শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য। কবি যদি দীপক রাগিণীতে সুর ধরিতেন, তাহা হইলে পারিপার্শ্বিক বিবেচনায় সমীচীন হইত।

"সেতু"—কবিতা, রচয়িতা শ্রীঅরূপ ভট্টাচার্য্য। সেতুর প্রয়োজনীয়তা কিসে অনুভূত হয়? নদী থাকিলেই সেতু, এবং সেতুর জন্যই নদী। যাহা হউক, নবীন লেখকের রচনায় ভাবুকতা ও চিন্তাশীলতা বর্ত্তমান। তবে "যে সেতু গড়িল আজি ভাঙ্গিবে কি আর?" ইহার সদুত্তর কেবল অনাগত কালই দিতে পারিবে। বিমানাক্রমণের ও যুদ্ধের পরিস্থিতিতে রচয়িতা সেতু রক্ষার জন্য A.R.P. ছন্দে কিছু রক্ষাব্যবস্থা যোগ করিলে পারিতেন। তাহা ছাড়া যদি সেতু Pontoon Bridge হয়, তাহা হইলে উভয় তীরের সাময়িক বিচ্ছেদও সম্ভব।

"প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও বিদ্যানুশীলন" গবেষণামূলক প্রবন্ধ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার বিদ্যাস্থানে "ভয়েবচ" সুতরাং উক্ত প্রবন্ধের পাশ কাটাইয়া "সঙ্ঘ" নাট্যে উপস্থিত হইলাম। ক্রমবর্দ্ধমান নাটক—পল্লী সংস্কারকে ভূমিকা করিয়া রচিত, সুতরাং পল্লীমঙ্গলকামী প্রত্যেকেরই পাঠযোগ্য।

"এরাও মানুষ"—বর্ত্তমান যুগোপযোগী অপরিহার্য্য কবিতা।

'অন্তঃপুর'—রচয়িত্রী শ্রীরেখা দেবী।

অন্তঃপুর সম্বন্ধে সমালোচনায় প্রবৃত্ত না হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। শাস্ত্রকারও যেন দূরত্ব নির্দ্দেশক একটা সীমা বা Safe distance নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হইতেছে। তা ছাড়া, অন্তঃপুরে প্রবেশের চেষ্টা করিয়া কি শেষে বিপদে পড়িব? সুতরাং দ্রুতবেগে বঙ্গশ্রীর অন্তঃপুর ছাড়াইয়া ধাবিত হইলাম। কেহ যদি আমার সাবধানবাণী সত্ত্বেও অন্তঃপুরের সমালোচনা করার দুঃসাহস রাখেন, তাহা হইলে তিনি নিজের দায়িত্বে করিতে পারেন।

"প্রলয়"—কবিতা, রচয়িত্রী শ্রীস্বর্ণ দেবী। বিগত মহাদুর্য্যোগের ভয়াবহ দৃশ্য অতি নিপুণভাবে মনশ্চক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। ভাষা হৃদয়গ্রাহী, বর্ণনা চমৎকার।

পরবর্ত্তী রচনা—"অপমানিত" রচয়িতা K 3 = K. K. K. = কে? কে? কে? = (কুমুদিনীকান্ত কর)। ক্রমবর্দ্ধমান উপন্যাস, বর্ত্তমানে সমালোচনা করা অনুচিত মনে করি। তবে রীতিমত রোমাঞ্চকর. রোমাঞ্চের যেন আভাস পাওয়া যাইতেছে।

শ্রী মতিলাল দাশ রচিত "লালনগীতিকা" পাঠে আনন্দ লাভ করিলাম। আমাদের দুর্ভাগা দেশের মাটির মধ্যে যে নিজস্ব লোকসাহিত্যের ফল্গুধারা প্রবাহিতা, লেখকের সারবান্ প্রবন্ধে তাহার সন্ধান পাই। সমুদ্রের গভীর তলদেশেও সুদুর্লভ মাণিক্য থাকিতে পারে; তা' ছাড়া বর্ত্তমান কালের সাম্প্রদায়িকতা-কলুষিত আবহাওয়ায় লালনগীতিকার ন্যায় অমূল্য রত্নরাজির বহুল প্রচলন একান্ত আবশ্যক। "Of the brave three hundred lend but three"—আজিকার দিনে যদি লালন ফকিরের মত মহাপ্রাণ ব্যক্তি আবার আমরা ফিরিয়া পাইতাম, তাহা হইলে সোনার বাংলা কাঙাল অবস্থা হইতে উন্নীত হইত। লেখক মহাশয়ের নিকট এইরূপ গবেষণাসম্পন্ন প্রবন্ধ আশা করি।

"একদিনের নাটক"—Continental সাহিত্যক্ষেত্রে অনুসৃত নাটিকা।

সাহিত্য ও সমালোচনা—শ্রীননীগোপাল গোস্বামী লেখকের সারবান্ যুক্তিসমূহ ভাবিয়া দেখিবার মত।

"বিজ্ঞান জগৎ"—বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, শিক্ষণীয় বহু বিষয়ের সমাবেশে উপভোগ্য এই শ্রেণীর প্রবন্ধ সাময়িক পত্রিকা সমূহে প্রচুর পরিমাণে প্রকাশিত হওয়া উচিত।

"মুক্তিমন্ত্র"—কবিতা; ভাব ও ভাষা সাধারণ।

"আকাশ"—কবিতা; রচয়িতা শ্রীরবি চক্রবর্ত্তী। ভাব ও ভাষা বৈচিত্র্যহীন; ছন্দের মধ্যে সঙ্গতির বিশেষ অভাব।

"ভিখারী"—কবিতা—শ্রীঅবনীকান্ত ভট্টাচার্য্য। পর পর দুইটি মামুলী

কবিতা পাঠান্তে উন্নততর কাব্য পাওয়া গেল। সুমধুর ছন্দ ও ভাষায় মহা-স্থিথারীর বর্ণনা চমৎকার রূপ গ্রহণ করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক যুগের প্রভাবে ধর্ম্ম ভক্তিমূলক সাহিত্যের পুষ্টি কোনও নিয়মের ব্যতিক্রমের সহিত তুলনীয়। কবিবর হেমচন্দ্রের বিরচিত—

"রে সতি! রে সতি! কান্দিল পশুপতি
পাগল শিব প্রমথেশ,
যোগ মগন হর তাপস যতদিন
ততদিন না ছিল ক্লেশ"—প্রভৃতি

ছন্দোবিন্যাস আজও হৃদয় হরণ করে। ছন্দের সৌরভে ও পারিপার্শ্বিক বর্ণনার সুকৌশলে আলোচ্য কবিতা উপভোগ্য হইয়াছে।

"বৃহত্তর পৃথিবী"—পর্য্যায়ে রাষ্ট্রনায়কদের বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা। রাজায় রাজায় যুদ্ধের ফলে উলুখাগড়ার সমূহ বিপদ, তাহা ত' বেশ ভালভাবেই ভোগ করিতেছি। রাষ্ট্রনায়কগণের এই বিশ্ব-কুস্তী-প্রতিযোগিতার শেষ কোথা ও কবে?' প্রবন্ধ পাঠান্তে এই কথাই মনে হয়, এবং এই সূত্রে মনে পড়ে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোনও সাময়িক পত্রে বিশ্ব-শান্তিপ্রতিষ্ঠার অবস্থা কখন্ সৃষ্ট হইতে পারে তাহার এক কৌতুককর গবেষণা পড়িয়াছিলাম—

"When the widow of Franco will meet Stalin at his death-bed, conveying the news that Hitler has been assassinated this morning, while attending Mussolini's funeral."

"একটা বিড়ি"—ছোট রিয়ালিষ্টিক গল্প। লেখক—শ্রীমোহিনী চৌধুরী ভাষা সরস, রচনার মৌলিকতা আছে। লেখকের সর্দ্দার সিং বোধকরি আফ্‌গানিস্থানবাসী হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত সম্প্রদায় ভুক্ত।

"কোথা ভগবান"—শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখাটি গদ্য ও পদ্যের মধ্যে "গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক (ভূতপূর্ব্ব নাম G. C. M.)," এবং কান্ত কবি রজনীকান্ত ও অমিত্রাক্ষর কবিদের অপূর্ব্ব সংক্ষিপ্ত সংমিশ্রণ অথবা "জগাখিচুড়ী।" ভগবান প্রাপ্তির জন্য প্রচুর সাধনা করিয়া নিম্নলিখিত ছন্দ লাভ করিয়াছি—

"কোথা ভগবান্
খুঁজিয়া বৃথা হয়রান্
দিন হয় না গুজরান্
খাঁচা ছাড়া হতে চায়
মানবের আত্মা।
তৈরী করি এক Differential Equation
গণিতের সাহায্যে করি তাহার Solution
বাহির করিয়া দিব কোথা ভগবান্
হউক Integral Calculus তোমাতে অভিন্ন।"

"চতুষ্পাঠী"—ক্রমশঃপ্রকাশ্য প্রবন্ধ। মন্তব্যও ক্রমশঃপ্রকাশ্য।

"কাছে ও দূরে" (কবিতা)—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ রায়। এখানেও সেই সেতুর কথা দেখিতেছি। তবে কথার সেতু, এই যা' পার্থক্য। অবস্থা বড় ambiguous দেখিতেছি; কারণ কবির রচনাই তাহার প্রমাণ:—

"তুমি যবে বসে থাক পাশে
কণ্ঠ মোর রুদ্ধ হয়ে আসে,
দুটি আঁখি ব্যাকুল আগ্রহে
শূণ্যপানে শুধু চেয়ে রহে।
তুমি যদি বল কোন কথা,
বাড়ে তাহে শুধু ব্যাকুলতা॥

আমার মনে হয়, বর্ত্তমান কবিতার উপরোক্ত অংশ "একটা বিড়ি" গল্পের সহিত যোগ করিলে সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধিত হইত।

"দেবশিশু" (ছোট গল্প)—মনস্তত্ত্ববিষয়ক মৌলিকতা কিছু থাকিলেও কেমন যেন জমিয়া উঠিতে পারে নাই।

"দেশের সেবা" (উপন্যাস) ক্রমশঃ।

"মধুসূদন, মেদো, অথবা টেঁপু (ব্যঙ্গ-রচনা)—বঙ্গ-সাহিত্যে পরশুরাম ও নারদের যুগ্ম আবির্ভাব এক স্মরণীয় ঘটনা। তাঁহাদের পরে অনেক লেখক ও চিত্রকর অনুরূপ রস-সাহিত্য-সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু "পরশুরাম-নারদ"কে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক যদি উচ্চাকাঙ্খা লইয়া রচনা করেন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট ভবিষ্যতে দুর্ম্মূল্য রস-সাহিত্যের ভরসা রাখি।

"আফগানিস্থান" (চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ)—নামহীন পরিব্রাজক-বিরচিত। রচনায় মাধুর্য্য আছে; বিদেশ সম্বন্ধে স্বাভাবিক কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবে। পরিব্রাজক নামহীন হইলেও যেন চিনি-চিনি মনে হয়। I sugar you (খাঁটি অনুবাদ)। তোমাকে শারদপ্রাতে (A.M.) দেখিয়াছি হাইকোর্টে, তোমায় মাধবীরাতে দেখিয়াছি বাড়ীর ছাদে: তুমি থাক সাগরা পারে— ইত্যাদি। যাহা হউক, স্বদেশী পথিকবর পাঠকগণের সম্মুখে আরও অন্যান্য neutral ও মিত্রদেশের দ্বারোৎপাটন করিবেন আশা করি। "রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে" যদি সাজানো যায়, তবে নামহীন স্বদেশী পরিব্রাজক মারফতে বৃহত্তর জগৎকে কেন দেখিতে পাইব না? প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে, 'বঙ্গশ্রী'র পাকশালায় বর্ত্তমানে আফগানিস্থানের জাফরাণী মশলার রং ধরিয়াছে।

ইহা ছাড়াও বঙ্গশ্রীর সাহিত্যপুরে বিবিধ বিষয়ক আলোচনার সমাবেশ দেখিলাম। আইন, খেলাধূলা, সাময়িক সংবাদ, সমালোচনা, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, যে-কোনও পত্রিকার পক্ষে একত্রে এত প্রকার সাহিত্য-রস পরিবেশন করা কম কৃতিত্বের পরিচয় নহে। 'বঙ্গশ্রী'র পরিচালকমণ্ডলী যথার্থই এই কৃতিত্বের দাবী অর্জ্জন করিতে পারেন।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, 'বঙ্গশ্রী' পাঁচফুলের সাজি। ইহার প্রচেষ্টা সার্থক হউক।

সাহিত্যের স্বরূপ—ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, এম্-এ, পি-আর-এস্, পি-এইচ্-ডি প্রণীত, মূল্য ১।০ টাকা মাত্র, পৃঃ ১৪৪। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাঃ দাশগুপ্ত সম্বন্ধে কোন পরিচায়িকা নিষ্প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্যের আসরে ইতিপূর্ব্বেই তিনি স্থায়ী এবং বিশিষ্ট আসন সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন। তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক ও সমালোচক। বাংলা সাহিত্যে নবযুগ নামক প্রবন্ধ পুস্তকখানি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সুসমালোচক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি প্রসারিত হইয়াছিল। সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁহার একটি নিজস্ব দৃষ্টি-ভঙ্গী আছে। রস বিচারেরই ক্ষেত্রে মৌলিক চিন্তা ও গবেষণার প্রয়োজন কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না, কিন্তু গবেষক হইতে হইবে বলিয়াই যে নানারূপ যুক্তিতর্ক ও তত্ত্বকথার অবতারণা করিতে হইবে এবং বিষয় বস্তুটিকে অতিক্রম করিয়া কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করিয়া আলোচনাকে সাধারণের বোধাতীত করিয়া পাণ্ডিত্য জাহির করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। বরং তেমন আলোচনাকে আমরা সাহিত্যিক আলোচনা বলিব কি না তাহাতে সংশয় জাগে। ডাঃ দাশগুপ্ত গবেষক বটে কিন্তু গবেষণার জটিলজাল বিস্তারে তাঁহার প্রয়াস নাই। রস বিচার তিনি করিয়াছেন রসিক সাহিত্যস্রষ্টার মতই। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সাহিত্যের স্বরূপ কি, আর্টের প্রয়োজন ও অপ্রয়োজন, সাহিত্যের প্রাণধর্ম্ম ও তত্ত্ববুদ্ধি, সাহিত্য, আদর্শবাদ বনাম বাস্তববাদ প্রভৃতি অতি দক্ষতার সহিত নিপুণ রস-স্রষ্টার ন্যায় আলোচনা করিয়াছেন। সাহিত্যের যে একটা ইতিহাস এবং সেই ইতিহাসই যে সাহিত্য-সৃষ্টির নিয়ামক এই কথাটা আমাদের বড় ভাল লাগিয়াছে। সাহিত্যের আদর্শ যে যুগে যুগে কালে কালে আমাদের জীবন-যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তনশীল ডাঃ দাশগুপ্তের সহিত এ বিষয়ে আমরা একমত। সাহিত্যে আদর্শবাদ ও বাস্তববাদ লইয়া আধুনিক কালে মতদ্বৈধতার আর শেষ নাই। ডাঃ দাশগুপ্তের সুচিন্তিত প্রবন্ধটি এ বিষয়ে অনেক নূতন আলোকপাত করিয়াছে। বিবাদমান পক্ষীয়দের পক্ষে ইহা হয় ত' কিছু নূতন উপকরণ যোগাইবে। বাংলা সাহিত্য গতিশীল—সেই গতির স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে শুধু বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্য লইলেই চলিবে না, সূক্ষ্ম অনুভূতিরও প্রয়োজন আছে। বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা কবিকে বুঝিতে গেলে কবিকে ঠিক মত বোঝা যাইবে না—কবির অন্তররাজ্যের সহিত পরিচিত হইতে হইলে সূক্ষ্ম মননশক্তি বা অনুভূতির প্রয়োজনটাই যেন বেশী বলিয়া মনে হয়। ডাঃ দাশগুপ্ত তাঁহার আলোচনার মধ্যে এই অনুভূতির পরিচয় দিয়াছেন দেখিয়া আনন্দ হইল। আলোচ্য গ্রন্থের ভাষাটি সুন্দর ও মনোমত এবং প্রকৃত-পক্ষে ইহাকেই সমালোচনার ভাষা বলা চলে। তাঁহার আলোচনার পদ্ধতিও আমাদের ভাল লাগিয়াছে। মোট কথা এই কথাই বলিতে চাহি যে ইংরাজিতে যাহাকে critical study বলে এই গ্রন্থে তাহা তো আছেই উপরন্তু আর একটি জিনিষ আছে—তাহা হইতেছে রস বিচার করিতে বসিয়া রসসৃষ্টির আয়োজন। ইহা বড় কম কথা নয়। বাংলা সাহিত্যের আলোচনা-মূলক সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে আলোচ্য পুস্তকখানির যে বিশেষ দান থাকিয়া যাইবে সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। পরিশেষে বক্তব্য, এই কাগজের দুর্ভিক্ষের দিনে উত্তম কাগজে পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া মুদ্রণের ব্যবস্থা করিয়া অঘটন সঙ্ঘটন করিয়াছেন। কাগজ, ছাপা, বাঁধাই সকলই সুন্দর—সেই তুলনায় এই বাজার পুস্তকের মূল্য যে অতি সামান্যই নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

সস্তা-চিনি

হাজার লোকে 'কিউ' করেছে ওটা কিসের বিকিকিনি
জানে না কি দেশের লোকে জলে ভেজা সস্তা-চিনি
পাচ্ছে খেতে এই বাজারেও কাদের দয়ায় চিন্‌লে না ?
তোমার বাপু আয়-বাড়ন্ত,—এ চিনি ত' কিন্‌লে না !
সাতটা থেকে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে লাইন ধরেছি পুরোভাগে
ঠেলাঠেলির চাপে পড়ে এগিয়ে গেছি সবার আগে।
আধসেরি ঐ হাজার ঠোঙা ঘরের মাঝে আছে ঠাসা
সামনে বসে গুটি কয়েক ফচকে ছোঁড়া
খেলছে পাশা।

বাজল সবে আট ঘটিকা, ঘণ্টা দু'এক আরও দেরী
দাঁড়িয়ে পা টাটিয়ে গেছে—
ঠোঙা মোটে আধসেরি।
বাড়ী এসে দেখি ও-মা! এ চিনি যে জলে ভেজা
পয়সা দিয়ে—ঠ'কে গেছি ; স্বীকার করি বলুক যে যা।
দরে যেটা বাদ পড়েছে, ওজনে তা' পুষিয়ে নেবে
বল্লে পরে
'সিভিক্ গার্ড'
পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেবে।



শ্রীশিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গালার আগামী ফুটবল খেলা

ফুটবল মরশুম আগতপ্রায়। সকল দলই বিশেষ তোড়জোড় আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। বর্ত্তমানে দেশের সঙ্কটজনক অবস্থাতেও অন্যান্য বৎসরের ন্যায় খেলোয়াড়দের 'ছাড়পত্র' স্বাক্ষর সম্বন্ধে আই. এফ. এ. অফিসে যেরূপ উত্তেজনা ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়া থাকে, এই বৎসর তাহা না হইলেও আই. এফ. এ. অফিসে বেশ খানিকটা জনসমাগম হয়। এই বৎসর সর্ব্বসমেত ১৬০ জন খেলোয়াড় তাহাদের পুরাতন ক্লাবের মায়া কাটাইয়া নূতনভাবে মায়া বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে হয় যে ২৫শে এপ্রিল তারিখটি বিভিন্ন ক্লাব পরিচালকগণের একটি স্মরণীয় দিন। যাহা হউক, এই বৎসর ভবানীপুর দলে নীলু মুখার্জ্জী, বিমলেন্দু কর ও মোজাম্মল হক; এরিয়ান্স দলে জি. লামসডেন, আমিন, শিবু পরামাণিক এবং ইষ্টবেঙ্গল দলে অজিত নন্দী, এস. তালুকদার, ডি. সেন ও এ. গাঙ্গুলী যোগদান করায় উক্ত দলগুলিই বিশেষ শক্তিশালী হইয়াছে।

কলিকাতার হকি লীগ

কলিকাতার হকি লীগ প্রতিযোগিতার সকল খেলা শেষ হইয়াছে। এই বৎসর গত বৎসরের বাইটন্ কাপ বিজয়ী রেঞ্জার্স দল প্রথম ডিভিসনে চ্যাম্পিয়ানশিপ পাইবার গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে। দ্বিতীয় ডিভিসনে ভবানীপুর দল ও তৃতীয় ডিভিসনে ডক্ ডিটাচমেণ্ট' চ্যাম্পিয়ান হইয়াছে। এই বৎসরও লীগ প্রতিযোগিতায় উঠানামা না থাকা সত্ত্বেও শুনা যাইতেছে, ভবানীপুর দল আগামী বৎসর প্রথম ডিভিসনে খেলিবার সুযোগ পাইবে। কারণ প্রথম ডিভিসনে নাকি একটি দল কম খেলিতেছে। তবে এই সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ মহল হইতে এখনও কোন কিছু শুনা যায় নাই। লীগ প্রতিযোগিতার সঙ্গে সঙ্গেই 'নক-আউট' প্রতিযোগিতাগুলি আরম্ভ হইয়াছে। এই বৎসরও বি. এইচ. এ. বাইটন কাপ, কাইভন কাপ, লক্ষ্মীবিলাস কাপ ও স্যার আশুতোষ চৌধুরী কাপ প্রতিযোগিতাগুলি খেলার ব্যবস্থা করিয়াছে। সকল প্রতিযোগিতারই তালিকা প্রস্তুত হইয়া খেলা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই বৎসর বাইটন কাপে সর্ব্বসমেত ২৯টি দল যোগদান করিয়াছে। প্রথমে মনে হইয়াছিল যে, গত বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও বুঝি কেবলমাত্র স্থানীয় দলগুলিরই মধ্যে খেলা হইবে। যাহা হউক, এইবার অনেকগুলি বাহিরের দল যোগদান করায় বেশ খানিকটা উত্তেজনা সৃষ্টি হইবে বলিয়া মনে হয়। বাহিরের দলের মধ্যে ভগবন্ত ক্লাব (টিকমগড়), ওয়াই. এম. সি. এ. (লাহোর), দিল্লী, জামালপুর এপ্রেণ্টিস, ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন (বহরমপুর), টাউনক্লাব (বহরমপুর), বি. এন. রেলওয়ে 'এ' ও 'বি'র নাম উল্লেখযোগ্য। তালিকা দেখিয়া মনে হয় যে, উপরভাগে রেঞ্জার্স ও ভগবন্ত ক্লাব সেমি-ফাইনালে উন্নীত হইতে পারিবে। তবে ভগবন্ত ক্লাবকে কোয়াটার ফাইনালে পুলিশ দলকে পরাজিত করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে। নিম্নভাগে কোন দল কতদূর অগ্রসর হইবে তাহা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে ওয়াই. এম. সি. এ. (লাহোর), দিল্লীর পোর্ট-কমিশনার্স ও বি. এন. রেলওয়ে দল যে বেশ খানিকটা অগ্রসর হইবে তা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা

আন্তঃপ্রাদেশিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা হিসাবে রণজি ট্রফি প্রতি বৎসরই হইয়া থাকে। এই বৎসর দেশের অনেক গোলমালের মধ্যেও প্রতিযোগিতাটি সাফল্যের সহিত পরিসমাপ্তি হইয়াছে। ফাইনালে বরোদা ও হায়দ্রাবাদ দল প্রতিদ্বন্দীতা করে এবং শেষ পর্য্যন্ত বরোদা দলই প্রতিপক্ষ দলকে ৩০১ রাণে পরাজিত করিয়া চ্যাম্পিয়ানশিপ পাইয়াছে। তাহারা এই বৎসর যেরূপ খেলিয়াছে তাহাতে যে তাহাদের এই জয়লাভ যথোপযুক্ত হইয়াছে তা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বরোদা দল এই সর্ব্বপ্রথম উক্ত সম্মান লাভের গৌরব অর্জ্জন করিল। হায়দ্রাবাদ দলের দ্বিতীয় ইনিংসে শোচনীয় ব্যর্থতার একমাত্র কারণ হাজারী ও নাইডুর মারাত্মক বোলিং। বরোদা দলে হাজারী ও অধিকারী ব্যাটিং-এও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। হায়দ্রাবাদ দলে ভারতচাঁদ কুরেশীর ব্যাটিং এবং গোলাম আবেদ ও মেটার বোলিং প্রশংসনীয় হইয়াছিল।

রণজি প্রতিযোগিতার পূর্ব্ববর্ত্তী বিজয়ীগণ

১৯৩৪-৩৫ বোম্বাই, ১৯৩৫-৩৬ বোম্বাই, ১৯৩৬-৩৭ নবনগর, ১৯৩৭-৩৮ হায়দ্রাবাদ, ১৯৩৮-৩৯ বাঙ্গালা, ১৯৩৯-৪০ মহারাষ্ট্র, ১৯৪০-৪১ মহারাষ্ট্র ও ১৯৪১-৪২ বোম্বাই।

পরাজয়

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

[সমস্ত মঞ্চখানি অন্ধকার। ব্যাকগ্রাউণ্ডে সঙ্গীত বাজছে ঐক্যতানে—ভৈরবী। দৃশ্যটী একটী হাল-ফ্যাসানের বাড়ীর উদ্যানসম্বলিত প্রাঙ্গন। ষ্টেজের দু'ধার থেকে মাঝামাঝি পর্য্যন্ত এগিয়ে এসেছে রেলিং, মাঝখানে গেট। প্রাঙ্গনে একটী ইজিচেয়ারে বসে আছে একটী যুবক; বয়স তেইশ, চব্বিশ। গায়ে ড্রেসিং গাউন জড়ানো, সিগারেট খাচ্ছে। ধীরে ধীরে আবহ সঙ্গীত জোর হ'ল; ক্রমে আলো ফুটে উঠলো, পাখীর কাকলী শোনা গেল: আলো যখন বেশ ফুটে উঠেছে একটী চাকর ট্রেতে করে চা আর খবরের কাগজ নিয়ে এলো এবং ইজিচেয়ারের পার্শ্বস্থিত ট্রের ওপর রাখল]

চাকর। দাদাবাবু, চা আর খবরের কাগজ।

সুকান্ত। আচ্ছা রেখে যা—

[চাকর চলে গেল: সুকান্ত চা ঢেলে খেতে আরম্ভ করলো: ক্রমেই আলো বেড়ে উঠলো: দূরে ঘড়িতে আটটা বাজলো: সঙ্গীত থেমে গেল: দূরে বেজে উঠলো মিলের বাঁশী: বাঁশী শুনে ছেলেটী রেলিং-এর ধারে এসে দাঁড়াল। বাঁ-ধার দিয়ে গান গাইতে গাইতে ঢুকল একদল কুলি।]

মায়ের দেশে চল্‌তে হবে
সাম্যের গান গেয়ে।
সবার সাথে রিক্ত হাতে
কণ্টক পথ বেয়ে।
প্রলয় দোলায় দুলতে হবে
ফুলের হাসি ভুলতে হ'বে
পথের ধুলো তুলতে হবে
রত্ন মাণিক কুড়িয়ে পেয়ে
সাম্যের গান গেয়ে—

[তারা সকলেই গান গাইতে গাইতে ডান ধারে বেরিয়ে গেল। যারা সুকান্তকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল তারা সেলাম জানিয়ে গেল: তাদের চলে যাবার পথের দিকে চেয়ে সুকান্ত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল—তারপর ফিরে গিয়ে ইজিচেয়ারে বসল, কাগজখানা খুলে পড়তে আরম্ভ করল: ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে সব মিলিয়ে গেল। প্রায় আধমিনিট পরে: এবার সন্ধ্যার শেষ রশ্মি কাজেই প্রথমবারের ঠিক বিপরিত দিক থেকে আসবে: আবহ সঙ্গীত বাজবে বিকেলের সুরে: মিলের বাঁশী বাজল: সুকান্ত আবার রেলিং-এর কাছে এসে দাঁড়াল। গোলমাল করতে করতে মিলের কুলিরা মঞ্চের ডানদিক দিয়ে ঢুকে বাঁ দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। সবার চোখে মুখে ছুটীর আনন্দ—কণ্ঠে—

সব হারিয়ে হাসতে হবে
কাঙ্গাল নামে স্বগৌরবে
ভুলতে হবে কাঁদন যত
খুলতে হবে বাঁধন যত
নিবিড় হবে সাধন যত
চির চাওয়া মিলবে চেয়ে
সাম্যের গান গেয়ে—

আনন্দের গান—সবাই সুকান্তকে সেলাম করতে করতে চলে গেল: সুকান্ত পাষাণের মত দাঁড়িয়ে। ক্রমেই অন্ধকার ঘনিয়ে এল: কুলির ভিড় কমে গেল—সুকান্ত একটী সিগারেট ধরালো—তারই আলোয় মাঝে মাঝে সুকান্তের মুখ দেখা যাচ্ছে: চাকর এসে বারান্দায় আলোটা জেলে দিলে, তাতেই মঞ্চটী আলোকিত হয়ে গেল সুকান্ত একবার পিছন ফিরে চাইল]

চাকর। দাদাবাবু, বেড়াতে গেলেন না?

সুকান্ত। না।

[চাকর চলে গেল]

সুকান্ত। আমাদেরই মিলের কুলি! অসহায়, অনাদৃত—অন্নদাতাদের শোষণে, অত্যাচারে, অবিচারে, শিক্ষার অভাবে আজ এরা বেঁচে আছে পশুরও অধম হয়ে—আজ এরা নিজেরাই জানে না এরা সত্যি সত্যি বেঁচে আছে কিনা। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এমনি করে রোজ সকালে এরা দল বেঁধে হৈ হৈ করতে করতে গান গাইতে গাইতে আসে—এমনি করে এরা গান গাইতে গাইতে ফিরে যায়—জীবন যে কি তা এরা জানে না, বেঁচে থাকা যে কি তা এরা

ভুলে গেছে—জীবনে সুখ দুঃখ কিছুই এদের নেই। এদের জীবনে আছে শুধু হাড়ভাঙা পরিশ্রম, অন্নদাতাদের হাতে নির্য্যাতন, অত্যাচার, অবিচার—আছে শুধু দারিদ্র্যের উৎপীড়নে পাগলের মতন চীৎকার। একবেলা কোন রকমে একমুঠো খেয়ে বাকী জীবনটা অনাহারে কাটে—অথচ এরাই জাতির মেরুদণ্ড, এরাই সভ্যতার পিলসুজ, এরাই ঐশ্বর্য্যের ভিত্তি।

[মঞ্চের ডান দিয়ে ঢুকল, 'মঙ্গল' কুলিদের সর্দ্দার: সর্ব্বাঙ্গে কালিঝুলি মাখা—ঢুকেই সুকান্তকে দেখে সেলাম করল]

মঙ্গল। সেলাম ছোটকর্ত্তা।

সুকান্ত। সর্দ্দার! কি খবর? কেমন কাজ-কর্ম্ম হচ্ছে?

মঙ্গল। আজ্ঞে আপনাদের কৃপায় তা একরকম দিন কাটছে বৈ কি—আর কদিনই বা আমাদের জীবনে বাকী।

সুকান্ত। আচ্ছা সর্দ্দার! তোমাদের কোন অভাব অভিযোগ নেই? কিছু চাইবার? কিছু বলবার?

মঙ্গল। তা হুঁজুর (হাসল) কি আবার অভাব কত্তা—বেশ আছি আমরা কত্তা, বেশ আছি।

সুকান্ত—ভয় কি, নিঃসঙ্কোচে বল।

মঙ্গল। না কত্তা আমরা ভালই আছি।

সুকান্ত। তবু কোন অভিযোগ—কোন অনুযোগ।

মঙ্গল। তা কত্তা চাইলেই কি আর পাওয়া যায়!

সুকান্ত। তাহলে চাইবার কিছু নিশ্চয়ই আছে—বল সর্দ্দার, কিসের তোমাদের অভাব?

মঙ্গল। তা যদি বলেন ছোটকত্তা, আমাদের ছেলেপুলেদের জন্যে বিনে মাইনের ইস্কুল, আমাদের মেয়েলোগদের জন্যে একটা হাসপাতাল, আর আমাদের জন্যে হপ্তায় একদিন ছুটী—না না ছোটকত্তা আমাদের জন্যে কিছু চাই না! হুজুর বড়কত্তার কাণে যদি এসব কথা ওঠে তাহ'লে আর রক্ষে নেই—ছেলেপুলে নিয়ে পথে বসতে হবে—দোহাই হুজুর।

সুকান্ত। ভয় নেই সর্দ্দার, তোমাদের যাতে কোন অনিষ্ট না হয় তা আমি দেখব। আর তোমাদের যা যা দরকার বল্লে তা'রও যাতে ব্যবস্থা হয় তাও আমি দেখব।

মঙ্গল। সেলাম কত্তা সেলাম।

[একরকম প্রায় দৌড়তে দৌড়তেই মঞ্চ ছেড়ে চলে গেল—সুকান্ত অবাক হ'য়ে তার চলে যাওয়ার পথে তাকিয়ে রইল—দূর থেকে ভেসে এলো মহুয়ার তালে কুলীদের মাতাল সুর—খুব ধীরে ধীরে]।

অনেক দূর থেকে মিলিত কণ্ঠে—

ঐ নাচিছে সাঁওতালী চল
বাজে মাদল বাজে বাঁশের বাঁশী
তাদের পায়ে পায়ে বাজে কড়ির মল
নাচে বনের মেয়ে নাচে বনের ছেলে
ওরে মনের মানুষ তারা কোথায় পেলে
নাচে দলে দলে পিয়াল তলে
যেন পাহাড়ী নদী করে ছল ছল।

[ঘর থেকে বেড়িয়ে এল চাকর]

চাকর। দাদাবাবু মা ডাকছেন।

সুকান্ত। বাবা কোথায়রে রঘুয়া?

চাকর। আফিস ঘরে।

সুকান্ত। ও! আচ্ছা তুই যা, মাকে বল, আমি বাবার সঙ্গে দুটো কথা বলে এখুনি আসছি।

[সুকান্ত ঘরে যাবার জন্যে পা বাড়াল। ঘূর্ণায়মান হলে মঞ্চ ঘুরবে অন্যথা মঞ্চখানি ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে যাবে]

ক্রমশঃ

ইউরোপীয় ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছাত্রছাত্রী

(সর্ব্ব প্রকার) মোট সংখ্যা ১২,৭৭৫ ; সর্ব্ব সূত্র হইতে মোট ব্যয় ৩৯,১১,৯৭৫৷ টাকা। সর্ব্ব সূত্র হইতে প্রতি ছাত্রের জন্য ব্যয় ৩০৬৷৭, তন্মধ্যে সরকারী তহবিল হইতে ৭৭৸৵০।

সাময়িক প্রসঙ্গ ও আলোচনা

ভারতীয় প্রসঙ্গ

বাঙ্গালায় স্বায়ত্ব শাসনের অবসান

বাঙ্গালার মন্ত্রী-মণ্ডল পদত্যাগ করিয়াছেন; ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারা অনুসারে গভর্ণর স্বহস্তে শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালার স্বায়ত্ব শাসনের অবসান ঘটাইয়াছেন। অবশ্য ইহাতে বিস্মিত বা দুঃখিত হইবার কিছুই নাই। প্রকৃতপক্ষে স্বায়ত্ব শাসনের নামে মন্ত্রীদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল বরাবরই তাহার কার্য্যকরী মূল শক্তিটুকু ছিল গভর্ণরের স্বেচ্ছাধীন ও তাহার সিভিলিয়ানী পরিবারবর্গের কূট ভৈরবীচক্রের নেমিতে নিবদ্ধ। তবে কথা এই যে, যে সময়ে দেশে মন্ত্রী-মণ্ডলের সর্ব্বাধিক প্রয়োজন ছিল সেই সময়েই তাঁহাদিগকে বিদায় দেওয়া হইল। বিদায় দেওয়াটাও ঠিক নিয়মমাফিক ও ন্যায় সঙ্গতভাবে হইয়াছে কিনা তাহাও বিবেচ্য।

বিগত ১৫ই চৈত্র সোমবার প্রাতে বাজেট আলোচনার্থ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইলে বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ. কে. ফজলুল হক যে চাঞ্চল্যকর ঘটনা পরিষদে বিবৃত করেন তাহা যেমনই অদ্ভুত তেমনই স্বৈরাচারযুক্ত ও রহস্যময়। পদত্যাগ পত্রখানি আগে হইতেই লাটভবনে টাইপ করা হইয়া বিরাজ করিতেছিল ইহাতে এরূপ মনে করা কি অসঙ্গত হইবে যে বাঙ্গালার স্বায়ত্ব শাসনের অবসান পূর্ব্ব পরিকল্পিত হইয়াই অপেক্ষা করিতেছিল। হক-গভর্ণর আলোচনা একটা ছুতা মাত্র। যাহা হইক, বাঙ্গালার গভর্ণর স্যর জন হারবার্ট এই যে কাণ্ড করিলেন ইহার অবিমৃষ্যতার ফল কখনই কল্যাণ প্রসব করিবে না। বাঙ্গালার পূর্ব্বদ্বারে শত্রু আসিয়া হামা দিয়াছে এ সময়ে বাঙ্গালার জনমতকে ক্ষুব্ধ না করিয়া বরং তুষ্ট করিয়া রাখাই উচিত ছিল। যাহাদের কুপরামর্শে বা চক্রান্তের ফলেই এই কুকাণ্ড ঘটিয়া থাকুক না কেন, আমরা তাহাদিগকে বাঙ্গালার হিতৈষীবন্ধু বলিয়া কখনই এ দুঃসময়ে অভিনন্দিত করিতে পারিব না। যে জাতীয় গভর্ণমেন্টের অজুহাতে মন্ত্রি-মণ্ডলকে কৌশলে অপসারিত করা হইল, সেই জাতীয় গভর্ণমেন্টের প্রকৃত ছিন্নমস্তা মূর্ত্তি দেখিয়া বাঙ্গালার সন্তানেরা শিহরিয়া না ওঠে।

ভারতে লোকগণনার ফলাফল।

ভারতের ১৯৪১ সালের লোকগণনার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কলমে কয়েকটি হিসাব প্রকাশিত হইল :—

সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যা ৩৮ কোটি ৮৯ লক্ষ ৯৭ হাজার ৯ শত ৫৫; ১৯৩১ সালে লোকসংখ্যা ছিল ৩৩ কোটি ৮১ লক্ষ ১৯ হাজার ১ শত ৫৪।

প্রধান প্রধান প্রদেশগুলির লোকসংখ্যা নিম্নরূপ :—

প্রদেশ	১৯৪১	১৯৩১
মাদ্রাজ	৪৯,৩৪১,৮১০	৪৪,২০৫,২৪৩
বোম্বাই	২০,৮৪৯,৮৪০	১৭,৯৯২,০৫৩
বাঙ্গালা	৬০,৩০৬,৫২৫	৫০,১১৪,৫৪৮
যুক্তপ্রদেশ	৫৫,০২০,৬১৭	৪৮,৪০৮,৪৮২
পাঞ্জাব	২৮,৪১৮,৮১৯	২৩,৫৮০,৮৫২
বিহার	৩৬,৩৪০,১৫১	৩২,৩৬৭,৯০৯
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১৬,৮১৩,৫৮৪	১৫,৩২৩,০৫৮
আসাম	১০,২০৪,৭৩৩	৮,৬২২,৭৯১
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৩,০৩৮,০৬৭	২,৪২৫,০৭৬
উড়িষ্যা	৮,৭২৮,৫৪৪	৮,০২৫,৬৭১
সিন্ধু	৪,৫৩৫,০০৮	৩,৮৮৭,০৭০

প্রধান প্রধান সহরগুলির লোকসংখ্যা নিম্নরূপ :—

সহর	১৯৪১	১৯৩১
কলিকাতা	২,১০৮,৮৯১	১,১৬৩,৭৭১
বোম্বাই	১,৪৮৯,৮৮৩	১,১৬১,৩৮৩
মাদ্রাজ	৭৭৭,৪৮১	৬৪৭,২৩০
লাহোর	৬৭১,৬৫৯	৪২৯,৭৪৭
দিল্লী	৫২১,৮৪৯	৩৪৭,৫৩৯
করাচী	৩৫৯,৪৯২	২৪৭,৭৯১
হাওড়া	৩৭৯,২৯২	২২৪,৮৭৩
কাশী	২৬৩,১০০	২০৫,৩১৫
ঢাকা	২১৩,২১৮	১৩৮,৫১৮
কাণপুর	৪৮৭,৩২৪	২৪৩,৭৫৫
আমেদাবাদ	৫৯১,২৬৭	৩১০,০০০
লক্ষ্নৌ	৩৮৭,১৭৭	২৭৪,৬৫৯

শিক্ষিতের হার

সমগ্র ভারতে শিক্ষিতের হার ১৯৩১ সাল অপেক্ষা শতকরা ৭০ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে :—প্রদেশগুলির মধ্যে পাঞ্জাবেই শিক্ষিতের হার সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪১ সালের হিসাবে দেখা যায়, ঐ প্রদেশে বর্ত্তমানে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৩০ জন। যুক্তপ্রদেশে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৮ জন মাত্র। শিক্ষিতের সংখ্যা বোম্বাই প্রদেশেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ১৯৪১ সালের হিসাবানুসারে এই প্রদেশে পুরুষদের মধ্যে শতকরা ৩০জন শিক্ষিত এবং মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৯জন শিক্ষিতা। বোম্বাইয়ের পরেই বাঙ্গলার স্থান।

বাঙ্গলার পুরুষদের মধ্যে শতকরা ২৫জন এবং মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৭জন শিক্ষিতা অর্থাৎ এই প্রদেশে গড়পড়তা শতকরা ১৬জন শিক্ষিত।

১৯৪১ সালের হিসাবে দেখা গিয়াছে, ফরাসী অধিকৃত ভারতের মোট লোকসংখ্যা ৩২৩,২৯৪, তন্মধ্যে পুরুষ ১৬২,৯১৬ এবং নারী ১৬০,৩৭৯।

সিংহলে ভারতীয় শ্রমিক প্রেরণ

কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদ রটিয়াছিল যে, সিংহল সরকার সিংহলে রবার উৎপাদনের কার্য্যের নিমিত্ত ভারত সরকারের নিকট ২০ হাজার ভারতীয় শ্রমিক চাহিয়াছেন। আমরা সে সংবাদ যথাসময় পত্রস্থ করিয়া তাহার উপর আমাদের মন্তব্যও প্রকাশ করিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি সংবাদটার গোড়ায়ই গলদ। আসলে সিংহল সরকার শ্রমিক চাহেন নাই, ইহা খাস বৃটিশ সরকারেরই ফরমাইস। যুদ্ধের জন্য রবারের প্রয়োজন এই অজুহাত দেখাইয়া নাকি বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ভারত সরকারকে সিংহলে ভারতীয় শ্রমিক প্রেরণের তাগিদ দিয়াছেন। সেই তাগিদের চাপে পড়িয়াই নাকি ভারতের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাণ্ডিং ইমিগ্রেসন কমিটি কয়েকটি সর্ত্তে শ্রমিক প্রেরণে সম্মত হইয়াছেন এবং সেই সকল সর্ত্তে সিংহল গভর্ণমেণ্টকে রাজী করাইবার জন্য বৃটিশ কলোনিয়াল সচিবের দ্বারস্থ হইয়াছেন। সাধু! আমরা শুনা কথায় বিশ্বাস করিয়া গতবারে সিংহল সরকারের প্রতি এই শ্রমিক প্রেরণ উপলক্ষে যে সব অপ্রিয় উক্তি করিয়াছি, এক্ষণে সে জন্য দুঃখিত। রহস্য যে অবগুণ্ঠনের অন্তরালে এ ভাবে প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা আমাদের সহজ বুদ্ধিতে ধরা পড়ে নাই। এক্ষণে সিংহল সরকার কমিটির সর্ত্ত কয়টিতে রাজী হইলে হয়।

পরলোকে সত্যমূর্ত্তি

মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা সত্যমূর্ত্তি গত ২৭শে মার্চ্চ মধ্যরাত্রে মাদ্রাজ জেনারেল হাসপাতালে পরলোক গমন করিয়াছেন। যেরূপ অবস্থাধীনে থাকিয়া সত্যমূর্ত্তির এই মৃত্যু হইয়াছে তাহা দেশবাসীর পক্ষে বড়ই মর্ম্মান্তিক। গত বৎসর ভারতরক্ষা বিধানানুসারে অন্যান্য অনেক নেতার সহিত সত্যমূর্ত্তিও গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। গ্রেপ্তারের পূর্ব্ব হইতেই তাহার স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল ছিল না। আটক অবস্থায় তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন এবং তাঁহাকে মাদ্রাজ জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা উদ্বেগজনক বুঝিয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মুক্তি দেন; কিন্তু মুক্ত হইয়া তিনি আর স্বগৃহে ফিরিতে পারেন নাই, চিকিৎসার্থ তাঁহাকে উক্ত হাসপাতালেই থাকিতে হইল; কারণ অবস্থা দিন দিনই এরূপ খারাপের দিকে গেল যে, চিকিৎসকেরা কেহই তাঁহাকে হাসপাতাল পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন না। তারপর যাহা হইবার তাহাই হইল। সত্যমূর্ত্তির মত দেশের আরও অনেক নেতা এইরূপ ভাবে কারাজীবনের সহিতই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। দেশবাসীর শোকাহত বুকে তাহার প্রত্যেকটির বেদনাদায়ক স্মৃতি চিরদিন জাগরূক থাকিবে। সত্যমূর্ত্তি অকপট দেশহিতৈষী ছিলেন এবং চিরদিন কায়মনোবাক্যে দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন, আমরা বেদনাহত চিত্তে তাঁহার পরলোকগত আত্মার সদগতি কামনা ও তদীয় শোকাহত পরিজনবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

ভিক্ষুকের আশ্রয়

কলিকাতার নানাস্থানে বিমান আক্রমণের সময় আশ্রয় লইবার জন্য আশ্রয়-কক্ষ নির্ম্মিত হইয়াছে। অনেক স্থানেই সেই সব আশ্রয়-কক্ষগুলি ভিক্ষুকেরা বাসগৃহে পরিণত করিয়াছে। জানিতে পারা গেল যে কর্পোরেশনের কর্ম্মীরা ভিক্ষুকদের বিপড়িত করিয়া আশ্রয় কক্ষগুলি যাহাতে বিপদের সময় কার্য্যকরী ও পরিষ্কৃত রাখে সে বিষয়ে বাঙ্গালার সরকার বাহাদুর তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য পুলিশকে হুকুম দিয়াছেন।

মনে হইতেছে ভিক্ষুক-সমস্যার নূতনতর অবস্থার উদ্ভব হইল। ভিক্ষুক-সমস্যার সমাধানের জন্য কলিকাতা-কর্পোরেশন মাঝে মাঝে তোড়জোড় করিয়া থাকেন। নিরাশ্রয় ও নিরন্ন ভিক্ষুকেরা সভ্য জগতের কণ্টকস্বরূপ। কিন্তু তাহারাও মানুষ। কি করিয়া এই দুর্দ্দিনে সর্ব্বসাধারণ যখন ভিক্ষুকে পরিণত হইতে চলিতেছে, তখন ভিক্ষুক-সমস্যা তথা, তাহাদের আশ্রয়-সমস্যার সমাধান হয়, তাহা আমরা সাগ্রহে লক্ষ্য করিব।

অন্নপূর্ণা পূজা

মা অন্নপূর্ণা, তুমি অন্নদানে বাঙ্গালা পূর্ণ কর। আজ তোমার পূজার দিনে অশ্রুপূর্ণ নয়নে সেই ভিক্ষা করিতেছি। তুমি বাঙ্গালায় আসিয়াছ, মা?

চাউল-সংগ্রহ

'কিউ' করিয়া অর্থাৎ সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে চাউল সংগ্রহ করিতে হইতেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আবালবৃদ্ধ-বনিতা কলিকাতার সদর রাস্তায় দাঁড়াইয়া 'হা অন্ন হা অন্ন' করিতেছে। মা অন্নপূর্ণা, তুমি বাঙ্গালায় আগমন করিয়া স্বচক্ষে এ দৃশ্য দেখিয়া যাও। ভিখারীরা সারিতে দাঁড়াইয়া গৃহস্থকে বঞ্চিত করিতেছে, এ সংবাদও কাণে আসিতেছে। কিন্তু ভিখারীরও ক্ষুধা আছে—যতদিন বিশ্বজননী নিঃস্বকে কোলে স্থান না দেন ততদিন তাহার দেহ ধারণ করিবার জন্য অন্ন-বস্ত্র ও আশ্রয়েরও প্রয়োজন আছে।

দুর্ব্বৃত্তেরা সুযোগ লইয়া ভিখারীদের দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ করাইতেছে। পুনরায় সেই ভিখারী-লব্ধ কনট্রোল মূল্যের চাউল উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু দুর্ব্বৃত্তেরা ক্ষমার পাত্র না হইলেও দুর্ব্বৃত্ত শাসনের ও ঘৃণার পাত্র। কিন্তু আমাদের অন্ন-সমস্যা আরও গুরুতর না হইয়া পড়ে তাহাই ভাবিতেছি।

কলিকাতায় তণ্ডুল ও গম-আমদানী

দিন কয়েক হইল সংবাদপত্রে সচিত্র সংবাদ বাহির হইতেছে, কলিকাতায় গম ও তণ্ডুল আমদানী হইতেছে। সংবাদ পাঠে ও চিত্র দর্শনে মনে আশার সঞ্চার হওয়াই স্বাভাবিক।

কয়েকটি বদান্য ফার্ম্ম

কলিকাতার কয়েকটি বদান্য ফার্ম্মে তাঁহাদের কর্ম্মচারীদের জন্য চাউল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য সুলভ মূল্যে দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাঁহাদের নাম আমরা করিতে চাই না, কিন্তু শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ তাঁহারা পাইবেন।

ধূমকেতুর আবির্ভাব

নানাস্থানে নূতন ধূমকেতু দর্শন করিয়াছেন। যশোহরের অন্তর্গত বাগচরের মিঃ আর, জি, চন্দ্র এবং ধানবাদের মিঃ এস্, কে, ধর এই সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণা করিতেছেন। আমরা ধূমকেতু দেখি নাই। দেখিবার বাসনাও নাই।

বোম্বে 'র‍্যাশন কার্ড'

বোম্বে সহরে পরিবারস্থ লোকদের মাথা গুনতি কত চাউল ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য প্রয়োজন সেই অনুপাতে র‍্যাশন্ কার্ড সরবরাহ করা হইতেছে। সেই 'কার্ড' বা লিপি দেখাইলে খাদ্যদ্রব্য মিলিবে।

সংক্রান্তি

বারোমাসে বারোবার সংক্রান্তি; কিন্তু চৈত্র-সংক্রান্তি কেবল চৈত্র মাসের জন্য নহে, একটি বৎসরেরও সংক্রান্তি। পাঁড়াগায়ে দূর হইতে ঢাকের বাদ্য শোনা যাইতেছে। "পাটবান্" বা নীল পুজার "পাট" বা ঠাকুর বাড়ী বাড়ী আসিতেছেন। "বালায়া" আজিও শিবঠাকুরের নানা গান রচনা করিয়া নৃত্য সংযোগে বাড়ী বাড়ী গাহিয়া বেড়ান।

বাঙ্গালার এই প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ চড়ক পুজার কথা স্মরণ করিতেছি। বহুস্থানে সংক্রান্তির দিনে মেলা বসে। কোথাও তাহার নাম "গলইয়া" কোথাও বা "দেইল"।

মাস, ঋতু ও বর্ষ সংক্রান্তি, হে চৈত্র সংক্রান্তি, আমাদের সর্ব্ব আপদ অশুভ ও অকল্যাণ লইয়া সংক্রমণ কর। নববর্ষ আমাদের শুভ হউক, কল্যাণের হউক, ইহাই প্রার্থনা করিতেছি।

বৈদেশিক প্রসঙ্গ

মিঃ ইডেনের সফর

বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ এন্টনি ইডেন মার্কিন মুলুকের সফর শেষ করিয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে কি করিতে গিয়াছিলেন এবং ফলতঃ কতদূর কি করিয়া আসিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। ফিরিয়া আসিয়া তিনি পার্লামেন্টের কমন্স সভায় যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাও নিতান্ত মামুলি বিলাতী রাজনৈতিকতা-সুলভ। তাঁহার বিবৃতিতে একটা কথা প্রকাশ পাইয়াছে। মার্কিন সরকার ভিসি সরকারের সহিত বরাবর সে সম্পর্ক বজায় রাখিয়াছিলেন তাহার মুলে বস্তুতঃ সখ্যতার কোন সম্বন্ধ ছিল না। তাঁহার মুল উদ্দেশ্য ছিল ইয়ুরোপের সহিত যোগসূত্র ঠিক রাখা। সেই যোগসূত্র ঠিক ছিল বলিয়াই মার্কিন সরকার উত্তর আফ্রিকায় নিজেদের বহুলোক পাঠাইতে পারিয়াছিলেন এবং ঐ সকল লোক পরে মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর পথ উন্মুক্ত করার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিতে সমর্থ হইয়াছিল। যাহা হউক, মিঃ ইডেন মার্কিনমুলুকে গিয়া মিঃ চার্চ্চিলের একটা ভুল সংশোধন করিয়া আসিয়াছেন। মিঃ চার্চ্চিলের কোন সলা-পরামর্শের মধ্যেই বেচারা চীনের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। মিঃ ইডেন চীনকে দলে টানিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যুদ্ধোত্তর পৃথিবী সংগঠনের দায়িত্বভার যাহাদের উপরে ন্যস্ত থাকিবে সেই কর্ত্তৃদলের মধ্যে চীনও থাকিবে একজন তুল্য অংশীদার। চীনকে এই দলে টানার মধ্যে উদ্দেশ্য যাহাই থাক, এবং বর্ত্তমানে সে উদ্দেশ্য অপরিহার্য্য হইয়া পড়িলেও পরোক্ষে ইহাতে মিঃ চার্চ্চিলকে একটু লঙ্ঘন করা হইয়াছে। মিঃ চার্চ্চিল জবরদস্ত মনের মানুষ। মিঃ ইডেনের এই 'বাহুল্যতা' তিনি বরদাস্ত করিতে পারিবেন কি না, তাহাই এক বিষম সমস্যা। ইতঃপূর্ব্বে তিনি তাঁহার সহকারী মিঃ এট্‌লীর 'বাহুল্যতা' কিন্তু বরদাস্ত করিতে পারেন নাই।

সমর প্রসঙ্গ

চীন যুদ্ধে জাপানের ক্ষতি

চীনের সহিত যুদ্ধে জাপানের ১৯৪২ সালে ১৬৫৫৩৬ জন সৈন্য হতাহত ও বন্দী হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে নিহত হইয়াছে ৫৫৪১৫ জন, আহত হইয়াছে ১০৭৯৮২ জন এবং বন্দী হইয়াছে ৪১১৯ জন। এই বৎসরে জাপানীরা চীনে মোট ৪২ ডিভিসন সৈন্য, অর্থাৎ প্রায় ১৫০০০০০ সৈন্য যুদ্ধার্থ নিয়োজিত করিয়াছিল। চীনের জাতীয় সমর পরিষদ ১৯৪২ সালে চীনে জাপানের যে ক্ষতির পরিমাণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সহিত উপরোক্ত সংখ্যার কোন মিল নাই। কোনটা বিশ্বাস্ করিব? আজকাল যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট অনেক সংবাদই এইরূপ বাহির হইয়া থাকে।

এক্সিস পক্ষের নৌ-ক্ষতি

কিছুদিন পূর্ব্বে নৌ-বিভাগীয় পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী লর্ড ক্রাফিস ফিল্ড্ যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে এক্সিস পক্ষের নৌ-ক্ষতির এক হিসাব দিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ, এযাবৎ জার্ম্মাণীর ১ খানা ব্যাট্‌লসিপ, ১ খানা ক্ষুদে ব্যাট্‌লসিপ, ৪ খানা ক্রুজার, ৩৯ খানা ডেষ্ট্রয়ার ও টর্পেডো বোট ৪ খানা রেইডার এবং অন্যান্য ধরনের ৬৯ খানা যুদ্ধ জাহাজ খোয়া গিয়াছে। ইতালীর খোয়া গিয়াছে,—১০ খানা ক্রুজার, ৪৮ খানা ডেষ্ট্রয়ার ও টর্পেডো বোট এবং ৩৫ খানা অন্যান্য ধরণের যুদ্ধ জাহাজ। জাপানের খোয়া গিয়াছে—২ খানা ব্যাট্‌লশিপ, ৬ খানা বিমানবাহী জাহাজ, ১৭ খানা ক্রুজার এবং ৭০ খানা ডেষ্ট্রয়ার। এতদ্ব্যতীত জাপানের অন্যান্য ধরণের ক্ষুদে জাহাজ আরও অনেকগুলি খোয়া গিয়াছে, তাহার সঠিক হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই। জাপানের নৌ-ক্ষতির পরিমান যাহাই হউক; নৌ-শক্তিতে জাপান যে আজিও বিশেষ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে নাই, তাহা একেবারে অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয় না। কিছুদিন পূর্ব্বে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলিকাতা প্রচার কেন্দ্র হইতে এক বেতার বক্তৃতায় লেঃ মরিস যাহা বলিয়াছেন তাহাতেও তাই মনে হয়। তিনি বলিয়াছেন যে, জাপানের যে পরিমাণ নৌ-ক্ষতি হইয়াছে তাহা সহ্য করিবার মত শক্তিও তাহার আছে। অধিকন্তু আরও বৃহত্তর নৌ-বহর গড়িয়া তুলিবার মত উদ্যম ও শক্তি জাপান রাখে।

মার্কিনের বিমান-বল বৃদ্ধি

বিগত ১লা এপ্রিল তারিখে মার্কিন সমর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর মিঃ লুকসেন ঘোষণা করিয়াছেন যে, এই বৎসরের মধ্যেই মার্কিনে ৯০০০০ হাজার বিমানের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইবে। যুদ্ধরত জাতিগুলির প্রত্যেকেই যেভাবে বিমান-বল বাড়াইতেছে তাহাতে যুদ্ধের ভীষণতার সঙ্গে সঙ্গে অসামরিক সম্পত্তি ও লোকের জীবনলীলার আশঙ্কাও ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। ফলতঃ বিমান হানায় সামরিক ক্ষতি যত না হয় তাহার দশগুণ, কি তাহারও বেশী হয় অসামরিক সম্পত্তি ও জীবন হানি। যুদ্ধমান জাতিগুলির এবার সত্যই মহাকালের ভর হইয়াছে, না হইলে এমন মারণ-যজ্ঞে সকলেই মাতিয়া উঠিত না। আর কত দিনে মহাকাল তাঁহার ভর হইতে অবসর লইবেন আর কবেই বা পৃথিবীর লোকগুলি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে, তাহা বিধাতাই জানেন। চারিদিকের লক্ষণ দেখিয়া ও যুদ্ধমান জাতিগুলির নায়কদের ভাষণ শুনিয়া তাহা বুঝিবার বা তৎসম্বন্ধে কোনরূপ ক্ষীণ আশা পোষণ করিবার কিছুই দেখা যাইতেছে না।

হিটলারের ভুল

পরলোকগত এড্‌মিরাল দারলা মৃত্যুর পূর্ব্বে আমেরিকায় কস্‌মো-পলিটন পত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশার্থ পাঠাইয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও ফ্রান্স বিজেতা জার্ম্মাণীর সহিত যে সন্ধি করে, তাহাতে ফ্রান্সের লাভই হইয়াছে। কারণ বিজয়ী হিটলার ঐ সন্ধিপত্রে সহি করিয়াই প্রথম ভুল করিয়াছেন। ঐরূপ সন্ধিপত্রে ঐভাবে সহি না করিলে হিটলার ফরাসীর উত্তর আফ্রিকা এবং ডাকার প্রভৃতি ঘাঁটিগুলি দখল করিয়া লইতে পারিতেন, পরন্তু একবার যদি ঐ সমস্ত স্থান জার্ম্মাণীর দখলে যাইত, তাহা হইলে পরে তাহাকে ঐ সকল স্থান হইতে হটান অত্যন্ত কষ্টকর হইত ; এমন কি অসম্ভব হওয়াও আশ্চর্য্য ছিল না। দারলার এই সিদ্ধান্ত একেবারে জল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না, তবে হিটলারের ভুল বাস্তবিক কোথায় হইয়াছে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার সময় এখনো ঠিক আসিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। হিটলার ভুল যে করিয়াছেন তাহা যুদ্ধনীতি বিশারদ এবং অন্যান্য অনেক বিশেষজ্ঞেরও অভিমত, কিন্তু তাঁহারাও ভুলটা ঠিক কোথায় তাহার হদিস খুঁজিয়া পাইতেছেন না। কেহ কেহ বলেন, যুদ্ধটা বাধাইয়া তোলাই হিটলারের মস্ত বড় ভুল হইয়াছে, ইহার ফলেই গত যুদ্ধে ও কার্সাই-সন্ধির নাগপাশবন্ধনে যাহা সম্ভবপর হয় নাই, জার্ম্মাণীর সেই প্রকৃত সর্ব্বনাশ ঘটিবে।

যুদ্ধ ও রাশিয়া

১৯৩৯ সনের ৩রা সেপ্টেম্বর এই বিশ্বব্যাপী রক্তপাতের তিনটী বৎসর অতিক্রম হইয়া গিয়াছে। কবে যে এই যুদ্ধের অবসান হইয়া বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা হইবে, তাহা কেহই জানে না অথচ সেই বাঞ্ছিত দিনের জন্ত বিশ্বের প্রতিটী নর-নারী ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্ব বলিতেছি এই জন্ম যে, এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ জাতি নাই বলিলেই চলে।

অনেকে বলেন ১৯৪৪ সনের মধ্যেই একটা আপোষ মীমাংসা হইয়া যাইবে। কিন্তু কোন ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যে তাহারা এইরূপ মতবাদ প্রকাশ করেন তাহা বুঝা শক্ত। তাহাদের এই মতবাদ শুনিলে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—আপোষ হইবে কাহার সঙ্গে। যদি আপোষ করিতে হয় তবে সমগ্র ইউরোপ খণ্ডটাকে ফাসিস্ত শক্তির কবলে বিসর্জ্জন দিতে হয়, আর এশিয়ার পূর্ব্বাংশ ছাড়িয়া দিতে হয় জাপানীদের হস্তে। কিন্তু ইহা কি সম্ভব? কোন ইংরাজ কি স্থির মস্তিষ্কে ঐরূপ প্রস্তাব-নামায় সহী করিতে পারিবে? তা' পারে না এবং আপোষ হওয়াও সম্ভব নয়। এ ছাড়াও বিবাদমান শক্তিগুলি একের অস্তিত্ব অন্যের ধ্বংসের কারণ ধার্য্য করিয়াই এই রণদামামায় মাতিয়া উঠিয়াছে। তাই আপোষ হইয়া যুদ্ধ থামিবে না ইহা বলা যাইতে পারে। ধ্বংসলীলা আজও যথেচ্ছা চলিতেছে। যুদ্ধের অবস্থা তৎসহ দেশের অবস্থা ক্রমেই কুটিলগতি ধারণ করিতেছে। রাজ্যগুলি পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে। অসংখ্য নরনারীর রক্তে যুদ্ধক্ষেত্র রঞ্জিত।

রাশিয়াতে কোন জমিদার নাই, কলকারখানায় কোন ব্যক্তিগত মালিক নাই। প্রত্যেকেই মনে করে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিটী শিল্প-প্রতিষ্ঠানে তার নিজের অংশ রহিয়াছে। ঐ প্রতিষ্ঠানের একটু কিছু অনিষ্ট হইলে তাহা যেন তাহার নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের একটু ক্ষত হইল মনে করে, সুতরাং প্রত্যেকেই মনে করে যে, শত্রুর আক্রমণ হইতে সে তাহার নিজের জিনিষই রক্ষা করিতেছে। জার্ম্মানী যদি বর্ত্তমান যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সমর্থ হয় তবে আপনা হইতেই সোভিয়েট ইউনিয়নের শাসন ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবে। সাম্যবাদের আদর্শ যত বড় মহৎ হউক না কেন ক্রমে ক্রমে সেই নীতির অবসান হইতে থাকিবে আর সেই স্থান অধিকার করিতে থাকিবে শ্রেণী স্বার্থের মনোভাব।

যুদ্ধ-পরিস্থিতি

সমগ্রভাবে সামরিক পরিস্থিতির দিকে চাহিলে বিষয়টা বড়ই গোলমেলে হইয়া পড়ে ; কোন সিদ্ধান্তেই পৌঁছান যায় না। কিন্তু খণ্ড খণ্ড রিপোর্ট গুলি পৃথক পৃথক ভাবে পাঠ করিলে অবস্থা মিত্রপক্ষের ক্রমশঃ অনুকূল বলিয়াই মনে হয়। কি রুষ সীমান্ত, কি উত্তর আফ্রিকা সীমান্ত, কি প্রশান্ত মহাসাগরাঞ্চল কোন দিকেই এক্সিস পক্ষ কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, পরন্তু সকল দিকেই যেন তাহাদের দুর্দ্দান্ত সমরশক্তিতে অবসাদ দেখা দিয়াছে। খণ্ড রিপোর্টগুলি পড়িয়া অনেক সময় এরূপও মনে হয় যে, এক্সিস শক্তি আর বেশীদিন টিকিয়া থাকিতে পারিবে না, অচিরেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়া চুরমার হইয়া যাইবে। এই সব খণ্ড রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া মিত্রপক্ষীয় নেতারা যুদ্ধোত্তরকালের জন্ত যে সব মুখরোচক পরিকল্পনা মাঝে মাঝে সংবাদ পত্রের মারফতে পরিবেশন করিতেছেন, সে-গুলি পাঠ করিয়াও এক্সিস পক্ষের পরাজয়ে আর কোন সন্দেহই মনের কোণে স্থান পায় না। মার্কিণ কর্ত্তৃপক্ষ ত' স্পষ্টই ঘোষণা করিয়াছেন যে, জার্ম্মাণী ও জাপানের দুর্জ্জয় যুদ্ধশক্তির একেবারে বিলোপ সাধন না করিয়া এবং এই উভয় পররাজ্যগ্রাসী আসুরিক মনোবৃত্তিশীল জাতিদ্বয়কে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র

করতঃ বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণে বাধ্য না করিয়া তাহারা কিছুতেই তাঁদের অসি কোষবদ্ধ করিবেন না। কেহ বা আস্ফালন করিয়া এমন মনোভাবও প্রকাশ করিতেছেন যে, যুদ্ধের পর জার্ম্মাণীর শিল্প, বাণিজ্য ও উৎপাদন শক্তি একেবারে পঙ্গু করিয়া দিতে হইবে এবং সমগ্র পৃথিবীর বর্ত্তমান এই অনর্থের মূল দুর্বৃত্ত হিটলারকে তাহার কৃত মহাপাপের শাস্তিস্বরূপ গুলি করিয়া মারিতে হইবে। অবশ্য যদি হিটলার স্বয়ং এই সময়ের পূর্ব্বে আত্মহত্যা করিয়া না বসেন। বক্তার মনে হিটলারের আত্মহত্যার সম্ভাবনাও স্থান পাইয়াছে দেখিতেছি। এইরূপ আরও অনেক আজগুবি মন্তব্য ও পরিকল্পনা মিত্রপক্ষের অদূর ভবিষ্যতের বিজয়বার্ত্তা বহন করিয়া সংবাদপত্র পাঠকদের চিত্তে ভরসার দানাবাঁধাইবার চেষ্টা করিতেছে। আবার মাঝে মাঝে এমনও দু'একটা হতাশাব্যঞ্জক দীর্ঘশ্বাস ইহার সঙ্গে মিশিয়া আবহাওয়াটাকে ভারী করিয়া তুলিতেছে যে, যাহাতে কোন আশায়ও মন বসিতে পারিতেছে না। যাক, যাহা হইবার তাহা ত' হইবেই। অস্ত্রযুদ্ধ অপেক্ষা এখন জীবিকাযুদ্ধই তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং সে ভাবনায় ভীত হইবার আর অবকাশ নাই। আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণে মিত্রপক্ষেরই বিজয় কামনা করি, যদিও মিত্রপক্ষের বিঘোষিত যুদ্ধের উদ্দেশ্য, নীতি ও যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা আমাদের মোটেই মনঃপুত নহে।

রুষ সীমান্ত—রুষ সীমান্তের যুদ্ধটা সারা শীতকালভোর যেরূপ একটানা চলিয়াছিল এখন আর তাহা নাই, দোটানা হইয়া উঠিয়াছে। তবে জার্ম্মাণদের গ্রীষ্মকালীন অভিযান পুরাদমে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যদি জার্ম্মাণদের বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ গ্রীষ্মকালীন অভিযান বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে জার্ম্মাণীর আর কোন আশা নাই, ইহাও নিশ্চিত। ইউক্রেন অঞ্চলের দিকে জার্ম্মাণেরা প্রচুর সৈন্য ও সমরোপকরণ সঞ্চিত করিয়া রুষদিগকে আক্রমণ করিতেছে বটে, কিন্তু সে আক্রমণও পূর্ব্বের তুলনায় মোটেই উল্লেখযোগ্য নহে। তবে রুষপক্ষ এই আক্রমণকে একটা ভীষণতম আক্রমণের পূর্ব্বাভাস বলিয়া মনে করিতেছে, রুষ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের ধারণা যে, মিত্রপক্ষ কর্ত্তৃক ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি সম্বন্ধে যে জল্পনা কল্পনা বহুদিন হইতে চলিতেছে তাহা সম্ভবপর হইয়া উঠিবার আগেই জার্ম্মাণেরা দক্ষিণ রণাঙ্গনে এমন তীব্রতর আঘাত হানিবে, যাহার বেগ সম্বরণ করিতে সোভিয়েট শক্তিকে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে। রুষ সীমান্তের অন্যান্য রণক্ষেত্রে সোভিয়েট সেনা কোথাও জার্ম্মাণদিগকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে, কোথায়ও বা অল্পাধিক হঠাইয়া দিয়াছে।

এযাবৎ রুষ সীমান্তের যুদ্ধে ইতালীর বাহিনীর যে ক্ষতির পরিমান রোমে সরকারী ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যায়, রুষ রণাঙ্গনের যুদ্ধে ইতালীর প্রায় ৬০,০০০ হাজার সৈন্য হতাহত ও ৪০,০০০ হাজার সৈন্য নিখোঁজ হইয়াছে। অর্থাৎ মোট ১ লক্ষ সৈন্য খোয়া গিয়াছে।

তিউনিস সীমান্ত—তিউনিসিয়ায় মিত্রপক্ষ ক্রমেই সাফল্য অর্জ্জন করিতেছে; সুতরাং তিউনিসিয়ার যুদ্ধ মিত্র পক্ষের অনুকূল বলিয়াই মনে হয়। এক্সিস পক্ষ তিউনিসিয়া তথা আফ্রিকা ভূখণ্ড হইতে একেবারেই সরিয়া পড়িবার মতলব করিয়াছে বলিয়াও সংবাদ রটিয়াছে। বৃটিশ অষ্টম বাহিনী এলহামা দখল করিবার পর, পূর্ব্ব দিকে গাবেস বন্দর আয়ত্তে আনে এবং উপকূল হইতে উত্তরে গাবেস হইতে ২৫ মাইল দূরবর্ত্তী উদ্রেক নামক স্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। এই স্থান পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া জেনারেল মণ্টগোমারি অষ্টম বাহিনীকে পুনর্গঠিত করিয়া শক্তিশালী করিয়া লন। ইহাতে তাহার কিছু সময় লাগে। অতঃপর তিনি পুনরায় আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন এবং শত্রুর রক্ষাব্যূহের দুই একটি স্থানে কীলক প্রবেশ করাইয়া তাহা ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যুদ্ধ খুব জোর চলিতেছে। মার্কিন বাহিনীও অন্যদিক হইতে এক্সিস বাহিনীকে বেশ চাপিয়া ধরিয়াছে। তাহারা মধ্য তিউনিসিয়ায় ম্যাকনাসির ৮ মাইল দূরবর্ত্তী জেবেল মেজিলা এলাকা হইতে এক্সিস সেনাকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিয়াছে। বর্ত্তমানে তাহারা এলগুয়েত্তার অঞ্চলে প্রচণ্ড আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। মোটের উপর যুদ্ধের খবর হইতে মনে হয় তিউনিসিয়ার যুদ্ধ আর অল্প কাল মধ্যেই শেষ হইবে। যাহা হউক, কেহ কেহ কিন্তু এরূপ অনুমানও করিতেছেন যে, তিউনিসিয়ায় এক্সিস পক্ষের এই যে যুদ্ধাভিনয় ইহা নিছক সামরিক কূট দুরভিসন্ধি মাত্র। মিত্র পক্ষ অনতি বিলম্বে ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গণ সৃষ্টি করিয়া জার্ম্মানীর রুষিয়া বিজয়ে যাহাতে বিঘ্ন ঘটাইতে না পারে, তাহারই উদ্দেশ্যে দুর্জ্জয় রোমেলের উপর তিউনিসিয়ার এই যুদ্ধ ভার ন্যস্ত হইয়াছে। এস্থানে রোমেলের উদ্দেশ্য হইতেছে মিত্র পক্ষের শক্তির বহুলাংশকে আটকাইয়া রাখা, তা ছাড়া আর কিছুই নহে।

প্রশান্ত সাগরাঞ্চল—প্রশান্ত সাগরাঞ্চলে যুদ্ধের ঝটিকা থামিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। কোন পক্ষেই আর বিশেষ কোন কর্ম্মতৎপরতা নাই; কেবল মাঝে মাঝে টুকটাক দু'একটাছোট খাট টহলদারী সংঘর্ষ। অথচ অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড হইতে মাঝে মাঝে জাপ-ভীতির হুলিয়ারীর খবর বাহির হইতেছে। এত ঘা খাইয়াও জাপানের শক্তি নাকি একটুও দমে নাই। এখনও বিমান ও নৌ-বলে জাপান দুর্জ্জয় হইয়াই রহিয়াছে এবং যাহা তাহার ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ করিবার শক্তিও সে রাখে।

উত্তর-ব্রহ্ম সীমান্ত—ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তেও প্রকৃত পক্ষে তেমন কোন যুদ্ধ নাই। বৃটিশ পক্ষ হইতে কিছু দিন পূর্ব্বে আরাকানের পথে ব্রহ্ম অভিযান আরম্ভ করা হইয়াছিল। মায়ু নদীর তীরে যাইয়াই সে যুদ্ধের আয়ু ফুরাইয়াছে। জাপানীরা এই স্থানে চুপিসারে অগ্রসর হইয়া বৃটিশ সেনাকে প্রায় তিন দিক হইতে বেষ্টিত করিয়া ফেলিবার উপক্রম করে, সুচতুর বৃটিশ সেনা ভাব বুঝিয়াই অগ্রগমন হইতে বিরত হইয়া বুদ্ধিমানের মত আপনাদের পূর্ব্বের ঘাঁটিতে ফিরিয়া আসিয়াছে। আরাকান অভিযান যখন আরম্ভ হয়, তখন রটিয়াছিল যে, ইহাই বৃটিশের ব্রহ্ম পুনরধিকারের অভিযান আরম্ভ হইল; কিন্তু এখন কর্ত্তৃপক্ষ বলিতেছেন যে ব্রহ্ম পুনরধিকারের উদ্দেশ্যে বস্তুতঃ উহা কথনও পরিকল্পিত হয় নাই। চীনের উপর জাপানীদের চাপ কমাইবার উদ্দেশ্যেই উহা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল না হইলেও আংশিক হইয়াছে। যাক, বর্ষার মধ্যে আর ব্রহ্ম অভিযানের আশা নাই। জাপানও যে অদূর ভবিষ্যতে এই সীমান্তে কোনরূপ বৃহৎ আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে তেমনও মনে হয় না। চট্টগ্রাম, ফেণী এবং দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের কোন একটি অগ্রবর্ত্তী বিমান ঘাটির উপর জাপানীরা বার বার বিমান আক্রমণ করিয়া বোমাবৃষ্টি করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না। বৃটিশের ব্রহ্মাভিযানে বিস্ময়োৎপাদন অথবা ভারত আক্রমণের বিঘ্নাপসারণ। যাহাই হউক, আজ না হয় কাল প্রকাশ পাইবেই। এ দিকে বৃটিশ পক্ষ হইতেও বিমান হানার প্রত্যুত্তর রীতিমত চলিয়াছে। বৃটিশ বোমারুর ঝাঁক প্রায়শঃই গিয়া ব্রহ্মের জাপানী ঘাঁটিগুলির উপর আক্রমণ করিয়া সবিশেষ ক্ষতিসাধন করিয়া আসিতেছে। মোটের উপর ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে এখন খেচর যুদ্ধ চলিয়াছে। খেচর যুদ্ধে বড়জোর দু'একটা সামরিক ঘাঁটি ধ্বংস হইতে পারে ইহার বেশী আর যাহা ক্ষতি হইবে তাহার প্রায় সবটুকুর ফলভাগী হইবে বেসামরিক নিরীহ অধিবাসীরা। তাহার দ্বারা দেশ ময় অশান্তি সৃষ্টি করা চলিবে কিন্তু দেশ জয় হইবে না।

চৈত্র স্মৃতি

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস, এম-এ, ব্যারিষ্টার এট্-ল

পল্লব বৃন্তের চিহ্ন চ্যুত পত্র রাখি' বৃক্ষ শাখে,
বিদায়ের ক্ষণে,
আসক্তির রক্ত-রাখী বেঁধে দিল বাসন্তী বৈশাখে
কঠিন বন্ধনে।
কে এল ললিত লতা আকুল-কুন্তলে,
সলজ্জ আরক্ত-মুখে স্খলিত অঞ্চলে,
দুলাইল ছায়াখানি, মায়াবিনী, বিলোল-হিল্লোলে
দক্ষিণ-পবনে?

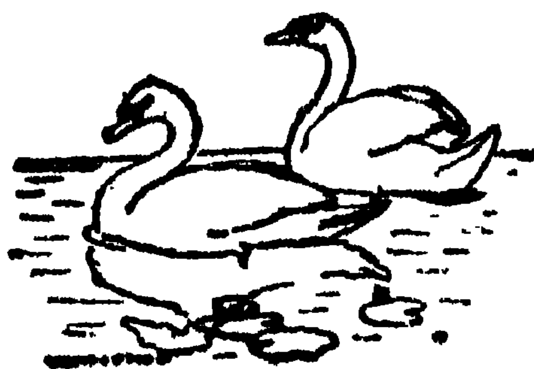
পুরাতন স্মৃতি লয়ে নব-বর্ষ বিপুল গৌরবে
এল পূর্ব্ব দ্বারে;
বকুল মল্লিকা চম্পা সকৌতুকে যৌবন সৌরভে
বন্দিল তাহারে।
রক্ত করবীর গুচ্ছ রোমাঞ্চিত করে,
সুস্মিত স্বাগত বাণী নিরুক্ত অক্ষরে
লিখিল চিকণ পত্রে, অবিশ্রান্ত কুহু কলস্বরে
পঞ্চমে ঝঙ্কারে।

রৌদ্র শুভ্র নব-বর্ষ পুনর্ব্বার শ্যামা-ধরণীরে
করে প্রদক্ষিণ,
উচ্চারিল কম্বুকণ্ঠে শান্তি-মন্ত্র জলদ-গম্ভীরে
হানি' রুদ্রবীণ।
প্রসন্ন মধুর শান্ত সৌম্য মনোহর,
অন্তরে শাশ্বত বাণী বহে নিরন্তর;
পুরাতন জীর্ণ ধরা কিশলয়ে সাজিল সুন্দর
উন্মুখ নবীন।

চৈত্রের বিষণ্ণ স্মৃতি শূন্যক্ষেত্রে সধূম নিঃশ্বাসে,
ঈশানের কোণে,
পুঞ্জ পুঞ্জীভূত মেঘে প্রত্যাসন্ন ঝঞ্ঝার আভাসে
বিদ্যুৎ স্ফুরণে!
দিক হ'তে দিগন্তরে অম্বরে চমকে
গুরু গুরু মেঘ-মন্দ্রে ডম্বরু গমকে,
প্রকম্পিত ধ্বনি-যন্ত্রে অকস্মাৎ ঝলকে ঝমকে
স্পন্দনে ক্রন্দনে।

শ্যাম শস্য সম্ভাবনা অঙ্কুরিত নব ধান্য বীজে
বৈশাখী বর্ষায়,
দগ্ধ মৃত্তিকার গর্ভে মহাকাল জন্ম নেবে নিজে
সৃজন লীলায়।
বিশ্বের অনন্ত ক্ষুধা, আকণ্ঠ পিপাসা,
হে বৈশাখ, নবযুগ বিবর্ত্তন আশা,
কালবৈশাখীর নৃত্যে হে প্রমত্ত, ভাঙ্গো ভাঙ্গো বাসা
ঝটিকা শিলায়।

যে সত্য শাশ্বত নিত্য চিরন্তন সর্ব্বকাল-ব্যাপী
সে সত্য জাগুক্,
যে গর্ব্বিত অহঙ্কার ফণীসম উদ্ধত অদ্যাপি
সে গর্ব্ব ভাঙ্গুক্।
দুর্গতের তরে আনো জাগ্রত কল্যাণ,
রবাব বীণায় হানো সুক্তি সাম গান,
রুদ্রের করাল-নৃত্য হে বৈশাখ, কর' অবসান,
আনো সত্য যুগ।





"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"



জ্যৈষ্ঠ—১৩৫০

৩০শ বর্ষ ২য় খণ্ড—৬ষ্ঠ সংখ্যা

গৌরপদাবলী

শ্রীকালিদাস রায়

শ্রীগৌরাঙ্গলীলার পদাবলী বঙ্গসাহিত্যের একটি অপূর্ব্ব সম্পদ। এই পদাবলী যাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বাসুদেব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, নরহরি সরকার ঠাকুর, মুরারি গুপ্ত, বংশীবদন, শিবানন্দ সেন, রামানন্দ বসু, নয়নানন্দ ও অনন্তদাস শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। আর গোবিন্দদাস, বলরামদাস, জ্ঞানদাস, লোচনদাস, ঘনশ্যাম, নরোত্তম, নরহরি চক্রবর্ত্তী ইত্যাদি কবিগণ মানস-নয়নে শ্রীচৈতন্যলীলা উপভোগ করিয়াছিলেন। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিগণের পদই কাব্যাংশে উৎকৃষ্টতর হইয়াছে।

গৌরলীলার কবিগণ যে ভাবটিকে মনে রাখিয়া গৌর-লীলার বর্ণনা করিতেন, বলরামের নিম্নলিখিত পদে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে—

কৈছন তুয়া প্রেমা কৈছন মধুরিমা কৈছন সুখে তুহুঁ ভোর।
এ তিন বাঞ্ছিত ধন ব্রজে নহিল পূরণ কি কহব না পাইয়া ওর।
ভাবিয়া দেখিলুঁ মনে তোহারি স্বরূপ বিনে এ সুখসম্পদ কভু নয়।
তুয়া ভাবকান্তি ধরি তুয়া প্রেম-গুরু করি নদীয়াতে করিব উদয়।

স্বরূপ দামোদরই এই তত্ত্বের প্রচারক।*

বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ শ্রীচৈতন্যকে রাধাভাবে-বিভাবিত পরম ভক্ত ও কৃষ্ণাবতার (ভক্তাবতার তাদাত্ম্যাপন্নতয়াবতীর্ণঃ বা ভক্তরূপেণ অবতীর্ণঃ যতিবেশঃ হরিঃ) বলিয়া মনে করিতেন এবং শ্রীচৈতন্যের মহাভাব-বিলাসকে অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাত্মক উপাসনা সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষে বৈধী ভক্তির পথে উপাস্য ছিলেন। ইঁহারা শ্রীচৈতন্যের প্রবর্ত্তিত রাগানুগা ভক্তিপথের উপাসনা প্রচার করেন। ইঁহাদের চিন্তা ও বক্তব্য সংস্কৃত ভাষাতেই উপনিবদ্ধ। কেবল কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইঁহাদের উপদেশমত ঐ তত্ত্ব বঙ্গভাষায় বিবৃত করেন। বঙ্গের বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যথা, মুরারিগুপ্ত, শিবানন্দসেন, কবিকর্ণপূর, নরহরি সরকার ঠাকুর, বাসুঘোষ, লোচনদাস ইত্যাদি শ্রীচৈতন্যকেই শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণভাবাশ্রিত বিগ্রহেরই রাগানুগা ভক্তির পথে উপাসনা গৌড়দেশে প্রচার করেন। শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনেই তাঁহারা ব্রজলীলার পুনরভিনয় দেখিয়াছেন। ইঁহাদের লক্ষ্য প্রধানতঃ গৌড়দেশ। সেজন্য ইঁহারা প্রধানতঃ বাংলা ভাষাতেই ইঁহাদের বক্তব্য প্রচার করিয়াছেন। মুরারি গুপ্ত ও কবিকর্ণপূর সংস্কৃতে গ্রন্থাদি লিখিলেও বাংলাতেও পদাবলী রচনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের উপাসনার প্রবর্ত্তনা প্রধানতঃ বৈদ্যজাতীয় সাধকদের কীর্ত্তি। ইহাই গৌর-পারম্যবাদ।

---

* চণ্ডীদাসের কোন কোন পদের অংশবিশেষকে এই দিক হইতে ব্যাখ্যা করা হয়—

দেখিতে দেখিতে না চিনিয়ে কালা কিংবা গোরা।

এই চরণকে গৌর আগমনের অভিসূচক মনে করা হয়। চণ্ডীদাসের—"সাগরে যাইব কামনা করিব সাধিব মনের সাধা। মরিয়া হইব শ্রীনন্দনন্দন তোমারে করিব রাধা।" এই পদটি রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীগৌরাঙ্গরূপ ধারণের প্রতিশ্রুতি বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়।

ফিরে ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া।
দেশে দেশে ফিরিব আমি যোগিনী হইয়া॥
কালো মাণিকের মালা তুলে নিব গলে।
কানুগুণ যশ কাণে পরিব কুণ্ডলে। ইত্যাদি

পদকে সন্ন্যাসিরূপে পুনরাগমনের সংকল্প বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়।

আজু কেগো মুরলী বাজায়।
এতো কভু নহে শ্যামরায়। ইত্যাদি পদের শেষ দুই চরণ—চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে। এরূপ হইবে কোন্ দেশে।

ইহা হইতে মনে হয়—চণ্ডীদাস গৌরাঙ্গের আগে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রকারান্তরে গৌর অবতারের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য—এ পদকে কেহ বড়ু চণ্ডীদাসের বলিয়া মনে করে না। বোধ হয় ইহা শ্রীগৌরাঙ্গ-সম্পর্কীয় অবতারবাদের প্রচার-বিভাগের কার্য্য—(propaganda)

অলৌকিক শক্তি ও মহাভাববিলাস দর্শন করিয়াই ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যকে কৃষ্ণাবতার বলিয়াই চিনিতে পারেন। তাঁহারা তাঁহাদের এই উপলব্ধির সমর্থন পাইয়াছিলেন ভাগবতের দুইটি শ্লোকে। সেই শ্লোক দুইটি এই—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ঃ হ্যস্য গৃহ্নতোহনুযুগং তনুঃ।
শুক্লোরক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

ভাগবত দ্বাপরে লিখিত, অতএব পীতবর্ণ কলিযুগের।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

বলা বাহুল্য, ভক্তগণ তাঁহাদের ভাববিশ্বাসের অনুরূপ এই শ্লোকের ব্যাখ্যাই করিয়া লইয়াছিলেন। বর্ণের কথাটা তত বড় নয়। সংকীর্ত্তন কথাটায় সার্থকতা আছে।

গৌর-পারম্যবাদের সাধকগণ শ্রীচৈতন্যকে নাগররূপে দেখিয়াছেন। গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসবেশ ইঁহাদের রুচিকর হয় নাই। তাঁহাদের মানসনেত্রে—

(১) চাঁচর চুলে চাঁপার ফুলে চারু কবরী চলে।
ভাল ঝলমল সুরুজ লুকায় তায় অলকা কোলে।

—সদানন্দ

(২) শ্রুতিপল্লবমূলে কনক কুণ্ডল দুলে পাকা বিম্ব জিনিয়া অধর।
চাঁচরচিকুর মাথে চম্পককলিকা তাতে যুবতীর মন-মধুকর॥
করিবর কর জিনি বাহুযুগ সুবলনি অঙ্গদবলয়া শোভে তায়।
অরুণ বসন সাজে চরণে নূপুর বাজে বাসু ঘোষ গোরাগুণ গায়।

(৩) অপরূপ গোরা নটরাজ।
প্রকট প্রেমবিনোদ নব নাগর বিহরই নবদ্বীপমাঝ।
করিবর জিনি বাহুযুগ সুবলনি দোলায়ি গজমোতিহার।
সুমেরুশেখর উপর যৈছন বহই সুরধুনি ধার।

—গোবিন্দ দাস

(৪) উরস পরিসর নানামণিহার মকর কুণ্ডল কাণে।
মধুর হাসনি তেরছ চাহনি হানয়ে মরম বাণে।
বিনোদবন্ধন দুলিছে লোটন মল্লিকা মালতীবেড়া।
নদীয়া নগরে নাগরীগণের ধৈরজধরম ছাড়া।

—রায়শেখর

ধবলপাটের জোড় পরেছে রাঙা রাঙা পাড় দিয়েছে
চরণ উপর দুলি যাইছে কোঁচা।
বাঁকমল সোনার নূপুর বাজাইছে মধুর মধুর
রূপ দেখিতে ভুবন মুরুছা।

—লোচন

প্রবোধানন্দ সরস্বতীও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে চৈতন্যের ঐ রূপেরই ধ্যান করিয়াছেন—

কোহয়ং পট্টধটী বিরাজিতকটীদেশঃ করে কঙ্কণম্
হারং বক্ষসি কুণ্ডলং শ্রবণয়োর্বিভ্রৎ পদে নূপুরম্।
ঊর্দ্ধীকৃত্য নিবদ্ধকুন্তলভরপ্রোৎফুল্লমল্লীস্রগা
পীড়ঃ ক্রীড়তি গৌরনাগরবরোনৃত্যন্নিজৈর্নামভিঃ॥

বৃন্দাবনদাস এই গৌরনাগর ভাবের বিরোধী ছিলেন। তিনিও গৌরাঙ্গের উপাসক ছিলেন—কিন্তু তাঁহার এই রূপ কল্পিত রূপের নয়, বা শুধু রূপেরই। তিনি ভাগবতে বিবৃত শ্রীকৃষ্ণলীলার সহিত মিলাইয়া গৌরাঙ্গলীলা বর্ণনা করেন। সে জন্য তাঁহার গ্রন্থের নাম দিয়াছেন ভাগবত। তিনি শ্রীচৈতন্যে কেবল শ্রীকৃষ্ণ নয়, বিষ্ণুর সকল অবতারকেই প্রতিবিম্বিত দেখিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপ-লীলায় কৃষ্ণভাবে বিভাবিত হইয়া রাধা-রাধা বলিয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইতেন—নীলাচলে তিনি রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া 'হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ' বলিয়া দিব্যোন্মাদ প্রাপ্ত হইতেন। এক ভাব হইতে অন্যভাবে পরিণতি ইহা অস্বাভাবিক নহে। বিদ্যাপতির নিম্নলিখিত পদটি এই প্রসঙ্গে স্মর্ত্তব্য—

অনুখণ মাধবমাধব সোঙরিতে সুন্দরি ভেলি মাধাই।
ও নিজ ভাব সভাবহি বিছুরল আপনগুণ লুবধাই।
অনুখণ রাধা রাধা রটতহি আধা আধা কহু বাণি।
রাধা সঙে যব পুন তহি মাধব মাধব সঙে যব রাধা।

রাধার বিরহ-জীবনের যে ভাবোন্মাদ বিদ্যাপতির দ্বারা কল্পিত, তাহারই অনুরূপ ভাবোন্মাদ শ্রীচৈতন্যের জীবনে পরিস্ফুর্ত্ত। অবশ্য বৈষ্ণব সাহিত্যের বিশেষজ্ঞেরা বলেন—রায় রামানন্দের সঙ্গে তত্ত্ববিচারের পর হইতে শ্রীচৈতন্যের জীবনে কৃষ্ণভাবের স্থলে রাধাভাবের উন্মেষ হয়। যে জন্যই হউক, শ্রীচৈতন্যের রাধাভাব ও কৃষ্ণভাব দুই ভাবেরই দিব্যাবেশ লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় স্বরূপদামোদর গোস্বামী শ্রীচৈতন্যকে রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত অবতার বলিয়াই প্রচার করিয়াছেন। এই তত্ত্ব বৃন্দাবনের গোস্বামী প্রভুরাও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই তত্ত্বের অবতারণা ও ব্যাখ্যা আছে। এই প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপ গোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত।

অন্য যে কেহ তাহা জানেন—তিনি স্বরূপ দামোদরের কড়চা হইতেই জানিয়াছেন। স্বরূপ গোসাঞির সিদ্ধান্ত শ্রীচৈতন্যের শেষজীবনে অথবা তিরোধানের পর প্রচারিত হইয়াছিল।

গৌরাঙ্গ-লীলা ব্রজ-লীলারই অনুপূরক। শ্রীচৈতন্যরূপেই রাধা ও কৃষ্ণের একদেহে মিলন। 'তনু তনু মেলি হোই এক ঠাম'। ব্রজে অনুপভুক্ত রসাস্বাদনের জন্য ও রাধাপ্রেমের মহিমাপ্রচারের জন্য শ্রীচৈতন্যরূপে একদেহে কৃষ্ণ-রাধা অবতীর্ণ। (নতুবা, 'রাধার মহিমা প্রেমরস-সীমা জগতে জানাত কে'?) ইহাই গৌর-লীলার অন্তরঙ্গ বার্ত্তা। বহিরঙ্গ বার্ত্তা জগতে প্রেম-বিতরণ—

"কলি-কবলিত কলুষ-জড়িত দেখিয়া জীবের দুখ।
করম উদয় হইয়া সদয় ছাড়িয়া গোকুল সুখ।"
'বাহিরে জীব উদ্ধারণ অন্তরে রস আস্বাদন ব্রজবাসী-সখাসখী সঙ্গে।

ব্রজের সখাসখীরাই শ্রীচৈতন্যের অনুচর সহচররূপে অবতীর্ণ। গৌর-লীলার কবিগণ এই তথ্যটিকে পদরচনায় বিস্মৃত হন নাই। বহু পদে এই কথাটিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলা হইয়াছে।

গৌর-লীলার কতকগুলি পদ কেবল শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ-বর্ণনা, কতকগুলি তাঁহার মহিমার বর্ণনা, কতকগুলি দেবদেবী স্তবের অনুকরণে স্তবমাত্র। সাধক কবিগণ পদের উপসংহারে চরণাশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছেন—অথবা করুণা-সিন্ধুর কৃপাবিন্দু লাভ না করিয়া আপনাদের ধিক্কৃত করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ লোচনের একটি পদ তুলি—

অবতারসার গোরা অবতার কেন না চিনিলি তারে।
করি নীরে বাস গেল না পিয়াস আপন করম ফেরে।
কণ্টকের তরু সেবিলি সদাই অমৃত ফলের আশে।
প্রেমকল্পতরু গৌরাঙ্গ আমার তাহারে ভাবিলি বিষে।
সৌরভের আশে পলাশ শুঁকিলি নাসায় পশিল কীট।
ইক্ষুদণ্ড বলি কাঠ চুষিলি কেমনে লাগিবে মিঠ।
হার বলিয়া গলায় পরিলি শমন কিঙ্কর সাপ।
শীতল বলিয়া আগুনি পোহালি পাইলি বজর তাপ।
সংসার ভাবিলি গোরা না ভজিয়া না শুনিলি মোর কথা।
ইহপরকাল উভয় খোয়ালি খাইলি আপন মাথা।

শ্রীগৌরাঙ্গকে যে চিনিল না তাহার মত অভাগ্য কে আছে? অনেক পদে সেই অভাজনদের জন্য আক্ষেপ প্রকাশ হইয়াছে—

ভব তরিবারে হরিনাম মন্ত্র ভেলা করি
আপনি গৌরাঙ্গ করে পার।
তবু যে ডুবিয়া মরে কেবা উদ্ধারিবে তারে
পরমানন্দের পরিহার।

ভক্ত কবিরা বলিয়াছেন—গৌরাঙ্গভজনই সর্ব্বজ্ঞানের চরম সিদ্ধি—

"যেবা চারিবেদ ষড়দর্শন পড়িয়াছে, সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে।
কিবা তার অধ্যয়ন লোচন বিহীন যেন দরপণে অন্ধে কিবা কাজে।
বেদ বিদ্যা দুই কিছুই না জানত সে যদি গৌরাঙ্গ জানে সার।
পরমানন্দ ভনে সেই সে সকল জানে সর্ব্বসিদ্ধি করতলে তার॥"

শ্রীচৈতন্যকে যে মানে না কবিরা তাহার নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন—

দৈবকীনন্দন ভণে—হেন প্রভু নাহি জানে সে ভাড়িয়া গড়িয়া শূকর।

নাচত উনমত ভকত ময়ূর।
অভকত ভেক রোয়ত জলে বুর।—বলরাম।

এমন দয়াল দুহুঁ যে না ভজে হেন পহুঁ সে ছারের জীবনে কি আশ?
সন্ন্যাসী বিপ্র ইহ অসুর গণন সেহ অনন্ত দাসের এই ভাষ।

শ্রীচৈতন্যের জীবন সম্বন্ধেও পদাবলীতে কিছু কিছু পরিচয় যায়। বলরাম দাস শ্রীচৈতন্যের কামিনীকাঞ্চনে অসামান্য বৈরাগ্য লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

সঙ্গে বিলসিত যার রাধা চন্দ্রাবলী আর কতশত বরজ কিশোরী।
এবে পহুঁ বুকে বুক না হেরেন নারীমুখ কি লাগি সন্ন্যাসী দণ্ডধারী।
সদা গোপী সঙ্গে রহে নানা রঙ্গে কথা কহে এবে নারী নাম না শুনয়ে।
ভুজযুগে বংশী ধরি আকর্ষয়ে ব্রজনারী সেই ভুজে দণ্ড কেন লয়ে।
ছাড়ি নাগরালি বেশ ভ্রমে পহুঁ দেশ দেশ পতিত চাহিয়া ঘরে ঘরে।
চিন্তামণি নিজগুণে উদ্ধারিল জগজ্জনে বলরাম দাস বহুদূরে।

লোচনদাস বা বাসু ঘোষ যাঁহাকে নাগররূপে সাজাইয়াছেন, বলরাম তাঁহার কথা এই ভাবে বলিয়াছেন—

মকরত বরণ রতন মণিভূষণ তেজি অব তরুতলে বাস।

অনন্ত আচার্য্য বলিতেছেন—শ্রীচৈতন্যের বিরোধীরা তাঁহার মহিমায় মুগ্ধ হইয়া শেষে ভক্ত হইয়াছে।

নিন্দুক পাষণ্ড ছিল বহু নিন্দা পূর্ব্বে কৈল ভজিল বলিয়া নারায়ণ।

দক্ষিণাপথ ভ্রমণের সময় চৈতন্য সাধারণ সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন—তাহা লক্ষ্য করিয়া কবিকঙ্কণ বলিয়াছেন—

'কপটে সন্ন্যাস বেশ ভ্রমিল অশেষ দেশ।'

প্রেমানন্দ বলেন—তিনি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য অভিমান দূর করিয়াছিলেন—

হাসিয়া কান্দিয়া প্রেমে গড়াগড়ি পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি কবে বা ছিল এ রঙ্গ।

বলরাম বলিয়াছেন—

"সংকীর্ত্তনের মাঝে নাচে কুলের বৌহারী।" "যবনেহ নাচে গায় লয় হরিনাম।"
রাজা ছাড়ে রাজ্যভোগ যোগী ছাড়ে ধ্যানযোগ জ্ঞানী কাঁদে ছাড়ি জ্ঞানরসে।

হরিনামে পাগলিনী হইয়া কুলের বধূও লোকলজ্জা জয় করিয়াছে, যবনেও হরিনাম মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছে, ধনী ধন-সম্পদ ত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণে আশ্রয় লইয়াছে, জ্ঞান-যোগীরা জ্ঞানমার্গ ত্যাগ করিয়া প্রেমের পথে যাত্রী হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের জীবনের এ সকল কথা গৌরপদাবলীরও উপজীব্য।

কতকগুলি পদে ছন্দোবন্ধের চাতুর্য্যের সহিত অলঙ্কৃত মাধুর্য্যের অপূর্ব্ব মিলন ঘটিয়াছে। এই শ্রেণীর পদ-রচয়িতাদের মধ্যে গোবিন্দদাসই শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেণীর পদ-গুলিই সাহিত্যের পদবীতে আরোহণ করিয়াছে। কতকগুলির দৃষ্টান্ত দিই—

১। ভকত কল্পতরু অন্তরে অঙ্কুর রোপয়ে ঠামহি ঠাম।
তছু পদতলে অবলম্বন পথিক পূরয়ে নিজ নিজ কাম।
ভাব গজেন্দ্রে চড়াওল অকিঞ্চনে ঐছন পহুঁক বিলাস
সংসার কালকূট হলাহলে দগধল একলি গোবিন্দ দাস।

২। অমিয়া মথিয়া কেবা নবনী তুলিল গো তাহাতে গড়িল গোরাদেহ।
জগৎ ছানিয়া কেবা রস নিঙ্গাড়িল গো এক কৈল সুধই সুলেহ।
ইন্দ্রধনুক আনি গোরার কপালে গো কেবা দিল চন্দনের রেখা।
পুরুবের স্বরূপ যত কুলের কামিনী গো দুহাত করিতে চায় পাখা।
নাচায় আঁখির কোণে সদাই সভার মনে দেখিবারে আঁখি পাখী ধায়।
আঁখির তিরাস দেখি মুখের লালস গো আলসল জর জর গায়।
কুলবতী কুল ছাড়ে পঙ্গু ধায় উভরড়ে গুণ গায় অসুর পাষণ্ড।
ধুলায় লুটায়্যা কাঁদে কেহ থির নাহি বাঁধে গোরাগুণ অমিয়া অখণ্ড
—লোচন দাস

৩। আজু সুরধুনী তীরে নাচত গৌর ঘন অবতার
ললিত তনুদ্যুতি দমকে দামিনি চমকে অলি আঁধিয়ার।
সঘনে হরি হরিবোল গরজন হোয়ত জগৎ বিথার
ভকত শিখী অতি মত্ত গায়ত ষড়জ সুর পরচার।
তৃষিত চাতক অখিল জন পিয়ে প্রেমজল অনিবার।
ধন্য ধরণী সুভাগ ভর বিহি দুলহ মোদ অপার।
ভণত ঘন ঘন শ্যাম ঐছন দিন কি হোয়ব আর।

এই ভাবে ঘনশ্যাম শ্রীগৌরাঙ্গের ঘন (ঘোর) অবতারের বর্ণনা করিয়াছেন।

৪। হেমবরণ বর সুন্দর বিগ্রহ সুরতরু বর পরকাশ।
পুলক পত্র নব প্রেম পকফল কুসুম মন্দ মৃদুহাস।
নাচত গৌর মনোহর অদভুত রাজিতসুরধুনী ধার।
ত্রিজগত লোক ওক ভরি পাওল ভকত রতন মণি হার।
ভাব বিভবময় রসরূপ অনুভব সুবলিত সুখময় অঙ্গ।
দ্বিরদমত্ত গতি অতি সুমনোহর মুরছিত লাখ অনঙ্গ।
ধনি ক্ষিতি মণ্ডল ধনি নদীয়াপুর ধনি ধনি ইহ কলিকাল।
ধনি অবতার ধনিরে ধনি কীর্ত্তন জ্ঞানদাস নহ পার।

৫। নীরদ নয়ানে নবঘন সিঞ্চন পুলকমুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত বিকসিত ভাবকদম্ব।
কি পেখলুঁ নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম কলপতরু সঞ্চরু সুরধুনী তীরে উজোর।
চঞ্চলনরণ কমলতলে ঝঙ্করু ভকত ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমল লুবধ সুরাসুর ধাবই অহনিশি রহত অগোর।
অবিরত প্রেম রতনফল বিতরণে অখিল মনোরথ পূর।
তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত গোবিন্দ দাস রহ দূর।

৬। অরুণ কমল আঁখি তারক ভ্রমর পাখী ডুবুডুবু করুণা মকরন্দে।
বদন পূর্ণিমা চাঁদে ছটায় পরাণ কাঁদে তাহে নব প্রেমার আরম্ভে।
পুলকে পূরল গায় ঘর্ম্মবিন্দু বিন্দু তায় রোমচক্রে সোনার কদম্ব।
প্রেমার আরম্ভে তনু যেন প্রভাতের ভানু আধবাণী কহে কম্বুকণ্ঠ।
অঙ্গের ছটায় যেন দিনকর দীপ হেন তাহে লীলা বিনোদ বিলাস
কোটিকোটি ফুলধনু জিনিয়া বিনোদ তনু তাহে করে প্রেমের প্রকাশ।
—লোচন দাস।

৭। নিন্দই ইন্দু বদনরুচি সুন্দর রদনই নিন্দই কুন্দ।
বদন-ছদন রুচি নিন্দই সিন্দুর ভুরুযুগ ভুজগগতি নিন্দ।
সুরধুনীতটগত হরিণ-নয়নী কত গুরুজন করইতে আন্ধে।
কতছত গোপত বরত করু অবিরত পড়ি তুহুঁ লোচন ফান্দে।
তুয়া মুখ সদৃশ সুধাকর নিরজনে নিরখিতে যব কহ মন্দ।
কঙ্কণঘাত মাথে দেই কাঁদই কি করব জগদানন্দ।

কতকগুলি পদে অলঙ্কৃতির বড় বাড়াবাড়ি ঘটিয়াছে। এই পদগুলি সাধারণতঃ ক্লিষ্ট রূপক ও শ্লিষ্ট রূপকে গঠিত। এই-গুলিতে ভক্তির গভীরতা প্রকাশিত হয় নাই—কাব্যাঙ্গেও এইগুলি উৎকৃষ্ট হয় নাই। তবু এইগুলির চাতুর্য্যের প্রশংসা করিতে হয়।*

শেখর কবি ত চৈতন্য প্রেমমণ্ডলীকে আখমাড়াই কলের সঙ্গে উপমিত করিয়াছেন—

বিশ্বম্ভর গাছ তার কাতুরী গদাধর। নিত্যানন্দ জাঠি তার ফিরে নিরন্তর।

এই ভাবে শ্রীচৈতন্যের সহিত সিংহ, চন্দ্র, সূর্য্য, সিন্ধু, কল্পতরু, মেঘ ইত্যাদির উপমা দিয়া আদ্যোপান্ত সাঙ্গ-রূপকে বহু পদ লিখিত হইয়াছে। এই সকল পদে ভক্তির মাধুর্য্য গৌণ, অলঙ্কৃতি-চাতুর্য্যই মুখ্য। এই সকল উপমায় বিরক্ত হইয়াই যেন সঙ্কর্ষণদাস বলিয়াছেন। এ সকল উপমার কোন সার্থকতা নাই। কারণ—

কল্পতরু অভিলাষ করয়ে পূরণ যে জন তাহার স্থানে করয়ে যাচন।
বিন্দু বিন্দু দেয় তথা করিলে গমন। ইন্দু করে এক পক্ষ কিরণ বর্ষণ।
পাত্রাপাত্র নাহি মানে গৌরাঙ্গরতন। সময় বিচার তেঁহ না করে কখন।

পরমানন্দ বলিয়াছেন—

পরশমণির সনে কি দিব তুলনা রে পরশ ছোঁয়াইলে হয় সোনা।
আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়া গাহিয়া রে রতন হইল কত জনা।
এ গুণে সুরভি সুরতরুসম নহেরে মাগিলে সে পায় কোন জন।
না মাগিতে অখিল ভুবন ভরি জনে জনে যাচিয়া দেওল প্রেমধন।

বাসু ঘোষও অনেক উপমা দিয়া শেষে বলিয়াছেন—

'গোরা রূপে কি দিব তুলনা।'

কষিত কাঞ্চন, চম্পক, গোরোচনা, বিজুলি কাহারও সহিত এ রূপের তুলনা হয় না।

ঘনশ্যাম উপমার অসার্থকতা প্রতিপাদন করিয়া বলিয়াছেন—

কো কহ অপরূপ প্রেম সুধানিধি কোই কহত রস মেহ।
কোই কহব ইহ সোই কলপতরু মঝু মনে হোয়ত সন্দেহ।
পেখলুঁ গৌরচন্দ্র অনুপাম।
যাচত যাক মূল নাহি ত্রিভুবনে ঐছে রতন হরিনাম।

লোচনদাস নিজেও অনেক উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ করিয়াছেন এবং মদন বাটিয়া বদন-রচনা, চিনি হইতে তৈরী ফেনির

---

* কতকগুলি এই শ্রেণীর পদের নামোল্লেখ মাত্র করি।

১। শান্তিপুরের বুড়া মালী বৈকুণ্ঠ বাগান খালি
করিয়া আনিল এক চারা। —কৃষ্ণদাস

২। কলিযুগ মত্ত-মতঙ্গজ মরদনে কুমতি করিণী দূরে গেল।
পামর দুরগত নাম মোতিম শত দাম কণ্ঠ ভরি দেল।
ত্যাগ যাগ যম তিরিখি বরত শম শশ জম্বুকী জরি জাতি।
বলরাম দাস কহ অতএ সে জগমাহ হরি হরি শবদ খেয়াতি।

৩। দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গ বিলাস
পুন গিরি ধারণ পুরব লীলাক্রম নবদ্বীপে করিল প্রকাশ।
কাল মেঘ বরিষণে ক্রোধ বজ্র নিক্ষেপণে লোকের হইল বড় ডর।
লোভ মোহ শিলাঘাতে মাৎসর্য্যাদি ঝরবাতে ধৈর্য্যধর্ম্ম উড়ে নিরন্তর।
—চৈতন্যদাস

৪। সো গিরি গোচর বিপনহি সঞ্চরু কুলকোটি কর অবগাহ।
চন্দ্রক চারু শটা পরিমণ্ডিত অরুণ কুটিল দিঠি চাহ।

৫। নবদ্বীপে শুনি সিংহনাদ।
সাজল বৈষ্ণবগণ করি হরি সঙ্কীর্ত্তন মূরতি গণিল প্রমাদ।

সহিত গোরা-অঙ্গের উপমা, প্রেমের সাচনা দেওয়া অনুরাগের দধির সহিত গোরার চোখের রূপক কল্পনা ইত্যাদি অনেক বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বুঝিলেন গোরারূপ উপমাতীত। তিনি তাই লিখিলেন—

শারদ চন্দ্রিকা বর্ণ ধিক্ চম্পকের বর্ণ শোণকুসুম গোরোচনা।
হরিতাল সে কোন ছার বিকার সে মৃত্তিকার সে কি গোরারূপের তুলনা।
ধিক চন্দ্রকান্ত মণি তার বর্ণ কিসে গণি ফণি মণি সৌদামিনি আর।
ও সব প্রপঞ্চ রূপ অপ্রপঞ্চ রসভূপ তুলনা কি দিব আমি তার।
শুন ওগো প্রাণসই জগতে তুলনা কই তবে সে তুলনা দিব কিসে?
জগতে তুলনা নাই যাঁর তুলা তাঁর ঠাঁই অমিয়া মিশাব কেন বিষে।
কেবা তার গুণ গায় গুণের কে ওর পায় কেবা করে রূপ নিরূপণ।
রূপ নিরূপিতে নারে গুণ কে কহিতে পারে ভাবিয়া বাউল হৈল মন।
পক্ষী যেন আকাশের কিছুই না পায় টের যতদূর শক্তি উড়ি যায়।
সেইরূপ গৌরাঙ্গের রূপের না পায় টের অনুসারে এ লোচন গায়।

যে সকল কবি শ্রীচৈতন্যের লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের পদাবলীতে কাব্যাঙ্গের অভাব আছে, কিন্তু ভক্তি ও আন্তরিকতার অভাব নাই। গোবিন্দদাসের মত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল না—অনুভব করিবার ও উপভোগ করিবার শক্তি ছিল তাঁহাদের অগাধ। শ্রীখণ্ডের নরহরি ঠাকুর দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—

গৌরলীলা দরশনে ইচ্ছা বড় হয় মনে ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।
মুঞিত অতি অধম লিখিতে জানি না ক্রম কেমন করিয়া তাহা লিখি।
এ গ্রন্থ লিখিবে যে এখনও জন্মেনি সে জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।
ভাষায় রচনা হৈলে বুঝিবে লোক সকলে কবে বাঞ্ছা পুরাবেন পহু।

অকপট কবির বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। সংস্কৃতে মুরারিগুপ্ত ও কবিকর্ণপুর চৈতন্যচরিত রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। লোচন দাস, বৃন্দাবন দাস এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ এ বাসনা পরে পূর্ণ করিয়াছেন, 'ভাষায়' চৈতন্য-চরিত রচনা করিয়া। গোবিন্দদাস এ বাঞ্ছা পূরণ করিয়াছেন তাঁহার অপূর্ব ভাষার চাতুর্য্যে ও মাধুর্য্যে। গৌর-পদাবলী-সাহিত্যে কিন্তু 'এহো বাহ্য'। লোচন দাসই প্রকৃত পক্ষে নরহরির আকাঙ্ক্ষিত কবি। নরহরির নির্দেশক্রমে লোচনদাস চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। কেবল চৈতন্যমঙ্গল নয়, শতাধিক পদ রচনা করিয়া লোচনদাস নরহরির প্রাণের কথা নিঃশেষ করিয়া বলিয়াছেন! নরহরি মনের মাধুরী দিয়া শ্রীচৈতন্যের যে রূপ রচনা করিয়াছিলেন—লোচনদাসই সেই রূপটিকে বাণীরূপ দিয়াছেন।

গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা, বিবাহ, অভিষেক, ইত্যাদি অবলম্বনে যে সকল পদ রচিত হইয়াছে—তাহাদের ২১টি ছাড়া উল্লেখযোগ্য নয়। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস তাঁহার জীবনে করুণতম বিষয়বস্তু। শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার পক্ষ হইতে হৃদয়বিদারক। সন্ন্যাস অবলম্বনে যে সকল পদ রচিত হইয়াছে সেইগুলি সৎসাহিত্যের পদাবলীতে স্থান পাইয়াছে।

গৌরাঙ্গের রূপ, গতি, চাহনি, বচন, বেশভূষা ইত্যাদির বর্ণনা করিয়া যে পদগুলি রচিত হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই কবিত্বময়। এই রসের প্রধান কবি লোচন, গোবিন্দদাস, বলরামদাস, জ্ঞান দাস, প্রেমদাস ইত্যাদি। শ্রীচৈতন্যের অপূর্ব নৃত্যলীলার বর্ণনা করিয়াছেন, বাসুঘোষ, বৃন্দাবনদাস, নয়নানন্দ, রামানন্দ ইত্যাদি। নরহরিই এ লীলার প্রধান কবি।

এখন কথা হইতেছে শ্রীগৌরাঙ্গের রূপে অনাসক্ততা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন কি? মানুষের ত এত রূপ হয় না। তিনি ত কোন নাটকের নায়ক নহেন, রমণীমনোমোহনের জন্য তাঁহার জন্ম নয়, বরং তিনি কামিনীকাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসী। রূপে তিনি বিশ্বজয় করেন নাই, প্রেমেই তাহা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের এই অলৌকিক রূপ কবি ও ভক্তদের মনের মাধুরী দিয়াই পরিকল্পিত। যিনি স্বয়ং ভগবান সাধারণ মানুষের মত তাঁহার রূপ হইতে পারে না। তাহা ছাড়া তিনি যে রাধার অঙ্গকান্তি লইয়া অবতীর্ণ কাজেই সে রূপের তুলনা কোথা?

রূপ যখন অসাধারণ তখন নদীয়ার নাগরীগণকে কি করিয়া স্থির রাখা যাইবে? এই সূত্র ধরিয়া গৌরনাগরীয়া পদাবলীর সৃষ্টি। পরবর্ত্তী কোন এক সংখ্যায় সেই শ্রেণীর পদগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

স্বাধীনতা

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

স্বাধীনতা নহে কল্পতরুর গলিত ফল
ব্যাদান করিলে বদন বিবরে পড়িবে গ'লে!
প্রাংশু লভ্যে উদ্বাহু বালখিল্য দল,
নৃত্য করিছে কঙ্কুক চাহি কল্প ফলে!

সে ফল লভিতে উদগ্র কর চরণ ভরে
দীর্ঘ করিয়া প্রত্যঙ্গবয়ব সম্প্রসার,
প্রাণপণে নহে, প্রাণাধিক প্রিয় তাঁহার তরে—
পণ কর বীর দেশ জননীরে মুক্তিবার।

পরাজয়

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

(নাটক)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

[রামবাবুর অফিসঘর: রামবাবু পুরাতন পন্থী, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ চেহারা, দেখলে ভয় করে, লম্বা প্রায় ছয় ফুট। তিনি টেবিলে বসে কাজ করছেন। একমাত্র পুত্র সুকান্তকে তিনি খুব ভালবাসেন। সুকান্তই তাঁর প্রাণ কিন্তু ঐশ্বর্য্যের দম্ভ তাঁর প্রত্যেক কাজে এবং কথা-বার্ত্তায়: সুকান্ত ঘরে ঢুকে পাশের সোফায় বসল: রামবাবু তার দিকে একবার চাইলেন]

বাবা। মিলের দেখাশুনো তোমার ওপর ছেড়ে production-এর খরচ যথেষ্ট বেড়ে গেছে দেখছি।

সুকান্ত। কুলিদের মজুরী আমি বাড়িয়ে দিয়েছি।

বাবা। ভাল করনি, ব্যবসা চালাতে গেলে নিজের ব্যবসার কথাই ভাবতে হয়, অন্য কারুর কথা ভাবতে গেলে ব্যবসা করা চলে না।

সুকান্ত। মজুররাও ত' ব্যবসার একটা অঙ্গ - তাদের কথাও ভাবতে হবে। তাদের সহানুভূতি না পেলে, তাদের কাজে প্রাণ সঞ্চার না করতে পারলে কাজ ভাল হবে না।

বাবা। সুকান্ত, আজ তিন পুরুষ ধরে আমাদের ব্যবসা চলছে। আমার প্রপিতামহ যখন প্রথম কাজ আরম্ভ করেন তখন তার চারটে মিলও ছিল না, আর তিন হাজার মজুরও ছিল না। তিনি নিজের হাতে কাপড়ের সুতো কাটতেন। আজ তার জায়গায় চারটে মিল হয়েছে আর প্রায় চার হাজার কুলির অন্ন জুটছে। ব্যবসা করা আমিও কিছু জানি এবং কি করে কাজ চালালে ব্যবসার উন্নতি হবে তাও আশা করি তোমার কাছে শিখতে হবে না।

সুকান্ত। আপনারা ব্যবসার কথাই ভাবেন। আপনারা চাবুক মেরে, হুমকি দিয়ে, মজুরদের ওপর অত্যাচার করে কাজ আদায় করায় অভ্যস্ত, কিন্তু তাদের ছেলে মেয়ের মত স্নেহ করে, আদর দিয়ে, তাদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে কাজ বেশী আদায় করা যায় একথা আপনারা ভাবেন কি?

বাবা। (উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন) সুকান্ত, তুমি ছেলেমানুষ, মজুরদের স্বভাব তুমি জান না—তারা কুকুরের জাত, তাদের নাই দিলে মাথায় চড়ে বসে, বসতে দিলে শুতে চায়। একবার যদি তাদের সাহস দাও, তাদের মাথায় চড়াও তাহলে ভবিষ্যতে তাদের শাসন করা একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠবে।

সুকান্ত। আমি ওদের জন্য একটা নৈশ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করতে চাই—সামান্য শিক্ষা ওদের দেওয়া প্রয়োজন।

বাবা। কি? কি বললে, পশুদের জন্যে নৈশ-বিদ্যালয়! না না সুকান্ত ওসব পাগলামী ছাড়—ওসব পাগলামী ছাড়। একথা তোমার মাথায় কে ঢোকাল?

সুকান্ত। আজ সন্ধ্যার সময় আমি নিজেই কুলিদের অভাব অভিযোগের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম—ওরাই বললে।

বাবা। ওরা বললেই আমাদের দিতে হবে? ওরা আমাদের মনিব, না আমরা ওদের মনিব!

সুকান্ত। এ মনিব চাকরের কথা নয়—এ মানুষের প্রতি মানুষের কর্ত্তব্য—এ মনুষ্যত্বের আদর্শ।

বাবা। মিলের কুলিরা আবার মানুষ, তাদের কাছে আবার মনুষ্যত্বের আদর্শ।

সুকান্ত। জানি আজ মিলের কুলিদের যে অবস্থা তাতে তারা পশু নামেরও অযোগ্য—কিন্তু এর জন্যে দায়ী কারা?

বাবা। দায়ী আমরা?

সুকান্ত। হাঁ আমরা মালিকরা—আমরা শিক্ষিতেরা। আমরা শিক্ষিত বলে গর্ব্ব করি—কিন্তু শিক্ষিতের কতটুকু কর্ত্তব্য আমরা করি? আমরা শিক্ষিত হয়ে সমাজে চলাফেরা করি, আর আমাদেরই চোখের সামনে আমাদেরই মত মানুষ আমাদেরই মতন আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রেম, ভালবাসা নিয়ে আমাদেরই মতন জীবন নিয়ে কুকুর বেড়ালের মতন বেঁচে আছে—এই কি আমাদের শিক্ষার পরিচয়, সভ্যতার নিদর্শন?

রাম। সুকান্ত, তুমি ভুলে যাচ্ছ তুমি তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলছ।

সুকান্ত। আমি কি কিছু অন্যায় কথা বলেছি?

রাম। অসংযত চরিত্র নিয়ে যারা সমাজে চলাফেরা করে—যারা উচ্ছৃঙ্খল, অসাধু, ইন্দ্রিয়াসক্ত, যারা জীবনে কুৎসিৎ ভোগ ছাড়া কিছু জানে না, তাদের উন্নতি কখনও কোন যুগে হয় নি কখন হবে না—সমাজের আবর্জ্জনা হয়ে তারা জন্মেছে, সমাজের আবর্জ্জনা হয়েই তারা পৃথিবী ত্যাগ করে যাবে। অক্ষম, মূর্খ, দুর্নীতিপরায়ণ যারা তারা শুধু সভ্যতার বোঝা বইবার জানোয়ার—আমরা চালক, তারা চালিত।

সুকান্ত। তবু তারা মানুষ, তারা হাজার দুঃখী, হাজার দরিদ্র অশিক্ষিত হ'ক, তবু তারা মানুষ—মনুষ্যত্বের দাবী তারাও করতে পারে, সেই অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করবার অধিকার আমাদের কিছুতেই নেই—আর তাদের চরিত্র, তারা চরিত্রহীন কেন? তার মূলে রয়েছে তাদের শিক্ষার অভাব, তাদের অবস্থা।

রাম। সুকান্ত! সুকান্ত! থাম, মূর্খের মতন তর্ক করো না।

সুকান্ত। এ অন্ধ বিশ্বাসের কথা নয়—এ যুক্তির কথা,

এ সত্যকে উপলব্ধি করার কথা, এ সভ্যসমাজের প্রত্যেকটী প্রকৃত শিক্ষিত লোকের ভাববার কথা।

রাম। তোমার আর কিছু বলবার আছে?

সুকান্ত। তাদের জন্যে নৈশবিদ্যালয় আমি প্রতিষ্ঠিত করতে চাই—তারা চায়।

রাম। হবে না।

সুকান্ত। তাদের দাবী।

আমি। আমি স্বীকার করব না।

সুকান্ত। তারা যদি একত্রিত হয়ে আপনার দরজায় এসে চীৎকার করে?

রাম। তা হলে সত্যি সত্যিই তুমি তাদের উত্তেজিত করেছ।

সুকান্ত। উত্তেজিত করি নি; তাদের অভাব অভি-যোগের প্রতিকার করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যাতে তাদের—

রাম। এতে কি ফল হবে জান? তারা নিশ্চুপে একত্রিত হয়ে তাদের দাবী জানাবে। তারা যদি ধর্মঘট করে, তা হলে তাদের সায়েস্তা করবার উপায় আমি জানি, কিন্তু এখন তা সম্ভব নয়—তারা তাদের দাবী সম্বন্ধে সচেতন ওদিকে মিলের কাজ আটকে থাকবে—আর হাজার হাজার টাকার ক্ষতি হয়ে যাবে। তুমি আমার পুত্র হয়ে আমার বিরুদ্ধে, আমার নীতির বিরুদ্ধে আমার মিলের কুলিদের এমনি করে উত্তেজিত করবে তা আমি ভাবি নি। এতে কি ফল হবে জান—এই রকম ভাবে তাদের উত্তেজিত করার পরিণাম কি জান—

সুকান্ত। জানি, তাদের নৈতিক উন্নতি হবে তারা মানুষ হয়ে বাঁচবে—তারা সত্যিকার জীবন লাভ করবে।

রাম। আমাদের তাতে যথেষ্ট লাভ হবে, না!

সুকান্ত। অন্ততঃ তাদের হবে। গরীব অশিক্ষিত তারা, পশুরও অধম জীবন থেকে তারা মুক্তি পাবে—মনুষ্যত্ব জিনিষটা তারা বুঝতে পারবে, সত্যিকার জীবন যে কি, বেঁচে থাকার সার্থকতা যে কি, তা তারা বুঝতে পারবে।

রাম। ও-সব আমি কিছু জানতে চাই না, শুনতে চাই না, বুঝতে চাই না—আমি শুধু জানতে চাই আমার পিতা, প্রপিতামহ প্রাণপণ পরিশ্রম করে যে ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করেছেন তাকি তুমি এমনি ভাবে দু'হাতে বিলিয়ে দিতে চাও?

সুকান্ত। পরিশ্রম কি শুধু তারাই করেছেন? আর এরা, যারা দিনের পর দিন মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত মিলের মেশিনের তলায় নিজেদের সুখ সুবিধা সমাজ সংস্কার বেঁচে থাকবার অধিকার সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে পশুরও অধম হয়ে বেঁচে আছে এরা পরিশ্রম করে নি?

রাম। এরা এই জন্যেই জন্মেছে বংশ পরম্পরায় এরা এই করে আসছে। আমাদের কাছ থেকে এরা যা পায়, যেটুকু দয়া মায়া মমতা, যেটুকু অন্ন, সেইটুকুই এদের প্রাপ্য, তার বেশী দাবী এদের নেই। এরা জানোয়ার অসভ্য বর্ব্বর।

সুকান্ত। এরাই সভ্যতার পিলসুচ। আমরা যে সভ্যতা নিয়ে বড়াই করি সেই সভ্যতার প্রদীপ এরাই মাথায় ধরে দাঁড়িয়ে আছে, আমরা পাচ্ছি আলো, এদের ভাগ্যে জুটছে পোড়া তেল।

রাম। যথেষ্ট হয়েছে, আর ধর্ম্মকথায় দরকার নেই। এইটুকু জেনে রাখ যে এই মনোভাব নিয়ে কাজ করলে ভবিষ্যতে এ ব্যবসা তুমি বজায় রাখতে পারবে না। তোমার পিতা প্রপিতামহ যেভাবে ব্যবসা চালিয়েছেন, তোমাকেও সেভাবে কাজ করতে হবে।

সুকান্ত। আমি তা পারব না। যারা বঞ্চিত, যারা অনাদৃত, যারা অনাথ, তাদের রক্তশোষণ করে অর্থ সমাগমের পথ সুগম করতে আমি পারব না।

রাম। পারবে না! পারবে না!! পারবে'না!!!
[রাগে ঘরে পায়চারী করতে আরম্ভ করলেন, হঠাৎ থেমে]

না, না, না, সুকান্ত তোমায় পারতেই হবে। আমারই চোখের সামনে আমার একমাত্র পুত্র, অবহেলায় মূর্খের মতন আমার সমস্ত ঐশ্বর্য্য দু'হাতে বিলিয়ে দেবে আর আমি হতবাক্ হয়ে তাই দেখব—আমি তাই সহ্য করব? সুকান্ত সুকান্ত—সুকান্ত, তোমায় পারতেই হবে।

সুকান্ত। আমি পারব না। মানুষ হয়ে জন্মে ঐশ্বর্য্যের মোহে সাধারণ মনুষ্যত্ব আমি হারাতে পারবো না। অত্যাচারে অবিচারে সরল হৃদয়ের রক্ত দিয়ে ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করে তুলতে আমি পারব না। তাদের সামান্য আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে, জীবনের হাসি কান্না থেকে বঞ্চিত করে, আমাদের বিলাসিতার উপকরণ সঞ্চয় করতে আমি পারব না। আর তা যদি কখনও করতে হয় তা হলে তার আগে যেন এ বিশ্ব জগত থেকে মনুষ্যত্ব জিনিষটা লোপ পায়।

রাম। সুকান্ত!!! সুকান্ত!! সুকান্ত! [রাগে কিছুক্ষণ কোন কথাই বলতে পারলেন না তারপর] সুকান্ত, তুমি যে একদিন এমনিভাবে আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে তা আমি জানতুম। আজ আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে [দু'চার বার পায়চারী করবার পর] তোমাকে আর মিল দেখতে হবে না। তুমি ক'লকাতা যাও সেখানকার supply department তুমি দেখবে। আমার বাল্যবন্ধু অনাদি সেই তোমাকে সব দেখেশুনে দেবে।

[সুকান্ত ধীরপদক্ষেপে ঘর ছেড়ে যে পথে এসেছিল সেই পথেই বেরিয়ে গেল।

বিড়বিড় করতে করতে রায়বাবু দু'চারবার পায়চারী করলেন তার পর চিঠি লিখতে বসলেন। ঘূর্ণীয়মান হ'লে মঞ্চ ঘুরবে অন্যথায় ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে যাবে]

[একটী সাধারণ ঘর, জিনিষপত্তর খুব বেশী নেই। কোনে একটা Dressing Table, অন্য কোনে একটা Study Table, একটা বিছানা, দরকারী আসবাব পত্তর সবই আছে, কিন্তু চাকচিক্য একদম নেই। Study Tableএ বসে খুব নিবিষ্ট মনে সুকান্ত চিঠি লিখছে। ঘরে ঢুকলেন সুকান্তর মা। বয়স ৪০।৪২, দোহারা চেহারা, শান্তশিষ্ট, অতিরিক্ত পুত্রবৎসল, সুকান্ত তাকে দেখতে পায় নি। তিনি সুকান্তর চেয়ার ধরে দাঁড়ালেন]

মা। কান্ত [সুকান্ত জবাব দিল না] কান্ত—

সুকান্ত। কি? [চিঠি লিখতে লিখতেই]

মা। রাগ হয়েছে বুঝি? উনি বুঝি বকেছেন? কি হয়েছে?

সুকান্ত। কিচ্ছু না।

মা। কিচ্ছু না ত' অমন গম্ভীর হয়ে আছিস কেন?

সুকান্ত। কোথায় আবার গম্ভীর হয়ে আছি?

মা। এই ত' আমার সঙ্গে ভাল করে কথা পর্য্যন্ত বলছিস না। কাকে চিঠি লিখছিস কাকে?

সুকান্ত। আমার বন্ধু রঞ্জনকে।

মা। ও, তোর সেই ডাক্তার বন্ধু! হঠাৎ এতদিন বাদে বুঝি তার কথা মনে পড়ে গেল?

সুকান্ত। মনে পড়ে গেল না মনে পড়িয়ে দিলে।

মা। কার সঙ্গে রাগারাগি করেছিস বল ত'? আমি ত' কিছু বুঝতে পারছি না।

সুকান্ত। পারবেও না।

মা। তোর যে সময় সময় কি হয় কিছু বোঝবার জো নেই [একটা ফটো আঁচলের তলা থেকে বের করে] নে, দেখ দিকিনি একে চিনতে পারিস কি না? বল দেখি কার ছবি?

সুকান্ত। একটী মেয়ের।

মা। তা তো আমিও জানি। বল দেখি কোন মেয়ে?

সুকান্ত। পৃথিবীতে ত' কত মেয়ে আছে; তাদেরই মধ্যে কারুর একজনের হবে আর কি।

মা। থাম, আর ঠাট্টা করতে হবে না! ওঁর বন্ধু ক'লকাতার অনাদি বাবু, তারই মেয়ে সুনন্দার।

সুকান্ত। তাকে আমি চিনি না।

মা। ও-মা সেকি কথা রে? ছেলেবেলায় তার সঙ্গে এত ঝগড়া মারামারি করতিস। বেবীকে না হলে তোর একদিনও চলতো না। কতদিন তার সঙ্গে বিয়ে করবার কথা নিয়ে আমাকে পাগল করেছিস, আর আজ তাকে চিনতেই পারলি না!

সুকান্ত। ছেলেবেলার বেবীকে চিনতাম, জানতাম, কিন্তু এখনকার সুনন্দাকে চিনি না।

মা। তোর যে কি কথার ছিরি! যাক গে ওসব বাজে কথা এখন বল দেখি মেয়েটিকে কেমন লাগে? ভারী সুন্দর না!

সুকান্ত। হাঁ গ্লাসকেসে সাজিয়ে রাখবার মতন।

মা। তা নয় ত' কি আমার কান্তর বৌ উঠোন ঝাঁট দিয়ে বেড়াবে না রান্নাঘরের ঝুল ঝাড়বে? আমার বৌকে আমি পটের বিবি করে রাখব; পাড়ার লোকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকবে আর আমি তাই দেখে হাসব।

সুকান্ত। ও! তা' হ'লে তুমি ঠিক ক'রে ফেলেছ যে, সুনন্দাকে আমি বিয়ে করব—আর তুমি তাঁকে ছিকেয় তুলে রাখবে। আর আমি যদি বলি বিয়ে করবো না।

মা। মানে?

সুকান্ত। মানে—আমি বিয়ে করবো না।

মা। তা' হ'লে কি করবি? সমস্ত জীবন বাউণ্ডুলে হ'য়ে ঘুরে বেড়াবি?

সুকান্ত। তাতে ক্ষতি কি?

মা। না, খুব লাভ! আমারই চোখের সামনে আমার একমাত্র ছেলে বাউণ্ডুলে হ'য়ে ঘুরে বেড়াবে আর আমি তোর মা হ'য়ে তাই মুখ বুজে দেখব! তুই কি যে হ'য়েছিস্ আমি কিছু বুঝি না বাপু। আজ পনেরো বছর আগে থেকে তোর বিয়ের সব ঠিক হ'য়ে আছে। অনাদি বাবু [অনাদি কথাটা বল্‌বার সঙ্গে সঙ্গে আলো ক্রমেই ক'মে যাবে—আধ মিনিটের মধ্যে একদম অন্ধকার হ'য়ে গেল] আমার সুকান্ত বল্‌তে পাগল। উনি বেবী বল্‌তে পাগল। ছেলেবেলায় তোরা দু'টীতে হাত ধরাধরি ক'রে বেড়া'তে যেতিস্ [আধ মিনিটের মধ্যে আবার আলো জ্বলে' উঠলো। দেখা গেল সুকান্তর জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ফুটফুটে একটী ছোট্ট ছেলে আর তার পাশে ফুটফুটে একটী ছোট্ট মেয়ে বেবী: সুকান্তর মার পাশে দাঁড়িয়ে, অনাদি বাবু আর সুকান্তর বাবা: তিনজনেই সুকান্ত আর বেবীর দিকে চেয়ে আছেন]

সু। মা, আমরা বেড়াতে যাচ্ছি—রঘুয়া আমাদের জন্যে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

মা। আচ্ছা বাবা, বেশী দেরী করো না কিন্তু।

বেবী। জ্যেঠিমা রাত্তিরে ফিরে এসে কিন্তু আমাদের রাজপুত্তুর আর রাজকন্যার গল্প বল্‌তে হবে।

মা। হাঁ মা বলব।

সু। ধ্যেৎ! রাজপুত্তুরের গল্প বিচ্ছিরি—তার চেয়ে কারাবাবুর কাছে রঘু ডাকাতের গল্প শুনবো। কেমন সুন্দর গল্প—

বেবী। না, জ্যেঠিমার কাছ থেকে রাজপুত্তুরের গল্প—

সু। না, রঘু ডাকাতের গল্প!

বেবী। না, রাজপুত্তুরের গল্প!

সু। বেশ, যাও, আমি তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাব না—আমি একলা যাব রঘুয়ার সঙ্গে।

মা। ছিঃ বাবা! ঝগড়া করতে নেই। আচ্ছা তোমরা দু'টো গল্পই শুনো। ঝগড়া করতে নেই, ছিঃ!

সু। ঐ তো আমার কথা শোনে না—পেত্নী!

মা। ছিঃ! অমন ক'রে বলতে নেই—বেবী আমার লক্ষ্মী মেয়ে।

সু। লক্ষ্মী না ছাই—আমি ওকে কখনও বিয়ে করবো না! [বেবীর অভিমান হ'ল—সে কাঁদতে আরম্ভ করল]

মা। ছিঃ মা বেবী, কাঁদতে নেই। কান্ত বড় দুষ্টু—

সু। আমি তো বলছি, দু'টো গল্পই শুনবো—তা' ওইতো কাঁদছে—

মা। তুমি ওকে পেত্নী বলেছ—বিয়ে করবে না বলেছ—তাই ও কাঁদছে।

সু। উঃ আমি বিয়ে করব বলছি—ওই তো বেড়াতে যাচ্ছে না—

মা। যাও মা বেড়িয়ে এস। [দু'জনেই হাসতে হাসতে চলে গেল] দু'টীতে বেশ মানায়।

অনাদি। বৌদি, আমার ঐ একটী মাত্র মেয়ে। তোমাকেই কিন্তু নিতে হবে।

রাম। সে কথা ত' তোমায় বলেছি অনাদি—বেবী-মাকে আমার বাড়ীতে প্রতিষ্ঠা করবোই করব। যখনই ভাবি বেবী বড় হ'লে আমার ঘর আলো করবে, তখনই যেন টাকা রোজগারের ঝোঁক আমায় বেশী ক'রে পেয়ে বসে। কান্ত আমার একমাত্র ছেলে—কত আদরের কত স্নেহের!

মা। কবে যে ওরা দু'টোতে মানুষ হবে, বড় হবে—বড় হ'য়ে এম্নি ক'রে দু'জনে আমাদের সামনে এসে এম্নি ক'রে দাঁড়াবে—এম্নি ছেলেমানুষি ক'রে ঝগড়া করবে—মারামারি করবে—আবার হাসতে হাসতে দু'জনে হাত ধরাধরি ক'রে বেড়াতে যাবে, আমরা সবাই দেখব!

অনাদি। সে দিন কি হবে বৌদি?

মা। হবে! হবে! আমি জানি সে দিন আসবে—আমার কান্ত বড় হবে, মানুষ হবে, লেখাপড়া শিখবে, বিদ্বান হবে, বুদ্ধিমান্ হবে—বেবী হবে তারই যোগ্য মেয়ে—তারই যোগ্য স্ত্রী। দু'টীতে রাজারাণী হ'য়ে জীবন কাটাবে।

রাম। তুমি ত' দেখছি বাতাসে রাজপ্রাসাদ গড়ে' তুললে—কিন্তু যদি ঝড় ওঠে—আর সব ভেঙ্গে যায়? যদি বড় হ'য়ে সুকান্ত বেবীকে বিয়ে করতে না চায়? যদি সে তোমার কথা না শোনে—

মা। না না—আমার সুকান্ত তা' কিছুতেই করবে না—আমার অবাধ্য সে কিছুতেই হবে না—আমার সমস্ত আশা সুকান্ত এম্নি ক'রে ধূলিসাৎ ক'রে দেবে না!—

[ক্রমশঃ

পাবনার জাগ-গান

কবিশেখর শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার, বি-এল

জাগ গান পল্লী-সঙ্গীত। বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলাতে, বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের পল্লী-সঙ্গীত প্রচলিত আছে। ইহা পল্লীবাসীর সুখ-দুঃখের, আশা-আনন্দের ইতিহাস বহন করিয়া সঙ্গীতের মধ্য দিয়া পল্লীবাসীদের নিকটে কত স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে। এই সমস্ত সঙ্গীত আজ অর্থহীন হইলেও একদিন এই সঙ্গীতই পল্লীবাসীর প্রাণে রস সঞ্চার ও পরিবেশন করিত। এখনও বহু পল্লীবাসী এই সঙ্গীতের মধ্যে তাহাদের প্রাণ ধর্ম্মের ঈপ্সিত বস্তু খুঁজিয়া পায়।

পাবনা জেলার সদরে রামচন্দ্রপুর, দৈলানপুর অঞ্চলের জাগ-গান, মাণিকপীরের গান নামে পরিচিত। পাবনাতে জাগ-গান পৌষমাসের প্রথম দিবস হইতে আরম্ভ হয়। প্রতি সন্ধ্যায় হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে বালকগণ গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী যাইয়া এই সঙ্গীত করিয়া থাকে এবং চাউল ভিক্ষা করে। তাহারা পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিবস ঐ ভিক্ষালব্ধ চাউল লইয়া একস্থানে 'বনভোজন' বা 'জোলামণি' করিয়া থাকে এবং নানা প্রকার গ্রাম্য ক্রীড়া-কলাপে আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। পল্লীবালকগণের ইহা একটা আনন্দের জিনিষ

এই সঙ্গীত গাহিবার সময় যে বালকটি 'আগ দোহারেতে' গান করে, সে একাই একদিকে দাঁড়ায়—অন্য বালকগণ যাহারা 'পাছ দোহারেতে' গাহে তাহারা তাহার সম্মুখে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। প্রথম বালকটি প্রথমে সঙ্গীত আরম্ভ করে এবং তাহার উত্তরে দ্বিতীয় দল গান গাহিয়া থাকে। গানগুলি খুব উচ্চকণ্ঠে গীত হয়। বালকগণ প্রথমে একটি গৃহস্থের বাড়ী যাইয়া উচ্চকণ্ঠে বলে,—

'ছওর হওর মানিকপীরের বরে আলো (এল) বচ্ছর অন্তর।'

তখন যদি গৃহকর্ত্তা গান গাহিতে আদেশ করে তবে তাহারা গান গাহিতে আরম্ভ করে। এই গানগুলি একটু অভিনব। একটি গানের মধ্যে

গোপাল ননী চুরি করিয়াছে—যশোদা-মা, গোপালকে পাচনি লইয়া শাস্তি বিধান করিতে উদ্যত হইয়াছেন—অপর একটি প্রসিদ্ধ 'সোনারায়ের' বিবাহ বিষয়ক। এই জাগ-গানের মধ্যে সোনারায় ও মুকুটরায়ের নামও পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে অতীত ইতিহাসের কোন আভাষ আছে কিনা মণীষীগণের বিচার্য্য, একটি সঙ্গীত তুলিয়া দিতেছি :—

সকল বালকগণ। এ মা মিছা মায়া তোর
মা হইয়া সদাইরে বলো
গোপাল রণি (ননী) চোর।

প্রথম। রণি খালো কেরে গোপাল, রণি খালো কে?

সকলে। আমি ত খাই নাই মা রণি—গোপাল খায়েছে।
আমি যদি খাতেম রণি ভাণ্ড করতেম আধা,
গোপাল খায়েছে মা রণি ভাণ্ড করে' ছ্যাদা।

প্রথম। লাঠি হাতে নন্দরাণী যায় গোপালের পিছে,

সকলে। লাফ্ দিয়ে উঠ্‌ল গোপাল কদম্বেরি গাছে।

প্রথম। পাতায় পাতায় হাঁটে গোপাল, ডালে না দেয় পাও।

সকলে। নীচ থেকে নন্দরাণীর হেলে দুলে গাও।

প্রথম। নাম নাম নামরে গোপাল পাড়ে দেব ফুল,

সকলে। ডাল ভাঙ্গিয়া পড়ে গোপাল মজাবে গোকুল!

প্রথম। নামি নামি নামি মারে একটি সত্য কর;

সকলে। নন্দ ঘোষ তোমার পিতা যদি আমায় মার।

প্রথম। ও কথা কি হয় রে গোপাল—ও কথা কি হয়,

সকলে। নন্দ ঘোষ তোমার পিতা সর্ব্বলোকে কয়।

প্রথম। লালাভোলা দিয়ে রে গোপালকে নামাল,

সকলে। গাভী-বাঁধা ছাঁদ নিয়া দুই হাত বাঁধিল।

প্রথম। কিরে বাঁধন বাঁধলে মারে বন্ধন জ্বালায় মরি,

সকলে। ছাড়ে দে মা হস্তের বাঁধন দেবো রণির কড়ি।

প্রথম। কালকে বেয়ানা যাব মারে গিরি ঘোষের বাড়ী,

সকলে। পরণের কাপড় 'বাঁধা দিয়া' দেব রণির কড়ি।

প্রথম। ওপারে যে কদমের গাছ—পাতা ঝর ঝর করে,

সকলে। তার নীচে কালিয়া কৃষ্ণ সদাই নৃত্য করে।

এই সঙ্গীতের মধ্যে একটু গ্রাম্য রসিকতা আছে। সঙ্গে সঙ্গে পল্লী-জননীর স্নেহ, ভয় ও শাসন স্নিগ্ধরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ওরে—নল কাটে রে নলেরা ছায়ে চতুর্দ্দিক,
স্বর্গ হ'তে সোনার পালঙ্ক পল আচম্বিত।
সেই পালঙ্কে সোনা রায় ঠাকুর গাও দোলাচ্ছে,
দেবপুরীর চার কন্যা—বাও দিতেছে।
বাও দিতে বাও দিতে করিল গমন,
বেরাহ্মণের বাড়ী যায়া দিল দরশন।
ওরে বেরাহ্মণ উঠিয়া বলে মুকুট রায় রে ভাই,
তোর বেটিকে যে করব বিয়ে মন বড় দৌড়ায়।
ওরে যাও রে মালেন ফুলের লাগিয়া
গেল মালি আন্‌লো ফুল—গাছ ধরিয়া।
ওরে দেখ রে আকড়ার লোক দেখ রে চাহিয়া
আমার সোনা রায় করে বিয়ে ফুলে জাঙ্গাল দিয়া,
সোনা রায় ঠাকুর বিয়ে করে' বেতার পালে কি?
এক পাইছি গাড়ু গামছা আর পাব কি?
আলো রে সোনারায় মা ধান দুর্ব্বা নিয়া,
এই ইস্তক দিয়ে গেলাম—সোনা রায়ের বিয়ে!

এই সব সঙ্গীতের মধ্যে কল্পনার লীলা তরঙ্গের উচ্ছ্বাসও লক্ষ্য করিবার বিষয়। দেবপুরীর চার কন্যার আগমন সোনারায়ের পালঙ্ক স্বর্গ হ'তে অবতরণ, মালীর পুষ্পচয়ন—কত সুখ-স্বপ্ন এই সব পল্লী-সঙ্গীতের মধ্যে রহিয়াছে। এই সকল পল্লী-সম্পদ আজ বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়া যাইতেছে।

মাণিকপীরের গান

এই মাণিকপীর কে ছিলেন কিছু বুঝিবার উপায় নাই। তবে তিনি এককালে গো জাতির নানা উপকার সাধন করিয়াছিলেন তাহা সঙ্গীত হইতে উপলব্ধি হয়। এই সঙ্গীতে আরও বুঝিতে পারা যায় তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালাতে 'কানু ভিন্ন গীত নাই'—তাই তিনি কানুর সঙ্গে স্থানে স্থানে এক হইয়া গিয়াছেন। সঙ্গীতটির কিছু কিছু তুলিয়া দিতেছি। প্রথমে মাণিকের জন্মের ইতিহাস।

প্রথম বালক। একমাসের গো কালে—জানি কিনা জানি
দুই মাসের গো কালে—লোকের মুখে শুনি?

সকলে। মাণিক মা বলে আর কোলে…প্রাণ জুড়াই
এ ভবে আর মা বল্‌বার কেহই নাই—হারে—ও—

মানিক অনেক সাধ্য সাধনার ধন। মায়ের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিল। কিন্তু শেষ জীবনে মাণিক ফকির পীর হইয়া সংসার ত্যাগ করেন।

সকলে। মানিক ফকির হ'য়ে তুমি যাও কনে,—(কোথায়)
তোমার মাও কাঁদে ফেরে বনে বনে।

প্রথম। দুলালী দাসী, দুলালী দাসী বলি যে তোমারে,
স্নান করিতে যাব আমি কালিদ'র সাগরে!

সকলে। দম্ দম্ বলিয়া মাণিক ছাড়িল জিগির
কানু ঘোষের মাও বলে যে ঐ আলো ফকির
—হারে—ও,—.

প্রথম। দম্ দম্ বলিয়া মানিক গোয়ালেতে যায়,
শুয়েছিল বাঁঝে গাভী উঠে খাড়া হয়।

সকলে। মাণিক ফকির হ'য়ে তুমি যাও কনে—ইত্যাদি।

প্রথম। দুগ্ধ লয়ে মাণিকপীর রে বাহিরেতে আসে,
থাক থাক কানুর মা—থাক তুমি বসে!

সকলে। দুগ্ধের কথা ফকির শুনে আলিকার আছে,
ওরে ছোট খাটো ফকির চেটা—জটা তার মাথে—
—হারে—ও;—

এমনি জাগ্-গানের মধ্যে আমাদের বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান আছে তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পল্লীর শান্ত-শীতল পারিপার্শ্বিক ব্যষ্টির মধ্যে—শীতের হিমস্পর্শে স্নিগ্ধ পল্লীবাটে এই সঙ্গীতের একটা বিশিষ্ট রূপ আছে। সে রূপ আজিকার বস্তুতান্ত্রিক বাঙ্গালার কাছে অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সঙ্গীতগুলির মধ্যে বাঙ্গালার অতীত ইতিহাসের কোন ইঙ্গিত আছে কিনা তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন।



(উপন্যাস)

শ্রীকুমুদিনীকান্ত কর

ছয়

তিনদিন পর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে মীনার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন। তৎক্ষণাৎ মীনার নাড়ি, বুক পরীক্ষা করিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, "সব ভাল, আর ভয় নাই···এই অষুধটা এখন খাইয়ে দিন্।" কাগজে মোড়া একটা ঔষধ আমার হাতে দিয়া দেওয়ানের সঙ্গে কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কক্ষে আমি একা। হিরুর বংশধরকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহারই অশ্রু ঝরিবার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। এই সময় মীনা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল। আমাদের দৃষ্টি মিলিত হইল। এই সেই মীনা! যাকে আমি হাতে ধরিয়া একদিন বধূবেশে এই গৃহে আনিয়াছিলাম, সন্ত ফোটা ফুলটির মত, এই সেই! এই ঝরা ফুলের বিষাদ মূর্ত্তি তার? আমার প্রাণ আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল, "মীনা! মীনা!" পাগল হইয়া উঠিলাম ভগিনীসমা বিষাদ প্রতিমাকে সান্ত্বনা দিতে। পাগলের ন্যায় দুই-পা অগ্রসর হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। তাহার দৃষ্টি স্থির। নাসিকা স্ফুরিত হইল। ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিয়া উঠিল। চোখের মণির উপর অশ্রু টলমল করিতে লাগিল। দেহ থাকিয়া থাকিয়া ঝঙ্কার দিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। সে দুই হাতে তাহার স্পন্দিত বক্ষ চাপিয়া ধরিল। কিন্তু তখনও আমার উপর এবং আমার বক্ষসংলগ্ন শিশুর উপর তাহার দৃষ্টি স্থির। তাহার সে দৃষ্টি হৃদয়ের সব কথাই ব্যক্ত করিতেছিল। উঃ! অসহ্য সে দৃশ্য!

'মীনা! মীনা!' আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়া তাহার শয্যার পাশে ছুটিয়া গেলাম। শিশুপুত্রটীকে তাহার বুকে রাখিয়া বলিলাম, "মীনা! এই-ই সে···"

আর আবেগ রুদ্ধ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। তাহার একটী হাত আমার উভয় হাতের মধ্যে লইয়া বলিলাম, "মীনা! বোন্!"

আর কিছু বলিতে পারিলাম না। আমার বহুক্ষণের রুদ্ধ ও তপ্ত অশ্রু এবার বর্ষা ধারার ন্যায় তাহার হাতের উপর ঝরিয়া পড়িল। তাহারও অশ্রু গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল। চীৎকার করিয়া কাঁদিতে না পারায় আমার বুক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। পাগলের ন্যায় ছুটিয়া সে কক্ষ ত্যাগ করিলাম।

পরদিন যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম তাহাতে আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এমন একটা কিছু হইতে পারে তাহা দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! একজন স্ত্রীলোকের—একটী ক্ষুদ্র বালিকার—ঐ সামান্য হৃদয়টুকুর মধ্যে এতখানি বল, এতখানি দৃঢ়তা লুকায়িত ছিল তাহা কে জানিত? ঘটনাটার আগাগোড়া সবটাই যেন একটা বিস্ময়কর স্বপ্ন! মীনার জীবনে মাত্র তিন চারদিন পূর্ব্বে যে এতবড় একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা সেদিন তাহাকে দেখিয়া আর বুঝিবার উপায় ছিল না। নারীর পক্ষে যাহা অস্বাভাবিক, একরূপ অসম্ভব, মীনা নারী হইয়াও তাহাই করিয়া বসিল। কেমন করিয়া এত কোমল এত কঠিন হইল, এমন অসম্ভব সম্ভব হইল, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। সত্যই কি নারী দুর্জ্জেয়? সত্যই কি নারী প্রিয়তমের জন্য—যাহাকে একদিন নারায়ণ সাক্ষী করিয়া জীবন মন সমর্পণ করিয়াছে, তাহার জন্য—এমন করিয়া সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে পারে? প্রহেলিকা বটে!

মীনার কক্ষে এককোণে নীরবে বসিয়া তাহার শিশুপুত্রের সঙ্গে খেলা করিতেছিলাম। মীনা শয্যায় বসিয়া নীরবে বাতায়ন পথে আকাশের দিকে চাহিয়াছিল। তাহাকে প্রকৃতিস্থ বলিয়াই বোধ হইতেছিল, কিন্তু বড় গম্ভীর, চিন্তা-ভার-ক্লান্ত। শিশুর সঙ্গে খেলা করিতে করিতে এক একবার তাহার দিকে চাহিয়া তাহার সঙ্গে কথা কহিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলাম। কত কথাই যে আমার মনে পুঞ্জীভূত হইয়াছিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু তাহার একাগ্র চিত্তের ভাবনা, পলকহীন দৃষ্টি দেখিয়া তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হইতেছিল না। হঠাৎ একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসের ক্ষীণ শব্দে চমকিয়া উঠিয়া দেখিলাম মীনা শিশুপুত্রের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। বড় করুণ দৃষ্টি, কিন্তু হতাশব্যঞ্জক নয়। যখন সে দৃষ্টি ফিরাইয়া পুনরায় বাতায়ন-পথে চাহিল তখন দেখিলাম তাহার কোমল মুখ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। একটা দৃঢ়সঙ্কল্পের ছায়া মুখের উপর পড়িয়াছে। সহসা সে পরিচারিকাকে ডাকিয়া বলিল, "দেওয়ান্ ম'শায়কে একবার এখানে আস্তে বল, এখনি···"

আমি ভাবিত হইলাম।

বৃদ্ধ দেওয়ান্ কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "ডেকেছ আমায় মা?"

ঘোমটা টানিয়া অনুচ্চ অথচ স্পষ্ট এবং দৃঢ়স্বরে বলিল, "আজ্ঞা হাঁ···"

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন।

"আমার পিতৃকুলের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেউ এ বাড়ীতে আছে ?"

বৃদ্ধ বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন, "হাঁ মা, সবাই আছে, রায়ম'শায়, তাঁর ছেলেরা…"

তাঁহাকে বাধা দিয়া মীনা বলিল, "আজই—এখনই তাঁদের বিদায় ক'রে দিন—ভুক্ত অভুক্ত যে যে-অবস্থায় আছে তাকে সেই অবস্থায়ই বিদায় করবেন, আমায় দেখতে চাইলে বল্‌বেন, এ জীবনে আর দেখা হবে না…"

এপর্য্যন্ত বলিয়া সহসা সে ক্ষান্ত হইল। কিন্তু ইহাই তাহার শেষ কথা বলিয়া মনে হইল না। তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল সে আরও কঠিন কিছু বলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া রুদ্ধশ্বাসে তাহার শেষ কথা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

মীনা পুনরায় বলিতে লাগিল, "আরও ব'লবেন, কৈলাশপুরের অভিজাত বংশ রায়দের মেয়ে মীনা মৃত; কিন্তু বিলাশপুরের শিক্ষিত ভদ্র তেজস্বীবংশ রায়দের কুলবধূ মীনারাণী জীবিত। সে তার শ্বশুরকুলের সম্মান রক্ষা ক'রতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। বিলাশপুরের কুলবধূ স্বামীর অপমানকারীদের ক্ষমা ক'রবে না, প্রতিশোধ নেবে…প্রতিশোধ…"

এ কি! এ কি সেই মীনা! সম্মুখে যাহাকে দেখিতেছিলাম সে ত' এক মহিয়সী নারী! কিন্তু মীনা এ কি বলিতেছিল? স্বামীর অপমান! প্রতিশোধ! তবে কি, তবে কি কোন অপমান সহিতে না পারিয়া হিরু…

তাহার কোন কথাই বুঝিতে না পারিয়া যার-পর-নাই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। আগাগোড়া সবটাই যেন একটা রহস্যে ভরা! মীনা কি আমায়ও তাহা বলিবে না? এই সময় সে পুনরায় বলিয়া উঠিল, "সেই সঙ্গে কৈলাসপুরের মেয়ে মীনাও বাদ যাবে না—ভগবান স্বয়ং সে ব্যবস্থা করেছেন"

তাহার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর হঠাৎ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল।

বৃদ্ধ কি বলিতে গিয়া তাহার মুখের দৃঢ়তাব্যঞ্জক ভাব দেখিয়া ক্ষান্ত হইলেন। পরে নীরবে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

আমি যেন স্বপ্নভঙ্গে হঠাৎ জাগিয়া চাহিয়া দেখিলাম তাহার অনিমেষ নয়ন পিতার প্রতিমূর্ত্তি শিশুর মুখের উপর স্থির হইয়া রহিয়াছে। বোধ হইতেছিল তাহার সমস্ত দেহটা যেন অসার, জীবনহীন। একমাত্র দৃষ্টিটাই তাহার জীবন্ত! মন প্রাণ, আশা, আকাঙ্ক্ষা সমস্তই যেন সেই দৃষ্টিতে নিবদ্ধ। দেখিতে দেখিতে তাহার দৃঢ়তা কোথায় ভাসিয়া গেল। মুখের উপর স্নেহময়ী কেমন নারীমূর্ত্তির ছায়াপাত হইল। চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। আমি মন্ত্র চালিতের ন্যায় উঠিয়া গিয়া ধীরে ধীরে শিশুকে মাতৃঅঙ্কে রাখিয়া নীরবে তাহার নিকটে দাঁড়াইলাম। বহুদিনের পুঞ্জীভূত কথা মন আলোড়িত করিয়া তুলিল। ব্যাকুল হইয়া ডাকিলাম "মীনা!"

আবেগে আমার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল। সে অশ্রুভারাক্রান্ত নয়ন তুলিয়া আমার দিকে একবার চাহিয়াই মস্তক নত করিল। আমি ব্যাকুল হইয়া তাহার একখানি হাত ধরিয়া ডাকিলাম, "মীনা! বোন্!"

নীরব উত্তরস্বরূপ তাহার তপ্ত অশ্রু আমার হস্তদ্বয় সিক্ত করিল।

আমি ধীরে ধীরে তাহার হাতখানি নামাইয়া রাখিয়া মনের আবেগ, নয়নের অশ্রু সম্বরণ করিতে তাড়াতাড়ি কক্ষ ত্যাগ করিলাম। যাইতে যাইতে পশ্চাতে মীনার রোদন শব্দ শুনিতে পাইলাম। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছিল, "ওগো, তুমি আমায় আরো কঠিন করে দাও—আরো কঠিন, আরো কঠিন। চোখের জলে যেন সব ভেসে না যায়—না এক বিন্দু চোখের জল না আর—শুধু কঠিন, শুষ্ক মরুভূমি ক'রে দাও আমায়।"

গভীর মর্ম্মবেদনা-প্রসূত তাহার এ বিলাপ। বায়ুও বোধ হয় ব্যথিত হইয়া মর্ম্মে সে বেদনা বহন করিতেছিল। উহা শুনিতে শুনিতে কখন আমি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম তাহা আমার খেয়াল ছিল না। এবার অশ্রু বারণ মানিল না, ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। সারা দেহ ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। আর দাঁড়াইয়া মীনার বিলাপ শুনিতে পারিলাম না। দ্রুতগতি সেস্থান ত্যাগ করিলাম।

বহিপ্রাঙ্গণে আসিয়া দেখিলাম বৃদ্ধ দেওয়ান দপ্তরের সম্মুখে অতিশয় চিন্তাকুল মনে পদচারণা করিতেছেন। অন্য কোনদিকে তাঁহার দৃকপাত নাই। এক সময় তিনি যখন চিন্তা করিতে করিতে অজ্ঞাতসারে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, আমি তখন তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া পশ্চাৎ হইতে বলিলাম, "উপায় নাই, বল্‌তেই হবে তাদের এ কথা—"

তিনি চমকিয়া ফিরিয়া আমায় দেখিয়া যেন অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। বলিলেন, "হুঁ—বুঝতে পারছি তা—কিন্তু আমি তার জন্য এতটুকু দুঃখিতও নই—তুমি এখন তাদের নিকট গেলে দেখতে পাবে তারা জমিদারীর আয় ব্যয় ও ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে মহাব্যস্ত—চিন্ময় রায়ের সম্পত্তি—আমার নিজ হাতে গড়া—আমারই চোখের উপর গোটা আত্মীয় কুটুম্ব হিরুর মৃত্যুর দু'দিনের মধ্যে ভাগাভাগি করতে ব্যস্ত! কি বলব—সত্যি আজ মীনারাণীর জন্য আমার গর্ব্ব হচ্ছে। কিন্তু বড় অভাগিনী সে! তা' না হলে হিরু আজ এমন করে সকলের বুক ভেঙ্গে চলে যাবে কেন—হিরু—অপুত্রক আমি—আমার সর্ব্বস্ব হিরু—"

বৃদ্ধের স্বর কাঁপিয়া উঠিল। আবেগ তাঁহার কণ্ঠস্বর

রুদ্ধ করিল বলিতে বলিতে হঠাৎ থামিয়া আবেগ দমন করিলেন।

একটু পরে পুনরায় বলিলেন, "কিসে কি হ'ল, কেন হঠাৎ এ সর্ব্বনাশ হ'ল, আজও তা' তেমন জানতে পারি নাই। কিন্তু সামান্য কারণে যে এসব হয় নাই তা বুঝতে পারছি—মীনারাণীর কথায় হঠাৎ আজ আমার সন্দেহ শতগুণ বেড়ে গেছে—সত্যিই যদি আমার সন্দেহ ঠিক হয় তবে—তবে জেনো আমার প্রতিহিংসা থেকে কেউ রক্ষা পাবে না—আগুন—আগুন জ্বালব পুড়িয়ে ছারখার করব এ অঞ্চল—"

উত্তেজিত বৃদ্ধের নিষ্প্রভ নয়ন হইতেও যেন আগুনের ফুল্কি ছুটিতেছিল। আমি নীরবে বিস্মিত-নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। কিছুকাল পর তাঁহার উত্তেজনার হ্রাস হইলে তিনি বলিলেন, "এক কাজ কর ভাই, বৈঠকখানায় তাদের যতদূর সম্ভব ভদ্রভাবে নিয়ে এস। সেখানেই না হয় একটা ব্যবস্থা করব।"

হিরুর কুটুম্বদের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম বৃদ্ধের অনুমান সত্য। লঙ্কাভাগ হইতেছিল। হঠাৎ আমাকে দেখিয়া তাহারা নেহাৎ অপরাধীর ন্যায় বাক্‌হীন হইয়া ভীত নয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমি মনে মনে হাসিলাম। প্রকাশ্যে বলিলাম, "আপনাদের বোধ হয় বিরক্ত করলাম, ক্ষমা করবেন। একটা কথা নিবেদন করতে এসেছি আপনাদের কাছে—দয়া ক'রে আপনারা একবার দেওয়ানজীর ওখানে যাবেন। তাঁর কি একটা কথা আছে ব'লবার।"

একসঙ্গে সকলের প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টি আমার মুখের উপর স্থাপিত হইল। বুঝিতে পারিলাম তাহারা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছে। আমি নীরবে দাঁড়াইয়া তাহাদের ভাব লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। হঠাৎ একটা রূঢ় প্রশ্ন হইল—"কেন, সে নিজে এসে বল্‌তে পারলে না?"

চাহিয়া দেখিলাম প্রশ্নকর্ত্তা এক উদ্ধত যুবক—হিরুর শ্যালক। তাহার অশিষ্ট কথায় আমারই আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। বহু কষ্টে মনোভাব গোপন করিয়া বলিলাম, "রাগ করবেন না। পাছে আপনারা কিছু মনে করেন সে জন্য তিনি আমায় পাঠিয়েছেন।"

হিরুর শ্বশুর মহাশয় বলিলেন, "আচ্ছা চল যাচ্ছি।"

আমি তাহাদের প্রশ্ন করিবার অবসর না দিয়া তৎক্ষণাৎ কক্ষ ত্যাগ করিলাম।

আমাকে একাকী ফিরিতে দেখিয়া বৃদ্ধ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন। আমি সে অর্থ বুঝিতে পারিয়া বলিলাম, "ওরা আসছে—আপনার অনুমান সম্পূর্ণ সত্য।"

তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বুঝতে পেরেছ এখন মীনারাণীর জন্য কেন গর্ব্ব অনুভব করছি।"

আমি মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলাম।

"জামাতার অকাল মৃত্যু—আত্মহত্যা, নিজেদের এতটুকু মেয়ের বৈধব্য এত সব মর্ম্মান্তিক ঘটনা তুমি কি মনে কর ওদের মনে কোন ক্রিয়া করেছে?—না এতটুকুও না—ওদের মনের এক কোনেও এতটুকু আঘাত লাগে নাই। চিন্ময় রায়ের ঘরে মেয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল ওদের নিজেদের উদরান্নের ব্যবস্থা করা; আজ সে উদ্দেশ্য সফল করবার সুযোগ এসেছে। বুঝলে সুযোগ এসেছে, সুযোগ—হিরুর মৃত্যু ওদের পক্ষে একটা মস্ত সুযোগ।"

"তা-ই—এর মধ্যেই তাদের মনিবি-মনের পরিচয় পেয়ে এলাম।"

"হুঁ—আর একটু পরেই তাদের পিপাসার শান্তি হবে—" এই বলিয়া উত্তেজিত বৃদ্ধ কক্ষে পদচারণা করিতে লাগিলেন। এমন সময় তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, "বসুন অনুগ্রহ ক'রে।" তাহারা বসিলে তিনি বসিলেন।

কিছুক্ষণ কেহই কিছু বলিতে পারিল না। হিরুর শ্বশুর হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন, "আমাদের কি ডাকা হয়েছিল?"

দেওয়ানজী তৎক্ষণাৎ ভদ্রতাসহকারে উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, আপনাদের আসতে অনুরোধ করেছিলাম।"

"কেন?"

দেওয়ানজী হঠাৎ এই 'কেন'র কোন উত্তর করিলেন না। একটু ভাবিয়া ধীরকণ্ঠে বলিলেন, "বড্ড ভুল হয়েছে রায় ম'শায়, আপনাদের বোধ হয় এখনো আহারাদি হয় নাই।"

রায় মহাশয়ের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। মুখে তীব্র বিরক্তির চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। প্রকাশ্যে বলিলেন, "শুধু এই কথা বলবার জন্য আমাদের ডাকা হয়েছে।"

তাঁহার উদ্ধত যুবক পুত্র বলিয়া উঠিল, "কখনো না, নিশ্চয়ই আরো কোন মতলব আছে।"

দেওয়ানজি বলিলেন, "হাঁ বিশেষ কথা আছে রায় ম'শায়, আহারাদির পর সুস্থির চিত্তে ব'সে তা' আলোচনা করলে ভাল হ'ত।"

যুবক পুনরায় উদ্ধতভাবে বলিল, "এখনই বল্‌তে হবে তোমার। এ কি খেলা পেয়েছ? কার সঙ্গে কথা বলছ তা বুঝি খেয়াল নাই?"

তাহার অশিষ্টতায় আমি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। তাহা লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় রায় মহাশয় পুত্রকে নীরব থাকিতে ইঙ্গিত করিলেন। অবশ্য ইহা আমার দৃষ্টি এড়াইল না।

দেওয়ানজী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "রায় ম'শায়েরও কি তাই মত? কিন্তু আমি বলছিলাম কি—এই—"

রায় মহাশয় বলিলেন, "না এখন বলাই ভাল—শুভস্য শীঘ্রম্—তা ছাড়া ব্যাপারটা যখন গূঢ় এবং গুরুতর বলেই বোধ হচ্ছে—আমারও ত একটা কর্ত্তব্য রয়েছে,—সব ভার যখন আমারই উপর পড়ল অদৃষ্টগুণে এই বুড়ো বয়সে—"

দেওয়ানজী ক্ষণেক ভাবিয়া বলিলেন, "তা বেশ আপনার যখন ইচ্ছা—"

পুনরায় কিছুক্ষণ ধরিয়া ভাবিয়া গম্ভীর হইয়া উঠিলেন হঠাৎ বলিলেন, "আপনারা বাড়ী ফিরে যান।"

"কী-ই-ঈ—কী বললে ?"

বৃদ্ধ রায় মহাশয় লাফাইয়া উঠিলেন। তাঁহার গৌরবর্ণ মুখ রক্তাভা ধারণ করিল। আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম রাগে তাঁহার দেহ কাঁপিতেছে।

দেওয়ানজী সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অবিচলিত কণ্ঠে কহিলেন, "আপনাদের এখানকার কাজ শেষ হয়েছে। এখন বাড়ী ফিরে যান—"

সেই উদ্ধত যুবক লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "কী এত স্পর্দ্ধা বাবা! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই গোলামের অপমান সহ্য করছেন আপনি ?"

সে অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে দেওয়ানজীর দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু আমার অঙ্গুলি হেলনে সে থমকিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ রায় মহাশয় বলিলেন, "আচ্ছা দাঁড়াও তোমরা একটু আমি আসছি—আমার সন্দেহ হচ্ছে নানা রকম—না হলে এত বড় বুকের পাটা একটা নফরের ? দেখে আসি একবার মীনা কেমন আছে, আর তার কাছে হয় ত' জানতেও পারব সব—হয় ত'—হয় ত' সে—মনে হচ্ছে একটা ষড়যন্ত্র, দাঁড়াও আসছি।"

তিনি কক্ষ হইতে বাহির হইবার জন্য পা বাড়াইতেই দেওয়ানজী বলিলেন, "দাঁড়ান, যাবেন না—"

"তোমার হুকুম নাকি—হা হা হা" সহসা তাঁহার বিকৃত মুখ হইতে একটা বিকট অবজ্ঞার হাসি নির্গত হইল।

দেওয়ানজী সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্থির কণ্ঠে বলিলেন, "রায় ম'শায়, আপনি স্বর্গীয় চিণ্ময় রায়ের বৈবাহিক চিনুর শ্বশুর, এবাড়ীর অতিথি, আমার পূজ্য। আপনাকে অপদস্থ করবার ইচ্ছা এতটুকুও আমার নেই কারণ তাতে আমাদেরই অপমান, কিন্তু আপনার ইচ্ছা সফল হবে না।"

"কী! আমারই মেয়ের বাড়ী আমি থাকতে পারব না ? আমারই মেয়ের সঙ্গে আমি দেখা করতে পারব না ?"

"না।"

"তোমার হুকুমে-?"

"যার গৃহ তারই হুকুম।"

"মীনার ? মিথ্যা কথা—এ নিশ্চয়ই তোমার ষড়যন্ত্র।"

"তা' আপনার যা খুসী মনে করতে পারেন—কিন্তু দেখা হবে না।"

এই সময় সেই যুবক উদ্ধতভাবে বলিয়া উঠিল, "আমার বোনের কাছে আমি যাব দেখি আমাকে কে আটকায়।" বলিয়া সে কক্ষ হইতে বাহির হইল।

পশ্চাৎ হইতে বৃদ্ধ দেওয়ানজী গম্ভীর স্বরে আদেশ করিলেন, "ভজুসর্দ্দার! ফটক পাহারা দাও—সাবধান, মীনারাণীর কিম্বা আমার হুকুম ছাড়া কাউকে ঢুকতে দিবে না অন্দরমহলে।"

সকলে স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিল।

"কী! এত অপমান ?—আমায় ?"

ক্রোধান্ধ বৃদ্ধ রায় মহাশয়ের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, কথা বন্ধ হইয়া গেল, চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল। তাঁহার পা এতদূর কাঁপিতেছিল যে পার্শ্বস্থ এক ব্যক্তি তাহা দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।

দেওয়ানজী গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তবে শুনুন, আমার উপর আমার মনিব মীনারাণীর কি আদেশ,—আমায় দেখতে চাইলে বলবেন, এ জীবনে আর দেখা হবে না—আরো বলবেন কৈলাসপুরের অভিজাতবংশ রায়দের মেয়ে মীনা মৃত; কিন্তু বিলাসপুরের শিক্ষিত উচু-মনা তেজস্বী রায়বংশের কুলবধূ মীনারাণী জীবিত; সে তার শ্বশুরবংশের সম্মান রক্ষা করতে সর্ব্বদা প্রস্তুত—বিলাসপুরের কুলবধূ স্বামীর অপমানকারীদের ক্ষমা করবে না, প্রতিশোধ নেবে—প্রতিশোধ—"

রায় মহাশয় তাঁহাকে হঠাৎ ধমক দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "চুপ, মিথ্যাবাদী, জুচ্চোর, জানি না তুই তাকে কি করেছিস—এ হ'তে পারে না অসম্ভব—এ তোর ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু না—কিন্তু জেনে রাখিস এ অপমানের প্রতিকার আমি করব।"

"স্বর্গীয় চিণ্ময় রায়ের গৃহে অতিথির সহস্র অযথা অত্যাচার অপমান মাথা পেতে নেব, এ অপরাধের এই-ই নীতি—কিন্তু জানবেন যদি কারো অপমান সইতে না পেরে আমার পুত্রাধিক প্রিয় চিনু এভাবে নিজের প্রাণ নিজে দিয়ে থাকে তবে—তবে এই দিব্যি করে বলছি, আমার প্রতিহিংসা থেকে তাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না—স্বয়ং ভগবানও না—"

পুনরায় বৃদ্ধ দেওয়ানজীর চোখ হইতে যেন আগুনের ফুলকি ছুটিতে লাগিল।

কৈলাসপুরের কুটুম্বের দল তৎক্ষণাৎ জমিদার বাড়ী পরিত্যাগ করিল।

আমি বৃদ্ধ দেওয়ানজীকে একাকী তাঁহার কক্ষে রাখিয়া একটু দূরে রায় দীঘির বাঁধানো ঘাটে নির্জ্জনে গিয়া বসিলাম। সমস্ত ঘটনার মাঝখানে কেবল মীনা আর হিরুর কথাই পুনঃ পুনঃ মনে জাগিতে লাগিল। হিরুর জীবন নাটকে যবনিকা পতনের পূর্ব্ব অঙ্কে মীনা এবং হিরুর দ্বারা কি অভিনীত হইল, তাহা জানিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিলাম। মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, এ রহস্য ভেদ করিতেই হইবে।

[ক্রমশঃ

নাট্যশালার ইতিহাস

ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

বিগত প্রবন্ধে আমরা "কুলীন কুল-সর্ব্বস্ব নাটকের" কথা বলিতেছিলাম। বাঙ্গালার রঙ্গ-জগতে এই নাটকের অভিনয়ই যে সর্ব্বপ্রথম, আর এই নাটকই যে প্রকৃত নাট্যপদবাচ্য সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। বস্তুতঃ এই নাটকের গ্রন্থকার পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় "আদি নাট্যকার" ও "নাট্যশালার প্রবর্ত্তক" হিসাবে যে সম্মান লাভ করিয়া আসিতেছেন, তাহা খুবই যুক্তিযুক্ত, তাই পণ্ডিতমহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁহার যুগান্তরকারী নাটকের উৎপত্তি ও তদ্‌চিত্রিত চরিত্রাবলী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা কয়েকটী প্রবন্ধে আমরা পাঠককে পরিবেশন করিতে অভিলাষ করিয়াছি।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিবাস ছিল হরিনাভি গ্রামে আচার্য্য-পাড়া। রাজপুর, হরিনাভি, চাংড়ীপোতা ও কোদালিয়া চব্বিশপরগণার সদর মহকুমান্তর্গত, এই চারিটী গ্রাম পাশাপাশি অবস্থিত। কালীঘাট হইতে ইহাদের দূরত্ব ৮।৯ মাইল দক্ষিণে হইবে। এই কয়টী গ্রামেই অসংখ্য পণ্ডিত বাস করিতেন। ইঁহারা অধিকাংশই দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। হরিনাভির পণ্ডিত হরসুন্দর তর্ক-বাচস্পতি, মধুসূদন বাচস্পতি, রামকমল বিদ্যারত্ন (রামায়ণের প্রথম গদ্য অনুবাদক, অযোধ্যা কাণ্ড পর্য্যন্ত) প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর, রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার ('কৌতুকসর্ব্বস্ব নাটক' 'দুর্গামঙ্গল' প্রভৃতি কাব্য-প্রণেতা) কোদালিয়ার গৌরহরি চূড়ামণি, কালিদাস ন্যায়রত্ন, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ (গীতাভাষ্য-প্রণেতা) তারাকুমার কবিরত্ন, রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন, জয়রাম ও জয়কৃষ্ণ বিদ্যাসাগর, ঈশানচন্দ্র চূড়ামণি, কাশী-প্রবাসী রাজ-পুরের শ্যামসুন্দর তর্কপঞ্চানন, গিরিশ বিদ্যারত্ন, লাঙ্গলবেড়িয়ার পিতাম্বর ন্যায়রত্ন, প্রসিদ্ধ ভরত শিরোমণি (দায়ভাগের টীকাকার) চাংড়ীপোতার দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়, তস্য পিতা হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন * প্রভৃতি সকলেই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। এই বিদ্যাভূষণ মহাশয় "সোমপ্রকাশ" পত্রিকা সম্পাদনা করিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রথম জাতীয়তামূলক পত্রিকার সম্পাদকরূপে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই গ্রন্থের নায়িক তর্করত্ন মহাশয়ের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। অধিকন্তু তর্করত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র যতীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। উভয় বৈবাহিকের মধ্যে বেশ সম্প্রীতি ছিল।

কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে ভাগীরথী কালীঘাট হইয়া আসিয়া বারুইপুর, বারাসত, জয়নগর প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া ছত্রভোগের নিকটে সমুদ্রে গিয়া পড়িত। "চৈতন্য ভাগবতে" শ্রীচৈতন্যদেব এই পথ হইয়া নীলাচলে যাইবার কথা আছে—

"উত্তরিলা আসি আটিসারা নগরে
এই মত প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে
আইলেন ছত্রভোগ মহা-কুতূহলে"

অন্তঃকাণ্ড, ২৮ অধ্যায়।

কবিকঙ্কণের "চণ্ডী" গ্রন্থে শ্রীমন্ত সওদাগরের এই পথ বহিয়া দক্ষিণে সমুদ্রে যাইবার কথা নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

কালীঘাট এড়াইল বেনিয়ার বালা
কালীঘাটে গেল ডিঙ্গা অবসান বেলা॥
মহাকালীর চরণ পূজেন সদাগর
তাহার মেলান বেয়ে যায় মাইনগর §
নাচন গাছার ঘাট বাম দিকে থুয়া
ডাহিনেতে বারাশত খলিনী এড়াইয়া
বিষ্ণু হরির দেউল বামেতে রাখিয়া
সাগড়া বাহিল সাধু মন্ত্রেশ্বর দিয়া
ডাহিনে অনেক গ্রামে রাখে সাধু সুত
ছত্রভোগ এড়াইল হয়ে হর্ষযুত

* কবি ঈশ্বরগুপ্ত ইঁহার ছাত্র ছিলেন। 'প্রভাকরে' অনেক স্থানে তাঁহার সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আছে।

§ প্রাচ্য বিদ্যার্ণব নগেন্দ্র বসু "মাইনগরের" পুরন্দর নবাব হোসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন।

তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন—"সন ১২২৯ সালে (অর্থাৎ ১৮২২ খৃঃ অব্দে) আমার জন্ম। আমার পিতাঠাকুরের নাম রামধন শিরোমণি মহাশয়। চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতি হরিনাভি নামক গ্রামে আমার বাস। আমি বাল্যাবস্থায় দেশে ও বিদেশে চৌবাড়ীতে ব্যাকরণ, কাব্য ও স্মৃতির কিয়দংশ এবং ন্যায়শাস্ত্রের অনুমান খণ্ড প্রায় অধ্যয়ন করি। পরিশেষে ইংরেজী ১৮৪৩ অর্থাৎ ১২৫০ সালে গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে পাঠার্থ প্রবিষ্ট হই।"

এই একুশ বৎসরের কাহিনী তিনি নিজে যাহা দিয়াছেন এ সম্বন্ধে আর বেশী কিছু জানা যায় নাই। রামধনের চারিপুত্র ছিল—প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর, বিশ্বম্ভর, বনমালী ও রামনারায়ণ। প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি "বৈদিক কুলপঞ্জিকা" নামক দাক্ষিণাত্য-বৈদিকদিগের আদি কুল গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বিশ্বম্ভর ও বনমালী অপুত্রক থাকিয়া পরলোকগত হন। প্রাণকৃষ্ণ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে (এই গ্রন্থের নায়ক) খুব স্নেহ করিতেন। তাঁহার স্ত্রীও বিশেষ গুণবতী ছিলেন। তর্করত্ন মহাশয় বলিতেন—"বড় ভাজ যদি আমায় পুত্রের ন্যায় স্নেহ না করিতেন তবে আমি কোথায় থাকিতাম।"

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বৈবাহিকের মৃত্যুর পরে "সোমপ্রকাশে" যে জীবন চরিতটী দিয়াছেন (১৩ই মাঘ, ১২৯২) তাহাতে আমরা অবগত হই যে, "পণ্ডিত রামনারায়ণ দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শৈশবাবস্থায় পিতামাতার মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রাণকৃষ্ণ দুরাবস্থাপন্ন হইয়াও তাঁহার লালন-পালনের ভার লইয়াছিলেন। এই অবস্থায় তিনি হরিনাভির প্রসিদ্ধ মধুসূদন বাচস্পতির নিকট প্রথমতঃ ব্যাকরণ, স্মৃতি ও কয়েকখানি সংস্কৃত কাব্য অধ্যয়ন করেন। পরে ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষার জন্য পূর্ব্বদেশস্থ 'পোড়া' * নামক গ্রামে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন।"

বিদেশে তর্করত্ন মহাশয় যশোহর জিলার যে চৌবাড়ীতে (টোলে) পড়িতেন, উহাতে অধ্যাপক ছিলেন রাঢ়ী শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ। তাঁহার কামিনী নামে একটী রূপবতী কন্যা ছিল। ইহার বিবাহের প্রায় ৪।৫ বৎসর পর্য্যন্ত কুলীন স্বামী আর শ্বশুরবাড়ী আসে নাই। আর সে অনেকগুলি বিবাহ করিয়াছিল। একদিন সন্ধ্যাই স্বামী আসিলেন। কামিনীও যথাসময়ে শয়নগৃহে স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। স্বামী ঘরে প্রবেশ করিয়াই কামিনীকে শয়ন দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া কর্কশস্বরে বলিয়া উঠিল—"কি? আমাকে অর্থ দ্বারা পূজা না করিয়া শয়ন করিয়া আছিস্? আমি কত বড় কুলীনের ছেলে তাহা বুঝি মনে নাই? আমার মর্য্যাদার টাকা কই? আগে টাকা বাহির কর্, পরে নিদ্রা যাস্।" কামিনী দেবী কাকুতি করিয়া করিয়া স্বামীকে কহিলেন "আমার তো কিছুই নাই, তুমি আমাকে টাকা না দিলে আমি কোথায় টাকা পাইব?" ইহাতে স্বামী আরও উন্মত্ত হইয়া বলিয়া উঠিল "কি আবার তর্ক? আমার যেখানে পূজা নাই, সেখানে একবিন্দু সময় থাকিতে নাই"—এই বলিয়া যেখানে রামনারায়ণ শয়ন করিয়াছিলেন, সেই চতুষ্পাঠী গৃহে চলিয়া গেল।

তর্করত্ন মহাশয় সব শুনিয়া তাহাকে আশ্রয় না দিয়া হাঁকাইয়া দিলেন। স্বামী স্ত্রীর ঘরে আর না ফিরিয়া কোথায় চলিয়া গেল। এই ঘটনার অল্পদিন মধ্যেই কামিনীদেবী উদ্বন্ধনে নিজের জীবনলীলা সাঙ্গ করেন। তর্করত্ন মহাশয় এই বালিকাকে ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করিতেন ও সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতির উপাখ্যানাদি তাহার কাছে বলিতেন। বালিকার অকালমৃত্যুতে তিনি মর্ম্মাহত হন। এই দুর্ঘটনা তাঁহার হৃদয়ে যে গভীর রেখাপাত করে কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব নাটক সেই অনুভূতিরই ফল। † নাটকের 'ফুলকুমারীতে' এই কামিনীর অনেকটা ছায়াপাত হইয়াছে। তর্করত্ন মহাশয় নিজেও কৌলীন্য বিষয়ে আন্দোলন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন।

এই বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ সাহস ছিল। "কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব নাটক" লিখিয়া তিনি কুলীনবর্গের বিষ নজরে পতিত হন। এমনও সময় গিয়াছে অভিনয়ান্তে কুলীনগণ সর্ব্ব-সমক্ষে নিজেদের যজ্ঞোপবীত ছিঁড়িয়া অভিসম্পাত দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কখনও বা তাঁহার দেহের উপর আক্রমণেরও আশঙ্কা গিয়াছে। কিন্তু তালপাতার চটি পরিহিত ইংরাজী অনভিজ্ঞ সেকেলে ব্রাহ্মণ কোনরূপে ভ্রূকুটী বা ভয় প্রদর্শনে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেন নাই। অতঃপরে কৌলীন্য প্রথা অনেকটা প্রশমিত হইয়া যায়। এখন তো উহা একেবারেই লুপ্ত।

বাল্য জীবনেই রামনারায়ণ তর্করত্নের শিক্ষালাভ হয়। একবার গ্রীষ্মের সময় এক আত্মীয়ের বাড়ী যাইতেছিলেন এবং পথে এক পয়সায় অনেকগুলি আম কিনিতে পারিলেন। কিছু খাইয়া অবশিষ্ট ফেলিয়া দিতেছিলেন, অমনি মনে হইল

* ইহা বোধ হয় বিক্রমপুরের পুরুয়া গ্রাম। কিন্তু কোন সঠিক প্রমাণ নাই। ইহা চব্বিশ পরগণার পুড়া নয়। "সোমপ্রকাশে" 'পোড়া' উল্লিখিত আছে, 'পুড়া' নয়।

† তর্করত্ন মহাশয়ের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ অধ্যাপক প্রণীত "বঙ্গের রত্নমালা"।

ফেলি কেন, নিকটস্থ কাহাকেও দিই। এই সময়ে কতকগুলি দরিদ্র কৃষক সেখান দিয়া যাইতেছিল, আমগুলি তাহাদিগকে দেওয়ায় তাহারাও সন্তুষ্ট হইল। অল্পক্ষণ পরে এরূপ ঝড় আসিয়াছিল যে, তাঁহার প্রাণের আশঙ্কা হইয়া পড়ে। কিন্তু ঐ কৃষকগুলি তাহাদের দাতাকে বাঁচাইবার জন্য অগ্রসর হওয়ায় তাঁহার জীবন রক্ষা হয়। তর্করত্ন মহাশয় তখনই বুঝিলেন, অতি ক্ষুদ্র জিনিষও ফেল্‌তে নাই। ইহাতেও বড় কাজ হইতে পারে। বুঝিলেন "যাকে রাখ, সেই রাখে।" বঙ্গের রত্নমালা ২য় ভাগ ৬৯-৭১।

অতঃপর তর্করত্ন মহাশয় ১৮৪৩ খৃঃ (১২৫০ সালে) গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন। সেখানে তিনি দশ বৎসর পাঠ করেন। এ-সময়ে তাহার জ্যেষ্ঠ প্রাণকৃষ্ণ যে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, তিনি নিজেও এই কথা আত্মচরিতে লিখিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর উভয়েই তখন সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করিতেন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বাংলা ১২৬০ সালে তিনি ঐ কলেজের পাঠ সাঙ্গ করেন। ঐ বৎসরেই সিন্দুরিয়া পটীস্থ সুপ্রসিদ্ধ গোপাল মল্লিকের বিশাল প্রাসাদে রাজেন্দ্র দত্তের উদ্যোগে মেট্রোপলিটান কলেজের উৎপত্তি হয়। সে-বৎসরই তর্করত্ন মহাশয় এখানে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। এই কলেজে তিনি দুই বৎসর কাজ করেন। এখানকার অধ্যাপক ছিলেন মধুসূদন, ভূদেব, রাজনারায়ণের শিক্ষাদাতা অধ্যাপক কাপ্তেন ডি, এল্, রিচার্ডসন। মেট্রোপলিটান কলেজে থাকিতেই "পতিব্রতোপাখ্যান" ও "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" নাটক রচিত হয়। প্রথম খানি ১৮৫৩, জানুয়ারী এবং দ্বিতীয়খানি ১৮৫৪, ডিসেম্বর।

সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় জনৈক লেখক বলেন, "১৮৫৩ খৃঃ অব্দে 'প্রকাশ্য বক্তৃতা' নামে একখানি পুস্তকও না কি প্রকাশ করেন।" এ-বিষয়ে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ আছে। কারণ পণ্ডিত মহাশয় অনুমান ১৮৭৩ খৃঃ যে আত্মচরিত লেখেন তাহাতে এ-যাবৎ রচিত যাবতীয় গ্রন্থের উল্লেখ থাকিলেও এই গ্রন্থের উল্লেখ নাই। দ্বিতীয়তঃ ইহার ভাষা অতিশয় মার্জ্জিত এবং সরল। পতিব্রতোপখ্যানে এবং 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের কুলপালক, ধর্ম্মশীল বিরহীপঞ্চানন প্রভৃতির কথোপকথনেও যেরূপ (সাগরী ভাষা তো দূরের কথা) মৃত্যুঞ্জয়ী ভাষার আধিক্য দেখা যায় তাহাতে এই গ্রন্থ—রামনারায়ণের বলিয়া কিছুতেই ধারণা হয় না। এই পুস্তকখানি ভারতবর্ষে দুষ্প্রাপ্য। কেবল প্রচ্ছদ পৃষ্ঠার নাম দেখিয়াই রামনারায়ণের রচনা বলিয়া ধরিয়া লওয়া খুবই ভুল হইবে। অন্য লেখকও তাঁহার নামে মুদ্রাঙ্কন করিতে পারেন। পতিব্রতোপাখ্যানের ভাষা এইরূপ—

"বিদ্যাভ্যাস করিলে বোধ বিধুর উদয় হয়। তাহাতে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়া যায় এবং সচ্চরিত্রতারূপ চন্দ্রিকার প্রভায় অন্তঃকরণে কৈরব প্রফুল্ল, সুখসাগর বর্দ্ধমান, সৎপথে দৃষ্টিপাত, সাহসিক ব্যাপারের সঙ্কোচ হয়..."

কথিত পুস্তকের ভাষা—"বঙ্গভাষার মধ্যে ইংরাজী দুই এক শব্দ প্রয়োগ করা আর বাঙ্গালী পরিচ্ছদ অর্থাৎ ধুতি চাদর পরিধান করিয়া একটি উত্তম ইংরেজী টুপী ধারণ করা তুল্য হাস্যাস্পদ। সত্য মিথ্যা তোমরা বিবেচনা কর..."

আর "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" নাটকের কুলপালকের কথার ভাষা—

"সহস্র কিরণ সূর্য্য প্রচুর কিরণ প্রদানে আপনার সহস্র নামই কি সার্থক করিতে উদ্যত হইয়াছেন? এক্ষণে অনবরত পথ পরিশ্রান্ত ও দিনকর কিরণে নিতান্ত ক্লান্ত পান্থলোকেরা সন্তাপশান্তি নিমিত্ত ছায়াপ্রধান পাদপতলে পল্লবশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাভজনা করিতেছে। মহীরুহচয় একান্ত পবন-পতনবিরহে সজ্জন মানসের ন্যায় চাপল্য পরিত্যাগ করিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছে, বরাহগণ পল্বলপঙ্কে সর্ব্বাঙ্গ বিলীন করিয়া রহিয়াছে, কুরবীকুল তরুমূলে শয়ন করিয়া আমীলিত নয়নে রোমন্থ করিতেছে।"

উক্ত লেখক হয় তো আরও কত তর্ক করিবেন, বলিবেন, এই নাটকে আবার সহজ কথাও তো আছে, কিন্তু পাঠক-গণের জিজ্ঞাস্য এক কথাই হইবে—তর্করত্ন মহাশয় নিজে কি কোন স্থানে—কোন পুস্তকের বিজ্ঞাপনে—আত্মচরিতে বা কোন চিঠিপত্রে এই পুস্তক উল্লেখ বা উহার পরিচয় দিয়াছেন? তিনি সব পুস্তকেরই পরিচয় দিয়াছেন। এ-পুস্তকখানির দিলেন না কেন! আমাদের বক্তব্য এই—তর্করত্ন মহাশয়ের যাহা আছে সে-টুকু হইতে বঞ্চিত না হইলেই রক্ষা। পরের ধনে পোদ্দারী? বিত্তশালী হইতে তিনিও চাহিতেন না, আমাদেরও সেই জিনিষ ঘাঁটিয়া অযথা বিদ্যা দেখাইবার কোন প্রয়োজন নাই।

১৮৫৫ সালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর পরলোক গমন করেন এবং ভ্রাতার মৃত্যুর পরে তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৮৩ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি নিজে বলিয়াছেন "হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে দুই বৎসর প্রধান পণ্ডিতের কর্ম্ম করিয়া ১৮৫৫ সালের ১৬ই জুন তারিখে বাংলা ১২৬২ সনে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অদ্যাপি সেই কর্ম্মই করিতেছি।" এই কলেজে তিনি চল্লিশ টাকায় ঢুকিয়াছিলেন এবং সর্ব্বোচ্চ বেতন হয় ১০০৲ টাকা।

এই সময়ের মধ্যে তিনি 'বেণীসংহার', 'রত্নাবলী',

'অভিজ্ঞান শকুন্তলা', 'নব নাটক', 'মালতী মাধব', 'রুক্মিণী হরণ', 'স্বপ্নধন', 'ধর্ম্মবিজয়' ও 'কংসবধ' নাটক রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনখানি প্রহসনও রচনা করেন—'যেমন কর্ম্ম তেমন ফল', 'উভয় সঙ্কট' ও 'চক্ষুদান'। এই এই সমস্ত নাটক ও প্রহসনের পরিচয় ও অভিনয়ের কথা আমরা যথাস্থানে দিব।

তাঁহার অধ্যাপনার কথাও 'সোম প্রকাশে' আছে—"অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ইনি ছাত্রদিগের নিরতিশয় শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। অধ্যাপকতা বিষয়ে সংস্কৃত কলেজে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।"

তিনি বড় সুবক্তা ছিলেন। উক্ত সোমপ্রকাশে আছে—"তিনি যে-সভায় উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহার মধুর বক্তৃতা শুনিবার জন্য সভাস্থ সকলেই ব্যগ্র হইতেন এবং তিনিও তাঁহাদিগকে রসগর্ভ ও উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা মুগ্ধ করিতেন।"

তর্করত্ন মহাশয় সংস্কৃতেও খুব পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার বৈবাহিক বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—"কাব্য অলঙ্কারে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার ন্যায় আর সুপণ্ডিত কেহ ছিল না। তাঁহার প্রণীত 'আর্য্যা শতক' 'দক্ষযজ্ঞ' সর্বত্র বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। 'দক্ষযজ্ঞ' প্রণয়ন করাতে ইংলণ্ডীয় মহাত্মা ই, বি, কাউ-এল তাঁহাকে "কবি কেশরী" উপাধি পাঠাইয়াছিলেন।

তর্করত্ন মহাশয় নিজে লিখিয়াছেন "১২৭৮ সালে মহাবিদ্যারাধন নামে দশ-মহাবিদ্যার স্তোত্র ও গীতিকা এবং বর্ত্তমান বর্ষে আর্য্যাশতক প্রস্তুত করিয়াছি।" সুতরাং দেখিতেছি ইং ১৮৭১ সনে রচিত হয় মহাবিদ্যারাধন নামে দশমহাবিদ্যা-স্তোত্র ইং ১৮৭২ সালে রচিত আর্য্যাশতক।*

১৮৮১....... পূর্ব্বার্দ্ধম্ } দক্ষযজ্ঞ
১৮৮২....... উত্তরার্দ্ধম্ }

"আত্মচরিত" ১৮৭৩ সালে লিখিত হয় বলিয়া "দক্ষযজ্ঞ"-এর উল্লেখ নাই। সুপ্রসিদ্ধ কাউ-এল সাহেব "আর্য্যাশতক" লইয়া তাঁহাকে যে পত্র লেখেন তাহাতে আপনি "গৌড়দেশীয় 'কবিনাং মধ্যচূড়ামণি স্বরূপ'—এবং আশা করি এখনও বাঙ্গলা নাটক লিখিবেন" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (১৩২৩ সালের কার্ত্তিক মাসের 'ভারতবর্ষে' চারুবাবুর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)

বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন, "তাঁহার সংস্কৃত রচনা এতদূর প্রাঞ্জল অলঙ্কারপূর্ণ এবং তাহাতে কবিত্বশক্তি এত মধুর যে তাঁহার 'আর্য্যাশতক' ও 'দক্ষযজ্ঞ' সহসা কবিচূড়ামণি কালিদাসের রচিত বলিয়া ভ্রম হয়।"

এই কথা যে কত সত্য তাহা বহুদিন পরে অধ্যক্ষ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্মৃতি-কথায় পাওয়া যায়। বলেন, (১৩১৭) "পণ্ডিত রামনারায়ণ আমার শিক্ষক প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের 'রত্নাবলী' শিক্ষিত বঙ্গসমাজে আদরের বস্তু। সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে তিনি যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, সেরূপ প্রায় দেখা যায় না। "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব" নাটকে ইহার যথেষ্ট নমুনা আছে। একটী শ্লোক আছে (৬ষ্ঠ অঙ্ক) যাহা মাঘ কবি লিখিলেও অগৌরব হইত না। কবিতাটী এই :—

"অতিরক্ত বপুঃস্খলদ্গতি
বর্স্নহীনো বিগতাম্বরো রবি।
পততি প্রতিবারি বারুণী
বহুসেবা ফলমেতদেবহি॥"

এই শ্লোকটির মধ্যে যে pun রহিয়াছে তাহা কেমন সুন্দর! এক অর্থ—সূর্য্যদেব অত্যন্ত লাল হয়ে মন্দগতি, কিরণ সব মিলিয়ে যাচ্ছে এমন অবস্থায় সমস্ত আকাশ অতিক্রম করে জলে ঝাঁপ দিচ্ছেন। পশ্চিম দিকে যাওয়ার এই ফল। অন্য অর্থ—মদ খেয়ে মাতালের শরীর লাল হয়ে উঠেছে, সে চলতে গিয়ে হোচট খাচ্ছে, সব টাকা উড়িয়ে দিয়েছে, গায়ের কাপড় গা থেকে খসে পড়েছে, সে জলে ঝাঁপ দিচ্ছে। অত্যন্ত মদ খাওয়ার ফল এই।

আমরা এখানে আরও একটী শ্লোক পাঠকবর্গকে উপহার দিব। ইহাও এই দ্ব্যর্থ-বোধক—

অয়মেতি বিস্তৃত করঃ পুরতো
দ্বিজরাজ ইত্যভভয়াৎ কৃপণঃ
বিরলো বভুব রবিরাশ্ববসু
নহি যাচকেঽভিমুখা সুলভা।

বঙ্গানুবাদ—

দ্বিজরাজ (১) সমায়াত কর (২) প্রসারিয়া,
দেখি বসু (৩) নিয়া রবি গেল পলাইয়া।
একথা যথার্থ বটে নাহিক সংশয়
কৃপণ যাচকে দেখি সঙ্কুচিত হয়।

উভয় শ্লোকই বিরহীপঞ্চাননের মুখে আরোপিত হইয়াছে, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' তাঁহার প্রিয় কাব্য ছিল। তাঁহার নাটকে জয়দেবের প্রভাব প্রতীয়মান হয়। "কুলীনকুল সর্ব্বস্ব নাটকে" নটীর গানে—

"চুত মুকুল কুল, অকুলদলি কুল
গুণ গুণ রঞ্জন গানে
মদকল কোকিল, কলরব সঙ্কুল
রঞ্জিত বাদল তানে
রতিপতি নর্ত্তন বিরস বিকর্ত্তন
শুক্ত ঋতুরাজ সমাজে
নব নব কুসুমিত বিপিন সুবাসিত
ধীর সমীর বিরাজে।"

—কবি জয়দেবকেই মনে পড়িতেছে। [ক্রমশঃ

*১৮৭২ সালের ১৮ মার্চ্চ হিন্দুপেট্রিয়ট সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছেন।

(১) চন্দ্র ও কিরণ (২) কিরণ ও হস্ত (৩) কিরণ ও ধন

দীপধারী

(গল্প)

শ্রীউৎপলাসনা দেবী

তিন

বৈদ্যনাথের মন্দিরে সে-দিন খুব ভীড়। খুব বড় একজন জমিদার আসিয়াছেন, বাবার পূজা দিতে। সমস্ত পাণ্ডারা জমিদার আর তাঁর গৃহিণীকে যেন গৃধিনীর মত ঘিরিয়া ধরিয়াছে। সে-দিন বিজয় লালুরা, সকলে বিজয়ের জন্ম পূজা দিতে গিয়াছিল। তাহারা পূজা দিয়া বাহিরে আসিতে আসিতে শুনিতে পাইল, কে যেন বলিতেছেন, "ও-চমক্ যেও না ওর মধ্যে, খবর্দ্দার যেও না বল্‌ছি, ওর মধ্যে গেলে আর আস্তট ফিরবে না। একেবারে মত্তহস্তি-পদদলিতার মতন হয়েহ ফিরে আস্‌তে হবে।" চমকলতা তখন পাণ্ডা বেষ্টিত হইয়া মন্দিরের মধ্যে আসিতেছে।

লালপাড় গরদপরিহিতা পুষ্পরিণীকে দেখিয়া বিজয়ের চিনিতে বিন্দুমাত্র দেরী হইল না। বিজয় মন্দিরের বাহিরে আসিয়া দেখিল, মন্দির-চাতালে বসিয়া পরেশবাবু হাঁপাইতে-ছেন। তিনি বলিতেছেন, "বাবা বৈদ্যনাথ মাথায় থাকুন, আমি কি শেষে খুন হবো? উঃ কী ভীড়! ওই মন্দিরে ঢুকতে হ'লে, সব সম্পত্তির উইল পত্তর ক'রে রেখে তবে যেতে হয়। একেবারে সশরীরে পাণ্ডাবাবাজীরা কৈলাসে পৌছিয়ে দেবেন, কি বলেন আপনারা এ কি মন্দির? যেন শিবঠাকুরের শিবলোক! আর পাণ্ডাম'শাইরা যেন মহাদেবের সাক্ষাৎ ভূত প্রেত! বাপুরা তোমরা কি মন্দিরের সংস্কার করতে পার না! দু'টো জানালা কেন ফোটাও না মন্দিরে!"

পাণ্ডারা বলিল, "বাবু আপনি ভক্তি ক'রে টাকা দেন, আমরা মন্দির সংস্কার করি! পয়সা কোথায়?"

চমকলতা পূজা সমাপনান্তে বাহিরে আসিল। পরেশবাবু ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "চমক্, তোমার বড্ড কষ্ট হ'ল, কি ব'ল? কেন গেলে বল তো? ভগবান তো সব জায়গায় আছেন, দিব্যি এখানে ব'সে ওঁর পূজো করতে তো পার্‌তে।"

চমকলতা হাসিয়া বলিল, "না, না, কিছু কষ্ট হয় নি, বেশ বাবার মাথায় হাত দিয়ে পূজো করলুম। বাবার দয়ার সবই হয়। আমার বেশ ভাল লাগলো। তা দরোয়ান কোথায়? যার জন্যে এলুম মন্দিরে! বেচারার যে ফাঁড়া গেছে, ভাগ্যে বাবা ওকে রক্ষা করেছেন, নইলে ডাকাতটা সে-দিন ওকে মেরেই ফেলত।"

দরোয়ান পিছন হইতে বলিল, "হাঁ মা, আপনার কথা ঠিক্। বেটা ডাকু আমাকে যে চোট্ দিয়েছিল, শুধু বাবার কৃপায়ই রক্ষা পেয়েছি। হামি আস্নান ক'রে ষোল আনার ডালা এনেছে,—

বলিয়া দরোয়ান মন্দিরের ভিতর চলিয়া গেল।

এমন সময়ে পরেশবাবু শঙ্কিত স্বরে বলিলেন, "চমক্, তোমার হাতের হীরের বালা কোথায়?" চমকলতা চমকাইয়া উঠিল। তাই তো! তার হাতের হীরের বালা? চমকলতা কাঁদিয়া ফেলিল। তাই তো! এক হাজার টাকা দামের হীরের বালা—ও-মা কি হবে? মুহূর্ত্তে মন্দিরের আঙিনায় হট্টগোল উঠিল। পরেশবাবু ও চমকলতার সম্মুখে বিজয় ভীড় ঠেলিয়া গিয়া বলিল, "কী হারিয়েছে বলুন তো!"

পরেশবাবু বলিলেন। বিজয় চমকলতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মন্দিরে যাওয়ার পূর্ব্বে আপনার হাতে বালা ছিল তো?"

চমকলতা দৃঢ়স্বরে বলিল, "হাঁ! আমার বেশ মনে আছে, বালা দু' গাছা বেশ করে এঁটে আমি বাবার মাথায় দুধ গঙ্গাজল দিলুম।"

"কি রকম জিনিষটা ছিল আপনি বলুন তো, আমি মন্দিরের ভিতরটা একবার দেখে আসি।"

চমকলতা বালাদু'টার সবিশেষ বর্ণনা দিল। কিছুক্ষণ বাদে বিজয় একজোড়া বালা আনিয়া বলিল, "দেখুন তো এই দু'গাছা আপনার কি না? মন্দিরের কাদার মধ্যে পড়ে-ছিল।"

পরেশবাবু ও চমকলতা উভয়েই সাগ্রহে বলিলেন, "হাঁ, হাঁ এই যে এইটেই!" পরেশবাবু গদ গদ স্বরে বলিলেন, "তোমায় আর কি বলব ভাই, আজ থেকে তুমি আমারি ভাই হলে," বলিয়া তিনি বিজয়কে আলিঙ্গন করিলেন। চমক-লতার চোখ দুইটি তখনও ছল ছল করিতেছিল, সে তেমনি ভাবে বলিল, "আপনি যে আমার উপকার করলেন তার ঋণ আমি কোনদিন শুধ্‌তে পারবো না—এ উপকার আমি কোন দিন ভুলবো না।"

বিজয় সবিনয়ে বলিল, "এ আর কি! জিনিষটা যে সহজে পাওয়া গেল, এই আপনাদের উপর বাবার অনেক দয়া বলে।"

পরেশবাবু বৈদ্যনাথের ভোগের দরুণ মোটা টাকা বরাদ্দ করিলেন। তারপর মন্দির-চত্বরে যত দেব-দেবী আছেন, তাঁদেরও ভাল করিয়া পূজা দিয়া বিজয়কে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "আজ তোমাকে আমার বাড়ীতে যেতে হবে।"

বিজয় বলিল, "আপনি কোথায় থাকেন?"

পরেশবাবু বলিলেন, "আমরা থাকি মধুপুর। আজ আমরা পূজো দিতে এখানে এসেছিলাম।"

বিজয় বলিল, "আমায় আপনার ঠিকানাটা দিন, ওদিকে গেলে আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে আসবো।"

পরেশবাবু বিজয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বিজয় একমুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিয়া বলিল, "আমার নাম শ্রীবিজননাথ চট্টোপাধ্যায়। থাকি ক'লকাতায়। পূজোর ছুটিতে বেড়াতে

এসেছি। মধুপুরে আমি হামেসাই যাই, এবার যখন যাবো, তখন আপনার বাড়ীও যাবো।"

চমকলতা গাড়ীতে উঠিয়াছিল। সে গাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া বলিল, "সে হবে না, আপনাকে আমাদের সঙ্গে আজই যেতে হবে। আজ থেকে আপনি আমার দাদা।"

তাহার অনুরোধ বিজয় এড়াইতে পারিল না। সে পরেশবাবুদের সঙ্গে মধুপুর চলিল। বাড়ীতে গিয়া পরেশবাবু ও চমকলতা দু'জনে মিলিয়া বিজয়কে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে আহার করাইলেন। পরে "মাঝে মাঝে আসব" এই প্রতিশ্রুতি বিজয়কে করাইয়া ছাড়িলেন।

ইহার কিছুদিন পরে একদিন হাটের মধ্যে পরেশবাবুর দারোয়ান বিজয়কে মস্ত এক সেলাম ঠুকিয়া বলিল, "আপকো, হামারা রাজাবাহাদুর বোলাতেছে।"

বিজয় বিস্মিত হইয়া বলিল, "তিনি কোথায়?"

দারোয়ান দূরে একটী গাড়ী দেখাইয়া বলিল, "ওই যে ডাক্তারবাবুকো কোঠিকা সামিনা।"

বিজয় গাড়ীর কাছে গিয়া দেখিল, গাড়ীর মধ্যে পরেশবাবু, চমকলতা ও তপতী বসিয়া আছে। বিজয়কে দেখিয়া পরেশবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন," এসো, এসো বিজয়, এসো," বলিয়া নামিতে উপক্রম করিলেন, চমকলতা পরেশবাবুর হাত ধরিয়া বলিল, "নেমো না, ডাক্তারবাবু তোমাকে নড়াচড়া করতে বারণ ক'রেছেন।"

বিজয় বলিল, "কেন? ওঁর বুঝি অসুখ করেছে? কি অসুখ?"

পরেশবাবু বলিলেন, "আমার অসুখ হ'ল এখন রক্তশূন্যতা। কিছুদিন রক্তামাশয় ভুগে আমার শরীর এমন হয়েছে যে, গায় এখন রক্ত নেই বল্লেই হয়। সেজন্যে চেঞ্জে এলাম। দুর্ব্বল শরীর বেশী দূরদেশে যেতে সাহস হ'ল না।"

বিজয় বলিল, "সবল লোকের গায়ের রক্ত তো নিলে পারেন।"

চমকলতা বলিল, "সেই জন্যেই তো এখন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম, একজন বলিষ্ঠ লোক দিতে পারেন কিনা।"

—"তা ডাক্তারবাবু কি বল্লেন?"

চমকলতা বিষণ্ণভাবে বলিল, "তিনি বল্লেন, না আমি কোথায় পাবো? এ তো আর ক'লকাতা নয়, যে না চাইতেই পাওয়া যাবে। পয়সা দিলে ক'লকাতায় মেলে না এমন জিনিষ নেই। এখন দু'দিন ধ'রে ওঁর শরীরটা যে রকম খারাপ হ'য়েছে, মনে করছি ক'লকাতায়ই ফিরে যাই। যেমন করে পারি, ওঁকে এখন রক্ত দেওয়াতেই হবে।"

বিজয় চমকলতার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। বৎসরখানেক পূর্ব্বে দেখা হাস্য দীপ্তিমুখী তরুণী-মূর্ত্তিতে দুশ্চিন্তায় প্রৌঢ়ত্বের ছাপ পড়িয়াছে। বিজয় ব্যথিত নেত্রে চমকলতার দিকে তাকাইয়া বলিল, "আপনাকে তো ভাল দেখছি নে। কয়দিনে আপনি খুব রোগা হয়ে গেছেন।"

পরেশবাবু বলিলেন, "চমক্ ছেলেমানুষ, আমার অসুখ দেখে বেচারী বড্ড ভয় পেয়েছে।"

বিজয় বলিল, "রক্ত দেওয়ার জন্যে লোকের ভাবনা? আচ্ছা আমি আপনার ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করবো, কখন কোন সময়ে দেখা করতে পারবো বল্‌তে পারেন?"

পরেশবাবু বলিলেন, "কাল সকালবেলা ডাক্তারবাবুর আমার বাড়ীতে যাওয়ার কথা আছে, ওই সময়ে আমার বাড়ী গেলে দেখা পাবে। তা কেন বলো তো? তোমার কাছে কি কোন সুস্থ বলিষ্ঠ লোক পাওয়া যাবে?"

বিজয় হাসিল। পরদিন বিজয় পরেশবাবুর বাড়ীতে গিয়া ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল, "দেখুন তো আমায় পরীক্ষা ক'রে আমার গায়ের রক্ত ওঁকে দেওয়া যেতে পারে কি না।"

ডাক্তার বিজয়কে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "আপনার মত সবল লোকের রক্ত যদি উনি পান, তবে দু'দিনে ভাল হয়ে যাবেন। তা আপনাকে কত ফি দিতে হবে।"

বিজয় বলিল, "আগে আপনি রক্তই দিন তো, পরের কথা পরে হবে।" স্থির হইল সেই দিনই রক্ত দেওয়া হইবে।

রক্ত দেওয়া হইয়া গেলে পরেশবাবু বিজয়কে নিবিড়ভাবে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "তোমায় ভাই আমি কি বলে আশীর্ব্বাদ করবো তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। তোমার নাম বিজয়, তুমি যেন তোমার সকল কাজের মধ্যে বিজয়ী হ'য়ে থাক।"

চমকলতা বিজয়কে প্রণাম করিয়া বলিল, "দাদা, আপনার ঋণ আমি কোন দিন শুধ্‌তে পারবো না, আপনি তো মানুষ নন্, আপনি দেবতা।"

তপতী এক জায়গায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে দেখিয়া বিজয় বলিল, "কি তপতি, তুমি তো আমায় কোন বড় বড় কথা বলে অভিনন্দন করলে না?"

সে হাঁসিয়া বলিল, "বৌদিই তো আপনাকে যা কিছু বড় বল্‌তে হয় সবই তো বলেছেন, একেবারে দেবতা! এর উপর আর তো কিছু নেই বলার।"

বিজয় হাসিয়া বলিল, "উনি যখন দেবতা বল্লেন তুমি তখন দানব বলো।"

তপতী ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল, "তাহ'লে আপনি

যদি খুসী হন, না হয় বল্‌ছি। তবে আপনি দানবই বা বোধ হয়।"

চমকলতা সে-দিন বিজয়কে খাওয়াইতে বসিয়া অনেক কথার মধ্যে বলিল, "ওঁর শরীরটি খারাপ হ'ত না যদি সেই চুরিটী না হ'ত। বলেন কি, প্রায় পনের ষোল হাজার টাকার গহনা ছিল, তার মধ্যে দামী একটা নেক্‌লেস্ ছিল, তারই দাম সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা। সেইটের জন্তে বড্ড দুঃখু হয়। একদিনও পরি নি। একেবারে আন্‌কোরা নূতন। সময়টা খারাপ পড়েছে, নইলে এমন হয়? যাক্, এখন উনি সেরে উঠলেই সব দুঃখু আমার যাবে।"

খাওয়ার পর বিজয় বিদায় লইল। ডাক্তার পরেশবাবুর ইসারা পাইয়া বিজয়কে বলিলেন, "আপনার ফি—"

বিজয় একটু হাসিয়া গেটের দিকে রওনা হইল। পরেশবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আজকে হেঁটে যেও না বিজয়, শরীরটা তো তোমার দুর্ব্বল নিশ্চয়ই হয়েছে, আমার গাড়ীটা বার করতে বল্‌ছি।"

বিজয় শুনিল না। তখন পরেশবাবু ডাক্তারের হাতে একতোড়া নোট দিয়া বিজয়ের দিকে ইঙ্গিত করিতে, ডাক্তার প্রায় ছুটিয়া গিয়া বিজয়কে ধরিয়া বলিলেন, "পরেশবাবু আপনাকে আশীর্ব্বাদ করেছেন, না নিলে তিনি বড়ই দুঃখিত হবেন, নিন্।"

বিজয় হাসিয়া জবাব দিল, "তাঁকে বল্‌বেন, আমি টাকা নেওয়ার লোভে তাঁকে রক্ত দিই নি। আমি টাকা নিতে পারব না। এটা যদি তাঁর কাছে আমার অপরাধ হয়, তাহ'লে তাঁকে আমার অনুরোধ জানিয়ে বল্‌বেন, তিনি যেন তাঁর ছোট ভাইকে মার্জ্জনা করেন। আচ্ছা নমস্কার।"

বলিয়া সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

ইহার পনের দিন বাদে বিজয় ও লালু পরেশবাবুর বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল, দরোয়ান তখন গেটের কাছে দাঁড়াইয়া তার মস্ত লাঠিটা পাশে দাঁড় করিয়া রাখিয়া খৈনী টিপিতেছিল। বিজয়কে দেখিয়া আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হাসিয়া বলিল, "সেলাম বিজোয়বাবু, আসুন।"

বিজয় বলিল, "আরেক দিন আস্‌বো।"

লালু অনুচ্চস্বরে বলিল, "এই বুঝি তোমার সাহেবজী?"

বিজয় চাপাগলায় বলিল, "চুপ।"

দরোয়ানজীর কানে বোধ হয় কথাটা গেল। সে সন্দিগ্ধ ভাবে বলিল, "কেঁ-উ? সাহেবজী।"

বিজয় তাড়াতাড়ি বলিল, "এই বাবু বল্‌ছেন, বাবু সাহেব কি বাড়ীতে আছেন?"

"হাঁ, উই তো সব বৈঠা আছেন।"

বলিয়া দরোয়ান বাড়ীর মধ্যে বাগানের মধ্যস্থলে মার্ব্বেল পাথরের বেদীর উপর চেয়ার পাতিয়া সকলে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন, সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। বিজয়ের গলার স্বর শুনিয়া পরেশবাবু তপতীকে বলিলেন, "বিজয় বোধ হয় গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে ভিতরে নিয়ে এসো।"

তপতী যাইয়া বিজয়কে বলিল, "আপনাকে দাদা ডাক্‌ছেন।"

বিজয় ও লালু দেখিল আর এড়াইয়া যাওয়া যাইবে না। অগত্যা তাহারা তপতীর সঙ্গে পরেশবাবুর কাছে গেল। সেখানে পরেশবাবু ও চমকলতা ছাড়া আর একজন ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া বিজয় ও লালু দু'জনেই চম্‌কিয়া উঠিল।

তাহাদের চম্‌কে যাওয়া ভদ্রলোকটির চক্ষু এড়াইল না। সেই ভদ্রলোকটী কুটিল দৃষ্টিতে ঘাড়টি ঈষৎ বাঁকাইয়া বক্রভাবে তাহাদের নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। লালু বিজয়ের হাত ধরিয়া শুষ্কগলায় বলিল, "বেশ যাই হোক্ বিজয়দা, ওখানে যে ছ'টার সময় পৌছানর কথা, তা কি ভুলে গেলেন? ছ'টা বাজতে মাত্র দশ মিনিট বাকি! কতদূর যাবো বল দেখি।"

বিজয় সম্মুখের ভদ্রলোকটীর কুট-দৃষ্টি লালুর শুষ্কগলার ব্যাকুলতা সব অগ্রাহ্য করিয়া লালুকে বলিল, "তুমি যাও আমি আজ যাবো না।"

লালু আরও যেন ভীত হইয়া পড়িল। তার চোখে-মুখে যেন একটা ভয়ার্ত্তভাব ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, "আমি একলা কি ক'রে যাব বিজয়দা! আমি কি কখনো মধুপুরে এসেছি, যখন দেরীই হলো, তখন চল একটা টাঙ্গা নিয়ে যাই, দু'জনে আধা আধি ভাড়া দেবো, কোন গায়ে লাগবে না, চলো চলো, আর দেরী করো না।"

পরেশ বাবু বলিলেন, "অপানি বুঝি কখনও এখানে আসেন নি।"

বিজয় বলিল, "না ইনি ক'লকাতার বাইরে কখনো আসেন নি, সেজন্তে দু-পা যেতে একলা সাহস পান না। আচ্ছা, তবে আজ আসি আমি।"

এমন সময় চমকলতা বলিল, "দাদা কালকে ভাইফোঁটা আপনার আসা চাই কিন্তু।"

পরেশবাবু বলিলেন, "হাঁ হাঁ, ও বিজয় কাল ভাইফোঁটা সকালে আসবে ফোঁটা নেবে, আর চারটি খাবে। চমক ক'দিন ধরেই বল্‌ছে, ওর বড্ড সখ।"

বিজয় বলিল, "আচ্ছা।"

পরেশবাবু বলিলেন, "আসতে নিশ্চয়ই হবে। না আসলে চমকের মনে বড্ড দুঃখ হবে।"

বিজয় যাইতে যাইতে পিছন ফিরিয়া হাসিয়া বলিল, "এই বিদেশে ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণ, কত সৌভাগ্য আমার এটা কি ছাড়ি।"

পথে যাইতে যাইতে লালু বলিল, "দেখ বিজয়দা, তুমি বড় বাড়াবাড়ি করছো। ওই নেমন্তন্ন আবার কি জন্যে নিলে বলতো? বিশেষ যখন দেখলে, সি-আই-ডি সতীশ বেটা বসে তখন তোমার এই নেমন্তন্নে আসা কিছুতেই উচিৎ নয়। ওই বেটা আমাদের মধুপুরের মধু চুষবে। ওই না আমাদের ধানবাদের আড্ডা ভেঙ্গে দিয়ে তাড়া করে নিয়ে এলো। মনে নেই, সেবার আমরা ধানবাদ থেকে ট্রেণে উঠতে যাচ্ছি, ও আমাদের ফটো তুলে নিল? যে রকম উনি আমাদের দেখছিলেন, আমার মনে হয়, আমাদের চিনেছেন ঠিক।"

বিজয় কিছু বলিল না, সে অন্য মনে হাঁটিতে লাগিল।

বাড়ী গিয়া বিজয় খাঁচা খুলিয়া পাখীটাকে বার করিল। তারপর তাহাকে কাঁধে বসাইয়া, কোলে বসাইয়া আদর করিতে লাগিল। বাক্সে প্যাক করা আঙ্গুর পাখীটাকে খাওয়াইতে লাগিল। আমেরিকান আপেল টুকরা করিয়া কাটিয়া পাখীটাকে খাইতে দিল। তার কাণ্ড দেখিয়া লালু, প্রভৃতি হাসিতে লাগিল। বলিল, "পাখীটা যে বিজয়দার দ্বিতীয় পক্ষ।"

বিজয় হাসিয়া বলিল, "তোরা আমার নকল গিন্নীকে আদর করা সহ্য করতে পারিসনে, তবে আমার আসল গিন্নীর আদর তো একেবারেই সহ্য করতে পারবি নে।"

লালু বলিল, "আর গিন্নীর আদর! তুমি যা আরম্ভ করেছো এখানকার পাত তারি এবার তুলতে হবে।"

বিজয় গম্ভীর হইয়া বলিল, "যা বলেছিস লালু, দেশ উদ্ধার ত' সমস্ত জীবন খুব করলাম এখন আর কেন? এখন যা টাকা পয়সা আছে গুপ্ত ঘরে তা তোরা সবাই ভাগাভাগি করে নিয়ে দেশে চলে যা। সেখানে গিয়ে চাষ-বাস করে বিয়ে-থাওয়া করগে, যাতে ভদ্রলোক হতে পারিস। আমাদের সেই সমিতির এই উদ্দেশ্য ছিল যে, ধনীদের টাকা পয়সা কেড়ে নিয়ে গরীবদের দিয়ে চাষ করে দেশে খাদ্য উৎপন্ন করাব, দেশে চাষাদের শিক্ষার জন্য স্কুল হাসপাতাল করাব কিন্তু এখন দেখছি সে সব মহান উদ্দেশ্য কোথায় হারিয়ে ফেলে আমরা রীতিমত চোর গুণ্ডা বনে গিয়েছি! এই নীচ কাজ করে কখনও কি মহৎকাজ সম্পন্ন করা যায়?"

ঘণ্টে বলিল, "আমরা চাষ-বাস করতে দেশে ফিরে গেলাম, কিন্তু তুমি কি করবে?"

বিজয় বলিল, "আমার কথা তোমরা ছেড়ে দাও। আমার কথা তোমরা চিন্তা না করে আমার আদেশটা শোন না।" তারপর সস্নেহে ঘণ্টের পিঠে হাত দিয়া বলিল, "দেখ এই কাজ এখন আমাদের জীবনে ব্যবসার মত এসে দাঁড়াল, তোরা কি চাস এই জঘন্য কাজ নিয়ে সারাজীবন অতিবাহিত করবে? এই সমিতিতে এসে চুরি বিদ্যে ছাড়া আমরা আর কি শিখলাম, বা কি করলাম? এখন যা পয়সা আছে দেশে তোরা নিয়ে যা, পল্লীর উন্নতি করে দেশের পাঁচ জনকেও খাওয়াগে, তোরাও খেয়ে দেয়ে ভদ্রভাবে থাক। আমার ভাইদের ত' বহুদিন ছেড়ে এসেছি, তাদের খবরও বড় জানি না, তোরাই আমার অত্যন্ত আদরের ভাই, আমি ক'দিন ধরে এই ভাবছি, তোদের জীবন আমি ভুল পথে টেনে এনেছি। লক্ষ্মী ভাইরা আমার, আজকের রাত্রের ট্রেণে তোমরা চলে যাও।"

এমন সময় সেই নির্জ্জন প্রান্তর ভেদ করিয়া একটা করুণ আর্ত্তনাদ সকলের কানে আসিল, সকলে জানালার কাছে ছুটিয়া গিয়া দেখিল, অদূরে বড় পাহাড়ের কোলে কতকগুলি মানুষ; তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে, ইহার বেশী আর কিছু দেখা গেল না। বিজয় মুহূর্ত্তেই ব্যাপার কি বুঝিতে পারিল। সে উত্তেজিত স্বরে বলিল, "দেখ, আমি এক্ষুণি বাইরে যাচ্ছি তোরা শিগ্গীর গুপ্ত ঘরে লুকো। তারপর যা কিছু টাকা-পয়সা আছে তোরা সকলে তা নিয়ে ৭৷৹ টার ট্রেণে ক'লকাতা চলে যা, আমার সঙ্গে আর কারুর দেখা করার প্রয়োজন নেই।"

কিন্তু কেহই নড়িল না। তাহারা সমস্বরে বলিল, "বিজয়দা, তুমি নিশ্চয়ই আমাদের কোন বিপদ বুঝতে পারছ, তাই আমাদের যেতে বলছো। আমরা তোমাকে বিপদের মুখে ফেলে কিছুতেই যাবো না।"

বিজয়ের চোখে মুখে তখন একটা উন্মাদনার ভাব। সে ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া বলিল, "আমার হুকুম তোরা শুনবি নে?"

ঘণ্টে ভয়ে ভয়ে বলিল, "বিজয়দা, তোমার আজ্ঞা আমরা কেন শুনব না? তোমার আজ্ঞা আমাদের কাছে শিরোধার্য্য কিন্তু তুমি তোমার প্রাণটাকে কেন এত তুচ্ছ করছো বল ত'? তোমার কাছে তোমার প্রাণের দাম না থাকলেও আমাদের কাছে তোমার প্রাণের দাম অনেক, যদি কোন বিপদ আসে আমাদের তো সবাই এক সঙ্গেই মরব, তোমায় একা রেখে আমরা এক পা'ও যাবো না।"

বিজয় কাতরস্বরে বলিল, "লক্ষ্মী ভাইরা আমার, এই শেষ অনুরোধ! তোমরা এই মুহূর্ত্তে আমার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন কর। আমি আর দেরী করতে পারছিনে। এখন তোমরা গুপ্তঘরে গিয়ে লুকোও বিশেষ প্রয়োজন আছে। তারপর ট্রেণের সময় পর্য্যন্ত যদি আমি তোমাদের সঙ্গে দেখা

না করতে পারি তো তোমরা আমার জন্য অপেক্ষা না করে চলে যাবে। আর সমস্ত টাকা তোমরা নিয়ে যেও। নইলে ও আমার কিন্তু থাকবে না। যাও তোমরা।"

তার সেই কাতরতাপূর্ণ অথচ দৃঢ়স্বরে 'যাও' আদেশ শুনিয়া সকলেই নীরবে গুপ্তঘরে প্রবেশ করিল। বিজয় দ্রুতপদে বাহির হইয়া পাহাড়ের কোলে আসিয়া দেখিল পরেশবাবু মাটিতে পড়িয়া আছেন বেহুঁস অবস্থায়। চমকলতা আকুলি ব্যাকুলি করিয়া কাঁদিতেছে। সতীশবাবু ও তপতী কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া আছে। সতীশবাবু মাঝে মাঝে বলিতেছেন, "তাই ত; দরোয়ান এখনও আসল না, তাই ত'?" বিজয় দূর হইতে এই অনুমানই করেছিল এবং উহাদের সঙ্গে যে সতীশবাবুও আছেন তাহাও সে লক্ষ্য করিয়াছিল। বিজয় চমককে বলিল, "আপনার কিছু ভয় নেই, এই কাছেই আমার বাড়ী, একে আমি এখনি আমার বাড়ীতে নিয়ে যাই, পরে সুস্থ হলে বাড়ী পাঠিয়ে দেবো।"

হঠাৎ এই নির্জন স্থানে বিজয়ের আবির্ভাব এবং ওই পড়ো বাড়ীটাকে তার বাসস্থান বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় সতীশবাবু খুবই সন্দিগ্ধ নেত্রে আবার বিজয়কে দেখিতে লাগিলেন।

চমকলতা বিজয়কে বলিল, "আপনি আমাদের নারায়ণ! যখনি বিপদে প'ড় আপনি যেন মাটিফুঁড়ে আসেন। আহা! ওঁকে নিয়ে চলুন আপনার বাড়ী। ডাক্তার বল্লেন, ওঁকে নিয়ে বেড়াতে যান, তাই এখানে এসেছি। বেড়াতে বেড়াতে কত আনন্দ প্রকাশ করলেন। হঠাৎ কিরকম পা ফস্‌কিয়ে বোধ হয় পড়ে গেলেন। দরোয়ান সঙ্গে ছিল, অন্ধকার দেখে তাকে আবার আলো আনতে পাঠালাম, গাড়ীতেই আলো আছে।"

বিজয় সযত্নে পরেশবাবুকে বুকে তুলিয়া লইয়া বলিল, "আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।" পরেশ বাবুকে অত্যন্ত ধীরে ধীরে বিছানায় শোয়াইয়া দিল। তারপর যেখানে, যেখানে তাহার কাটিয়া গিয়াছিল, সেখানে সেখানে ঔষধ লাগাইয়া দিল। একটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স বাহির করিয়া একডোজ ঔষধ দিল। কিছুক্ষণ বাদে এক বাটি গরম দুধ আনিয়া পরেশবাবুকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে খাওয়াইল। পরেশবাবু অনেকটা সুস্থ হইলেন। বিজয়ের সঙ্গে দু-চারটি কথাও বলিতে লাগিলেন।

বিজয় বলিল, "আপনি যে রকম অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন, আজ আমার বাড়ীতে থাকুন।"

চমকলতা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "থাকা কোন রকমে যায় না, যেতে আমাদের হবেই। তবে উনি তো হেঁটে গাড়ীতে গিয়ে উঠতে পারবেন না, আবার গাড়ীটা রয়েছে সেই ওধারের বড় রাস্তায়। তবে দরোয়ান বোধ হয় মাঠে এতক্ষণ এসে আমাদের খুঁজছে। আপনি একটু বাইরে গিয়ে দেখুন।"

বিজয় বাহিরে গিয়া একটু বাদে দরোয়ানকে লইয়া আসিল।

পরেশবাবু বিজয়কে বলিলেন, "এইবার ভাই তুমি আমাকে পার ক'রে দাও।"

বিজয় পরেশবাবুকে ছোট্ট শিশুর মতন সযত্নে বুকে তুলিয়া লইল। দরোয়ানকে বলিল, "তুমি আলো নিয়ে সামনে চল।" সতীশবাবুকে বলিল, "আপনি ওঁদের নিয়ে আসুন।" পরেশবাবুকে গাড়ীতে বসাইয়া, বিজয় বলিল, "আচ্ছা, আপনি এখন একটু সুস্থ বোধ করছেন তো? এখন আমি যাই।"

পরেশবাবু বলিলেন, "কালকের নিমন্ত্রণটার কথা ভুলে যেও না যেন বিজয়, নিশ্চয়ই কাল যাবে, আমরা তোমার জন্যে পথপানে চেয়ে থাকবো।"

বিজয় হাসিল। সে হাসি যেন ঝড়ে জলে বিধ্বস্ত গোলাপ ফুলের হাসি। বলিল, "সে নিমন্ত্রণ কি ভুলতে পারি?"

সতীশবাবু এতক্ষণে বলিলেন "আচ্ছা এই জনশূন্য মাঠে আপনি একা থাকেন? কেন? বাড়ীটা কি আপনার, না ভাড়াটে?"

বিজয় বলিল, "ওটা আমি কিনেছি, মাঝে মাঝে আমি এসে থাকি।"

গাড়ীতে যাইতে যাইতে সতীশবাবু বলিলেন, "আপনার চুরির তদন্ত এবার বোধহয় আমি সফল ক'রে তুলতে পারবো।"

পরেশবাবু একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকমে?"

সতীশবাবু বলিলেন, "বলবো যখন সমস্ত কাজ হাসিল ক'রে চোরকে আপনার কাছে হাজির করবো।

[ক্রমশঃ

বিচিত্র জগৎ

শ্রীবিশ্ববন্ধু বর্ম্মা

স্কান্দিনেভিয়া (সুইডেন)

স্কান্দিনেভিয়া বলিলে সুইডেন, নরওয়ে ও ডেনমার্ক নর্দ্দিক জাতি অধ্যুষিত এই তিনটি দেশকে বুঝায়। তবে সুইডেন ও নরওয়ে সম্মিলিত হইয়া যে প্রায়ই দ্বীপাকার উপদ্বীপ গড়িয়া তুলিয়াছে তাহাকেই খাস স্কান্দিনেভিয়া বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। আমরা ইউরোপের সর্ব্বোত্তর সীমায় অবস্থিত তুষারশীতল সুইডেনের কথা কহিব।

ভৌগোলিক অবস্থিতি বা প্রাকৃতিক পরিস্থিতি দেখিয়া মনে হইবে সুইডেনে সুমেরুসুলভ প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। অনেক বিষয়ে বৃটিশ দ্বীপ অপেক্ষা সুইডেনের আবহাওয়া অধিক প্রীতিপ্রদ। বৃটিশ দ্বীপে যেরূপ বর্ষা-বাদল ও কুয়াশা-কুহেলিকা সর্ব্বদা দেখা যায় সুইডেনে তাহা নাই। ইহার কারণ সুমেরুসুলভ শীতলতা গাল্‌ফ ষ্ট্রিম নামক উষ্ণ অন্তঃস্রোত সমূহের দ্বারা প্রতিহত হইয়াছে। অন্য দিকে (আতলান্তিক-বেষ্টিত) বৃটিশ দ্বীপের ন্যায় নাতিশীতোষ্ণ জলবাতাস সুইডেনের নিকট আমরা প্রত্যাশা করিতে পারি না। সুইডেনে শীতে যেমন সুতীব্র শীত, গ্রীষ্মে তেমনই অসহ্য গরম। শীতকালে এইদেশের হ্রদ ও নদগুলি পূর্ণরূপে বরফে রূপান্তরিত হইয়া শুভ্র শিলার ন্যায় আকার পরিগ্রহ করে। এইরূপ অপরূপ রূপান্তরের জন্যই রুশীয় বাহিনী একবার সুইডেন আক্রমণ করিবার জন্য ফিন্‌ল্যাণ্ড হইতে পদব্রজে জলের উপর আগাইয়া গিয়াছিল। বৃটিশ দ্বীপের মত বর্ষা-বাদল নাই বলিয়া এই দেশের আবহাওয়া জলীয় বাষ্পবহুল না হইয়া শুষ্ক ও হাল্কা। এই কুহেলিকাবিহীন হাল্কা হাওয়া একটা আনন্দময় অনুভূতি অন্তরে ও সর্ব্ব শরীরে সঞ্চারিত করে। স্কি প্রভৃতি শীতসুলভ ক্রীড়াসমূহ করিবার পক্ষে এই দেশ যেরূপ উপযোগী পৃথিবীর অন্য কোন দেশ সেরূপ নহে। ভারতের ভিতর কাশ্মীরে এই শ্রেণীর ক্রীড়া সুন্দররূপে সম্পাদিত হইবার সুবিধা আছে। ইউরোপের মধ্যে এই সকল খেলার দিক দিয়া সুইডেনই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর দেশ।

গ্রীষ্মে এই শুভ্র তুষারের দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যখন শান্ত শ্যাম কান্তারে রূপান্তরিত হয় তখন বিদেশীয় দর্শকের অন্তরে অপূর্ব্ব হর্ষধারা সঞ্চারিত হওয়া স্বাভাবিক। যাহা শুভ্র ছিল, অলক্ষ্যে অবস্থিত কোন যাদুকরের মায়াদণ্ড তাহাকে সহসা সবুজে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলে। ষ্ট্রবেরি, বিলবেরি, কাউবেরি, র‍্যাস্পবেরি প্রভৃতি বেরি জাতীয় বন্য ফলের গাছ তখন প্রচুর পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়। বনভূমির অপেক্ষাকৃত মুক্ত স্থানগুলিতে বিবিধ বর্ণরাগে রঞ্জিত পুষ্পরাজির প্রদর্শনী গড়িয়া ওঠে। ভারতবাসী ভ্রমণকারিগণের মনে এই দৃশ্য সিকিম, কাশ্মীর এবং নীলগিরির স্মৃতি উদ্রিক্ত করে। যাহারা অত্যুষ্ণ গ্রীষ্মমণ্ডলে বাস করে তাহাদের নিকট তুষারশুভ্র দেশের এই শ্যামসুন্দর সুস্নিগ্ধ রূপ এই শান্তিময় কান্তি অত্যন্ত আনন্দদায়ক সন্দেহ নাই।

সুইডেনকে ইউরোপের ক্যানাডা বলিয়া অভিহিত করা হয়। তবে সুইডেনে ক্যানাডার ন্যায় 'প্রেরি' আখ্যায় অভিহিত তৃণাস্তীর্ণ প্রান্তরবলী দৃষ্ট হয় না। সুদূর আদিম যুগের দিগন্ত অরণ্যানী, বৃহদাকায় হৃদয়হারী হ্রদশ্রেণী, শত শত বেগবতী স্রোতস্বতী ক্যানাডার মত সুইডেন ও উর্দ্ধে মেরুমণ্ডলকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। পার্ব্বত্যের ভিতর সুইডেনের মেরুমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে বাস করে যাযাবর ল্যাপ জাতি এবং কানাডার সর্ব্বোত্তর প্রদেশ এস্কিমো নামক মেরুবাসী সম্প্রদায়ের দ্বারা অধ্যুষিত। সেখানে বিরাট বার্থবনের বুকের উপর দিয়া প্রকাণ্ডকায় এল্‌ক নামক মৃগগণ আজিও ছুটিয়া যায়।

এই দেশকে চারিটি বিশিষ্ট বিভাগে বিভক্ত করা চলে—গথল্যাণ্ড, ভিয়াল্যাণ্ড, নর্ল্যাণ্ড এবং ল্যাপল্যাণ্ড। এই বিভাগগুলি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত। গথল্যাণ্ড বা স্কানিয়া সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষিণে অবস্থিত। ইহাই গথ বা গথিক জাতির প্রাচীন বাসস্থান। সুইডেনের ভিতর ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর ও সমৃদ্ধ প্রদেশ। দক্ষিণস্থ গথল্যাণ্ড সেরূপ পর্ব্বতবন্ধুর নহে। ইহা অপেক্ষাকৃত অনুচ্চ ভূখণ্ডে পূর্ণ। মধ্যে হ্রদাবলী ও বনরাজি, ময়দান ও শস্যক্ষেত্র বিরাজিত রহিয়া এই সকল ভূখণ্ডকে এক প্রকার চিত্তাকর্ষক বৈচিত্র্যে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। নানারকম ফলের গাছ এই অঞ্চলে জন্মায়। ওক, বীচ, ম্যাপ্‌ল, এল্‌ম্‌ ও লাইম প্রভৃতি বৃটিশ দ্বীপ সুলভ বৃক্ষশ্রেণীও এখানে দেখা যায়। এই প্রদেশের আর একটি চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্য প্রাচীন দুর্গ ও প্রাসাদ সমূহ। যে স্থাপত্য প্রণালীতে ইহারা প্রস্তুত উহা 'গথিক' আখ্যায় অভিহিত। এই গথিক প্রণালী শুধু ইউরোপে নহে সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই প্রণালী অধুনা অপ্রচলিত হইলেও ইহা এক সময় ইউরোপে বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। গথিক স্থাপত্যে প্রস্তুত গুরুগম্ভীর গীর্জ্জাগৃহগুলি আজিও আমাদের বিস্ময় ও সম্ভ্রম সঞ্চারিত করিতেছে। এই প্রদেশের উপকূলাংশে বহু বাণিজ্যপ্রধান ও নানা প্রকারের পণ্য-প্রস্তুতকারী নগর ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিয়াছে।

আমরা গথল্যাণ্ডের বুকের উপর দিয়া উত্তরে অগ্রসর হইলে ভেনার, ভেটার, মালার প্রভৃতি হ্রদাবলীকে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে প্রসারিত দেখি। এই প্রীতিপ্রদ মনোমদ হ্রদশ্রেণীর পূর্ব্ব প্রান্তে সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহলম



সুইডেনের পল্লী-ভবন

মায়াপুরীর ন্যায় অবস্থিত বলিলে ভুল হয় না। ইটালীর ভুবনমোহন ভিনিস নগরের ন্যায় ইহাও কতিপয় দ্বীপের উপর অপরূপ রূপপুরীর অনুরূপ অবস্থান করিতেছে। একটি দ্বীপ হইতে অপর দ্বীপে যাইতে সুদৃশ্য সেতু রহিয়াছে। সুদর্শন সৌধশ্রেণী এবং অতিশয় প্রীতিপ্রদ পারিপার্শ্বিক দ্বীপাবলীর উপর নির্ম্মিত এই নগরটি অপার সৌন্দর্য্যের আগার। উক্ত হ্রদাবলীর পশ্চিম প্রান্তে গোথেনবার্গ নামক বাণিজ্যপ্রধান প্রসিদ্ধ বন্দর। হ্রদগুলি পর পর কৃত্রিম পয়ঃপ্রণালীর দ্বারা এরূপ ভাবে সংযুক্ত যে একটি হ্রদ হইতে আর একটি হ্রদে জলযান যোগে অনায়াসে যাওয়া চলে। হ্রদাবলীর পূর্ব্বপ্রান্তস্থ ষ্টকহলম হইতে পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী গোথেনবার্গ ষ্টীমার যোগে যাতায়াত করিবার সময় অত্যন্ত নেত্রতর্পণ দৃশ্যাবলী দর্শকের দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত থাকে। রুদ্র সমুদ্রবক্ষে পরিভ্রমণের সময় ক্ষুদ্র মানুষ বিস্ময় ও সম্ভ্রমে এবং একপ্রকার ভীতিতে অভিভূত হইয়া পড়ে, কিন্তু এই সকল শান্তসুন্দর

মনোহর হ্রদাবলীর কমনীয় ক্রোড়ে বিচরণের সময় নিসর্গের স্নেহস্নিগ্ধ মূর্ত্তি আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া তোলে।

ডিয়ালাণ্ড নামক বিভাগটি এই বৃহদাকার হ্রদাবলী হইতে আরম্ভ হইয়া উত্তরস্থ সিলজান হ্রদের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত উপত্যকাসমূহ পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। এইটি সুইডেনের সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মব্যস্ত অংশ। প্রশস্ত বারণ-স্থল ও বিস্তৃত বনানী ব্যতিরেকে এই অঞ্চলে লৌহ ও তাম্রের সমৃদ্ধ খনি সমূহ অবস্থিত। খনিজ সম্পদের জন্য এখানে সমৃদ্ধিশালী সহরসমূহ ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চলের অরণ্যে পূর্ব্বে প্রশস্ত পত্র শালী ওক ও ম্যাপ্‌ল বৃক্ষ প্রায়ই লক্ষিত হইত। বর্ত্তমানে উহাদের পরিবর্ত্তে প্রকাণ্ডকায় পাইন পাদপ ও ফারবৃক্ষ শ্রেণী দণ্ডায়মান দেখা যায়।

আরও উত্তরে আগাইয়া গেলে শান্তসুন্দরের পরিবর্ত্তে উত্তরোত্তর অধিকতর পর্ব্বতবন্ধুর প্রকৃতি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবে। এই বন্ধুরতা অবশেষে নরওয়ের সীমান্তের সন্নিকটে তুষারশুভ্রশীর্ষ সমুচ্চ শৈলমালায় পরিণতি পাইয়াছে। নদ-নদীগুলিও উত্তরে অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর উদ্দাম ও দুর্দ্দমনীয় প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করিতেছে। বনানীগুলিও অধিক নিবিড় ও নিরবচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই নিবিড় বিরাট বনানীবিমণ্ডিত অঞ্চলটিই নরল্যাণ্ড। সুইডেনের পক্ষে অপূর্ব্ব সম্পদের ভাণ্ডার এই উৎকৃষ্ট কাষ্ঠপ্রসূ প্রকাণ্ড অরণ্যগুলি। প্রতি বৎসর কত বৃক্ষ কাটা হইতেছে, কিন্তু শূন্য স্থান পূর্ণ হইতে বিলম্ব হইতেছে না। দেখিলে মনে হয় যেন অফুরন্ত প্রাণের উৎস কোথাও লুকান রহিয়াছে। নরল্যাণ্ডের ঘন-সন্নিবিষ্ট তরুলতা-বিশিষ্ট বিরাট বনানীগুলি ভল্লুক, নেকড়ে-বাঘ, এল্‌ক হরিণ এবং বহু ক্ষুদ্রকায় বনচর প্রাণীর বাসস্থল। এই অরণ্য-পূর্ণ প্রদেশের উপর দিয়া ইন্দাল, এঙ্গারম্যান প্রভৃতি প্রকাণ্ডকায় নদী বেগে বহিয়া গিয়াছে। এই সকল নদীতে ষ্টিমারযোগে ভ্রমণ করিবার সময় ভ্রমণকারীর সম্মুখে অরণ্য প্রকৃতির যে অপরূপ রূপ প্রকটিত হয় তাহা অতুলনীয়, সুদূর উত্তরে অবস্থিত এই শুভ্র তুষারের দেশ অসংখ্য পাদপ প্রসূ, এরূপ প্রবল প্রাণশক্তি কোথা হইতে পাইল তাহা ভাবিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। এই সকল নিবিড় অরণ্যে যে সকল বৃক্ষ শীতকালে কাটা হয় বসন্তের উষ্ণ করস্পর্শে তুষাররাশি গলিয়া গেলে তাহারা জল-স্রোতের সহায়তায় উপকূলবর্ত্তী সহরসমূহে আনীত হয়। আমাদের দেশে নেপালের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাষ্ঠখণ্ডগুলি গণ্ডক ও গঙ্গা নদীর নীরে ভাসাইয়া যেমন কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে আনা হয়, সুইডেনেও প্রায় সেইরূপ প্রণালীতেই নরল্যাণ্ডের উৎকৃষ্ট কাষ্ঠখণ্ডগুলি উপকূলস্থ বন্দরগুলিতে আনীত হইয়া থাকে। কাঠের জন্য উপকূলে গেফ্‌লে, সুন্দসভাল, হের্ণোসান্দ, উমিয়া প্রভৃতি বন্দর জন্মলাভ করিয়াছে। এই সকল উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ সুইডেনের পক্ষে যেরূপ সম্পদের হেতু হইয়াছে র‍্যাণ্ডের স্বর্ণখনি দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে সেইরূপ হইয়াছে কি না সন্দেহ।

নরল্যাণ্ড পার হইয়া এই দেশের একান্ত উত্তর সীমান্তে উপনীত হইলে ল্যাপল্যাণ্ড নামক সুমেরুমণ্ডলবর্ত্তী প্রদেশে পৌঁছান যায়। এখানে আসিতে আর্কটিক সার্কল নামক কল্পিত রেখা অতিক্রম করিয়া সেই স্থানে পদার্পণ করিতে হয় যেখানে ফিনল্যাণ্ড এবং নরওয়ে সংযুক্ত হইয়াছে। নদী-তীরবর্ত্তী উপত্যকাগুলি নরল্যাণ্ডের ন্যায় এখানেও পাদপসম্পর্কীয় সম্পদের ভাণ্ডার, কিন্তু উপত্যকাগুলির মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডগুলি অন্যরূপ। দুই দিকে বৃক্ষশ্যাম উপত্যকা মধ্যে টুণ্ড্রা নামক উষ্ণ প্রান্তর বা একপ্রকার জলা বা বিল। এই সকল বিলে একপ্রকার শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ জন্মায় যাহা মেরুবাসী বল্গাহরিণদিগের প্রধান আহার্য্য। এই মেরু অঞ্চলেই গ্রীষ্মে নিশীথসূর্য্য এবং শীতে অরোরাবোরিয়ালিস বা মেরুজ্যোতি বিস্ময়কর দৃশ্য প্রকাশিত করিয়া দর্শককে স্তম্ভিত করে। এখানে নিদাঘে যেমন কতিপয় সপ্তাহব্যাপী সুদীর্ঘ দিন তেমনই শীতে বা শিশিরে কয়েক মাস ব্যাপী সুদীর্ঘ রাত্রি দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই নিশীথসূর্য্যের দেশে এরূপ লৌহপ্রস্তর স্তর অবস্থিত, যাহাদিগকে পৃথিবীর উৎকৃষ্টতম লৌহপ্রস্তর খনিসমূহের অন্যতম বলা চলে। গেলিভারা এবং কিরুণা এই দুইটি স্থানে লৌহপ্রস্তরপুঞ্জের এমন বিরাট নিরেট পাহাড়সমূহ বিরাজিত যে উহাদের প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ বিশুদ্ধ লৌহ। বর্ত্তমান সংগ্রাম আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে লক্ষ লক্ষ টন লৌহপ্রস্তর জার্ম্মাণীতে বৃটেনে রপ্তানী করা হইত। সংগ্রামে সুইডেন নিরপেক্ষতার



সুইডিস্ তরুণী

পরিবর্ত্তে জার্ম্মাণীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইতে বাধ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। সুতরাং আমাদের বিশ্বাস সুইডেন হইতে জার্ম্মাণরা বিস্তর লৌহপ্রস্তর লইয়া গিয়া সমর সম্পর্কীয় উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। লৌহপ্রস্তর বহনের জন্য এই অঞ্চলে যে বৈদ্যুতিক রেলপথ প্রস্তুত হইয়াছে উহাই পৃথিবীর সর্ব্বোত্তর রেলওয়ে বলিয়া বিবেচিত। এই রেলপথটি বথনিয়া উপসাগরের শীর্ষদেশের সন্নিকটে অবস্থিত লুলিয়া হইতে লফোদেন দ্বীপপুঞ্জের নিকটবর্ত্তী নরওয়ের আতলান্তিক পার্শ্ববর্ত্তী উপকূলে দণ্ডায়মান নার্ভিক নামক বন্দর পর্য্যন্ত প্রসারিত। শত শত মাইল অতিক্রম করিয়া পোলার সার্কল ষ্টেশন পার হইয়া আমরা ভ্রমণকারীদিগের বিশ্রামস্থল এবিস্কো নামক স্থানে অনায়াসে পৌঁছিতে পারি। এই স্থানটি টর্নেট্রেস্ক নামক হ্রদের তটদেশে বিরাজিত। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী পর্য্যটক রেজিনার্দ্দ এবিস্কোকে মনুষ্যবাসযোগ্য পৃথিবীর প্রান্ত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

সুইডেনের ভৌগোলিক পরিস্থিতির ভিতর ভ্রমণকারীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিকর স্কেরগার্দ্দ বা গার্ডেন অফ স্কেরিজ আখ্যায় অভিহিত দৃশ্যাবলী। এই দেশের উপকূল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জে পরিবেষ্টিত। বেষ্টনীর ন্যায় বিরাজিত এই দ্বীপসমষ্টিকেই স্কেরগার্দ্দ নাম প্রদত্ত হইয়া থাকে। দ্বীপগুলির সংখ্যা এত অধিক যে গণিবার সময় শত শত না বলিয়া সহস্র সহস্র বলিয়া গণনা করিতে হয়। পশ্চিমোপকূলের পার্শ্বস্থ দ্বীপাবলীর অধিকাংশই

অনুর্ব্বর পাহাড় শ্রেণীমাত্র, কিন্তু পূর্ব্বোপকূলের পার্শ্ববর্ত্তী দ্বীপগুলি আকারে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং উর্ব্বর ও বনশ্যাম বটে। বথনিয়া উপসাগরের



লেকল্যাণ্ডের গীর্জ্জাগৃহ

উপকূলে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় স্বপ্নপুরীর গোলক ধাঁধাঁ গড়িয়া বলিলে ভুল হয় না। গথল্যাণ্ড ও ওল্যাণ্ড নামক দ্বীপদ্বয় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহারা এতবড় যে এক একটি প্রদেশ বলিলেও চলিতে পারে। প্রাচীনকাল হইতে বহু লোকালয় ইহাদের বক্ষে বিরাজিত রহিয়াছে। অতীতের ভীতি সঞ্চারক নির্ভীক ভিকিং সম্প্রদায় এবং হ্যানিয়াটিক লীগ নামক বণিকসঙ্ঘের সহিত ইহাদের সম্পর্ক আছে। স্কটল্যাণ্ডের গ্লাসগো নগরের পক্ষে লক নামক হ্রদাবলী এবং পার্শ্বস্থ দ্বীপগুলি যেমন অপূর্ব্ব দর্শনীয় তেমনই ষ্টকহলমের পক্ষে স্কেরগার্দ্দ আখ্যায় অভিহিত এই অপরূপ দ্বীপময়ী বেষ্টনী। সম্পত্তিশালী ব্যক্তিগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলির বুকে ভিলা জাতীয় ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহারা তাঁহাদের দ্বারা গ্রাম্যাবাসরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এই পরম রমণীয় দেশের লোকসংখ্যা অতিশয় অল্প। সকল উপকণ্ঠসহ লণ্ডন মহানগরে যত লোকের বাস তদপেক্ষা কম লোক সুইডেনে অবস্থান করে এই সত্য অনেককে বিস্মিত করিতে পারে। এই দেশের প্রায় সকলেই সুইডিস। ইহাদের সংখ্যা ৬০ লক্ষের অধিক হইবে না। ইহারা প্রধানতঃ স্কানিয়ার শস্য সমৃদ্ধ প্রান্তরে বাণিজ্য প্রধান কর্ম্মব্যস্ত বড় বড় নগরগুলিতে, লৌহখনি পূর্ণ অঞ্চলে এবং অরণ্যপ্রধান প্রদেশে বাস করিয়া থাকে। এই দেশের উত্তরে অপর দুইটি সম্প্রদায় আমরা দেখিতে পাই। বথনিয়া উপসাগরের শীর্ষদেশের চতুর্দ্দিকে প্রায় ২৫ হাজার ফিনের বাস। ঐ উপসাগরের পরপারে অবস্থিত ফিনল্যাণ্ড নামক দেশে যে ফিনগণ বাস করে ইহারা তাহাদেরই ভ্রাতা। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে উরাল পর্ব্বত শ্রেণীর নিকট হইতে ফিনদের পূর্ব্বপুরুষরা আসিয়া এই অঞ্চলে অবস্থান করিতে আরম্ভ করে। আকৃতি দেখিয়া বুঝা যায় মোঙ্গোলীয় শোণিত ইহাদের দেহে প্রবাহিত রহিয়াছে। হাঙ্গেরীর হানগণও মোঙ্গোলীয়ান। ফিনগণ ব্যতিরেকে আর এক প্রকার খর্ব্বাকায় সম্প্রদায় এখানে দেখা যায়। আমরা ল্যাপ জাতির কথা কহিতেছি। ইহাদের দেহেতে মোঙ্গোলীয় শোণিত বিদ্যমান। এই যাযাবর জাতিকে তুষার ঊষর উত্তরমেরুর বেদুইন বলিয়া অভিহিত করা হয়। মরুবাসী দুর্দ্দমনীয় বেদুইন এবং মেরুচারী দৃঢ় দেহ খর্ব্বতনু ল্যাপজাতি উভয়েই আমাদের দৃষ্টিতে বিচিত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ল্যাপরা বন্য হরিণের দল লইয়া যেখানে চারণভূমি পায় সেখানে কিছুদিন থাকে এবং সেখানে তাহাদের আহার্য্য শৈবাল শেষ হইলে পুনরায় অন্য কোন চারণ স্থানে চলিয়া যায়। সভ্যতার অগ্রগতির সহিত রেড ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের ন্যায় ল্যাপদের সংখ্যাও ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে।

যদিও সুইডিসদিগের সংখ্যা অধিক নহে কিন্তু ইহারা সেই নর্দ্দিক জাতির সন্তান যাহারা একসময় ইউরোপের নানা দেশে গিয়া বাস করিয়াছে। বর্ত্তমান জার্ম্মাণরা আপনাদিগকে নার্দ্দিকদিগের বিশুদ্ধতম বংশধর বলিয়া মনে করিয়া গর্ব্বিত হইয়া থাকে। হিটলারের মতে নার্দ্দিকদের দেহে বিশুদ্ধ আর্য্যরক্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। নার্দ্দিক প্রাধান্য পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে এই উচ্চাশা তিনি পোষণ করেন। সুইডিসরা বিরাট গথিক জাতির প্রকৃত প্রতিনিধি। ইউরোপের আর কোন দেশবাসীর দেহে বিশুদ্ধ গথিক শোণিত প্রবাহিত নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ইংরাজের শরীরে নার্দ্দিক বা টিউটনিক রক্ত রহিলেও তাহা অন্যান্য শোণিতের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া বর্ণশঙ্করত্বের কারণ হইয়াছে সে বিষয়ে সংশয় নাই। গথগণ বার বার দাক্ষিণস্থ দেশসমূহে আগমন করিয়া তথাকার অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলদেহ সম্প্রদায়-সমূহের শরীরে শক্তিশালী গথিক শোণিত সঞ্চারিত করিয়াছে। জনৈক ইংরেজ লিখিয়াছেন—পৃথিবীর বিখ্যাতনামা বিজেতৃ জাতিদিগের মধ্যে জাপানী ব্যতিরেকে আর সকলের শরীরেই স্বল্পবিস্তর গথিক শোণিত বিদ্যমান রহিয়াছে। অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিচার করিলে এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া আমাদের মনে হয় না। অবশ্য ইউরোপ ও আমেরিকার বিজেতৃ জাতি বা শাসক সম্প্রদায়দিগের শরীরে অল্প বিস্তর গথিক বা নর্দ্দিক শোণিত থাকা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

গথল্যাণ্ড এবং এল্যাণ্ডের দ্বীপাবলীতে, স্কানিয়ায়, সিলিজান হ্রদের চতুর্দ্দিকে বিরাজিত উপত্যকাসমূহে পরিভ্রমণকালে আমরা যে সকল সুইডিস দেখিতে পাই তাহারা জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি অব্যাহত রাখিয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। উপকূলবাসী ধীবরদিগের মধ্যে আমরা অতীতের ভীতিজনক নির্ভীক ভিকিং নাবিকদিগের সন্তানদিগকে দেখিতে পাই। ইউরোপের ভিতর সুইডিসরাই সর্ব্বাপেক্ষা সুদীর্ঘ শরীরশালী সম্প্রদায়। ইহাদের কেশ-কলাপ কৃষ্ণকায় না হইয়া স্বর্ণাভ শনের ন্যায় সুদৃশ্য। ইহাদের নেত্র নীলাভ ধূসর বা সম্পূর্ণ নীলবর্ণ। নিবিড় বনানীবক্ষে বিরাজিত নির্জ্জন নিস্তব্ধতার ভিতর পরস্পর বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ গৃহগুলিতে বাস করার জন্য ইহাদের স্বভাব এক প্রকার বিষাদ-গম্ভীরভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহারা অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্রিয়। এই স্বাধীনতায় কেহ হস্তক্ষেপ করিবে ইহা ইহারা আদৌ পছন্দ করে না। ইহারা বিদেশীয়দিগের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন এবং অত্যন্ত অতিথিবৎসল। ন্যায় পরায়ণতা, সত্যবাদিতা ও সরলতা ইহাদের সদ্গুণাবলীর অন্যতম। আরও এমন কতকগুলি সদ্গুণের ইহারা অধিকারী যাহার জন্য তাহারা নানা দেশে বিশাল উপনিবেশসমূহ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহারা অসমসাহসিক অভিযান বা এডভেঞ্চার ভালবাসে এবং অসাধারণ অধ্যবসায়ের অধিকারী বলিয়াই পৃথিবীতে এরূপ প্রবল প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে। ইহারা যে কোন কঠোর কাজও নৈপুণ্যের সহিত করিতে সক্ষম।

গত অর্দ্ধশতাব্দীর ভিতর নানা প্রকার পরিবর্ত্তন এই দেশে দেখা দিয়াছে। কোন কোন জিলায় কৃষিকার্য্যের পরিবর্ত্তে আজকাল কলকারখানার কাজ চলিতেছে। সুইডেনকে স্বাধীনতার চিরন্তন লীলাস্থলী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই দেশের কৃষকরাও কোনকালে সম্ভ্রান্ত বংশের বা অভিজাত সমাজের ক্রীতদাসরূপে কার্য্য করে নাই। সুইডিস্ কৃষকরা স্বদেশের অতীতকে গভীর শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করে। অতীতের দেশভক্ত বীরগণ আজিও তাহাদের পূজা প্রাপ্ত হয়। যেমন স্কটল্যাণ্ডবাসী কৃষকরা ওয়ালেস ও রবার্ট ব্রুসের উদ্দেশ্যে আজিও শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছে তেমনই ইহারা গুস্তাভাস ভাসা প্রভৃতি বীরগণের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করে।

সুইডেনের দর্শনীয় দৃশ্যাবলীর ভিতর যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক বলিয়া অভিহিত করা চলে সেই উত্তরস্থ সিলিজান হ্রদকে 'দালার্ণের চক্ষু' বা দালেকালিয়া আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। শ্যামল সুষমায় সমৃদ্ধ আরণ্য-সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি শান্ত গম্ভীর অরণ্যানী এবং অঙ্কিত আলেখ্যবৎ অবস্থিত উপত্যকাসমূহে পরিবেষ্টিত বলিয়া এই হ্রদ অধিকতর প্রীতিপ্রদ বা মনোমদ হইয়াছে সন্দেহ নাই। এই পরম রমণীয় উপত্যকাগুলিতে সুইডেনের দীর্ঘদেহ ও বলবান কৃষিজীবী সন্তানগণ অবস্থান করে। খাস বা বিশুদ্ধ সুইডিস ইহারাই। এই দেশের প্রাচীন আচার ও অনুষ্ঠান, ভাষা ও সাহিত্য কথা ও কাহিনীসমূহের সহিত যাঁহারা পরিচিত হইতে চান তাঁহাদিগকে আমরা সিলিজান হ্রদের পার্শ্ববর্ত্তী উপত্যকাগুলিতে ভ্রমণ করিতে বলি। উপত্যকাবাসী এই দেশের প্রাচীন পরিচ্ছদ আজিও পরিতেছে।

ইউরোপের উত্তরের দেশগুলিতে ২৪শে জুন অনুষ্ঠিত 'মিড্-সামার ডে' নামক পর্ব্বই সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় উৎসব। ইহা সুইডেনে 'জোহানেসদাগেন' আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। শব্দটির অর্থ 'সেন্ট জনের দিন'। পূর্ব্বকালের খৃষ্টীয় পুরোহিতগণ এই পর্ব্বটিকে প্রাচীন দেববাদ হইতে লইয়া খৃষ্টীয় ক্যালেণ্ডার বা পঞ্জিকায় স্থান দান করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই পর্ব্বটি সুপ্রাচীন সূর্য্যপূজা বা সবিতৃবাদের অবশেষ। সুমেরুর সন্নিকটবর্ত্তী তুষার-শীতল সুদূর উত্তরে বিশ্বপ্রসবিতা সবিতৃদেবতার শক্তি ও সৌন্দর্য্য এই দিনটিতে আশ্চর্য্যরূপে প্রকটিত হয় বলিলে ভুল হয় না। এই দিনটিই এই সকল দেশের পক্ষে বৎসরের দীর্ঘতম দিবস। সুতীব্র শীতের দেশে সূর্য্যদেব প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-সহকারে সম্পূজিত হওয়া স্বাভাবিক। অনেকের অনুমান বৈদিক সূর্য্যার্চনা ...



প্রাচীন দুর্গ

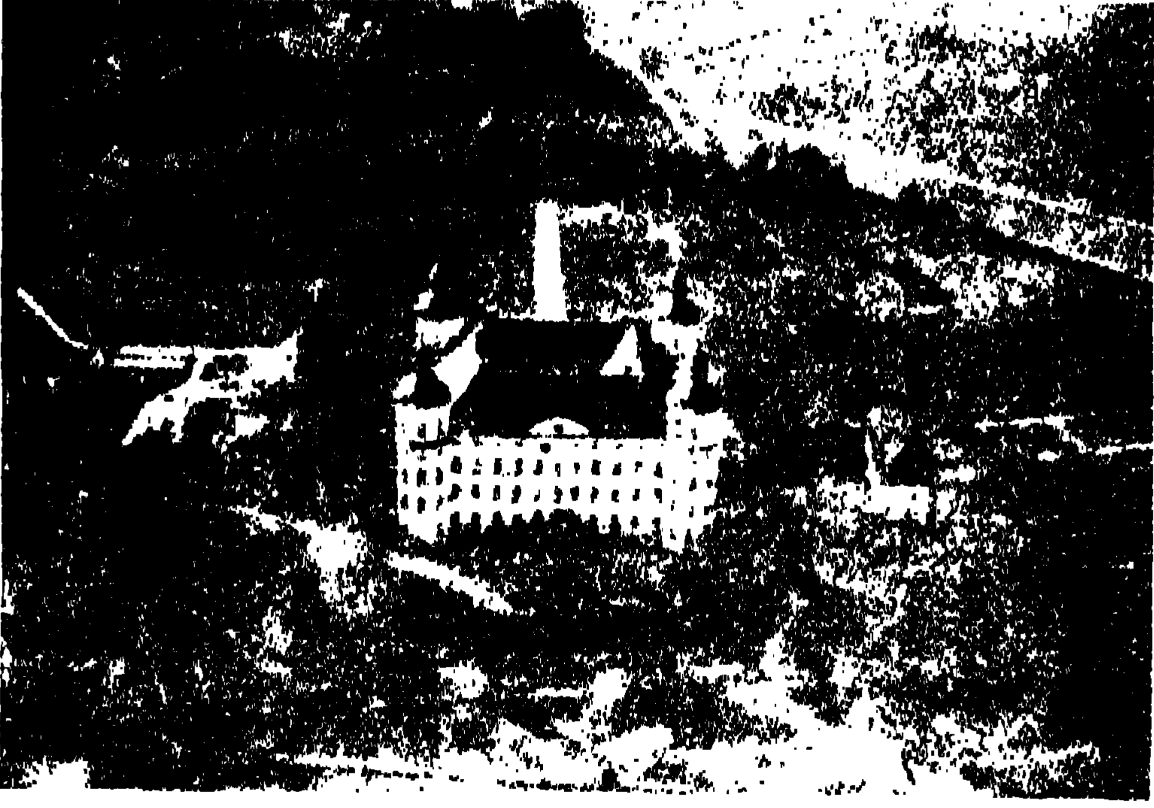
কোন দেশে থাকিতেন অথবা সে সময় ভারতবর্ষের অংশবিশেষ বিশেষ শীতপ্রধান ছিল। হইতে পারে আদিম বৈদিক দেববাদ আফগানিস্থানে বা ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী শীতার্ত্ত অঞ্চলে জন্মলাভ করিয়াছিল।



অবজারভেটরি বা মানমন্দির

প্রায় সকল দেশের প্রত্যেক প্রধান পর্ব্বদিবস বা উৎসব প্রকৃতির সুন্দর ও সমুজ্জল মূর্ত্তি প্রকাশিত থাকার কালে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আমাদের রাস, ঝুলন, দোল প্রভৃতি উৎসবগুলি পূর্ণচন্দ্রকরোদ্ভাসিত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় রাত্রিতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান উৎসব বা পর্ব্ব দুর্গোৎসবও শুক্লপক্ষে সম্পাদিত হইয়া থাকে। আমাদের দোলযাত্রার মত 'মিড্-সামার-ডে'-কেও বসন্তোৎসব বলিলে অন্যায় হয় না। সমগ্র সুদীর্ঘ শীতকাল ব্যাপিয়া সারা দেশ শুভ্র তুষার বাসে সমস্ত শরীর সমাবৃত করিয়া যেন নিবিড় নিদ্রায় নিমগ্ন থাকে। তখন রবিরশ্মিরেখা বা দিনের আলো ক্ষণকালের জন্য দেখা দিয়া অকস্মাৎ অন্তর্হিত হয়। তারপর বসন্ত আসিয়া তাহার ঐন্দ্রজালিক উষ্ণ করস্পর্শে প্রকৃতির সেই প্রগাঢ় প্রসুপ্তি ভাঙ্গিয়া ফেলে। তুষাররাশি বিগলিত হইবার ফলে নদী ও নির্ঝর নিচয়ের ঝঙ্কারে দিব সকল মুখরিত হয়। কাননে কাননে সুস্নিগ্ধ সুরভিশালী কমনীয় কুসুমকুল বিকশিত হইয়া উঠে। যেন শুভ্রবাসা বিষাদ মৌনী বিরহিণী সহসা বর্ণ-বৈচিত্র্যে চিত্ত-চমৎকারী ...

প্রকৃতির বুকে যখন এই পরমপ্রীতিকর পরিবর্ত্তন প্রবাহ বহিতে আরম্ভ করে তখন সুইডেনবাসী নরনারী আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাঁহার কৃপায় এই পরিবর্ত্তন সেই সূর্য্যদেবের অর্চ্চনামূলক এই উৎসব সম্পাদন করে। এই দিনটিতে সূর্য্যদেব আদৌ অস্তমিত হন না। যখন দিনান্তে নিশা দেবী আসেন তখনও সৌররশ্মি একপ্রকার স্বপ্নময় ঐন্দ্রজালিক সৌন্দর্য্যের জালে পৃথিবী, আকাশ ও সমুদ্রকে আচ্ছন্ন করিয়া আমাদের মনে কোন অপার্থিব দূর দিব্য-লোকের স্মৃতি উদ্রিক্ত করিয়া তোলে। আমরা এই সময় যতই উত্তরে আগাইয়া যাই না কেন সূর্য্যদেবকে সর্ব্বদা উত্তর-দিক্‌চক্র রেখায় অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে বিরাজিত দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইব।



প্রাচীন মঠ

সুইডেনে আমরা বর্ত্তমানে প্রবল পরিবর্ত্তন বহিয়া যাইতে দেখি। অতীতের সেই কৃষিপ্রধান দেশ ক্রমশঃ শিল্প ও বাণিজ্য প্রধান রাষ্ট্রে পরিণতি পাইতেছে। তবে গ্রামাঞ্চলে যাইলে এখনও আমরা কৃষকদিগকে দেখিতে পাইব। কৃষকরা নিস্কর জমি যেরূপ স্বাধীনতার সহিত উপভোগ করে তাহা দেখিলে আমরা আমাদের দেশের করভার প্রপীড়িত জমিদারশ্রেণীর পদানত কৃষকদিগের কথা ভাবিয়া একপ্রকার বেদনা অনুভব করিব। কৃষিব্যতিরেকে আর দুইটি কাজ আমরা এখানে প্রাচীনকাল হইতে অনুষ্ঠিত হইতে দেখি। আমরা লৌহ ও টিম্বারের কাজের কথা কহিতেছি। এই দুইটি দ্রব্যের সহিত সভ্যতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। দুইটি জিনিষ এখান হইতে বিদেশে চালান যায় এবং তথায় শিল্পীদের দ্বারা বা কল-কারখানায় নানাপ্রকার পণ্যে পরিণতি পায়। তবে বর্ত্তমানে সুইডিসরা কাঠ, লৌহ হইতে আপনাদের দেশে কয়েক প্রকার পণ্যপদার্থ প্রস্তুত করিতে প্রবল প্রযত্ন করিতেছে। কাষ্ঠের একটি বিস্ময়কর পরিণতি কাগজ ও কাগজ-মণ্ড। এই দেশে প্রচুর কাগজ ও কাগজমণ্ড বা পেপার-পাল্প প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাষ্ঠজাত পরম প্রয়োজনীয় পণ্যের অন্যতম দিয়াশলাই। আজ-কাল জাপান প্রভৃতি দেশে দিয়াশলাই প্রস্তুত হইতেছে, কিন্তু এক সময় সুইডেনই এ বিষয়ে অগ্রণী ছিল। দিয়াশলাই প্রস্তুত করিবার বৃহত্তম কারখানা এই দেশেই। লৌহ সম্পর্কীয় কার্য্যেও এই দেশের ইঞ্জিনিয়াররা অগ্রগণ্য।

শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় এইরূপ দ্রুত-উন্নতির অন্যতম হেতু তাড়িত শক্তির সুলভতা। বড় বড় নদী ও প্রপাতগুলির সাহায্যে তাড়িতশক্তি সহজেই সম্ভূত হয় বলিয়া এইদেশে এই শক্তিকে নানাপ্রকার পণ্য প্রস্তুত কার্য্যে ব্যবহার করা আদৌ কঠিন নহে। এই দেশের গ্রামাঞ্চলের গৃহ-গুলিকেও তড়িদালোকে উদ্ভাসিত দেখিয়া আমাদের বিস্ময় জাগিতে পারে। শুধু কলকারখানা নয় কৃষি সম্পর্কীয় ব্যাপারগুলিও বৈদ্যুতিক শক্তির সহায়তায় সম্পাদিত হয়। এই শক্তির সাহায্যে লৌহ প্রস্তর হইতে লৌহ প্রস্তুত করার পর হইতে এই দেশ পৃথিবীর লৌহ ও ইস্পাতপ্রসূ দেশসমূহের মধ্যে প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছে বলা চলে। বর্ত্তমান বৈদ্যুতিক যুগ যাহাদের প্রাণপণ প্রযত্ন আবির্ভূত হইয়াছে সুইডিসরা তাহাদিগের ভিতর শ্রেষ্ঠ। 'ডিনামাইট' উদ্ভাবক নোবেল এই দেশের লোক। 'নোবেল পুরস্কার' ইঁহারই অক্ষয় কীর্ত্তি। সুইডেনের এই প্রসিদ্ধনামা সন্তানের কীর্ত্তি সভ্যতার পথে এই দেশের দ্রুত অগ্রগতির বার্ত্তাই বিজ্ঞাপিত করে।

এই দেশ যেমন নৈসর্গিক সম্পদে সমৃদ্ধ এই দেশের উপ-শিক্ষিত সন্তানরা তেমনই অপূর্ব্ব উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী। ক্রমশঃ বাণিজ্য ও শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হইলেও সুইডিসরা কৃষিকার্য্যকে উপেক্ষা করে নাই। বিজ্ঞানানুগ প্রণালীতে বিস্তৃতভাবে কৃষিকার্য্য করিয়া ইহারা যেরূপ ফসল ও ফল উৎপন্ন করিতেছে তাহার প্রতি আমাদের দেশের কৃষকদের দৃষ্টি-আকর্ষণ হওয়া দরকার। সাধারণ লাঙ্গলের সাহায্যে যে ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে একদিন লাগিবে তাড়িত প্রবাহের সহায়তায় তাহা মাত্র এক ঘণ্টায় সম্পাদিত হইতেছে। সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বাঙ্গালায় বা ভারতভূমিতে বহু ক্ষেত্র প্রযত্নের অভাবে পতিতরূপে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহাদিগকে দেখিলে সাধক কবি রামপ্রসাদের তত্ত্বসঙ্গীত "এমন মানব জমিন রৈল পতিত, আবাদ কল্লে ফলত সোনা" মনে পড়ে। সুইডিসদিগের ন্যায় বৈজ্ঞানিক প্রণালীর আশ্রয় লইলে এই সকল জমি স্বর্ণবর্ণ শস্য-সম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া সত্য সত্যই আমাদের নেত্র ও চিত্তকে তর্পিত করিত এবং দেশকে উন্নতির পথে আগাইয়া দিবার অন্যতম হেতু হইতে পারিত।

জনসাধারণ

...এখনও যাঁহাদের চরিত্র এবং জীবনযাত্রাপ্রণালী আধুনিক সভ্যতার কৃত্রিমতা এবং কপটতার দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্প পরিমাণে স্পৃষ্ট হইয়াছে, যাঁহারা এখনও সভ্য মানুষগুলির উপহাসের পাত্র, তাঁহারাই আমাদের মতে "জনসাধারণ" পদবাচ্য। যাঁহারা "জনসাধারণ", তাঁহারা প্রায়শঃ অশিক্ষিত ও নির্ব্বোধ বলিয়া মধ্যবিত্ত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের নিকট অবজ্ঞাত হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহারাই সমাজে কৃষকরূপে সর্ব্বসাধারণের অন্ন; তাঁতী ও জোলারূপে সর্ব্বসাধারণের বস্ত্র; রাজ, মজুর ও ঘরামীরূপে সর্ব্বসাধারণের গৃহ; ছুতার, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার ও কাঁসারী রূপে সর্ব্বসাধারণের তৈজসপত্র সর্ব্বত্র সরবরাহ করিয়া আসিতেছেন।...

শ্রীহরিপদ দত্ত

চতুর্থ দৃশ্য

জীবন ঘোষের নদীতীরস্থ কাছারী বাটী

একটী ভৃত্য সম্মার্জ্জনী দ্বারা বিছানা ঝাড়িতেছে

হেড্‌মাষ্টার, বিনোদ মাষ্টার এবং বীরেন্দ্র প্রমুখ কতিপয় বালকের প্রবেশ

তাঁহাদিগকে দেখিয়া ভৃত্য সম্মার্জ্জনী হস্তে সোজা হইয়া দাঁড়াইল

হে-মা। বিনোদ, ও-যে ঝাঁটা খাড়া করে' দাঁড়া'ল। আমাদের ঐ-রকম করে' reception করছে নাকি?

বিনোদ। এক সঙ্গে এত লোক দেখে হক্‌চকিয়ে গেছে।

হে-মা। তাই'লে আর হেসো না, আরো ঘাব্‌ড়ে যা'বে। বীরেন, জীবনবাবু আছেন কি না খবর নাও।

বীরেন। কি-রে দাসোপো, বাবু কৌটি গিলা?

ভৃত্য। বাবু অখনো আসি নাই থি।

বীরেন। জীবনবাবু এখনো আসেন নি sir!

হে-মা। এখনও আসেন নি! তিনি ত' সাধারণতঃ খুব punctual।

বিনোদ। হয় ত' কোন অনিবার্য্য কারণে দেরী হচ্ছে।

বীরেন। তিনি বলেছিলেন বিভূদাদের বাড়ী হ'য়ে আস্‌বেন—জরুরী কাজ আছে। হয় ত', সেখানে আট্‌কে গেছেন। তিনি যখন আপনাদিগকে আস্‌তে বলেছেন তখন নিশ্চয় আস্‌বেন।

হে-মা। তা' ঠিক। তাঁ'র কথার কখন খেলাপ হয় না।

বীরেন। তা' ছাড়া বিভূ-দারও আস্‌বার কথা আছে। হয় ত', দু'জনে এক সঙ্গে আস্‌বেন।

হে-মা। তা' হ'তে পারে। ডাক্তারদের বড় একটা punctuality থাকে না।

ভৃত্য। বাবু, এই ঠিকি বসন। মোর বাবু ঠিক আসিব।

হে-মা। তাই করা যা'ক্। বসে' বসে' প্রকৃতির দৃশ্য দেখা যা'ক্।

বিনোদ। এ-কাছারী বাড়ীর situation-টি বড় চমৎকার।

হে-মা। Artist কি না, artistic situation-টা চোখে লেগে গেছে।

জীবন। (প্রবেশ) আমার দেরী হ'য়ে গেছে, কিছু মনে করবেন না মাষ্টার-ম'শায়রা। এমন একটা important ঘটনা ঘটে' গেল যে উমাপদ বাবুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে একবার নিজের বাড়ী হ'য়ে আস্‌তে হ'ল। কাজেই দেরীটা unavoidably হ'য়ে গেল।

হে-মা। আজ রবিবার, দেরীতে কোন ক্ষতি নাই। বিভূতিবাবু এলেন না?

জীবন। তা'র আর একটু দেরী হ'বে। ডাক্তার লোক, হাতের case-গুলি না-দেখে ত' আস্‌তে পারে না। এখন খবর কি বল ত' বীরেন?

বীরেন। আমরা একটা club করব মনে করেছি কাকাবাবু! আপনাকে তার president আর বিভূদাকে vice-president হ'তে হ'বে। বোস জ্যেঠাম'শাই patron থাক্‌বেন।

জীবন। আমরা মানে কা'রা?

বীরেন। school-এর student, ex-student এবং Sir-রা। আর গ্রামবাসীদের যাঁ'রা join করেন।

জীবন। কী club?

বীরেন। Foot-ball, cricket, badminton।

জীবন। Game-হিসেবে ভাল বটে, বিশেষ আজকাল-কার দিনে! কিন্তু সেই সঙ্গে সাঁতার ও হাডু-ডু চাই। সাঁতার সর্ব্বরকমে useful।

বীরেন। অত পয়সা পা'ব কোথা থেকে কাকাবাবু? পয়সা পেলে আমরা ত' tennis-ও খুল্‌তে পারি।

জীবন। সাঁতারে বা হাডু-ডুতে পয়সার দরকার কী? বেশী খরচ cricket-এ, তার চেয়ে কম foot-ball-এ। Tennis-এ অনেক খরচ, সে এখন থাক্।

বীরেন। আপনি যেমন বল্‌বেন সেই রকম ব্যবস্থা হ'বে।

জীবন। তাহ'লে একটা institute খোল। তা'তে library, debating club, essay-competition, recitation-এর competition প্রভৃতি থাক্‌বে—out-door games ত' থাক্‌বেই। কি বলেন হেড্‌মাষ্টার-ম'শায়?

হে-মা। ভালই ত' হ'বে Sir!

বীরেন। কিন্তু তা'র জন্যে একটা বড় ঘর ত' চাই-ই, আর একটা অন্ততঃ ছোট ঘর-ও চাই। এত ঘর কোথায় পাওয়া যা'বে? —ঐ বিভূদা আস্‌ছেন।

বিভূতি। (প্রবেশ) মস্ত meeting হচ্ছে যে বীরেন!

জীবন। ওরা বলে একটা sporting club খুল্‌বে—cricket, foot-ball আর badminton। আমি বল্‌ছি একটা institute খুল্‌তে। Foot-ball, cricket, badminton, হাডু-ডু আর swimming থাক্‌বে এবং library,

debating club, literary competition প্রভৃতিও থাকবে।

বিভূ। তা'র চেয়ে ভাল প্রস্তাব আর কী হ'তে পারে? কি হে?

বীরেন। আমাদের ত' আপত্তি নেই বিভূদা, কিন্তু institute-এর উপযোগী ঘর পাই কোথা, আর এত পয়সাই বা আসে কোথা থেকে?

বিভূ। একবার আরম্ভ করতে পারলে ক্রমশঃ সবই চলে' যা'বে। ঘরের ভাবনা কি? স্কুলের অত বড় বাড়ী, সব ঘর ত' ব্যবহার হয় না। ঐ বাড়ীরই দু'খানা ঘর institute-এর জন্য নিলেই হ'বে।

বীরেন। বেশ! কিন্তু আপনাকে secretary হ'তে হ'বে বিভু-দা! যা' তা' Secretary চলবে না।

বিভূ। Secretary এখন যেন হলুম, কিন্তু যদি ক'লকাতায় practise করতে যাই?

হে-মা। তখনকার কথা তখন হ'বে ডাক্তারবাবু!

জীবন। সঙ্গীতের চর্চ্চাও চাই। আজকাল university music introduce করেছে।

বীরেন। আপনারা যা' বলবেন তাই হ'বে।

জীবন। ভাল কথা! স্কুলে কোন্ কোন্ জাতের ছেলে এখন আছে হেড্‌মাষ্টার ম'শায়?

হে-মা। অনেক জাত আছে sir—ব্রাহ্মণ, কায়স্থই বেশী; তদ্ভিন্ন, মুসলমান আছে, নবশাক আছে, আর যাদের হরিজন বলা যায় তাঁদের ছেলেও কতকগুলি আছে।

জীবন। ওহে বাপ-সকল! সব জাতের ছেলেদের সঙ্গে মেলা-মেশা কর ত'? ছত্তিশ জাত ছুঁতে হয় বলে' বাড়ী গিয়ে গঙ্গাজল পরশ করতে হয় না কি?

বীরেন। না কাকাবাবু! তবে স্কুলের কাপড়-চোপড় ছেড়ে আলাদা করে' রাখতে হয়, কারণ ময়লা কাপড় পরে' স্কুলে এলে Sir-রা বকাবকি করেন। তাঁরা সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে বলেন।

জীবন। এটা বেশ ভাল শিক্ষা মাষ্টার-মশায়। কি বল বিভূ?

বিভূ। আজ্ঞে হ্যাঁ। স্বাস্থ্যের দিকে সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখা উচিত।

জীবন। স্কুলই ত' ছেলে মানুষ করে' তোলবার যায়গা। স্বাস্থ্য বলুন, চরিত্র বলুন, সদ্ব্যবহার বলুন, বয়স্থ লোকের সম্মান বলুন, regularity of habits বলুন, সুকুমারমতি বালকদের এ-সকল বিষয়ে যে শিক্ষা হ'বে, যদি প্রকৃতরূপে হয়, সেটা তা'দের অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হ'য়ে যা'বে। কেবল দু'দশখানা বই পড়লেই প্রকৃত শিক্ষা হয়' না ত'। বই-এত ভাল কথাই থাকে, কিন্তু সে-গুলোর actual application কিরূপে সে-গুলোকে life-এ utilize করা যায়, এ-সম্বন্ধে যদি বিশদরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই হয় যথার্থ শিক্ষা। শুধু পুঁথিগত বিদ্যেয় লাভ কি?

হে-মা। আমরা প্রত্যেক বিষয় ভাল করে' বুঝিয়ে ছেলেদের মনে impress করে' দিতে চেষ্টা করি, সম্ভব হ'লে actual life থেকে example দেখিয়ে দিই। সকল teacher-কেই এই রকম instruction দেওয়া আছে এবং তাঁ'রা সেটা follow করেন।

জীবন। তা' হ'লে আপনারা আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

(নদীতে দুইটি ধীবর একখানি নৌকা চালাইয়া যাইতেছে, পাইক নৌকা থামাইতে বলায় তাহারা নৌকা ভিড়াইল এবং একজন ধীবর মৎস্যের ঝুড়ী আনিয়া জীবনের সম্মুখে রাখিল)

জীবন। কী মাছ আছে হে?

ধীবর। আজ্ঞে, ভাল ভেট্‌কি আছে, পার্সে আছে, গল্‌দা চিংড়ী আছে। কী দোব বাবা?

জীবন। (ভৃত্যের প্রতি) একটা চুব্‌ড়ি-টুব্‌ড়ি নিয়ে আয়। (ধীবরের প্রতি) সব রকমই দাও। এই দেখছ ত, এতগুলি লোক মিলে খা'ব।—আজ এঁদের সকলকে মাছ-ভাত খাইয়ে দিই। কি বল বিভু?

হে-মা। আপনি খাওয়াবেন, তা'তে আর কে আপত্তি করবে? (ভৃত্য ঝুড়ী আনিলে ধীবর তাহাতে মাছ তুলিয়া দিল)

জীবন। (ধীবরকে) কত দিতে হ'বে রে?

ধী। আপনি আবার দাম দেবেন কি বাবা। এ'ত তোমার আপনার ঘেরীর মাছ। আমি জমা নিয়েছি বৈ ত' নয়।

জীবন। জমা নিয়েছিস্ কি বিনা খাজনায়?

ধী। না, তা'তে কি বাবা?

জীবন। মাছ ত' এখন তোদেরই। আমি খাজনাও নোবো, মাছও নোবো?

ধী। জমিদারকে খাবার মাছ দিতে হয় ত'!

জীবন। যখন খাজনা আর খরচার টাকা উঠে গিয়ে লাভ হ'বে, তখন খাবার মাছ দিস্।

ধী। এবার মাছ খুব উঠছে বাবা!

জীবন। তা' বলে' কি ফেলে দিতে হ'বে? এই টাকা নে।

ধী। তি-ই-ন টাকা। হাটের দাম বড় জোর দু'টাকা। বেশী নোবো কেন বাবা? এক টাকা ফিরিয়ে নিন্। টাকার দরকার হ'লেই ত' তোমার কাছে পাই।

জীবন। যা' হাত থেকে বেরিয়ে গেছে তা' আর ফিরে নোবো না। নৌকায় আর কে আছে?

ধী। আমার ছেলে।

জীবন। হাট থেকে ফেরবার সময় বাপ বেটা এখান থেকে খেয়ে যাবি।

ধী। যে-আজ্ঞে। আপনারই ত' খাচ্ছি। (নমস্কার ত্বরতঃ ঝুড়ী লইয়া নৌকায় উঠিল)

জীবন। ওরে কাশি, দাঁড়িয়ে কী দেখছিস্? মাছগুলো কুটে-ধুয়ে ফেল্ না।

ভৃত্য। ভাল ভেকটি আছি, যেন রাজপুত্তুরু।

জীবন। দূর বেটা। (ভৃত্যের মৎস্য লইয়া প্রস্থান)

বিভু এত রাঁধবে কে কাকাবাবু?

জীবন। আমি রাঁধব। এর ভেতর ব্রাহ্মণ কেউ নেই ত'।—ওরে' ছেলেরা, তোরা গান শিখেছিস্ কি-রকম?

বিনোদ। কিছু কিছু শিখেছি Sir!

জীবন। দু'একখানা শোনা দেখি বাবা!—তোমরা যোগাড় কর, আমি একবার ও-দিকটা দেখে আসি। বীরেন ও-ঘর থেকে যন্তর-গুলো নিয়ে আয়।

(জীবন, বীরেন্দ্র ও আরি একটি বালকের প্রস্থান)

বিভু। কী-গান শিখিয়েছেন মাষ্টার ম'শায়?

বিনোদ। হিন্দীও শেখাচ্ছি, বাংলাও শেখাচ্ছি।

বিভু। ওস্তাদী হিন্দী-গানের অনুকরণে রচিত কয়েক-খানা বাংলা-গান বঙ্গশ্রীতে বেরিয়েছিল—দেখেছেন?

বিনোদ। আজ্ঞে হ্যাঁ, সে গান শেখা'তে আরম্ভ করেছি। নিজেকে ত' সে-গুলো আয়ত্ত করতে হ'য়েছে, সে-জন্য আরম্ভ কর্'তে একটু দেরী হ'ল। বীরেন একখানা গান অনেকটা রপ্ত করেছে, তবে তান-টান এখনও আয়ত্ত হয় নি। (বীরেন্দ্র ও আর একটি বালক হার্ম্মোনিয়াম ও বাঁয়া-তবলা লইয়া প্রবেশ করতঃ সে-গুলি রাখিল) বীরেন সুর দাও, তবলাটা বেঁধে নিই। তারপর তুমি গা'বে।

তবলার সুর বাঁধা হইলে বীরেন্দ্র গাহিল—

করি হে প্রণতি বিশ্বপতি।
ব্যাপি বসুমতী তোমার শকতি
জীবকুলে তুমি শকতি-দাতা॥
নিয়মে তোমার চলে রবিশশী
জলদ উদরে জীবনরাশি
তাপ হুতাশনে শৈত্য চন্দনে
তটিনী শৈল হ'তে আবির্ভূতা।
শুষ্ক মরুতে তরু দানে বারি
অকূল সাগরে জনপদ হেরি
নিবিড় আঁধারে সম দীপ-সারি
তারকা দিশি করে নির্দ্দেশ—
আসে ষড়ঋতু পর্য্যায়ক্রমে
পথহারা রবি নহে কভু ভ্রমে
ঋতু অনুসারে ওদন বিতরে
বসুধা তব বিধানে বিধাতা॥

বিভু। বেশ, বীরেন, বেশ! আর কে গাইবে?

বিনোদ ইঙ্গিত করায় আর একজন বালক গাহিল—

বসি বেলাভূমে বালুকা-আসনে
রহি সিন্ধুপানে চাহি অবিরাম।
নীল বক্ষপরে লহরে লহরে
খেলে জলরাশি অশান্ত উদ্দাম॥
পশ্চে কণ্ঠ তা'র করিয়া বিদায়
তরুণ অরুণ, রহে রজোধার,
লভিয়া যৌবন ভাস্কর কখন
রূপালীর বাসে সাজায় সুঠাম॥
বসুধা-দুহিতা তটিনী জীবন
করে অর্ণব-করে অর্পণ
ভকতি-উচ্ছ্বাসে চরণের পাশে
পড়ে আছাড়িয়া তাই অষ্টযাম॥

জীবন। (প্রবেশ) বেশ, মাষ্টারম'শায়, বেশ শিখিয়েছেন। এখন যান, নদীতে স্নান করে' আসুন। ঐ ছোট ঘরে তেল, গামছা, তোয়ালে, সাবান—যা' চাই তাই আছে। [ক্রমশঃ

মধুসূদনের ট্র্যাজিক প্রতিভা

শ্রীসুনীলকুমার ঘোষ, এম্-এ

বাংলা ভাষায় ট্র্যাজিডির ঠিক প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। ইংরাজীতে "ট্র্যাজিক ড্রামা" বলিতে আমরা যে বিশিষ্ট নাট্য-রীতি বুঝি, বিষাদান্ত নাটক বলিতে ঠিক সেইটি বুঝি না। মোট কথা ট্র্যাজেডি বলিতে যে আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় ভারতীয় সাধনাকাশে তাহার সম্ভাবনা খুবই কম। জীবনকে প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে না পারিলেই আসে অসম্পূর্ণ-তার ব্যর্থতা। সেই ব্যর্থতা হইতেই জীবনে ট্র্যাজিডি ঘনীভূত হইয়া উঠে। কিন্তু এ দেশের মায়াবাদ দৃশ্যমান্ এই জগতের বাহিরে অদৃশ্য এক পরলোকের সৃষ্টি করায় শারীরিক মৃত্যুতেই আমাদের জীবনের পরিসমাপ্তি হইল বলিয়া আমরা মনে করি না। কেবল তাহাই নহে, ভারতীয় সাধনা আমাদের বর্ত্তমান জীবনের সহিত জুড়িয়া দিয়াছে কর্ম্মবাদের নেজুড়। সেই কর্ম্মবাদের পুচ্ছ ধ'রিয়া আমরা অসীমের শেষ সীমারেখা পর্য্যন্ত আনাগোনা করিতে পারি। পাশ্চাত্য সাহিত্য বর্ত্তমান জীবনের মধ্যেই একটা বোঝাপড়া করিয়া ফেলিতে চাহিয়াছে। তাই যখনই সে জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে কোন কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ খুঁজিয়া পায় নাই, অর্থাৎ যখনই দুঃখ আসিয়াছে যদিও তাহার পশ্চাতে কোন সঙ্গত কারণ তাহার নাই, তখনই সে

বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। ভগবানের এই স্বেচ্ছাচার সে নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইতে পারে নাই। কিন্তু যে জীবন অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন যুগ ধরিয়া চলিয়াছে, এবং যাহার অবস্থা পরিবর্ত্তনের মধ্যেও বেশ একটি সুসঙ্গতি রহিয়াছে বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন—তাঁহারা সেই অনন্ত পরিসর জীবনের একটি ক্ষণস্থায়ী অবস্থান্তরকে সমস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার হিসাব-নিকাশ করিবেন কেমন করিয়া ?

সেই জন্যই বোধ হয় প্রাক্-মধুসূদন বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে ট্র্যাজিডির সুযোগ ছিল না। এইরূপ বিশেষ অর্থ-বোধক একটি শব্দ নির্ব্বাচনেরও তাই আবশ্যক তখন হয় নাই। বিয়োগান্ত, বিষাদান্ত প্রভৃতির দ্বারা বিয়োগ অথবা বিষাদ বুঝায় বটে, কিন্তু শুধু তাহার মধ্যেই ট্র্যাজিডির বিশেষত্ব সীমাবদ্ধ নহে। আমি তাই ইহাকে বিয়োগ বা বিষাদে পরিণত না করিয়া "ট্র্যাজিডি" রূপেই ব্যবহার করিব।

যাহাই হউক, চিরবিদ্রোহী মধুসূদন প্রাচীন এই আভিজাত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে ছাড়িলেন না। "কৃষ্ণকুমারী"ই বৈদেশিক ক্লাসিকাল আদর্শের প্রথম বাংলা ট্র্যাজিক নাটক। এখানে তাঁহার আদর্শ ক্লাসিকাল, অর্থাৎ গ্রীক্ ট্র্যাজিডি, ও বিশেষ করিয়া সেক্সপীয়ার।

আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য মধুসূদনের এই বিশেষ প্রতিভার সমালোচনা করা।

ক্লাসিকাল ট্র্যাজিডির মধ্যে একটি বড় স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে ইহার নায়ক অথবা নায়িকা। নায়ক অথবা নায়িকা তাঁহাকেই বলিব যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ঘটনার আবর্ত্ত ঘটিবে ;—শুধু আবর্ত্ত ঘটিলেই চলিবে না—যিনি নায়ক অথবা নায়িকা হইবেন তিনিই প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে সমস্ত ঘটনাবলীর নিয়ন্ত্রণ করিবেন। নাটকটির ভারকেন্দ্র তাঁহারই উপর ন্যস্ত থাকিবে। এই দিক্ দিয়া যখন বিচার করিতে যাই তখন "কৃষ্ণকুমারী"তে নায়ক অথবা নায়িকার সাক্ষাৎ পাই না। অনেক সময় নাম-ভূমিকায় যাঁহাকে পাওয়া যায় নাট্যকার তাঁহাকেই নায়ক অথবা নায়িকা করিতে চান। কিন্তু এখানে কৃষ্ণা কি নায়িকা ? আমার মনে হয়—তাহা নহে। যদিও কৃষ্ণার উপর দিয়াই নাটকটির যত কিছু বিভীষিকা চলিয়া গিয়াছে এবং যদিও তাহার করুণ পরিণতিই নাটকটির উপর একটি বিষাদময় কুহেলি আস্তরণ বিছাইয়া দিয়াছে, তথাপি সমস্ত ক্ষেত্রেই কৃষ্ণাকে আমরা পরোক্ষে দেখি। কোনখানেই সে ঘটনাবলীর নিয়ন্ত্রী নহে ; কোন-স্থলেই সে প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে ঘটনাবলীকে সাহায্য করে নাই। প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছিল, মধ্যাহ্ণ আসিতে না আসিতেই তাহা ঝড়িয়া পড়িল। কৃষ্ণা নায়িকা হইবার সৌভাগ্য রাখে না।

রাণা ভীমসিংহকে নায়ক বলিব ? কিন্তু তাঁহার মধ্যে নায়কোচিত কর্ম্মকুশলতার পরিচয় কোথায় ? নায়কের যেটি আসল গুণ, চরিত্রগত দৃঢ়তা, তাহা ভীমসিংহের মধ্যে। এইরূপ দুর্ব্বলতা ও মানসিক পঙ্গুতা কোন নায়কের থাকা বিধেয় নহে। "ম্যাক্‌বেথ" নাটকে ম্যাক্‌বেথ নায়ক না হইয়া যদি অন্য কেহ নায়ক হইত, তাহা হইলে হয় তো নাটকটি একটি ট্র্যাজিডি হইত না ; কিন্তু "কৃষ্ণকুমারী"তে ভীমসিংহ না থাকিয়া যদি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ও দৃঢ়চেতা অন্য কেহ উদয়পুরের রাণা থাকিতেন, তাহা হইলে, যদিও কৃষ্ণাকে বাঁচানো হয় তো সম্ভব হইত না, তথাপি যেরূপ নিছক হা-হুতাশ ও নিঃসহায়তার মধ্য দিয়া নাটকটির সমাপ্ত আসিয়াছে—তাহা না হইয়া উহা একটি উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজিডি হইতে পারিত।

ভীমসিংহ অথবা মানসিংহ নায়ক নহে, যদিও তাহাদেরই কর্ম্মকুশলতার জন্য নাটকটির পরিণতি ঐরূপ শোচনীয় হইয়াছিল। জগৎসিংহের সুপ্ত গর্ব্ব জাগিয়া উঠিয়াছিল অপমানের তীব্র কষাঘাতে—কিন্তু তাহা অত্যন্ত বিলম্বে। আর মানসিংহের তো কথাই নাই ; তাঁহার সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত একবার আমরা পাইলাম না।

তবুও নাটক যখন, তখন তাহার মধ্য হইতে নায়ক অথবা নায়িকা হয় তো একজনকে খুঁজিয়া বাহির করা যাইতে পারে —কিন্তু ক্লাসিকাল ট্র্যাজিডির "হিরো"র যে বিশেষত্ব, সেই বিশেষত্ব লইয়া এখানে কেহ দেখা দেয় নাই। সুতরাং সেই দিক্ দিয়া ইহাতে নায়ক অথবা নায়িকার সাক্ষাৎ পাইলাম না। অথচ ক্লাসিকাল ট্র্যাজিডির মত এই যে—"It is pre-eminently the story of one person, the hero, and in some cases two, the hero and the heroine."

দ্বিতীয়তঃ, ক্লাসিকাল ট্র্যাজিডির শেষ পরিণতি মৃত্যু। এই মৃত্যু হইবে বিশেষ করিয়া নায়ক অথবা নায়িকার, অথবা দুই জনেরই ; এবং সেই মৃত্যু আসিবে তাঁহার বা তাঁহাদেরই বিভিন্ন কার্য্যাবলীর মধ্য দিয়া। তাহার জন্য দায়ী সেই নায়ক অথবা নায়িকা। এখানেও দেখি মৃত্যুতেই নাটকটির সমাপ্ত আসিয়াছে। কিন্তু সেই মৃত্যু হইয়াছে কাহার ? মৃত্যু হইয়াছে কৃষ্ণার এবং কন্যার শোকে রাজ-মহিষির। এই মৃত্যুর জন্য উক্ত দুই জনকে দায়ী মোটেই করা যায় না।

তারপর, ট্র্যাজিডির মধ্যে শারীরিক মৃত্যুটাই বড় কথা নহে ; কারণ মানুষ নশ্বর, সে একদিন না একদিন মরিবেই। যে কোন বড় ট্র্যাজিডির মধ্যে নায়ক-নায়িকার নৈতিক মৃত্যুটাই বড় করিয়া দেখানো হইবে ; সেই নৈতিক মৃত্যু নায়ক বা নায়িকা চোখের সম্মুখেই দেখিতে পাইবেন—পাইয়া শিহরিয়া উঠিবেন, অথচ তাহাকে রোধ করিতে পারিবেন না।

"This even-handed justice commends the ingredients of poison'd chalice to our own lips"—ইহা বলিয়াছিলেন ম্যাকবেথই, আবার গভীর রজনীতে বিশ্বাসঘাতকের মত ডানকানকে হত্যা করিয়াছিলেন সেই ম্যাকবেথই। ইহাই ভাবিবার কথা। ম্যাকবেথের যে মৃত্যু হইল তাহার জন্ম আমরা খুব দুঃখ করি না; কিন্তু তথাপি যেখানে ডানকানকে হত্যা করিয়া আসিয়া নিহত রাজার উষ্ণ রক্ত সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া ম্যাকবেথ রক্তাক্ত ছোরা-হস্তে উন্মত্ত অবস্থায় ষ্টেজে দাঁড়াইয়া বলিলেন –

Methought I heard a voice cry 'sleep no more !
Macbeth does murder sleep,' the innocent sleep,
Sleep that knits up the ravell'd sleave of care,...

তখন দেখি আমাদের নিকট সগুনিহত ডানকান ছোট হইয়া গিয়াছে—বড় হইয়া দেখা দিয়াছে ম্যাকবেথের নৈতিক মৃত্যুটাই।

ম্যাকবেথ যখন প্লাগলের মত চীৎকার করিয়া উঠে—

......No, this my hand will rather
The multitudinous seas incarnadine
Making the green one red—

তখন সত্য সত্যই ভাবিয়া পড়িতে হয় যে মানুষের অন্তরের সূক্ষ্মতন্ত্রীতে কি ভীষণ আঘাত লাগিলে মানুষ এত বড় একটা সত্যকথা বলিতে পারে। এইখান হইতেই তো তাহার জীবনে ট্রেজিডি আরম্ভ হইয়া গেল। কৃষ্ণার এই নৈতিক মৃত্যু হইবার অবসর নাই।

"কৃষ্ণকুমারীর" মধ্যে মৃত্যুর এই দিকটি প্রায় দেখি না। নৈতিকমৃত্যু এক হইয়াছে ভীমসিংহের, কিন্তু সেখানেও ভীমসিংহের নীতিবোধ এত ক্ষুদ্র হইয়া দেখা দিয়াছে যে, তাহা কাপুরুষতার মধ্যেই ডুবিয়া গিয়াছে। কাপুরুষের জীবন যত বিষাদময়ই হউক না কেন তাহার মধ্যে ট্র্যাজিডির গভীর তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার অবসর নাই।

তৃতীয়তঃ ট্র্যাজিডির মধ্যে প্রধান জিনিষ দ্বন্দ্ব; আর সেই দ্বন্দ্ব গড়িয়া উঠিবে একদিকে স্বাধীন ব্যক্তিপুরুষ ও অন্যদিকে সংসার প্রবাহ—এই দু'য়ের মধ্যে। এই দ্বন্দ্ব যে-নাটকে যত বেশী ও গভীর সেই নাটক তত বেশী ট্র্যাজিক। এই দ্বন্দ্বের জন্যই সেক্‌স্পীয়ারের ট্র্যাজিডির শ্রেষ্ঠত্ব। "If it were done when it is done then it were done quickly" এই একটিমাত্র উক্তি হইতেই আমরা ম্যাকবেথের অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় পাই। দ্বন্দ্ব তাঁহার জীবনে কোথায় ছিল না? একটিমাত্র বিশেষ রজনীতে সুগভীর দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া তিনি যে দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়া বসিলেন তাহারই ফলভোগ করিলেন সমস্ত জীবন ধরিয়া। কি হইতে যেন কি হইয়া গেল! ডানকানকে হত্যা করিয়াই তো তিনি শান্ত হইতে চাহিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহার এই প্রকৃতিগত দ্বন্দ্বই তাহাকে পাষাণ হইতে পাষাণতর করিয়া তুলিল। জীবনের মধ্যে যতই তিনি একটা সামঞ্জস্য আনিতে চান—জীবনকে যতই তিনি একটা সুরের মধ্যে বাঁধিতে চান—ততই তাঁহার প্রাণের তন্ত্রীগুলি বেসুরো হইয়া উঠে। জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ও আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও যখন কিছুতেই তাঁহার খাপছাড়া ভাবকে বাগ বানাইতে পারিলেন না তখনই ম্যাকবেথ বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

Out, Out, brief candle !
Life's but a walking shadow, a poor player
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more ; it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
signifying nothing.

ইহা তাহার জীবনের উপর নির্ব্বেদ বিতৃষ্ণা। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, জীবনের এতবড় একটা ফাঁকিকে ধরিয়া ফেলিয়াও ম্যাকবেথ নিশ্চেষ্ট ভাবে শত্রুর যূপকাষ্ঠে নিজের মস্তকটি গলাইয়া দেন নাই। তিনি মরিয়াছিলেন শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে।

কিন্তু ভীমসিংহ করিলেন কি? স্বীকার করি তিনি হীনবল। কিন্তু তিনি যদি উপযুক্ত একজন পাত্রে কন্যা সমর্পণ করিয়া বিফলমনোরথ অন্য রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া মরিতে পারিতেন—আর উদয়পুরের ধ্বংসাবশেষের উপর যদি কৃষ্ণার আহুতি হইত তাহা হইলে ইহা একটি উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজিডি হইত সন্দেহ নাই। কৃষ্ণাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিয়াও ভীমসিংহের জীবন সুখের হয় নাই। প্রাণের সমস্ত স্নেহ মমতা উজাড় করিয়া যাহাকে পালন করিয়াছিলেন, প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর সেই কৃষ্ণাকে রক্ষা করিবার জন্য একটু আয়াস স্বীকার না করিয়া তিনি স্বীয় কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়াছেন। কৃষ্ণা-হীন যে জীবন সে কি কম দুর্ব্বিসহ?

তা ছাড়া ভীমসিংহের মনে যে দ্বন্দ্বের উদয় হইয়াছিল তাহার প্রকৃতি অন্য প্রকার; কৃষ্ণাকে হত্যা করা হইবে কি না। পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের শেষের দিকে আমরা এই দ্বন্দ্বের প্রথম চিহ্ন পাই। মন্ত্রী যে পত্র বহন করিয়া আনিয়াছিলেন তাহাতে কৃষ্ণাকে হত্যা করিবার উপদেশই লিখিত ছিল। স্নেহপুত্তলিকা কৃষ্ণার প্রাণনাশ না করিলে রাজ্যরক্ষা হয় না—অথচ পিতা হইয়া কেমন করিয়া তিনি এই পাষণ্ডের কাজ করিবেন? এইখানে একদিকে কর্ত্তব্য অন্য দিকে অপত্য স্নেহ—এই দুইএর মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। এই দৃশ্যেরই শেষে রাজার মূর্চ্ছা প্রাপ্তির মধ্যে অপত্যস্নেহই কঠোর কর্ত্তব্যকে ছাপাইয়া উঠিল। কিন্তু ঠিক পরের দৃশ্যেই কৃষ্ণার সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গেল। দ্বন্দ্বের অবসান হইল সেই সঙ্গে। ইহার পরে রাজার মনে দ্বন্দ্বের অবসর আর

নাই। পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে স্নেহান্ধ রাজা পাগলের মত হইয়া গেলেন সত্য, কিন্তু তথাপি তাহার মধ্যে ট্র্যাজিক দ্বন্দ্বের সুযোগ নাই। সেই স্নেহ কেবল হা-হুতাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিল। সক্রিয় মনোবৃত্তির অভাবে তাঁহার কল্পনাশক্তির লোপ হইল। রাজকুমারীকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি অঙ্গুলি পর্য্যন্ত উত্তোলন করিলেন না।

ট্র্যাজিডির একটি প্রধান জিনিষ এই দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া "ট্র্যাজিক হিরোর" জীবনের উত্থান পতন ও তাহার মানসিক অশান্তির ছবি বিশেষ করিয়া দেখানোই ট্র্যাজিডির উদ্দেশ্য। একে তো সে সুযোগ ভীমসিংহের মধ্যে পাই না; তাহার উপর নাট্যকার তাঁহার মধ্যে যদিও বা একটু দ্বন্দ্ব আনিলেন—কিন্তু তাহা এত কম সময়ের জন্য যে ট্র্যাজিডির গভীরতা উপলব্ধি করিবার অবসর পাইলাম না। পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে নাটকটির সমাপ্তি আসে। পঞ্চম অঙ্কের ১ম দৃশ্যের শেষের দিকে ভীমসিংহের মনে যে সামান্য একটু দ্বন্দ্বের চিহ্ন লক্ষিত হয়—তাহার নিরসন হয় পঞ্চম অঙ্কের ২য় দৃশ্যেই।

তাহার পর কৃষ্ণার কথা। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যে, দুই দেশের রাজা যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে তাহা কৃষ্ণা কিছু কিছু জানিত। বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার মত সামর্থ্য ও শক্তি তাহার ছিল না। সুতরাং এ সম্বন্ধে তাহার মনে কোন দ্বন্দ্ব উপস্থিত না হওয়াই স্বাভাবিক। নাট্যকার যদিও পরিণতিটিকে স্বাভাবিক করিয়া তুলিবার জন্য অতিপ্রাকৃতের আয়োজন কিছু পূর্ব্ব হইতেই করিয়াছেন তথাপি শেষ দৃশ্যের শেষ কয়েক লাইন ব্যতীত কৃষ্ণার আত্মত্যাগের ইচ্ছা জাগে নাই। সেইজন্য করিব, কি করিব না বা করিয়া কি হইবে এইরূপ কোন দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় নাই। কৃষ্ণাকে লইয়া যে এতবড় একটা ঘটনা দানা পাকাইয়া উঠিয়াছে, সে বাঁচিয়া থাকিতে যে ইহার সমাধানের সম্ভাবনা নাই এবং সেইজন্য রাজ্যের প্রজার ও পবিত্র সূর্য্যবংশের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে যে তাহার পিতাই তাহার মৃত্যুর আদেশ দিয়াছেন, তাহা সে প্রথম জানিতে পারিল পিতৃব্য বলেন্দ্রসিংহের নিকট হইতে যখন মৃত্যুদূত তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া।

কৃষ্ণা। [সহসা গাত্রোত্থান করিয়া] অ্যাঁ—অ্যাঁ—কাকা! এ কি? এ কি?

বলেন্দ্র। কৃষ্ণা! আমি তোমার প্রাণ নষ্ট করতে এসেছিলাম।

কৃষ্ণা সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া প্রশ্ন করিল, "কাকা, আমার পিতারও কি এই ইচ্ছা যে…" সম্মুখে তাহার সুদূর প্রসারী আলোছায়া ভরা জীবন যে তাহাকে লোলুপ করে নাই কে বলিতে পারে! কিছুক্ষণ আগেও তো সে এইরূপ একটি চিন্তা করিতেছিল। কিন্তু নিষ্ঠুর শমনের মত পিতৃব্যকে দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। তখন শেষ আশ্রয়কূল পিতার উপর ভরসা করিয়া সে উক্ত প্রশ্ন করিল, ভাবিল হয় ত তাঁহাকে না জানাইয়াই এই কার্য্য করা হইতেছে। কিন্তু হায় রে, তাহার সে আশাতেও বজ্রাঘাত হইল।

বলেন্দ্র। মা, আমি কি বলবো? তার অনুমতি ভিন্ন আমি কি এমন চণ্ডালের কর্ম্ম কর্ত্তে প্রবৃত্ত হই?

এইখানে কুসুমকোমল বালিকার সুপ্তগর্ব্ব জাগিয়া উঠিল। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া রাজ্যে এত গণ্ডগোল অথচ তাহাকে একবার সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাও করা হইল না। তাহাকে হত্যা করিবার জন্য নিঃশব্দে আদেশ দিয়াছেন তাহারই প্রিয়তম পিতা, আর সেই কার্য্য সমাধা করিবার জন্য আসিয়াছে তাহারই পিতৃব্য নিঃশব্দে চোরের মত গভীর রজনীতে। কেন? সে কি মরিতে ভয় পায়? রাজপুত রমণীরা কি আপনার কুলমান রক্ষার জন্য কখনও আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দেয় নাই। তাই কৃষ্ণা অনেকটা ক্ষোভের সহিতই বলিয়া উঠিল, "বটে? তা এর নিমিত্ত আপনি এত কাতর হচ্চেন কেন?" [৫ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য]

সহসা রাজপুত রমণীর মজ্জাগত সংস্কার তাহাকে নাড়া দিয়া তাহার আলস্যকে ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিল। তাহার সহিত যোগ দিল পিতার অবহেলা। ক্ষিপ্তপ্রায় রাজা ভীমসিংহ আপনার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় কন্যাকে চিনিতে পারিলেন না। পিতার নিকট শেষ বিদায় লইতে গেলে পিতা বলিলেন, "এ না মানসিংহের দূত? এত বড় স্পর্দ্ধা, আমাকে রুদ্ধ করে?"

কৃষ্ণা। কেন পিতঃ! আমি আপনার নিকট কি অপরাধ করেছি?

এমন সময় কৃষ্ণা শুনিল আকাশে কোমল বাদ্য। পদ্মিনী সতী তাহাকে ডাকিতেছেন। দেশের জন্য আত্মত্যাগ করিলে সুরপুরে তাহার স্থান হইবে। জীবন রক্ষার যখন কোন আশাই নাই তখন কোন্ রাজপুত রমণী এ প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারে? তাই কৃষ্ণা বলিল, "জননী! এই আমি এলাম"। [সহসা খড়্গাঘাত ও শয্যাপরি পতন] ৫ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য।

এইখানে 'সহসা' কথাটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি কৃষ্ণার আত্মহত্যার মূলে ট্র্যাজিডির কোন গভীর তত্ত্ব নাই, উহার মধ্যে ভাবিয়া চিন্তিয়া করিবার মত কিছুই নাই—উহা করিয়া ফেলিয়াছে কৃষ্ণা হঠাৎ—আকস্মিক উত্তেজনার মধ্যে।

কিন্তু শারীরিক মৃত্যুটাই তো ট্র্যাজিডির বড় কথা নয়। তাহা হইলে প্রবল ভূমিকম্পে বা রেল দুর্ঘটনায় যে হাজার হাজার লোক মরিয়া যায় তাহাই তো সর্ব্বাপেক্ষা বড় ট্র্যাজিডি।

নীরব ব্যথা

শ্রীনীহার দাশগুপ্তা বি-এ

(গল্প) পূর্ব্বানুবৃত্তি

অনীতা শুভেন্দুর কাছে নিয়মিতভাবে পড়িতেছিল। তাহার আর এখন পূর্ব্বের ন্যায় সঙ্কোচ নাই। কিন্তু সে অনাবশ্যক একটি কথাও বলে না। যেটুকু দরকার সেটুকু পড়া বুঝিয়াই উঠিয়া আসে। শুভেন্দুর দিক্ হইতেও কোন-প্রকার কৌতূহল বা অবান্তর প্রশ্ন ওঠে না। তবে সে লক্ষ্য করিয়াছিল যে, পড়িবার সময় অনীতার দুই চোখে বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া ওঠে এবং অনীতাকে পড়াইতে সেও একটা অদ্ভুত আনন্দ অনুভব করে।

যথাক্রমে রণির ও অনীতার টেষ্ট পরীক্ষা হইয়া গেল। শুভেন্দু বড়দিনের ছুটিতে মায়ের কাছে দেশে গেল। নূতন বৎসরের শুভেচ্ছা জানাইয়া সে রণিকে দেশ হইতে পত্র দিল। তাহাতে বাড়ীর প্রত্যেকের কথাই জিজ্ঞাস্য ছিল, কিন্তু তাহাতে সে অনীতার নামোল্লেখও করে নাই। চিঠিখানা লইয়া অনীতার ঘরে ঢুকিয়া রণি বলিল, "অনী, স্যর এই চিঠি লিখেছেন, একটা ভাল করে উত্তর দিতে হবে তো? তুই ভাই ইংরাজীটা লিখিস্ ভাল—তা একটা সুন্দর জবাব লিখে দে না।"

এই বলিয়া সে চিঠিখানা টেবিলের উপর রাখিয়া খেলিতে চলিয়া গেল। অনীতা চিঠিখানা খুলিয়া পড়িল, দেখিল তাহাতে তাহার কথা কিছুই নাই। ভাবিতে চেষ্টা করিল যে তাহার কথা থাকিবার প্রয়োজন কোথায়? কিন্তু মনের সহিত যুঝিতে পারিল না—আঁধার নামিয়া তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া চিঠিখানা যথাস্থানে রাখিয়া দিল। শুভেন্দুর নির্লিপ্ততা এমনই ভাবে বহুবার তাহাকে আঘাত দিয়াছে। পুরা একমাস পরে শুভেন্দু কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল এবং নিয়মিতভাবে সেনদের বাড়ীতে পড়াইতে আসিল। একদিন রণি বলিল, "স্যর, অনী এবার টেষ্টে ফাষ্ট হয়েছে।" শুভেন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "তাই না কি?"

পরে অনীতা যখন পড়িতে আসিল তখন বলিল, "তুমি পরীক্ষায় প্রথম হোয়েছ, অথচ এই সুখবরটা আমায় এতদিন দাও নি।" অনীতা মৃদুস্বরে বলিল, "আপনি তো আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করেন নি?" শুভেন্দু বলিল, "বাঃ! বেশ তো তুমি? জিজ্ঞাসা না করলে বুঝি আর নিজে থেকে বলতে নেই? তোমার সুখবরে যে আমিও খুসী হ'তাম এটুকু বিশ্বাস তুমি আমার উপরেও রাখতে পার।" তাহার অভিমান অনীতা বুঝিল, কিন্তু কোনও প্রত্যুত্তর দিল না। শুভেন্দুর পক্ষ হইতে এইরূপ মাঝে মাঝে অভিযোগ অনুযোগ আসিত।

তারপর একদিন! এই দিনটাই অনীতার স্মৃতিপটে আজও উজ্জ্বল হইয়া আছে। সেদিন কাকীমা ছেলেমেয়ে লইয়া সিনেমা দেখিতে গিয়াছিলেন। রণিও টেনিস্ খেলিতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। আসন্ন পরীক্ষার জন্য অনীতাই শুধু বাড়ীতে ছিল। সন্ধ্যার সময় শুভেন্দু আসিলে অনীতা নীচে নামিয়া পড়ার ঘরে ঢুকিল। পড়ার বই খুলিয়া বসিবামাত্র শুভেন্দু বলিয়া উঠিল, "একটা দিনও কি তুমি কামাই দেবে না পড়া? এসো আজ একটু গল্প করা যাক্।" অনীতা বলিল, "বেশ বলুন।"

শুভেন্দু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আমি ষ্টেটস্ স্কলারশিপএর জন্য দরখাস্ত করেছিলাম, সেটা পেয়েছি। আর মাসখানেকের মধ্যেই আমাকে বিলাত যেতে হবে।"

অনীতা হঠাৎ চমকাইয়া উঠিল। তাহার ভাবাতুর বিহ্বল নেত্র দুইটি শুভেন্দুর মুখের উপর স্থাপিত করিয়া বলিল, "আপনি চলে যাবেন?" তাহার হৃদয়ে বিচ্ছেদ-বেদনা উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে মনের ব্যথা গোপন করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু চোখের ভিতর দিয়া তাহার আভাষ ফুটিয়া উঠিল।

শুভেন্দু বলিল, "তোমার তো preparation হোয়েই গেছে, আমার বিশ্বাস তুমি পরীক্ষায় ভালই করবে।" তারপর একটু পরে বলিল, "অনীতা! ফিরে এসেও তোমায় এরকমই দেখব তো? যোগ্যতার বড়াই আমি করি না, তবে আমার জীবনের সকল কাজে, সব সময়ের সাথী তোমায় করতে চাই—বল, তোমার এতে অমত নেই। আমি এই দুই দিন শুধু এই ভেবেছি যে, তোমায় ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। বল তোমার কি বলবার আছে?" অনীতার মুখখানা সিঁদুরের মত লাল হইয়া গেল। সে কোনও স্বীকারোক্তি জানাইল না। শুভেন্দু ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "জানি আমার মত গরীবের ঘরে তোমার কষ্ট হবে। কিন্তু এটুকুও জানলে না যে, আমি তোমায় সাধ্যমত সুখেই রাখতাম।" এইবার অনীতা বলিল, "আমায় আপনি ভুল বুঝবেন না।"

এই কথা শুনিবামাত্র শুভেন্দু আর দ্বিরুক্তি না করিয়া একেবারে অনীতার মার ঘরে গিয়া ঢুকিল। সকল কথা বলিয়া সে মাতার অনুমতি চাহিল। অনীতার মা খুব খুসী হইলেন। কিন্তু বিবাহের কোন কথা না বলিয়া শুধু বলিলেন, "আগে তুমি ভালয় ভালয় ফিরে এস বাবা। তোমার মত জামাই পাওয়া ত' আমার দুরাশা। তা ছাড়া তোমার মা কি আমার অনীকে পছন্দ করবেন?" শুভেন্দু মৃদুস্বরে বলিল, "মা জানেন, এতে তাঁর কোন আপত্তি হবে না।"

এই বলিয়া শুভেন্দু তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। নীচে অনীতাকে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার খুব কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, একটু পরে তাহার হাতখানা নিজের হাতের মুঠার মধ্যে

লইয়া বলিল, "অনুরাণী, তুমি কিছু ভেবো না। দেখতে দেখতে ক'টা বছর কেটে যাবে। এর মধ্যে তোমার পড়াও শেষ হোয়ে যাবে। আমি চিঠি লিখলে উত্তর দেবে তো? আর তো আমাদের কোনও সঙ্কোচ নেই—আমি মা'র অনুমতি পেয়েছি।"

অনীতা তাহার মুখের উপর তাকাইতেই দেখিল নব-অনুরাগের দীপ্তিতে শুভেন্দুর মুখখানা উদ্ভাসিত। এত চঞ্চল সে তাহাকে কোনদিনও দেখে নাই। অনীতার সরল সুন্দর মুখখানা দেখিয়া শুভেন্দুর ইচ্ছা হইল তাহার ঈপ্সিতকে আর একটু কাছে টানিয়া লয়। কিন্তু পাছে অধিকারের অতিরিক্ত কিছু করিয়া ফেলে এই ভয়ে নিজেকে সংযত করিয়া সে নিঃশব্দে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। শুভেন্দু চলিয়া গেল—কিন্তু অনীতা তেমনই বসিয়া রহিল। শুভেন্দুর স্পর্শে তাহার সর্ব্বাঙ্গে এক অভূতপূর্ব্ব পুলকের শিহরণ বহিয়া গেল। ইহার পরদিনই শুভেন্দু মরোক্কো বাঁধানো Shakespear এর দুইখানা বই আনিয়া অনীতার হাতে দিয়া বলিল, "আমি যখন বি-এ পাশ করি তখন কলেজ হতে এই বই দুখানা পুরস্কার পাই। ভেবেছিলাম কখনও এদের কাছ ছাড়া করব না। আজ আমার একান্ত প্রিয়জনের হাতেই তা তুলে দিলাম।" এই বলিয়া কিছুক্ষণ অনীতার মুখপানে তাকাইয়া রহিল, পরে বলিল, "হয় ত' এদের দেখলে বেচারা গরীবকে মাঝে মাঝে মনে পড়বে। কেমন, নয় কি?"

অনীতার নিজের উপর রাগ হইতে লাগিল। কেন সে শুভেন্দুর একটা কথারও ঠিক উত্তর দিতে পারে না!

ইহার পর সাতদিন চলিয়া গিয়াছে। শুভেন্দুর বিলাত যাইবার কথা বাড়ীময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। কাকীমার খিট্‌খিটে মেজাজ একটু যেন কোমল হইয়া শুষ্কমুখ উদ্ভাসিত হইয়াছে। সর্ব্বদাই যেন তিনি কি একটা গভীর চিন্তায় মগ্ন। এই দীর্ঘ তিন বৎসরেও তিনি যাহা করেন নাই ক্রমে তাহা করিতেছেন। শুভেন্দুর সংসারের খুঁটিনাটি সমস্ত তথ্যই তিনি জানিয়া লইতেছেন।

টেষ্ট পরীক্ষার পরও মাঝে মাঝে ক্লাশ হইত। তাই অনীতাকেও কলেজ যাইতে হইত। সেদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া সে যেমন দোতলায় উঠিয়াছে অমনি ড্রইং-রুমে শুভেন্দুর গলা শুনিতে পাইল। এরকম সময় কখনও শুভেন্দু আসে না, আর আসিলেও দোতলায় সে তাহাকে কোনও দিন দেখে নাই। তাই কৌতূহলবশে পর্দ্দাটা সরাইয়া মুখ বাড়াইতেই কাকীমা বলিয়া উঠিলেন, "অনু এলি? তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে আয়—চা জুড়িয়ে গেল।" এই কথা শুনিয়া অনীতা বলিল, "আমি এক্ষুণি আসছি কাকীমা।"

যখন সে কাপড় বদলাইয়া বসিবার ঘরে পুনরায় ঢুকিতে যাইবে তখন শুনিতে পাইল শুভেন্দু বলিতেছে, "সক্ষম না হোয়ে আপনাকে আমি কোন কথা দিতে পারছি না মিসেস সেন। তা ছাড়া মা আছেন, তাঁকে সব জানাবেন।"

অনীতা থমকিয়া দরজার পাশে দাঁড়াইল। ভিতরে না গেলে অশোভন হইবে মনে করিয়া সে ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। শুভেন্দুর মুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে সে মুখে না আছে কৌতুক না আছে কৌতুহল, একেবারে নির্ব্বিকার হইয়া সে বসিয়া আছে। সে একটা সোফায় বসিয়া কাকীমার হাত হইতে চায়ের পেয়ালা হাতে নিল।

শুভেন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "আজও তোমার ক্লাশ ছিল অনীতা? কবে তোমাদের বন্ধ হবে? পরীক্ষা ত' এসে গেল।"

কাকীমা লক্ষ্য করিলেন শুভেন্দুর মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের গম্ভীর মুখখানা হঠাৎ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি কারণ বুঝিতে পারিলেন। তাই খুব গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আর বলো না বাবা, ওর কলেজের খাটুনিও খুব যাচ্ছে—আর সারাদিন ত' বই মুখে করেই আছে। কবে যে পরীক্ষা শেষ হবে তাই ভাবছি। তা ছাড়া আমার বোনের ভাসুর পো বিমল মিত্র এটর্ণির সঙ্গে পরীক্ষার পরই বিয়ের কথাবার্ত্তা সব পাকা হবে স্থির হোয়ে আছে। পরীক্ষাটার জন্য আমিও তাই চুপ করে আছি। পড়ে পড়ে যদি এই চেহারা হয় তবে কি দেখে তারা মেয়ে পছন্দ করবে বলো? বড়লোক মানুষ তারা, শুধু চেহারার জন্য যা ওকে নেওয়া, আর তো তারা কিছু চায় না। এখন ওদের দু'টির বিয়ে হোলেই আমরা সুখী হই।"

অনীতা মুখ নীচু করিয়া চা পান করিতেছিল, কাকীমার মুখ হইতে এই সম্পূর্ণ নূতন খবরটা পাইয়া সে হতভম্ব হইল, মুখ তুলিতেই শুভেন্দুর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হইয়া গেল। লজ্জায় তাহার মুখখানা রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

শুভেন্দু হঠাৎ বলিল, "আচ্ছা আমি যাই। আমার একটু কাজ আছে।"

দীপা বলিল, "বাঃ! তা কি করে হয়—আজ যে আমরা সব সিনেমায় যাব। আপনিও ত' আমাদের সঙ্গে যাবেন ঠিক হোয়ে আছে, সেই সকাল থেকে। এখন না বললেই কি হবে?"

দীপার অভিমানদীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া শুভেন্দু একটু হাসিল, পরে বলিল, "আচ্ছা বেশ, চল। তবে একটু তাড়াতাড়ি তৈরী হোয়ে নাও।"

দীপা প্রস্তুত ছিল; কথাটা শুভেন্দু বলিয়াছিল অনীতাকে লক্ষ্য করিয়া। অনীতা উঠিবার উপক্রম না করিয়া নির্ব্বিকার

ভাবে চা পান করিতেই লাগিল। অণীতার এইরূপ নিস্পৃহতা শুভেন্দুর সহ্য হইল না। তাই একটু উষ্ণভাবে বলিল, "কৈ তুমি যে উঠছ না—যাবে না, না কি ?"

অণীতা শুধু একটু ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল। শুভেন্দু ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "আমি আগেই জানতাম তুমি যাবে না। কেন যাবে না ব'লতে দোষ আছে কি ? না গেলে আর কি করা যাবে, জোর ত' নেই।"

শুভেন্দু দীপা, শ্যামল, ও সমীরকে লইয়া চলিয়া গেল। অণীতা সেই ঘরে একাকী বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে মিসেস্ সেন সেই ঘরে আসিয়া অণীতাকে দেখিয়া বিস্মিত স্বরে বলিলেন, "একি যাস নি ?"

অণীতা "না, আমার পড়া আছে" বলিয়া এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ এড়াইবার জন্য উঠিয়া পড়িল। তাহার না যাওয়াতে মিসেস্ সেন যে খুসী হইয়াছিলেন অণীতা তাহা শীঘ্রই বুঝিতে পারিল। তিনি বলিলেন, "বস্, এক্ষুণি কোথায় যাচ্ছিস ? তোর চুলগুলি শুকিয়ে দিই। রোজ রোজ ভিজে চুল বেঁধে এগুলির কি ছিরি করেছিস বল ত' ?" অণীতা অগত্যা বসিল। তাহার কাকীমা একথা ওকথা বলিয়া হঠাৎ বলিলেন, "আচ্ছা অণি, দীপার সঙ্গে যদি শুভেন্দুর বিয়ে হয় তবে কেমন হয় বল্ ত' ? ওদের দু'টীকে বেশ মানাবে, না ?"

তাহার প্রসন্নতা যে অণীতাকে কতটা বিষণ্ণ করিয়াছিল তাহা তাঁহার অজ্ঞাত রহিল। এই প্রস্তাবে অণীতার কণ্ঠ-তালু অবধি শুকাইয়া গেল। সে জোর করিয়া বলিল, "তা বেশ হয় কাকীমণি।"

মিসেস্ সেন বলিলেন, "ও ছেলে খুব ভাল। তাই না তোর কাকার ওকে এত পছন্দ ? তিনি ত' প্রথম থেকেই এই সম্বন্ধ উত্থাপন করতে চেয়েছিলেন—আমিই মত দিইনি। ভেবেছিলাম চাকুরী নেই, গরীবের ছেলে, কোথায় গিয়ে মেয়েটা আবার কষ্ট পাবে। এখন দেখছি ভগবানেরই ইচ্ছা যে ওদের দু'টীর বিয়ে হয়। তাই আর আমার অমত নেই। বিলেত হ'তে ফিরে একটা কিছু হবেই। আর তা ছাড়া আমার জামাই হলে আমরাই না কেন সাহায্য করব বল্ ? আচ্ছা তুই ত' ওর কাছে পড়া বুঝতে যাস্—ওকে না হয় এবিষয়ে একটু জিজ্ঞাসা করিস্, ওর কি মত।"

এই কথায় অণীতার মাথাটা বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল—কাকীমা একি বলিতেছেন ? কেমন করিয়া শুভেন্দুকে বলিবে ? সে বসিয়া বসিয়া শুধু ঘামিতে লাগিল। কাকীমার আহ্বানে সচকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তা কি করে হবে ?" পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া বলিল, "আচ্ছা আমি ওঁকে বলব।"

দুই দিন পূর্ব্বেও অণীতা তাহার বিবাহিত জীবনের যে একখানা সুন্দর চিত্র মনে মনে আঁকিয়াছিল, মিসেস্ সেনের কথায় তাহার সেই অতি সাধের চিত্রখানা মুহূর্ত্তেই ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল।

শুভেন্দুর বিলাত যাত্রার দিন আগাইয়া আসিল। সমস্ত আয়োজন প্রায় শেষ। এই কয়দিনে সে সর্ব্বদাই খুব ব্যস্ত ছিল। কিন্তু মিসেস্ সেনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে প্রায় প্রত্যহই সে আসিত। সকলের সাথে গল্প আমোদ ইত্যাদি করিয়া রাত্রে খাইয়া মেসে ফিরিয়া যাইত। ক্রমে শুভেন্দু আবিষ্কার করিল, অণীতা যেন আজকাল তাহাকে এড়াইয়া চলে। কোনও কথা বলে না বা তাহাদের বাড়ী আসিতেও অনুরোধ করে না। আসিবার সময় আর দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া বিদায় দেয় না। সে ভাবিয়া পায় না কেন অণীতা তার প্রতি বিরূপ হইল। সে ত' কোনও অপরাধ করে নাই। সত্যই তাহার বড় কষ্ট হইল। একবার মনে হইল অণীতাকে গিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই নিজেকে সংযত করিয়া ফেলিল।

মিসেস্ সেনের পীড়াপীড়িতে সত্যই একদিন অণীতা তাহার নিকট উপস্থিত হইল। শুভেন্দু অণীতাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হঠাৎ কি মনে করে ? আচ্ছা বল ত' তুমি আজকাল অত গম্ভীর হ'য়ে গেছ কেন ? ভাল করে কথা বল না ? আমার ত' যাবার দিন এসে গেল। একটা দিন না হয় হাসিমুখেই থাক।"

অণীতা একটু ইতস্ততঃ করিয়া ঢোক গিলিয়া কাকীমার ইচ্ছাটা তাহাকে জানাইল। শুভেন্দু আর্ত্তস্বরে বলিল, "তুমি বলছ একথা ? হঠাৎ কেন এ তিরস্কার ? হঠাৎ কেন এ দণ্ড ? এ যে ফাঁসির দণ্ড।" তাহার চক্ষে বেদনাভরা অশ্রুধারা, অভিমানের ভর্ৎসনা ফুটিয়া উঠিল। অণীতা কোনও উত্তর দিল না। শুভেন্দু পুনরায় বলিল, "দীপাকে বিয়ে করলে তুমি কি সুখী হবে, বলো ?"

অণীতা বলিল, "হ্যাঁ।"

শুভেন্দু কতক্ষণ অর্থহীন দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। একটা ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে তাহার বুক হইতে বাহির হইল। অণীতা সম্মুখে একখানা বই খুলিয়া বসিয়া রহিল, কিন্তু মন তাহার উদাস হইয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ দুইজনেই নীরবে বসিয়া রহিল। তারপর শুভেন্দু প্রথমে কথা কহিল, "আমি তোমার মনে কোন ব্যথা দেই নি। আমি সর্ব্বদাই তোমার মঙ্গল কামনা করেছি। দূরে চলে গেলেও এর ব্যতিক্রম হবে না জেনো।"

উভয়েই আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এই অসহ্য নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া শুভেন্দু অণীতাকে একটা নিষ্ঠুর

আঘাত করিল। "একটা দুঃখ থেকে গেল তোমার বিয়ের নিমন্ত্রণ খাওয়া হল না। বড়লোকের বিয়ের ব্যাপারে আমাদের মত দরিদ্রের লাভ শুধু মিষ্টান্ন খাওয়া।"

এই বলিয়া নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। হঠাৎ অণীতা বলিয়া উঠিল, "বড় লোকের বিয়ের নিমন্ত্রণ খাওয়া—সেটাও যে ভাগ্য করে আসতে হয় শুভেন্দুবাবু?" এই বলিয়া দ্রুতভাবে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। শুভেন্দু হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিল। এমন সময় দীপা তাহাকে চা খাইতে ডাকিতে আসিয়া তাহার এই অবস্থা দেখিয়া দিদির উপর ভয়ানক চটিয়া গেল, বলিল, "দিদি বুঝি আপনাকে কিছু বলেছে? আজকাল যেন দিদি কেমন হ'য়ে গেছে—সব সময়েই আনমনা—ভারী ত' দিদি—মাত্র তিন বছরের বড়—তা কত গম্ভীর। আগে দিদি কত গল্প, গান করত, আর আজকাল বল্‌লে বলে, 'যা যা, আমার সময় নেই'। আপনি কিছু মনে করবেন না—ও ঐ রকমই হোয়ে গেছে। চলুন চা জুড়িয়ে গেল।" এই বলিতে বলিতে দীপার স্বর ভারী হইয়া গেল। অণীতার নির্লিপ্ততা শুভেন্দুকে ভিতরে ভিতরে পীড়িত করিলেও সে মুখে আর কিছু বলিল না। মনের মধ্যে অভিমান চাপিয়া লইয়া একদিন সকলের কাছ হইতে বিদায় লইয়া সুদূর ইংলণ্ডে যাত্রা করিল। ষ্টেশনে সকলেই আসিয়াছিল তাহাকে বিদায় দিতে, শুধু অণীতাই আসে নাই। শুভেন্দু জানিত সে আসিবে না। তবু ট্রেণ ছাড়িবার পূর্ব্বে তার দুই উৎসুক চক্ষু কাহার জন্য যেন ব্যাকুল হইয়াছিল। ষ্টেশনে বিদায়কালে সকলের মনেই একটা বিষাদের ছায়া বিরাজ করিতে লাগিল। সজল নয়নে তাহাকে বিদায় দিয়া সকলে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। সেদিন আর বিশেষ কোনও কথাবার্ত্তা হইল না। যে যার ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

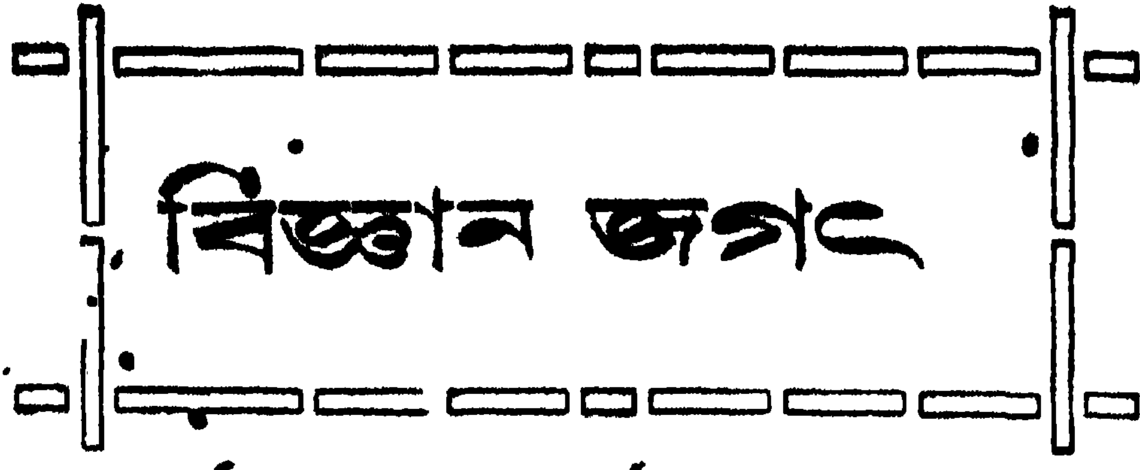
গভীর রাত্রে অণীতা বিছানায় লুটাইয়া পড়িল। অজ্ঞাত ব্যথায় বুকটা তাহার ফাটিয়া যাইতে লাগিল। চোখের জলে বালিশ ভিজিয়া গেল। সারাটা রাত্রি এইরূপ আকুল হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভোরের দিকে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

[ক্রমশঃ

রাঙা শাড়ী-পরা বউ

বন্দেআলী মিয়া

আমার জানালা হ'তে দেখা যায় দূরে একখানি ঘর,
খড়ের ছাউনি আর ঘন ছন-বেড়া ঘুণে জর জর।
এ-পাশে: কলার ঝাড়—বাঁশের মাচান—সজিনার গাছ,
বাতাসের সাথে পাতাগুলো তার সারাদিন করে নাচ।
ঐ ছোটো ঘরে রয় গো একটী সোণায় বরণা মেয়ে,
সারাদিন ধরি' ঘর বা'র করে দেখি তাই চেয়ে চেয়ে।
প্রথম বয়স—সারা দেহ তার রসে করে টলমল,
আষাঢ়ের মেঘ—বাতাস লাগায় হয় যেন চঞ্চল।
বিহান বেলায় সোয়ামীরে তার রাঁধিয়া বাড়িয়া দিয়া,
কাজ করিবারে দূর ভিন্ গাঁয়ে দেয় তারে পাঠাইয়া।
হেঁসেল সারিয়া ঘরে চাবি দিয়া পড়শীর বাড়ী যায়,
হাসিয়া হাসিয়া কথা কয় আর খালি পানপাতা খায়।
এ-বাড়ী ও-বাড়ী বেড়াইয়া শেষে দু'পহর হ'তে বেলা,
বনে ও বাদাড়ে আগাছা কুড়ায়—শুনো কাঠ করে চেলা।
উনুনের ধারে থরি সাজাইয়া তেল মাখে সারা চুলে,
আল্‌গা বিনুনী বাতাস লাগায় ওঠে খালি ফুলে' ফুলে'।
মাঠের ওপারে পাকুমল দীঘি সেথায় সিনানে যায়,
কালোজল তার সারাদেহ ঘিরে খুশিভরে উছলায়।
হাঁসের মতন সাঁতার কাটে সে—এপার-ওপার করে,
কভু ডুবে যায়—কভু ভেসে ওঠে অতি অবহেলাভরে।
ভরা কলসীরে কাঁখে লয়ে ফেরে—তালে তালে দোলে মাজা,
জলে ধোয়া মুখ—আধ-ঢাকা তনু ফুলের মতন তাজা।
কলসী নামায়ে দাবার উপরে ঘরের কাণাচে আসে,
গামছা নিঙাড়ি' মাথা মো'ছে আর ঠোঁট টিপে যেন হাসে।
সোণার বরণ দুপুরের রোদ সোণা দেহে ঝলকায়,
মোর ঘর হ'তে যখন তখন তারে হোথা দেখা যায়।



শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্-এ

আপেক্ষিকতাবাদের শিক্ষা

দুই

আপেক্ষিকতাবাদের ভিত্তি—মাইকেলসনের পরীক্ষা

পরীক্ষামূলক সত্যকে ভিত্তি ক'রেই আইনষ্টাইন তাঁর মত প্রচার করেছিলেন। এই ঐতিহাসিক নিষ্ফল পরীক্ষা সম্পন্ন হ'য়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৮৮১-১৮৮৭ খৃঃ) যখন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক মাইকেলসন্ সচলারূপে কল্পিত বসুন্ধরার নিরপেক্ষ বেগ নির্ণয়ে—শূন্যের ভেতর দিয়ে পৃথিবী কি বেগে কোন দিকে ছুটে চলেছে এই প্রশ্নের উত্তর দানে—বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকের অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে দৃঢ়পদে অগ্রসর হয়েছিলেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখা যায় যে, বৈজ্ঞানিকের সাধনা অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থতায় পরিণত হয়েও নূতন ও ব্যাপকতর সত্যের সন্ধান দিতে সক্ষম হয়েছে। মাইকেলসনের পরীক্ষা এর অন্যতম, হয় ত' শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ।

এই পরীক্ষায় অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা ছিল এবং পরীক্ষাকার্য্যও নিষ্পন্ন হয়েছিল অতি নিখুঁতভাবে। কিন্তু শত চেষ্টাতেও পৃথিবীর নিরপেক্ষ বেগ নিরূপণ সম্ভব হলো না,—অথচ শূন্যের ভেতর পৃথিবীর যে একটা বেগ রয়েছে এবং প্রত্যাশিত বেগের দশমাংশও যে, ঐ যন্ত্রে অনায়াসে ধরা পড়তে পারতো, তাতে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল না যে, অন্ততঃ সূর্য্য প্রদক্ষিণ ব্যাপারে, পৃথিবী শূন্যের ভেতর দিয়ে ছুটে চলেছে এবং ঐ বেগের পরিমাণ সেকেণ্ডে প্রায় আঠারো মাইল। সূর্য্য সম্পর্কীয় এই বেগটাকেই পৃথিবীর একমাত্র নিরপেক্ষ (শূন্য সম্পর্কীয়) বেগ ব'লে গ্রহণ করতে পারা যেত, যদি সূর্য্যকে শূন্যের ভেতর সম্পূর্ণ স্থিরতা দান ক'রে সূর্য্য-দেহকে মহাশূন্যেরই অংশ বিশেষরূপে মেনে নিতে আমাদের কল্পনায় না বাধতো। বস্তুতঃ কোপর্নিকসের মত পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করলে ঐরূপ সিদ্ধান্তই এসে পড়ে। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, নিউটনের মহাকর্ষণের নিয়ম মেনে নিয়ে সূর্য্যকে সম্পূর্ণ অচল জ্যোতিষ্করূপে স্বীকার করা যায় না; বরং এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় যে, পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহগণকে সাথে নিয়ে স-পরিষদ্ ঐ গ্রহপতি শূন্যের ভেতর দিয়ে একটা বিশিষ্ট বেগে বিশিষ্ট দিকে ছুটে চলেছেন—যা'কে বলা যেতে পারে সৌরজগতের প্রস্থান-বেগ (Velocity of Translation)। ফলে শূন্যের ভেতর পৃথিবীর দু'টা বেগ স্বীকার করতে হয়—একটা ওর সূর্য্য-প্রদক্ষিণ বেগ, যা'র দিক ক্রমে বদলে যায় এবং ছ'মাস অন্তর (প্রতি অর্দ্ধ আবর্ত্তনে) সম্পূর্ণ উল্টে যায় এবং অপরটা ওর প্রস্থান বেগ, যা' ওকে বহন করতে হয় সৌরজগতের বেগের সাধারণ অংশীদার হিসাবে এবং যার দিক বিশেষ বদলায় না ব'লে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। এই উভয় বেগের ফল বেগকে (Resultantকে) তখনকার মত একটা সমবেগ* ব'লে গ্রহণ করা যেতে পারে। পৃথিবীর তৎকালীন নিরপেক্ষ বেগ বলতে এই বেগকেই বোঝায় এবং এর মাত্রা নিরূপণই ছিল মাইকেলসনের পরীক্ষার লক্ষ্যের বিষয়।

ব্যর্থতার কারণরূপে সন্দেহ হতে পারে যে, মাইকেলসন যখন পরীক্ষা কচ্ছিলেন তখন পৃথিবীর প্রদক্ষিণ-বেগটা ছিল হয়ত ওর প্রস্থান-বেগের ঠিক উল্টো দিকে, সুতরাং দুই বেগে কাটাকাটি হয়ে ফল-বেগটা হয়ত শূন্যে পরিণত হয়েছিল অথবা এত কমে গেছিল যে, যন্ত্রে ধরা পড়ার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এ যুক্তি মানতে হ'লে এও স্বীকার করতে হয় যে, ছ'মাস পরে ঐ বেগ দু'টা একমুখো হয়ে দ্বিগুণ মাত্রাতেই প্রকাশ পাবার কথা; সুতরাং তখনও ফলবেগটা ধরা পড়বে না, এ হ'তেই পারে না। এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হবার জন্য মাইকেলসন্ বৎসরের বিভিন্ন সময়ে (বিভিন্ন ঋতুতে) পরীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করেছিলেন; কিন্তু প্রতিবার একই ফল পাওয়া গেল—পার্থিব দ্রষ্টার মাপে পৃথিবীর নিরপেক্ষ বেগ এতটুকু মাত্রায়ও ধরা দিল না।

এই পরীক্ষার খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে আমরা এখানে পরীক্ষার অন্তর্গত প্রধান যুক্তিগুলি উপস্থিত করবো। আপেক্ষিকতাবাদের গোড়াপত্তন এই যুক্তিগুলি থেকে, সুতরাং এদের বাদ দেওয়া চলে না। মনে করা যাক, পৃথিবীর নিরপেক্ষ বা নিজস্ব বেগটা 'ব' পরিমিত এবং উত্তর দিকে (একটা বিশিষ্ট দিকে) এবং এই বেগ সমবেগ। এর অর্থ এই যে, আমরা কল্পনা কচ্ছি যে, তখনকার মত পৃথিবী উত্তরদিকে অগ্রসর হয়েছে এবং পর পর সেকেণ্ডে 'ব' পরিমিত পথ (শূন্যপথ) অতিক্রম কচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এই বেগের সোজাসুজি পরিমাপ পৃথিবী থেকে হতে পারে না। যে কারণে ট্রেনের বেগের পরিমাপের জন্য একটা বাইরের জগতের—রেল ষ্টেশন, রেল-লাইন বা ঐরূপ কিছুর—মুখাপেক্ষী হতে হয়, সেই কারণে পৃথিবীর নিরপেক্ষ বেগের পরিমাপেও একটি বাইরের জগতের দিকে তাকাতে হয়, এবং পরিমাপ ক্রিয়া সহজ হয় যদি ঐ জগৎ শূন্যের ভেতর একেবারে স্থির হয়ে রয়েছে ব'লে নিশ্চিতরূপে জানা যায়। তা' হলে অনায়াসেই বলতে পারা যায় যে, সেখানকার দ্রষ্টার মাপে পৃথিবীর বেগের মাত্রা যা' দাঁড়াবে তাই হবে আমাদের সত্যকার নিরপেক্ষ বেগ। কিন্তু পৃথিবী হতেও আমরা পরোক্ষভাবে আমাদের বেগ নিরূপণ করতে পারি—পৃথিবী সম্পর্কে ঐ অচল জগতের বেগ মেপে। কারণ ঐ জগতের দ্রষ্টা যদি পৃথিবীকে 'ব' বেগে উত্তর দিকে ছুটতে দেখে তবে আমরাও ঐ জগৎকে ঐ বেগেই দক্ষিণ দিকে ছুটতে দেখবো—ঠিক যেমন, বেগবান ট্রেন থেকে ষ্টেশন প্লাটফরমকে সমান বেগে উল্টো দিকে দৌড়তে দেখা যায়। সুতরাং পৃথিবী থেকে ঐ অচল জগতের বেগ মেপে তার দিকটাকে উল্টে নিলেই আমরা আমাদের নিরপেক্ষ বেগের দিক ও পরিমাণ উভয়ই জানতে পারি। ফলে পরিমাপটা কোন্ জগতে সম্পন্ন হবে সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে ঐরূপ একটি অচল জগতের সাক্ষাৎ পাওয়া। কিন্তু গোড়ায় গলদ এইখানেই; কারণ আমরা জানি যে, ঐরূপ জগতের খবর এযাবৎ পাওয়া যায়নি। সুতরাং এ কথা অতি স্পষ্ট যে, আপাততঃ এই সহজ প্রণালীর সাহায্য গ্রহণের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই।

দ্বিতীয় পথ হচ্ছে—যা' মাইকেলসন্ অবলম্বন করেছিলেন—এমন কোন সচল জগৎ বা সচল পদার্থের মুখাপেক্ষী হওয়া যা' শূন্যের ভেতর স্বভাবতঃই সকল দিকে একটা নির্দ্দিষ্ট বেগে ছুটে চলে এবং যা'কে অনায়াসে চিনে নিতে পারা যায়। এরূপ পদার্থ আমাদের অপরিচিত নয়। বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, আলোকরশ্মি এমন পদার্থ যা' স্থির বা চঞ্চল যে কোন জগৎ (বা যে কোন আলোকাধার) থেকে নিক্রান্ত হোক্ না

---

* যে পদার্থ ক্রমাগত একই দিকে চলতে থাকে এবং সমান সমান কালে সমান সমান পথ অতিক্রম করে তার বেগকে বলা যায় সমবেগ। বেগের দিক বা পরিমাণ বা উভয়ই বদলাতে থাকলে তাকে বলা যায় বিষমবেগ। ইংরেজিতে এদেরকে বলা হয় যথাক্রমে, Uniform Motion এবং Variable বা Accelerated Motion। বিষম বেগকেও অতি অল্প সময়ের জন্য একটা সমবেগরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে; যেমন বক্র রেখার একটা খুব ছোট টুক্রা সরল রেখার মতই প্রতীয়মান হয়ে থাকে।

যদি জগৎ বিশেষের দ্রষ্টা অন্যান্য জগৎসমূহের প্রত্যেককে তার সম্পর্কে সমবেগে ছুটতে দেখে তবে ঐ সকল জগতের দ্রষ্টাগণও পরস্পরকে সমবেগেই —যদিও বিভিন্ন মাত্রার বেগে—ছুটতে দেখবে। এইরূপ এক সেট্ জগৎকে বলা যায় সমবেগের জগৎ। অন্যপক্ষে ওদের পারস্পরিক বেগ যদি বিষম বেগ হয় তবে ঐ সেটকে বলা যায় বিষম বেগের জগৎ।

কেন, ওর আধার পাত্রের বেগের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না রেখে শূন্যের ভেতর দিয়ে একটা নির্দ্দিষ্ট বেগে—সেকেণ্ডে প্রায় একলক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বেগে—সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শূন্যদেশে আলোর বেগ, যেমন ওর উৎপত্তিস্থানের বেগ নিরপেক্ষ, সেইরূপ ওর রশ্মিগুলিরও দিক্ নিরপেক্ষ; সুতরাং সর্ব্বতোভাবে একটি নির্দ্দিষ্ট রাশি। এই জন্যই মাইকেলসনের পরীক্ষায় পৃথিবী সচলারূপে স্বীকৃত হলেও ভূপৃষ্ঠ হতে নিক্রান্ত আলোকরশ্মি-সমূহকে পরিক্ষণীয় বিষয়রূপে গ্রহণ করতে কোন দ্বিধা উপস্থিত হয় নি। আলোকের এই নির্দ্দিষ্ট বেগকে আমরা সংক্ষেপে 'ভ' চিহ্ন দ্বারা নির্দ্দেশ করবো।

পরীক্ষার অন্তর্গত যুক্তি এইরূপ। ভূপৃষ্ঠে একটা আলো জ্বাললে শূন্যের ভেতর দিয়ে রশ্মিগুলি সব দিকেই অগ্রসর হবে একটা নির্দ্দিষ্ট বেগে ('ভ' বেগে), এবং এর কারণ এই যে, ওদের ওপর পৃথিবীর বেগের কোন ছাপ পড়ে না—কোন রশ্মিকেই পৃথিবীর বেগটাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে আসতে হয় না। অন্য পক্ষে, পরিমাপের যন্ত্রগুলিকে পৃথিবীর সঙ্গে সমান বেগে অগ্রসর হতে হয়। সুতরাং, শুধু পৃথিবীর বেগের জন্যই, পার্থিব দ্রষ্টার মাপে, ঐসকল রশ্মির বেগ সবদিকে সমান বা সবদিকে 'ভ' পরিমিত হতে পারে না। পৃথিবীর নিরপেক্ষ বেগ যদি 'ব' পরিমিত ও উত্তর দিকে হয় তবে পার্থিব যন্ত্রের মাপে প্রত্যেক রশ্মির বেগই উত্তর দিকে 'ব' পরিমাণে কম ব'লে ধরা পড়বে—ঠিক যেমন ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে উত্তর দিকে ধাবমান কোন ট্রেনের আরোহীর মাপে বিভিন্ন দিকে ধাবমান অন্যান্য ট্রেনের বেগগুলি উত্তর দিকে ঘণ্টায় ষাট মাইল পরিমাণে কম ব'লে প্রতিপন্ন হয়ে থাকে। ফলে, বিভিন্ন দিগ্‌গামী আলোক রশ্মির বেগে একটা মাত্রা-বৈষম্য দেখা যাবে। পার্থিব দ্রষ্টা দেখতে পাবেন যে, একটা বিশিষ্ট দিকে আলোর বেগের পরিমাপের ফলটা হয় সবচেয়ে কম। এর থেকে তিনি ঐ দিকটাকে পৃথিবীর নিরপেক্ষ বেগের দিক্ বলে গ্রহণ করতে পারবেন। তিনি এও দেখতে পাবেন যে, ওর বিপরীত দিকে আলোর বেগের মাপটা হয় সবচেয়ে বেশী, এবং মাঝামাঝি দিকে হয় মাঝামাঝি পরিমাণের। বস্তুতঃ পৃথিবীর একটা নিরপেক্ষ বেগ স্বীকার করলে এও স্বীকার করতে হয় যে, পার্থিব দ্রষ্টার মাপে বিভিন্ন রশ্মির বেগের পরিমাপের ফল দিগ্‌ভেদে ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন না হয়ে পারে না। পৃথিবীর বেগের জন্যই এই গরমিল; সুতরাং দু দিক্‌কার দু'টা আলোকরশ্মির বেগ মেপে এবং ওদের গরমিলের মাত্রা দেখে পৃথিবীর নিরপেক্ষ বেগ নিরূপণ অবশ্যই সম্ভব হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারা যায় যে, পরিমাপলব্ধ রাশিগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতম ও বৃহত্তম রাশি দু'টা যথাক্রমে, 'ভ' ও 'ব' এর বিয়োগফল ও যোগফল নির্দ্দেশ করবে। সুতরাং ওদের বিয়োগ ক'রে 'ব'এর মূল্য (এবং যোগ ক'রে 'ভ'এর মূল্যও) পাওয়া যাবে।

এই যুক্তির মূল কথা এই যে, শূন্যদেশে আলোর বেগ সবদিকে সমান ('ভ' পরিমিত) হ'লেও পৃথিবীর বেগের জন্য, পার্থিব দ্রষ্টার মাপে, ঐ বেগটা সবদিকে সমান বা কোন দিকেই 'ভ'এর সমান হতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, পুনঃপুনঃ পরীক্ষা করেও দু'টা আলোকরশ্মির বেগে বিন্দুমাত্র পার্থক্য দেখা গেল না—পৃথিবী শূন্যের ভেতর একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে ব্যাপারটা যেমন হতো, পরীক্ষার ফল হলো ঠিক সেই রকমের। পার্থিব যন্ত্রপাতির ওপর পৃথিবীর বেগের ব্যবহারটা হলো প্রতিবারেই একটি অস্তিত্বহীন রাশির মত। অথচ পৃথিবী বরাবর শূন্যের ভেতর স্থির হয়ে রয়েছে এরূপ সিদ্ধান্ত করারও উপায় নেই, কারণ তার অর্থ, পুনরায় টলেমির যুগে ফিরে যাওয়া এবং কেপলার ও নিউটনের নিয়মসমূহকে অমূলক ব'লে উড়িয়ে দিয়ে নিউটনীয় গতিবিজ্ঞানের ভিত্তিমূলে প্রচণ্ড আঘাত দান করা।

লোরেঞ্জ এর ব্যাখ্যা দিতে চাইলেন এই ব'লে যে, পৃথিবীর বেগের জন্য, ঐ বেগের দিক বরাবর, পরিমাপ-যন্ত্রের, এবং এমন কি সমগ্র পৃথিবীরই সঙ্কোচন ঘটে। কিন্তু একটা কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্য—পদার্থটা যত দৃঢ়ই হোক, শুধু ওর বেগের ফলে কমে যাবে এরূপ যুক্তি সমীচীন বলে গণ্য হলো না। আরো একটা মুস্‌কিল হলো এই যে, এই উক্তির সত্যতা নির্দ্ধারণের কোন উপায়ই দেখা গেল না। কারণ, যে মাপকাঠি দিয়ে এই সঙ্কোচন পরিমাপ করা যাবে তাও ঠিক একই অনুপাতে সঙ্কুচিত হয়ে ঐ চেষ্টাকে আপনা থেকে ব্যর্থ ক'রে দেবে। সুতরাং এই নির্ভুল পরীক্ষার নিষ্ফলতার একটা সুসঙ্গত ব্যাখ্যার প্রয়োজন বিশেষভাবেই অনুভূত হলো।

পরীক্ষার প্রথম সিদ্ধান্ত—
জড়ের বেগের আপেক্ষিকতা

আইনষ্টাইন এই সমস্যার সমাধান করলেন জড়দ্রব্যের নিরপেক্ষ বেগের—নিরপেক্ষ স্থিতি ও গতির—কল্পনাটাকেই অলীক বলে প্রচার ক'রে। নিরপেক্ষ বা নিজস্ব বেগ ব'লে পৃথিবীর কোন বেগ নেই, সুতরাং তা' পরিমাপেরও কোন অর্থ হয় না। জড়ের বেগ মাত্রই আপেক্ষিক। জড় সম্পর্কে জড়ের বেগেরই স্পষ্ট অর্থ রয়েছে, কারণ তা' পরিমাপযোগ্য; কিন্তু শূন্যের ভেতর (বা শূন্য সম্পর্কে) জড়ের স্থিতি বা গতি অনির্দ্দেশ্য, সুতরাং অর্থহীন। প্রথমতঃ আইনষ্টাইন্ শুধু সমবেগ সম্বন্ধেই এইরূপ মত প্রকাশ করলেন, কারণ মাইকেলসন পৃথিবীর যে বেগ নির্ণয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন তা' হচ্ছে ওর তৎকালীন বেগ, এবং যা' ধরা পড়লে পড়তো একটা সমবেগরূপে। সুতরাং ঐ নিষ্ফল পরীক্ষা থেকে বড় জোর এইটাই দাবি করা যেতে পারে যে, 'পৃথিবীর সমবেগ' এমন একটা সত্তা যা' পার্থিব দ্রষ্টার মাপে, অন্ততঃ আলোক সম্পর্কীয় পরীক্ষাদি দ্বারা, ধরা পড়বার সম্ভাবনা নেই।

তড়িৎ সম্পর্কীয় পরীক্ষা দ্বারা পৃথিবীর বেগ নিরূপণ সম্ভব কি না এ প্রশ্নও উঠেছিল এবং নোবল, ট্রুটন্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ সে দিক থেকেও পরীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করেছিলেন কিন্তু তাদের চেষ্টাও সমান নিষ্ফল হলো।

সমস্যার গুরুত্ব আরো বেড়ে গেল এই জন্য যে, সাধারণ গতিবিজ্ঞান সম্পর্কীয় কোন পরীক্ষা থেকেও যে পৃথিবীর বা অপর কোন জড়দ্রব্যের সমবেগ নির্ণীত হতে পারেনা এ তত্ত্বটা জানা ছিল নিউটনের সময় থেকেই। একে বলা যায় "গতিবিজ্ঞান সম্পর্কীয় আপেক্ষিকতাবাদ" (Mechanical Principle of Relativity)। অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের কাছে হয়ত এরূপ উক্তি সহজ সত্য ব'লেই অনুভূত হবে। কারণ এযাবৎ আমরা এইরূপই দেখে আসছি যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ভেতর পৃথিবীর তথাকথিত নিরপেক্ষ বেগ কোন ওলট পালটের সৃষ্টি করে না—আমাদের আহার বিহার লম্ফন ধাবন প্রভৃতি নৈসর্গিক ব্যাপারগুলি আবহমানকাল একই প্রণালীতে সম্পন্ন হয়ে আসছে। এর সঙ্গে পৃথিবীর আকাশপথে যাত্রার কোন সম্বন্ধ থাকতে পারে এরূপ প্রশ্নও কখনো আমাদের মনে জাগে নি। যদি দিগ্‌ভেদে এই সকল ব্যাপারে একটা বৈলক্ষণ্য দেখা যেতো—যদি পূর্বদিকের ব্যাপারগুলি দক্ষিণদিকের ব্যাপার থেকে ভিন্ন আকার ধারণ করতো—তবেই পৃথিবীর বেগের কথাটা আমাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দিত।

উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারা যায় যে, যদি এমন দেখা যেতো যে, ফুটবল খেলায় পার্টি দু'টো সর্ব্বাংশে সমান হলেও শুধু উত্তরদিকের দলটাই জয়লাভ কচ্ছে, দক্ষিণদিককার দলটা ক্রমাগত হেরে যাচ্ছে, তবে এরূপ সন্দেহ হতে পারতো যে, স-গোলপোষ্ট পৃথিবী উত্তরদিকে ছুটে চলে নি ত? ফলে, ফুটবল খেলায় হারজিতের ধরণ দেখে পৃথিবীর নিরপেক্ষ বেগের দিক এবং

ওর পরিমাণেরও মোটামুটি একটা আভাষ পাওয়া যেতো। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে ঐরূপ ঘটতে দেখা যায় না। না-ঘটার জন্য, নিউটনীয় গতিবিজ্ঞানে, দায়ী করা হতো জড়ের জড়ত্ব-ধর্ম্ম বা Inertia কে। কোন জড় দ্রব্যই নিজে নিজের বেগের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটাতে পারে না। জড়ধর্ম্মী গোলপোষ্টকে যেমন মাটিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর বেগটাকে বহন করতে হয়, আহত ফুটবলকেও সেইরূপ শূন্যপথে ছুটতে গিয়ে, কেবল আঘাতজনিত বেগটাই নয়, পৃথিবীর বেগটাকেও পথের সাথী করে ছুটতে হয়। উভয়েই জড়ধর্ম্মী এবং উভয়ের ওপরেই পৃথিবীর বেগের ছাপ পড়ে—একই দিকে এবং একই মাত্রায়। এর জন্যই গোলপোষ্টরূপ যন্ত্রের মাপে ফুটবলের গতিবিধিতে কোন দিকেই কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। মাইকেলসনের পরীক্ষায় জড়ের বদলে আলোর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণের প্রয়োজনও হয়েছিল বিশেষ ক'রে এই জন্যই। আলোকরশ্মি, আর যাই হোক, আহত ফুটবলের মত পৃথিবীর বেগকে সঙ্গে নিয়ে ভূপৃষ্ঠ হতে নির্গত হয় না।

কিন্তু আলোর বেগেও যখন কোন দিকে কোনরূপ বৈষম্য দেখা গেল না, তখন পৃথিবীকে এবং জড়দ্রব্যমাত্রকেই নিরপেক্ষ-বেগ রূপ নিরর্থক বোঝা বহনের দায় থেকে মুক্তি দেবার এবং জড়ের বেগের মাত্র আপেক্ষিক সত্তা স্বীকারের প্রয়োজন তীব্রভাবেই অনুভূত হলো। এই প্রয়োজনবোধই আপেক্ষিকতাবাদরূপে আত্মপ্রকাশ করলো—প্রথমতঃ সমবেগের নিরপেক্ষতার দাবির অস্বীকৃতি দ্বারা এবং পরে, বিষম বেগের নিরপেক্ষতার দাবিকেও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ব'লে প্রতিপন্ন ক'রে। বর্ত্তমানে মাইকেলসনের পরীক্ষা থেকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তকে আমরা সত্য বলে গ্রহণ করতে পারি :

কোন দ্রষ্টাই তাঁর জগতে, গতি বিজ্ঞান, আলোকবিজ্ঞান, তাড়িতবিজ্ঞান বা পদার্থবিদ্যার অন্তর্গত অপর কোন বিজ্ঞান সম্পর্কীয়, এমন কোন পরীক্ষা বা পরিমাপ সম্পন্ন করতে পারেন না যা' তার জগতের নিরপেক্ষ সমবেগের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করতে পারে।

এই উক্তিকে নিম্নোক্তরূপেও প্রকাশ করা যেতে পারে :

জড়ের সমবেগ মাত্রই আপেক্ষিক। জড় দ্রব্যের 'নিরপেক্ষ সমবেগ' পরিমাপের অযোগ্য এবং অর্থহীন। পদার্থবিশেষ শূন্যের ভেতর স্থির হয়ে রয়েছে বা ওর ভেতর দিয়ে সমবেগে কোনদিকে ছুটে চলছে এরূপ কল্পনার পরীক্ষামূলক ভিত্তি নেই, প্রাকৃত ঘটনার বর্ণনায় সার্থকতা নেই এবং খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়মের ভেতরেও কোন স্থান নেই।

এই উক্তিকে 'আপেক্ষিকতা-সূত্র' (Principle of Relativity) বলা যায়। এর ব্যাখ্যা এইরূপ। আমরা এযাবৎ 'সূর্য্য স্থির না পৃথিবী স্থির ?' এইরূপ প্রশ্নের যৌক্তিকতা স্বীকার করে এসেছি ; এমন কি এক সময়ে সূর্য্যকে 'সত্যই' স্থির এবং পৃথিবীকে 'সত্যই' সচলরূপে বর্ণনা করতে কুণ্ঠিত হই নি। এর অর্থ এই যে, সূর্য্যকে (জড়দ্রব্য বিশেষকে) শূন্যের ভেতর আটকে রেখে এবং পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণকে ওর সম্পর্কে ছুটে বেড়াবার স্বাধীনতা দিয়ে আমরা নিরপেক্ষ স্থিতি ও গতির কল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়েছি। এর ফল হয়েছে এই যে শুধু সূর্য্যমণ্ডলকেই শূন্যদেশের প্রতিনিধি-রূপে গ্রহণ ক'রে ওকে খাঁটি ভিত্তিভূমির মর্য্যাদা দিয়ে এসেছি এবং পৃথিবী ও অন্যান্য জগৎকে তার থেকে বঞ্চিত করেছি। কিন্তু মাইকেলসনের পরীক্ষা নিরপেক্ষ স্থিতি ও গতির—অন্ততঃ নিরপেক্ষ সমবেগের—কল্পনাকে অর্থহীন প্রতিপন্ন ক'রে যেমন ঐরূপ প্রশ্নের যৌক্তিকতা অস্বীকার করেছে সেইরূপ সমবেগের সকল জগৎকেই খাঁটি মানমন্দির রূপে সমান মর্য্যাদা দান করেছে।

সূর্য্য সম্পর্কে পৃথিবীর অবশ্য একটা বেগ রয়েছে যা' সূর্য্যের অধিবাসী তার জগৎ থেকে মেপে দেখে—পৃথিবী সূর্য্য থেকে কখন কোন্ দিকে এবং কতদূরে অবস্থান কচ্ছে এইটা নিরূপণ করে—ব'লে দিতে পারে। এই বেগ পৃথিবীর একটা আপেক্ষিক (সূর্য্য সম্পর্কীয়) বেগ নির্দ্দেশ করে মাত্র—নিরপেক্ষ বা শূন্য সম্পর্কীয় বেগ নয়। সেইরূপ পৃথিবী সম্পর্কেও সূর্য্যের একটা আপেক্ষিক বেগ রয়েছে যা' ঐ প্রণালীতে, পৃথিবী থেকে পরিমাপ ক'রে, আমরা নিরূপণ করতে পারি। এই বেগ দু'টা পরস্পরের সমান এবং বিপরীতমুখী—বলতে পারা যায়, একই বেগের দু'টা দিক। একই বেগ হ'লেও আমরা ওকে বর্ণনা করবো পৃথিবী সম্পর্কে সূর্য্যের বেগ ব'লে এবং ওরা ওকে বলবে, সূর্য্য সম্পর্কে পৃথিবীর বেগ। আমরা বলবো পৃথিবী স্থির সূর্য্য বেগবান, কারণ আমাদের সহজ দৃষ্টিতে ব্যাপারটা ঐরূপই প্রতিপন্ন হচ্ছে। একই কারণে ওরা বলবে সূর্য্য স্থির, পৃথিবী সচলা। প্রত্যেক দ্রষ্টার কাছে নিজের জগৎ প্রকৃতই স্থির এবং অপরের জগৎ প্রকৃতই বেগবান। কার বর্ণনা সত্য এ প্রশ্ন ওঠে না। প্রত্যেক বর্ণনাকেই সমান দরের সত্য বলে গ্রহণ ক'রে ঘটনার রাজ্যে যোগাস্থান দিতে হবে। টলেমির যুগে আমরা সূর্য্যের কাছে পৃথিবীকে এবং কোপর্নিকসের যুগে পৃথিবীর কাছে সূর্য্যকে স্থির ব'লে দাঁড় করিয়েছি, এবং এইরূপে এক জগতের অনুরোধে, অপর জগতের প্রত্যক্ষের দাবিকে ক্ষুণ্ন করেছি। কিন্তু এইরূপ পদ্ধতি অবলম্বনে জড়-বিশ্বের খাঁটি চিত্র আঁকতে পারা যায় না এবং এইরূপ কল্পনার ওপর প্রতিষ্ঠিত নিয়ম সমূহও খাঁটি নিয়ম হ'তে পারে না। খাঁটি নিয়ম হবে তা'ই যা'র গঠন কার্য্যে প্রত্যেক জগতের প্রত্যেক দ্রষ্টাই সমান অংশ গ্রহণ করতে পারবে এবং স্পষ্ট অনুভব করতে পারবে যে, এই ব্যাপারে বিভিন্ন জগতের বেগের মাত্র আপেক্ষিক সত্তা স্বীকৃত হয়েছে—নিরপেক্ষ স্থিতির দাবিতে কোন জগৎকে খাঁটি মানমন্দির ব'লে আলাদা সম্মানও দেওয়া হয় নি, কিম্বা নিরপেক্ষ বেগের অপবাদে কাউকে ওর থেকে বঞ্চিত করাও হয়নি। এইরূপ নিয়মসমূহের আবিষ্কার অবশ্যই সহজসাধ্য নয়। কিন্তু এই কঠিন কাজে সফলতা লাভ করেই আইনষ্টাইন্ আপেক্ষিকতাবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন।

আবার যেমন সূর্য্য সম্পর্কে, সেইরূপ মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি এবং বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক জগৎ সম্পর্কেই পৃথিবীর এক একটা আপেক্ষিক বেগ রয়েছে যা' সমবেগ হতে পারে, বিষম বেগ হতে পারে বা শূন্য পরিমিতও হতে পারে। একই পৃথিবীর বেগের বর্ণনায়, ভিন্ন ভিন্ন জগতের দ্রষ্টাগণ, ভিন্ন ভিন্ন দিক ও পরিমাণ নির্দ্দেশ কচ্ছে। ভিন্ন ভিন্ন, কারণ ঐ সকল জগৎ পরস্পর-সম্পর্কে স্থির নয়—আপেক্ষিক বেগ সম্পন্ন। ফলে পদার্থ বিশেষের আপেক্ষিক বেগের বর্ণনায় বিভিন্ন জগতের দ্রষ্টাগণের একমত হবার আশা নেই—এখনো নেই, কোন কালেই ছিল না। এর জন্যই নিরপেক্ষ বেগের কল্পনা—যাকে ভিত্তিরূপে অবলম্বন ক'রে প্রতি পদার্থের বেগের বর্ণনায় সকল জগতের দ্রষ্টাই, তাদের আপেক্ষিক বেগ সত্ত্বেও, হয়ত একমত হতে পারবে। কিন্তু মাইকেলসনের পরীক্ষা ঐরূপ কল্পনাকে অর্থহীন প্রতিপন্ন ক'রে এই ইঙ্গিত দান কচ্ছে যে, ঐ চেষ্টা ত্যাগ ক'রে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠাই হবে সকল জগতের সকল দ্রষ্টার সাধারণ কাম্য।

পরীক্ষার নিষ্ফলতার কারণ

এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েরও সন্ধান পাই আমরা মাইকেলসনের পরীক্ষা থেকেই। ব্যর্থতার ভেতর দিয়েই ঐ পরীক্ষা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে, আলোর বেগ এমন একটি সত্তা (বা আলোর বেগ সম্পর্কীয় নিয়ম এমন একটি নিয়ম) যা' সমবেগ-সম্পন্ন সকল জগতের দ্রষ্টাগণের কাছে একই আকারে আত্মপ্রকাশের জন্য স্বভাবতঃই উন্মুখ। একই পরীক্ষা থেকে আমরা যুগপৎ দু'টা পরস্পর-সম্বদ্ধ সত্যের সাক্ষাৎ পাই—জড়ের বেগের আপেক্ষিকতা ও আলোর বেগের দ্রষ্টা-নিরপেক্ষতা। উভয় সত্য, আঁধারের পাশে আলোর মত, পরস্পরকে ফুটিয়ে তুলেছে। জড়ের বেগকে সর্ব্বজনীন আকারে পাবার বৃথা আশায় আমরা এক অনির্দ্দেশ্য অচল জগতের সন্ধানে

ছুটোছুটি করেছি। ফলে আলোর বেগের সর্ব্বজনীনতার সম্ভাবনা মাত্রও আমাদের মনের-দোরে, উঁকি মারবার সুযোগ পায়নি। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে ব্যক্তিগত সত্যের সর্ব্বজনীনতার মুখোশটা খুলে গেল সর্ব্বজনীন সত্যও সেই মুহূর্ত্তে স্বাভাবিক মূর্ত্তি প্রকাশের সুযোগ পেল। এই মুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়েছিল মাইকেলসনের পরীক্ষাকে উপলক্ষ ক'রে এবং নিষ্ফলতার ভেতর দিয়েই ওকে জয়যুক্ত করে'। এই পরীক্ষার প্রধান শিক্ষা এই যে, আলোর বেগের, তথা খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়ম মাত্রেরই দ্রষ্টা-নিরপেক্ষতার অনুরোধে জড়দ্রব্য তার নিরপেক্ষ স্থিতি ও গতির দাবি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে এবং ফলে, আপেক্ষিকবেগ-সম্পন্ন সকল জগৎকেই মানমন্দির হিসাবে সমান আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রাকৃতিক নিয়মের সর্ব্বজনীনতার দাবি এবং মানমন্দিররূপে বিভিন্ন জগতের সম-মর্য্যাদার দাবি এক সূত্রে গ্রথিত এবং উভয় দাবিই প্রকৃতির অনুমোদিত। মাইকেলসনের পরীক্ষা অগ্রসর হয়েছিল উভয় দাবিকেই অস্বীকার করে', সুতরাং ব্যর্থতা ভিন্ন ওর গত্যন্তর ছিল না। এই গুরুত্বপূর্ণ উক্তির সত্যতা উপলব্ধির জন্য আমরা পরীক্ষার অন্তর্গত যুক্তিগুলিকে পুনরায় বিশ্লেষণ করে দেখবো।

নিষ্ফলতার কারণ বিশ্লেষণ

একথা স্বীকার্য্য যে, মাপজোখের দিক থেকে মাইকেলসনের পরীক্ষায় কোন ত্রুটী ছিল না। সুতরাং যদি কোন দোষ থাকে তবে থাকবে পরীক্ষার অন্তর্গত মূল প্রতিজ্ঞা বা Proposition-এ অথবা আলোকরশ্মিকে পরিমাপের বিষয়রূপে নির্ব্বাচনে। পরীক্ষার মূল প্রতিজ্ঞা এই যে, পৃথিবীর একটা নিরপেক্ষ (শূন্য সম্পর্কীয়) বেগ রয়েছে এবং তা পরোক্ষভাবে পরিমাপ যোগ্য। এই বেগ নির্ণয়োদ্দেশ্যে আলোকরশ্মির সাহায্য গ্রহণের পক্ষে প্রধান যুক্তি এই যে, আলোরও নিজস্ব (শূন্য সম্পর্কীয়) এমন একটা বেগ রয়েছে যার ওপর, রশ্মিগুলি ভূপৃষ্ঠ হতে নিক্রান্ত হ'লেও, পৃথিবীর বেগের কোন ছাপ পড়ে না। পৃথিবীর বেগের যা' কিছু প্রভাব তা' হচ্ছে পরিমাপ যন্ত্রের ওপর, কিন্তু যা' পরিমাপের বিষয়বস্তু—শূন্যদেশগামী আলোকরশ্মি—তার গতিবিধিতে পৃথিবীর বেগ কোন বৈলক্ষণ্য ঘটাতে পারে না। সুতরাং রশ্মিগুলির নিজস্ব বেগ এবং চলন্ত পৃথিবী থেকে ওদের পরিমাপের ফল কখনো সমান সমান হতে পারে না। এ যুক্তির উল্লেখ আমরা একাধিকবার করেছি, কিন্তু এ সম্বন্ধে তর্ক উঠতে পারে এই যে, যদি পরিমাপ-যন্ত্রের মত পরিমাপের বিষয়-বস্তুর ওপরও পৃথিবীর বেগের ছাপ পড়তো—যদি ভূপৃষ্ঠ হতে নিক্রান্ত হবার সময় আলোকরশ্মিগুলি, নিক্ষিপ্ত ফুটবলের মত, পৃথিবীর বেগটাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে আসতো—তবে যেমন ফুটবলের বেলায়, সেইরূপ এ ক্ষেত্রেও, যন্ত্রের বৈগুণ্যটা ঘটনার বৈলক্ষণ্য দ্বারা ঠিকমত শুধরে যেত, ফলে যে গরমিল দেখার ভরসা ক'রে মাইকেলসনের পরীক্ষা অগ্রসর হয়েছিল সুরুতেই তা' অগ্রাহ্য হয়ে যেত; কিন্তু তা'তে ক'রে বসুন্ধরা সত্যই বেগহীনা বা ওর নিরপেক্ষ বেগ সত্যই অর্থহীন এর কোনটাই প্রমাণ হতো না। সুতরাং প্রশ্ন হ'তে পারে যে, পৃথিবীর বেগ বা সাধারণ ভাবে বলতে গেলে, চলন্ত আলোকাধারের বেগ যে, নির্গত আলোকরশ্মির বেগের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে কি?

এর উত্তর এই যে, ফুটবল বা গোলাগুলির বেলায় যাই হোক, আলোর বেগের ওপর ওর উৎপত্তি স্থানের বেগ কোন ছাপ ফেলতে পারে এরূপ সন্দেহ করবার মত কোন পরীক্ষামূলক প্রমাণ নেই, বরং তার প্রতিকূল প্রমাণই রয়েছে। এ ভিন্ন, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হবার পক্ষে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ রয়েছে আলোর তরঙ্গবাদ—যা হাইগেন্সের সময় থেকে বিজ্ঞানজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই মতবাদ অনুসারে আলো জিনিষটা তরঙ্গধর্ম্মী এবং আলো-তরঙ্গ বহন ক'রে থাকে জল স্থল ব্যোমব্যাপী এক বিরাট ইথর-সাগর, যা' মহাশূন্যের মত অতীন্দ্রিয় হ'লেও, যার ভেতর দিয়ে, বারিধিবক্ষে জলতরঙ্গের মত বা বায়ু সাগরে শব্দ তরঙ্গের মত, আলোকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঊর্ম্মিগুলি সবদিকে সমান বেগে—যদিও জলতরঙ্গ বা শব্দতরঙ্গের তুলনায় বহুগুণ প্রচণ্ড বেগে—রশ্মির আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এখন এ বিষয়ে মতভেদ নেই যে, তরঙ্গ মাত্রেরই বেগ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে ওর বাহন বা মিডিয়মের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মদ্বারা, যার সঙ্গে ওর উৎপত্তি স্থানের বেগের কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই। শব্দ তরঙ্গের বেগ নিয়মিত করে বাতাসেরই দু'টা বিশিষ্ট ধর্ম্ম—ওর স্থিতিস্থাপকতা ও ঘনত্ব। ইথরেরও অনুরূপ দু'টা ধর্ম্ম আলো-তরঙ্গের বেগের নিয়ামক বলে সাব্যস্ত হয়ে এসেছে। তরঙ্গের স্বভাবই এই যে, উৎপন্ন হবা মাত্র, জন্মস্থানের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে, ওর রঙ্গভূমির অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে এবং মিডিয়ম-নিয়ন্ত্রিত বেগে, সুতরাং সবদিকে সমান বেগে, ছুটতে থাকে। শূন্যদেশে ইথরের ধর্ম্ম সব দিকেই সমান; সুতরাং দিগ্-ভেদে আলোর বেগে একটা মাত্রাবৈষম্য ঘটবে এরূপ আশঙ্কা নেই। মোটের ওপর, তরঙ্গবাদ গ্রহণ দ্বারা আলোর বেগ যে, তার উৎপত্তি স্থানের বেগ নিরপেক্ষ হবে এবং শূন্যব্যাপী ইথর রাজ্যে, সবদিকে সমান হবে, তা' একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধরূপেই স্বীকৃত হয়ে এসেছে। এই বেগকেই আমরা পূর্ব্বে 'ভ' চিহ্নদ্বারা নির্দ্দেশ করেছি এবং এর পরিমাণ আমরা জানি, সেকেণ্ডে প্রায় একলক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল।

এইরূপ ইথর-কল্পনা থেকে আরো একটা আশার সঞ্চার হোল এই যে, মহাশূন্যকে বাস্তব আকারে পাবার জন্য যে অচল জগতের সন্ধান টলেমির যুগ থেকে এপর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক সমাজের সাধনার বিষয় ছিল, ইথরকে আশ্রয় করেই হয়ত তা' সফলতা লাভে সক্ষম হবে। শূন্যের নাগাল না পেলেও হয়ত ইথর মূর্ত্তিতে আমরা ওর এমন একটি বাস্তব ও সর্ব্বজনীন রূপের সাক্ষাৎ পাব যা' সকল জগতের সকল দ্রষ্টার খাঁটি পরিমাপের জন্য একটি সাধারণ ভিত্তিভূমিরূপে ব্যবহৃত হতে পারবে। এই আশা আরো বেড়ে গেল যখন বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে এও প্রতিপন্ন হলো যে, আমাদের চার পাশের ইথর সাগর, আমাদের বায়ুমণ্ডলের মত, পৃথিবীর সঙ্গে ছুটে চলে না, পরন্তু মহাশূন্যের মতই যথাস্থানে স্থির হয়ে অবস্থান করে। তবু শূন্যের সঙ্গে ইথরের মূলে তফাৎ রইলো এই যে, শূন্যের ভেতর ঢেউ ওঠে না, কিন্তু ইথরের ভেতর আলোর ঢেউ ওঠে এবং আলোরূপে তা' ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য। সুতরাং এই ঢেউগুলিকে অচল ইথরের সচল চিহ্নরূপে গ্রহণ ক'রে এবং বেগবান ভূপৃষ্ঠ থেকে বিভিন্নদিগ্‌গামী দু'টা আলো-তরঙ্গের বেগ মেপে ইথর সম্পর্কে পৃথিবীর বেগ নিরূপণ সম্ভব হবে; এবং যেহেতু ইথর শূন্যের ভেতর স্থির হয়ে রয়েছে, সেই হেতু ঐ বেগটাকে পৃথিবীর শূন্য সম্পর্কীয়, সুতরাং খাঁটি নিরপেক্ষ-বেগ রূপেও গ্রহণ করা চলবে। এও বোঝা গেল যে, এরূপ উক্তি কেবল ইথর সম্পর্কেই খাটে, বায়ু সম্পর্কে খাটে না। বায়ুর ভেতরেও শব্দের ঢেউ ওঠে এবং ওরাও ওর ভেতরে সবদিকে সমান বেগেই (সেকেণ্ডে প্রায় এগারশত ফুট বেগে) অগ্রসর হয়ে থাকে কিন্তু ভূপৃষ্ঠ হতে ঐ সকল বিভিন্ন দিগ্‌গামী ঢেউ-এর বেগ মেপে আমরা একটা গরমিল দেখার আশা করতে পারিনে; কারণ শব্দের-বাহন বায়ুমণ্ডল আলোর-বাহন ইথর সাগরের মত যথাস্থানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না—পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে শূন্যের ভেতর দিয়ে ছুটে চলে। কিন্তু স্থির ইথরের বেলাতেও ঐরূপ গরমিল দেখা গেল না।

সুতরাং এই ইথর-চিত্র সম্পর্কে আমাদের বিশেষ করে দেখবার বিষয় এই যে, এর থেকে মাইকেলসনের পরীক্ষার ব্যর্থতার কোন নূতন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। আলোর রশ্মিগুলি ইথরের ভেতর ঢেউ তুলেই এগিয়ে চলুক কিম্বা শূন্যের ভেতর দিয়ে ছিটেগুলির মত ছুটতে থাকুক, তাতে মূল সমস্যার সমাধান হয় না। ইথর-কল্পনার আশ্রয় নিলে আলোর ছুটবার বেগকে বর্ণনা করতে হয় ওর ইথর-সম্পর্কীয় বেগ বলে, আর না নিলে ওকে বলতে হয় ওর শূন্য সম্পর্কীয় বেগ, কিন্তু যাই বলা যাক্ না কেন, চলন্ত পৃথিবীর মাপে

ঐ বেগটা সবদিকে সমান ('ভ' পরিমিত ?) হয় কি ক'রে এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। বরং এই কথাটাই নূতন ক'রে সমর্থন লাভ ক'রে এই ভাবে যে, শূন্য মূর্ত্তিতেই হোক বা ইথর মূর্ত্তিতেই হোক, একটি সাধারণ অচল ভিত্তি-ভূমির কল্পনার মূলেই মস্ত গলদ রয়েছে এবং বাইরের কোন স্থানে ওর খোঁজ করতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ মতবাদও সমর্থন লাভ করে যে, আলোর যে বেগকে আমরা কখনো ওর শূন্য সম্পর্কীয় কখনো ইথর সম্পর্কীয় বেগ ব'লে একটা বিশিষ্ট মর্যাদা দিয়ে এসেছি, কিম্বা যার খাঁটি মূল্য পরিমাপের জন্য ঐ সকল অচলায়তনের মধ্যে এক এক জন অচল দ্রষ্টার আসন বিছিয়ে দিচ্ছি ঐ বেগ বস্তুতঃ ওর পৃথিবী সম্পর্কীয় বেগই বটে এবং ঐ কল্পিত দ্রষ্টা ও পার্থিব দ্রষ্টা বস্তুতঃ একই ব্যক্তি; এবং কেবল পার্থিব দ্রষ্টাই নয়, পৃথিবী সম্পর্কে সমবেগ-সম্পন্ন সকল জগতের সকল দ্রষ্টাই ঐ ব্যক্তি। যে অচল জগতের সন্ধানে আমরা মহাশূন্যকে ছেড়ে পৃথিবীকে, পৃথিবী ছেড়ে সূর্য্যকে ধরেছি, আবার উভয়কে ছেড়ে দিয়ে ইথরকে ধরি ধরি করেও ধরতে পারি নি, মাইকেলসনের পরীক্ষার ভেতর দিয়ে তা' বস্তুতঃই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে—শূন্য বা ইথররূপে নয় বা কোন একটি বিশিষ্ট ভাগ্যবান জগৎরূপেও নয়, পরন্তু সমবেগসম্পন্ন অসংখ্য জগতের মূর্ত্তিতে এবং ঐরূপ প্রত্যেক জগতের বাসিন্দাকেই খাঁটি মানমন্দিরের দ্রষ্টারূপে অন্যান্য জগতের দ্রষ্টাগণের সঙ্গে সমান মর্য্যাদা দান ক'রে। এইরূপ প্রত্যেক দ্রষ্টারই নিজের জগৎকে পরিমাপের ভিত্তিভূমিরূপে গ্রহণ ক'রে যাবতীয় ঘটনার বর্ণনাদানে এবং প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহকে খাঁটি আকারে লাভ করবার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

আর এই খাঁটি আকার যে সর্ব্বজনীন আকার তা'ও ঐ পরীক্ষার ভেতর দিয়েই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আলোর বেগ পার্থিব দ্রষ্টার মাপে সবদিকে সমান ("ভ" পরিমিত) হয়ে প্রত্যেক জগতের দ্রষ্টাকে জানিয়ে দিচ্ছে যে খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়ম মাত্রেরই ঐ হচ্ছে সত্যকার রূপ এবং ঐরূপে প্রকাশিত হয়ে থাকে ওরা সমবেগ সম্পন্ন সকল জগতের দ্রষ্টার কাছেই। ঐ সত্যকার ও সর্ব্বজনীন রূপকে পরিমাপের গণ্ডির ভেতর টেনে আনবার অধিকার রয়েছে যেমন ঐরূপ প্রত্যেক জগতেরই, সেইরূপ নিজের নিরপেক্ষ বেগের অজুহাতে ওকে বিকৃত ক'রে নিজেকে বঞ্চনা করার অধিকারও নেই কোন জগতেরই।

প্রাকৃতিক নিয়মকে সত্যকার আকারে পাবার জন্য শূন্যের ভেতর বা ইথরের ভেতর একজন কল্পিত দ্রষ্টা দাঁড় করানোর বা তাকে দিয়ে নিরপেক্ষ পরিমাপের খেলা খেলিয়ে নেবার প্রয়োজন নেই। এ অভিনয় যেমন মিথ্যা, অভিনয়ের রঙ্গমঞ্চও সেইরূপ মিথ্যা। ইথর কল্পনার অন্য কোন সার্থকতা থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু পরিমাপের ভিত্তিভূমিরূপে শূন্যদেশ যেমন অস্তিত্বহীন ইথর-সমুদ্রও সেইরূপ অস্তিত্বহীন। সুতরাং নিরপেক্ষ সমবেগের কল্পনাকে মন থেকে একেবারে মুছে ফেলে, সমবেগের জগৎ সমূহের দ্রষ্টাগণ যার যার জগৎকে, সর্ব্বশ্রেণীর পরিমাপের পক্ষে খাঁটি ভিত্তিভূমিরূপে গ্রহণ করবে এবং ফলে দেখতে পাবে যে, আলোর বেগ-নির্দ্দেশক এবং খাঁটি নিয়ম মাত্রেরই আকার-নির্দ্দেশক দেশ ও কালের সম্বন্ধগুলি ঐরূপ সকল জগতের দ্রষ্টার কাছে এবং সকল দিকের পক্ষে, একই আকৃতি ধারণ করে থাকে। বুঝতে হবে, প্রাকৃতিক নিয়মের এই সাধারণ লক্ষণটাই আলোর বেগের ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ ক'রে, পৃথিবীর এবং জড়দ্রব্য মাত্রেরই নিরপেক্ষ বেগের কল্পনাকে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছে এবং পৃথিবীকে ও সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জগৎকে খাঁটি ভিত্তিভূমি হবার অযোগ্যতার গ্লানি থেকে সম্পূর্ণ মুক্তিদান করেছে।

পৃথিবীর তথাকথিত নিরপেক্ষ বেগ পার্থিব যন্ত্রপাতির ওপর কিছুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারে না;—ওদেরকে খাঁটি পরিমাপের যোগ্যতা থেকে কিম্বা পৃথিবীকেও খাঁটি মানমন্দিরের মর্য্যাদা থেকে এতটুকু বঞ্চিত করতে পারে না। সেইরূপ পরিমাপের বিষয়বস্তুও সম্পূর্ণরূপেই ঐ কল্পিত বেগের প্রভাব-মুক্ত। ঘটনাসমূহ যে জগতেই ঘটুক এবং পরিমাপকার্য্য যে জগৎ থেকেই সম্পন্ন হোক, ঘটনার অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ স্বভাবতঃই দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ নিয়মের আকারে উপস্থিত হয়ে থাকে। আলোর বেগের দ্রষ্টা-নিরপেক্ষতা এইরূপ একটি বিশিষ্ট নিয়ম এবং এইরূপে প্রকাশিত হওয়া খাঁটি নিয়ম মাত্রেরই স্বভাব। মাইকেলসন নিজের জগতে একটি কল্পিত বেগ আরোপ ক'রে যেমন পৃথিবীকে খাঁটি মানমন্দিরের মর্য্যাদা থেকে বঞ্চিত করেছিলেন সেইরূপ ঐ বেগটা আলোর বেগে একটা মাত্রা-বৈষম্য সৃষ্টি করবে এইরূপ প্রত্যাশা ক'রে খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়মের সর্ব্বজনীনতার দাবিকেও অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু এই দাবি দু'টা পরস্পর-সম্বন্ধ বিধি নির্দ্দিষ্ট দাবিরূপে আত্মপ্রকাশ ক'রে ঐ কল্পিত বেগের অনস্তিত্ব প্রতিপন্ন করেছে এবং ফলে, ওর পরিমাপের প্রয়োজন বোধকেও অস্বীকার করেছে। আপেক্ষিকতাবাদের মতে, মাইকেলসনের পরীক্ষার প্রধান শিক্ষা এই-ই এবং ব্যর্থতার কারণও এই-ই। [ক্রমশঃ]

মুক্তি

শ্রীঅরূপ ভট্টাচার্য্য

(নাটিকা)

[কমলেশের লিখিবার ঘর। কমলেশ তাহার উপন্যাসের নায়িকা পলাশীর জীবন-মৃত্যু লইয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন। এমন সময় স্ত্রী সুরমা প্রবেশ করিল]

সুরমা। তুমি কি আমায় রাত্তির জাগিয়ে জাগিয়ে মেরে ফেলবে না কি? শেষ হ'লো? আর পারি না বাপু!

কমলেশ। আঃ! সব মাটি করে দিলে, সব মাটি করে দিলে, ভেবে প্রায় ঠিক্ করে এনেছিলুম···

সুরমা। আমি ত' তোমার সব মাটি করতেই আছি। কিন্তু আমি ত' আর পারি না।

কমলেশ। কেন, কি হয়েছে সুরমা?

সুরমা। কি আবার হবে! হয়েছে তোমার মাথা আর আমার মুণ্ডু।

কমলেশ। আমার মাথা আর তোমার মুণ্ডু! মাথা আর মুণ্ডু! এ দু'টো ত' একই জিনিস সুরমা। ও ত' তোমার একটা আছে আমারও একটা আছে। ও আবার হবে কি?

সুরমা। [একটু উত্তেজিত হইয়া] আর একটা করে গজিয়েছে। বুঝতে পারছ না। তাই তোমার এত বাড়াবাড়ি।

কমলেশ। কেন আমি কি করলুম সুরমা? কোন অপরাধ···

সুরমা। অপরাধ তুমি কি করবে, অপরাধ সব আমারই। বলি ও নিয়ে আমি আর কত রাত্তির পর্য্যন্ত জেগে থাকব? একটু রেহাই দাও না। সারাদিন-রাত্রি ঝি-চাকরাণীর মত যে আর খাটতে পারি না।

কমলেশ। ও! এই কথা। তবু ভাল। কিন্তু তুমি ত' খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লেই পার, সুরমা!

সুরমা। আমি খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লেই হবে? তোমায় আবার ভাত বেড়ে দেবে কে?

কমলেশ। কত দিন ত' বলেছি সুরমা, আমার জন্ম তুমি রাত্তির জেগো না—কষ্ট ক'র না। দেখছ ত' কত কাজ।

সুরমা। হ্যাঁ কাজের ত' অন্ত নেই। কত দিন কলম হাতে করে এক গাদা কাগজ নিয়ে বসে থাকা—এই ত' কাজ।

কমলেশ। কলম হাতে করে কাগজ নিয়ে শুধু বসে থাকা নয় সুরমা—পাতার পর পাতা সে গুলোকে লিখে ভরিয়ে তুলতে হয়। তুমি যদি বুঝতে তা হলে এত হাল্‌কা নজরে একে দেখতে না।

সুরমা। আমি লোকই হাল্‌কা। নজর কোত্থেকে ভারি হবে বল? যাক্‌গে, আমি আর এত রাত্তিরে তোমার সঙ্গে বক্‌তে পারি না। তুমি খাবে কি না বলে দাও।

কমলেশ। খাব না এ কথা ত' বলতে পারি না, হয় ত' শেষ পর্য্যন্ত খাবার সময় নাও হতে পারে। তবে তুমি আর আমার জন্যে শুধু শুধু বসে থেকো না। যাও লক্ষ্মী…

সুরমা। থাক্‌ আর আদরে কাজ নেই। তা হলে তুমি লেখা শেষ না করে আর উঠবে না?

কমলেশ। কি করে উঠব বল ত'? এটা আমায় আজ শেষ ক'রে কাল ওদের দোকানে পাঠিয়ে দিতেই হবে। টাকা চাই, সুরমা, টাকা…

সুরমা। টাকা দিয়ে ত' তুমি আমায় ঢেকে রেখেছ?

কমলেশ। কি করব সুরমা? পরিশ্রমের মর্য্যাদা এ দেশ দিতে জানে না; যদি জানত তা হলে তোমার মুখে আজ আমায় ঐ কথা শুনতে হ'ত না। যাও যাও আর আমায় বিরক্ত করো না। আমায় শেষ করতে দাও, শেষ করতে দাও।

সুরমা। আজ রাত্তিরে এটা শেষ করতে পারবে?

কমলেশ। পারতে হবে সুরমা। তা না হলে টাকা আসবে না। শুধু পলাশী, পলাশীকে নিয়েই আমার সমস্যা। পলাশীকে আর বাঁচিয়ে রাখা যায় না—পলাশী আর বাঁচতে পারে না, আমি ওকে মারব, জোর করে মারব। তা না হলে সব ছার-খার হয়ে যাবে—সব ছার-খার হয়ে যাবে। মৃত্যু…মৃত্যু…মৃত্যুই ওর শ্রেয়ঃ।

সুরমা। আজ পনের দিন ধরে ত' রাত দিন কেবল পলাশী পলাশী কোরেই মরছ। কে সে তোমার এই পলাশী চোখেও দেখতে পেলুম না।

কমলেশ। আমি দেখতে পাচ্ছি সুরমা ওর মূর্ত্তি, ও যে আমার হাতের তৈরি পুতুল; আমিই ওকে প্রাণ দিয়েছি, বড় করেছি, বিয়ে দিয়েছি, অকাল বৈধব্য গ্রহণ করিয়েছি। সেটা ওর ভাগ্য, সুরমা, ভাগ্য! কিন্তু ও পারলে না, সংযমের বাঁধ ও রাখতে পারলে না। সুজিতের রূপের আগুনে ও মরল পুড়ে—ছাড়ল সমাজ, সংসারের বুকে টেনে দিয়ে গেল একটা চির-কলঙ্কের দাগ। ও অপরাধিনী সুরমা, কলঙ্কিনী, ওর বাঁচবার কোন অধিকার নেই, তাই ওকে মারব, খুন করব আজ রাত্রেই…আজ রাত্রেই। যাও…যাও সুরমা, আমায় লিখতে দাও। বিরক্ত করো না…বিরক্ত করো না!

সুরমা। [কিঞ্চিৎ নম্রস্বরে] তাই যাচ্ছি, তোমার ভাত চাপা দিয়ে রাখিগে—ইচ্ছে হয় খেয়ো না হয় না খেয়ো, আমি আর ডাকতে আসতে পারব না। [প্রস্থানোদ্যতা]

কমলেশ। হ্যাঁ দেখ, ও ঘর থেকে candle lightটা জ্বেলে টেবিলের ওপর দিয়ে যাও ত' লক্ষ্মীটি, আর তোমায় বিরক্ত করবো না। ইলেক্‌ট্রিক standটা আমি আর সহ্য করতে পারছি না। বড্ড গরম! দিয়ে যাচ্ছ ত'?

সুরমা। আমি কি না বলেছি?

কমলেশ। good! good!

[গভীর নীরবতার মধ্য দিয়া কিছু সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। কমলেশ তখনও কলমের গোঁড়াটা দুই ঠোঁট দিয়া চাপিয়া ধরিয়া তন্দ্রালু চোখে পলাশীর ভবিষ্যৎ চিন্তায় মগ্ন। হঠাৎ এই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিল। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক্‌ দম্‌কা হাওয়া ঘরে ঢুকিয়া টেবিলের উপর হইতে কমলেশের উপন্যাসের কয়েক খণ্ড কাগজ মেঝের উপর ছড়াইয়া দিল। কমলেশের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল—জান্‌লার দিকে তাকাইতেই দেখিল একটি ছায়ামূর্ত্তি তার টেবিলের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া আছে। ভীতিবিহ্বল দৃষ্টি লইয়া কমলেশ সেই ছায়ামূর্ত্তিকে জিজ্ঞাসা করিল]

কমলেশ। কে?

ছায়ামূর্ত্তি। আমি—

কমলেশ। কে তুমি?

ছায়ামূর্ত্তি। আমি—আমি পলাশী।

কমলেশ। পলাশী—তুমি? তুমি এখানে, এত রাত্তিরে? কে এ? কে এ? কি চাও তুমি?

পলাশী। আমি চাই মুক্তি।

কমলেশ। মুক্তি? অসম্ভব! অসম্ভব! তোমায় মুক্তি দেওয়া যেতে পারে না পলাশী।

পলাশী। কেন?

কমলেশ। কেন? সে কৈফিয়ৎ আমি তোমায় দেবো না, কিছুতেই না। তুমি যাও।

পলাশী। কিন্তু আজ আমি কৈফিয়ৎ চাইতে এসেছি, কৈফিয়ৎ আপনাকে দিতেই হবে।

কমলেশ। [উত্তেজিত হইয়া] তুমি পাপী, ব্যাভিচারিণী, কলঙ্কিনী তুমি সমাজের কীট, দূষিত বায়ু, তাই তোমাকে হত্যা করব—নৃশংস হত্যা, মুক্তি তোমার নেই—নেই পলাশী, তুমি ফিরে যাও।

পলাশী। কিন্তু আমার এই পাপের জন্যে, আমার ব্যাভিচারের জন্যে, আমার এ কলঙ্কের জন্যে কে দায়ী?

কমলেশ। দায়ী তুমি নিজে।

পলাশী। অসম্ভব!

কমলেশ। তবে কে?

পলাশী। আপনি, আপনার সমাজ।

কমলেশ। আমি! আমার সমাজ? আশ্চর্য্য! তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে এ-কথা বল্‌তে পার্‌লে পলাশী! জান? তোমার জীবন-মৃত্যু আমার হাতে।

পলাশী। জানি।

কমলেশ। তবে? মৃত্যুভয় তোমার নেই বোধ হয়!

পলাশী। অকালমৃত্যুকে আমি ভয় করি। বেঁচে থাকা যখন একান্ত প্রয়োজন মৃত্যুকে আমি তখন বরণ কর্‌তে পারি না।

কমলেশ। তবে এখন তুমি কি চাও?

পলাশী। চাই বেঁচে থাক্‌তে।

কমলেশ। কিন্তু বেঁচে থেকে তোমার লাভ?

পলাশী। লাভ পৃথিবীর সৌন্দর্য্য ভোগ।

কমলেশ। তুমি ত' বিধবা, তোমার আবার ভোগ কি? সংযমই ত' তোমার ধর্ম্ম।

পলাশী। স্থান কাল হিসাবে সংযম অপেক্ষা ভোগই অনেক সময় বড়। সংযমই বৈধব্যের একমাত্র ধর্ম্ম নয়। এটা সমাজের রীতি হ'তে পারে, কিন্তু যুক্তি নয়।

কমলেশ। তা' হ'লে তুমি সংযমকে মান না?

পলাশী। যে সংযম মানবতার অপমান করে তাকে আমি মানি না।

কমলেশ। সমাজ?

পলাশী। যে সমাজে রীতিই প্রবল, যুক্তির ক্ষেত্র নেই, যে সমাজের দণ্ড দেওয়াই একমাত্র পেশা বা নেশা বিচারের মানদণ্ড নেই—সে সমাজকে আমি ঘৃণা করি।

কমলেশ। সেই জন্যেই কি তুমি সমাজ ছেড়ে গেছ?

পলাশী। সমাজকে আমি ছেড়ে যেতে চাই নি, সমাজই আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে।

কমলেশ। তুমি সঙ্কীর্ণ, তাই।

পলাশী। নারী হ'য়ে পুরুষকে ভালবাসা কলঙ্ক, পৃথিবীর ইতিহাসে তা' লেখে না।'

কমলেশ। কিন্তু বিধবার আবার ভালবাসা কি?

পলাশী। প্রেম, সে ত' বিচার ক'রে আসে না, সে আসে আবার যায়; প্রকৃতির সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ—যুগ যুগ ধ'রে নর ও নারীর হৃদয়ে সে যাওয়া-আসা করে। এই প্রকৃতির নিয়ম। প্রকৃতির সন্তান আমরা সে নিয়ম মান্‌তে বাধ্য। আর তা' ছাড়া আমার সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ পরিচয় আমি নারী, বৈধব্যই আমার প্রধান পরিচয় নয়।

কমলেশ। কিন্তু তোমার স্বামীর যখন মৃত্যু হয়েছে, তখন তুমি আর কাউকে ভালবাসতে পার না।

পলাশী। কিন্তু সমাজ আমার স্বামীকে ভালবাসবার সুযোগ দেয় নি।

কমলেশ। তার অর্থ?

পলাশী। আমার যখন বিয়ে হয়েছিল তখন ভালবাসার অর্থ আমি কিছুই বুঝতুম না। যখন বুঝলুম তখন আমার স্বামীর হল মৃত্যু; আর সে মৃত্যু হল যক্ষ্মা রোগে।

কমলেশ। তার জন্যে সমাজ দায়ী নয়।

পলাশী। সম্পূর্ণরূপে দায়ী। কারণ সমাজ জেনে শুনেই আমাকে শুধু ঐশ্বর্য্যের লোভে ঐ যক্ষ্মাগ্রস্ত লোকের হাতে তুলে দিয়েছে।

কমলেশ। কি করে?

পলাশী। আমার বাবা আমাকে ছোট রেখেই মারা যান। কিন্তু তিনি মরবার কিছুদিন আগে আমার এক দূর-সম্পর্কীয় কাকার হাতে বেশ কিছু টাকা দিয়ে আমাকে ও মাকে তাঁর আশ্রয়ে রেখে যান। কাকা সে টাকাগুলো আত্মসাৎ করেন। উপরন্তু আমার বিয়ের সময় আমার স্বামীর এই রোগ আছে জেনেও তিনি শুধু কয়েক শত টাকার লোভে আমাকে এই রোগীর হাতে সঁপে দেন। সেই দুঃখে মা আমার কাশীতে চলে গেছেন। আর আমারও এই অবস্থা। এর জন্যে দায়ী কি সমাজ নয় বলতে চান?

কমলেশ। কিন্তু সমাজ ত' তোমায় চলে যেতে বলেনি?

পলাশী। বলে নি সত্য, কিন্তু সমাজ আমায় রাখতেও পারলে না।

কমলেশ। কেন তোমার জন্যে কি সমাজে যায়গা ছিল না?

পলাশী। ছিল, কিন্তু যে যায়গা ছিল সেখানে আমায় তারা ঘর বাঁধতে দিলে না।

কমলেশ। কি রকম?

পলাশী। আমার স্বামীর মৃত্যুর পর যখন আমি ভালবাসতে শিখলুম, তখন সুজিত আমার চোখের সামনে করতে লাগল আনাগোনা। সমাজই তাকে এ পথ দেখিয়ে দিলে। সুজিত আমার স্বামীর বন্ধু। আমার সমস্ত ভালবাসা গিয়ে পড়ল ওর ওপর, আমি তখন ওকেই আঁকড়ে

ধরলুম। সুজিত চাইলে আমায় বিয়ে করতে। কিন্তু সমাজ তা হতে দিল না।

কমলেশ। কিন্তু সমাজ এতে কি করে রাজি হতে পারে? এ যে অবৈধ।

পলাশী। নারীর জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন সে তার চতুর্দ্দিকে খুঁজে বেড়ায় একটা আশ্রয়। স্রোতস্বিনী নদীর মত মিলনের অপূর্ব্ব আনন্দে সে ছুটে চলে সাগরের সন্ধানে। কত বাধা, কত বিঘ্ন, কত দীর্ঘ পথের ক্লান্তি এড়িয়ে ওকে ছুটতে হয় সাগরের সন্ধানে। কিন্তু তবুও চায় মিলন—মিলনেই ওর জীবনের পরিপূর্ণতা। আমাদের এই নারী-জীবন ঠিক ঐ নদীর মত। মিলনের পরিপূর্ণতাই যে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, কাম্য বা ধর্ম্ম, সেখানে বৈধ বা অবৈধের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কমলেশ। কিন্তু তোমার এ যুক্তি আমি মানি না পলাশী।

পলাশী। আপনার মেনে নেওয়ার মধ্যেই জগতের সব সত্য নির্ভর করছে না।

কমলেশ। কিন্তু শাস্ত্র।

পলাশী। যে শাস্ত্র মানবত্বার অপমান করে, সেটা সমাজের প্রচলিত নীতিপাঠ হতে পারে, কিন্তু তাই বলে তাকে সত্য বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে না।

কমলেশ। কিন্তু যা অবৈধ, যা অশ্লীল তা কখনই সত্য হতে পারে না এবং তা সুন্দরও নয়।

পলাশী। তা আমি জানি। কিন্তু সমাজের চোখে যেটা বৈধ, সেইটেই বৈধ আর যেটা অবৈধ সেইটেই অবৈধ এ আমি স্বীকার করি না। সমাজই বৈধ বা অবৈধর একমাত্র বিচারক নয়, তার ওপরেও একজন বিচারক আছে এবং সে বিচারক হচ্ছে এই অনন্ত প্রকৃতি—তার চোখে যেটা সুন্দর সেইটেই সত্য এবং যেটা সত্য তাই সুন্দর।

কমলেশ। কিন্তু প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে সমাজ নয়।

পলাশী। যে সমাজ প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে নয় সে আরো বৃহত্তর সমাজ। সে হচ্ছে বিশ্বমানবের সমাজ, মানবতার একমাত্র আশ্রম। সেখানে আপনাদের এই গতানুগতিক ক্ষুদ্র ক্লিষ্ট সমাজের স্থান নেই। তার আদর্শ আরো মহান্, তার দৃষ্টি আরো উদার। সেখানে শুধু আছে সুন্দর ও সত্যের সিংহাসন। সেখানে অসত্য ও অসুন্দর পদদলিত ও ঘৃণিত।

কমলেশ। কিন্তু আমাদের এই সমাজ আমাদের এই শাস্ত্র, রীতি, নীতি যা আমাদের জীবনকে সুন্দর ও সৌষ্ঠবের সঙ্গে পরিচালিত করছে এ সবই প্রাচীন আর্য্যঋষিদের তৈরী। তাঁরা মানবের কল্যানের জন্য সে সত্য ও সুন্দরের সন্ধান পেয়েছেন তাই শাস্ত্রাকারে আমাদের মধ্যে প্রচারিত করে গেছেন, আমরা তা মানতে বাধ্য।

পলাশী। কিন্তু জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। পৃথিবীতে এমন কোন অস্তিত্ব নেই যা অপরিবর্ত্তনীয়। কাজেই এই পরিবর্ত্তনশীলতাই যখন পৃথিবীর নীতি বা ধর্ম্ম তখন কালের প্রবাহে আপনাদের এই সমাজ, রীতি বা নীতি এদেরও চাই একটা আত্মবিবর্ত্তন। প্রাচীন আর্য্যঋষিরা সে যুগের মানুষের পক্ষে যে শাস্ত্র কল্যাণকর বা হিতকর বলে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, এ যুগের মানুষকেও যে সেই প্রতিষ্ঠাকেই হিতকর বলে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে তার কোনই অর্থ নেই। প্রত্যেক যুগেই আছে নূতন মণীষীর জন্ম, আর নূতন মতবাদের সৃষ্টি। প্রত্যেক যুগই চায় তার নিজস্ব দাবী নিয়ে বেঁচে থাকতে। অতীতই তার একমাত্র সম্বল নয়। তবে অতীতকে সে কামনা করতে পারে, শুধু ততটুকু, যতটুকু তার নিজস্ব দাবীকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে একান্ত দরকার।

কমলেশ। তা' হলে আবহমান কাল থেকে যা সত্য বলে চলে আসছে তা তুমি মান না।

পলাশী। হাজার বছর আগে যে মন্দিরে হয় ত' একদিন সত্যিকারের দেবতার আসন ছিল, তখন সেই মন্দিরপ্রাঙ্গনে হয় ত' হাজার হাজার ভক্তেরাও দেবতার জন্যে ছুটে আসত। কিন্তু হাজার বছর পরে সে দেবতা হয় ত' এ মন্দির ত্যাগ করে চলে গেছে আর এক নূতন মন্দিরে, আর এ মন্দির হয়েছে ভগ্ন জরাজীর্ণ, প্রাণহীন মলিন বেদীকা। এ মন্দিরে এখন নেই দেবতা, আছে শুধু তার স্মৃতি। তাই হাজার বছর আগে এ মন্দিরে দেবতা ছিল বলে হাজার বছর পরের ভক্তেরাও যদি সেই ইষ্টদেবতার জন্যে পাগল হয়ে ছুটে আসে এই মন্দির প্রাঙ্গনে যেখানে নেই প্রাণ আছে নির্জ্জীবতা, সে জন্যে দেবতা দায়ী নয়, দায়ী ভক্তেরা এবং তাদের অজ্ঞতা।

কমলেশ। তা হলে প্রাচীন ঋষিদের কি তুমি অজ্ঞ বলতে চাও?

পলাশী। তাদের আমি অজ্ঞ বলতে চাই না। কারণ তাদের যুগে তারা হয় ত' বিজ্ঞতারই পরিচয় দিয়েছেন। আমি বলতে চাই বর্ত্তমান সমাজের কথা। আপনারা যেন সব এ ভক্তের দল, ভাঙ্গা মন্দির নিয়েই চান বেঁচে থাকতে, অথচ দেবতা কোথায় সে খোঁজের দরকার মনে করেন না।

কমলেশ। পলাশী, তুমি নিতান্ত যুক্তিতর্কের বাইরে। এ সমাজে তোমার এ যুক্তির কোন স্থান নেই।

পলাশী। আচ্ছা যদি আপনাদের যুক্তি মেনে নিয়েই আমি সমাজে ফিরে আসতে চাই তা হলে সমাজ কি আমায় গ্রহণ করবে।

কমলেশ। কিন্তু তুমি তার কোন পথ রেখে যাও নি। সে পথের দরজা তোমার জন্যে চিরকাল বন্ধ।

পলাশী। কিন্তু সে পথের সন্ধান ত' সমাজই আমায়

দেখিয়ে দিয়েছে। যদি তারা বেরিয়ে আসবার পথ দেখিয়ে দিতে পারে, তবে ফিরে যাবার পথে কেন তারা দরজা বন্ধ করে রাখবে ?

কমলেশ। কেন রাখবে সে তুমি নিজেই বিচার করে দেখ।

পলাশী। আমার বিচারে এ নিতান্ত অহেতুক অবিচার, অমানুষের পরিচয়।

কমলেশ। [উত্তেজিত হইয়া] পলাশী, তুমি সংযত হয়ে কথা বল।

পলাশী। সংযমের মুখোস ত' আপনারাই খুলে নিয়েছেন।

কমলেশ। [উত্তেজিত হইয়া] পলাশী !

পলাশী। বলুন।

কমলেশ। তুমি পতিতা, তাই সমাজ তোমায় গ্রহণ করতে পারে না।

পলাশী। পতিতা ! তার প্রমাণ ?

কমলেশ। [তেমনি উত্তেজিত ভাবে] প্রমাণ ! তুমি প্রমাণ চাও !

পলাশী। হ্যাঁ, চাই।

কমলেশ। তুমি সুজিতের প্রণয়ে মুগ্ধ হয়ে তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছ, দেহের মর্য্যাদা নষ্ট করেছ, নারীত্বের অবমাননা করেছ। এর চেয়ে বড় প্রমাণ তুমি কি চাও পলাশী ?

পলাশী। আত্মসমর্পণ করাই যদি পতিতা হওয়ার একমাত্র লক্ষণ, তা হলে যে স্ত্রী স্বামীর কাছে আত্মসমর্পণ করে আপনার কথা মত সেও পতিতা, আর তা ছাড়া দেহের মর্য্যাদাও আমি নষ্ট করি নি বা নারীত্বেরও অবমাননা করি নি, কারণ নারী শুধু তার কাছেই নিজের আত্মাকে, নিজের দেহ ও মনকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করতে পারে যাকে সে মনে ও প্রাণে মেনে নেয় স্বামী বলে। আমি সুজিতকে ভালবাসি, একান্ত আপন করে ভালবাসি, আমার ভালবাসার মধ্যে নেই এতটুকু ত্রুটী, এতটুকু গড়মিল। সুজিতের মধ্যে পেয়েছি আমি আমার আত্মার সন্ধান, তার আত্মার সঙ্গে আমার আত্মার মিলন ঘটানই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এক আত্মার সঙ্গে আর এক আত্মার মিলন যেখানে সেখানে অবমাননা নেই, আছে পরিপূর্ণতা, আর এই মিলনের পরিপূর্ণতা লাভের মধ্যেই রয়েছে নারীজীবনের চরম সার্থকতা।

কমলেশ। তা হলে আমাদের সমাজে বিবাহ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পুরুষ ও নারী উভয়ের মধ্যে যে একটা স্বামী স্ত্রীর চিরসম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সে সম্বন্ধ তুমি চাও না বা মান না ?

পলাশী। আপনাদের এই বাহ্যিক অনুষ্ঠান ছাড়াও নর ও নারী যখন উভয়ে মিলনের পথে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়, তখন তাদের মধ্যে একটা আন্তরিক অনুষ্ঠান আছে। আমি বাহ্যিক অনুষ্ঠানের চেয়ে আন্তরিক অনুষ্ঠানকেই বড় করে দেখি। এই আন্তরিক অনুষ্ঠানের যেখানে ত্রুটী আছে সেখানে আত্মার মিলন ঘটতে পারে না। এবং আত্মার মিলন যেখানে নেই সেখানে স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধও থাকতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে তারাই শুধু স্বামী স্ত্রীর পরিচয়ের দাবী করতে পারে, যাদের মধ্যে ঘটেছে আত্মার মিলন। অবশ্য প্রথা অনুযায়ী, আত্মার মিলন না থাকলেও স্বামী স্ত্রীর পরিচয়-পাশে আবদ্ধ হ'য়ে সমাজের ভেতর বাস করা যায়, তবে সে সম্বন্ধের মধ্যে কোন সৌন্দর্য্য বা পরিতৃপ্তি নেই—এটা শুধু গড্ডালিকা-প্রবাহ।

কমলেশ। পলাশী, আমি আর এত রাত্রে তোমার সঙ্গে তর্ক করতে পারব না ; আমি ক্লান্ত, তুমি ফিরে যাও পলাশী।

পলাশী। তা' হ'লে আপনি পরাজিত, বলুন ?

কমলেশ। পরাজিত ? তুমি কি উন্মাদিনী পলাশী ? আমি হব তোমার কাছে পরাজিত ! জান, তুমি আমার হাতের তৈরি পুতুল, আমি আছাড় দিয়ে গুড়ো ক'রে মারতে পারি, চমৎকার ! চমৎকার বলেছ পলাশী, যাও যাও, আমায় বিরক্ত করো না, আমি ক্লান্ত, আমায় একলা থাকতে দাও, একলা থাকতে দাও !

পলাশী। তা' হ'লে আমি যার জন্যে এসেছি, আমায় তা' দিয়ে দিন।

কমলেশ। কিসের জন্যে এসেছ পলাশী ?

পলাশী। অনেক আগেই ত বলেছি, মুক্তি।

কমলেশ। হাঃ···হাঃ···হাঃ···চমৎকার ভিক্ষা পলাশী, চমৎকার ভিক্ষা।

পলাশী। ভিক্ষা নয়, এ আমার দাবী।

কমলেশ। দাবী ? [অট্টহাসি] আরো চমৎকার পলাশী, আরো চমৎকার ! যাও ! যাও ! আমায় অযথা বিরক্ত করো না, আমি তোমায় সহ্য করতে পাচ্ছি না, তুমি দূষিত বায়ু, যাও—ফিরে যাও, ফিরে যাও !

পলাশী। তা' হ'লে আপনি আমায় মুক্তি দেবেন না ?

কমলেশ। না না, মুক্তি দেওয়া তোমায় অসম্ভব ! মুক্তি তোমার নেই পলাশী। আমি তোমায় বাঁচতে দিতে পারি না, কোন মতেই না, মৃত্যুই তোমার একমাত্র দণ্ড। তুমি পাপী, তোমায় মরতেই হবে আর সে-মৃত্যু হবে বীভৎস। সেই সুজিত যাকে তুমি ভালবাস, সেই তোমায় খুন করবে। তুমি ফিরে যাও পলাশী, তুমি ফিরে যাও।

পলাশী। কিন্তু তার আগে আমার বেঁচে থাকবার পথ

তৈরী করে যেতে হবে, আমায় বাঁচতেই হবে। বাঁচা আমার একান্ত প্রয়োজন। এর জন্যে আমি আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেও রাজি আছি। আমি বিদ্রোহ করব, তবু আমি এই নৃশংস অকাল মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে চাই।

কমলেশ। বাঁচতে চাও? বিদ্রোহ করে? আমার বিরুদ্ধে! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ......এ-কি! তুমি আমার সামনে এগিয়ে আসছ কেন?

পলাশী। বলুন আমায় মুক্তি দেবেন কি না?

কমলেশ। না! এ-কি! আমার কাঁধে হাত? পলাশী!

পলাশী। বলুন আমায় মুক্তি দেবেন কি না?

কমলেশ। না, তুমি পাপী, এ-কি! আমার গলা টিপে ধরো না পলাশী, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও পলাশী, আমি তোমায় মুক্তি দেবো না, দিতে পারি না, তুমি পাপী কলঙ্কিনী, তুমি নিজে বিচার কোরে দেখ। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও পলাশী...প [বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া চেয়ার হইতে মেজেতে পড়িয়া গেল। সেই শব্দে সুরমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ছুটিয়া কমলেশের ঘরে প্রবেশ করিল।]

সুরমা। ও-মা, এ-কি! তোমার কি হ'ল? মেজের ওপর পড়ে আছ কেন, ওগো শুনছ? এঁ্যা সর্ব্বনাশ! লাইট্-টা পড়ে গিয়ে কাগজ পত্তর সব জ্বলে গেল যে! জল! জল! জল কোথায় [জল আনিয়া জ্বলন্ত কাগজের উপর ছিটাইয়া আগুন নিভাইয়া দিল] হ্যাঁ গা শুনছ? সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল যে। কি বিপদেই পড়েছি বাপু!

কমলেশ। [বিজড়িত কণ্ঠে] কে সুরমা? তুমি! তুমি এসেছ! কিন্তু পলাশীকে আমি কিছুতেই মুক্তি দেবো না সুরমা, ও-যতই মিনতি করুক, আমার বিচার অপরিবর্ত্তনীয়। আমি ওকে মুক্তি দিতে পারি না সুরমা, ও কলঙ্কিনী।

সুরমা। তোমার পলাশী পুড়ে মরেছে যে?

কমলেশ। [সহসা লাফাইয়া উঠিয়া] এঁ্যা পুড়ে মরেছে? কৈ কৈ, সুরমা?

সুরমা। ঐ যে দেখ না টেবিলের ওপর লাইট্-টা পড়ে গিয়ে সব কাগজ পত্তর জ্বলে গেছে।

কমলেশ। তাই তো—তাই তো সুরমা, কিন্তু ও পুড়ে মরে নি সুরমা ও বেঁচে আছে। একটু আগেও এখানে আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলেছে। দেখেছ? দেখেছ ওকে সুরমা ও এসেছিল মুক্তি নিতে আমার কাছে। আমি ওকে মুক্তি দিতে চাই নি সুরমা, কিছুতেই না। আজ রাত্রেই নেমে আসত ওর জীবনের শেষ অধ্যায়ের উপর মৃত্যুর কালো যবনিকা। কিন্তু ও করলে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা। বিদ্রোহ করে আমাকে জোর করে হার মানিয়ে ও নিয়ে গেল মুক্তি। ও মরে নি সুরমা ও বেঁচে আছে, বেঁচে আছে। পলাশী, শুনে যাও, আমি পরাজিত, পরাজিত—তুমি মুক্ত...মুক্ত...মুক্ত—

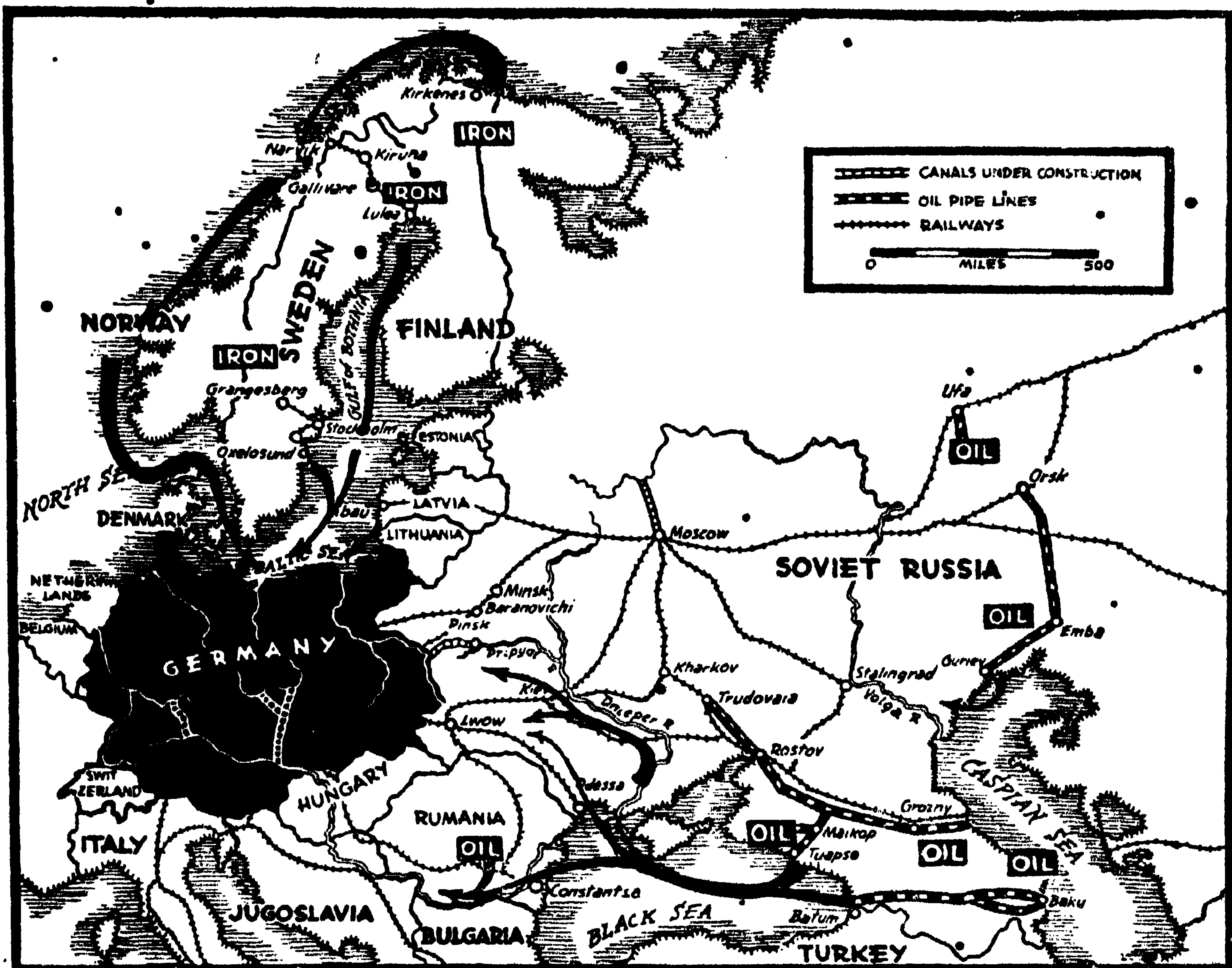
বৃহত্তর পৃথিবী

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

যান্ত্রিক যুদ্ধে জয়লাভ কোন্ শক্তি দ্বারা সম্ভব?

দুই রাষ্ট্রের যুদ্ধে কোন্ পক্ষ জয়লাভ করিবে—এই ধরণের প্রশ্নের উদয় মনোমধ্যে বিচিত্র নয়। এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য আমরা তখন চিন্তা করি—কোন্ পক্ষের শক্তি বেশী। কিন্তু এই শক্তির মাপকাঠি চিরযুগ সমান থাকে না, শক্তির পরিমাপক বিষয়গুলিও কালের গতির সহিত পরিবর্ত্তিত হয়। হাজার বৎসর পূর্ব্বে যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের জন্য প্রথমে হিসাব লওয়া হইত সৈন্যসংখ্যার। পদাতিক, অশ্বারোহী, তীরন্দাজ প্রভৃতি কত সৈন্য কোন্ পক্ষে আছে তাহারই হিসাব অনুযায়ী যুযুধান পক্ষের শক্তির তারতম্য বিচার করা হইত। তাহার পর ক্রমশঃ আগ্নেয়াস্ত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শক্তির উৎকর্ষ বিচারে কোন্ পক্ষ উন্নততর ধরণের অস্ত্রাদির অধিকারী তাহারও হিসাব গ্রহণের প্রয়োজন উপস্থিত হইল। প্রাচীন কালের বহু যুদ্ধে এক পক্ষের হস্তীর ব্যবহার প্রতিপক্ষকে যুদ্ধের প্রারম্ভেই নৈতিক শক্তিতে দুর্ব্বল করিয়া দিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর কর্ত্তৃক বন্দুকের ব্যবহার যে লোদী সম্রাটের সৈন্যদলের মধ্যে দারুণ হতাশা ও নৈরাশ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল ইতিহাসের ছাত্রদের নিকট ইহা অজ্ঞাত নয়। গত মহাযুদ্ধেও নবাবিষ্কৃত সমর-সম্ভার যুদ্ধজয়ের অনুকূলে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। বর্ত্তমান পৃথিবী-ব্যাপী যুদ্ধেও তাই আমরা যুযুধান রা[ষ্ট্রের] সমরোপকরণের হিসাব জানিতে ব্যগ্র। জার্ম্মাণী, জাপা[ন], রুশিয়া, বৃটেন, আমেরিকা প্রভৃতি কাহার কত বিমান, ট্যাঙ্ক,

বিমান-বিধ্বংসী কামান, রণতরী, সাবমেরিণ প্রভৃতি আছে, কোন্ রাষ্ট্রের এই সকল সমরোপকরণের উৎপাদন শক্তি কতখানি—যুযুধান রাষ্ট্রগুলির যুদ্ধ-শক্তি জানিবার জন্য এই সকল তথ্যাদি পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে বিচার করিলেই বুঝা যাইবে, যেমন শুধু বাহুবলেই যান্ত্রিক যুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না, তেমনই শুধু অপর্য্যাপ্ত সমরোপকরণ থাকিলেই যুদ্ধে শত্রুকে পরাজিত করা সম্ভব হয় না। কথাটা শুনিতে প্রথমে যথেষ্ট বিস্ময় বোধ হওয়া স্বাভাবিক, যান্ত্রিক যুদ্ধে সংখ্যাধিক বিমান, ট্যাঙ্ক প্রভৃতি থাকিলেও যুদ্ধ জয় করা চলে না—কথাটা প্রথম ভ্রমাত্মক পারে। ইঞ্জিনের সমস্ত কলকব্জা সঠিক এবং কার্য্যক্ষম থাকিলেও একমাত্র বাষ্পের অভাবে যেমন তাহা অকর্ম্মণ্য ও গতিহীন হইয়া যায়, তেমনই বিংশ শতাব্দীর এই বিরাট যান্ত্রিক যুদ্ধও একমাত্র খনিজ তৈলের অভাবে অচল! তাহা হইলে বর্ত্তমান যুযুধান রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরীণ শক্তির গোপন পরিচয় জানিতে হইলে তাহাদের সঞ্চিত পেট্রোল ও প্রত্যেকের রাষ্ট্রান্তর্গত তৈলশক্তির পরিমাণ জানা অত্যাবশ্যক। গত ১৯৩৭-৪০ সালে কয়েকটি প্রধান প্রধান রাষ্ট্রে কি পরিমাণ তৈল উৎপন্ন হইয়াছে তাহার একটি হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :



বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু যুদ্ধে সৈনিকদের যেমন সামরিক শক্তি ছাড়াও নৈতিক সাহস একান্ত প্রয়োজনীয়, তেমনই যন্ত্রাদির জন্যও অন্য আরও কিছুর আবশ্যক। পর্য্যাপ্ত সমর-সম্ভার থাকিলেই হইবে না, জল, স্থল ও বিমানবাহিনীর একত্র সমাবেশ ও পরিচালন-কৌশল পরিজ্ঞাত হইলেও সৈন্যাধ্যক্ষের পক্ষে যুদ্ধ জয় অসম্ভবই থাকিয়া যাইবে—যদি না এই যন্ত্র-সম্ভারের পিছনে থাকে তাহার পরিচালন-শক্তি। বিমান, ট্যাঙ্ক, সাবমেরিণ, রণতরী, ডেষ্ট্রয়ার—প্রত্যেকেরই প্রয়োজন তৈলের। এই তৈলই বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রাণ। এই বিরাট যান্ত্রিকযুদ্ধ একমাত্র তৈলাভাবে মুহূর্ত্তমধ্যে অচল হইয়া পড়িতে

দেশ	১৯৩৭	১৯৩৮	১৯৩৯	১৯৪০
	লক্ষ টন	লক্ষ টন	লক্ষ টন	লক্ষ টন
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৭৩০	১৬৫০	১৭৩৩	১৯২১
সোভিয়েট রুশিয়া	২৮৬	২৯০	৩০৯	৩২০
রুমানিয়া	৭২	৬৬	৬৫	৬১
নেদারল্যাণ্ড—				
পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীঃ পুঃ	৭২	৭৩	৫৮	৫৭
বৃটিশ ভারত	৩	৩	৩	—*
ইরাণ	১০২	১০০	১১১	১০৯

* তালিকা প্রস্তুতির সময় পর্য্যন্ত হিসাব প্রকাশিত হয় নাই।

অনেক অভিজ্ঞের মতে জার্ম্মাণী যুদ্ধের প্রারম্ভে যে তৈল মজুদ করিয়াছিল তাহা ১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত যুদ্ধে যথেষ্ট হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে জার্ম্মাণীর মজুদ তৈলে আর দেড় বৎসর হইতে দুই বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে ইহা অনুমান মাত্র। জার্ম্মাণী যুদ্ধারম্ভের সময়ে তাহার মজুদ তৈলের পরিমাণ অভিজ্ঞদের জানাইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় নাই। তাহার পর ১৯৩৯ সালেও আমেরিকা হইতে প্রচুর তৈল স্পেন ক্রয় করিয়াছে। স্পেনের পক্ষে অত অধিক তৈল ক্রয় একদিকে যেমন নিষ্প্রয়োজন, অপর দিকে তেমনই স্পেনের অপর্য্যাপ্ত তৈল আমদানী অনেক রাষ্ট্রের বিস্ময় উৎপাদন করে। পরে অনুসন্ধানে প্রকাশ পায় যে, জার্ম্মাণী সেই তৈল স্পেনের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে। তৈল-সম্পদে রুমানিয়া যথেষ্ট সমৃদ্ধ। সেই রুমানিয়ান্ তৈল আজ জার্ম্মাণীর আয়ত্বে।

আমেরিকা তৈল-সম্পদে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ, উপরোক্ত তালিকা হইতে উহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে। ইরাণের তৈল-সম্পদে বৃটিশের এক বৃহৎ অংশ আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৈল যে বৃটেনের অথবা মিত্রশক্তির যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতে পারিবে ইহা নিঃসন্দেহ।

এই প্রসঙ্গে বৃটিশ-ভারতে উৎপন্ন তৈলেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। সমগ্র পৃথিবীতে যে পরিমাণ তৈল প্রতি-বৎসর উত্তোলিত হয়, ভারতে উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ১.১ অংশ। ভারতে মাত্র দুই স্থানে পেট্রোল পাওয়া যায়—প্রথম উত্তর আসামের অন্তর্গত ডিগবয় নামক স্থানে এবং দ্বিতীয়, পাঞ্জাবের অন্তর্গত য়্যাটক-এ। ১৯৩২ হইতে ১৯৩৮ সাল, মিত্রপক্ষের যুদ্ধে লিপ্ত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, সাত বৎসরে ভারতে উত্তোলিত তৈলের একটি হিসাব প্রদত্ত হইল :—

সাল	গ্যালন তৈল
১৯৩২	৩০৪,৬০৬,০৩১
১৯৩৩	৩০৬,০০৯,০২২
১৯৩৪	৩২২,০২৫,২৮০
১৯৩৫	৩২২,৬৬২,৩৩৬
১৯৩৬	৬৯,২৪১,৫০৪
১৯৩৭	৭৫,৬৫৭,৮৫৭
১৯৩৮	৮৭,০৮২,৩৭১

উপরের হিসাব হইতে স্পষ্টই দেখা যায় ১৯৩৫ সালে ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ তৈল উত্তোলিত হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালের উৎপাদন ১৯৩৫ সালের উৎপাদন অপেক্ষা এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক কম।

জাপান আপন ভূমিতে তৈল-সম্পদে দরিদ্র হইলেও যে সকল অঞ্চল সে অধিকার করিয়াছে তাহাতে সে যথেষ্ট পরিমাণ তৈল লাভ করিয়াছে। এক ব্রহ্মদেশেই বৎসরে যে পরিমাণ তৈল উৎপন্ন হয়, তাহা নিতান্ত অল্প নয়। আমেরিকা অথবা রুশিয়ার উৎপাদনের তুলনায় ইহা সামান্য হইলেও ব্রহ্মদেশের তৈল যথেষ্ট উৎকৃষ্ট। বিমানে ব্যবহারের জন্য অতি উৎকৃষ্ট তৈলের প্রয়োজন—ব্রহ্মদেশের তৈল দ্বারা সেই প্রয়োজন অল্পাধিক সাধিত হইবে। বোর্ণিওর অন্তর্গত সারওয়াক্-এ যথেষ্ট তৈল জাপান লাভ করিয়াছে। মালয় অধিকার করায় জাপানের হাতে যথেষ্ট তৈলখনি আসিয়াছে। তবে ঐসকল অঞ্চল পরিত্যাগের সময় মিত্রশক্তি যথাসাধ্য তৈলখনিগুলি নষ্ট করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে ঐ সকল খনি কার্য্যকরী করিতে ছয় মাস মাত্র সময় লাগে। কাজেই জাপান যত অধিক দিন ঐ সকল স্থানে আপন আধিপত্য বজায় রাখিতে পারিবে ততই তৈল ও অন্যান্য সম্পদে যে সে আপনাকে অধিক শক্তিশালী করিয়া লইতে পারিবে ইহা নিঃসন্দেহ।

বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীর সহিত রুশিয়া প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত, রুশিয়ার তৈল সম্পদ কতখানি আছে তাহা উপরের হিসাব হইতেই পাওয়া যাইবে। কিন্তু উহাই রুশিয়ার তৈলের প্রকৃত পরিচায়ক নহে। প্রথমতঃ ঐ হিসাব যখন লওয়া হইয়াছে ককেশাশের তৈল তখনও জার্ম্মাণ আক্রমণে বিপন্ন হয় নাই। ককেশাশের বহু তৈল বর্ত্তমানে রুশিয়ার অভ্যন্তরে নিরাপদ স্থানে প্রেরিত হইয়াছে। গ্রজনির নিকটস্থ তৈলের কিয়দংশ জার্ম্মাণ অধিকার আশঙ্কায় বিনষ্ট হইয়াছে। তাহার উপর রুশিয়ার এক বিরাট অঞ্চলের তৈলের পরিমাণ উপরোক্ত হিসাবের মধ্যে নাই, এই প্রচণ্ড সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের পশ্চাতেও স্থির মস্তিষ্ক রুশ-বৈজ্ঞানিকগণ যান্ত্রিক যুদ্ধের গতি অব্যাহত রাখিবার জন্য কি ভাবে নূতন নূতন তৈলাঞ্চল আবিষ্কার করিয়া চলিয়াছেন সেই সংবাদই বর্ত্তমানে আমরা প্রদান করিব।

পৃথিবীর একদিক হইতে সমুদ্রের তলদেশ দিয়া অপরদিক পর্য্যন্ত যেমন পর্ব্বতশৃঙ্খল বর্ত্তমান মধ্য-এশিয়ার রিপাবলিক্‌ও তেমনই তৈলবাহী এক বিস্তৃত পরিধিযুক্ত অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত। আমাদের সাধারণের ধারণা ভূতত্ত্ববিদদের এক বিশেষ বিভাগ যাঁহারা সিস্‌মোলজি লইয়া আলোচনা করেন, তাঁহারা শুধু ভূ-কম্পনের হিসাব ও তাহার কারণ অনুসন্ধান লইয়া ব্যস্ত। কিন্তু রুশ বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, সিস্‌মোলজিষ্টদের আরও যথেষ্ট কাজ আছে এবং তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভূগঠন পাঠ পদ্ধতি অনুযায়ী তাঁহারা রুশিয়ার বিভিন্ন অংশের জমির স্তরের গঠন প্রণালী, গঠন উপাদান প্রভৃতি পাঠ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, উহার ব্যবহারিক প্রয়োগ দ্বারা কোন্ অঞ্চলে তৈল আছে তাহাও আবিষ্কার করিতেছেন। এই পদ্ধতি দ্বারা মধ্য এশিয়ার কতকগুলি তৈলখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং সেই সকল

খনি হইতে বর্ত্তমানে তৈল উত্তোলিত হইতেছে। আবিষ্কৃত কিন্তু অনুত্তোলিত তৈলখনি এখনও ঐ অঞ্চলে প্রচুর রহিয়াছে? অনেক অঞ্চলে তৈল থাকে ভূগর্ভের বহু নিম্নে। ঐ সকল খনি আবিষ্কার করাও যেমন শ্রমসাধ্য, খনি খনন করিয়া সেই তৈল উত্তোলন করাও তেমনি সময় ও পরিশ্রম-সাধ্য ব্যাপার। খনির তৈল উত্তোলনের জন্য খননকে বলে—বোরিং। এই বোরিং প্রণালীতে খনি খননে যথেষ্ট সময় ও অর্থব্যয় হয়? রুশ বৈজ্ঞানিকগণ এই সমস্যারও সমাধান করিয়াছেন। তৈল যখন ভূমির সুগভীর অভ্যন্তরে থাকে, তখন রুশ বৈজ্ঞানিকগণ সিস্‌মিক পদ্ধতি অবলম্বন করেন। বিস্ফোরক পদার্থ সাহায্যে নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে তাঁহারা এক বিস্ফোরণ ঘটান—একটা ছোটখাট ভূমিকম্পের ন্যায় এই বিস্ফোরণে সেই অঞ্চল প্রকম্পিত হয়। ভূকম্পনগ্রাহী যন্ত্রে এই কম্পনের যে প্রবাহ সকল আঘাত দেয় ও তরঙ্গ সৃষ্টি করে তাহার দ্বারা রুশ বৈজ্ঞানিকগণ সেই স্থানের জমির স্তরের অবস্থা, তৈলের অবস্থান প্রভৃতি বুঝিতে পারেন। বৃটিশ এবং মার্কিন বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কৃত পদ্ধতি সকলও উপেক্ষিত হয় নাই, প্রয়োজনমত সে সকল পদ্ধতিও প্রয়োগ করা হইতেছে। বৃটিশ বৈজ্ঞানিক স্যার জি, পি, লেনক্স-কানিংহাম আবিষ্কৃত যন্ত্রাদিও ব্যবহারের ব্যবস্থা হইতেছে। রুশ বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত যন্ত্রাদি সাহায্যে ৫,০০০ মিটার ভূনিম্নের স্তরের অবস্থান, গঠন, উপাদান প্রভৃতি পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। ভূগর্ভস্থ ঐশ্বর্য্যাদি আবিষ্কারের কার্য্য প্রভৃতি সু-সংগঠিত সমিতির তত্ত্বাবধানে শৃঙ্খলার সহিত চলিতেছে। এই সমিতির নাম—সিস্‌মোলজিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট্ অফ্ দি য়্যাকাডেমি অফ্ সায়েন্সস্ অফ্ দি ইউ, এস, এস, আর (Seismological Institute of the Academy of Sciences of the U. S. S. R.)। এই ইন্‌ষ্টিটিউট্-এর ডিরেক্টার প্রফেসর পি, এম, নিকিফোরোভ (P. M. Nikiforov)-এর নির্দ্দেশ ও তত্ত্বাবধানে শিক্ষিত বৈজ্ঞানিকের দল দেশের ভূ-ঐশ্বর্য্য যুদ্ধের প্রয়োজনে লাগাইবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া দিনের পর দিন আপন কর্ত্তব্য করিয়া চলিয়াছেন। সমগ্র মধ্য রুশিয়ার এবং উরাল পর্ব্বতাঞ্চলে বর্ত্তমানে রুশ বৈজ্ঞানিকগণ যে তৈলখনি আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার তৈলের পরিমাণ কতখানি অন্যান্য রাষ্ট্রের পক্ষে বর্ত্তমানে তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব না হইলেও একক যুযুধান রাষ্ট্রের পক্ষে নিঃসন্দেহে উহা যথেষ্ট।

শুধু সাধারণ নহে, অনেক অভিজ্ঞেরও ধারণা, ককেশাশই রুশিয়ার একমাত্র তৈলাঞ্চল এবং ককেশাশ জার্ম্মাণীর হস্তগত হইলে রুশিয়ার যুদ্ধের উপযোগী তৈল আর থাকিবে না। আশা করি বর্ত্তমান প্রবন্ধ এই ভ্রমাত্মক ধারণা কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিতে সমর্থ হইবে। ককেশাশের তৈল যে রুশিয়ার উৎপন্ন তৈলের এক বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছে, তাহা সত্য, জার্ম্মাণী ককেশাশের তৈলাঞ্চল হস্তগত করিতে পারিলে শুধু রুশিয়ার তৈলহানি নয়, জার্ম্মাণী তৈল-শক্তিতে যথেষ্ট শক্তিশালী হইতে পারিত এবং সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া যান্ত্রিক যুদ্ধ পরিচালনের ক্ষমতা সে লাভ করিত ইহাও সত্য। কিন্তু 'পৃথিবীর শস্যাগার' ইউক্রেন হস্তচ্যুত হইলেও রুশগণ যেমন অনাহারে মরে নাই এবং জার্ম্মাণীতে অপরিমিত



খাদ্যসম্ভারের বন্যা প্রবাহিত হয় নাই, তেমনই ককেশাশের তৈল রুশিয়ার হস্তচ্যুত হইলেও রুশের প্রতিকূলে রুশযুদ্ধের পরিসমাপ্তি দ্রুত ঘটিত না। বর্ত্তমানে অবশ্য ককেশাশ নিরাপদ। সুতরাং রুশিয়ার তৈলশক্তির পরিমাণও বর্ত্তমানে সহজে অনুমেয়।

আলোচ্য প্রবন্ধে প্রত্যেক যুযুধান রাষ্ট্রের তৈলশক্তির পরিমাণ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হইল। এই তৈলই বর্ত্তমান যান্ত্রিক যুদ্ধের প্রাণ, এবং কোন্ শক্তির হস্তে এই যান্ত্রিক যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত করার ক্ষমতা কতখানি বর্ত্তমান প্রবন্ধ হইতেই পাঠকগণ তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

ফরাসী বিপর্য্যয়ের কারণ

শ্রীসুধীরচন্দ্র সান্যাল

বর্ত্তমান ইউরোপীয় সমরের সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনা ফরাসী দেশের বিপর্য্যয়। আধুনিক জগতে রাষ্ট্রনীতির ভিত্তি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার জন্মদাতা, সাহিত্য, কলা, শিল্প ঐতিহ্য প্রভৃতির, গত তিন শত বৎসরের ইউরোপীয় সভ্যতার পথপ্রদর্শক, স্বাধীনতার লীলাভূমি ফ্রান্স যখন জার্ম্মাণ আক্রমণের প্রথম ধাক্কার নিকট নিতান্ত অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করিল, তখন সমগ্র পৃথিবী রূঢ় বিস্ময়ে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। ফরাসীবাসীদের যাহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, পৃথিবীর গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ভক্তবৃন্দ যুদ্ধের ভীষণতম পরিণামেও যাহা কল্পনা করিতে পারে নাই, এমনকি, সর্ব্ববিষয়ে ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠত্বে সন্দিহান ফরাসী-বিদ্বেষীগণও যাহা আশা করিতে সাহস পায় নাই, তাহাই যখন বাস্তবে পরিণত হইল, এবং তাহাও অবিশ্বাস্য দ্রুত সময়ের মধ্যে, তখন ইহার আকস্মিকতায় সমগ্র পৃথিবীই যে হতচেতন হইবে তাহাতে বৈচিত্র কিছু নাই। তাই বিমূঢ়তার ভাব যখন কাটিয়া গেল তখন লোকের মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগিল যে, কেন এবং কি ভাবে এ অসম্ভব সম্ভব হইল।

যুদ্ধারম্ভের কিছুকাল পর হইতেই কয়েকজন চিন্তাশীল ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি ফ্রান্সের প্রকাশ্য শক্তি ও নিরপত্তাবরণের নীচে জগদ্দল গলদের সন্ধান পাইয়াছিলেন। যুদ্ধরত দেশে রাষ্ট্র ব্যবস্থার বাণী উচ্চারণ করা সম্ভব হয় নাই। ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান, নিউ ষ্টেট্‌স্‌ম্যান ইত্যাদি পত্রের প্যারীস্থিত সংবাদদাতা আলেকজান্দার ওয়ার্থ ইঁহাদের অন্যতম। নিজ সংবাদপত্রে প্রেরণের জন্য তাঁহাকে যখন রাষ্ট্র ও সমাজের উচ্চ নীচ বিভিন্ন লোকদের মধ্যে মিশিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইত, তখন এই সমস্ত গলদ তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। তিনি অনেক কিছু দেখিয়াছিলেন, অনেক কিছু শুনিয়াছিলেন যাহা সংবাদদাতা হিসাবে তিনি ব্যবহার করিতে পারিতেন না; সংবাদ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় তাহা অনুমোদিত হইত না। তাই মিঃ ওয়ার্থ প্রেরিতব্য সংবাদ ছাড়া তাঁহার দিন-লিপিতে নিবদ্ধ অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে ফ্রান্সের পরাজয়ের কারণ ও কাহিনী সম্পর্কে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মিঃ ওয়াটারফিল্ড নামক 'রয়টার'-এর জনৈক প্রতিনিধি ফরাসী সৈন্যবাহিনীর সহিত অবস্থানকালে তাঁহার যাহা জানিবার সুযোগ হইয়াছিল তাহা আশ্রয় করিয়া এই বিষয় সম্পর্কে আর একখানি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশিত করিয়াছেন। মিঃ ওয়াটারফিল্ড ফরাসীবাহিনীর সহিত ছিলেন, আর মিঃ ওয়ার্থ ছিলেন রাজধানী প্যারীতে; সুতরাং, অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের উপায় ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্র বিভিন্ন হওয়ার ফলে ব্যাধির হেতু সম্পর্কে তাঁহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ মতভেদ বিদ্যমান।

ফরাসী আপামর সাধারণের অধঃপতনের কারণ খুঁজিতে গেলে প্রথমেই আমাদের গত ইউরোপীয় মহাসমরের কথা স্মরণ করিতে হয়। একথা সর্ব্বজনবিদিত যে, গতযুদ্ধে ফ্রান্সই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। দীর্ঘ চার বৎসর নিজ ভূমির উপর যুদ্ধ করিয়া এবং প্রবল প্রতিপক্ষের প্রচণ্ড গতির মুখে প্রধানতঃ একা দাঁড়াইয়া শত্রুকে পরাজিত করিতে ফ্রান্সকে যে ধন ও প্রাণ হানি স্বীকার করিতে হইয়াছিল, বলিতে গেলে, তাহার প্রতিক্রিয়া সে এই যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বেও সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। সে যুদ্ধে ফ্রান্স সর্ব্বস্ব আহুতি দিয়াছিল এবং প্রস্তুত হইয়াই দিয়াছিল, কেননা, সেবার জয়লাভে তাহার আশা ও আস্থা ছিল; বিশ্বাস ছিল যে, যাহা সে বিসর্জ্জন দিতেছে, জয়লাভের পর তাহা উজ্জ্বলতর ও মধুরতর হইয়া ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু বাস্তবে যাহা ঘটিয়াছে তাহা আশা, আকাঙ্ক্ষা, কল্পনার বহু পশ্চাতে রহিয়াছে। গত যুদ্ধের পরবর্ত্তী এই বিশ বৎসরে ফ্রান্সের চূর্ণ, বিধ্বস্ত নগর জনপদ সমূহ প্রায় পুনর্গঠিত হইয়া আসিলেও আনন্দোজ্জ্বল স্বাধীন ফরাসীর স্বাভাবিক মানসিক স্থৈর্য্য আজিও ফিরিয়া আসে নাই। নিজ ভূমিতে যুদ্ধ করিবার ভয়াবহ ফল ফরাসী অধিবাসীগণ যে কিরূপ অস্থিমজ্জায় অনুভব করিয়াছে, অগণিত অর্থ ব্যয়ে ও সুক্ষ্মতম নিপুণতা দ্বারা রচিত ম্যাজিনো ব্যূহই তাহার প্রমাণ। যুদ্ধের সর্ব্বগ্রাসী ব্যয়ের ধাক্কা কাটাইবার পূর্ব্বেই আবার অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছে যাহাতে কোন ক্রমেই ১৯১৪-১৮'র পুনরাবৃত্তি না ঘটিতে পারে। পরবর্ত্তী যুদ্ধ যতই ভয়াবহ হউক না কেন, ম্যাজিনো ব্যূহ থাকার ফলে তাহার প্রাণাধিক প্রিয় মাতৃভূমি আর রণক্ষেত্রে পরিণত হইবে না,—এই ছিল সাধারণ ফরাসীবাসীর অটল বিশ্বাস। সুতরাং জার্ম্মাণ সৈন্যবাহিনীর ফরাসীভূমিতে পদার্পণ করিবার সংবাদ প্রকাশ মাত্র ফ্রান্সের জনসাধারণের মনে গত যুদ্ধের শোচনীয় ধ্বংসের চিত্র ফুটিয়া উঠিল।

মিঃ ওয়াটারফিল্ডের পুস্তকে ফরাসী বাহিনীর অনুরূপ নৈতিক অধঃপতনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ফরাসী বিপ্লবের পর নেপোলিয়নের অধীনে যাহারা দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিল, গতমহাযুদ্ধে অতি ক্ষুদ্র শত্রুঘাঁটি দখলের জন্য যাহারা অকাতরে বিপদাগ্নির মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, সমগ্র ইউরোপের শ্রদ্ধা ও প্রশংসার পাত্র সেই ফরাসী সৈন্যবাহিনী মাসের পর মাস নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে; কেবল তাহাই নহে, কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইবার ইচ্ছা তাহাদের প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া চলিয়াছে—ইহাই হইল মিঃ ওয়াটারফিল্ডের অভিজ্ঞতা। আধুনিক যুগের উৎকৃষ্টতম রণসম্ভার সমন্বিত সুশিক্ষিত জার্ম্মাণ সৈন্যবাহিনী অতি অল্পকাল মধ্যে এই পরাজয়োন্মুখ ফরাসীবাহিনীকে যে পর্যুদস্ত

করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে বিজিতদের এই নৈতিক অধঃপতন।

কিন্তু জনসাধারণ বা সৈন্যবাহিনীর এই নৈতিক অধঃপতন বিশেষ অনিষ্টকর হইত না যদি এই সময় ফরাসী রাষ্ট্রনীতির কাণ্ডারীগণ দৃঢ়হস্তে ঘটনার গতি নিয়ন্ত্রণ করিতেন। বস্তুতঃ, রাষ্ট্রনেতাদের অক্ষমতাই ফরাসী বিপর্য্যয়ের প্রথম ও প্রধান কারণ। যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই ফ্রান্সে দলগত যে চিরাচরিত রাজনৈতিক খেলা আরম্ভ হইল, জার্ম্মাণ অস্ত্রশক্তির নিকট অসহায় প্রায় সর্ত্তহীন আত্মসমর্পণই তাহার পরিণতি।

প্রথমে সাম্যবাদী দলের কথা ধরা যাক। পূর্ব্বাপর বাক্যে ও কার্য্যে তাহারা যে পররাষ্ট্রনীতি পোষকতা করিয়া আসিয়াছে তাহার অবিসম্বাদী পরিণাম নাৎসী এবং সম্ভবতঃ ফ্যাসিষ্ট শক্তির সহিত সংঘর্ষ; সংঘর্ষ হইলে রুশিয়ার অগণিত লালফৌজের সাহায্য পাওয়া যাইবে, সে প্রতিশ্রুতিও তাহারা দিয়াছিল। তাই তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধ যখন আসিল তখন তাহারা অবিলম্বে অবাধ সমর্থন দিতে ইতস্তত করে নাই। কিন্তু যুদ্ধারম্ভের সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই তাহারা অন্য সুরে গাহিতে সুরু করিল,—তাহাদের রুশীয় প্রভুদের আদেশে তাহাদেরই ভাষায় 'নাৎসী বর্ব্বরতার সহিত যুদ্ধের পরিবর্ত্তে সন্ধিস্থাপনের আন্দোলন হইল। একথা অবশ্য সত্য যে প্যারীর শ্রমিকগণ প্রথমেই তাহাদের পরদেশাপেক্ষী এই সাম্যবাদী নেতাদের নূতন বুলি সমর্থন করে নাই; তথাপি টোরেজ ও তাহার সাঙ্গপাঙ্গদের এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতার ফলে জাতীয় ঐক্য ও আত্মপ্রত্যয়ের যে অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, তৎকালীন অবস্থা বিবেচনায় তাহা মোটেই উপেক্ষনীয় নহে।

ইহারই বিপরীত দিকে রহিয়াছে ফ্রান্সের দক্ষিণপন্থী জমিদার ও মালিক শ্রেণী, যাহাদের কাছে স্বদেশ অপেক্ষা ইতালী ও ইতালীয় শাসন ব্যবস্থা অধিকতর আদরণীয় ছিল। ইহারা বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই ফরাসী জনসাধারণের নিকট মুসোলিনীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া এবং বামপন্থীদের সাম্যবাদ নীতির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিয়া আসিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমাবধি তাহারা জাতীয়তাবাদী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিল এবং গণতান্ত্রিক নীতি ক্রমপ্রকাশের ফলে তাহাদের জাতীয়তাবাদী একনায়কত্বের আশা যতই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতে লাগিল, ইতালীয় ফ্যাসিষ্ট শাসন ব্যবস্থার প্রতি তাহাদের আনুগত্য ততই প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া ক্রমে স্বদেশদ্রোহিতার আকার ধারণ করিল। জার্ম্মাণীকে সংযত রাখিবার জন্য ফ্রান্স-ইংল্যাণ্ড মৈত্রী অপেক্ষা ফ্রান্স-ইটালী ঐক্যবন্ধন অনেক কার্য্যকরী হইবে বলিয়া তাহাদের যে বিশ্বাস ছিল, তাহা হইতেই ইংরেজ-বিদ্বেষের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সর্ব্বগ্রাসী জাতীয়তাবাদ ও তাহার ফল ফ্যাসিজম্-প্রীতির মূলে দোদে প্রভৃতি সাহিত্যিকদের রচনা অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে—সাহিত্য হইতেই প্রথম লাটিন জাতিগুলির ঐক্য সাধন করিয়া লাটিন প্রতিষ্ঠা পুনঃস্থাপনের কল্পনা উদ্ভূত হয়। জার্ম্মাণীর সহিত সন্ধি না করিলে আফ্রিকা হইতে যুদ্ধ চালাইতে হয়, অর্থাৎ প্রধানতঃ ইতালীর সহিত যুদ্ধ করিতে ও তাহাকে পরাজিত করিতে হয়। ফ্যাসিজম্-উপাসক দক্ষিণপন্থীগণ উহাকে নিজদের পরাজয় এবং তাহাদের শত্রুদের জয় বলিয়া গণ্য করিত; তাই আত্মসমর্পণমূলক সন্ধিই তাহাদের নিকট অধিক কাম্য হইল। 'শক্তিশালী স্বাধীন ও সুখৈশ্বর্য্যদৃপ্ত' ফরাসীদেশের জন্য সাম্যবাদীদের কাকুতি এতই আকস্মিক হইয়াছিল যে বুদ্ধিজীবী বলিয়া আখ্যাত সরল বিশ্বাসী ব্যক্তিদের কয়েকজন ব্যতীত অধিক কেহ তাহাতে আস্থাস্থাপন করেন নাই। কিন্তু দক্ষিণপন্থীদের আচরণের ফল অধিকদূর বিস্তৃত হইয়াছে; তাই সাম্যবাদীদের তুলনায় তাহাদের এই বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশদ্রোহিতা আরও গ্লানিকর।

এই দুই প্রধান বিদেশীমুখাপেক্ষীদের বাহিরে রহিয়াছে বনে-লাভালের নাৎসী-অনুচরদের ক্ষুদ্র অথচ শক্তিশালী তৃতীয় দল। জার্ম্মাণীতে নাৎসী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পর হইতেই তাহারা নানা উপায়ে জার্ম্মাণীর শক্তিবৃদ্ধি করিয়া নাৎসীদের বর্ত্তমান অভাবনীয় শক্তি সঞ্চারের সুযোগ দিয়াছে ও ক্রমাগত তুষ্টিসাধন করিয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, আত্মসমর্পণের পূর্ব্বে ফ্রান্সের শাসন পরিচালক রাজনীতিকগণ চতুষ্পার্শ্বে বিদেশী অর্থে পরিপুষ্ট বিদেশী প্রভাবান্বিত নীতিবাগীশ এবং বিদেশী শাসন ব্যবস্থার ভক্তগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাষ্ট্রনায়কদের অনেকে বহু বিষয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি হইলেও, এমন কি, ইংরেজী অর্থে, 'চরিত্রবান' লোক হইলেও, প্রকৃত প্রতিপত্তি কাহারও ছিল না—ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি হয় তো বা কিছু ছিল, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা কিছুই ছিল না। আর সর্ব্বোপরি ফরাসী রাষ্ট্রে আদেশ পালন করাইতে সক্ষম কোন কেন্দ্রিয় কর্ত্তৃত্বের অস্তিত্ব ছিল না; ইহার অভাবই র‍্যাডিক্যালদের পক্ষে মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইল। আলায়ে প্রভৃতি র‍্যাডিকেলগণ বজ্রকঠোর কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃত্ব অবসানের যে গুণগান করিয়াছিল, হৃতস্বাধীন হইয়া তৃতীয় রিপাব্লিককে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল। শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব প্রধান নেতা সম্পর্কে আশঙ্কা ছিল বলিয়া ফ্রান্সকে লাভালের ন্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের খপ্পরে পড়িতে হইল।

অকাম্য বৈশিষ্ট্য

শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

(নাটিকা)

[কাল—প্রভাত। স্থান—অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জগদীশ চৌধুরী এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি-র বসিবার ঘর—ঘরটি অবশ্য ভাল, বড় প্রশস্ত মার্বেল পাথরের মেজে বটে, কিন্তু দুই একখানা সোফা নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে রক্ষিত—ঘরের দুই তিন স্থানে ছোট ছোট টেবিল—চতুর্দ্দিকে বইয়ের আলমারী—আলমারী অবশ্য দামী ও পুস্তকরাজি অতি সযত্নে রক্ষিত—কিন্তু প্রত্যেক টেবিলেও কিছু পুস্তক রক্ষিত—আর মেজের উপর দুই স্থানে ছোট ছোট কার্পেট পাতা, কার্পেটের উপর কতকগুলি পুস্তক, খাতা; দুই তিন রকম পেন্‌সিল। পার্শ্বে একটী বিরাট অর্গান]

জগদীশ। (পাঠ করিতে করিতে উঠিয়া, স্বগত) Very original article—কাম্য বৈশিষ্ট্য ও অকাম্য বৈশিষ্ট্য—very nicely put—শারীরিক কার্য্যক্ষমতা ও স্বাস্থ্য যাতে সমান ভাবে বশ করা যায় ও বৃদ্ধি করা যায় তার জন্য মানুষকে বাধ্য হয়ে যে সমস্ত বস্তু ব্যবহার কর্ত্তে হয় সেই বস্তুগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—বাচা, বাজ ও লক্ষ্য—What a nice analysis—What a beautifnl interpretation—quite original—বাচা—মনের বৃদ্ধি সাধন; বাজ, আত্মার বৃদ্ধি সাধন; লক্ষ্য—মুখ্যতঃ শরীর ও ইন্দ্রিয়ের বৃদ্ধি সাধন—খাদ্য পরিধেয় বাসগৃহ, আসবাব etc. Excellent subdivision of লক্ষ্যার্থে। (পুনরায় টেবিলের নিকটে গিয়া বলিলেন, "দেখি তো chartটা"—chart দেখিতে দেখিতে "বাঃ বেশ হয়েছে"।)

[টেবিলের উপর এই chartটী রক্ষিত ছিল]

জগৎব্যাপী অর্থাভাব | রাগ দ্বেষ সংযমোপযোগী শিক্ষার জগৎ-ব্যাপী অভাব | সমগ্র মানবজাতি পরিব্যপ্ত পরার্থপরতার অভাব

যুদ্ধ

বর্ত্তমান পরিস্থিতি

বৈশিষ্ট্য

কাম্য | অকাম্য

কাম্য:
- শিল্প ও বাণিজ্য কার্য্যের বিস্তৃতি
- নিয়োগ ও চাকুরীর বিস্তৃতি
- শিল্প ও বাণিজ্য লাভের হারের বৃদ্ধি

অকাম্য:
- প্রয়োজনীয় ঔষধ খাদ্য পরিধেয় ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্য হারের অপরিমিত বৃদ্ধি
- প্রয়োজনীয় ঔষধ খাদ্য পরিধেয় ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যের প্রয়োজনীয় পরিমাণের দুর্লভতা ও অপ্রাপ্যতা

জগদীশ। (চার্ট দেখিতে দেখিতে) বাঃ বেশ এই রকম চার্ট করা যায়—very original article.

(গৃহিনীর প্রবেশ)

গৃহিনী। কি গো নিজের মনেই কথা ব'লছো, হাস্‌ছো আজ ভারী স্ফূর্ত্তি যে তোমার, ব্যাপার কী?

জগদীশ। দেখ সরলা, এই লাইব্রেরীতে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন—এখানে আমি কি করি, না করি তার কারণ জিজ্ঞাসা ক'রো না—দ্বিজেন্দ্রলালের একটা গান আছে না "তুষিতে আপন প্রাণ, নিজ মনে গাই গান, নিজ মনে করি খেলা আপনারে ক'রে সাথী।" গাইব নাকি?

গৃহিনী। দোহাই তোমার, শোন, তোমার পাগলামীর জ্বালায় জ্বালাতন। বলি ড্রেসিং টেবিল-এর কাঁচটা ভেঙ্গে গিয়েছে—তা প'ড়েই থাকবে, খুকী ব'ল্‌ছিলো—

জগদীশ। উঁহু হবে না—অকাম্য বৈশিষ্ট্য।

গৃহিনী। কী তুমি হেঁয়ালীতে কথা ব'লো—অকাম্য বৈশিষ্ট্য কী?

জগদীশ। অর্থাৎ ভাল বিলাতী কাঁচের মূল্য হারের অপরিমিত বৃদ্ধি ও তার দুষ্প্রাপ্যতা।

গৃহিণী। দাম এতই বেশী আর কলকাতা সহরে খুঁজে পাওয়া যায় না।

জগদীশ। খুঁজে হয় তো পাওয়া যেতে পারে, নাও পারে কিন্তু খোঁজাটা কী এতই দরকার?

গৃহিণী। গাড়ীটা নিয়ে একবার ঘুরে এসো না?

জগদীশ। ঘুর্ব্বো কি রকম করে?

গৃহিণী। কেন?

জগদীশ। তেল নেই—ঐ এক কারণ অকাম্য বৈশিষ্ট্য।

গৃহিণী। না, তোমায় বলাই ভুল হয়েছে দেখছি। দারোয়ানকে পাঠাব।

জগদীশ। বুঝেছো—"A Daniel has come to judgment."

গৃহিণী। আর একটা কথা, তোমার সব দামী দামী পোষাক নষ্ট ক'রে ফেলছে পোকাতে—একবারও তো পরো না।

জগদীশ। ওগুলো দান ক'রে দাও শিশিরকে—সে সাহেবী পোষাক পর্ত্তে ভালবাসে, আর সে তার ছোট কাকাকেও ভালবাসে।

গৃহিণী। আর তোমার ঐ সাদা থান ধুতি, গলায় মোটা পইতে, আর কী বিশ্রী পটটুর হাতকাটা ফতুয়া আর তাল তলার চটী—তুমি যে পাঁচ বছর বিলেতে কাটিয়ে ছিলে তা কেউ বিশ্বাস কর্ব্বে না।

জগদীশ। কেন বিশ্বাস কর্ব্বে না—ডি, এল, রায় তো হাসির গানে গেয়ে গিয়েছেন, "হ'ল কি এ, হ'ল কি এ তো ভারী আশ্চর্য্যি, বিলেত-ফের্ত্তা টানছেন হুকো, সিগারেট খাচ্ছেন ভট্‌চার্য্যি।"

গৃহিণী। বুড়ো হ'লে কিন্তু রঙ্গরসের ভাব গেল না।

জগদীশ। এ-রঙ্গরস নয় সরলা, হাসি কান্না একই বস্তুর এ-পিঠ ও-পিঠ।

গৃহিণী। যাই, গবেষণা শোনবার সময় নেই—(প্রস্থান)

(বাহির হইতে কলিযুগ সম্পাদক কৃষ্ণকমল বাবু)—কাকা, বাড়ী আছেন?

জগদীশ। এসো এসো কৃষ্ণকমল—(কৃষ্ণকমলের প্রবেশ) বলি তোমাদের Puritan ঠাকুর্দ্দা'র কাছে সকালে এসে হাজির, ব্যাপার কী।

কৃষ্ণকমল। কাকা—কলিযুগ কাগজ তো উঠে যাবার যোগাড়, কাগজ যোগাড় করতে পারছি না, যত টাকা লাগে দেবো তবুও তো কাগজ পাচ্ছি না, কী করি।

জগদীশ। কী আর করবে কৃষ্ণকমল, অকাম্য বৈশিষ্ট্যের জন্যে সকলকে কষ্ট পেতে হচ্ছে তা কী ধনী, কী গরীব।

কৃষ্ণকমল। অকাম্য বৈশিষ্ট্য কী।

জগদীশ। বর্ত্তমানে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার মধ্যে কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করি, একটা হচ্ছে কাম্য বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ শিল্প বাণিজ্য কার্য্যের বিস্তৃতি, নিয়োগ ও চাকুরীর বিস্তৃতি, শিল্প বাণিজ্যে লাভের হারের বৃদ্ধি, এ-গুলো কাম্য বৈশিষ্ট্য, ব'লতে হবে এ-তে তুমিও লাভবান্ হয়েছ মশারী ও মিলিটারীদের জামার মোটা কণ্ট্রাক্ট নিয়ে তুমিও এ-বাজারে বেশ দু'পয়সা করেছো।

কৃষ্ণকমল। (মাথা চুলকাইয়া) আজ্ঞে হ্যা—তা বেশ কিছু করেছি।

জগদীশ। করেছো তো, কিন্তু টাকা থাকা সত্বেও কাগজের যোগাড় কর্ত্তে পাচ্ছ না, তোমার সাধের 'কলিযুগ' উঠে যাবার অবস্থা হয়েছে—এটা হচ্ছে অকাম্য বৈশিষ্ট্য।

কৃষ্ণকমল। তাই তো দেখছি।

জগদীশ। তুমি কাম্য বৈশিষ্ট্যের জন্য একক্ষেত্রে লাভঃ করিলেও অকাম্য বৈশিষ্ট্যের জন্য আর একক্ষেত্রে জর্জ্জরিত। অকাম্য বৈশিষ্ট্য দুই রকম, যথা—(১) প্রয়োজনীয় ঔষধ, খাদ্য পরিধেয় ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্য হারের অপরিমিত বৃদ্ধি (২) প্রয়োজনীয় ঔষধ, খাদ্য পরিধেয় ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যের প্রয়োজনীয় পরিমাণের দুর্ল্লভতা ও অপ্রাপ্যতা—তুমি পড়ে গিয়েছো আপাততঃ (২)-এর মধ্যে—কাগজ নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য, তার দুর্ল্লভতায় ও অপ্রাপ্যতার জন্য তুমি জর্জ্জরিত।

কৃষ্ণকমল। যদি হিটলারের সাম্রাজ্যবাদের লোলুপতা না থাকতো, যদি গভর্ণমেণ্ট ভাল ক'রে ব্যবস্থা কর্ত্তেন—

জগদীশ। ও দুটোই ভুল কথা।

কৃষ্ণকমল। ভুল কথা?

জগদীশ। হ্যা, You don't mind a cup of tea and biscuits Krisna Kamal?

কৃষ্ণকমল। তা দিন না।

জগদীশ। কে আছিস? (ভৃত্যের প্রবেশ) ভাল ক'রে চা করে নিয়ে আয়—ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কুটে ভাল করে মাখম মাখিয়ে নিয়ে আয় ৪ খানা—চাও আর খাবার জো আছে কী?—ঐ অকাম্য বৈশিষ্ট্য—Himalayan blend Lipton এর এক টাকা পাঁচ আনা দিয়ে ৬ পাউণ্ড কিনে রেখে ছিলাম এখন ২ টাকা ২ আনা হয়েছে—যাক্ চার গুড়ো ব্যবহার কর্ত্তে হবে আর কী, এই অকাম্য বৈশিষ্ট্যের কারণ

হিটলারের সাম্রাজ্যবাদও নয়, গভর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্যও নয়—

কৃষ্ণকমল। তবে কী?

জগদীশ। যুদ্ধ কেন হোল—হিটলারের সঙ্গে যে জার্ম্মাণরা এক হয়ে এই বিরাট যুদ্ধ চালাচ্ছে আর জাপানীরাই কেন যুদ্ধে লিপ্ত হোল, রাশিয়া, আমেরিকা, বৃটিশ, ফ্রেঞ্চ, ইতালীয়ন সকলেই যুদ্ধে লিপ্ত হয় কেন? এর কারণ খুঁজতে গেলেই সর্ব্বব্যাপী কোন অসুবিধার সন্ধান কর্ত্তে হবে। গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বদেশেই যথেষ্ট চেষ্টা করছেন লোকের সুবিধা কর্ব্বার জন্য কিন্তু সদিচ্ছা সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও কিছু কর্ত্তে পাচ্ছেন না কেন?

কৃষ্ণকমল। তাই তো কেন?

(ভৃত্যের চা ও বিস্কুট লইয়া প্রবেশ)

জগদীশ। ঐ তেপায়াটা সরিয়ে ওটার ওপরে রাখ—

কৃষ্ণকমল। (চা পান করিতে করিতে ও বিস্কুট খাইতে খাইতে) তাই তো—

জগদীশ। এর কারণ প্রথমতঃ জগৎব্যাপী অর্থাভাব, দ্বিতীয়তঃ রাগ-দ্বেষের সংযমোপযোগী শিক্ষার জগৎব্যাপী অভাব।

কৃষ্ণকমল। Puritan ঠাকুর্দ্দা is in the fore-front

জগদীশ। Puritanই দরকার হে—ও তৃতীয়তঃ সমগ্র মানব জাতি পরিব্যাপ্ত পরার্থপরতার অভাব—

কৃষ্ণকমল। পরার্থপরতার অভাব কেন বলছেন—

জগদীশ। পরার্থপরতার অভাব যে সেটা বোঝা কি খুব কঠিন, কৃষ্ণকমল। পরার্থপরতার অভাব না হলে সমগ্র বিশ্বে এই সমরানল প্রজ্বলিত হোল কি করে, দুটো বড় বড় পরাক্রান্ত জাতি ও যদি পরার্থপরতার বশে যুদ্ধ থামাতে চেষ্টা কর্ত্তেন তা হ'লে কি এত মারাত্মক যুদ্ধ হোত? পাশ্চাত্ত্য মনীষীরাও যে একথা বোঝেন না তা নয়—Zimmern সাহেবই বলেছেন, শুধু তোমার Puritan ঠাকুর্দ্দা নয়—"The moral problem is the most important problem, but seeming at any rate, the least urgent a permanent problem in all political life."

কৃষ্ণকমল। Moral problem is a permanent problem in all political life—Zimmern সাহেব বলেছেন কি বইতে কাকা?

জগদীশ। বিখ্যাত বই গো Prospects of Civilisation—হায়, কৃষ্ণকমল! কাগজ চালাও—উপন্যাস, কথা-সাহিত্য, বড় বড় Artist ধুমধাড়াক্কা ব্যাপার—মহা-কথা-সাহিত্যিক, টকী, প্রেমিক-প্রেমিকার চুম্বন—এই সাহিত্য নিয়ে মশগুল হয়ে আছো কৃষ্ণকমল, নীতির দরকার নেই সাহিত্যে politicsএও নীতির দরকার নেই!—Puritan ঠাকুর্দ্দা এক দিশী মনীষীর কথাই উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু যেই Zimmern-এর নাম করেছি অমনি চুপ।

কৃষ্ণকমল। কাম্য-বৈশিষ্ট্য ও অকাম্য বৈশিষ্ট্যটি বুঝেছি তবে ঠিক অর্থ ধর্ত্তে পাচ্ছি না।

জগদীশ। অর্থের আবার কত রকম অর্থ আছে তা যে জানতে হবে বাবা অমনি বুঝতে পার্ব্বে?

কৃষ্ণকমল। আর এক দিন আলোচনা কর্ব্ব কাকা, এখন একটা কাজে এসেছি।

জগদীশ। তা আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলাম, বলো কি কাজ।

কৃষ্ণকমল। আমি শুনলাম আপনার খুব খাতির আছে আপনি চেষ্টা ক'রলে কাগজ কিছু যোগাড় হ'তে পারে।

জগদীশ। তা আমি পার্ব্ব না ভাই—কাগজ যদি উঠে যায় যাক্ না, ওরকম কাগজ না থাক্‌লে কিছু ক্ষতি আছে?

কৃষ্ণকমল। কেন ভাল কাগজ তো সকলেই বলে, circulationও খুব।

জগদীশ। কৃষ্ণকমল, সত্যি একটা কথা ব'লবে কী?

কৃষ্ণকমল। কী বলুন।

জগদীশ। তোমার কাগজের যে এতো circulation হয়েছে তার পিছনে advertise কর্‌বার জন্য (অতি চতুর ভাবে লোকের চোখে ধুলো দিয়ে) কত টাকা খরচ করেছিলে?

কৃষ্ণকমল। এ আপনার অন্যায় কথা—publicity-র জন্য খরচ কর্ত্তে হবে বৈকি।

জগদীশ। ও একটা অতি শ্রুতিমধুর বাক্য, মানে, নিছক আত্মপ্রশংসা সমালোচনার নামে।

কৃষ্ণকমল। তবে আপনি কলিযুগের জন্য কাগজ যোগাড় কর্‌বার কিছু সাহায্য কর্‌তে পার্‌বেন না?

জগদীশ। না, আমার সে-রকম কোন ক্ষমতা নেই—Believe me.

কৃষ্ণকমল। আচ্ছা তবে উঠি—(প্রস্থান)।

(এই সময়ে গোলাপ ফুলের মতন একটী সুন্দরী বালিকা—বয়স নয় দশ বৎসর হইবে—সুন্দর কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, গৌরাঙ্গী "বাবা" "বাবা" বলিতে বলিতে ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল—এই সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান জগদীশবাবুর, নাম শেফালী)।

শেফালী। বাবা—

জগদীশ। খুকী ঠিক তোরই কথা ভাবছিলাম (সস্নেহে জড়াইয়া) ঐ গান্‌টা কর্ না, দেখি কী-রকম শিখ্‌লি।

শেফালী। না বাবা—আমি এখন গান কর্‌ব না।

জগদীশ। লক্ষ্মী মা আমার, গান কর্।

শেফালী। (দুষ্টুমীর হাসি হাসিয়া) আচ্ছা বাবা গাচ্ছি—কিন্তু

জগদীশ। কিন্তু "বাবা আমাকে একটা রঙ্গিন সিল্কের ফ্রক এনে দিতে হবে" কেমন তে. .

শেফালী। কি ক'রে বুঝলে বাবা—ব'ল না।

জগদীশ। দেখছিস্ তো কেমন বুঝে ফেলেছি, দেবো, দেবো, দেবো, আয়।

(জগদীশ ও শেফালী অর্গানের নিকটে উপস্থিত হইলেন ও অর্গান বাজাইতে লাগিলেন ও শেফালী গাহিতে অগ্রসর হইয়া)

জগদীশ। ডি, এল্, রায়ের ঐ-গানটা।

"আমার আমার বলে ডাকি"

শেফালী গাহিতেছে—

"আমার আমার ব'লে ডাকি
আমার এ-ও আমার তা
আমার বাড়ী আমার ভিঁটে
(ওরে) আমার যা তা বড়ই মিঠে
আমার নিয়ে কাড়াকাড়ি
আমার নিয়ে ভাবনা
আমার ছেলে আমার মেয়ে
আমার বাবা আমার মা
আমার পতি আমার পত্নী
সঙ্গে তো কেউ যাবে না
আমার যত্নের দেহ,
তবে তা-ও তো রেখে যেতে হবে
আমার ব'লে কারে ডাকি
চোখ বুঁজ্‌লে কেউ কারুর না।"

(গীত শেষ হইতেই গৃহিণীর সরোষে প্রবেশ)।

গৃহিণী। খুকী আয়, আর গান পেলে না শেখাবার।

জগদীশ। যখন রাত্তিরে সাইরেন বাজে ও ঘন ঘন বাজ্‌ছে তখন এমন সময়োপযোগী আর কোন গান আছে ব'লে তো মনে হয় না।

গৃহিণী। তর্ক করতে পারব না—চ'ল্ খুকী।

(খুকীকে লইয়া প্রস্থান)

জগদীশ। (স্বগতঃ) সরলা, এখনও আমাদের চৈতন্য হ'ল না, কোন দিন—যাক্ (বাহির হইতে) ডাক্তার চৌধুরী আছেন?

জগদীশ। আছি, আসুন।

(মিঃ সেনের প্রবেশ,—দাড়ি কামান নাই, চেহারা সুন্দর হইলেও বেশের পারিপাট্য নাই)।

জগদীশ। এই যে সতীশ, চেহারা এ-রকম কেন, এসো, এসো।

সতীশ। দাদা, অনেক কথা আছে।

জগদীশ। একটু চা খাবে? What is the matter?

সতীশ। চা?—তা এক পেয়ালা—

জগদীশ। এই কে যাচ্ছিস? (ভৃত্যের প্রবেশ) যা এক কাপ চা কড়া করে নিয়ে আয়।

সতীশ। জগদীশদা, I want a shelter in your house—আমি আমার সামান্য জিনিষ-পত্র এনেছি, একটা week, তারপর সব ব্যবস্থা করে নেবো।

জগদীশ। তোমার কথাটা paradox-এর মতন শোনা হচ্ছে। তোমার বাড়ী is a bigger house—কী হয়েছে, বৌমার সঙ্গে ঝগড়া?

সতীশ। ব'লছি সব, আগে আপনি বলুন shelter দেবেন কী না?

জগদীশ। (সোফা হইতে উঠিয়া সতীশের নিকটে গিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া সস্নেহে) It goes without saying—You are always welcome. এই রামা, রামা (রামার প্রবেশ) দেখ্ মোটর গাড়ীতে যা জিনিষপত্র আছে নামিয়ে আন্। এসো সতীশ আমার এই দুটো guest room আছে—দেশের বাল্যবন্ধু, বাবার পরিচিত, আমার পরিচিত অনেক লোক কাজ-কর্ম্মের জন্য ক'ল্‌কাতায় আসেন সেই জন্য দুটো guest room ক'রেছিলাম—যুদ্ধের হাঙ্গামার জন্য কেউ আর আসেন না—এসো ঘর দেখো, আমার মনে হয় দক্ষিণ দিকের ঘর suit করবে ভাল (সতীশকে লইয়া প্রস্থান ও প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া)

সতীশ। চমৎকার ঘর।

জগদীশ। Sand bag দেওয়া আছে, air raid-এর পক্ষেও খুব safe, খুকী খুকী—(শেফালীর প্রবেশ)

শেফালী। বাবা।

জগদীশ। তোর মাকে ব'ল যে ওপরের ঘরে যে বড় spring-এর খাট আছে সেইটে গদীশুদ্ধ দারোয়ানকে ব'ল্‌বেন লোক ডেকে নীচে নামাতে। আর আমি আর তোর সতীশ-কাকা দু'জনেই বাইরে যাব, বুঝেছিস্?

সতীশ। খুকী এদিকে আয়।

শেফালী। কাকাবাবু, আপনি খাবেন, বাঃ কী মজা কাকীমা, টুলু, তৃপ্তি, টুনটুনদিদি সব ভাল আছেন?

সতীশ। (কাকীমার কথা উচ্চারণ করিতেই তাঁহার মুখ লাল হইয়া গেল, সাম্‌লাইয়া) হ্যাঁ ভাল আছেন।

(শেফালীর প্রস্থান। রামার জিনিষপত্র আনয়ন)

জগদীশ। জিনিষপত্র সব পাশের ঘরে গুছিয়ে রাখ—আর ওপর থেকে spring এর খাট, যেটা জামাইবাবুর ঘরে আছে সেটা নীচে এনে দেওয়ালের দিকে রাখ, ঘরের ছবিগুলো খুলে রেখে দে।

সতীশ। আর আমার গাড়ীটা?

জগদীশ। গাড়ীটা গ্যারেজে রেখে দে—ড্রাইভার আছে তো?

সতীশ। হ্যাঁ।

জগদীশ। ড্রাইভারকে পাশের ঘরটা খুলে দে, ড্রাইভার খাবে সেকথাও ব'লে দে।

(রামার প্রস্থান। চা লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ)

জগদীশ। চা খাও সতীশ।

সতীশ। (চা খাইতে খাইতে) ব্যাপারটা বলি।

জগদীশ। ব'লো।

সতীশ। আপনার মনে আছে যে আমার স্ত্রীকে গান শেখানোর জন্য আপনি একটী মহিলাকে পাঠিয়েছিলেন। বৃদ্ধা কীর্ত্তন বেশ ভাল গান—তাকে স্ত্রীর পছন্দ হ'ল না। তিন মাস বাদে একরকম অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিলেন।

জগদীশ। আমি তোমায় তো ব'লেছিলাম সতীশ কীর্ত্তন শেখাটা তখন একটা fashion হয়েছিল। কীর্ত্তন-এর উপর sincere আকর্ষণ হয় তো নেই—ওকে বেশী দিন পছন্দ হ'বে না—তাই হয়েছে!

সতীশ। বেশী না হয় না শিখলেন, কিন্তু what is it, without my knowledge এক ফক্কড় ছোকরা, ব'লে এম-এ পাশ—I doubt it, বয়স প্রায় ৩০ হ'বে, সুন্দর চেহারা এসে রবিবাবুর গান নাকি মিহিসুরে আরম্ভ করলো শেখাতে—ক্রমশঃ স্ত্রীর সঙ্গে এতোই ঘনিষ্টভাবে মেশামেশি আরম্ভ করেছে—intolerable, তার জন্য আমি স্ত্রীকে পরশু দিন যথেষ্ট ভৎসনা করেছি—তিনি উত্তরে যা ব'লেছিলেন তা বোধ হয় টকীর কোন পাত্র-পাত্রীর conversation, যা আমি আপনার কাছে উচ্চারণ কর্ত্তেও লজ্জা বোধ করি—বড় মেয়ে, বড় ছেলে একটু—

জগদীশ। হুঁ, ইঙ্গ-বঙ্গ আভিজাত্যের অকাম্য বৈশিষ্ট্য, অবশ্য বর্ত্তমান পরিস্থিতির নয়, after all অকাম্য বৈশিষ্ট্য।।

সতীশ। তারপর স্ত্রী তাঁর মাতাকে আমার বিরুদ্ধে অনেক কিছু ব'লেছেন, শাশুড়ী এসে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ ক'রেছেন, আমি ব'লেছিলাম যে সঙ্গীত-শিক্ষককে দূর ক'রে দেবো বাড়ী থেকে, এই আর কী, আপনি ঠিক ব'লেছিলেন তখন।

জগদীশ। (হাসিয়া) কি ব'লেছিলাম?

সতীশ। ব'লেছিলেন যে, আমরা বিলেত কস্মিনকালে না গিয়ে সাহেবীয়ানা করছি, এর কুফল যে কী তা' হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারবে, তখন আপনার কথায় আস্থা হয় নি, আপনি যখন নিজের বাড়ীতে মেয়েদের ইস্কুল কলেজে না পড়িয়ে অল্প বয়সেই আপনার বাপ ঠাকুর্দার মতন বিয়ে দিলেন তখন আপনার দৃষ্টান্ত দেখে একদিন তাচ্ছিল্যের হাসিও হেসেছিলাম, আজ বুঝছি।

জগদীশ। হুঁ, সেই কারণে ইঙ্গ-বঙ্গ আভিজাত্যের অকাম্য বৈশিষ্ট্য থেকে রক্ষা পেয়েছি কিন্তু ভাই সতীশ, তার জন্য কী কম বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে, সে-দিন যে আমার সঙ্গেই বিলেতে গিয়েছিলেন ডাঃ চক্রবর্ত্তী তিনি খুব তর্ক করলেন আমার সঙ্গে, এই মেয়েদের ইস্কুল কলেজ পড়া, মেয়েদের midwife ইত্যাদি হওয়া এই নিয়ে।

সতীশ। আপনি কি ব'ললেন।

জগদীশ। ব'ললাম যে অল্প বয়সে সে-কালে মেয়েদের বিবাহ দেওয়া হ'ত তার যথেষ্ট কারণ ছিল, আমাদের চেয়ে তাঁরা ঢের বেশী বুদ্ধিমান ছিলেন।

সতীশ। কী কারণ ছিল?

জগদীশ। মেয়েদের পুরুষকে আকৃষ্ট কর্ব্বার প্রবৃত্তি বিশেষভাবে গজাবার আগে বিয়ে দেওয়া উচিত—যা কিছু আকৃষ্ট করুক স্বামীকে। ইস্কুল-কলেজে মেয়েরা প'ড়ে পুরুষের কাছে, ট্রামে বাসে পুরুষের সঙ্গে ওঠে, এই সব আদপ-কায়দায় তাদের সাজ-সজ্জার পারিপাট্য ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। কী করে পুরুষকে capture কর্ত্তে পারে তার চেষ্টা ক্রমশঃ হবে এ দেশেও, কারণ 99% মেয়েরা বিয়ে কর্ত্তে চায়, তারা শিক্ষয়িত্রী, মিড্‌ওয়াইফ, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে জীবন কাটাতে চায় না—যতক্ষণ তাদের প্রবৃত্তি থাকবে বিবাহ করা, যেটা তাদের উচিত প্রবৃত্তি, ততদিন লোকে এই প্রথার "অকাম্য বৈশিষ্ট্যের" উদ্ভবের ঠেলায় অস্থির হয়ে প'ড়বে। মেয়েদের এ প্রথাতে ভাল হোত যদি তারা শিক্ষা পেয়ে বিবাহের চিন্তা ছেড়ে sincerely ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় জীবন যাপন কর্ত্ত—কিন্তু যখন মা হওয়া বা সন্তান আশা করা তাদের প্রকৃতিগত তখন মেয়েদের ঠিক ছেলেদের মতন ইস্কুল কলেজে পড়িয়ে শিক্ষা দেওয়ার কোন মানে হয় না, শিক্ষা দিতে চাও বাড়ীতে পড়াও না নিজে। যাক্, এখন তুমি কি কর্ব্বে? এই সামান্য ঘটনার জন্য তোমার এখানে থাকাও উচিত নয় এবং বাড়ীতে স্ত্রীকে বুঝিয়ে মিটমাট করে ফেলা উচিত।

সতীশ। মিটমাট? আমি বাড়ীর কর্ত্তা, না কেবল কর্ত্তার ভূমিকা অভিনয় করে যাচ্ছি? It is intolerable জগদীশদা।

জগদীশ। But who asked you to do it—কর্ত্তার ভূমিকা অভিনয় কর্ত্তে, তখন ভাবের জোয়ারে ভেবেছিলে সত্যি কি না "মধুর দাসত্ব"—যাই হোক, সঙ্গীত শিক্ষক যাতে সরে প'ড়ে তার ব্যবস্থা আমি কর্ব্ব, I assure you.

সতীশ। তা কি সম্ভব?

জগদীশ। আচ্ছা সে বিষয় ভাবা যাবে, এখন স্নান ক'রো, খাওয়া দাওয়া ক'রে একটু বিশ্রাম ক'রো। এই রামা, রামা, (ভৃত্যের প্রবেশ) গরম জল তোয়ালে সব ঠিক আছে তো?

রামা। আজ্ঞে হাঁ।

জগদীশ। যাও সতীশ স্নান ক'রো, আমিও স্নান করি গে, বেলা হয়ে গিয়েছে। (প্রস্থান)

(স্নান-আহারান্তে প্রায় তিন ঘণ্টা পরে, বেলা চারিটার সময় লাইব্রেরীতে জগদীশ সোফায় বসিয়া গড়গড়া টানিতেছিলেন, এক কাপ চা টিপয়ের উপরে ছিল, সতীশও চা খাইতেছেন)

জগদীশ। তোমার খেতে তো অসুবিধা বোধ হয় নি? তোমরা সব্ টেবিলে খাও।

সতীশ। না কষ্ট আর কি, আপনি মাটিতে আসন পেতে খেতে পারেন আর আমি এতোই সাহেব হয়েছি যে মাটিতে ব'সে খেতে কষ্ট হবে।

জগদীশ। যাক, এখন চ'লো একটু বেড়িয়ে আসি। দোকানে গিয়ে একবার খবর নিতে হবে আটা পাওয়া যাবে কি না।

সতীশ। বড়ই মুস্কিল হয়েছে।

জগদীশ। বর্ত্তমান পরিস্থিতির অকাম্য বৈশিষ্ট্য।

সতীশ। আপনি মাঝে মাঝেই ঐ কথাটা use কচ্ছে'ন, অকাম্য বৈশিষ্ট্যটা কী?

জগদীশ। বর্ত্তমানের অকাম্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিত্য ব্যবহার্য্য যে সব জিনিষ যথা—খাদ্য, ঔষধ, পরিধেয় ইত্যাদির মূল্য-হারের অপরিমিত বৃদ্ধি ও এই সব জিনিষের প্রয়োজনীয় পরিমাণের দুর্লভতা ও দুষ্প্রাপ্যতা।

সতীশ। বা, বেশ word coin করেছেন তো!

জগদীশ। আমি নয় ভাই, আমাদের দেশের একজন দিশী মনীষী। চ'লো ঘুরে আসা যাক্।

(এই সময়ে একটী মোটর গাড়ী হর্ণ দিয়া উপস্থিত হইল, উপর হইতে শেফালীর কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল "তৃপ্তিদি, টুলুদা দাঁড়া আমি যাচ্ছি)

(শেফালীর দৌড়িয়া লাইব্রেরীর মধ্য দিয়া জগদীশ ও সতীশকে তৃপ্তি, টুলুর আগমনের সংবাদ দিতে দিতে প্রস্থান)

জগদীশ। সতীশ, তোমার regiment এসে প'ড়েছে আর ভয় নেই!

(শেফালীর সহিত বার বৎসরের কন্যা তৃপ্তি, দশ বৎসরের পুত্র টুলু ও চার বছরের টুনটুন্ আসিয়া উপস্থিত হইল)

শেফালী। বাবা, আমি যাই পাশের বাড়ী থেকে মাকে ডেকে আনি, মা গিয়েছেন খোঁজ নিতে কোথায় ক'নট্রোলের আটা পাওয়া যায়।

জগদীশ। যা, অকাম্য বৈশিষ্ট্য (শেফালীর প্রস্থান)

(তৃপ্তি আসিয়া পিতার হাত ধরিল, বাচ্চা টুনটুন্ "বাবা যাগ" বলিয়া সট্যাং বাবার কোলে চড়িয়া বসিল)

জগদীশ। বাঃ! সব চুপ ক'রে ব'সো, নড়ো না; ফটো তুলবো (পকেট ক্যামেরা আনিয়া snap shot তুলিলেন) ব্যস্।

বাচ্চা টুনটুন্। বাবা চ'লো, মা কাঁদে।

তৃপ্তি। বাবা চ'লো, রাগ ক'রো না, আমরা কেউ আজ সারাদিন কিছু খাই নি—তুমি ফিরে না গেলে কেউ খাবো না। মার সঙ্গে দিদিমার ভারী ঝগড়া হয়ে গিয়েছে—মা দিদিমাকে খুব বকেছেন।

টুলু। বাবা চলো, দিদিমাকে খুব ধমকে দিয়েছে।

জগদীশ। বলিস্ কিরে টুলু?

টুলু। হ্যাঁ জ্যাঠামণি, মা আর কোন কথা ব'লতে পারলে না।

সতীশ। তোদের মা দিদিমা এরকম ক'রে অপমনা কর্বেন, আমি কি করে থাকি ব'ল?

তৃপ্তি। চ'লো বাবা মা বড় কাঁদছেন।

(শেফালীর প্রবেশ, "চ'ল্ মার কাছে, মা এসেছেন।" সকলকে লইয়া প্রস্থান)

সতীশ। তাই তো সরসী কাঁদছে, খাইনি কেউ!

(শেফালীর প্রবেশ)

শেফালী। বাবা, মা ওদের চা মিষ্টি খেতে দিচ্ছেন, তোমাদের জল খাবার দেবেন?

সতীশ। না আমার দরকার নেই, বেলায় খাওয়া হয়েছে।

জগদীশ। আমারও দরকার নেই—দেখ, তুই ওদের গাড়ীতে নিয়ে যাস্।

শেফালী। আর কাকা?

জগদীশ। তাকে আগেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

শেফালী। বেশ বেশ কী মজা (হাত-তালি দিতে দিতে প্রস্থান)

সতীশ। তাই তো What to do?

জগদীশ। What to do? You are to go and to embrace your wife. What else can you possibly do? You read too many continental novels and perhaps in your mind appeared a scene from Tolstoy's Kreutzer Sonata—though one of the world famous novels—Isn't it? But India is not Russia.

সতীশ। ঠিক ব'লেছেন জগদীশদা—আমি এ কয়দিন Kreutzer Sonata প'ড়ছিলাম।

সতীশ। তাই তো সরসী কাঁদছে, খাই নি কেউ।

(এই সময় ঘোষাল ম'শায় এসে উপস্থিত হ'লেন)।

জগদীশ। এসো, এসো ঘোষাল, কী খবর।

ঘোষাল। দেখুন, কিছু চিনি যোগাড় ক'রে রেখেছিলাম তাও ফুরিয়ে গিয়েছে, চা না হ'লে চ'লে না, কী ক'রি বলুন। জগদীশ দা' জীবনে যেন অন্য কোন কাজ নেই সকাল থেকে

খাদ্য আহরণ করবার চেষ্টা কাছারীর কাজ করা ছাড়া what a tragedy। ভাবলাম অনেকদিন জগদীশদা'র গান শুনি নি একটা গান শুনে আসি।

জগদীশ। সতীশ, ঘোষাল আলিপুরের উকীল, বড় ভাল ছেলে আর ঘোষাল, সতীশ হ'লেন একজন বড় ইঞ্জিনীয়ার ও কণ্ট্রাক্টার ও পণ্ডিত লোক। (উভয়ের প্রীতি-নমস্কার করণ) ঘোষাল আমাদের সকলেরই একই অবস্থা ঐ অকাম্য বৈশিষ্ট্য।

ঘোষাল। তা হোক্, আপনি একটা গান করুন।

জগদীশ। শুনবেই, ছাড়বে না।

ঘোষাল। না।

জগদীশ। প্রকাণ্ড অর্গানের নিকটে গিয়া চেয়ারে বসিয়া অর্গান বাজাইয়া পরে বলিলেন, ঘোষাল শোন একটা খাঁটি বাংলা গান, বাংলার সরস মাটির সুর—

"মন তুমি কৃষি কাজ জান না
এমন মানব জমি রইল পতিত
আবাদ ক'র্‌লে ফ'ল্‌তো সোনা।" ইত্যাদি।

ঘোষাল। ঠিকই গেয়েছেন জগদীশদা' মানব জমি বাস্তবিকই পতিত রইল আবাদ ক'র্‌লে সত্যই সোনা ফ'ল্‌তো।

জগদীশ। বিশ্বব্যাপী লোকের মানব জমি পতিত হ'য়ে গেল সোনার বদলে কেবল ফলছে যা তাতে কেবল কাম্যের চেয়ে অকাম্য বৈশিষ্ট্যেরই উদ্ভব হচ্ছে।

ঘোষাল। আপনার বাড়ীর সব এখানেই তো।

জগদীশ। একবার পাঠিয়ে ভারী নাকাল হয়েছি ভাই, তা ছাড়া আমি লক্ষ্য কর্‌ছি যে প্রাণের চেয়ে বেশী ভাল বাসেন বাড়ীর গিন্নী তাঁর বাড়ী, গাড়ী, আসবাব-পত্র

ঘোষাল। (হঠাৎ) একেবারে ভুলে গিয়েছি, ছেলের জন্য কাগজ কিন্‌তে হবে, এক টাকা ক'রে দিস্তা, যাই, নমস্কার ম'শায় (সতীশকে) (প্রস্থান)।

জগদীশ। সব অকাম্য বৈশিষ্ট্য।

সতীশ। কী সুন্দর গান, কী চমৎকারই গেয়েছেন দাদা।

জগদীশ। হ্যাঁ, খুব সুন্দর গেয়েছি, এখন ওঠো দেখি চেয়ার ছেড়ে, ওঠো ভাই, যাও ভাই, এবারে ইঙ্গ-বঙ্গ আভিজাত্যের অকাম্য বৈশিষ্ট্যের কাল বোধ হয় গত হ'ল তোমার বাড়ী থেকে—Wish you good luck.

(সতীশ ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন, ড্রাইভার মোটর গাড়ীতে সতীশকে লইয়া হর্ণ দিয়া প্রস্থান করিল)

(গৃহিণীর প্রবেশ)।

গৃহিণী। ছেলেপিলেরা চা মিষ্টি সব খাচ্ছে, বেচারীরা সারাদিন কিছু খায় নি, সরসীও কাঁদ্‌ছে।

জগদীশ। যাক্ বল্লভকে রওনা ক'রে দিয়েছি।

গৃহিণী। তাই তো এ-সব কী।

জগদীশ। "বিরহে নিখিলহারা, বিরহে নিখিলময়।"

গৃহিণী। বিরহ!

জগদীশ। হ্যাঁ গো, হ্যাঁ।

(হাসিতে হাসিতে উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

যবনিকা

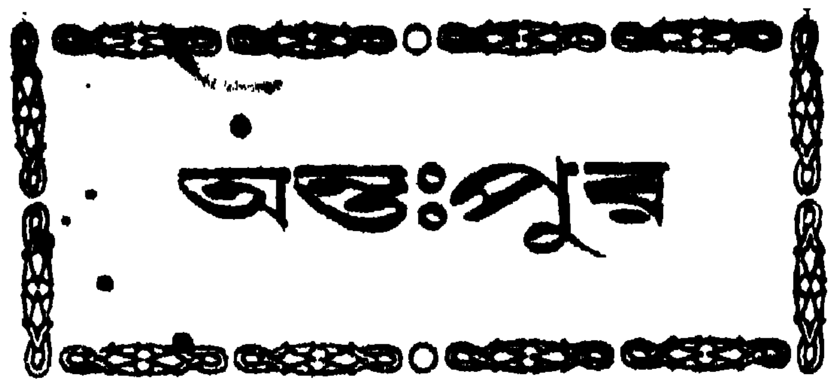
এস্‌কেপিষ্ট

শ্রীমৃণালকান্তি দাশগুপ্ত

ওখানে বনের সুরু,—অরণ্যের সবুজ গৌরব,
ওই বন-প্রান্তে চলো হাত ধরে চলে যাই সরে,
ঘাসের ফরাসে বসে ভ্রমরের মর্ম্মর প্রলাপে
যদি এ জগৎ ডোবে—ডুবুক না আমাদের বাস্তব জগৎ।

জোলোয়ারী চাঁদ দেখে জীবনের তিক্ত পরিহাস—
ভুলে যদি যাই সখি সহরের এই ধূলি ধোঁয়া,
অভিশাপ বঞ্চনার প্রাত্যহিক রূঢ় পরিবেশ,—
ক্ষোভ কেন? চলো যাই অরণ্যের সবুজ ছায়ায়!

এখানে বাতাসে বিষ, আশার আবেশ নেই কোনো
জীবনের প্রতি স্তরে অসংবৃত ক্লেদের উচ্ছ্বাস
স্বার্থান্ধ দানব শুধু টুঁটি টিপে করে রক্তপান
বীভৎস বসতি বেঁধে এখানের নারকী জঠরে
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছ্বাসে গড়ে মানুষেরা ফাঁকির প্রণয়!
প্রাণহীন এ শ্মশান ছেড়ে চলো চলে যাই দূরে!



জনৈক গৃহী

দুহিতা ও অন্যান্য পরিজন

পুত্রবধূ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)—স্বাস্থ্যের হিতার্থে মুক্তবায়ু-সেবন সকলের পক্ষেই প্রয়োজনীয়—নারীও এ-পর্য্যায়বহির্ভূতা নহেন। পুরাকালে অট্টালিকার (যাঁহাদের অট্টালিকাবাসের সৌভাগ্য হইত) ছাদমাত্র বায়ুসেবনের উপায় ছিল—বিশেষতঃ যাঁহারা সহরে বাস করিতেন। পল্লীগ্রামে পরিষ্কার মুক্তবায়ু অধিকাংশ স্থলে সহজপ্রাপ্য সে-কালেও ছিল, এখনও আছে। খিড়কীর বাগান ও পুষ্করিণী তাঁহাদের নিত্য-ব্যবহার্য্য ছিল, কিন্তু প্রয়োজন হইলে তাঁহারা অবগুণ্ঠনবতী হইয়া সদরের পুষ্করিণীও ব্যবহার করিতেন। রমণীর ব্যবহার্য্য জলাশয়ের পাড় উচ্চ ও চারিদিকে শ্রেণিবদ্ধরূপে বৃক্ষ রোপণ করা হইত। এক পাড়ার মধ্যে যতগুলি গৃহস্থের বাটী থাকিত সকল বাটীতেই রমণিগণের যাতায়াত চলিত, তবে অল্পবয়স্ক বধূগণ "এ-বাড়ী ও-বাড়ী" করিতে পারিত না। প্রৌঢ়ত্বের শেষার্দ্ধে রমণিগণ ভিন্ন পাড়াতেও বেড়াইতে যাইতেন। ভিন্ন পাড়ায় নিমন্ত্রণ-রক্ষার জন্য যাইতে হইলে যুবতিগণ গাড়ী বা পাল্কীতে যাইতেন। অধুনা পল্লীগ্রামেও এ-প্রথার বহুল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই পরিবর্ত্তনের মূলেও কিয়দংশে অর্থসমস্যা ও কিয়ৎপরিমাণে অনুকরণপ্রিয়তা। নূতন প্রথার বা ফ্যাসনের উৎপত্তি হয় সহরে এবং সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় তাহা পল্লীগ্রাম ছাইয়া ফেলে। শিক্ষিতা, অর্দ্ধশিক্ষিতা ও অশিক্ষিতা-নির্ব্বিশেষে সকলেই ফ্যাসনের অনুকরণ করিয়া থাকেন। বেশভূষার পারিপাট্য ও লজ্জাশীলতার অভাব হইতে কাহারও শিক্ষার পরিমাণ বা অভাব বোধগম্য হয় না। বিশেষতঃ যাহার শিক্ষা যত অসম্পূর্ণ তাহার বাহ্যাড়ম্বর তত অধিক। বরং অনেক উচ্চশিক্ষিতা রমণীর আচরণে যথেষ্ট সংযম ও শমতার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অশিক্ষিতা ও অর্দ্ধশিক্ষিতা অথচ আধুনিকতাগ্রস্তা রমণিগণের অধিকাংশের আচরণে এই উভয় গুণেরই অভাব লক্ষিত হয়। "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী"—ইহার প্রমাণ এ-ক্ষেত্রেও সুলভ।

পদব্রজে গৃহের বাহিরে যাইতে হইলে পাদুকা, সেমিজ বা পেটিকোট ও ব্লাউজ প্রভৃতির ও সময়ে সময়ে ছাতার ব্যবহার অপরিহার্য্য এবং পার্শী-ধরণে বস্ত্র পরিধান সমীচীন ও শ্রেয়ঃ। বাঙ্গালীর মেয়েরা স্বগৃহে যে-ধরণে বস্ত্র পরিধান করেন তাহা অন্তঃপুরেই চলে, যাঁহারা গাড়ী-পাল্কীতে যাতায়াত করেন, রাজপথে পদক্ষেপ করেন না তাঁহাদের পক্ষেও উপযোগী, কিন্তু যাঁহারা স্থান হইতে স্থানান্তরে পদব্রজে গমন করেন কিম্বা পার্কে বা রাজপথে ভ্রমণে নির্গত হয়েন তাঁহাদের এইরূপ গমন বা ভ্রমণের পক্ষে আদৌ উপযোগী নহে। ফলতঃ আধুনিক বেশভূষা নিন্দার্হ নয়, বরং সময়োপযোগী। অবশ্য এরূপ বেশভূষা অল্পকাল পূর্ব্বে, রমণিগণের আধুনিক উচ্চশিক্ষার প্রবর্ত্তনকাল হইতে প্রচলিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে দশহস্ত-পরিমিত সাড়ী প্রমাণ সাড়ী গণ্য হইত। অদ্যাপি কোন দোকানে প্রমাণ সাটী বা প্রমাণ ধুতি চাহিলে দশহাতী সাটী বা ধুতি পাওয়া যায়। বর্ত্তমান পার্শীধরণ-প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে বঙ্গনারী স্বগৃহে দশহাতী সাড়ী পরিধান করিতেন। বঙ্গের বাহিরে কোন কোন স্থানে, বিশেষতঃ বিহার ও যুক্তপ্রদেশে ১১।১২ হাত সাড়ীর ব্যবহার বহুকাল অবাধ চলিয়া আসিতেছে। কারণ, তত্তৎ প্রদেশে বস্ত্র-পরিধানের রীতি বাঙলা হইতে বিভিন্ন এবং পার্শীধরণ অপেক্ষা তাহার জন্য দীর্ঘতর সাড়ীর প্রয়োজন হয়। কিছুকাল পূর্ব্বে পশ্চিমাঞ্চলের স্ত্রীলোকগণ সাধারণতঃ মোটা কাপড় ব্যবহার করিতেন, সুতরাং তাঁহাদের পেটিকোট ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হইত না, কিন্তু ছোট রকমের জাম্পারের (short jumper) মত অঙ্গরাখ তাঁহাদের অঙ্গে সর্ব্বদাই পরিদৃষ্ট হইত এবং বর্ত্তমান-কালেও হয়। যদিও সম্প্রতি অনেক গৃহস্থের সংসারে মোটা বস্ত্রের স্থান মিহি ও সৌখীন বস্ত্র অধিকার করিয়াছে এবং সেমিজ, পেটিকোট, ব্লাউজ প্রভৃতি প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে, তথাপি দরিদ্র সংসারে অদ্যাপি মোটা কাপড়ের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। পাঞ্জাব প্রদেশে অদ্যাপি রমণি-গণের "পা-জামা" ও পাঞ্জাবী বা আলখাল্লার ন্যায় অঙ্গাবরণ বহুলপ্রচলিত। মহারাষ্ট্রীয় রমণিগণ "মালকোচা"-ধরণে বস্ত্র পরিধান করেন, কাজেই অপেক্ষাকৃত মোটা এবং দীর্ঘ বস্ত্রের প্রয়োজন হয়। তৎসত্ত্বেও "মোটা"র যুগ ক্রমশঃ লুপ্ত হইতেছে এবং "মিহি"র যুগের প্রবর্ত্তন হইয়াছে ও প্রসার বাড়িতেছে সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। উড়িষ্যা আধুনিক সভ্যতার অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে অবস্থিত ইহাই সাধারণের ধারণা, কিন্তু বেশভূষার পারিপাট্য-বিষয়ে অধুনা বাঙ্গালী যুবতিগণের সহিত আধুনিক সঙ্গতিশালী উড়িয়ার যুবতী কন্যার পার্থক্য স্পষ্ট প্রতীয়মান নহে। বঙ্গদেশে ধনী ও মধ্যবিত্ত সংসারে মিহি ধুতি ও সাড়ীর প্রচলন বহুযুগব্যাপী। শুনা যায়—যখন সেমিজ, পেটিকোট প্রভৃতির প্রচলন আরম্ভ হয় নাই তৎকালে রমণিগণ একখানি ছোট কাপড় পরিয়া তাহার উপর মিহি সাড়ী পরিধান করিতেন।

এইরূপে বায়ুসেবন, রাজপথে ভ্রমণ, ট্রামে ও বাসে আরোহণ এবং এই প্রকার বেশভূষার, যথা পাদুকা ও ছাতার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার ও তাহাদের পোষকতা করিলেও হরতালের জন্য ট্রাম বন্ধ করার উদ্দেশ্যে লাইনের উপর শয়ন বা উপবেশন, রাজনৈতিক আন্দোলনে ও সভা-সমিতিতে যোগদান, দলবদ্ধ হইয়া রণনিনাদ বা সিংহনাদের

স্বায় উচ্চৈঃস্বরে "বন্দেমাতরম", "কংগ্রেসের জয়", "মহাত্মা গান্ধীর জয়" প্রভৃতি slogan উচ্চারণ করিতে করিতে নিশান উড়াইয়া রাজপথে বা পার্ক প্রভৃতিতে কোলাহল—এই সকল কার্য্যের পোষকতা করা যায় না। বিলাতে suffragette movement-এর ফলে অনেক রমণীকে নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। সম্ভবতঃ তাহারই অনুকরণে এ-দেশীয় রমণিকুলের এক মুষ্টিমেয় অংশ নির্য্যাতন বা নিগ্রহ বরণ করিয়া উল্লিখিতরূপে 'হৈ-চৈ' করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। স্বভাব-কোমলা ললনাগণের এরূপ আচরণ অনেকের, বিশেষতঃ "সেকেলে" লোকের নিতান্ত বিসদৃশ মনে হয়। দুই চারিজন "হুজুগে" লোককে বাদ দিলে হয় ত' কেহই চাহেন না যে, তাঁহার বণিতা বা কন্যা বা পুত্রবধূ বা সহোদরা বা ভ্রাতৃজায়া এরূপ আচরণের জন্য কারারুদ্ধা বা অন্যপ্রকারে নিগৃহীতা হয়েন। দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির যাঁহারা মাতব্বর বা ধুরন্ধর দুই একজন ব্যতীত তাঁহাদের নিজ নিজ পরিবার-ভুক্তা কোন রমণী প্রকাশ্যভাবে সেগুলির সহিত কোন প্রকারে সংশ্লিষ্টা নহেন।

যে-দেশে পুরুষের অভাব নাই, সেদেশের নারীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে ও আন্দোলনে যোগদান করিবার অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইংলাণ্ড প্রভৃতি দেশে বহুসংখ্যক রমণী অনূঢ়া থাকিয়া যান; তাঁহাদের ধর্ম্মে ইহা বাধে না। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানে ও আন্দোলনে যোগদান তাঁহাদের পক্ষে ততদূর দোষাবহ নহে। তথাপি আর্ত্তের সেবা, আত্মীয়ের সেবা, মনুষ্যসমাজের সেবা তাঁহাদের পক্ষে অধিকতর উপযোগী এবং জগতের পক্ষে অধিকতর হিতকর। যাঁহাদের নিজের সংসার আছে, স্বামী, পুত্র, কন্যা আছে, সংসারকে উপেক্ষা করিয়া, স্বামী ও পুত্রকন্যাকে উপেক্ষা করিয়া তথাকথিত দেশের কাজে 'হৈ-চৈ' করিয়া বেড়ানো তাঁহাদের পক্ষে না সমীচীন, না প্রশংসনীয়। হিন্দুর বিবাহ একটি সংস্কার, সুতরাং ধর্ম্মের সহিত জড়িত। "পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনাৎ" এই বাক্যের অন্তর্গত পিণ্ড-শব্দ শাস্ত্রে যে-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে যদি কোন পাশ্চাত্যশিক্ষাভিমানী কুসংস্কারজনিত মনে করিয়া সে-অর্থ গ্রহণ করিতে সম্মত না হয়েন, এই দারিদ্র্যপ্রপীড়িত দেশে জীবন্ত পিতার বার্দ্ধক্যে জীবনধারণের উপযোগী যে অন্নপিণ্ডের প্রয়োজন তাহার জন্য পুত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্ভবতঃ অস্বীকার করিবেন না। যাহা হউক পুরুষ অবিবাহিত থাকিলে হিন্দুসমাজ তত আপত্তি করে না, নারী যাবজ্জীবন অনূঢ়া থাকিলে যত আপত্তি ও নিন্দার পাত্রী হয়। যখন কৌলীন্যপ্রথার উৎকট্য ছিল সে-যুগে কোন কোন রমণীকে যাবজ্জীবন অবিবাহিত থাকিতে হইত। একখানি বহুপুরাতন দলীলে সম্পত্তির পরিচয়স্থলে তাহার চতুঃসীমার একটী সীমা "আইবুড়া ব্রাহ্মণীর ঘর" লিখিত আছে দেখা গিয়াছিল। শুনা যায় সে-যুগে গঙ্গাতীরস্থ মুমূর্ষুর কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান করিয়া কোন কোন প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা আইবুড়া-নাম ঘুচাইতেন। কৌলীন্যপ্রথা অলীক বংশাভিমান হইতে উদ্ভূত হইয়া নির্ম্মম দেশাচারে পরিণত হইয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কন্যা রজঃস্বলা হইবার পূর্ব্বে তাহাকে পাত্রস্থা করিবার যে-বিধান হিন্দুশাস্ত্রে আছে তাহা মানিলে কৌলীন্যপ্রথা যে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ ছিল ইহা বলিতে হইবে। এ-প্রথার দোষগুণ-বিচার এ-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; তথাপি ইহার লোপপ্রাপ্তির সঙ্গে হিন্দুসমাজ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণসমাজ এক প্রগাঢ় কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়াছে এবং অধিকাংশ জনকজননী ও যুবতী কন্যা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন।

কৌলীন্যপ্রথার পর্য্যালোচনা করিলে ইহাও উপলব্ধ হয় যে দেশাচার যতই নিন্দার্হ হউক সমাজবিশেষের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিতে গেলে সেই সমাজ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বা তাহাতে প্রচলিত দেশাচার মানিতেই হইত এবং অদ্যাপি মানিতে হয়। দুর্নীতি হইলেও দেশাচার সমাজের নীতি বা বিধি; সমাজকে পরিত্যাগ বা "Damn care" না করিলে দেশাচার অমান্য করা চলে না, কারণ, কোন না কোন সমাজের অন্তর্ভুক্ত না হইলে সংসারী লোকের, বিশেষতঃ হিন্দুর, জীবনযাপন দুষ্কর এমন কি অসম্ভব হইয়া উঠে।

আহার-বিহার-বিষয়ে নারীর যথেচ্ছাচারিতা হিন্দুসমাজের চক্ষুশূল। হিন্দুসমাজ চাহেন না যে তৎসমাজভুক্তা রমণিগণ যে-কোন পুরুষের (তাঁহারা স্বামীর বন্ধুবান্ধব হইলেও) সহিত অবাধে ও অসঙ্কোচে মেলামেশা করেন, এক টেবিলে বা একত্র ভোজন করেন, স্বামীর অসাক্ষাতে থিয়েটার, বায়স্কোপ প্রভৃতি প্রমোদাগারে গমন করেন অথবা হোটেলে পান ভোজন করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উপরোক্ত আচরণগুলির উল্লেখ করা হইল।

পর্দ্দানশীনতা সহরে অনেক পরিমাণেই লুপ্ত হইয়াছে, যদিও পল্লীগ্রামের রমণিগণ অদ্যাপি অবাধ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন নাই। সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় অনেক কিশোরী ও যুবতী যোগদান করেন এবং সাধারণ সম্মেলনে গান গাহিয়া থাকেন, ইহাতে আপত্তির কারণ না থাকিলেও, এরূপ স্থানে নৃত্যকলা-প্রদর্শন সমাজের চোখে বিসদৃশ প্রতীয়মান হয়।

পুত্রবধূর প্রসঙ্গে পতি-পত্নীর পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা হইয়াছে। এ সম্পর্কে আরও কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। পত্নীর আচরণের সংশোধন ও স্বভাবের উন্নতি-সাধনের চেষ্টা যেমন পতির কর্ত্তব্য, পতির চরিত্রগত কোন দোষ লক্ষিত হইলে বা কার্য্যাবলী কিম্বা কার্য্যবিশেষ নীতিধর্ম্ম-বিরুদ্ধ হইলে তাহার সংশোধনের চেষ্টাও পত্নীর কর্ত্তব্য। যেমন "রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী" এরূপ

রমণী সমাজে বিরল, তদ্রূপ "রূপে কার্ত্তিক, গুণে গণপতি" এমন পুরুষের সংখ্যাও অল্প। শিক্ষা কখনই সম্পূর্ণ হয় না; বহু বিষয়ে শিক্ষালাভ করিলেও, নানা উপাধিভূষিত হইলেও শিক্ষার অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায় এবং আচার ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও আচরণ নীতিবিগর্হিত ও ত্রুটীবহুল হইয়া থাকে। এমন পুরুষেরও অভাব নাই যিনি এরূপ দুর্ব্বলচিত্ত যে অত্যধিক কোমলতাপ্রযুক্ত সময়ে সময়ে স্বীয় সংসারের ও পরিজনবর্গের পক্ষে অনিষ্টকর কার্য্য করিয়া বসেন। সংসারিক বুদ্ধি বা বিষয়-বুদ্ধির অভাব অনেক কৃতবিদ্য পুরুষে লক্ষিত হয়। স্বভাবতঃ কোমলবৃত্তিসম্পন্না হইলেও রমণীর চিত্তে দৃঢ়তার অভাব হয় না; তাহা হইলে পুত্রকন্যাকে শাসন করিবার জন্য জননী সন্তানকে প্রহার করিতে পারিতেন না, চিত্তের দৃঢ়তা না থাকিলে নারীধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য রমণিগণ জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিতে পারিতেন না। অবশ্য চিতানলে আত্মনাশের প্রয়োজন বহুযুগ পূর্ব্বে নিরাকৃত হইয়াছে; তথাপি কেরোসিন তৈলের সাহায্যে রমণীর আত্মহত্যার বিবরণ এ-যুগেও মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। আত্মহত্যা নিঃসন্দেহ কাপুরুষতার পরিচায়ক, কিন্তু ইহা মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় প্রদান করে। বর্ত্তমান জগদ্ব্যাপী যুদ্ধে স্বদেশ-রক্ষার উদ্দেশ্যে রুশরমণিগণ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া সমরাঙ্গণে অবতরণ করিয়াছেন, ইহা অনেকেই অবগত আছেন। বিমানবহর-চালনায় ও বিমানযুদ্ধে পাশ্চাত্ত্য ও জাপানদেশীয় রমণিগণের পারদর্শিতার কথাও মধ্যে মধ্যে শ্রুতিগোচর হয়। যে যে জাতির মধ্যে সমর-প্রচেষ্টা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান সেই সেই জাতির রমণিকুল বর্ত্তমান সময়ে মানবজীবনঘাতী অস্ত্রশস্ত্রের ও বিবিধ সমরোপকরণের নির্ম্মাণ-বিষয়ে নিযুক্তা। উল্লিখিত কার্য্যাবলী রমণীর চিত্তদৃঢ়তার পরিচায়ক।

দুর্ব্বলচিত্ত স্বামীকে সাহায্য ও সংশোধন করিবার নিমিত্ত পত্নীর দৃঢ়তা অবলম্বন কেবল বাঞ্ছনীয় নহে, একান্ত আবশ্যক। যে-নৃশংস স্বামী স্বীয় পত্নীকে প্রহার করিতেও কুণ্ঠা বোধ করে না, তাহার রোগ উৎকট, সে রোগের উপযুক্ত ঔষধ সহজপ্রাপ্য নহে। অপিচ বন্য পশুও পোষ মানে, সার্কাসে ক্রীড়ক বা trainer-এর আদেশে সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ নানাবিধ ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শন করে। রোগ শিবের অসাধ্য মনে করিলেও কেহ প্রতীকারের চেষ্টা পরিত্যাগ করে না। পরন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে মানবচরিত্রের কতকগুলি দোষ স্বতঃই অপসৃত হয়। অতএব ক্ষেত্রবিশেষে পত্নীর নির্ব্বন্ধাতিশয্য ও সহিষ্ণুতা বিশেষ আবশ্যক। দেশ কাল পাত্রভেদে অভিমান প্রকাশ ও অশ্রুবর্ষণরূপ ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগে রমণীর জয়লাভ হয়, তবে এমন হৃদয়ও আছে যাহা ব্রহ্মাস্ত্রেও বিদ্ধ হয় না। স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্বে কোন্ অবস্থায় কিরূপ কৌশল অবলম্বনীয় এবং কোন্ অস্ত্র প্রযুজ্য তদ্বিষয়ে "গৃহী" অপেক্ষা রমণীর জ্ঞান প্রকৃষ্টতর এইরূপ আশা করা যায়, সুতরাং সে-বিষয়ে নির্দ্দেশ বা উপদেশ প্রদান করিতে যাইয়া হাস্যাস্পদ হইতে "গৃহী" অসম্মত।

"ঘরভাঙা" হইতে যৌথ পরিবারে মনোমালিন্য ও বিচ্ছিন্নতার সূত্রপাত হয় এবং উহা বিভাগবণ্টনে পর্য্যবসিত হয়। এই "ঘরভাঙার" জন্য সাধারণতঃ পরিবারভুক্তা কোন না কোন সধবা রমণীকেই অপরাধিনী বা দায়ী সাব্যস্ত করা হয়। অবশ্য প্রকাশ্য বিরোধের কর্ত্তা সাধারণতঃ কোন পুরুষ—সরীক বা অংশীদার, কিন্তু বিরোধসৃষ্টির জন্য অপরাধিনী গণ্যা হয়েন সেই পুরুষের সহধর্ম্মিণী। "ঘরভাঙা"র পূর্ব্বাধ্যায় "কাণভাঙানী"। ত্রুটী-বিচ্যুতি সর্ব্বত্র সকল সংসারে, সকলের কার্য্যে অল্প-বিস্তর ঘটিয়া থাকে—একমালী সংসারে অধিকতর ত্রুটী-বিচ্যুতির সম্ভাবনা। এইরূপ ত্রুটী-বিচ্যুতির ফলে সকল পরিজনকেই এক সময়ে না এক সময়ে কিছু কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়; কেহ কেহ এ-সকল উপেক্ষা করেন, কেহ কেহ বিরক্ত হয়েন। বধূগণকেই এই অসুবিধা অধিক পরিমাণে ভোগ করিতে হয়। হয় ত', বধূ নিজকক্ষে বসিয়া প্রাতঃকালে কোন ভৃত্যকে বা পাচককে আটটা পাঁচ মিনিটের সময়ে হুকুম করিলেন তাঁহার শিশুসন্তানের জন্য দুগ্ধ গরম করিয়া দিতে; তখন যাঁহারা আফিসে বা আদালতে যাইবেন তাঁহাদের আহার্য্য প্রস্তুত করিবার জন্য পাচক ব্যস্ত এবং তাঁহাদেরই অন্য কাজ করিবার জন্য দাসদাসী ব্যস্ত; হয় ত', বধূর আদেশ তাহারা শুনিতে পাইল না, হয় ত' সবগুলি উনান যোড়া—অবশেষে সওয়া আট ঘটিকায় দুগ্ধ গরম হইল এবং শিশুকে খাওয়ান হইল। বধূ "নাকে কাঁদিতে" আরম্ভ করিলেন—"আটটা সাড়ে সাত মিনিটের সময় খোকাকে (বা খুকীকে) খাওয়াইবার নিয়ম, তাহাকে যথাসময়ে খাওয়ান হইল না; চাকরবাকর আমার কথা মানে না; অন্যের খাবার যোগাড় করিবার আগে শিশুকে খাওয়ান উচিত" ইত্যাদি। হয় ত' ইহার পর স্বামীর নিকটে এ-সম্বন্ধে নানারূপ অনুযোগ অভিযোগ করিয়া, তিলকে তালে পরিণত করিয়া তাঁহার "কাণ ভাঙাইলেন"। হয় ত', কোন বধূর স্বামী তাঁহার ভ্রাতা বা ভ্রাতুষ্পুত্র অপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করেন ও একমালী সংসারের জন্য অধিক অর্থ ব্যয় করেন, অথচ তাঁহার নিজের সন্তানসন্ততির সংখ্যা অল্প, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতার বা ভ্রাতৃগণের আয় সামান্য, অথচ সন্তানসন্ততির আধিক্যবশতঃ ব্যয় অধিক। এরূপ ক্ষেত্রে যদি স্ত্রী ক্রমাগত এই বিষয়ে স্বামীর "কাণ ভাঙাইতে" থাকেন এবং ব্যয়সঙ্কোচ না করিলে স্বীয় পুত্রকন্যা-গণের (বিশেষতঃ হঠাৎ তাঁহার "ভাল-মন্দ" হইলে) ভবিষ্যৎ দুঃখময় হইতে পারে এরূপ চিন্তা স্বামীর মনে প্রবুদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে স্বামীর মানসিক শক্তি একান্ত প্রবল না হইলে পারিবারিক একত্ব অধিক কাল স্থায়ী

হইতে পারে না। যাঁহারা এইরূপে কাণ ভাঙাইতে ও ঘর ভাঙিতে প্রবৃত্তা হয়েন তাঁহারা ইহা বুঝেন না যে, যাঁহাদিগকে লইয়া যৌথ পরিবার গঠিত, তাঁহাদের প্রত্যেক ব্যক্তি স্বকীয় পরিবারের সহিত পৃথক্‌ভাবে বাস করিলে প্রত্যেকের যে-পরিমাণ ব্যয় হয় তাহার সমষ্টি এরূপ যৌথ পরিবারের ব্যয়সমষ্টি অপেক্ষা অবধারণযোগ্যরূপে অতিরিক্ত। এই কাণ ভাঙাইবার ও ঘর ভাঙ্গিবার প্রবৃত্তির উৎস তীব্র স্বার্থপরতা। স্বার্থপরতা হইতেই মনোমালিন্য, বিদ্বেষ, বিবাদ ও বিরোধের সৃষ্টি হয়। স্বার্থপরতা পরিহার করিলে রমণী সহজেই স্বামীর প্রতি প্রীতিপরায়ণা, শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি ভক্তিপরায়ণা, দেবর, ননদ, জা ও স্বামীর ভ্রাতাভগ্নীর সন্তানগণের প্রতি স্নেহপরায়ণা হইতে ও তাঁহাদের সকলকে সম্পর্ক হিসাবে "ভাল বাসিতে" পারেন। এরূপ মনোভাবসম্পন্না হইলে যৌথ পরিবারভুক্তা বধূ হিংসা প্রণোদিতা হইয়া স্বীয় পুত্রকন্যাদিগকে অপরিমিত আহার করাইয়া তাহাদের পীড়ার কারণ হইবেন না। ফলতঃ স্বামীর কাণ ভাঙাইতে বা শ্বশুরের ঘর ভাঙিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে না।

সন্তানপ্রসব প্রসূতির একটি ফাঁড়া। সেই জন্য গর্ভসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে প্রসূতিকে নানা বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। প্রথম অবস্থাতেই এ-সকল বিষয়ে ডাক্তারের উপদেশ গ্রহণ এ-দেশের লোকের স্বভাববিরুদ্ধ। বস্তুতঃ যে-রোগই হউক, প্রকট না হইলে কেহ চিকিৎসকের দ্বারস্থ হয় না, কিঞ্চিৎ ঔৎকট্যের সঞ্চার হইলে ডাক্তারের খবর হয়। স্ত্রীলোকের গর্ভধারণ এদেশে অন্যান্য দৈনন্দিন সাংসারিক ব্যাপাররূপে পরিগণিত। গৃহিণী বা বহুপুত্রের জননী অন্য কোন আত্মীয়া বা প্রতিবেশিনী কোন্ কার্য্য বা খাদ্য গর্ভাবস্থায় নিষিদ্ধ বা গর্ভিণীর পক্ষে সমীচীন তত্তৎবিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। গর্ভাবস্থাসম্বন্ধীয় কতকগুলি বিধি নিষেধ দীর্ঘকাল প্রচলিত দেশাচারের ন্যায় পালনীয় এবং বহুযুগ ধরিয়া পালিত হইয়া আসিতেছে; এ-গুলি গর্ভসংস্কার প্রভৃতির সম্বন্ধে যে-সকল শাস্ত্রীয় বিধান আছে তাহা হইতে ভিন্ন। বহুদর্শিতা হইতে এ-সম্বন্ধে প্রবীণাগণের যে জ্ঞান সঞ্জাত হয় তাহা উপেক্ষণীয় নহে।

সকল পিতামাতাই স্বাস্থ্যবান্ সন্তান লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু জননী স্বাস্থ্যবতী না হইলে (জনকের কথা এখন ধরিতেছি না) সন্তান কদাচিৎ স্বাস্থ্যবান হয়। গর্ভাবস্থায় প্রসূতির স্বাস্থ্য যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সে-বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে যত্ন ও চেষ্টা করা উচিত। কথিত অবস্থায় প্রসূতির ভারী জিনিষ উত্তোলন বা বহন করা অনুচিত। এ-দেশের প্রথা অনুসারে গর্ভের অষ্টম মাস হইতে গর্ভিণীর গাড়ী-পাল্কীতে আরোহণ নিষিদ্ধ। গুরুভারগ্রস্ত পদার্থের উত্তোলন ও শকটের ঝাঁকানি ও আকস্মিক হোঁচট্ প্রভৃতির ফলে গর্ভপাতের ও গর্ভের ও ভ্রূণের অন্য প্রকার অনিষ্টের প্রতিষেধ যে এরূপ বিধি-নিষেধের উদ্দেশ্য ইহা, বোধ করি, কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। যদি ইহা স্বীকার করা যায় তাহা হইলে এই বিধি-নিষেধ মানিয়া চলা সকল গর্ভিণীরই কর্ত্তব্য। কিন্তু, আধুনিক যুগের কেহ কেহ এ-সকল মানেন না। অবশ্য অবস্থাবিপর্য্যয়ে সময়ে সময়ে ঝুঁকি (risk) লইতে হয়, কিন্তু যাঁহাদের ধারণা এই যে সে-কালের বিধি-নিষেধ সম্পূর্ণ কুসংস্কারমূলক তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল।

গর্ভিণীর আহার লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর খাদ্যেই সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। বিশেষতঃ যখন গর্ভবৃদ্ধির সহিত বমনেচ্ছা ও উকির সূত্রপাত হয় তখন গুরুপাক খাদ্যে পাকস্থলী পূর্ণ থাকিলে গর্ভিণীর পীড়াদায়ক হইয়া থাকে। "পেটে পোয়াতি মাংস খাইতে নাই" এ-বাক্য বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু অধুনা ইহার অনুসরণ একান্ত সীমাবদ্ধ। অপর দিকে লঘুপাক খাদ্যে উদরপূর্ত্তি হওয়া আবশ্যক, নচেৎ ভ্রূণ বা শিশুর গর্ভের মধ্যেই অপরিমিতরূপে আকার-বৃদ্ধির সম্ভাবনা হয়।

গর্ভাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পরে যতদিন তাহার দন্তোদ্গম না হয় এবং তাহাকে স্তন্যদান করিতে হয়, ততদিন আহার-বিষয়ে প্রসূতির বিশেষ সংযম আবশ্যক। প্রসূতি যে-খাদ্য আহার করেন তাহার রস প্রাকৃতিক নিয়মে স্তন্যে মিশ্রিত হয় এবং তদনুসারে মাতৃস্তন্য শিশুর পক্ষে লঘুপাক বা গুরুপাক হইয়া থাকে। প্রসূতির স্বাস্থ্য ও পরিপাকশক্তি হিসাবে মাতৃস্তন্য বন্ধ করিয়া কোন কোন স্থলে শিশুর জন্য গর্দ্দভী বা ছাগীর দুগ্ধ ও মাইপোষের (feeding bottle)-এর ব্যবস্থা করা হয়। কোন কোন স্থলে প্রসূতির স্বাস্থ্যহানি নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে সাহেবদের অনুকরণে শিশুর জন্ম হইতেই Feeding bottle-এর ব্যবস্থা হয়; অবশ্য এ-সকল আধুনিক যুগের কথা। বাঙ্গালীর সম্পর্কে অদ্যাপি পয়স্বিনী ধাত্রীর (wet nurse) নিয়োগবার্ত্তা কর্ণগোচর হয় নাই।

"কেমন মা তা কে জানে"—এ-বিষয়ের আলোচনা করিলে গিরিশচন্দ্রের সু-পরিচিত গানের এই চরণটি স্বতঃই স্মৃতিপথে উদিত হয়। যে-মা নিজের সন্তানের হিতার্থে কথঞ্চিৎ আত্মসংযমে ও স্বার্থ-পরিহারে পরাঙ্মুখ, সে কিরূপ মা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

[ক্রমশঃ]

গোপন প্রেম

শ্রীবিমলা দেবী

(গল্প)

রাধারাণী! হ্যাঁ, রাধাকে নিয়েই গল্প। বৃদ্ধ পিতার একমাত্র আশ্রয়স্থল। রামকৃষ্ণবাবুর স্ত্রী অনেক দিন গত হয়েছেন। তাঁর দু'টী সন্তান—রাধারাণী ও মাধব। এদের নিয়েই সংসার। মাধব বড়। রামকৃষ্ণবাবু একজন সনাতনপন্থী ব্রাহ্মণ। সনাতন ধর্ম্মে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি তাঁর নিজের মনের মত ক'রে রাধাকে শিক্ষা দিয়েছেন। গৃহদেবতা গোপীকিশোরের পূজা তিনি নিজেই করেন। আর আয়োজন করে রাধা।

কিন্তু মাধব! এই নূতন যুগের মানুষ সে। পিতার প্রাচীন মতকে সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। তাই স্কুলের গণ্ডী পার হয়ে, সে এসে ভর্ত্তি হয়েছে কলেজে এক রকম জোর করেই। পিতার ইচ্ছা ছিল সে কোন সংস্কৃত টোলে পড়ুক।

কিন্তু রাধা! সেও যে চেয়েছিল, তার বড় আদরের দাদামণি কলেজেই পড়ুক। তাই সে রামকৃষ্ণবাবুকে বুঝিয়ে বলেছিল, "বাবা, দাদামণি বড় হয়েছে, তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে বাধা হওয়া উচিত নয়।" বৃদ্ধের এইখানেই ছিল দুর্ব্বলতা। তাঁর এই ছোট্ট মায়ের অনুরোধ বা আদেশ উপেক্ষা করবার ক্ষমতা তার ছিল না। তাই একদিন তিনি অনুমতি দিলেন, 'আচ্ছা রাধু, ও কলেজেই পড়ুক।"

মাধব কলেজ থেকে এসেই ডাকছে, "রাধু, ও রাধু, এই পোড়ারমুখী রাধি।" যাঁহাকে এই নতুন আখ্যা দেওয়া হয়েছে সে তখন জল খাবারের রেকাবী নিয়ে সিঁড়িতে উঠতে উঠতে সায় দেয়, "এই যে সোনামুখী দাদা, যাচ্ছি।" দাদা তখন মুখখানি বেশ ভারী করে দরজার দিকে পিছন ফিরে বসেছে।

রাধা বেশ শব্দ করেই জলখাবারের রেকাবীটা সামনের টেবিলের উপর রাখে। "এই যে পোড়ারমুখী এসেছে। এবারে সোনামুখীর কি আদেশ শুনি?" মাধব আর হাসি চাপতে পারে না। হঠাৎ দুই ভাইবোনে খুব হেসে ওঠে। বৃদ্ধ পিতা নীচে থেকে ভাইবোনের এই কলহাস্যে আনন্দিত হ'য়ে গোপীকিশোরকে প্রার্থনা জানান—"ঠাকুর! তুমি ওদের সুখী কোরো।"

মাধব আজকাল বীরেনের কথা খুব বলে। "জানিস্ রাধু, বীরেনটা আজ কি করেছে।"

রাধু। রোজ তোমার ঐ বীরেনের গল্প আর শুনতে পারি না।

মাধব। আরে শোন্ না। আজ সকলের আগে ক্লাসে এসেছে।

রাধু। বেশ! এসে কি করলেন, তা' আর শোনবার দরকার নেই, আর আমার সময়ও নেই।

মাধব। যতই কাজ থাক, এই মজার কথাটা তোকে শুনতেই হবে।

রাধু। বা রে! কে বীরেন তার ঠিক নেই। তার কথা আমাকে শুনতেই হবে। বেশ মজা ত'!

মাধব। বক্ বক্ করছিস কেন শোন্, ক্লাশে এসেই ছুরি দিয়ে চেয়ারের তিন দিকের বেত কেটে রেখে দিয়েছে।

রাধু। কার? তোমার চেয়ারের নাকি?

মাধব। দূর! আমার কেন হবে?

রাধু। তবে কার? সেইটী বলে আমাকে রেহাই দিন।

মাধব। তোর আজ এত তাড়া কেন রাধু। কোথাও যাবি নাকি রে?

রাধু। না-গো না। দেখছ না সন্ধ্যা হ'য়ে এল। বাবার সন্ধ্যার আয়োজন করতে হবে। ঠাকুর ঘরে প্রদীপ দিতে হবে।

মাধব। আরে, আজ যে বীরেনকে আসতে বলেছি।

রাধু। তা বেশ করেছ। এবারে আমি যেতে পারি বোধ হয়, তোমার ঐ বাজে কথা শোনবার সময় ও ধৈর্য্যের বিশেষ অভাব আমার।

মাধব। কেটেছিল প্রফেসারের চেয়ারের। ক্লাসে প্রফেসর রায় যেই এসে চেয়ারে বসতে যাবেন—অমনি ধপাস্।" ব'লেই দু'জনে খুব হেসে উঠল।

রাধু। এবারে আমি যাই ভাই, বুঝলে?

মাধব। আচ্ছা যাও, কিন্তু শীঘ্র আসবি, কারণ তোকে আগেই বলেছি।

রাধু। যে আজ্ঞে হুজুর।

পূজার ঘরে এসেই রাধু তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নিল। সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বেলে, গলায় কাপড় দিয়ে, গোপীকিশোরকে প্রণাম করছে—তার মনের নিভৃত বাসনা জানিয়ে।

এমন সময় রামবাবু ডাকলেন, "কই রে মা রাধু! সন্ধ্যার আয়োজন হ'য়েছে?" বলতে বলতে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

হ্যাঁ সব তৈরী হ'য়ে গেছে বাবা।

তাড়াতাড়ি রাধা ঠাকুরকে সব বুঝিয়ে দিলে এবং আরো বলে, "ঠাকুর-দা, আজ দাদামণির একটি বন্ধু এখানে খাবে।"

পুরোনো ঠাকুর, রাধুকে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছে। সেই জন্য রাধু ঠাকুরকে দাদা বলে।

বীরেনকে রাধু দেখেনি। কিন্তু মাধবের কাছে সে এত গল্প শুনেছে তার নামে, সে প্রায় দেখবারই মত। রাধা একমনে বাবার খাবার তৈরী করছিল।

রাধু, এই রাধু—বলতে বলতে মাধব এসে উপস্থিত হ'ল। এই কালা শুনতে পাচ্ছিস না?

রাধু। আজ্ঞে হ্যাঁ শুনছি, বলুন না?

মাধব। বীরেন এসেছে, চল্ তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

রাধু। না ভাই দাদামণি। বাবা ও সব পছন্দ করেন না। আমি যাব না। বাবা রাগ করবেন। তার চেয়ে তোমরা খুব গল্প কর, আমি খাবারগুলো তৈরী করে নিই। কেমন?

মাধব বিরক্ত হয়ে বলে, না, না তোকে যেতেই হবে। এই সভ্যতার যুগে বাবার ও সব সেকেলে চাল মোটেই চলবে না। চল তুই।

রাধা অনুনয়ের সুরে বলে, লক্ষ্মী দাদামণি আমার! বাবার মনে কষ্ট দেওয়া কি ভাল হবে। তিনি আমাদের কত ভালবাসেন। তার প্রতিদানে যদি আমরা তাঁকে অবহেলা করি, সেটা কি ভাল হবে? তুমি একটু বুঝে দেখ!

এই স্পষ্টবাদী বোনটীকে সত্যিই মাধব ভালবাসত প্রাণ দিয়ে এবং শ্রদ্ধাও করত যথেষ্ট তার এই মনের জোরকে।

দুই বন্ধুতে অনেক গল্প হল। খাওয়া দাওয়া সেরে বীরেন যখন বাড়ী ফিরল, রাত্রি তখন একটু বেশীই হয়েছে।

... ...

মাধব এখন এম্-এস্-সি পাশ করেছে। ইচ্ছাটা বিলাত যায়। বন্ধু বীরেন আগেই পালিয়েছে, বি, এ পাশ করেই। মাধব ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যাবে। সে ঠিক করেছে দুই বছরেই পড়া শেষ করে ফিরবে। রাধুর খুব ইচ্ছা আছে। কিন্তু বাবা! রাধু বলেছে সেই সব ঠিক করে দেবে।

অনেক দিক থেকে মাধবের নানা জায়গা থেকে সম্বন্ধ আসছে। মাধব বলে এখন নয় পরে। রাধু বলে না পরে নয় আগেই।

হোলও তাই। বীরনগরের জমিদারের পৌত্রীর সঙ্গে শুভদিনে মাধবের বিয়ে হয়ে গেল! বৌটী বেশ হয়েছে, নাম মালতী। মেয়েটী ভারী সরল। রাধুর সঙ্গে তার খুব ভাব। রামবাবুকে মালতী খুব যত্ন করে। এই পিতৃহীনা পুত্রবধূটীকে তিনিও যথেষ্ট স্নেহ করেন। রামবাবু বলেন, রাধু তোকে আর একলা থাকতে হবে না। তোরা দুটীতে বেশ আনন্দে থাকবি।

হ্যাঁ বাবা, বৌদিমণি বড় ভাল মেয়ে. আপনাকেও খুব ভালবাসে। বলে, কোন দিনও বাবার আদর পাইনি ত ভাই। রাধুর কথা শুনে বৃদ্ধের চোখ সজল হয়ে ওঠে। রাধু কথায় কথায় মাধবের বিলাত যাওয়ার কথা বাবাকে জানিয়েছে। প্রথমে তিনি খুবই আপত্তি করেছিলেন, শেষে বললেন, রাধু, আমার মাকে ডাক, সে কি বলে শুনি। রাধু গিয়ে মালতীকে ধরে নিয়ে এল। এই যে বাবা তোমার মা এসেছেন।

হ্যাঁ মা, তুমি মাধবের বিলাত যাওয়ায় মত দিয়েছ। বলে রামকৃষ্ণবাবু জিজ্ঞাসু নেত্রে পুত্রবধূর মুখের দিকে চাইলেন।

মালতী মুখ হেঁট করেই উত্তর দেয়, হ্যাঁ বাবা, কিন্তু আপনি।

তুমি আর আমার রাধুমা যখন রাজী হয়েছ তখন আমার আর আপত্তি কি থাকতে পারে?

আগামী কাল মাধব রওনা হবে। রাত্রে মালতীর অপেক্ষায় মাধব জেগে খাটের উপর শুয়ে আছে। মালতী আস্তে আস্তে এসে দরজাটী দেয় বন্ধ করে। "একি তুমি এখনও ঘুমোও নি", বলেই মালতী শুয়ে পড়ে মাধবের পাশে।

আচ্ছা লতি! আমার জন্যে তোমার মন কেমন করবে ত? বলে মাধব মালতীকে বুকের কাছে টেনে নিল।

বা রে! তুমি যাচ্ছ তোমার উন্নতির জন্য, তাতে আমি কত খুসী হয়েছি, মন কেমন করবে কেন?

মাধব নিবিড় ভাবে মালতীকে বুকে জড়িয়ে নেয়। বলে লতি রাণী, লক্ষ্মী হয়ে থেকো, বাবাকে রাধুকে খুব যত্ন কোরো, আর মাঝে মাঝে বীরেনের মাকে ফোন করো কারণ, জান ত সবই। বলেই দুজনে খুব হেসে ওঠে। আর তোমার নিজের শরীরের প্রতি লক্ষ্য রেখ। তুমি এখন আর একা নও, একটী অজানা অতিথি আসছে। এই রকম নানা গল্প হয় তাদের মধ্যে।

মালতী বলে, ও দেশে গিয়ে এই কালো কুৎসিৎ মালতীকে ভুলে যাবে না ত?

না, গো না, বলে মাধব অজস্র চুমায় মালতীর সুন্দর মুখখানি ভরিয়ে দেয়।

বাধা দেওয়া অশ্রু আজ আর কোন বাধাই মানল না, হঠাৎ পড়ল ঝরে।

এ কি তুমি কাঁদছ লতি? তুমি যদি মন খারাপ করো, আমি কি করে থাকব বল ত?

সারাদিন রাধু ও মালতী মাধবের সব জিনিষ পত্র গোছাতে লাগল। সন্ধ্যার আগেই রওনা হবে। ঠাকুর ঘরে প্রণাম করে এসে বাবাকে প্রণাম করে গাড়ীতে উঠল। মালতী ও রাধু হাসি মুখে, বিদায় দিলে। সহপাঠিরা গেল তুলতে ট্রেনে। মাধব আগেই বীরেনকে জানিয়েছে যে সে যাচ্ছে।

প্রায় এক বছর হ'ল মাধব বিলাত গেছে। চার মাস হল, মালতীর একটী খোকা হয়েছে। রাধু নাম রেখেছে "কিশলয়।" মাধব প্রতি মেলে চিঠি দেয়, খোকা হওয়ার খবর পেয়ে সে খুব খুসী হয়েছে।

বীরেন বিলাত যাবার পর তার মা বড় একলা হয়ে পড়েছেন। প্রায়ই তিনি রাধুকে ফোন করে তাদের খবর নেন। মাতৃহীনা রাধার এই সরল প্রাণা বৃদ্ধাকে খুবই ভাল লাগে। মনে মনে তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে।

রাঙাদি ও রাঙাদি, মামণি এসেছেন। রাঙাদি ওরফে রাধা, মামণি হলেন বীরেনের মা। ডাকছে আমাদের শ্রীমতী মালতী।

যাই রে বৌদিমণি, বলিতে বলিতে রাধু এসে উপস্থিত হল। আরে মামণি যে, কখন এলেন? বলে তাঁহাকে প্রণাম করল;

এই আসছি মা। তুমি কি করছিলে?

কি আর করব মামণি! যা আপনাদের বৌ। সব নিজে করবে, আমাকে কিছু করতে হয় না, ভারী গিন্নী হয়েছেন।

সব বাজে কথা মামণি! চলুন গল্প করি গে। বীরেন ঠাকুরপোর চিঠি পেয়েছেন, বলে মালতী।

হ্যাঁ মা সে ভাল আছে। নানা গল্পের পর বীরেনের মা বিদায় নিলেন।

রামকৃষ্ণবাবু একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন রাধুর বিয়ের জন্য। ঘটক, ঘটকী খুব যাওয়া আসা করছে। কিন্তু রাধু সে যে একজন কে তার হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছে, অন্তরের সমস্ত প্রেম দিয়ে পূজা করছে, তার সেই প্রেম কি ব্যর্থ হবে? তার এই গোপন ভালবাসার কি কোন মূল্য নেই?

বীরেনের মাও এই মেয়েটিকে তাঁর পুত্রবধূরূপে কামনা করেন। রাধুর মত বৌ হলেই তাঁর সংসারটী খুব সুখের হয়।

বিধাতা ও অলক্ষ্যে বসে হাসেন।

আজ প্রায় ১৫ দিন হল বীরেন ফিরে এসেছে। এসেই সে রামবাবুর সঙ্গে দেখা করেছে। মাধবের কুশল সংবাদ দিয়ে জানিয়েছে যে সে ২২শে রবিবার এসে পৌঁছুবে।

রাত্রে মালতী ও রাধু এক জায়গায় শুয়ে গল্প করছে। আচ্ছা বৌদিমণি, তোর খুব আনন্দ হচ্ছে না রে? আর ক'দিন আছে বল ত' দাদা মণির আসবার?

হুঁ তা হচ্ছে বৈ কী। বলে মালতী পাশ ফিরে শোয়।

তা ত হবেই, বলে রাধু আস্তে মালতীর গালটা দেয় টিপে।

আচ্ছা রাঙাদি, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাস করব?

কি কথা বল না?

আচ্ছা, হ্যাঁ তুই—

হ্যাঁ আমি কি, বল—বাবা তাড়াতাড়ি আমার ভারী ঘুম পেয়েছে।

আচ্ছা রাঙাদি, তুই বীরেনকে ভালবাসিস না রে?

বাঃ রে, তাকে আমি চোখেই দেখিনি কি করে ভালবাসব? আর যদিই বলি, না।

তা হলে সেটা তোর মিথ্যে কথা। বলেই মালতী দু'হাতে রাধুকে জড়িয়ে ধরল। বল না রাঙাদি—

আচ্ছা, যদি বলি, হ্যাঁ—

হ্যাঁ-টাই তোর মনের কথা। তোর সঙ্গে যদি বীরেনের বিয়ে হয় কেমন হয় বলনা ভাই।

কিছুই হয় না, শুনলি ভাই। বলেই রাধু তাড়াতাড়ি পাশ ফিরে শোয়।

মালতী রাগ করে বলে, যা, তোকে বলে কিছু লাভ নেই। আগে ও আসুক, তবে সব ঠিক হবে।

এদের কথার আওয়াজ পেয়ে খোকন বেশ উঁ-আঁ সুরু করে দিয়েছে।

আঃ! কি হচ্ছে বৌদিমণি, খোকন যে উঠে পড়ল। বলেই খোকনকে কাছে টেনে নিয়ে রাধু আবার শুয়ে পড়ে। মনে মনে ভাবে, বৌদিমণি যা বলছে, সেকি কখনও সত্যি হবে? মনে মনে ভগবানকে জানায়, ঠাকুর আমার স্বপ্ন, বৌদির আশা, সফল করবার ভার তোমার উপর। ছোট বেলা থেকে তোমার পূজার আয়োজন আমি নিজেই করে আসছি। আমার এই আশা তুমি কি পূর্ণ করবে না?

প্রায় দিন কুড়ি হল মাধব ফিরেছে। এখানে এসেই একটী ভাল চাকুরীও পেয়েছে।

বীরেন, এই বীরেন।

আরে এই দুপুর রৌদ্র মাথায় নিয়ে কি মনে করে। বলতে বলতে বীরেন বেরিয়ে এল।

মাধব বলে, ভারী দরকারে পড়ে এসেছি। বল আমার এই অনুরোধ তুই রাখবি।

আরে কি অনুরোধ, কি ব্যাপার বল ত' ?

আগে বল তুই আমার—

আরে বল না, আগে শুনি কি ব্যাপার তবে রাখব।

রাধুর ভার তোকে নিতে হবে, বাবার ও আমাদের এই ইচ্ছা।

কিন্তু ! বলে বীরেন—

কিন্তু কি ভাই, রাধু কি তোর যোগ্য নয়, না তোর পছন্দ হয় না ?

বীরেন মনে মনে বলে, কি বলে মাধব, এটা পাগল নাকি ? কিন্তু বীরেন মুখে বলে, রাধারাণী বড় হয়েছে তারও একটা মতের দরকার।

সে জন্যে তোকে ভাবতে হবে না। রাধু মালতীকে সব বলেছে।

বীরেন মনে মনে ভাবছে যার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে আছে, তাকে একান্ত আপনার করে পাব। এতে আবার অমত কি থাকতে পারে। মনে মনে আনন্দে ভোরে ওঠে। তবুও বলে কিন্তু মা ?

ও, মামণি ! সে জন্য তোকে ভাবতে হবে না, তিনি এতে খুব খুসী হয়েছেন। শুধু তোর মতের অপেক্ষায় আছেন, বলে মাধব খুব হাসতে থাকে।

শুভদিনে বীরেনের সঙ্গে রাধারাণীর বিয়ে হয়ে গেছে। আজ ফুলশয্যা, বীরেনের আত্মীয়রা ফুলশয্যার শাস্ত্রীয় নিয়ম সেরে একে একে বিদায় নিয়েছেন। বীরেনও কি দরকারে একটু বাইরে গেছে—

রাধু আসবার সময় একখানি ছোট্ট ছুরী সঙ্গে এনেছে। যেই বীরেন বাইরে গেছে, দরজাটি আস্তে আস্তে খিল দিয়ে দিল।

অনেক দিন আগে মাধব রাধুর কাছে গল্প করেছিল, বীরেন কি করে প্রফেসার রায়কে জব্দ করেছিল।

তাই রাধুও ছুরি দিয়ে ঘরে যে চেয়ার খানি ছিল তার তিন দিকের বেত কেটে কুশান চাপা দিয়ে আস্তে দরজাটা খুলে রাখল।

বড় দেরী হয়ে গেল রাণী, রাগ করনি ত' ? বলে বীরেন এসে ঘরে ঢুকল। আচ্ছা রাধু, বোস তুমি, আমি দরজাটা বন্ধ করে দিই। বলে দরজাটা বন্ধ করে রাধুর পাশে এসে দাঁড়াল, কত দিন তোমাদের বাড়ী গিয়েছি কিন্তু একদিনও তোমায় দেখতে পাই নি ?

রাধু কেবল ভাবছে, বীরেণ কখন ঐ চেয়ারটাতে বসবে। মনে মনে ঠাকুরকে জানাচ্ছে, হে ঠাকুর, একবার যেন চেয়ারে বসে।

বীরেন বলে, বাঃ চুপ করে রইলে কেন রাধু, আমাকে বুঝি তোমার পছন্দ হয় নি। এস এইখানে বসি, আমি এই চেয়ারে বসি, তুমি ঐ জানালায় বোস।

রাধুর ভারী হাসি পাচ্ছে। তবুও চুপটী করে আছে। আরে, ধর, ধর, রাধু ধর, আচ্ছা দুষ্টু ত, ধর কি করে উঠব। রাধু তখন খুব হাসছে, বীরেন হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে, হাতটা ধর রাধু, আমি উঠি।

কেন ধরব ? প্রফেসার রায় যখন পড়ে গিয়েছিলেন, তখন কে তাঁকে তুলেছিল ? তিনি ত' নিজেই উঠেছিলেন দাদামণি বলে।

ও তাহলে এ তোমারই কাজ। আমি মনে করেছিলাম, রঘুয়া ব্যাটা বুঝি ভুলে বেত ছেঁড়া চেয়ারটা দিয়ে গেছে। রোস, তোমাকে আচ্ছা করে শাস্তি দিচ্ছি। ব'লেই দু'হাতে রাধারাণীকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে ছোট্ট একটী আদরের চিহ্ন এঁকে দিল তার সুন্দর গালের উপর।



আর্য্য-কৃষ্টি ও বর্ণাশ্রম

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সত্যবান

প্রথমে ব্রাহ্মণের আশ্রম-ধর্ম্মের কথাই বলিব ; যেহেতু ব্রাহ্মণকে কেন্দ্র করিয়াই চতুরাশ্রম-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা এবং ব্রাহ্মণই চতুরাশ্রমের প্রবর্ত্তক, উপদেষ্টা বা গুরু। শাস্ত্রতঃ জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবীও ব্রাহ্মণেরই।

"উত্তমাঙ্গোদ্ভবাজ্জ্যৈষ্ঠ্যাদ্ ব্রহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ।
সর্ব্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্ম্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ ॥

... ...

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ ॥"

ব্রহ্মার উত্তমাঙ্গ, অর্থাৎ মুখ হইতে সম্ভূত এবং অন্য তিন বর্ণ হইতে জ্যেষ্ঠ এবং ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন হেতু সমস্ত জগতের মধ্যে ধর্ম্মতঃ ব্রাহ্মণই প্রধান।

ভূতগণের মধ্যে প্রাণিগণই শ্রেষ্ঠ। প্রাণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাহারা বুদ্ধিজীবী। এই বুদ্ধিজীবী জীবগণের মধ্যে আবার মানুষ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাবতীয় মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ।

স্বভাবজাত ধর্ম্মের গুণাগুণ বিশ্লেষণ দ্বারাই এই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাতে পক্ষপাতিত্ব বা দ্বেষ-হিংসা কিছুই নাই।

"তং হি স্বয়ম্ভূঃ স্বাদাস্যাত্তপস্তপ্ত্বাদিতোঽসৃজৎ।
হব্যকব্যাভিবাহ্যায় সর্ব্বস্যাস্য চ গুপ্তয়ে ॥

... ...

উৎপত্তিরেব বিপ্রস্য মূর্ত্তির্ধর্ম্মস্য শাশ্বতী।
স হি ধর্ম্মার্থমুৎপন্নো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥"

... ...

ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধি জায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে ॥

স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা দেবলোকের নিমিত্ত হব্য ও পিতৃলোকের নিমিত্ত কব্য বহনার্থ এবং এই জগৎ-সংসার পরিপালনের জন্য তপস্যাপ্রভাবে স্বীয় মুখ হইতে ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করিলেন।

ব্রাহ্মণের দেহ ধর্ম্মের সাক্ষাৎ সনাতন মূর্ত্তি, ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্তই ব্রাহ্মণের জন্ম। ব্রহ্মজ্ঞানের হেতুভূত করিয়াই বিধাতা ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

জন্মগ্রহণ মাত্রই ব্রাহ্মণ পৃথিবীর সমস্ত লোকাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়েন, যেহেতু সকলের ধর্ম্মসমূহের রক্ষার জন্যই ব্রাহ্মণের জন্ম হইয়াছে।

বস্তুতঃ ব্রাহ্মণই আর্য্য-কৃষ্টির বিধাতা পুরুষ তথা সমগ্র মানবজাতির একমাত্র অদ্বিতীয় কল্যাণকামী। আর্য্য-কৃষ্টি বুঝিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে এই দণ্ড-কমণ্ডলু-উপবীতমাত্র-সম্বল ব্রাহ্মণজাতিকেই ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। বুঝিতে হইবে কি অপূর্ব্ব মনীষা, অতুলনীয় অধ্যবসায়, অনন্য শ্রম ও সংযম এবং সুপরিকল্পিত শিক্ষা-দীক্ষার ভিতর দিয়া তাঁহারা চতুর্ব্বর্গের

আশ্রম-ধর্ম্ম গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। যাহার সাহায্যে একদা এই ভারতবর্ষে চারি বর্ণই স্ব স্ব স্বভাবজাত ধর্ম্মের পরিপূর্ণতা লাভে সমর্থ হইয়াছিল। আজিকার দিনে যাহার কল্পনাও আর করিতে পারা যায় না। যাহার কাহিনী বর্ত্তমান জগতের কাছে অদ্ভুত উপকথার মত অলীক বলিয়া উপহাস মাত্র লাভ করিয়া থাকে।

বর্ণধর্ম্মের বিভিন্নমুখী প্রকৃতির বিশ্লেষণ ও তৎসম্বন্ধীয় অভ্রান্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞান, চতুর্ব্বর্ণের সমীকরণ এক অতুলনীয় কীর্ত্তি। কি সুন্দর পরিকল্পনা! সমগ্র মানবসমাজ একটিমাত্র বিরাট অবয়ব। ব্রাহ্মণ তাহার উত্তমাঙ্গ, মুখ বা মস্তিষ্ক অর্থাৎ জ্ঞানের প্রচার-কেন্দ্র; ক্ষত্রিয় তাহার বাহু বা বলকেন্দ্র, বৈশ্য তাহার উরু বা বহনকেন্দ্র এবং শূদ্র তাহার পদ বা পরিচর্য্যাকেন্দ্র। ব্রাহ্মণ তদীয় স্বভাবজাত ধর্ম্মের অনুশীলনদ্বারা স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি করতঃ সর্ব্বদা সমগ্র অবয়বের স্থিতি, বিস্তৃতি ও উন্নতি বিষয়ক হিতচিন্তা ও তদুপযোগী বিধি-নিষেধাদি প্রবর্ত্তন করিবেন। ক্ষত্রিয় স্বধর্ম্মের অনুশীলন দ্বারা তাহার সমুন্নতি সাধন করিয়া স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়ী হইবে এবং দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করতঃ সমগ্র অবয়বকে অন্তর্বিপ্লব ও বহির্ব্বিপ্লব হইতে নিয়ত রক্ষা করিয়া সম্পূর্ণ নিরাপদ, সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান করিয়া তুলিবে। বৈশ্য দেশদেশান্তর পর্য্যটন দ্বারা কৃষি-বাণিজ্যাদির সমুৎকর্ষ সাধন করতঃ ধনরত্ন ও আহার্য্যাদি আহরণ করিয়া আনিয়া সমগ্র অবয়বের প্রসাধন ও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিবে এবং শূদ্র তদীয় স্বভাবজাত সেবাধর্ম্মের ঐকান্তিক অনুশীলন করিয়া দক্ষতার সহিত যথোপযোগী শুশ্রূষাদ্বারা সমগ্র অবয়বের সর্ব্ববিধ ক্লান্তি ও গ্লানি অপনোদন করতঃ তাহাকে সুখ-সাচ্ছন্দ্য প্রদান করিবে। এইরূপে বর্ণচতুষ্টয়ের স্বভাবজাত ধর্ম্মানুশীলনবৃত্তি প্রযুক্ত হইলেই সমগ্র সমাজ-দেহ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে এবং তাহাই হইবে সমষ্টিগত সাধনার অতুলনীয় সিদ্ধি।

হইয়াছিল তাহাই। একদা চারিবর্ণকেই নিরপেক্ষভাবে স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিতে হইত। প্রত্যেকেরই ঐকান্তিকভাবে এই বিশ্বাস ও সঙ্কল্প অচল অটল রাখিতে হইত যে, তাহারা প্রত্যেকেই একই অবয়বের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ মাত্র। প্রত্যেকতঃ পৃথক্ স্বাতন্ত্র্য বা তৎকামনা, কেবল পাপজনকই নহে; পরন্তু মারাত্মক।

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"

স্বভাবজাত ধর্ম্ম গুণপরিশূন্য হইলেও পরকীয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে শ্রেয়স্কর। কারণ স্বভাবজাত ধর্ম্মের অনুশীলন করিতে করিতে যদি মৃত্যুও ঘটে তথাপি সমগ্র সমাজদেহে ব্যভিচার সৃষ্ট হইয়া অনর্থ সংঘটিত হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। সুসম্বদ্ধ সমাজদেহে একবার একটীমাত্র রন্ধ্র সৃষ্টি করিলে সেই রন্ধ্রপথে ব্যভিচার প্রবিষ্ট হইয়া কি না অপকার সাধন করিতে পারে? তাই গীতায় ভগবান স্বয়ং উপরোক্ত সাবধানবাণী ঘোষণা করিয়াছেন।

মস্তিষ্ক স্বভাবতঃ মস্তিষ্কেরই কাজ করে। মস্তিষ্ক-ধর্ম্মের অনুশীলনেই মস্তিষ্কের পূর্ণতা তথা সার্থকতা সম্ভবপর। বাহু-ধর্ম্মের অনুশীলনে মস্তিষ্কের পুষ্টি বা কল্যাণ ত হইতে পারেই না; পরন্তু বাহুরও তাহাতে কোনরূপ উপকার সংসাধিত হইবে না। এইরূপ পরস্পর প্রত্যেকের পক্ষেই একই সত্য নিহিত। বস্তুতঃ সমগ্র মানবগোষ্ঠীর সমষ্টিগত অবয়বকে পূর্ণায়ত ও শক্তিমান করিয়া তুলিতে প্রত্যেকতঃ স্বভাবধর্ম্মের অনুকূল নিরপেক্ষ ও নিঃস্বার্থ অনুশীলনই যে একমাত্র সমীচীন পন্থা একথা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। গাধা পিটাইয়া ঘোড়া তৈয়ারী করা কোন কালেই কোন দেশে সম্ভবপর হয় নাই। স্বভাবজাত শূদ্রকে শত শিক্ষা দিলেও সে স্বভাবজাত ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হইবে না। মোটের উপর একথা স্পর্দ্ধার সহিত বলা যাইতে পারে যে, মানবগোষ্ঠীর সমষ্টিগত কল্যাণ ও সমুন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ন্যায় সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত পন্থা আর হইতে পারে বলিয়া এযাবৎ পৃথিবীর কোন স্থানের কোন মনীষীই কোনরূপ নির্দ্দেশ দান করিতে পারেন নাই।

একমাত্র ভারতীয় ঋষিগণের চিত্তেই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছিল। এ যাবৎ আর তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। অবশ্য ভারতের বুকেও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ও তথা আর্য্যজাতির প্রতিষ্ঠা অনায়াসে সম্ভবপর হয় নাই। পুরাণেতিহাস পাঠে তাহা বেশ বুঝা যায়। একদা বিশাল মানব-গোষ্ঠীর যাহারা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম মানিয়া লইল তাহারাই আর্য্য নামে অভিহিত হইল, আর যাহারা মানিয়া লইল না, তাহারাই রহিয়া গেল অনার্য্য। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে আর্য্য ও অনার্য্যের মধ্যে বহুকাল ব্যাপিয়া তুমুল সংঘর্ষ চলিয়াছিল। সে সকল সংঘর্ষের কাহিনী একটু অভিনিবেশ-সহকারে পাঠ করিলেই, অনায়াসে বুঝা যাইবে যে, তাহার প্রত্যেকটীর মূলেই রহিয়াছে একদিকে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার উদগ্র আগ্রহ, আর অপর দিকে উহার সম্পূর্ণ প্রতিকূলতা। সুখৈশ্বর্য্য-পরিত্যাগী জটাচীরধারী তপোবনবাসী ঋষিরা যজ্ঞায়োজন করিয়াছেন—অসুর-দানবাখ্য অনার্য্যেরা আসিয়া অস্থি-অঙ্গার, মল-মূত্র, রুধির ও অস্ত্র-শস্ত্রাদি বর্ষণরূপ বিবিধ উৎপাত করিয়া অনবরত তাহা পণ্ড করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই প্রকার অত্যাচারে অসুরগণের স্বার্থ কোথায় নিহিত ছিল তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়।

বিকৃত শিক্ষার ফলে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিকারগ্রস্ত হওয়ায় আজ সমাজ-দেহেও বর্ণে বর্ণে বিদ্বেষের দারুণ বিভীষিকা দেখা দিয়াছে। ইহা রোগেরই লক্ষণ, সুস্থ সবল মনের লক্ষণ নহে। ব্রাহ্মণের পুত্রই কেন ব্রাহ্মণ হইবে? শূদ্র কেন ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে না? বস্তুতঃ এরূপ প্রশ্ন যাহারা করে তাহারা যে কতবড় হস্তীমূর্খ তাহা তাহারা আদৌ জানে না। জল কেন আগুন হইবে না, লোহা কেন সোনা হইবে না—এরূপ প্রশ্ন অজ্ঞতারই দ্যোতকমাত্র। ইহার উত্তর দিতে গিয়া বিতণ্ডার সৃষ্টি করাও বাতুলতা। একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, স্বভাবজাত ধর্ম্মই বর্ণের প্রকৃত পরিচয় এবং আশ্রমধর্ম্ম পরিকল্পিত হইলেও বর্ণ ঈশ্বরসৃষ্ট বা স্বাভাবিক। সুতরাং এই মূল সত্যটুকু না বুঝিয়া কেবল নাম লইয়া কলহ যে কিরূপ অর্থহীন ও অজ্ঞতার পরিচায়ক তাহা আর না বলিলেও চলে।

যাক, এ সম্বন্ধে বক্তব্য আর বাড়াইব না। এক্ষণে যাহা বলিতেছিলাম, সেই ব্রাহ্মণ-আশ্রমধর্ম্মের কথাই সংক্ষেপে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। ব্রাহ্মণের আশ্রমধর্ম্ম,—

"তপঃ স্বাধ্যয়নং যজ্ঞো ব্রাহ্মণস্য ত্রিধা মতঃ।
নান্যশ্চতুর্থো ধর্ম্মোঽস্তি ধর্ম্মস্তস্যাপদং বিনা॥"

মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

তপস্যা, সাঙ্গবেদাধ্যয়ন এবং যজ্ঞানুষ্ঠান এই তিনটি ব্রাহ্মণের আশ্রমধর্ম্ম। একমাত্র আপৎকাল ব্যতীত ব্রাহ্মণের আর চতুর্থ ধর্ম্ম নাই। ইহার দ্বারা আপৎকাল ব্রাহ্মণের পক্ষেও চতুর্থ ধর্ম্ম পরোক্ষে স্বীকৃত হইল। অর্থাৎ আপৎকাল উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ সেই আপৎ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্তির নিমিত্ত সাময়িক ভাবে প্রয়োজনানুরূপ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারিবে। ইহাতে তাহার প্রত্যবায় হইবে না। জমদগ্নিনন্দন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পরশুরাম, যিনি ভগবানের প্রধান দশাবতারের অন্যতম অবতার বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছেন, তিনিও অত্যাচারী কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে শাস্তিদানের নিমিত্ত সাময়িক ভাবে ক্ষাত্রধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু আপৎকাল উত্তীর্ণ হইবার পর আশ্রমবিহিত ধর্ম্মের বহির্ভূত বিষয়ে আকৃষ্ট থাকা কাহারও পক্ষে সমীচীন নহে। তাহাতে পরধর্ম্মের ভয়াবহ কুফল ফলিতে পারে। ভগবান্ মনু ব্রাহ্মণের আশ্রমধর্ম্মের বিষয় বলিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

"বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥"

বেদ, স্মৃতি ও সদাচার-নিষ্ঠা এবং আত্মতুষ্টি এই চারিটি ধর্ম্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ বলিয়া কথিত।

"স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ।
মহাযজ্ঞৈশ্চ, যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ॥"

বেদাদি অধ্যয়ন, মধুমাংস বর্জ্জনাদিরূপ ব্রত, হোম, ত্রৈবিদ্য সাধন, ব্রহ্মচর্য্য কালীন দেবঋষি-পিতৃযজ্ঞাদি সম্পাদন, গৃহস্থ দশায় সন্তানোৎপাদন, ব্রহ্মযজ্ঞাদিরূপ পঞ্চবিধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞদ্বারা ব্রাহ্মণ স্বীয় দেহকে ব্রহ্ম প্রাপ্তির যোগ্য করিয়া তুলিবে।

ব্রাহ্মণের আশ্রমধর্ম্ম চতুর্দ্ধা বিভক্ত, যথা,—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। উপনয়নের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত কোন আশ্রমধর্ম্ম নাই।

"যাবত্তু নোপনয়নং ক্রিয়তে বৈ দ্বিজন্মনঃ।
কামচেষ্টোক্তিভক্ষশ্চ তাবত্তবতি পুত্রক॥"

দ্বিজাতিগণের যে পর্য্যন্ত উপনয়ন-সংস্কার না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহারা যথেচ্ছ আচার, সংলাপ ও আহার্য্যাদি গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু উপনয়ন সংস্কার হইলে আর তাহা পারে না। তখন হইতে একনিষ্ঠ ভাবে স্ব স্ব আশ্রম ধর্ম্ম মানিয়া চলিতে হয়।

এই উপনয়ন সংস্কার হইতেই দ্বিজাতির বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সূচনা। এই সময় হইতেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের স্বভাবজাত ধর্ম্মের প্রকৃত অনুশীলন ও সংগঠন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

ব্রাহ্মণের উপনয়ন কাল শাস্ত্রে নিম্নোক্তরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :—

"গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম।"

গর্ভসঞ্চার কাল অবধি অষ্টম বৎসরে, অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় হইতে ৬ বৎসর ৩ মাসের পর ৭ বৎসর তিন মাস পর্য্যন্ত কাল-মধ্যে ব্রাহ্মণের উপনয়ন সংস্কার করিবে।

এই শিশুবয়সে ব্রাহ্মণসন্তান উপনীত হইয়া পিতৃগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মচারী হইয়া গুরুকুলে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন এবং যাবৎ কাল মধ্যে তাঁহার বেদাধ্যয়নরূপ ব্রত সম্যকরূপে সম্পন্ন না হইত ততকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী হইয়া গুরুগৃহেই বাস করিতেন। বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন হইলে যথারীতি সমাবর্ত্তন করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন এবং সমর্থ হইলেই গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবিষ্ট হইতেন।

"ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্।
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা॥"

ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বাস করিয়া ছত্রিশ বৎসর যাবৎ ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদ অধ্যয়নরূপ ব্রতাচরণ করিবেন, অর্থাৎ প্রত্যেক বেদশাখা ১২ বৎসর করিয়া অধ্যয়ন করিবেন। অথবা আঠার বৎসরে তিন বেদ, অর্থাৎ প্রত্যেক বেদশাখা ছয় বৎসর করিয়া অধ্যয়ন করিবেন; কিম্বা নয় বৎসরে তিন বেদ, অর্থাৎ তিন তিন বৎসরে এক একটি বেদশাখার অধ্যয়ন কার্য্য সম্পন্ন করিবেন; অথবা যাবৎ কাল মধ্যে উক্ত বেদত্রয় অধ্যয়ন করিতে পারেন তাবৎ কাল পর্য্যন্ত গুরুগৃহে অবস্থিতি করিয়া অধ্যয়ন করিবেন।

মোটের উপর সমগ্র বেদাধ্যয়নের কালের উপরেই ব্রহ্মচর্য্যের কাল নির্ভরশীল ছিল। সুতরাং বেদাধ্যয়নই যে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য এবং ব্রাহ্মণ্যলাভের একমাত্র উপায় তাহা বলাই বাহুল্য।

"বেদমেব সদাভ্যস্যেত্তপস্তপ্স্যন্ দ্বিজোত্তমঃ।
বেদাভ্যাসো হি বিপ্রস্য তপঃ পরমিহোচ্যতে॥"

যে সর্ব্বোত্তম ব্রাহ্মণ তপস্যার আচরণ করিবেন, তিনি সর্ব্বদা সম্যকরূপে জানিবার জন্য বেদাভ্যাস করিবেন; যেহেতু ইহলোকে ব্রাহ্মণের বেদাভ্যাসই পরম তপস্যা বলিয়া মুনিগণ কহিয়াছেন।

বেদাভ্যাসহীন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই নহে।

"যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী, যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি॥
"যথা ষণ্ঢোঽফলঃ স্ত্রীষু যথা গৌর্গবি চাফলা।
যথা চাজ্ঞেঽফলং দানং তথা বিপ্রোঽনৃচোঽফলঃ॥"

কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্তী এবং চর্ম্মনির্ম্মিত মৃগের ন্যায় বেদাধ্যয়নহীন ব্রাহ্মণও কেবল নামতঃই ব্রাহ্মণ, বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ নহে।

ক্লীব ব্যক্তির স্ত্রীসঙ্গম, গাভীর গবীসঙ্গম এবং অজ্ঞ ব্যক্তিকে দান যেরূপ নিষ্ফল, তদ্রূপ বেদবিহীন ব্রাহ্মণও নিষ্ফল; বস্তুতঃ তাহার কোনই মূল্য নাই।

গুরুগৃহে বাসকালে এই বেদাধ্যয়নের সহিত আরও বহুবিধ কর্ত্তব্য ব্রহ্মচারীকে সম্পাদন করিতে হইত। ব্রহ্মচারী ইন্দ্রিয় সংযমনপূর্ব্বক গুরুগৃহে বাস করতঃ স্বীয় তপস্যা বৃদ্ধির নিমিত্ত সেই সকল কর্ত্তব্য যথাযথ নিয়মে সম্পন্ন করিতেন। গুরুকুলে বাসকালে ব্রহ্মচারী প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য শৌচাদি সমাপনানন্তর স্নান করিয়া শুদ্ধ ভাবে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ, যথাবিধি দেবতাগণের অর্চ্চনা এবং সায়ং প্রাতে সমিধ্ দ্বারা হোম করিতেন। এই হোমের সমিধ্ ব্রহ্মচারীকে আশ্রমের দূরবর্ত্তী বৃক্ষ হইতে আহরণ করিতে হইত। মধু, মাংস, গুড় ও শুক্ত দ্রব্য ভোজন, গন্ধ মাল্যাদি প্রসাধন দ্রব্য অঙ্গে ধারণ, স্ত্রীজাতির সংসর্গ ও যাবতীয় প্রাণীর হিংসা হইতে ব্রহ্মচারীকে সর্ব্বদা বিরত থাকিতে হইত। ব্রহ্মচারী কদাপি অভ্যঙ্গ করিতেন না, চক্ষুতে কাজল দিতেন না এবং জুতা ও ছাতা ব্যবহার করিতেন না। বিষয়াভিলাষ, ক্রোধ ও লোভ ব্রহ্মচারীকে সর্ব্বতোভাবে বিসর্জ্জন করিতে হইত। নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদি ব্রহ্মচারীর পক্ষে ছিল একেবারেই নিষিদ্ধ। অক্ষাদি ক্রীড়া, লোকের সহিত অযথা কলহ, অপরের দোষান্বেষণ, মিথ্যাকথন, কুৎসিতাভিপ্রায়ে স্ত্রীলোকদিগকে অবলোকন বা আলিঙ্গন এবং অন্যের অনিষ্টাচরণ হইতে ব্রহ্মচারীকে সম্পূর্ণ বিরত থাকিতে হইত। ব্রহ্মচারী সর্ব্বত্র অধঃশয্যায় অর্থাৎ ভূতলে একাকী শয়ন করিতেন। ব্রহ্মচারীর পক্ষে ইচ্ছাপূর্ব্বক রেতঃপাত নিষিদ্ধ; যেহেতু ইচ্ছাপূর্ব্বক শুক্রপাত করিলে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত নাশপ্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মচারীকে আচার্য্যের প্রয়োজন মত জলকুম্ভ, পুষ্প, গোময়, মৃত্তিকা ও কুশ আহরণ করিতে হইত এবং এতদ্ভিন্ন আচার্য্যের আরও যে সমস্ত বস্তুর প্রয়োজন তাহাও যথাসময়ে যত্নের সহিত সংগ্রহ করিয়া দিতে হইত। প্রত্যহ ভিক্ষার দ্বারা অন্নের সংস্থানও ছিল ব্রহ্মচারীর আর একটী গুরুতর কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচারীর ভিক্ষালব্ধ সমস্ত অন্নেই ছিল তদীয় আচার্য্যের অধিকার; সুতরাং ব্রহ্মচারী ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইতেন তাহাই আনিয়া গুরুকে দিতে হইত। যে সকল গৃহস্থ বেদযজ্ঞাদিবিহীন নহে, এমন সব গৃহস্থের গৃহ হইতেই ব্রহ্মচারী ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতে পারিতেন, কারণ বেদযজ্ঞাদিহীন গৃহস্থের ভিক্ষা ব্রহ্মচারীর গ্রহণীয় নহে। ব্রহ্মচারী অযাচিত-সুলভ হইলেও একই গৃহস্থের গৃহ হইতে পর্য্যাপ্ত ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিবেন না, ইহাই ছিল আশ্রমের কঠোর নিয়ম। এই নিমিত্ত ব্রহ্মচারীকে প্রত্যহ বহু গৃহ পর্য্যটন করিয়া আবশ্যকীয় ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতে হইত। এই কঠোর বিধানের উদ্দেশ্য ছিল দুই প্রকার। একদিকে ইহ দ্বারা যেমন গৃহস্থের প্রতি পীড়ন-করিণ জন্মিতে পারিত না, অন্যদিকে তেমনই ভিক্ষান্নের অনায়াস-লভ্যতা হেতু ব্রহ্মচারীর শ্রমবিমুখতা প্রশ্রয় পাইত না।

গুরুগৃহবাসী ব্রহ্মচারীর উপাস্য গায়ত্রীকে মাতা এবং আচার্য্যকে পিতার ন্যায় মনে করিতে হইত। আচার্য্য-সমীপে ব্রহ্মচারীকে শরীর, বাক্য, বুদ্ধীন্দ্রিয় ও মন সংযমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গুরুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তদ্গতভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে হইত, এবং গুরুর অনুমতি ব্যতিরেকে ব্রহ্মচারী উপবেশন করিতে পারিতেন না।

মাত্র সপ্তমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতৃগৃহ ও আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করিয়া গুরুগৃহে গিয়া এইরূপ কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠার সহিত সুদীর্ঘ বেদাধ্যয়নকাল পর্য্যন্ত সামান্ত ভিক্ষান্নে জীবনযাপন করা কি ব্রাহ্মণেতর বর্ণের পক্ষে সম্ভব, না, তাহার স্বভাবধর্ম্মের অনুকূল? কি কঠোর অনুশাসন! এইরূপ কঠোর অনুশাসন ও এই প্রকার শিক্ষা ও সংযমের ফলে যে ব্রাহ্মণ গড়িয়া উঠে সে যে জগদ্বরেণ্য হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? অনার্য্যগণ যে এইরূপ একান্ত কষ্টসাধ্য সংগঠনের ব্যবস্থা মানিয়া লইতে পারে নাই তাহাতেও আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পর গার্হস্থ্যাশ্রম। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কর্ত্তব্য সম্পাদনানন্তর অধীত-বেদ ব্রাহ্মণকুমার আচার্য্যের অনুমতি লইয়া সমাবর্ত্তন করতঃ দক্ষিণা প্রদান দ্বারা গুরুকে সম্যক পরিতুষ্ট করিয়া গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন এবং বিচার পূর্ব্বক আপনাকে গৃহস্থাশ্রমের যোগ্য মনে করিলে বিবাহ পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবেন।

"গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্॥"

গৃহস্থাশ্রমেও ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য অতিশয় কঠোর। গৃহস্থ ব্রাহ্মণের জীবিকা নির্ব্বাহার্থ শাস্ত্র নিম্নোক্ত বিধান নির্দ্দেশ করিয়াছেন;—

"যাজনাধ্যাপনে শুদ্ধে তথা পূতপরিগ্রহঃ।
এষা সম্যক্ সমাখ্যাতা ত্রিবিধা চাস্য জীবিকা॥"

যাজন, অধ্যাপন এবং পবিত্র প্রতিগ্রহ এই ত্রিবিধ উপায়ে ব্রাহ্মণ স্বকীয় জীবিকার সংস্থান করিবেন। এতদ্ভিন্ন উপায়ে জীবিকার সংস্থান ব্রাহ্মণের পক্ষে নিন্দনীয় বা গর্হিত। বর্ত্তমানে কাল ও বৈদেশিক প্রভাব বশতঃ জীবিকার্জ্জনের ধারার আর কোনরূপ বাধ্য-বাধকতা নাই। যাহার যেরূপ অভিরুচি সেই ভাবেই সর্ব্বত্র জীবিকানির্ব্বাহ কার্য্য চলিতেছে; এই জীবিকা-সাঙ্কর্য্যের ফলে যে কেবল ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্যেরই অধঃপতন ঘটিয়াছে তাহা নহে, এই পাতকের পরিণামে সকল বর্ণের মধ্যেই জীবিকা-সঙ্কট প্রখরতররূপে অনুভূত হইতেছে। যে যাহার বৃত্তি লইয়া সন্তুষ্ট থাকা সম্ভবপর হইলে অন্নপূর্ণার পীঠস্থানে এরূপ অন্নদৈন্য কখনই সম্ভবপর হইতে পারিত না। কেন হইতে পারিত না, তাহা বিস্তৃত ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইবার ক্ষেত্র এ প্রবন্ধ নহে; সুতরাং সে সম্বন্ধে বক্তব্য আর বাড়াইব না।

এক্ষণে ত্রিবিধ উপায়ে অর্জ্জিত বিত্ত গৃহস্থ ব্রাহ্মণ কোন্ উদ্দেশ্যে কি ভাবে ব্যয় করিবেন, গার্হস্থ্য ধর্ম্মের কর্ত্তব্য কি, ইহার স্থান কোথায় সেই সম্বন্ধেই আমরা কিছু একটু অনুসন্ধান করিব।

ব্রাহ্মণ স্বকীয় বৃত্তি দ্বারা ন্যায়ানুসারে ধন উপার্জ্জন করিয়া দেবগণ, পিতৃগণ ও অতিথিগণের যথারীতি অর্চ্চনা দ্বারা নিয়ত তৃপ্তি সাধন করিবেন এবং আশ্রিতগণের পোষণ এবং ভৃত্য, আত্মীয়, দীন, অন্ধ, পতিত, পশু ও পক্ষীদিগকে যথাশক্তি অন্নদান দ্বারা প্রতিপালন করিবেন। প্রত্যহ যথাবিধি পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। পঞ্চ মহাযজ্ঞ বলিতে পঞ্চসূনাজনিত পাপক্ষয় নিমিত্ত যে পঞ্চ যজ্ঞ বিহিত তাহাকেই বুঝায়। পঞ্চসূনা, যথা,—

"পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য চুল্লী, পেষণ্যুপস্করঃ।
কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্॥"

চুল্লী, পেষণী, সম্মার্জ্জনী, উদুখল-মুষল ও জলকলস, এই পাঁচটির নাম সূনা। ইহারা আপন আপন কার্য্যে বিনিয়োজিত হইলে তদ্দ্বারা যে জীব-হিংসা হয় গৃহস্থ সেই পাপে লিপ্ত হয়। সুতরাং

"তাসাং ক্রমেণ সর্ব্বাসাং নিষ্কৃত্যর্থং মহর্ষিভিঃ।
পঞ্চ কৢপ্তা মহাযজ্ঞাঃ প্রত্যহং গৃহমেধিনাম্॥"

উক্ত চুল্লী প্রভৃতি দ্বারা পঞ্চ প্রকারে উৎপন্ন পাপের নাশ-জন্য গৃহস্থ ব্রাহ্মণ প্রত্যহ যথাক্রমে পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা উক্ত পাপ নাশ করিবেন। পঞ্চ মহাযজ্ঞ, যথা,—

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥"

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, অন্নাদি দ্বারা পিতৃতর্পণের নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমের নাম দেবযজ্ঞ, বলির নাম ভূতযজ্ঞ এবং অতিথিসেবাকে নৃযজ্ঞ বলে।

"পঞ্চৈতান্ যো মহাযজ্ঞান্ ন হাপয়তি শক্তিতঃ।
স গৃহেঽপি বসন্নিত্যং সূনাদোষৈর্ন লিপ্যতে।"

যে গৃহস্থ প্রত্যহ শক্তি অনুসারে এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের ত্যাগ না করেন গৃহবাসী হইয়াও তিনি পঞ্চসূনাজনিত পাপে লিপ্ত হয়েন না।

অতএব পঞ্চ মহাযজ্ঞ প্রত্যেক গৃহস্থ ব্রাহ্মণেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, পিতৃলোক, ও আত্মা এই পাঁচটিকে যে ব্যক্তি অন্ন না দেয়, সে নিশ্বাস-প্রশ্বাস বিশিষ্ট হইলেও মৃত; অর্থাৎ তাহার জীবন ধারণ নিরর্থক।

গৃহস্থ ব্রাহ্মণ দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ সমাপনানন্তর ভূতগণের আপ্যায়ন জন্য আদর সহকারে উৎসর্গ বিধি সমাহিত করিবেন। কুক্কুরগণ, শ্বপচগণ ও পক্ষীগণের জন্য ভূতলে বলি নিক্ষেপণ করিবেন। ইহার নাম বৈশ্বদেব বলি। সায়ং প্রাতঃ ইহা প্রদান করা কর্ত্তব্য। এই বলিপ্রদানান্তে গৃহস্থ আচমন করিয়া দ্বারদেশ অবলোকন করিবেন। অর্থাৎ দ্বারপথে কেহ কোথায়ও অভুক্ত রহিয়াছে কি না তাহা দেখিবেন। তারপর মুহূর্ত্তের অষ্টম ভাগ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া রহিবেন। যদি কোন অতিথি আসিয়া উপস্থিত হয়। অতিথি উপস্থিত হইলে শক্তি অনুসারে যত্নের সহিত তাহার সৎকার করিবেন। অতিথির গোত্র বা পদবী এবং স্বাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিবেন না। অতিথি কুৎসিত বা সুশ্রী যেরূপই হউক তাহাকে সাক্ষাৎ প্রজাপতি অর্থাৎ ব্রহ্মার তুল্য জ্ঞান করিবেন। প্রাণান্তেও অতিথিকে বিমুখ করিবেন না। যে ব্যক্তি অতিথিকে নিরাশ করিয়া স্বয়ং ভোজন করে সে মহাপাপীর ভোজন বিষ্ঠাভোজনবৎ হইয়া থাকে।

অতিথির সৎকারান্তে অভীষ্ট জ্ঞাতি, বন্ধু, অর্থী, অসমর্থ, বালক, বৃদ্ধ ও আতুর ইহাদিগকে এবং নিঃস্ব ভিক্ষার্থী ব্যক্তিবর্গকে যত্ন সহকারে ভোজন করাইবেন। অপারগ না হইলে সমর্থ ব্যক্তিকেও অন্নদানে কদাপি কুণ্ঠিত হইবেন না। যে ব্যক্তি সম্পদশালী শ্রীসম্পন্ন জ্ঞাতি বর্ত্তমানে অভাব নিবন্ধন অবসাদ প্রাপ্ত হয়, অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় সে যে পাপ করে শ্রীমান্ জ্ঞাতিকে সেই পাপ অর্শিয়া থাকে। সুতরাং সম্পন্ন গৃহস্থ সর্ব্বদা স্বকীয় কল্যাণার্থে অভাবগ্রস্ত জ্ঞাতির অভাব মোচন করিবেন।

মোটামুটি ইহাই ব্রাহ্মণের গার্হস্থ্য ধর্ম্ম। গার্হস্থ্য আশ্রম সকল আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রকারগণ এই আশ্রমের অতিশয় গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে মদালসোপাখ্যানে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

"বৎস গার্হস্থ্যমাদায় নরঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
পুষ্ণাতি তেন লোকাংশ্চ স জয়ত্যভিবাঞ্ছিতান্॥
পিতরো মুনয়ো দেবাঃ ভূতানি মনুজাস্তথা।
কৃমি-কীট-পতঙ্গাশ্চ বয়াংসি পশবোঽসুরাঃ॥
গৃহস্থমুপজীবন্তি ততস্তৃপ্তিং প্রয়ান্তি চ।
মুখঞ্চাস্য নিরীক্ষন্তে অপি নো দাস্যতীতি বৈ॥
সর্ব্বস্যাধারভূতেয়ং বৎস ধেনুস্ত্রয়ীময়ী।
যস্যাং প্রতিষ্ঠিতং বিশ্বং বিশ্বহেতুশ্চ যা মতা॥
ঋক্‌পৃষ্ঠাসৌ যজুর্ম্মধ্যা সামবক্ত্রশিরোধরা।
ইষ্টাপূর্ত্তবিষাণা চ সাধুসূক্ততনূরুহা॥

শান্তি-পুষ্টি-শকৃন্মূত্রা বর্ণপাদপ্রতিষ্ঠিতা।
আজীব্যমানা জগতাং সাক্ষয়া নাপচীয়তে॥"

হে বৎস, গৃহস্থাশ্রমী ব্যক্তিগণই এই নিখিল জীবগণের পোষণ করিয়া থাকেন এবং সেই পুণ্যবলে অভিলষিত লোক সকল লাভ করেন। পিতৃগণ, দেবগণ, মুনিগণ, ভুতগণ মনুষ্যগণ, কৃমি, কীট ও পতঙ্গগণ, পশু ও পক্ষীগণ এবং অসুরগণ সকলেই গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে এবং তৎসহকারে তৃপ্তিভোগ করে। গৃহস্থ আমাদিগকে অন্নদান করিবেন কি না ইহা ভাবিয়া সকলেই গৃহস্থের মুখপানে চাহিয়া থাকে। বৎস, বলিতে কি—এই গৃহস্থ বেদময়ী ধেনুরূপে সকলের আধারস্বরূপ হইয়া আছে। এই ধেনুতেই নিখিল বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই ধেনুই নিখিল বিশ্বের কারণ। ঋক্ বেদ উহার পৃষ্ঠ, যজুর্ব্বেদ উহার মধ্য এবং সামবেদ উহার বক্ত্র ও গ্রীবা। ইষ্টাপূর্ত্ত উহার বিষাণ, সাধুসূক্ত উহার লোম, শান্তি ও পুষ্টি-কার্য্য উহার মল ও মূত্র এবং বর্ণ ও আশ্রম উহার প্রতিষ্ঠা। উহার ক্ষয় নাই; এই জন্য সমস্ত জগৎ উহাকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করিলেও উহার অপচয় হয় না।

গার্হস্থ্যের পর বানপ্রস্থ ও তৎপরে সন্ন্যাস। গৃহস্থ যথাবিধি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া যখন আপনার দেহে চর্ম্মের শিথিলতা, কেশে পক্কতা ও পুত্রের পুত্র অবলোকন করিবেন তখন বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বনের নিমিত্ত পত্নী সহচারিণী হইতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে সমভিব্যাহারে অন্যথা পত্নীকে পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া বনে গমন করিবেন। বনবাস কালে তাহাকে পরিচ্ছদ, গো, অশ্ব, শয্যাদি এবং ধান্য-যব গোধূমাদি সমুদয় গ্রাম্য আহার পরিত্যাগ করিতে হইবে। শ্রৌত অগ্নি, আবসথ্য অগ্নি এবং শ্রুক্‌স্রুবাদি অগ্নির উপকরণ সমুদয় গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক বনে অবস্থান করতঃ নীবারাদি বিবিধ অন্ন ও ফলমূলাদি ভোজন, মৃগাদির চর্ম্ম বা কৌপীন অথবা বৃক্ষ-বল্কল পরিধান করিয়া বিধানানুসারে প্রত্যহ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। বানপ্রস্থাবলম্বীর পক্ষে জটা-শ্মশ্রু, নখ লোম ধারণ বিহিত। বানপ্রস্থাশ্রমেও যাহা ভোজন করিবে তাহা হইতে বৈশ্বদেব বলি দিবে ও নিত্য শ্রাদ্ধ করিবে। ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিবে এবং জল, ফলমূলাদি দ্বারা আশ্রমে আগত অতিথিগণের যথারীতি সৎকার করিবে। বেদাধ্যয়ন হইতে কদাপি বিরত হইবে না। শীতাতপাদি দ্বন্দসহনশীল হইবে, সকলের উপকার করিবে, মনের সংযম করিবে। প্রত্যহ দান করিবে, কিন্তু কাহারও নিকট হইতে দান গ্রহণ করিবে না। সকল প্রাণীর প্রতি সর্ব্বদা দয়া প্রকাশ করিবে।

বানপ্রস্থাশ্রমীর যদি সংবৎসরের অন্ন সঞ্চিতও থাকে, তথাপি আশ্বিন মাস সমাগত হইলেই তৎসমুদয় পরিত্যাগ করিবে। ফাল দ্বারা বিদারিত ভূমিতে উৎপন্ন শস্যাদি যদি কেহ পরিত্যাগও করিয়া যায় তথাপি বানপ্রস্থ ব্যক্তি ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইলেও তাহা ভোজন করিবেন না। বন্য অন্ন অগ্নি দ্বারা পাক করিয়া খাইবেন না।

গ্রীষ্ম কালে চতুর্দ্দিকে অগ্নি উর্দ্ধে সূর্য্য এই পঞ্চতাপে আত্মাকে তাপিত করিবে, বর্ষাকালে অনাবৃত স্থলে গাত্রাবরণ ব্যতিরেকে বৃষ্টিধারায় দণ্ডায়মান হইবে এবং হেমন্ত কালে আর্দ্রবাস পরিধান করিবে। এইরূপে দেহকে সর্ব্ববিধ প্রাকৃতিক উপদ্রবে সহনশীল করিয়া ক্রমে ক্রমে স্বীয় তপস্যার বৃদ্ধি সাধন করিবে। ত্রৈকালিক স্নান করিয়া পিতৃলোক ও দেবলোকের তর্পণ করিবে এবং পক্ষ-মাসোপবাসাদি অতি কঠিনতর নিয়মাদি দ্বারা আপনার দেহ শোধন করিবে।

বানপ্রস্থ শাস্ত্রের বিধানানুসারে শ্রৌত অগ্নি আত্মাতে হস্ম পানাদি দ্বারা আরোপিত করিয়া অর্থাৎ ভোজন করিয়া মৌন ব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক ফলমূল ভোজন করিয়া ছয় মাস নিয়মের পর সকল প্রকার অগ্নিশূন্য ও গৃহশূন্য হইয়া, বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিবে। ভূশয্যায় শয়ন করিবে এবং স্ত্রীসম্ভোগাদি যাবতীয় সুখেচ্ছায় সম্পূর্ণরূপে বিরত হইবে।

এইরূপে বহুবিধ কঠোর সংযমশীল অনুষ্ঠানে পরমায়ুর তৃতীয় ভাগ অর্থাৎ বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তি হইলে, বনে বিবিধ দুশ্চর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া চতুর্থ ভাগ অর্থাৎ আয়ুঃশেষে বিষয়সঙ্গ পরিহার পূর্ব্বক ঈশ্বরে মনঃ সমাধান করতঃ পারিব্রাজ্য অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রমের অনুষ্ঠান করিবে।

সংক্ষেপতঃ ইহাই চতুরাশ্রমের কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মণ সংগঠন ও ব্রাহ্মণ্যের সাধনা ও ব্রাহ্মণ জীবনের যাবতীয় কর্ত্তব্য যথারীতি সম্পাদন যে কিরূপ আয়াসসাধ্য এই সাধারণ আলোচনাটুকু হইতেই তাহা বুঝা যাইবে। বিস্তৃতভাবে ব্রাহ্মণের চতুর্ব্বিধ আশ্রমধর্ম্মের আলোচনা করা একটি মাত্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। অসংখ্য বিধি-নিষেধের মধ্য দিয়া এই সব আশ্রমধর্ম্ম যুগে যুগে গড়িয়া উঠিয়াছে। মোটের উপর আর্য্যকৃষ্টির অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব কীর্ত্তি এই ব্রাহ্মণ-সংগঠন। ইহার তুলনা নাই। আর্য্যকৃষ্টি অজেয়, তাই ব্রাহ্মণও অপরাজিত, বিশ্ববরেণ্য। দণ্ড-কমণ্ডলুধারী, ভিক্ষোপজীবী হইয়াও বিশ্বেশ্বর।

[ক্রমশঃ

দেবতা

শ্রীযামিনীমোহন কর

বিশ্বপালক নিখিল দেবতা সুন্দর নিরুপম।
বজ্র আঘাতে চূর্ণ কর হে ক্ষুদ্রতা যত মম॥
সীমাতে বদ্ধ দৃষ্টি এ মোর,
তাইত' অসীম হয় না গোচর,
ভেঙ্গে দাও কারাপ্রাচীর সকল নাশিয়া ব্যর্থতমঃ॥

নয়ন আমার স্বার্থে অন্ধ,
হৃদয়-দুয়ার সতত বন্ধ,
মোহ তমসায় ঢেকেছে জীবন ঘোর অমানিশা সম॥
স্বল্প জ্ঞানের বিফল শকতি,
এনেছে দম্ভ হরিয়া ভকতি,
খর্ব্ব কর হে গর্ব্ব আমার ক্ষম অপরাধ ক্ষম॥

মুদ্রাপ্রসারণ ও পণ্যমূল্য

অধ্যাপক শ্রীঅমরেশচন্দ্র লাহিড়ী এম্-এ, (কলিঃ)
এম, এস, সি (ইকন) (লণ্ডন) ব্যারিষ্টার-এট-ল

আমাদের দেশের লোকে কিছুদিন যাবৎ পণ্যমূল্যের বৃদ্ধি সম্বন্ধে খুব সচেতন হইয়া পড়িয়াছে। মাঠে, ঘাটে, ট্রামে, বাসে সর্ব্বত্র লোকের মুখে শুধু এক কথা—চালের দাম ৬৲ টাকা মণ ছিল, আজ ২৪৲ টাকায় কিনিতে হইতেছে; কয়লা ॥৹ মণ ছিল, তাহা আজ তিনগুণ দামেও পাওয়া যাইতেছে না। যে ধুতি ৩৲ টাকা জোড়া পাওয়া যাইত, তাহা আজ ৭॥৹—৮৲ টাকা জোড়া হইয়া গিয়াছে। ইহার মূলে কি? এরূপ পরিস্থিতির কেন উদ্ভব হইল? যাঁহারা নির্দ্দিষ্টসংখ্যক টাকা রোজগার করেন তাঁহারা আজ পথে বসিয়া গিয়াছেন। যাঁহার রোজগার ধরুন মাসে ১০০৲ টাকা, তিনি আজ দেখিতেছেন যে ঐ ১০০৲ টাকার বিনিময়ে যে জিনিষপত্র কেনা যায় তাহাতে তাঁহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। পূর্ব্বে অর্থনীতির ছাত্র ও অধ্যাপকগণই টাকার দাম লইয়া মাথা ঘামাইতেন। কিন্তু এখন সাধারণ গৃহস্থও ঠেকিয়া শিখিতেছেন যে টাকার দামও উঠে নামে এবং তাহার ফলে লোকের অবস্থা সময় সময় সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়ায়।

জিনিষপত্রের মূল্য বাড়িবার কারণ এক কথায় বলা সম্ভব নহে। কেহ বলিতেছেন যে দেশে মুদ্রার সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। তাই মুদ্রার দাম কমিয়া গিয়াছে এবং পণ্যমূল্য বাড়িয়াছে। বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ভকিল প্রমুখ খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদগণ বলিতেছেন যে দেশে Inflation বা অতিমুদ্রা প্রসারণ হইয়াছে এবং সেই জন্যই জিনিষপত্র এত দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। এই যুদ্ধের প্রারম্ভে দেশে টাকার সংখ্যা কম ছিল, সুতরাং যখন প্রথমে অতিরিক্ত নোট ছাপান হয়, তখন দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্যের উপর সুফলই হইয়াছিল। কিন্তু পরে যেভাবে এবং যে হারে নোট ছাপান হইতেছে তাহাতে দেশের প্রয়োজনের চেয়ে ঢের বেশী নোট বাজারে চালু হইয়াছে এবং জিনিষপত্রের দাম চড় চড় করিয়া বাড়িয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধের গোড়া থেকে কি হারে নোট ছাপান হইতেছে তাহা নিম্নের সংখ্যাগুলি দেখিলেই বুঝা যাইবে।

সময়	পুরা নোটের সংখ্যা	চালু নোটের সংখ্যা
আগষ্ট, ১৯৩৯	২১৬.৭৮ কোটি	১৭৮.৮৯ কোটি
১৯৩৯-৪০ গড়ে	২২৭.৭৫ „	২০৮.৮৬ „
১৯৪০-৪১ গড়ে	২৫৮.৭৭ „	২৪৫.৬২ „
১৯৪১-৪২ গড়ে	৩২০.৬৩ „	৩০৮.৪৬ „
২২শে জানুয়ারী, ১৯৪৩	৬০৫.১৬ „	৫৯০.৭২ „
৫ই মার্চ্চ, ১৯৪৩	৬৩৪.৮১ „	৬২৫.৩৮ „

যেখানে ১৯৩৯ সালের আগষ্টমাসে চালু নোটের সংখ্যা ছিল ১৭৮,৮৯ কোটি, সেখানে ১৯৪৩ সালের ৫ই মার্চ্চ তারিখে আমরা দেখিতেছি যে চালু নোটের সংখ্যা হইয়াছে ৬২৫,৩৮ কোটি। যুদ্ধের সময় দেখা যায় যে খানিকটা নোটের সংখ্যা সব দেশেই বাড়ে, কিন্তু যখন এই পরিমাণ বৃদ্ধি হয় যেমন আমাদের দেশে হইয়াছে, তখন লোকে চিন্তিত না হইয়া পারে না। নোটসংখ্যা বাড়িলেই অতিমুদ্রা প্রসারণ বা inflation হইয়াছে বলা যায় না। অনেক সময় দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য বেশী পরিমাণ নোট ছাপিতে হয়। এইরূপ নোট ছাপাকে expansion বলা হয়। ইহার সহিত inflationএর যথেষ্ট তফাৎ আছে। যখন ছাপা নোটের সংখ্যা ব্যবসায় ও বাণিজ্যের প্রয়োজনের চেয়ে বেশী হইয়া যায় তখন inflation হইয়াছে বলা যায়। বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে ভারতের ব্যবসায় ও বাণিজ্য বাড়িয়াছে সে বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু সে বৃদ্ধির পরিমাণ ছাপা নোটের সংখ্যার তুলনায় অতি সামান্য। ইংরাজ সরকার ও মিত্রশক্তিপুঞ্জের জন্য ভারত নানাপ্রকার মালমশলা প্রস্তুত করিতেছে। এখানে অনেক নূতন শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে এবং পুরাতন শিল্পও বেশী পরিমাণ মাল প্রস্তুত করিতেছে। কিন্তু পূর্ব্বে যদি ১০০টা জিনিষ প্রস্তুত হইত, এখন বড় জোর ১২০টা জিনিষ প্রস্তুত হইতেছে এদিকে পূর্ব্বে যেখানে ১০০খানি নোট চলিত, এখন সেখানে ৩৫৭খানি নোট চলিতেছে। উৎপাদনের সংখ্যা যেখানে শতকরা ২০ করিয়া বাড়িয়াছে, নোটের সংখ্যা সেখানে প্রায় ২৫৭ করিয়া বাড়িয়াছে। ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে ব্যবসায়ে বাণিজ্যের প্রয়োজনের সহিত নোট-সংখ্যার সামঞ্জস্য নাই। তাই inflation বা অতিমুদ্রা-প্রসারণ হইয়াছে বলা যায়।

যে অধিকসংখ্যক নোট ছাপা হইয়াছে তাহার অনেকটা ব্যবসায়ীদের হাতে আসিতেছে গভর্ণমেণ্টকে মাল সরবরাহের বদলে। মাগ্‌গি ভাতা, অতিরিক্ত মাহিয়ানা হিসাবেও অনেকটা টাকা মজুরদের হাতে পড়িতেছে। বাজারের জিনিষপত্র যদি পরিমাণে সমানও থাকে তো এই বাড়তি টাকার প্রভাবে চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছে এবং পণ্যমূল্য বেগের সহিত ঊর্দ্ধমুখী হইতেছে। সরকার তরফ থেকে Defence Savings Campaign করা হইয়াছিল। আশা ছিল যে লোকে Defence Bonds অধিক পরিমাণ কিনিবে এবং বাড়তি টাকার অনেকাংশ গভর্ণমেণ্টের হাতে ফিরিয়া আসিবে এবং জিনিষপত্রের দাম এত চড়িবে না। কিন্তু এই দেশের লোকেরা Defence Bonds তেমন কেনে নাই। তাহারা হাতের টাকা দিয়া সমানে মাল কিনিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে যেখানে লোক টাকা সঞ্চয় করিত, সেইখানে এখন তাহারা জিনিষপত্র কিনিয়া সঞ্চয় করিতেছে। ফলে পণ্যমূল্য অসম্ভব

চড়িয়া গিয়াছে এবং আরও যে চড়িবে এরূপ সুসঙ্গতভাবেই মনে করা যাইতে পারে।

সরকার তরফ হইতে বারংবার বলা হইয়াছে যে দেশে Inflation বা অতিমুদ্রাপ্রসারণ হয় নাই। স্যর জেরিমি রেইসমান Inflationএর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে মোটেই রাজী নহেন। তিনি বলিয়াছেন যে Pure Credit Inflation এবং ভারতের বর্ত্তমান মুদ্রাসমস্যা এক জিনিষ নহে। তাঁহার মতে বর্ত্তমানে এই দেশে ক্রয় ক্ষমতা (Purchasing Power) হঠাৎ বাড়িয়া গিয়াছে এবং সাময়িক ভাবে সেই ক্রয়ক্ষমতার প্রভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়িতেছে। তিনি আরও বলেন যে ব্যবহারিক জিনিষপত্রের পরিমাণ সমান আছে অথবা কমিয়া গিয়াছে, কোনক্রমেই বাড়ে নাই। তাই লোকের হাতে অতিরিক্ত ক্রয়ক্ষমতা থাকায় জিনিষপত্র দুর্মূল্য হইয়াছে। তাঁহার এই মতের ভিত্তি কোথায় তাহা স্যর জেরিমি খুলিয়া বলেন নাই। তিনি কেন যে এই অবস্থাকে সাময়িক বলিতেছেন তাহাও বুঝা দুষ্কর।

গত আগষ্ট মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অংশীদারগণের বার্ষিক সভায় পরলোকগত স্যর জেমস টেলার বলিয়াছিলেন যে জিনিষপত্রের দাম যে বাড়িয়াছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাঁহার মতে টাকার সংখ্যাবৃদ্ধি ও জিনিষপত্রের দাম বাড়ার মধ্যে কোনও কার্য্যকারণ সম্পর্ক নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন যে ভারতে ইংরাজ সরকার বহু জিনিষপত্র কিনিতেছেন। ইহার দাম পাওয়া যাইতেছে ষ্টার্লিংএ। এই ষ্টার্লিংএর বিনিময়ে নোট ছাপান হইতেছে জিনিষপত্রের দাম শোধ করিবার জন্য। যদি জিনিষপত্রের উৎপাদন সমান ভাবে না বাড়ে তাহা হইলে পণ্যমূল্য যে বাড়িবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্যর জেমস সোজাসুজি Inflation হইয়াছে একথা স্বীকার করিতে চান নাই। কিন্তু তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করিলেই বুঝা যাইবে যে ভারতে inflation হইয়াছে ইহা বাস্তব সত্য।

কিছুদিন পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বিরলা একখানি পুস্তিকা লিখিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ টাকার আধিক্য নহে, ইহার মূল কারণ জিনিষপত্রের স্বল্পতা। বিরলা মহাশয়ের মতে ভারতে inflation হয় নাই, শুধু Expansion of Currency হইয়াছে, অর্থাৎ মুদ্রাপ্রসারণ প্রয়োজনের চেয়ে বেশী হয় নাই। তিনি বলেন যে আমাদের বাড়তি নোট ষ্টার্লিংএর ভিত্তিতে ছাপা হইতেছে। অতএব inflation হইয়াছে কি করিয়া বলা যাইতে পারে?

বিরলা মহাশয়ের মতে যে অধিক-সংখ্যক নোট চালু করা হইয়াছে তাহা পণ্যমূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কারণ, এই টাকার বেশীর ভাগই ব্যাঙ্কে অকেজো হইয়া পড়িয়া আছে। শুধু কামান ও গোলাবারুদ থাকিলেই যেমন জীবন ধ্বংস হয় না, তেমনি শুধু টাকা চালু করিলেই পণ্যমূল্য বাড়ে না। বিরলা মহাশয় বলেন যে গভর্ণমেণ্ট জিনিষ কিনিতেছেন বলিয়া বাজারে পণ্যস্বল্পতা হইয়াছে এবং সেইজন্য জিনিষপত্রের দাম বাড়িতেছে। বিরলা মহাশয়ের কথার মধ্যে যে খানিকটা সত্য নাই তাহা নহে। সরকার তরফ হইতে মাল কেনা হইতেছে বলিয়া বাজারে চাহিদার বৃদ্ধি হইয়াছে এবং সেইজন্য জিনিষপত্রের দামও বাড়িতেছে। কিন্তু সরকার নোট ছাপিয়া যে দাম দিতেছেন তাহা মাল-বিক্রেতার হাতে ক্রয় ক্ষমতায় পরিণত হইতেছে এবং পণ্যমূল্য অসম্ভব রকমে প্রভাবিত করিতেছে। বিরলা মহাশয় আরও লিখিয়াছেন যে টাকার velocity কমিয়া গিয়াছে। অতএব বাড়তি নোট জিনিষপত্রের দামের দিক দিয়া কার্য্যকরী হইয়া উঠিতে পারে নাই। বিশ্লেষণ করিয়া Clearing Houseএর Returns দেখিলে মনে হয় যে Deposit Currencyর Velocity সত্যই কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা দেখিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। শুধু এই বুঝা যায় যে ব্যাঙ্ক যতটা Credit সৃষ্টি করিতে পারিত ততটা করিতেছে না। যদি ব্যাঙ্ক আরও Credit সৃষ্টি করিত তাহা হইলে পণ্যমূল্য একেবারে গগনস্পর্শী হইয়া যাইত।

পূর্ব্বের আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে যেদিক দিয়াই দেখা যাক এবং যতই বিভিন্নভাবে উচ্চ পণ্যমূল্যের বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা করা যাক না কেন inflation বা অতিমুদ্রাপ্রসারণ যে পণ্যমূল্য বাড়ার মূল কারণ ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই। দেশে যে অসংখ্য নোট ছাপা হইতেছে, তাহাও কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অনেকে বেশী নোট ছাপাকে expansion বলিতেছেন, কিন্তু ইহা জোর করিয়া বলা ছাড়া কিছুই নহে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, কেন এই অসংখ্য নোট ছাপা হইতেছে? যুদ্ধের প্রথম হইতে ভারতের বাজারে বহু মালমসলা ইংরাজ সরকার ও মিত্রশক্তিপুঞ্জের জন্য কেনা হইতেছে। এই মালমসলার দাম পাওয়া যাইতেছে ষ্টার্লিংএ, কিন্তু এখানে দাম দিতে হইতেছে টাকায়। যে ষ্টার্লিং পাওয়া যাইতেছে তাহার ভিত্তিতে এদেশে নোট ছাপা হইতেছে। যতদিন যুদ্ধ চলিতে থাকিবে ততদিন মালপত্র ইংরেজ সরকার ও মিত্রশক্তির জন্য ভারতে কেনা হইবে এবং বর্ত্তমান দাম দেওয়ার পদ্ধতির বদল না হইলে এ দেশে নোটও ক্রমবিবর্দ্ধমান হারে ছাপিতে হইবে। বর্ত্তমানে প্রতি সপ্তাহে ৮ হইতে ১১ কোটি টাকার নোট ছাপা হইতেছে। এ ভাবে চলিলে যে কোথায় inflationএর অবস্থার পরিসমাপ্তি হইবে তাহা ভাবিতেও আতঙ্ক হয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ প্রতিদিন দেখিতেছে যে তাহার সংসার চালান দুরূহ হইয়া পড়িতেছে।

যতই নোটের সংখ্যা বাড়িতেছে, ততই টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমিয়া যাইতেছে। যেখানে পূর্ব্বে এক-টাকায় পাঁচ সের চাউল পাওয়া যাইত, সেখানে এখন দুই সের চাউল ও পাওয়া যায় না। যদি সরকার খাদ্য-দ্রব্যাদির মূল্য বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে না পারেন তাহা হইলে বহুলোক দারুণ কষ্টে পড়িবে। অতিমুদ্রা-প্রসারণ হেতু লোকে দেখিতেছে যে টাকার দাম অত্যন্ত অনিশ্চিত, তাই তাহারা টাকা না জমাইয়া মাল জমাইতে চেষ্টা করিতেছেন। ফলে বাজারে পণ্যের স্বল্পতা আরও বাড়িতেছে এবং মূল্য ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতেছে। যদি ভারত সরকার যুদ্ধের মালমসলার দামটা ইংরাজ সরকার ও মিত্রশক্তিপুঞ্জের নিকট সোনায় বা কলকব্জায় লইতে পারেন তবেই এই অতিমুদ্রা-প্রসারণের অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটিবে এবং পণ্যমূল্য আকাশের সীমায় পৌঁছিবে না।

ঝরা ফুল (গল্প)

ন গুহ

বিবাহের কয়েকদিন পরেই অজিতের ক'লকাতায় আসতে হয়েছিল। কিন্তু ক'লকাতা ত্যাগের হিড়িকে যখন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই যার যার প্রাণ নিয়ে দেশের বাড়ীতে ছুটেছিল, অজিতও তাদের মধ্যে একজন।

গাড়িতে বসবার যায়গাটুকু পর্য্যন্ত নেই। অজিত কোন রকমে এক কোণে দাঁড়াবার মত একটু স্থান করে নিল। সে জানে চাকুরী ছাড়া তার সংসার অচল, এমন কি কারোর নিকট হ'তে যে কিছু সাহায্য নেবে এমন নিকট আত্মীয়ও কেহ নেই; আর যারাও আছে, আর্থিক অবস্থা তাদেরও অজিতেরই মত। তথাপি এই আর্থিক এবং সাংসারিক চিন্তার গণ্ডিকে অতিক্রম করেও মিলনের বাসনা বলবতী হয়ে উঠল। না-বলা আনন্দে মুখে হাসির আলো ফুটে উঠল।

ষ্টেশন থেকে অজিতের বাড়ী একটু দূরেই, তিন চার মাইল হবে।

অজিতের জিনিষপত্র খুব সামান্য। একটা কুলীই সমস্ত জিনিষ মাথায় করে নিয়ে চলতে সুরু করল। অজিত তাকে ডেকে বল্লে, "আচ্ছা, তোমার নামটি কি বল্লে না তো?"

আজ্ঞে, বারেক।

একটু দাঁড়াও, বারেক। এই বলে অজিত ষ্টেশনের চারিপাশটা বেশ করে দেখতে লাগল। এই ষ্টেশনই তাকে যাবার দিন নিষ্ঠুরভাবে বিদায় দিতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করে নি, আর আজও যেন তাকে আবার হাসি মুখেই অভ্যর্থনা করতে কার্পণ্য করছে না। ষ্টেশনের প্রতিটি বস্তু আজ তার কাছে কত চমৎকার মনে হচ্ছে। রাস্তার দু'ধারে রৌদ্রের ভিতর কৃষকেরা লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করে, এ দৃশ্য সে ত জীবনে কতবার দেখেছে কিন্তু আজকের মত যেন আর সে কোন দিনই দেখে নি—আজ তার কাছে সমস্তই নূতন। প্রখর রৌদ্রে কর্ম্মক্লান্ত এক কৃষক, তার ছোট ছেলে তামাক সেজে আনতে চায় নি বলে পাচন দিয়ে প্রহার করছে, অজিতের ইচ্ছা হ'ল ছুটে গিয়ে থামায়, বলে "আহা ভাই, কেন ওকে মারো? ছোট ছেলে কথা শোনে নি বলে কি এমনি ভাবে মারতে আছে? ওকে একটু বুঝিয়ে বল্লেই ত পারতে।"

"হ্যাঁ বারেক! তোমার কথা ত কিছুই জিজ্ঞেস করলাম না।"

"আর বাবু! আমাদের খোঁজখবর আবার কে নেবে? তবু আপনার মুখ থেকে এ কথা শুনে খুশি হ'লাম।"

দু'জনে ক্ষিপ্রগতিতে হেঁটে চলেছে। অজিত আবার জিজ্ঞেস করল, "তোমার আর কে আছে বারেক?"

"থাকার মধ্যে আমি, আর আমার পরিবার, বাবু।"

"কতদিন যাবৎ তুমি বিয়ে করেছ?"

এই পাঁচ ছয় মাস হবে বাবু। পরিবারটী খুবই ভাল। গৃহস্থালী আমার চেয়ে সে অনেক বেশী বোঝে। আমিও সারাদিন পরিশ্রম করে যা' কিছু পাই, তার কাছেই নিয়ে দেই। কিন্তু একটা গুণ যে, একটী পয়সাও এদিক-ওদিক করে না।

অজিত সম্মুখেই চেয়ে দেখে বাড়ীর পার্শ্বেই এসে পৌঁচেছে। কিন্তু এখন আর তার পা' যেন চলছে না—কোথা থেকে লজ্জা এসে তাকে বাধা দিচ্ছে। সে চোরের মত বাড়িতে প্রবেশ করল।

... ...

একটা কিছু না করলে সংসার অচল তাই অজিত কিছু মূলধন নিয়ে গ্রামেই ব্যবসা আরম্ভ করে দিল। তাতে বেশ দু'পয়সা হয়।

ব্যবসা বিষয়ে অজিতের যেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অন্য বিষয়েও তার অনুরাগ কম ছিল না।

অজিত তার স্ত্রী যুঁইকে নিয়ে প্রায়ই বেড়াতে যায় তার বন্ধুদের বাড়ীতে। ফেরার পথে ছোট্ট মাঠের মধ্যে দু'জনে বসে চেয়ে দেখে দিক্‌চক্রবালে দিনমানের বিদায় নেবার ছলনা। পৃথিবীর বুকে আবিরের পর্দ্দা নেমে আসে,

পাখিগুলি নিজ নিজ বাসায় ছুটছে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে, গরুগুলি হাম্বারবে লেজ উঁচু করে ছুটে যাচ্ছে—যুঁই ভয়ে অজিতের হাতখানি জড়িয়ে ধরে।

"ভয় কি ?"

—"ঐ যে গরু ছুটে আস্‌ছে।"

—"কিছু করবে না। এখন বিদায় নেবার পালা কি না, সূর্য্যদেব বিদায় নিলেন, পাখীরা চলে গেল, রাখালও তাই গরু নিয়ে যাচ্ছে। শুধু আছি আমি আর তুমি, আর এই সম্মুখের বিস্তৃত মাঠ, আর ঐ মাথার উপরে নীল আকাশে অসংখ্য তারা।"

—"ভগবান যেন আমাদিগকে এমনি করেই রাখেন।"

বাড়ীতে ফিরতে তাদের একটু বিলম্ব হ'য়ে গেল। আরও বিলম্ব হ'ত যদি না যুঁই তাড়াতাড়ি করে উঠত।

ভোরের বেলা পাখী ডাকে। অজিত ডাকে যুঁই ! যুঁই !! ওঠো বেড়াতে যাবে না ? আবছা আলোতে তোমাকে কত সুন্দর দেখাবে।

যুঁই তাড়াতাড়ি ওঠে।

সত্যই যুঁই সুন্দর ! যুঁই ফুলের মতই সুন্দর। ঠিক যেন হাতে আঁকা ছবি। প্রায়ই তারা বেড়াতে যায়। রাত্রে চাঁদের আলোয় আর ভোরে কুয়াসা মাখা আবছা জ্যোছনায় দু'জন দু'জনকে সুন্দরতর দেখে কতই না তৃপ্তি অনুভব করে। অজিত যেন যুঁইকে ছাড়া কিছুতেই থাকতে পারে না, পারবেও না।

এইরূপ রোজ রোজ বেড়ানটা তাদের নিত্য নূতন অভিযান। যুঁইও যেন বেড়াতে যাবার জন্ত উৎসুক—স্বামীকে বলে দিল, "ব্যাবসায়ী ! একটু সকাল সকাল আসবে, প্রস্তুত হ'য়ে থাকব কিন্তু।"

বেলা প্রায় পড়ে পড়ে। অজিত বাড়ীতে এসে দেখে ঘরের মধ্যে মহা হুলুস্থুলু। যুঁইর মাথায় সকলে জল দিচ্ছে, মা পার্শ্বেই বসে।

"কি হ'য়েছে মা ?"

"কি জানি বাপু। এই ত কাজ কচ্ছিল—হঠাৎ "আমার মাথা ঘোরে, শীঘ্র জল দিন" বলে শুয়ে পড়ল।"

বেড়াতে যাওয়া ত' দূরের কথা অজিতের প্রাণের জলটুকু পর্য্যন্ত শুকিয়ে গেল। জল দিতে দিতে কিছুক্ষণের মধ্যেই যুঁই চোখ মেলে ঘোমটা টেনে দিল।

যুঁইফুলের এইরূপ প্রায়ই দুর্ব্বলতা অনুভব করায় শাশুরীর মন অস্থির হ'য়ে উঠল। অজিতের সঙ্গে পরামর্শ করে সরকারী ডাক্তারকে আর না ডেকে পারল না। কিন্তু দেশের সরকারী চিকিৎসালয়ের সরকারী ডাক্তারের বিদ্যা-বুদ্ধিও সরকারী। দু'টা টাকাই একেবারে জলে গেল। কিন্তু এমনি অবস্থায় ত' আর ফেলে রাখা চলে না ? তাই গ্রাম থেকে ৫।৬ মাইল দূরে বিখ্যাত ডাক্তার ব্যানার্জ্জিকে কল্ দেওয়াই শেষ পর্য্যন্ত স্থির হ'ল।

ডাক্তার ব্যানার্জ্জি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে হেসে ফেল্লেন, সঙ্গে সঙ্গে শাশুরীর মুখখানিও হাসিতে ভরে এল।

... ...

অজিতের মায়ের মুখে হাসি ধরে না। বৃদ্ধা মহিলারা এখন থেকেই ঠাকুমাকে ক্ষ্যাপাতে সুরু করল। কিন্তু তখন কে জান্‌ত যে এই অফুরন্ত হাসি এবং আনন্দের অন্তরালে হৃদয় বিদারক কোন ঘটনার হাতছানি রয়ে গেছে ?

অজিত চাঁদনী রাতে সেই ছোট্ট মাঠের মধ্যে এসে চুপ করে বসে থাকে—চাঁদের আলোয় সমগ্র জগৎ স্নান করতে থাকে—চারিপার্শ্বে প্রকৃতির কত সৌন্দর্য্য আজ আর তার মনকে আলোড়িত করতে পারে না। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্য আজ তাকে শুধু দু'ফোটা চোখের জল ফেলতে সাহায্য করে মাত্র।

কে ?

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস

আঁধারের পারে একা জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মা প্রজাপতি,
ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম্,
প্রশান্ত সুনীল নভঃ সুবিশাল নক্ষত্র সংহতি,
জ্যোতিষ্কমণ্ডল সূর্য্য সোম—
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড খণ্ড সৃজিলেন অপূর্ব্ব লীলায়
নিমেষে ইচ্ছায় বিশ্বপতি,
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র নর অবিমৃষ্য উদ্ধত স্পর্দ্ধায়
জানাবে না স্রষ্টারে প্রণতি ?

মৃত্তিকার গর্ভ হ'তে খুঁড়িয়া আনিবে আশীবিষে
বিষোদ্গারী অসত্য অন্যায়,
নির্ম্মল বিশুদ্ধ বায়ু বিষাক্ত করিবে ঊর্দ্ধে কি সে,
আত্মঘাতী উড্ডীন পাখায় ?
স্বীয় শির ছিন্ন করি' ছিন্নমস্তা, দিগন্ত বসনা,
সংহারিণী উন্মাদিনী নারী—
লোল-জিহ্বা শুষ্কমাংসা ভীমারুদ্রা ভীষণ দশনা,
উষ্ণ রক্ত ফেলিবে উদ্গারি' ?

হে বিধাতা, মুহুর্মুহু সৃষ্টিস্থিতি জলধি অম্বর,
প্রকম্পিত উদ্ধত আচারে,
অগ্নিগর্ভ হিরণ্যাক্ষ কোটিসূর্য্য প্রদীপ্ত ভাস্বর,
কে রক্ষিবে মুমূর্ষু ধরারে ?

আজকের উৎকল

শ্রীসুবোধচন্দ্র মিত্র

গত একশত বৎসরের মধ্যে ভারতের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে দেখা যায় বিভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্ম্মীর আবির্ভাব। বাংলাতে রাজা রাম মোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, বোম্বাইতে দাদাভাই নওরোজী, গোখলে, মহারাষ্ট্রে তিলক আর উৎকলে মধুসূদন দাস ও গোপবন্ধু দাস। এ-দিকে মহামানব মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করেছেন ভারতের দাবী, বিবেকানন্দ প্রচার করেছেন ভারতের বাণী।

বর্ত্তমান উড়িষ্যার যুগপ্রবর্ত্তক মধুসূদন দাস আর তাঁহারই মন্ত্রে অনুপ্রাণিত গোপবন্ধু দাস। মধুসূদন ও গোপবন্ধুর জীবনের সহিত নব-উৎকলের জীবন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। মধুসূদনের সময়ে উড়িষ্যাবাসীরা আশিক্ষিত অনুন্নত ঘৃণ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। মধুসূদনই প্রথম তাঁহার স্বদেশবাসীদের উপলব্ধি করাইলেন তাহাদের পূর্ব্বগৌরব, তাহাদের তিনি বুঝাইলেন যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সাহিত্যে, শিল্পে, স্থাপত্যে, কলাবিদ্যায় অপর যে কোনও প্রদেশের অধিবাসীদের অপেক্ষা কোন বিষয়ে পশ্চাৎপদ বা কোনও অংশে হীন ছিল না। বরং প্রভৃত বিষয়ে অন্যান্য প্রদেশ হইতে উড়িষ্যা ছিল উন্নত। তাঁর জীবনের ব্রত হ'ল স্বদেশবাসীর মধ্যে দেশাত্মবোধের জাগরণ, জাতীয় জীবনের অনুভূতি আনয়ন, আত্মগরিমার প্রেরণাদান, উড়িষ্যাকে অন্যান্য প্রদেশের সমপর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা। তিনি স্থাপনা করিলেন "উৎকল সভা" (Utkal Union Conference)। প্রতি বৎসর যে-সময়ে যে-তারিখে ভারতের জাতীয় মহাসভার কার্য্যারম্ভ হইত সেই দিনই তাঁহার নেতৃত্বে তাঁহার স্বদেশে এই উৎকল সভার বৈঠক বসিত।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশ বৎসরে অনেক স্মরণীয় ঘটনা ঘটে। ১৯০৬ খৃঃ অব্দে মডারেট দলের আবির্ভাব ও জাতীয় মহাসভার ক্ষমতাবিচ্যুতি। শ্রীঅরবিন্দ প্রচার করিলেন, "এগিয়ে চল, এগিয়ে চল ভাই, ন্যায্য পাওনার দাবী কর, কেবল বক্তৃতা ও গানের সময় নাই।" অরবিন্দ মনোমোহনের জ্বালাময়ী বক্তৃতা উৎকলে আনিল চাঞ্চল্য, উড়িষ্যাবাসীদের ধমনীতে রক্তস্রোত হইয়া উঠিল তাণ্ডব। উড়িষ্যা আর স্বাতন্ত্র রক্ষা করিতে পারিল না। ভারতের জাতীয় জীবন-স্রোতে সে-ও গেল ভাসিয়া। সূত্রপাত হইল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নীতির তীব্র সমালোচনা, ব্রিটিশ পণ্যবর্জ্জন, সৃষ্টি হইল "আনন্দমঠ", গীত হইল "জনগন মন অধিনায়ক।" টেরারিজম্ বলিতে যা বুঝা যায় উড়িষ্যাতে ঠিক তাহা না হইলেও উড়িষ্যার দাবী পূর্ব্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। এ-দিকে "উৎকল সমিতি" গেল উঠিয়া। ইংলণ্ডে লয়েড জর্জ্জের মত বাংলাতে সুরেন্দ্রনাথের মত, উৎকলে মধুসূদন লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্তর্হিত হইলেন। আছে কেবল সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের পুণ্যস্মৃতি কিন্তু সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন মধুসূদনই বর্ত্তমান উড়িষ্যার প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা। উৎকলের জাতীয় জীবনযজ্ঞের তিনিই প্রথম হোতা।

মধুসূদনের পর আসিলেন গোপবন্ধু। ব্রাহ্মণসন্তান গোপবন্ধু ছিলেন সনাতনপন্থী, তাঁহাকে পুরোহিত করিয়া এক নূতন সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল। কেন্দ্র হইল সাক্ষীগোপাল। দেশবরেণ্য রবীন্দ্রনাথ যে-ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বোলপুরে শান্তিনিকেতন স্থাপনা করেন গোপবন্ধু সেই একই ভাবের প্রেরণায় সাক্ষীগোপালে এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনা করিলেন। উন্মুক্ত প্রান্তরে সুশীতল বৃক্ষছায়ায় সনাতন আশ্রমের আদর্শে শিক্ষাদান কায়িক পরিশ্রমের মর্য্যাদাপ্রচার এই প্রতিষ্ঠানের মূলমন্ত্র।

ইহার পর আসিল গোপবন্ধুর প্রচারপত্রিকা "সমাজ"। মহাত্মা গান্ধীর "হরিজনের" মত এই সমাজ হইল গোপবন্ধুর মুখপত্র। উৎকলবাসীর জন্য উৎকল, সরকারী চাকুরীতে উৎকলবাসীর দাবীপ্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন সম্প্রদায়কে একত্রীভূত করিবার প্রচেষ্টা, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার, দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন জাতীয়বোধের উদ্বোধন এই হইল সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য। গোপবন্ধু বাগ্মী। যখনই তিনি বক্তৃতামঞ্চে উঠিয়াছেন মণ্ডলীর শ্রোতারা স্তব্ধ বিস্মিত হইয়া তাঁর ওজস্বিনী বক্তৃতার সুধা পান করিয়াছে। বাস্তবিক তাঁহার পত্রিকা ও বক্তৃতা দ্বারা তিনি স্বদেশে নূতন চিন্তাধারার প্রবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু এইখানেই তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার সমাধি হয় নাই। তিনি রাষ্ট্রপরিষদে যোগদান করিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পুরী জিলার মহামারী ও দুর্ভিক্ষের সময় গভর্ণমেণ্টের নিষ্ক্রিয়চেষ্টা ও অনশন বিদূরণে অমনোযোগীতার বিরুদ্ধে তাঁহার অক্লান্ত আপ্রাণযুদ্ধ উড়িষ্যার ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

প্রথম প্রথম গোপবন্ধুর দৃষ্টি সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন উড়িষ্যাকে ভারতের জাতীয়তা থেকে স্বতন্ত্রা রাখিলে চলিবে না। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেশকেও সমতালে চলিতে হইবে। সেইজন্য যখন মহাত্মাজী অহিংসানীতি ও অসহযোগ প্রচার করিলেন গোপবন্ধু সর্ব্বান্তঃ-করণে উহার সমর্থন করিলেন। জীবনসায়াহ্নে যখন তিনি দুই বৎসরকাল কারাগৃহে বাস করেন তাহার পূর্ব্ব থেকেই সাক্ষীগোপাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবস্থা বিপর্য্যয় ঘটে। আর্থিক দুরবস্থা ও সরকারের কোপদৃষ্টি উভয়ের সংমিশ্রণে প্রতিষ্ঠানের ভাঙন ধরিল। কারাপ্রাচীরের বাহিরে আসিবার

কয়েক দিন পরেই গোপবন্ধুর মৃত্যুর ফলে তাঁহার সহিত তাঁহার অতিপ্রিয় সাক্ষীগোপাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সমাধিপ্রাপ্ত হয়।

গোপবন্ধুর পর উড়িষ্যার রাজনীতি সারাভারতের রাজনীতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। মহাত্মার বাণী "১ বৎসরের মধ্যে স্বরাজ অবশ্যম্ভাবী" দুঃস্বপ্নই রহিয়া গেল। তাঁহার প্রথম অসহযোগ আন্দোলন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল, কারণ গভর্ণমেণ্টের রুদ্রনীতি। আকাশে বাতাসে উঠিল বিফলতার হতাশ্বাসধ্বনি। এক দিকে চলিল দমননীতি অপর দিকে কারাগার বরণ আর রাষ্ট্রপরিষদে যোগদান করিয়া গভর্ণমেণ্টকে বিকল করিবার চেষ্টা।

১৯৩১ খৃঃ অব্দে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করিয়া বিলাতের গোলবৈঠকে যোগদান করিলেন। মহাত্মার প্রত্যাবর্ত্তনের পর গভর্ণমেণ্ট পুনরায় রুদ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। তাহার পর ১৯৩৫ খৃঃ অব্দে আসিল ভারত-গভর্ণমেণ্ট আইন। মুসলমানেরা লাভ করিল প্রধান্য। উদ্ভব হইল জিন্নার পাকিস্থান কল্পনার। কংগ্রেস লাভ করিল প্রদেশে প্রদেশে শাসনক্ষমতা। লাগিল সংঘর্ষ মুশ্লিম লীগের সহিত। ১৯৩৯ খৃঃ অব্দে আসিল বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ। উড়িষ্যাকে কংগ্রেস দলভুক্ত মন্ত্রীরা অবসর গ্রহণ করিলেন। ১৯৪১ খৃঃ অব্দে উচ্চপরিষদের সভ্যেরা পণ্ডিত গোদাবরীশ দের নেতৃত্বে নূতন দল গঠন করিয়া কোয়ালিশন পার্টি এই নামে নূতন মন্ত্রীমণ্ডলীর সংগঠন করিলেন। উদ্দেশ্য মহৎ; যুদ্ধে সরকারবাহাদুরকে সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করা।

পণ্ডিত গোপবন্ধুই প্রথম উড়িষ্যার জনসাধারণের মধ্যে কংগ্রেসের বাণী প্রচার করেন। উড়িষ্যাবাসীরা এই বাণীর মধ্যে দেখিতে পাইল দারিদ্র্য এবং সামাজিক বীভৎসতার অপসরণ, সর্ব্বসাধারণের অবস্থার উন্নতির আশার আলোক। সুতরাং দলে দলে লোক কংগ্রেসে যোগদান করিতে থাকে। রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচনে কংগ্রেসই জয়ী হয়। সঙ্গে সঙ্গে দেশে দুর্নীতির প্রবাহ আসে। সর্ব্বদেশে নির্ব্বাচনের সময় যে সমস্ত দুর্নীতি প্রশ্রয় পায় যথা, ছড়াগান, গালিগালাজ, আত্মপ্রশংসা দলাদলি এ সমস্তই উড়িষ্যাতে দেখা দিল। কংগ্রেসদলভুক্ত মন্ত্রীরা খদ্দরধারী; জয়োল্লাসে ও ভাবাবেগে তাঁহারা নিজেদের বেতন মাত্র ৫০০৲ মাসিক ধার্য্য করিলেন। নামের পূর্ব্বে মিঃ এর পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত লিখিয়া ট্রেণে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর বদলে মধ্যম শ্রেণীতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের বেতনও কমাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজস্বের বৃদ্ধি ঘটল না। এই সময়ে দেশীয় তাড়ি কংগ্রেসের কুদৃষ্টিতে পড়াতে তাড়িশুল্ক প্রভূত পরিমাণে কমিয়া গেল। এই তাড়িশুল্ক ছিল উড়িষ্যার রাজস্বের একটী প্রধান উপাদান।

গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব আদায় এত কমিয়া যায় যে মন্ত্রীরা যে সমস্ত কার্য্য করিবেন মনস্থ করিয়া নির্ব্বাচনপ্রার্থী হন খরচ করিতে না পারায় সে সবের কিছুই হইল না। নূতন শুল্ক স্থাপন করিতেও সাহস হইল না। বন্যার বাঁধ দেওয়া, জনসাধারণের মধ্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষাবিস্তার, ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, ভিন্ন হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা সমস্তই "মধুর স্বপন আশার ছলন" রহিয়া গেল। জনসাধারণে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য আন্দোলন করিতে লাগিল। কিন্তু অর্থাভাব হেতু মন্ত্রীমণ্ডলী ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিবর্ত্তে বালক-বালিকার সহপাঠ অনুমোদন করিলেন। অবশ্য একেবারে কোন কার্য্যই হইল না একথা বলা যাইতে পারে না। কারণ উড়িষ্যার টেনান্সী আইন পাশ হইল। ইহার দ্বারা কৃষক সম্প্রদায়ের কতদূর দুঃখদূর হইয়াছে সেটা বিবেচ্য হইলেও পূর্ব্বের তুলনায় আজ তাহাদের অবস্থার যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা নিশ্চিত।

আজ উড়িষ্যার চিন্তাধারা বিভিন্ন পথে ধাবিত। উড়িষ্যাকে এখন আর অবনত প্রদেশ বলা যাইতে পারে না। একটা জিনিষ বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। উড়িষ্যাতে শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টা। স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা চলিতেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের পরিস্থিতির মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা শ্লাঘার বস্তু সন্দেহ নাই। বিগত মহাযুদ্ধের সময় দেখিতে পাই রুশদেশে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। বর্ত্তমানে দেখিতে পাই চীন দেশে বোমার নির্ঘোষ ও ধ্বংসস্তূপের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার বন্ধ হয় নাই। বর্ম্মাপ্রদেশ সম্প্রতি ইংরাজ হস্তচ্যুত হইলেও রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য চলিতেছে। কিন্তু অপর দিকে দেখা যায় উৎকলের দারিদ্র্য। উড়িষ্যাবাসীরা অতিশয় দরিদ্র। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের অবস্থাও স্বচ্ছল নয়। তাহার পর বর্ত্তমানে দেশব্যাপী খাদ্য সমস্যা। সুতরাং দারিদ্র্য দূর, দেশের মধ্যে স্বচ্ছলতা আনয়ন, বেকার সমস্যা দূর, ধীরে ধীরে যন্ত্রশিল্পের বিস্তার, সর্ব্বসাধারণে শিক্ষা বিস্তার যদি সম্ভব হয় তবেই উড়িষ্যা আবার লুপ্ত গৌরব ফিরাইয়া পাইবে। আজ দেখিতে পাই এক দিকে জনজাগরণ আরম্বরহীন জীবনযাত্রার প্রতি পক্ষপাতিত্ব লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা বৈদেশিক শাসনের ফলে ক্রমঃবর্দ্ধমান অস্থিরতা। অপরদিকে গণতন্ত্র, কর্ম্মী ও নেতাদের মধ্যে বিরোধ। কিন্তু সমস্তদিক থেকে বিচার করিলে আজ স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারতমাতার এই লোলচর্ম্মা কন্যা আজ নবপ্রাণে সঞ্জীবিত। আজ গোপবন্ধু উড়িষ্যাকে অন্যান্য প্রদেশের সহিত সমভাবে উন্নত দেখিবার আশা পূর্ণ হইতে চলিয়াছে বলিতে পারা যায়।

স্বখাত সলিলে

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

'নির্দ্দয় বিশ্বের ধাতা', নিত্যদিন অন্তহীন এই অভিযোগ
শুনিতেছি মূঢ় মানুষের। রিক্ত নিঃস্ব অসহায় শ্রান্ত জীবনের
অভিশাপ পুঞ্জ হয়ে উঠিতেছে প্রতিদিন দেবতার পানে—
রোষে ক্ষোভে অভিমানে তিক্ত অশ্রু অবিরাম ঝরে ক্রন্দনের।

বিদ্রোহী আজিকে নর! বিধাতার প্রতিপক্ষ, সৃষ্টি ভাঙ্গে গড়ে,
হিংস্র অভিযোগে দোষে প্রতিক্ষণ 'একচক্ষু মূর্খ বিধাতারে'
আপন দৈন্তের লাগি'। অন্নহীন বস্ত্রহীন মুমূর্ষু সভ্যতা
ক্ষীণতনু ক্ষুধার কঙ্কাল, অবসন্ন আপনার শীর্ণ দেহ-ভারে।

লোলুপ কাতর ক্ষুধা, গলিত পঙ্কিল দৈন্য পিচ্ছিল কামনা
মলিন কুৎসিৎ লোভ, উদগ্র এ অভাবের মর্ম্মদাহী জ্বালা,
অসহ্য দুঃখের ক্ষত, রসহীন এ মৃত্তিকা, প্রাণহীন দেহ
শষ্প শস্যহীন মাঠ, রৌদ্রদগ্ধ মরুপথ নিঃশব্দ নিরালা।

ফলহীন আজি তরু, শুষ্ক নদী, সুধাহীন মাটির ধরণী—
কিসের আগুনে হায় দগ্ধ হ'ল অবশেষে দুঃখের শিখায়
আজিকে সমগ্র ধরা! মৃত্যু হল মৃত্তিকার, স্বর্ণ শস্য কণা
নিঃশেষে বিদগ্ধ হ'ল কী কঠিন প্রতিকূল ললাট লিখায়!

সীমাহীন দুঃস্থতায় খাদ্যহীন দুর্ভিক্ষের রূঢ় বিভীষিকা
আপন আতঙ্ক ল'য়ে জেগে ওঠে দিকে দিকে মৃত্যু ছায়াময়
নামিয়া আসিছে বিশ্বে কোথা হ'তে ওরে ভ্রান্ত বল্ কোন পাপে
ক্ষুধার দু'মুঠি অন্ন ধরণীর বুকে আজ তাও হ'ল ক্ষয়!

ওরে ও বিজয়ী বীর! আপন কীর্ত্তির শিরে সৌধ জীবনের
এতকাল সাজায়ে যতনে অভ্রভেদি আজি তার সমুন্নত শির
সম্মুখে পড়িল ভাঙ্গি কিসের প্রলয়ে হেথা এতদিন পরে
আপন গর্ব্বের ভারে প্রণষ্ট এ মৃত সৌধ গত শতাব্দীর!

বিধাতা নির্ম্মম নহে। প্রকৃতির বুকে তাই গুপ্ত ছিল সুধা
জন্মের অনেক আগে পালনের অন্নজল আছিল সঞ্চিত
জননীর দুগ্ধধারে। মৃত্তিকার সিক্তরসে সঞ্জীবিত করি'
নধর শস্যের কণা লুকায়ে রেখেছে বিধি একান্তে গচ্ছিত

ঘুমন্ত পৃথ্বীর বুকে। যে এসেছে কাছে অন্নপূর্ণা মা তাহারে
দিয়াছে ক্ষুধার অন্ন তৃষ্ণার সলিল; আজি এতদিন পরে
কেমনে হ'ল তা রিক্ত! সুধা নাই একবিন্দু এক ফোঁটা দুধ
কেন আর বেঁচে নাই শীর্ণা ঐ জননীর স্তনবৃন্ত্য পরে!

মরেছে দেশের মাটি! মানুষের সর্ব্বগ্রাসী উদগ্র ক্ষুধার
জননী প্রথম বলি। স্বর্ণ ডিম্ব প্রসবিনী ধরিত্রী মাতার—
গর্ভ চিড়ি' পলে পলে নিয়ত মানুষ নিয়াছে উদ্ধার করি'
নিঃশেষে সকল রস বাহুবলে তীব্র লোভে, কী দোষ ধাতার!

বিজ্ঞান আঁকিয়া দিল দীপ্ত জয়টীকা যন্ত্র দানবের শিরে—
আকাশে বাতাসে আর মৃত্তিকার গর্ভতলে যা ছিল সঞ্চয়
সকলি লুণ্ঠন করি' সম্ভোগের পূর্ণ পাত্র ভরেছে মানুষ—
নিখিলের মর্ম্ম তাই নিঃস্ব হ'ল সর্ব্বরূপে, সব হ'ল ক্ষয়।

লৌহ দৈত্য রুখে ওঠে, দিগ্বিজয়ী স্ফীত ভোগ অম্বর ভেদিয়া
আকাশ চুম্বনে মত্ত; বস্তুর বাহুল্য ভারে নানা আড়ম্বরে
জর্জ্জর নিখিল কণ্ঠে মানুষের অহঙ্কার মণিকার মালা
উঠেছে বিচিত্র হয়ে! মুদ্রাযন্ত্র বারংবার অতি তারস্বরে

দীপ্তকণ্ঠে ঘোষিছে নির্ভয়; অর্থের আগম বিধি সে নিয়েছে হাতে
কাগজের মুদ্রা ছাপে লক্ষ লক্ষ প্রতিবারে পলকে পলকে
পর্ব্বত প্রমাণ অর্থ, হিমাদ্রি প্রমাণ দম্ভ যশের গৌরব
উপচিয়া পড়ে যেন দিগ্বিদিকে অনুক্ষণ ঝলকে ঝলকে।

এত সমারোহ মাঝে তবুও মানুষ আজ নিঃস্ব সর্ব্বহারা
প্রকৃতির প্রতিশোধ নির্ম্মম কঠিন বজ্র হানিতেছে শিরে
সকল পূর্ণতা মাঝে তাই তার উদরেতে খাদ্য নাই আজ
সকল সম্পদ মাঝে সে চির দরিদ্র তাই অন্নহীন ফিরে!

অর্থহীন আজি অর্থ। বিত্ত দিয়ে মেটে না তো জঠরের ক্ষুধা
মাণিক্য কাঞ্চন রত্নে অন্নহীন বুভুক্ষার নাহিক সান্ত্বনা
স্বখাত সলিলে হায় ডুবিছে মানুষ আজ মৃত্যুর অতলে
আপন জ্ঞানের দর্প লুব্ধ লোভ সবই তারে করেছে বঞ্চনা।

বাংলাদেশে জমির প্রকৃত মালিক কে, রাজা না প্রজা?

শ্রীবিশ্বনাথ সেন, এটর্নী-অ্যাট-ল

বর্ত্তমান যুগে আমাদের বাংলাদেশের জমির প্রকৃত মালিক কে, রাজা না প্রজা তাহা বলা কিঞ্চিৎ সমস্যার ব্যাপার। অনেকেই হয় ত' বলিয়া উঠিবেন এই প্রশ্নের উত্তর কিছুই কঠিন নহে; জমির মালিক চিরকালই রাজা অর্থাৎ বাংলাদেশে জমিদারগণ বরাবরই জমির মালিক এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তাহারা জমির সম্পূর্ণ মালিকানা সত্ত্ব পাইয়াছেন এবং ঐ বন্দোবস্ত মূলে আজিও তাহারা নিজ নিজ জমিদারি ভোগ দখল করিতেছেন। কথাটা সত্য; লর্ড কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় জমিদারদিগকে জমির সম্পূর্ণ মালিক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং তাহাদের এই প্রভুত্ব যাহাতে চিরকাল অটুট অবস্থায় বজায় থাকে সেই মর্ম্মে ইস্তাহার জারী করিয়াছিলেন। তদ্‌পূর্ব্বে অর্থাৎ মুসলমানদিগের রাজত্বকালে জমিদারগণের যথেষ্ট প্রভুত্ব ছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে এতই প্রধান্য লাভ করিয়াছিলেন যে, নিজ নিজ জমিদারীর মধ্যে গভর্ণমেন্ট অনুযায়ী সকল কার্য্য করিতেন, জমি তাহাদের, সেইজন্য জমি সম্বন্ধে আইনকানুন বিলিবন্দোবস্ত প্রজাপত্তন উচ্ছেদ জমির খাজনা ধার্য্য প্রভৃতি বিষয় তাহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। প্রজার জমিতে বিশেষ কোন অধিকার থাকিত না। যত দিন ঠিক মত খাজনা দিতে পারিত ততদিন সে নির্ব্বিবাদে জমি ভোগ করিতে পারিত অন্যথা ঘটলে জমিদার তাহাকে ইচ্ছামত উচ্ছেদ করিতে পারিতেন। জমিতে তাহার যত বৎসরের দখল হউক না কেন তাহার কোন সত্ত্ব বা অধিকার জন্মাইত না এবং জমিদারের বিনা অনুমতিতে কোনপ্রকার হস্তান্তর করিতে পারিত না। প্রজা কোন অন্যায় করিলে তাহার বিচার করিতেন জমিদার। এই ত' গেল মুসলমানের রাজত্বকালের কথা। হিন্দুদিগের রাজত্বকালে জমিদারগণের উৎপত্তি হয় নাই। তখন ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজত্বে পূর্ণ ছিল। প্রত্যেক রাজত্বের রাজা নিজ নিজ রাজ্যের জমির মালিক ছিলেন। সে সকল কথা যাউক, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় জমির মালিক যে জমিদার এই বিষয় ঘোষণাপত্র দ্বারা সকল লোককে জ্ঞাত করা হইয়াছিল। আরও বলা যায় যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে জমিদারদিগকে জমির হস্তান্তরের প্রয়োজন হইলে কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারের নিকট হইতে নামমাত্র অনুমতি লইতে হইত কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে আর কোন বাধা বিঘ্ন রহিল না। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এককালে জমিদারগণ জমির মালিক ছিলেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, জমিদারদিগের সেই মালিকানা সত্ত্ব আজও আছে অথবা তাহাদের শক্তির কোন অংশের হ্রাস হইয়াছে।

উক্ত বিষয় বিচার করিতে হইলে আমাদের প্রজাস্বত্ব আইনগুলির ভালভাবে খুঁটিয়া আলোচনা করিতে হইবে। ইং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে প্রজাস্বত্ব আইন প্রচার হয়। এই আইন বলে দ্বাদশ বৎসর দখলের ফলে প্রজা জমিতে দখল অধিকার পাইয়া থাকে। প্রজাকে এইরূপ স্বত্ব দেওয়ার ফলে জমিদারের মালিকানা সত্ত্বের কিঞ্চিত হ্রাস হইয়া থাকে। তখনও কিন্তু কোন প্রজার জমির হস্তান্তর করিবার কোন ক্ষমতা ছিল না বা অন্যথা চুক্তি থাকিলে দখল করিবার স্বত্ব লাভ করিতে পারিত না। খাজনা বাকী পড়িলে জমিদার প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে পারিতেন। তাহার পরে মধ্যে মধ্যে প্রজাস্বত্বের যে যে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহাতে বিশেষ লক্ষ্য করিবার কিছুই নাই।

ইং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের যে-যে পরিবর্ত্তন হয় তাহার দ্বারা জমিদারগণের প্রভুত্ব অর্থাৎ মালিকানা সত্ত্বের অনেক ক্ষতি হয় এবং প্রজার অধিকার অনেক অংশে বৃদ্ধি পায়, যথা—জমিদার ও প্রজার মধ্যে চুক্তিমূলে আইনের কোন প্রকার অন্যথা করা সম্ভব রহিল না। ঐরূপ সকল চুক্তি আইনের চক্ষে বাতিল ও নামঞ্জুর হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বার বৎসর দখলের পর প্রজা জমিতে দখল অধিকার পাইত কিন্তু জমিদারের সহিত অন্যথা চুক্তি থাকিলে সে এইরূপ অধিকার হইতে বিচ্যুত হইত। কিন্তু বর্ত্তমান আইন প্রচলিত হওয়ার পর সে-উপায় আর রহিল না। আরও দেখা গেল যে, প্রজা তখন হইতে জমিদারকে কিঞ্চিৎ সেলামী দিয়া জমি হস্তান্তর করিবার অধিকার পাইল জমির ভোগদখল ব্যাপারে প্রজার সম্পূর্ণ অধিকার জন্মাইল বৃক্ষনির্ম্মাণ, বৃক্ষচ্ছেদন, পুষ্করিণী খনন ব্যাপারে দখল অধিকার একবার লাভ করিলে প্রজার আর কোনপ্রকার বাধাবিঘ্ন রহিল না। চুক্তি দ্বারা জমিদার প্রজাকে আর কোনরূপে আটক করিতে পারিতেন না। খাজনা বৃদ্ধি সম্বন্ধ তদ্‌কালীন এই আইন হইল যে, জমির খাজনা যতই কম হউক না কেন আর সে-জমি হইতে প্রজার আয় যতই হউক না কেন জমিদার প্রতি ১৫ বৎসর অন্তর টাকায় ৶০ দুই আনার বেশী বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। কোর্ফা ব্যতীত অন্য কোন প্রজাকে জমি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, ইং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে প্রজাস্বত্ব আইনের পরিবর্ত্তন ফলে প্রজার জমির উপর, অধিকার জমিদার অপেক্ষা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিল। জমিদার নামে মাত্র মালিক রহিলেন। কিন্তু এই ব্যাপার এইখানে শেষ হইল না। ইং ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে প্রজাস্বত্ব আইনের পরিবর্ত্তনের ফলে জমিদারগণের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রজাকে আর জমির হস্তান্তর দরুণ কোন সেলামী দিতে

হয় না; পূর্ব্বে জমিদার ইচ্ছা করিলে প্রজার স্বত্ব কিনিয়া লইতে পারিতেন। তাহাতে তাহার কোন অমনোনীত ব্যক্তি তাহার প্রজার নিকট হইতে জমি খরিদ করিয়া তাহার জমিদারীর মধ্যে আসিতে পারিত না। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের পর আর জমিদারের উক্ত ক্ষমতা নাই। প্রজা ইচ্ছা করিলে তাহার জমি বা তাহার কোন অংশ তাহার মনোমত যে কোনও ব্যক্তিকে দানবিক্রয়াদি করিতে পারে। এ-বিষয়ে জমিদারের তরফ হইতে কোন ওজর আপত্তি করিবার কিছু নাই। এমন কি অনেকে জমিদারের আপত্তির বিরুদ্ধে নানারূপ ব্যাভিচারের সহিত জমি দখল করিতেছে। বলিবার বা করিবার কিছু নাই যে-হেতু আইন তাহাদের সপক্ষে। এখন প্রজারা ইচ্ছা করিলে খারিজ দাখিল, নামপত্তন, জমি জমা বিভক্ত করা প্রভৃতি ব্যাপারে আইন বলে জমিদারগণকে বাধ্য করিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে গ্রামের সকল পতিত জমি, পুষ্করিণী প্রভৃতির অধিকার দাবি করে। বলপূর্ব্বক বৃক্ষচ্ছেদন করে, পতিত জমির উপর যে-সকল গাছপালা জন্মায় তাহা কাটিয়া লয়। জমিদারের আপত্তি চলে না কারণ গভর্ণমেণ্ট প্রজার পক্ষে, আইনও তাহার দিকে আর গ্রামের পুলিশের ত' কথাই নাই। ন্যায্য খাজনা দেওয়াকে অনেক প্রজা দাতব্য মনে করে। জমিদারের তরফ হইতে পাইক বা দারোয়ান তাগাদা করিতে আসিলে অনেকে উত্তর দেয়—"জমি চাষ করে পরিষ্কার রেখেছি এই যথেষ্ট খাজনা আবার কি?" পূর্ব্বে বাকি খাজনার উপর কিস্তি খেলাপি সুদ শতকরা ১২৷৷০ টাকার প্রথা ছিল কিন্তু বর্ত্তমানে সুদের হার অতিমাত্রায় কম হওয়াতে প্রজার আর ঠিকমত খাজনা দিবার চাড় নাই। তাহা ছাড়া বর্ত্তমানে যে ডেট্ সেটেলমেণ্ট বোর্ড হইয়াছে তাহার সাহায্যে প্রজা জমিদারকে তাহার ন্যায্য খাজনা আদায় করিতে যথেষ্ট হায়রান করিয়া থাকে। প্রজাই বাদী জমিদার প্রতিবাদী (অপরাধী)। এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে মনে হয়—জমির মালিক আর জমিদার নাই—প্রজা হইয়াছে।

মধুপর্ক

শুকতারা

[দুই বন্ধুতে ইডেন গার্ডেনে বসিয়া]

সুধীর। একি! কাপড়ে যে বেজায় তালি লাগিয়েছ।

নরেশ। আর কি করি, উপায়। কাপড়ের দাম যেমন Geometrical progression এ বেড়ে চলেছে তাতে permutation combination করে পরা ছাড়া আর উপায় নেই। সেবাইত হ'য়ে লক্ষ্মী জনার্দ্দনের কৃপায় এতদিন চলছিল মন্দ নয়, কিন্তু আতপতণ্ডুলের উষ্ণতা যেমন বেড়ে চলেছে, তাতে ঠাকুরের ভোগের প্রসাদও কমে যাচ্ছে। এইরূপ চাউলের সঙ্গে অহর্নিশ লড়াই করে কি আর সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করা সম্ভব!

সুধীর। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যে ষ্টাণ্ডার্ড ক্লথ (standard cloth) বের করল তার কি হল?

নরেশ। অনেকদিন থেকেই ত' শুনে আসছি তা, অঙ্গে ধারণ করার সৌভাগ্য ত' আর হল না।

সুধীর। কাপড়, এবার তা হলে লোককে বল্কলধারী না করিয়ে ছাড়বে না।

নরেশ। আমি একটা প্ল্যান ঠিক করে রেখেছি, বড় হরপের একটা রবার ষ্টাম্প তৈরী করাব। দশহস্তমিত বস্ত্রখণ্ডকে Standard measurement অনুসারে চারখণ্ড করিয়া লইব এবং প্রত্যেক বস্ত্রখণ্ডে 'Standard Cloth' এই ছাপটী লাগাইয়া লইব। B. A. পাশ ডিগ্রির মত কে-না ছাপটীর সমাদর করিবে? এই Privileged ছাপ লাগান কাপড় পরিধান করিয়া যথা-ইচ্ছা-তথায় নির্ভয়ে বিচরণ করা যাইবে। রন্ধনশালা থেকে আরম্ভ করে নেমন্তন্ন, অফিস, কাচারী, রাজদরবার পর্য্যন্ত এই ছাপের মহিমায় যাতায়াত চলিবে।

সুধীর। বাঃ বাঃ! তুমি যে দেখছি Economics এর একটা মস্ত বড় Prodigy।

[জনসভায়]

A.R.P. Instructor। বিমান আক্রমণের সময় সন্নিকটবর্ত্তী যে কোন shelterএ আশ্রয় লইবেন; কেহ যদি রাস্তায় কিংবা মাঠে থাকেন তবে নিকটস্থ slit trench-এ আশ্রয় নেওয়া সব চেয়ে নিরাপদ।

জনৈক সভাসদ্। কিন্তু স্যার, slit trenchএর যা অবস্থা, সেখানে flit machine বসান না থাকলে আশ্রয় নেওয়া মোটেই নিরাপদ নয়; কেননা মাঝে মাঝে সূক্ষ্ম চতুষ্পদের আক্রমণে springএর মত লাফিয়ে উঠবার সম্ভাবনা খুব বেশী।

বর্ত্তমান যুগের পরম প্রয়োজনীয় পদার্থপুঞ্জের অন্যতম 'কাগজ'। সুদূর অতীতে তিনটি দেশ সভ্যতার অত্যুচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বিশ্বসভ্যতায় এই দেশত্রয়ের দান অতুলনীয় ও চিরস্মরণীয়। এই তিনটি দেশ ভারত, সুমের ও মিশর। এই তিনটি দেশেই বৃক্ষপত্র কাগজের কাজ সাধন করিত। ভারতে নিবিড় অরণ্যজাত ভূর্জ্জ নামক একপ্রকার বৃক্ষের ত্বক্, মিশরে পেপাইরাস নামক নলজাতীয় জলজ উদ্ভিদের ছাল এবং সুমেরে 'লেবার' নামধারী একপ্রকার বৃক্ষবল্কল লিখনকার্য্যে ব্যবহৃত হইত।

হিমাদ্রির পাদদেশে প্রসারিত নিবিড় বনানীগুলিতে ভূর্জ্জবৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মায় এবং এই বৃক্ষের ছাল সহজেই শুকাইয়া বৃক্ষচ্যুত হয় বলিয়া তপোবনবাসী ঋষিগণ ইহাকেই লিখনকার্য্যে ব্যবহারের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী মনে করিয়াছিলেন। ভূর্জ্জবৃক্ষের ভৈষজ্যগুণও অসাধারণ। ভূর্জ্জবল্কল ভূতাবেশ-নিবারক বলিয়া কথিত। ভূর্জ্জপত্র (এখানে পত্র বলিলে বল্কলই বুঝাইতেছে) ধারণ করিলে ভূতের ভয় থাকে না এবং কোন অপদেবতা পূর্ব্ব হইতেই কাহাকেও আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিলে ভূর্জ্জ-ত্বকের কবচ ব্যবহারে সেই ব্যক্তি বিপন্মুক্ত হইতে পারে—প্রাচীন পুস্তকে এইরূপ ব্যবস্থা দেখা যায়। সংস্কৃত ভাষা কিরূপ সমৃদ্ধ এবং ভূর্জ্জবৃক্ষ ভারতবাসীর জীবনে কি প্রকার প্রভাব প্রসারিত করিয়াছিল তাহা এই বৃক্ষের বহুসংখ্যক আখ্যা দ্বারা প্রমাণিত। ইহার সাতাশটি নাম আমাদের জানা আছে। 'ভূতঘ্ন' এই সপ্তবিংশ নামের অন্যতম। প্রেতাদির কুদৃষ্টি হইতে রক্ষা করে বলিয়া ইহার আর একটি নাম 'রক্ষাপত্র'। এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, ভূর্জ্জপত্র দীর্ঘকাল ধরিয়া কাগজের কাজ করিয়াছিল। আমরা বহু দেশের বহু উদ্যানেও ভূর্জ্জবৃক্ষ জন্মিতে দেখিয়াছি। শুষ্ক বল্কলখণ্ডগুলি বৃক্ষচ্যুত হইয়া তলদেশে পতিত থাকার দৃশ্যও আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। ভূর্জ্জপত্রে লেখা প্রাচীন পুঁথি এখনও অনেকের গৃহে রক্ষিত আছে। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের লেখা এইরূপ গ্রন্থ রক্ষিত থাকার কথাও আমরা জানি।

ভূর্জ্জপত্রে লেখার প্রথা খৃষ্টাবির্ভাবের তিন হাজার বা চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত হওয়া অসম্ভব নয়। ভারতের আদি ভাষা সংস্কৃতের অক্ষরশ্রেণী বা বর্ণমালা-বিন্যাস-কৌশলের পরিচয় প্রদান করিতেছে। এরূপ বিজ্ঞান-সম্মত বিন্যাস অন্য কোন দেশের ভাষাতে দেখা যায় না। লিখন ব্যতিরেকে এরূপ বিন্যাস সম্ভব নয়। ভারতে আরও পরবর্ত্তীকালে তালপত্রে লেখার প্রথা প্রচলিত ছিল। কাগজ প্রবর্ত্তিত হইবার পরেও পল্লীগ্রাম অঞ্চলের পাঠশালার ছাত্রগণ তালপত্রে লিখিত। ছাত্রদের পাত-তাড়ি বগলে পাঠশালায় যাওয়ার দৃশ্য আমরাও শৈশবে দেখিয়াছি। এ-দেশে তাল-পাতার পুঁথি এখনও অনেক আছে। খৃষ্টীয় নবম শতকের লেখা একখানি তালপাতার পুঁথি নেপালে আবিষ্কৃত হয়। আমরা নেপালে ভ্রমণকালে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তক দেখিয়াছি। ইহাদিগের কতকগুলি তালপত্রে লিখিত, অন্যগুলি হস্তপ্রস্তুত কাগজে লেখা। তালপত্রে লেখা প্রাচীন পুস্তকাবলীর মধ্যে নেপালে প্রাপ্ত নবম শতকের ঐ পুঁথিখানি প্রাচীনতম বলিয়া বিবেচিত। যত প্রকার পত্র আছে তাহার ভিতর তালপত্রই দীর্ঘতা ও দৃঢ়তার জন্য লিখনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। ইহা সহজে ছেঁড়ে না এবং কীটদ্বারা কর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনাও কাগজ অপেক্ষা কম।

যখন ভূর্জ্জবৃক্ষের বল্কলের সাহায্যে ভারতবর্ষের অতুলনীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত রাখিবার চেষ্টা ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতেছিল তখন প্রতীচ্য সভ্যতার প্রথম পথপ্রদর্শক মিশরবাসীরা পেপাইরাস নামক একপ্রকার নলজাতীয় ও জলজাত উদ্ভিদের ছালগুলিকে পরস্পর সংলগ্ন করিয়া তাহাদের সহায়তায় ঐ দেশের বিচিত্রকায় দেব-দেবীদের গুণগরিমা প্রচার করে। পেপাইরাসের ছালগুলি পরস্পর সংলগ্ন হইয়া একপ্রকার কাগজাকার পদার্থে পরিণত হইত সন্দেহ নাই। এই পদার্থ 'পেপাইরি' আখ্যায় অভিহিত হইত। এই ছালে এক প্রকার আঠাবৎ দ্রব্য থাকার জন্য সামান্য জল ছালগুলির প্রান্তভাগে লাগাইলে উহারা সত্বর পরস্পর সংলগ্ন হইয়া পড়িত। যেমন ভারতের তপোবনবাসী ঋষিরাই ভূর্জ্জপত্রের ব্যবহার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তেমনই মিশরের দেব-পূজক বা ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ই পেপাইরি প্রস্তুত-প্রণালীর প্রকৃত তথ্য বা রহস্য জ্ঞাত ছিলেন। দেশের সাধারণ জনগণ উহা অবগত ছিল না। গ্রীক ও রোমানরা বহু কষ্টে বা চেষ্টায় সেই তথ্য জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইয়াছিল। তাহারা পেপাইরি প্রস্তুত রহস্য শিখিয়া এই জাতীয় উদ্ভিদ্ গ্রীসে ও রোমে আমদানী করিতে আরম্ভ করে। পেপাইরি হইতেই 'পেপার' শব্দের উদ্ভব সে-বিষয়ে সংশয় নাই। আমরা গ্রীকগণের লিখিত গ্রন্থ হইতেই পেপাইরির বিচিত্র বৃত্তান্ত জানিতে পারি। হেরেটিকা আখ্যায় অভিহিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট পেপাইরির উপর লিখনকার্য্য অতি সুন্দররূপে সম্পাদিত হইত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সুমেরে বা প্রাচীন ইরাকে এক রকম গাছের ছাল লিখন-কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। এই ছালের নাম 'লেবার'। কিন্তু প্রাচীন ইরাকে বাক্যকে লিপিবদ্ধ করিবার আর এক প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এমন কি, এই প্রণালীতে পুস্তক পর্য্যন্ত প্রণীত হইত। এখন জগৎ জুড়িয়া কাগজ যে কাজ করিতেছে সুমেরে—বাবিলোনিয়ায় ও

আসীরিয়ায় ইষ্টকের দ্বারা সেই কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত। প্রথমে কাঁচা ইটের গায়ে অক্ষরগুলি উৎকীর্ণ করা হইত এবং পরে সেই ইঁটগুলি পুড়াইয়া নেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। এক একখানি পুস্তক ছিল সেই হরফ-লিপি-বিশিষ্ট বহু ইষ্টকের সমষ্টি। তাইগ্রীস-তীরে অবস্থিত নিনেভেনগারের ধ্বংসাবশেষ দর্শনের সময় এইরূপ অদ্ভুত গ্রন্থ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কলমের পরিবর্ত্তে সূচির ন্যায় একপ্রকার সূক্ষ্মাগ্র পদার্থের দ্বারা অপক্ক ইষ্টকের গাত্রে অক্ষর খোদাই করার নিয়ম প্রবর্ত্তিত ছিল। উর নামক নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও আমরা এইরূপ লিপি দেখিয়াছিলাম। কাগজের পরিবর্ত্তে কর্দ্দমের উপর লিখিত এই সকল পুস্তকের বয়স প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বৎসর। এইরূপ লিখন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল সুমেরিয়ানগণ এবং উহার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল আসীরিয়ানদিগের দ্বারা। এইরূপ লিখনকার্য্যে যেরূপ অক্ষর ব্যবহৃত হইত তাহাও বিচিত্র রকমের। এই বিচিত্র বর্ণমালাকে চিত্রলিপি আখ্যায় অভিহিত করা হয়। সুমেরিয়ানরা 'কিউনিফর্ম্ম' নামক চিত্রাক্ষর প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। ঠিক এইরূপ না হইলেও আর একশ্রেণীর চিত্রলিপি মিশর দেশে প্রচলিত ছিল। মিশরীয় চিত্রলিপি হায়রোগ্লিফক আখ্যায় অভিহিত। ইহাতে নানাপ্রকার পশুপক্ষীর চিত্র অক্ষরের কার্য্য সাধন করিত। শুধু পশ্চিম এশিয়ায় ও পূর্ব্বোত্তর আফ্রিকায় নয়, আজটেক ও মায়া সভ্যতার লীলাস্থলী মধ্য-আমেরিকাতেও চিত্রলিপির প্রচলন ছিল। পশুপক্ষীর আলেখ্য অঙ্কিত করিয়া মনোভাব প্রকাশ করা সুদূর প্রস্তর-যুগের স্মৃতি বহন করিতেছে। প্রস্তরযুগের নরনারী গুহা-গৃহগুলির গাত্রে এইরূপ বহু চিত্তাকর্ষক চিত্র আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছে। ফ্রান্সের ফণ্ট-দ্য-গাউমে এবং স্পেনের আল্টামিরা নামক স্থানে গুহাগাত্রে অঙ্কিত যে সকল প্রাচীন চিত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে উহারা সত্যই অত্যাশ্চর্য্য। ঐ সকল চিত্র বিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বের বলিয়া পণ্ডিতরা মনে করেন। যাহারা সর্ব্বদা পর্ব্বতারণ্যে পশুপক্ষীর সাহচর্য্যে কাল কাটাইত তাহাদের পক্ষে বাস-স্থল গুহা-গৃহগুলির গাত্রে পশুপক্ষীর আকৃতি নৈপুণ্যসহকারে অঙ্কিত বা উৎকীর্ণ করা স্বাভাবিক এবং সেই চিত্রগুলির দ্বারা মনোভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টাও স্বভাব-সম্মত।

ভূর্জ্জপত্র, পেপাইরাস বা ইষ্টক শিক্ষা বা বাণীর বাহনরূপে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয় নাই। অন্যান্য দেশে অন্যান্য উপায় অব-লম্বিত হইয়াছে। এ বিষয়ে ইরাণ বা পারস্যদেশ অনেকটা ইরাককে অনুসরণ করিয়াছে। তবে ইরাণীয় বর্ণমালা ও ভাষার ভিতর আমরা ভারতীয় বর্ণমালা ও ভাষার অনুরূপ উৎকর্ষের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকি। পারস্যের প্রাচীন রাজধানী পার্সিপলিসের ধ্বংসাবশেষের বক্ষে গিরিগাত্রে উৎকীর্ণ ক্ষ রোস্থি'ভাষায় যে লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে সেগুলির ভার-তীয় ভাষার সহিত সাদৃশ্য অস্বীকার করা যায় না। পাথরের দ্বারা কাগজের কাজ সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে সাধিত হইয়া আসিতেছে। পাথরের গায়ে উৎকীর্ণ বাণী প্রকৃতির সহস্র অত্যাচার সহ্য করিয়া দীর্ঘকাল অবিকৃত থাকিতে পারে। পুরাতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতদের চেষ্টায় ভারতবর্ষে প্রাচীন শিলালিপি বিস্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল শিলা-লিপির ভিতর সম্রাট অশোকের আদেশে উৎকীর্ণ লিপিগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাক্-বৌদ্ধযুগের শিলা-লিপিও স্থানে স্থানে পাওয়া গিয়াছে। পাঞ্জাবের হারাপ্পায় এবং বিহার প্রদেশের রাজগৃহে আবিষ্কৃত শিলালিপি প্রাক্-বৌদ্ধযুগের না হইলেও অশোকের পূর্ব্ববর্ত্তী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শিলাফলকের পর ধাতুনির্ম্মিত পাতে লিখিবার প্রথার প্রবর্ত্তন হয়। বুদ্ধির বিকাশ ও সভ্যতার প্রসারের সহিত মানুষ তাহার অন্তরে-কন্দরে উৎসারিত ভাব-নির্ঝরকে লিপিবদ্ধ করিবার যোগ্যতর উপায় খুঁজিতে খুঁজিতে অবশেষে কাগজ আবিষ্কার করিয়া পূর্ণকাম হইয়াছে বলিলে ভুল হয় না। কাগজের কাজ শিলাখণ্ড অপেক্ষা তামা বা পিতলের পাতলা পাতে অধিক সুবিধাজনক ভাবে সাধিত হইতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রাচীনকালে তাম্রপাতে বাক্য লিপিবদ্ধ করার প্রথা আমাদের দেশেও প্রচলিত ছিল। এগুলিকে তাম্রলিপি বলা হইয়া থাকে। তাম্রপাতে রাজাদেশ লিপিবদ্ধ হইলে তাহাকে তাম্রশাসন নাম দেওয়া হইত। বহু তাম্রশাসন ভারতের নানাস্থানে পাওয়া গিয়াছে। ইটালীতে তাম্রপাতের পরিবর্ত্তে পিত্তলপাত ব্যবহৃত হইত এবং সময়-বিশেষে লিপিকার্য্যে সীসার পাতও ব্যবহৃত হইতে দেখা যাইত। রোমের বিশ্ববিখ্যাত ব্যবস্থাবলী পিত্তলপাতে লিখিত হইয়াছিল। হেসিয়াদের রচনাবলী সীসার পাতে লিখিত হইয়াছিল। রোম সম্রাট ভেস্পেসিয়ানের শাসনকালে যে প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ড সঙ্ঘটিত হয় তাহাতে প্রায় তিন হাজার লিপিবিশিষ্ট পিত্তল পাত নষ্ট হইয়াছিল। ডক্টর বুকানন সিরিয়ার একটি প্রাচীন খৃষ্টীয় মঠে উৎকীর্ণ-লিপিবিশিষ্ট ছয় খানি মিশ্র-ধাতু-প্রস্তুত পাত আবিষ্কার করেন।

হিন্দুরা চর্ম্মকে চিরকালই অপবিত্র মনে করিয়া থাকে বলিয়া চামড়ার উপর লেখার প্রথা ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। অবশ্য চর্ম্মের ভিতর অজিন বা মৃগচর্ম্ম এবং কৃত্তি বা ব্যাঘ্র-ছাল পবিত্র বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে বটে কিন্তু উহারা বসিবার আসনরূপেই চিরকাল ব্যবহৃত হইয়াছে, লিখনকার্য্যে উহাদের ব্যবহার কখনও দেখা যায় নাই। ভারতবর্ষের পশ্চিমে প্রসারিত ইসলামীয় সংস্কৃতি ও খৃষ্টীয় কৃষ্টির লীলাস্থলী দেশগুলিতে লিপিকার্য্যে চর্ম্মের ব্যবহার এক সময়ে প্রবর্ত্তিত

ছিল। সেন্ট-মার্কের সুসমাচার মেষ-চর্ম্মের উপর প্রথমে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। গ্রীস দেশেও চামড়ার উপর লিখিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। অনেকে শুনিলে বিস্মিত হইবেন, মহাকবি হোমারের ইলিয়দ এবং ওদেসি নামক মহা-কাব্যদ্বয় সর্পচর্ম্মের উপর প্রথম লিখিত হয়। পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে নানাপ্রকার প্রাণীর চামড়ার উপর লিপিবদ্ধ করিয়া রাজাদেশ এবং প্রবর্ত্তিত বিধি-ব্যবস্থা বা আইন-কানুন প্রচার করিবার প্রথা বহুকাল চলিয়াছিল। এইরূপ ব্যবহারের উপযোগী উৎকৃষ্ট চামড়াকে 'ভেলাম' আখ্যায় অভিহিত করা হইত। কাগজ প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে লিখন-কার্য্যে ভেলামের ব্যবহার ক্রমশঃ বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। তবে পার্চ্চমেন্ট আখ্যায় অভিহিত প্রায়ই কাগজের অনুরূপ চর্ম্মজাত পদার্থ লিখন-কার্য্যে আজও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। কাগজ অপেক্ষা অধিককাল স্থায়ী হইবে বলিয়া বিশেষ মূল্যবান্ দলিলাদি পার্চ্চমেন্টে লেখার প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। উৎকৃষ্ট পার্চ্চমেন্ট-পেপার ছাগশিশু ও মেষ-শাবকের চর্ম্মে প্রস্তুত।

যেমন ভারতবর্ষের পশ্চিমস্থ ইসলামীয় ও খৃষ্টীয় দেশ-গুলিতে লিপি-কার্য্যে চর্ম্মের ব্যবহার প্রচলিত ছিল তেমনই, ভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রধান রাষ্ট্রসমূহে লিখন ব্যাপারে কাষ্ঠ ব্যবহার হইত। সাধারণতঃ কাঠের উপর অক্ষরগুলি ক্ষোদাই করাই নিয়ম ছিল। ব্রহ্মদেশে কাঠের উপর লিখিবার প্রথা এখনও দেখা যায়। হাতীর দাঁতের উপর লিখিবার প্রথাও ব্রহ্মদেশে দৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের মধ্যে কাষ্ঠফলকের উপর লিখিবার প্রথা একমাত্র গ্রীসে প্রচলিত ছিল। লিখনকার্য্যে হস্তীদন্তের ব্যবহার গ্রীসেও প্রবর্ত্তিত থাকার কথা আমরা জানিতে পারি। সোলন প্রণীত ব্যবস্থাবলী কতিপয় কাষ্ঠখণ্ডের উপর লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। কোন কোন দেশে সময় বিশেষে বস্ত্রখণ্ড কাগজের কাজ করিয়াছে। বিখ্যাতনামা রোম্যান লেখক প্লিনি প্রাচীনকালে কাপড়ের উপর লিখিবার প্রথা প্রচলিত থাকার কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন। মধ্য-এশিয়ায় আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষের ভিতর সচিত্র বস্ত্রখণ্ড সার অরেল ষ্টীন প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(ক্রমশঃ

হারাধন (গল্প)

শ্রীপ্রবোধ ঘোষ

ছোট ছেলেটাকে দেখা এবং এমনিভাবের এটা-ওটা-সেটা করবার জন্য নিধেকে রাখা হয়েছিল। বড় দুই ছেলে ও মেয়েই এতদিন ঐসব হাল্কা কাজ করছিল, কিন্তু সম্প্রতি তা'দের দু'জনকেই স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দেওয়ার পরে নানা অসুবিধা হচ্ছিল নানাদিকে। হাতের কাছে পেয়ে তাই নিধিরামকে বহাল করা হ'য়ে গেল।

নিধিরাম ছেলেমানুষ—রবির সমবয়সী। মা তার কিছু-দিন আগে আমাদের বাড়ীতেই বাসন মাজার ঠিকে কাজ করত এবং কাছেই একটা বাড়ীতে খাওয়া-পরার কাজ পেয়ে সেখানে চ'লে গিয়েছে। গৃহিণীকে ধ'রে পড়েছিল সে তার ছেলের একটা উপায় ক'রে দেবার জন্য।

বেশ চালাক-চতুর ছোকরা নিধিরাম। কাজ অবশ্য সে ঠিকমত করে না, কারণ খেলা করবার বয়স তার এখনো পেরোয় নি; এতে বেশ বুঝতে পারা যায় যে, কাজকেও সে খেলার মত ক'রে নিতে চায়। কোন কাজই সে তাড়াতাড়ি ক'রে করে না এবং দেরী হয় তার সব কাজেই। আর হবেই বা না কেন? ঘর ঝাঁট দিতে গিয়ে যদি সে বড় আরশি-খানার সামনে দাঁড়িয়ে মুখভঙ্গী করতে থাকে বা জামাকাপড় সব আন্‌লায় সাজিয়ে রাখবার সময়ে হারমোনিয়ামটার পাশে যদি সে দাঁড়িয়ে ভাবে এবং একফাঁকে যদি সে তার পর্দ্দাগুলো টিপে দিয়ে পালায়, তা' হ'লে কাজ করতে দেরী হবে না তা'র? তার ওপরে হাতের কাছে একটা পেন্সিল বা কলম পেয়েছে কি লিখতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে—অ, আ, ক, খ, এবং ঘরের মেঝেয় বা দেয়ালের গায়ে তার শ্রীহস্তের অক্ষর এখনো কোথাও কোথাও উঁকি দিচ্ছে—মুছে ফেলা যায়নি তাদের কিছুতেই। আরও একটা লক্ষ্য করছি এই যে রবির বই নিয়ে সে নাড়াচাড়া করে মাঝে মাঝে একবার রবিকে বলে, ঐ সব বইএর গল্প তাকে বলবার জন্য।

মোটের উপর তা'হলেও নিজের কাজ সে করে, যদিও প্রায় সময়েই দেরী করে সে ঐ কাজ করতে। মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে উঠতে হয় তার ওপরে কিন্তু অন্যায় কিছু করবার জন্য তাকে বকলে এমনিভাবে সে চায় মুখের দিকে যে অতঃপর শক্ত কোন কথা তাকে বলা অত্যন্ত শক্ত হয়ে ওঠে।

মার তার ইচ্ছা যে, ছেলে লেখাপড়া শেখে। তার ভাব-গতিক দেখেও মনে হয় যে লেখাপড়া শিখতে চায় সে। তার জন্য তাই সেলেট পেন্‌সিল বই কিনে দেওয়া হল এবং একটা সময়ও ঠিক করে দেওয়া হল তার পড়ার জন্য যে সময় কোন কাজ করতে কেউ আমরা তাকে ডাকব না।

দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছিল এবং দিনে দিনে বাড়ীর একজন হয়ে উঠছিল অগোচরে।

মাসখানেক কাজ তার তখনো হয় নি তেমনি একটা সময় একদিন আমি আপিস থেকে ফিরলে আমার জন্য চা তৈরি করতে গিয়ে গৃহিণী দেখলেন যে চিনি নেই। নিধেকে ডেকে তার হাতে পয়সা দিয়ে তখনই তিনি তাকে দোকানে পাঠিয়ে দিলেন এবং বলে দিলেন যে এক দৌড়ে সে যায়। সম্ভবতঃ এক দৌড়েই সে গিয়াছিল এবং কি ভাবে ফিরবে সে বিষয় স্পষ্ট নির্দ্দেশ না থাকার জন্যই ফিরতে দেরী হচ্ছিল। দেরীটা কিন্তু বড্ড বেশী বোধ হচ্ছিল কারণ ফুটন্ত জল বরফ হয়ে গেল তবু সে ফিরল না।

সেদিন আর সে ফিরলই না—দিনেও না—রাত্রেও না। কি তার হ'ল খবর নেবার জন্য কিছু ছুটাছুটি করতে হল এবং থানায় খবর নিয়ে জানা গেল যে ঐ বয়সের কোন ছেলের সম্পর্কে দুর্ঘটনার কোন খবর এখনো সেখানে পৌছায় নি। কতকটা ভাবনা গেল বটে, কিন্তু একেবারে নির্ভাবনা হতে পারা গেল না। কি হল ছেলেটার? কোথায় গেল সে?

পরের দিন সকালেও সে এল না দেখে তার মাকে খবর দেওয়া হল। মা তার উদ্বিগ্ন হ'ল কিন্তু বলল যে, ঐ ওর দোষ। আছে বেশ কিন্তু কখন যে ওর মাথায় পোকা নড়ে উঠবে তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই এবং একবার পোকা নড়লে—ইত্যাদি।

বিকেলে তার মা এসে বলে গেল নিধে ফিরেছে এবং কাল সকালে কাজে আসবে। তাকে জিজ্ঞেসা করে জানা গেল যে, বাজারে যে বারোয়ারি যাত্রা হচ্ছে সমস্ত রাত সেই যাত্রা সে শুনেছে কাল। ঐ যাত্রার উদ্যোগ সকালে বাজার করবার সময়ই দেখে এসেছিলাম কিন্তু কেমন করে বুঝব যে নিধে যাত্রা শুনছে ঐখানে বসে? আর জানলেই বা ঐ লোকারণ্যের মধ্যে থেকে তাকে খুঁজে বার করত কে?

পরের দিন সকালে কিন্তু নিধিরাম এল না—তার মা এসে অনেক দুঃখ করে গেল তার ছেলের তার ছেলেমানুষীর জন্য এবং বলে গেল যে রাত জেগে ঠাণ্ডা লাগিয়ে না খেয়ে শরীরটা তার বে-এক্তিয়ার হয়েচে একটু এবং সে ভাব কাটলে কাল সকাল থেকে সে কাজে লাগবে এসে।

যখন সে ছিল না, তখন ছিল না; কিন্তু এখন সে নেই বলে নানা অসুবিধে হচ্ছে নানাদিকে। বরং মন গৃহিণীর তেতে উঠছে সময়ে অসময়ে কারণে অকারণে।

নিধের মা চলে যাবার পর ডাকপিওন একখানা মণি-অর্ডার নিয়ে এল এবং সেখানা সই করে নেবার জন্য রবিকে তার কলমটা নিয়ে আসতে বললাম, রবি কলম নিয়ে এল, কিন্তু সে তার নয় আমার কলম। দামী কলমটা নাড়াচাড়া করতে কখন হয় ত' পড়ে যাবে তার হাত থেকে তাই রবিকে বারণ করে দিয়াছিলাম আমার কলমটায় হাত দিতে। সেই কলম আমার হাতে দিয়ে নিজের কৈফিয়তে সে বলল যে, কলমটা তার খুঁজে পেলে না সে। কথাটা শুনে গৃহিণী বললেন যে ও নিশ্চয়ই নিধের কাজ—কলমটা নিয়ে ভেগেছে ছোঁড়া—যাত্রা শোনাটোনা সব ছুতো। রবিকে জিজ্ঞাসা করতে সে ঠিক করে বলতে পারল না যে কোথায় সে তার কলমটা রেখেছিল, তবে সে বলল যে নিধে যেদিন থেকে আসছে না সেইদিন সকালে সে লিখেছিল তার কলমটা দিয়ে এবং তারপর আর কলমটার কোন খোঁজ করে নি সে দু'দিন।

দামী কলম সেটা নয়। তার মামা রবির জন্মতিথিতে কলমটা তাকে দিয়েছিলেন। খুব ভাল না হলেও কলমটা দেখতে ভালই ছিল—নিজে পছন্দ করে কিনেছিল রবি তার মামার সঙ্গে গিয়ে। কলমটা না পেলে মনটা তার খারাপ হয়েছে বোঝা গেল। চারিদিকে খোঁজও করা হল কলমটার জন্য, কিন্তু পাওয়া গেল না সেটা!

সন্ধ্যারদিকে নিধের মা এসে বলল যে, নিধে আর কাজ করবে না। কথাটা বেশ ভাল শোনালো না—কেন কাজ করবে না কেন সে? গৃহিণীর অনুমানই কি তা'হলে সত্য?

কলমের কথাটা তখন নিধের মাকে বলা হল। দেখলাম কথাটা শুনে গম্ভীর হয়ে গেল তার মুখ—চোখ দিয়েও জল বেরিয়ে গেল ক্রমে। ব্যাপারটা তাকে বোঝাবার জন্য তখন বললাম যে, আমরা কেউ দেখিনি যে নিধে কলমটা নিয়েছে, কিন্তু কলমটা আমাদের হারিয়েছে এবং নিধে যেদিন থেকে কাজ করছে না সেইদিন থেকেই পাওয়া যাচ্ছে না কলমটা।

পরদিন সকালে তার মা নিধেকে সঙ্গে নিয়ে এল। কলমের কথা জিজ্ঞাসা করতে সে বলল যে, কলম সে নেয় নি। তার দিকে চেয়ে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হ'ল তার এই কথাটা, কিন্তু মনে হ'ল যে একটা মিথ্যা কথা বলা কিছুই অসম্ভব নয় ওর পক্ষে এবং আরো মনে হ'ল যে, অমন লোভনীয় একটা জিনিষ সুযোগ পেয়ে না নিয়েও থাকা সহজ নয় ছেলে-মানুষের পক্ষে। তার পাওনা থেকে কলমের দাম কেটে নেবার জন্য ব'লল নিধের মা এবং আরো ব'লল যে দাম ওর যদি বেশী হয় তা'হলে সে বেশীও সে দেবে—একবারে না পারে দু'বারে দেবে।

আমি তাকে ব'ললাম যে, কলমের দাম কেটে নেবার জন্য কোন কারণ নেই যেহেতু আমরা দেখি নি যে নিধে কলম নিয়েছে। কলমটা আমাদের হারিয়েছে এই মাত্র—আর হারিয়েছে কলমটা না কোণে কোণাচে পড়ে আছে তাই বা কে জানে?

অতঃপর নিধের পাওনা হিসাব করে তার মাকে দিয়ে দিলাম। সে গুণে সব নিয়ে যখন উঠছিল তখন আমি তাকে ব'ললাম, দেখ, নিধে যদি কাজ করতে চায় তা'হলে যেন আসে সে কাল পরশু যেদিন তার ইচ্ছা। আর যদি

কাজ করতে না চায় তা'হলে যেন একদিন এসে তার সেঁলেট পেনসিল বই সব নিয়ে যায়।

কপালে করাঘাত করে তার মা বলল, আর বাবা ছেলে যদি আমার চোরই হল তা হলে আর বই সেলেট দিয়ে কি হবে তার?

না না না ভুল বুঝো না তুমি আমি বলছিনে যে নিধে নিয়েচে কলমটা। আর তাই যদি আমি মনে করব তাহলে ওকে আবার রাখতে চাইব কেন? না না না ও চোর হবে কেন?

চোখ দিয়ে নিধের মার ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল কিন্তু কোন কথা সে বলল না। তার পর বারান্দার মেঝেয় মাথা ঠেকিয়ে সে আমাদের নমস্কার জানিয়ে ছেলের তার হাত ধরে চলে গেল সেখান থেকে চোখ মুছতে মুছতে।

দেখে শুনে মনটা আমার খারাপ হয়ে গিয়েছিল। চুপ করে বসেছিলাম তাই সেখানে অনেকক্ষণ। মনে করতে ইচ্ছে করছিল না যে কলমটা নিধে নিয়েছে কিন্তু—ঐ একটা কিন্তুও জাগছিল ঐ ভাবনার মধ্যে।

রবির ডাকে যেন চমকে উঠলাম। চেয়ে দেখলাম দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে, হাতে তার সেই কলম। জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় ছিল কলমটা?

দেরাজের মধ্যেই ছিল বাবা—ফাঁকে পড়ে গিয়েছিল খুঁজে পাইনি তাই সেদিন।

আজ বুঝি আবার খুঁজছিলি?

হাঁ, তুমি যখন নিধের মাকে বললে যে, হয় ত কোথাও পড়ে আছে কলমটা, তখনই মনে হল আমার যে ভাল করে খুঁজতে হবে এবং বইগুলো সব সরাতেই দেখলাম রয়েচে কলমটা। আমি চুপ করেই ছিলাম। রবি বলল আগেই ভাল করে খুঁজলে হত কলমটা, তা'হলে মনে হত না যে নিধে নিয়েছে ওটা।

কথা শুনে আমি তারদিকে চাইলাম এবং মুখের তখনকার তার সেই কাঁচুমাচু ভাব দেখে মন আমার ভরে উঠল নিমেষের মধ্যে এবং কোন কথা আমি বলতে পারলাম না রবিকে।

বর্ত্তমান ভারতের লৌহশিল্প

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

দেশের মধ্যে বিদেশী দ্রব্য আমদানী হইবার পরও নানা স্থানে লৌহশিল্পের কেন্দ্র ছিল। তাহার মধ্যে মধ্যপ্রদেশ হইতে প্রতি বৎসর ২,৪০০ হইতে ৫,০০০ টন (১৯০৫) সাল পর্য্যন্ত লৌহ নিষ্কাসিত হইত। ইহা ছাড়া মধ্য-ভারতের কয়েকটী করদ রাজ্যে এবং মহীশূরেও বহু পুরাতন 'লোহার' ছিল। বিহারে সাঁওতাল পরগণা ও মুঙ্গের, এবং উড়িষ্যা, মাদ্রাজের সালেম ও ত্রিচিনপল্লীতে, হায়দরাবাদ ও রাজপুতানা ও কুমাওন পর্ব্বত প্রদেশে কিছু কিছু শিল্প বাঁচিয়া আছে। মধ্য-প্রদেশের মধ্যে জব্বলপুর, রায়পুর ও মুণ্ডলা জেলা এ বিষয়ে প্রধান।*

ক্রমে বিদেশী প্রভাবে পড়িয়া ভারতের শিল্প প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতে চিরকাল কাঠ কয়লা দ্বারা লৌহ উদ্ধারের রীতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু জঙ্গল ক্ষয় পাওয়ার সহিত এক এক কেন্দ্র পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে এবং সময় সময় প্রচুর কাষ্ঠ যে স্থানে পাওয়ার সম্ভাবনা তথায় 'প্রস্তর' বহন করিতে হইয়াছে। ক্ষুদ্র শিল্পের পক্ষে এ ব্যাপার বহু ব্যয় ও সময়সাপেক্ষ। তাহা ছাড়া, রেল বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের দূর দূরান্তে বিদেশী লৌহ প্রবেশ করায় দেশায় শিল্পের জীবিত থাকা আর সম্ভব হইল না।

আধুনিক শিল্প—বাঙ্গলা

এখন হইতে ভারতবর্ষ নূতন কারখানার দিকে মনঃসংযোগ করিল। সাধারণতঃ ১৮৩০ সাল এবং মিঃ হীথ্-এর (J. M. Heath) নাম এই সম্পর্কে প্রথম বলিয়া উল্লেখ করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বীরভূমের অধিবাসী ইন্দ্রনারায়ণ শর্ম্মা এই পথের প্রথম প্রদর্শক। ১৭৭৪ সালে তিনি কারখানা পদ্ধতিতে লৌহ নিষ্কাসনের মানসে সরকারের নিকট হইতে বীরভূমে খনি ইজারা লইবার দরখাস্ত করেন। তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য হইলেও শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার আর কার্য্যারম্ভ করা সম্ভব হয় নাই।† ১৭৭৭ সালে মেসার্স মট্ ও ফারকুহার (Messrs. Mott and Farquohar) বর্দ্ধমানের পশ্চিমে জমি ইজারা লইবার দরখাস্ত করেন এবং তাহারা ঝরিয়ায় চুল্লী স্থাপনের মতলব করিলেও বীরভূমের লোহা মহলের একাধিপত্য ইজারা প্রার্থনা করে। ১৭৭৮ সালে মিঃ ফারকুহার ঐ জমিদারির দখল লাভ করেন। ১৭৮৯ সালে

* Rec. Geo. Sur. India Vol. XXXIX (1904-8) 1910. p. 116,

† V. Ball—Minerals of Economic Value, Pt. III. p. 362, R. Chowdhury—Evolution of Indian Industries.

কোনও রকমে চলিবার পর, কোম্পানী অকৃতকার্য্য হওয়ায় ১৭৯৫ সালে সমস্ত সম্পত্তি জমিদারদিগের অধিকারে চলিয়া যায়।

মাদ্রাজ

এই সকল চেষ্টা কোনও আকার ধারণ করিতে পারে নাই। ইহার পর ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের মিঃ হীথ (J. M. Heath) ১৮৩০ সালে দক্ষিণ আর্কটে পোর্টো নোভো-তে পরীক্ষামূলক (Indian Steel, Iron and Chrome Co.) কারখানা স্থাপন করেন; এই কার্য্যে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৩৩ সালে ভিন্ন নামে (Porto Novo Steel and Iron Co.) মালাবার উপকূলে বেপুর-এ নূতন কারখানা স্থাপন করে। ১৮৫৩ সালে পুনরায় নাম পরিবর্ত্তন করা হয় (East India Iron Co.) এবং দক্ষিণ আর্কটে একটী ও কইম্বাটুর জেলায় কাবেরী নদীর তীরে অপর একটী "ব্লাষ্ট ফার্ণেস্" স্থাপন করে। ১৮৫৮ সালে ইহা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৬৬ সালে ও ১৮৬৭ সালে যথাক্রমে পোর্টো নোভো ও বেপুরের কাজ বন্ধ হয়। ইহাই ভারতের প্রথম বিধিবদ্ধ প্রচেষ্টা।

অন্যান্য প্রচেষ্টা

কুমাওন প্রদেশে কালাঢুঙ্গি অঞ্চলে (১৮৬২) যে কারখানা স্থাপিত হয় তাহা পরে নৈনিতালের ডেচাউরিস্থিত কারখানার সহিত সম্মিলিত হইয়া কার্য্যারম্ভ করে। কিন্তু তাহাও সফল হয় নাই। ১৮৬২ সালে ইন্দোর রাজ্যে বারওয়াই অঞ্চলে অপর এক চেষ্টা হয়; তাহাও কিছুদিন চলিবার পর বন্ধ করিয়া দিতে হয়।

বাঙ্গলার নব প্রেরণা

১৮৫৫ সালে ম্যাকে কোম্পানী (Messrs. Mackay and Co.) বীরভূমে মহম্মদ বাজারে (Birbhoom Iron Works) কারখানা সুরু করে। ১৮৫৬ সালে সেই লৌহ (Mr. James Barrat এর নিকট) বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিল। নানা তর্ক-বিতর্ক ও আশা-নিরাশার মধ্যে মেসার্স বার্ণ এণ্ড কোম্পানী (Messrs Burn and Co.) কর্ত্তৃক পরীক্ষা প্রভৃতি পরিচালিত হইলেও ১৮৭৫ সালে তাহা লোপ পায়।

বিফলতার হেতু

এ যাবৎ বরাবরই কাঠ কয়লার তাপ দ্বারা লৌহ নিষ্কাসনের চেষ্টা চলিয়াছে। তাহা ছাড়া সকল প্রদেশের "প্রস্তরের" লৌহভাগ সমান নহে, অথবা তাহাতে অন্যান্য দ্রব্যাদি সংশ্লিষ্ট থাকায় একই নিয়মে সমস্ত "প্রস্তর" লইয়া কাজ করার অসুবিধা ঘটিয়াছে। ১৮৭৫ সালে ভারতে পাথুরে কয়লার প্রচলন হয়। ১৮৭৪ সালে (কাহারও মতে ১৮৭৫) একটী নূতন কোম্পানী স্থাপিত হয় এবং তাহারা বরাকরের নিকট কুলটীতে দুইটী চুল্লী স্থাপন করে। ১৮৭৯ সালে উহা বন্ধ হইয়া গেলে ১৮৮২ সালে গভর্ণমেণ্ট নিজ হাতে কোম্পানীর পরিচালনা গ্রহণ করেন এবং ১৮৮৪ সালে একটী চুল্লীতে পুনরায় কাজ আরম্ভ করেন। ১৮৮৯ সালে বেঙ্গল আয়রণ ও ষ্টীল কোম্পানী (Bengal Iron and Steel Co.) নাম দিয়া মার্টিন কোম্পানী ইহার কার্য্যভার গ্রহণ করে। ১৯১৯ সালে ইহা বেঙ্গল আয়রণ কোম্পানী (Bengal Iron Co.) নাম গ্রহণ করে। ১৯২৫ সালে ইহা ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টীল কোম্পানীর সহিত লভ্যাংশের বিভাগ (Profit-sharing) নির্দ্ধারিত করিয়া কাজ চালাইতে থাকে। ১৯৩০ সালে কোম্পানী ম্যানেজিং এজেন্সী তুলিয়া দিয়া কলিকাতা অফিস হইতে পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। হিসাব মত ইহাই ভারতের সর্ব্বপ্রথম সফল কারখানা।

নব জাগরণ

১৯০৫-৬ সালে ভারতের, বিশেষতঃ বাঙ্গলার নবজাগরণের লক্ষণ প্রকাশিত হয়। সারা বাঙ্গলাব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনের ফলে লোকে নূতন করিয়া স্বদেশী শিল্পে মন দিয়া সর্ব্বপ্রকারে বিদেশীর আমদানীর কবল হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করে। ইহার সহিত ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত টাটা কোম্পানীর (মূলধন ২,৩১,৭৫,০০০ টাকা) কিছু যোগাযোগ আছে বলিয়া উল্লেখ করিতে হইল।

জেমসেদজী টাটা সারা পৃথিবী ঘুরিলেন ভারতে লৌহ কারখানা স্থাপনের সুযোগ সুবিধা ও উপযুক্ত জ্ঞান অন্বেষণে। যখন দৈবাৎ ক্রমে ভারতের প্রচুর "প্রস্তরের" সন্ধান পাইয়া প্রধান অন্তরায় অন্তর্হিত হইল, তখন মূলধনের কথা উঠিল। তাঁহার ধারণা ছিল, ভারতের এত বড় কারখানার জন্য লণ্ডনের বাজারে অতি সহজেই টাকা উঠিবে। ক্রমে তাঁহার এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইল; কারখানার কর্ত্তৃত্ব না পাইলে টাকা দিতে অস্বীকার করিয়া বিলাতী ধনিকেরা টাটার নব কল্পিত কারখানার সংস্রব ত্যাগ করিলেন। তাঁহার এত দিনের শ্রম, অর্থব্যয় ও জাগরণের চিন্তা, নিদ্রার স্বপ্ন সবই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতে বসিল। মূলধনের অর্থ কোথা হইতে সংগ্রহ হইতে পারে, তখন এই এক চিন্তা দাঁড়াইল।

তখন বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন বাঙ্গলার জীবনে নূতন উন্মাদনা আনিয়াছে; তাহারই রেশ ভারতে ছড়াইয়া পড়িতেছে। আবালবৃদ্ধবনিতা কি এক আবেগে কেবলমাত্র মনের শক্তি

লইয়া সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর, প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার প্রয়াসী। জীতিধর্ম্ম ভুলিয়া, লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশ ভুলিয়া, তুচ্ছ ক্ষুদ্র স্বার্থ এমন কি জীবনের মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া আপনার দাবী সফল করিতে বাঙ্গালী তখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। তখন "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন"। এই সকলের অন্তঃস্থলে শিল্প প্রবৃত্তি ফল্গুর মত অদৃশ্য ধারায় বহিতে লাগিল।

অপর দিকে ইংলণ্ডে সার ডোরাব ও মিঃ পাদ্‌সার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল, তাঁহারা ভগ্ন হৃদয়ে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন। লৌহ কারখানার বিরাট মূলধন পাইবার কোনও আশা তখন রহিল না। স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে তাঁহারা আশার ক্ষীণ আলোক দেখিলেন। মিঃ বিলিমোরিয়ার সহিত পরামর্শ করিয়া আশা নিরাশার সন্দেহ-দোলায় চড়িয়া তাঁহারা দেশবাসীর নিকট তাঁহাদের প্রস্তাব পেশ করিলেন। ঘোর অন্ধকারের মধ্যে নবারুণ রাগ প্রকাশিত হইল; দিনের সহিত দিনমণির গতির ন্যায় দেশপ্রীতি, দেশের শিল্পপ্রীতি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া তাহা মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় আপন জ্যোতিঃ বিকিরণ করিতে লাগিল। ভারতবর্ষ আপনার গুপ্ত শক্তির পরিচয় দিল, বিলাতের ধনিকেরা বিস্ময়ে অভিভূত হইল; জগৎ চমৎকৃত হইল।

আবেদন করিবার সঙ্গে সঙ্গে, প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে কাতারে কাতারে টাটার অফিসে লোক উপস্থিত হইতে লাগিল। মুখে অবিশ্বাসের চিহ্ন নাই, ভবিষ্যৎ ক্ষতির সম্ভাবনায় বিচলিত হইবার রেখা মাত্র নাই। আজ ভারত আপন শক্তির পরিচয় দিতে বদ্ধপরিকর। শিল্পে বিফলতার গ্লানি তাহারা মুছিতে চায়, বিদেশীর অবজ্ঞার, ভারতবাসীর শিল্পের উপর তাহাদের প্রভাব বিস্তারের সকল প্রচ্ছন্ন চেষ্টা চিরতরে দূর করিতে চায়। তিন সপ্তাহকাল শেষ হয় নাই; জগতের নিকট প্রচারিত হইল অষ্ট সহস্র ভারতবাসী টাটার প্রয়োজনের ১৬,৩০,০০০ পাউণ্ড শেয়ায় (share) ক্রয় করিয়াছে। পরে যখন আবার কিছু টাকার জন্য ডিবেঞ্চার বিক্রয় করা স্থির করা হইল, তখন মহারাজা সিন্ধিয়া একাই ৪ লক্ষ পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রয়োজনের সমস্ত টাকা দেন।‡

এতদূর অগ্রসর হইয়াও সমস্ত চিন্তার অবসান হয় নাই। টাটা কোম্পানীর সফলতা সম্বন্ধে অনেকেই বিশেষ সন্দিহান ছিলেন। ইহার পূর্ব্বে যে সকল চেষ্টা হইয়াছে, তাহাদের মোট ফলাফল দর্শন করিয়া এরূপ অভিমত গঠন করা খুব অস্বাভাবিক নহে।§ কিন্তু সকল সন্দেহের অবসান ঘটাইয়া টাটা কোম্পানী আজ জগতের অন্যতম প্রধান কারখানা হইতে চলিয়াছে।

এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে প্রচুর সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন, এবং টাটা কোম্পানী তাহাতে বঞ্চিত হয় নাই। এ সম্বন্ধে যথাস্থানে সবিস্তার বিবরণ দেওয়া যাইবে।

১৯১৮ সালে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানী (Indian Iron & Steel Co.) তিন কোটী টাকা মূলধনে স্থাপিত হইল।

১৯৩৬ সালে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল কোং ও বেঙ্গল আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানী মিলিত হইয়া যায়। ইহাদের কারখানা কুলটী ও হীরাপুরে অবস্থিত।

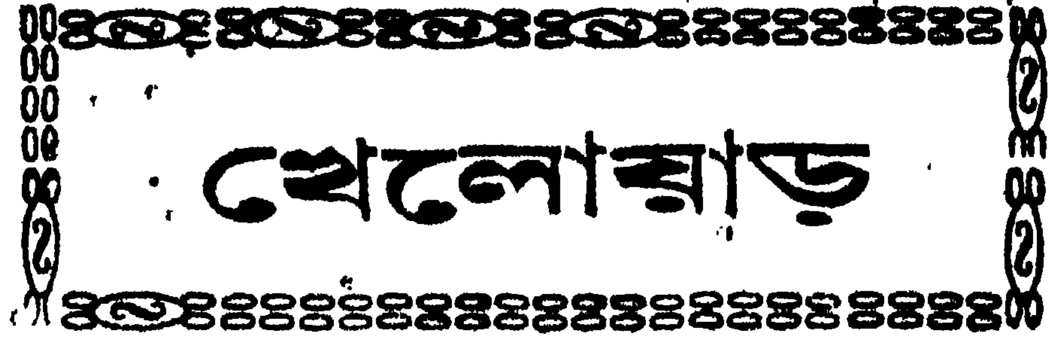
মহীশূরে ভদ্রাবতী আয়রণ ওয়ার্কস (Bhadravati Iron Works) ১৯১৮ সালে জন্মলাভ করিলেও ১৯২৩ সালের জানুয়ারী মাসের পূর্ব্বে কাঁচা লৌহ (pig) নিষ্কাশনের সুযোগ হইয়া উঠে নাই। এই কারখানায় এখনও কাঠ কয়লার সাহায্যে লৌহ-নিষ্কাসনের ব্যবস্থা আছে। বায়ুবদ্ধস্থানে (destructive distillation) কাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া তাহার বিভিন্ন উৎপাদ্য দ্রব্যাদি উদ্ধারের ব্যবস্থা করিবার উপযুক্ত বৃহদাকার চুল্লী ভারতবর্ষে একটী আছে; তাহা ভদ্রাবতী লৌহ কারখানার সম্পত্তি। সেই চুল্লী হইতে প্রাপ্ত কাঠ-কয়লা ফার্ণেসে ব্যবহৃত হয়।

প্রতি কারখানার উৎপাদিত লৌহের স্বতন্ত্র পরিমাণ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য টাটার কারখানা এবিষয়ে সর্ব্বপ্রধান। বেঙ্গল আয়রণ কোম্পানী সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। ১৯৩৮-৩৯ সালে কাঁচা লৌহ (pig) ১৫,৭৫,৫৬২ টন, ঢালাই (iron castings) ৮৭,৮৬২ টন, ইস্পাতের চাঁই (steel ingots) ৯,৭৭,৩৫৮ টন, ইস্পাত (finished steel) ৭,২৫,৭৯২ টন ও মাঝামাঝি (semis) ৭,৯০,৭৪৬ টন সমস্ত কারখানায় প্রস্তুত হইয়াছিল।

‡ Mr. A. Sahlin (টাটা কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ার—Messrs Julian Kennedy, Sahlin and Company-র অংশীদার) ১৯১২ সালে Staffordshire Iron and Steel Institute-এ বক্তৃতাকালে বলেন "From early morning till late at night the Tata offices in Bombay were besieged by crowd of native investors. Old and young, rich and poor, men and women they came, offering their mites; and at the end of three weeks, the entire capital required for the construction requirements, £16,30,000, was secured, every penny contributed by some 8,000 native Indians. And when, later, an issue of Debentures was decided upon to provide working capital, the entire issue, £400,000, was subscribed for by one Indian magnate, the Maharaja Scindia of Gwalior."

§ "Earlier attempts to introduce European processes for the manufacture of pig iron and steel in India, have been such conspicuous failure that there is naturally some hesitation in reposing confidence in the project now launched by Messrs Tata, Son and Company."

Rec. Geo. Sur. Vol. XXXIX (1904-08) p. 102.



শ্রীশিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বেটন হকি কাপ ফাইনাল

বাঙ্গালা দেশে খেলা পরিচালনা করিবার ত্রুটি-বিচ্যুতি যেন একটা মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কি ফুটবল, কি ক্রিকেট, কি হকি প্রায় খেলাতেই খেলা পরিচালকের ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের পরিচয় পাওয়া যায়। এই বৎসর বেটন কাপ হকি ফাইনালে রেঞ্জার্স ও খড়্গপুর হইতে আগত বি, এন, রেলওয়ে দলের খেলায় রেঞ্জার্স দলের বিরুদ্ধে প্রথম গোলটি সম্বন্ধে তীব্র মতভেদ রহিয়াছে। রেলওয়ে দলের আর, কার নীতি বিরুদ্ধ ভাবে হাত দিয়া বলের গতিরোধ করা সত্ত্বেও ইহা যে কিরূপে পরিচালকের দৃষ্টির অগোচর হইল তাহা কোন মতেই বুঝা গেল না। যাহা হউক, কোন বিশিষ্ট খেলায় একজন যে উপযুক্ত পরিচালক নির্ব্বাচন করা দরকার সে সম্বন্ধে আমরা বহুবার কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি এবং ঐ সমস্ত খেলা পরিচালনার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধেও বহুবার তীব্র সমালোচনা করিয়াছি; কিন্তু কেন যে ইহা কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হইতেছে না তাহার যথাযথ কারণ খুজিয়া পাইলাম না। যাহা হউক এই খেলার সঙ্গে সঙ্গেই এ বৎসরের মতন হকি মরশুমের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। উক্ত খেলায় বি, এন, রেলওয়ে দল ৩-১ গোলে লীগ চ্যাম্পিয়ান রেঞ্জার্স দলকে পরাজিত করিয়া সত্যই কৃতিত্বের দাবী করিতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে হয় যে গত বৎসর ঠিক এই বি, এন, রেলওয়ে দলই প্রতিপক্ষ রেঞ্জার্স দলের নিকট ১-০ গোলে পরাজিত হইয়াছিল। এইবার লইয়া বি, এন, রেলওয়ে দল উক্ত প্রতিযোগিতার ফাইনালে দশবার উন্নীত হইয়াছে; কিন্তু তাহারা মাত্র দুইবার বিজয়ী হইবার সম্মান লাভ করিয়াছে। যাহা হউক এই বৎসর ফাইনাল খেলাটি বেশ উচ্চাঙ্গের হয় এবং প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতা পরিলক্ষিত হয়।

প্রদর্শনী হকি খেলা

কোন একটি প্রদর্শনী খেলায় সংবাদ পত্রে উভয় দলের খেলোয়াড়গণের নাম প্রকাশ হইবার পর সাধারণতঃ ক্রীড়ামোদীগণ যে দলে বেশী নাম করা খেলোয়াড় স্থান পাইয়াছেন সেই দলটিকেই শক্তিশালী বলিয়া মন্তব্য করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের ধারণাটা যে সব সময় কার্য্যক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না তাহা বি, এইচ, এ, পরিচালিত রেডক্রশ ফাণ্ডের সাহায্যার্থে ভারতীয় ও অবশিষ্ট দলের খেলায় বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। টিমের নাম দেখিয়া সকলেই অবশিষ্ট দলটিই শক্তিশালী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু খেলা দেখিবার পর তাঁহাদের ধারণাটা ব্যর্থ হইয়াছে। ভারতীয় দলের প্রায় সকল খেলোয়াড়ই বেশ উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছে। উভয় দলই একটি করিয়া গোল করায় খেলাটি শেষ পর্য্যন্ত অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।

আগা খাঁ হকি প্রতিযোগিতা

বোম্বাই-এর আগা খাঁ, হকি প্রতিযোগিতার বেশ খানিকটা সুনাম শুনিতে পাওয়া যায়। এই বৎসরও উক্ত প্রতিযোগিতাটি সাফল্যের সহিত পরিসমাপ্তি হইয়াছে। জি, আই, পি, রেলওয়ে দল শেষ পর্য্যন্ত ফাইনালে লুসিটিয়ান্স দলকে ১-০ গোলে পরাজিত করিয়া উক্ত কাপ বিজয়ী হইবার গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে। এই বৎসর রেলওয়ে দল যেরূপ ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখাইয়াছে তাহাতে তাহাদের উক্ত সম্মান লাভ যে যথাযথ হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। তবে তাহারা এই বৎসর কলিকাতার বেটন কাপের খেলায় তাহাদের খ্যাতি অনুযায়ী খেলিতে পারে নাই।

কলিকাতা ফুটবল লীগ

বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলার সহরে সহরে ফুটবল খেলার উৎসাহটা বিশেষ পরিলক্ষিত না হইলেও কলিকাতার ফুটবল, মরশুম যদিও অল্পদিন হইল আরম্ভ হইয়াছে তথাপি ক্রীড়ামোদীগণের মধ্যে বেশ খানিকটা উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতেছে। আই, এফ, এ, পরিচালিত সকল বিভাগেরই খেলা প্রত্যহ নিয়মিত হইতেছে। এই সকল খেলা দেখিবার জন্য অন্যান্য বৎসরের ন্যায় দর্শক সমাগম না হইলেও দর্শকহীন মাঠে যে বিভিন্ন খেলা হইতেছে তাহা কোন মতেই বলা যায় না। এই বৎসরও লীগে উঠা নামা নাই; সুতরাং এই বৎসর বিভিন্ন ক্লাব পরিচালকের তরুণ ও উৎসাহী খেলোয়াড় দ্বারা দল গঠন করাটাই সমীচীন হইবে বলিয়া মনে হয়।

পেন্ এণ্ড ইন্‌ক ক্লাব স্পোর্টস

যাঁহারা দিনের পর দিন খেলা-ধূলার সমালোচনা করিয়াই থাকেন তাঁহারা যদি বাস্তবিক নিজেরা খেলা-ধূলার অংশ গ্রহণ করেন ইহা ক্রীড়ামোদীগণের একটা বিশেষ আনন্দের বস্তু তা আমরা গত সপ্তাহে সাংবাদিকগণের প্রবর্ত্তিত পেন এণ্ড ইনক ক্লাবের স্পোর্টস বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। যদিও অনুষ্ঠানটি করিতে দেরী হইয়াছে তথাপি বহু সংখ্যক প্রতিযোগি যোগদান করায় প্রত্যেক বিষয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতা পরিলক্ষিত হয়। ষ্টেটসম্যান পত্রিকা টীম চ্যাম্পিয়ানসিপ ও উক্ত দলের এম, সেন ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান সিপ পাইয়া কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। যাহা হউক এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের আমরা সাফল্য কামনা করি।

অনুকরণযোগ্য আদর্শ

বিপন্ন মানবজাতির কল্যাণ কামনায় প্রত্যেক সুস্থ ব্যক্তি বর্ত্তমানে যে সকল মহামূল্য বস্তু দান করিতে পারে "রক্তদান" তন্মধ্যে অন্যতম। অনেকক্ষেত্রে একটী জীবন রক্ষা করিতে দেহে রক্ত-সঞ্চারণ একমাত্র এবং শেষ উপায়। "ইণ্ডিয়ান রেড-ক্রশ সোসাইটির"র অধীনে ব্লাড ব্যাঙ্ক নামক প্রতিষ্ঠান রক্ত সংগ্রহ, রক্ত-সংরক্ষণ এবং বিশেষ বিপদক্ষেত্রে প্রয়োগোপযোগী রক্ত তৈয়ার রাখিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। অনেক নরনারী এতৎপূর্ব্বেই, স্বেচ্ছায় তাঁহাদের রক্ত দান করিয়াছেন; এবং এমন অনেকে আছেন যাঁহারা এই পর্য্যন্ত তিন, চার, পাঁচ, ছয় অথবা ততোধিকবার রক্ত-দানকার্য্যে কুণ্ঠিত হ'ন নাই এবং আরও দান করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন। এই বিষয় বাটানগরের জনমণ্ডলী কর্ত্তৃক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হইয়াছে; তাঁহারা এ পর্য্যন্ত অন্যূন ১০৯২ বার রক্ত দান করিয়াছেন। এই দৃষ্টান্ত প্রকৃতই প্রশংসনীয় এবং অনুকরণযোগ্য।

ব্যবহারজীব

শ্রীকল্যাণকুমার বসু, এম্-এ, এল্ এল্ বি (ক্যান্টাব), ব্যারিষ্টার অ্যাট-ল

*অনেকেই ব্যবহারজীবীর অপযশে মুখর হয়ে ওঠেন, তা উকীলই হোক আর ব্যারিষ্টারই হোক আর জজই হোক। অবশ্য উকীল, ব্যারিষ্টারদের ওপরই যেন আক্রোশ একটু বেশী। কেউবা রহস্য করে বলেন, কেউবা বলেন গাত্রদাহে যে, আইনজীবীমাত্রেই পরাসক্ত জীব, পরের আপদবিপদেই তাদের বাড়বাড়ন্ত।

সব দেশেই সাহিত্যে আইনজীবিদের নিয়ে ব্যঙ্গ কৌতুক করা হয়েছে এবং এমন চরিত্র খুব কমই সৃষ্টি করা হয়েছে যা সাধারণ আইনজীবির যথার্থ পরিচায়ক। একমাত্র বোধ হয় Balzac ছাড়া অন্য কোন লেখকই নিরপেক্ষভাবে এ বিষয়ে লেখেন নি। ন্যায়নিষ্ঠ এবং অভিজ্ঞ আইনজীবির সঙ্গে অপকৌশলী ও অপটু আইনজীবির তুলনা করে তফাৎ দেখাবার বিশেষ কোন রকম চেষ্টাই করা হয় নি। আইনজীবিদের বিরুদ্ধে এই অপবাদ-কোলাহলের মধ্যে দুটি অভিযোগ খুব স্পষ্ট হয়ে উঠছে। হয় তারা সাধারণের দুর্বোধ্য পরিভাষায় অসার চুলচেরা তর্কবিতর্ক করতে ভালবাসে; অথবা তারা মক্কেলের সম্পত্তি প্রতিপক্ষের হাত থেকে উদ্ধার করে কেবল আত্মসাৎ করবার জন্যই। অর্থাৎ তারা হয় তর্কবিলাসী না হয় পরস্বাপহারী আর না হয় দুই-ই।

কিন্তু এ অপবাদ সত্য হওয়া উচিত নয় এবং যথার্থই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্যও নয়। তর্কবিলাসিতার যে অপবাদ সেটা সেই সময় থেকেই এসেছে যখন আইনজীবিরা সত্য সত্যই তর্ক করতে ভালবাসত, যখন অসাধুতা ও অপটুতা সাধারণ বিচারপদ্ধতির একটা অঙ্গ ছিল, যখন কেউ বিচারালয়ে হেসে ফেললে সমস্ত লোককেই জজ সাহেব ঘর থেকে তাড়িয়ে দিতেন, যখন আইনেতে যেটুকু ব্যাপার বিনা প্রমাণে গ্রাহ্য করে নিতে বলা আছে তার বাইরে সকল অভিজ্ঞতাই জজেরা অস্বীকার করতেন আর ব্যারিষ্টারকে হয় ত গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করে বসতেন, "আপনি কি আমাকে জানাবেন যে, 'Cabinet meeting' জিনিষটা কি?" সে সব সময় থেকে আমরা আজ অনেক দূরে এগিয়ে এসেছি।

আজকালকার আইনজীবিরা সাধারণ মানুষের স্বভাব ও মনোবৃত্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত। জীবনের কঠোর বাস্তবকে অস্বীকার করবার মত নির্বুদ্ধিতা তাদের নেই। জনসাধারণ যেটাকে বৃথা তার্কিকতা বলে ভুল করে সেই সুসম্বদ্ধ ও সুবিন্যস্ত ভাষা আইন শিক্ষাদীক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফল, সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তাশক্তির বিকাশ মাত্র। কলিকাতার একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবী সম্বন্ধে শোনা যায় যে, তিনি সাধারণ লৌকিক ও সামাজিক কথোপকথনেও প্রায় আদালতী ধরণের যুক্তিতর্ক ব্যবহার করতেন। আর এও শোনা যায় যে জীবনে আইন অধ্যয়ন ও আইন ব্যবসায় ছাড়া অন্য কিছুতেই তাঁহার বিশেষ আগ্রহ বা উৎসাহ ছিল না। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, তাঁর অনন্যসাধারণ উন্নতির মূলে শুধু যে অগাধ পাণ্ডিত্যই ছিল তা নয়, তীক্ষ্ণ বিবেচনাশক্তি ও মানব চরিত্রে গভীর অন্তর্দৃষ্টিও ছিল। আজকাল যে সকল জজদের সুবিচারক বলে খ্যাতি আছে তাঁদের অনেকেই হয় ত সেকালের অমানুষিক গাম্ভীর্য্যের মাপকাঠিতে লঘুচিত্ত বলে প্রতীয়মান হবেন। কিন্তু এ কথা মানতেই হবে যে, তাঁদের বিচারকার্য্যে জীবনসমস্যার প্রতি যে গভীর জ্ঞান ও সহানুভূতি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তাতে আদালতের বিরস পরিমণ্ডলিতেও জীবনের স্পন্দন পাওয়া যায়; আর তাঁদের যে ব্যবহার ও ভাষা লঘুচিত্তের চাপল্য বলে আপাতদৃষ্টিতে অনুমিত হয়, তা আসলে অনাবশ্যক গাম্ভীর্য্যপূর্ণ বিচারপদ্ধতির আড়ষ্টতার বিরুদ্ধে অসহিষ্ণু প্রতিবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

পরস্বশোষণের অভিযোগ আরও ভিত্তিহীন। লোকে যখন ঘোড়দৌড়ের মাঠে বুকমেকারের বা ফাটকার দালালদের দালালি বা গুদামওয়ালার বা গাড়ীওয়ালার ভাড়া ইত্যাদি (অর্থাৎ যেখানে মাথার কোন কেরামতিই নেই) দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না তখন ব্যবহারজীবীর বহু কষ্টার্জ্জিত ও ব্যয়সাধ্য শিক্ষার প্রয়োগের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে কেনইবা ইতস্ততঃ করবে এটা আমি বুঝতে পারি না। আইনজীবিদের কাজের দুরূহতার কথা ছেড়ে দিলেও জনসাধারণের মোকর্দ্দমার খরচ সম্বন্ধে যে অন্যায় ও অসঙ্গত মনোভাব আছে সে বিষয়ে কিছু বলা দরকার। সাধারণতঃ কোন স্বতন্ত্র চুক্তি বা রফারফিয়ৎ না থাকলে মকর্দ্দমার খরচা ইত্যাদি যে নিয়মাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে Taxation Rules বলে। যদি আদালতের বিচারের মূল্য গুরুভার বলেই মনে হয় তবে জনসাধারণের প্রতিনিধিরা ব্যবস্থাপক সভায় যথোচিত আইন পাশ করে এই সকল নিয়মাবলীর সংস্কার বা উচ্ছেদ করতে পারেন। আরও একটা উপায় আছে। যাঁর পারিশ্রমিক অতিরিক্ত রকমের বেশী এমন কোন আইনজীবিকে সেই কাজে সর্ব্বদা নিযুক্ত না করলেও খরচা আপনা থেকেই কমে যায়। কিন্তু দেখা যায় কার্য্যকালে এই দুই উপায়ের কোনটিই জনসাধারণ গ্রহণ করে না। এর থেকে অন্ততঃ ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, বিচারপ্রার্থীরা সকলেই খরচের অনুপাতে প্রতিদান নিশ্চয়ই পেয়ে থাকে। তা নইলে উপরোক্ত প্রতিকারকল্পে তারা নিশ্চয়ই তৎপর হতো।

আদালতের বিচারপদ্ধতির বিরুদ্ধে জনসাধারণের যে

* Barnes J., 27th June 1904.

অভিযোগ তাতে কিছু সত্য হয়ত থাকলেও থাকতে পারে। এটা অবশ্য দেখা যায় যে, বিচারপদ্ধতি আজকাল এমন দাঁড়িয়েছে যাতে যে কোন ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক, শ্রমিক, বণিক, সমাজ সংস্কারক, ব্যবস্থাপক সভার সভ্য বা শাসক সম্প্রদায় কারো মতামত আদালতের কার্য্যে একমাত্র আইনজীবিদের মধ্যস্থতা ছাড়া আসবার উপায় নেই যদিও বিচারের নিষ্পত্তি ব্যবহারশাস্ত্র ছাড়া অন্যত্রও কম প্রভাব বিস্তার করে না। আর ঐ বিচারফল কেবল এক সম্প্রদায়ের অর্থাৎ আইনজীবিগণের বিদ্যাবত্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও তাদের অভিজ্ঞতাতেই সীমাবদ্ধ। এই চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে বিচারক যদি কোন পূর্ব্বকালের নজিরের ওপর নির্ভর করেন তা হলে তাঁকে বিশেষ যুক্তিতর্কের অবতারণা করতে হয় না। তাঁর এই বিচারের ফল আবার পরবর্ত্তী বিচারকের বা নিম্ন আদালতের পক্ষে ঐ ধরণের মামলার বিচারে বাধ্যকর না হ'লেও বিধিনির্দ্দেশক "জ্ঞানাঞ্জনশলাকা" হয়ে দাঁড়ায়। একজন প্রসিদ্ধ মার্কিণ বিচারপতি বলেছেন যে, এই নজির অনুসরণ বিষয়ে বিচারক পূর্ব্বসুরিদের বিচারাভিজ্ঞতা ও অকাট্য যুক্তিবত্তারই সমাদর করে থাকেন * কিন্তু এতেই সমস্যার সমাধান হ'ল না। কার অভিজ্ঞতা এবং কার যুক্তিবত্তা? একমাত্র আইনজীবিগণই কি সমগ্র জাতির তরফে কথা বলবার অধিকারী? যা হোক, এ কথার জবাবদিহি আমাদের করতে হবে না। পদ্ধতির সংস্কার মোকর্দ্দমার খরচের ব্যবস্থার মতই ব্যবস্থাপরিষদের কর্ম্ম এবং যদি দরকার হত জনসাধারণ তাদের প্রতিনিধিদের দিয়ে এই প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়ে নিত।

সাধারণ লোকের মনে আইন-ব্যবসায়ীর সম্পর্কে যে বিরুদ্ধ ভাব আছে তার কতকটা নিশ্চয়ই এই জন্যে যে মোকর্দ্দমার ফলাফল যাই হোক না কেন, আইনজীবিরা নিজেদের পারিশ্রমিক ঠিকই আদায় করে নেয়। কিন্তু প্রধান কারণ অজ্ঞতা। যে আইনের শাসনে আমরা আছি তার বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে জনসাধারণের বিশেষ কোন ধারণাই নেই। সেই জন্যেই মামলা-মোকর্দ্দমার ফলে তাহাদের স্বার্থহানি বা অর্থব্যয় হ'লেই তারা এই সন্দেহই করে থাকে যে, সব জিনিষটাই জুয়াচুরী বা ধাপ্পাবাজি। বিচারনীতির একটা মূলসূত্র—আইনের অজ্ঞতা কোন অপরাধেরই জবাব হ'তে পারে না—এর থেকে ধরে নিতে হবে যে, সকলেই আইন জানে। আগেকার দিনে হয়ত সেটা অনেকটা সত্য ছিল। একথা আমরা অবশ্য বলি না যে সকলেই কিছু সুদক্ষ আইন-ব্যবসায়ীর মত গভীর ভাবে আইন অধ্যয়ন করবে। কিন্তু সকলেরই যদি প্রচলিত আইনের মূলগত তথ্যগুলি মোটামুটি রকম জানা থাকে তাহ'লে আমার বিশ্বাস যে উপরোক্ত বৃথা সন্দেহেরও অবকাশ থাকবে না, ব্যবহারজীবীর প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতাও সর্ব্বত্র স্বীকৃত হবে। আজকাল যে বাণিজ্যশিক্ষার্থী, চিকিৎসা-শিক্ষার্থী হিসাবনবীশ প্রভৃতির শিক্ষায় আইনের যথাযোগ্য তথ্যগুলি শেখানো হচ্ছে এটা নিশ্চয়ই আমাদের উন্নতির পরিচায়ক।

*Brandeis J.—Burnet v Colorado oil Co. 285. U. S. 393 (406)

এবার নিজেদের কথা কিছু বলি। সাধারণের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, আইন-ব্যবসায়ীর জীবন খুবই আরামের-কুসুমাস্তীর্ণ শয্যা। কিন্তু এ ব্যবসায়ে কুসুম চয়ন করতে গেলে শয়নের অবকাশ থাকে না, আর শয়নপ্রিয় হ'লে কুসুম চয়ন সম্ভব নয়। যে পরিস্থিতি বা সমস্যার সমাধান আইনজীবিদের করতে হয় তার বৈচিত্র্য মানবচরিত্রের ন্যায়ই অনন্ত। এজন্য যে কত গভীর অধ্যয়ন করতে হয় এবং মননশক্তিকে কতটা সুপটু ও সজাগ রাখতে হয় তা সাধারণ লোক তলিয়ে দেখে না। অবান্তর ও পরস্পরবিরোধী চিঠিপত্র, খবরাখবর, দলিলদস্তাবেজের স্তূপের মাঝ থেকে স্বল্পপরিসর আর্জি বা জবাব সুচারুভাবে লেখা বা অস্পষ্ট ধারণা ও দুর্ব্বল সাক্ষ্য প্রমাণাদির উপর একটা তর্ক সাপেক্ষ যুক্তি খাড়া করা যে কতটা কঠিন কাজ এটাও খুব কম লোকেই জানে। যদিও এসব না জানলে আইনজীবীর কার্য্যের গুরুত্ব ঠিক প্রণিধান করা যায় না। আইনব্যবসায়কে ইংরাজীতে 'The Learned Profession' বা বিদ্বদ্‌বৃত্তি বলে। যদিও পার্লামেণ্টের সকল সদস্যকেই বলা হয়, 'The Honourable Member' ব্যারিষ্টার সদস্যমাত্রকেই উল্লেখ করতে হয় The Honourable Learned Member' ব'লে। আইনজীবিগণকে এই যে বিদ্বান্ ব'লে সম্মানিত করা হয় সেটা তাদের পুঁথিগত বিদ্যার বিদ্যাভিমানের জন্য নয়। এ সম্মান দেওয়া হয় এই জন্যই যে সাংসারিক সকল বিষয়েই তাঁদের যে গভীর ও সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে সেটা তাঁরা নিয়ত অধ্যবসায়ে অক্ষুণ্ণ ও কালোপযোগী ক'রে রাখে। আইনজীবিদের সদ্‌গুণাবলি সংযত এবং কার্য্যকরী বলেই, সাধারণ লোকের সেই ধরণের সদ্‌গুণের সঙ্গে তাদের আছে মূলগত পার্থক্য। আইনজীবীর সাহস অদম্য কিন্তু কোনরূপ আস্ফালন নেই। সে অস্ত্রের স্বীকৃতি অর্জ্জন করে যুক্তিতর্ক দিয়ে, গায়ের জোরে নয়। তার বাগ্মিতার মধ্যে আছে জ্ঞানের আলো, জ্ঞানাভিমানের বা আত্মম্ভরিতার তাপ নেই। খুঁটিনাটি প্রত্যেক ব্যাপারে তীক্ষ্ণ লক্ষ্য, সর্ব্ববিষয়ে অবান্তর পরিহার ক'রে সার গ্রহণ করার ক্ষমতা, প্রতিপক্ষের বক্তব্য অনুধাবন ও বিচার করবার অভ্যাস, এইগুলি প্রত্যেক আইনজীবীকেই নিজের ব্যবসার জন্য আয়ত্ত করতে হয়। এবং এই সকল সদ্‌গুণের জন্যই আইনজীবিদের পক্ষে, নিজেদের পেশার কথা বাদ দিয়েও, কি বাণিজ্য, কি রাজ-

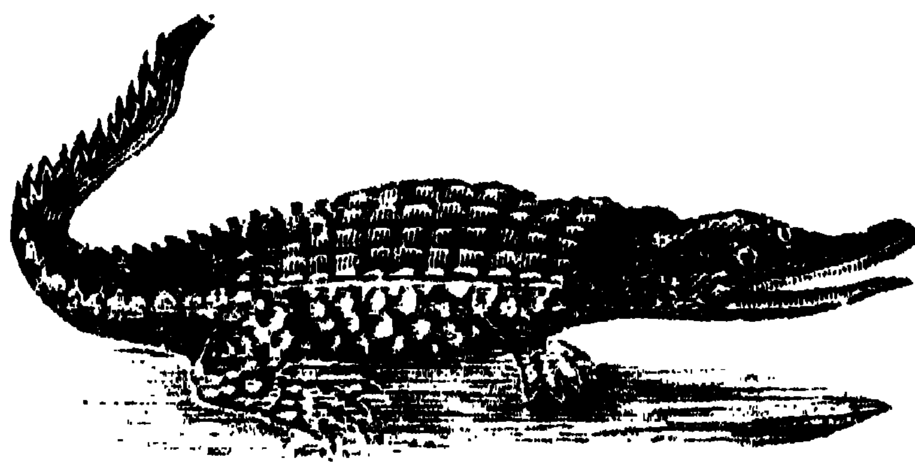
নীতি, কি জাতিসংগঠন, সকলক্ষেত্রেই জনসাধারণকে সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করা সম্ভব হয়েছে।

একটা মোকর্দ্দমায় * একবার বিলাতের পূর্ব্বতন কোন প্রধান বিচারপতি Lord Kenyon বিচার আরম্ভ হবার আগেই অন্যায় ক'রে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, 'প্রতিবাদীর জবাবে কি কিছু বলবার আছে?' এর উত্তরে Mr. Horne Tooke জজকে ও তাঁর উপরোক্ত প্রশ্নকে উপেক্ষা করে জুরিদের প্রতি যে বক্তৃতা করেছিলেন তার সূচনাটি চিরস্মরণীয়। "এই আদালতে বিচারপতি এবং আমলারা কেবল শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই আছেন। তাঁদের এখানে উপস্থিতির জন্য আমরা মোটা টাকা দিয়ে থাকি এবং নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁদের কিছু উপযোগীতাও আছে। কিন্তু তাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হয় সহায়ক হিসাবেই, তারা আমাদের কার্য্যনিয়ন্তা নন। ভদ্রমহোদয়গণ! আপনারা জেনে রাখুন যে, প্রতিবাদীর আত্মসমর্থনে অনেক কিছু বল্‌বার আছে আর সে জবাব বেশ অকাট্য জবাব। আপনাদের কর্ত্তব্য তার সেই ভাষণকে গ্রহণ করা।" প্রসিদ্ধ Baccarat case † এ Sir Edward Clarke অন্য অনেক সাক্ষীর মত ইংলণ্ডের তদানীন্তন যুবরাজ ভাবী সপ্তম এডোয়ার্ডকে জেরা করেন এবং তাঁহার বক্তৃতায় উক্ত সাক্ষ্যের খোলাখুলি ভাবে সমালোচনা ক'রে কর্তৃপক্ষকে এও বলেছিলেন যে তার মক্কেলকে যদি সাজা দিতে হয় তা হ'লে উপযুক্ত সাজা যুবরাজ ও মক্কেলের অন্য সহকারীদের দেওয়া উচিত। কল্‌কাতার হাইকোর্টে এত গরম গরম বক্তৃতার কারণ হয়ত আজও ঘটে নি, তবে আদালতে নির্ভীকতার যে সব উদাহরণ William Jackson, চিত্তরঞ্জন দাশ, Langford James, শরৎচন্দ্র বসু প্রভৃতি দেখিয়েছেন সেগুলিকে ইংলণ্ডের বা যে কোন দেশের শ্রেষ্ঠ উদাহরণের সহিত তুলনা করা চলে। বাক্‌চাতুর্য্য, প্রিয়ভাষিতা বা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি গুণ অবশ্য সকলের সমান থাকে না। কিন্তু নির্ভীকতা আইনজীবির শিক্ষাদীক্ষার অঙ্গ। যখনই কোন আইনজীবী কোন পক্ষ সমর্থনের জন্য আদালতে উপস্থিত হন তখনই তিনি মক্কেলের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদনে, নিজের স্বার্থ বা ব্যক্তিগত জীবনের বন্ধুত্ব বা রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতা সমস্তই উপেক্ষা করতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। এমন দুর্দ্দিন যদি কখনও আসে যে কোন আইনজীবি নিজের প্রতিদিনের কর্ম্মস্থান আদালতে শাসক সম্প্রদায়ের পীড়ন থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করতে অসম্মত হন, তা হ'লে বুঝতে হবে সেই মুহূর্ত্তেই দেশবাসীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লোপ পেয়েছে। একথা আমি মুক্তকণ্ঠেই বল্‌তে পারি যে, দেশবাসীর স্বাধীনতা ও অধিকার সুনির্দ্দিষ্ট করতে, সুপুষ্ট করতে এবং সুরক্ষিত করতে একমাত্র আইনজীবিরা যা করেছে তার বেশী, এমন কি ততটাও দেশের অন্য কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায় করেন নি।

কয়েকমাস পূর্ব্বে একটী বেতার বক্তৃতায় জনৈক বিচারপতি ব্যারিষ্টার সম্প্রদায়কে ভারতের মধ্যযুগের ঠগীদস্যু সম্প্রদায়ের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। অর্থবোধ না হ'লে এই উক্তির কদর্থ অসম্ভব নয়। কিন্তু উপমাটি বেশ জুতসই ঠগীদের মত আমরা লুটপাট করে খাই একথা বলা বক্তার উদ্দেশ্য ছিল না। ঠগীদের মধ্যে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে এমন একটা একতাবোধ ছিল যাতে তারা সর্ব্বদাই যে কোন ব্যাপারে পরস্পরকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকতো। আইনজীবিদের মধ্যেও এই পারস্পর্য্যভাব আছে। আজকালকার পরিভাষায় বলতে হ'লে আইন ব্যবসায় সকলের চেয়ে পুরাতন Trade Union, আর সে Trade Union এর সদস্য খু বেছে ও বাজিয়ে নেওয়া হয়। এই জন্যই আইনজীবিদে নিজেদের মধ্যেই যে কেবল সৌহার্দ্য আছে তা নয়, কলকাতার হাইকোর্টের Original Side এ বিচারক ও ব্যারিষ্টারগণের মধ্যেও এই প্রীতিবন্ধন আছে। এর কারণ কিছুকাল পূর্ব্বে বিচারকেরাও হয় ত ব্যারিষ্টার রূপে আইন ব্যবসা করতেন। আইন ব্যবসায়ের তাগিদে নিয়ত অন্তহীন দ্বন্দ্বের মধ্যে শ্রমসাধ্য, নাছোড়বান্দা বাক্‌বিতণ্ডার আবহাওয়া আমরা জীবনধারণ করে থাকি। এই কঠিন জীবন সংগ্রামে প্রতিনিয়ত পরস্পরের সহিত সংঘর্ষ ও ঘাতপ্রতিঘাত আমাদের দৈনন্দিন বিধিলিপি! কিন্তু এ সকল ব্যাপার আমাদের নিজেদের মধ্যে দলাদলি বা বিক্ষোভাব আনে না আমাদের পরস্পরের অন্তরঙ্গতা আরও দৃঢ়ীভূত করে। আর এই অন্তরঙ্গতা পৃথিবীর উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানবের প্রতিদ্বন্দ্বিতার আর কোনও কর্ম্মক্ষেত্রে দেখা যায় না।

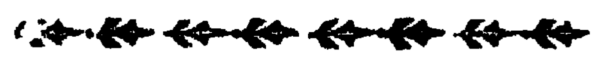
* In re-Fox's Election Petitions. 1784

† 3rd June 1891





পুস্তক ও আলোচনা



ভবিষ্যতের বাঙালী—এস ওয়াজেদ্ আলি বি-এ, (কেন্টাব) বার-এ্যাট্-ল প্রণীত—প্রকাশক শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ, ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট্, মূল্য দেড়টাকা। ১১২ পৃঃ—

গ্রন্থকার এই কয় পৃষ্ঠায় কতকগুলি সুচিন্তিত প্রবন্ধে ভবিষ্যতের বাঙালী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। আজকালকার দিনে এরূপ সুপাঠ্য ও হিতকর প্রবন্ধ বড়ই বিরল। ভারতে কিরূপে ঐক্যের স্থানে অনৈক্য, মৈত্রির স্থানে দ্বন্দ্ব, সহযোগের স্থানে অসহযোগ আসিয়া রাষ্ট্রসৌধ ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়াছে গ্রন্থকার প্রাণের দরদ দিয়া সব কথাগুলি লিখিয়াছেন। যদি হিন্দু তাহার ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান পায়, মুসলমান তাহার ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত শাশ্বত সত্যের সন্ধান পায় তবে কোন দ্বন্দ্ব, সঙ্কীর্ণতা এবং দ্বেষ হিংসা আসিতে পারে না, ইহা অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। গ্রন্থকার স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন, "রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হইতে হইলে, জাতীয় চরিত্র তদুপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে।"

গ্রন্থকার হিন্দু মুসলমান মিলন সম্বন্ধে কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন "অন্যায় অত্যাচার মুসলমানের এক-চেটিয়া জিনিষ নয়। দু'একজন মুসলমান বাদশা যদি প্রজাপীড়ন ক'রে থাকেন তাঁরা মুসলমান হিসাবে তা করেন নি, তাঁদের স্বভাবেরই অনুসরণ করেছেন। তাঁদের স্বৈরাচারের সঙ্গে ইসলাম ধর্ম্মের এবং মুসলমান জাতির কোন সম্পর্ক নাই। পক্ষান্তরে অসংখ্য মুসলমান বাদশা, নওয়াব সুবেদার প্রভৃতি ন্যায় বিচার এবং উদারতার যে পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ এবং দৃষ্টান্ত তো ভারতবর্ষের ইতিহাসেই পাওয়া যায়।" গ্রন্থকার সত্যই বলিয়াছেন যে, "হিন্দু-বিদ্বেষ এবং মুসলমান বিদ্বেষ সাহিত্যে তিলমাত্র স্থান না পায়, এবং উভয় জাতির মধ্যে যাহাতে ঐক্যভাব সম্যকভাবে ফুটে ওঠে, তার জন্যে সাধনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। সাহিত্যিকের কাজই উদার সার্ব্বজনীন মনোভাবের সৃষ্টি করা।" গ্রন্থকারের সহিত আমরা একমত যে বস্তুতঃই মোঘল সম্রাট আকবর, শহীদ নওয়াব সিরাজদ্দৌলা এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যেরূপ ঐক্যের উপাসক ছিলেন এবং সম্মিলিত জাতীয়তার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। আমরাও গ্রন্থকারের কথার প্রতিধ্বনি করি যে "আমাদের স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমি সত্যই মহামানবের তীর্থভূমি।" কবির স্বপ্ন সফল হউক। আবার ভারতে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হইয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করুক।

গ্রন্থের ভাষা অতি প্রাঞ্জল। ছাপা খুব সুন্দর। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীঅবনীকান্ত ভট্টাচার্য্য

অবসর সঙ্গিনী—স্বর্গীয়া সরলাবালা বিরচিত কবিতা পুস্তক (বিতরণের নিমিত্ত মুদ্রিত)

পরম শ্রদ্ধাসহকারে আলোচ্য গ্রন্থখানি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে বসিয়াছি। মহিলাকবি মানকুমারী দেবী লিখিয়াছেন, "তাঁহার কবিতার কথা কি বলিব? তিনিই জীবন্ত কবিতালক্ষ্মী ছিলেন।"

শঙ্খচক্র গদাপদ্ম সুশোভিত চারি কর,
হীরক কিরীট শিরে, পরিধান পীতাম্বর।
কটিতে কিঙ্কিনী বাজে, চরণে নূপুর রাজে'
অলকা তিলকা ভালে, গলদেশে ফুলহার;
কৌস্তুভ মণ্ডিত উরঃ, বাঁকা আঁখি মনোহর।

জন্মাষ্টমী

আদর্শ গৃহলক্ষ্মীর ভগবদ্ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ উদ্ধৃত অংশ সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। অবসর সঙ্গিনী পাঠে মনে শুচিতা আনয়ন করে।

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস

সাময়িকপ্রসঙ্গ ও আলোচনা

ভারতীয় প্রসঙ্গ

বাঙ্গলার নব মন্ত্রীমণ্ডল

৯ই বৈশাখ (২৩শে এপ্রিল) তারিখের সরকারী বৈকালিক ইস্তাহারে প্রকাশ যে, খাজা সার নাজিমুদ্দিনকে প্রধান মন্ত্রী করিয়া বাঙ্গলার মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হইয়াছে। সাধারণ বাঙ্গালীর ইহাতে বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কিন্তু যাঁহারা মুস্লিম লীগের নামে মন্ত্রীত্ব কায়েম করিতে চান, তাঁহাদের উজিরীকালে ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পুনরাবৃত্তি না হয় এই এক আশঙ্কা। লাভের মধ্যে কিছু নাই, বলা যায় না। মন্ত্রীত্ব গঠনের পূর্ব্বে সার নাজিমুদ্দিন বিনাবিচারে আটকবন্দীদের যে সুবিধাদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাহা গদীতে বসিয়া যদি কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন, তাহাতে বাঙ্গলার বহু পরিবারে কথঞ্চিৎ শান্তি আসিতে পারে। চারিদিকে অশান্তি রাখিয়া লাঠি ও সঙীনের বলে রাজ্যশাসন অতিশয় বিঘ্নসঙ্কুল। আমরা আশা করিতে পারি কি যে সার নাজিমুদ্দিনের উজিরীকালে চারিদিকে এই অশান্তি ও অবিশ্বাসের ছায়া কিছু পরিমাণ হ্রাস পাইবে?

কলিকাতার মেয়র ও ডেপুটি মেয়র

হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ফল স্বরূপ সৈয়দ বদরুদ্দোজা ও মিঃ আনন্দী লাল পোদ্দার ১৯৪৩-৪৪ সালের জন্য কলিকাতা নগরীর যথাক্রমে মেয়র ও ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মিঃ বদরুদ্দোজা কিছুকাল পূর্ব্বেও কর্পোরেশনের বেতনভোগী কর্ম্মচারী ছিলেন। কর্পোরেশনের পরিচালনায় বহু গলদ শোনা যায় এবং করদাতৃগণের নানা দুর্ভোগের কথা কাণে আসে। তিনি যখন নিজে কর্ম্মচারী ছিলেন, তখন এ সকল বিষয়ে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। আমরা আশা করিতে পারি, তিনি মেয়র হইয়া তাহা যথাসম্ভব দূর করিতে চেষ্টা করিবেন। অনেকে এ চেষ্টা করিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি। যাহা হউক আশা করিতে দোষ নাই, তিনি কতক পরিমাণেও সফল হইবেন। আমরা নব নির্ব্বাচিত মেয়র ও ডেপুটী মেয়রকে আমাদের অভিনন্দন জানাইতেছি।

অসুবিধার মানদণ্ড

কাহার যে কি হইলে অসুবিধা হয় তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন ব্যাপার, ভারতের শাসক সম্প্রদায় সুখী বিদেশী। আর শাসিত অধিবাসী নিরক্ষর স্বাস্থ্য-অন্ন বস্ত্রহীন ভারতবাসী। দুই জাতির প্রয়োজনের বিশেষ তারতম্য বা পার্থক্য আছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে যখন নৌকা,শকট,সাইকেল প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত হইল, বাড়ী জমি দখল হইল, চাষ বন্ধ হইল, তখন কোনও প্রতিবাদ উচ্চবাচ্য ইঙ্গ-সম্প্রদায়ের নিকট হইতে উঠে নাই। এখন সরকার হইতে তাপ নিয়ন্ত্রণ (air conditioning) যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ বা "স্বেচ্ছায়" সরকারের নিকট জমা দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। সমস্ত ইংরেজ্ পরিচালিত পত্রিকা সম এবং তারস্বরে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছে। হয় ত' গভর্ণমেণ্টকে এই অসদুদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভারতবাসীর নিকট নৌকা, জমি প্রভৃতি যে বস্তু, ইংরেজদের নিকট air-conditioning plant বোধ হয় সেইরূপ প্রয়োজনীয় বস্তু। এই বিরাট ব্যবধান দুই জাতি মিলনের পথে একটী প্রধান অন্তরায়।

প্রাথমিক সাহায্য

পত্রিকায় প্রকাশ, "ভোলা, ২২ এপ্রিল—গত ১৭ই এপ্রিল চরজংলা নিবাসী মুসলিম মিস্ত্রী নামে বৃদ্ধ নিয়ন্ত্রিত চাউল কিনিতে আসিয়াছিল। ভিড়ের ভিতর সে হঠাৎ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে। তাহাকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে পাঠান হয়, পথেই সে মারা যায়—বিঃ সঃ।" যাঁহারা কণ্ট্রোলে চাউল কেনার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন বা নিজেরা ভুক্তভোগী তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারেন যে এই দারুণ চৈত্র গ্রীষ্মের রৌদ্রে, কাল-বৈশাখীর তাণ্ডবলীলার মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শরীর ধর্ম্মের ক্রিয়া বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া ঠেলাঠেলির মধ্যে সংজ্ঞাহীন বা অসুস্থ হইয়া পড়া অসম্ভব নহে। এরূপ ক্ষেত্রে সামান্য প্রাথমিক চিকিৎসা পাইলে হয় ত' গুরুতর বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে এরূপ ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার।

ঘাস খাওয়া

ঘাস যাহারা খায়, তাহাদের নাকি বুদ্ধি কম। সেই কারণে যখন নিজের বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া দরকার, বা কোনও ব্যাপার হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি আছে তাহা অপরকে বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন, তখন ঘাস-খাদক দল হইতে নিজেকে ভিন্ন করিয়া দেখাইতে হয়। কোনও ব্যাপার যে আমি বুঝিয়াছি অথচ অপরে হয় ত' মনে করিতেছে আমি বুঝি নাই—তখন জোরে বলি, "আমি কি ঘাস খাই, যে বুঝতে পারব না।" ডাঃ বি. সি. গুহ বিজ্ঞানের প্রভাবে প্রমাণ করিয়াছেন, ঘাস মানুষের মত বুদ্ধিমান জীবের প্রশস্ত খাদ্য, চপ্ খাইলেও পেট কামড়ায় না, বেশ মুখরোচক এবং এই দুর্দ্দিনে অন্ন সমস্যার দুশ্চিন্তাহারক। তাহাতে প্রোটীন বা আমিষের অংশও বিশেষ নিন্দার নয়। আমরা আশাপূর্ণ হৃদয়ে চাহিয়া রহিলাম ঘাস কবে ল্যাবরেটারীর পরীক্ষার অবস্থা ছাড়িয়া, আমাদের ভোজ্যের থালায় কলমী নটে পুঁই প্রভৃতি শাকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিত্যাগ করিয়া একেবারে ভাতের (food) স্থান অধিকার করিবে। এই টাকা-টাকা-সের চালের দুর্ভিক্ষ দূর হইলে ভারতের এক প্রকাণ্ড মঙ্গল সংসাধিত হয়! আমরা প্রার্থনা করি ডাঃ গুহর আশা ও চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক।

ভারতের ভাবী বড়লাট

কতকগুলি ব্যাপারে আমাদের জল্পনা-কল্পনার অন্ত নাই, অথচ তাহাতে কোনও ফল নাই। ভারতের নূতন বড়লাট কে হইবে ইহা লইয়া পত্রিকায় বহু নাম প্রকাশিত হইতেছে। দৈনিক পত্রিকার কলেবর বিশেষ সূক্ষ্ম হইয়াছে, তাহার উপর প্রতিদিন এই কার্য্যে কিছু স্থান খরচ করিতে হয়। যিনিই আসুন, ভারতের তাহাতে বিশেষ কি আসে যায় তাহা বলা কঠিন। প্রকৃত পক্ষে ইংলণ্ডে বসিয়া যিনি ভারত নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁহার মতিগতির উপর সমস্তই নির্ভর করিতেছে। আমাদের একটী ক্ষুদ্র গল্পের কথা মনে পড়িয়া গেল: এক "বউ-কাঁটকী" অর্থাৎ বধূকে অত্যাচারকারিণী শাশুড়ী বধূদের পেট ভরিয়া খাইতে দিতেন না, একখানি ছোট সরার মাপে প্রত্যেককে ভাত লইতে হইত। একদিন ভাগ্যক্রমে ঐ সরাখানি ভাঙ্গিয়া গেল; বধূদিগের আনন্দের আর সীমা নাই। অবশিষ্ট যে বড় সরাখানি আছে এইবার তাহার মাপে ভাত পাইলে তাহাদের পেট ভরিবে; তাহারা তাই লইয়া আপনাদের মধ্যে চাপা গলায় আলোচনা সুরু করিয়াছে, তাহার মধ্যে স্বস্তির রেশ শ্বশ্রূঠাকুরাণী বেশ অনুভব করিতেছেন। তিনি তখন আপন মনে অপেক্ষাকৃত চড়া সুরে আউড়াইতে লাগিলেন, "বড় সরাখানি ভেঙ্গে গেছে, ছোট সরাখানি আছে। নাচন-কোঁদন কর কি, বউ, (আমার) হাতের মাপ ঠিক আছে।" যাঁহারা ভারতের ভাবী বড়লাট এ্যাট্‌লী, সিন্‌ক্লেয়ার, এ্যাণ্ডারসন, ক্রীপস্ প্রভৃতির নাম লইয়া মাতামাতি করিতেছেন, তাঁহারা ভারতে ব্রিটিশ-শাসন-নীতি রূপ শ্বশুড়ীর কথা স্মরণ করিলে নানা সন্দেহ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন। বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতের ত্যাগ ও শিল্প-প্রচেষ্টার সহায়তায় সম্মিলিত জাতির জয়ে তুষ্ট হইয়া ইংরেজ সরকার যাহা দিবার মত করিবেন, তাহাই হইবে। বড়লাটের উপর বিশেষ কিছু নির্ভর করিতেছে বলিয়া আনন্দ করিবার কিছু নাই।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ

খাদ্য-সমস্যার ন্যায় ভারতের বস্ত্রসমস্যা ক্রমশঃ তীব্র হইয়া উঠিতেছে। বহুদিন হইতে শুনা যাইতেছে যে, ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় প্রস্তুত এবং বিলি করা হইবে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ফলের দিক দিয়া বিশেষ কিছুই দেখা গেল না। গত ডিসেম্বর মাসে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বলিয়াছিলেন, যে ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইবে। তদানীন্তন ব্যবসায়-সচিবের এই আশ্বাস কিন্তু কার্য্যে পরিণত হয় নাই। অনেকে আশা করিতেছেন যে, আগামী জুলাই মাসের মধ্যে ১১ কোটি ৫০ লক্ষ গজ ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় বাজারে পাওয়া যাইবে। সরকার তরফ হইতে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই সংখ্যার প্রায় আটগুণ ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় বৎসরে দরকার। দেখা যাইতেছে যে, উপযুক্ত পরিমাণ ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় প্রস্তুত হওয়ার আশা খুবই কম। প্রস্তুত যদিও বা হয়, বিলি করা আর একটা মহাসমস্যার ব্যাপার। শীঘ্র যাহাতে বিলি হয় সে ব্যবস্থা করিতে হইবে। সে জন্য বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের সাহায্য প্রয়োজন। নূতন কিছু পরিকল্পনা না করিয়া বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের সাহায্যে বিলি করিলেই লোকের নগ্নতা শীঘ্র ঘুচিবে বলিয়া মনে হয়।

শুশ্রূষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সমস্ত সরকারী হাসপাতালে কেবল অ-ভারতীয় নার্স বা সেবিকা ছিল। ক্রমে দেশীয় নার্স পাওয়া যাইতেছে। সাধারণ মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র ঘরের রোগীর মানসিক অবস্থা, রোগ ব্যক্ত করিবার ধারা প্রভৃতি, তাহার সমস্ত পারিপার্শ্বিক ঘটনার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সেই কারণে ভারতীয় নার্স হইলে রোগীর সকল দিকের অবস্থা বিবেচনা করিয়া নিজেদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। যাহারা শিক্ষিত এবং ভিন্ন সামাজিক আবহাওয়ায় পালিত, তাহাদের নিকট ভারতীয় রোগীর যে আচরণ বা দাবী অন্যায় আবদার বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাদের প্রতি সহানুভূতিসূচক ভারতীয় নার্সের নিকট তাহাই হয় ত' নিতান্ত স্বাভাবিক ঘটনা। নার্সের বৃত্তি এখনও অনেকে গ্রহণ করেন না; এই দিকে ভারতীয় অ-ভারতীয় সম্মিলিত নার্স সংখ্যা প্রয়োজনের অনুপাতে নিতান্ত কম। এক লণ্ডন নগরীতে যত নার্স আছে, সমস্ত ভারতবর্ষে তাহা নাই। এখানে প্রতি ৬৫,০০০ লোক প্রতি এক জন নার্স পড়ে এবং যুক্ত প্রদেশে প্রতি ২,৫০,০০০ অধিবাসীর হিসাবে একজন শিক্ষিতা নার্স দেখিতে পাওয়া যায়। এ দিকে রুচি ও শিক্ষা যতই বিস্তৃতি লাভ করে ততই মঙ্গল। যুদ্ধোত্তর ভারতে এই বৃত্তি মহিলাদিগের মধ্যে আরও ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন।

বন্দীর মুক্তি

বিগত উপদ্রবের সময়ে যাহাদিগকে বন্দী করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্য হইতে বিহার সরকার বাহাদুর ৫০% বন্দীর মুক্তির আদেশ দিয়াছেন। তাহারা পাটনা ক্যাম্প জেলে আটক ছিলেন। ইতিমধ্যেই ৪০০ জন খালাস পাইয়াছেন।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট নেতা ও দেশসেবকদের শীঘ্রই মুক্ত করা হইবে এই সংবাদ কিছুদিন যাবৎ আমরা শুনিয়া আসিতেছি কিন্তু তাহাদিগকে কিম্বা তাহাদিগের মধ্যে জন-কয়েককেও কেন যে এযাবৎ মুক্তি দেওয়া হইতেছে না তাহা আমরা এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।

প্রহসন (১)

ভারতরক্ষা আইনের কোন্ এক ধারায় (২৬ বা ২৯) যাহাই হউক, ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভারতীয় নাগরিক আটক রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। বেশ চলিতেছে, কোনও অসুবিধা নাই; আপত্তি করিলে শুনিবার কেহ নাই; আন্দোলন করিলে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন, ভারতরক্ষা আইন প্রভৃতি আছে। সম্প্রতি ভারতের প্রধান বিচারপতি এই আইনে কি ফাঁক আবিষ্কার করিলেন; ভারতবাসী বিস্ময়ে তাঁহার সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, বিদ্যাবত্তা ও নিরপেক্ষতার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। তিনি বলিলেন ঐ আইনের ঐ ভাষায় বিনাবিচারে নাগরিক ধরিয়া রাখা যায় না; সুতরাং তাহা আইনে সিদ্ধ নয়। অতবড় বিচারপতির রায়ে মনে হইল বুঝি সব বন্দী মুক্তি পাইয়া যায়। তাহা হইবার নহে; আইনের ভাষার বদল করা হইল। রায় বাহির হইবার পর হইতে নূতন শব্দ বা কয়েকটী বাক্যান্তরিত আইন বাহির হওয়া পর্য্যন্ত সকল বন্দী নিজ নিজ স্থানেই আটক রহিলেন। এ বড় চমৎকার ব্যবস্থা। "এখন এক্সিকিউটিভ বা শাসন পরিচালকেরা যাহাই করিবেন তাহাই সিদ্ধ"—এই কথা বলিয়া দিলে যখন চলিয়া যায়, তখন এত ঘটা করিয়া আইন করিবার প্রয়োজন কি?

পরলোকে সিষ্টার সরস্বতী

গত ২২শে এপ্রিল বিশিষ্ট সমাজ সেবিকা সিষ্টার সরস্বতী পরলোকগমন করিয়াছেন শুনিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইলাম।

বোম্বাই প্রদেশের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ-বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পিতৃদত্ত নাম বাই রমাবাই। পালেকার। মাতার মৃত্যু হইলে পর তিনি রামকৃষ্ণ মিশনে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সেবাধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯২৮-২৯ সালে রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতায় মাতৃ ও শিশুমঙ্গল খুলিতে চাহিলে, সিষ্টার সরস্বতীর উপরেই আসিয়া সেই ভার বর্ত্তে। তিনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য

অর্থসংগ্রহ এবং অন্য অন্য কাজে অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িয়াছিল।

লোকগণনা (১৯৪১)

ভারতবর্ষে মোট ২৭০৩টি সহর ও ৬৫৫,৮৯২টি গ্রাম আছে। ভারতের মোট সংখ্যা ৩৮৮,৯৯৭,৯৯৫ তন্মধ্যে ৪৯,৬৯৬,০৫৩ জন লোক সহরে ও ৩৩৯,৩০১,৯০১ জন লোক গ্রামে বাস করে।

বৃহৎ নগর ৫৮টি, তন্মধ্যে ২৩টি নূতন। হাজার করা ৯৩৫ জন স্ত্রীলোক; মাদ্রাজ ও উড়িষ্যায় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক বেশী। পাঞ্জাবে হাজার করা ৮৪৭ জন স্ত্রীলোক। সেখানে হাজার করা ৫,৭০৭ মুসলমান এবং ২৮৫৭ হিন্দু। বঙ্গদেশে প্রতি দশ হাজারে ৫৪৭৩ জন মুসলমান ও ৪১৫৫ জন হিন্দু।

খাদ্য সমস্যা সমাধান সম্মিলনী

ভারতে তথা বঙ্গদেশেই যে কেবলমাত্র খাদ্যসমস্যা উগ্র-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে তাহা নহে। মহাযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ জগতের প্রত্যেক অংশেই খাদ্য সমস্যা দেখা দিয়াছে। ধ্বংসমূলক যুদ্ধে পৃথিবী খাদ্যহীন হইয়া পড়িতেছে। বৃহৎ জগতের প্রত্যেক জাতিই আজ এই সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। ১৮ই মে মিলিত জাতিবৃন্দ খাদ্যসমস্যা দূরীকরণ মানসে একটি সম্মিলনী করিতেছে। প্রায় ২০টি জাতি এই সম্মিলনীতে যোগদান করিবে, এই সম্মিলনীর নাম "United Nations' Food Conference." আমরা ইহার সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি। আমাদের মতে, ভারতের ঋষি প্রোক্ত পন্থায় উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত এ সমস্যার শাশ্বত সমাধান সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায় না।

বৈদেশিক প্রসঙ্গ

ব্রহ্মের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র

ব্রহ্মের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র লইয়া সেদিন পার্লামেন্টে বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। সেখানে সকলেই পণ্ডিত, সুতরাং পরিকল্পনা যত সুন্দর এবং যত রকমের হইবার তাহাতে কোন ত্রুটী হয় নাই। আমরা দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম যে ব্রহ্মকে স্বায়ত্তশাসন দিতে ব্রহ্মের সচিব মিঃ আমেরীর অনিচ্ছা নাই। অবশ্য তাঁহার সেই 'এক কথা'র পরিচয় পাইয়া সুখী হইলাম। যখন প্রধান মন্ত্রী মিঃ উ-স যুদ্ধান্তে ব্রহ্মকে স্বাধীনতা দিবার জন্য দরবার করিতে ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, তখন সে কথার কোন আমল দেওয়া হয় নাই; যুদ্ধান্তে সব আলোচনা হইবে বলিয়া বিদায় দেওয়া হইয়াছিল। যখন ইংরাজের অধিকারে ছিল, তখন ব্রহ্মের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত ছিল না; আর এখন ব্রহ্ম শত্রু-কবলিত, তাহার ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনার কাল উপস্থিত হইয়াছে ইহা সুখের কথা। যাহাই হউক মিঃ আমেরীকে "ভদ্রলোক" বলিয়া চেনা গেল; তাহার কথার নড়চড় হয় নাই। ব্রহ্মবাসী এখন নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতে পারিবে।

প্রহসন (২)

বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে বড় বড় প্রহসন অভিনীত হইতেছে। সমস্ত দেশে জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ নির্ব্বিশেষে সমান অধিকার স্থাপনের জন্য এই বিরাট ধ্বংসলীলা চলিতেছে—ইহা যুদ্ধপর্ব্বের প্রথম অধ্যায়। তাহার পর সুযোগ অনুযায়ী চার্চিল-রুজভেল্ট অতলান্তিক সনদের আবিষ্কার হইল এবং দুই মহাপুরুষ তাহার দুই ব্যাখ্যা করিলেন; শেষ মীমাংসা হয় নাই, হইবে না। দক্ষিণ আফ্রিকার স্মাটস্ মানুষের অধিকার সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করিয়া বেশ সুনাম করিয়াছিলেন। কার্য্য-কাল সমুৎপন্নে দেখা গেল, ভারতবাসী মানুষ নয়, সুতরাং নাটাল ট্রান্সভালে শ্বেতাঙ্গের স্বার্থে তাহাকে ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত করিলে দোষ হয় না। মোট কথা 'মানুষ' বলিতে শ্বেতাঙ্গ জাতি বুঝায়। পীতজাতি এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে জগতে চিরতরে শান্তির অবসান ঘটিবে।

ইংরাজের যুদ্ধ ব্যয়ের হিসাব

স্যার কিংসলি উড পার্লামেন্ট সভায় চ্যান্সেলার-অব-দি এক্সচেকার হিসাবে যে ফর্দ্দ দাখিল করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া অবধি এ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র আমেরিকাতেই ইংরেজেরা ১,৫০০,০০ পাউণ্ড খরচ করিয়াছে। খরচ হইয়াছে সরবরাহে, যুদ্ধরসদে ও অন্যবিধ কারণে। রাশিয়ায় ইংরাজেরা যুদ্ধোপকরণ পাঠাইয়াছে ১৭০,০০০,০০০ পাউণ্ডের। যুদ্ধের খরচ এপর্য্যন্ত ১৩,০০০,০০০,০০০ পাউণ্ড। সমস্ত ইংরেজ অভিযানের খরচ অন্য জাতির নিকট ঋণ সমেত মোট ১৫,০০০,০০০,০০০ পাউণ্ড।

যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা

ভারত সরকারের কর্ম্মতৎপরতা দেখিয়া সারা সভ্য জগৎ চমৎকৃত হইয়া গিয়াছে। সরকারী মহল হইতে বলা হইয়াছে ভারতের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে শতাধিক কমিটী কাজ সুরু করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের কার্য্যধারা কি, কাহারা কোন বিভাগ লইয়া ব্যস্ত, এবং কাজ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, ইঁহাদের জন্য কত ব্যয় হইতেছে, ইত্যাদি জানিবার জন্য সাধারণের মনে একটা অহেতুক আগ্রহ থাকিতে পারে। কিন্তু বোধ হয় তাহা "সাধারণের স্বার্থের দিকে (in public interest) লক্ষ্য রাখিয়া প্রকাশ করিয়া বলা চলে না। এই শত কমিটীর নাম জানিলে হয় ত' একটা আভাষ পাওয়া যায়। ইহার পর আর ভারত-সরকার, তথা বৃটিশ গভর্ণমেন্টকে কেহ

নিন্দা করিতে পারে না। ভাত কাপড় ভারতবাসীর জীবনে দু'টা অত্যাবশ্যক বস্তু; যুদ্ধোত্তরকালে যাহাতে যানবাহন, শাসন, ঋণশোধ, পেন্‌সন, আমদানী শুল্ক, ফ্রি-ট্রেড, প্রভৃতি অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় লইয়া বিব্রত না হইতে হয় তাহার ব্যবস্থা হইতেছে। ইহার পরও যদি কেহ দোষ দেখে, তাহারা বিশ্বনিন্দুক।

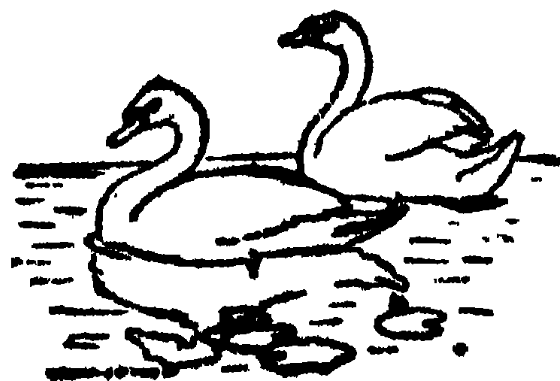
সামরিক প্রসঙ্গ

আফ্রিকা—৮ই মে তারিখের সংবাদে প্রকাশ টিউনিস ও বিজার্টা (Bizerta) মিত্রশক্তি অধিকার করিয়াছে। ৭ই মের বিকালের দিকে বৃটিশ ও আমেরিকান সৈন্যগণ সম্পূর্ণরূপে এই দুইটী নগরীকে শত্রু কবল হইতে মুক্ত করিয়াছে। আলজিয়ারস্ রেডিও বলিয়াছে এক্সিস্ শক্তি টিউনিসিয়া হইতে 'বন্' অন্তরীপের দিকে পলায়ন করিতেছে। টিউনিসিয়া হারাইয়া এক্সিস্ শক্তিবর্গের সমগ্র আফ্রিকা অধিকার করিবার স্বপ্ন ছুটিয়া গেল। মুসোলিনীর আস্ফালন শুনিলে আজ সত্যই হাসি পায়। মুসোলিনী দম্ভের সহিত বলিয়াছে, 'আমরা আফ্রিকা পুনরাধিকার করিব'। অবশ্য এ-কথাও ঠিক যে কয়েকবার ধরিয়া উভয়পক্ষ উত্তর আফ্রিকা অধিকার করিতেছে আবার তাহা হারাইতেছেও। দেখা যাউক এইবার কি হয়। বৃটীশ অষ্টম বাহিনীর সাফল্য কিন্তু প্রশংসার্হ।

ভারতবর্ষ—দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্তে বৃটীশ শত্রু জাপান প্রায়ই বিমান হানা দিতেছে এবং আরাকান-এর উত্তর পশ্চিমে দুই পক্ষের সংঘর্ষ ঘটিতেছে, তাহার সংবাদ দিল্লী হইতে সামান্য সামান্য পাওয়া যাইতেছে। সংবাদগুলি সম্পূর্ণ নহে তবে যে-টুকু পাইতেছি, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, জাপান ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইবার প্রয়াস পাইতেছে। বৃটীশ বা আমেরিকান বোমারু বিমান প্রায়ই শত্রু অধিকৃত অঞ্চলে হানা দিয়া তাহাদের প্রভূত ক্ষতি সাধন করিয়া আসিতেছে। জাপ বোমারুগণও ফেণী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজারে হানা দিতেছে। ইতিমধ্যে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফালেও তাহারা উপর্য্যুপরি দুইদিন বোমা নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছে। ৭ই মে তারিখের খবর, যে তিনখানি বোমারু বিমান ১৭ খানি ফাইটার সাহায্যে, কক্সবাজারের কয়েক মাইল দক্ষিণে 'রামু'র আকাশে বৃটীশ বিমান শক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল। ১২ই তারিখের সংবাদের অবস্থা আরও সঙ্গীন বলিয়া মনে হয়—কক্সবাজারের দিকে জাপান অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে। বঙ্গ-আরাকান সীমান্তে মায়ু পাহাড়ের উৎরাই-এ বুথিয়াডং-এর কয়েক মাইল পশ্চিমে জাপানী সৈন্যেরা ঘাঁটি স্থাপনা করিতে সমর্থ হইয়াছে। রাথেডাং বহুদিন হইল আবার জাপানীদের কবলে পড়িয়াছে —এবার মংড ও বুথিয়াডং পার হইয়া উত্তরে উঠিলেই ইহারা বঙ্গভূমির পাদদেশে পৌঁছাইবে।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর- জাপান ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে কি অষ্ট্রেলিয়া আক্রমণ করিবে তাহা লইয়া অনুমানের অন্ত নাই। জাহাজ ডুবির বা জাপানী সেনার সমাবেশ প্রভৃতির ছিন্ন ছিন্ন সংবাদ যাহা মাঝে মাঝে আমরা পাই তাহাতে মনে হয় জাপান অষ্ট্রেলিয়া আক্রমণের ভাণ করিয়া দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে অধিকৃত অঞ্চল রক্ষণের জন্য এবং যুক্তরাজ্য আমেরিকাকে জব্দ করিবার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। দুই পক্ষের সংঘর্ষ ত' লাগিয়াই আছে। মিত্রপক্ষীয় নৌ ও বিমান বহরের আক্রমণে জাপানীদের বহু জাহাজ ও বিমান বিধ্বস্ত হইয়াছে।

রুশ-জার্ম্মাণ সমর—মস্কো রেডিও বলিয়াছে জার্ম্মাণী পুনরায় একটি বিরাট বসন্তকালীন অভিযান করিতেছে। বাল্টিক হইতে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত দুই হাজার মাইল ব্যাপী সীমান্তে তাহারা আবার ভীষণ ভাবে যুদ্ধ করিতেছে। কিন্তু নভোরসিস্‌কে রুশ দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যগণ তাহাদের ব্যূহ ভেদ করিয়া পশ্চিমে অগ্রসর হইতেছে। বার বার কয়েকবার ধরিয়া জার্ম্মাণী রাশিয়াকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিতে অগ্রসর হইতেছে কিন্তু প্রতিবারই বিফল হইয়া শীতকালে পিছু হটিয়া আসিতেছে। এবার দেখা যাউক হিটলার কি করে। ও-দিকে আফ্রিকায় পরাজয় গ্লানির বোঝা লইয়া রোমেল প্রমুখ সেনাপতিদের রুশ সমরাঙ্গনে পাঠাইবে না মিত্রশক্তির ইউরোপ আক্রমণের বিরুদ্ধে লাগাইবে।



"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"



দশম বর্ষ	মাঘ—১৩৪৯	২য় খণ্ড—২য় সংখ্যা



১। সমগ্র পৃথিবীকে সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের পক্ষে স্বর্গতুল্য সুখময় আবাসস্থল করিবার ভারতীয় ঋষিপ্রোক্ত কার্য্যযোগ্য পন্থা।

২। সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের সমস্ত রকমের দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ভারতীয় ঋষিপ্রোক্ত কার্য্যযোগ্য পন্থা।

৩। সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের অর্থাভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ভারতীয় ঋষিপ্রোক্ত কার্য্যযোগ্য পন্থা।

৪। সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের হৃদয় হইতে যুদ্ধ এবং দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ভারতীয় ঋষিপ্রোক্ত কার্য্যযোগ্য পন্থা।

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

উপক্রমণিকা অধ্যায়

—————:০:—————

আমরা কি বলিতে চাই?

আমরা বর্ত্তমান যুদ্ধের পরিস্থিতিতে যুদ্ধ কি করিয়া নিবৃত্ত করা যায়, সমগ্র মানব সমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের অর্থাভাব কি করিয়া দূর করা যায়, সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের সমস্ত রকমের দুঃখ সর্ব্বতোভাবে কি করিয়া দূর করা যায় এবং পৃথিবীকে কি করিয়া সর্ব্বতোভাবে মানুষের স্বর্গতুল্য সুখময় আবাস-স্থল করা সম্ভব হয়, তাহার পন্থা মানুষকে শুনাইতে চাই। আমরা যাহা বলিতে চাই তাহা কোন ব্যক্তি বিশেষ অথবা কোন সম্প্রদায় বিশেষ অথবা কোন দেশ বিশেষ অথবা কোন ধর্ম্মাবলম্বী বিশেষের জন্য নহে। আমরা যাহা বলিব তাহা সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া।

আমাদের মুখ্য বক্তব্য একটী কথা—

'বর্ত্তমান অবস্থায় পৃথিবীকে কে কোন্ পন্থায় সর্ব্বতোভাবে সকল মানুষের স্বর্গতুল্য সুখময় আবাস-স্থল করিতে পারেন?'

উপরোক্ত কথাটী পরিষ্কার করিবার জন্য আমাদিগকে নিম্নলিখিত **তিনটী কথার** আলোচনা করিতে হইবে, যথা:—

(১) বর্ত্তমান যুদ্ধের পরিস্থিতিতে যুদ্ধের প্রবৃত্তির কি করিয়া সর্ব্বতোভাবে মানবসমাজ হইতে উচ্ছেদ সাধন করা যায়?

আমরা দেখাইব যে, যুদ্ধের আয়োজন করিয়া ও যুদ্ধ করিয়া শত্রুকে পরাজিত করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে যুদ্ধের প্রবৃত্তি মানবসমাজ হইতে সর্ব্বতোভাবে দূর করা যায় না।

(২) বর্ত্তমান অবস্থায় সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের অর্থাভাব কি করিয়া দূর করা যায়?

(৩) সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের সমস্ত রকমের দুঃখ সর্ব্বতোভাবে কি করিয়া দূর করা যায়?

কি করিয়া সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের খাদ্যাভাব, পরিধেয়াভাব, বাসভূমির অভাব, প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করা যায়, কি করিয়া প্রত্যেকের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সমানভাবে সুস্থ

ও সবল রাখা যায়, কি করিয়া প্রত্যেকের শান্তি স্থায়ী করা যায়, কি করিয়া প্রত্যেকের অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু দূর করা যায়, ইহা আমরা একে একে দেখাইব।

এই পৃথিবীকেই যে মানুষের পক্ষে স্বর্গতুল্য সুখময় আবাসস্থল করিয়া তোলা যায়, এবং মানুষই যে তাহা করিতে পারে, তাহাও আমরা দেখাইব।

কোন নীতি-বাদ অথবা কোন ধর্ম্ম-বাদ অথবা কোন দর্শন-বাদ অথবা কোন বিজ্ঞান বাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কোন নীতিকথা অথবা ধর্ম্মকথা অথবা কোন দর্শনের কথা অথবা কোন বিজ্ঞানের কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা মুখ্যতঃ বলিতে চাই কার্য্য-পন্থার কথা এবং কার্য্যের কথা। মানুষ যাহা করিতে পারে না অথবা যাহা করিতে গেলে কোন মানুষের কোন অবস্থায় কোন রকমের কষ্ট হয়, তাদৃশ কোন কার্য্য-পন্থায় আমাদিগের বিশ্বাস নাই। তাদৃশ কোন কার্য্য-পন্থার কথা আমরা বলিব না। আমরা কেবলমাত্র সেই কার্য্য-পন্থার কথা বলিব যে কার্য্য-পন্থায় পৃথিবী স্বতঃই মানুষের পক্ষে স্বর্গতুল্য হইয়া উঠিবে এবং যে কার্য্য-পন্থায় কেবল মাত্র এমন কার্য্য আছে যাহা প্রত্যেক মানুষ তাঁহার স্ব স্ব অবস্থায় অনায়াসে করিতে পারেন এবং করিলে তৃপ্তিলাভ করেন। আমরা যে কথাগুলি বলিব সেই কথাগুলি মূলতঃ ভারতবর্ষের ব্যাসদেব নামক ঋষির গ্রন্থসমূহ হইতে ধার করা।

বর্ত্তমান অবস্থায় পৃথিবীকে কোন্ পন্থায় কে সর্ব্বতোভাবে সকল মানুষের সুখময় আবাস-স্থল করিতে পারেন তাহা আমরা বলিতে চাই কেন, তাহার কৈফিয়ৎ মানুষকে সর্ব্বাগ্রে শুনাইতে চাই। আমরা দেখিতেছি যে, এই পৃথিবীকে সর্ব্বতোভাবে সকল মানুষের স্বর্গতুল্য সুখময় আবাস-স্থল করিতে পারা যায় অথচ এই পৃথিবী আজকাল মানুষের পক্ষে নরকের মত হইয়া পড়িয়াছেন। একদিকে যুদ্ধের অগ্নিকাণ্ড এবং অন্যদিকে ঘরে ঘরে খাদ্যের অভাব, পরিধেয়ের অভাব, বাসগৃহের অভাব, সাজসরঞ্জামের অভাব। সর্ব্বত্রই হাহাকার!

আমাদিগের মতে বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রধান কারণ পৃথিবীর সর্ব্বত্রব্যাপী অর্থাভাব।

একদিকে দেখিতেছি যে,—

সমগ্র জগতের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের অর্থাভাব দূর করিবার ব্যবস্থা না হইলে যুদ্ধ-প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করা সম্ভব নহে। অন্যদিকে অস্ত্র-শস্ত্রের ঝন্‌ঝনানি বন্ধ না হইলে অর্থাভাব দূর করিবার কোন কার্য্য সর্ব্বতোভাবে চালান সম্ভব নহে। সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের অর্থাভাব দূর করিতে না পারিলে সমস্ত রকমের দুঃখ সর্ব্বতোভাবে সমগ্র মানবসমাজ হইতে দূর করা সম্ভব নহে। সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক

দেশের প্রত্যেকের সমস্ত রকমের দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ব্যবস্থা না হইলে এই পৃথিবীকে সর্ব্বতোভাবে সকল মানুষের স্বর্গতুল্য সুখময় আবাস-স্থল করিতে পারা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ দেখিতেছি যে—

সমগ্র জগতের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের অর্থাভাব দূর করিবার ব্যবস্থা ও কার্য্য যুদ্ধ সত্ত্বেও এখনই আরম্ভ করা যাইতে পারে। ঐ ব্যবস্থা ও কার্য্য আরম্ভ হইলেই যুদ্ধাস্ত্রের ঝনঝনানি নিবৃত্ত হইতে পারে। যুদ্ধাস্ত্রের ঝনঝনানি নিবৃত্ত হইলেই অর্থাভাব দূর করিবার কার্য্য পূরাদমে চলিতে পারে। অর্থাভাব দূর করিবার কার্য্য পূরাদমে চলিলে অদূর-ভবিষ্যতে সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের অর্থাভাব সর্ব্বতোভাবে দূর হইতে পারে। প্রত্যেকের অর্থাভাব সর্ব্বতোভাবে দূর হইলে প্রত্যেকের সমস্ত রকমের দুঃখও সর্ব্বতোভাবে দূর হইতে পারে। প্রত্যেকের সমস্ত রকমের দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর হইলে এই পৃথিবীই—যাহা এখন নরকে পরিণত হইয়াছে—সেই পৃথিবীকে সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের পক্ষে স্বর্গতুল্য সুখময় আবাস-স্থল করিতে পারা যায়।

আমরা যাহা যাহা বলিতেছি তাহার কোনটী কাল্পনিক নহে। আমরা মানুষকে দেখাইতে বসিয়াছি যে উহার প্রত্যেক কথাটী কার্য্যযোগ্য।

যাঁহারা যুদ্ধ চালাইতেছেন তাঁহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে—

প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য আশ্রিত মানুষগুলিকে এত কষ্ট দেওয়াই তাঁহাদের মনুষ্যোচিত কর্ত্তব্য ?—না, আশ্রিত মানুষগুলির দুঃখ যাহাতে যায় এবং এই পৃথিবী যাহাতে প্রত্যেক মানুষের স্বর্গতুল্য সুখময় আবাস-স্থল হয় তাহা করিতে হইলে যদ্যপি প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি বিসর্জ্জন দিতেও হয়—তাহা বিসর্জ্জন দেওয়া সঙ্গত ?

আমরা সমস্ত জগতের জনসাধারণকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে—

ইহা যদি প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্রীয় নেতাগণ প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি বিসর্জ্জন করিলে এখনই সকল মানুষের অর্থাভাব দূর করিবার ব্যবস্থা ও কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে এবং ঐ কার্য্য আরম্ভ হইলে এখনই অস্ত্রের ঝনঝনানি নির্ব্বাপিত হইতে পারে এবং অস্ত্রের ঝনঝনানি নির্ব্বাপিত হইলে সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের অর্থাভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার কার্য্য পূরাদমে চলিতে পারে এবং এখন হইতে সাত বৎসরের মধ্যে সর্ব্বজগতের প্রত্যেকের অর্থাভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করা যাইতে পারে এবং পঁচিশ বছরের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীকে প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের পক্ষে স্বর্গতুল্য সুখময় আবাস-স্থল করিয়া তুলিতে পারা যাইতে পারে, তাহা হইলে তাঁহারা কি একযোগে রাষ্ট্রীয় নেতাগণ যাহাতে প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি বিসর্জ্জন দেন তাহার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইবেন না ?

পৃথিবী বর্ত্তমান কালে মানুষের ভুলে মানুষের পক্ষে নরকের তুল্য হইয়া পড়িয়াছে অথচ ঋষির দেওয়া যে সঙ্কেতে মানুষ চেষ্টা করিয়া ইহাকে প্রত্যেক মানুষের পক্ষে স্বর্গ-তুল্য করিয়া তুলিতে পারেন সেই সঙ্কেত আমাদিগের নিকট আছে। ইহারই জন্য আমরা কোন্ সঙ্কেতে মানব সমাজ পরিচালিত হইলে এবং কে ঐ পরিচালনার ভার লইলে এই পৃথিবীকে প্রত্যেক মানুষের পক্ষে, স্বর্গ-তুল্য করিয়া তুলিতে পারেন তাহার কথা সমগ্র মানবসমাজকে শুনাইতে চাই।

আমরা যে সঙ্কেতের কথা বলিতেছি সেই সঙ্কেত অনুসারে পৃথিবীকে তাহার বর্ত্তমান অবস্থা হইতে প্রত্যেক মানুষের পক্ষে স্বর্গ-তুল্য অবস্থায় পরিণত করিতে হইলে—

সর্ব্ব প্রথমে প্রত্যেক মানুষের যাহাতে অর্থাভাব দূর হয় তাহার ব্যবস্থা ও কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে ; ঐ ব্যবস্থা ও কার্য্য আরম্ভ না হইলে যুদ্ধের প্রকৃত নিবৃত্তি সাধন করা সম্ভব হইবে না। এই যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ ব্যবস্থা ও কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে এবং মানব সমাজকে ঐ ব্যবস্থা ও কার্য্যের নেতৃত্ব অর্পণ করিতে হইবে—ইংরাজজাতির হস্তে।

দ্বিতীয়তঃ অস্ত্রের ঝনঝনানি যাহাতে বন্ধ হয় তাহার ব্যবস্থা ইংরাজ জাতিকে করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ যাহাতে সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের সমস্ত রকমের দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর হয় তাহা করিতে হইবে ইংরাজজাতির নেতৃত্বে, প্রত্যেক দেশের রাষ্ট্রীয় নেতাগণকে ও প্রত্যেক দেশের প্রত্যেককে।

ভারত গভর্ণমেণ্টের আইন অনুসারে তাঁহাদের সর্ব্বতোমুখী যুদ্ধনীতি (Policy of Total war-fare) নামক নীতির বিরোধিতা করা যে অপরাধ তাহা আমরা পরিজ্ঞাত। কোন্ কার্য্য সর্ব্বতোমুখী যুদ্ধনীতি (Policy of Total war-fare) এর বিরোধী এবং কোন্ কার্য্য উহার বিরোধী নহে তাহা ভারত গভর্ণমেণ্টের আইন হইতে আমরা বুঝিতে পারি নাই। মোটামুটি বুঝিয়াছি যে বিচারক যে কার্য্যকে সর্ব্বতোমুখী যুদ্ধনীতি (Policy of Total war-fare) এর বিরোধী বলিয়া মনে করিবেন তাহাই সর্ব্বতোমুখী যুদ্ধনীতি (Policy of Total war-fare) এর বিরোধী। আমরা যাহা বলিতে চাহিতেছি তাহা মানবসমাজ হইতে যাহাতে যুদ্ধের প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে দূর হয় তৎসম্বন্ধীয় কথা। কোন্ পন্থায় রণসাজে না সাজিয়াও প্রত্যেক দেশের গভর্ণমেণ্ট নিজ নিজ প্রতিষ্ঠা চিরদিন বজায় রাখিতে পারেন তাহা আমাদের অন্যতম বক্তব্য। ভারত গভর্ণমেণ্ট রণসাজ আরও বাড়াইবেন অথবা খুলিয়া ফেলিবেন কিম্বা ভারতবাসী রণসাজের সাহায্য করিবেন অথবা বিপক্ষতা করিবেন তৎসম্বন্ধে আমরা কোন কথা কহিব না। গভর্ণমেণ্টের আইন অমান্য করা আমরা পছন্দ করি না ; কারাগার বরণ করা আমরা অপছন্দ করি। আমাদের মতে গভর্ণমেণ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে কোন দেশের কোন মানুষের পক্ষে নিজ নিজ কোন দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর করা সম্ভব নহে। কাজেই গভর্ণমেণ্ট যাহাতে

সুপ্রতিষ্ঠিত হন তাহা প্রত্যেক মানুষের করা কর্ত্তব্য। গভর্ণমেণ্টের আইন অমান্য করিলে গভর্ণমেণ্টের সুপ্রতিষ্ঠার বাধা জন্মান হয়। প্রত্যেক মানুষের পক্ষে যেরূপ গভর্ণমেণ্টের সুপ্রতিষ্ঠার জন্য কর্ত্তব্য আছে সেইরূপ গভর্ণমেণ্টের নিজেরও তাঁহার সু-প্রতিষ্ঠার জন্য কর্ত্তব্য আছে। দেশের মধ্যে অথবা অন্য দেশের সহিত যাহাতে দ্বন্দ্ব-কলহ না ঘটিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। যে গভর্ণমেণ্ট ঐ ব্যবস্থা না করিতে পারেন তাঁহার যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইতে হয় এবং প্রতিষ্ঠায় বাধা উপস্থিত হয়। আমাদের মতে এক্ষণে যখন জগতে এত বড় যুদ্ধ বিগ্রহ আসিয়া পড়িয়াছে তখন কোন গভর্ণমেণ্টকে ইহার জন্য তিরস্কার করা সঙ্গত নহে। উহাতে দ্বন্দ্ব-কলহের বৃদ্ধি ছাড়া আর কোন সুফল লাভ করা সম্ভব হইবে না।

এই অবস্থায় যাহাতে এই পৃথিবী প্রত্যেক মানুষের পক্ষে স্বর্গ-তুল্য হইতে পারেন তাহা করিতে হইলে কি করিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রবৃত্তি মনুষ্যসমাজ হইতে দূর হইতে পারে তাহার আলোচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

যুদ্ধ যাহাতে মানবসমাজে আর না হইতে পারে তাহা আমাদের ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টেরও অন্যতম উদ্দেশ্য। তাঁহারা মনে করেন যে শত্রুপক্ষকে পরাজিত করিয়া নিরস্ত্র করিতে পারিলেই যুদ্ধ মানবসমাজ হইতে দূরীভূত হইবে এবং তাহার জন্যই তাঁহারা সর্ব্বতোমুখী যুদ্ধনীতি (Policy of Total war-fare) গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদিগের মতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিচারে ভুল আছে। যুদ্ধে পরাজিত করিয়া শত্রুপক্ষকে পরাজিত ও নিরস্ত্র করিতে পারিলে যাঁহারা কোন যুদ্ধে মিত্রপক্ষ অথবা নিষ্ক্রিয় (Neutral) থাকেন তাঁহারাই যে আবার শত্রু হইয়া যুদ্ধ করিবেন না তাহার কোন নিশ্চয়তা থাকে না।

১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে জার্ম্মানজাতি পরাজিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে সম্ভবযোগ্য অংশে নিরস্ত্রও করা হইয়াছিল। আর যাহাতে মানবসমাজে যুদ্ধ না হয় তজ্জন্য League of Nations ও গঠন করা হইয়াছিল। তখন জাপানিগণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মিত্রপক্ষীয় ছিলেন। কিন্তু ঐ মিত্রপক্ষীয় জাপানিরাই আবার শত্রুপক্ষীয় হইয়াছেন এবং নিরস্ত্র জার্ম্মানগণও আবার সশস্ত্র হইয়া দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছেন। ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধ হইতেও ভীষণতর যুদ্ধ আবার সমগ্র মানবসমাজকে সহ্য করিতে হইতেছে।

আমাদের মতে যুদ্ধের আশঙ্কা হইতে মুক্ত হইয়া প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক গভর্ণমেণ্ট যাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন তাহা করিতে হইলে যুদ্ধের প্রবৃত্তি যাহাতে মানবসমাজ হইতে দূর হয় তাহা করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

যুদ্ধে কাহাকেও পরাজিত করিয়া অথবা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কখনও যুদ্ধের প্রবৃত্তি দূর করা সম্ভব হয় না ; উহাতে বরং যুদ্ধের প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বাড়িয়া যায়।

যুদ্ধের প্রবৃত্তি দূর করিতে হইলে যুদ্ধের কারণ দূর করিতে হয়।

ভারতীয় ঋষিগণের মতে অর্থাভাব ছাড়া কখনও মানুষে মানুষে যুদ্ধ হইতে পারে না। অবশ্য আজকাল মানুষ যাহাকে wealth বলেন তাহার সঙ্গে ভারতীয় ঋষির অর্থের কিছু পার্থক্য আছে। ঐ পার্থক্যের কথা আমরা পরে আলোচনা করিব।

মোটের উপর আমরা বলিতে চাই যে এই পৃথিবী যাহাতে প্রত্যেক মানুষের পক্ষে স্বর্গ-তুল্য হইতে পারেন, তাহা করিতে হইলে কি করিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রবৃত্তি মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের হৃদয় হইতে দূর করা যায় তাহার কথা মানুষকে ভাবিতে হইবে এবং তজ্জন্য কি করিয়া প্রত্যেক মানুষের অর্থাভাব দূর করা যায় তাহাও মানুষকে ভাবিতে হইবে।

আমাদের মুখ্য বক্তব্যে হাত দিবার আগে আমরা মোট পাঁচটী কথা বলিব। ঐ পাঁচটী কথার প্রথম তিনটীর উদ্দেশ্য—সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের অর্থাভাব দূর করিয়া কোন্ পন্থায় ইংরাজ জাতির নেতৃত্বে মানুষের হৃদয় হইতে যুদ্ধের প্রবৃত্তি সম্পূর্ণভাবে মুছিয়া ফেলা যায়। চতুর্থ-টীর উদ্দেশ্য—মানুষের যুদ্ধের প্রবৃত্তি দূর করিবার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে এবং যুদ্ধ চলিতে থাকিলে মানবসমাজের ও জগতের অবস্থা কি হইতে পারে তাহা দেখান। পঞ্চমটীর উদ্দেশ্য—ইংরাজ জাতি চেষ্টা করিলে সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেকের পক্ষে এই পৃথিবীটিকে যে স্বর্গ-তুল্য সুখময় করিয়া তুলিতে পারেন তাহা দেখান।

যে পাঁচটী কথা বলিতে চাই তাহা এই—

(১) **বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রধান কারণ—জগৎব্যাপী অর্থাভাব।**

এই অর্থাভাব হইতে কোন দেশ বর্ত্তমানে মুক্ত নহেন। প্রায় প্রত্যেক দেশই ভাবিতেছেন যে অন্য কোনদেশের কিছু শস্য-ক্ষেত্র এবং বাজার কাড়িয়া লইতে পারিলে অথবা জোর্ করিয়া দখলে রাখিতে পারিলে অর্থাভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন। ইহারই জন্য কেহ বা কাড়িয়া লইবার উদ্দেশ্যে আর কেহ বা দখল বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে, সম্মান, সম্পদ ও সুখ-তৃষ্ণা বিসর্জ্জন দিয়া পাশবিক যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। প্রত্যেক দেশেই যে সেই দেশের সমগ্র মানবসংখ্যাকে সুস্থ শরীরে ও সুস্থ মনে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে খাদ্য, পরিধেয়, বাস-গৃহ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণের জন্য ভূমিজাত, জল-জাত এবং প্রাণীজাত কাঁচামাল যে পরিমাণে প্রয়োজন তাহা উৎপন্ন হইতেছে না এবং যথোপযুক্তভাবে বণ্টিত হইতেছে না তাহা কোন দেশই দেখিতেছেন না।

(২) **সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের যাহাতে অর্থাভাব দূর হয় তাহার ব্যবস্থা যতদিন না করা যাইবে ততদিন মানবসমাজ হইতে অন্য কোন উপায়ে যুদ্ধের প্রবৃত্তি**

সর্ব্বতোভাবে দূর করা সম্ভব হইবে না। অন্য যে কোন উপায়ই অবলম্বন করা যাক্ না কেন তাহাতে সাময়িকভাবে সম্মুখ সমরের তীব্রতা অথবা অস্ত্রশস্ত্রের ঝনঝনানি কিছুদিনের জন্য নির্ব্বাপিত হইতে পারে বটে, কিন্তু সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের অর্থাভাব দূর করিবার ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত যুদ্ধের প্রবৃত্তি থাকিয়া যাইবে এবং আবার উহা সময়ান্তরে পুনরায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে। একটী দেশেও অর্থাভাব থাকিলে সেই একটী দেশই জঠরানলের জ্বালায় হতাশ হইতে পারেন এবং অন্যান্য দেশকেও যুদ্ধে আহ্বান করিয়া সমগ্র মানবসমাজকে বিব্রত করিয়া তুলিতে পারেন।

(৩) অনেকে মনে করেন যে সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের অর্থাভাব দূর করা সম্ভব নহে। আমরা দেখাইব যে উহা সম্পূর্ণ সম্ভব।

কি করিয়া সমগ্র জগতের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের অর্থাভাব দূর করিতে হয় এবং প্রত্যেকের সমস্ত রকমের দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর করিতে হয় তাহার কার্য্যযোগ্য পন্থা ভারতবর্ষের ঋষিগণ দেখাইয়াছেন।

আমরা ঐ কার্য্যযোগ্য পন্থা সমগ্র মানবসমাজকে শুনাইতে চাই।

সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের অর্থাভাব যে পন্থায় দূর হইতে পারে **সেই পন্থা জগতের বর্ত্তমান প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক অবস্থায় একমাত্র ভারতবর্ষে অবলম্বিত হইতে পারে।** ভারতবর্ষে যাহাতে ঐ পন্থা অবলম্বিত হয় তাহা অনতিবিলম্বে করিতে পারিলে ভারতবর্ষের সহায়তায় আগামী সাত বৎসরের মধ্যে সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের অর্থাভাব দূর করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে ঐ পন্থা অবলম্বিত না হইলে জগতের বর্ত্তমান প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক অবস্থায় আর কোন দেশের পক্ষে এই পন্থা অবলম্বন করা সম্ভব নহে।

ভারতবর্ষে এই পন্থা যাহাতে অনতিবিলম্বে অবলম্বন করা সম্ভব হয় তাহা করিতে জগতের প্রত্যেক দেশকে ইংরাজজাতির নেতৃত্ব মানিয়া লইতে হইবে। ইংরাজজাতির নেতৃত্ব মানিয়া না লইলে ভারতবর্ষে এই পন্থা অনতিবিলম্বে গ্রহণ করা সম্ভব নহে। জগতের প্রত্যেক দেশকে যেরূপ ইংরাজজাতির নেতৃত্ব মানিয়া লইতে হইবে, সেইরূপ ইংরাজজাতিকেও জগতের নেতৃত্বের উপযুক্ততা প্রমাণ করিবার জন্য আগেই শত্রুমিত্রনির্ব্বিশেষে সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের অর্থাভাব দূর করিবার চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে এবং এই চুক্তিপত্র যাহাতে প্রত্যেক দেশের বিশ্বাসযোগ্য হয় তাহার ব্যবস্থায় সম্মত হইতে হইবে। ইহা ছাড়া কোন্ পন্থায় ভারতবর্ষের সহায়তায় সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের অর্থাভাব দূর করা সম্ভব, তাহা ইংরাজের রাষ্ট্র-নেতাগণকে আমাদের নিকট হইতে ভাল করিয়া বুঝিয়া

লইতে হইবে। ভারতবাসীগণ যাহাতে তাঁহাদের পরস্পরের বিদ্বেষ, ইংরাজজাতির বিরুদ্ধে বিদ্বেষ এবং তাঁহাদের স্বাধীনতার দাবী স্বতঃই ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন তাহাও ইংরাজজাতিকে ভারত-শাসনের নীতি পরিবর্ত্তন করিয়া সাধন করিতে হইবে। যাঁহারা কপটাচারী, আত্ম-পরীক্ষায় অক্ষম, আকাশ, বাতাস, জল, স্থল ও মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাব সর্ব্বতোভাবে বুঝিবার অক্ষমতা সত্ত্বেও দম্ভযুক্ত, তাঁহারা যাহাতে ইংরাজজাতির রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব না পাইতে পারেন তাহাও ইংরাজজাতিকে করিতে হইবে।

(৪) **বর্ত্তমানে আকাশে, জলে এবং স্থলে যেরূপ ভীষণভাবে তেজস্মান দ্রব্য সমূহের ব্যবহারে যুদ্ধ চলিতেছে তাহা আর কিছুদিন চলিলে প্রাকৃতিক কারণে অশ্রুতপূর্ব্ব ভূমিকম্প ও আগ্নেয়োদ্গমের দারুণ আশঙ্কা আছে** এবং তাহাতে আমেরিকা (America) ও জাপান (Japan) এই দুইটী দেশ অশ্রুতপূর্ব্ব রকমের লোকসান গ্রস্ত হইতে পারেন। অ্যাসিয়া (Asia) এবং ইয়োরোপের (Europe) স্থানে স্থানে ঐ ভূমিকম্প ও আগ্নেয়োদ্গম অল্পাধিক ভাবে ঘটা অসম্ভব নহে। প্রত্যেক দেশের মানুষের ক্লেশও অভাবনীয় মাত্রায় সর্ব্ববিধ রকমে বৃদ্ধি পাইবে। ইহা আমাদিগের কাল্পনিক কথা নহে এবং গণকগণের কল্পিত গণনা প্রসূত নহে। কার্য্য-কারণের বিজ্ঞানের দ্বারা উহা আমরা বুঝাইব।

(৫) ইংরাজজাতি যদ্যপি তাহাদের স্বভাব-জাত এবং প্রকৃতি-জাত হৃদয়কে সংযত করিয়া মনুষ্যোচিত আদর্শে অনুপ্রাণিত হন এবং ঐ আদর্শানুসারে কার্য্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, তাহা হইলে সমগ্র মনুষ্য জাতির প্রত্যেক দেশের মানুষের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত মনুষ্যোচিত ভাবে চলিতে যত্নবান হইবেন তাঁহাদের, শুধু অর্থাভাব কেন, সমস্ত রকমের দুঃখ দূর করিয়া তাঁহারা যাহাতে সর্ব্বতোভাবে সুখী হইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা ভারতবর্ষের সহায়তায় ইংরাজজাতির দ্বারাই সাধিত হইতে পারে।

আমাদের পঞ্চম কথাটী আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিব।

আজকালকার মানুষের ধারণা যে অর্থাভাব দূর হইলেই মানুষ তাঁহার ইচ্ছামত খাদ্য, পরিধেয়, বাসগৃহ, যানবাহনাদি ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম ক্রয় করিতে পারেন এবং এমন কি ইচ্ছামত নাম, যশ, প্রভুত্ব পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। কাজেই তাঁহারা মনে করেন যে মানুষের নিজ নিজ অর্থাভাব দূর হইলেই মানুষের সমস্ত রকমের দুঃখ দূর হয় এবং তখন সর্ব্বতোভাবে মানুষ সুখী হইতে পারেন।

ভারতীয় ঋষি এই সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহাতে আমরা অন্য রকম বুঝিয়াছি এবং ভারতীয় ঋষির কথা অত্যন্ত ঠিক বলিয়া আমাদিগের মনে হইয়াছে।

এই সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষির প্রথম কথা এই যে—

নিজ নিজ অর্থাভাব দূর হইলে নিজ নিজ ইচ্ছা পূরণ করা যায় বটে এবং তাহাতে কয়েকটা তৃপ্তিও লাভ করা যায় বটে কিন্তু সমাজের প্রত্যেকের অর্থাভাব দূর না হইলে অর্থাভাবের তাড়নায় মানুষের মধ্যে চুরি করিবার, জোর করিয়া কাড়িয়া লইবার এবং প্রতারণা করিয়া লইবার প্রবৃত্তি স্বতঃই জাগ্রত হয়। তাহাতে অর্থশালী লোকের অর্থ থাকা সত্ত্বেও অনেক সময়েই বিব্রত হইতে হয়। কাজেই তাঁহাদের মতে কেবল নিজ নিজ অর্থাভাব দূর করিতে পারিলেই সব সময়ে তৃপ্তি রক্ষা করা সম্ভব হয় না। নিজ নিজ অর্থাভাব দূর করিয়া সর্ব্বতোভাবের তৃপ্তি লাভ করিতে হইলে দেশের প্রত্যেকের অর্থাভাব যাহাতে দূর হয় তাহার ব্যবস্থার প্রয়োজন।

ইহার পরই তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে শুধু নিজ দেশের প্রত্যেকের যাহাতে অর্থাভাব দূর হয় তাহার ব্যবস্থা হইলেই কাহারও পক্ষে সর্ব্বতোভাবের তৃপ্তি পাওয়া সম্ভব হয় না। নিজের দেশের মধ্যে কাহারও অর্থাভাব থাকিলে, যেরূপ স্বতঃই অর্থাভাবের তাড়নায় মানুষের মধ্যে চুরি করিবার, ডাকাতি করিবার এবং প্রতারণা করিবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়, সেইরূপ মানব-সমাজের অন্য কোন দেশের অর্থাভাব থাকিলে, সেই দেশের মানুষেরও অর্থাভাবের তাড়নায় অন্যদেশ হইতে চুরি করিয়া লইবার, প্রতারণা করিয়া লইবার এবং ডাকাতি করিয়া লইবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হইয়া থাকে এবং তাহাতেও প্রত্যেক দেশের মানুষের বিব্রত থাকিতে হয়।

কাজেই, তাঁহাদের মতে, কোন একটী মানুষ যদি কেবল মাত্র তাহার নিজ তৃপ্তি সর্ব্বতোভাবে সাধন করিতে চান তাহা হইলে কেবল মাত্র তাঁহার নিজের অর্থভাব দূর করিবার চেষ্টা করিলেই চলিবে না। সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের অর্থাভাব যাহাতে দূর হয়, প্রত্যেকের প্রতারণা প্রবৃত্তি, চৌর্য্যপ্রবৃত্তি, জোর করিয়া কাড়িয়া লইবার প্রবৃত্তি যাহাতে নিবৃত্তি লাভ করে তাহার ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

এই সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষির দ্বিতীয় কথা—

নিজ নিজ খাদ্য, পরিধেয়, বাসভূমি ও সাজ-সরঞ্জামের সঙ্গে নিজের শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের স্বাস্থ্যের, মনের শান্তির এবং বুদ্ধির প্রাখর্য্যের অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ। খাদ্য, পরিধেয়, বাসগৃহ এবং সাজ-সরঞ্জামের কোনটীর অভাব হইলে যেরূপ কষ্ট হয় সেইরূপ কোনটী নিজের মনের মত না হইলেও কষ্টকর হয়। নিজের মন যাহা যাহা চায় তাহার প্রত্যেকটী যেরূপ পরিমাণে পাওয়া চাই সেইরূপ আবার প্রত্যেকটী যাহাতে মনের মত হয় তাহারও ব্যবস্থা চাই। কিন্তু শুধু মনের মত হইলেই চলে না। ভারতীয় ঋষির মতে মন অনেক সময়েই ঠিক বস্তু বাছিতে পারে না। আজ যাহা তৃপ্তিকর বলিয়া মন মনে করিতেছে, আবার পরের দিনই তাহা বাতিল করিয়া দিতেছে।

খাদ্য, পরিধেয়, বাসগৃহ এবং সাজসরঞ্জাম, এমন জিনিষ এত পরিমাণে, মন এক এক সময়ে চাহিয়া বসিতেছে যে পরক্ষণেই বুঝা যায় যে, উহাতে হয় শরীরের অস্বাস্থ্য না হয় ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা ও বিপদ নতুবা মনের অশান্তি ঘটিতেছে। এমন কি বুদ্ধির উপর পর্য্যন্ত বিকৃত ক্রিয়া ঘটিতেছে।

উপরোক্ত কথাগুলি মানুষের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া ভারতীয় ঋষি বুঝাইয়াছেন যে অর্থাভাব দূর করিয়া নিজ নিজ তৃপ্তি সর্ব্বতোভাবে সাধন করিতে হইলে শুধু যে মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের খাদ্য, পরিধেয়, বাসভূমি ও অন্যান্য সরঞ্জামের অভাব দূর করিবার ব্যবস্থার প্রয়োজন, তাহা নহে; মানুষের প্রত্যেকের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি যাহাতে সমানভাবে ভাল থাকে এবং কোনটী যাহাতে খারাপ না হইতে পারে তদুপযোগীভাবে খাদ্য, পরিধেয়, বাসগৃহ এবং সাজসরঞ্জামের প্রত্যেকটীর বাছাই হওয়াও একান্ত দরকার।

এই সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষির তৃতীয় কথা —

যদি কোন মানুষ তাঁহার নিজের তৃপ্তি সর্ব্বতোভাবে যাহাতে সর্ব্বদা রক্ষা করা যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে চাহেন, তাহা হইলে—

প্রথমতঃ প্রত্যেকের খাদ্য, পরিধেয়, বাসগৃহ এবং অন্যান্য সাজসরঞ্জাম যাহাতে তাঁহার নিজ নিজ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই চারিটীর কোনটীর অস্বাস্থ্যকর না হয় এবং সমানভাবে এই চারিটীর পুষ্টি সাধিত হয় সেইরূপভাবে খাদ্য, পরিধেয়, বাসভূমি ও অন্যান্য সাজসরঞ্জামের প্রত্যেকটীর বাছাই হওয়ার ব্যবস্থা হওয়া চাই।

দ্বিতীয়তঃ যে সমস্ত কাঁচামাল হইতে খাদ্য, পরিধেয়, বাসগৃহ ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগীভাবে তৈয়ারী হইতে পারে সেই সমস্ত কাঁচামাল যাহাতে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের অভাব পূরণ করিবার মত প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে প্রত্যেক দেশের সেইরূপ ব্যবস্থা হওয়া চাই। তাহা ছাড়া কাঁচামাল উৎপাদনের প্রণালীও এমন হওয়া চাই যে উৎপাদকগণের কোনরূপ অস্বাস্থ্যের সম্ভাবনা না ঘটে এবং এই প্রণালীর দোষে কোন কাঁচামাল অস্বাস্থ্যকর না হইয়া পড়ে।

তৃতীয়তঃ কাঁচামালকে খাদ্য অথবা পরিধেয় অথবা বাসগৃহ অথবা অন্যান্য সাজসরঞ্জামের জন্য ব্যবহারোপযোগী করিতে যে সমস্ত শিল্পকার্য্য ও কারুকার্য্যের প্রণালী ব্যবহৃত হয় সেই সমস্ত প্রণালীর দোষে যাহাতে খাদ্য, পরিধেয়, বাসগৃহ এবং অন্যান্য সাজসরঞ্জামের কোনটী কোন প্রকারে মানুষের অস্বাস্থ্যকর ও অতৃপ্তিকর না হয়, যাহাতে এই প্রণালীসমূহ শিল্পী ও কারিকরগণের কোনরূপ অস্বাস্থ্যকর এবং অতৃপ্তিকর না হয় তাহার ব্যবস্থা হওয়া চাই।

চতুর্থতঃ যে সমস্ত বস্তু যে যে পরিমাণে মানুষের খাদ্য, পরিধেয়, বাসগৃহ ও অন্যান্য সাজসরঞ্জামের জন্য মানুষের প্রয়োজন, সেই সমস্ত বস্তু যাহাতে প্রচুর পরিমাণে প্রত্যেক মানুষের উপার্জ্জন করা সম্ভব হয় এবং কার্য্যক্ষমতানুসারে উহার পরিমাণের বিভাগ হয় তাহার

ব্যবস্থা হওয়া চাই। ঋষিগণ দেখাইয়াছেন যে স্বাস্থ্য রক্ষার ও তৃপ্তির জন্য প্রত্যেক সংসারের যে যে খাদ্য, পরিধেয়, বাসগৃহ ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম যে যে পরিমাণে প্রয়োজন তাহা প্রত্যেক সংসারে যাহাতে পাইতে পারে তাদৃশ বন্টন ও উপার্জ্জনের ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। কিন্তু সকলের উপার্জ্জন এক রকম হইলে চলে না। সকল মানুষের কার্য্যক্ষমতা এক রকম হয় না। সকল শ্রেণীর মানুষের উপার্জ্জন সমান হইলে মানুষের কার্য্যক্ষমতার উন্নতি সাধন করিবার উৎসাহ থাকে না। কার্য্যক্ষমতার তারতম্যানুসারে উপার্জ্জনের তারতম্যের ব্যবস্থাও একান্ত প্রয়োজনীয়।

কি করিলে মানুষ তাঁহার নিজ তৃপ্তি সর্ব্বতোভাবে সাধন করিতে পারেন তৎসম্বন্ধে **ঋষিগণের চতুর্থ কথা**—

উপরোক্ত চারিটী ব্যবস্থা সাধিত হইলে সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের অর্থাভাব দূর হইতে পারে এবং প্রত্যেক মানুষই অর্থাভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন। ঋষিগণের মতে অর্থাভাব হইতে মুক্ত হইলেই মানুষের দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর হয় না। অর্থাভাবের দুঃখ না থাকিলেও অন্যান্য রকমের দুঃখ মানুষের থাকিতে পারে। অর্থাভাব না থাকিলে মানুষের অন্য কোন্ কোন্ রকমের দুঃখ থাকিতে পারে তাহা বুঝাইবার জন্য ঋষিগণ দেখাইয়াছেন যে, প্রত্যেক মানুষের দেহের অঙ্গগুলির তিন শ্রেণীর অবস্থা, তিন শ্রেণীর কার্য্য-শক্তি ও তিন শ্রেণীর কার্য্য থাকে এবং মানুষের প্রকৃতি তিন রকমের হইয়া থাকে। অর্থাভাব না থাকিলেও প্রবৃত্তির দোষে মানুষের হিংসা দ্বেষ থাকিতে পারে এবং অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু ঘটিতে পারে। তাহাতেও মানুষের দুঃখ কষ্ট ঘটিয়া থাকে। ঋষিগণ মানুষের উপরোক্ত তিন রকমের প্রবৃত্তির তিনটী নাম দিয়াছেন, যথা—

(১) **স্বাভাবিক অবস্থাজাত প্রবৃত্তি**
(২) **স্বাভাবিক কর্ম্মশক্তিজাত প্রবৃত্তি**
(৩) **প্রাকৃতিক অবস্থাজাত প্রবৃত্তি।**

এই তিনটী প্রবৃত্তির শ্রেণীবিভাগ দেখাইবার জন্য, তাঁহারা বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক মানুষই স্বতঃই নিজ নিজ উন্নতি সাধনের জন্য অথবা নিজ নিজ সুখ বিধান করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত হইয়া থাকেন। ঋষিগণের মতে এই উন্নতি বিধানের প্রযত্ন সাধারণতঃ তিন রকমে সাধিত হইয়া থাক।

কেহ বা সমগ্র মনুষ্যসমাজের কাহারও যাহাতে কোনরকমে অপকার হয় তাহা করিতে অত্যন্ত নারাজ থাকেন। যে কার্য্য করিলে সমগ্র মনুষ্যসমাজের একজনেরও কোনরূপ অনিষ্ট হইতে পারে তাহাতে তাঁহার নিজের অত্যন্ত উন্নতি হইবে বলিয়া মনে হইলেও তাহা করেন না। যে যে কার্য্য করিলে সমগ্র মনুষ্যসমাজের কাহারও অনিষ্ট না হয় এবং প্রত্যেকের উপকার হইতে পারে কেবলমাত্র সেই সেই কার্য্য করিয়াই নিজের উন্নতি

বায়

সাধন অথবা সুখ-বিধান করিবার জন্য প্রযত্নশীল হইয়া থাকেন। এতাদৃশ কার্য্য-প্রবৃত্তিকে ঋষিগণ নাম দিয়াছেন "প্রাকৃতিক অবস্থাজাত প্রবৃত্তি"।

ঋষিগণের মতে মানুষের আর এক শ্রেণীর কার্য্য-প্রবৃত্তি আছে যাহা মানুষের হৃদয়ে থাকিবার দরুণ মানুষ সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেকের ইষ্ট ও অনিষ্টের দিকে তাকাইতে চাহেন না। এই প্রবৃত্তির ফলে **মানুষের লক্ষ্য হয় কেবলমাত্র কোন একটি সঙ্ঘ অথবা সম্প্রদায় অথবা দেশের ইষ্ট ও অনিষ্টের দিকে।** মানুষের এই প্রবৃত্তি থাকে বলিয়া মানুষ সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেকের ইষ্ট ও অনিষ্টের দিকে লক্ষ্য করিতে চাহেন না বটে কিন্তু যে কার্য্য করিলে তাঁহার সঙ্ঘের অথবা সম্প্রদায়ের অথবা তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বীগণের অথবা তাঁহার সমগ্র দেশের কাহারও অনিষ্ট হইতে পারে তাহা তিনি করেন না। যে যে কার্য্য করিলে স্ব স্ব সঙ্ঘের অথবা স্ব স্ব সম্প্রদায়ের অথবা স্ব স্ব ধর্ম্মাবলম্বীগণের অথবা স্ব স্ব দেশের কাহারও অনিষ্ট না হয় এবং উহার প্রত্যেকের উপকার হইতে পারে কেবলমাত্র সেই সেই কার্য্য করিয়াই নিজের উন্নতি সাধন অথবা সুখ-বিধান করিবার জন্য প্রযত্নশীল হইয়া থাকেন। এতাদৃশ কার্য্য প্রবৃত্তিকে ঋষিগণ নাম দিয়াছেন মানুষের "স্বাভাবিক কর্ম্মশক্তিজাত প্রবৃত্তি"।

ঋষিগণের মতে মানুষের তৃতীয় আরএক শ্রেণীর কার্য্য-প্রবৃত্তি আছে যাহা মানুষের হৃদয়ে থাকিবার দরুণ সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেকের ইষ্ট ও অনিষ্টের দিকে তাকান ত দূরের কথা কোন সঙ্ঘ অথবা সম্প্রদায় অথবা স্বধর্ম্মাবলম্বী অথবা সমগ্র দেশের পর্য্যন্ত ইষ্ট ও অনিষ্টের দিকে মানুষ তাকাইতে চাহেন না। ঐ প্রবৃত্তির ফলে **মানুষ কেবলমাত্র নিজের দিকেই লক্ষ্য করিতে চাহেন** এবং নিজের উপভোগ বিধান করিবার জন্যই ব্যাকুল হন। এই প্রবৃত্তির বিদ্যমানতার ফলে মানুষ নিজ নিজ স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, জামাতা, পুত্রবধু, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, ভগ্নিপতি, ভ্রাতৃবধূ প্রভৃতির উপর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান। তাহাদের যিনি যাহাই করুন না কেন তাহাদিগের সম্বন্ধে দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য যে মানুষের অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত তাহা মনে থাকে না। এই প্রবৃত্তির ফলে স্ত্রী পুত্রাদির মধ্যে যিনি নিজ উপভোগ বিধানের যতখানি সহায়তা করেন তিনি ততখানি প্রিয় হইয়া থাকেন। যিনি উপভোগের সহায়ক নহেন তিনি নিষ্প্রয়োজনীয় হইয়া পড়েন। এতাদৃশ উপভোগের প্রবৃত্তিকে ঋষিগণ নাম দিয়াছেন—স্বাভাবিক অবস্থাগত প্রবৃত্তি।

ঋষিগণ দেখাইয়াছেন যে এই তিন শ্রেণীর প্রবৃত্তি প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে অল্পাধিক পরিমাণে সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে। কাহারও হৃদয়ে প্রাকৃতিক অবস্থাগত প্রবৃত্তি, কাহারও হৃদয়ে স্বাভাবিক কর্ম্মশক্তিগত প্রবৃত্তি, কাহার হৃদয়ে স্বাভাবিক অবস্থাগত প্রবৃত্তি প্রাবল্য লাভ করে। কোন শ্রেণীর প্রবৃত্তি একেবারে সম্পূর্ণভাবে সাধারণতঃ বিলুপ্ত হয় না।

এই তিন শ্রেণীর প্রবৃত্তি মানুষের হৃদয়ে কেন উদ্ভব হয় তাহার আলোচনা ঋষিগণ করিয়াছেন এবং উহার একটী গাণিতিক নিয়ম আছে ইহা তাহাদিগের গ্রন্থে প্রমাণিত

হইয়াছে। আমরা ঐ গাণিতিক নিয়ম সম্বন্ধের কথাগুলি সঠিক ভাবে বুঝিতে পারিয়াছি কি না তাহা আরও কিছুদিনের জন্য পরীক্ষা না করিলে বলিতে পারি না। ঐ গাণিতিক নিয়ম সম্বন্ধে যাহা পাঠ করিয়াছি তাহাতে মনে হইয়াছে যে ঋষিগণের মতে প্রত্যেক বারহাজার বৎসরে একটী মাত্র মানুষের উদ্ভব হইতে পারে যিনি তাহার সাধনার দ্বারা জীবনের কোন ভাগে তাঁহার স্বাভাবিক কর্ম্মশক্তিজাত শক্তির ও স্বাভাবিক অবস্থাজাত প্রবৃত্তির সর্ব্বতোভাবের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারেন। ঋষিগণের মতে প্রত্যেক মানুষই জন্মগ্রহণ করেন স্বাভাবিক অবস্থাজাত প্রবৃত্তির প্রাবল্য লইয়া। মানুষের কাম্য হওয়া উচিৎ প্রাকৃতিক অবস্থাজাত প্রবৃত্তির প্রাবল্য অর্জ্জন করা। একমাত্র সাধনার (culture-এর) দ্বারা এই প্রাবল্য অর্জ্জন করা সম্ভব হয়। যে কোন সাধনার দ্বারা প্রাকৃতিক অবস্থাজাত প্রবৃত্তির প্রাবল্য অর্জ্জন করা সম্ভব হয় না। উহা অর্জ্জন করিতে হইলে মানুষের এই তিন শ্রেণীর প্রবৃত্তি উহার স্বভাবের সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত কেন তাহা জানিতে হয়। উহা জানিবার জন্য আকাশ, বাতাস, জল, স্থল ও বিবিধ প্রাণীর কোন নিয়মে স্বতঃই উৎপত্তি হয় এবং কোনটীর কত শ্রেণীর অবস্থা, কত শ্রেণীর কর্ম্মশক্তি, কত শ্রেণীর কর্ম্ম এবং কত শ্রেণীর প্রবৃত্তি থাকে তাহা জানিতে হয়। উহা জানা মানুষের পক্ষে খুব দুরূহ বটে কিন্তু মানুষের অসাধ্য নহে।

ঋষিগণের মতে মানুষের স্বাভাবিক অবস্থাজাত প্রবৃত্তির প্রাবল্য থাকিলেও তাহার অর্থাভাব দূর হইবার ব্যবস্থা হইতে পারে বটে কিন্তু তাঁহাতে তাঁহার দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর হয় না। আগেই বলিয়াছি যে প্রাকৃতিক অবস্থাজাত প্রবৃত্তির প্রাবল্য অর্জ্জন করিতে না পারিলে রাগ দ্বেষের প্রবৃত্তি এবং তাহার জন্য অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু অনিবার্য্য হয়। কাজেই ঋষিদিগের মতে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের অর্থাভাব দূর করিবার সামাজিক ব্যবস্থা যেরূপ প্রয়োজনীয় সেইরূপ আবার দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার জন্য সামাজিক ব্যবস্থাও প্রয়োজনীয়।

যে পাঁচটী কথা আমাদিগের প্রধান বক্তব্য তাহার পঞ্চমটীতে আমরা ইহাই বলিতে চাই যে ইংরাজজাতি চেষ্টা করিলে ভারতবর্ষের সহায়তায় সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের অর্থাভাব যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূর হয় তাহার ব্যবস্থাত করিতে পারেনই, অধিকন্তু, সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের স্বাভাবিক অবস্থাজাত ও কর্ম্ম-শক্তিজাত প্রবৃত্তির প্রাবল্য যাহাতে দূর হয় এবং যাহাতে প্রাকৃতিক অবস্থাজাত প্রবৃত্তির প্রাবল্য অর্জ্জন করা সম্ভব হয় তাহার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করিতে পারেন।

আমরা গত আটবৎসর হইতে অনেক কথা বলিয়া আসিতেছি এবং অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমাদিগের বিশ্বাস আমাদিগের কথাগুলি ইংরাজ জাতির

রাষ্ট্রীয় নেতাগণের মনোযোগ যথাসময়ে আকর্ষণে সক্ষম হইলে জগতে আর সার্ব্বজনীন যুদ্ধ ঘটিতে পারিত না এবং মানুষকে আর এতাদৃশ ভাবে বিব্রত হইতে হইত না। আমাদিগের মতে, ইংলণ্ডের জনগণের যে স্বাভাবিক সত্যপ্রিয়তা, সাধুতা, স্পষ্টবাদীতা এবং পরিশ্রমশীলতা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ছিল এবং যাহার জন্য ঐশ্বরিক নিয়মে ইংরাজ জনগণের ভাগ্যে এতাদৃশ সাম্রাজ্য গঠন করা ও তাহার বিস্তার সাধন করা সম্ভব হইয়াছে, সেই স্বাভাবিক সত্যপ্রিয়তা প্রবৃত্তি ইংরাজ জনগণের এখনও অনেকাংশে আছে। পতিত হইয়াছেন ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিকগণ, বিশেষজ্ঞগণ এবং রাষ্ট্রীয় নেতাগণের মধ্যে যাহারা অধুনা প্রধান অংশের অভিনয় করিতেছেন তাঁহারা। ইহাদের সকলেই পতিত হইয়াছেন কি না এবং যে পতনের আবরণে আর নিজেদের ভুল বুঝা এবং সংশোধন করা অসম্ভব, সেই রকমের পতন ইঁহাদের হইয়াছে কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমরা পুনরায় প্রধানতঃ ইংরাজ জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার আশায় তাঁহারা কোন্ কার্য্যযোগ্য পন্থায় এতাদৃশ অবস্থাতেও ঈশ্বরের দেওয়া তাঁহাদের সাম্রাজ্য অটুট ভাবে রক্ষা করিতে পারেন এবং উহার বিস্তৃতি সাধন করিতে পারেন তাহা দেখাইতে বসিয়াছি।

আমাদের মতে সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের অর্থাভাব যাহাতে দূর হয় তাহার ব্যবস্থা ও কার্য্য ভারতবর্ষে ইংরাজ জাতি এই যুদ্ধ কালেও আরম্ভ করিতে পারেন। কি করিয়া তাঁহারা উহা কার্য্যতঃ এখনও আরম্ভ করিতে পারেন তাহার কার্য্য যোগ্য-সঙ্কেত ভারতীয় ঋষির গ্রন্থে আছে। এই সঙ্কেত আমরা ইংরাজ জাতিকে দেখাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি। আমরা ইংরাজ জাতির যে কোন সংযত চরিত্রের দম্ভহীন প্রতিনিধিকে আমাদিগের নিকট হইতে এই সঙ্কেত গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি। আমরা এই সঙ্কেত কোথা হইতে পাইয়াছি তাহা জানিবার তাঁহাদের কোন প্রয়োজন নাই। এই সঙ্কেত অনুসারে ভারতবর্ষে কার্য্য আরম্ভ হইলে যে সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের অর্থাভাব ও সমস্ত রকমের দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর হইতে পারে এবং এই পৃথিবীকেই ইংরাজ জাতি প্রত্যেক মানুষের পক্ষে স্বর্গতুল্য সুখময় করিয়া তুলিতে পারেন এবং ইংরাজ জাতি চেষ্টা করিলেই যে এই সঙ্কেত অনুসারে এখনই কার্য্য আরম্ভ করিতে পারেন তাহা যে কোন সংযমী দম্ভহীন সহৃদয় বিচারজ্ঞানযুক্ত ইংরাজ প্রতিনিধিকে বুঝাইয়া দিতে আমরা পারিব। আজকালকার ইংরাজগণের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত তাঁহাদের কাহার কাহার যেরূপ নির্দ্দয়তা, দম্ভ, সংযমহীনতা এবং বিচার জ্ঞানহীনতা দেখা যায় তাহাতে যে কোন ইংরাজ প্রতিনিধিকে এই সঙ্কেত আমরা বুঝাইতে পারিব বলিয়া মনে হয় না, কারণ যাঁহারা পদের প্রতিষ্ঠায় গৌরবান্বিত ও নিজদিগকে উচ্চতর মনে করিয়া মানুষকে অবজ্ঞা করেন, তাঁহারা ঋষির দেওয়া এই সঙ্কেত বুঝিতে পারিবেন না। যাঁহারা প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারেন যে, প্রতিষ্ঠায় উচ্চতার অর্থ অধিক সংখ্যক মানুষকে অধিকতর মাত্রায় সেবা করিবার দায়িত্ব, তাঁহাদিগকে এই

সঙ্কেত বুঝাইতে আমরা পারিব বলিয়া আমাদের মনে হয়। আমরা যে সঙ্কেতের কথা বলিতেছি সেই সঙ্কেত অনুসারে কার্য্য আরম্ভ হইলে যে, সমস্ত মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের অর্থাভাব ও প্রত্যেক রকমের দুঃখ অদূর ভবিষ্যতে সর্ব্বতোভাবে দূর হইতে পারিবে এবং এই পৃথিবীই যে মানুষের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে স্বর্গতুল্য সুখময় আবাসস্থল হইতে পারিবে তাহা আমরা ইংরাজ প্রতিনিধিকে যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দিব। যদি না পারি তাহা হইলে আমাদিগের সঙ্কেত গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন থাকিবে না।

এই সঙ্কেত অনুসারে কার্য্য আরম্ভ হইলে ইংরাজ জাতি মানবসমাজকে শুনাইয়া দিবেন যে তাঁহারা সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের সমস্ত রকমের অর্থাভাব ও দুঃখ দূর করিবার কার্য্য ভারতবর্ষে আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাঁহারা যে কার্য্য-পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন তাহার ফলে যে অদূর-ভবিষ্যতে তাঁহাদের অভিষ্ট সিদ্ধ হওয়া অনিবার্য্য তাহাও সমগ্র মানবসমাজকে বুঝাইয়া দিবেন। তখন অ্যাক্সিস্ (Axis) পক্ষকে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানি নিবৃত্ত করিবার জন্য ইংরাজ পক্ষ অনুরোধ করিবেন।

ঋষির দেওয়া এই সঙ্কেতের এমন আশ্চর্য্যজনক শক্তি আছে যে, উহা অকপটভাবে গ্রহণ করিলে এবং অকপটভাবে উহা প্রকাশ করিলে স্বতঃই মানুষ শত্রু হইলেও উহার সেবকের কথা শুনিতে আকৃষ্ট হইবেন। ইংরাজজাতি পরীক্ষা করিলেই আমাদিগের কথার সত্যতা সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে পারিবেন।

এই সঙ্কেত গ্রহণ করিতে হইলে ইংরাজজাতিকে সর্ব্ব প্রথমে বুঝিতে হইবে যে সর্ব্বতোমুখী যুদ্ধনীতি (Policy of Total war-fare) দ্বারা যুদ্ধের জয় করা সম্ভব হইলেও হইতে পারে বটে কিন্তু তাহাতে সাম্রাজ্য ক্রমশঃই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং যুদ্ধ জয়ের দ্বারা শত্রুর যুদ্ধের প্রবৃত্তির নিবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে সাধন করা যায় না। শত্রুর যুদ্ধের প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্তি লাভ না করিলে মানবসমাজে পুনরায় যুদ্ধ হইবার আশঙ্কা থাকে। সর্ব্বতোমুখী যুদ্ধনীতি (Policy of Total war-fare)এর পরিণাম কি, তাহা বিচার করিয়া উহা ত্যাগের যোগ্য কি না তৎসম্বন্ধে ইংরাজ জাতিকে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে।

আমরা ইংরাজ জাতিকে শুনাইতে চাই যে জয়-পরাজয় মীমাংসা করিতে চাহিলে এই যুদ্ধ মানব সমাজের শেষ যুদ্ধ হইবে না। কারণ মনোবৃত্তির নিয়মানুসারে পরাজিত, প্রতিহিংসার জন্য বদ্ধপরিকর হইবেন। **মানব সমাজের শেষ যুদ্ধের জয় পরাজয় অমীমাংসিত থাকিতে বাধ্য।**

ইংরাজের রাষ্ট্রীয় নেতাগণ মনে করেন যে, সর্ব্বতোভাবের যুদ্ধের নীতির (Policy of Total war-fareএর) দ্বারা তাঁহারা যুদ্ধের পূর্ণ নিবৃত্তিসাধন করিতে পারিবেন। যদি মানিয়া লওয়া হয় যে সর্ব্বতোভাবে যুদ্ধের নীতির দ্বারা মিত্রপক্ষ (Allies) অ্যাকসিস (Axis) পক্ষকে

সর্ব্বতোভাবে পরাজিত করিতে পারিবেন ইহা দৃঢ়তার সহিত অঙ্গীকার করা যাইতে পারে তাহা হইলেও মিত্র পক্ষের রাষ্ট্রীয় নেতাগণকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে কত প্রাণ ক্ষয় ও কত ধনক্ষয় এই যুদ্ধ-জয়ের মূল্য স্বরূপ মিত্র পক্ষকে প্রদান করিতে হইবে? এই মূল্য প্রদান করিবার পর মিত্রপক্ষের রাষ্ট্রীয় নেতাগণের আশ্রিত জনসাধারণ কি অবস্থায় পতিত হইবেন?

মিত্রপক্ষের নেতাগণ হয় ত মনে করিতেছেন যে, তাঁহাদিগের বিস্তৃত সাম্রাজ্য। যুদ্ধজয়ের মূল্য স্বরূপ যাহাই দেওয়া যাক না কেন, এই বিস্তৃত সাম্রাজ্য হইতে উহা অল্পদিনের মধ্যেই পূরণ করা যাইবে। আমরা তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধ জয় করিতে যে মূল্য বৃটিশ-সাম্রাজ্যকে দিতে হইয়াছিল তাহা ১৯৩৯ সালের ৩১শে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভব হয় নাই। তাঁহাদিগকে আমরা আরো শুনাইতে চাই যে, মানুষের অর্থের প্রধান উৎপত্তিস্থল আকাশ বাতাস জল ও ভূমি। জগতের সু-সভ্য জাতিগুলি জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া তাঁহারা মনে করেন ইহা সত্য, কিন্তু ঐ সুসভ্য জাতিসমূহকে মনে রাখিতে হইবে যে তাঁহাদিগের বৈজ্ঞানিকগণ এত শত আবিষ্কার করিয়াছেন বটে, কিন্তু আকাশ, বাতাস, জল ও ভূমি কি করিয়া উৎপন্ন হয় তাহা তাঁহারা এখনও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই এবং তাঁহাদিগের প্রত্যেক আবিষ্কারটী পরের দেওয়া আকাশ, বাতাস, জল ও ভূমির উপর নির্ভরশীল। আকাশ বাতাস, জল ও ভূমি কি করিয়া উৎপন্ন হয় তাহা আমরা মানুষকে শুনাইতে বসিয়াছি। উহা জানিতে পারিলে দেখা যাইবে যে বর্ত্তমান সুসভ্য জাতিসমূহের শ্রদ্ধাষ্পদ বৈজ্ঞানিকগণ অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য করিতেছেন। তাঁহাদিগের আবিষ্কারের ফলে একদিকে যেরূপ মানুষমারা অস্ত্রশস্ত্রের উৎকর্ষ হইয়াছে, অন্যদিকে আবার আকাশ, বাতাস, জল ও ভূমির প্রাকৃতিক সঙ্গতি (natural harmony) নষ্ট করা হইয়াছে। আকাশ, বাতাস, জল ও ভূমি এই চারিটীর পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ কি তাহা জানিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, সুসভ্য জাতিসমূহের বৈজ্ঞানিকগণের কার্য্যের ফলে, যে ভূমি মানুষের অন্নদাত্রী, পরিধেয়দাত্রী, বাসগৃহ-দাত্রী, সাজ-সরঞ্জাম দাত্রী **মা-টী সেই মাটিকে** ক্রমে ক্রমে শুষ্ক করিয়া ফেলা হইতেছে। পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি বাহির করিয়া লইয়া উপর হইতে Scientific Irrigation ও Scientific manuringএর নামে পেটের উপর প্রলেপ দেওয়া হইতেছে। জনসাধারণ অত্যন্ত নিরীহ। তাই এই বৈজ্ঞানিকগণ এখনও তাঁহাদিগের নিকট শ্রদ্ধা পান। মানুষের চক্ষু যখন আবার অন্ধকার মুক্ত হইবে তখন আবার মনুষ্য-সমাজ বুঝিতে পারিবেন যে এই বৈজ্ঞানিকগণ মোটেই শ্রদ্ধার যোগ্য নহেন। ইহারা প্রায়শঃ আত্ম পরীক্ষায় অনভ্যস্ত, চরিত্রহীন এবং অযথা দাম্ভিক। একদিকে যেরূপ মানুষমারা অস্ত্রসমূহ ইহাদের কার্য্যে উৎপন্ন হইতে

পারিতেছে এবং ভূমির শুষ্কতা সম্পাদিত হইতেছে, সেইরূপ আবার ইহাদের প্রদর্শিত প্রণালীতে যে সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদন করা হইতেছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটি মানুষকে ক্রমশঃ বিষাক্ত (slow poisoning) করিবার কার্য্য করিতেছে। আমাদিগের কথা যে একটিও ভ্রম-প্রমাদ পরিপূর্ণ নহে তাহা আমরা ক্রমে ক্রমে দেখাইব। এইটুকু শুধু বলিয়া রাখিতে চাই যে ইঁহারা যে যে প্রণালীতে যাহা যাহা উৎপাদন করিবার পরামর্শ দেন তাহার কোন্‌টি মানুষের ইন্দ্রিয়ের, মানুষের মনের এবং মানুষের বুদ্ধির উপর কিরূপ কার্য্য করে তাহা পরীক্ষা করিবার পন্থা ইঁহারা জানেন না। ঐ পন্থা জানিতে পারিলে দেখা যাইবে যে ইঁহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের প্রত্যেকটি মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির কার্য্যের মধ্যে প্রাকৃতিক সঙ্গতি (natural harmony) নষ্ট করিয়া দিতেছে এবং মানুষ, কখনও শরীরের অস্বাস্থ্য, কখনও ইন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্য অথবা উত্তেজনা, কখনও মনের উত্তেজনা ও বিষাদ, কখনও বুদ্ধির অধিকতর মলিনতায় ভুগিতেছে। মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি যে কি কি বস্তু, কি রকমভাবে উৎপন্ন হয় এবং কি রকম ভাবে কার্য্য করে, তাহা পর্য্যন্ত ইঁহাদিগের জানা নাই।

আমরা বৈজ্ঞানিকগণের সম্বন্ধে এত কথা রাষ্ট্রীয় নেতাগণকে শুনাইতেছি তাহার কারণ, ঐ মিত্রপক্ষের রাষ্ট্রীয় নেতাগণ যদি মনে করেন যে, বিস্তৃত সাম্রাজ্য হইতে যথেষ্ট অর্থ অনায়াসে উৎপাদন করা সম্ভব হইবে তাহা হইলে তাঁহারা ভুল করিবেন। **বৈজ্ঞানিকগণের অজ্ঞানময় কার্য্যের ফলে প্রত্যেক দেশের আকাশ, বাতাস, জল ও ভূমি অত্যন্ত কলুষিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক দেশের ভূমির ঈশ্বরের দেওয়া উৎপাদিকা শক্তি অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে।** আজকাল যুদ্ধ যেরূপ আকাশে, জলে ও স্থলে তীব্রভাবে চলিতেছে সেইরূপ আর ছয়মাস চলিলে মানুষকে ভূমির প্রাকৃতিক উৎপাদিকা শক্তির হ্রাসের জন্য বর্ণনাতীতভাবের ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। মিত্র পক্ষ যুদ্ধ করিলে তাঁহাদিগকে মরুভূমি তুল্য সাম্রাজ্যের উপর রাজত্ব করিতে হইবে। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে '**ঈশ্বর**' এই কথাটি ভারতবর্ষজাত সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথমে স্থান পাইয়াছে এবং উহা ভারতীয় ঋষির কলম হইতে সর্ব্বপ্রথমে নির্গত হইয়াছে। আরও জানা যাইবে যে বায়ুর একটি কার্য্য শক্তিকে ভারতীয় ঋষি 'ঈশ্বর' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। বাতাসে অত Bomber এবং Fighter, জলে অত Submarine এবং U-Boat, স্থলে অত Tank অতদিন ধরিয়া চালাইলে বায়ুর যে কার্য্যশক্তিকে "ঈশ্বর" নাম দেওয়া হইয়াছে সেই কার্য্য শক্তি থাকে না। তাহাতে 'ঈশ্বরের' কিছু যায় আসে না। সাজা পাইতে হয় মানুষকে, ভূমির উৎপাদিকা শক্তি হারাইয়া এবং খাদ্যাভাবের যন্ত্রণা ভোগ করিয়া।

মানুষের মধ্যে খাদ্যাভাব ও পরিধেয়াভাব প্রভৃতি থাকিলে মানুষ

কখনও দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তি অথবা যুদ্ধের প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারে না।

যুদ্ধে জয়-পরাজয় স্থির করিয়া যুদ্ধের প্রবৃত্তি উচ্ছেদ কখনও সাধন করা যায় না। মানুষের মন কি বস্তু এবং তাহার কার্য্য কি, তাহা জানা থাকিলে দেখা যাইবে যে, পরাজয়ের অনিবার্য্য পরিণাম—প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি, অসদ্ভাব এবং পুনরায় যুদ্ধের সূচনা।

যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইয়া কখনও কোন সাম্রাজ্যকে দীর্ঘস্থায়ী করা যায় না। সাম্রাজ্যকে দীর্ঘস্থায়ী করিতে হইলে যুদ্ধবিগ্রহ কি করিয়া চাপা দিতে হয় তাহার বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হয়। যুদ্ধ-বিগ্রহে জয় লাভ করিয়া যদি সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব সুদৃঢ় করা যাইত তাহা হইলে অনেক দিনের অনেক রাজত্বের কথা ইতিহাসে পাওয়া যাইত। কিন্তু ইতিহাসে পাঁচ শত বৎসরের অধিক স্থায়ী রাজত্বের কথা দেখা যায় না। ইতিহাসে যে সমস্ত রাজত্বের কথা আছে তাহার অধিকাংশই দুইশত বৎসরের অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। কেন পারে নাই তাহার কারণ সন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে অধিকাংশ রাজত্বই, যুদ্ধে মূলতঃ পরাজয়ের ফলে নষ্ট হয় নাই। যুদ্ধে জয় করিতে করিতে যুদ্ধপ্রবৃত্তি বাড়িয়া গিয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে দৌর্ব্বল্য আসিয়াছে, অবশেষে পরাজয় ঘটিয়াছে অথবা রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। এইরূপে যুদ্ধে জয়ী হইবার পরিণামেই রাজত্ব নষ্ট হইয়াছে।

আমরা চার্চ্চিল সাহেব ও রুজভেল্ট্ সাহেবকে আমাদিগের কথাগুলি চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন, তাঁহারা আজ বর্ত্তমান জগতের কত বড় লোক। তাঁহাদিগের কৃত-কর্ম্মের জন্য কতগুলি মানুষকে কি ভীষণভাবে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে। তাঁহারা এত বড় হইয়া নিজেরাই বা কি সুখে আছেন, তাহা তাঁহারা চিন্তা করুন। আহার, নিদ্রা ও বিশ্রাম ছাড়িয়া দিয়া যে অমানুষিক পরিশ্রম তাঁহাদিগকে করিতে হইতেছে তাহাতে তাঁহারা নিজেদের ও আশ্রিত লোকের কাহার কি উপকার করিতে পারিতেছেন অথবা পারিবেন, তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন। আমরা তাঁহাদিগকে আমাদিগের পরামর্শ লইতে অনুরোধ করিতেছি। **তাঁহাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, ভারতবাসী ঘৃণার যোগ্য হইতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষ ঘৃণার যোগ্য নহে। ভারতবাসী পরাধীন হইতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষ কখনও পরাধীন হইতে পারে না।** ভারতবর্ষের জমীকে কি করিয়া উৎপাদনশীল করিতে হয় তাহা ভারতবাসীর পক্ষেই সর্ব্বতোভাবে জানা ও করা সম্ভব। অন্য কোন দেশবাসী তাহা জানিতে ও করিতে পারিবেন না।

মানবসমাজ এক্ষণে যে অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে তাহাতে আমাদিগের কথা উপেক্ষিত হওয়া সঙ্গত নহে। কি করিয়া অপমান স্বীকার না করিয়া যুদ্ধ মিটাইতে হয় এবং কি করিয়া

মানব-সমাজের সেবা করিয়া সমগ্র নর-সমাজের শ্রদ্ধার ভাজন হওয়া যায় এবং কি করিয়া শ্রদ্ধার ও ধর্ম্মের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তাহার পরামর্শ আমাদিগের কাছে আছে। আমরা ভিক্ষুক। ভিক্ষুকের সঙ্গে মানুষের সুখ দুঃখের সম্বন্ধে পরামর্শ করায় প্রতিষ্ঠিত মানুষের বড়ত্বেরই পরিচয় হয়। তাহাতে কোন অপমান নাই।

ভারতবর্ষের সহায়তায় যখন সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের সমস্ত রকমের অর্থাভাব ও দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর করিয়া এই পৃথিবীকেই প্রত্যেক মানুষের পক্ষে স্বর্গতুল্য করিয়া তুলিবার ঋষিদের দেওয়া সঙ্কেত আছে বলিয়া আমরা মানবসমাজের সম্মুখে ঘোষণা করিতেছি, তখন ভারতের ঋষির দেওয়া সঙ্কেত কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ইংরাজ জাতিকে কি প্রয়োজন, অথবা ভারতবাসীগণ ইংরাজ জাতির বিনা সহায়তায় উহা কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না কেন, তাহার একটা কৈফিয়ৎ আমরা ভারতবাসীগণকে শুনাইতে বাধ্য।

অ্যাক্সিস (Axis) পক্ষও জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, ইংরাজ জাতি যদি ভারতবর্ষের সহায়তায় ঐ কার্য্য করিতে পারেন, তাহা হইলে ভারত জয় করিয়া উহা তাঁহাদের করিতে বাধা কি? তাঁহারা হয় ত মনে করিতে পারেন যে, আমরা ইংরাজের পক্ষেরই মানুষ।

আমরা সমস্ত জগৎকে শুনাইতে চাই যে, আমরা কোন পক্ষের মানুষ নহি। আমরা ভারতীয় ঋষির শিষ্য। ভারতীয় ঋষির উপদেশ—**জয়-পরাজয়, মান অপমান, দ্বন্দ্ব-কলহের কথা বিসর্জ্জন দিয়া ভারতবাসী হয় সমস্ত মানুষের জন্য কার্য্য করিবেন, সমস্ত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করিবেন, নতুবা যাহাতে কাহারও অনিষ্ট না হয় সেইরূপভাবে কেবলমাত্র তাঁহার নিজের জীবন রক্ষার কার্য্য করিবেন।** সক্ষমতা ও অক্ষমতা অনুসারে কেবলমাত্র এই দুই শ্রেণীর কার্য্যই, যাঁহারা ঋষির অনুবর্ত্তী, তাঁহাদের সম্মুখে খোলা আছে। সমগ্র মানবসমাজের কথা ছাড়িয়া দিয়া যাহাতে মানবসমাজের একজনেরও অনিষ্ট হইতে পারে, তাদৃশ কোন কার্য্য কোন সম্প্রদায়গত ভাবে হউক অথবা ব্যক্তিগত ভাবে হউক, ভারতীয় ঋষির ছাত্রের করিবার অধিকার নাই। প্রাণের বেদনাভরা কথাগুলি সমগ্র মানবসমাজের সম্মুখে পৌঁছাইবার মত সক্ষমতা আমাদের আছে কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না। কে যেন বলিতেছেন যে মানবসমাজ বড় ক্লান্ত। কতকগুলি দয়ামমতাহীন দাম্ভিকতাপূর্ণ মানুষের ভ্রান্তির জন্য অনেক নিরীহ মানুষ বড় হৃদয়-বিদারক অবস্থায় নিপতিত হইয়াছে। এখন জগৎকে ভারতীয় ঋষির কথা শুনাইবার সময় আসিয়াছে। যিনি আমাদের কলমের ভিতর দিয়া এই কথাগুলি শুনাইতেছেন তাঁহারই কার্য্যের ফলে মানুষ এই কথাগুলি শুনিবেন। কোন দেশের অথবা কোন সম্প্রদায়ের অথবা কোন ব্যক্তিবিশেষের কোন সঙ্কীর্ণ স্বার্থোদ্ধার করিবার জন্য আমরা কোন কথা বলিতে বসি নাই।

ভারতবাসীগণ তাঁহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থায় ইংরাজের সহায়তা ব্যতীত ভারতবর্ষের কোন ভাল কার্য্যও করিতে পারিবেন না। আমাদিগের মতে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায় এক্ষণে যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছেন তাহাতে ইংরাজ জাতি যদ্যপি ভারতবাসীগণের ভার ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হস্তে ছাড়িয়াও দেন তাহা হইলেও তাঁহারা নিজেরা মিলিত হইয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কোন শ্রেণীর যাহাতে কোনরূপ অনিষ্ট হয় তাদৃশ কোন কার্য্য, জনসাধারণের অধিকাংশের অর্থাভাব দূর করিবার উপযোগী হইলেও, কোন ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের করিবার সামর্থ্য নাই। ঋষির দেওয়া যে সঙ্কেতের কথা আমরা বলিতে বসিয়াছি তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে যাহা করিতে হইবে তাহাতে ভারতবর্ষের হিন্দু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, হিন্দু পুরোহিত, হিন্দু গুরু, কতকগুলি হিন্দু গোঁড়া বৈজ্ঞানিক, কতকগুলি হিন্দু রাষ্ট্রীয় নেতা, কতকগুলি হিন্দু গোঁড়া ডাক্তার, কতকগুলি হিন্দু গোঁড়া সিভিলিয়ান, কতকগুলি হিন্দু গোঁড়া ইন্‌জিনিয়ার, কতকগুলি হিন্দু গোঁড়া জজ, কতকগুলি হিন্দু গোঁড়া আইনব্যবসায়ী, কতকগুলি হিন্দু গোঁড়া গভর্ণমেন্ট-কর্ম্মচারী এবং কতকগুলি গোঁড়া হিন্দু জনসাধারণের বিরোধীতা আমরা আশঙ্কা করি। যাঁহাদিগের বিরোধীতা আমরা আশঙ্কা করি তাঁহারা সংখ্যায় ঊর্দ্ধপক্ষে এক লক্ষ হইতে পারেন। অথচ ঋষির দেওয়া ঐ সঙ্কেত কার্য্যে পরিণত হইলে সমগ্র চল্লিশ কোটী ভারতবাসীর ত বটেই সমগ্র মনুষ্য সমাজের সর্ব্বরকমের অর্থাভাব ও দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর হইতে পারে।

ভারতের শাসনভার ভারতবাসীর হস্তে হস্তান্তরিত হইলে যে একলক্ষ মানুষ এই সঙ্কেতের বিরোধীতা করিবেন বলিয়া আমরা আশঙ্কা করিতেছি, সেই একলক্ষ মানুষই কার্য্যতঃ ভারত শাসনের ভার পাইবেন বলিয়া আমাদের মনে হইয়াছে। ভারতের এই একলক্ষ মানুষ সমগ্র ভারতবাসীগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান কিন্তু তাঁহাদের বুদ্ধি বিপথগামী। তাঁহারা মুখে বলেন বটে এবং তাঁহাদের কার্য্যেও আপাতদৃষ্টিতে দেখায় বটে, যে তাঁহারা জনসাধারণের ইষ্টের জন্য ত্যাগ-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু ঋষির ভাষায় যাহাকে ত্যাগ বলে সেই ত্যাগের ব্রত, আমাদের মতে, ইঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন নাই, কারণ, প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা, সুখ্যাতি লাভ করিবার বাসনা, অপমানে উত্তেজনা, দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তি—ইঁহাদের যে আছে তাহা ইঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যে পরিলক্ষিত হয়। যাহাতে নিজ নিজ প্রভুত্ব দূর হইতে পারে তাদৃশ কোন কার্য্যে ইঁহারা অত্যন্ত বাধা প্রদান করিবেন বলিয়া আমরা আশঙ্কা করি। ঋষির দেওয়া সঙ্কেত মানব-সমাজের দ্বারা গৃহীত হইলে যাঁহারা প্রভুত্ব পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিবেন তাঁহাদের ভাগ্যে প্রভুত্ব কিছুতেই জুটিবে না। অথচ যাঁহারা প্রভুত্ব-ভৃত্যত্ব, মান-অপমান, হার-জিত সমান করিয়া দ্বন্দ্ব কলহের প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে ছাড়িয়া দিয়া জনসাধারণের কাহারও যাহাতে কোনরূপ ক্লেশ না হয় সেই রকম কার্য্য-পদ্ধতিতে **একমাত্র জনসাধারণের**

প্রত্যেকের হিতসাধনের ব্রত গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগকে জনসাধারণ আপনা হইতেই প্রভু বলিয়া শ্রদ্ধার উচ্চতম আসনে বসাইবেন। আমাদের ধারণা ভারতবর্ষের ঐ একলক্ষ মানুষের বুদ্ধি এত বিপথগামী হইয়াছে যে এই রহস্য তাঁহাদের জীবনকালে অনেকেই বুঝিতে পারিবেন না। আমাদের মনে হইয়াছে যে ইংরাজ-জাতিকে বুঝাইতে পারিলে তাঁহাদের কেহ কেহ এই রহস্য বুঝিতে পারিবেন এবং তাঁহাদিগের দ্বারা ঐ কার্য্য হইতে পারিবে।

অ্যাক্সিস্ (Axis) পক্ষের দ্বারা ভারতবর্ষের সহায়তায় ঋষির দেওয়া সঙ্কেত অনুসারে কার্য্য হওয়া অসম্ভব তাহা আমরা মনে করি না। তবে আমাদের ধারণা অ্যাক্সিস্ (Axis) পক্ষের ভারত জয় করা খুব সহজ-সাধ্য নহে। উহা সময়সাপেক্ষ ত বটেই। এদিকে সমগ্র মানবসমাজের জনসাধারণের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে যুদ্ধ মিটিলে কল্যকার জন্য অপেক্ষা করা কোন বুদ্ধিমান মানুষের সঙ্গত নহে। যুদ্ধ চলিতে থাকিলে কোন্ পক্ষ কি অবস্থায় উপনীত হইবেন, যুদ্ধ চালাইলে দুই পক্ষেরই যে পরিমাণ ধন-জনের ব্যয় করিতে হইবে, তাহা চলিতে থাকিলে, কোন পক্ষের জনসাধারণ তাঁহাদের স্ব স্ব নেতাগণের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিতে পারিবেন কি না তাহা বলা খুবই দুরূহ। যুদ্ধ চলিতে থাকিলে ভারতবর্ষের ভূমির উপর আগ্নেয় অস্ত্র অতি ভীষণভাবে নিপতিত হইবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় ধারণা। আমরা যাহা বলিতে বসিয়াছি তাহা বলা শেষ হইলে মানব-সমাজ বুঝিতে পারিবেন যে আকাশ, বাতাস, জল ও স্থলের মধ্যে যে প্রাকৃতিক সঙ্গতি (natural harmony) দেখা যায় তাহার মূল কারণ ঐ আকাশ, বাতাস, জল ও স্থলের মধ্যে যে আকুঞ্চন (Contraction), প্রসারণ (Expansion) ও গমন (Tendency to expansion and displacement) আছে তাহার সঙ্গতি। ঐ সঙ্গতি (natural harmony) আছে বলিয়াই ভূমির প্রাকৃতিক উর্ব্বরা শক্তি থাকে এবং অহরহঃ ভূমি-কম্পন অথবা অগ্ন্যুদ্গম হয় না। আকাশে, জলে এবং স্থলে আগ্নেয় অস্ত্রের ব্যবহারে ভীষণভাবে যুদ্ধ বহুদিন চলিতে থাকিলে অথবা ভূমির রস ও তেজ রক্ষক ক্ষনিজ পদার্থগুলি অপরিমিতভাবে ব্যবহৃত হইলে আকাশ, জল এবং স্থলের ঐ আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমনের প্রাকৃতিক সঙ্গতি (natural harmony) নষ্ট হওয়া অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। তাহাতে এক দিকে যেরূপ ভূমির প্রাকৃতিক উর্ব্বরা শক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে বাধ্য হয় সেইরূপ আবার ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুদ্গমের আশঙ্কা অনিবার্য্য হয়। বায়ু নাকের ভিতর কিরূপ কার্য্য করে ভারতীয় ঋষিগণ তাহা পরীক্ষা করিয়া আকাশ, বাতাস, জল ও স্থলের সঙ্গতি (harmony) কিরূপ দাঁড়াইতেছে তাহা স্থির করিবার পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ঐ পদ্ধতি সকলের পক্ষে বুঝা সম্ভব নহে। ঐ পদ্ধতি অনুসারে আমরা অনেক দিন হইতেই দেখিতেছি যে ভূমির প্রাকৃতিক উর্ব্বরা শক্তি বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকের কার্য্যে অতি দ্রুত গতিতে হ্রাস পাইতেছে। এই যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতেই উহা আরও দ্রুতগতিতে কমিতে আরম্ভ করিয়াছে।

আমাদের বিচারানুসারে জগতের প্রত্যেক দেশে জনসাধারণের মধ্যে যে অর্থাভাব

ঘটিয়াছে তাহার প্রধান কারণ এই, যে সমস্ত কাঁচামাল মানুষ তাঁহার খাদ্যে, পরিধেয়ে, বাসগৃহে এবং অন্যান্য সাজ সরঞ্জামে ব্যবহার করিলে তাঁহার শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সমান ভাবে সবল রাখিতে পারেন সেই সমস্ত কাঁচামাল কোন দেশেই সেই দেশের সমগ্র মনুষ্য সংখ্যার প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে না।

সমস্ত-পৃথিবীতে ও সারাপৃথিবীর সমগ্র লোক সংখ্যার প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণের উৎপাদন গত কুড়ি বৎসর হইতে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য উহার আরও অনেক কারণ আছে, তাহার আলোচনা আমরা এক্ষনে করিব না। আমরা ভারতীয় ঋষির কথায় যাহা বুঝিয়াছি—তাহাতে দৃঢ়তার সহিত বলিতে হয় যে প্রত্যেক দেশে যে প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে কাঁচামাল উৎপন্ন হইতে পারিতেছে না **তাহার প্রধান কারণ প্রত্যেক দেশের জমির প্রাকৃতিক উর্ব্বরা শক্তির হ্রাস।**

আমরা ইহা বুঝিয়াছি যে ভারতবর্ষের জমির প্রাকৃতিক উর্ব্বরা শক্তি এখনও যাহা আছে তাহা আর হ্রাস না পাইলে ঋষির পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া উহা আগামী সাত বৎসরের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব এবং তখন যে দেশে যে কাঁচামালের যে পরিমাণের অভাব আছে তাহা ভারতবর্ষ হইতেই পূরণ করা সম্ভব হইবে।

কিন্তু ভারতবর্ষের ভূমিতে যদ্যপি আগ্নেয় অস্ত্র অত্যধিক পরিমাণে নিক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত হয় তাহা হইলে উহা সম্ভব হইবে কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে।

ইহার পরে আমরা দেখাইব যে, অ্যাক্‌সিস্ (Axis) পক্ষ যদ্যপি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইংরাজের মত বিশাল সাম্রাজ্যও গঠন করিতে পারেন, আর ভারতের জমির প্রাকৃতিক উর্ব্বরা শক্তি পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব হয় তাহা, হইলে তাঁহারা বিশাল সাম্রাজ্য লাভ করা সত্ত্বেও তাহাদের জনসাধারণের অর্থাভাব সর্ব্বতোভাবে মিটাইতে পারিবেন না।

উপরোক্ত কারণে তাড়াতাড়ি যুদ্ধ মিটাইবার যে অত্যন্ত প্রয়োজন তাহা আমাদিগের কথাগুলি হইতে খুবই সম্ভব কোন বুদ্ধিমান মানুষের বুঝিতে কষ্ট হইবে না। তাড়াতাড়ি যুদ্ধ মিটাইবার উদ্দেশ্যেই আমরা অ্যাক্‌সিস্ (Axis) পক্ষকে ইংরাজের নেতৃত্ব স্বীকার করিতে অনুরোধ করিতেছি।

আমাদের এই সমস্ত কথা যাহাতে অ্যাক্‌সিস্ পক্ষের নিকট পৌঁছায় তাহার জন্য অনুরোধ করিতেছি ইংরাজ পক্ষের রাষ্ট্রীয় নেতাগণের মধ্যে যাঁহারা প্রধান তাঁহাদিগকে।

অ্যাক্‌সিস্ পক্ষকে আমরা আরও বলিতে চাই যে ঈশ্বরের ইঙ্গিত তাঁহাদের উপেক্ষা করা উচিৎ নহে। কাহার নাম ঈশ্বর তাহা জানিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে উহার কার্য্য ছাড়া মানুষ অথবা কোন প্রাণী বাঁচিতে পারে না। বাতাসেরই একটী কার্য্য বিশেষকে ভারতীয় ঋষি 'ঈশ্বর' নামে অভিহিত করিয়াছেন। বায়ুর যে কার্য্যকে ভারতীয় ঋষি 'ঈশ্বর' নামে

অভিহিত করিয়াছেন সেই কার্য্য সর্ব্বদা সর্ব্বত্র আছেন বলিয়া মানুষ আকাশ, বাতাস, জল ও স্থলের সঙ্গতির সহিত নিজের সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারেন এবং জীবন ধারণ করিতে পারেন। বাতাসে ঐ সঙ্গতি না থাকিলে মানুষের পক্ষে এক নিমেষও বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নহে। বাতাস না হইলে মানুষ যে এক নিমেষও বাঁচিতে পারে না এবং বাতাস যে কোন মানুষ তৈয়ারী করিতে পারেন না, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। বাতাসের কোন্ কার্য্যকে ভারতীয় ঋষি 'ঈশ্বর' নামে অভিহিত করিয়াছেন তাহা আমরা ইহার পর কথাচ্ছলে আলোচনা করিব। ভারতীয় ঋষি যাহাকে ঈশ্বর নাম দিয়াছেন তাহাই যে প্রকৃত ঈশ্বর তাহা মানুষকে স্বীকার করিতেই হইবে। আমাদের এই কথার কারণ এই যে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে জগতের সাহিত্যে 'ঈশ্বর' নামটী সর্ব্ব প্রথমে ভারতীয় ঋষিই ব্যবহার করিয়াছেন। বাতাসের যে কার্য্যটীকে 'ঈশ্বর' নামে অভিহিত করা হইয়াছে মানুষ আপনার দোষে সেই কার্য্যটীকে বুঝিতে চেষ্টা করেন না এবং অনেক সময়ে অকালে নিজ নিজ প্রাণ-বাতাস নষ্ট করিয়া ফেলেন।

আমরা বলিতে চাই যে—ঈশ্বরের ইঙ্গিত, ইংরাজ জাতিকে দিয়া সমগ্র মানব সমাজের জন্য কিছু করান। তাহা না হইলে ইংরাজ জাতি এত বড় সাম্রাজ্য লাভ করিতে পারিতেন না। লিখিত ইতিহাসে এত বড় সাম্রাজ্যের আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ঈশ্বরকে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে তাঁহার অনুমোদন ছাড়া মানুষ কোন কার্য্য করিতে পারেন না। এত বড় সাম্রাজ্য তাঁহার অনুমোদন ছাড়া ইংরাজ জাতি লাভ করিতে পারেন নাই। ইংরাজ জাতি অনেক ভুল করিয়াছেন, অনেক পাপ করিয়াছেন এবং তাহার জন্যই দুই শত বৎসর হইতে না হইতেই ঐ সাম্রাজ্যকে এত আঘাত সহ্য করিতে হইতেছে। কিন্তু ইংরাজ জাতি তাঁহাদের ভুল সংশোধন করিতে স্বীকৃত হইলেও যদি অ্যাক্সিস্ পক্ষ তাঁহাদের নেতৃত্ব মানিতে অস্বীকার করেন, তবে বুঝিতে হইবে যে অ্যাক্সিস্ পক্ষ ঈশ্বরের ইঙ্গিত না মানিয়া পশুবলকে বেশী মানিয়া লইতেছেন। অ্যাক্সিস্ পক্ষ যাহাতে উহা না করেন তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি।

ইংরাজ রাষ্ট্রীয় নেতাগণ যদি তাঁহাদের দায়িত্ব পালন না করিয়া প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির চরিতার্থ করাই বেশী প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন তাহা হইলে জগৎ ঈশ্বরের খেলা দেখিতে পাইবে না।

ইংরাজ জাতি যদ্যপি ভারতীয় ঋষির দেওয়া সঙ্কেত অনুসারে অকপটভাবে সমগ্র মানব সমাজের প্রত্যেকের অর্থাভাব ও সমস্ত রকমের দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে ভারতের সংগঠনে অ্যাক্সিস্ প্রতিনিধিগণের সহায়তা লইতে তাঁহাদিগের কোন আপত্তি হইতে পারে না। তাহা হইলেই কি অ্যাক্সিস্ পক্ষ তাহাদিগের পাশবিকতা অনতিবিলম্বে নিবৃত্ত করিয়া ইংরাজ জাতির নেতৃত্ব স্বীকার করিতে সম্মত হইবেন না?

ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা স্বাধীনতার জন্য অধীর তাঁহাদিগকে আমরা কিছু বলিতে চাই—

তাঁহারা যাহাই ভাবুন, সত্য বলিতে হইলে, আমাদিগকে বলিতে হইবে যে ভারতবর্ষে প্রকৃতির যে দান আছে তাহা জানা থাকিলে ভারতবর্ষ যে শুধু ভারতবাসীর জন্য নহে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। **ভারতবর্ষ সমগ্র মানবসমাজের জন্য—**ইহা ভারতীয় ঋষির কথা। মানবসমাজের যখন যে দেশ দুঃখে পড়িবেন তখন সেই দেশকেই কোল পাতিয়া দিবার সামর্থ্য একমাত্র আমাদের মায়ের আছে। ভূমির প্রাকৃতিক গঠন ও অবস্থান সম্বন্ধে ঋষি কি দেখাইয়াছেন তাহা জানিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে আমরা বাতুল নহি। ভারতীয় ঋষি চিরদিন সমগ্র মানবসমাজের ও মানব-ধর্ম্মের কথা কহিয়াছেন এবং ঐ পরামর্শই সন্তানগণকে দিয়াছেন। প্রভুত্ব, মান, অপমান, জয়, পরাজয় ভারতসন্তানের জন্য নহে। ভারতসন্তান তাঁহার ঋষির কথা বুঝিতে পারিলে দেখিতে পারিবেন যে স্থানগত জাতীয়তার স্পৃহা ভারতবর্ষে ঘৃণার যোগ্য। **ব্যক্তিগত জীবন যাত্রার জন্য জগতের কাহারও যাহাতে কোনরূপ ভৃত্যত্ব স্বীকার করিতে না হয়, কোন মানুষ যাহাতে নিজেকে অসহায় মনে করিতে না পারেন, সকল মানুষ যাহাতে এক পরিবারভুক্ত বলিয়া মনে করিতে পারেন, দ্বন্দ্ব, কলহ এবং দ্বেষ ও অন্ধঅনুরাগ প্রত্যেক মানুষের যাহাতে অজানা হইয়া উঠে—তাহাই ভারতীয় ঋষির বার্ত্তা।** ইংরাজ বিদ্বেষ মানুষেরই বিরুদ্ধে বিদ্বেষ। মানুষের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো ভারতীয় ঋষির বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানোর অন্য নাম। যাহারা এতাদৃশ নেতৃত্ব মান্য করিয়াছেন, তাঁহারা পাপী হইয়াছেন। ঈশ্বরের নিয়মানুসারে তাঁহাদিগকে কিছু শাস্তি সহ্য করিতেই হইবে। তরুণ ও তরুণীদিগকে উচ্ছৃঙ্খল হইলে চলিবে না। তরুণ ও তরুণীদিগের সুখশান্তি বিধান করিবার দায়িত্ব তাঁহাদের পিতাগণের। যে সব পিতা নিজেরা নিজদিগের দায়িত্ব নির্ব্বাহ করিতে না পারিয়া সন্তানগণকে ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন অথবা ঐ উদ্বোধনের অনুমোদন করিয়াছিলেন তাঁহারা প্রাথমিক দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়াছেন। যাঁহারা এতাদৃশভাবে দায়িত্ব-জ্ঞানহীন, তাঁহারা ভারতবর্ষের মত দেশের সংগঠনের উপযুক্ত বলিয়া নিজদিগকে কি করিয়া মনে করিতে পারেন—তাহা আমাদিগের বুদ্ধির অগম্য। যাঁহারা ভারতবর্ষে Civil disobedience অথবা Non-co-operation অথবা Civil defence চালাইয়া থাকেন তাঁহারা আমাদিগের মতে ভারতবর্ষের আকাশ, বাতাস, জল ও ভূমির গুণাগুণ কি কি এবং আকাশ, বাতাস, জল, ভূমি ও অধিবাসীর মধ্যে কি অভেদ্য প্রাকৃতিক সম্বন্ধ থাকে তাহা জানেন না। এতবড় অজ্ঞতা সত্ত্বেও নিজদিগকে কৃতীপুরুষ বলিয়া মনে করা অত্যন্ত অসঙ্গত। যাঁহাদের এতবড় অজ্ঞতা আছে তাহাদিগকে রাজ্যভার লইবার উপযোগী হইতে হইলে ধৈর্য্য রক্ষা করিতে হইবে এবং নিজদিগকে প্রস্তুত করিতে হইবে। মানুষের যখন চক্ষু অন্ধকার দেখে

হইবে তখন মানুষ বুঝিতে পারিবেন যে, ভারতবর্ষের দেওয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান জগতের উপর চিরদিন প্রাধান্য স্থাপন করে। নির্ভুল হইলেও করে, ভুল হইলেও করে। জগতে আজ যে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, প্রাণী-বিজ্ঞান, মনুষ্য-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, জ্যোতিষ্কমণ্ডল-বিজ্ঞান, বাণিজ্য-বিজ্ঞান, অর্থ-বিজ্ঞান, রসায়ণ-বিজ্ঞান, সাম্রাজ্য-শাসন-বিজ্ঞান, অথবা দর্শন প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহার মূল কোথায় উহা অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রত্যেকটীর মূলে রহিয়াছে ভারতীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ কথা। এতাদৃশ ভারতবর্ষে জন্মিয়া যাঁহারা পরের দেওয়া কথা ধার করিয়া নিজদিগকে সাম্রাজ্য শাসনের উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন তাঁহাদিগের লজ্জা অনুভব করা উচিৎ।

আমরা ভারতবর্ষের প্রত্যেক পরিণত বয়স্ক শিক্ষিত পুরুষকে মানব-সমাজের সেবার কার্য্যে আহ্বান করিতেছি। যিনি পরকে দেখেন তাঁহাকে ভগবান দেখিবেন—ইহা ভারতবাসীরই কথা। পরকে খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিতে চাহিলে নিজের ব্যবস্থা, সব ব্যবস্থার যিনি নিয়ন্তা তিনিই করিবেন—এই দৃঢ়বিশ্বাস অন্ততঃপক্ষে প্রকৃত ভারতবাসীর থাকা উচিত। ইংরাজী বুক্‌নিতে ইংরাজী কায়দায় চলাফেরা করিলে কতদূর কি হয় তাহার অভিজ্ঞতা আমাদের এতদিনে হওয়া উচিত।

ভারতবাসীগণের সহনশীলতা আমরা ভিক্ষা করিতেছি। ভারতবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায় আমাদিগকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে ভারতবর্ষের সহায়তায় যদ্যপি ইংরাজের দ্বারা সমগ্র মানব-সমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের অর্থাভাব দূর করার ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব হয় এবং এই পৃথিবীকে স্বর্গতুল্য সুখময় আবাসস্থল করিয়া তোলা সম্ভব হয়, তাহা হইলে ভারতবাসীগণ নিজেরা তাহা করিতে পারিবেন না কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর আমরা আগেই দিয়াছি। ইহার পরে আরও কিছু বলিব।

যাঁহারা এই প্রশ্ন করিবেন তাঁহাদিগকে আমরা বলিব যে উহা ভারতবাসীগণের পক্ষে একেবারে কখনও সম্ভব নহে—তাহা আমরা মনে করি না; কিন্তু **বর্ত্তমান অবস্থায়** ইংরাজের সহায়তা ও সম্মতি ছাড়া ভারতবাসীগণের পক্ষে উহাতে হস্তক্ষেপ করার অনেক অসুবিধা আছে।

প্রথমতঃ ভারতবর্ষের শাসনভার ইংরাজ স্বেচ্ছায় ভারতবাসীগণের হস্তে ছাড়িয়া না দিলে ভারতবাসীগণের পক্ষে কোন সংগঠনমূলক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সম্ভবযোগ্য নহে।

দ্বিতীয়তঃ ইংরাজ ভারতবাসীগণের হস্তে ভারতের শাসনভার ছাড়িয়া দিলেও, পরস্পরের মধ্যে একতা ও শৃঙ্খলা না থাকিলে, তাঁহাদের নিজেদের পক্ষে মিলিত হইয়া কোন সংগঠনমূলক কার্য্য করা সম্ভব নহে।

আমাদের মতে ইংরাজ স্বেচ্ছায় ভারতবাসীগণের হস্তে ভারতবর্ষের শাসনভার ছাড়িয়া দিতে সম্মত নহেন এবং তাঁহাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহারা উহা ছাড়িয়া দিতে পারেন না। কাজেই

ভারতবাসীগণ যদি নিজেরা ঐ সংগঠনমূলক কার্য্য করিতে চাহেন তবে তাঁহাদিগকে ইংরাজের হাত হইতে ভারতের শাসনভার যে কোন প্রকারে হউক তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাঁড়িয়া লইতে হইবে। ইংরাজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতের শাসনভার কাড়িয়া লওয়া ভারতবাসীগণের নিজেদের মধ্যে যেরূপ বিবাদ রহিয়াছে, তাহাতে তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে কিনা তাহা বিবেচনার যোগ্য। আমাদের মতে উহা সম্ভব হইবে না। বিচারের খাতিরে যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে উহা সম্পূর্ণ সম্ভব তাহা হইলেও উহা যে সময় সাপেক্ষ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ ভারতবাসীগণের নিজেদের মধ্যে একতা ও শৃঙ্খলার যে অভাব আছে তাহা দূর করাও তাঁহাদের নিজেদের পক্ষে সম্ভব কিনা তাহা বিবেচনার যোগ্য। আমাদের মতে তৃতীয় পক্ষ না হইলে ভারতবাসীগণ নিজেরা তাঁহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থায় নিজেদের মধ্যে একতা ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পারিবেন না। আমরা নিজেরা যে নিজেদের মধ্যে একতা ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পারি না তজ্জন্য ধিক্কারের যোগ্য হইতে পারি কিন্তু তাহার জন্য ইংরাজকে দায়ী করা সঙ্গত নহে। আমাদের মতে মুসলমান ও ইংরাজ রাজত্বের অনেক আগে হইতেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষের ছড়াছড়ি আরম্ভ হইয়াছে এবং তজ্জন্য ইংরাজের স্কন্ধে সর্ব্বতোভাবের দায়িত্ব আরোপ করা অসঙ্গত এবং অধর্ম্মের। ভারতবাসীগণের মধ্যে কতরকমের অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা আছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে আমাদিগের কথা আরও পরিষ্কার হইবে। আমাদের মতে আমাদিগের নিজেদের মধ্যে মোটামুটী ছয় রকমের অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা আছে, যথা ঃ—

(১) বিভিন্ন ধর্ম্মভাবজনিত
(২) বিভিন্ন বর্ণভাবজনিত
(৩) বিভিন্ন আচারজনিত
(৪) বিভিন্ন শিক্ষাজনিত
(৫) বিভিন্ন আর্থিক অবস্থাজনিত
(৬) বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাবজনিত

এই ছয় রকমের অনৈক্যের কোন্‌টী কবে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিলে ইংরাজ যে উহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী নহেন এবং ইংরাজ আগমনের অনেক আগে হইতেই অনেক রকমের অনৈক্য এদেশে আছে তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে।

কে কে ঐ সমস্ত অনৈক্যের সূচনা ও রক্ষা করিবার জন্য দায়ী তাহা পরীক্ষা করিলে, কি করিলে ঐ সমস্ত অনৈক্যের দূর করা সম্ভব যোগ্য হয় তাহা বুঝা যায় এবং তখন ইহাও বুঝা যাইবে যে ঐ অনৈক্য দূর করা আমাদিগের নিজেদের পক্ষে সহজ সাধ্য নহে এবং উহার জন্য তৃতীয় পক্ষের অত্যন্ত আবশ্যকতা আছে।

"বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলমানগণ অস্পৃশ্য ও ম্লেচ্ছ" এই ভাবকে আমরা "বিভিন্ন ধর্ম্মভাব জনিত বিদ্বেষ" বলিয়া থাকি। এই ভাব ভারতবর্ষের হিন্দু জনসাধারণের ন্যুনপক্ষে বার আনির মধ্যে এখনও আছে। ইহা ইংরাজ আগমনের আড়াই হাজার বৎসর আগে হইতেই বৌদ্ধ প্রভৃতি এক একটী ধর্ম্মের উদ্ভব কাল হইতেই ভারতবর্ষে ছড়ান আছে। এই ভাব ছড়াইয়াছেন ভারতের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ। এই বিদ্বেষ ভাব এখনও সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছেন ভারতের তথাকথিত নিরীহ টিকিওয়ালা নামাবলী পরা কিম্ভুতকিমাকারের চেহারা, মন ও বুদ্ধিওয়ালা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পুরোহিত ও গুরুগণ। গভর্ণমেন্ট, মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ড সমূহ এখনও ইহাদিগকে যেরূপ ভাবে বৃত্তিপ্রদান করিতে বাধ্য হন, ইহারা এখনও যেরূপ ঘটাসহকারে প্রণাম পায়, তাহা দেখিলে স্বীকার করিতে হয় যে ভারতবাসীগণ নিজের স্বেচ্ছায় তাহাদের ক্ষয় রোগ দূর করিতে প্রস্তুত নহেন। এই ক্ষয় রোগ দূর করিতে হইলে একদিকে মানুষ যে মানুষ এবং ভারতবর্ষে ঋষিগণ যে মানবধর্ম্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম্মের কথা বলেন নাই তাহা যেরূপ ভারতবাসীগণকে শুনাইতে ও বুঝাইতে হইবে, সেইরূপ আবার সমাজের ক্ষয় রোগ স্বরূপ এই মানুষগুলি যাহাতে ঐ বিদ্বেষগন্ধভাবক তথাকথিত ধর্ম্মানুষ্ঠানগুলি চালাইতে না পারেন এবং তদ্দারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম না হন, তাহা আইন করিয়া বন্ধ করিতে হইবে। ইহা ভারতবাসীগণের নিজেদের পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশ সাধ্য। তৃতীয় পক্ষ থাকিলে ইহা করা অপেক্ষাকৃত সহজ সাধ্য হইবে।

"আমি ব্রাহ্মণ, তুমি কায়স্থ, তুমি চণ্ডাল, তুমি নবশাখের অন্তর্গত, তুমি নবশাখের বহির্গত, তোমার জল চলিতে পারে, তোমার জল চলিতে পারে না।" "আমি বৈষ্ণব, তুলসীমালা আমার গলায় আছে, আমি পরমভক্ত, আমার মত ভক্ত কে আছে?" "ওগো আমি শাক্ত, বীরাচার ত' আমার ধর্ম্ম, কারণ ও চক্র ত' আমায় ভূষণ, আমার সাধনা তুমি কি বুঝিবে?" "আমি শৈব, আমার আনন্দ গাঁজায়, ভাঙ্গে ; চরষেও আমার আপত্তি নাই। গাঁজার টানের সঙ্গে আমি কৈলাসে পৌঁছিয়া যাই, আমার সাধনার মত সাধনা আর কাহার আছে?" ইত্যাকার বিদ্বেষকে আমরা বর্ণভাব জনিত বিদ্বেষ বলিয়া থাকি। ইহা ভারতবর্ষের হিন্দুগণের অর্দ্ধেকের মধ্যে এখনও আছে। ইহার জন্যও ইংরাজগণ দায়ী নহেন। যাহারা ধর্ম্ম ভাব জনিত বিদ্বেষের জন্য দায়ী সেই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পুরোহিত ও গুরুগণই ইহার জন্য ও দায়ী। ইহা দূর করিতে হইলেও আইন ও শিক্ষার সহায়তা লইতে হইবে। তাহাও ভারতবাসীগণের নিজেদের পক্ষে সহজসাধ্য হইবে না।

"আমি নিরামিষাশী, সন্ধ্যায় পূজা করি, শুদ্ধাচারে থাকি, তুমি পেঁয়াজ-রসুন খাও, যার তা হাতে খাও, তুমি অশুদ্ধাচারী" ইত্যাকার ভাবকে আমরা বিভিন্ন আচার জনিত বিদ্বেষ বলিয়া থাকি। ইহার জন্যও ইংরাজ দায়ী নহেন। অন্বেষণ করিলে দেখা যাইবে এই সংক্রামক

ব্যাধিও ভারতবর্ষের হিন্দুগণের মধ্যে অতি ব্যাপকভাবে রহিয়াছে। ইহা দূর করা সহজ সাধ্য নহে। ইহার জন্যও ঐ তথাকথিত নিরীহ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পুরোহিত ও গুরুগণ দায়ী।

"আমি সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ণ করিয়াছি, আমার অনেক ছাত্র, অনেক রাজা মহারাজা আমার পায়ে গড়াগড়ি দেন, আমাকে গভর্ণমেন্ট মহামহোপাধ্যায় উপাধি দিয়াছেন, আমার সাথে বিচারে কেহ আঁটিতে পারে না, তুমি আমার সাথে স্মৃতিশাস্ত্রের তর্ক কর, তুমি পাজী, তুমি বদ্‌মায়েস, তুমি অপাংতেয়" "আমি ফিলজফিতে এম,এ, আমি ইংরাজীতে এম,এ, আমি সংস্কৃতে এম, এ, তুমি কোথাকার কে হে ? তুমি আমার সাথে কথা কহিবার উপযুক্ত নহ", "আজ্ঞে আমি এম, ডি, এম, বি-তে আমি ফার্ষ্ট হইয়াছি, আর আমি বিলাতের হস্‌পিটালে অনেকদিন ছিলাম আর ঐ ডাক্তারটী সামান্য একজন এম, বি', "আমি ডি, এস-সি, রিসার্চস্কলার, এতগুলি মেডেল আমার আছে, ওঁর কথা ছেড়ে দিন, উনি কি জানেন ?" "মোকদ্দমা বুঝি আর না বুঝি, গুছাইয়া বলিতে পারি আর না পারি, আমি অ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল, ল' মেম্বার, তুমি আইনের কি জান হে"—ইত্যাকার ভাবকে আমরা শিক্ষাজনিত বিদ্বেষ বলি। আজকাল ইংরাজী জানা পণ্ডিতগণের মধ্যেও এ ভাব পুরাদমে আছে বটে এবং তাহার জন্য ইংরাজগণ দায়ী বটে, কিন্তু সন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, শিক্ষায় এতাদৃশ অস্বাভাবিক দাম্ভিকতার ও বিদ্বেষের পুরা রাজত্ব ইংরাজ আগমনের বহু আগে হইতেই এ দেশে ছিল। শিক্ষার নামে কু-শিক্ষা চলিতে থাকায় এই ভাব মানুষের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। বাহিরে বিনয়ের আবরণ কিন্তু অন্তরে দম্ভ ও বিদ্বেষের জলন্ত মূর্ত্তি। এই ব্যাধি, উপাধিধারীগণের, সংবাদিকগণের ও সাহিত্যিকগণের শতকরা নিরানব্বুই জনকে সংক্রামকরূপে আক্রমণ করিয়া বসিয়াছে। ইহাও ভারতবাসীগণ নিজেরা দূর করিতে পারিবেন না। যে সরিষার দ্বারা ভূত তাড়াইতে হইবে সেই সরিষাকেই ভূতে পাইয়া বসিয়া আছে।

"তুমি কোথাকার কে হে, মাসে ত্রিশ টাকা রোজগার করিবার মুরদ নাই, আমি মাসে আঠারশত টাকা বেতন পাই, আমি সুন্দরবনের জমিদার, আমার প্রকাণ্ড সওদাগরি অফিস আছে, তুমি আমার সঙ্গে সমান সমান কথা কইবার উপযুক্ত নহ"—ইত্যাকার ভাষাকে আমরা বিভিন্ন আর্থিক অবস্থাজনিত বিদ্বেষের ভাব বলিয়া থাকি। এই ভাবও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ও বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব কম ব্যাপক নহে। ইহাও ইংরাজের আমদানী নহে। ইহা দূর করাও খুব সহজসাধ্য নহে।

"ঐ উড়ে ব্যাটা কি বল্লে গো" "মেড়ো ব্যাটা ত বড় জ্বালাতন কর্‌ছে" "মাদ্রাজী ব্যাটারা ভারী ধূর্ত্ত" "ঘটী চোরের দলকে বিশ্বাস করা যায় না" "বাঙ্গাল পুঁটীমাছের কাঙ্গাল"—ইত্যাকার ভাবকে আমরা বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাবজনিত বিদ্বেষ বলিয়া থাকি। ইহাও ইংরাজের আমদানী নহে। ইহাও এত মজ্জাগত হইয়াছে যে ইহার জন্যও তিক্ততার উদ্ভব হয়। নিজেদের মিলন সাধিত করিতে হইলে এই ভাবকেও দূর করিতে হইবে। এই ভাবও উপেক্ষণীয় নহে।

আমরা বলিতে চাই যে এতাদৃশ হরেক রকমের অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা ভারতবাসীগণের নিজেদের পক্ষে দূর করা সম্ভব নহে। তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করা যায় যে সকলই সম্ভব তাহা হইলেও উহা যে সময় সাপেক্ষ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সমগ্র জগতের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের অর্থাভাব দূর করিবার সংগঠনের কার্য্য ভারতবাসীগণের হস্তে ন্যস্ত হওয়া উচিৎ নহে কেন, তাহার উত্তরে আমরা এই বলিতে চাই যে—

ভারতবাসীগণের পক্ষে স্বায়ত্বশাসন এখনই পাওয়া সম্ভব নহে, পাইলেও তাহারা তাহাদের নিজেদের পরস্পরের বিদ্বেষ দূর করিতে পারিবেন না। ভারতের শাসনের ভার ভারতবাসীগণের হস্তে অর্পিত হইলে নিজেদের মধ্যে বিদ্বেষ আরও বাড়িয়া যাইবে। তাহাতে যে বিপদ উপস্থিত হইবে সেই বিপদ বর্ত্তমান যুদ্ধের বিপদ হইতে কোনক্রমেই কম নহে।

যাঁহারা মনে করেন যে ভারতবাসীগণ নিজেরাই এখন নিজেদের শাসনভার পাইবার উপযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা দুইটী বিষয়ে চিন্তা করেন না। প্রথমতঃ জগতের কথা ছাড়িয়া দিয়া শুধু ভারতবর্ষের জনসাধারণের অর্থাভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করিতে হইলে কি করিতে হইবে, তাহা এই স্বাধীনতাকামী শ্রদ্ধেয় মানুষগুলি ভাবিয়া দেখেন না এবং ভাবিয়া দেখিলেও জানেন না। উহারা কেবল ধার করা শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির (Development of Industry and Commerce) কথা বলিয়া থাকেন। কৃষির উন্নতি (Development of agriculture) না হইলে, যে শিল্প এবং বাণিজ্যদ্বারা (Industry and Commerce) মানুষের অর্থাভাব দূর হইতে পারে সেই শিল্প এবং বাণিজ্যের (Industry and Commerce) উন্নতি করা যে সম্ভব নহে, তাহা পর্য্যন্ত উহারা বুঝেন না। কৃষির উন্নতি (Development of agriculture) ছাড়া যদি কেবল মাত্র শিল্প ও বাণিজ্যের (Industry and Commerce) উন্নতি করিয়া জনসাধারণের দুঃখ দূর করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে জাপান ও জার্ম্মাণীতে জনসাধারণের মধ্যে দারিদ্র্য থাকিতে পারিত না। কিন্তু উহাদের জনসাধারণের মধ্যে যে দারিদ্র্য অতি তীব্রভাবে রহিয়াছে তাহা মানুষ আগে না বুঝিলেও এক্ষণে বুঝিতে বাধ্য হইবেন। দ্বিতীয়তঃ কৃষির (Agriculture) কোন উন্নতি হইলে ভারতবাসী জনসাধারণের দারিদ্র্য দূর হইতে পারে, তাহাও এই স্বাধীনতাকামী শ্রদ্ধেয় মানুষগুলি চিন্তা করেন না। কৃষি কার্য্যের কোন্ শ্রেণীর উন্নতি সাধন করিতে পারিলে ভারতবাসী জনসাধারণের অর্থাভাব দূর হইতে পারে তাহা চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে **ভারতবাসীগণের সর্ব্বতোভাবের ঐক্য না থাকিলে তাহা করা সম্ভব নহে।**

যে কৃষিকার্য্যে ভারতবাসী জনসাধারণ একদিন প্রচুর পরিমাণে খাওয়া পরার উপকরণ উপার্জ্জন করিতে পারিত, আত্মীয়-স্বজনকে খাওয়াইতে পারিত, আতিথেয়তা রক্ষা করিতে

পারিত, ঘটা করিয়া বারমাসে তেরপার্ব্বণ করিতে পারিত, যৌথ পরিবার রক্ষা করিতে পারিত, সংকীর্ণ স্বার্থপরতা দূর করিতে পারিত, আলস্যে কাটাইয়াও খাওয়া পরার অভাবে দৈন্যগ্রস্ত হইত না, সেই কৃষিকার্য্য কোন্ ভেল্কীবাজীতে হঠাৎ এইরূপ হইয়া গেল তাহা অনুসন্ধান করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে উহার **একমাত্র কারণ জমির প্রাকৃতিক উর্ব্বরাশক্তি হ্রাস।** জমির প্রাকৃতিক উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস কেন হইল, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, জমি তাহার প্রাকৃতিক উর্ব্বরাশক্তি পান্ কোথা হইতে – তাহার সন্ধান করিতে হয়। বাতাস, জল ও ভূমি কোথা হইতে কোন্ পদ্ধতিতে উৎপন্ন হয়, তাঁহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ কি, তাহা জানিতে না পারিলে জমি স্বতঃই তাহার উর্ব্বরাশক্তি কোথা হইতে প্রাপ্ত হন তাহা জানা যায় না। ঐ সংবাদ আজকালকার ভেল্কীবাজী উৎপাদক যে তথাকথিত জ্ঞান-বিজ্ঞান আছে, সেই তথাকথিত জ্ঞান-বিজ্ঞানে পাওয়া যায় না। ঐ সংবাদ পাইতে হইলে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রবিষ্ট হইতে হইবে **সেই জ্ঞান বিজ্ঞানে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষের জমির প্রাকৃতিক উর্ব্বরাশক্তি ফিরাইয়া পাইতে হইলে আধুনিক বিজ্ঞান ভারতবর্ষকে যাহা কিছু দিয়াছেন তাহার অনেকগুলি ক্রমে ক্রমে (একদিনে নয়) মুছিয়া ফেলিতে হইবে।** যাঁহাদের মৌলিকভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা আছে তাঁহারা এই কার্য্য বুঝিলেও বুঝিতে পারেন এবং আমরা আশা করি যে ঈশ্বর এমন সময়ের উদ্ভব করিয়াছেন যে উঁহারা এক্ষণে এই একান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে স্বীকার করিবেন। কিন্তু যাহাদের মৌলিকভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা নাই অথচ নিজদিগকে এক একটা প্রকাণ্ড মস্তিষ্ক সম্পন্ন মানুষ বলিয়া মনে করেন তাঁহাদিগের পক্ষে আধুনিক বিজ্ঞানের ঐ সব কার্য্য মুছিয়া ফেলিবার প্রয়োজনীয়তা বুঝা সম্ভব নহে।

আমরা সমগ্র মানবসমাজকে বলিতে চাই এবং বুঝাইতে চাই যে -

আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক দান মুছিয়া ফেলিতে না পারিলে, আকাশ, বাতাস, জল, ভূমি ও প্রাণীর কার্য্যের সঙ্গতি (Harmony) পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হইবে না এবং তাহা পুনরুদ্ধার করিতে না পারিলে কোন দেশেরই জমির প্রাকৃতিক উর্ব্বরা শক্তি ফিরাইয়া পাওয়া যাইবে না। জমির প্রাকৃতিক উর্ব্বরাশক্তি ফিরাইয়া না পাইলে জনসাধারণের দারিদ্র্য কিছুতেই দূর করা সম্ভব হইবে না। অন্য যে কোন পন্থাই অবলম্বন করা যাক্ না কেন তাহাতে মানুষের দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য, অশান্তি, দ্বেষ-হিংসা এবং পশুভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে।

শুধু যে বিজ্ঞানের অনেকগুলি দান মুছিয়া ফেলিতে পারিলেই উদ্দেশ্য সফল হইবে তাহা নহে। একদিনে বিজ্ঞানের অনেক দান মুছিয়া ফেলা সম্ভব নহে এবং উহা মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করাও সঙ্গত নহে। উহাও একদিনে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলে মানুষ ভীষণ অসুবিধায় পড়িবেন এবং তাহাতেও দ্বন্দ্বকলহের আশঙ্কা আছে। **যাহাতে কোন দেশের একটী মানুষেরও অসুবিধা না হয় সেইরূপ ভাবে তথাকথিত বৈজ্ঞানিকের**

অকীর্ত্তিগুলি মুছিয়া ফেলিবার উপায় আছে। সেই উপায় মানুষকে বুঝিয়া লইতে হইবে এবং তাহা অবলম্বন করিতে হইবে। একটু অসতর্ক হইলেই মানুষের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইতে পারে। একদিকে যেরূপ আধুনিক বিজ্ঞানের অনেকগুলি দান ক্রমে ক্রমে কোন মানুষের অসুবিধা যাহাতে না হয়, তদনুরূপ পদ্ধতিতে মুছিয়া ফেলিবার রাস্তা উদ্ভাবন করিতে হইবে, অন্যদিকে আবার মানুষ যাহাতে তাঁহার প্রকৃত অর্থ কোন্ কোন্ বস্তু তাহা সঠিক ভাবে নির্দ্ধারণ করিতে পারেন, যাহাতে তাঁহার প্রয়োজনীয় কাঁচা মালগুলি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিতে পারেন, প্রয়োজনীয় কাঁচামালগুলিকে যে প্রণালীর শিল্পকার্য্যে ও কারুকার্য্যে মানুষের অর্থ সাধকভাবে প্রয়োগযোগ্য করা যায় তাহা যাহাতে স্থির করিতে পারেন, যে প্রণালীর বণ্টনে ও উপার্জ্জনে প্রত্যেক মানুষ তাঁহার প্রয়োজনীয় প্রত্যেক বস্তুটী প্রচুর পরিমাণে পাইতে পারেন এবং যাহাতে কেহ অসন্তুষ্ট না হইতে পারেন, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে এবং তদনুযায়ী কার্য্য যাহাতে হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই কার্য্যে একদিকে যেরূপ বুদ্ধিজীবী মানুষের প্রয়োজন, সেইরূপ আবার শ্রমজীবী মানুষের প্রয়োজন। ইহাতে একদিকে যেরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সন্ধানের প্রয়োজন, সেইরূপ আবার আইনের প্রয়োজন, গভর্ণমেণ্টের কার্য্য-বিভাগের প্রয়োজন, শিক্ষাবিধির প্রয়োজন, শিক্ষা সংগঠনের প্রয়োজন, কার্য্যের প্রয়োজন এবং কার্য্যতত্ত্বাবধানের প্রয়োজন।

ইহার প্রত্যেকটী কার্য্যে স্বাধীন চিন্তার প্রয়োজন। আমাদের মতে পরের দেওয়া শিক্ষায় অথবা বিকৃত শিক্ষায় যাঁহারা শিক্ষিতের অভিমান পোষণ করেন, যাঁহারা মানুষের কার্য্য দেখিতে ও বুঝিতে জানেন না, যাঁহারা কথায় কথায় সার্টিফিকেটের সন্ধান করেন, এবং কথায় কথায় সার্টিফিকেট, ডিগ্রী, মেডাল ও প্রতিষ্ঠা দেখান ও দেখেন, তাঁহাদের স্বাধীন চিন্তা থাকা সম্ভব নহে। যাঁহারা নিজেরা স্বাধীন হইবার চেষ্টা না করিয়া পরের কাছে অস্বাভাবিকভাবে স্বাধীনতার দাবী করেন অথবা ভিক্ষা করেন এবং তজ্জন্য লজ্জানুভব না করিয়া গৌরব অনুভব করেন, তাঁহারা আমাদিগের মতে মানুষের অযোগ্য পরিমাণে বেহায়া এবং তাঁহাদের পক্ষে কোন স্বাধীন চিন্তায় প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভব নহে। যাঁহারা অনেকদিন হইতে কতক পরিমাণে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদিগের চিন্তা যতই বিকৃত হউক না কেন তাঁহারা উপরোক্ত কার্য্যগুলির প্রয়োজনীয়তা বুঝিলেও বুঝিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা পরের কাছে ধার-করা বুলিগুলি টিয়া-পক্ষীর মত আওড়াইয়া authority হইতে চাহেন তাঁহাদিগের পক্ষে উহা বুঝা অথবা ধারণা করা সম্ভব নহে—ইহা আমাদের অভিমত।

যাঁহারা ভাবুক তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, আধুনিক বিজ্ঞানের দানগুলি মুছিয়া ফেলা এবং তদ্বিপরীত কোন কাজ করা কত দুরূহ। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বতোভাবের ঐক্য

ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে না পারিলে উহা যে একেবারেই সম্ভব নহে, তাহা ভাবুকগণ বুঝিতে পারিবেন বলিয়া আমরা মনে করি।

ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে, কোন ঐক্য অথবা শৃঙ্খলা আছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না যদি থাকিত তাহা হইলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এতগুলি দলের কথা শুনা যাইত কি? জগতের আর কোথাও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এতগুলি, এত ভীষণ ভাবে পরস্পরের বিরুদ্ধাচারী দলের কথা শুনা যায় কি? পঁচিশ বছরের বি-এ পাশ করা যুবক সংসারের সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও যেরূপ ভাবের অহঙ্কার পোষণ করেন সেইরূপ অহঙ্কার আজকাল আর কোন স্থানের যুবকগণের মধ্যে আছে বলিয়া শুনা যায় কি?

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপরোক্ত অবস্থা দেখিতে পাই বলিয়া আমাদের প্রতীতি হইয়াছে যে, জনসাধারণের অর্থাভাব দূর করিতে হইলে তাঁহাদের মধ্যে যে ঐক্য ও শৃঙ্খলার প্রয়োজন তাহা তাঁহারা সাধন করিতে পারিবেন না। ইহার জন্য যে স্বাধীন চিন্তার প্রয়োজন তাহা ও এখনই লাভ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে।

তর্কের খাতিরে যদি মানিয়া লওয়া হয় যে, ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায় ভেল্কী বাজীর মত একদিনে নিজদিগকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন, তাহা হইলে ও ইহা সুনিশ্চিত যে, একদিনে তাঁহারা ভারতবর্ষের শাসন-ভার পাইবেন না। ইংরাজ তাহা উহাদিগকে দিবেন না। উহা যে সময়সাপেক্ষ তাহা সুনিশ্চিত।

অথচ এদিকে জনসাধারণের অর্থাভাব দূর করিবার কার্য্য অনতিবিলম্বে আরম্ভ না হইলে নিরীহ মানুষগুলি না খাইতে পাইয়া অথবা আংশিক আহারের ফলে অথবা খাবারের নামে বিষ খাইয়া, তিল তিল করিয়া মরিয়া যাইতেছে। দেশের জমি শুকাইয়া যাইতেছে। শিশুর দিকে চাওয়া যাক্, যুবকের দিকে চাওয়া যাক্, যুবতীর দিকে চাওয়া যাক্, প্রৌঢ়ার দিকে চাওয়া যাক্, বৃদ্ধের দিকে চাওয়া যাক্, বৃদ্ধার দিকে চাওয়া যাক্, কোথায়ও মানুষের মূর্ত্তি পাওয়া যায় না। সবাই যেন অহঙ্কার, কপটতা, ছল-চাতুরী এবং সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নতম স্বভাবের প্রতিমূর্ত্তি। ইংরাজের মধ্যেও এই মূর্ত্তি পাওয়া যায় না। ইংরাজের কাছে ব্যক্তিগতভাবে আমরা অত্যন্ত ঋণী। ইংরাজের বিরুদ্ধে কোন কথা কহিতে আমাদের প্রাণ সাধারণতঃ চাহে না। ইংরাজগণকে বলিতে ইচ্ছা করে যে, তাঁহারা যদি আকাশ, বাতাস, জল, স্থল ও প্রাণীর পরস্পরের সম্বন্ধ কি তাহা জানিতে পারেন এবং জগতের মধ্যে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর প্রাকৃতিক স্থান কোথায় তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাহা হইলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, বর্ত্তমান ভারত ও ভারতবাসী তাঁহাদের কু-কীর্ত্তির চরম দৃষ্টান্ত। তাঁহাদের এই কু-কীর্ত্তি মুছিয়া ফেলিতেই হইবে।

ভারতবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আমরা বলিতে চাই যে—

তাঁহাদের হৃদয়ে যদ্যপি মনুষ্যত্বের লেশমাত্রও থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা সবদিকে

বুঝিয়া শুনিয়া তাঁহাদের স্বাধীনতার দাবী অনতিবিলম্বে উঠাইয়া লইবেন এবং ইংরাজ যাহাতে জনসাধারণের অর্থাভাব দূর করিবার কার্য্যে এখনই প্রবৃত্ত হন তাহার চেষ্টায় বদ্ধপরিকর হইবেন। ঐ কার্য্যের জন্য ভারতের ঋষির দেওয়া সঙ্কেত আমাদিগের নিকট আছে। একদিন ঐ সঙ্কেত অনুসারে সারা জগতের প্রত্যেক দেশ কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়াই প্রত্যেক দেশের মানুষই সময় আলস্যে কাটাইয়াও খাওয়া পরার অথবা প্রয়োজনীয় কোন বস্তুর অভাবে বিব্রত হন নাই। প্রত্যেক দেশের মানুষেরই পরমায়ু বাড়িয়া গিয়াছিল। এক্ষণে ঐ সঙ্কেত অনুসারে কার্য্য হয় না বলিয়া প্রত্যেক দেশের প্রায় প্রত্যেক পরিবার প্রায় প্রতিদিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করিয়াও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যকর খাদ্য, পরিধেয়, বাসগৃহ এবং সাজসরঞ্জাম প্রয়োজনীয় পরিমাণে জুটাইতে পারিতেছেন না। যিনি মনে করেন যে তাঁহার অর্থাভাব নাই তিনি হয় শারিরীক অস্বাস্থ্যে নতুবা অশান্তিতে প্রতিনিয়ত বিব্রত থাকেন। প্রায় সকল দেশের মানুষেরই পরমায়ু অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে।

ভারতীয় ঋষির দেওয়া সঙ্কেত যে একদিন সারাজগতের প্রত্যেক দেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আমাদিগের নিকট আছে। দরকার হইলে যথাসময়ে আমরা উহা মানবসমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

জনসাধারণের অর্থাভাব দূর করিবার কার্য্যে ভারতবাসীগণকে তাঁহাদিগের স্বাধীনতার দাবী উঠাইয়া লইয়া আন্তরিকভাবে ইংরাজজাতির সহায়তা করিতে হইবে। আমাদিগের বিশ্বাস উপরোক্তভাবে কার্য্য চলিতে আরম্ভ করিলে একদিকে যেরূপ ভারতবর্ষের প্রত্যেকের অর্থাভাব ও অন্যান্য দুঃখের কারণগুলি দূর হইয়া যাইবে সেইরূপ আবার ইংরাজজাতির প্রত্যেকের অর্থাভাব এবং অন্যান্য দুঃখের কারণগুলিও দূর হইয়া যাইবে। তাহা ছাড়া জগতের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকেই অর্থাভাব হইতে এবং অন্যান্য দুঃখের কারণ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন।

আমরা ভারতবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করি যে—এই অবস্থা কি তাঁহাদিগের কল্পিত স্বাধীনতার অবস্থা হইতেও আনন্দদায়ক নহে? তাঁহাদিগের আর একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে দুনিয়াটি একখানি দর্পণের মত। দর্পণের দিকে তাকাইয়া যেরূপ মুখভঙ্গি করা যায় প্রতিদানে সেরূপ মুখভঙ্গিই দেখিতে পাওয়া যায়। হাঁসিলে হাঁসিযুক্ত মুখ দেখিতে পাওয়া যায়, ভ্যাঙচাইলে ভেঙচিই দেখিতে হয়।

প্রকৃতির নিয়ম জানিতে পারিলে মানুষ বুঝিতে পারিবেন যে দুনিয়ায় প্রকৃতির নিয়মই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। ভারতবাসীগণ যদ্যপি সর্ব্বান্তঃকরণে ইংরাজজাতির সহায়তা করিয়া **ভারতবর্ষের, ইংলণ্ডের এবং জগতের প্রত্যেক জাতির প্রত্যেকের অর্থাভাব ও দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর করিতে পারেন, তাহা হইলে, প্রকৃতির নিয়মানুসারে ভারতবর্ষের শাসন ভারতবাসীর হস্তেই আসিবে। ইংরাজজাতি**

শ্রদ্ধাভরে ভারতবাসীর হস্তে উহা অর্পণ করিবেন। কে জানে যে একদিন জগতের প্রত্যেক দেশই ভারতবাসীকে তাঁহাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবেন না? যে সঙ্কেতের কথা আমরা জগৎকে শুনাইতে বসিয়াছি সেই সঙ্কেত যে একদিন সমগ্র মানবসমাজকে সর্ব্বতোভাবের সুখ দিতে পারিয়াছিল এবং সমগ্র মানবসমাজ যে ভারতবাসীর নিকট শ্রদ্ধায় অবনত ছিল তাহার প্রমাণ আছে। কথায় ঐ প্রমাণ আমরা এখনও দেখাইতে পারি। কিন্তু কার্য্যে না দেখাইতে পারিলে কথায় বাজীমাৎ করিয়া লাভ কি?

ভারতবাসী শিক্ষিতগণের অনেকে মনে করেন যে ঋষির দেওয়া সঙ্কেত অনুসারে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে, আলোচাল আর কাঁচাকলা খাইতে হইবে, কম্বলে শুইতে হইবে, লেংটী আর নামাবলী পরিতে হইবে এবং প্রায়ই নগ্নপদে থাকিতে হইবে। খুব বেশী হইলে একজোড়া চটী জুতা পাওয়া যাইবে। তাঁহারা মনে করেন, ঋষির সঙ্কেত অসভ্যতার অন্যনাম। আমাদিগের মতে এই ধারণা একেবারেই ভিত্তিহীন।

জীবনযাত্রার কোন্ ধারা কে অনুমোদন করেন, তাহা, তাঁহার শিল্প ও কারুকার্য্যের রুচি জানিতে পারিলে বুঝা যায়—ইহা আমাদের ধারণা। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া শিল্প ও কারুকার্য্য কাহাকে বলে এবং শিল্প ও কারুকার্য্যের নীতি কি হওয়া উচিৎ তৎসম্বন্ধে ঋষিগণ যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহার কয়েকটী কথা আমরা ভারতবাসীগণকে-তথা সমগ্র মানবসমাজকে-শুনাইব। ঋষিগণের মতে জমিজাত, জলজাত, বাতাসজাত ও প্রাণীজাত কাঁচামালগুলি মানুষের খাদ্যে, পরিধেয়ে, বাসগৃহে এবং বিভিন্ন উপকরণে ব্যবহারযোগ্য করিতে হইলে প্রথমে কাঁচামালকে পরিবর্ত্তন করিয়া প্রাথমিক ভাবে ব্যবহারযোগ্য করিবার কার্য্যকে ঋষিগণ নাম দিয়াছেন **শিল্পকার্য্য** (অর্থাৎ Industry)।

কাঁচামালকে পরিবর্ত্তন করিয়া প্রাথমিক ভাবে ব্যবহারযোগ্য করিবার পর উহার প্রত্যেকটীকে মানুষের খাদ্য, পরিধেয়, বাসগৃহ এবং উপকরণাদিরূপে প্রয়োগযোগ্য করিতে হইলে পুনরায় পরিবর্ত্তিত করিতে হয়। প্রাথমিক ব্যবহারযোগ্য অবস্থা হইতে মানুষের খাদ্য, পরিধেয়, বাসগৃহ এবং আসবাবাদিরূপে প্রয়োগযোগ্য অবস্থায় পরিবর্ত্তনের কার্য্যকে ঋষিগণ নাম দিয়াছেন **কারুকার্য্য**। এই কারুকার্য্যকেই একদিন ইউরোপীয়গণ Art বলিয়া অভিহিত করিতেন। আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের Art যে কি বস্তু, তাহা আমরা সঠিক ভাবে ধরিতে পারি না। আমরা চিত্রের রাজ্যে দেখিতে পাই যে মানুষের যে মাতা, ভগ্নি, দুহিতা ও সহধর্ম্মিণীগণ স্ত্রীলোক রূপে বিরাজিতা থাকেন, সেই স্ত্রীলোকগণকে কখনও অংশবিশেষে কখনও সম্পূর্ণভাবে নগ্ন করিয়া চিত্রিত না করিলে Art প্রস্ফুটিত হয় না। এই Art কি মনুষ্যত্বের বিকাশ? কোন মানুষ মনুষ্যত্ব থাকিতে নিজের মাতার, অথবা ভগ্নির, অথবা দুহিতার, অথবা সহধর্ম্মিণীর নগ্নতা সহ্য করিতে পারেন কি?

কারুকার্য্য সম্বন্ধে ঋষিগণের প্রধান কথা—উহা যাহাতে দেখিতে সুন্দর হয়; কারুকার্য্যের

উৎপন্ন বস্তুর গন্ধ যাহাতে প্রীতিকর হয়, তাহা সর্ব্বদা নজর রাখিতে হইবে। খাদ্য যাহাতে দেখিতে সুন্দর, গন্ধে প্রীতিকর, রসে সুস্বাদু, স্পর্শে সুকোমল হয় তাহা করিতেই হইবে। পরিধেয় যাহাতে দেখিতে সুন্দর, গন্ধে প্রীতিকর, স্পর্শে সুকোমল হয় তাহা করিতেই হইবে; অথচ পরিধানে উহা যাহাতে শরীরের রস ও তেজের মাত্রার ও প্রবাহের অসামঞ্জস্য ঘটাইতে না পারে তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে। বাসগৃহ যাহাতে দেখিতে সুন্দর, গন্ধে প্রীতিকর, প্রাকৃতিক বাতাস ও আলোক যাহাতে অব্যাহত থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। রাত্রির ও শীতকালের শীতলতা, মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ও গ্রীষ্মকালের উষ্ণতা যাহাতে সংযত করা যায় তাহারও ব্যবস্থা করিবার উপদেশ আছে। আসবাবগুলি যাহাতে দেখিতে সুন্দর, গন্ধে প্রীতিকর এবং স্পর্শে সুকোমল হয় তাহার ব্যবস্থা করাও ঋষিগণের উপদেশ।

ঋষিগণের কথানুসারে মানুষের খাদ্য, পরিধেয়, বাসগৃহ এবং আসবাবাদির প্রত্যেকটী দেখিতে সুন্দর ও গন্ধে প্রীতিকর হওয়া প্রয়োজন বটে কিন্তু যাহাতে কোনটী মনের মলিনতা অথবা উত্তেজনা অথবা বিষাদ আনিতে পারে তাহা সর্ব্বদা বর্জ্জনীয়। ইহা ছাড়া যাহাতে শরীরের অথবা ইন্দ্রিয়ের অথবা মনের অথবা বুদ্ধির কোনরূপ অস্বাস্থ্য অথবা স্বাভাবিক পুষ্টির হ্রাসকর কিছু ঘটিতে পারে তাহাও সর্ব্বদা বর্জ্জনীয়। ঋষিদিগের মতে—যে-সমস্ত কাঁচামালকে শিল্পকার্য্যের দ্বারা মানুষের খাদ্য, পরিধেয়, বাসগৃহ ও আসবাবাদির কারুকার্য্য যোগ্য অবস্থার পরিবর্ত্তিত করা হয় সেই সমস্ত কাঁচামালের প্রত্যেকটীর মধ্যে প্রাকৃতিক পাঁচটী কর্ম্ম (অর্থাৎ উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন, এই পাঁচটী) অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। এই কাঁচা মালগুলি যখন শিল্প কার্য্যের দ্বারা কারুকার্য্যের যোগ্য অবস্থায় পরিবর্ত্তিত করা হয় তখন এই কাঁচা মালগুলির গমন কর্ম্ম (inherent work of the displacement of internal molecules) যাহাতে সর্ব্বতোভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তদ্বিষয়ে লক্ষ রাখিতে হয়। কিন্তু উহার উৎক্ষেপণ অথবা অবক্ষেপন অথবা আকুঞ্চন অথবা প্রসারণ কর্ম্মের ক্ষয় যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প পরিমাণে ঘটিতে পারে সেই-রূপ শিল্প প্রণালীর অবলম্বন করাইতে হয়। ঋষিগণের মতে প্রত্যেক কাঁচা মালের উৎক্ষেপনাদি কর্ম্ম মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির অত্যন্ত উপকারী। উহা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে পারিলে মানুষের ঔষধের কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু সাধারণ শিল্প কার্য্যে কাঁচা মালের অন্তর্নিহিত এই চারিটী প্রাকৃতিক কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা সম্ভব নহে। ইহারই জন্য যে শিল্প প্রণালীতে কাঁচা মালের এই চারিটী প্রাকৃতিক কর্ম্ম যত অধিক পরিমাণে বজায় রাখা যায়, সেই শিল্প প্রণালী তত অধিক ভাল। যে-শিল্প প্রণালীতে কাঁচা মালের এই চারিটী প্রাকৃতিক কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে নষ্ট হইয়া যায়, সেই শিল্প প্রণালীর উৎপন্ন দ্রব্য মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির কার্য্যে অসঙ্গতি আনাইয়া দেয় এবং তাহা সর্ব্বতোভাবে মানুষের ত্যাগের যোগ্য।

খাদ্য, পরিধেয়, বাসভূমি ও অন্যান্য সাজসরঞ্জামের সম্বন্ধে ঋষিগণ যে সমস্ত উপদেশ

দিয়াছেন তাহার মোটা কথাগুলি আমরা ভারতবাসীগণকে শুনাইলাম। এই সম্বন্ধে বহু কথা আছে যাহা এখানে শুনান সম্ভব নহে এবং শুনাইবার প্রয়োজন নাই। এই কথাগুলি বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যাঁহারা মনে করেন যে ঋষিগণ কেবল ত্যাগের কথাই বলিয়াছেন তাঁহারা ভ্রান্ত; ঋষিগণ কোথায়ও অর্থত্যাগের কথা বলেন নাই। তাঁহারা কেবলমাত্র অনর্থ ত্যাগের কথা বলিয়াছেন। খাদ্য, পরিধেয়, বাসভূমি ও সাজ-সরঞ্জাম প্রত্যেক দেশে তাহাদিগের মতে ঋতুভেদে, প্রাতঃকালে, দ্বিপ্রহরে এবং সন্ধ্যায় বিভিন্ন হওয়া দরকার। বয়স ভেদেও উহার ভেদ হওয়া উচিৎ, তাহাও তাঁহাদিগের উপদেশ। দেশ-ভেদে খাদ্য, পরিধেয়, বাসভূমি ও সাজ-সরঞ্জামের বিভিন্নতা প্রয়োজনীয়। এত রকম খাদ্য, এত রকম পরিধেয়, এত রকম বাসগৃহ ও এত রকম সাজ-সরঞ্জামের কথা তাঁহারা বলিয়াছেন যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক তাহা কল্পনাও করিতে পারেন না। কালভেদে, দেশভেদে কিরূপ খাদ্য খাইলে অথবা পোষাক পরিধান করিলে অথবা বাসগৃহে বাস করিলে অথবা কিরূপ সাজ-সরঞ্জামে ব্যবহার করিলে মানুষের শরীর ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সমান ভাবে সুস্থ ও কার্য্যক্ষম থাকিতে পারে তাহার উপদেশ তাঁহারা যেমন দিয়াছেন, সেইরকম কার্য্যভেদে (অর্থাৎ বিবিধ শারিরীক ও মানষিক পরিশ্রমের কার্য্য) কিরূপ খাদ্য ও পরিধেয়াদি হওয়া উচিৎ এবং কেন হওয়া উচিৎ তাহার আলোচনাও তাঁহারা করিয়াছেন। প্রত্যেক বস্তুর কারুকার্য্যে সোন্দর্য্য, সুগন্ধ, সুকোমল স্পর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে—ইহা তাঁহাদের উপদেশ। জগতের প্রাচীন কীর্ত্তি যে সমস্ত দেখা যায় তাহার কোনটীতে সৌন্দর্য্যের অভাব নাই। অথচ উহার প্রত্যেকটী বর্ত্তমান বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের অনেক আগে নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক ঐরূপ সুন্দর ও স্থায়ী কিছুই নির্ম্মাণ করিতে পারেন না।

এত সৌন্দর্য্য, এত সুগন্ধ, এত সুকোমলতার দিকে তাঁহাদিগের নজর অথচ মানুষের সর্ব্বতোভাবে স্বাস্থ্যের দিকেও তাঁহাদিগের নজরের অভাব নাই।

ঋষিগণের কথাগুলি সর্ব্বতোভাবে জানিতে পারিলে ও বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে তাঁহাদিগের সভ্যতা সম্বন্ধে মানুষের ভুল ধারণা আছে এবং এই ভুল ধারণার জন্য বর্ত্তমান কালে দায়ী ভারতের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ ও জগতের Sanskrit Scholarগণ। ইঁহারা কেহই ঋষিগণের ভাষা বুঝেন না। এই ভাষা বুঝিতে হইলে যে সাধনার প্রয়োজন সেই সাধনাই লুপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

মানুষ আজকাল Standard of Living বাড়াইবার কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সময় হইলে আমরা সমগ্র মানব সমাজকে দেখাইব যে, ঋষিগণ যে Standard of Livingএর কথা বলিয়াছেন তাহা আজকালকার মানুষ কল্পনাই করিতে পরেন না। এক একটী মানুষের জন্য বয়স ভেদে, বাসস্থান ভেদে, কার্য্য ভেদে কত রকমের সাজ-সরঞ্জাম, কত রকমের বাসগৃহ, কত রকমের পোষাক, কত রকমের খাদ্য ও পাণীয়ের কথা তাঁহারা বলিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিলে ঋষির সভ্যতার Standard কত উচ্চ তাহা বুঝা যাইবে। আজকালকার বৈজ্ঞানিক

Standard of Living বাড়াইবার কথা বলেন বটে কিন্তু কি ব্যবহার করিলে মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সামর্থ্য ও সঙ্গতি (Harmony) না হারাইয়া বাড়িতে পারে, তাহার কোন কথা বলেন না। কোন্ দ্রব্যের ব্যবহারে কি পরিণতি হইবে তাহা জানা ত' দূরের কথা, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কাহাকে বলে, দেহের মধ্যে কোথায় কে কি অবস্থায় আছেন তাহাই আজকালকার ডাক্তারগণ জানেন না। ঋষি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কত নজর রাখিয়াছেন, জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি কত পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

আজকালকার বৈজ্ঞানিকগণ Standard of Living বাড়াইবার কথা বলেন বটে কিন্তু কোন্ উপায়ে মানুষ যে Standard of Living বাড়াইবার মত উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হন তাহার কোনো সুচিন্তিত কথাই আজকালকার অর্থনীতির বিজ্ঞানে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেও পাওয়া যায় না। ভারতীয় ঋষির গ্রন্থ বুঝিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিয়া উহা অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, যে শ্রেণীর মানুষের জন্য তাঁহারা যে শ্রেণীর Standard of Livingএর কথা বলিয়াছেন, সমস্ত পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের সেই শ্রেণীর মানুষ সেই Standard of Living কি করিয়া অনায়াসে উপার্জ্জন করিতে পারেন তাহার কথাও ঋষিগণের গ্রন্থে আছে। ঐ সমস্ত কথা আমরা মানুষকে যথা সময়ে জানাইব।

ভারতবাসী শ্রমিক ও জনসাধারণকে আমরা বলিতে চাই যে, তাঁহারা অযথা ইংরাজ জাতির উপর বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়াছেন। তাঁহারা যে ইংরাজ জাতির উপর বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়াছেন তাহা তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারেন না। একৃসিস্ (Axis) পক্ষের জয়ের কথা শুনিলে তাঁহাদের প্রাণে কত আনন্দ হয় তাহা পরীক্ষা করিলেই ইংরাজ জাতির বিরুদ্ধে যে তাঁহাদের বিদ্বেষ আছে তাহা বুঝা যায়। আমাদের মতে তাঁহাদের এই ইংরাজ বিদ্বেষের কারণ কংগ্রেসের মূল নীতি।

ভারতবাসীগণের পক্ষে কাহারও বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করা অত্যন্ত পাপজনক। ভারতীয় ঋষি পরিষ্কার ভাবে দেখাইয়াছেন যে, কোন দুইটী দেশের মাটী, জল এবং হাওয়ার গুণাগুণ সর্ব্বতোভাবের একরকম নহে। মাটীর এই গুণাগুণ ভেদে, এক দেশে যাহা সহ্য হয় অন্য দেশে তাহা সহ্য হয় না। মানুষে মানুষে বিদ্বেষ সর্ব্বদেশেই ঈশ্বরের নিয়মানুসারে অমার্জ্জনীয় পাপ। সম্রাট পর্য্যন্ত ঈশ্বরের বিচারের বহির্ভূত নহেন। তফাৎ এই যে, এক দেশে যে পাপের যে বিচার যত তাড়াতাড়ি হয়, অন্যদেশে ঐ পাপের সেই বিচার তত তাড়াতাড়ি নাও হইতে পারে। কিন্তু একদিন বিচার হইবেই। ভারতবর্ষের মাটী যত সুজলা ও সুফলা অন্য কোন দেশের মাটী তত সুজলা ও সুফলা নহে। ভারতবর্ষের মাটীর এই অবস্থা ঈশ্বরের দান। ইহা কোন মানুষের তৈয়ারী করা নহে। মানুষ তাহার পাপে ঈশ্বরের দান নষ্ট করিতে পারে। মানুষের পাপেই ঈশ্বরের দেওয়া ভারতবর্ষের মাটীর উৎপাদনশক্তি অনেক পরিমাণে ইংরাজ ও মুসলমানগণের রাজত্বের অনেক আগে হইতেই কমিয়া আসিতেছে। উহার জন্য

দায়ী প্রধানতঃ ভারতের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ। কেন উঁহারা দায়ী তাহার কথা আমরা মানুষকে পরে শুনাইব। ভারতবর্ষের মাটীতে ঈশ্বরের দেওয়া এত গুণ আছে বলিয়া ভারতবর্ষের মানুষেরও অভাবগ্রস্ত লোককে অভাবের সময় সাহায্য করিবার দায়িত্ব আছে। ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই দায়িত্ব রক্ষা করিতে পারেন নাই বলিয়া ঈশ্বরের বিচারানুসারে তাঁহাদিগের দেশের শাসনভার অপর দেশের লোকের হস্তে হস্তান্তরিত হইয়াছে। এই শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের কংগ্রেস গড়িয়া উল্টা ভাবে জনসাধারণের মনে ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করিবার প্রবৃত্তি জাগ্রত করিয়াছেন। কি করিয়া জমির প্রাকৃতিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিতে হয়, কি করিয়া ভারতবর্ষের জমি পৃথিবীর সমস্ত লোকের খাওয়া পরার মত ব্যবস্থা করিতে পারে, তাহা যদি কংগ্রেস ইংরাজ জাতিকে দেখাইয়া দিতে পারিতেন এবং ইংরাজ জাতি কংগ্রেসের এই কথা মান্য না করিতেন, তাহা হইলেও বা ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করিবার কতকটা সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইত। কংগ্রেসের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে,-কংগ্রেস কেবলমাত্র ইংরাজ রাজত্বের, এ দোষ অথবা ও দোষ, এই কথাই বলিয়াছেন এবং স্বরাজ ও স্বাধীনতা চাহিয়াছেন এবং আইন অমান্য ও অসহযোগীতা করিয়া দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। দেশের গরীব মানুষের অথবা জনসাধারণের খাওয়া পরার ব্যবস্থা—কাহারও সহিত ঝগড়া বিবাদ না করিয়া কোন্ পন্থায় হইতে পারে, তাহার কোন কথা কংগ্রেসের কোন মহামান্য নেতা কোন দিন বলেন নাই। আমরা তাঁহাদিগের অনেকের সহিত কথা কহিয়া যাহা বুঝিয়াছি তাহাতে আমাদিগের সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, কংগ্রেসের নেতাগণের কাহারও ভাগ্যে ঐ বিষয়ে চিন্তা করিবার মত বুদ্ধি লাভ করা সম্ভব হয় নাই। আমরা কাহাকেও তাঁহাদিগের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করিতে বলি না। ভাগ্যকে অথবা মানুষের কৃতকর্ম্মকেই আমরা দোষ দিতে চাই। অন্য কেহ যদি অন্যায় করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে অন্যায় করিয়া ঈশ্বরের বিচারে অপরাধী হইতে আমরা কাহাকেও পরামর্শ দেই না।

আমরা জনসাধারণকে, ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ এবং নিজেদের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করি। প্রত্যেক মানুষই মানুষ, সকলেই ঈশ্বরের দেওয়া আকাশ, বাতাস, জল ও ভূমির সাহায্যে বাঁচিয়া থাকেন। ঈশ্বরানুগ্রহ না হইলে কাহারও জন্মগ্রহণ করা সম্ভব নহে—এই কথা মনে রাখিয়া হিন্দু-মুসলমান, অথবা ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, অথবা পুতুল পূজা করা—না করার, বিদ্বেষ, জনসাধারণকে খাওয়া পরার সংস্থান করিতে হইলে, পরিত্যাগ করিতে হইবে। কাহারও প্রতি কোন বিদ্বেষ মানুষের হৃদয়ে থাকিলে ঈশ্বরের নিয়মানুসারে ভীষণ-ভাবের অপরাধ হয়। যাঁহারা এই অপরাধে অপরাধী হইয়া থাকেন তাঁহাদিগের পক্ষে খাওয়া পরা জুটান কষ্টসাধ্য হয়।

সমগ্র মানবসমাজের কোন দেশের কাহারও যাহাতে খাওয়া পরা জুটাইতে কোনরূপ ক্লেশ পাইতে না হয় তাহার পরিকল্পনা ইংরাজ রাজের সম্মুখে উপস্থিত করিতে চলিয়াছি। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত এতাদৃশ পরিকল্পনার সাফল্য লাভ করা সম্ভব নহে—ইহা ভারতীয় ঋষির কথা। **ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাইতে হইলে প্রত্যেককেই পবিত্র হইতে হয় এবং বিচার করিয়া কার্য্য করিতে হয়। অন্ধ অনুরাগ, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব ও কলহের প্রবৃত্তি ভারতীয় ঋষির মতে সর্ব্বাপেক্ষা অপবিত্রতার কার্য্য।** জনসাধারণ-যেন কাহারও প্ররোচনায় কোন অপবিত্রতার কার্য্যে লিপ্ত না হন।

ইংরাজগণের অথবা মিত্রপক্ষের রাষ্ট্রীয় নেতাগণকে আমরা যাহা যাহা বলিয়াছি অ্যাক্সিস্ (Axis) পক্ষের রাষ্ট্রীয় নেতাগণকেও আমরা সেই সেই কথাই বলিতে চাই। তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, তাঁহারাই যুদ্ধে জয়ী হইবেন, তাহা হইলে যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য তাঁহাদিগের কত ব্যয় করিতে হইবে, কত সময় ক্ষেপণ করিতে হইবে। যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর তাঁহাদিগের নিজ নিজ দেশ কোন্ অবস্থায় উপনীত হইবে, এবং সমগ্র মানবসমাজ কোন্ অবস্থায় উপনীত হইতে পারেন তাহা আমরা তাঁহাদিগকে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। তাঁহারা ইউক্রেন (Ukraine) লাভ করিয়াছেন, ব্রহ্মদেশ লাভ করিয়াছেন, ভারতবর্ষের দ্বীপপুঞ্জের অনেকগুলি লাভ করিয়াছেন, ইহা খুবই সত্য। তর্কের খাতিরে স্বীকার করা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষও তাঁহারা লাভ করিবেন। যুদ্ধে তাঁহারা সর্ব্ববিজয়ী এই খ্যাতি তাঁহাদের হইবে, তাহাও স্বীকার করা যাইতে পারে। এই রাজত্ব লাভ ও খ্যাতি লাভে তাঁহাদের স্ব স্ব দেশবাসীর খাদ্য, পরিধেয়, বাসস্থান ও অন্যান্য উপকরণ লাভ করিবার কতদূর সহায়তা করিবে তাহা তাঁহাদের বিবেচনার যোগ্য। তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ইংরাজ জাতি ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও দ্বীপপুঞ্জ হইতে ইদানীং তাঁহাদের জনসাধারণের জন্য কি লাভ করিতে পারিতেছিলেন। ইংরাজের জনসাধারণের অধিকাংশই দারিদ্র্য ও অস্বাস্থ্য হইতে মুক্ত কি না তাহার দিকেও লক্ষ্য করা উচিৎ। আমরা দূর হইতে যাহা বুঝি, তাহাতে আমাদের মনে হয়, বিশাল সাম্রাজ্য থাকা সত্ত্বেও ইংরাজ জনসাধারণের শতকরা ৭৫ জনই এখন আর দারিদ্র্য হইতে মুক্ত নহেন। সেন্সাস রিপোর্ট বিবেচনার সহিত পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, ১৮৯১ সালে ইংলণ্ডের পাঁচ বৎসর বয়স্ক মানুষ যত সংখ্যায় ছিলেন তাহার অর্দ্ধেকের অধিক ১৯৩১ সালে ৪৫ বৎসর বয়স্ক হন নাই। ইহা হইতে বুঝিতে হয় যে ইংলণ্ডে যে সংখ্যক মানুষ জন্মগ্রহণ করেন তাহার প্রায় অর্দ্ধেকই চল্লিশ বৎসরের পরমায়ু লাভ করেন না। আমাদিগের মতে জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্য, স্বাস্থ্যপ্রদ পরিধেয়, স্বাস্থ্যপ্রদ বাসগৃহ এবং স্বাস্থ্যপ্রদ সাজসরঞ্জামের অভাব না হইলে এইরূপ অল্প বয়সে মৃত্যু ঘটে না। আমরা ভারতবর্ষে যে সমস্ত ইংরাজ যুবকগণকে দেখিতে পাই এবং তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনের জন্য যেরূপ আকুলতা অনুভব করি, তাহাতে আমাদের মনে হয় তাঁহাদের দেশে ভীষণ দারিদ্র্য না থাকিলে আত্মীয় স্বজন

ছাড়িয়া এত দূরদেশে তাঁহারা জীবিকার্জ্জনের জন্য আসিতেন না। আমাদিগের মতে ইংরাজ জনসাধারণ যুদ্ধে যেরূপ ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন তাহাও তাঁহাদের দারিদ্র্যেরই একটি বড় প্রমাণ। মনোবৃত্তির নিয়মানুসারে বড় মানুষ মানের দায়ে অথবা জিদ্ রক্ষা করিবার জন্য সময় সময় ঝগড়া-ঝাঁটিতে অথবা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতে পারেন বটে কিন্তু গরীব মানুষ অথবা জনসাধারণ পেটের দায় উপস্থিত না হইলে যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়েন না। **ইংলণ্ডেও দারিদ্র্য ভীষণভাবে আছে ইহা প্রমাণিত হইলে নরহত্যা করিয়া সাম্রাজ্যগঠনে কোন লাভ আছে কিনা তাহা বিচারের যোগ্য হয়।**

আমরা যাহা বুঝিয়াছি তাহাতে বলিতে হয় যে, জগতে এমন একদিন ছিল যখন আকাশ, বাতাসের দেওয়া উর্ব্বরাশক্তি জগতের প্রত্যেক দেশেই ছিল। তখন কোন দেশের মানুষকেই আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া জীবিকার্জ্জনের জন্য দূরদেশে যাইতে হইত না। ঘরে বসিয়াই প্রায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ জমি হইতে এবং কুটীর শিল্পের দ্বারা যাহা পাইতেন তাহা দিয়াই সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। ইয়োরোপের জমিতেই সর্ব্বপ্রথমে শুষ্কতা আরম্ভ হইয়াছে এবং অনেকেরই জমি হইতে প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণ পাওয়া অসাধ্য হইয়া পরিয়াছে। ইহার ফলে ইয়োরোপীয়গণকে পেটের দায়ে সর্ব্বপ্রথমে দেশ বিদেশে ছুটা-ছুটী করিতে আরম্ভ করিতে হইয়াছে। তখনও এশিয়ায় (Asia) অনেক যায়গায় স্ব স্ব অধিবাসীগণের খাওয়া পরার সংস্থান করিয়াও কিছু উদ্বৃত্ত হইত। কাজেই তখন সাম্রাজ্য গঠনে তখনকার মত কিছু লাভ ছিল। কিন্তু এখন আর ঐ অবস্থা নাই। **বর্ত্তমান বিজ্ঞানের কৃপায় অ্যাসিয়ার (Asia) জমিও অনেক জায়গায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে এবং অনেক দেশ নিজের অধিবাসীগণের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করিতেই সক্ষম নহে। সাম্রাজ্য গঠনে লাভের মধ্যে হয় দ্বেষ-হিংসার বৃদ্ধি।** ভারতবর্ষে লাটগণকে সন্ত্রাশবাদীগণের ভয়ে পুলিশের সাহায্য লইয়া যেরূপ সন্তর্পণে চলাফেরা করিতে হয়, তাহা কাহারও আকাঙ্খনীয় কিনা তাহা বিবেচনার যোগ্য। অ্যাক্সিস্ (Axis) পক্ষ হয়ত ভাবিতে পারেন যে তাহারা বিজ্ঞানে যেরূপ উন্নত তাহাতে ইংরাজগণ যদিও কোন দেশের উন্নতি সাধন করিয়া দেশবাসীগণকে খাওয়াইয়া পরাইয়া নিজেদের দেশের জনসাধারণের জন্য বিশেষ কিছু রোজগার করিতে পারেন নাই, কিন্তু তাহারা তাহা পারিবেন। আমরা তাহার উত্তরে বলিব যে উহা যদ্যপি আক্সিস্ (Axis) পক্ষের সামর্থ্যযোগ্য হইত তাহা হইলে তাহারা নিজ নিজ দেশের জমি হইতেই তাহাদের জনসাধারণের খাওয়া-পরার সংস্থান করিতে পারিতেন। উপনিবেশের জন্য তাহাদের ছট্‌ফট্ করিতে হইত না। **আমাদের মতে কোন দেশের জনসাধারণকে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য যাহাতে দূরদেশে যাইতে না হয় এবং জনসাধারণ যাহাতে দেশে বসিয়াই সুস্থ ও দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে, তাহা করিতে হইলে জল, বাতাস ও ভূমির মধ্যে**

প্রাকৃতিক সম্বন্ধ কি আছে তাহা জানিতে হয়। ঐ সংবাদ আধুনিক বিজ্ঞানে নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পন্থায় উহা জানা যায় না। উহা জানিতে হইলে দাম্ভিকতা, দ্বন্দ্ব-কলহ, উত্তেজনা, দ্বেষ-হিংসা, খেলাধূলা, মদ্যপান, একাধিক স্ত্রী-লোলুপতা, টেলিস্কোপ, মাইক্রস্কোপ, ল্যাবরেটরী ও টেষ্ট-টিউব্ সর্ব্বতোভাবে ছাড়িয়া দিতে হয় এবং বাতাসের সঙ্গে নিজেকে কি করিয়া মিশাইতে হয় তাহা অভ্যাস করিতে হয়। আমাদের মতে বিজ্ঞানের খেলায় এতবড় যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলে অ্যাক্সিস্ (Axis) পক্ষ খুব সহজে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের খেলা ছাড়িয়া দিতে পারিবেন না ও ছাড়িবেন না—বিশেষতঃ মিত্রপক্ষকে হারাইতে পারিলে হয়ত তাহারা তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিতে চাহিবেন কিন্তু তাহাতেও তাহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না। ইংলণ্ডকে (England) কায়দায় রাখিবার জন্য সর্ব্বদাই তাহাদিগকে পুনরায় যুদ্ধের জন্য সজ্জিত থাকিতে হইবে। আমাদিগের মতে অ্যাক্সিস্ (Axis) পক্ষ যদি ভাবেন যে ইংরাজ যাহা করিতে পারেন নাই তাহা তাহারা পারিবেন, তাহা হইলে তাহাদের ভুল করা হইবে।

ঋষিদিগের দেওয়া সঙ্কেত অনুসারে যাহাতে ভারতবর্ষে কার্য্য আরম্ভ হয়, যাহাতে সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের অর্থাভাব দূর করিয়া যুদ্ধ বিবাদের প্রবৃত্তি মানবসমাজ হইতে সর্ব্বতোভাবে দূর করা সম্ভব হয় তাহার সহায়তা করিবার জন্য **আমরা অ্যামেরিকার জনসাধারণের এবং তাহাদের রাষ্ট্রনেতাগণের সহযোগ যাচ্ঞা করিতেছি।** এই যুদ্ধে অ্যামেরিকাবাসীগণ ইংরাজ-গভর্ণমেন্টের যেরূপ মিত্রতার পরিচয় দিতেছেন তাহাতে তাহারা চেষ্টা করিলে ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট তাহাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। জগতের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের যাহাতে অর্থাভাব ও সর্ব্ববিধ দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর হয় তাহার ব্যবস্থা সম্ভব-যোগ্য করিতে পারিলে কোন দেশেরই কোনরূপ লোকসানগ্রস্ত হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে।

আমাদিগের মতে মানুষে মানুষে যে যুদ্ধ হয় তাহার ভাল ও মন্দ দুইদিকই আছে তাহা সত্য, কিন্তু যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তি মূলতঃ মানুষের পাশবিকতা (animality) হইতে উদ্ভূত হয়। **মানুষের মনুষ্যত্ব মূলক প্রবৃত্তি (spirit of rationality) যুদ্ধ ত' দূরের কথা দ্বন্দ্ব-কলহের পর্য্যন্ত বিরোধী।** মানুষ পশুত্ব ও মনুষ্যত্ব (animality এবং rationality) এই দুইশ্রেণীর প্রবৃত্তি লইয়াই জন্মগ্রহণ করে বটে কিন্তু তাহার পশুত্বের প্রবৃত্তি যত সহজে উৎকর্ষ লাভ করে মনুষ্যত্বের প্রবৃত্তি তত সহজে উৎকর্ষ লাভ করে না। মনুষ্যত্বের প্রবৃত্তি জাগ্রত করিতে হইলে সাধনার (culture-এর) প্রয়োজন এবং ঐ সাধনার জন্য প্রত্যেক অবস্থায় কার্য্যোপযোগী সুচিন্তিত আদর্শের প্রয়োজন এবং প্রত্যেক মানুষ যাহাতে ব্যক্তিগতভাবে ঐ আদর্শানুসারে দৈনন্দিন জীবনে চলিতে পারে, তদুপযোগী সামাজিক ব্যবহার প্রয়োজন। আপাতদৃষ্টিতে সমস্ত মনুষ্য সমাজের প্রত্যেকের সর্ব্বতোভাবের মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ সাধনের ব্যবস্থার কথা যতই Arabian Night এর গল্পের মত শুনাক না কেন, আমাদের মতে প্রত্যেক অবস্থায় কার্য্যোপযোগী

সুচিন্তিত আদর্শ মানুষের সম্মুখে ঝুলাইয়া দিলে এবং সামাজিক যে ব্যবস্থায় ঐ আদর্শানুসারে চলা কোন মানুষের পক্ষে অসম্ভব না হয়, সেই সামাজিক ব্যবস্থার সংগঠন করিতে পারিলে প্রত্যেক মানুষই অতি সহজেই তাহার মনুষ্যোচিত প্রবৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন।

আমাদের মতে আজকাল প্রায় প্রত্যেক দেশেই প্রকৃত মনুষ্যোচিত আদর্শ লইয়া চলা একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে এই দেখা যাইবে যে, "সত্য-বাদীতা" **মনুষ্যত্বের প্রধান অঙ্গ** অথচ আজকাল প্রায় প্রত্যেক দেশেই আদালত সমূহে বিচার-কার্য্যের সাক্ষ্য গ্রহণ প্রণালী যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে কাহারও সর্ব্বতোভাবের অকপট যথার্থবাদীতা রক্ষা করা সম্ভব নহে। আইনের ধারার সহিত ঘটনার সর্ব্বতোভাবের সামঞ্জস্য না থাকিলে তথাকথিত বুদ্ধিমান বিচারকগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার অসুবিধা হয়। আইনের ধারাও ঘটনার ঐ সামঞ্জস্য বিধান করিবার জন্য যাঁহারা আদালতে যাইতে বাধ্য হন তাঁহারা প্রায়ই সত্য ব্যাপারের অদল-বদলের কার্য্য করিতেও বাধ্য হন। যাঁহারা জীবিকার্জ্জনের জন্য বিষয় কর্ম্ম করেন তাঁহারা আজকালকার দিনে প্রায়ই আদালতে না যাইয়া পারেন না এবং জীবিকার্জ্জনের জন্য বিষয় কর্ম্ম না করিয়া পারেন এমন লোকও প্রায়শঃ দেখা যায় না। কাযেই প্রায় প্রত্যেক দেশেরই গভর্ণমেণ্টের এই আদালত সংগঠনের দুষ্টতায় মানুষের সত্যপ্রিয়তা রক্ষা করা প্রায়শঃ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার পর আবার সমাজে যাহাতে অসত্যবাদীতা প্রশ্রয় না পায় তাহার জন্য যাঁহারা অসত্যবাদী অথবা কপট, তাঁহারা যাহাতে সমাজের কোন উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারেন তাহার ব্যবস্থাও একান্ত প্রয়োজনীয়। অথচ আজকালকার দিনে যাঁহারা রাষ্ট্রীয় নেতা অথবা গভর্ণমেণ্ট সমূহের সর্ব্বোচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত তাহাদের কপটতা ছাড়া এক পদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই। Diplomacy ব্যাপারটা কি তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, উহা সর্ব্বৈব কপটতা ও মিথ্যার খেলা।

মনুষ্যত্বের দ্বিতীয় অঙ্গ সাধুতা। অথচ আজকালকার দিনে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও চাকুরী যেরূপভাবে করিতে হয় তাহাতে ক্রেতা যদ্যপি বিক্রেতাকে অথবা বিক্রেতা যদ্যপি ক্রেতাকে, মনিব যদ্যপি চাকরকে এবং চাকর যদ্যপি মনিবকে, ধনিক যদ্যপি শ্রমজীবীকে এবং শ্রমজীবী যদ্যপি ধনিককে ঠকাইতে না পারেন তাহা হইলে বুদ্ধিমান এবং চতুরের (Intelligent এবং Smart এর) তালিকায় উল্লেখযোগ্য হইল না।

আমাদের ধারণা উপরোক্ত রকমের ভ্রমপ্রমাদ চলিতেছে বলিয়া সর্ব্বত্র হাহাকার উঠিয়াছে এবং যাহাকে মানুষ আজকাল সভ্যতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহা সর্ব্বৈব মানুষের পশুত্ব প্রবৃত্তি হইতে সমদ্ভূত। মানবসমাজ হইতে এই অবস্থায় এই এতাদৃশ পশুত্বের প্রবৃত্তি দূর করিয়া মনুষ্যত্ব প্রবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করা যায় কি করিয়া তাহার পন্থা নির্ব্বাচন করা আমাদিগের লেখার অন্যতম উদ্দেশ্য। ভারতীয় ঋষিদিগের লেখা পড়িয়া আমরা যাহা বুঝিয়াছি তাহাতে ঐ উদ্দেশ্য সফল করা মোটেই শক্ত নহে বলিয়া আমাদিগের মনে হইয়াছে। আদর্শবাদ

কার্য্যযোগ্য হইলে এবং যাহা আদর্শ তাহা কার্য্যে পরিণত করিলে কোনরূপ বাধার উৎপত্তি যাহাতে না হয় তাদৃশ সামাজিক সংগঠন করিতে পারিলে, যে কোন আদর্শকেই কার্য্যে পরিণত করা যায় ইহা আমাদিগের অভিমত।

আমরা আগেই দেখাইয়াছি যে, ঋষিগণ মানুষের কি আদর্শ হওয়া উচিৎ তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন এবং পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন **যে মানুষ জন্মগ্রহণ করে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি লইয়া সাধনার দ্বারা মনুষ্যোচিত প্রবৃত্তি যাহাতে মানুষের অর্জ্জন করা সম্ভব হয় তাহাই মানুষের আদর্শ।**

মানুষের পশুত্ব (animality) ও মনুষ্যত্ব (rationality) আপনা হইতেই জন্মাবধি কি করিয়া আইসে এবং ঐ পশুত্ব ও মনুষ্যত্বের কতরকমের হ্রাস বৃদ্ধি হয় ও কেন হয় তাহা সন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারিলেই মানুষের পশুত্ব কোন পন্থায় দূর করা যাইতে পারে এবং মনুষ্যত্ব কি করিয়া প্রস্ফুটিত করা যায়, তাহা নির্দ্ধারণ করা সহজ হইয়া থাকে। আমাদিগের মতে ভারতের ঋষিগণ ঐ সন্ধান তাঁহাদিগের বিবিধ গ্রন্থে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। মানুষ আজকাল ভারতীয় ঋষির ভাষা ভুলিয়া গিয়াছে এবং ঐ ভাষার পুনরুদ্ধার করিতে হইলে যে সাধনার প্রয়োজন সেই সাধনাও ভুলিয়া গিয়াছে। এই দুই কারণে ঋষিগণের মূল বক্তব্য মনুষ্যসমাজ হইতে লুকায়িত হইয়া রহিয়াছে।

আজকাল ভারতীয় ঋষির গ্রন্থে কার্য্যের অযোগ্য ও মানুষের ধারণার অতীত যে সমস্ত আজগুবি গল্প আছে বলিয়া মনে হয়, তাহাই যদি ঐ সমস্ত গ্রন্থের মূল বক্তব্য হইত তাহা হইলে ঐ সমস্ত গ্রন্থ প্রকৃতির নিয়মানুসারে অনেক দিন out of print হইয়া যাইত। কোন নিষ্প্রয়োজনীয় লেখার বারবার মুদ্রন (Edition after Edition) কখনও হয় না এবং হইতে পারে না।

আমরা যথা সময় দেখাইব যে, যে জ্ঞান-বিজ্ঞান আজকালকার মানুষ সন্ধান করিবার জন্য এত পরিশ্রম করিতেছেন, সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্তই ভারতীয় ঋষির মূল গ্রন্থে আছে।

যাঁহারা আমাদিগকে আদর্শবাদী বলিয়া মনে করিবেন তাঁহাদিগকে আমরা ধৈর্য্যের সহিত আমাদিগের কথাগুলি শুনিতে অনুরোধ করি। যে আদর্শ মানুষের সকল রকমের অবস্থায় কার্য্যযোগ্য নহে সেই আদর্শ আমরা বিশ্বাস করি না এবং তাদৃশ কোন আদর্শবাদ আমাদিগের এই লেখায় থাকিবে না। আমাদিগের কোন কথা মানুষের কোন অবস্থায় কার্য্যের অযোগ্য বলিয়া মনে হইলে বুঝিতে হইবে, আমাদিগের কথা ঠিকভাবে বুঝা অথবা গ্রহণ করা হয় নাই। আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে আমরা একবারের স্থানে একাধিকবার আমাদিগের যে কোন বক্তব্য বুঝাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি।

আমাদিগের বক্তব্য পরিস্ফুট করিবার জন্য যে সমস্ত কথা বলিতে হইবে সেই সমস্ত কথা প্রধানতঃ নিম্নলিখিত নয়টী অধ্যায়ে বিভক্ত হইবে যথা—

(১) সমগ্র মনুষ্যসমাজকে স্বর্গতুল্য সুখময় আবাসস্থল করিবার সাধারণ পন্থা।

(২) সমগ্র মনুষ্যসমাজের অর্থাভাব দূর করিবার সাধারণ পন্থা।

(৩) মনুষ্যসমাজের বর্ত্তমান অর্থাভাবের কারণ।

(৪) বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে অর্থাভাব দূর করিবার পন্থা।

(৫) বর্ত্তমান যুদ্ধের কারণ।

(৬) বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ণ নিবৃত্তি করিবার পন্থা।

(৭) বর্ত্তমান যুদ্ধের নিবৃত্তি অনতিবিলম্বে করিতে না পারিলে মানুষের ভাগ্যে কি কি ঘটিবার আশঙ্কা আছে।

(৮) সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর করিয়া সারা জগৎকে স্বর্গতুল্য আবাসস্থল করিবার পন্থা।

(৯) উপসংহার

এই পৃথিবীকেই যে প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের পক্ষে স্বর্গতুল্য সুখময় আবাসস্থল করিয়া তোলা যায় তাহা আমরা প্রমাণিত করিব প্রথম অধ্যায়ে। এই পৃথিবীকে স্বর্গতুল্য সুখময় আবাসস্থল করিয়া তুলিবার সাধারণ পন্থা কি তাহাও এই অধ্যায়েই দেখাইব।

জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় এই পৃথিবীকে স্বর্গতুল্য সুখময় আবাসস্থল করিতে হইলে কি কি করিতে হইবে তাহা দেখাইব অষ্টম অধ্যায়।

বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রধান কারণ যে জগদ্ব্যাপী অর্থাভাব এবং বর্ত্তমান জগতের প্রত্যেক দেশেই যে দারুণ অর্থাভাব বিদ্যমান আছে এবং প্রধানতঃ নিজ নিজ অর্থাভাব দূর করিবার জন্যই যে প্রত্যেক দেশে যুদ্ধপ্রবৃত্তি বৃদ্ধিলাভ করিতেছে তাহা আমরা প্রমাণ করিব পঞ্চম অধ্যায়ে। এই অধ্যায়ে আরও দেখাইব যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের অন্যতম কারণ বর্ত্তমান বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা ও ভ্রম-প্রমাদ এবং বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণের অদূরদর্শিতা।

সমগ্র জগতের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের অর্থাভাব যাহাতে দূর হয় তাহার ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে এই যুদ্ধের পরিস্থিতিতে না করিলে অন্য কোন উপায়ে যে যুদ্ধপ্রবৃত্তি মনুষ্যসমাজ হইতে দূর করা যায় না এবং মনুষ্যসমাজ হইতে যুদ্ধপ্রবৃত্তি দূর করিতে না পারিলে অন্য কোন উপায়ে যে যুদ্ধের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করা সম্ভব নহে, তাহা আমরা দেখাইব ষষ্ঠ অধ্যায়ে (অর্থাৎ বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ণ নিবৃত্তি করিবার পন্থায়)।

সমগ্র জগতের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের অর্থাভাব যে ব্যবস্থায় অনতিবিলম্বে দূর হইতে পারে, সেই ব্যবস্থা যে এক ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোন দেশের পক্ষে অনতিবিলম্বে করা সম্ভব

নহে এবং উহা যে ইংরাজের নেতৃত্ব ছাড়া বা ভারতবাসীর অথবা জার্ম্মানীর অথবা আমেরিকার অথবা জাপানের নেতৃত্বে হওয়া সম্ভব নহে, তাহা আমরা দেখাইব চতুর্থ অধ্যায়ে (অর্থাৎ বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে অর্থাভাব দূর করিবার পন্থায়)। এই অধ্যায়ে আরও দেখাইব যে, ইংরাজের নেতৃত্ব ছাড়া এই ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে বটে, কিন্তু ইংরাজ রাষ্ট্রনেতাগণ এখন যে নীতিতে চলিতেছেন সেই নীতিতে তাঁহারা চলিতে থাকিলে এবং সর্ব্বতোভাবে ঋষিগণের প্রদর্শিত নীতিতে না চলিলে, উহা করা কোনমতেই সম্ভবযোগ্য নহে।

ইহাও আমরা দেখাইব যে, যে ব্যবস্থায় সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের অর্থাভাব দূর হইতে পারে এবং প্রত্যেকের সর্ব্ববিধ রকমের দুঃখের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি সাধিত হইতে পারে সেই ব্যবস্থা আপাতভাবে ইংরাজের নেতৃত্ব ছাড়া হইতে পারে না বটে, কিন্তু ইংরাজ জন-গণ স্বেচ্ছায় ও সদন্তঃকরণে তাঁহাদের অক্ষমতার জন্য যদ্যপি তাহাদের নেতৃত্ব ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে অন্য যে কোন দেশের মানুষ, ঋষির নীতি অবলম্বন করিলে ভারতবর্ষের সহায়তায় ইংরাজ-জনগণের এবং অন্যান্য প্রত্যেক দেশের জনগণের অর্থাভাব ও শান্তির অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করিতে পারে।

বর্ত্তমান যুদ্ধের অবস্থা আর কিছুদিন চলিলে জগতের প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক অবস্থা কি ঘটিতে পারে এবং তাহাতে যে স্বাভাবিক ভূমি-কম্প ও আগ্নেয়োদগম সুনিশ্চিত এবং উহাতে যে অনেক হিটলার, গোয়েরিং, গোয়েব্‌লস্‌, মুসোলিনী, টোজো, রুজভেল্ট, ষ্ট্যালিন, চিয়াং-কাইশেক, চার্চ্চিল ও ইডেনের ভাসিয়া যাইবার আশঙ্কা আছে, তাহা আমরা প্রমাণিত করিব সপ্তম অধ্যায়ে (অর্থাৎ "বর্ত্তমান যুদ্ধের নিবৃত্তি অনতিবিলম্বে না করিতে পারিলে মানুষের ভাগ্যে কি কি ঘটিবার আশঙ্কা আছে"—এই অধ্যায়ে)।

আজকালকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই মনে করেন যে, সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের অর্থাভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করা অসম্ভব। উহা যে একেবারেই অসম্ভব নহে এবং পরন্তু সর্ব্বতোভাবে সম্ভব তাহা আমরা প্রমাণিত করিব দ্বিতীয় অধ্যায়ে (অর্থাৎ সমগ্র মনুষ্যসমাজের অর্থাভাব দূর করিবার সাধারণ পন্থায়)। জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকের অর্থাভাব দূর করিতে হইলে কোন্ কোন্ পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা দেখান হইবে তৃতীয় অধ্যায়ে)। সাধারণ পন্থা কি তাহা জানা না থাকিলে অবস্থা বিশেষে কি পন্থা হওয়া উচিত, তাহা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয় না। ইহারই জন্য আমাদিগকে প্রথম অধ্যায়টী লিখিতে হইবে।

অনেকের হয় ত কৌতূহল হইতে পারে যে যাহাতে সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেকের অর্থাভাব ও দুঃখ দূর হইতে পারে তাহার কোন কার্য্যযোগ্য পন্থা যদি সত্য সত্যই ঋষিগণ উদ্ভাবন করিয়া থাকেন তাহা হইলে মনুষ্যসমাজে অর্থাভাব আইসে কেন ও কোন্ কোন্

কারণে ? এই কৌতূহল নিবৃত্ত করিবার জন্য তৃতীয় অধ্যায় (অর্থাৎ মনুষ্যসমাজের বর্ত্তমান অর্থাভাবের কারণ) আমরা লিখিব। এই অধ্যায়ের আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য হইবে "বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে অর্থাভাব দূর করিবার পন্থা" নির্দ্দেশ করা ও "বর্ত্তমান যুদ্ধের কারণ" নির্দ্দেশ করা এবং "মানুষের সর্ব্ববিধ দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর করিয়া সম্যক্ সুখ-শান্তি বিধান করিবার পন্থা" নির্দ্দেশ করা।

মানুষের অর্থাভাব দূর হইলে ও কোন্ কোন্ শ্রেণীর দুঃখ থাকিতে পারে এবং কি কি কারণে উহা থাকে এবং তাহা দূর করিবার পন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে অষ্টম অধ্যায়ে।

শ্রীসচ্চিদানন্দ চট্টোপাধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

সমগ্র ভূ-মণ্ডলকে স্বর্গতুল্য সুখময় আবাসস্থল করিবার সাধারণ পন্থা

প্রথম ভাগ

প্রথম অধ্যায়ের বক্তব্য

প্রথম অধ্যায়ের বক্তব্য ছয় ভাগে বিভক্ত থাকিবে, যথা :

(১) প্রথম অধ্যায়ের বক্তব্য,

(২) "ভূ-মণ্ডল", "পৃথিবী", "জগৎ", "বিশ্ব", "ব্রহ্মাণ্ড", "স্বর্গতুল্য সুখ", "সাধারণ পন্থা", এই সাতটী কথার অর্থ,

(৩) ব্যাস-দেবের গ্রন্থ-সমূহের বৈজ্ঞানিকতার পরিচয়,

(৪) ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটী প্রয়োজনীয় কথা,

(৫) সমগ্র ভূ-মণ্ডলকে যে স্বর্গতুল্য সুখময় আবাস-স্থল করা অসাধ্য নহে পরন্তু সর্ব্বতোভাবে সুসাধ্য তাহার যুক্তি,

(৬) সমগ্র ভূ-মণ্ডলকে স্বর্গ-তুল্য-সুখময় আবাস-স্থল করিবার সাধারণ পন্থা।

"ভূ-মণ্ডল", "পৃথিবী", "জগৎ", "বিশ্ব", "ব্রহ্মাণ্ড", "স্বর্গতুল্য সুখ", সাধারণ পন্থা"—এই সাতটী কথার অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিব কেন?

সমগ্র ভূ-মণ্ডলকে স্বর্গতুল্য-সুখময় আবাস-স্থল করিবার সাধারণ পন্থা কি হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে প্রথমতঃ নিম্নলিখিত তিনটী কথা আমি কি অর্থে ব্যবহার করিতেছি তাহা পাঠকগণকে জানিতে হইবে, যথা :

(১) ভূ-মণ্ডল,

(২) স্বর্গতুল্য-সুখ,

(৩) সাধারণ পন্থা।

'ভূ-মণ্ডল' বলিতে কতখানি স্থানকে আমি ধরিয়া থাকি, "স্বর্গতুল্য-সুখ" বলিতে আমি মানুষের কি রকম সুখ মনে করি এবং "সাধারণ পন্থা" বলিতে ঐ সুখ-লাভের কোন পন্থার কথা আমি বলিতে চলিয়াছি তাহা সঠিক ভাবে জানা না থাকিলে আমার বক্তব্য পাঠকগণের সর্ব্বতোভাবে বুঝা সম্ভব হইবে না। কাযেই উপরোক্ত তিনটী কথার কোনটী কি অর্থে ব্যবহার হইবে তাহা পাঠকগণকে জানাইয়া দিতে হইবে। "ভূ-মণ্ডলে"র সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ কতখানি তাহা জানিতে হইলে "পৃথিবী", "জগৎ", "বিশ্ব" এবং "ব্রহ্মাণ্ড" এই চারিটী শব্দের অর্থও জানিবার প্রয়োজন হয়।

ব্যাস-দেবের মতে মানুষের সাধারণ মনুষ্যত্ব চারিটী উপকরণ লইয়া, যথা :

(১) তাহার রূপ ধারণ করিবার শক্তি,

(২) তাহার কর্ম্মশীলতা,

(৩) তাহার রুচি, এবং

(৪) তাহার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য করিবার শক্তি।

"পৃথিবী", "জগৎ", "বিশ্ব", এবং "ব্রহ্মাণ্ড"-- এই চারিটী কথার অর্থ না জানা থাকিলে মানুষ তাহার সাধারণ মনুষ্যত্বের উপকরণ লাভ করে কোথা হইতে তাহা বুঝা যায় না। ইহা ছাড়া, আজকাল "ভূ-মণ্ডল", "পৃথিবী", "জগৎ", "বিশ্ব" ও "ব্রহ্মাণ্ড"—এই পাঁচটী কথা প্রায়শঃ একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। এই পাঁচটী কথাই সংস্কৃত-ভাষা হইতে বাঙ্গালা-ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। ভাষাতত্ত্ব অবগত হইয়া সংস্কৃত ভাষা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ঐ পাঁচটী কথা কোন অংশেই একার্থক নহে। পরন্তু পাঁচটী কথার অর্থ বিভিন্ন পাঁচটী। এই কারণে "ভূ-মণ্ডল" এই কথাটীর অর্থ স্পষ্টভাবে বুঝিতে হইলে অপর চারিটী কথার অর্থও জানিবার প্রয়োজন হয়।

ব্যাস-দেবের গ্রন্থ-সমুহের বৈজ্ঞানিকতার পরিচয় দিবার প্রয়োজন কি?

"চারিটী পন্থায়"

[অর্থাৎ— (১) ভূ-মণ্ডল হইতে দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার পন্থা,

(২) ভূ-মণ্ডলের প্রত্যেক মানুষের দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার পন্থা,

(৩) ভূ-মণ্ডলের প্রত্যেক মানুষকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করিবার পন্থা, এবং

(৪) সমগ্র ভূ-মণ্ডলকে স্বর্গতুল্য-সুখময় আবাসস্থল করিবার পন্থায়]

আমি যে সমস্ত প্রয়োজনীয় কথা কহিব তাহার প্রত্যেকটীর প্রধান ভিত্তি ব্যাস-দেবের রচিত কয়েকখানি গ্রন্থের কয়েকটী কথা।

ব্যাস-দেবের গ্রন্থ-সমূহের বৈজ্ঞানিকতার পরিচয় দিবার প্রয়োজন কি তাহা বলিতে হইলে আমার **"চারিটী পন্থা"** লিখিবার প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য কি তাহার ব্যাখ্যা করিতে হয়।

আমার ধারণা বর্ত্তমান যুদ্ধের শান্তি স্থাপন করা খুব সহজ-সাধ্য নহে। মনুষ্যসমাজ হইতে যাহাতে যুদ্ধ-প্রবৃত্তি এবং অর্থাভাব সর্ব্বতোভাবে দূর হয় তাহা না করিতে পারিলে বর্ত্তমান যুদ্ধের নিবৃত্তি হইবে না। আমি এখানে অর্থ-শব্দটী অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিতেছি। উহার মধ্যে যেমন টাকা-কড়ির কথা আছে সেইরূপ আবার খাদ্য-দ্রব্য, পরিধেয় বস্ত্রাদি, বাস-গৃহ ও অন্যান্য উপকরণাদির কথাও আছে। তাহা ছাড়া শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, শারীরিক ও মানসিক কর্ম্ম-শক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা এবং ইচ্ছার সর্ব্বতোভাবের পূরণের কথাও আমি মানুষের অর্থের অন্তর্গত অন্যতম বস্তু বলিয়া মনে করি। **মনুষ্যসমাজের সর্ব্বত্র কোন না কোন রকমের অর্থাভাব তীব্রভাবে দেখা দিয়াছে ইহা আমার অভিমত।**

সর্ব্বব্যাপী এই তীব্র অর্থাভাবের কারণ কি এবং কোন্ উপায়ে ঐ অর্থাভাব দূর হইতে পারে তাহার একটা মোটামুটী ধারণা থাকিলে বর্ত্তমান যুদ্ধের শান্তি স্থাপন করা যে সহজসাধ্য নহে কেন, তাহা বুঝা যাইবে।

বর্ত্তমান যুদ্ধের শান্তি স্থাপন করা যে সহজসাধ্য নহে কেন, তাহা বুঝিতে পারিলে আমার **"চারিটী পন্থা"** লিখিবার প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝা যাইবে।

আমার বিচারানুসারে সর্ব্বব্যাপী বর্ত্তমান তীব্র অর্থাভাবের **প্রধান কারণ চারিটী,** যথা:

(১) বিশ্বের **আদি কারণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে** বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজের জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব,

(২) বিশ্বের আদি কারণের **কার্য্য-পদ্ধতি** সম্বন্ধে বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজের জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব,

(৩) বিশ্বের আদি কারণের **কার্য্য-নিয়ম** সম্বন্ধে বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজের জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব,

(৪) বিশ্বের **আদি কারণের কার্য্য-পদ্ধতি ও কার্য্য-নিয়মের বিপরীত ভাবে** মানুষের ব্যক্তিগত জীবন যাপন করা ও গভর্ণমেণ্টের পরিচালনা করা।

উপরোক্ত চারিটী কারণ হইতে তীব্র অর্থাভাব চারিদিকে কিরূপে ছড়াইয়া পড়িতে পারে তাহা আমি পরে দেখাইব।

আমার বিশ্বাস, যতদিন পর্য্যন্ত বিশ্বের আদি কারণ কে এবং কোথায় আছেন, তাঁহার কার্য্য পদ্ধতি কোন্ রকমের এবং তাঁহার কার্য্য-নিয়মই বা কি কি, তাহা মানুষ সর্ব্বতোভাবে জানিতে না পারিবে এবং ঐ কার্য্য-পদ্ধতি ও কার্য্য-নিয়মানুসারে ব্যক্তিগত জীবন ও গভর্ণমেণ্ট পরিচালনা করিতে এবং ব্যক্তিগত জীবনে ও গভর্ণমেণ্ট পরিচালনায় ঐ কার্য্য-পদ্ধতির ও কার্য্য-

নিয়মগুলির বিরুদ্ধতা পরিহার করিতে কৃতসঙ্কল্প না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ-প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার অথবা সর্ব্বতোভাবের অর্থাভাব দূর করিবার পরিকল্পনা মানুষ স্থির করিতে পারিবে না। সর্ব্বতোভাবে যুদ্ধ-প্রবৃত্তি দূর করিবার অথবা সর্ব্বতোভাবের অর্থাভাব দূর করিবার পরিকল্পনা স্থির না করিয়া কোন শান্তি স্থাপনার চেষ্টা করিলে উহা সাময়িকভাবে সাফল্য লাভ করিলেও করিতে পারে বটে কিন্তু ঐ সাফল্য কিছুতেই দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না।

আমার উপরোক্ত চিন্তায় কোন ভ্রম-প্রমাদ আছে কিনা তাহা আমি বলিতে পারি না। কারণ, আমার নিজের ভ্রম আমার নিজের পক্ষে সব সময়ে সর্ব্বতোভাবে ধারণা করা সম্ভব হয় না, ইহা আমি উপলব্ধি করিয়াছি।

বিশ্বের **আদি কারণ** কে এবং কোথায় আছেন, তাঁহার **কার্য্য-পদ্ধতি** কোন্ রকমের এবং তাঁহার **কার্য্য-নিয়মই** বা কি কি তাহা সর্ব্বতোভাবে স্থির করিতে না পারিলে যুদ্ধের প্রবৃত্তি ও সর্ব্বব্যাপী অর্থাভাব মনুষ্য-সমাজ হইতে সর্ব্বতোভাবে দূর করা সম্ভব হইবে না এবং যুদ্ধের প্রবৃত্তি ও সর্ব্বব্যাপী অর্থাভাব মনুষ্য-সমাজ হইতে দূর করিতে না পারিলে বর্ত্তমান যুদ্ধের কোন্ দীর্ঘস্থায়ী শান্তি স্থাপন করা সম্ভব নহে—আমার এই সিদ্ধান্তে যদি কোন ভুল না হইয়া থাকে তাহা হইলে আমি **"চারিটী পন্থা"**য় যাহা যাহা লিখিব তাহা যে বর্ত্তমান অবস্থায় মনুষ্য-সমাজের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বিশ্ব-কারণের অনুগ্রহে আমার লেখনীর সহযোগে সমগ্র মানবসমাজের প্রয়োজনীয় বহু কথা বাহির হইবে মনে করিয়া আমি **দুইটী বিষয়ে** সতর্কতা অবলম্বন করিবার প্রয়োজন মনে করি। ঐ দুইটী বিষয়ের **একটী** এই যে, প্রয়োজনীয় কথাগুলি আমার মত একজন নগণ্য লেখকের মস্তিষ্ক-প্রসূত বলিয়া বিবেচিত হইয়া উহা যাহাতে উপেক্ষিত না হয় তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া। **দ্বিতীয়তঃ**, যাহা আমার মস্তিষ্কপ্রসূত নহে তাহা আমার মস্তিষ্কপ্রসূত বলিয়া বিবেচিত হইয়া আমার অহঙ্কারের ইন্ধন যোগাইবার সহায়ক যাহাতে না হইতে পারে তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া। আমার **"চারিটী পন্থা"**র ভিত্তি যে ব্যাস-দেবের লেখা হইতে সংগৃহীত তাঁহা আমার ভ্রাতৃবৃন্দকে জানাইয়া দিবার প্রধান কারণ **উপরোক্ত দুইটী।**

ব্যাস-দেবের গ্রন্থ-সমূহের বৈজ্ঞানিকতার পরিচয় দিবার প্রয়োজন—মানুষকে জানাইয়া দেওয়া যে, আমার **"চারিটী পন্থা"**র ভিত্তি অসাধারণ বৈজ্ঞানিকতাময় বিষয়সমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যাস-দেবকে অসাধারণ বৈজ্ঞানিক এবং তাঁহার গ্রন্থগুলিকে অসাধারণ বৈজ্ঞানিকতাময় বলিয়া আমি মনে করি কেন তাহা আমার নিম্নলিখিত কথাগুলি হইতে বুঝা যাইবে :

বিশ্বের আদি কারণ কে, তিনি কোথায় আছেন, তাঁহার সহিত এই ভূ-মণ্ডলের ও মানুষের সম্বন্ধ কি, এই ভূ-মণ্ডলের ও মানুষের সৃষ্টি, পুষ্টি, ক্ষয় ও পরিবর্ত্তনের কারণ কি, ভূ-মণ্ডলের ও

মানুষের সৃষ্টি, পুষ্টি, ক্ষয় ও পরিবর্ত্তনের নিয়ম কি কি এবং ঐ সমস্ত হয় কোন্ পদ্ধতি অনুসারে —এবম্বিধ তত্ত্বগুলির আমি একজন সাধারণ ছাত্র।

উপরোক্ত তত্ত্বগুলি পরিজ্ঞাত হইবার জন্য আমি কয়েক বৎসর হইতে ইংরাজী, বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বিবিধ শ্রেণীর গ্রন্থগুলির সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। অবশেষে সংস্কৃত ভাষায় রচিত ব্যাস-দেবের কয়েকখানি গ্রন্থের মধ্যে আমার জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহের সন্ধান পাইয়াছি। ইংরাজী ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে আমার জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহের কোন সন্ধান পাই নাই। ঐ সমস্ত বিষয়ে ইংরাজী গ্রন্থে যে সমস্ত কথা আছে তাহা প্রায়ই সংস্কার-মূলক, যুক্তিহীন এবং মানুষের গ্রহণের অযোগ্য।

ব্যাস-দেবকে যে আমি অসাধারণ বৈজ্ঞানিক বলিয়া মনে করি এবং তাঁহার গ্রন্থগুলিকে যে বৈজ্ঞানিকতাময় বলিয়া দেখি তাহার প্রধান কারণ উপরে যাহা বলিলাম তাহাই।

আমি আমার পাঠকগণকে জানাইয়া রাখিতে চাই যে, আমি যে পদ্ধতিতে সংস্কৃত ভাষার অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকি, সেই পদ্ধতি প্রচলিত পদ্ধতি হইতে পৃথক্।

যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় মহা মহা পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাঁহারা আমার কথাগুলি খুবই সম্ভব ব্যাস-দেবের রচনায় দেখিতে পাইবেন না। ইহার প্রধান কারণ অর্থ-গ্রহণ-পদ্ধতির পার্থক্য। অর্থগ্রহণ করিবার পদ্ধতিতে পার্থক্য হয় কেন তাহা আমি "ভাষা-তত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা" লিখিবার সময় ব্যাখ্যা করিব।

বিশ্বের **আদিকারণ** কে এবং কোথায় আছেন, তাঁহার **কার্য্য-পদ্ধতি** কোন্ রকমের, তাঁহার **কার্য্য-নিয়ম** কি কি এই তিনটী তত্ত্ব জানা না থাকিলে অথবা ঐ **তিনটী তত্ত্বের বিপরীতভাবে** মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের অথবা গভর্ণমেণ্টের পরিচালনা কার্য্য চলিতে থাকিলে যে সর্ব্বব্যাপক অর্থাভাব এবং পরিশেষে ভীষণ ভীষণ যুদ্ধপ্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়া অবশ্যম্ভাবী তাহার ব্যাখ্যা আমি এক্ষণে করিব।

ঐ চারিটী কারণই যে বর্ত্তমান সর্ব্বব্যাপী অর্থাভাব এবং মহাযুদ্ধের কারণ তাহা দুইটী ব্যাপার লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে। **এক**, বিশ্বের আদি-কারণের সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের সম্বন্ধ এবং **দুই**, বিশ্বের আদি কারণের কার্য্য-পদ্ধতি ও কার্য্য-নিয়ম সম্বন্ধে বর্ত্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের চিন্তার ধারা এবং শাসক সম্প্রদায়ের ব্যবহার।

বিশ্বের আদি কারণের অথবা বিশ্বস্রষ্টার সহিত মানুষের কি সম্বন্ধ তাহা ভাবিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, বিশ্ব-স্রষ্টা ছাড়া মানুষের জন্মগ্রহণ করা সম্ভব নহে, এক নিমেষও মানুষের বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নহে, মানুষের কোন শারীরিক অথবা মানসিক কার্য্য করা সম্ভব নহে, মানুষের কোন শক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব নহে এবং মানুষের নিজ নিজ কামনা পূরণ করা সম্ভব নহে।

বিশ্ব-স্রষ্টা ছাড়া মানুষের জন্ম গ্রহণ করা যে কখনও সম্ভব নহে তাহা বুঝিতে বেশী বিলম্ব হয় না। বিশ্ব-স্রষ্টার কার্য্য না থাকিলে যে মানুষের পক্ষে গর্ভধারণ করা সম্ভব হয় না ইহা বলাই বাহুল্য। অন্য কথা বাদ দিয়া একমাত্র গর্ভধারণের অঙ্গ জরায়ুর দিকে লক্ষ্য করিলেই উহা বুঝা যাইবে। মানুষ যত বড়ই বৈজ্ঞানিক হউক না কেন, ঈশ্বরের সৃষ্টি ব্যতীত মানুষের পক্ষে জরায়ু সৃজন করা কখনও সম্ভব হয় নাই এবং হইবে না।

মানুষের বাঁচিয়া থাকিতে হইলে তিনটী বস্তু একান্ত প্রয়োজনীয়, যথা: (১) ভূমি, (২) রস, (৩) বাতাস। এই তিনটীর কোনটীই মানুষ সৃজন করিতে পারে না। উহার প্রত্যেকটী বিশ্ব-স্রষ্টার সৃষ্টি। ঐ তিনটীর একটিও এক নিমেষের জন্য অপ্রাপ্য হইলে সমগ্র মনুষ্যসমাজের মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। ভূমি না থাকিলে মানুষের দাঁড়াইবার স্থান থাকে না। মানুষের দেহে রস না থাকিলে এবং পানীয় জল না থাকিলে মানুষ তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে বাধ্য হয়। বাতাস না থাকিলে মানুষের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য চালান অসম্ভব হয়, হৃদযন্ত্র বন্ধ হইয়া যায় এবং মানুষ নিমেষের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে বাধ্য হয়।

কাযেই বিশ্ব-স্রষ্টার কার্য্য না চলিলে যে মানুষের পক্ষে নিমেষের জন্যও বাঁচিয়া থাকা সম্ভবযোগ্য নহে, ইহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

বিশ্ব স্রষ্টার কার্য্য না চলিলে যেরূপ মানুষের সৃষ্টি ও রক্ষা সম্ভব নহে, সেইরূপ বিশ্ব-স্রষ্টার কার্য্য না চলিলে মানুষের কোন শারীরিক অথবা মানসিক কার্য্য করা সম্ভব নহে। এই কথা যে অতীব সত্য তাহা মানুষ তাহার নিজের শারীরিক অথবা মানসিক কার্য্য সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারে। একটু চিন্তা করিলেই মানুষ দেখিতে পাইবে যে, তাহার শারীরিক ও মানসিক কার্য্যের প্রধান উপকরণ তিনটী, যথা—(১) তাহার শরীরের অঙ্গ, (২) তাহার মন এবং (৩) তাহার শারীরিক ও মানসিক কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি। এই তিনটীর কোনটি বিশ্ব-স্রষ্টা সৃষ্টি না করিলে কোন মানুষের পক্ষে সৃষ্টি করা সম্ভব নহে। অথচ তিনটির কোনটি একনিমেষের জন্য অনুপস্থিত হইলে মানুষের কোন রকমের শারীরিক অথবা মানসিক কর্ম্ম করা সম্ভব হয় না।

বিশ্ব-স্রষ্টার কার্য্য না চলিলে মানুষের শারীরিক অথবা মানসিক কোন শক্তিবৃদ্ধি করাও সম্ভব নহে। মানুষের শক্তি বৃদ্ধি করিবার প্রধান উপাদান তিনটি, যথা: (১) মানুষের শরীরের ও মনের কার্য্য করিবার দশটি ইন্দ্রিয়, (২) মানুষের শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য তাহার বুদ্ধির প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য, এবং (৩) মানুষের আহার-বিহারের বস্তুগুলি। এই তিনটির কোনটিই বিশ্ব-স্রষ্টার দানরূপে যদ্যপি মানুষ না পায় তাহা হইলে কোন মানুষের পক্ষে উহা সৃজন করা সম্ভব নহে। মানুষের আহার-বিহারের প্রত্যেক বস্তুর মূল উপাদান যে কাঁচামালসমূহ তাহার কোনটি বিশ্ব-স্রষ্টার দানস্বরূপ ভূমি ও ভূমির উৎপাদনের প্রবৃত্তি না থাকিলে কোন মানুষের পক্ষে কৃষি অথবা শিল্প অথবা কারুকার্য্যের দ্বারা সৃজন করা সম্ভব নহে।

মানুষের নিজ নিজ কামনা পূরণের কথা ভাবিতে বসিলেও ঐ একই কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যাইবে। মানুষের প্রত্যেক কামনার সঙ্গেও তিনটি বিষয়-বস্তু অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকে। ঐ তিনটি বিষয়বস্তুর নাম—

(১) কামনার প্রবৃত্তি,

(২) কাম্যবস্তু অথবা কাম্য অবস্থা নির্দ্ধারণের প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য,

(৩) কাম্যবস্তু অথবা কাম্য অবস্থা অর্জ্জন করিবার পন্থা নির্ব্বাচন ও তদনুযায়ী চলিবার সামর্থ্য।

উপরোক্ত তিনটি বিষয়বস্তুর কোনটিই বিশ্ব-স্রষ্টার কার্য্যপদ্ধতি ও কার্য্যনিয়ম চলিতে না থাকিলে কোন মানুষের পরিকল্পনায় উদ্ভাবিত অথবা সৃজিত হইতে পারে না।

বিশ্ব-স্রষ্টার কার্য্য-পদ্ধতি ও কার্য্য-নিয়ম ছাড়া যখন মানুষের পক্ষে জন্ম-গ্রহণ করা, মানুষের বাঁচিয়া থাকা, মানুষের কোন শারীরিক অথবা মানসিক কার্য্য করা, মানুষের কোন শক্তি বৃদ্ধি করা এবং মানুষের নিজ নিজ কামনা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভব নহে, তখন ইহা বলাই বাহুল্য যে, মানুষ যদ্যপি দুঃখহীন জীবন যাপন করিতে চায় তাহা হইলে মানুষকে সর্ব্বপ্রথমে বিশ্ব-স্রষ্টার দৈনিক **কার্য্য-পদ্ধতি** কি ও তাঁহার **কার্য্যের নিয়ম** কি তাহা সর্ব্বাগ্রে জানিতে হইবে এবং **তদনুসারে দৈনন্দিন জীবন যাপন করিবার ও তদ্-বিরুদ্ধে না চলিবার জন্য** কৃতসঙ্কল্প হইতে হইবে।

বিশ্বের আদি কারণের কার্য্য-পদ্ধতি ও কার্য্যের নিয়মের সঙ্গে মানুষের জীবনের শুভাশুভ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত তাহা বুঝিয়া লইয়া বর্ত্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের চিন্তার ধারা ও শাসক-সম্প্রদায়ের ব্যবহার কিরূপ ধরণে চলিতেছে তাহা লক্ষ্য করিলে **তিনটী ব্যাপার** দেখা যাইবে, যথা:

(১) বিশ্বের আদি-কারণের কার্য্য-পদ্ধতি ও কার্য্য-নিয়মের সম্বন্ধে বর্ত্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের চিন্তার ধারায় ঔদাসীন্য এবং ঐ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব,

(২) বিশ্বের আদি-কারণের কার্য্য-পদ্ধতি ও কার্য্য-নিয়মের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত জীবনের পরিচালনা,

(৩) বিশ্বের আদি-কারণের কার্য্য-নিয়মের বিরুদ্ধে সমষ্টিগত গভর্ণমেণ্টসমূহের আইন-প্রণয়ন এবং তাঁহার কার্য্য-পদ্ধতির বিরুদ্ধ কার্য্যসমূহের অবলম্বন ও প্রশ্রয় প্রদান।

উপরোক্ত তিনটী ব্যাপারের বিশদ ব্যাখ্যা করিতে হইলে অনেক কথা লিখিতে হইবে। তাহা এখানে লেখা সম্ভব নহে। সংক্ষেপে বলিতে হইলে কেবলমাত্র **নিম্নলিখিত তিনটী কথা লিপিবদ্ধ করিতে হয়, যথা:**

(১) বৈজ্ঞানিকগণ ভূমি সৃজন করিতে পারেন না, ভূমির ও মহাসমুদ্রের গঠন

(construction) কিরূপ তাহা সঠিক ভাবে জানেন না, ভূমির ও মহাসমুদ্রের উৎপাদন-প্রবৃত্তি কোথা হইতে এবং কোন্ পন্থায় সৃজিত হয় তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন না, ভূমির ও মহাসমুদ্রের উৎপাদক শক্তি কিরূপে রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয় তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না; অথচ উপকথার দানবের মত ভূমির বক্ষ ছিন্ন করিয়া তাহার কঠিন ও তরল খনিজ পদার্থগুলি লইয়া ছিনি-মিনি খেলিতেছেন। ভূমি ও মহাসমুদ্রের উপরিভাগ আলোড়িত করিয়া লইয়াছেন।

(২) বিশ্বের আদি-কারণের কার্য্য-পদ্ধতি ও কার্য্য-নিয়ম ছাড়া যখন মানুষের অঙ্গ ও বৃত্তির সৃজন হওয়া সম্ভব নহে, তখন ইহা বলাই বাহুল্য যে, বিশ্বের আদি-কারণের কার্য্য-পদ্ধতি ও কার্য্য-নিয়ম সঠিকভাবে না জানিতে পারিলে মানুষের অঙ্গের গঠন-পদ্ধতি এবং বৃত্তির পরিচালনা-পদ্ধতি নিরূপণ করা সম্ভব নহে। মানুষের অঙ্গের গঠন-পদ্ধতি এবং বৃত্তি-পরিচালনার পদ্ধতি সঠিক ভাবে জানা না থাকিলে কোন্ খাদ্য অথবা ঔষধ মানুষের হিতকারী অথবা অহিতকারী হইতে পারে তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে। অথচ বর্ত্তমান রসায়নের পণ্ডিতগণ খাদ্য ও ঔষধে বাজার বোঝাই করিয়া দিয়াছেন।

(৩) বিশ্বের আদি-কারণের কার্য্য-পদ্ধতি ও কার্য্য-নিয়ম জানা না থাকিলে মানুষের দুষ্ট-প্রবৃত্তি কেন হয় এবং ঐ দুষ্ট-প্রবৃত্তি কোন্ উপায়ে দূরীভূত করিতে পারা যায় তাহা জানাও সম্ভব নহে। মানুষের দুষ্ট-প্রবৃত্তি কেন হয় এবং ঐ দুষ্ট-প্রবৃত্তি কোন্ উপায়ে দূরীভূত করিতে পারা যায় তাহা জানা না থাকিলে গভর্ণমেণ্টের পরিচালনার আইন কি হওয়া উচিত তাহা সঠিক ভাবে স্থির করা সম্ভব হয় না।

মূলত: উপরোক্ত প্রথম অনাচারের ফলে যে সর্ব্বত্রই জমির উর্ব্বরাশক্তি দ্রুতগতিতে হ্রাস পাইতেছে তাহা বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করেন না বটে কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে তাঁহাদিগকে উহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইবে।

একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে, **বিশ্ব-কারণের দেওয়া জমির উৎপাদিকা প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য অটুট থাকিলে অনায়াসেই জমি হইতে মানুষের প্রয়োজনীয় প্রত্যেক বস্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা অনায়াসসাধ্য হয়।** মানুষের প্রয়োজনীয় প্রত্যেক বস্তু সমগ্র লোকসংখ্যার প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত পরিমাণে **উৎপাদনের** ব্যবস্থা থাকিলে **বণ্টনের** (distribution-এর) কথা লইয়া মারামারি করিবার প্রয়োজন হয় না। ইহা অতি সাধারণ কথা। এই কথা হইতে ইহা অতি সহজেই বুঝা যাইবে যে, মানুষের যুদ্ধ-প্রবৃত্তি ও সর্ব্বরকমের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, শরীরের বল, মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য এবং সামর্থ্য, এবং কামনার উপকরণের অথবা এক কথায় সর্ব্বরকম অর্থের অভাব দূর করিতে হইলে মানুষের

সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন হয়, ভূমি হইতে যাহাতে মানুষের প্রয়োজন সাধনের প্রত্যেক উপকরণ সমগ্র লোক-সংখ্যার প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণে **উৎপাদন** করা যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। এই ব্যবস্থার জন্য সর্ব্বাগ্রে ভূমির সৃষ্টি হইতেছে কোন্ পদ্ধতিতে এবং কোন্ নিয়মে, ভূমির শরীরে কি কি অঙ্গ আছে, কোন্ অঙ্গটীর পর কোন্ অঙ্গটীর সৃজন হইয়াছে, ভূমির বৃত্তি কি কি, ভূমির কোন্ অঙ্গের কোন্ কার্য্য মানুষের উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য কতখানি প্রয়োজনীয়— এবম্বিধ সংবাদগুলি জানা মানুষের একান্ত আবশ্যকীয়। এক কথায়, **ভূমি ও মহা-সমুদ্রের বিজ্ঞান** সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা মানুষের বাঁচিয়া থাকিতে হইলে একান্ত প্রয়োজনীয়। ভূমি ও মহাসমুদ্রের বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে বিশ্বের আদি-কারণের অস্তিত্ব কোথায় আরম্ভ হইয়াছে, তাঁহার প্রধান প্রধান কার্য্য-পদ্ধতি কি কি, তাঁহার প্রধান প্রধান কার্য্য-নিয়মই বা কি কি তাহা জানা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। বিশ্বের আদি-কারণ সম্বন্ধে উপরোক্ত কথাগুলি জানিতে পারিলে ভূমি ও মহাসমুদ্র সম্বন্ধে সমস্ত প্রয়োজনীয় কথা জানা সম্ভব হয়। বিশ্বের আদি-কারণ সম্বন্ধে উপরোক্ত কথাগুলি জানিতে না পারিলে ভূমি ও মহাসমুদ্রের সৃজন, পুষ্টি ও পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কোন কথাই জানা যায় না। ইহার কারণ বিশ্বের আদি-কারণ ছাড়া কোন মানুষের দ্বারা ভূমি ও মহাসমুদ্রের সৃজন, পুষ্টি ও পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব নহে।

ব্যাস-দেবের গ্রন্থসমূহের বৈজ্ঞানিকতার পরিচয় দিবার সময় আমি দেখাইব যে, তাঁহার বিবিধ গ্রন্থে মানুষের **সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ আছে** এবং উহা সমগ্র মনুষ্যসমাজের আর কোন দেশের কোন গ্রন্থে নাই। মানুষের ঐ প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি আর কোন দেশের কোন গ্রন্থে নাই বলিয়া মানুষ দিশাহারা পথিকের মত চলাফেরা করিতেছে এবং স্ব স্ব প্রয়োজন সাধনে অক্ষম হইয়াও বৃথা অহঙ্কার পোষণ করিতেছে এবং ভীষণ ভীষণ যুদ্ধে ও মারামারিতে লিপ্ত হইতেছে।

এক্ষণে মানুষের নিজ নিজ সামর্থ্যের পরিমাপ করিবার এবং স্থির হইয়া কিছু ভাবিবার সময় আসিয়াছে।

ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটী প্রয়োজনীয় কথা বলিবার আবশ্যকতা কি?

সমগ্র ভূ-মণ্ডলকে স্বর্গতুল্য-সুখময় আবাস-স্থল করিবার সাধারণ পন্থা কি তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে একদিকে যেরূপ মানুষের সৃষ্টি ও পুষ্টি হয় বিশ্বের আদিকারণের কোন্ কার্য্য-পদ্ধতি ও কোন্ কোন্ কার্য্য নিয়মে তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ প্রত্যেক নর-নারীর ক্ষয় ও মৃত্যু হয় সাধারণতঃ কোন্ কোন্ কারণে এবং কোন্ কোন্ ভ্রম-বশতঃ তাহাও জানিবার প্রয়োজন হয়।

ব্যাস-দেবের কথা বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মানুষের মনুষ্যত্বের ও অমানুষত্বের কার্য্যের প্রধান উপকরণ চারিশ্রেণীর, যথাঃ (১) তাহার কার্য্যের বিষয়, (২) তাহার শরীরের

কার্য্য করিবার শারীরিক ইন্দ্রিয়গুলি, (৩) তাহার মনের কার্য্য করিবার মানসিক ইন্দ্রিয়গুলি, এবং (৪) কার্য্য ও চিন্তা বুঝিবার জন্য তাহার মস্তিষ্ক।

বিশ্বের আদিকারণের কার্য্যনিয়ম ও কার্য্যপদ্ধতির মধ্যে যে শৃঙ্খলা আছে তাহা বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মানুষের মনুষ্যত্বের কার্য্যের ও অমানুষত্বের কার্য্যের প্রধান উপকরণ যে চারিশ্রেণীর তাহার প্রত্যেকটীর সঙ্গে প্রত্যেকটী ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

ব্যাস-দেব দেখাইয়াছেন যে, মনুষ্যত্বের ও অমানুষত্বের কার্য্যের জন্য বিশ্বের আদিকারণের দেওয়া মানুষের যে চারিশ্রেণীর উপকরণ আছে তাহার পরস্পরের সম্বন্ধ জানা না থাকিলে মানুষের যেরূপ ক্ষয়, ব্যাধি ও দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায় সেইরূপ আবার ঐ চারিশ্রেণীর উপকরণের পরস্পরের সম্বন্ধ জানা থাকিলে মানুষ তাহার পুষ্টি, স্বাস্থ্য, ও ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি করিবার সুযোগ পায়।

ভাষাতত্ত্বের প্রয়োজন একাধিক। তাহার মধ্যে প্রধান মানুষের ও মনুষ্যত্বের ও অমানুষত্বের যে চারিশ্রেণীর উপকরণ আছে তাহার পরস্পরের সম্বন্ধ দেখান।

উপরোক্ত কথাগুলি স্পষ্ট করিবার জন্য আমাকে আরও কয়েকটী কথা বলিতে হইবে।

মানুষকে ভাবিতে হইবে যে, মানুষ যে কথা কয়, তাহার জন্য তাহার কি কি প্রয়োজন। মানুষ যে কথা কয় তাহার জন্য তাহার কি কি প্রয়োজন হয় তাহা যদি মানুষ ভাবে, তাহা হইলে মানুষ দেখিতে পাইবে যে, কথা কহিবার জন্য মানুষের প্রয়োজনীয় **উপকরণ** চারিশ্রেণীর, যথা: (১) কথা কহিবার বিষয়, (২) কথা কহিবার জন্য জিহ্বা, (৩) কথা শুনিবার জন্য কাণ, এবং (৪) কথা বুঝিবার জন্য মস্তিষ্ক। মানুষের কথা কহিতে হইলে যেরূপ উপরোক্ত চারিশ্রেণীর উপকরণের প্রয়োজন হয়, সেইরূপ আবার চারিশ্রেণীর **প্রবৃত্তিরও** প্রয়োজন হয়, যথা: (১) কথা কহিবার বিষয় নির্ব্বাচন করিবার প্রবৃত্তি, (২) কথা কহিবার প্রবৃত্তি, (৩) কথা শুনিবার প্রবৃত্তি এবং (৪) কথার অর্থ বুঝিবার প্রবৃত্তি।

কথা কহিবার চারিশ্রেণীর **উপকরণ** যেরূপ পরস্পরের মধ্যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, সেইরূপ আবার উহার চারিশ্রেণীর **প্রবৃত্তিও** পরস্পরের মধ্যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। চারিশ্রেণীর উপকরণের পরস্পরের মধ্যে, এবং চারিশ্রেণীর প্রবৃত্তির পরস্পরের মধ্যে যেরূপ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে সেইরূপ আবার চারিশ্রেণীর উপকরণের চারিশ্রেণীর প্রবৃত্তির পরস্পরের মধ্যেও অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধগুলি পরিষ্কারভাবে জানিয়া লইয়া মানুষ যদি কথা কয় এবং কথা শোনে তাহা হইলে একদিকে মানুষ যেরূপ নিজের মনের ভাব সুন্দর ও পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করিতে পারে, সেইরূপ আবার যাহা শোনে তাহা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে বুঝিতে পারে।

ব্যাস-দেবের মতে মানুষের পরস্পরের সম্বন্ধে যে সন্দেহ, অপ্রীতি ও কলহের প্রবৃত্তি দেখা যায় তাহার প্রধান কারণ কোন মানুষ স্বভাবতঃ তাহার নিজের মনের ভাব পরিষ্কার করিয়া ব্যক্ত করিতে পারে না এবং

পরের মনের ভাবও নিঃসন্দিগ্ধরূপে পরের কথা হইতে বুঝিতে পারে না। স্বভাবতঃ নিজের মনের ভাব মানুষ পরিষ্কার করিয়া সম্পূর্ণ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিতে পারে না এবং পরের মনের ভাবও নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝিতে পারে না বলিয়া মানুষের ভাষার সংস্কৃতির প্রয়োজন হইয়া থাকে। ভাষার সংস্কৃতি সাধন করিতে হইলে ভাষা-তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের অত্যন্ত প্রয়োজন। কথা কহিবার চারিশ্রেণীর উপকরণের ও চারিশ্রেণীর প্রবৃত্তির পরস্পরের সম্বন্ধ ভাষাতত্ত্বের ভিত্তি।

কথা কহিবার উপরোক্ত চারিশ্রেণীর **উপকরণের** ও চারিশ্রেণীর **প্রবৃত্তির** কোনটীই কোন মানুষ বিশ্বের আদিকারণের দানস্বরূপ না পাইলে, মানুষী কোন শক্তিদ্বারা সৃজন অথবা রক্ষা করিতে পারেন না। কাযেই ব্যাস-দেবের কথানুসারে ভাষাতত্ত্বে প্রবিষ্ট হইতে হইলে, বিশ্বের আদিকারণের অস্তিত্ব, কার্য্য-পদ্ধতি ও কার্য্য-নিয়ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা ও উপলব্ধির সামর্থ্য অর্জ্জন করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

আমি ব্যাস-দেবের লিখিত গ্রন্থে যে-সমস্ত বৈজ্ঞানিক কথার পরিচয় পাইতেছি, সেই সমস্ত বৈজ্ঞানিক কথার পরিচয় যে, যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্যের প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাঁহারা পান না, তাহার প্রধান কারণ, আমার মতে, ব্যাস-দেবের ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের ঔদাসীন্য।

ব্যাস-দেব দেখাইয়াছেন যে, প্রত্যেক নর-নারী যত রকমের কার্য্য তাঁহার জীবনে করিয়া থাকেন তাহা আপাত-দৃষ্টিতে অসংখ্য বটে, কিন্তু মূলতঃ পাঁচ শ্রেণীর। এই পাঁচ শ্রেণীর কার্য্যের প্রথম ও প্রধান—মানুষের কথা কহিবার প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য। এই পাঁচ শ্রেণীর কার্য্য হইতেই মানুষের পাঁচ শ্রেণীর কামনার উৎপত্তি হয়। এই পাঁচ শ্রেণীর কামনার প্রত্যেকটী কখনও ভাল ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, আবার কখনও মন্দ ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। কামনাগুলি ভাল ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে, মানুষ ঐ কামনা পূরণের জন্য যে সমস্ত কার্য্য করে, তাহা যেমন তাহার নিজের পক্ষে ভাল হয় সেইরূপ আবার মানবসমাজের প্রত্যেকের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ হইয়া থাকে। অন্যদিকে, কামনাগুলি মন্দ ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে, মানুষ ঐ কামনা পূরণের জন্য যে সমস্ত কার্য্য করে, তাহা যেমন তাহার নিজের পক্ষে মন্দ হয় সেইরূপ আবার মানব-সমাজের প্রত্যেকের পক্ষে অমঙ্গলপ্রদ হইয়া থাকে।

ব্যাস-দেব দেখাইয়াছেন যে, মানুষের কথা কহিবার প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য ভাষাতত্ত্বের জ্ঞানের দ্বারা পরিমার্জ্জিত হইলে কেবলমাত্র যে মানুষের নিজের মনের ভাব স্পষ্ট ও সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিবার ও পরের মনের ভাব নিঃসন্দিগ্ধ ও সম্পূর্ণরূপে শুনিবার সামর্থ্য বৃদ্ধি পায় তাহা নহে; সমস্ত রকমের কর্ম্মশ্রেণীর সম্বন্ধে শক্তি ও সমস্ত রকমের কামনার নির্ব্বাচন সম্বন্ধে পটুতাও বৃদ্ধি পায়। ইহার কারণ মানুষের কথা কহিবার কার্য্য ও কামনা তাহার পাঁচ শ্রেণীর কার্য্যের ও কামনার মধ্যে প্রথম ও প্রধান।

সংস্কৃত ভাষায় **অষ্টাধ্যায়ী-সূত্র পাঠ** নামক যে গ্রন্থ বিদ্যমান আছে তাহার **সূত্রগুলি** ভাষাতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ভাষা-বুঝিবার-নিয়মের দ্বারা বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহা যেরূপ **ভাষাতত্ত্বের বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ** সেইরূপ মানুষের অপর চারিশ্রেণীর শারীরিক ও মানসিক **কর্ম্মতত্ত্ব ও কামনা-তত্ত্বের বিজ্ঞান বিষয়কও বটে।**

আমি অন্যান্য ভাষায় যে সমস্ত গ্রন্থ দেখিয়াছি তাহার কোনখানির মধ্যে মানুষের সর্ব্ববিধ কর্ম্মতত্ত্ব ও কামনাতত্ত্ব সম্বন্ধে এতাদৃশ বিচারপূর্ণ সম্পূর্ণ আলোচনা দেখিতে পাই নাই। আমার মতে **অষ্টাধ্যায়ী-সূত্র-পাঠ** এবং **অন্যান্য পাঁচখানি বেদাঙ্গ** ব্যাস-দেবের লিখিত এবং অন্যান্য ভাষায় লিখিত যে সমস্ত গ্রন্থ আছে তাহার প্রত্যেকখানির সহিত তুলনায় ইহা অতুলনীয়।

অনেকে মনে করেন যে **অষ্টাধ্যায়ী-সূত্র-পাঠ** "পাণিনি" নামক কোন মানুষের রচিত। **মহেশ্বর সূত্র** দেখিয়া তাঁহারা মনে করেন যে "মহেশ্বর" নামক কোন বৈয়াকরণের ব্যাকরণের সূত্র হইতে ঐ সূত্রগুলি গৃহীত।

আমার মতে, উপরোক্ত ধারণা দুইটীর কোনটীই সঠিক নহে। "পাণিনি" অথবা "মহেশ্বর" এই দুইটী শব্দ সাধারণতঃ অথচ মূলতঃ কোন মানুষের নাম-বাচক হয় না। ঐ দুইটীই মূলতঃ মানসিক কর্ম্ম অথবা বিষয়-বাচক হইয়া থাকে।

ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা আমি কহিব, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য চারিটী, যথা :—

(১) ব্যাস-দেব কত বড় বৈজ্ঞানিক তাহা বুঝান এবং তাঁহার বৈজ্ঞানিকতার দৃষ্টান্ত দেখান,

(২) সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত বলিয়া যাঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের ভাষাজ্ঞান হইতে আমার ভাষাজ্ঞানে এত পার্থক্য কেন, তাহা বুঝান,

(৩) বর্ত্তমানে যে ভাষা, সংস্কৃত ভাষা নামে চলিতেছে তাহা কোন্ শ্রেণীর ভাষা এবং ঐ শ্রেণীর ভাষা সমগ্র মনুষ্যসমাজের কতখানি অপকার করে, তাহা বুঝান,

(৪) মানুষকে তাহার সর্ব্ববিধ ক্ষয় ও ব্যাধি হইতে রক্ষা করিতে হইলে, ভাষাতত্ত্ব কতখানি প্রয়োজনীয়, তাহা দেখান।

সমগ্র ভূ-মণ্ডলকে যে স্বর্গতুল্য সুখময় আবাসস্থল করা অসাধ্য নহে পরন্তু সর্ব্বতোভাবে সুসাধ্য তাহার যুক্তি লিখিবার উদ্দেশ্য।

আমি আমার জীবিকা উপার্জ্জনের কর্ম্মক্ষেত্রে যাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তায় বুঝিয়াছি যে, তাঁহাদের অনেকেরই ধারণা যে, এই ভূ-মণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিলে কোন মানুষের পক্ষে তাহার কষ্টের হাত হইতে সর্ব্বতোভাবে

রক্ষা পাওয়া সম্ভব নহে। তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তায়, আরও বুঝিয়াছি যে, ঐ ধারণা যে কেবলমাত্র তাঁহারাই পোষণ করেন তাহা নহে, প্রায় প্রত্যেক মানুষই ঐরূপ ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন।

যাঁহারা "দার্শনিকতায়" বর্ত্তমানকালে প্রসিদ্ধ ও শ্রদ্ধেয়, তাঁহাদের অধিকাংশের সহিতই আমার জীবনে সাক্ষাৎ হইবার সৌভাগ্য হয় নাই। তাঁহাদের রচনা পড়িয়া আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে আমার মনে হইয়াছে যে, "কোন মানুষের পক্ষে তাহার কষ্টের হাত হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা পাওয়া সম্ভব কি না" অথবা "মানুষের আদর্শ কি হওয়া উচিত" তৎসম্বন্ধে পরিষ্কার কোন ধারণা তাঁহাদের ছিল না এবং নাই। অথচ তাঁহাদের অক্ষমতা তাঁহারা স্বীকার করিতে নারাজ। "কাযেই শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার" মত কার্য্য, তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন এবং করেন।

"কোন মানুষের পক্ষে তাঁহার কষ্টের হাত হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা পাওয়া সম্ভব কি না" এই বিষয় সম্বন্ধে আমার ধারণা,—"প্রত্যেক মানুষের পক্ষে নিজ নিজ সর্ব্ববিধ কষ্টের হাত হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা পাওয়া সম্পূর্ণ রকমে সম্ভব"। সর্ব্ববিধ কষ্টের হাত হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা পাওয়ার পন্থা সর্ব্বশ্রেণীর মানুষের পক্ষে এক নহে। মানুষ স্বভাবতঃ চারি শ্রেণীর হয়—এবং মানুষের দুঃখ-কষ্টও, মূলতঃ, চারি শ্রেণীর হইয়া থাকে। চারি শ্রেণীর মানুষের চারি শ্রেণীর দুঃখ-কষ্টের হাত হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা পাইবার পন্থাও চারি শ্রেণীর। আমার উপরোক্ত ধারণার মূল ভিত্তি ব্যাস-দেবের রচিত গ্রন্থ এবং আমার ব্যক্তিগত পর্য্যবেক্ষণ (observation) ও অভিজ্ঞতা (experience)।

ব্যাস-দেবের মতে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে যতই উচ্চ শ্রেণীর হউন না কেন, কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ভাবে কোন মানুষের কার্য্যের দ্বারা কোন মানুষের সর্ব্ববিধ দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর করা সম্ভব হয় না। একটি মানুষেরও সর্ব্ববিধ দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর করিতে হইলে তাহার ব্যক্তিগত কার্য্যের যেরূপ প্রয়োজন সেইরূপ মনুষ্য-সমাজের সমষ্টিগত কার্য্যেরও প্রয়োজন আছে।

ব্যাস-দেবের কথানুসারে প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার জন্য সমষ্টিগত কার্য্যের দায়িত্ব যিনি গ্রহণ করিতে সক্ষম এবং ঐ সক্ষমতা অর্জ্জন করিয়া যিনি ঐ দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁহার নাম "রাজা।"

ব্যাস-দেবের মতে যে দেশের রাজা প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার সমষ্টিগত যে সমস্ত কার্য্যের প্রয়োজন সেই সমস্ত কার্য্যের কথা পরিজ্ঞাত হইয়া তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং সেই সমস্ত কার্য্য করিবার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন সেই দেশে অধিকাংশ মানুষেরই সর্ব্ববিধ দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর হইয়া যায়।

ব্যাস-দেবের উপদেশ যে, যখন কোন দেশের রাজা উপরোক্তভাবে অক্ষম হইয়াও মানুষের উপর প্রভুত্বপ্রয়াসী হন, তখন সেই দেশের মানুষকে নানা রকমের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হয় বটে, কিন্তু তথাপি রাজার সহিত কলহে প্রবৃত্ত হওয়া সঙ্গত নহে। তখন প্রজাগণের মধ্যে যাঁহারা বিচারশীল ও নেতৃত্বের উপযুক্ত, তাঁহাদের কর্ত্তব্য রাজার দায়িত্ব কি কি তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া এবং ঐ সম্বন্ধে রাজাকে জানাইয়া দেওয়া।

ব্যাস-দেব বুঝাইয়াছেন যে, বিশ্বের আদি কারণের কার্য্য প্রত্যেক মানুষের শরীরের ও মনের বৃত্তিসমূহের সৃজন ও সর্ব্বাপেক্ষা সঠিক পরিমাণে রক্ষা করিয়া থাকেন। রাজাও একজন মানুষ। যখন রাজা তাঁহার দায়িত্ব পালনের প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অযথা প্রভুত্বপ্রয়াসী হন তখন প্রজাগণের মধ্যে যাঁহারা বিচারশীল ও নেতৃত্বের উপযুক্ত তাঁহারা যদ্যপি রাজার সহিত কলহ না করিয়া উপরোক্ত পন্থার আশ্রয় ল'ন তাহা হইলে তাঁহারা বিশ্বের আদি কারণের কার্য্য-পদ্ধতি ও কার্য্য-নিয়মানুসারে রাজার মনোবৃত্তির সংস্কার করিতে সক্ষম হন। একান্তই যদি কোন রাজা তাহা না করেন তাহা হইলে প্রজাগণের পক্ষে ঐ রাজার পরিবর্ত্তন সাধন করা সহজসাধ্য হইয়া থাকে।

অন্যদিকে প্রজাগণের মধ্যে যাঁহারা বিচারশীল ও নেতৃত্বের উপযুক্ত তাঁহারা যদি রাজার সহিত কলহে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে সেই রাজত্বের কোন মানুষের পক্ষে তাহার নিজ নিজ দুঃখ-কষ্টের সর্ব্বতোভাবের লাঘব সাধন করা সম্ভব নহে।

উপরোক্ত কথাগুলি বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, সমগ্র ভূ-মণ্ডলের মধ্যে যদি একজনও প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের আদি কারণের অস্তিত্ব, কার্য্য-নিয়ম ও কার্য্য-পদ্ধতি সম্বন্ধে সু-পরিজ্ঞাত হইতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে সমগ্র ভূ-মণ্ডলকে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের পক্ষে স্বর্গতুল্য সুখময় আবাসস্থল করিয়া তোলা কষ্টসাধ্য হইলেও সাধ্য।

উপরোক্ত কথাটী যুক্তিদ্বারা প্রমাণিত না হইলে আমার পাঠকগণ বিকৃত সংস্কারের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমার কথাগুলি পাঠ করিতে আরম্ভ করিবেন, এই আশঙ্কায়, মূল কথায় প্রবৃত্ত হইবার আগে আমি এই কথাটী প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিব।

সমগ্র ভূ-মণ্ডলকে স্বর্গতুল্য সুখময় আবাসস্থল করিবার সাধারণ পন্থা—ইহা আমার "চারিটী পন্থা"র প্রথম অধ্যায়ের মুখ্য বক্তব্য।

এই সম্বন্ধে এখানে অধিক কিছু বলিতে চাহি না।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম ভাগের **উপসংহারে** পাঠকগণের নিকট আমার একটী মিনতি আছে। সেই মিনতিটী জানাইবার আগে আজকালকার অন্যান্য রচনাসমূহের সঙ্গে আমার এই রচনার কি পার্থক্য তৎসম্বন্ধে আমি যাহা বুঝি তাহার ব্যাখ্যা করিতে চাই।

আমার বিশ্বাস, পাঠকগণের যাহাতে সন্তুষ্টি ও তৃপ্তি হয় তাহার সর্ব্ববিধ চেষ্টা অন্যান্য রচনায় উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত থাকে। কিরূপভাবে লিখিলে পাঠকগণের সুখ-পাঠ্য হইবে, কোন্ ভাবের কথা লিখিলে পাঠকগণের তৃপ্তি সাধিত হইবে এবম্বিধ বিষয়ে অন্যান্য রচনার প্রণেতাগণ হয় জ্ঞাতভাবে নতুবা অজ্ঞাতভাবে সজাগ থাকেন। উপরোক্ত দুইটী বিষয়ে যিনি যত নিপুণতা অর্জ্জন করিতে পারেন তিনি পাঠকগণের তত শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারেন।

আপাত ভাবে পাঠকগণের কোনরূপ সন্তুষ্টি অথবা তৃপ্তি সাধন করিবার উদ্দেশ্যে আমি এই রচনায় প্রবৃত্ত হই নাই। আমার রচনা যাহাতে সুখ-পাঠ্য এবং সুবোধ্য হয় তাহার দিকে যে আমার একেবারে লক্ষ্য নাই, তাহাও নহে। **আমার প্রধান লক্ষ্য, ব্যাস-দেবের কথাগুলি যাহাতে মনুষ্যসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় মানুষের বুঝিবার যোগ্য হয় তাহা করা এবং মানুষের দুঃখ-কষ্ট সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার জন্য ব্যাস-দেব যে সমস্ত বিধি ও নিষেধের কথা বলিয়াছেন তাহা মানুষকে বুঝান।**

আমি যে খুব নিপুণ লেখক তাহা আমি মনে করি না। উহা মনে করি না বলিয়াই, যাঁহাদিগকে আমি নিপুণ লেখক বলিয়া মনে করি তাঁহাদিগকে ব্যাস-দেবের কথাগুলি বুঝাইয়া লইয়া, উহা মনুষ্যসমাজে প্রচারের জন্য লেখনীর নৈপুণ্যের সহায়তা আশ্রয় করিবার চেষ্টা আমি করিয়াছি। পরিশেষে আমি বুঝিয়াছি যে উহা সম্ভব নহে। অবশেষে খন্তা ও কোদালী প্রভৃতির দিক হইতে লেখনীর দিকে অগ্রসর হইয়াছি। এবম্বিধ অবস্থায় যে দুষ্টতা অবশ্যম্ভাবী তাহা আমার লেখায় থাকিবেই। আমার ধারণা—কোন তত্ত্বকথা যেরূপ ভাবেই লেখা হউক না কেন, উহা নাটক ও নভেলের মত পড়া সম্ভব নহে।

নাটক ও নভেলে প্রায়শঃ বক্তব্য-বিষয় বিশেষ কিছু থাকে না। উহাতে থাকে প্রধানতঃ মনুষ্য-চরিত্রের কথা-চিত্র। চিত্রের যেরূপ প্রত্যেক বিন্দু ও প্রত্যেক লাইনটী লক্ষ্য না করিয়া মোটামুটি ভাবে চিত্রখানি দেখিলেও চিত্র-বিষয়ে একটা ধারণা জন্মে, নাটক এবং নভেলও সেইরূপ মোটামুটি পড়িলেই তাহার বক্তব্য-বিষয়ের একটা ধারণা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।

যে সমস্ত রচনায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা থাকে তাহা মোটামুটী পড়িলে চলে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের রচনা পড়িতে হইলে উহার প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রত্যেক অংশের প্রধান বক্তব্য কি তাহা একটু কষ্ট করিয়া লক্ষ্য করিতে হয়। তাহার পর দেখিতে হয় যে, ঐ বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কি যুক্তি দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথার রচনায় প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভব হয় না।

দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমান সময়ে খাওয়া পরার অভাবে ও বিকৃততায় মানুষের মন সর্ব্বদা অস্থির হইতে বাধ্য হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা পড়িতে হইলে এবং বুঝিতে হইলে মনের যে স্থিরতার প্রয়োজন সেই স্থিরতা রক্ষা আজকালকার দিনে খুবই কষ্টসাধ্য।

এই জন্য নাটক-নভেলের অথবা রবিবাবু ও শরৎবাবুর পাঠকগণের নিকট আমার মিনতি যে, তাঁহারা যদি তাঁহাদের মন স্থির করিয়া অধ্যয়ন করিতে কৃতসঙ্কল্প না হন তাহা হইলে তাঁহারা যেন এই রচনা পাঠ না করেন। রবিবাবু ও শরৎবাবুর রচনায় যে শ্রেণীর তৃপ্তি ও আমোদ লাভ করা সম্ভব, এই শ্রেণীর রচনায় সেই শ্রেণীর তৃপ্তি ও আমোদ লাভ করা সম্ভব নহে।

আমি আমার মনের ভাব লুকাইতে চাহি না। আমি বর্ত্তমান শিক্ষিত বাঙ্গালীর সহিত সমবেদনাযুক্ত নহি। বাঙ্গালাদেশকে আমি খুব ভালবাসি। ব্যাস-দেবের লেখা হইতে যাহা বুঝিয়াছি তাহাতে আমার মনে হইয়াছে যে, বাঙ্গালাদেশ—কোন দেশের গুণাগুণ বুঝিতে হইলে যে সমস্ত বিষয়ে লক্ষ্য করিতে হয় সেই সমস্ত গুণাগুণের বিচার করিলে—সমগ্র ভূ-মণ্ডলের সমস্ত দেশের শীর্ষস্থানীয়। যথোপযুক্ত দেশে বসবাস করিতে না পারিলে, যে সাধনায় মানুষের পূর্ণতা (perfection) সাধিত হইতে পারে সেই সাধনায় সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয় না। আমার বিশ্বাস, ব্যাস-দেব মানুষের পূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বাসস্থান ছিল বাঙ্গালাদেশ। আমার কথার প্রমাণ আছে। এক্ষণে ঐ প্রমাণের আলোচনা করিতে চাহি না।

ভাল দেশের মানুষের ভালত্ব যেরূপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে, সেইরূপ মন্দত্বেরও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিপূর্ণতা লাভ করা ঐ ভাল দেশেই সম্ভব। আমার মতে বর্ত্তমান শিক্ষিত বাঙ্গালীর অধিকাংশই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মন্দত্বের দৃষ্টান্ত। তাঁহারা নিজদিগের মন্দত্ব উপলব্ধি করিয়া যদি নিজেদের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে প্রস্তুত না হন, তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগের সহানুভূতি চাহিতে পারি না এবং চাহি না। অন্যদিকে তাঁহারা যদি নিজেদের মন্দত্ব বুঝিয়া তাহার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে প্রস্তুত হ'ন তাহা হইলে আমি তাঁহাদের সহানুভূতির কাঙ্গাল হইব।



যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থা ও যুদ্ধ মিটাইবার অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

আপাতদৃষ্টিতে যে ছয়টী জাতি বর্ত্তমান ভূ-মণ্ডল-ব্যাপী যুদ্ধের পৌরোহিত্য করিতেছেন তাঁহাদের কেহই এখনও পর্য্যন্ত প্রকাশ্যভাবে সন্ধি স্থাপন করিবার কোন কথাই উত্থাপন করেন নাই। পরন্তু উঁহাদের প্রত্যেকেই এখনও কয়েক বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত—এইরূপ ইঙ্গিত প্রকাশ করিতেছেন।

এই অবস্থায় একটী চলিত প্রবাদ সর্ব্বদাই আমাদের স্মৃতিপথে জাগ্রত হইতেছে। সেই প্রবাদটী হইতেছে এই, "বান্দা ভাবে এক, খোদা করে আর এক।"

মানুষ তাহার দেহ, তাহার দেহের গুণসমূহ, শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহ কোথা হইতে পায়, কোন্ পদ্ধতিতে মানুষের শরীরের ও মনের বৃত্তিসমূহ পরিচালিত হয়—এবম্বিধ তত্ত্বগুলি মানুষের জানা থাকিলে মানুষ দেখিতে পাইবে যে, মানুষের কার্য্যাবলীর ও কার্য্য-সামর্থ্যের পশ্চাতে মানুষের ইচ্ছা ও বুদ্ধি যেরূপ বিদ্যমান থাকে সেইরূপ আবার স্রষ্টা ও বিধির বিধানও বিদ্যমান থাকে। কোন্ কার্য্য কতক্ষণ করা যায়, কোন্ কার্য্যে কি ফল হয়, তাহা একটু বেশী করিয়া লক্ষ্য করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক কার্য্যে মানুষের ইচ্ছা ও বুদ্ধি প্রাবল্য রক্ষা করে বটে কিন্তু বিধির অথবা স্রষ্টার বিধান সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রবল হইয়া থাকে।

এই প্রবন্ধে আমাদের মুখ্য বক্তব্য তিনটী, যথা:—

(১) যে ছয়টী গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধের পৌরোহিত্য লইয়াছেন তাঁহারা তাঁহাদিগের ইচ্ছামত বিজয়লাভ করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ চালাইতে যতই বদ্ধপরিকর হউন না কেন, স্রষ্টা অথবা বিধির বিধানানুসারে ইচ্ছামত বিজয়লাভ করিবার আগেই—অদূর ভবিষ্যতে (খুবই সম্ভব ইংরাজী ১৯৪৩ সাল অতিক্রান্ত হইবার আগেই) তাঁহাদের প্রত্যেকেই যুদ্ধ মিটাইবার জন্য প্রকাশ্যভাবে বিব্রত হইয়া পড়িবেন। আমাদের এই বক্তব্যটীর নাম হইবে **যুদ্ধকাল ও অবস্থার তাড়না।**

(২) বর্ত্তমান যুদ্ধ মিটাইবার জন্য যে সমস্ত সন্ধিসর্ত্ত স্থির করিতে হইবে সেই সমস্ত সন্ধিসর্ত্তে অন্ততপক্ষে দুইটী বিষয়ে প্রত্যেক দেশের জনসাধারণ যে নিরাপদ হইয়াছে তাহা নেতৃবর্গকে দেখাইতে হইবে। এই দুইটী বিষয়ের একটীর নাম **যুদ্ধের পুনরাবৃত্তির মূল উৎপাটন**; অপরটীর নাম **মানুষের আর্থিক অস্বচ্ছলতার মূল উৎপাটন।** আমাদের এই বক্তব্যটীর নাম হইবে **বর্ত্তমান যুদ্ধের সন্ধির অত্যাবশ্যকীয় সর্ত্ত।**

(৩) বর্ত্তমান যুদ্ধের সন্ধিস্থাপনে সর্ত্ত নির্দ্ধারণ করা

বর্ত্তমান বিজ্ঞান ও দর্শনের যে অবস্থা তাহাতে উহাদের দুইটীর কোনটীর দ্বারা সম্ভবযোগ্য নহে। আমাদের এই বক্তব্যটীর নাম হইবে সন্ধিসর্ত্ত নির্দ্ধারণ করিবার অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞান।

যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি এবং মানুষের আর্থিক অস্বচ্ছলতা যাহাতে কোন দেশে ভবিষ্যতে আর সম্ভবযোগ্য না হয় তাহা করিতে হইলে যুদ্ধ মিটাইতে যে সমস্ত সর্ত্তের প্রয়োজন, সেই সমস্ত সর্ত নির্দ্ধারণ করা একমাত্র ভারতবর্ষের ব্যাস-দেবের দেওয়া বিজ্ঞান ও দর্শনের সহায়তায় সম্ভব।

যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি যাহাতে না হয় তাহা করিতে হইলে যুদ্ধের প্রবৃত্তি যাহাতে সর্ব্বতোভাবে মনুষ্যসমাজ হইতে উৎপাটিত হইতে বাধ্য হয় তাহার ব্যবস্থার প্রয়োজন। মানুষের মনে যুদ্ধের প্রবৃত্তি যাহাতে জাগ্রত না হয় তাহা করিতে হইলে মানুষের স্রষ্টা কে এবং কোথায় থাকেন, মানুষ কোন্ কোন্ উপাদানে গঠিত এবং ঐ উপাদানসমূহের মূল কোথায়, ঐ মূলকে কোন্ পদ্ধতিতে মানুষের উপাদানের যোগ্য করা হয়, মানুষের স্রষ্টার কার্য্য কোন্ নিয়মে পরিচালিত হইয়া থাকে—এই চারিটী কথা জানা একান্ত প্রয়োজনীয়।

মানুষের আর্থিক অস্বচ্ছলতা যাহাতে কোন দেশে আর ভবিষ্যতে সম্ভবযোগ্য না হয় তাহা করিতে হইলেও, মানুষ যে সমস্ত বস্তু তাহার খাদ্য, তাহার পানীয়, তাহার পরিধেয় এবং তাহার বসবাসের ও সুখসম্ভোগের উপকরণরূপে ব্যবহার করে প্রত্যেক দেশের জমি হইতে সেই সমস্ত বস্তুর কাঁচা মাল প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প পরিশ্রমে কিরূপে সম্ভব হইতে পারে তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইবে। আজকালকার অর্থনীতিব পণ্ডিতগণ মনে করেন যে বিতরণের পদ্ধতির সংস্কার সাধন করিতে পারিলে মানুষের অর্থাভাব দূর করা সম্ভব হইতে পারে। এই পণ্ডিত-গণকে বুঝিতে হইবে যে, উৎপাদন সমগ্র মানবসমাজের প্রয়োজনানুরূপ প্রচুর পরিমাণে হইতে থাকিলে বিতরণের পদ্ধতির সংস্কার-সাধনের সম্বন্ধে কোন কথাই উঠিতে পারে না। যখন বণ্টনের পদ্ধতির সংস্কার সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছে—তখনই বুঝিতে হইবে যে, উৎপাদনের পরিমাণ প্রয়োজনের পরিমাণের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অল্প হইতেছে। যখনই বৈজ্ঞানিক সেচন প্রণালী ও সার-প্রদান-প্রণালীর কথা উঠিয়াছে—তখনই বুঝিতে হইবে যে, জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। মানুষের আর্থিক অস্বচ্ছলতা যাহাতে আর কোন দেশে সম্ভবযোগ্য না হয় তাহা করিতে হইলে জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যাহাতে আর হ্রাসপ্রাপ্ত না হয় এবং ঐ স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যাহাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহা করিতে হইবে।

জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি আর যাহাতে হ্রাসপ্রাপ্ত না হয় পরন্তু উহা যাহাতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় তাহা করিতে হইলেও জমির স্রষ্টা কে এবং তিনি কোথায় থাকেন, জমি কোন্ কোন্ উপাদানে গঠিত এবং ঐ উপাদান সমূহের মূল কোথায়, ঐ মূলকে কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে জমির উপাদানের যোগ্য করা হয়, জমির স্রষ্টার কার্য্য কোন্ কোন্ নিয়মে পরিচালিত হইয়া থাকে—এই চারিটী কথা জানা একান্ত প্রয়োজন।

যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি এবং মানুষের অস্বচ্ছলতা যাহাতে আর ভবিষ্যতে কোন দেশে সম্ভবযোগ্য না হয় তাহা করিতে হইলে মানুষের ও জমির স্রষ্টা,

উপাদান, উপাদানের পরিণতি-পদ্ধতি এবং সৃষ্টির নিয়ম এই চারিটী বিষয়ে যে জ্ঞানের প্রয়োজন সেই জ্ঞান অর্জ্জন না করিয়া সন্ধিস্থাপনের সর্ত্তনির্দ্ধারণ করা সম্ভবযোগ্য নহে। মানুষ জমি সম্বন্ধীয় ঐ চারিটী বিষয়ে জ্ঞান অর্জ্জন না করিয়া সন্ধির সর্ত্ত নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিলে যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি এবং মানুষের আর্থিক অস্বচ্ছলতার পুনরাবৃত্তি দূর করা কখনও সম্ভবযোগ্য হইবে না। বর্ত্তমান বিজ্ঞান ও দর্শনে মানুষ ও জমির স্রষ্টা, উপাদান, উপাদানের পরিণতি-পদ্ধতি ও সৃষ্টির নিয়ম সম্বন্ধে কোনও বৈজ্ঞানিক কথা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিকগণ ইচ্ছানুযায়ী মানুষ অথবা জমি সৃষ্টি করিতে পারেন না অধিকন্তু তাহাদের উপাদান, স্রষ্টা, উপাদানের পরিণতি-পদ্ধতি ও সৃষ্টির নিয়ম সম্বন্ধেও কোন কথা জানেন না,—অথচ মানুষ ও জমির যথেচ্ছা ব্যবহার করিতেছেন; এই অনাচারের ফলে পুনঃ পুনঃ ভূ-মণ্ডলব্যাপী মহাযুদ্ধের অভিনয় ঘটিতেছে এবং সর্ব্বত্র অর্থাভাবে হৃদয়বিদারক হাহাকার উঠিয়াছে—ইহা মানুষকে এক্ষণে বুঝিতে হইবে।

মানুষের ও জমির স্রষ্টা, উপাদান, উপাদানের পরিণতি-পদ্ধতি ও সৃষ্টির নিয়ম সম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিক কথা, বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ে ইংরাজি, বাংলা ও সংস্কৃতে লিখিত যে সমস্ত গ্রন্থ বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত আছে তাহার কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। উহা পাওয়া যায় একমাত্র ব্যাসদেবের লেখা গ্রন্থে। ব্যাসদেব যে ভাষায় তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সেই ভাষা বুঝিবার লোকও এখন আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

যাহাতে মহাযুদ্ধের পুনরাবৃত্তি না হয় এবং মানুষের আর্থিক অস্বচ্ছলতা যাহাতে আর কোন দেশে ভবিষ্যতে সম্ভবযোগ্য না হয়, সেইরূপ ভাবে সন্ধির সর্ত্ত নির্দ্ধারণ করিতে হইলে বিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধে যে জ্ঞানের প্রয়োজন সেই জ্ঞান ব্যাসদেবের লেখা ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না বলিয়া আমাদের মতে বর্ত্তমান যুদ্ধের সন্ধির সর্ত্ত যথাযথ ভাবে নির্দ্ধারণ করিতে হইলে ব্যাসদেবের দেওয়া বিজ্ঞান ও দর্শনের সহায়তা একান্ত প্রয়োজনীয়।

আমাদের উপরোক্ত তিনটী বক্তব্যের সম্বন্ধে আমরা একের পর এক আলোচনা করিব।

যুদ্ধকাল ও অবস্থার ভাড়না

যে কয়টী গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেকেই ধনুর্ভঙ্গ-পণ করিয়াছেন যে, শত্রুপক্ষকে যতদিন পর্য্যন্ত চূর্ণিত ও বিচূর্ণিত করিতে না পারিবেন ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা যুদ্ধ চালাইবেন। একদিকে যেরূপ শত্রুপক্ষকে চূর্ণিত ও বিচূর্ণিত করা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য, অন্যদিকে আবার আগামী হাজার হাজার বৎসরের মধ্যে কোন মহাযুদ্ধের পুনরাবৃত্তি যাহাতে না হয় তাহা করাও তাঁহাদের উদ্দেশ্য।

আমাদের প্রশ্ন—শত্রুপক্ষকে পরাজিত করিয়া তাহাকে চূর্ণিত বিচূর্ণিত করিলে যুদ্ধের পুনরাবৃত্তির মূলে কুঠারাঘাত করা সম্ভব হয় কি?

আমাদের মতে যুদ্ধের পুনরাবৃত্তির মূল সম্পূর্ণ ভাবে উৎপাটিত করিতে হইলে শত্রুপক্ষকে সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত করা চলে না। কোন শত্রুপক্ষকে পরাজয়ের অপমানে অপমানিত করিলে শত্রুপক্ষের মন পরাজয়ের কালিমায় হতশ্রী হইয়া থাকে এবং মনস্তত্ত্বের নিয়মানুসারে প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তিতে জর্জ্জরিত হইতে থাকে। এতাদৃশ প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি শত্রুপক্ষকে প্রতিশোধের জন্য ব্যাকুল করিয়া তুলে। অবশেষে মহাযুদ্ধের পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী হয়।

যাঁহারা মনে করেন যে, শত্রুপক্ষকে সম্পূর্ণ ভাবে চূর্ণিত ও বিচূর্ণিত করিয়া নিরস্ত্র করিতে পারিলে

শত্রুপক্ষের প্রতিশোধ-প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করা সম্ভব হয়, তাঁহারা আমাদের মতে, মানুষের মনস্তত্ত্ব-সম্বন্ধ জ্ঞানে ভ্রমপ্রমাদযুক্ত।

শত্রুপক্ষকে পরাজিত করিয়া নিরস্ত্র করিতে পারিলেই যদি মহাযুদ্ধের পুনরাবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে বর্ত্তমান যুদ্ধ ঘটিয়া উঠিতে পারিত না। আমাদের উপরোক্ত কথার যুক্তি এই যে, গত ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে ইংরাজ-পক্ষ জার্ম্মাণপক্ষকে সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে নিরস্ত্রও করিয়াছিলেন। মহাযুদ্ধের পুনরাবৃত্তি যাহাতে না হয় তাহার আয়োজনেরও তাৎকালিক দৃষ্টিতে কোন ত্রুটি ছিল না। লীগ অব নেশনস্ (League of Nations)-এর সৃষ্টি ও সংগঠন ঐ আয়োজনের দৃষ্টান্ত।

কোন শত্রুপক্ষকে পরাজয়ের কালিমায় কলঙ্কিত করিলে পুনরায় যুদ্ধ হইবার আশঙ্কা যে তিরোহিত হয় না পরন্তু পুনরায় যুদ্ধ হইবার আশঙ্কা যে বলবান হইয়া পড়ে, তাহা ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের শেষ অবস্থা এবং তাহার পরবর্ত্তীকালে যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বুঝা যাইবে।

আমাদের মতে, পুনরায় যাহাতে মহাযুদ্ধ ঘটিতে না পারে তাহা করা যদ্যপি যুদ্ধলিপ্ত গভর্ণমেণ্টগুলির নেতাদের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, তাহাদিগের কাহারও আর যুদ্ধে অগ্রসর হওয়া সঙ্গত নহে।

উপরোক্ত কারণে যুদ্ধলিপ্ত গভর্ণমেণ্টসমূহের নেতাগণের কাহারও যেরূপ আর যুদ্ধে অগ্রসর হওয়া সঙ্গত নহে, সেইরূপ আবার ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, **আর অধিককাল যুদ্ধ চালান প্রত্যেক যুদ্ধলিপ্ত গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের পক্ষে বিপদজনকও বটে।**

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল সেই সময় প্রত্যেক দেশের মানুষের মনের অবস্থা ও খাদ্যাদি সংগ্রহ করিবার অবস্থা কিরূপ ছিল, আর এখনই বা মানুষের মনের অবস্থা ও খাদ্যাদি সংগ্রহ করিবার অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে এবং ঐ দুই সময়ের অবস্থার তুলনা করিলে মানুষ কোন দিকে চলিয়াছে তাহা লক্ষ্য করা যায় এবং আমাদিগের কথিত বিপদজনকতার সাক্ষ্যও পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের ব্যাসদেবের কথার সুরের সহিত সুর মিলাইয়া কথা কহিতে হইলে আমাদিগকে বলিতে হয় যে, **মানুষের অস্তিত্বের ও প্রত্যেক কার্য্যের পশ্চাতে কাল, স্থান, উৎপাদন বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের প্রকৃতির অস্তিত্ব ও কার্য্য বিদ্যমান আছে।**

উপরোক্ত কথাটী আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইলে বলিতে হয় যে, কোন মানুষ ইচ্ছা অনুসারে কোন মানুষকে এবং মানুষের কোন কার্য্যপ্রবৃত্তিকে সৃজন করিতে পারে না। প্রত্যেক মানুষের সৃষ্টি ও তাহার প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে যেরূপ মানুষের ইচ্ছা ও বুদ্ধি বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ আবার প্রকৃতির কার্য্য ও তাহার কার্য্যনিয়মও বিদ্যমান থাকে। মানুষ যতই বুদ্ধিমান ও বলবান হউক না কেন, প্রকৃতির কার্য্য ও তাঁহার কার্য্যের নিয়ম বাদ দিয়া কোন কার্য্যেই অগ্রসর হইতে পারে না। প্রকৃতির কার্য্য ও প্রকৃতির কার্য্যের নিয়ম বাদ দিয়া যেরূপ কোন কার্য্যে অগ্রসর হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না, সেইরূপ আবার কোন কার্য্যের জীবনকালও প্রকৃতির কার্য্য ও কার্য্যনিয়ম বাদ দিয়া স্থির করা সম্ভব হয় না।

উপরোক্ত নিয়মানুসারে কোন কার্য্যের বিদ্যমানতার সময় ঐ কার্য্য কতদিন চলিতে পারে তাহা স্থির করিতে হইলে একদিকে যেরূপ মানুষের ইচ্ছার

তীব্রতার দিকে লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ আবার মানুষের শরীর, মন ও অর্থের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহার দিকে লক্ষ্য করিতে হয়।

কোন কার্য্যের বিদ্যমানতার সময় ঐ কার্য্য কতদিন চলিতে পারে তাহা স্থির করিতে হইলে যেরূপ মানুষের ইচ্ছার, মানুষের শরীরের, মানুষের মনের এবং মানুষের অর্থের তাৎকালিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিতে হয়, কোন কার্য্য আরম্ভ করিবার প্রাক্কালে ঐ কার্য্য অনায়াসে কতদিন চলিতে পারে তাহা ঠিক করিতে হইলেও কতকাংশে উপরোক্ত পদ্ধতির অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। কোন কার্য্যের বিদ্যমানতার সময় ঐ কার্য্য কতদিন চলিতে পারে তাহা স্থির করিতে হইলে একদিকে যেরূপ মানুষের ইচ্ছার, মানুষের শরীরের, মানুষের মনের এবং মানুষের অর্থের তাৎকালিক অবস্থা স্থির করিতে হয়, অন্যদিকে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে উপরোক্ত চতুর্ব্বিধ অবস্থা কতদিন অথবা কতকাল অটুট থাকিতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়োজন হয়। সেইরূপ কোন কার্য্য আরম্ভ করিবার প্রাক্কালে ঐ কার্য্য চালান কতদিন অথবা কতকাল সম্ভব হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে মানুষের উপরোক্ত চতুর্ব্বিধ অবস্থা সম্বন্ধে উপরোক্ত দুই-শ্রেণীর নির্দ্ধারণের পন্থা অবলম্বন করিতে হয়।

উপরোক্ত দুই শ্রেণীর পন্থাকে ভিত্তি করিয়া সমগ্র দেশব্যাপক সঙ্ঘবদ্ধভাবে এক পক্ষ আর এক পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধকার্য্যে সর্ব্ববিধ শক্তির নিয়োগে লিপ্ত হইলে আক্রমণের কার্য্য ও বাধা দিবার কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা কতকাল দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে—এবং আক্রমণের কার্য্য ও বাধা দিবার কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা তীব্রভাবে কতদিন চালান সম্ভব হইতে পারে, তাহা স্থির করিবার পন্থা সম্বন্ধে ব্যাসদেব কতকগুলি কথা তাঁহার অর্থনীতি-বিষয়ক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই কথাগুলি গভীর চিন্তাশক্তির এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক। সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে ঐ কথাগুলি বুঝা খুব সহজসাধ্য নহে। ঐ কথাগুলি সম্বন্ধে আমরা এখানে কোন বিস্তৃত আলোচনা করিব না। ঐ কথাগুলির সংক্ষিপ্ত শিক্ষা কি,—তাহাই লিপিবদ্ধ করিব। আমাদের মতে ঐ কথাগুলির কোনটাই বিন্দুমাত্র উপেক্ষণীয় নহে, পরন্তু সর্ব্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য। মূল কথাগুলি উপেক্ষণীয় না হইলে তাহা হইতে যে সংক্ষিপ্ত শিক্ষা পাওয়া যায় তাহাও উপেক্ষণীয় হইতে পারে না।

ব্যাসদেবের মতে দুই পক্ষ মোটের উপর প্রায় সমকক্ষ না হইলে কোন সংগ্রাম মাসাধিক দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। এক পক্ষ অপর পক্ষের তুলনায় কথঞ্চিৎ মাত্রায় অধিকতর বলশালী না হইলে কোন পক্ষেরই কোন পক্ষকে আক্রমণ করা সম্ভব হয় না। আক্রমণকারী পক্ষ বাধাদানকারী পক্ষের তুলনায় পাশবিক বলে কথঞ্চিৎ বলশালী হইয়া থাকে। বাধাদান কার্য্যে যে পরিমাণ বলের প্রয়োজন হয়, আক্রমণের কার্য্যে সর্ব্বদাই তদপেক্ষা অধিকতর বলের প্রয়োজন হইয়া থাকে। অধিকতর বল অর্জ্জন না করিয়া আক্রমণের কার্য্যে লিপ্ত হওয়া নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

সংগ্রামের কার্য্যে সাধারণতঃ যে সমস্ত বলের প্রয়োজন হয় তাহার শ্রেণীসংখ্যা বহু। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছয়টী, যথা :—

(১) নেতাগণের সংগ্রামের ইচ্ছার প্রাবল্য ও ধীরতা,

(২) সেনাগণের সংগ্রাম-নৈপুণ্য,

(৩) নিপুণ সেনাগণের সংখ্যা,

(৪) নেতৃবর্গের প্রতি জন-সাধারণের ও সেনাগণের শ্রদ্ধা ও অনুরক্তির আন্তরিকতার মাত্রা,

(৫) দেশের ও জন-সাধারণের আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রাচুর্য্যের পরিমাণ,

এবং (৬) সর্ব্ববিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানে নেতৃবর্গের পরিপক্কতার পরিমাণ ও সেনাগণকে শিক্ষাদান কার্য্যে নৈপুণ্যতার মাত্রা।

ব্যাসদেব সংগ্রামের বলাবলের নির্দ্ধারণ ও সংগঠনের জন্য উপরোক্ত যে সমস্ত কথা কহিয়াছেন, তাঁহা লক্ষ্য করিলেই সংগ্রাম সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তাশক্তি কত গভীর তাহা বুঝা যাইবে।

ব্যাসদেবের মতে সমবলে বলীয়ান যখন দুইটী রাজ্যের মধ্যে সংগ্রাম হইতে থাকে, তখন দুইটী রাজ্যই ক্রমাম্বয়ে আক্রমণকারী হইয়া থাকে। যখন দীর্ঘ সময়ের জন্য একটী আক্রমণকারী আর একটী বাধাপ্রদানকারী হয়, তখন বুঝিতে হয় যে, আক্রমণকারী রাজ্যই অপেক্ষাকৃত অধিকতর বলবান। যখন দেখা যায় যে, একটী রাজ্য আক্রমণের কার্য্য চালাইতেছে এবং অপরটী বাধাপ্রদানের কার্য্য করিতেছে অথচ দুইটী রাজ্যের কোনটীই পরাভব স্বীকার করিতেছে না, তখন বুঝিতে হয় যে, যদিও আক্রমণ-সামর্থ্যের জন্য আক্রমণকারী রাজ্য বাধাপ্রদানকারী রাজ্যের তুলনায় অধিকতর বলবান্, তথাপি বলাধিক্যের মাত্রা খুব বেশী নহে। এতদবস্থায় যুদ্ধের সন্ধিস্থাপন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

ব্যাসদেব দেখাইয়াছেন যে, প্রকৃতির নিয়মানুসারে উপরোক্ত বলসম্পন্ন দুইটী রাজ্যের তিন বৎসরের অধিক সংগ্রাম করিবার সামর্থ্য থাকে না। তিন বৎসরও এতাদৃশ রাজ্য একাদিক্রমে সংগ্রাম করিতে সক্ষম হয় না। খণ্ড খণ্ড ভাবে তাহাদের যুদ্ধের তীব্রতা চলিতে থাকে। খণ্ড খণ্ড ভাবে তাহাদের যে তীব্র রকমের যুদ্ধ হয় সেই তীব্রতার ব্যাপ্তি কখনও ১৮০ দিনের অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না। যে অঙ্কশাস্ত্রের দ্বারা ব্যাসদেব উপরোক্ত সত্যগুলি প্রমাণ করিয়াছেন তাহার ভিত্তি পঞ্চবিধ কার্য্য-নিয়ম, যথা :—

(১) ঈশ্বরের কার্য্যনিয়ম,
(২) প্রকৃতির কার্য্যনিয়ম,
(৩) মানুষের জন্মসাধক কার্য্যনিয়ম,
(৪) মানুষের পুষ্টিসাধক কার্য্যনিয়ম এবং
(৫) মানুষের ক্ষয়সাধক কার্য্যনিয়ম।

বলা বাহুল্য, এই প্রবন্ধে ঐ পাঁচটি নিয়ম সম্বন্ধে বেশী কথা বলা সুস্তবযোগ্য নহে। ব্যাসদেব সংগ্রাম, যুদ্ধ এবং দ্বন্দ্ব-কলহ এক অর্থে ব্যবহার করেন নাই। তিনটির পার্থক্য অতি স্পষ্টভাবে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ব্যাসদেবের কথা মানুষ বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, তিন বৎসরের অধিক যুদ্ধ চালান যে যুদ্ধলিপ্ত প্রত্যেক রাজ্যের পক্ষে অত্যন্ত বিপদজনক তাহা যেমন সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা কতক পরিমাণে বুঝা যায় সেইরূপ আবার ১৯১৪-১৮ সালের ইউরোপীয় যুদ্ধের ফলাফল লক্ষ্য করিলেও প্রতীয়মান হয়।

কোন দুইটী রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধের অবস্থা ঘোষিত হইলে সেই দুইটী রাজ্যের জন-সাধারণের মধ্যেই যে একটা অস্বাভাবিক রকমের আতঙ্ক অথবা মনের অশান্তি এবং খাদ্যাদি দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন উপস্থিত হয়, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। এতাদৃশ আতঙ্ক অথবা মনের অশান্তি এবং খাদ্যাদির নিয়ন্ত্রণ মানুষ সাধারণতঃ মানিয়া লইতে চাহে না। প্রায়শঃ হয় দেশ হিতৈষণা-প্রবৃত্তিতে অথবা রাজার আইন অথবা নিয়মের ফলে যাহা মানুষ সাধারণতঃ মানিয়া লইতে চাহে না অথবা মানিয়া লইতে পারে না, তাহাও মানিয়া লইয়া থাকে।

যুদ্ধ যত দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে মানুষের মনের

অশান্তির পরিমাণ ও খাদ্যাদির অভাবের তাড়না তত অসহ্য হইতে থাকে। প্রকৃতির নিয়মানুসারে মানুষের সহনশীলতার একটা সীমানা আছে। সহনশীলতার ঐ সীমানা অতিক্রান্ত হইলে মানুষের বিদ্রোহ আপনা হইতেই ঘোষিত হইয়া থাকে। মানুষের সহনশীলতার সীমানা যাহাতে অতিক্রান্ত না হয় তদ্বিষয়ে সতর্কতা রক্ষা করিবার দায়িত্ব প্রধানতঃ রাজপুরুষগণের।

তিন বৎসরের অধিক যাহাতে কোন রাজ্য কোন সমবলসম্পন্ন রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত না থাকে তদ্বিষয়ে সতর্ক হইবার আর একটী যুক্তি আছে। ঐ যুক্তিটী মানুষের খাদ্যবিষয়ক কয়েকটী সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ঈশ্বরের দেওয়া ধান অথবা গম মানুষের প্রধান খাদ্য। এই দুইটীর কোনটীই তিন বৎসরের অধিক খাদ্য-প্রয়োজনীয়তা সমানভাবে রক্ষা করিতে সক্ষম হয় না।

আজকালকার ঈশ্বর-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানের প্লাবনের দিনে অনেকেই মনে করেন যে, ঈশ্বরের দেওয়া খাদ্যশস্য সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়া কেবল মাত্র বৈজ্ঞানিক খাদ্যের উপর নির্ভর করিলেও মানুষের শরীরের ও মনের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখা সম্ভব হয়। আমাদের মতে মানুষের এতাদৃশ ধারণা অত্যন্ত অযৌক্তিক এবং অসত্য। ধান ও গম হইতে টাট্‌কা তৈয়ারী খাদ্য ছাড়া মানুষ কোনদিন তাহার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সর্ব্বতোভাবে বজায় রাখিতে পারে নাই, এখনও পারে না, কোন দিন পারিবে না। এই দুইটী খাদ্য বাদ দিয়া অথবা এই দুইটী খাদ্যকে বিকৃত করিয়া বিকৃতভাবের খাদ্য দিয়া জীবন ধারণের চেষ্টা করিলে মানুষের পক্ষে বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইলেও হইতে পারে বটে এবং তাহাতে শারীরিক কার্য্যক্ষমতা কথঞ্চিৎ পরিমাণে রক্ষা করা সম্ভব হইতে পারে বটে কিন্তু পূর্ণভাবের শারীরিক কার্য্যক্ষমতা অথবা দীর্ঘ জীবন অথবা নির্ভরযোগ্য বুদ্ধি-ক্ষমতা কোন দেশেই রক্ষা করা সম্ভব হয় না।

কোন যুদ্ধ তিন বৎসরের অধিক স্থায়ী হইলে যুদ্ধলিপ্ত রাজ্যসমূহে সৈন্যগণের ও জনসাধারণের স্বাস্থ্যকর খাদ্যের অভাব উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যখনই কোন রাজ্য যুদ্ধে লিপ্ত থাকে তখনই প্রয়োজনীয় খাদ্য-শস্যের উৎপাদনের পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্তি অনিবার্য্য হয়। ইহার কারণ, সমরের প্রয়োজন সরবরাহের অতিরিক্ত কার্য্যসমূহ। ইহারই জন্য যখনই কোন রাজ্য যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখনই সেই রাজ্যকে যথাসাধ্য প্রচুর পরিমাণে খাদ্যাদির সঞ্চয় সাধন করিয়া আগুয়ান হইতে হয়। খাদ্যশস্য তিন বৎসরের অধিক সঞ্চিত থাকিলে তদ্দ্বারা পূর্ণভাবে মানুষের স্বাস্থ্যসাধন করা কখনও সম্ভব হয় না। উপরোক্ত কারণে আমরা মনে করি যে, যদি কোন যুদ্ধ তিন বৎসরের অধিককাল স্থায়ী হয় তাহা হইলে যুদ্ধলিপ্ত রাজ্যসমূহের সৈন্যগণের ও জনসাধারণের স্বাস্থ্যকর খাদ্যের অভাব অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে।

একদিকে স্বাস্থ্যকর খাদ্যের অভাব, তাহার পর আবার মানসিক অশান্তির সহনশীলতার সীমানা অতিক্রমণ, তৃতীয়তঃ প্রত্যেক প্রয়োজনীয় জিনিষের অভাব—এই তিনের মিলনে তিন বৎসরের অধিক কোন রাজ্যের পক্ষে যুদ্ধ চালান দুঃসাধ্য হয়। প্রকৃতির এই নিয়ম না বুঝিয়া যদি কোন রাজ্যের নেতৃবর্গ নিজদিগের অহঙ্কার পরিতৃপ্তির জন্য যুদ্ধ চালাইতে বদ্ধপরিকর হন, তাহা হইলে তাঁহারা প্রায়শঃ অজ্ঞাতভাবে রাজ্যের সংহার-লীলা সম্পাদন করিয়া থাকেন।

আমাদিগের উপরোক্ত কথার জাজ্জ্বল্যমান সাক্ষ্য ১৯১৪-১৮ সালের ইউরোপের যুদ্ধের ইতিহাসে

পাওয়া যায়। ঐ ইতিহাস লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, রুশ রাজ্যের তিন বৎসরও যুদ্ধ চালাইবার সামর্থ্য ছিল না। ঐ সামর্থ্য ছিল না বলিয়াই তিন বৎসর যাইতে না যাইতেই রুশ রাজ্যের পতন ঘটিয়াছিল।

তিন বৎসরের অতিক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য যুদ্ধলিপ্ত রাজ্যগুলি কোন্ অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল তাহা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, জার্ম্মাণ, তুর্কী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং ইটালী এই কয়টী রাজ্যও অবসাদের শেষ সীমানায় উপস্থিত হইয়াছিল। ভাগ্যক্রমে তখনও আমেরিকার যুক্ত-রাজ্য যুদ্ধের অবস্থা হইতে দূরে দণ্ডায়মান ছিল এবং অবশেষে মিত্রপক্ষে যোগদান করিয়াছিল। আমাদের বিচারে প্রধানতঃ আমেরিকার যোগদানের ফলেই জার্ম্মাণীকে হতোদ্যম হইয়া পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। নতুবা যুদ্ধলিপ্ত প্রত্যেক রাজ্যকেই প্রায় সমানভাবে হতোদ্যম হইবার অবস্থা স্বীকার করিয়া লইতে হইত। ঐ যুদ্ধে যদিও মিত্রপক্ষ সন্ধির চুক্তিপত্রানুসারে বিজয়লাভ করিয়াছিলেন ইহা সম্পূর্ণভাবে সত্য, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে বৃটীশ সাম্রাজ্য কোন্ অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, যদিও চুক্তিপত্রানুসারে বৃটীশ সাম্রাজ্যের বিজয়লাভ ঘটিয়াছিল তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে—ঐ যুদ্ধে বৃটীশ সাম্রাজ্যের যে অনিষ্ট ঘটিয়াছিল সেই অনিষ্ট পরবর্ত্তী পঁচিশ বৎসরের মধ্যে পূরণ করা সম্ভব হয় নাই।

১৯১৪-১৮ সালের ইউরোপীয় যুদ্ধে আমেরিকা ও জাপানের পক্ষে যেরূপ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দূরে দণ্ডায়মান থাকা সম্ভব হইয়াছিল এবারকার যুদ্ধে আর কোন উল্লেখযোগ্য রাজ্যের পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দূরে দণ্ডায়মান হওয়া সেইরূপ ভাবে সম্ভব হয় নাই।

কাজেই আমাদের মতে এবারকার যুদ্ধের এই চতুর্থ বর্ষে যুদ্ধলিপ্ত রাজ্যগুলির প্রত্যেকের অধিকতর সতর্ক হইবার প্রয়োজন আছে।

"যুদ্ধকাল ও অবস্থার তাড়না" শীর্ষক আখ্যানে আমাদের মুখ্য বক্তব্য চারিটী, যথা:—

(১) যাহাতে ভূমণ্ডলের কোন রাজ্যের পুনরায় কোন মহাযুদ্ধে লিপ্ত না হইতে হয় তাহা করিতে হইলে যুদ্ধলিপ্ত প্রত্যেক রাজ্যকে বিপক্ষকে পরাজয়ের অপমানে কালিমাময় করিবার প্রবৃত্তি বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

(২) যাহাতে ভূমণ্ডলের কোন রাজ্যের পুনরায় কোন মহাযুদ্ধে লিপ্ত না হইতে হয় তাহা করিতে হইলে যুদ্ধের এই চতুর্থ বৎসরে যুদ্ধলিপ্ত সকল রাজ্যকে মিলিত হইয়া সন্ধিস্থাপনা করিতে হইবে।

(৩) সময় থাকিতে সন্ধিস্থাপন করিতে উদ্যোগী না হইয়া যুদ্ধ চালাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলে প্রত্যেক রাজ্যের জনসাধারণের ও সৈন্যসামন্তগণের স্বাস্থ্যকর খাদ্যের অভাব ও মানসিক অশান্তি সহনশীলতার সীমানা অতিক্রম করিবে।

(৪) খাদ্যের অভাব ও মানসিক অশান্তি সহনশীলতার সীমানা অতিক্রম করিলে এক পক্ষের আর এক পক্ষের উপর বিজয়লাভ করা সম্ভব হইলেও হইতে পারে বটে কিন্তু জয়ীপক্ষেরও এত অনিষ্ট হওয়া অবশ্যম্ভাবী যে, জয়ের দ্বারাও অনিষ্টের পূরণ করা সুদূর ভবিষ্যতেও সম্ভবযোগ্য হইবে না।

আমাদের উপরোক্ত কথাগুলির প্রত্যেকটী ব্যাসদেবের বিজ্ঞান ও দর্শনকে ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছে। ঐ কথাগুলির কোনটী উপেক্ষার যোগ্য নহে।

বর্ত্তমান যুদ্ধের সন্ধির অত্যাবশ্যকীয় সর্ত্ত

আমরা আগেই বলিয়াছি যে, বর্ত্তমান যুদ্ধ মিটাইবার জন্য যে সন্ধি স্থাপিত হইবে সেই সন্ধির সর্ত্ত গঠনে দুইটী বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। ঐ দুইটী বিষয়ের নাম যথা :—

(১) কোন মহাযুদ্ধের পুনরাবৃত্তি যাহাতে না হয় তাহার ব্যবস্থা,

আর (২) কোন দেশের কোন মানুষের সাংসারিক অবস্থায় যাহাতে আর্থিক অস্বচ্ছলতা না ঘটিতে পারে তাহার ব্যবস্থা।

যুদ্ধলিপ্ত গভর্ণমেণ্ট সমূহের বিভিন্ন নেতৃবর্গের মুখে সন্ধিসর্ত্ত সম্বন্ধে যে-সমস্ত কথা শোনা যাইতেছে, সেই সমস্ত কথার দিকে লক্ষ্য করিলেও দেখা যাইবে যে, উপরোক্ত দুইটী ব্যবস্থার যে প্রয়োজন আছে তাহা তাঁহাদেরও মনে স্থান পাইয়াছে।

উপরোক্ত দুইটী ব্যবস্থার যে প্রয়োজন আছে তাহা যুদ্ধলিপ্ত গভর্ণমেণ্ট সমূহের নেতৃবর্গের মনে স্থান পাইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় বটে কিন্তু তাঁহাদিগের কথার সহিত আমাদিগের কথার কিছু পার্থক্য আছে।

প্রথম পার্থক্য এই যে —

যুদ্ধলিপ্ত গভর্ণমেণ্ট সমূহের নেতৃবর্গের মুখে যাহা শুনা যায় তাহাতে মনে হয় যে, তাঁহারা প্রত্যেকেই তাঁহাদের মিত্রপক্ষের জনসাধারণের প্রত্যেকের সংসারের আর্থিক অস্বচ্ছলতা দূর করিবার প্রয়োজন যত তীব্রভাবে উপলব্ধি করেন, শত্রুপক্ষের জনসাধারণের প্রত্যেকের আর্থিক অস্বচ্ছলতা দূর করিবার প্রয়োজন তত তীব্রভাবে উপলব্ধি করেন না।

আমাদিগের মতে: বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজ যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে সেই অবস্থায় কোন দেশ অথবা কোন দেশের মানুষকে উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র নিজের দেশের অথবা নিজ মিত্রপক্ষের দেশসমূহের জনসাধারণের আর্থিক অস্বচ্ছলতা দূর করিতে প্রযত্নশীল হইলে ঐ প্রযত্ন কখনও বিন্দুমাত্র সাফল্যযুক্ত হইবে না।

আমরা কেন এই মতবাদ পোষণ করি তাহার ব্যাখ্যা করিতে হইলে ভূমণ্ডলের প্রত্যেক দেশে তীব্রভাবে আর্থিক অস্বচ্ছলতা ও অশান্তি কেন দেখা দিয়াছে, প্রত্যেক দেশেই প্রকৃত সুখশান্তি প্রত্যেক মানুষের ভাগ্যে কেন দুর্লভ হইয়াছে তাহার ব্যাখ্যা করিতে হয়।

বর্ত্তমান যুদ্ধের সন্ধিসর্ত্ত নির্দ্ধারণ করিবার অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞান কোন্ কোন্ বিষয়ক হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় তাহার ব্যাখ্যা কালে আমরা উপরোক্ত বিষয়ের আলোচনা করিব।

কোন একটী দেশের জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে আর্থিক অস্বচ্ছলতা না ঘটে তাহার ব্যবস্থা করা, যাহাতে সমগ্র ভূমণ্ডলের সমগ্র মানব-সমাজের প্রত্যেক সংসারে আর্থিক অস্বচ্ছলতা না থাকে তাহা করিতে না পারিলে কিছুতেই সম্ভবযোগ্য হইবে না।

দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে—

যুদ্ধলিপ্ত গভর্ণমেণ্টসমূহের প্রত্যেকের নেতৃবর্গ মনে করেন যে, বিপক্ষকে চূর্ণিত বিচূর্ণিত করিয়া অস্ত্রহীন করিতে পারিলে হাজার হাজার বৎসরের মত মানবসমাজকে মহাযুদ্ধের আশঙ্কা হইতে মুক্ত করা সম্ভব হইবে

আমাদের মতবাদ ঠিক উহার বিপরীত। ব্যাসদেবের কথা হইতে আমরা যাহা বুঝিয়াছি তাহাতে আমরা মনে করি যে, কোন শত্রুপক্ষকে পরাজয়ের অপমানে কালিমাযুক্ত করিলে পুনরায় যুদ্ধের আশঙ্কা

বিন্দুমাত্র পরিমাণেও বিলুপ্ত হয় না, পরন্তু সর্ব্বদা তীব্রভাবে উহা জাগ্রত থাকে।

আমাদের মতে কোন মহাযুদ্ধের পুনরাবৃত্তি মানবসমাজে পুনরায় যাহাতে না ঘটে তাহা করিতে হইলে জয়-পরাজয় সম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার আগেই **যুদ্ধের এই চতুর্থ বৎসরে যুদ্ধলিপ্ত সমস্ত গভর্ণমেণ্টের উল্লেখযোগ্য সমস্ত নেতাকে কোন সুবিধাজনক স্থানে একসঙ্গে মিলিত হইয়া পরামর্শে উদ্যত হইতে হইবে।** পরামর্শের বিষয় থাকিবে তিনটী ; যথা :—

(১) পুনঃ পুনঃ ভূমণ্ডলব্যাপী মহাযুদ্ধ হইতেছে কেন, তাহার কারণসমূহের নির্ব্বাচন এবং ঐ কারণ সমূহ সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার কার্য্যযোগ্য পন্থা নির্দ্ধারণ ;

(২) সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক সংসারের অর্থাভাবের ও অশান্তির কারণসমূহের নির্ব্বাচন এবং ঐ কারণসমূহ দূর করিবার কার্য্যযোগ্য পন্থা নির্দ্ধারণ ;

(৩) সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক সংসারে যাহাতে সর্ব্বতোভাবের সুখ ও শান্তি বিরাজিত হয় তাঁহার পন্থা নির্দ্ধারণ।

উপরোক্ত দুইশ্রেণীর কারন ও তিন শ্রেণীর পন্থা নির্দ্ধারিত হইলে কোন্ সর্ত্তে সন্ধি করিলে মনুষ্য-সমাজে যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি এবং আর্থিক অস্বচ্ছলতার পুনরাবির্ভাব অসম্ভব হইবে তাহা স্থির করা যাইবে। যে সর্ত্তে সন্ধি করিলে মহাযুদ্ধের পুনরাবৃত্তি এবং ব্যাপক আর্থিক অস্বচ্ছলতার তীব্রতা দূর হইতে পারে তাহা স্থির করা উপরোক্ত দুইশ্রেণীর কারণ এবং তিন শ্রেণীর পন্থা নির্ব্বাচন ছাড়া সম্ভব নহে। কোন্ কোন্ সর্ত্তে সন্ধি করিলে মহাযুদ্ধের পুনরাবৃত্তি এবং ব্যাপক আর্থিক অস্বচ্ছলতার তীব্রতা সর্ব্বতো-ভাবে দূরীভূত হইতে পারে তাহা উপরোক্ত পদ্ধতিতে মিলিত হইয়া স্থির না করিতে পারিলে মহাযুদ্ধের পুনরাবৃত্তির এবং আর্থিক অভাবের তীব্রতার আশঙ্কা থাকিয়াই যাইবে।

উপরোক্তভাবে সন্ধির সর্ত্ত ঠিক করিতে পারিলে অনায়াসেই বাঞ্ছনীয় সন্ধিস্থাপন করা সম্ভব হইবে, নতুবা অন্য কোন উপায়ে উহা সম্ভবযোগ্য হইবে না।

তৃতীয় পার্থক্য এই যে—

যুদ্ধলিপ্ত গভর্ণমেণ্টসমূহের প্রায় প্রত্যেক নেতা মনে করেন যে, বিতরণের নিয়ম (Laws of Distribution of Wealth) সংস্কৃত হইলে দেশের জন-সাধারণের অর্থাভাব দূর করা সম্ভব হইবে।

তাঁহাদের প্রায় প্রত্যেকের মুখেই currency, finance, banking, insurance প্রভৃতির সংগঠনের পুনঃ সংস্কারের কথা শুনা যাইতেছে।

আমাদিগের মতে বিতরণের কোনরূপ সংস্কারের দ্বারা ব্যাপকভাবে কোন দেশের জনসাধারণের অর্থাভাবের কোনরূপ লঘুতা সম্পাদন করা সম্ভব হইবে না।

যাহাতে প্রত্যেক দেশের জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পায়, সর্ব্বাপেক্ষা অল্প পরিমাণের পরিশ্রমে যাহাতে জমি হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণের মানুষের স্বাস্থ্যপ্রদ ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয়, যাহাতে প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক সংসার পাঁচ মাসের পরিশ্রমে সম্বৎসরের প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তুর কাঁচা মাল উৎপাদন করিতে পারে—তাহার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে

সর্ব্বতোভাবে কোন দেশের অর্থাভাব দূর করা কখনও সম্ভব হয় না, ইহা ব্যাসদেবের সিদ্ধান্ত। আমরা ঐ সিদ্ধান্তের অনুবর্ত্তী।

ব্যাসদেবের মতে জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিবার মৌলিক উপায় তিনটী ; যথা :—

(১) জমির স্রষ্টা কে এবং কোথায় বিদ্যমান আছেন, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া।

(২) জমির মৃত্তিকার মূল উপাদান কোন্ বস্তু এবং ঐ মূল উপাদান হইতে জমির মৃত্তিকা কোন পদ্ধতিতে এবং কোন কার্য্যনিয়মে উৎপন্ন হয়; তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া।

(৩) জমির উৎপাদন-শক্তির সৃষ্টি, রক্ষা, বৃদ্ধি ও ক্ষয় হয় কোন্ কোন্ কার্য্যপদ্ধতিতে এবং কোন্ কোন্ কার্য্যনিয়মে, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া।

আমাদিগের মতে জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিবার উপরোক্ত তিনটী মৌলিক উপায় পরিজ্ঞাত হইয়া তদনুযায়ী বিধি ও নিষেধগুলি পালন করিলে এখনও প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব। জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি সম্পূর্ণভাবে বৃদ্ধি করিতে পারিলে প্রত্যেক দেশেই ঐ দেশের সমগ্র লোক-সংখ্যার প্রয়োজনানুরূপ শিল্প ও কারুকার্য্যের কাঁচামাল উৎপাদন করা সহজসাধ্য হইবে এবং তখন শিল্প ও কারুকার্য্য অপেক্ষাকৃত অনেক কম ক্লেশ-সাধ্য হইবে। **তখন আর শিল্প ও কারু-কার্য্যের জন্য ধনিকের প্রয়োজন হইবে না। জনসাধারণই শিল্প ও কারুকার্য্যের দায়িত্ব নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন।**

কাঁচা মাল যাহাতে প্রচুর পরিমাণে জনসাধারণের প্রত্যেকে স্বাধীন কার্য্যের দ্বারা পাইতে পারেন, ধনিকের সহায়তা ব্যতীত স্বাধীনভাবেই জনসাধারণের প্রত্যেকে যাহাতে শিল্প ও কারুকার্য্য করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা হইলে বিতরণের ব্যবস্থার কোন কথাই প্রয়োজন হয় না, ইহা বলাই বাহুল্য।

আমাদিগের মতে একদিকে যেরূপ শ্রমজীবি-গণের অর্থাভাব দূর করিবার প্রয়োজন, সেইরূপ আবার বুদ্ধিজীবিগণের অর্থাভাব দূর করিবারও প্রয়োজন আছে।

বুদ্ধিজীবিগণের অর্থাভাব দূর করিবার প্রধান উপায় ছয়টী, যথা :—

(১) বুদ্ধিজীবিগণের প্রত্যেকে যাহাতে জমির উৎপাদনশক্তির সৃষ্টি, রক্ষা ও ক্ষয় হয় কোন্ কোন্ কার্য্যপদ্ধতিতে এবং কোন্ কোন্ কার্য্য-নিয়মে তাহা জানিতে পারেন তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(২) জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির ক্ষয় নিবারিত করিতে হইলে এবং উহার রক্ষা ও পুষ্টিসাধন করিতে হইলে যে যে বিধি ও নিষেধ পালন করা একান্ত প্রয়োজনীয় তাহা যাহাতে বুদ্ধিজীবিগণ পরিজ্ঞাত হইতে পারেন তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(৩) যে যে নিয়মে শিল্প, কারুকার্য্য ও বাণিজ্য পরিচালিত করিলে জনসাধারণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প পরিশ্রমে প্রয়োজনীয় সুখ ও শান্তি লাভ করা সম্ভব হয় তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(৪) বুদ্ধিজীবিগণের প্রত্যেক সন্তান যাহাতে উপরোক্ত ত্রিবিধ শিক্ষায় সুশিক্ষিত হন তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে বাধ্য করিবার ব্যবস্থা করা।

(৫) বুদ্ধিজীবিগণের সন্তানগণের মধ্যে যাঁহারা উপরোক্ত ত্রিবিধ শিক্ষায় সুশিক্ষিত হন, তাঁহাদের প্রত্যেকে যাহাতে রাজকার্য্যের দায়িত্ব পান, রাজকর্ম্মচারী হিসাবে যাহাতে তাঁহাদের প্রত্যেকে আন্তরিকভাবে জনসাধারণের কৃষি, শিল্প, কারু-কার্য্য ও বাণিজ্যের সহায়তা করেন, তাঁহাদের কাহারও যাহাতে কোনরূপ অর্থাভাব না থাকে এবং তাহাদের প্রত্যেকে যাহাতে জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হন তাহার ব্যবস্থা করা।

(৬) বুদ্ধিজীবিগণের সন্তানগণের মধ্যে যাঁহারা উপরোক্ত ত্রিবিধ শিক্ষায় সুশিক্ষিত না হন, তাঁহারা যাহাতে হয় শ্রমজীবী হইতে বাধ্য হন নতুবা দণ্ডপ্রাপ্ত হইতে বাধ্য হ'ন তাহার ব্যবস্থা করা।

আমাদিগের মতে যাহাতে জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং যাহাতে প্রত্যেক দেশে যে সমস্ত কাঁচা মালের প্রয়োজন হয় তাহা যাহাতে জনসাধারণ প্রচুর পরিমাণে পাইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা না করিয়া কেবল মাত্র বিতরণের পন্থার সংস্কারসাধন করিলে জনসাধারণের অর্থাভাব লাঘব পক্ষে বিন্দুমাত্রও ফলোদয় হইবে না। বরং বিশৃঙ্খলার মাত্রা ক্রমশঃই তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিবে।

চতুর্থ পার্থক্য এই যে—

যুদ্ধলিপ্ত গভর্ণমেণ্টসমূহের নেতৃবর্গ মনে করেন যে, "আমরা আর কখনও যুদ্ধ করিব না, সকলের অর্থাভাব যাহাতে দূর হয় আমরা সমস্ত শক্তি মিলিত হইয়া তাহার কার্য্য করিব," সকলে মিলিয়া এবম্বিধ একটা চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিলেই যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি ও অর্থাভাবের তীব্রতা দূর করিবার কার্য্য সম্পাদিত হয়।

আমরা উহা মনে করি না। কি করিয়া যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি ও অর্থাভাবের তীব্রতা দূর হইতে পারে তাহার পন্থা নির্দ্ধারিত না হইলে, ঐ পন্থানুসারে বিধি ও নিষেধগুলি যাহাতে জনসাধারণ পালন করিতে বাধ্য হয় তাহার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে, কেবল মাত্র চুক্তিপত্রের দ্বারা অথবা কমিটি গঠনের দ্বারা কোন যথার্থ কার্য্য সাধিত হইতে পারে—ইহা আমরা মনে করি না।

আমাদের মতে এবারকার মহাযুদ্ধে সন্ধি-স্থাপন করিতে হইলে **সর্ব্বাগ্রে** শত্রু-মিত্র-নির্ব্বিশেষে জগতের সমস্ত শক্তিগুলিকে একটি সুবিধাজনক দেশে মিলিত হইতে হইবে। **দ্বিতীয়তঃ**, কোন্ পন্থায় সমগ্র মানব-সমাজ হইতে যুদ্ধ-প্রবৃত্তি ও অর্থাভাব সর্ব্বতোভাবে দূর হইতে পারে, তাহার পরিকল্পনা স্থির করিতে হইবে। **তৃতীয়তঃ**, কোন্ কোন্ সর্ত্তে সন্ধি স্থাপন করিলে যুদ্ধের প্রবৃত্তি ও অর্থাভাব দূর করিবার পরিকল্পনা কার্য্যযোগ্য করিতে পারা যায়, তাহা স্থির করিতে হইবে।

উপরোক্ত তিনটী কার্য্য সাধন করিবার পর যে পরিকল্পনায় যুদ্ধের প্রবৃত্তি ও অর্থাভাব দূর করা যায়, সেই পরিকল্পনার কার্য্য বাস্তবতঃ আরম্ভ করিতে হইবে।

সন্ধিসর্ত্ত নির্দ্ধারণ করিবার অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞান

কি কি সর্ত্তে সন্ধি স্থাপন করিলে মহাযুদ্ধের পুনরাবৃত্তির এবং সর্ব্বব্যাপী অর্থাভাবের তাণ্ডবলীলার সম্ভাবনা সর্ব্বতোভাবে উৎপাটিত হইতে পারে—তাহার কথা আমাদিগের মতে কেহই গভীরভাবে চিন্তা করিতেছেন না। আমাদের বিশ্বাস, যাঁহারা এক একটি রাজ্যের সর্ব্ববিধ দায়িত্বভার নিজ নিজ স্কন্ধে

গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের উপরোক্ত চিন্তা একান্ত প্রয়োজনীয়।

আজকালকার মানুষ সাধারণতঃ জগৎ-কারণ, ঈশ্বর, ঈশ্বরের কার্য্য-নিয়ম, প্রকৃতি, পুরুষ, প্রকৃতি ও পুরুষের কার্য্য-নিয়মের কথা স্মৃতিপথে জাগ্রত রাখিবার প্রয়োজন স্বীকার করেন না। এই মানুষগুলিকে মনে রাখিতে হইবে যে, যিনি যতই বলশালী ও বুদ্ধিমান হউন না কেন, কাহারও পক্ষে জগৎ-কারণ ও ঈশ্বরকে বাদ দিয়া বলশালী ও বুদ্ধিমান হওয়া সম্ভব নহে। বলের মূল উপাদান যে বাহু ও পদ—তাহার অবয়বের ও কার্য্য-প্রবৃত্তির সৃষ্টি কোন মানুষের দ্বারা সম্ভব নহে। যিনি যতই বলশালী ও বুদ্ধিমান হউন না কেন, জগৎ-কারণ ও ঈশ্বরের দেওয়া বাহু ও পদের অবয়ব ও কার্য্য-প্রবৃত্তি না থাকিলে তাঁহার পক্ষে কোন বল অথবা বুদ্ধি লাভ করা সম্ভব হয় না। যিনি যতই বলশালী, বুদ্ধিমান ও পদস্থ হউন না কেন, ঈশ্বরের দেওয়া ভূমি, জল ও বাতাস না থাকিলে কাহারও পক্ষে কোনও বল অথবা বুদ্ধি অথবা পদ লাভ করা ত' দূরের কথা, বাঁচিয়া থাকাই সম্ভব হয় না।

জগৎ-কারণ ঈশ্বর ও ঈশ্বরের নিয়মের কথা বাদ দিয়া আজকালকার অজ্ঞতার ফলে মানুষ চলিবার কল্পনা করে বটে, কিন্তু মানুষকে মনে রাখিতে হইবে যে যিনি যতই উচ্চপদস্থ হউন না কেন, ঈশ্বরকে বাদ দিয়া তাঁহার কোন অহঙ্কারের সামগ্রী নাই। প্রত্যেককেই মূলতঃ 'পরের ধনে পোদ্দারী' করিতে হইতেছে। কেহই কোন কার্য্য ঈশ্বরের নিয়মের বাহিরে করিতে সক্ষম নহেন।

যাঁহারা রাজ্যপরিচালনার গুরু দায়িত্ব নিজ নিজ স্কন্ধে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন তাঁহারা অহঙ্কারে আত্মহারা হইতে পারেন বটে, মানুষের শাস্তির সীমানা হইতে তাঁহারা দূরে থাকিতে পারেন বটে, কিন্তু ঈশ্বরের কার্য্যের নিয়মানুসারে যে শাস্তি ও পুরস্কার আছে তাহার গণ্ডীর বাহিরে কখনও থাকিতে সক্ষম নহেন।

কি কি সর্ত্তে সন্ধিস্থাপন করিলে মহাযুদ্ধের পুনরাবৃত্তি এবং সর্ব্বব্যাপী অর্থাভাবের তাণ্ডবলীলার সম্ভাবনা সর্ব্বতোভাবে বিদূরিত হইতে পারে তাহা যুদ্ধলিপ্ত প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টের প্রত্যেক নেতার সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতম চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত।

এই চিন্তায় মূলতঃ কোন্ কোন্ বিষয়ক জ্ঞানের প্রয়োজন এবং ঐ ঐ বিষয়ক জ্ঞানের কথা কোথায় পাওয়া যায়, তাহা আমরা এই প্রবন্ধের প্রথম ভাগেই বলিয়াছি।

এই প্রবন্ধের প্রথম ভাগেই আমরা দেখাইয়াছি যে, মহাযুদ্ধের পুনরাবৃত্তি এবং তীব্র আর্থিক অস্বচ্ছলতার তাণ্ডবলীলা যাহাতে মানবসমাজে অসম্ভব হয়, সেইরূপভাবে সন্ধির সর্ত্ত নির্দ্ধারণ করিতে হইলে যে সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান অত্যাবশ্যকীয় তাহাদের সংখ্যা মূলতঃ চারিটী, যথা :—

(১) এই ভূমণ্ডলে যে সমস্ত প্রকৃতিগত বস্তু কঠিন (solid), তরল (liquid) ও বায়বীয় (aerial) অবস্থায় দেখা যায় তাহার কোন্টী মূলতঃ কোন্ কাঁচামাল হইতে প্রস্তুত হয় এবং ঐ সমস্ত কাঁচামালের মূল কোথায় কোন্‌রূপে আছে এবং তাহার গুণ (properties) এবং বৃত্তি (functions) কি কি—তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান।

(২) যে সমস্ত কাঁচামাল ভূমণ্ডলের প্রত্যেক প্রকৃতিজাত বস্তুর মূল উপাদান, সেই সমস্ত কাঁচামালের স্রষ্টা কে এবং তিনি কোথায় থাকেন—তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান।

(৩) উপাদানের পরিণতি-পদ্ধতি কি কি—তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান।

(৪) উপাদানগুলির সৃষ্টির ও পরিণতির নিয়ম কি কি—তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান।

ইহা ছাড়া এই ভূমণ্ডলে যে সমস্ত প্রকৃতিজাত বস্তু কঠিন, তরল ও বায়বীয় অবস্থায় দেখা যায়, তাহাদের প্রত্যেকটীর উৎপাদন, রক্ষা, পুষ্টি ও ক্ষয় কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে ও কোন্ কোন্ নিয়মে সম্পাদিত হইতেছে তাহাও জানিবার প্রয়োজন হয়।

আমরা ইহাও দেখাইয়াছি যে, ঐ পাঁচটী বিষয়ের জ্ঞান ইংরাজী, বাংলা এবং সংস্কৃতে লিখিত কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। উহা পাওয়া যায় একমাত্র ব্যাসদেবের লিখিত গ্রন্থে।

উপরোক্ত পাঁচটী বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই যে বর্ত্তমান যুদ্ধের সন্ধির সর্ত্ত নির্দ্ধারণ করা সম্ভব, তাহা নহে।

যাহাতে এই যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি এবং অর্থাভাবের তাণ্ডবলীলা সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব হয় তদনুরূপ সন্ধির সর্ত্ত নির্দ্ধারণ করিতে হইলে প্রথমতঃ, মানুষের হৃদয়ে যুদ্ধের প্রবৃত্তি, মানুষের অবস্থার আর্থিক অস্বচ্ছলতা এবং মানুষের প্রাণে দুঃখের বেদনা কোন্ কোন্ কারণে উদ্ভব হয় তাহা সঠিকভাবে স্থির করিতে হইবে। যে পাঁচটী মৌলিক জ্ঞানের কথা আমরা সর্ব্বাগ্রে লিখিয়াছি সেই পাঁচটী মৌলিক জ্ঞান অর্জ্জন করিতে না পারিলে উপরোক্ত তিনটী কারণ সঠিকভাবে স্থির করা সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, ঐ তিনটী কারণ কোন্ কোন্ অবস্থায় সর্ব্বতোভাবে দূর করা এবং উহাদের পুনরাবৃত্তি অসম্ভবযোগ্য করা সম্ভব হইতে পারে তাহার পরিকল্পনা স্থির করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক দেশের গভর্ণমেণ্টের সংগঠন কিরূপভাবে পরিবর্ত্তিত করিলে, উপরোক্ত (দ্বিতীয় দফায় কথিত) পরিকল্পনাগুলি কার্য্যপ্রসূ করা যাইতে পারে তাহা স্থির করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ, কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে সমগ্র ভূমণ্ডলে সমস্ত গভর্ণমেণ্টের একতা স্থাপন করা ও রক্ষা করা সম্ভব হইতে পারে তাহা স্থির করিতে হইবে।

পঞ্চমতঃ, প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের ব্যক্তিগত আচার ও ব্যবহার কি নিয়মে পরিচালিত হইলে, ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তি, আর্থিক অস্বচ্ছলতা ও সর্ব্ববিধ দুঃখকষ্টের আশঙ্কা সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত হইতে পারে তাহা স্থির করিতে হইবে।

উপরোক্ত পঞ্চবিধ কারণ নির্দ্ধারণ ও কার্য্য-পরিকল্পনা স্থির করিতে পারিলে যে যে সর্ত্তে সন্ধি হইলে মনুষ্যসমাজে মহাযুদ্ধের পুনরাবৃত্তি ও আর্থিক অস্বচ্ছলতার তাণ্ডবলীলা তিরোহিত হইতে পারে, সেই সেই সর্ত্ত নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয়। অন্য কোন উপায়ে অথবা বিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধীয় যে পাঁচটী মৌলিক জ্ঞানের কথা উল্লেখ করিয়াছি ঐ পাঁচটী জ্ঞান অর্জ্জন না করিতে পারিলে সন্ধির সর্ত্ত যথাযথভাবে নির্দ্ধারণ করা কখনও সম্ভব নহে।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, মনুষ্যসমাজ এখন যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে তাহাতে মহাযুদ্ধের অবসান হওয়া একান্ত প্রয়োজন। প্রকৃতির নিয়মানুসারে এই সন্ধি স্থাপনার কার্য্যে বিরোধিতা করা কোন মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। অহঙ্কারের বশে যদি কোন মানুষ ইহার বিরোধিতা করে, তাহা হইলে জগত দেখিতে পাইবে যে মানুষের চরম অবস্থা কিরূপ ভীষণতায় উপনীত হয়!

মহাযুদ্ধের অবসানের সন্ধিসর্ত্তের অবশ্য উপাদান দুইটী, যথাঃ—

(১) কোন মহাযুদ্ধের পুনরাবৃত্তি যাহাতে সহস্র সহস্র বৎসর মধ্যে না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা সম্পাদন করা।

(২) আর্থিক অস্বচ্ছলতা যাহাতে মনুষ্যসমাজের কোন সংসারে প্রবেশলাভ করিতে না পারে তাহারই ব্যবস্থা করা।

উপরোক্ত দুইটী উপাদান যাহাতে সন্ধির সর্ত্তে নিখুঁতভাবে সন্নিবেশিত হয় তাহা করিতে হইলে বিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধে যে যে বিষয়ক জ্ঞানের প্রয়োজন সেই সেই বিষয়ক জ্ঞান প্রচলিত বিজ্ঞান ও দর্শন হইতে লাভ করা করা সম্ভব নহে। উহা লাভ করিতে হইলে ভারতবর্ষের ব্যাসদেবের দেওয়া বিজ্ঞান ও দর্শন একান্ত প্রয়োজন।

আমাদের কাছে ব্যাসদেবের দেওয়া বিজ্ঞান ও দর্শনের ঐ জ্ঞানের কথা পাওয়া যাইতে পারে। কোন্ কোন্ সর্ত্তে সন্ধি করিলে মানবসমাজে কোন মহাযুদ্ধের পুনরাবৃত্তি ও আর্থিক অস্বচ্ছলতার তাণ্ডবলীলা অসম্ভব হইতে পারে তাহার কথাও আমাদের নিকট আছে।

আমাদিগের নিকট হইতে ঐ কথাগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য যুদ্ধলিপ্ত গভর্ণমেন্টের নেতৃবর্গকে আহ্বান করিতেছি।



পত্র

শ্রীক্ষেত্র
Camp পর্ণশালা (পণ্ডশালা নহে)

মাননীয় "বঙ্গশ্রী" সম্পাদক মহাশয় !

উপক্রমণিকা—আপনাদের খেলোয়াড়ী মনোবল, অর্থাৎ কিনা Sportsmanly spirit আছে দেখিতেছি। ইহার প্রমাণ, আমার বিগত বঙ্গশ্রী অভিযানের বিবরণের প্রকাশ।

আপনাদের সমালোচনা করিবার জন্যই শ্রীক্ষেত্রে আসিয়াছিলাম, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখানে আসিয়া কিন্তু একটা বৈষয়িক মতলব ঠিক করিয়াছি। বর্ত্তমান কাগজসমস্যার সমাধান কল্পে শ্রীক্ষেত্রের পবিত্র বালুকা-রাশি ব্যবহার করা যায় না কি? সাধু! ধণিক্-বণিক সম্প্রদায় আসিয়া সমুদ্রতীরে Sri Jagannath Paper Mills Ltd. নামক প্রস্তাবিত শিল্পকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবেন কি? আমাকে যদি Managing Agent করেন, তাহাতে কোনও আপত্তি নাই।

এই সকল ব্যবসায়িক প্রস্তাব সমূহ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কয়েক-দিনের জন্য ধনিক বণিক সম্প্রদায়ের কেন্দ্র কলিকাতায় আসিতে হইল। পথে আসিতে আসিতে অনেকগুলি সেতু অতিক্রম করিয়াছিলাম। বঙ্গশ্রী অভিযানে বহুবার সেতুর হেতু অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে, তাহা আপনারা অবগত আছেন। স্মরণ করিলাম, যোড়া "সেতু" (=যোড়াসাঁকো) নিবাসী বিশ্বকবিও বলিয়াছেন—

"তোমায় আমায় এই বিরহের অন্তরালে
কত আর সেতু বাঁধি॥"

যাহা হউক, কলিকাতায় আসিয়া দেখিতে পাইলাম যে উভয় তীরের বিরহের অবসান ঘটিয়াছে; আর দৈনিক বিরহের অন্তরালে দৈনিক সেতু বাঁধার হাঙ্গামা নাই। শুনিলাম, বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়াই পৌরজনসভা তাঁহাদের ত্রৈমাসিক আমন্ত্রণলিপিতে (Rate Bills) এই প্রস্তাবিত কলিকাতা-হাওড়া মিলনের রাখীরাখী বাঁধিয়া আসিতেছেন—এ যেন "ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা।" আরও অবগত হইলাম যে, কতিপয় বে-রসিক ব্যক্তি এই শুভ মিলনের ধারাবাহিক লৌকিকতার ব্যয় বহনে অক্ষমতা জানাইয়া পৌরসভাকে এক আর্ট হীন দেশালাই হীন (অর্থাৎ Matchless) আবেদন করেন, এবং তদুত্তরে পৌরসভা (Corporation) কেবলমাত্র এইটুকু বলেন "বাঁধিনু যে রাখী পরাণে তোমার, সে রাখী খুলো না, খুলো না।"

পরে দেখিতে পাইলাম, "বঙ্গশ্রী"র পরিচালকবর্গ আপাততঃ সেতুবন্ধ (=সেতু পথে চলাচল বন্ধ) করিয়াছেন। সুতরাং সেতুঘটিত আলোচনার এইখানেই উপসংহার (পুরাপুরি সংহার নহে) হউক।

কলিকাতায় কয়েকদিন বসি করিয়া আমার কল্পনাকে কার্য্যকরী করিয়া ফেলিয়াছি। কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলী গঠন করিবেন। "বাসবদত্তা এণ্ড কোং" এর মথুরা নিবাসী কে একজন উপগুপ্ত শর্ম্মা প্রধান under writer হইতে ইচ্ছুক আছেন। পরিকল্পনার পারিশ্রমিক বাবদ উক্ত সুধী কলাকারবৃন্দ আমাকে Outright কদলী প্রদর্শন না করিয়া, যৎকিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক দিবেন, ইহাই শুনিলাম; অথচ আগামী শ্রীরথযাত্রার দিবসে আমারই পরিকল্পিত Jagannath Brand কাগজ বিক্রয়ার্থ বাজারে বাহির হইবে শুনিলাম! ইহাই নাকি দীন্ দুনিয়ার দিনগত নিয়ম।

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, পুণ্যক্ষেত্রে সমুদ্রতীরে একটি ছোট কুটীর প্রস্তুত করাইতেছিলাম। কারণটা obvious! অতিথিবৎসল বন্ধুর গৃহে তো আর সুদীর্ঘকাল বসিয়া business drive করা চলে না। যুদ্ধের দুর্ম্মূল্যতার বাজারেও অতিকষ্টে প্রয়োজনীয় মালপত্র কিনিয়াছিলাম। হঠাৎ শ্রীক্ষেত্র হইতে আমার জনৈক বিল্ডিং তত্ত্বাবধায়কের পত্র পাইলাম, তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ:—"সমুদ্রের জলে সমস্ত চুণ ধুইয়া গিয়াছে, শ্রীধামের শ্রীবানরগণ সমস্ত টালী ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, ইঁট যা' ছিল সমস্ত চুরি হইয়াছে এবং আকস্মিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হেতু কাঠওয়ালা আর পূর্ব্ব মূল্যে মাল দিতে চাহিতেছে না।" কি আর বাকী রহিল? পত্র প্রেরক কিন্তু লিখিয়াছেন 'সত্বর আসিয়া ইহার প্রতিকার করুন।"

প্রতিকার যে কি প্রকারে এবং কতদূর করিতে পারিব, তাহা ভালরকম জানা আছে। যাহা হউক, কলিকাতায় থাকিতে ভাল লাগিতেছিল না, সেইজন্য "প্রতিকার" চেষ্টায় পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে শ্রীক্ষেত্রে ফিরিয়া গেলাম। এমন সময় দেখি, পুনরায় "বঙ্গশ্রী-অভিযান" করিতে হইবে।

বিষয়-বস্তু

"বঙ্গশ্রী"র নববর্ষ সংখ্যার সমালোচনা করিতে গিয়া বড় বিপদে পড়িলাম। প্রথমতঃ, ক্রমশঃ প্রকাশ্য রচনার সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িতেছে, এবং ক্রমশঃ রচনাবলী সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কলমবাজী করিব না বলিয়াই পরিচালকগণ আমাকে ঠেকাইয়া রাখিলেন। দ্বিতীয়তঃ, দার্শনিক বা ঐতিহাসিক রচনাগুলির সমালোচনা করিবার মত বিদ্যাবুদ্ধি নাই, সুতরাং আমার কিছুই বলিবার নাই।

বর্ত্তমান সংখ্যার বিশিষ্ট সম্পদ পত্রিকার গোড়ার কবিতা ও শেষের কবিতা (কবিগুরু বিরচিত নহে)। ভাব, ভাষা ও ছন্দে কবিতা দুইটি অপরূপ অভিনব। গোড়ার কবিতায় যৎসামান্য ছন্দ ত্রুটী থাকিলেও, বিষয়ের সাময়িকতায় ও রচনা মাধুর্য্যে তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আসে না। Parallel Passage (অর্থাৎ সমান্তরাল পথ?) খুঁজিতে গেলে প্রথমশ্রেণী কবিদের নিকট পৌঁছিতে হয়। কবিতার ভাষায় যেন বিগত ও অনাগত কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে পাইতেছি।

"বঙ্কিম সাহিত্যে নারী"—লেখক শ্রীউপগুপ্ত শর্ম্মা। রচনার চাতুর্য্যে ও নিপুণতায় অতি উপাদেয় হইয়াছে সন্দেহ নাই। বঙ্কিম সাহিত্যের মূল্যবান্ চন্তাশীল অনুশীলন ও বিশ্লেষণ।

"দীপধারী"—নূতন ক্রমশঃ উপন্যাস। আপাততঃ বন্দুকধারী ও লাঠিধারীর দ্বন্দ্বযুদ্ধে বিচলিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া কাষ্ঠাসন হইতে লাফাইয়া উঠিলাম। অধিক কিছু বলিয়া prejudice সৃষ্টি করিব না। বর্ত্তমান নিষ্প্রদীপের পরিস্থিতিতে দীপধারী অসুবিধায় পড়িবেন না ত?

"অপমানিত"—K-3 ও রচিত। জমিয়া আসিতেছে মনে হয়।

এরোপ্লেন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যে প্রবন্ধটি মূল্যবান্।

"আলাস্কা"—বৈদেশিকী। রচনা সুন্দর, বিষয় মনোযোগ আকর্ষণ করিবে। এবারে পূর্ব্ব পরিচিত নামহীন পরিব্রাজক নীরব রহিয়াছেন।

ক্ষুদ্র রিয়্যালিষ্টিক কবিতা "সস্তা চিনি" লেখককেও যেন চিনি বলিয়া মনে হয়। কে যেন বলিয়াছিল, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও যেন একদা চিনির অভাবে ক্ষুব্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন "আমার মন বলে চিনি চিনি।" আলোচ্য কবিতায় কনট্রোল-দোকানের uncontrolled ব্যবস্থার দৃশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পুস্তক-সমালোচনা, খেলাধূলা, সংবাদ সাহিত্যিক-বিবিধ প্রসঙ্গ প্রভৃতিও আছে।

আলোচ্য সংখ্যায় শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মী দেবীর সুন্দর ত্রিবর্ণ চিত্র দেওয়া হইয়াছে।

ইহা ছাড়াও কয়েকটি ছোট গল্প ও কবিতা আছে। এবারে সমালোচনা করিবার মত mood ছিল না, পূর্ব্বেই তাহা বলিয়াছি সুতরাং আপাততঃ বিদায় লইলাম। ইতি—

আপনাদের Faithfully
অশোক মিত্র।